...মানন্দ চট্টোপাধ্যায়

৬৩

প্রবাসী

কার্ত্তিক—১৩৭১

প্রবাসী—কার্ত্তিক, ১৩৭৯

সূচীপত্র

মানন্দ চট্টোপাধ্যায়

প্রবাসী

প্রবাসী—অগ্রহায়ণ ১৩৭৯

সূচীপত্র

মানন্দ চট্টোপাধ্যায়
প্রবাসী

প্রবাসী—পৌষ, ১৩৭৯

সূচীপত্র

মানন্দ চট্টোপাধ্যায়

প্রবাসী

মাঘ—১৩৭১

প্রবাসী—মাঘ, ১৩৭৯

সূচীপত্র

প্রবাসী
ফাল্গুন—১৩৭৯

প্রবাসী—ফাল্গুন, ১৩৭৯

সূচীপত্র

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়
চৈত্র
প্রবাসী

প্রবাসী—চৈত্র ১৩৭৯

সূচীপত্র

লায়লা-মজনু

ঃঃ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ঃঃ

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৭২তম ভাগ
দ্বিতীয় খণ্ড

কার্ত্তিক, ১৩৭৯

১ম সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

দারিদ্র্য দূর করিতে হইবে

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বলিয়াছেন ভারতবর্ষ হইতে দারিদ্র্য দূর করিতে হইবে। ভারতবর্ষে বর্তমান যুগে তিনিই যে এই কথা প্রথমে বলিয়াছেন এমন নহে। তাঁহার পূর্ব্বে বহু রাষ্ট্রনেতা সমাজ-সংস্কারক, এমন কি ব্যবসাদারগণও ঐ কথা বলিয়াছেন। দারিদ্র্যের মূল কোথায় তাহা অনুসন্ধান করিবার জন্য বহু মনীষী আত্ম-নিয়োগ করিয়াছেন, এবং সমাজ সংস্কার বা শিক্ষার বিস্তার লইয়া যাঁহারা আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছেন তাঁহারাও কোন কোন জাতির বা গোষ্ঠীর অনুন্নত অবস্থার মূলে যে দারিদ্র্যই প্রকটভাবে উপস্থিত আছে সেই কথা বলিয়া অনুন্নত সম্প্রদায়গুলিকে শিক্ষাদান ও নূতন নূতন ভাবে কর্ম্মকৌশলী করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন।

মহাত্মা গান্ধী যে চরকা কাটা প্রবর্তন করিয়াছিলেন তাহার মূলেও ছিল অবসর সময়ে অর্থকর কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া দারিদ্র্যের হস্ত হইতে কিছুটা মুক্তিলাভের চেষ্টা। রবীন্দ্রনাথের শ্রীনিকেতনে ছিল গ্রামবাসীদিগকে নূতন পন্থায় চাষ-বাস করিতে শিক্ষা দেওয়ার, এবং বৎসরের বহু সময় যে চাষ করিবার কার্য্য না থাকায় মানুষ বসিয়া বসিয়া সময় নষ্ট করে তাহার প্রতিকার ব্যবস্থার জন্য তাহাদিগকে অপরাপর কার্য্য শিক্ষা দেওয়ার প্রচেষ্টা। ইহার মূলেও ছিল গরীব গ্রামবাসীকে নানাপ্রকার ভোগ্যবস্তু উৎপাদন করিয়া নিজেদের দারিদ্র্য দূর করিতে শিখাইবার আদর্শ।

কিন্তু বহু উন্নতমনা আদর্শবাদীর নানান চেষ্টার পরেও ভারতবর্ষ হইতে দারিদ্র্য দূর হয় নাই। এখনও ভারতবর্ষে প্রায় কুড়ি কোটি লোকের বাস যাহারা দৈনিক ৫০/৬০ নয়া পয়সার অধিক ব্যয় করিতে পারে না এবং কোন মতে জীবনধারণ করিতে সক্ষম হয়।

দারিদ্র্য দূর করিতে হইলে সর্বাগ্রে আবশ্যক এইসকল ব্যক্তিকে এরূপ ভাবে কার্য্যক্ষম করিবার ব্যবস্থা করা যাহাতে তাহারা অন্ততঃ দৈনিক এক টাকা রোজগার করিতে পারে। অর্থাৎ যাহারা বর্তমানে রোজগার করিয়া নিজ নিজ পরিবার প্রতিপালন করে তাহাদিগের রোজগার এরূপ হওয়া আবশ্যক যাহাতে তাহাদের পরিবারস্থ সকল ব্যক্তির জন্য দৈনিক মাথাপিছু এক টাকা ব্যয় করা সম্ভব

হয়। পরিবারে যদি এক এক রোজগারী ব্যক্তির পিছনে আরও দুইজন করিয়া প্রতিপালিত ব্যক্তি থাকে তাহা হইলে কর্মীর রোজগার অন্ততঃ মাসিক নব্বই টাকা হইয়া আবশুক। আজকাল কারখানায় যাহারা কাজ করে তাহারা অনেক ক্ষেত্রেই মাসে ১৫০।৩০০ টাকা উপায় করিয়া থাকে। ক্ষেতে যাহারা কার্য্য করে তাহারাও দৈনিক দেড়টাকা নগদ ও ১॥।২ টাকা প্রমাণ খাদ্যবস্তু পাইয়া থাকে। সুতরাং যাহারা মাসিক নব্বই টাকাও পায় না, তাহারা বৎসরের অনেকাংশ বেকার থাকে অথবা অতি অল্প উৎপাদনের কার্য্যে স্বয়ং নিযুক্ত হইয়া দিন গুজরান করে। অনেকে ভিক্ষা করিয়া খায় ও বহু ব্যক্তি নানাপ্রকার অবৈধ কার্য্যে লিপ্ত থাকে বলিয়া তাহাদিগের কোনও রোজগার নাই বলিয়া ধরা হয়। সুতরাং দারিদ্র্য দূর করিবার যে সমস্যা তাহা দেখা যাইতেছে বেকারত্বের এবং অল্প বেতনের অথবা অত্যল্প উৎপাদনের সমস্যা। বেতন বৃদ্ধিও উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধির উপর নির্ভর করে। অর্থাৎ যেখানে চাষের ক্ষেত্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, দোকানের বিক্রয়-সামগ্রী পরিমাণে ও মূল্যে অল্পই এবং অন্যান্য সম্পদও বহু ভাগীদার-সঙ্কুল, সেখানে বেতন অথবা আয়বৃদ্ধি কঠিন বলিয়াই মনে হয়। চাষের জমির আয়তন বৃদ্ধির সম্ভাবনা নাই, কারণ, এক এক ব্যক্তির অধিকৃত জমির পরিমাণ বণ্টনের ফলে ক্রমশঃ আয়তনে হ্রাসের দিকেই যাইতেছে। দোকান-বাজারে বহু মাল বিক্রয়ের জন্ম আসিবে, এরূপ আশাও করা যায় না। ভিক্ষুক, সন্ন্যাসী ও স্বভাবতঃ পরগলগ্রাহী ব্যক্তিরা অকস্মাৎ উপার্জ্জন করিতে লাগিয়া পড়িবে এরূপ সম্ভাবনাও দেখা যায় না।

তাহা হইলে কি করিয়া দারিদ্র্য দূর করা সম্ভব হইতে পারিবে? যদি সকল বেকার ব্যক্তির কোনও না কোনও কাজ জুটিয়া যায় তাহা হইলে তাহাদিগের বেতন যে মাসিক ১৫০ টাকার অধিক হইবে ইহাই বা কে বলিতে পারিবে? ১৫০ টাকার কম হইলে তাহারা গরীবই থাকিয়া যাইবে। ভারতের অধিকাংশ লোক কৃষিকার্য্যের উপরই অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নির্ভরশীল। ঐ ক্ষেত্রে এক এক ব্যক্তি যতটা উৎপাদনের সহিত জড়িত থাকে তাহা নির্ভর করে কৃষকের জমির পরিমাণের উপর। জমির পরিমাণ ক্রমশঃ কমিয়াই চলিয়াছে সুতরাং উৎপন্ন ফসল হঠাৎ অধিক বাড়িয়া যাইতে হইলে সেচন ও সার সরবরাহের উপরই তাহা নির্ভর করিতে পারে। শ্রীমতী গান্ধী যদি ভারতের সকল কৃষিক্ষেত্রেতেই জল সেচন ব্যবস্থা করিতে পারেন তাহা হইলে কিছু কিছু মানুষ দারিদ্র্যের কবল হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবে। অন্যদিকে কারখানার সংখ্যাবৃদ্ধি প্রভৃতি অর্থনৈতিক প্রগতির আশা ততটা নাই, কেননা ভারতের অর্থনীতি যতটা অধিকভাবে সমাজবাদ অবলম্বনে চলিতেছে' ব্যক্তিগতভাবে কারখানা গঠনের সম্ভাবনা ততটা কমিয়া যাইতেছে এবং সমাজবাদী অর্থনীতি যে একাধারে লক্ষ লক্ষ একর চাষের ক্ষেত্রের সেচন ব্যবস্থা এবং তৎসঙ্গেই নানান প্রকার কারখানা স্থাপন করিয়া কয়েক কোটি মানুষের বেকারত্ব দূর করিবার আয়োজন সম্পূর্ণ করিবে এই আশা বাস্তব অবস্থা বিচার করিয়া করা চলে না। অপরাপর যে-সকল কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়া মানুষ দারিদ্র্যে নিষ্পেষিত অবস্থায় কষ্টভোগ করিয়া জীবন যাপন করিতেছে সেই সকল কার্য্যে তাহাদের উপার্জ্জন বৃদ্ধি হইবে ইহাও অনেকাংশে কষ্ট-কল্পনার কথা।

দারিদ্র্য দূর করিবার উপায় কি

দারিদ্র্য দূর করা কঠিন। কিন্তু তাহা কি অসম্ভব? এই পৃথিবীতে যাহা কিছু মানুষের অসাধ্য, দারিদ্র্য দূর করা তাহার মধ্যে পড়ে না। কারণ পৃথিবীর বহু দেশেই দারিদ্র্য প্রায় নাই বলিলেই চলে। এবং সেই সকল দেশের অধিবাসী জনসাধারণ আমাদেরই মত মানুষ। সুতরাং সেই সকল দেশ হইতে যদি দারিদ্র্য দূর করা সম্ভব হইয়া থাকে তাহা হইলে আমাদের দেশ হইতেও দারিদ্র্য দূর করা যাইবে বলিয়া ধরা যাইতে পারে। ঐ সকল দেশের অবস্থা অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের চক্ষে দেখিলে আমরা দেখিতে পাইব যে, ঐ সকল দেশের

মানুষ প্রধানতঃ পূর্ণ উদ্যমে কাজ করায় বিশ্বাস করে। কর্মস্থলে জায়গা জুড়িয়া বসিয়া থাকিয়া কাজ না করিয়া অল্প অল্প বেতন গ্রহণ করাতে ঐশ্বর্য্যশালী দেশের লোকেরা বিশ্বাস করে না। তাহারা ঘণ্টা হিসাবে কাজ করে ও উৎপন্ন বস্তুর মূল্যের একটা ন্যায্য অংশ নিজেদের প্রাপ্য বলিয়া গ্রহণ করে। ব্যস্ততার অভিনয় করিয়া নিয়োগ-কর্তাকে ঠকাইয়া যাহা পাওয়া যায় তাহাই লাভ, এই রীতি অনুসরণ তাহারা করে না। নিয়োগ-কর্তারাও কাহাকেও খাটাইয়া তাহাকে ন্যায্য বেতন না দিয়া নিজেদের লাভ বৃদ্ধি চেষ্টাতে বিশ্বাস করে না। অর্থাৎ পুরাপুরি কাজ করিয়া পুরাপুরি বেতন দেওয়া ও নেওয়ায় ঐ সকল ঐশ্বর্য্যশালী দেশের লোকেরা বিশ্বাস করে এবং সেইভাবেই ঐ সকল দেশে কাজকর্ম করা হইয়া থাকে। মালিক ও শ্রমিক উভয় পক্ষই সে কথা উত্তমরূপে জানেন বলিয়া ভাগ-বাট লইয়া মতবৈধ ঐ সকল দেশে ততটা হইতে পারে না। দ্বিতীয় কথা এই যে, যে সকল বস্তু উৎপন্ন হয় তাহা সবই প্রয়োজনীয় বস্তু। তাহা কোথায় কি মূল্যে বিক্রয় হইবে এই কথা লইয়া ব বিশেষ শিরঃপীড়া হয় না। বস্তু উৎপাদন ব পূর্বেই দেখিয়া লওয়া হয় তাহার চাহিদা আছে এবং কি মূল্যে কতগুলি বস্তু বিক্রয় হইতে পারে। মূল্যে মাল বিক্রয় করিলে ন্যায্য বেতনে শ্রমিক [illegible] করা যায় কি না এবং কাঁচামাল, শ্রমিকের বেতন প্রভৃতি দিয়াও ঐ মূল্যে মাল বিক্রয় করিয়া লাভ থাকে কিনা তাহাও উত্তমরূপে দেখিয়া লওয়া হয়। সুতরাং লাভ হইবে কি হইবে না প্রভৃতি অজানা আতঙ্ক কোন ব্যবসাদারকে আবিষ্ট করে না। এতদ্ব্যতীত যাহারা শ্রমিক ও ভোগ্য বস্তু উৎপাদনে নিযুক্ত তাহারাই আবার সেই সকল উৎপন্ন ভোগ্যবস্তু ক্রয় করিয়া নিজেদের ভোগে লাগায়। ইহাতে উৎপাদন ও ভোগের মধ্যে একটা পরস্পর সহায়তার সম্বন্ধ সৃষ্টি হইয়া অর্থনীতির অঙ্গে অঙ্গে একটা স্বাস্থ্যকর ভারসাম্য আবির্ভূত হইতে দেখা যায়। অর্থ নৈতিকভাবে সুগঠিত দেশগুলির জনসাধারণ অসংখ্য ভোগ্য বস্তু ও অবাস্তব উপভোগ্য সেবা মূল্য দিয়া আহরণ করিয়া সম্ভোগ করিয়া থাকেন। এই কারণে ঐ সকল বাস্তব ও অবাস্তব মানব উপভোগ্য ক্ষেত্রব্যাপিচয় সরবরাহের কার্য্যে লক্ষ লক্ষ নরনারী উচ্চ বেতনে নিযুক্ত হইতে পারেন ও তাঁহারাই আবার সরবরাহকৃত ভোগ্য সকলের একটা বিরাট অংশ নিজেরাই ক্রয় করিয়া ব্যবহার ও ভোগ করিয়া থাকেন। অর্থাৎ ঐ সকল দেশের নরনারীর জীবন-যাত্রা প্রণালী বিশেষ উন্নত ও বহু শাখা-প্রশাখায় বিস্তৃত। আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষ শুধু মূল খাদ্য ও বস্ত্র সংগ্রহ চেষ্টাতেই উপার্জ্জিত অর্থের অধিক অংশই ব্যয় করিয়া থাকে। তাহাদের ক্রয় করিবার বস্তু বা সেবা এতই অল্প সংখ্যক যে তাহার সরবরাহের জন্য অধিক মানুষ নিযুক্ত হইতে পারে না। সুতরাং জীবনযাত্রার মান উন্নত ও ভোগ্য সকলের বৈচিত্র্য বৃদ্ধি না হইলে সকল ভারতীয়দের উৎপাদনী শক্তি কখনও পূর্ণ ব্যবহৃত হইতে পারিবে না।

জীবনযাত্রার মান নানাভাবে উন্নত ও বহু ্যর উপর নির্ভরশীল করিতে হইলে তাহার চেষ্টা াবশ্যক। এই দেশের মানুষ অর্থ থাকিলেও দ্রব্য- ী ক্রয় ও ব্যবহার করিতে অনিচ্ছুক। পূর্বে মানুষ াকিলেও নগ্নপদে ও অনাবরিত দেহে সর্বত্র বিচরণ [illegible]তেন। এখন সে অবস্থার অনেক পরিবর্তন হইয়াছে এবং জুতা-জামা বিক্রয় যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে। পূর্ব্বে বহুলোক এদেশে শুধু ডাল-রুটি অথবা ছাতু খাইয়া থাকিত। এখন তাহারাই খাদ্যের রকম বিচার করিতে শিখিয়াছে। গৃহের আসবাব বলিতে পূর্বে এবং বহু ক্ষেত্রে এখনও গদি, চাদর ও তাকিয়া কিম্বা শুধু মাদুর বা চাটাই দেখা যাইত। পৃথক বসিবার, শুইবার ঘর থাকিত না এবং উলঙ্গ শিশুদিগকে সর্বত্র নৃত্য করিয়া ঘুরিতে দেখা যাইত। এখন সাজ-পোশাক, আসবাব ইত্যাদি বহু গৃহস্থের বাসগৃহে দেখা যাইতেছে এবং সেই সকল বস্তুর প্রস্তুতি ও বিক্রয়ে নানান ব্যক্তির সংস্থান হওয়া সম্ভব হইয়াছে। কিন্তু ব্যাপারটা এখনও তেমন প্রসার লাভ করে নাই। বড় বড় শহরে কিছু কিছু নরনারী

আধুনিকত্বের আকর্ষণে জীবনযাত্রা পদ্ধতির পরিবর্তনে মন দিয়াছেন ও তাহার ফলে কিছু কিছু ভোগ্য উৎপাদন কার্য্য আরম্ভ হইয়া কিছু সংখ্যক ব্যক্তির রোজগারের পথ খুলিয়া গিয়াছে। কিন্তু লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি ব্যক্তির এখনও জীবনযাত্রা পদ্ধতি বলিতে যাহা আছে তাহা অত্যন্তই প্রাগৈতিহাসিক ও সকল বৈচিত্র্য বর্জ্জিত। এই কারণে ভারতের পঞ্চান্ন কোটি মানুষ যেভাবে বসবাস করেন তাহাতে উপযুক্ত বেতনে ও আধুনিক উপায়ে উৎপাদন কার্য্য পরিচালনা করিলে পাঁচকোটি মানুষেরও কর্মে নিযুক্ত হওয়া সম্ভব হয় কি না সন্দেহ। অতএব "গরীবি হটাও" নীতি যদি কার্য্যে পরিণত করিবার কোনও সত্য আগ্রহ আমাদের রাষ্ট্রনেতাদিগের মনে জাগিয়া থাকে তাহাহইলে সাদাসিধা ভাবে জীবন নির্বাহ বিষয়ে অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি না করিয়া বর্তমান সভ্যতার ধরণ-ধারণ ক্রমশ: কিছু কিছু অনুকরণ করা আরম্ভ করিতে হইবে।

সরল সহজ অনাড়ম্বর ভাবে বসবাস উচ্চ আদর্শ অনুগত হইলেও যদি সকল ব্যক্তি তাহাই করিতে থাকে তাহা হইলে কোটি কোটি মানুষের উচ্চ বেতনে কর্মে নিযুক্ত হওয়া কখনও সম্ভব হইবে না। শুধু ঘটি, বাটি, মাদুর, বালটি ও তেলের কুপি সরবরাহ করিয়া আধুনিক অর্থনীতির আদর্শ কখনও রক্ষিত হইতে পারে না। কোন সভ্যতা যদি মানুষকে সহস্র প্রকার দ্রব্য ও অবাস্তব সেবা সমূহ ক্রয় করিয়া ব্যবহার করিতে শিখায় তাহা হইলে সেই সভ্যতা যত ব্যক্তিকে কর্মে নিযুক্ত হইতে সক্ষম করিবে তাহার তুলনায় অপর কোন সভ্যতায় যদি ক্রেতব্য-সকল সংখ্যায় শতাধিক হইতেও না পারে তাহাতে কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তিদিগের সংখ্যা প্রথম সভ্যতার এক-দশমাংশ হইবার সম্ভাবনা হইবে। অর্থাৎ কর্মীদিগের পূর্ণ কর্মশক্তি ব্যবহার করিয়া তাহাদিগকে যদি উচ্চমানের জীবনযাত্রা নির্বাহের উপযুক্ত উপার্জ্জন করিতে সক্ষম করিতে হয়, তাহা হইলে সকল কর্মী মিলিতভাবে যত বিভিন্ন বস্তু ও ক্রয়যোগ্য সেবা উৎপাদন করিবেন সেই সকলই সমাজের সকল লোকের (কর্মীগণেরও) দ্বারা ক্রীত ও ব্যবহৃত হওয়া আবশ্যক। আমাদের দেশের মানুষ যে যথেষ্ট উপার্জ্জন করে না তাহার কারণ যে তাহারা বহু বিভিন্ন দ্রব্য ও অবাস্তব সেবার ক্রয়েচ্ছুক নহে। খাদ্য, বস্ত্র, গৃহ, আসবাব, ঔষধ, পুস্তক, প্রসাধন-উপকরণ প্রভৃতি যাহা কিছু অন্যান্য বহুদেশের নরনারী ব্যবহার করিয়া থাকেন, আমাদের দেশে সে সকলের কোন ব্যাপক ব্যবহার নাই। ফলে দ্রব্য ও অবাস্তব সেবা উৎপন্ন হইবার বা বিক্রয়ের কোনও প্রয়োজন এদেশে দেখা যায় না। দেশের মানুষ সেই জন্যই এত অধিক সংখ্যায় বেকার ও অলস জীবন যাপনে নিরত থাকে। দারিদ্র্য এই অবস্থারই অভি-ব্যক্তি।

আঁধিয়ালা হটাও

দারিদ্র্য অপসারণ সম্ভব হইবে কি না তাহা জাতীয় এবং প্রাদেশিক সরকারের কার্য্যকলাপে ঠিক বোধগম্য হইতেছে না। কিন্তু শহরের বাসিন্দাদিগের দারিদ্র্য, অভাব ও উপার্জ্জনহীনতা আর একটা কারণে আরও বাড়িয়া চলিয়াছে, তাহা হইল বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন ও বন্টনের ব্যবস্থাক্ষেত্রে আমলাদিগের যথেচ্ছাচারের ফলে সহস্র সহস্র ব্যক্তির খাদ্যবস্তু সংরক্ষণ অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহার কারণ ঠাণ্ডা আলমারি চালিত রাখা অসম্ভব হইয়া তন্মধ্যস্থ খাদ্যাদি গরমে নষ্ট হইয়া যাওয়া। হোটেলে বহু মূল্যবান্ খাদ্যবস্তু এইভাবে নষ্ট হইতেছে। বহু সহস্র কর্মী নিজ নিজ কর্মস্থলে যে বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যবহারে যন্ত্র চালাইয়া উপার্জ্জন ব্যবস্থা করেন তাহাও বিদ্যুৎ না পাওয়ায় বন্ধ হইয়া যাইয়া থাকে। কারখানাগুলিতে যে সকল কর্মীর রোজগার উৎপাদনের পরিমাণের সহিত সংশ্লিষ্ট তাহাদের উপার্জ্জন বহুল পরিমাণে হ্রাস পাইয়া যায়। অসংখ্য গৃহস্থ হঠাৎ হঠাৎ আলো পাখা প্রভৃতি অচল হইয়া যাওয়ায় অসম্ভব কষ্টে প্রত্যেক মাসেই বহুদিন থাকিতে বাধ্য হ'ন। এই অবস্থার কোনও উন্নতি হইতে দেখা যাইতেছে না এবং ইহা যে ক্রমাগতই দেশের শহরগুলিকে অন্ধকারে ডুবাইয়া রাখিতেছে তাহাতে জনসাধারণের সরকারী আমলাতন্ত্রের উপর বিশ্বাস আর থাকা সম্ভব হইতেছে না। যাহারা বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ কার্য চালিত

রাখিতে অক্ষম তাহারা যে আবার লক্ষ লক্ষ বেকার নরনারীর কার্য্য ব্যবস্থা করিয়া দিবে ইহা নিঃসন্দেহে একটা বৃথা-কল্পনার কথা।

কিন্তু দেশের রাষ্ট্রনেতাগণ নিজেদের অক্ষমতা প্রযুক্ত আমলাদিগের উপর নির্ভর না করিয়া কোনও অন্য পথ খুজিয়া পাইতেছেন না। তাঁহাদের সমাজবাদ অর্থে বুঝিতে হয় আমলাবাদ, এবং সমাজ বহু-ব্যক্তির সমষ্টিজাত প্রতিষ্ঠান হইলেও সেই ব্যক্তি সমষ্টির উপর কোন কিছুর ভারার্পণ করায় রাষ্ট্র-নেতাগণ বিশ্বাস করেন না। সমাজের ব্যক্তিদিগের কাজ হইল রাষ্ট্রনেতাদিগকে নিজেদের প্রতিনিধি নির্বাচন করিয়া তাহাদের নিযুক্ত অপদার্থ আমলাদিগের হস্তে নিজেদের সকল সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা ছাড়িয়া দিয়া নিঃশব্দে সকল অভাব ও উৎপীড়ন সহ্য করিয়া বসিয়া থাকা।

কিন্তু জাতির সকল ব্যক্তিই ক্রমশঃ বুঝিতে পারিতেছেন যে আমলাদিগের হস্তে কাজ ছাড়িয়া দিয়া এইভাবে কষ্ট ভোগ করা আর অধিককাল চলিবে না। আমলাদিগকে বিতাড়িত করা একান্তভাবে আবশ্যক ও তৎসঙ্গেই আবশ্যক জনসাধারণের নিজেদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের ভার নিজ হস্তে গ্রহণ করা। সেই কার্য্য হয় সমবায় রীতি অনুসরণে করিতে হইবে। নয়ত যৌথ কারবার গঠন করিয়া সে কার্য্য সম্পন্ন হইবে, যৌথ কারবার হইলে তাহার অংশীদার হইবে—বহুসংখ্যক ব্যক্তি। কোন একাধিপত্য যাহাতে গজাইতে না পারে সেইজন্য অংশ ক্রয় কার্য্যে কোনও ব্যক্তি বা এক পরিবারস্থ ব্যক্তি-দিগকে একটা সীমিত সংখ্যক অংশের অধিক অংশ ক্রয় করিতে না দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

সমাজের সকল ব্যক্তির অর্থনৈতিক অধিকার সংরক্ষণ আমলা পরিচালিত তথাকথিত সমাজবাদী প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়া হইতে পারে না। কারণ উহা বস্তুত ব্যক্তির অধিকার খর্ব্ব করিয়া রাষ্ট্র-করায়ত্ত মূলধন নীতির অনুসরণ ও তাহার ফল হইতেছেআমলা-দিগের প্রভুত্বজাত অবস্থায় সকল বস্তুর মূল্য বৃদ্ধি,সরবরাহ হ্রাস, নিকৃষ্ট বস্তুর বিক্রয় ও প্রচার প্রচেষ্টা, ইত্যাদি, ইত্যাদি। দারিদ্র্য অপসারণ বা "গরীবি হটাও" বাণীর প্রচারে কোনও ফল হইতেছে বলিয়া দেখা যাইতেছে না। অন্ধকার দূর কর বা "আঁধিয়ালা হটাও"কে যদি কিছুদিনের জন্য সমাজবাদের মন্ত্র বলিয়া লক্ষ কণ্ঠে উচ্চারণ করার ব্যবস্থা করা যায় তাহা হইলে বহু লক্ষ মানুষের উপার্জ্জনের হানি নিবারণ সম্ভব হইতে পারে। তৎসঙ্গে আরও অধিক সংখ্যক রাজকর-দাতা-দিগকে অন্ধকারে বসিয়া থাকিতে বাধ্য করার সম্ভাবনা কিছুটা দূর হইতে পারে।

এখন যদিও অন্ধকার হইলেও রন্ধন কার্য কোন মতে চলিতেছে, বেশীদিন চলিতে নাও পারে। শুনা যাইতেছে যে এখন আমলাগণ চেষ্টা করিতেছে যাহাতে খাদ্যবস্তু ক্রয় ব্যবস্থা তাহাদের হস্তে আসিতে পারে। আড়তদারদিগকে যদি হটাইয়া তৎস্থলে আমলাদিগের দ্বারা চালিত আড়ত খোলা হয় তাহা হইলে শীঘ্রই খাদ্য-বস্তুর অভাব দেখা যাইতে আরম্ভ করিবে এবং সেই সকল খাদ্য বস্তু কালো বাজারে দ্বিগুণ চতুর্গুণ মূল্যে বিক্রয় হইতে থাকিবে। যাহা ঘটে নাই তাহা ঘটিবে বলিয়া ধরিয়া লওয়া ন্যায়শাস্ত্রানুগত না হইলেও জনসাধারণের বিশ্বাস যে আমলাদিগের হস্তে কোন কিছু যাইলেই তাহার সহিত কালো বাজারের সংযোগ অতি শীঘ্রই গড়িয়া উঠে। বর্ত্তমানেও আড়তদারদিগের দ্বারা যে কালো বাজার চালিত হইতেছে না এমন নহে, কিন্তু লোকের বিশ্বাস তাহা হইতে পারিতেছে এই কারণে যে আমলাগণ তাহা বন্ধ করিতে ততটা সচেষ্ট নহেন।

গৃহ ও ভূসম্পত্তির সীমা নির্দ্ধারণ

ভারত সরকার সহর অথবা নগর কাহাকে বলেন এবং গ্রামই বা কাহাকে বলেন তাহা পরিষ্কার করিয়া বোঝা যায় না। কারণ সরকারী পুস্তকে ভারতবর্ষের যে সকল বর্ণনা প্রকাশিত হয় তাহাতে বহু কথার অর্থ স্থিরনিশ্চয়ভাবে লিখিত হয় না। যথা India 1971-72 গ্রন্থে ভারত সরকার Table 16এ বলেন ভারতে ২৯২১টি সহর আছে। ইহার মধ্যে ১৫৬টি সহরে ৫০০০ হইতে ৯৯৯৯ জন লোকের বাস। আরও ২৭৭টি সহর

আছে যেখানে ৫০০০ হইতে অল্প সংখ্যক মানুষ বাস করেন। ঐ পুস্তকের Table 17এ দেখা যায় এ দেশে ৫৬৬৮৭৮টি গ্রাম আছে। ইহার মধ্যে ৭৭৬টি গ্রামে ১০০০০ বা ততোধিক মানুষের নিবাস এবং ৩৪২১টি গ্রাম আছে যাহাতে ৫০০০ হইতে ৯৯৯৯ বাসিন্দা থাকেন। ইহাতে দেখা যাইতেছে যে, ভারত সরকার জনসংখ্যা বিচারে সহর অথবা গ্রামের বিভিন্নতা স্থির করেন না কারণ,তাঁহাদের প্রকাশিত পুস্তকে ২৭৭ ও ৭৫৬টি "সহর" আছে যাহাতে ৫০০০ হইতে অল্প এবং ৫০০০ হইতে ৯৯৯৯ জন মানুষ বাস করে। এবং ৭৭৬টি গ্রামে ১০০০০ বা ততোধিক "গ্রামবাসী" থাকেন ও ৩৪২১টি গ্রামে ৫০০০ হইতে ৯৯৯৯ জন গ্রামবাসীর নিবাস। আমাদের মতে কোন স্থানে যদি ৫০০০০ হাজার মানুষও না থাকে তাহা হইলে সেই স্থানকে সহর বলা চলে না।

সে যাহাই হউক, ভারত সরকার সম্প্রতি সমাজবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য সহরের অধিবাসীদিগের গৃহ ও ভূসম্পত্তির উচ্চতম সীমা নির্দ্ধারণ ব্যবস্থা করিতেছেন। কিন্তু সহর বলিতে তাঁহারা যে স্থলে ১০০০০ বা ততোধিক মানুষের বাস সেই সকল স্থানকেই সহর বলিয়া ধরিতেছেন। অর্থাৎ তাঁহদের প্রকাশিত উপরিউল্লিখিত পুস্তক অনুসারে তাঁহারা যে ৭৭৬টি স্থানকে গ্রাম বলিয়াছেন সেগুলি সহর এবং যে ১০৩৩টি স্থানকে সহর বলিয়াছেন সেগুলি গ্রাম। ৪৩০টি সহরে ৫০০০০ বা ততোধিক মানুষের বাস এবং সেইগুলি নিঃসন্দেহে সহর বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। অতঃপর দেখা আবশ্যক কোন্ সহরের গৃহ ও ভূসম্পত্তির মূল্য কিরূপ। যে সকল সহর বৃহৎ সেগুলিতে একটি পরিবারের বাসোপযোগী নিবাস গৃহের যাহা মূল্য হয় ক্ষুদ্রতর সহরে সেইরূপ গৃহের মূল্য অনেক ক্ষেত্রে তাহার এক দশমাংশ হইতে পারে। যথা বৃহত্তম সহরগুলির লোকসংখ্যা ও ছয়টি মাঝারি ঘরের গৃহের মূল্য কিরূপ হইতে পারে বিচার করিলেও তাহার সহিত ক্ষুদ্রতর সহরের ঐ মূল্য তুলনা করিলে বিষয়টা কিছু পরিষ্কারভাবে উপলব্ধ হইতে পারে।

সহরের নাম	লোকসংখ্যা	ক্ষুদ্র গৃহের মূল্য	বৃহত্তর গৃহ এক পরিবারের
কলিকাতা	৭০০৫৩৬২	২৫০০০০	৫০০০০০
বোম্বাই	৫৯৬৮৫৪৬	২৫০০০০	৫০০০০০
দিল্লী	৩৬২৯৮৪২	২০০০০০	৪০০০০০
মাদ্রাজ	২৪৭০২৮৮	১৫০০০০	৩০০০০০
কানপুর	১২৭৩০১৬	১৫০০০০	৩০০০০০
বাঙ্গালোর	১৬৪৮২৩২	১৫০০০০	৩০০০০০
আহমেদাবাদ	১৫৮৮৩৭৮	১৫০০০০	৩০০০০০
হাইদ্রাবাদ	১৭৯৮৯১০	১৫০০০০	৩০০০০০
ভূবনেশ্বর	১০৫৫১৪	৫০০০০	১০০০০০
গৌহাটি	১২২৯৮১	৫০০০০	১০০০০০
আশানসোল	১৫৭৩৮৮	৭৫০০০	১৫০০০০
গাজিয়াবাদ	১২৮০৩৬	৭৫০০০	১৫০০০০

ইহা দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, ব্যক্তিগতভাবে সংরক্ষিত গৃহ ও ভূসম্পত্তিও উচ্চতম সীমা নির্দ্ধারণ সহজ কার্য্য নহে। কলিকাতায় বহু পরিবার আছে যাহাতে পিতামাতা পুত্র পৌত্রাদি লইয়া ১০।১৫ জন লোক এবং তাহাদের বাসের জন্য এমন গৃহ আছে যাহার মূল্য ৫ লক্ষেরও অধিক। বোম্বাই সম্বন্ধেও ঐ কথাই বলা যায়। সুতরাং কলিকাতা ও ভুবনেশ্বর সম্বন্ধে একই নিয়ম প্রয়োগ একেবারেই ভুল হইবে। এমন কি পাটনা

ও কলকাতার অর্থ নৈতিক ওজন ও কখনও এক হইতে পারে না। পাটনার তুলনায় কলিকাতা বোম্বাই অথবা দিল্লীর মূল্যের পরিমাণ অন্তত তিন গুণ।

সকল দিক বিচার করিয়া গৃহ সম্পদাদির উচ্চসীমা নির্দ্ধারণ না করিলে একটা ক্ষুদ্র লোক-দেখান ঔচিত্য সৃজনের জন্য একটা বিরাট অন্যায় মূর্ত্ত হইয়া উঠিবে। যে সহরে কোন গুদাম বা দোকান ঘরে ক্রোর টাকার মাল ধরিয়া রাখিয়া বিরাট লাভের ব্যবস্থা করা আইনতঃ গ্রাহ্য সেই সহরেই যদি কেহ গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া তাহা ভাড়া দিয়া নিজের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিলে তাহার গৃহটি ছিনাইয়া লওয়া হয় তাহা হইলে বিষয়টা নীতিবাদকে একটা ছেলেখেলায় পরিণত করে। যে দেশে কোনও বিশেষজ্ঞ মাসিক ৫।১০ হাজার টাকা উপার্জ্জন করিতে পারে ও তাহা আইনবিরুদ্ধ নহে বলিয়া স্বীকৃত হয় ও যে দেশে রোজগারের এক পঞ্চমাংশ সঞ্চয় করাও আইন সমর্থিত, সেই দেশে ৩০ বৎসরের কর্ম্ম জীবনে মানুষ ৩০ লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিতে পারে। সেই অর্থের সঞ্চয়াংশ সুদে আসলে দশ লক্ষে দাঁড়ায় বলিলে ভুল হয় না। সেই টাকা কিভাবে রাখা হইবে তাহার উপর টাকা থাকার ন্যায্যতা নির্ভর করিতে পারে না। গৃহ নির্ম্মাণ করা যদি আইন-গ্রাহ্য হয় তাহা হইলে আইন করিয়া তাহার আকার ও মূল্য লইয়া মারপ্যাচ চালাইলে সাধারণ বুদ্ধিতে সেইরূপ ব্যবস্থাকে সুনীতি-স্থাপনকারী বলা যায় না।

বিদেশে শ্রীমতী গান্ধীর বিরুদ্ধ সমালোচনা

কিছুকাল পূর্ব্বে বিদেশের সকল পত্রিকাতেই শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর বিরুদ্ধে প্রায় কোন কথাই লিখিত হইত না। তাঁহাকে বর্ত্তমান কালের নূতন পথের পথপ্রদর্শকদিগের মধ্যে স্থান দেওয়া হইয়াছিল এবং তিনি যে বার্দ্ধক্য-প্রপীড়িত কংগ্রেস দলকে নবযৌবন দান করিয়া পুনরায় নূতন শক্তিতে অগ্রগমনে সক্ষম করিয়াছেন ইহাই প্রায় সর্ব্বত্র প্রচারিত হইতে আরম্ভ হয়। পাকিস্থানের বাংলাদেশ লইয়া উন্মত্ত বর্ব্বরতার চরম অভিব্যক্তি, ভারতের উপর আক্রমণ ও ভারতকর্ত্তৃক পাকিস্থানের পরাজয় শ্রীমতী গান্ধীর যশের প্রবাহ প্রবল গতিতে বাড়াইয়া তোলে ও তাঁহার সাহস, সকল সমস্যার দ্রুত নিষ্পত্তি করিবার ক্ষমতা, নেতৃত্বের প্রাণবান্ প্রেরণা প্রভৃতি লইয়া সর্ব্বত্র আলোচনা হইতে থাকে। এই সময়ে খাদ্য উৎপাদনও খুব বাড়িয়া যায় এবং আমেরিকার ভারত-বিরুদ্ধতার কারণে ঐ দেশের নিকট সাহায্য না লওয়া একটা এমন রূপ ধারণ করে যাহা অপরিবর্ত্তনীয় ভাবে ভারতের আন্তর্জাতিক সম্বন্ধ নির্ণয় ক্ষেত্রে ক্রিয়াশীল হইয়া দেখা দেয়। ভারত অর্থ-নৈতিক সাহায্য আর লওয়া হইবে না বলিতে আরম্ভ করে। নব্বই লক্ষ টন অতিরিক্ত খাদ্যবস্তু একথা বলিতে ভারতকে বিশেষ ভাবে সাহায্য করে।

কিন্তু এ অবস্থা স্থায়ী হইল না। প্রথমতঃ যুদ্ধ জয়ের পরে তাহার খরচ মিটাইবার পালা শুরু হইল এবং তাহার ধাক্কায় নোট ছাপাইয়া অর্থ সংস্থান কার্য্য প্রবল ভাবে চালিত হইতে থাকায় বাজারে সকল দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি আরম্ভ হইল। কৃষিক্ষেত্রে "সবুজ বিপ্লব" শেষ হইয়া রৌদ্রের খরতাপে সবুজ পাটকিলে হইতে আরম্ভ করিল। দেখা যাইতে লাগিল যে ঐ নব্বই লক্ষ টন খাদ্যবস্তু বেশীদিন অভাব মোচন করিতে পারিবে না।

যে সকল রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের অপপ্রচারকারী ব্যক্তিগণ প্রথমে ভাবিত শ্রীমতী গান্ধীকে আক্রমণ করিয়া কোনও সুবিধা হইবে না তাহারা এখন দেখিতে আরম্ভ করিল যে পরোক্ষভাবে সে আক্রমণ যদি চালান যায় তাহা হইলে শ্রীমতী গান্ধীর দুর্গের প্রাকারে ফাট ধরান আরম্ভ করা যাইতে পারে। তাহারা এখন কোন উপলক্ষ্য দেখিলেই হৈ হল্লা আরম্ভ করিল। শ্রীমতী গান্ধীকে আক্রমণ কেহ করিল না; কিন্তু তাঁহার সমর্থকদিগকে লক্ষ্য করিয়া অস্ত্র নিক্ষেপ আরম্ভ হইল। বিদেশী পত্রিকাদি ভারতের বর্ত্তমান পরিস্থিতি লইয়া প্রচার আরম্ভ করিল। তাহারাও শ্রীমতী গান্ধীকে বাদ দিয়া তাঁহার সমর্থকদিগকে ও ভারতের নানান সমস্যা লইয়া সেই সমালোচনা চালনা করিতে লাগিল। মূল্য বৃদ্ধি-

পুলিশের জুলুম, ছাত্রদিগের উপর আক্রমণ,প্রভৃতি বিভিন্ন অভিযোগ প্রদেশ হইতে প্রদেশান্তরে উঠাইয়া জন-বিক্ষোভ জাগ্রত করিবার চেষ্টা আরম্ভ হইল। শ্রীমতী গান্ধী বিশেষ বিচক্ষণতার সহিত ঐ সকল অভিযোগের সুবিচার চেষ্টা করিতে এখন অবধি আত্মনিয়োগ করিয়া আসিয়াছেন। অর্থাৎ তিনি অভিযোক্তাদিগের নিকট নিরপেক্ষ তৃতীয় পক্ষ হিসাবে উপস্থিত হইয়াছেন। কতদিন এইরূপ চলিবে তাহা বলা যায় না, বিদেশী সংবাদ দাতা দিগের মতে কোনও না কোন সময় দল ভারি হইলে শ্রীমতী গান্ধীর বিরুদ্ধ পক্ষ সাক্ষাৎ ভাবে তাঁহার উপর অভিযোগ ন্যস্ত করিবে। সে সুযোগ তাহারা কবে পাইবে কে বলিতে পারে ?

রাজর্ষি রামমোহন

রাজর্ষি রামমোহন রায়ের দ্বিশতবার্ষিকী জন্মোৎসব অনুষ্ঠান উপলক্ষে এই বৎসর ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় একটি রামমোহন মেলা বসিবে। এই মেলাতে রাজা-রামমোহন রায়ের জীবন, বিভিন্ন ক্ষেত্রে গঠন ও সংস্কার-মূলক কার্য্যকলাপ সম্পর্কিত চিত্র, মূর্ত্তি, লেখন, ইত্যাদি প্রদর্শিত হইবে। এই কার্য্য যাহাতে উত্তমরূপে সুসাধিত হয় তাহার জন্য একটি সভা গঠিত হইয়াছে ও তাহাতে দেশের অনেক কৃত কর্ম্মা ব্যক্তি যোগদান করিয়াছেন। সকলেরই বিশ্বাস যে রামমোহন মেলা যে মহামানবের স্মৃতিরক্ষার্থে আয়োজিত হইতেছে তাঁহার মাহাত্ম্যের আকর্ষণেই দেশবাসী মেলার সহায়তা করিতে অগ্রসর হইয়া আসিবেন ও মেলা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ভাবে সফলতা আহরণ করিবে।

রাজা রামমোহন রায়ের জীবন কাহিনী চর্চ্চা করিলে দেখা যায় যে, তিনি একাধারে ভারতের প্রাচীন সভ্যতা ও গৌরবের পুনরুদ্ধার এবং জাতির প্রগতি সাধন চেষ্টায় পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও শিক্ষা পদ্ধতির অনুসরণ ব্যবস্থা করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। তিনি নারীজাতির স্বাধীনতা, শিক্ষা ও সামাজিক উৎপীড়ন হইতে মুক্তি লাভের জন্য আজীবন নানা চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন এবং মূলতঃ তাঁহার চেষ্টাতেই সতীদাহ প্রথা ভারত হইতে উঠিয়া গিয়াছিল। তিনি বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ ও স্ত্রীজাতির ক্ষতি ও অপমানকর অপরাপর সকল সামাজিক প্রথার পরম বিরোধী ছিলেন। বাল্যবিধবাদিগের পুনর্ব্বার বিবাহ দেওয়া উচিত বলিয়া তিনি সকলকে বুঝাইতেন এবং নারীদিগকে বিদ্যায় বুদ্ধিতেও যুক্তিসম্মত ভাবে জীবন গঠন করিতে শিখাইতে তিনি চির প্রয়াসী ছিলেন। জাতির উন্নতি ও জগৎ সভায় অগ্রগমনের সুবিধা সৃজন হেতু রামমোহন ইয়োরোপীয় শিক্ষাধারা প্রবর্ত্তনের সমর্থক ছিলেন। লর্ড আমাহার্স্টকে তিনি যে শিক্ষা সম্বন্ধে পত্র লেখেন তাহাতে তিনি বলেন, "ভারতকে অজ্ঞানতার অন্ধকারে রাখাই যদি বৃটিশ আইন সভার নীতি হইত, তবে তার শ্রেষ্ঠ পন্থা ছিল সংস্কৃত শিক্ষা পদ্ধতি।" কিন্তু যদি দেশের মানুষের উন্নতি কাম্য বলিয়া মনে করা হয় তাহা হইলে "শিক্ষণীয় বিষয় গুলির অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত গণিত শাস্ত্র, প্রাকৃতিক দর্শন, রসায়ন, শারীর বিজ্ঞান এবং অন্যান্য কল্যাণকর বিজ্ঞান।"

রামমোহনের এই সকল কথা ইংরেজরা শুনিতে বিশেষ ইচ্ছুক ছিলেন না। কিন্তু রামমোহন ইহাতে কিছুমাত্র না দমিয়া নিজকার্য্যে মনোযোগ দিয়া নানা চেষ্টা চালাইয়া চলিলেন। তিনি ডেভিড হেয়ার ও অন্যান্য শিক্ষা ক্ষেত্রে চালক দিগের সহিত মেলামেশা করিতে লাগিলেন, যাহাতে সুযোগ ও সুবিধা হইলে আধুনিক রীতিতে শিক্ষা ব্যবস্থা করা সহজেই সম্ভাব্য হইতে পারে। রামমোহন সকল ধর্ম্মকেই শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেন। নিজ ধর্ম্মে তাঁহার ভক্তি অবিচল ছিল। এবং ছিল অন্যান্য সকল ধর্ম্মেরই প্রতি পরম শ্রদ্ধা। রবীন্দ্র নাথ বলিয়াছেন, "ভারতবর্ষের শাশ্বত বাণীকে জয়যুক্ত করতে কালে কালে যে মহাপুরুষরা এসেছেন, বর্ত্তমান যুগে রামমোহন রায় তাঁদের অগ্রণী। এর আগেও নিবিড়তম অন্ধকারের মধ্যে মাঝে মাঝে শোনা গিয়েছে ঐক্য বাণী।" যথা কবীর ও দাদুর সংস্কারমুক্ত মিলনের বাণী। রামমোহন জ্ঞানের দীপ্ত আলোক বহন করিয়া যে পথ দিয়াই গিয়াছেন সেইখানেই অজ্ঞানতার

(শেষাংশ ১৬৪ পাতায়)

জামাইষষ্ঠী

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

রায়গিন্নি এসে সভয়েই আরম্ভ করলেন—'হ্যাগা বান্নু, এ আবার কি শুনছি, জামাই নাকি থাকতে পারছেন না!'

বন্দনা ভাঁড়ার ঘরে ছিল, বেরিয়ে এসে বলল—'হ্যাঁ মাসিমা, বলছিল, ট্যুরে যাওয়ার অর্ডার বেরিয়েছে, মাসিমাকে বোল, এবার যেন কোন ব্যবস্থা না করেন। আমি হাতের পাটটুকু সেরে বলতেই যাচ্ছিলাম, বলল—আপিসের কাজ......'

'ওমা কী অলুক্ষুণে কথা! জামাইষষ্ঠী আগে, না আপিস আগে।'—রায়গিন্নি শিউরে উঠে বারান্দার বেঞ্চটাতে বসতে বসতে ব'লে চললেন—'আপিস হোল তিনশ' পঁয়ষট্টি দিনের ব্যাপার, জামাইষষ্ঠী একটা দিন। সেই জামাইষষ্ঠী ছেড়ে আপিসের ট্যুরে বেরিয়ে যেতে হবে? ছিষ্টিছাড়া কথা যে মা! না, ও হবে না। আজ একমাস ধরে তোমার মেসোমশাই হয়রান হচ্ছে—কোথায় বেলডাঙার সোনামুগের ডাল, কোথায় দেরা-দুনের চাল—পোলাওয়ের জন্যে, পোড়া দেশে পাওয়া তো যায় না, কাল ওদের যতীন কলকাতা থেকে আসছে, তাকে ভীমনাগের সন্দেশ আর মগরার দই আনতে লিখে দেওয়া হয়েছে—অমনি বর্দ্ধমানে নেমে ভেতরে গিয়ে সীতেভোগ......'

বন্দনা হেসে ফেলল, বলল—'ওসব তোমার মেয়ের ভোগেই আছে মাসিমা, এখন থেকেই মুখে জল আসছে......'

'তুই হাসছিস্ বান্নু, কিন্তু আমার মনে যে কী হচ্ছে শুনে অবধি! ধুতি-চাদর, জামার কাপড়, জুতো-মোজা সব কেনা হয়ে গেছে, তোর মেসোমশাই নিজে ঘুরে ঘুরে বাজার চট্‌কে পছন্দ ক'রে কিনেছে, এখন ছেলে ব'লে: কিনা আমি ট্যুরে চললাম, নিকুচি করেছে এমন আদাড়ে ট্যুরের।'

'কি করবে মাসিমা, পরের দাস...'

'ছুটি নিক্।'

'শ্বশুর মারা গেলেন, অনেক ছুটি নেওয়া হ'য়ে গেছে...।'

'বেশ, না দিতে চায় ছুটি, এবার বলুক মাস্‌-শাশুড়ি মারা গেছে। অশৌচ অবস্থায় তো কাজ করতে পারে না। কেরেস্তান নয় তো বাছা যে জামার ওপর একটা কালো পটি বেঁধে সারা দুনিয়া এক ক'রে বেড়াবে।.. না বাবু, এই বাড়িতে আমি বারো বছর ধরে জামাইষষ্ঠী ক'রে আসছি, আপিস কোন্ ছার, পৃথিবী উল্টে গেলেও আমি জামাইষষ্ঠী ছাড়তে পারব না। জামাই এলে তুমি বুঝিয়ে বোলো। আপিস না শোনে আমি নিজে গিয়ে পৌঁছব। দরকার পড়লে আমি চাকর সংগে ক'রে হাট-বাজার করা মেয়ে বাছা, আমার আটকাবে না...'

হেসে ফেলল আবার বন্দনা। এবার মুখে মুঠোটা চেপে।

'তুই হাসছিস মা, আমার কিন্তু যা হচ্ছে!...'

'ও মাসিমা, এইমাত্র যে কাল্ হ'য়ে অশৌচের ব্যবস্থা করলেন।'

একটু অপ্রাতিভভাবে রায়গিন্নিও হেসে ফেললেন। তারপর ওর কথাই ঘুরিয়ে নিয়ে বললেন—'সে তো আরও ভালোই হবে, ভূত হয়ে সবার ঘাড় মটকাতে গেছি...'

দুজনেরই হাসির মধ্যে আদিত্য চাকরের সংগে দৈনিক কাঁচা-বাজার নিয়ে ঢুকল। পুরণো চালের বর্ষীয়সী স্ত্রীলোক, রায়গিন্নি জামাইয়ের সামনাসামনি

হ'য়ে কথা বলায় অভ্যস্ত নয়। আদিত্য ঢুকতেই মাথার কাপড়টা কপালের মাঝামাঝি টেনে দিয়ে একটু গলা নামিয়ে বন্দনাকে উদ্দেশ্য করেই বললেন—'না বাপু, তুমি জামাইকে বুঝিয়ে বলবে, নইলে ভরাডুবি হব আমি।'

সম্পর্কে কেউই নয়, অথচ বন্দনারা এসেছে পর্য্যন্ত এই দু'বছর ধ'রে মেয়ে আর জামাই; উপরি পাওনা একটি নাতনীও রয়েছে, আদরের পুতুলি, স্বামী-স্ত্রী দুজনেরই।

পাশাপাশি দু'টি ফ্ল্যাটবাড়ী। দুখানি ক'রে ঘর, একটি ছোট রান্নাঘর, ছোট ভাঁড়ার ঘর, স্নানাগার ইত্যাদি। একটি ছোট উঠোনও আছে। স্বামী-স্ত্রী, গুটি দুই ছোট ছোট ছেলেমেয়ে, এককথায় ফ্যামিলী-প্ল্যানিংএর মতো একটি ছোট-খাটো সংসারের বেশ স্বচ্ছন্দে চলে যায়। রায়গিন্নি যে বারো বছরের কথা বললেন, এই বারো বছরে এসেছেও সেই ধরণেরই পরিবার। দুই বৎসর ছিল অনাদি, তার স্ত্রী আর মা, রায়গিন্নিরই সমবয়সী। মেয়ে, জামাই, তার ওপর আবার বেয়ান, খুব জমেছিল দুটো বছর। জামাইএর সম্পর্ক ঐ একটি দিন, জামাইষষ্ঠীর দিন, তবে ঐ একটি দিনই সমস্ত বৎসরটাকে স্নেহ-প্রীতি-শ্রদ্ধার সূত্রে গ্রথিত ক'রে রাখত। তারপর থেকে মেয়ে-জামাই বদল হলেও এই সম্পর্ক যাতে না ছিন্ন হয়ে পড়ে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে এসেছেন দু'জনে। বিশেষ ক'রে গৃহিনী। কর্তা বেটাছেলে, তাঁর যেটুকু সতর্কতা তা গৃহিনীর মুখ চেয়েই অনেকটা, যদিও একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়ে জামাইষষ্ঠীর দিন যতই এগিয়ে আসতে থাকে তাঁর মনটাও ভিতরে ভিতরে আনচান করতে থাকে, কি ক'রে দিনটিকে সার্থক ক'রে তুলতে হবে, গৃহিনীর মনের মতো ক'রে।

সতর্কতার একটা অঙ্গ এই যে, এক ভাড়াটে ছেড়ে যাচ্ছে জানতে পারলেই বাড়িওলা থেকে ওঁদেরই মাথা-ব্যথা পড়ে বেশী। দু'জন বুড়োবুড়ি কিম্বা ওঁদের বয়সের হলেও তো চলবে না। তাদের মেয়ে-জামাই থাকলেও না। তারা তাদের জামাই অপরকে ধার দিতে যাবে কেন?

এ-ছাড়া পাঞ্জাবী আছে, মাদ্রাজী আছে, তাদের সংগে অত গলাগলি চলবে না, জামাই করা তো দূরের কথা।

এত বেছে বেছে ভাড়াটে মেয়ে-জামাই এনে তোলায় নানাঅসুবিধা। কর্তাকেই বেশী খোঁজ রাখতে হয় ঘোরা-ঘুরি করতে হয়, তবে রায়গিন্নিরও দুর্ভোগ কম যায় না, সে দুর্ভোগের মধ্যে বার-দুই বাড়িওলাকে লুকিয়ে লুকিয়ে ঘুষ দিতে হয়েছে, একবার পনেরো দিনের ভাড়া, আর একবার পুরো একমাসের।

দীনেশ জামাই হঠাৎ বদলি হয়ে উঠে গেল। সহর জায়গা, বাড়ীরই অভাব, ভাড়াটের অভাব নেই, একজন মাদ্রাজী মুখিয়েই ছিল, রায়গিন্নি নিজের মানুষই আসছে, নিজেই নিয়ে রাখছেন বাড়ি বলে কিছু আসবাবপত্র ঢুকিয়ে দখলে রাখলেন বাড়ি। একমাস পরে অপূর্ব-জামাইকে পাওয়া গেল। টাকাটা গচ্চা দিতে হোল রায়গিন্নিকে। অপূর্ব চারটে জামাইষষ্ঠী সামলে দিয়ে গেল। নিজে, স্ত্রী অরুণা, কখনও এল বিধবা পিসি, কখনও মা; দেশে বড় সংসার পারাপারি ক'রে থাকতেন এসে দু'জনে। একেবারে শেষে মাস চারেক তাঁরাও না আসতে পারায় রায়গিন্নিই দেখা-শোনা করেন।

তাদের গল্পই করছিলেন রায়গিন্নি বন্দনার সংগে।

ট্যুরটা দুটোদিন পেছিয়ে দিতে খুব বেশি বেগ পেতে হয়নি আদিত্যকে।

কাল জামাইষষ্ঠী। রাত্তিরের রান্নাবান্না সকাল সকাল সেরে তারই জোগাড় করছিলেন রায়গিন্নি। বন্দনা রয়েছে। চার বছরের মেয়ে সুমনাও বারান্দার একপাশে জামাইষষ্ঠীর আয়োজন নিয়ে ব্যস্ত। মা—দিদুর চেয়ে বেশিই ব্যস্ত, কেন না এঁরা তবু দু'জন, সে আবার একা মানুষ। দু'টি বেশ বড় বড় জলপুতুল—মেয়ে আর জামাই আদায় করেছে রায়গিন্নির কাছ

থেকে, নইলে তার ছেলে আদিত্যকে জামাইষষ্ঠীর জামাই হ'তে দেবে না, ঘরে বন্ধ করে রাখবে তালাচাবি দিয়ে।

নিজের মনেই বিড়বিড় করে বকার সংগে মেয়ে-জামাইয়ের সাজ-গোজ নিয়ে ব্যস্ত রয়েছে।

রায়গিন্নীর কালকের কুটনো কোটা শেষ হয়ে গেছে। নিতান্ত কম নয়, পাশাপাশি ক'জন মেয়ে-বৌকেও বলেন রায়গিন্নি, যাদের নিজের বাড়িতে জামাইষষ্ঠীর হাঙ্গাম নেই। রান্নার ব্যবস্থা মোটামুটি সেরে মিষ্টির আয়োজন করছেন। কলকাতা-বর্দ্ধমান থেকে যা সব আসবার এসে গেছে, বাড়িতে হবে ক্ষীরের ছাঁচ আর চন্দ্রপুলি। ভাঁড়ার ঘরের সামনে একটা কুরুনি হাঁটুতে চেপে নারকেল কুরছে বন্দনা, রায়গিন্নি কড়ায় শুকনো খোওয়া তৈরী করছেন। সংগে সংগে গল্পও চলছে—

'......তাই বলছিলাম মা, দেখলাম তো কম নয়—এই জামাইষষ্ঠী নিয়েই ভালোমন্দ কতরকম মানুষ। তোদের নিয়ে হোলও তো পাঁচ ঘর—দীনেশ, অপূর্ব, অভয়, ষষ্ঠীচরণ আর এই তোরা। কেউ দুই কেউ চার কেউ আড়াই, কেউ মাত্তোর মাস-ছয়েক এই ক'রে বারো বচ্ছর হ'য়ে গেল। তোরা এসেছিস, আবার কতদিনের মেয়াদ কে জানে বাছা। যেমন আমার মন্দ কপাল, যারাই না এসেছে ভাড়াটে হ'য়ে তাদের সবারই বদলির চাকরি। তা একরকম মন্দই বা কি বল্, অনেকের সংগেই তো পরচে হোল। আর, বলতে নেই, ঠিক মনের মতনটি না হ'লে কেমন যেন মনও উঠে যায় বাছা, মনে হয় একটু নতুন জল নামুক দরিয়ায়, হয় না মনে? —বল্না তুই।......এই তোরা এসেছিস, খুঁজতেও হয় নি। "বাড়ী খালি আছে?" বলে জামাই এসে দাঁড়ালেন, তারপর থেকে যতই দিন যাচ্ছে, মনে হচ্ছে যেন ভগবান নিজে ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছেন পাঠিয়ে।... না, বাছা, আর সুখ্যেৎ করব না, ভাজ মোটা হ'য়ে যাবে...'

হাতনাড়া বন্ধ ক'রে একটু হেসেই খুন্তিটা তুলে নেন রায়গিন্নি। তখনই হয়তো মন্তব্যের মধ্যে জামাইও এসে পড়ছে, হুঁস হওয়ায় বলেন—'তা তোদের কি বলছি নাকি—না, বলার সম্বন্ধ? আমার বলার মানুষ রয়েছে বলেই বলছি।...দেখনা, কেমন ক'রে সব আদায় ক'রে নিলে। বলি, হ্যাঁ বেয়ান, তোমার বাসনা পুরল না, বাকি আছে এখনও?'

শেষের ক'টা কথা সুমনাকে লক্ষ্য ক'রে বলা, সেও ব্যস্ততার মধ্যে হাত থামিয়ে ঘুরে বলল—'আমার মেয়ে-জামাইয়ের একছেট্ খাট-পালং চাই।'

একেবারে ফুকরে হেসে উঠলেন দু'জনে। বন্দনা তার মাঝেই বলল—'নিন, খুব বেছে বেছে বেয়ান ক'রেছেন, সামলান এখন।'

হাসির তোড়টা সামলে আবার খুন্তি নাড়তে নাড়তে রায়গিন্নি আরম্ভ করলেন—'এ শিশু, যেমনটি দেখে-শোনে তেমনি বলে, ওর কি দোষ? তবে ষষ্ঠীচরণ, তোদের আগে যারা গেল, তার সেই কোন্ সাতপুরুষের মাস-শাশুড়ী—তা ঠিক কি এইরকম তার গাঁই হ'তে হয় না—দাঁও বুঝে। তবে বলি তোকে তার কথা, দিব্যি মনে করিয়ে দিয়েছে ক্ষুদে বেয়ান।'

খোওয়াটা হয়ে গেছে। কড়া নামিয়ে জুড়োতে দিয়ে পিঁড়েয় ঘুরে বসলেন রায়গিন্নি, বলে চললেন—'অথচ নিজের মাস-শাশুড়ী নয়—দূর সম্পর্কের কে। অমূলে রুপী, একটা সম্বন্ধ পাতিয়ে সারতে এসেছে। কাঁকলাসের মতন চেহারা খিটখিটে মাগ, আর কি মতলববাজ! যেদিন শুনল আমার কাছে, মেয়ে বলেছি কাতুকে—কাতু বৌটার নাম—ইচ্ছেটা জামাইষষ্ঠী করব ষষ্ঠীচরণকে দিয়ে সেইদিন থেকে বায়নক্কা শুরু ক'রে দিলে—'আমার নিজের জামাই, ষষ্ঠীর দিন এগিয়ে আসছে দেখে তাড়াতাড়ি ছুটে এলাম, এখন আপনি বলছেন আপনার ঠ্যাকা পড়েছে, লোক পাচ্ছেন না—তা দেখি ষষ্ঠীকে ব'লে...'

শুধু ভাঁওতা মা বাছু। তিনকুলে কেউ নেই, পরকে আপন ক'রে নিয়ে প'ড়ে আছেন, উনি করবেন জামাই-ষষ্ঠী। ছেলে, বৌ, ঐ শতেক খোওয়ারী—সব একরকম মা। ষষ্ঠীচরণের মা, যে নাকি গোড়ায় দিনকতক

এখানে থেকে গুছিয়ে-গাছিয়ে দিয়ে যায়—মানুষটি বেশ সাদাসিদে ছিল। সে চ'লে যেতে এ মাগির ওসকানি পেয়ে একটু একটু করে ছেলে-বৌও নিজমূর্ত্তি ধরতে লাগল। আমিও তিতিবিরক্ত হয়ে এলাকাড়ি দিলাম না। এই তখন, একেবারেই বেহাত হয়ে যায় দেখে নরম হয়ে এল। তিনজনেই। তবু আদায় করলে বৈকি, ট্রানজিষ্টার থেকে শুরু করেছিল, আমিও দেখলাম, একেবারে খালি যায় বছরটা, একটা ব্রতর মতনই দাঁড়িয়ে গেছে তো, একটা হাতঘড়িতে এসে রক্ষা হোল...'

বন্দনা মাথা নীচু ক'রে নিয়ে বলল—'আমিও এবার আপনার জামাইকে দোব উস্‌কে, আজকাল সবার স্কুটার গাড়ীর ওপর ঝোঁক হয়েছে...'

'ছাখো মতলব বেটির।—খিল খিল ক'রে হেসে উঠলেন রায়গিন্নি। বললেন—'তা তুমি পার, নইলে অমন ধুর্তু মেয়ে গর্ভে ধরো ?...তা হ্যাঁরে সুমু—ক্ষুদে বেয়ান, তোর জামাই আর কিছু বায়না ধরছে না যে। পেছনে ওসকাবার লোক যেন...'

আমার জামাই চন্দ্রপুলি খাবে, খিল দাও, নারকোল দাও।'

ওঁর বলার আগে নিজের মনেই উঠে পড়েছিল সুমনা। ফ্রক দোলাতে দোলাতে গটগট ক'রে এসে হাত পাতল। দুজনেই আবার সজোরে হেসে উঠলেন।

খানিকটা ওর কথাই চলল—'কী মেয়ে হয়েচে বল্ দিকিন্ মা বামু— না, কালেরই ধম্ম।...'

একটু ক্ষীর আর নারকেল কুরো একটা ডিসে তুলে দিয়ে বললেন—'যা, জামাইকে কিন্তু বলবি, অত আবদার নয়...'

'ঘুঁটেল ঘরে বন্ধ ক'রে দোব।'

—বাপ-মার কাছে শুনে শুনে যে কথাটা অভ্যাস হয়ে গেছে।'

এবার জামাইয়ের দুর্দ্দশার কথায় দুজনে একেবারে দুলে দুলে হেসে উঠলেন।

আজকের পাট হয়ে গেছে। কালকে ঝি এলে তাকে দিয়ে নারকেলের কুরটুকু পিষিয়ে নিয়ে চন্দ্রপুলি, তার সংগে ক্ষীরের ছাঁচ। সব গুছিয়ে তুলতে তুলতে একটু যেন অন্যমনস্ক হয়ে থেমে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন —'কী যেন বলছিলাম ?'

'বলছিলেন কালের ধর্ম '

—বন্দনা জুগিয়ে দিল।

'না বাছা, দীর্ঘজীবী হয়ে বেঁচে থাক—ছেলে হোক, মেয়ে হোক, ঢেলে দিক, তেমান বুঝে নিক নিজের পাওনা-গণ্ডা। আর, তোদের মেয়ে, সে কি ষষ্ঠীচরণের সেই কোন্ সাতপুরুষের মাসির মতন অত চশমখোর হতে পারে গা ?......খোরাটা কোথায় রাখলাম আবার ?...'

'এই যে।' পাশের একটা ঝুড়ির আড়ালে ছিল, এগিয়ে দিল বন্দনা।

'ছাখো ভীমরতি, এক্ষুনি নিজেই রাখলাম।'

আরও অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছেন যেন।

তারপর চুপ করে থেকেই আরও ছোটখাটো ভুল করতে করতে খোরায় ক্ষীরটুকু তুলে রাখার মধ্যে একবার মুখটা তুলে বললেন —'দিয়েছিলেন মা বামু এ পোড়া কপালীকেও দিয়েছিলেন, কিন্তু দুটো বছরও কোলে ধরে রাখতে পারান, এই ষষ্ঠীতে তার ঠিক বাইশ বছরে...'

—একটা দীর্ঘশ্বাসের মধ্যে কথাটা মিলিয়ে দিয়ে রায়গিন্নি বাঁ হাতে আঁচল তুলে নিয়ে চোখ মুছলেন। কবে, কোন্ মায়ের ঘটা করে জামাইষষ্ঠী করা দেখে সাধটা মনে উঠে এই বারো বৎসর ধরে মেয়ের নামে একবার করে চোখের জল মুছে যাচ্ছেন।

অমর গঙ্গার পথে

তুষার সরকার

॥ এক ॥

তারপর—

তারপর ছুটতে ছুটতে স্বর্গ মর্ত্ত পেরিয়ে সে এসে পৌঁছালো পাতালে। বাসুকি নাগকে গিয়ে বললো—'আশ্রিতকে রক্ষা করা তোমার ধর্ম্ম, আমাকে বাঁচাও।' বাসুকি রাজী হলেন না। সুরু হোলো আবার ছোটা। থামলো গিয়ে মহামুনি ব্যাসদেবের আশ্রমে। ব্যাসদেব ধ্যানমগ্ন। আশ্রমের দরজায় বসেছিলেন তাঁর স্ত্রী। উঠতে গিয়ে তিনি যেই তুলেছেন বিরাট এক হাই, সে গিয়ে ঢুকে পড়লো তাঁর মুখে। পিছনে রোষভরে ছুটে আসতে আসতে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন সদাশিব। হেরে গেলেন ছোট্ট একটা পাখীর কাছে।

তপস্যারত ব্যাসদেবের তলব পড়লো সদাশিবের কাছে—'তোমার বাড়ীতে লুকিয়ে আছে আমার চোর।' তন্ন তন্ন করে খুঁজে বাড়ীতে কোথাও চোরের হদিশ পেলেন না মহামুনি। শেষে জানতে পারলেন তাঁর স্ত্রীর অগোচরে মুখ দিয়ে ঢুকে পড়েছে এক পাখী। মুনি বুঝলেন এইই শিবের চোর। চোরকে শিবের চাই। তাই ভেবেচিন্তে স্ত্রীহত্যার পথই বেছে নিলেন ব্যাসদেব। জানতে পেরে ব্যাসদেবের স্ত্রী পার্ব্বতীকে বল্লেন—'আমার স্বামী আমাকে হত্যা করলে তোমার স্বামীও সে পাপের ভাগী হবেন।'

তাই পার্ব্বতীর অনুরোধে শিব নিরস্ত হলেন।

পহলগাঁওয়ের হোটেলে বসে অমরনাথের গল্প শুনছিলাম শুভানের কাছে। আজকে সকালে এসেছি এখানে। শুভানকে আগেই জানিয়েছিলাম আসার কথা। ও নিজেই হোটেল, তাঁবু, ঘোড়া সব ঠিক করে
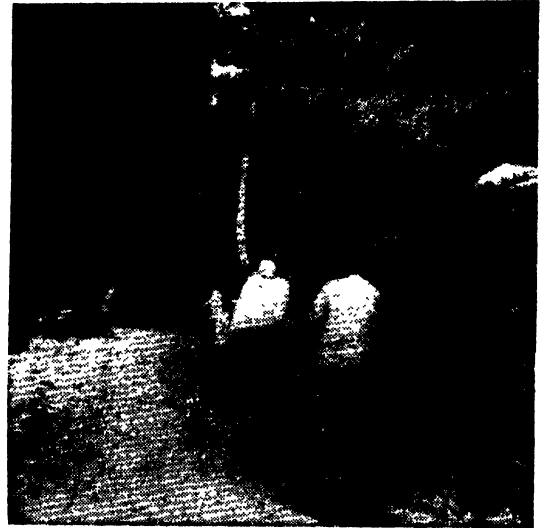
চন্দনবাড়ীর পথ

রেখেছিল। পাঁচ ছ বছর আগে আমার সঙ্গে আলাপ, অদ্ভুত করিৎকর্ম্মা লোক। বাসষ্ট্যাণ্ডেই এগিয়ে এসে হাত ধরেছিল—'সেলাম্ আলেকুম্'। আগের চাইতে কিছুটা যেন বয়সের ছাপ পড়েছে মুখে। কিন্তু তবুও কোনো কিছুতে ক্লান্তি নেই। বিকেলে ওর সঙ্গেই বেরিয়ে বাজার থেকে সমস্ত কিছু কিনে এনেছি। প্রায় ছ সাত দিনের রসদ নিতে হবে সঙ্গে। পহলগাঁওয়ের সমস্ত কিছু ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখিয়েছে ও নিজেই। মাঝখান দিয়ে বয়ে গেছে লীডার নদী। তার এক পাশে খাড়া পাহাড় আর এক পাশে পহলগাঁও শহর। এই লীডার ভ্যালীকে নিয়েই পহলগাঁও-এর এত গর্ব্ব। কালকে আমরা এই লীডারের ধারে ধারেই হাঁটা শুরু

করবো অমরনাথের পথে। পহল গাঁও-এর আর এক নদী আরু'র ধারে ধারে রাস্তা চলে গেছে কোলাহাই হিমবাহ পর্য্যন্ত।

বাসষ্ট্যাণ্ডের সামনেই টুরিষ্ট অফিস। অমরনাথ-যাত্রীদের সুবিধার জন্য বিরাট এক ক্লোকরুম্ তৈরী করা হয়েছে ওখানে।

আগামীকাল আমাদের দলে সবশুদ্ধ তিনজন—সঙ্গী দেবরাজ ও ঘোড়াওয়ালা গনি। শুভানেরও ইচ্ছে ছিল সঙ্গে যাবার। ওর বাড়ী শ্রীনগরে। ওখানে ডাল লেকের ওপরে ওর বিরাট হাউসবোট রয়েছে। আমাদের যাতে কোনো অসুবিধা না হয় এই ভেবেই ও হাজির হয়েছে পহলগাঁও এ।

ভোর চারটেয় এসে হাজির হ'ল ঘোড়াওয়ালা। আমরা প্রায় রেডী। দেবরাজের হাতে পকেট ব্যালান্স। ওজন করতে করতে গম্ভীর হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। বললে—সবশুদ্ধ প্রায় দু মনেরও বেশী।

সাধারণতঃ এখানের পাহাড়ী রাস্তায় এক-একটা ঘোড়া দেড়মন পর্য্যন্ত বয়ে নিয়ে যেতে পারে। জিনিষ-পত্র বৃষ্টিতে ভিজলে ওজন আরও বেড়ে যাবে। আর পাহাড়ী রাস্তায় বৃষ্টি একটু আধটু হবেই। তাই আর একটা ঘোড়া বা আর একটা কুলি হলেও নিশ্চিন্ত হওয়া যেত। কিন্তু এই সাত সকালে দুটোর কোনোটাই পাওয়া যাবে না জানি। শুভানকেও একটু চিন্তিত বলেই মনে হোল।

—'আগর আপলোক চাহে তো হম্ যা সকতা, লেকিন্ ম্যয় সরকারী নহি।'

চেয়ে দেখি দরজায় দাঁড়িয়ে ঝাঁকড়া মাথা কালো একটা লোক। সরকারী অর্থে রেজিষ্টার্ড কুলী নয়। এই সেই রহমন। আমাদের কুলী কাম্ গাইড্ কাম্ দু দিনের অভিভাবক। আমরা তাকাই শুভানের দিকে। শুভান ওদের ভাষায় কি যেন বলল ওকে, মাঝে মাঝে ঘোড়াওয়ালাকেও। তারপর আমাদেরকে বলল—'লোকটা ভালোই, রেজিষ্টার্ড কুলী পঁয়ত্রিশ টাকা নিত, একে তিরিশ দিলেই চলবে।'

হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। আমরা ততক্ষণে প্রায় রেডী। কফি ভর্ত্তি ফ্লাস্ক, জলের বোতল, ছাতা৷ হ্যাভারস্যাক আর ক্যামেরা আমাদের সঙ্গে বাকী সব কিছু কুলী আর ঘোড়ার পিঠে।'

শুভানকে জানালাম, যেদিন আমরা পহলগাঁওয়ে ফিরব, তার পর দিনই যাব শ্রীনগরে ওর ওখানে। আমাদের সঙ্গে সঙ্গে একটু এগিয়ে এলো ও। পহল-গাঁওয়ের বাজার ছাড়িয়ে এলাম। শুরু হোল ছোট ছোট কুঁড়ে ঘরের মতো কাঠের বাড়ী। শুনেছি খুব গরীব এরা।

শুভান বল্লো—'খুব আস্তে আস্তে হাঁটবেন। সব কিছু দেখে শুনে রাখবেন। রাস্তায় লাঠি আর জুতো খুব চুরি হয়। সাবধানে থাকবেন। খুদা আপলোগোঁকো ভালা করে।' খুব ভালো লাগলো ওর এই কথাগুলো যাবার আগে। এখান থেকেই বিদায় নিলো ও। পহলগাঁওকে পিছনে ফেলে আমরা এগিয়ে গেলাম। অনেকদূর থেকে শুভান আমাদের হাত নেড়ে বিদায় জানালো। আমাদের যাত্রা হোল শুরু।

এতক্ষণ আসছিলাম পিচঢালা রাস্তা ধরে। এবার শুরু হোল পাথর ফেলা কাঁচা রাস্তা। শুনলাম, চন্দনবাড়ী পর্য্যন্ত জীপ যাচ্ছে আজকাল। বছর কয়েকের মধ্যেই হয়তো বাস যাওয়া আসা করবে। তখন যাত্রীরা পহলগাঁওয়ের বদলে সোজাসুজি চন্দন-বাড়ীতে এসে থাকবেন। পহলগাঁওয়ের দাম কিছুটা কমে যাবে এতে, আর চন্দনবাড়ীতে কিছু স্থায়ী আবাস হয়তো গড়ে উঠবে। সেই সঙ্গে যাত্রীরা হারাবেন পাইনের ছায়াঘেরা সুন্দর এই পাহাড়ী পথটুকু হেঁটে পার হওয়ার আনন্দ।

ঘরবাড়ী আস্তে আস্তে শেষ হয়ে এলো। লীডার নদী পেরিয়ে আমরা পাহাড়ী রাস্তায় উঠে এলাম। মাঝে মাঝে কাবুলীদের মত দেখতে দু একজনকে, দেখলাম পাহাড়ের ওপর দিয়ে যাতায়াত করতে। রহমন বল্লো—'গুর্জর, ওরা পাহাড়েই থাকে।' শুনলাম

এদেরকে মানুষ করে সমতলে আনার জন্য সরকার উঠে পড়ে লেগেছেন।

পাইন আর দেওদারের ছায়া বিছানো চওড়া পাথুরে রাস্তা। রহমনের সঙ্গে আমরা এগিয়ে চলেছি। ঘোড়াওয়ালাকে দেখতে পাচ্ছি না। অনেকটা পিছিয়ে পড়েছে। রহমন কিন্তু পিঠে বোঝা নিয়েও সমান তালে এগিয়ে চলেছে আমাদের সঙ্গে। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে গরমও বাড়তে লাগলো। পুলওভার আগেই খুলে ফেলেছিলাম। শেষনাগ নদীর বাঁ পাড় ধরে আমরা চলেছি। কখনো কখনো নদীকে দেখতে পাচ্ছি না, শুধু শব্দ শুনেই বুঝতে হচ্ছে। মাইল পাঁচেক আসার পর আমরা বসলাম পাইনের ছায়ায়। ফ্লাস্ক খুলেই দেবু মেতে উঠলো রহমনের সঙ্গে গল্পে—কতটা এলাম আর কতটা বাকী।

আধঘন্টা পর আবার পথে। আগে রহমন তারপর আমরা। এই দুর্গম পথে ওই একমাত্র আত্মীয়, কাজেই ওর উপর ভরসা না করে উপায় নেই, তাই মাঝে মাঝে ওর খবরদারিও আমাদের সহ্য করতে হচ্ছে। পেরিয়ে এলাম একটা ছোট্ট পাহাড়ী গ্রাম। আমাদেরকে দেখে ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে এলো কয়েকটা বাচ্চা ছেলেমেয়ে আর কিছু পাহাড়ী কুকুর।

আমরা চন্দনবাড়ী পৌঁছালাম বেলা একটায়। আজ এখানেই যাত্রার সমাপ্তি। চারিদিক পাহাড়ে ঘেরা ছোট্ট উপত্যকা। একদিকে শেষনাগ আর অন্যদিকে একটা পাহাড়ী নদী। অমরনাথ-যাত্রীদের বেস্ ক্যাম্প। এখানে আছে থানা, পুলিস্, হাসপাতাল, পোষ্ট অফিস, হোটেল। সবই ভ্রাম্যমাণ।

শেষনাগ নদীর ঠিক ধারেই একটা ভালো ক্যাম্পিং গ্রাউণ্ড ঠিক করে বোঝা নামিয়ে হাল্কা হয়ে সবাই পা ছাড়িয়ে বসলাম। একটুখানি বসার সঙ্গে সঙ্গেই ঠাণ্ডা বাড়তে লাগলো। ঘোড়াওয়ালা এসে পড়লো একটু পরেই। খুব তাড়াতাড়িই খাটানো হোল তাঁবু। রহমনকে রেখে আমরা বেরুলাম চন্দনবাড়ী দেখতে।

শুভানের কাছে শুনেছিলাম, আগে চন্দনবাড়ীর নাম ছিল স্থাণু আশ্রম। সতীর মৃত্যুর পর শোকসন্তপ্ত সদাশিব এখানে কঠিন তপস্যায় বসেন। পরজন্মে সতী পর্বত রাজের কন্যা পার্ব্বতী হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু শিবের তপস্যা ভঙ্গের চেষ্টা করে বিফল হন।

খাওয়া দাওয়ার পাট চুকলো রাত আটটা নাগাদ। আজ থেকে রহমনই আমাদের সমস্ত কিছুর ভার নিয়েছে। সকালের জন্য কফি আর গরম জল রেডী করে সবাই শুয়ে পড়েছি। পাশ দিয়ে ভীষণ শব্দ করে বয়ে চলেছে পাহাড়ী নদী। দেবুর গভীর ঘুমের আওয়াজ পাচ্ছি। তাঁবুর পিছন দিকের কিছুটা ছেড়ে দিয়েছি রহমনকে, সেও হয়ত ঘুমে অচেতন সারাদিনের ক্লান্তির পর। শুধু আমার চোখেই ঘুম নেই। ওদেরকে রেখে আস্তে আস্তে বেরিয়ে এলাম তাঁবুর বাইরে। চোখে তো ঘুমের নেশা লাগেনি, কিন্তু এ কি দেখছি আমি—স্বপ্ন না সত্যি! দিনের আলোয় যাকে মনে হয়েছিল সুন্দর, এখন মনে হচ্ছে তা ভুল। শুধু সুন্দর বলেই তাকে বোঝানো যাবে না, সে তুলনাহীন। তার এই পাহাড়, নদী, গাছ সব কিছুই যেন খুবই চেনা। চাঁদের আলোয় ভেসে গেছে চারিদিকের পাহাড় আর নদী। পাহাড়ের সেই অসীম নিস্তব্ধতা আর স্রোতের ডাকে নিশি পাওয়ার মত এগিয়ে চলেছি। কখন যে এসে বসেছি নদীর ধারে এক বড় পাথরের উপর খেয়াল নেই। পায়ের কাছ দিয়ে শব্দ করে বয়ে চলেছে নদী। এই চাঁদ তার আলো, এই রাত, পাহাড়, নদী সব কিছুর সঙ্গে যেন এক হয়ে গেছি।

কতক্ষণ এভাবে বসে ছিলাম জানি না। হঠাৎ চমক ভাঙ্গলো টর্চের জোরালো আলোয়—

—'আরে সাব্, হাম্‌লোক সোচা আপ কিধর চলে গয়ে'। তাকিয়ে দেখি রহমন, সঙ্গে দেব।

॥ দুই ॥

ঘুম ভাঙ্গলো বেশ একটু দেরীতে। পথে নামলাম সকাল আটটায়। নদীর ধার দিয়ে আধমাইলের মত প্রায় সমতল রাস্তা। এখনো পাচ্ছি পাইনের ঘন বন।

শেষনাগ নদী ঘুরে গেছে পাহাড়ের ধার দিয়ে ডানদিকে। আমাদের পথ বাঁদিকে। পেরুতে হবে মাইল দুয়েক খাড়া পাহাড় 'পিসুঘাট'। তীর্থযাত্রীদের বিশ্বাস যারা এই পিসুঘাট পার হতে পারবে তারা অমরনাথে পৌঁছাবেই।

একঘেয়ে খাড়া চড়াই। মাইল খানেক ওঠার পরই শেষ হয়ে গেলো পাইনের ঘন বন। রহমন বল্লো—'এত উঁচুতে আর কোনো গাছ পাবেন না।' অর্থাৎ আমরা Tree Line পেরিয়ে এলাম। উপরে যারা উঠছে তাদের দেখে ভয় হচ্ছে। নীচে নদী দেখতে পাচ্ছি না।

দেড় মাইল মাইল উঠে বসলাম সবাই। বেশ হাঁফিয়ে উঠেছি এরই মধ্যে। রহমন্ বল্লো, এই নিয়ে পরপর সাতবার যাচ্ছে ও এই রাস্তায়। প্রথমবারের সেই ভয়ে ভয়ে পথচলার কথা মনে পড়লে এখনও হাসি পায়, আরও শুনলাম। একবছর প্রবল বৃষ্টিতে এই পিসুটপের শিকার হয়েছিল একান্নটি ঘোড়া আর একত্রিশ জন তীর্থযাত্রী। আর বহু যাত্রীকে এখান থেকেই ফিরে যেতে হয়েছিল। অমরনাথ দর্শন আর তাদের ভাগ্যে ঘটে উঠেনি। বৃষ্টি হলে এ রাস্তায় উঠা সত্যিই দুঃসাধ্য। আমরা এখনও বৃষ্টি পাইনি রাস্তায়।

উঠে পড়লাম। আরও বেশ কিছুটা চড়াই ভাঙ্গতে হবে এখনো। নীচের গাছগুলোকে খুব ছোট সবুজ ক্ষেতের মত লাগছে। অনেক দূরে নীচে নদীটি দেখতে পাচ্ছি।

বেলা তিনটে। আমরা এ রাস্তার দুর্গমতম চড়াই পিসুঘাটী পেরিয়ে এলাম। রহমনের ভাষায় 'হাড্ডিকা চেড়াই হাড্ডিকা মাফিক জবরদস্ত'। পুরাকালে দেবতাদের সঙ্গে অসুরদের যুদ্ধ হয়েছিল এখানে। যুদ্ধে অসুরদের পিষে মেরেছিলেন দেবতারা। সমস্ত অসুরদের অস্থি দিয়ে তৈরী এই পাহাড়। তাই এটা হাড্ডিকা চেড়াই। কালকের চাইতে ঠাণ্ডা যেন একটু বেশী এত উপরে উঠেও রোদ্দুরটা তাই গা সওয়া হয়ে গেছে। প্রায় সমতল ছোট্ট একটা মাঠ, তার মাঝ
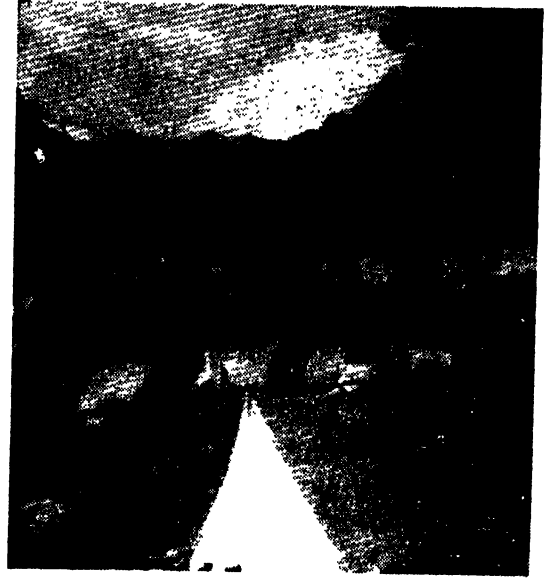
তাঁবুর মেলা—চন্দনবাড়ী

বরাবর চলে গেছে রাস্তা। সময় নষ্ট করার ইচ্ছে ছিল না। কালকে ঢালু পাহাড়ী রাস্তায় নামতে গিয়ে বাঁ পায়ের হাঁটু একটু জখম। এতটা চড়াই ভাঙ্গার দরুন বেশ চাড়া দিয়ে উঠেছে সেই ব্যথা। তাই ইচ্ছে না থাকলেও বসতে হোল। আমাদের দেখাদেখি রহমনও বসল বোঝা নামিয়ে।

আরও মাইল পাঁচেক যেতে হবে আজকে। মাঠের রাস্তা ছেড়ে পাহাড়ী রাস্তায় উঠে এলাম। নদীকে আবার পেয়েছি রাস্তার পাশেই। চন্দনবাড়ীর কাছে এর নাম নীল গঙ্গা। নীলগঙ্গার গল্প শুনেছিলাম গুজ্জানের কাছে। একবার কামক্রীড়ায় মত্ত সদাশিবের মুখমণ্ডল ভরে গিয়েছিল পার্বতীর নীলাঞ্জনে। পার্ব্বতী লজ্জা পেয়ে তাঁকে পাঠিয়েছিলেন গঙ্গায় মুখের রঙ ধুয়ে আসতে। পার্বতীর কাজলের রঙ লেগেছিল নদীর জলে, সেই থেকে এর জল নীল আর নাম নীলগঙ্গা।

পাহাড়ের কোলে ঘেঁসে এঁকে বেঁকে চলেছে রাস্তা। ঘোড়া ওয়ালা আজকে অনেক পিছনে। ওই পাঁচ মাইল চড়াই ভাঙ্গতে আমাদের যা হাল হয়েছে তাতে পিঠে বিরাট বোঝা নিয়ে ঘোড়ার আরও বেশী সময় লাগাই

স্বাভাবিক। রহমনের কথামত তাই আমরা পা চালিয়ে চলেছি। শেষনাগ পৌঁছে রেষ্ট হাউসের কোনো ঘর যদি খালি পাওয়া যায়। মাইল দুয়েক চড়াই উৎরাই পার হয়ে আমরা এলাম জোসপালে। অমরনাথ থেকে ফেরার পথে যাত্রীরা শেষনাগে না থেমে এখানে এসে ক্যাম্প করেন। পায়ের ব্যথা বেড়ে চলেছে, কিন্তু রেষ্ট হাউসের কথা ভেবে কিছু বলতে পারছি না ওদের। সমান তালে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করছি ওদের সঙ্গে। মাঝে মাঝেই পিছিয়ে পড়ছি, ওদের তাড়ায় আবার এগিয়ে যেতে হচ্ছে।

রহমন বল্লো—শেষনাগ বহোৎ খতরনাক্ বাবুজী, আভি সদ্দি আভি ধুপ। অর্থাৎ এখনই বৃষ্টি এখনই রোদ।

পাঁচটা বাজে। কিন্তু সূর্য্যকে দেখতে পাচ্ছি না, কখন যে মেঘের আড়ালে ঢেকেছে বুঝতে পারিনি কেউ। কালকের চাইতে মেঘের অবস্থা আজ বেশ খারাপ। রহমনের কাছে জানলাম পাহাড়ের এই বাঁকটা ঘুরলেই শেষনাগ। কিন্তু পা যেন আর চলছে না। বাঁকটা শেষ হতেই চোখে পড়ল দূরে শেষনাগ হ্রদ, এখান থেকেই বেরিয়েছে শেষনাগ নদী। হ্রদের ওপারে দু একটা তাঁবু আর রেষ্ট হাউস দেখতে পাচ্ছি। ব্যথা ভুলে তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে দিলাম। এক ঘন্টা পর পৌঁছালাম শেষনাগ। ঘোড়াওয়ালা কখন আসবে কোনো ঠিক নেই। রহমন গেলো রেষ্ট হাউসে ঘরের খোঁজে। কোনো বাঁধাধরা নিয়ম নেই এখানে, যারা আগে আসবে তারাই দখল করবে ঘর।

হ্রদের চারিদিকে পাহাড়। সামনের পাহাড়ের নামও শেষনাগ। বায়ুরূপী রাক্ষসের অত্যাচারে অতিষ্ঠ দেবতারা প্রতিকারের নিমিত্ত সদাশিবের শরণাপন্ন হলেন। কিন্তু সদাশিব কিছুতেই রাজী হলেন না, রাক্ষসকে তিনি বর দিয়েছিলেন—একমাত্র বিষ্ণু ছাড়া কেউ তাকে হত্যা করতে পারবে না। দেবতারা ক্ষীর সাগরের তীরে এসে শুরু করলেন বিষ্ণু বন্দনা। প্রসন্ন
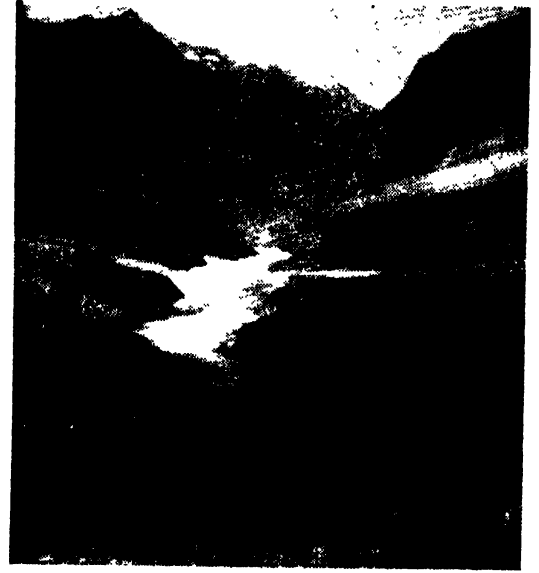
শেষনাগ পেরিয়ে

হয়ে বিষ্ণু তাঁদের ফিরে যেতে বল্লেন। তাঁর আদেশে পাতাল থেকে বেরিয়ে এলেন শেষনাগ। তাঁর পিঠে চড়ে ভগবান বিষ্ণু বায়ুরূপী দৈত্যকে হত্যা করলেন। তখন থেকেই এই হ্রদ এবং পর্ব্বতের নাম শেষনাগ।

হ্রদের জল ঘোলাটে আর নীলচে। এই নিয়ে অনেক কাহিনী শোনা যায়। এর মধ্য দিয়েই অর্জুনকে পাতালে নিয়ে গেছিল উলুপী। আবার অনেকে বলেন এই পুণ্য সলিলে স্নান করতেন পার্বতী, তার এই রঙ এরকম।

রোদের যেটুকু আভা ছিল তাও মিলিয়ে গিয়ে শুরু হোল টিপ টিপ বৃষ্টি। ঘোড়াওয়ালার আশা ছেড়েই দিয়েছিলাম। রহমানেরও পাত্তা নেই। বৃষ্টি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঠাণ্ডায় হিম হয়ে আসছে সারা শরীর। বর্ষাতি গায়ে দিয়ে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছি দুজনে। কারো মুখে কোনো কথা নেই। সারা দিনের চড়াই ভাঙ্গার ক্লান্তির পর এই বৃষ্টি যেন শরীরের সমস্ত শক্তি নিঃশেষ করে দিচ্ছে। বৃষ্টি থামার কোনো লক্ষণ নেই। আরও অনেক পরে ফিরল রহমন। কোনো ঘর খালি

নেই। সন্ধ্যে প্রায় নেমে এসেছে। রহমনও অনেকটা হতাশ। ঘোড়াওয়ালারা কখন এসে পৌঁছবে ঠিক নেই। আবার এই ভিজে মাটীর উপর গ্রাউণ্ড শীট বিছিয়েও ঠাণ্ডার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে না। সারা রাত্রির কথা তো দূরের,এখন এই মুহূর্ত্তে কি করণীয় ভাবতে পারছি না। কি জানি কতক্ষণ এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। রহমনকে বল্লাম—চলো, রেষ্ট হাউসেই যাই। ওখানেই কারো সঙ্গে বসে রাত্তিরটা না হয় কাটিয়ে দেবো, যদি জায়গা পাই।

আগে শুনেছিলাম, এ রাস্তায় রেষ্ট হাউসগুলোয় সাধু-সন্ন্যাসীদের একাধিপত্য। গিয়ে দেখি প্রথম দুটো ঘরেই জুনিপার গাছের ধুনি জ্বলছে। পরের ঘরের দরজায় একটা প্লাষ্টিক শীট ঝোলানো। বাইরে থেকে দেবের হাঁক ডাক শুনে যিনি বেরিয়ে এলেন, তাঁকে দেখে মনের মধ্যে আশ্রয় পাবার যে ক্ষীণ আশাটুকু ছিলো তাও উবে গেলো। টুপি আর ওভারকোট ঢাকা এক মহিলা পরিষ্কার হিন্দীতে শুধালেন—

—কি ব্যাপার?

যদ্দুর সম্ভব বিনীত গলায় বলতে শুরু করেই হঠাৎ চিৎকার করে উঠলো দেবরাজ—ভাবিজী?

এই খতরনাক জায়গায় ভাবিজী? এগিয়ে গেলাম। ততক্ষণে ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছেন আরও দুজন—মিঃ পন্থ আর উষা বহিন। চিনতে পেরে ছুটে এসে হাত ধরলেন মিঃ পন্থ। ইতিমধ্যে ভাবিজী আর উষা হাভারস্তাক দুটো ভিতরে নিয়ে গেছে।

ভেতরে গিয়ে আগুনের ধারে বসে ভালভাবে লক্ষ করলাম। রেষ্ট হাউস অর্থে মাটি আর পাথরের তৈরী জানালা-বিহীন ছোট্ট ঘর। দরজায় কপাট নেই, ঠাণ্ডার হাত থেকে বাঁচার জন্য দরজায় ঝোলানো হয়েছে প্লাষ্টিক শীট। রেওয়া থেকে এসেছেন মিঃ পন্থ। ওখানের ফরেষ্ট অফিসার উনি। দু বছর আগে রেওয়া বেড়াতে গিয়ে আমরা ওঁর ওখানেই ছিলাম দিন সাতেক। দেবরাজের সূত্রেই আমার সঙ্গে আলাপ। ওদের দুই পরিবারের বহুকালের জানাশোনা।

মিঃ পন্থ বেশ ধর্ম্মভীরু মানুষ। অনেকদিন থেকেই ইচ্ছে অমরনাথ দর্শনের। কিন্তু দেবতার চাইতে উপর-ওয়ালার ডাকই প্রতিবার বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। গল্পে মশগুল হয়ে কাটলো সারাটা সন্ধ্যে।

খাওয়া দাওয়ার পাট চুকিয়ে শুয়ে পড়েছি। আজকের সারাদিনের কথা ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি খেয়াল নেই, হঠাৎ ঘুম ভাঙলো বাইরে থেকে রহমনের গলায়—ঘোড়া আ গিয়া শেঠজী।

আবার ভাবিজীই উঠেছেন। কিছু বলার আগেই রহমনকে বল্লেন বাইরে তাঁবু খাটিয়ে শুয়ে পড়তে—'সাব্ লোক এত্‌না রাত মে ফির্ কাঁহা যায়েগা?'

উঠতে যাচ্ছিলাম। ভাবিজী ধমক দিয়ে উঠলেন। উষা বললো—ভাইয়ালোক্ সব অ্যায়সা হি হোতা হ্যায়।

ভাবিজীর হাসির আওয়াজ পেলাম। দেব চুপি চুপি বলে উঠলো—শেষনাগ বহোৎ খতরনাক্ বাবুজী।

আবার সারা ঘরে হাসির ঝ[illegible]।

॥ তিন ॥

সকালে ঘুম ভাঙলো উষার ডাকে—ভাইয়া, কফি। বললাম—'দিলে তো পাকা ঘুমটা মাটি করে। বহিন্ লোক সব অ্যায়সাহি হোতি হ্যায়।' বললে—'পাহাড়ে এসেছেন, মৌ ঘুমের কথা ভুলে যান।'

জিনিষ-পত্তর বাঁধার কাজ শেষ। পায়ের ব্যথা তখনো কমেনি। কালকে ঠিক করেছিলাম আজকে বেরুবার আগে একবার কম্প্রেস্ করবো। ভাবিজীকে বলার সঙ্গে সঙ্গেই গরম জল রেডী। উষা এতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল। কাছে এসে হাত থেকে তুলোটা কেড়ে নিয়ে বললো—'অনেক হয়েছে, ছাড়ুন।' চেঁচিয়ে বললাম—'আহা কর কি।' কিন্তু বৃথা। ভাবিজী হেসে বললেন—'বহিন্ লোক সব অ্যায়সাহি হোতি হ্যায়।' হেসে ফেলল ও। মিঃ পন্থও হেসে বললেন—'সিভিল্ সার্জেনের হাতে পড়েছেন মশাই, ভাবনাও নেই, ভরসাও নেই।'

উষা চোখ পাকিয়ে তাকালো ওঁর দিকে। পরে

জেনেছিলাম সিভিল্ ডিফেন্সে ফার্স্ট এড্ ট্রেনিং নিয়েছিল ও। তাই বাড়ীতে ও সিভিল্ সার্জেন্।

আজকে আমরা দলে ভারী। ঘোড়াওয়ালা আগেই চলে গেছে। আগে আমি রহমন, মাঝে দেব আর উষা, সবশেষে মিঃ পন্থ আর ভাবিজী। সারাদিনে আজকে আমাদের হাঁটতে হবে নয় মাইল। রাত্রে থাকবো পঞ্চতরণীতে। কালকে সকালে সেখান থেকে অমরনাথ, আবার ফিরে আসবো পঞ্চতরণীতে। আজকে এই ন' মাইলের মধ্যে পেরুতে হবে প্রায় পনের হাজার ফুট উঁচু মহাগুনস্ পাস। মহাগুনস্ নদীর ধারে ধারে আমরা এগিয়ে চলেছি। এতক্ষণ আসছিলাম নদীর ডানদিক ধরে, মাইল খানেক পর উঠে এলাম বাঁদিকে, এখান থেকে আমাদের উঠতে হবে ১৫০০ ফুট উঁচু চড়াই। আস্তে আস্তে চড়াই ভাঙ্গছি। শীতও আস্তে আস্তে বাড়ছে। মেঘলা আকাশ। মাঝে মাঝে রোদ্দুর পাচ্ছি।

মিঃ পন্থ আর ভাবিজী অনেক পিছনে। উপরে উঠতে কষ্ট হচ্ছে। বাতাসে অক্সিজেন্ কম। একটুতেই হাঁফিয়ে পড়ছি।

এক হাজার ফুট চড়াই ভেঙে আমরা মহাগুনস্ ভ্যালীতে এলাম। আরও শ' পাঁচেক ফুট উঠতে হবে। তারপর আর চড়াই নেই। একটানা মাইল পাঁচেক উৎরাই পঞ্চতরণী পর্য্যন্ত। মহাগুনস্ টপে মেঘ নেমেছে দেখতে পাচ্ছি। ওর ওপারে কি আছে এখনো জানি না। আগেই শুনেছিলাম এই রাস্তায় সময় সময় এত বেশী মেঘ নামে যে দু'তিন হাত দূরের জিনিসও দেখা যায় না। ঠিক ছিলো এখানেই বসবো ওরা না আসা অবধি। কিন্তু উপরে মেঘ দেখে যেন চড়াই ভাঙ্গার নেশা পেয়ে বসলো। এটাই আমাদের রাস্তার সবচাইতে উঁচু জায়গা। না থেমে উঠে এলাম মেঘলোকে। পাতলা কুয়াসা আর মেঘের আবরণ। ঠাণ্ডায় অসাড় হয়ে আসছে হাত-পা, তবু কি যেন এক অদ্ভুত অনুভূতির স্বাদ পাচ্ছি মনে। শুনেছি পুরাকালে রাস্তা ছিলো এদিক দিয়ে মানস সরোবর আর কৈলাসে যাবার।
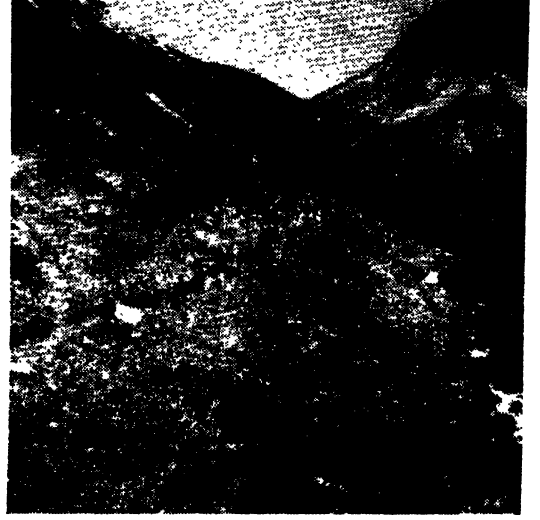
মহাগুনস্ পাস্

দেবতাদের পদধূলিপূত এই রাস্তায় সত্যি সত্যিই কি আমরা দেবলোকে এলাম! কিন্তু রহমন দেবতা হতে রাজী নয়। ওর তাড়ায় বেশ তাড়াতাড়িই পেরিয়ে এলাম মেঘলোক। কারণ—সর্দ্দিমে রহনা জাদা আচ্ছা নহি।

চোখের সামনে এই দৃশ্যের জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। সামনে যতদূর চোখ যায় একটানা ঢালু পাহাড়ী রাস্তা। আজকের রাস্তায় চড়াইয়ের সমাপ্তি। এরপর একটানা উৎরাই পঞ্চতরণী অবধি। তাই বিশ্রামেও আপত্তি নেই।

—'লেকিন্ পিতাজী তো সাথমে হ্যায় রোশন্; তুম্ ডরতা কিঁউ।' প্রথমবার বাবার সঙ্গে এই রাস্তায় আসার সময় রোশনকে বলেছিলাম। ওদের বাড়ীর পিছনের বিরাট চিনার গাছের ছায়ায় বসে ও আমায় এই রাস্তায় আসতে মানা করেছিল বাবুজী। শেষনাগের রাস্তাকে ওর ভীষণ ভয়। পাহাড়ীরাও বলে—শেষনাগ বহোৎ খতরনাক। আমার কিছু হোল না। কিন্তু সেই প্রথম বারই এই রাস্তায় হারালাম বাবাকে। তারপর প্রতি বছরই এই সময় এই রাস্তার টানে বেরিয়ে পড়ি। 'দিল্

খুশ রহে তো কিসি বরস্ কোই বাবুকা সাথ, নেহি তো অ্যায়সাহি আতা যাতা।'

গল্পে মেতে আছি রহমনের সঙ্গে। ও আর রোশন একই সঙ্গে মানুষ ছোটবেলা থেকে। বাবা মারা যাবার আগে থেকেই ওদের বিয়ে ঠিক হয়েছিল। দু'বছর আগে রোশনেরও বাবা মারা যেতে ওকে নিয়ে এসেছে নিজের বাড়ীতে। ওর অনুরোধে কথা দিলাম পহল-গাঁওয়ে ফিরে আমরা ওর গাঁও 'সুঁপিয়ানে' যাব, ওর রোশনকে দেখে আসব।

—বাবুজী, রোশন চিনারের ছায়ার মতই ঠাণ্ডা।'

—'লেকিন্ ম্যায় উস্‌সে ভি ঠাণ্ডা হুঁ।' তাকিয়ে দেখি পিছনে উষা, সঙ্গে দেব।

—'দেখিয়ে ভাইয়া,' বলেই গ্লাভ্‌স্ খুলে খালি হাতে আমার গাল জড়িয়ে ধরল।

রহমন হেসে উঠল।

আমরা পঞ্চতরণী পৌঁছালাম। মিঃ পন্থ আর ভাবিজী অনেক পিছনে। ঘোড়াওয়ালা অনেক আগেই চলে গেছে। নদী পেরিয়ে ওপারে যেতে হবে আমাদের। সারা রাস্তায় এত চওড়া নদী আর চোখে পড়ে নি। সমতলের নদীর মতই অগভীর। পরিষ্কার অল্প জল পেরিয়ে আমরা এপারে এলাম। কালকে এপার দিয়েই আমরা অমরনাথের পথে যাবো।

তাঁবু ফেলার জায়গা ঠিক হোল রিভার বেড্-এ। সামনে পিছনে দুটো তাঁবু খাটানোর পালাও শেষ। মিঃ পন্থ আর ভাবিজীর দেখা নেই। এতটা রাস্তা হেঁটেও উষা কিন্তু দিব্যি প্রাণ-চঞ্চল এখনো। ওরা বেরিয়ে গেল জায়গাটা দেখবে বলে। তাঁবুর মধ্যে বসে রইলাম আমি জিনিসপত্তর আগলে।

মিঃ পন্থ আর ভাবিজী এলেন অনেকক্ষণ পর। ভাবিজীর অবস্থা আজ সত্যিই সঙ্গীন। মহাগুনস্ পেরিয়ে ঢালু পাহাড়ী রাস্তায় নামতে গিয়ে মচ্‌কেছে পা, ভেঙ্গেছে হাতঘড়ি। পায়ের ব্যথা ভুলতে পারলেও বাবার দেওয়া ঘড়ির কথা ভুলতে পারছেন না। "ওটাই ছিলো বাবার দেওয়া সর্ব্বশেষ জিনিস।"

ওঁদেরকে রেখে বেরিয়ে এলাম তাঁবু থেকে। রহমনকেও রেখে এলাম, দরকার হতে পারে ওঁদের। নদীর ধারে ছোট-বড় পাথর বাঁচিয়ে এগিয়ে চলেছি। শুনেছি এই পঞ্চতরণী শিবের জটাজাল থেকে সৃষ্ট। স্নানে সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয়। এখান থেকে মাইল তিনেক দূরে অমর-গঙ্গা, সেখান থেকে আরও প্রায় এক মাইল দূরে পঞ্চতরণী মিশেছে অমর-গঙ্গার সঙ্গে। কালকে এই কয়েক মাইল ভীষণ চড়াই ভাঙ্গতে হবে।

কিন্তু নীচে জলের ধারে যেন কাদের গলার আওয়াজ পাচ্ছি।

—ফিরে গিয়ে আবার আমাকে, আমাদের সব্বাইকে ভুলে যাবে না?

—কি করে বুঝলে?

—কোথায় রেওয়া আর কোথায় কোলকাতা, রেওয়ার জঙ্গলে বসে কি আর কোলকাতার কথা মনে থাকবে তোমার?

—রেওয়ার জঙ্গলে অন্য কিছু হারালেও মন হারায় না আর কোলকাতার ট্রামে-বাসে মন তো দূরের কথা, পুরো মানুষটাই হারিয়ে যায়।

উঠে এলাম। এ-নির্জ্জনতা ওদেরই প্রাপ্য। তাঁবুতে ফিরেই দেখি মিঃ পন্থ ভাবিজীর সেবায় ব্যস্ত। রহমন ইতিমধ্যেই কিছু পাহাড়ী ওষুধ নিয়ে হাজির। ঘন্টা কয়েকেই নাকি সেরে যাবে ব্যথা। ভাবিজীকে বুঝিয়ে আমি আর মিঃ পন্থ রান্নার ভার নিলাম। আজকের রান্না খিচুড়ী আর ভাজি। মিঃ পন্থের সঙ্গে কথা হচ্ছিল কালকে ভোর রাত্রে যাত্রা শুরু করার। যাতে করে দশটার মধ্যেই এখানে ফিরে আসতে পারি। তাহলে কালকে জোসপালে থেকে পরশুদিনই পহল-গাঁওয়ে পৌঁছে যাব।

কিছু পরই ফিরল ওরা দুজন। আমাদেরকে স্টোভের সামনে দেখেই উষা হৈ হৈ করে উঠল—আজ রাত্রে আর কিছু গলায় উঠলোনা। ভালোই, রাত্রে উপোস দিয়েই কালকে দেবদর্শনে যাওয়া যাবে।

॥ চার ॥

রাত্রি তিনটের সময় উঠে পঞ্চতরণী নদীর ডানদিক ধরে আমরা চলেছি। কালকের মতই আমরা তিনদলে

বিভক্ত। ঘুটঘুট্টি অন্ধকার। চাঁদের আলোর চিহ্নমাত্র নেই। চারিদিক ঢেকে আছে মেঘে। যে কোনো মুহূর্তে বৃষ্টি নামতে পারে, তাই আগে থেকেই বর্ষাতি পরেই চলেছি। মাঝে মাঝে দু পাশে খাড়া বরফের দেওয়াল। পঞ্চতরণীকে বাঁয়ে রেখে আমরা ডানদিকে পাহাড়ের নীচে এলাম এই দেড় মাইল খাড়া পাহাড় পেরিয়ে আমরা অমরগঙ্গায় পৌঁছাবো।

লাঠি ছাড়া এই চড়াইতে উঠতে গিয়ে মনে হচ্ছে শুভানের কথা কত সত্যি। ডান পাশে খাড়া পাহাড় আর বাঁয়ে অতল খাদ। ভিজে মাটী, পদে পদেই পা পিছলে যাচ্ছে। আধ মাইলও হাঁটিনি, শুরু হোল বৃষ্টি। হাত পা সব অসাড় হয়ে আসছে। এই অবস্থায় কতদূর যেতে পারবো বুঝতে পারছি না। প্রায় প্রতি পদক্ষেপেই রহমন বলছে আর আগানো ঠিক হবে না। জানি না ওরা সবাই আসছে কি না, হয়তো বা ফিরে গেছে পঞ্চতরণী।

বৃষ্টি আস্তে আস্তে বাড়লো। হাতের গ্লাভস্, প্যান্ট সব ভিজে দ্বিগুণ ভারী হয়ে গেছে। ঘণ্টা দুয়েক পর পাহাড়ের ঢালুর দিকে নামতে শুরু করেছি। অন্ধকার ফিকে হয়ে অসছে। একটু একটু করে ফুটে উঠছে ভোরের আলো। বৃষ্টি ততক্ষণে কমে এসেছে। দূরে আবছা সাদা অস্পষ্ট রেখার মত বরফ দেখতে পাচ্ছি। রহমন বল্লো—অমরগঙ্গা।

তাহলে আর দূর নেই। সীমাহীন আনন্দে চিৎকার করে উঠলাম। আরও আধঘণ্টা পর নেমে এলাম অমর গঙ্গায়। বৃষ্টি থেমে গেছে। অমর গঙ্গার উপর দিয়ে হেঁটে চলেছি। ছয় থেকে দশ ফুট বরফের নীচে দিয়ে বয়ে চলেছে নদী। প্রায় সারা বছর বরফে ঢাকা থাকে। কখনো চলেছি পাশ দিয়ে, কখনো মাঝ বরাবর। এক ঘণ্টা পর এসে থামলাম। তিনদিকে পাহাড়। সামনের পাহাড়ের থেকে বেরিয়েছে অমরগঙ্গা। বাঁদিকের পাহাড়ে দূরে দেখতে পাচ্ছি অমরনাথের গুহামুখ। ডানদিকের পাহাড়ের নাম জানি না। কিন্তু একে ঘিরে অনেক উপকথার জন্ম। আগেকার যুগে যখন পহলগাঁও থেকে এ রাস্তা লোকে জানতো না তখন শ্রীনগরের ব্রহ্মচর্য্য পাহাড় থেকে যাত্রা শুরু করে এই পাহাড়ে আসতো, তারপর দুকূল প্লাবানো অমরগঙ্গায় আত্মাহুতি দিতো। আজকের মতো দেবতার পরশ তারা পেতো না।

—শেঠজী, কবুতর।

তাকিয়ে দেখি বাঁ দিকের পাহাড়ের চুড়ার কাছে উড়ছে একটা পায়রা। শুনেছি সারা বছর নাকি এখানে দুটো পায়রা থাকে। অনেকে বলেন শ্রাবণী পূর্ণিমার কিছু আগে ওগুলোকে এখানে এনে ছেড়ে দেওয়া হয়। শুভানের কাছে শুনেছিলাম 'কুরু কুরু' শব্দ করে দুই রাক্ষস বিঘ্ন ঘটিয়েছিল শিবের নাচে। শিব তাদের অভিশাপ দিয়েছিলেন—চিরকাল এই শব্দই তোমাদের মুখ দিয়ে বেরুবে। সেই থেকে তারা 'কবুতর' হয়েই এখানে আছে।

গুহার কাছাকাছি নদীর বেশ কিছুটা জায়গায় বরফ গলে গেছে। কুলকুল শব্দে বয়ে চলেছে স্বচ্ছসলিলা অমরগঙ্গা। নদীর দুপাশেই নাম না জানা অসংখ্য ফুল। নদীকে ছেড়ে বাঁ দিকের পাহাড়ে উঠতে লাগলাম গুহামুখের দিকে। রহমন ভিন্ন ধর্মাবলম্বী। গুহার মধ্যে ও যাবে না। বাইরে ওকে বসিয়ে রেখে ভিতরে গেলাম। সামনে বাঁধানো ছোট্ট চত্বর। ও পারে গুহার গা ঘেঁসে চার পাঁচ ফুট উঁচু বরফের শিবলিঙ্গ। গুহার ভিতরে স্যাঁতসেঁতে চুন মাটি। চুঁইয়ে চুঁইয়ে জল পড়ছে চারিদিকে।

শুভানের কাছে এই অমরনাথের গল্প শুনেছিলাম পহলগাঁও-এ। নারদ ঠাকুর শান্তি একেবারে পছন্দ করেন না। পার্ব্বতীকে শুধালেন—শিব ঠাকুরের গলায় রুদ্রাক্ষের মালা কেন জানো? কি রকম গোলমেলে ঠেকল ব্যাপারটা পার্ব্বতীর। সোজাসুজি সদাশিবকে গিয়ে তিনিও ওই একই প্রশ্ন করলেন। কিন্তু সদাশিব এড়িয়ে গেলেন প্রশ্ন। শেষে পার্ব্বতীর পীড়াপীড়িতে বল্লেন—তুমি যতবার জন্ম নিয়েছো ততবারই তোমার সঙ্গে আমার মিলন হয়েছে। আর যতবার তুমি জন্ম নিয়েছো ঠিক ততগুলি রুদ্রাক্ষ রয়েছে আমার মালায়।

ব্যাপারটা আরও গোলমেলে মনে হোল পার্ব্বতীর—'তা কি করে হয়! বার বার আমিই জন্ম নিলাম কিন্তু তুমি সেই থেকেই গেলে?' শিব বল্লেন—এটা জানতে হলে তোমাকে আমার অমরকথা শুনতে হবে।

কিন্তু যে এই অমরকথা শুনবে সেই তো অমর এক প্রাণ হয়ে পড়বে। তাই অমরনাথ গুহায় বাঘছালের উপরে বসে পার্ব্বতীকে অমরকথা শোনাবার আগে মায়া-বলে সমস্ত সৃষ্টিকে ঘুম পাড়িয়ে দিলেন সদাশিব। কিন্তু বাঘছালের আসনের নীচে এক তোতাপাখীর ডিম থেকে গেল, তিনি বুঝতে পারলেন না। পার্ব্বতীকে অমরকথা শোনাতে শুরু করলেন তিনি। শুনতে শুনতে দু চোখ ভরে তন্দ্রা এলো পার্ব্বতীর। শিবের অজ্ঞাতে তিনি পড়লেন ঘুমিয়ে প্রহরের পর প্রহর ধরে চলল সেই অমর কাহিনী। মাঝে মাঝে শিবের কথার জোগান দিয়েছে সেই তোতাপাখীর সদ্যোজাত ছানা।

শেষ করে শিব তাকালেন নিদ্রাভিভূতা পার্ব্বতীর দিকে—এ কি! তাহলে মাঝে মাঝে আমার প্রশ্নের উত্তর দিলো কে?

খুঁজতে খুঁজতে পাওয়া গেল সেই তোতাপাখীর ছানা। তার পিছনে ধাওয়া করে শিব এসে পৌঁছালেন ব্যাসদেবের আশ্রমে। কিন্তু বুদ্ধির খেলায় হেরে গেলেন ছোট্ট একটা পাখীর কাছে।

কালক্রমে সেই পাখী শুকদেব নাম নিয়ে ব্যাসদেবের পুত্ররূপে জন্ম নিলো। সংসার ত্যাগ করে সে জনক রাজাকে মেনে নিলো গুরু বলে। তারপর গুরুর আদেশে গেলো মুনি-ঋষিদের আশ্রমে। সেখানে তাঁদের অনুরোধে তাঁদেরকে অমরকথা শোনাতে আরম্ভ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মলোক দুলতে শুরু করলো। ক্রোধান্বিত শিব এসে নিরস্ত করলেন শুকদেবকে, বল্লেন—যে এই কথা শুনবে সে কোনোদিনই অমর হবে না। 'আবার কি ভেবে তক্ষুণি বল্লেন—'তবে তার শিবলোক প্রাপ্তি ঘটবে।'

সেই থেকে অমরনাথ পরম পবিত্র স্থান।

দূর দূরান্ত থেকে আমার মতো আরও কতো যাত্রী এসেছে এর টানে। নদীর ধার হতে আনা নাম-না-জানা ফুল দিয়ে সবাই অঞ্জলি দিলাম অনন্ত সুন্দরের কাছে।

কতক্ষণ এভাবে বসেছিলাম জানি না। সকলকে চলে যেতে দেখে খেয়াল হোলো ফিরতে হবে। আর তখনই বিশ্বাসের গণ্ডী ছাড়িয়ে প্রশ্ন করি নিজেকে—কি পেলাম?

মন বলে—অনেক পেয়েছি। অক্ষয় হয়ে থাকবে এ সঞ্চয় মণিকোঠায়।

জতুগৃহ

জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী

"আমার কৃষ্ণ কালো তমাল কালো তাই তমাল বড় ভালবাসি" গান হচ্ছে।

গ্রামের জমিদার বাড়ী। শ্রাদ্ধসভা। পূজার দালানের প্রাঙ্গণে ভিড় ধরে না।

এবারে "সখি রে মরিলে ঝুলায়ে রেখো তমালের ডালে"। "মরিব মরিব সখি নিশ্চয় মরিব।" আবার "আমার মরা হোলো না।" "কানুরে কারে দিয়ে যাব"। বিরহে মৃত্যু ইচ্ছা। আবার অভিমান মান। নানা সংকল্প তারই আখরের পর আখর, দোয়ারী দিচ্ছে। এবং গায়িকাও 'আখর' দিচ্ছেন।

গায়িকার পরিধানে সূক্ষ্ম বারাণসী। গায়ে অলঙ্কার ও কীর্ত্তনীয়াদেরই মত—ওদেরি মত মুখে পান। পাশে পানের রেকাবী ও ডিবা। জরদার কৌটো। তন্বঙ্গী। বয়স? রূপ? চেহারা সুন্দর বা মাঝারি—তা আর কারুর মনেও নেই। কারুর চোখেও পড়ছে না। গান আর এমন কণ্ঠস্বরে সভা মুগ্ধ। আর কিছুই চোখে পড়ছে না। শুধু গান আর আখরের পর আখরে তারা মুগ্ধ হয়ে বসে আছে।

এবারে আবার কীর্ত্তনীয়াদের মতই হাত নেড়ে নেড়ে চার দিকে ঘুরে ঘুরে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে—কখনো বুকে হাত রেখে গানের 'আখর' দিচ্ছে।

"ওহে জীবন রবে। সখিরে জীবন রবে। জীবন তো যাবে না সখি। সখিরে যৌবন যাবে। ওহে যৌবন তো রবে না। ওহে জীবন রবে। যৌবন রবে না। রবে না। রবে না।"

শীতকাল। চারিদিকের জাজিমে সম্ভ্রান্ত সমাগত অভ্যাগতরা শাল জামিয়ার গায়ে বসে আছেন। উঠে যাচ্ছেন।

গায়িকার সামনে একটা রূপার থালায় ঝনাৎ ঝনাৎ করে পেলা পড়ছে। কাগজের ও রূপার টাকা জমছে। সভায় ক্ষণে ক্ষণে ভিড় ভাঙছে। আবার জমছে।

কারুর চোখে জল। বিরহ মাথুর মান অভিমানের পালায় সভা টলমল। মানুষের চিত্ত মনও টলমল। উদ্বেল।

"রাধা আর যমুনার কালো জলে গাগরী ভরতে যাবেন না। আর চোখে কাজল পরবেন না। কালো চুল? কালো কেশ আর এলিয়ে রাখবেন না। সখি তোরা শক্ত করে বেঁধে দে। যেন চোখে মুখে না পড়ে। রাধা আর কালো বরণ দেখবেন না।"

প্রাঙ্গণের ও প্রান্তে সারি সারি চারখানা মূল্যবান্ শয্যাসহ পালঙ্ক। তার সামনে একটা রূপার ষোড়শ ঘড়া গাড়ু থালা-বাটি গেলাস ডাবর গামলা পানের ডিবা আদি। আর তিনটি পিতল কাঁসার ষোড়শ দ্রব্যাদি সাজানো। ভোজ্য ফলের থালা পরাত। বস্ত্র শাল দোশালা।

বেলা পড়ে এসেছে, এবারে 'চন্দন ধেনু' করতে হবে। অর্থাৎ বৃদ্ধ কর্ত্তার গৃহিণী সৌভাগ্যবতী সধবা গৃহিণীর শ্রাদ্ধ এটা কাজেই বৃষ উৎসর্গ নয়। চন্দন ধেনু দান। সধবা নারীর শ্রাদ্ধ কৃত্য ব্যবস্থা মত। উৎসর্গীদের ষোড়শ উৎসর্গ সমাপ্ত হয়ে গেছে। সব উৎসর্গকারী জ্যেষ্ঠের পাশে জড় হয়েছেন। সকলেরই শুভ্র বেশ, উত্তরীয় গলায়। এবং কীর্ত্তন গায়িকার আসরেও এবারে বিরহ মাথুর শেষ করে মিলন গাইতে হবে। বিরহ বিয়োগান্ত করে কোনো সভাই শেষ করার নিয়ম নয়। মিলনান্ত করতেই হবে। গায়িকা আরম্ভ করলেন

"চাঁদ চাঁদ চাঁদ
'চাঁদের বামে চাঁদ বদনী দাঁড়াল।
ও রে চাঁদ বদনী দাঁড়ালো।
ওই কদম্ব তরুর মূলে ওই বংশীধারী দাঁড়াল।
ওরে যমুনার কূলে প্যারী চাঁদ বদনী দাঁড়াল।
তার পাশে দাঁড়াল। দাঁড়াল। ওরে চাঁদ বদনী
দাঁড়াল।
কালাচাঁদের পাশে গিয়ে চন্দ্রমুখী দাঁড়াল।"

বিরহের গানে ভাবাভূত শ্রোতারা চোখ মুছছিলেন এতক্ষণ। মিলন সঙ্গীতে সহাস্য হলেন।

সহসা জ্যেষ্ঠ পুত্র কাকে ডাকলেন: "অমরবাবু সভা ভেঙ্গে এলো। 'পেলা' থালাটা আপনি আর খাজাঞ্চি মশাই সব গুনে থাক দিয়ে খাজাঞ্চিখানায় জমা করে রাখিয়ে দিন। কীর্ত্তনীদের সঙ্গে হিসেব করে দিয়ে সব মিটিয়ে দিতে হবে।"

গায়কা কীর্ত্তনী একটু থমকে গেল। ছেদ পড়ল গানে যেন।

সভাও জনবিরল হয়ে এসেছে। তাই?

না, ওই ডাকাডাকিতে? তাই?

না, ওই অমরবাবু নামধেয় কালো মোটা কাঁচের চশমা পরা ঋজু কৃশকায় ভদ্রলোকের সামনে এগিয়ে আসাতে? তাই মিলন গানে যেন একটা বাধা পড়ল। গায়কা থমকে আসরের দিকে না, থালার দিকে না, ওই ভদ্রলোকের দিকে চাইলেন।

অবশ্য মিনিট খানেক মাত্র। তারপর আবার একটু অস্বাভাবিকভাবে কাঁপা গলায় গান ধরলেন

'চাঁদবদনী দাঁড়াল। কালাচাঁদের পাশে এসে দাঁড়াল।'

তারপর সহসা বসে পড়লেন। এ মূল দোয়ারীকে বললেন 'জিজ্ঞাসা করুন বাবুদের। আমি ঘরে যাব কি এবার? বড় মাথাটা ধরেছে। গান আর পারছি না।' কাছেই এক বর্ষীয়ান্ আত্মীয় বৃদ্ধ বসেছিলেন, তিনি তার বসে পড়াটা দেখতে পেয়েছিলেন, কথাটাও শুনলেন। বললেন 'হ্যাঁ মা, মিলন তো গাওয়া হয়েছে। আপনারা যান। বিশ্রাম করুন।' ওদিকে রূপার থালাটির পাশে অনেকগুলি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে ঘিরে দাঁড়িয়ে। টাকার থাক দেওয়া, নোটের গোছা গোনা দেখছে। কাছে একটি ১২।১৩ বছরের শ্যামবর্ণ বালকও দাঁড়িয়ে ছিল।

অমরবাবু আর খাজাঞ্চি মশাই টাকা গুনছেন। একটি ছেলে বললে, 'অত টাকা কে পাবে? মাষ্টার মশাই?' মাষ্টার মশাই বললেন, 'সে কর্ত্তা মশাই জানেন কাকে দেওয়া হবে।'

অমরবাবুই মাষ্টার মশাই তাহলে?

কীর্ত্তনী অমরবাবুর দিকে আবার চাইল। তারপর প্রশ্নকারী ছেলেটার দিকে আর তার পাশে দাঁড়িয়ে শ্যামবর্ণ ছেলেটির দিকে চাইল।

'কার ছেলেটি? বাড়ীর? না অভ্যাগতদের? অথবা কার। খানিকটা যেন অমরবাবুর মত দেখতে। ওঁর ছেলে?'

চক দালানের একদিকে সারি সারি এ-দুটি ঘরে কীর্ত্তনীদের থাকবার বিশ্রামের ঘর দেওয়া হয়েছে।

ওরা সব উঠল বাজনা বাদ্যযন্ত্র নিয়ে।

গায়িকা উঠল পানের ডিবে নিয়ে।

গায়িকার ঘর। তক্তপোষের ওপর ফরাস পাতা ঘর, দু একটা তাকিয়া। ঘরের কোণের কুঁজো থেকে সে একটু জল খেল।

তারপর চোখ বুজে শুয়ে পড়ল। না, মাথা ধরে নি। ক্লান্তিতে আচ্ছন্ন চোখে ঘুমও আসে না। চোখে জলও এলো না। শুধু যেন সব গা মাথা গরম আগুন হয়ে উঠেছে। কত কি মনে আসছে। কিন্তু কিছু ভাবতে ইচ্ছে করছে না। কিন্তু সেই কত কি ভাবনা চারদিক থেকে হুড়োহুড়ি করে জটিল হয়ে কোথায় যেন জমছে মনে মাথায় বুকে। আর কি যেন কষ্ট হচ্ছে। কোন্‌খানে। যদি ঘুমতে পারত।

কিন্তু ঘুম এলো না। স্বপ্ন দেখল না। তাকিয়ে তাকিয়েই মনের মধ্যে কিন্তু স্বপ্নের মত দেখতে লাগল। সেই বাড়ীটা।

ষ্টেশনের ধারে একতলা গ্রামের বাড়ী। চারদিকে গাছ, পিছনে একটা পুকুর। ষ্টেশনের কোয়ার্টার।

বাড়ীতে চারজন মাত্র, মানুষ একজন মা, দুটি স্বামী স্ত্রী। একটা শিশু, বছর চার বয়স।

স্বামী ষ্টেশন মাষ্টার। গ্রামটার নাম? নাম কি হবে মনে করে। চোখ ভরে আগুনের মত জ্বালা। কর কর করছে।

বাড়ীটায় শিশুর হাসি। সংসারের কাজ। স্বামীর ডিউটী। কখনো রাত্রে। কখনো দিনে। সকালে বিকালে। ঠিক নেই।

আর এক উগ্র মেজাজী একপুত্রের জননী। পুত্রের প্রতি অন্ধ মোহময় স্নেহাতুর আর পুত্রবধূর প্রতি তেমনি কঠোর ব্যবহার ছিল। খরা প্রকৃতির শাশুড়ী মিশ্র স্বভাবের এক নারীর রুদ্র রুদ্র ভাষণে দিবারাত্রি বাড়ী মুখর।

গায়িকার এখনকার নাম পারিজাত।

তখন একটা গৃহস্থ নাম ছিল বইকি। হয়ত নিভা প্রভা যাই হোক।

শিশুর খালি কলকথা, মাতার মেজাজ ভীত শান্ত স্বামী, আর শাউড়ী বৌয়ের রূঢ় তর্কবিতর্ক, এই নিয়ে বাড়ীখানা ঘুমোত আর জাগত। প্রতিদিন যেন একই ভাব।

যেদিন দৈবাৎ ষ্টেশন মাষ্টারের বাড়ীতে রাত্রে থাকা হত—সেদিন একটু নীরব। নইলে বাড়ী নিত্য শাশুড়ীর উগ্র বচনোৎসবে মুখর।

পাশে টিকিটবাবু মালবাবুদের কোয়ার্টার। সবাই সব জানে। প্রতিকার নেই এর তাও জানে। কারণ একপুত্রের জননী, তাঁর না হয়েছে স্নেহ মমতায় ভাগ, না হয়েছে অন্য সন্তানদের সঙ্গে অধিকার কর্ত্তব্যের ভাগাভাগি, আর সব জননীদের মত। এই জননী এঁর সবটাই পাওনা গণ্ডার হিসাব। কড়া জমা, খরচ নেই। লোকে বলত আর দু একটা বৌ ঝি থাকলে মাগী এ বৌয়ের দোষগুণ বুঝত। সাক্ষীও থাকত তার ঘরে।

নিরীহ মাতৃভক্ত এবং মাতাভীত স্বামী অভিমানিনী উৎপীড়িতা পত্নীকে জননীর নিষ্ঠুরতা থেকে রক্ষা করতে পারতেন না। জানতেও পারতেন না সব সময় কবে কি ঘটনা ঘটেছে। দিনেও রাত্রের ডিউটীতে ক্লান্ত মুখ পুরুষটিকে দেখলে স্ত্রীও চোখের জল মুছে নীরবে কাজকর্ম করত। জননীও ক্ষণকাল জিহ্বা সংযত করতেন।

মনের তাপ জমতে জমতে বধূরও দিনের পর দিন ধৈর্য্য কমতে লাগল। সেও তিক্ত উগ্র রুক্ষ হয়ে ওঠে।

তারপর সেই রাত্রি। সেদিন স্বামী খেয়ে কর্ত্তব্য স্থলে চলে গেছেন একটু দূরে কোথায়। দুদিন আর ফিরবেন না। শিশু-পুত্র শাশুড়ীর কাছে নিদ্রিত। সে রান্নাঘরে কাজ করছে। টিকিটবাবুর বাড়ীর বৌ এসে জানলা দিয়ে ডাকল। ভাই, আমার দেবর এসেছে, কলকাতা থেকে। খুব ভালো গান গায়। আসবি একবার? আয় না। শাশুড়ীকেও বল্না আসতে।

'মা কি যেতে দেবেন?' ভীত বধূ জিজ্ঞাসা করে। 'যাবেন কি?'

'তবে চুপি চুপে চলে আয় না একটুখানির জন্যে।'

'দরজা খোলা থাকবে যে। থাক ভাই। যাব না।'

'তাহলে ওকে নিয়ে আসি এখানে।'

'কিন্তু সেও তো গান গাইলে মা উঠে পড়বেন। না ভাই, থাক।'

কিন্তু আনন্দের প্রলোভন নিরানন্দ জীবনের মনের কাছে। গান সুরে সুরে রাত্রের নীরবতাকে ছিন্ন ভিন্ন করে এ-বাড়ীর শূন্যতা ভেদ করে ঘর দুয়ারের কানেও এসে পৌঁছতে লাগল। রাতের পর রাত, সন্ধ্যার পর প্রতি সন্ধ্যায়।

শাশুড়ীও জানলেন ছেলেটা ভাল গান গায়। স্বামীও জানলেন গানের কথা এবং সুবিধা পেলে বধূও কান পেতে থাকে গানের আহ্বানে। দু' একদিন গৃহিণীর অনুমতি নিয়ে গেছেও গানের মজলিসে।

তারপর সেই দুর্যোগের রাত এসে পড়ল। শাশুড়ী নিদ্রিত। ছেলে তাঁর কাছে। স্বামী আবার কর্মসূত্রে কোথায় গেছেন ক'দিনের জন্য। সে বেরিয়ে এলো

সখীর বাড়ীর উদ্দেশে বাইরের দরজায় শিকল তুলে। আর বৃষ্টি নেমে এলো আকাশ পাতাল ভাসিয়ে আকালকূল করে। সারারাত্রি।

ভোরের অন্ধকারে বৃষ্টির কোপ নরম হলে সে বাড়ীর দরজায় সখী আর সখীর দেবরের সঙ্গে এসে শিকল নামিয়ে দরজা খুলতেই সভয়ে দেখতে পেল, শিশুটাকে কোলে নিয়ে থমথমে ভয়ঙ্কর রাগে উগ্রমূর্ত্তি শাশুড়ী ঘরের সামনে রকের ওপর দাঁড়িয়ে।

কিছুক্ষণ এপার ওপারের কারুরই মুখে কথা এলো না।

তারপরে শাশুড়ী বললেন, 'কোথায় রাত কাটাতে যাওয়া হয়েছিল। ছিঃ ছিঃ, তুমি ভদ্রঘরের মেয়ে না? সারারাত বাবার করে এলে কোথায়? বাড়ীর দরজা খোলা। আমার ছেলে বাড়ী নেই। জনমানিষ্যি নেই বাড়ীতে। আমাকে বলা নয় কওয়া নয়। এখন এত আস্পর্দ্ধা হয়েছে যে বাইরে রাত কাটাও! ভয়ডর নেই মেয়ে মানুষের শরীরে......। কি ঘেন্না।

বধূ স্তব্ধ। ভয়ে শরীর অসাড় হয়ে গেছে।'

সখী বললে, 'মামীমা, ওকে গান শুনতে ডেকেছিলাম। কদিন সময় পায়নি। কাল রাত্রে গেছে তখনি ফিরবে—আর বৃষ্টি এসে পড়ল। আর বেরুতে পারলে না। সব জলে কোমর জল হয়ে গেছে।'

বধূ এ-বারে শাশুড়ীর পায়ের কাছে মাথা রেখে বললে, 'মা, তুমি ঘুমাচ্ছিলে তাই বলে যেতে পারিনি। আর তখনিই তো চলে আসব ভেবেছিলাম।'

মাথাটা পায়ে রাখতে গেল—

শাশুড়ী পা দিয়ে ঠেলে দিলেন মাথাটা।

বন্ধু বা সখী আর তার দেবর দূরে দাঁড়িয়ে ছিল। স্তম্ভিত ভয়ে তারা আস্তে আস্তে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল। শুনতে পেল, শাশুড়ীর কণ্ঠ 'ও। ওখানে গিয়েই থাক এবারে। রাতের লোক তো পেয়েছ হাতের কাছে। অমর আসুক। একটা হেস্ত নেস্ত করুক।'

অমরবাবু ক'দিন অন্য লোকের কাজে গিয়েছিলেন। ফিরে এলেন। সব শুনলেন। মাকে বিশ্বাস করলেন। স্ত্রীকে ঠিক অবিশ্বাস করলেন না। কিন্তু সন্দিগ্ধ হলেন যেন। রাতে বাড়ীর বাইরে যাওয়া। মাকে না বলে শিকল তুলে দরজায়। গান শুনতে যাওয়া। মেয়ে মানুষের রাত্রে পুরুষ গায়কের বাড়ী গান শুনতে যাওয়া।

আগে ছিল শাশুড়ীর উগ্র মেজাজ ও দুর্বাক্য। এখন এলো মুখখিস্তি ভাষণ। নানা ইঙ্গিত চরিত্রের ওপর। এখন থেকে স্বামীরও সন্দিগ্ধ ভাব ইঙ্গিতময় যখন তখন আসা যাওয়ার সতর্ক আচরণ। ওদিকে শাশুড়ীর সব সময় নির্মম ব্যবহার, নোংরা ইঙ্গিতময় ভাষা বেড়েই চলেছে। আর এদিকে গান আর গায়ক এবং এক মনোময় জগৎ সেই উৎপীড়িত ক্রমে সাহসী অবাধ্য ও বোকা নির্বোধ গৃহস্থ বধূকে এক 'উথাল পাথাল' সংসার সমুদ্রে দ্বন্দ্ব ও সমস্যায় হাবুডুবু খাওয়াতে লাগল।

এবং স্বামী আবার সরকারী নির্দেশে কাজে অন্যত্র গেলেন। আর সে দুপুরে ও সন্ধ্যায় চুপিচুপি সখীর দেবর আর তার গানের মজলিসে যায়। সে প্রায় বেপরোয়া। একদিন সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরে আর দুয়ার খোলা পেল না। এবং গালাগালির লাভাস্রোত বয়ে গেল বাড়ীতে। ষ্টেশনের সব কোয়ার্টারের মেয়ে পুরুষও জড় হল। মিনতি অনুনয় তোষামোদ। কিন্তু দরজা আর খুলল না।

স্বামী অন্যত্র।

সখী আর সখীর দেবর বললেন, 'চলুন আপনাকে আপনার বাপের বাড়ীতে দিয়ে আসি। কাছেই তো তাঁরা থাকেন? আপনার স্বামী এলে তাঁর সঙ্গে ফিরে আসবেন।'

সখীর স্বামীও তাই বললেন, বললেন, আমি অমর বাবুকে পাঠিয়ে দোব দিদি।

* * * *

না। অমরবাবু স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনতে যান নি। তার পিতা ও বিমাতা তাকে যে মুখে গিয়েছিল

পিত্রালয়ে—সেই মুখেই 'ধুলোপায়ে'ই বাড়ীর দরজা থেকে বিদায় দিয়েছিলেন। পিতা বলেছিলেন, 'ভাল কাজ করনি নিভা, সেইখানে তাড়িয়ে দিলেও এখনি ফিরে যাও। ওর চেয়ে আর বড় আশ্রয় জীবনে মেয়েদের নেই।' বিমাতা অতি অসন্তুষ্ট হয়ে বলেছিলেন, 'তোমার মত মেয়েকে ধরে রাখলে আমার ছেলে মেয়েদের পরকাল ইহকাল দুই'ই গোল্লায় যাবে। তুই না সন্তানের মা। ঘর ছেড়ে ছোঁড়াদের নিয়ে পথে পথে ঘুরছিস্। শ্বশুরঘরে ঠাঁই না পেলি তো গঙ্গার জলেও ঠাঁই পেলিনে। গলায় দড়ি। মর। মরে যা না। তুমি ফিরে যাও বাছা। এখানে ঘরে উঠো না।'

বাড়ীতে ফেরা হয়নি। আশ্রয় মেলেনি কোথাও।

তারপর অনেক তারপর। অনেক ইতিহাস।

তার ভালো বা মন্দ সে শুধু নিজেই জানে। আর কেউ জানে না। সখীদেবর সঙ্গী হ'ল, গান আশ্রয় দিল, জীবনের চারিদিকে সীমা ভাঙা বিশাল একটা পৃথিবীর সামনে এসে পড়েছিল। যেখানে সবটাই কখনো ঊষর প্রান্তর অথবা কখনো উত্তাল সাগর আর দুর্গম অরণ্যের পথ। সে পথ পা ক্ষত বিক্ষত করে দিয়েছে। ঢেউ-এ ঢেউ-এ কাদা মাটী মাখিয়েছে। আর শুধু হাঁটা। পথ চলা। কিন্তু সে বাউল নয়। ভক্ত নয়। সন্ন্যাসী পরিব্রাজকও নয়। সে নারী। সে গৃহস্থ বধূ। কিন্তু তার গৃহ আর মেলেনি। তার দুচোখ শুকনো জ্বালায় ভরা। চোখ বুজে শুয়ে থাকে। সহসা কারা ডাকল, 'আমাদের খাবার জায়গা হয়েছে মা।' চমৎকার খাবার জায়গা। বাড়ীর লোকেরা দেখা শোনা করছেন। তারা অতিথি। সৎকার করতে হবে ভালো করে। চমৎকার খাদ্যসামগ্রী, আজো সব নিরামিষ খাদ্য যদিও। শ্রাদ্ধবাড়ী তো।

* * * *

সন্ধ্যার পরও কাদের অনুরোধে একটু আসর বসল। গায়িকার এখনকার নাম পারিজাত কীর্তনী। সে দিন আর সে গহনা বারাণসী পরল না। একটা সাধারণ কালো পাড় শাড়ী পরে মাথায় কাপড় দিয়ে সাধারণ কুলবধূর মত আসরে গিয়ে দাঁড়াল। মাথায় কৃত্রিম ফাঁপানো খোঁপা নয়—সত্যি চুলের খোঁপা জড়ানো এলো করে। গানের টানে অনেক লোক জমেছে। সভা ঝাড় লণ্ঠন এসিটিলিন গ্যাসের আলোয় ঝলমল।

গান ধরলে।

কি গাইবে? চণ্ডীদাস? গোবিন্দদাস?

"এক জ্বালা গুরুজন আর জ্বালা কানু
সখি দুইয়েতে মিলিয়া মোর জর জর তনু।"

—"ঘরে গুরুজন বলে কুবচন, সখি ঘরেতে রহিতে নারি।"

গায়িকার চোখে জল নামল যেন। সে চোখটা মুছল।

আখর দিতে দিতে।

"সখি সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু—"

"সখি - উচল বলিয়া অচলে চড়িনু
পড়িনু অগাধ জলে"

যে 'অগাধ জলের' কথা তার মত আর কে জানে।

অনেক রাত্রে আসর ভাঙল।

শোনা গেল গৃহস্বামী বললেন, "অমরবাবু আর খাজাঞ্চি মশাই, টাকাকড়ি আপনারা সব ঠিক করে ওঁর ঘরে ওঁর জিনিষপত্রের সঙ্গে হিসাব মিটিয়ে গুছিয়ে দেবেন। ওঁরা কাল সাতটার গাড়ীতে কলকাতায় ফিরবেন। গরুর গাড়ী যেন ঠিক করে বলে দেওয়া হয়। অমরবাবু আপনার ওপর সব ভার রইল।' নিদ্রা-বিনিদ্রায় কীর্তনীর রাত কাটল।

বাড়ীর বাইরের প্রাঙ্গণে চারটা গরুর গাড়ী। একটাতে বেশ ভালো করে বিছানা-গদী পাতা।

পারিজাত ঘরে দাঁড়িয়ে। খাজাঞ্চিবাবু এবং মাষ্টার সহাস্যে জিনিষ-পত্র তোলাচ্ছেন গরুর গাড়ীতে।

হাতে মজুরীর ৫০০ টাকা দেওয়া হল। 'পেলা'র টাকাও পেলেন। একখানা শাল। গরদের শাড়ী জরী পাড় একটি। ধনীর বাড়ী। মায়ের শ্রাদ্ধ। চন্দন-ধেনু উৎসর্গ শ্রাদ্ধ।

গরুর গাড়ীর চারিদিকে বালক-বালিকার ভিড় সেই ভোরেই। তারা জিনিষ দেখছে। বাজনা দেখছে। জিনিষ তুলছেও কেউ কেউ।

কে ডাকল, 'সমর—ঐ দেখ্, ওটা কি বাজনা রে? জানিস?'

সমর? সমর? গায়িকা চকিত চোখে চারদিকে চাইল। তবে ও কি তার সেই শিশুপুত্র 'সমর'?

স্বামী নাম রেখেছিলেন সমর।

দেখতে পেল, গতকাল দেখা সেই বালকটি একটি সেতারের গায়ে হাত দিয়ে দেখছে। জিজ্ঞাসা করল কাকে, 'এটাকে কি বলে?'

'সেতার? ওটা সারেঙ্গী? কত নাম ভাই।'

অমরবাবু সব জিনিষ তোলাচ্ছেন নীরবেই। নামও তো মিলে যাচ্ছে। কিন্তু তিনি তো 'মাস্টার' ছিলেন না। স্টেশন-মাস্টার ছিলেন তো।

সে একবার লোকটার দিকে চাইল। ছেলেটির দিকেও চাইল। চার বছরের ছেলে আজ ১৪।১৫ বছরের হয়েছে। চেনা যায় কি? সাদৃশ্য লোকটির সঙ্গে আছে কি?

গরুর গাড়ী ছেড়ে দিল। শুকনো দু'চোখে সে আকাশ, জঙ্গল, গ্রামের বনপথ, শিশুদের ভিড়, ভাঙা বাড়ী-ঘর, আস্ত বড়-ছোট বাড়ী, খোলা-খাপরার ঘর, আম-কাঁঠালের বাগান, তাল-নারিকেল-খেজুর-সুপারির বাগান পার হয়ে গেল।

চোখের সামনে একটা শ্যামবর্ণ ঋজুদেহ বিষণ্ণ মুখ পুরুষ শান্তমুখে সেই সময়ে যে একদিন বলেছিল, 'নিভা, কেন গেলে? অত রাত্রে বাড়ী থেকে কি মেয়েরা কখনো বেরোয়? মাকে বলে যাওনি কেন? গানের জন্যে সারারাত বাড়ীর বাইরে রইলে। খুব ভুল হয়েছে নিভা'.........নিভা কেঁদে ফেলেছিল। অনাদর করেন নি। অনুযোগ করেছিলেন শুধু।

সেই লোকটাই কি উনি। নামও এক, চেহারাও মেলে।

কিন্তু সত্যিই কি সেই লোক? যদি জানতে পারত সে-কথাটা।

কিন্তু জানলেই বা কি?

এবারে চোখে জল এসেছে। মুখে হাসিও এলো জানলেই বা কি হত।

গ্রামের স্টেশন এসে পড়েছে। গাড়ী আসছে দূর থেকে শব্দ আসছে। "কু—উ—উ—উ বাঁশীর শব্দ। ঝিক্ ঝিক্ ঝিক্ চাকার শব্দ। ভস্ ভস্ ভস্ তার বাষ্প নিঃশ্বাসের শব্দ।

মনে পড়ল ছোট্ট ছেলে সমরকে কোলে নিয়ে সে বলত—'ঐ দেখ দেখ রেলগাড়ী আসছে, কু—উ—উ—উ—ঝিক্ ঝিক্ করে।'

আর সে—বলত 'বাবা এবারে আসবে? ঐ গাড়ীটায় করে?' তার ধারণা, প্যাসেঞ্জার গাড়ী, মালগাড়ী, মেল ট্রেণ, যেন সবই তার বাবাকে বহন করে আনবে কু—উ—উ করে। বলত, সব গাড়ী বাবার। সেই ছেলে কি ঐ সমর?

সত্যি কি আজ ও তাদেরই দেখতে পেল? দেখতে পেয়েছে?

এবারে চোখ জলে ভেসে গেল।

সে চোখ আর মুছল না। জল গড়িয়ে পড়ে। মশ-বিভ্রময় পথহীন, গৃহহীন, মরুপ্রান্তরের একটা জতু-গৃহের মত তার সেই গৃহের ওপারে তারা ওই আধচেনা দুটি পিতাপুত্র দাঁড়িয়ে আছে চিরকালের ছবির মত।

কিন্তু 'জতুগৃহ' কোন্‌টা ছিল? যে ঘর ছেড়ে আসতে হয়েছিল গানের টানে, না, এইটা?

ভাবে, উনি কি স্বামী? নাম এক, চেহারাও তো বদল হয়নি বেশী।

উনি কি চিনতে পারলেন? মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন একবারও কি? কোন কথা তো বলেন নি। কথাবার্ত্তা তো খাজাঞ্চি আর বাবুর কে বললেন।

ট্রেণে শুয়ে পড়ে ভাবে, যদি খোকা একবারটি কাছে আসত। সে কি করত।...চোখে জল আসে। ওরা এখানে কোথায় থাকে? শাশুড়ী কি জীবিত? ওর নিজের কি বদলেছে। স্বামী কি আবার বিবাহ করেছেন?

মনে পড়ে স্বামীর মৃদুকণ্ঠে সেই কথা, 'নিভা, কেন সারারাত বাড়ীর বাইরে রইলে?'

মন ভাবে কোথায় পালিয়ে যাই, তীর্থে পুরী, বৃন্দাবন কাশী-বিশ্বনাথের কোলে। সেও কি জতুগৃহ হবে? এবারে মন হাসে। মন থেকে পালাবার জায়গা কোথায় আছে, কোন্ দেশে?

লটারি

সীতা দেবী

"বলি এই ত এলে মিনিট পনেরো আগে, এরই মধ্যে ধিন্ ধিন্ করে নাচতে নাচতে কোথায় চ'লে?"

ললিতা ফিরে দাঁড়িয়ে বলল, "কেন, স্কুল থেকে এসে কোথায় যাই, তা তুমি জান না নাকি?"

মা সুরধুনী হলুদ মাখা হাতখানা ময়লা শাড়ীর আঁচলে মুছতে মুছতে বললেন, "জানি গো জানি। তা আজ না তোমার বাবা বলেছিলেন ছুটি নিতে? তোমায় দেখতে আসবে আজ সন্ধ্যাবেলা সেটা ত শুনেছ?"

ললিতা দাওয়ার থেকে নীচে নেমে দাঁড়িয়ে বলল, "তা বাবা ত বলেছিলেন চারটের মধ্যে পাকা খবর দেবেন। দিয়েছেন কিছু খবর?"

"তা দেননি অবশ্য, কিন্তু চারটে বেজে আর ক' মিনিটই বা হয়েছে? একটু দেখে গেলে কি চণ্ডী অশুদ্ধ হয়ে যাবে? খবর এলে তখন এক হাতে আমি কত দিক্ সামলাব?"

ললিতা একটু ভ্রুকুটি করে বলল, "কিই বা এত করতে হবে? খবর এলে কার্তিকে পাঠিয়ে দিও, তখনি এসে পড়ব। আমাকে আনারসী বেনারসী কিছু পরতে হবে না। চুল এসেই বেঁধেছি, পরিষ্কার শাড়ী-জামাও পরেছি। আর ত কিছু করবার দেখছি না। জলখাবার ত দোকান থেকেই কিনবে, ঘরে একমুঠো ময়দা বা এক চামচ দাল্‌দাও নেই যে লুচি ভাজবে। তাহলে কি কাজের জন্ম আমাকে বসে থাকতে হবে?"

সুরধুনী কর্কশ গলায় বললেন, "এই ছিরি করে বেরবে নাকি তাদের সামনে? তাহলে ত তারা এখনি মাথায় করে নিয়ে যাবে।"

ললিতা বলল, "হীরে জহরৎ ত বাড়ীতে নেই, তা আর কি করা যাবে?"

"কেন, ইন্দু মাসির বড় হার আর নূতন ফারকোর বালা জোড়া ত সে দিতে রাজি হয়েছে।"

ললিতা বলল, "কেন কথা বাড়াও মা। তোমাকে কতদিন বলেছি আমি ধার করা কাপড় গহনা পরে সং সাজবনা। আমি যাচ্ছি এখন, শুধু শুধু কামাই কেন করব? দরকার হলে ডেকে পাঠিও।"

সদর দরজা খুলে সে বেরিয়ে গেল। সুরধুনী বকবক করতে করতে তরকারি কুটতে লাগলেন।

গলির মধ্যে বাড়ী। তিনতলা বাড়ীর একতলায় স্যাঁৎসেঁতে দুটো মাঝারি গোছের ঘর। বারান্দার এক পাশ টিন দিয়ে ঘিরে রান্নাঘর। উঠোনে স্নানের ঘর প্রভৃতি আছে, তবে সেটা দোতলার ভাড়াটেদের সঙ্গে ভাগাভাগি করে ব্যবহার করতে হয়।

গলি দিয়ে খানিকটা হেঁটে গিয়ে প্রায় বড় রাস্তার মুখের কাছে আর একটা বাড়ীতে ললিতা ঢুকে পড়ল। এরও একতলাতেই সে ঢুকল। তাদের বাড়ীর চেয়ে পরিষ্কার, ঘরগুলো কিছু বড় বড়, অত অন্ধকারও নয়, স্যাঁৎসেঁতেও নয়। বোঝাই যায় এরা ললিতাদের চেয়ে কিছু সম্পন্ন। ঢুকেই ললিতা ডাক দিল' "বনু আছিস?"

পাশের ঘর থেকে তারই প্রায় সমবয়সী একটি মোটা সোটা মেয়ে বেরিয়ে এসে বলল, "বোস ভাই একটু। বনুটা বাড়ী নেই, দাদার সঙ্গে জুতো কিনতে গেছে। এখনি এসে পড়বে।"

ললিতা তক্তপোশের উপর বসে পড়ে বলল, "বেছে বেছে ঠিক এই সময়ই বেরিয়ে গেল? মা হয়ত অল্পক্ষণের মধ্যেই ডাকতে পাঠাবে আর না গেলেই পাড়া মাথায় করবে। জানিস্ ত তাকে?"

যমুনা নাম্নী মেয়েটি বলল, "কেন ভাই, আজ এ সময়ে ডাকাডাকি কেন?"

ললিতা বলল, "বাবা কোথায় নাকি এক আশ্চর্য্য

পাত্রের সন্ধান পেয়েছেন, তারা হয়ত আজকে আমাকে দেখতে আসতে পারে।"

যমুনা খেদ সূচক একটা শব্দ করে বলল, "আঃ, কি জ্বালাতন। সত্যি ভাই, তোর জন্যে আমার দুঃখ হয়। এ রকম করে মানুষ কতদিন টিঁকতে পারে? বিজনদাটাও ত কোনো কূল কিনারা পাচ্ছে না। নিজে সংসার করবে কি, বাপের সংসার ঠেলতে ঠেলতেই তার জিব বেরিয়ে গেল। এই সব হতচ্ছাড়া বুড়ো-বুড়ীগুলোকে আমি দু চক্ষে দেখতে পারি না। খেতে দেবার মুরোদ নেই, সব পাঁচ গণ্ডা করে ছেলেমেয়ের জন্ম দিয়ে বসে আছেন।"

ললিতা বলল, "আমাদের দেশে এটাকে একটা অপরাধ কেই বা ভাবে? আগেকার কালে ত একেবারেই ভাবত না, এখন তবু কিছু কিছু লোকের জ্ঞান হয়েছে। বাবা ত দাদার বিয়ে দেবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছিলেন। ছেলেটাকে ভাল বলতে হবে যে সে রাজী হল না।"

যমুনা বলল, "সত্যি বাপু, কি যে কাণ্ড! তোমার দাদার ঐ ত শরীর। এক মাস কাজ করে ত ছ' মাস শুয়ে থাকে। সে কি করে পরিবার প্রতিপালন করত।"

ললিতা বলল, "সে সব কে ভাবছে? তাঁদের ধারণা, জীব দিয়েছেন যিনি, আহার দেবেন তিনি।" আহার যে তিনি হাতে তুলে দেন না, তা ত দেখতেই পাচ্ছেন, তবু ত আক্কেল হয় না। এখন লেগেছেন আমাদের দুই বোনের পিছনে। আমাদের বিয়ে দিতেই হবে। এ দিকে ত ভাঁড়ে মা ভবানী। আমাদের কেলে মূর্ত্তিদ্বয়কে বিনা পয়সায় কোন্ বড় লোকের ছেলে মাথায় করে নিয়ে যাবে? ঝি-গিরি করবার জন্যে যদি কেউ নেয়ও তাহলেও কিছুদিন পরেই আবার এসে বাপ-ভাইয়ের গলগ্রহ হতে হবে কতগুলো আণ্ডা বাচ্চা নিয়ে। গরীবের ঘরে মেয়ে দিলে মা বাবা কোনোদিনই দায়মুক্ত হতে পারে না। মেয়ে, নাতি নাতনী, অর্দ্ধেক বছর তাদের ঘাড়ে চেপেই থাকে।"

যমুনা বলল, "আচ্ছা ভাই, খুব ত কনে দেখানোর জোগাড় করছিস্। ধর্ যদি কেউ পছন্দই করে বসে? তুই পারবি আর কোনো লোকের ঘর করতে?"

ললিতার মুখটা একটু যেন শুকিয়ে এল। বলল, "না ভাই, তা পারব না, ভগবানের উপর ভরসা করে দিন কাটাচ্ছি, কেউ যেন আমায় পছন্দ না করে। তুইই বল্, আমার মত কুচ্ছিত মেয়েকে কেউ বিয়ে করতে চাইবে?"

যমুনা বলল, "কি এমন কুচ্ছিত? রংটাই না হয় ফরশা নয়। তোর মত দেখতে মেয়ের গণ্ডায় গণ্ডায় বিয়ে হয়ে যাচ্ছে। বিজনদার যদি এত সব গলগ্রহ না থাকত তাহলে কি সে তোকে বিয়ে করত না?"

ললিতা একটু ক্ষণ ভেবে বলল, "করতই হয়ত। অভাবের সংসারে আমি মানুষ, আমি চালিয়ে নিতে পারতাম। কিন্তু এতগুলো গলগ্রহ নিয়ে সে যখন ভরাডুবি হতে বসেছে, তখন আমি আরো ভার বাড়াবার কথা বলি কি করে?"

যমুনা বলল, "এঁরা কেন এত লাফাচ্ছেন ভাই তোর বিয়ে দেবার জন্যে? কিছু কিছু আনছিস্ ত তুই? তোর খাওয়াটা ত চলে যাচ্ছে?"

ললিতা বলল, "কি ভাবেন কে জানে? আমরা দুজন চলে গেলে নাকি, ওঁদের বোঝা হালকা হয়ে যাবে। তখন নাকি ওঁরা ইচ্ছা করলে বস্তিতে ঘর নিয়েও থাকতে পারবেন। আমাদের মত দুটো বড় বড় মেয়ে নিয়ে সেটা পারছেন না। ঐ ছাখ, কে আবার দরজা ঠ্যাঙাচ্ছে।"

যমুনা গিয়ে দরজা খুলে দিল। একটি ন' দশ বছরের মেয়ে এবং দুজন যুবক এসে ঘরে ঢুকল।

ললিতা বলল, "বনু ত জুতো নিয়ে মহাখুশী, এ দিকে পড়ার সময়টা যে প্রায় পার হয়ে গেল।"

সঙ্গী যুবক দুজনের একজন বলল, "কি আর করে বল? আমাকেও ত সব সময় পাওয়া যায় না? যখন পায় তখনই ধরতে হয়।"

বণু খুশি চাপবার বৃথা চেষ্টা করতে করতে বলল, "আজ না হয় একটু রাত জেগেই পড়ব।"

ললিতা বলল, "রাত অবধি আমাকে থাকতে দিলে ত? এখনি হয়ত ডাক আসবে।"

অন্য যুবকটি এতক্ষণ চুপ করে ছিল। সে হঠাৎ ললিতার দিকে ফিরে বলল, "এত তাড়া কিসের? অন্য দিনও ত এমন সময় এত ব্যস্ততা দেখি না?"

যমুনা, "আজ যে মহাব্যাপার। কনে দেখতে আসছে যে? কাজেই না গিয়ে উপায়?"

বনু হাততালি দিয়ে উঠল, "কি মজা। ললিতাদির বিয়ে হবে।"

তার দাদা তাড়া দিয়ে বলল, "বাইরে কে দরজা ঠেলছে দেখ দিখি, এখন নাচতে হবে না।"

বনু ছুটে গেল দরজা খুলতে। ললিতা বলল, "কে আর হবে, মা আমাকে ডাকতে পাঠিয়েছেন আর কি।"

ললিতাদের বাড়ীর ঝি কাতী এসে দাঁড়াল। ললিতার দিকে চেয়ে বলল, "মা ডাকতেছে গো। শীগ্‌গির যেতে হবে।"

ললিতা উঠে পড়ে বলল, "বনু, আজ তাহলে চলি পড়ান ত হল না, রবিবারে এটা make up করে দেব। চলি যমুনা।"

যমুনা বলল, "আরে দাঁড়া দাঁড়া। দু'মিনিট। তোকে একটা জিনিষ দেখাবার আছে। একটা টাকা আছে সঙ্গে?"

ললিতা একটু অবাক্ হয়ে বলল, "একটা টাকা? তা আছে আজ, কিন্তু সেটা দিয়ে হবে কি?"

যমুনা একটা টেবিলের পাশে দাঁড়িয়েছিল, তার একটা দেরাজ খুলে বলল, "এই একটা লটারির টিকিট কিনবি। যদিই পেয়ে যাস্। তোর অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে তাহলে।"

হাতব্যাগ খুলে একটা টাকা বার করতে করতে ললিতা বলল, "আমার সমস্যা কি অত সহজ? প্রথম প্রাইজ্‌টা পেলে হয়ত হতে পারে। যা হোক, কয়েকদিন স্বপ্ন ত দেখা যাবে। আচ্ছা চলি, মা হয়ত এতক্ষণে মাথার চুল ছিঁড়ছেন।"

ললিতা চলে যাবার পর যমুনার দাদা আর বিজন এক-একখানা টিকিট কিনে ফেলল। বিজন বলল, "স্বপ্ন দেখাটা আমারও খুব দরকার। এখনও যে না দেখি তা নয়, তবে সেগুলো সবই দুঃস্বপ্ন।"

যমুনার দাদা বলল, "তোমার স্বপ্ন না হয়ে বাস্তব পুরস্কার লাভই একান্ত দরকার, তাহলে তোমার এবং তোমার তরুণী বান্ধবীর একসঙ্গেই সব সমস্যার সমাধান হয়।"

"অত 'অতি বর্ষা সম' ভাগ্য আমার নামবে না", বলে বিজন চলে গেল।

ললিতা বাড়ীতে ঢুকে দেখল তার মা রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে উদ্‌গ্রীব হয়ে পথের দিকে চেয়ে আছেন। তাকে দেখে বললেন, "তখনই বললাম যাস্‌নে, ওরা ত এসে পড়ল বলে।"

ললিতা বলল, "ওরা ত এখনও আসে নি, আমি এসেই গেছি। কি করতে হবে বল। বাবার ঘর পরিষ্কার আছে? ঝাঁট দিয়ে দেব?"

তার মা বললেন, "থাক, তোমার আর এখন ভূত সাজতে হবে না। কাতী আর সুজাতা মিলে ঘর ঠিক করে নিয়েছে। তুমি মুখ-হাত ধুয়ে একখানা ভাল কাপড় পর দেখি।"

ললিতা বলল, "বেশ ত পরিষ্কার শাড়ী পরে আছি, আবার বদ্‌লে কি হবে?"

তার মা বললেন, "অত কথা বলতে হবে না। আমার বিয়ের বালুচরীখানা পর গিয়ে। গহনা কিছুতেই পারবি না?"

ছোট মেয়ে সুজাতা বলল, "আচ্ছা মা, তুমি যেন কি। নিজে বয়সকালে একটু ফরশা ছিলে বলে বাপ-মায়ে যা খুশি কিনে দিয়েছে, পরেছ। তাই বলে আমাদের দুই কালো পেত্নীকে ঐ সব নীল, কালো শাড়ী পরতে হবে নাকি? যা দেখাবে।"

ললিতা বলল, "তার উপর ধার করা মোটা মোটা সোনার গহনা পরে তাদের কাছে ভান করতে হবে যে আমরা বেশ বড়লোক। তাহলে এমনিতে যদি বাবার কাছে তিন হাজার পণ চাইত ত এখন ছ' হাজার চাইবে।"

সুজাতা বলল, "যা বলেছ।"

তাদের মা বললেন, "ঐ তোমাদের বাবা এসে পড়লেন বুঝি তাদের নিয়ে। যাই, আমি জলখাবার গুছিয়ে রাখি। তোমাদের যা-খুশি কর। বাপ মায়ের চেয়ে তোমরাই ত সব বেশী বোঝ।"

স্বল্প আয়োজন, তবু নিয়ম মত সবই করা হতে লাগল। কাতী আর সুজাতা জলখাবার নিয়ে গেল। সুজাতা ফিরে এসে বলল, "সব ক'টাই মোটা মোটা বুড়ো ওদের মধ্যে নিশ্চয়ই কেউ বর নয়? বাবা যদি ঐ রকম বোকামী করেন, তাহলে নিশ্চয় তুই বেঁকে বসবি দিদি।"

ললিতা বলল, "বুড়ো না হয়ে ছুঁড়ো হলেও বেঁকেই বসব। তুই ত জানিসই, বাবার যোগাড় করা কোনো বরকে এখন আমি বিয়ে করতে পারি না।"

সুজাতা বলল, "নিজে যেটিকে যোগাড় করেছ সেটি ত বিয়ে করার নামও করে না।"

ললিতা বলল, "কি করে করবে? তার বাবা মা ও তার ঘাড়ে আরো দুটি ভাই, দুটি বোন সহ চেপে বসে আছেন। তাদের খেতে পরতে দিয়ে আর তার বাকি থাকে কি, যে, সে নিজে বিয়ে করবে?"

কাতী এমন সময় এসে তাড়া দিল, "চল গো বড়দি-মণি, পান নিয়ে চল।"

সুজাতা বলল, "যখন ঠিকই করেছিস্ যে বিয়ে করবি না, তখন ঢং করে এ-সব কনে দেখানোর কি দরকার? অন্ততঃ পাঁচটা টাকাও ত খরচ হয়, এই লোকগুলোকে জলখাবার খাওয়াতে? মাঝ থেকে আমাদের বাজার খরচে টান পড়ে আর আমরা শুধু শাক ভাজা ভাত খেয়ে মরি।"

ললিতা একটা কাঁসার ডিবে ভর্ত্তি করে পান নিয়ে উঠে দাঁড়াল, বলল, "সব জেনেশুনেও তারা যখন ঠেলে দিচ্ছেন, তখন আমার কি দোষ? সারাক্ষণ কে তাঁদের সঙ্গে মারামারি করবে? ভরসা করছি যে কেউ বিনা পয়সায় বাবাকে বাধিত করতে আসবেন না।"

সে পান নিয়ে সামনের ঘরে ঢুকে গেল। কাতী চলল তার সঙ্গে। বাবার ঘর খানিকটা পরিষ্কার করা হয়েছে। তক্তপোশটা রয়েছে, তবে তার উপরের ময়লা বিছানাটা সরিয়ে ফেলে একটা শতরঞ্চি পেতে দেওয়া হয়েছে। প্রতিবেশীদের ঘর থেকে দুটো হাতা-বিহীন ও একটা হাতাওয়ালা চেয়ার যোগাড় করা হয়েছে, তারা ঘরের মাঝখানটার শোভাবর্দ্ধন করছে। এখন সেগুলির উপর তিনজন প্রৌঢ় ব্যক্তি বসে আছেন। ললিতার বাবা বসে আছেন তক্তপোশের এক কোণে। ললিতাকে দেখে বললেন, "এঁদের নমস্কার কর মা, আর পান ঐ টেবিলের উপর রাখ।"

ললিতা নির্দ্দেশমত পানের ডিবেটা খুলে টেবিলের উপর রেখে ভদ্রলোকদের নত হয়ে নমস্কার করল, তারপর বাবার পাশে চৌকীর উপর বসে পড়ল।

একজন ভদ্রলোক তার দিকে চেয়ে বললেন, "নাম ধাম ত শুনেই এসেছি। তা মায়ের কতদূর পড়াশুনো করা হয়েছে?"

ললিতা বলল, "আই. এ. পাস করেছি। বি. এ. প্রাইভেটে পড়েছি, তবে পরীক্ষা দেওয়া হয় নি।"

ভদ্রলোক বললেন, "ও।" তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বললেন, "কোথাও চাকরি বাকরি কর নাকি?"

ললিতা বলল, "পাড়ায় যে মেয়েদের স্কুল আছে তাতে কাজ করি। গোটা দুই ট্যুশনিও করি।"

খানিকক্ষণ সবাই চুপচাপ। অতঃপর প্রশ্নকর্ত্তা ভদ্রলোক অন্যদের দিকে চেয়ে বললেন, "এইবার তোমরা দু-একটা কথা বল হে।"

একজন এতক্ষণে মুখ খুলে বললেন, "মেয়ের যা বয়স বলেছিলেন, তার চেয়ে বেশী মনে হচ্ছে।"

ললিতার বাবা সংক্ষেপে বললেন, "আজ্ঞে না, ঠিক বয়সই বলেছি।"

তৃতীয় ভদ্রলোক আকর্ণবিস্তৃত হাসি হেসে বললেন, "তা তোমার পাত্রটিই বা এমন কি নওজোয়ান? তোমার চেয়ে বড় জোর বছর দুইয়ের ছোট হবেন।"

ললিতা ভাবল, বাবার যেমন খেয়ে কর্ম্মে কাজ

নেই তাই এই সব প্রাগ্‌ঐতিহাসিক নমুনা ধরে আনছেন।

যিনি বয়স সম্বন্ধে মন্তব্য করছিলেন, তিনি বললেন, "তা বললে কি হয় বাপু? বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা এ ত লোকে চায়ই।"

ললিতার বাবা এ হেন রসাল আলোচনায় বাধা দিয়ে বললেন, "মেয়েকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করার আছে আপনাদের?"

এক ভদ্রলোক বললেন, "বিশেষ আর কি? আসল কথাবার্ত্তা ত আপনার সঙ্গে। তা উনি ঘরকন্নার সব কাজ, রান্নাবান্না সব জানেন ত? মধ্যবিত্ত ঘরে ঠাকুর চাকর ত অনেক থাকে না?"

ললিতার বাবা বললেন, "সে সবই জানে। আমাদের বাড়ীতেই বা ক'টা ঠাকুর চাকর আছে?

ভদ্রলোক বললেন, "আচ্ছা মা, তুমি এখন যেতে পার। আমরা তোমার বাবার সঙ্গে একটু আলাপ আলোচনা করি।"

ললিতা হাঁফ ছেড়ে উঠে চলে এল। ভিতরে এসে দেখল সুজাতা ডাল্‌মুঠের ঠোঙাটা ঝেড়ে ঝেড়ে দু-চারটে ছোলা কোনোমতে বার করছে। দিদিকে দেখে বলল, "সব ঝেড়ে ঝুড়ে ঐ পেট-মোটা বুড়োদের দিয়ে দিয়েছে। কি বললে রে তোকে দেখে?"

দিদি বলল, "খুব বেশী কিছু বলেনি। তবে আমাকে ওদের খুব বুড়ী মনে হয়েছে।"

সুজাতা বলল, "আহা, তাও যদি দোজবরের পাত্র না হত!"

ললিতার মা পিছন থেকে বললেন, "ওমা, কে আবার তোমার কানে জপে গেল যে বর দোজবরে? একটু বয়স বেশী হয়েছে তাতে কি? ছোটবেলায় ম্যালেরিয়া ধরেছিল বলে শরীর খারাপ ছিল, বিয়ে টিয়ে করতে পারেনি, ভাল কাজও পায় নি। এখন শরীর সেরেছে, ভাল কাজকর্ম্ম করে, সংসার করার মন হয়েছে। বলছে ত যে পঁয়তাল্লিশ ছেচল্লিশের বেশী বয়স নয়, তা সেটা আর পুরুষ মানুষের পক্ষে কি এমন বেশী বয়স? মেয়েরাই না কুড়ি পেরুলেই বুড়ী?"

সুজাতা বলল, "তা হলে ত আমরা দুজনেই বুড়ী। দিদি, বরের দাদাটির কত বয়স হবে রে? শুনলাম সেও দেখতে এসেছে।"

ললিতা বলল, "তা বছর ষাট হবে বোধ হয়। সামনের ক'টা দাঁত ত ভাঙা দেখলাম। বাকিগুলো নিজের কি বাঁধান জানি না।"

সুজাতার মা রাগ করে ঘর থেকে চলেই গেলেন। যাবার সময় বললেন, "আজকালকার মেয়েদের কথা, মুখের কোনো আগল নেই। আমাদের বাপ্‌ বাপ-মায়ে যা ধরে দিয়েছে তাই করেছি, মুখে একটু টুঁ শব্দ করেছি কেউ বলতে পারে?"

মেয়েরা এর আর কোনো উত্তর দিল না, যে যা করছিল, আপন মনে করে যেতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে আগন্তুকদের চলে যাবার শব্দ শোনা গেল। ললিতার বাবা নিজের মনে বসে বসে তামাক খেতে লাগলেন। স্ত্রীকে ডাকলেন না, কোনো কথাও বললেন না। ললিতার মা রান্নাঘরে কি একটা কাজ সারছিলেন। সেটা শেষ হতে স্বামীর ঘরে ঢুকে বললেন, "কি গো, কথা নেই যে মুখে? কি বলে গেল ওরা? মেয়ে পছন্দ হয়নি ওদের?"

স্বামী তামাক খাওয়া থামিয়ে বললেন, "দেখবামাত্র পছন্দ হয়ে যাবে এমন মেয়ে ত তোমার নয়? কথাবার্ত্তা ঢের কইতে হবে। মেয়ে দেখে বলছেন বয়স বেশী, রংও বড় বেশী ময়লা। অর্থাৎ বেশ টাকা না খসালে বিয়ে দিতে রাজী নয়। পাত্রের তাঁদের বয়স বেশী বটে, তবে স্বাস্থ্য ভাল, ভাল চাকরি করছে। দেশে বাড়ীঘর আছে।"

স্ত্রী জিজ্ঞাসা করলেন, "তা, কি তাঁরা চান শুনি?"

"চান অনেক কিছুই। বরের বয়স বেশী, তাই নগদ টাকাটা আর তাঁরা দাবী করছেন না। কিন্তু মেয়েকে গা সাজিয়ে গহনা দিতে হবে, বরাভরণ দিতে হবে, আসবাবপত্র, বাসন কোসন সব দিতে হবে। এ ছাড়া তত্ত্ব আদি ভাল মতে করা চাই, নইলে আত্মীয়-স্বজন ছি ছি করবে, ওঁরা হলেন গিয়ে বনিয়াদি ঘর।"

ললিতার মা গালে হাত দিয়ে বললেন, "এ ত বাপু চার-পাঁচ হাজার টাকার কথা। সম্বলের মধ্যে ত আমার দুটো বালা আর এক ছড়া হার। তাও আর একটা মেয়ে প্রায় মাথায় মাথায় হয়ে উঠেছে। সব কিছু এঁর পিছনে ঢেলে দিলে অন্যটার হবে কি?"

স্বামী বললেন, "সে ত পরের কথা, এমনিতেই এক মেয়ের বিয়েতে সর্বস্বান্ত হলে অন্যগুলোর দুবেলা দুমুঠো খাওয়াও বন্ধ হবে। ঘরে দু-এক টুকরো সোনা-দানা আছে জেনে তবু বাড়ীওলা, মুদী, গয়লা একটু পয়সা ফেলে রাখে, তখন তাও বন্ধ হবে।"

গৃহিণী বললেন, "মেয়েও ত কিছু কিছু আনছে, শুধু ত বসে থাচ্ছে না?"

কর্ত্তা বললেন, "যা আনে তা নিজের উপরেই খরচ হয়ে যায়। আজকালকার দিনে একটা মেয়েছেলের খাওয়া-দাওয়া, শাড়ী জামা জুতোর খরচ কি কম? তায় আবার মেয়ে সারাক্ষণ বাইরে বেরুচ্ছেন। এমন নয় যে তোমার মত ছেঁড়া ময়লা শাড়ী পরে ঘরের কোণে বসে আছেন। ওরা যখন সব ছোট ছোট তখন ত ধোপা আমি বাড়ীতে ঢুকতে দিই নি।"

ললিতা সুজাতাকে একটা টিপুনি দিয়ে বলল, শুনছিস্ রে। এরপর পেটে খেতে হলে আর ধোপার বাড়ী কাপড় দেওয়া চলবে না।"

সুজাতা বলল, "বাবার মতে ত মা হচ্ছেন আদর্শ নারী। কখনও শাড়ী ধোপার বাড়ী দেন না, ঘরেও সাবান কাচা করেন না। যদিও কাছ দিয়ে হাঁটলেই দারুণ গন্ধ লাগে।"

ললিতা বলল, "মা কি করবেন বল? স্বামীর যদি ঐ রকম পছন্দ হয় ত তাঁকে ঐ রকম করেই থাকতে হবে। নিজের ত কোনো পয়সা নেই? আর্য্যনারী হতে হলে অনেক কিছুই সইতে হয়।"

পরদিনই রবিবার। অন্যান্য সপ্তাহে এই দিনটায় ললিতার ছুটি থাকে। সে সেদিন ঘর-দোর পরিষ্কার করে, জামা কাপড় ইস্ত্রি করার থাকলে সেগুলিও করে। ললিতার বাবা যতই এ বিষয়ে বক্তৃতা করুন, দুই মেয়ে গোটা দুই-তিন শাড়ী ছাড়া আর বেশী কিছু ধোপার বাড়ী দেয় না, বাকী সব বাড়ীতেই কাচে ও ইস্ত্রি করে। গৃহিণীর ওসবের বালাই নেই, তিনি শাড়ী জামা ব্যবহারই করেন খুব কম, এবং সেগুলি কোনোদিনই কাচতে দেন না। কর্ত্তা এবং বড় ছেলে কাজ করতে বেরয়, ছোট ছেলেমেয়ে দুটো স্কুলে পড়ে, কাজেই ধোপা একটা পুষতেই হয়।

আজ সকালে উঠে ললিতা বলল, "আজ ত আমার ছুটি হয়েও ছুটি নেই। কাপড় কাচা আমার আজ হবে না। কাল বন্নুর পড়ায় ফাঁকি পড়েছে, আজ সেটা পুষিয়ে দিতে হবে। অন্য কাজও একটু আছে।"

সুজাতা বলল, "তা যা। আমি পারি ত তোর গোটা দুই-তিন কাপড় কেচে দেব।"

ললিতা সকালেই স্নানটা সেরেই তবে বেরোল। এ বাড়ীতে স্নানের ঘরে যখন খুশিই যাওয়া যায় না। দুই বাড়ীর যুগ্ম অধিকার এটির উপর, পরস্পরের সুবিধা বুঝে চলতে হয়। এখন পথ খোলা দেখে গিয়ে স্নানটা সেরে এল। মাকে বলে গেল, "বন্নুকে পড়াতে যাচ্ছি।"

বন্নু অবশ্য তাকে দেখে বিশেষ কিছু খুশী হল না। কাল যে পড়া হয়নি সেটা ত সবটাই তার দোষ নয়? সে ত দেরি করে পড়তে রাজীই ছিল, ললিতাদিই ত চলে গেলেন। যা হোক, তিনি এসেছেন যখন তখন পড়িয়েই ছাড়বেন, এ ভেবে সে মুখ বুজেই বই খাতা নিয়ে এসে পড়তে বসল।

বন্নুকে পড়ান শেষ করে ললিতা উঠে পড়তেই যমুনা বলল, "এখনি চললি কোথায় রে? বস্ না, আজ ত আর স্কুল নেই?"

ললিতা বলল, "একবার স্কুলের বড়দিদিমণির কাছেই যাব ভাবছিলাম। আয় আর একটু না বাড়ালে আর চলছে না। বাবার মতে আমি যা আনি, তার থেকে খরচ নাকি আমার জন্যে বেশী হয়ে যায়।"

যমুনা ঠোঁট উল্টে বলল, "হ্যাঁ বেশী হয়, না হাতী! কি এমন সোনা দানা খেয়ে নিস্?"

ললিতা বলল, "খাই না এমন বেশী কিছু, তবে

আমাদের শাড়ী জামাতে নাকি ভীষণ খরচ, তা ছাড়া ক্রমাগত কাপড় ধোপার বাড়ী দিই।"

যমুনা বলল, "মহা জ্বালা। আর্য্যনারীদের দেখে শিখিস না কেন? বেশ গামছা পরে বেড়াবি, ঘরে জল-কাচা করে নিলেই চলবে। ঐ আবার কে এল? ওমা, এ যে দেখি বিজনদা। এত সকালে যে?"

বিজন বলল, "কাজে বেরিয়েছি। শিবেশ বাড়ী নেই বুঝি? তার সঙ্গে ঐ কোচিং ক্লাসটা নিয়ে একটু কথা ছিল। ললিতা যে আজ এ বাড়ীতে এত সকালে?"

ললিতা বলল, "বন্ধুর পড়া make up করে দিতে এসেছিলাম। তুমি কোচিং ক্লাস করছ বুঝি? আমাকে তাতে একটা কাজ দাও না? আমি ত খরচে কুলিয়ে উঠতে পারি না।"

বিজন বলল, "তুমি ধেড়ে ধেড়ে ছেলেকে পড়াতে পারবে? তোমার বাবা-মা, মার্ মার্ করে উঠবেন না?"

ললিতা বলল, "করতে পারেন, বিচিত্র নয়। তুমি ধেড়ে ধেড়ে মেয়ে নাও না গোটা কয়েক তোমার ক্লাসে, তা হলেই ত হয়।"

বিজন বলল, "আমাদের মত আইবুড়ো কার্ত্তিক মাষ্টারের কাছে লোকে মেয়ে পাঠাবে কি? বউ টউ থাকলে হত।"

যমুনা বলল, "দেখ ত, বউ থাকলে কত কাজে লাগে। জুটিয়ে নাও-না তাড়াতাড়ি।"

বিজন বলল, "কি করে জোটাই বল ত? কোন বউ শুধু জল আর হাওয়া খেয়ে থাকতে রাজী হবে?"

যমুনা বলল, "বউ যদি নিজের খাবার দাবার জোগাড় করে আনে?"

বিজন বলল, "তাতেই কি আর হবে? বউকে একটা বাড়ী মাথায় করে আনতে হবে, নইলে সে থাকবে কোথায়?"

ললিতা বলল, "থাক বাপু। তোমার বউ সহজে আসবার নয়। আমি ততক্ষণ স্কুলের কাজটার খোঁজ করি গে। সেটা হলেও হতে পারে।"

বিজন বলল, "আপাততঃ সেটাই ভাল বোধহয়। ধ্রুবকে পরিত্যাগ করে অনিশ্চিতের পিছনে ছোটা যুক্তি-যুক্ত নয়। আমার যতই সাধ থাক, আইবুড়োত্ব ঘুচোবার সাধ্য এখনই হবে না।"

ললিতা বলল, "চলি তবে। রোদ বড় বেড়ে যাচ্ছে।"

বন্ধু এতক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে সকলের কথা শুনছিল। সে হঠাৎ বলল, "যদি বিজনদা লটারির প্রাইজ পায়, তাহলেই ত হয়ে যায়।"

যমুনা বলল, "যে কেউ পেলেই অনেকের লাভ। কিন্তু সেটা ত ইচ্ছে করলেই হবে না?"

ললিতা এরপর বেরিয়েই পড়ল। অন্যরাও যে যার কাজে চলে গেল।

স্কুলেও ললিতার খুব একটা সুবিধা হল না। কাজ একটা খালি হতে যাচ্ছিল বটে, মাইনেও ললিতা এখন যা পায়, তার থেকে কিছুটা বেশী। কিন্তু উমেদার ত সে একলা নয়, আরো দুতিন জন আছেন। বড়দিদিমণি বললেন, "ভাই তোমরা যে ক'জন আছ তার মধ্যে তোমাকে পেলেই আমার সব চেয়ে ভাল লাগত, কিন্তু আমার সব দিক্ দেখতে হবে ত? সুরবালা যদিও ম্যাট্রিক পাশ, কিন্তু তার কাজের অভিজ্ঞতা ছ-সাত বৎসরের বেশী। সে দাবী করতে পারে। যশোধরা প্রায় তোমার সঙ্গে সঙ্গেই ঢুকেছে, কিন্তু তার গায়ে বি. এ. পাসের ছাপটা ত আছে? যদিও ইংরিজি কিছুই জানে না সে, পড়াতেও পারে না। তবে এক হয়, এই বৎসর যদি বি. এ. টা পরীক্ষা দিয়ে পাস করে নাও। এখনও ত পূজো অবধি কাজ খালি হচ্ছে না? কয়েক মাস সময় আছে।"

ললিতা বলল, "এত কাজের মধ্যে পড়াশুনো করার সময় পাব কোথায়? মাস-দুই একটু দেখে শুনে না নিতে পারলে, পরীক্ষা দেব কি করে? সব ত প্রায় ভুলে বসে আছি।"

বড়দিদিমণি বললেন, "এক মাসের ছুটি আমি তোমার মঞ্জুর করে দিতে পারি। বিনা বেতনের হবে অবশ্য।"

ললিতা বলল, "তাহলে ত আবার ঘরে হাঁড়ি চড়বে না, সেটাও ত দেখতে হবে?"

"তা ও বটেই। কিন্তু আমাদের এই সব বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানের ব্যাপার জান ত? আমাদের ত সারাক্ষণই পান্ত আসতে লবণ ফুরায় লবণ আনতে পান্ত। ইচ্ছা থাকলেও কোনো কর্ম্মীকে আমরা দশটা টাকা দিয়ে সাহায্য করতে পারি না।"

ললিতা বলল, "তা কি আর জানি না? দেখি, কোথাও কিছু ধারধোর পাই কি না। এক মাস আদা জল খেয়ে লাগলে হয়ত পরীক্ষা দিয়েও ফেলতে পারি।" সে বাড়ীর পথ ধরল।

চেনাশোনা বন্ধু-বান্ধব এমন কে আছে যে তাকে একশ'টা টাকা ধার দিতে পারে? সবই ত তার মত দিন আনে দিন খায়।

বাড়ী ফিরতেই সুজাতা বলল, "কি রে, এতক্ষণ ধরে কি পড়ালি?"

ললিতা বলল "শুধু কি পড়িয়েছি? বিজনদার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। আবার স্কুলেও গেলাম বড় দিদিমণির সঙ্গে দেখা করতে।"

"তবে ত ের কাজ করে এলে। এখন খেয়ে নাও তাড়াতাড়ি। মা রান্নাঘরে বসে বক্ বক্ করছে, তার চান করার দেরি হয়ে যাচ্ছে।"

ললিতা বসে পড়ে বলল, "যাচ্ছি বাপু, যাচ্ছি। বারো মাস তিরিশদিন ঐ এক খাবারই ত? খেতে উৎসাহও হয় না। নিতান্ত পেটের জ্বালায় খাই।"

সুজাতা বলল, "বিয়ে করে নিজের সংসারে গিয়ে পোলাও কালিয়া খাস্ এখন।"

ললিতা মায়ের ডাকে উঠে পড়ে বলল, "সে রকম বিয়ে ত এ জন্মে হবে না। তবু হত যদি দুখের অন্ন সুখের করে খেতে পারতাম।'

দিন এরপর কেটেই চলল একই ভাবে। ললিতা ক্রমাগত চেষ্টা চালিয়ে যেতে লাগল টাকা যোগাড়ের, কিন্তু কোথাও কোনো সুবিধা করতে পারল না।

সন্ধ্যাবেলা একদিন ঘরের বিছানাগুলো ঠিক করে পেতে রাখছে, এমন সময় বন্নু এসে হাজির। বলল, "দিদি তোমায় ডাকছে।"

ললিতা একটু অবাক্ হয়ে বলল, "এই সন্ধ্যে বেলা কেন?"

বন্নু বলল, "কি জানি। তুমি চল না। খুব দরকার।"

ললিতা অগত্যা চলল। সুজাতাকে বলে গেল, "মাকে বলিস্, এখনিই ঘুরে আসছি।"

বন্নুদের বাড়ী গিয়ে দেখে, যমুনার সাড়াশব্দ নেই। তাদের ঘরে একলা বিজন বসে আছে। ললিতাকে দেখে বলল, "খুব অবাক্ হচ্ছ, না? আমিই ডেকে পাঠিয়েছি, যমুনা নয়। একটা কথা আছে। তোমাদের বাড়ীতে ত যাবার জো নেই।"

ললিতা বসে পড়ে বলল, "কি ব্যাপার?"

বিজন বলল, "দেখ, লটারির প্রাইজ আমি একটা পেয়েছি। টাকা মন্দ হবে না। কিন্তু বেশী খুশী হয়ো না। আমি ঠিক করেছি এর সবটা আমার বাবাকে দিয়ে আমি সংসারের দায় থেকে মুক্ত হয়ে যাব। তিনি রাজী, ঐ টাকায় তাঁর দেশের বাড়ীঘর বিষয়-সম্পত্তি সব ছাড়িয়ে নিয়ে তিনি স্বচ্ছন্দে থাকবেন। এর পর আমার জীবন আমার। তুমি কি রাজী হবে এখন এই নিঃস্ব মানুষটার পাশে দাঁড়াতে? দুজনে খেটে খাব, এখনও ত তাই করছিলাম।"

ললিতা ভাবতে বেশী সময় নিল না। বলল, "খুব পারব। বোনকে এই সেদিন বলছিলাম যে বিয়ে হয়ে গেলে দুখের অন্ন সুখের করে খেতাম। গলগ্রহ হতে চাই না, গলগ্রহ কাউকে করতেও চাই না। এতে মানুষ আর মানুষ থাকে না। ভালই করেছ সব টাকা তোমার বাবাকে দিয়ে দিয়ে। আমি টাকা পেলে আমিও তাই করতাম। দুই পক্ষই মাথা তুলে দাঁড়াতে পারত।"

প্রবন্ধ ঃ পঞ্চভূত ঃ রবীন্দ্রনাথ

প্রিয়তোষ ভট্টাচার্য্য

(ক) সাহিত্যের যতগুলি বিভাগ আছে তন্মধ্যে প্রবন্ধের বিভাগটি একটু স্বতন্ত্র। কাব্য, নাটক, গল্প বা উপন্যাসের সৃষ্টিকর্ম্মের ভিতর লেখকের খুশী মতো আত্মপ্রসারণের যে পরিচয় আছে, যুক্তি-তর্ক-তত্ত্ব ও তথ্যের নিরেট বন্ধনে বাঁধা প্রবন্ধের বস্তু-প্রাধান্যের ভিতর সেই পরিসর নেহাৎ স্বল্প। জেম্‌স্ জীন্‌সের বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ অথবা ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের "পারিবারিক প্রবন্ধ" যতটা তত্ত্ব ও তথ্যের সন্ধান দেয়, যে পরিমাণ শিক্ষা ও উপদেশ প্রদান করে ততটা ও সেই পরিমান রসের সঞ্চার করে না। আবার, বঙ্কিমের "কমলাকান্তের দপ্তর" বা রবীন্দ্রনাথের "বিচিত্র প্রবন্ধ" যে পরিমাণ রস ও ব্যক্তিত্ব পরিবেশন করে সে পরিমাণ বস্তু বা তত্ত্ব প্রদান করে না। একটির ভার বেশী ধার কম, অন্যটির ধার বেশী ভার কম।

প্রথম শ্রেণীর প্রবন্ধ হইল প্রকৃত প্রস্তাবে 'প্রবন্ধ'— অর্থাৎ প্রকৃষ্ট রূপে বন্ধন। তত্ত্বের সহিত তথ্যের; সংহতির সহিত সংক্ষেপনের। ইংরেজীতে ইহাকেই বলে; Treatise বা essays।

আর, দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রবন্ধ হইল একরূপ "রচনা শিল্প," যাহার ভিতর 'বলা' অপেক্ষাও বেশী উজ্জ্বল 'কেমন-করিয়া-বলা"; Logic সেখানে 'লীলা'। অর্থাৎ, বক্তব্য ব্যক্তির অনুভূতি ও ব্যাখ্যানে শিল্প-সমুজ্জ্বল। এই শ্রেণীর রচনা 'ব্যক্তিগত প্রবন্ধ' রূপে অভিহিত হইতে পারে। ইংরেজীতে যাহাকে বলে intimate essays।

এইরূপ ব্যক্তিগত প্রবন্ধে মন্ময়তা (subjectivity) একটা বিশেষ গুণ; হৃদয়ের সঞ্চরণশীলতা "কান্তা-সম্মিত" হইলে তন্ময়তা (objectivity) গৌণ হইলেও ক্ষতি নাই। বিষয় ভেদে কখনও উহা ডমরুর মত গুরু গুরু যেমন, 'ধর্ম'; কখনও সঙ্গীতের মত হৃদয় বিমুগ্ধকর, যেমন, "বিচিত্র প্রবন্ধ"; আবার কখনও কখনও স্রোতস্বিনীর মত হাস্যমুখর ও লাস্যময়' যেমন, 'পঞ্চভূত'।

এই শিল্প-সুন্দর সৃষ্টিধর্মী রচনা-কর্মের দিক দিয়াই রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধগুলির শ্রেণীবিভাগ ও সাহিত্য বিচার করিতে হইবে। নচেৎ, ইংরেজী প্রথায় উপরি উক্ত Treatise-জাতীয় প্রবন্ধ রবীন্দ্রনাথের বিপুলাকার প্রবন্ধ সাহিত্যের মধ্যে খুঁজিলে একটিও পাওয়া যাইবে না। এমন কি, 'বিশ্ব-পরিচয়' নামক তাঁহার বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ পুস্তিকাটিও কেবল বস্তু-ভারাক্রান্ত তথ্য-পঞ্জীর নিরেট আধার না হইয়া একরূপ সরস ও সুন্দর সাহিত্য হইয়া উঠিয়াছে।

'ভুবনমোহিনী' প্রতিভা হইতে 'সভ্যতার সংকট' পর্যন্ত— অর্থাৎ, পনের বৎসর বয়স হইতে আরম্ভ করিয়া মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব ১৩৪৮ সালের বৈশাখ মাস পর্যন্ত, এই ৬৫ বৎসর কাল রবীন্দ্রনাথের লেখনী অজস্র ধারায় যে প্রবন্ধ সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছে রচনা-গৌরবের দিক দিয়া উহা যেমন তুলনারহিত, বৈচিত্র্য ও বৈদগ্ধ্যে তেমনি অনন্যসাধারণ। কবি যদি একটিও কাব্যগ্রন্থ না লিখিয়া যাইতেন তো বোধ করি সেই প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথ বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচয়িতা বলিয়া পরি-গণিত হইতে বিন্দুমাত্র প্রশ্ন ও প্রচারের প্রয়োজন হইত না। বিষয়বস্তুর দিক দিয়া এই প্রবন্ধগুলির দিগন্ত-সীমা নির্দ্দেশ করিতে যাওয়া আর ডুব দিয়া সমুদ্রের কূলকিনারা নির্দ্ধারণ করিতে যাওয়া প্রায় একই কথা। সমাজ ও রাষ্ট্র হইতে আরম্ভ করিয়া, ধর্ম ও দর্শন; শিক্ষা ও সভ্যতা হইতে আরম্ভ করিয়া সুর ও ছন্দ; সমালোচনা

ও রাজনীতি হইতে আরম্ভ করিয়া সাহিত্যতত্ত্ব ও নন্দনবাদ—বিষয়বস্তুর এই দিগন্তবিস্তারী প্রসারণে রবীন্দ্র প্রবন্ধ-ভাণ্ডার সমুন্নত ও অন্নপূর্ণা।

তথাপি, নিম্নলিখিত উপায়ে রবীন্দ্র-প্রবন্ধরাজির দিগ্দর্শন করা যাইতে পারে। (১) সাহিত্য-সমালোচনা বা সাহিত্য ও শিল্পের মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা; উদাহরণ:—প্রাচীন সাহিত্য, আধুনিক সাহিত্য, লোকসাহিত্য, সাহিত্য, সাহিত্যের পথে, সাহিত্যের স্বরূপ।

(২) রাজনীতি, সমাজনীতি ও রাষ্ট্রনীতি বিষয়ক নিবন্ধ; উদাহরণ:—আত্মশক্তি, রাজা প্রজা, স্বদেশ, কালান্তর, সমাজ।

(৩) শিক্ষা ও সভ্যতা বিষয়ক প্রবন্ধ; উদাহরণ: —শিক্ষা, সভ্যতার সংকট।

(৪) ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ক প্রবন্ধ; উদাহরণ:—ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা, পরিচয়, ভারতবর্ষ।

(৫) ধর্ম, দর্শন ও আধ্যাত্মিক বিষয়ক আলোচনা ও ব্যাখ্যান; উদাহরণ:—ধর্ম, মানুষের ধর্ম, শান্তিনিকেতন।

(৬) জীবনী ও আত্মবিষয়ক রচনা; উদাহরণ:—চারিত্রপূজা, জীবনস্মৃতি, আত্মপরিচয়, ছেলেবেলা।

(৭) ব্যক্তিগত প্রবন্ধ; উদাহরণ:—পঞ্চভূত, বিচিত্র প্রবন্ধ, লিপিকা।

(৮) চিঠিপত্র, ভ্রমণকাহিনী ও ডায়েরী জাতীয় রচনা; উদাহরণ:—য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র য়ুরোপ যাত্রীর ডায়রি, জাপান যাত্রী, রাশিয়ার চিঠি, পথের সঞ্চয়, ছিন্নপত্র, চিঠিপত্র, জাভাযাত্রীর পত্র।

(৯) অন্যান্য রচনা; উদাহরণ:—বাংলাভাষা-পরিচয়, বিশ্ব-পরিচয়, ছন্দ, শব্দতত্ত্ব।

উপরি উল্লিখিত তালিকাটি হইতেই রবীন্দ্রনাথের অবগাঢ় প্রবন্ধ-প্রতিভার সূচী-নির্দেশ পাওয়া যাইবে। ইহার বিস্তার ভূমি হইতে ভূমা পর্যন্ত। আসলে, সাহিত্য রবীন্দ্রনাথের কাছে কোন সাধ্য বস্তু নয়, সিদ্ধ বস্তু। সাহিত্যের মৌলিক উপাদানগুলি রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তি-সত্তারই উপাদান। এই কারণেই পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের রচনা-সাহিত্য সবটাই সম্পূর্ণরূপে তাঁহার নিজস্ব। রবীন্দ্রনাথ সমগ্র জীবন ধরিয়া শুধু সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন এবং এই স্রষ্টৃধর্মই রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-ধর্ম। তাঁহার প্রবন্ধাদি রচনা সাহিত্যর সেই ধর্ম হইতে বিচ্যুত না হইয়া বরং অপরূপ সৃষ্টি-কর্ম হইয়া উঠিয়াছে। স্বর্গীয় ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয় ঠিক এইরূপ মন্তব্যই করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক কালের ইংলণ্ডের নবজাগ্রত সাহিত্য-চেতনার মূর্ত নায়ক T. S. Eliot তাঁহার "The Sacred Wood" গ্রন্থে সমালোচনার আদর্শ ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া ঠিক এইরূপ সিদ্ধান্তেই উপনীত হইয়াছেন,—সেই সমালোচনাই প্রথম শ্রেণীর সার্থক রচনা যাহা স্বয়ং একরূপ "সৃষ্টিরূপ" লাভ করিতে পারিয়াছে। সেদিক হইতে, সমালোচনা প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সমালোচক।

যে-গুণে রচনা 'সৃষ্টি' হইয়া উঠে তাহা 'মন্ময়তা', রচয়িতার অনুভূতি-তীক্ষ্ণ ব্যক্তিসত্তার একরূপ স্বাদ। এইজন্যই রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের সহিত আমরা যত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হই, রবীন্দ্রনাথের সহিতও আমরা ততই ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠি। কারণ, রবীন্দ্র-সাহিত্য আর রবীন্দ্রনাথ প্রায় সমার্থক।

রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধরচনাগুলি যে-কোন বিষয়বস্তুই গ্রহণ করুক না কেন উহা তাঁহার বুদ্ধি, হৃদয় ও রসানুভূতির ত্রয়ী-সঙ্গমে সস্মিত "যুবতী" হইয়া উঠে। জ্ঞানকে মাষ্টারি যুক্তিতে প্রয়োগ না করিয়া প্রজ্ঞা ও রসের সুমেল পরিবেশনে স্নিগ্ধ করিয়া তুলিতে তাঁহার জুড়ি নাই। যে গুণে এই পরিমিতি তিনি রক্ষা করেন তাহা হইতেছে তাঁহার সূক্ষ্ম জীবনবোধ ও কৌতুকপ্রিয়তা। Wit ও Humour-এর এমন হরপার্বতী মিলন রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত অপরাপর প্রবন্ধ রচয়িতার রচনায় একান্তই বিরল।

এক জাতীয় রচনা আছে রবীন্দ্রনাথ যাহাকে

বলিয়াছেন 'বাজে কথা"। প্রমথ চৌধুরী বলিয়াছেন "গুণপনাযুক্ত ছ্যাবলামি", আর ডঃ জনসন বলিয়াছেন, "Loose sally of mind"। বোধ করি আধুনিক সংজ্ঞায় ইহাকে বলিতে পারি "রম্য রচনা"। এ যেন এক রকম সুরুচিপূর্ণ খোশ-গল্পের বৈদগ্ধ্য—যেন 'হঠাৎ আলোর ঝলকানি'। রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত প্রবন্ধগুলি অনেকটা এই জাতীয়। সুখের কথা, এই রচনাগুলি গল্প না হইয়া কাব্য-গুণযুক্ত প্রবন্ধ হইয়াছে বলিয়াই অত্যাধুনিক রম্যরচনার দোষগুলি ইহাতে নাই। কেবল রমণীয়তাই নয়, এক প্রকার মনন-প্রিয়তাও উহাতে দীপ্যমান। "পঞ্চভূত" গ্রন্থখানি এই পর্যায়ভুক্ত।

(খ) অপরাপর গদ্য রচনা হইতে "পঞ্চভূত" একটু স্বতন্ত্র আঙ্গিকের রচনা। ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম—এই পাঁচটি শক্তিকে পঞ্চভূত আখ্যা দিয়া সমাসোক্তি অলঙ্কার সহযোগে উহাদের এক-একটিকে মনুষ্যচরিত্রে রূপায়িত করা হইয়াছে। এক-একটি চরিত্র আলোচনা-জগতের এক-একটি পৃথক দৃষ্টিকোণ। অর্থাৎ, আমাদের পরিচিত জগতে যে সকল ভিন্ন ভিন্ন তার্কিক ও সমালোচকের সাক্ষাৎ ঘটে পঞ্চভূত যেন তাহাদেরই রূপকভাষ্য। ডায়েরী লেখক ভূতনাথবাবু, যেন রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং, পঞ্চভূতের দ্বারা পরিবৃত হইয়া আছেন একটি সাধারণ সমাধানের মত। ভূত পঞ্চক যে-কোন বিষয়ের উপর যখন আপন আপন মতানুযায়ী মন্তব্য প্রকাশ করিয়া চলে, ভূতনাথবাবু তখন সুকৌশলে তাহার সমাধান করিয়া আপন মতটি প্রতিষ্ঠা করিয়া যান। ইহাতেই রচনাটি অভিনব হইয়া উঠিয়াছে। ইহা অনেকটা রূপকের মতো, কিন্তু ঠিক রূপকও নয় কারণ কোন বিশেষ নৈতিক উপদেশ বা ধর্মব্যাখ্যা ইহাতে নাই। ইহা অনেকটা American লেখক Oliver Wendell Holmes-এর Autocrat at a Breakfast Table-এর মতো সরস বিচিত্র রচনা শিল্প।

রচনা হিসাবে ইহা রম্য রচনা জাতীয় রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত প্রবন্ধ। রম্য রচনা এইজন্যই যে ইহাতে বিষয়ের কোন সুনির্দিষ্টতা কিছু নাই। জগৎ, জীবন, সাহিত্য সৌন্দর্য্য শিল্প, মনুষ্য-প্রবৃত্তি, বিজ্ঞান, ইত্যাদি বহুবিধ আলোচনার একটি মধুচক্র। ইংলণ্ডের প্রাক্ আধুনিক কালের বিখ্যাত লেখক ও সমালোচক Robert Lynd রম্য রচনা কী জাতীয় রচনা বলিতে যাইয়া বলিতেছেন:—
Sometimes it is nearly a sermon, it sometimes is nearly a short story. It may be a fragment of autobiography or a piece of nonsense. It may be satirical or vituperative or sentimental. It may deal with any subject from the day of judgement to a pair of scissors.

পঞ্চভূতের যাহা আলোচ্য বিষয় সব না হইলেও তাহার অধিকাংশ কথাই রবীন্দ্রনাথ কাব্যাকারে কি প্রবন্ধাকারে কি নাটকাকারে অন্যত্র অন্যরূপে বহুবার বলিয়াছেন এবং 'পঞ্চভূত'-গ্রন্থটি প্রকাশিত হইবার পরেও (১৮৯৭) ঐ একই কথা আরও সুষ্ঠু করিয়া আরোও যুক্তিঘন করিয়া নানা যায়গায় নানাভাবে বলিয়াছেন। এইজন্যই পঞ্চভূতের বিষয়বস্তুর নানা পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও উহাদের মধ্যেও একটি সূক্ষ্ম যোগসূত্র আছে—সে সূত্রটি রবীন্দ্রনাথের মন ও মত।

যে-মতগুলি রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব এবং অতিপ্রিয়, যাহা তত্ত্বাকারে বার বার তাঁহার সাহিত্যে আবর্তিত হইয়াছে তাহারই কয়েকটি পঞ্চভূত গ্রন্থে বিতর্কের আকারে পরিহাস-তরল করিয়া পরিবেশন করা হইয়াছে।

গ্রন্থের প্রথম বিতর্ক সভা "পরিচয়" লইয়া, লেখক বলিতেছেন, "কেবল পাঠকের এজলাসে লেখকের একটা এই ধর্ম শপথ আছে যে, সত্য বলিব। কিন্তু সে সত্য বানাইয়া বলিব।" এই যে সত্য কথাকে একটু "বানাইয়া বলা" ইহা লইয়াই সাহিত্যের কারবার। এবং রবীন্দ্র-সাহিত্য তত্ত্বের ইহা একটি বিশেষ পরিচিত মতবাদ। সাহিত্যের দিক হইতে বিষয়বস্তুর মহিমা অপেক্ষা প্রকাশভঙ্গির মহিমা কিছু

কম নয়—বরঞ্চ এই দ্বিতীয়টাকেই রবীন্দ্রনাথ বড় বলিয়া মনে করেন। পঞ্চভূতেরই অপর একটি বিতর্ক 'মনুষ্য' আলোচনায় এই মতটির প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা রহিয়াছে।

"সমীর কহিল, মানুষের ব্যক্ত করিবার ক্ষমতা অতিশয় অল্প। এই জন্যই প্রকাশের সঙ্গে নির্দেশ, ভাষার সঙ্গে ভঙ্গি,' ভাবের সহিত ভাবনা যোগ করিয়া দিতে হয়......

"স্রোতস্বিনী কহিল, এই জন্যই সাহিত্যে বহুকাল ধরিয়া একটা তর্ক চলিয়া আসিতেছে যে, বলিবার বিষয়টা বেশী, না বলিবার ভঙ্গিটা বেশী।........."

বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব রচনাকৌশলেও 'বিষয়' অপেক্ষা "ভঙ্গি'র, প্রাধান্য বেশী। কি বলিয়াছেন তাহা অপেক্ষা কেমন করিয়া বলিয়াছেন সেই দুর্লভ নৈপুণ্যের প্রতি আমাদের 'ভাল-লাগা-বোধ"টি চরিতার্থ হয়। উক্তির এই বক্রতা, আলঙ্কারিক কুণ্তক যাহাকে কাব্যের 'জীবিত' বলিয়াছেন, সেই বক্রতা অর্থাৎ প্রকাশভঙ্গির চারুত্ব সমগ্র রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রাণ।

শিল্প ও সাহিত্যতত্ত্ব লইয়া রবীন্দ্রনাথের আর একটি বহুল-প্রযুক্ত অতিপ্রিয় মতবাদ হইতেছে, ''আবশ্যক ও অনাবশ্যক, প্রয়োজন ও অপ্রয়োজন, লইয়া। পঞ্চভূতের অনেকগুলি বিতর্কের মধ্যে নানা প্রস্তাবে এই অনাবশ্যকের সত্যমূল্য ও অপ্রয়োজনের আনন্দ স্থান পাইয়াছে। মূল প্রতিপাদ্য হইতেছে এই যে, এই প্রয়োজনের জগতে, এই আবশ্যকের পণ্যশালায় যাহা অনাবশ্যক তাহা লইয়াই আমাদের ভালবাসা, যাহা অপ্রয়োজন তাহা লইয়াই শিল্প ও সাহিত্য।

"শ্রীমতী অপ্ (স্রোতস্বিনী) তরঙ্গনিন্দিত-গ্রীবার আন্দোলনে বলিল, আমি অনাবশ্যককে ভালবাসি। অতএব অনাবশ্যক-ও আবশ্যক। অনাবশ্যক আমাদের আর কোন উপকার করে না, কেবলমাত্র আমাদের স্নেহ, আমাদের ভালবাসা, আমাদের করুণা, আমাদের স্বার্থ-বিসর্জনের স্পৃহা উদ্রেক করে। এই মতবাদটি লইয়া রবীন্দ্রনাথ 'পুরস্কার', 'আবেদন', 'অনাবশ্যক'—ইত্যাদি শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলিতে এবং কয়েকটি রূপক-নাট্যে অপূর্ব ভাবরূপ দিয়াছেন। যেমন, দেখা যাউক—

লোকান্তর প্রতিভাসম্পন্ন কবির সুধাসম 'কাব্যকূজনে মুগ্ধ হইয়া রাজা বলিলেন,

'ভাবিয়া না পাই কি দিব তোমারে,
করি পরিতোষ কোন্ উপহারে;
যাহা কিছু আছে রাজভাণ্ডারে
সব দিতে পারি আনি।,

—উত্তরে, আনন্দ-জলভরা নয়নে কবি শুধু বলেন, 'কণ্ঠ হইতে দেহ মোর গলে ওই ফুলমালাখানি।' দৈনন্দিন জীবনের পৌনঃপুনিক 'তুচ্ছ-লাভ-ক্ষতি-টানাটানি' লইয়া কাবর মন সন্তুষ্টি লাভ করিতে পারে না, কবির মন মনোরম হইয়া উঠে প্রয়োজনীয় সীমার বহু উর্ধ্বে অপ্রয়োজনের ধ্যানলোকে,যেখানে হীরা-মণি-মাণিক্যের মালা নয়, প্রীতির বরণ-মালাই যুগ-যুগান্ত ধরিয়া সকল কালের সকল শ্রেণীর শিল্পী সাধকের গুণপনার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার।—এতদিন যোদ্ধার অসিতে, স্থপতির খনিত্রে, বিজ্ঞানীর গবেষণাগারে যাহা চলিয়া আসিয়াছে উহা অত্যাবশ্যক, উহা প্রয়োজন, উহা কাজ। কিন্তু, কবি চাহিয়া বসিল, 'আজকের কাজ যত—আলস্যের সহস্র সঞ্চয়। শত শত আনন্দের আয়োজন।' এই আনন্দের জন্যই শিল্পীবালা কাশের বনে শূন্য নদীর তীরে একেলা আকাশ প্রদীপ জলে ভাসাইয়া দেয়; এই আনন্দের জন্যই রাজার দুলাল ঘরের সমুখপথ দিয়া চলিয়া যাইবে শুনিয়া শিল্পীমন আপন কণ্ঠহার পথের ধুলায় নিক্ষেপ করিতে কুণ্ঠিত হয় না। আসলে হৃদয় ও অনুভূতি লইয়াই সুন্দরের আনন্দলোক। কাজ-কারবার তাহার কাছারিবাড়ীতে।

যে যে কলা-কৌশল রবীন্দ্রনাথের গদ্য রচনাকে 'শুষ্কং কাষ্ঠং' না করিয়া 'নীরস তরুবর' করিয়াছে, হাস্য-রস, ঔচিত্য, উপমা প্রয়োগ ও ভাষাগত অভিজাত রুচি তাহাদের প্রধানতম। রবীন্দ্রনাথের কবিধর্ম তাঁহার গদ্য-রচনাকেও বিষয়ভেদে ও জায়গাভেদে গীতিকবিতার (lyrics) মর্য্যাদা দিয়াছে। গ্রন্থ হিসাবে, 'লিপিকা'

ও অংশ হিসাবে তাবৎ সকল গদ্য রচনায় স্থানবিশেষের উল্লেখ করা যাইতে পারে। 'পঞ্চভূতে'ও এই গীতি-ধর্মের অমিল নাই। 'পল্লীগ্রামে' ও 'মন' এই দুইটি রচনা, ভূতপঞ্চকের বিতর্কসভায় কেমন করিয়া যেন কোন ফাঁকে ঢুকিয়া পড়িয়া বিশিষ্ট গীতিধর্মি হইয়া উঠিয়াছে।

'মায়ের কোলের মধ্যে সন্তান যেমন একটি উত্তাপ, একটি আরাম, একটি স্নেহ পায়, তেমনি এই পুরাতন প্রকৃতির কোলে শোঁয়াইয়া বসিয়া একটি জীবনপূর্ণ আদর পূর্ণ মৃদু উত্তাপ চতুর্দিক হইতে আমার সর্বাঙ্গে প্রবেশ করিতেছে।' (মন)

'আমার নানা চিন্তাবিক্ষুব্ধ চিত্তের কাছে এই ছোট পল্লীটি তানপুরার সরল সুরের মতো একটি নিত্য আদর্শ উপস্থিত করিয়াছে। সে বলিতেছে, আমি মহৎ নহি, বিস্ময়জনক নহি, কিন্তু আমি ছোটর মধ্যে সম্পূর্ণ; ..... আমি ছোট বলিয়া তুচ্ছ, কিন্তু সম্পূর্ণ বলিয়া সুন্দর।' (পল্লীগ্রামে)

এইসকল রচনা যে-গুণে গৌরবলাভ করিয়াছে তাহাতে কেবল ভাব, ভাষা ও উপমার সুসম্পৃক্তি নয়, একরূপ অনির্বচনীয় গীতিময়তাও আছে।

হাস্যরস সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব একটা theory আছে। নানা জায়গায় তাহার নানা ব্যাখ্যা তিনি নিজেই করিয়াছেন। কিন্তু পঞ্চভূতের বিতর্কসভায় 'কৌতুকহাস্য' ও 'কৌতুকহাস্যের মাত্রা' লইয়া যে আলোচনাটি আছে তাহার আর জুড়ি নাই।

একপ্রকার অসঙ্গত উদ্ভট চিত্রের দ্বারা আমাদের মনে যে হাস্যরসের উদ্রেক হয়, তাহা কৌতুকহাস্য। কিন্তু প্রশ্ন হইতে পারে, 'যাহা অসঙ্গত তাহাতে মানুষের দুঃখ পাওয়া উচিত ছিল। হাসি পাইবার কোন অর্থই নাই। পশ্চাতে যখন চৌকি নাই তখন চৌকিতে বসিতেছি মনে করিয়া কেহ যদি মাটিতে পড়িয়া যায় তবে তাহাতে দর্শকবৃন্দের সুখানুভব করিবার কোন যুক্তিসঙ্গত গ্রন্থে 'কৌতুকহাস্যের মাত্রা' প্রবন্ধে এই প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া তাহার যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখাইয়াছেন। কৌতুক একপ্রকার চেতনাকে পীড়ন। ইচ্ছার সহিত কার্য্যের অসঙ্গতি দেখা দিলেই চেতনা পীড়ন অনুভব করে এবং এই পীড়নের দ্বারাই হাস্যের উৎপত্তি।

'অসঙ্গতি যখন আমাদের মনের অনতিগভীর স্তরে আঘাত করে তখনি আমাদের কৌতুক বোধ হয়। গভীরতর স্তরে আঘাত করিলে আমাদের দুঃখ বোধহয়। অসঙ্গতির ভার অল্পে অল্পে চড়াইতে চড়াইতে বিস্ময় ক্রমে হাস্যে এবং হাস্য ক্রমে অশ্রুজলে পরিণত হইতে থাকে।'

ট্র্যাজেডি ও কমেডির পার্থক্য লইয়া ওদেশে ও এদেশে বাগবিতণ্ডার অন্ত নাই, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের এই সমীকরণটি বোধ করি সকল বিতর্কের সাধু সমাধান করিতে সমর্থ।

'অসংগতি কমেডিরও বিষয়, অসংগতি ট্র্যাজেডিরও বিষয়। একটা হাস্যজনক, আর একটা দুঃখজনক। কমেডি ও ট্র্যাজেডি কেবল পীড়নের মাত্রাভেদ মাত্র।'

'পাণ্ডিত্য' ও রসাস্বাদন এক জিনিস নহে। বিশেষ করিয়া রবীন্দ্রনাথের নিকট 'পাণ্ডিত্য' রসাস্বাদনের বিঘ্ন-স্বরূপ। 'কাব্যের তাৎপর্য্য' এই আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ একটি সুন্দর মীমাংসা বাহির করিয়াছেন।

"কাব্যের একটা গুণ এই যে, কবির সৃজনশক্তি পাঠকের সৃজনশক্তিও উদ্রেক করিয়া দেয়; তখন স্ব স্ব প্রকৃতি অনুসারে কেহ বা সৌন্দর্য্য, কেহ বা নীতি, কেহ বা তত্ত্ব সৃজন করিতে থাকেন।......অনেকে বলেন, আঁঠিই ফলের প্রধান অংশ এবং বৈজ্ঞানিক যুক্তির দ্বারা তাহা প্রমাণ করাও যায়। কিন্তু তথাপি অনেক রসজ্ঞ ব্যক্তি ফলের শস্যটি খাইয়া তাহার আঁঠি ফেলিয়া দেন। ...কাব্য হইতে কেহ বা ইতিহাস আকর্ষণ করেন, কেহ বা দর্শন উৎপাটন করেন, কেহ বা নীতি, কেহ বা বিষয়জ্ঞান উদ্ঘাটন করিয়া থাকেন, আবার কেহ বা কাব্য হইতে কাব্য ছাড়া আর কিছুই বাহির করিতে পারেন না।

ফিরিতে পারেন, কাহারও সহিত বিরোধের আবশ্যক দেখি না, বিরোধে ফলও নাই।" কাব্য সম্পর্কে এই যে একটা উদার রসবোধ, রবীন্দ্রনাথের নিজের ক্ষেত্রে উহা একরূপ কাব্য-সত্য বলিয়াই প্রতিভাত হইত। কারণ, 'সোনার তরী', 'উর্বশী', 'তপোভঙ্গ', 'ঝরণা তোমার স্ফটিকজলের স্বচ্ছধারা'—ইত্যাদি কয়েকটি কবিতার অর্থ লইয়া এককালে সাহিত্যজগতে তুমুল ঝড় উঠিয়াছিল। অনেকেই রবীন্দ্রনাথকে অনুরোধ করিয়াছিলেন তাঁহার নিজের ব্যাখ্যাটি দিতে। ইহা অপেক্ষা অধিক বিপদের ঝুঁকি রবীন্দ্রনাথকে আর কোন ব্যাপারেই লইতে দেখা যায় নাই। নিজের কবিতার অর্থ নিজে ব্যাখ্যা করা—ইহা যেন তাঁহার নিকট পণ্ডশ্রম মাত্র। তবু অনুরাগী ভক্তসমাজকে খুশী রাখিতে কখনো কখনো বাধ্য হইয়া ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু কখনোই তিনি নিজে সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। পারেন নাই কেন তাহা ঐ 'কাব্যের তাৎপর্য' পড়িলেই বোঝা যায়। অর্থ লইয়া টানাটানি চলিলেই কাব্যের তাৎপর্য যায় ব্যর্থ হইয়া।

মানুষের অন্তরাত্মা সর্ব্বদাই নিয়মের অনুশাসনে বদ্ধ থাকিতে ভালবাসে না। কিন্তু বিজ্ঞান আলোচনা করিলে জগৎকে নিরানন্দ ইচ্ছাসম্পর্কবিহীন বলিয়া মনে হয়। এইজন্য আমাদের ইচ্ছা একটা বিশ্বইচ্ছার, আমাদের প্রেম একটা বিশ্বপ্রেমের নিগূঢ় অপেক্ষা না রাখিয়া বাঁচিতে পারে না। 'বৈজ্ঞানিক কৌতূহল' প্রসঙ্গে আলোচনা করিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথ এই ইচ্ছাশক্তির প্রেম, আনন্দ ও সৌন্দর্য্যের নিয়মাতিরিক্ত 'আশ্চর্য্য' আবিষ্কার করিয়াছেন। এই অত্যাশ্চর্য্যটি একটা স্বর্গীয় অনিয়মের উৎসব। সাহিত্য, শিল্প ও সঙ্গীত প্রভৃতি হৃদয়বৃত্তির চারুকলাগুলি এই স্বর্গীয় অনিয়মেই এত রহস্যময়। সৌন্দর্য্য ও প্রেমের এই রহস্যকে বিজ্ঞানের নিয়ম আজও বাঁধিতে পারে নাই।

'গদ্য ও পদ্য' আলোচনাকালে শ্রীযুক্ত সমীরের মুখে একটা সৃষ্টিছাড়া কথার অবতারণা করা হইয়াছে। তিনি বলেন, 'কৃত্রিমতাই মনুষ্যের সর্ব্বপ্রধান গৌরব। মানুষ ছাড়া আর কাহারও কৃত্রিম হইবার অধিকার নাই।' এই সৃষ্টিছাড়া কথাটাই কিন্তু রবীন্দ্রনাথের নন্দনতত্ত্বের একটা বিশিষ্ট মতবাদ। পঞ্চভূত রচনার বহু পরে রচিত 'বলাকা' কাব্যে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন,

"পাখীরে দিয়েছ গান, গায় সেই গান,
তার বেশি করে না সে দান।
আমারে দিয়েছো স্বর, আমি তার বেশী করি দান
আমি গাই গান।"

পক্ষীকুলকে সঙ্গীত সৃজন করিতে হয় না, কিন্তু মানুষকে সাধনা করিয়া স্বরকে সুরে উন্নীত করিতে হয়। সেই তার প্রধান গৌরব। গদ্য অপেক্ষা পদ্য অধিক কৃত্রিম এই কারণেই যে, উহাতে মানুষের সৃষ্টি বেশী। যতটুকু মানুষের সৃষ্টি ততটুকুই কৃত্রিম, তাই পদ্যের ভাষা কৃত্রিম। কিন্তু সৌন্দর্য্য কৃত্রিম নহে। উহা চারিদিকের এবং সমস্ত জগতের।

'নরনারী' ও 'অখণ্ডতা' আলোচনা দুটিতে পুরুষ ও নারীর প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে যে-সকল কথা বলা হইয়াছে রবীন্দ্রনাথ নানা জায়গায় নানাভাবে উহার পুনরুক্তি করিয়াছেন। নারীর নারীত্ব যে একটি অখণ্ড-শ্রী সে সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের একটি স্বাভাবিক শ্রদ্ধা আছে। "পুরুষ আংশিক, বিচ্ছিন্ন, সামঞ্জস্যবিহীন। আর স্ত্রীলোক এমন একটি সঙ্গীত যাহা সমে আসিয়া সুন্দর সুগোলভাবে সম্পূর্ণ হইতেছে। রূপকে যদি কাহারও আপত্তি না থাকে তবে আমি বলি, আমাদের এই চঞ্চল বহিরংশ পুরুষ এবং এই বৃহৎ অচেতন অন্তরাংশ নারী।" ইংলণ্ডের দার্শনিক Newman ঠিক এই কথা না বলিলেও অনেকটা এইরূপই ভাবিয়া লইয়াছেন।

'নরনারী'তে ব্যোম একটি নূতন কথা বলিয়াছে। উহা প্রচলিত বিশ্বাসের এতই বিরোধী যে হঠাৎ শুনিলে চমক লাগে। কিন্তু কথাটি সত্য। ভাবিয়া দেখিলে তত্ত্বটির গভীরতা সম্পর্কে মনে কোন সংশয় থাকে না। প্রচলিত বিশ্বাস হইতেছে, যেখানে হৃদয়বৃত্তির প্রাধান্য সেখানে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোক শ্রেষ্ঠ, যেখানে কার্য-ক্ষেত্র সেখানে পুরুষের প্রভুত্ব। কিন্তু ব্যোম বলেন,

"কার্যই স্ত্রীলোকের। কার্যক্ষেত্র ব্যতীত স্ত্রীলোকের অন্যত্র স্থান নাই। যথার্থ পুরুষ যোগী, উদাসীন, নির্জন-বাসী। কার্যবীর নেপোলিয়নও তুমুল কার্যক্ষেত্রের মাঝখানে একটা মস্ত আইডিয়ার দ্বারা পরিরক্ষিত হইয়া বিজনবাস যাপন করিতেন। স্ত্রীলোকই যথার্থ কাজ করে। তাহার কাজের মাঝে কোন ব্যবধান নাই। সেই যথার্থ লোকালয়ে বাস করে, সংসার রক্ষা করে—সে স্বতন্ত্র হইয়া থাকে না।"

রবীন্দ্রনাথের গল্পরচনার অন্যতম গুণ হইতেছে ব্যখ্যান-চাতুর্য। পঞ্চভূতের 'অপূর্ব রামায়ণ' তাহার অপূর্ব নিদর্শন।

রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক চেতনার মধ্যে মৃত্যুর এক বিশেষ রূপ আছে। 'মরণ রে তুঁহু মম শ্যাম সমান' হইতে আরম্ভ করিয়া 'রূপনারায়ণের কূলে জেগে উঠিলাম' পর্যন্ত কাব্যপর্যায়ের বিভিন্ন কালে রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুর নব নব রূপ দেখিতে পাইয়াছেন। সে রূপ ভীতির নহে। উহা মাভৈঃ। "মনে হইতেছে মৃত্যুটা এই রাগিণীর মতো সকরুণ বটে, কিন্তু এই রাগিণীর মতই সুন্দর। .... জগৎরচনাকে যদি কাব্য হিসাবে দেখা যায় তবে মৃত্যুই তাহার সেই প্রধান রস, মৃত্যুই তাহাকে যথার্থ কবিত্ব অর্পণ করিয়াছে।" —পঞ্চভূতের এই মৃত্যু যশোগান রবীন্দ্রসাহিত্যে অন্যত্রও প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। এমন কি —"যদি মৃত্যু না থাকিত, জগতের যেখানকার যাহা তাহা চিরকাল সেখানেই যদি অবিকৃতভাবে দাঁড়াইয়া থাকিত তবে জগৎটা একটা চিরস্থায়ী সমাধিমন্দিরের মতো অত্যন্ত সংকীর্ণ, অত্যন্ত কঠিন, অত্যন্ত বদ্ধ হইয়া রহিত। এই অনন্ত নিশ্চলতার চিরস্থায়ী ভার বহন করা প্রাণীদের পক্ষে বড়ো দুরূহ হইত।" পঞ্চভূতের এই অবলোকনটি ঠিক একইরূপে চমৎকার কাব্যরূপ পাইয়াছে অনেক পরে লিখিত "বলাকা"র 'চঞ্চলা' কবিতাটির মধ্যে।

"যদি তুমি মুহূর্তের তরে
ক্লান্তিভরে
দাঁড়াও থমকি,
তখনি চমকি
উচ্ছ্রি য়া উঠিবে বিশ্ব পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তুর পর্বতে;
পঙ্গু মূক কবন্ধ বধির আঁধা
স্থূলতনু ভয়ংকরী বাধা
সবারে ঠেকায়ে দিয়ে দাঁড়াইবে পথে;
অণুতম পরমাণু আপনার ভারে
সঞ্চয়ের অচল বিকারে।
বিদ্ধ হবে আকাশের মর্মমূলে
কলুষের বেদনার শূলে।"

এইসূত্রে এখানে একটি কথা বলিয়া রাখা ভাল যে, গতিবাদ লইয়া ইউরোপ : রবীন্দ্রনাথ : বের্গস সম্বন্ধে যে একটি জমকালো আলোচনা রবীন্দ্র-দর্শন সম্বন্ধে প্রায়ই আলোচিত হইয়া থাকে তাহা বহুলাংশেই পশ্চিমবাহিনী খেতাবী শিক্ষা-স্রোতের একরূপ পণ্ডিত গবেষণা মাত্র। যে অভীক্ষণ গতিবাদের মূলে রহিয়াছে তাহা বীজরূপে ক্রান্ত পরিদর্শকের বহুপূর্বেই পঞ্চভূতে লুকাইয়া ছিল।

সে যাহাই হউক, মৃত্যুর অপর একটি ব্যাখ্যা 'অপূর্ব রামায়ণে' যেভাবে দেওয়া হইয়াছে, বিশ্বের সাহিত্য-ভাণ্ডারে অনুরূপ কবিকল্পনা একান্তই বিরল। উহা যেমন মৌলিক, তেমনি মর্মঘন—যেন একটি আবিষ্কার।

এ-জগতে আর সকলই নশ্বর, "জগতের মধ্যে মৃত্যুই কেবল চিরস্থায়ী—সেইজন্যই আমাদের সমস্ত চিরস্থায়ী আশা ও বাসনাকে সেই মৃত্যুর মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি। আমাদের স্বর্গ, আমাদের পুণ্য, আমাদের অমরতা সব সেখানেই। যে সকল জিনিস আমাদের অতিপ্রিয়, যাহাদের বিনাশ আমরা কল্পনাও করিতে পারি না, সেগুলিকে মৃত্যুর হস্তে সমর্পণ করিয়া দিয়া জীবনান্তকাল অপেক্ষা করিয়া থাকি।"

একটি প্রশ্ন উত্থাপন করা হইয়াছে। প্রশ্নটি যুগোপ-যোগী। "আমাদের প্রেমকে পৃথিবী হইতে প্রত্যাহরণ করিয়া মৃত্যুর পারে পাঠাইয়া দিব, না এই পৃথিবীতেই রাখিব, ইহা লইয়াই তর্ক।" প্রাচীন বৈরাগ্যধর্ম বলিতেছে, পরকালের মধ্যেই প্রকৃত প্রেমের স্থান;

নবীন সাহিত্য ও ললিতকলা বলিতেছে 'ইহলোকেই আমরা তাহার স্থান দেখাইয়া দিতেছি।'

সাহিত্যের আধুনিকবাদী ও পুরাতনবাদীদের এই মতদ্বৈধতা লইয়া রবীন্দ্রনাথ এক অপূর্ব্ব-রামায়ণ-কথা ফাঁদিয়াছেন। সেখানে রামচন্দ্র হইতেছেন মানুষের হৃদয় আর সীতা হইতেছেন প্রেম। নিন্দুকের দল হইল ধর্ম্মশাস্ত্র। রাবণ হইল অনিত্যপদার্থ। অনিত্যপদার্থের সংস্পর্শজনিত কলঙ্কের অপরাধ শাস্ত্রের অনুশাসন যখন মানুষের হৃদয় হইতে প্রেমকে নির্ব্বাসিত করে তখন প্রেমের একমাত্র আশ্রয় ঘটে মহাকবির কাব্যে। এই-খানেই অনাথিনী প্রেম 'কুশ' ও 'লব' নামক কাব্য ও ললিতকলার প্রসব করেন। এই কাব্য ও ললিতকলাই আজ মনুষ্যসভায় তাহাদের পরিত্যক্তা জননী প্রেমের যশোগান করিতে আসিয়াছে। তাই উত্তরকাণ্ড এখনও শেষ হয় নাই।

'প্রাঞ্জলতা', 'সৌন্দর্য সম্বন্ধে সন্তোষ' ও 'ভদ্রতার আদর্শ' এই তিনটি আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ মানুষের 'ভাল-লাগা' ও 'না-লাগা'র উপর বিষয়ভেদে ভিন্ন ভিন্ন আলোচনা করিয়াছেন। যাহা ভাল লাগে উহাই প্রাঞ্জল আর যাহা ভাল লাগে না উহা প্রাঞ্জল নয় এইরূপ ভাবিয়া লওয়াটা সংস্কৃত রুচির পরিচয় নয়। ভাল লাগিবারও একরূপ শিক্ষা দরকার।

প্রাঞ্জলতা সরলতা হইলেও 'যাহা সরল তাহাই যে সহজ এমন কোন কথা নাই। অনেক সময় তাহাই অত্যন্ত কঠিন;' কৃষ্ণনগরের কারিগরের তৈরী মূর্তি দেখিতে ভাল লাগে, তাই বলিয়া উহা সরল নয়, উহাতে অনেক রঙচঙ ও প্রয়াস ব্যয়িত হইয়াছে। কিন্তু সর্বপ্রকার প্রয়াসবিহীন প্রাঞ্জল যাহা, তাহা হইল গ্রীক প্রস্তরমূর্তি-গুলি। কিন্তু তাই বলিয়া উহারা সহজ নহে। 'কলা-বিদ্যায় সরলতা উচ্চ অঙ্গের মানসিক উন্নতির সহচর।'

ভারতীয় মনের গহনে সন্তোষবোধের একপ্রকার সংস্কার বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে বলিয়াই সৌন্দর্য সম্বন্ধে ভারতবাসী বড় উদাসীন। অসুন্দরকেও সুন্দর বলিয়া ভাবিতে তাহাদের জন্মগত সন্তোষ বাধা পায় না। সেই-জন্যই ভারতবর্ষীয় প্রকৃতির এই বিশেষত্বটি উচ্চ অঙ্গের কলাবিদ্যার পরিপন্থী।

"অসন্তোষ না থাকাতে বহুকাল হইতে আমাদের সম্বন্ধে দেবতাকে দেবতা হইবার, পূজ্যকে উন্নত হইবার, মূর্তিকে ভাবের অনুরূপ হইবার প্রয়োজন হয় নাই।" ইহাকে আধ্যাত্মিকতা বলিয়া চালাইয়া দিতে রবীন্দ্রনাথ নারাজ।

"সৌন্দর্য অনুভব করিবার জন্য সুন্দর জিনিসের আবশ্যকতা নাই, ভক্তি বিতরণ করিবার জন্য ভক্তি-ভাজনের প্রয়োজন নাই—এরূপ পরম সন্তোষের অবস্থাকে আমি সুবিধা মনে করি না। ইহাতে কেবল সমাজের দীনতা শ্রীহীনতা এবং অবনতি ঘটিতে থাকে।"

ঠিক এই কারণেই 'ভদ্রতার আদর্শ' আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ একটি কঠিন মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, "কাব্য রাজ্যে কবির শাসন যেমন কঠিন, আমাদের আচার-ব্যবহার, বসন-ভূষণ সম্বন্ধে সমাজপুরুষের শাসন তেমনি কঠিন হওয়া উচিত, নতুবা সমগ্র সমাজের ছন্দ ও সৌন্দর্য কখনোই রক্ষা হইতে পারে না।"

শিষ্টাচার, শিষ্টালাপ ও ভদ্র বসন-ভূষণের শৈথিল্যকে রবীন্দ্রনাথ অকৃত্রিম সরলতা বা আধ্যাত্মিকতা মনে করিয়া ক্ষমা করেন নাই। উহা মানুষের আত্মসম্মানকে লাঘব করে। যাহারা টাকার অভাবের দোহাই দেয় রবীন্দ্রনাথ তাহাদের সহিত একমত নহেন। কারণ, আমাদের দেশের অনেক ধনীরাও যে অশোভনভাবে থাকে সেটা কেবল জড়তা ও মূঢ়তা বশতঃ, অর্থের অভাবে নহে। "টাকার অভাব নহে, আমাদের দেশে যথার্থ 'ভদ্রতার আদর্শ' এখনো প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।" ইহার জন্য, 'বেতনবৃদ্ধি নহে, চেতনবৃদ্ধির আবশ্যক।'

অথচ আশ্চর্য এই যে, রবীন্দ্রনাথেরই কবিদৃষ্টি যখন 'পল্লীগ্রামে' সরল চাষাভূষার মানবিক মহত্ত্ব দেখিয়া মনে মনে শ্রদ্ধা পোষণ করিয়াছেন তখন কিন্তু তিনি 'ভদ্রতার আদর্শ' অনুযায়ী তাহাদের কৌলীন্য বিচার করেন নাই। কবিমনের বিশেষবিশেষ 'মুড'-এর ফলে

এইরূপ মধুর আপাতবিরোধিতা লেখকের রচনায় সর্ব্বত্র কিছু কিছু ছড়াইয়া আছে। আসলে রবীন্দ্রনাথের টীকা, টিপ্পনী বা মন্তব্যগুলি যখন তাঁহার ধ্যানস্থ রসানুভূতির প্রকাশরূপ লাভ করে তখন উহা সর্ব্বজনীন আস্বাদনযোগ্য হইয়া কাব্যসত্যরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে; আর যখন কোন বিশেষ বিশেষ রুচি বা সংস্কারের দ্বারা তাড়িত হইয়া তিনি সমাজ, সভ্যতা, শিক্ষা বা রাজনীতি সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়া বসেন তখন ঐ মন্তব্যগুলি আলঙ্কারিক গুণে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইলেও সর্ব্বত্র সর্বজনগ্রাহ্য নির্বিবাদ হইয়া উঠে না। উঠে না বলিয়াই, এই জাতীয় মন্তব্য দ্বারা রবীন্দ্রনাথকে অনেকসময়েই দেশবাসীর ভুল বোঝা-বুঝির মনোকষ্ট পাইতে হইয়াছিল।

(গ) রচনাকার হিসাবে রবীন্দ্রনাথ কবি-রবীন্দ্রনাথ অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহেন। প্রভেদ এই, কবি-রবীন্দ্রনাথের তুলনা রবীন্দ্রনাথ নিজেই, আর রচনাকার রবীন্দ্রনাথের তুলনা কেবলমাত্র বঙ্কিম—তা-ও আত্মনিষ্ঠ কৌতুক প্রধান ব্যক্তিগত রচনার ক্ষেত্রে।

রবীন্দ্রনাথের গল্প-রচনাও তাঁহার ছোটগল্প ও কাব্যের মত একটি সৃষ্টিকর্ম। যে-কোন সৃষ্টি-কর্ম্মেই প্রতিভার সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি উপাদানের প্রয়োজন হয়। এই উপাদানগুলি তালিকাকারে প্রস্তুত করিলে দেখা যাইবে, উপমা-প্রয়োগের ঔচিত্য, Epigram, হাস্যরস, কৌতুকপ্রিয়তা, ভাষার ছন্দ ও ধ্বনির সুষম পরিবেশন, অর্থদ্যোতক শব্দের সুষ্ঠু ব্যবহার, পশ্চাতে বিশাল ভৌম সমীক্ষণের পটভূমিকা, সঙ্গে সঙ্গেই ভাব-ভাষা-রীতির অনায়াস ব্যক্তিত্ব ও রোমাঞ্চিত গীতিময়তাই হইতেছে বিশ্বস্ত সহচর। এই উপাদানগুলি কিন্তু রবীন্দ্ররচনার স্বাভাবিক চলতায় মাঝে মাঝে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য পৃথক পৃথকভাবে কেহই সাজিয়া-গুজিয়া পথরোধ করিয়া নাই। কর্ণের কবচকুণ্ডলের মত উহারা এমনই সহজাত ও সুসম্পৃক্ত যে সবটা মিলিয়াই উহারা এক অখণ্ড রচনা—যেন চালচিত্রসহ দুর্গাপ্রতিমার গরীয়সী শারদশ্রী!

'পঞ্চভূত' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের রচনাবৈশিষ্ট্যের প্রায় সকল দিকই সুপরিস্ফুট হইয়াছে, তথাপি এই গ্রন্থখানি একমাত্র পরীক্ষার আসর ব্যতীত পাঠকসমাজে কোন প্রীতির আসন পাতিতে পারে নাই। বোধকরি গ্রন্থটির রচনাকৌশলের মধ্যে যে আপাত দুর্বোধ্যতা রহিয়াছে উহাই গ্রন্থটিকে লোকপ্রীতি হইতে বঞ্চিত করিয়াছে। আরও একটি কারণ আছে। মাঝে মাঝে সংলাপগুলি অতিদীর্ঘ হইয়া পড়ায় রসাস্বাদনে পরিশ্রম আসিয়া যায়। নইলে রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যানচাতুর্য, তাঁহার ধর্ম্মবোধ, বিশ্লেষণ ক্ষমতা, গুরু বিষয়ের উপর গম্ভীর আলোচনা, সঙ্গে সঙ্গে স্নিগ্ধ মধুর একরূপ নির্দোষ পরিহাসপ্রিয়তা—প্রায় সবগুলিই পঞ্চভূত গ্রন্থে বর্তমান। ইহা ছাড়াও আর ও একটি বস্তু 'অধিকন্তু' রহিয়াছে। উহা সংলাপী রবীন্দ্রনাথ। ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোমের বিতর্কের মাঝে মাঝে যেখানে ঘরোয়া কথোপকথন আসিয়া গিয়াছে সেখানে সংলাপী রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত। এই সংলাপরত রবীন্দ্রনাথ যে কী মধুর ব্যাপার তাহা যাঁহারা মৈত্রেয়ী দেবীর 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' পড়িয়াছেন তাঁহাদের আর অবিদিত নাই।

স্বাধীন ভারতের একটি কর্মযজ্ঞ ঃ উদ্বাস্তু শহর নববারাকপুর

কানাইলাল দত্ত

স্বাধীন ভারতবর্ষের মুক্ত মানুষরূপে পঁচিশটা বছর কাটলো এটাই তো পরম পাওনা। এর চেয়ে বেশি সুখ চাই নি কোন দিন। তবু এই পঁচিশ বছরের সীমানায় এসে হিসাব মেলাবার একটা সহজাত বাসনা জাগ্রত হয়েছে। নানা স্তরে না পাওয়ার দুঃখটা এতই তীব্র যে, কি পেয়েছি তা ভাববার অবকাশ হয় না। আমিও সেই না-পাওয়াদের একজন। আমি উদ্বাস্তু। পঞ্চাশ সনের দাঙ্গা বিধ্বস্ত পূর্ব বাংলা ছেড়ে এদেশে আশ্রয় নিয়েছিলাম। কেবল আমি না, এসেছিলেন লক্ষ লক্ষ সর্বহারা মানুষ। কত লক্ষ এসেছিলেন তার কোন যথার্থ হিসেব নেই। থাকতে পারে না।

১৯৫০ সনের ডিসেম্বরের আদম-সুমারি অনুসারে ঐ সময় পর্যন্ত পশ্চিম বঙ্গে উদ্বাস্তু সংখ্যা ছিল—২০,০৪,৫১৪ জন। কিন্তু অভিজ্ঞ ব্যাক্তি বর্গ মনে করেন প্রকৃত প্রস্তাবে উদ্বাস্তু সংখ্যা তখন এর দ্বিগুণ ছিল। তারপর কখন কিছু কম হারে কখন বেশি করে উদ্বাস্তু-স্রোত অবিশ্রান্ত বয়ে এসেছে। ইতিহাসের কোন অধ্যায়েই এত অধিক সংখ্যক মানুষকে জন্ম জন্মান্তরের ভিটে মাটি ছেড়ে অন্য দেশে গিয়ে আশ্রয় নিতে হয় নি।

উদ্বাস্তু পুনর্বাসন ক্ষেত্রে সরকারী ক্রটি-বিচ্যুতি ভ্রম-প্রমাদ এবং অবহেলা ও অনৌদার্য অবশ্যই আছে। কিন্তু জাতিধর্ম নির্বিশেষে পশ্চিম বাংলার মানুষ দুর্যোগের অন্ধকারতম মুহূর্তে (১৯৫০ সনে) শরণার্থীদের যে সেবা করেছেন তার কোন তুলনা হয় না। মুখ্যত তাদের সমবেদনা ও সেবার কল্যাণেই নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও উদ্বাস্তুদের পক্ষে কিঞ্চিৎ আত্মপ্রতিষ্ঠালাভ করা সম্ভব হয়েছে। যা প্রয়োজন তা নিশ্চয়ই হয় নি, কিন্তু যতটুকু হয়েছে তাই বা কম কিসে!

পঞ্চাশের কলকতা একদিকে ছিল দাঙ্গা-বিধ্বস্ত অন্যদিকে শরণার্থীর চাপে ডুবু ডুবু। এক সময় মনে হয়েছিল সমগ্র অবস্থাটা সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে। এই সময় পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তু পুনর্বাসন কমিশনার ছিলেন শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি "উদ্বাস্তু" গ্রন্থে লিখেছেন- "১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকের সেই দিনগুলির কথা ভাবতে এখনও আতঙ্ক হয়। কি দিন না গেছে! পূর্ববঙ্গ হতে আগত উদ্বাস্তু মানুষের স্রোত তখন এমন বিরাট আকার ধারণ করেছিল যে তাকে বন্যার সহিত তুলনা করা যায়। মানুষের বন্যা যেন পূর্ববঙ্গের সীমান্ত উপচে পশ্চিমবঙ্গ প্লাবিত করেছিল।"

মানুষের এই বন্যায় ভাসতে ভাসতে আমি একদিন কলকাতায় এসেছিলাম। অনেক পুরণো পরিচিত এ দেশের মানুষের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হলো। তারা সকলেই অন্তর থেকে আমাকে নানাভাবে সাহায্য করবার চেষ্টা করেছেন। তাঁদের আন্তরিকতা আমার হৃদয় স্পর্শ করেছিল। অধিকাংশ মানুষের হৃদয়ে উদ্বাস্তুদের জন্য গভীর সমবেদনা ও সহানুভূতি ছিল বলেই সেদিন গভীরতর কোন বিপর্যয় ঘটে নি। পরে অবশ্য নানা স্বার্থ সংঘাত ও বিকৃত রাজনৈতিক আন্দোলন এবং ভ্রান্ত সরকারী নীতির দরুণ শরণার্থীরা এ দেশবাসীর প্রীতি থেকে বাহুলাংশে বঞ্চিত হয়েছেন।

সুরাবর্দি সাহেব নাকি একদা পরিকল্পনা করেছিলেন

নানা রাজ্য থেকে মুসলমানদের আমদানি করে কলকাতার উপকণ্ঠে পুনর্বাসন দিয়ে হিন্দু প্রধান কলকাতা শহরটাকে ঘিরে ফেলবেন। কাজও কিছু আরম্ভ হয়েছিল। যে কাজটি ব্যাপকভাবে করবার জন্য একটি মাষ্টার প্লানও নাকি রচিত হয়েছিল। যুদ্ধের সময় সামরিক প্রয়োজনে কলকাতার চারপাশে প্রচুর জমি ভারত সরকার দখল নেন। যুদ্ধ অবসানে (১৯৪৫) এগুলি রাজ্য সরকার মারফত মালিকদের ফেরত দেবার হুকুম হয়। কিন্তু সুরাবর্দি সরকার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জমিগুলি ফেরত দেন নি। এই সব ভূমিতে মুসলমান এনে বসাবার পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু সে সময় ও সুযোগ তিনি পান নি। কিন্তু তার এই কাজের ফলে দৈবক্রমে শরণার্থীরা বিশেষ উপকৃত হলেন।

কলকাতার উপকণ্ঠে সরকারী খাস প্লটগুলিতে রাতারাতি উদ্বাস্তুরা কুঁড়ে ঘর তুলে বসবাস করতে শুরু করে দিলেন। এই জবর দখল আন্দোলন অবশ্য শেষ পর্যন্ত সর্ববিধ ফাঁকা জমি গ্রাস করেছে। না করে কোন উপায় ছিল না। তখন সরকারী নির্দেশ ছিল আশ্রয় প্রার্থীদের সীমান্ত অঞ্চলে সাময়িকভাবে আশ্রয় দেওয়া হবে, পুনর্বাসন নয়। দুজন বাঙালি সে দিন ক্রুদ্ধ কণ্ঠে এর প্রতিবাদ করেছিলেন—ডকটর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও ডকটর মেঘনাদ সাহা। ভারত সরকারের নীতির প্রতিবাদে শ্যামাপ্রসাদ কেন্দ্রীয় মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করেন। তিনি বলেছিলেন পাঞ্জাবে যদি মানুষ বিনিময় সম্ভব হয়ে থাকে বাংলায় তা হবে না কেন? পণ্ডিত নেহরু কতকগুলো ভাসা ভাসা কথা বলে মূল প্রশ্নটি এড়িয়ে যান। শ্যামাপ্রসাদ ও মেঘনাদ সাহার মত দুইজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মানুষের চেষ্টায় ভারত সরকারের নীতি কিছুটা কালক্রমে বদলেছিল বটে, কিন্তু পুনর্বাসনের সাহায্যদানের ক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তানের উদ্বাস্তুরা যে সাহায্য সহায়তা লাভ করেছে তার ধারে কাছে আমরা পৌঁছাতে পারি নি। বাঙালি উদ্বাস্তুর প্রতি এই বিভেদমূলক নীতির ফলে উদ্বাস্তুরা সাধারণভাবে সরকার বিরোধী হয়ে যান। অনিচ্ছুক কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে প্রত্যেকটি সাহায্য সহায়তা আদায়ের ব্যাপারে তুমুল আন্দোলন করতে হয়েছে উদ্বাস্তুদের। সে আন্দোলনের ঢেউয়ে দিশেহারা হয়ে ছোট মাপের স্থানীয় নেতারা উদ্বাস্তু ও স্থানীয় মানুষের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টিতে উস্কানি দিয়েছেন। ফলে উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের জন্য প্রতিষ্ঠিত প্রতিটি কলোনির ইতিহাস আজ সংগ্রামের ইতিহাস। প্রতিকূল পরিবেশে বাঙালির কর্মদক্ষতার উজ্জ্বল প্রতীক এগুলি। এরই কোন একটি কলোনিতে আশ্রয় নেবার সুযোগ পেয়েছিলাম। কিন্তু নিজের মনকে রাজি করতে পারি নি। এমনি করে ধাকা খেতে খেতে একদিন নিউ বারাকপুরে হাজির হলাম। সমবায় পদ্ধতিতে একটি পল্লী গড়ে তোলার কাজে আমার কিছু পূর্ব পরিচিত স্বজেলাবাসী (খুলনা) সেখানে আত্ম নিয়োগ করেছেন। সর্বহারা মানুষ একমাত্র নিজেদের কর্মশক্তিকে সম্বল করে ১৯৫০ সনে জঙ্গল জলা ভূমির মধ্যে উদ্বাস্তু কলোনি প্রতিষ্ঠায় হাত লাগিয়েছিলেন। পনের বছরের মধ্যে সেই কলোনিটি একটি স্বতন্ত্র পৌর-সভার গৌরব লাভ করেছে। উদ্বাস্তু ক্ষেত্রে তো বটেই, স্বাধীন ভারতে এত বড় গঠন কর্মযজ্ঞের দৃষ্টান্ত খুব বেশি নেই। তাই স্বাধীনতার রৌপ্যজয়ন্তীবর্ষে এই নব বারাকপুরের কথা একটু বলি।

বারাকপুর মহকুমার খড়দহ থানার আহারামপুর, কোদালিয়া আগাপুর ও মাসুন্দা মৌজায় এটি অবস্থিত। খুলনা কলকাতা রেলপথে এখন নববারাকপুর নামে একটি রেল স্টেশন হয়েছে। নববারাকপুর নামটির একটা ইতিহাস রয়েছে। খুলনা জেলায় বারাকপুর নামে একটি ইউনিয়ন আছে। সেখানকার অধিবাসীরা এই কলোনিটির উদ্যোক্তা। সেই ছেড়ে আসা বারাকপুরকে তারা নতুন করে দেখতে চেয়েছিলেন এই বাংলায়। তাই তাদের নতুন বাসভূমির নামকরণ করলেন নতুন বা নব-বারাকপুর।

এপ্রিলের (৫০) এক দুই তারিখে খুলনা বারাকপুরের চার শ' ঘর নমঃশূদ্র পরিবার এক সঙ্গে চলে আসেন। পূর্ব পরিচিত দু'টি পরিবার মধ্যমগ্রামে বাস করতেন

সেই সুবাদে তারা ওখানেই নেমে পড়লেন। দুটি পরিবার হাজার মানুষের কি সাহায্য করতে পারেন। খুলনা বারাকপুর ইউনিয়নের সভাপতি শ্রীহরিপদ বিশ্বাস কর্মসূত্রে কলকাতায় থাকতেন। উদ্বাস্তরা অবিলম্বে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। হরিপদবাবু প্রথমে এদের স্বদেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। তখনও নেহরু—লিয়াকৎ নামক বাঙালি উদ্বাস্তবলির চুক্তি হয় নি। পাকিস্তান সরকার হরিপদবাবুকে বহিষ্কৃত করলেন দেশ থেকে। সে-বারই তিনি বুঝে এলেন সাময়িক কোন ব্যবস্থা নয়, স্থায়ী কিছু করতে হবে।

জবর দখল তখন সহজ ব্যাপার ছিল। সে পথ এদের পছন্দ হলো না। ওরা বল্লেন—সব হারিয়েও বেঁচে যখন আছি তখন মানুষের মত বাঁচতে হবে। মানুষের শেষ সম্বল যে শ্রম শক্তি তাকেই তারা সম্বল করে নতুন এক কর্মযজ্ঞ সৃষ্টি করতে চাইলেন সকলের শক্তি সমান নয়—কিন্তু প্রয়োজন তখন সকলের এক। সুতরাং তারা সৃষ্টি করলেন সমবায় সমিতি। শ্রীহরিপদ বিশ্বাসের নেতৃত্বে গড়ে উঠল নিউ বারাকপুর কো অপারেটিভ কলোনি সোসাইটি লিমিটেড। ১৯৫০ সনের ১৪ই এপ্রিল সমিতিটি বিধিবদ্ধ হয়। ইতিমধ্যে খুলনা বারাকপুর থেকে আসা ৪০০ পরিবার পরিত্যক্ত বাঁশঝাড় থেকে বাঁশ আর হোগলা বিল নামক জলাভূমি থেকে হোগলা সংগ্রহ করে মাগুন্দ গ্রামের শঙ্করপুকুর পাড়ের আমবাগানে ঝুপড়ি তুলে নিয়েছেন। অনন্তকাল তো মানুষ স্ত্রী, পুত্র কন্যা নিয়ে খোলা আকাশের নিচেয় থাকতে পারে না।

হরিপদবাবুর কর্মস্থলে একটা সমবায় সমিতি ছিল—পোষ্ট এণ্ড টেলিগ্রাফ এ্যাকাউন্টস্ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড। ঐ সমিতি উদ্বাস্তু সেবার জন্য যে তহবিল গঠন করেন তার থেকে এই পরিবারগুলি সাহায্য পান। অন্যান্য ক্ষেত্র থেকেও কিছু কিছু সাহায্য সংগৃহীত হয়েছিল। কিন্তু এই অনিয়মিত সাহায্যের পর নির্ভর করে অতগুলো লোক বেশি দিন বাঁচতে পারে না। সরকারের অনুমতি নিয়ে এতদঞ্চলের পরিত্যক্ত জমিতে চাষ করার সুযোগ পেলেন অনেকে। খরচ দিলেন সরকার।

ইতিমধ্যে সমবায় সমিতি কিছু জমি কিনতে পেরেছেন।

পরিবার প্রতি পাঁচ কাঠার একটি প্লট নির্দিষ্ট হলো। সরকার প্রত্যেকটি পরিবারকে দুই কিস্তিতে বাড়ি করার জন্য ৫০০ টাকা ঋণ দিলেন। ঘরবাড়ি নির্মাণ, রাস্তাঘাট কিছু কিছু তৈরি এতে কিছু লোকের কাজ জুটলো। দেখতে দেখতে হাজার হাজার মানুষ এসে ভিড় জমাতে থাকলেন একটু আশ্রয় চাই। জমি সংগ্রহ করা সহজ কথা নয়। তার পর অনেক বিত্তশালী উদ্বাস্তু বহুগুণ বেশি দাম দিয়ে কলোনির মধ্যে পাঁচ দশ বিঘে জমি কিনে নানারূপ অসুবিধা সৃষ্টি করতে থাকেন। এরা একদিকে যেমন ধনবান অন্যদিকে তেমনি প্রভাবশালী। বহুদিন ধরে কলকাতায় আছেন, সরকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে বড় বড় চাকরি বা ব্যবসা বাণিজ্য করেন। সমিতি এদের নিকট দাবি করলেন কলোনি এলাকায় বাস করতে হলে সকলের সঙ্গে সমপ্রাণ হয়ে পাঁচ কাঠা জমি নিয়েই থাকতে হবে। আমাদের দেশের অধিকাংশ বিত্তবান ও ক্ষমতাধর মানুষের নিকট সজ্জন মানুষের ব্যবহার আশা করা বৃথা। এরা জোট বাঁধলেন স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে। মুসলমানদের জমি জমা এ অঞ্চলে বেশি। তারা স্বভাবতই অল্পবিস্তর উৎপীড়িত হচ্ছিলেন। কারো কারো গাছের ফল-পাকড়া, কিছু জ্বালানী কাঠ, দু'চারটা বাঁশ উদ্বাস্তরা জোর জুলুম করে যে কখনো নেয় নি, এমন নয়। এ গুলি স্বাভাবিক ঘটনা। এ টুকুও যাতে না ঘটে তার বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষ যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। তবু এদের নালিশের অন্ত ছিল না। টাকা ওয়ালা শরণার্থীদের সঙ্গে এরা জোট বেঁধে নানা মামলা মোকদ্দমা দাঙ্গা হাঙ্গামার সৃষ্টি করে। একটি বৃদ্ধ মুসলমান হাপানী কাশের রুগী মারা গেলেন। কিন্তু উদ্বাস্তু নেতা হরিপদ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে খুনের মামলা রুজু হলো। জনৈক বিত্তশালী উদ্বাস্তু পুরনো বন্ধুত্বের সূত্র ধরে

নিউ বারাকপুরের অন্যতম প্রধান কর্মী সুরেন্দ্র বিশ্বাসের বাড়িতে গেলেন, চা সন্দেশ খেলেন—এসে মামলা করে দিলেন—। খাদ্যে বিষ মিশিয়ে হত্যার ষড়যন্ত্রের দায়ে অভিযুক্ত হন সুরেনবাবু। এর চেয়েও তাজ্জব ব্যাপার ঘটেছিল। উদ্বাস্তুদের অবস্থানের জন্য মুসলমানরা আতঙ্কিত হচ্ছে ও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে—আর হরিপদবাবুর নেতৃত্বে এটা ঘটছে বলে দিল্লীতে অভিযোগ পেশ করা হলো। দাবি হরিপদবাবুকে চব্বিশ পরগণা থেকে বহিষ্কার করে দেওয়া হোক। কয়েকজন শুভানুধ্যায়ী অফিসার না থাকলে হরিপদবাবুর পক্ষে নির্বাসন দণ্ড এড়ানো সম্ভব হতো না। এই সব ঝামেলা কাটতে না কাটতে দেখা দিল রাজনৈতিক আন্দোলন। সে ইতিহাস যাক।

এমনি নানা বিরোধের সঙ্গে উদ্বাস্তুরা সাপ শেয়ালের সঙ্গেও মোকাবিলা করে ধীরে ধীরে গড়ে তুলেছেন শহর নববারাকপুর। গঠন কর্মের ইতিহাসে এবং সমবায় আন্দোলনের ক্ষেত্রে এ এক অক্ষয় কীর্তি। এখানে এখন পঞ্চাশ হাজার মানুষ বসবাস করেন। প্রাথমিক দুর্যোগ কাটিয়ে উঠে সমিতি যখন আপন শক্তি ও শ্রমের ফসলে সোজা হয়ে দাঁড়াতে সমর্থ হয়েছে তখন কিছু কিছু সরকারী সাহায্য অবশ্যই মিলেছিল। সরকারী নীতির ফলে সে সাহায্য কখনই পর্যাপ্ত ছিল না। তাই বস্তুতঃ সমিতির কর্মকর্তাদের সাংগঠনিক প্রতিভা ও সদস্যদের সমবেত উদ্যোগে নব-বারাকপুর আজ বে-সরকারী উদ্বাস্তু উপনিবেশের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থানের অধিকারী। স্বাধীনতা লাভের ফলে আমাদের মধ্যে যে উৎসাহ উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়েছিল তার ফলে জীবনের নানা ক্ষেত্র নব নব সৃষ্টির উৎসবে ভরে উঠেছে। পঁচিশ বছর আগের সমাজ ও জীবনের সঙ্গে আজকের অবস্থা তুলনা করলেই তা সহজেই বোঝা যায়। কিন্তু সরকার গঠন কর্মের উপর প্রয়োজনীয় গুরুত্ব দেন নি, অপরদিকে সমাজতন্ত্রের নামে সরকারী ক্ষমতা ও নিয়ন্ত্রণ জনজীবনের অবাঞ্ছিত গভীরে প্রবেশ করানো হয়েছে। এর ফলে মানুষের সহজাত উদ্যোগের উৎস শুকিয়ে গেছে। ছোট বড় সব মানুষ একান্তই সরকার নির্ভর হয়ে উঠেছেন। ফলে এখন আমরা নিজে কিছু করি না। কেবল বলি দিতে হবে, দিতে হবে। আমাদের দাবি মানতে হবে। নইলে গদী ছাড়তে হবে। এই অবস্থার মধ্যে বেসরকারী উদ্যোগে সমবায় পদ্ধতিতে পুনর্বাসন পেয়েছেন প্রায় ৬০০০ হাজার পরিবার। সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তিনটি কলেজ, তিনটি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ছয়টি উচ্চ বিদ্যালয়, তিনটি নিম্নমান উচ্চ বিদ্যালয়, পাঁচটি বুনিয়াদি বিদ্যালয় এবং উনিশটি প্রাথমিক বিদ্যালয় তিনটি কে, জি স্কুল। তিনটি কে জি স্কুল ও দুটি উচ্চ বিদ্যালয় ছাড়া আর সব ক'টি স্কুল কলেজ নিউ বারাকপুর কো-অপারেটিভ কলোনি কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সমিতির সদস্যগণ এ জন্য বিস্তর অর্থ সাহায্য করেছেন। বহু শিক্ষক গোড়ার দিকে নাম মাত্র বেতনে শিক্ষকতা করেছেন। এই কলোনিতে প্রথম স্কুলটি সুরু হয় গাছতলায়। স্থানীয় জনৈক মুসলমান ভদ্রলোক স্কুলের জন্য একটু জায়গা দেন। সেখানে ধীরে ধীরে একখানা টিনের চালাঘর তৈরি করা হয়। সেই সামান্য আরম্ভ থেকে সব ক'টি স্কুলের আজ প্রাসাদোপম একাধিক বাড়ি হয়েছে। তিনটি কলেজের দু'টি পরিচালনা করেন স্থানীয় শিক্ষা সমাজ এবং একটি স্পনসর্ড কলেজ। এই কলেজটির ব্যয়ভার সরকার বহন করেছেন। কিন্তু এর জন্য দুই লক্ষাধিক টাকা দামের বার বিঘা জমি সমবায় সমিতি সরকারকে দান করেছেন। যে দু'টি কলেজ নব বারাকপুর শিক্ষা সমাজ পরিচালনা করেন তার একটি শিক্ষক শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়। হুগলী জেলার খন্যান স্টেশনে দুটি শিশুর জীবন রক্ষা করতে গিয়ে ইটাচুনা বিজয়নারায়ণ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ গোপালচন্দ্র মজুমদার নিজের জীবন আহুতি দেন। তাঁর নামেই এখানকার এই শিক্ষক শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়।

কলোনিতে যে কালীবাড়ি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার বিগ্রহটিও খুলনা বারাকপুরের। আসবার সময় উদ্বাস্তুরা মাকে সঙ্গে করে আনেন। এ ছাড়া শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির, শিববাড়ি দুর্গাবাড়ি প্রভৃতি আরও কয়েকটি দেবস্থান নির্মিত হয়েছে।

কলোনি এলাকায় ২৮ মাইল কাচা পাকা পথ ও ড্রেন নির্মিত হয়েছে। অনেক পুকুর ও বিল খনন করে এবং নলকূপ বসিয়ে কর্তৃপক্ষ জলের ব্যবস্থা করেছেন। বর্তমানে সরকার পনের লক্ষ টাকা ব্যয়ে ট্যাপ ওয়াটার সরবরাহ পরিকল্পনার কাজে হাত দিয়েছেন।

কলোনির নিজস্ব হাসপাতাল, মাতৃসদন আছে। সেখানে এক্স-রে হয়। অ্যাম্বুলেন্স পাওয়া যায়। এই নগরীতে একাধিক বাজার স্থাপিত হয়েছে। মোট চারটি টেলিগ্রাফ অাপিস একটি পুলিশ ফাড়ির জন্য কলোনি কর্তৃপক্ষ বাড়ির ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। টেলিফোন ও বিজলি সরবরাহ করা হয়েছে। মধ্যমগ্রাম রেল স্টেশন থেকে আধ মাইলের মাথায় নববারাকপুরের জন্য নোতুন একটি রেল স্টেশনও উদ্বাস্তু কর্ম ক্ষমতা প্রমাণ করছে। প্রথমে চার শ কৃষিজাতী পরিবারকে নিয়ে এই নব বারাকপুরের পত্তন হয়েছিল। তারা প্রত্যেকেই দুই বিঘা করে চাষের জমি পেয়েছেন।

এক দল নিঃস্বার্থ দেশপ্রেমী মানুষের শ্রমের সঙ্গে সরকারী সাহায্য যুক্ত হয়েছিল বলেই জঙ্গল আর জলা ভূমির বুকে সবহারা উদ্বাস্তুদের দ্বারা একটি পৌরসভা স্থাপন করা সম্ভব হয়েছে। সরকারী সাহায্য মানে কেবল অর্থ সাহায্য নয়। প্রশাসনিক পৃষ্ঠপোষকতার ফলে নানা ক্ষতিকর প্রতিবন্ধকতা সহজেই প্রতিহত হয়। নিউ বারাকপুর এই সাহায্যটি থেকে কখন বঞ্চিত হয় নি। স্বাধীনদেশের সরকার ও জনসাধারণের উদ্যোগের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া ও নির্ভরতা থাকা অবশ্য প্রয়োজন। নব-বারাকপুরে সেটার কখন অভাব হয় নি। তাই তো উদ্বাস্তু কলোনিগুলির মধ্যে নব-বারাকপুর প্রথম পৌরসভা গঠনের গৌরবলাভ করেছে আর সে গৌরব তারা নিশ্চিত শ্রমের মূল্যে অর্জন করেছেন। নববারাকপুর পৌরসভার প্রথম চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান হয়েছিলেন যথাক্রমে নববারাকপুর কলোনির প্রতিষ্ঠাতা প্রতিষ্ঠান নিউ বারাকপুর কো-অপ কলোনি সোসাইটি (পরিবর্তিত নাম নিউ বারাকপুর কো-অপারেটিভ হোমস) লিমিটেডের সভাপতি শ্রীহরিপদ বিশ্বাস ও সহকারী সভাপতি শ্রীসুধীরচন্দ্র সান্যাল। এর একটা ব্যঞ্জনা হলো—পৌরসভা সমবায় সমিতির অনুক্রম।

স্বাধীনতার রজত জয়ন্তীর প্রভাতে দাঁড়িয়ে ফেলে আসা দিনগুলির দিকে ফিরে তাকালে আমি আশান্বিত হই। সমাজের দুর্বলতম অংশ হলেন উদ্বাস্তু। বহু ক্ষেত্রে তাদের দুঃখ দুর্দশা এখনো অতলস্পর্শী। সরকারী ত্রুটি বিচ্যুতি সে জন্য নিশ্চয়ই দায়ী। কিন্তু নিউ বারাকপুর দেখে আমার মনে হয়েছে উপযুক্ত নেতৃত্ব এবং কর্মোদ্যোগ থাকলে সহস্র বাধা বিপত্তির মধ্যেও মানুষ আত্মপ্রতিষ্ঠিত হয়ে, মানুষের মতো বাঁচতে পারে। শ্রীহরিপদ বিশ্বাস ও তাঁর অগণিত সহকর্মীদের আমি স্বাধীনতার রজত জয়ন্তী বর্ষের পুণ্যলগ্নে স্মরণ করি। গান্ধীজি প্রবর্তিত গঠন কর্মের একটি উজ্জল নিদর্শন নব বারাকপুর। নববারাকপুরের জয় হোক।

ভারতের বিপ্লব আন্দোলন ও সন্ত্রাসবাদের ভূমিকা

সন্তোষকুমার অধিকারী

কাকোরী ডাকাতির সঙ্গে বাঙলার বিপ্লবীদলের যোগাযোগ সম্পর্কে পুলিশ নোটের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ নীচে দিলাম।

"১৯১৯ সালে শাসনসংস্কার আইনের ধারায় সরকারী সদিচ্ছার প্রতীক হিসেবে কিছু রাজনৈতিক বন্দীকে মুক্তি দেওয়া হয়। এর কিছু পরেই একটি নতুন বিপ্লবী-দলের সৃষ্টির সম্ভাবনা দেখা দিল। অসহযোগ আন্দোলনের প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অহিংস সংগঠনের আড়ালে নেতারা প্রদেশে প্রদেশে ঘুরে ঘুরে তাঁদের পুরনো সহকর্মীদের সঙ্গে আলাপ আলোচনার সুযোগ পেলেন।

"১৯২১-২২ সালের বিভিন্ন সময়ে যে সংবাদ পাওয়া গেছে তাতে দেখা যায় যে, বিপিন গাঙ্গুলী, ভূপেন দত্ত, জ্যোতিষ ঘোষ ও শচীন সান্যাল আন্তঃপ্রাদেশিক সংগঠনের জন্য চেষ্টা করেছেন।

"১৯২৩ সালের সংবাদে জানা গেছে যে ভূপেন দত্ত বেনারসে এসে উমানাথ চক্রবর্তী ও শচীন সান্যালের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। এই সংবাদে আরও দেখা যায় যে, ভূপেন দত্ত জীবন চ্যাটার্জীকে একটি চিঠি লিখে-ছিলেন। সে চিঠিতে তিনি সংগঠনের জন্য বেনারস হিন্দু ইউনিভারসিটি থেকে বেশ কিছু ছেলে সংগ্রহ করা গেছে বলে উল্লেখ করেছেন।

"রাসবিহারী বসুর সুযোগ্য সহকর্মী শচীন সান্যাল আন্দামান থেকে ফিরে এসে নদীয়া জেলার শান্তিপুরে বিবাহ করেন। তাঁর ছোট ভাইও হুগলীর শ্রীরামপুরে বিবাহ করেছিলেন। এই নতুন বৈবাহিক সম্পর্কের সুযোগে শচীন পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াবার সুযোগ পেয়েছিলেন। মুক্তি পাওয়ার পর শচীন তাঁর পুরনো কর্মধারাকেই অনুসরণ করেন, এবং উত্তর প্রদেশে বিপ্লব আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। শচীন বেনারসের বাসিন্দা। তাই বেনারসে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে কাজ চালানো তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। কাজেই ১৯২৪ সালে সে বাংলাদেশে চলে আসে এবং অনুশীলন সমিতির পশ্চিম বঙ্গ সংগঠনের নেতৃত্ব গ্রহণ করে।

"শচীন চলে আসায় বাংলা থেকে যোগেশ চ্যাটার্জীকে পাঠানো হয় উত্তর প্রদেশের সংগঠনের তদারকির জন্য। ১৯২৪-এর আগষ্ট মাসে যোগেশ সাজাহানপুরে গিয়ে রামপ্রসাদের সঙ্গে দেখা করে। রামপ্রসাদ ও বানারসী (রাজসাক্ষী) অন্যান্যদের সঙ্গে কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলায় বিচারাধীন আসামী।

"রামপ্রসাদ বানারসীর কাছে স্বীকার করেছেন যে শচীন্দ্র তাঁর গুরু। আরও প্রমাণ পাওয়া গেছে যে যোগেশ এলাহাবাদে 'বন্দীজীবন' বিক্রী করেছে। 'বন্দীজীবন' শচীনের প্রকাশিত উত্তেজনামূলক গ্রন্থ। যোগেশ উত্তরপ্রদেশের বিভিন্ন জেলায় এইচ আর এ নামক বৈপ্লবিক সংগঠনের কাজ করেছিল। পন্দিচেরী থেকে ফেরার সময় কলকাতায় যোগেশকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তারের সময় তার কাছে যে সব কাগজপত্র

পাওয়া গেছে তার থেকে জানা যায় যে সে উত্তর প্রদেশে অত্যন্ত গর্হিত কাজে নিযুক্ত ছিল।

"২৫. ২. ২৫. তারিখে শচীনকে কলকাতার একটি ঘর থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। একই সঙ্গে সেই ঘরের মধ্যে আরও তিনটি ছেলেকে ধরা হয়। তাদের নাম: সুশীল ব্যানার্জী, কালীশঙ্কর গাঙ্গুলী ও মধুসূদন সান্যাল। ঘরের মধ্যে আপত্তিজনক পুস্তিকা 'দি রেভোলিউশনারি'র কয়েকটি সংখ্যা পাওয়া যায়। এই ঘরটি শচীনের জন্যে ভাড়া করেছিল বিভূতি চক্রবর্তী; তার কাছেও ঐ ধরণের কাগজ পাওয়া গিয়েছিল। এর থেকে প্রমাণ হয় যে, যুবকগুলি শচীনের দলের লোক। ইংরেজীতে লেখা এই আপত্তিকর ইস্তাহার ও আর একটি বাংলা পুস্তিকা 'দেশবাসীর প্রতি নিবেদন' শচীনেরই সৃষ্টি। 'দি রেভোলিউশনারি' বাংলা ও উত্তর প্রদেশে ও সঙ্গে সঙ্গে ভারতের বাইরেও প্রচার করা হয়েছিল। বাংলায় লেখা কাগজগুলি বাংলাতেই ছড়ানো হয়েছিল। এই ধরণের কিছু কাগজপত্র কাকোরী মামলার কয়েকজন আসামীর কাছেও পাওয়া গেছে। 'দি রেভোলিউশনারি' পুস্তিকা প্রচারের জন্য বাংলাতে শচীন দণ্ডিত হয়।

"শচীন গ্রেপ্তার হওয়ার পরে নরেন সেন সুরুলের (বীরভূম) ঠাকুর কৃষি কলেজের মনমোহন ঘোষকে লক্ষ্ণৌতে একটা গোপন সভায় পাঠান। এই সভায় রামপ্রসাদও উপস্থিত ছিলেন। মনমোহন উত্তরপ্রদেশের সংবাদাদি নিয়ে ফিরে যান এবং জানান যে রামপ্রসাদ সংগঠনের অর্থসংগ্রহের জন্য ডাকাতি করতেও প্রস্তুত।...

"বাংলাদেশে শচীনের দুজন সহযোগী রয়েছে—তাদের নাম রবীন ও গোরা। এও জানা গেছে যে শচীন ধরা পড়ার পর তার সহযোগীরা শচীনের ভাই জিতেনকে চিঠিপত্রের জন্য দুটি ঠিকানা দেয়। এর মধ্যে একটি ভবানীপুরে ৪৮ নম্বর শাঁখারীপাড়া রোডের কে সি গুহর ঠিকানা। এই ঠিকানায় কতকগুলি চিঠিতে গুরুত্বপূর্ণ খবর পাওয়া গেছে; জানা গেছে যে, রবীন হচ্ছে আসলে যতীন্দ্রনাথ দাস। কে সি গুহ যতীনের কাকা অমরেন্দ্রনাথ দাসের অধীনস্থ এক কন্ট্রাকটর। এই কে সি গুহর ভাইপো প্রবোধ গুহই চিঠিপত্রের (Post Box) তদারকি করত। চিঠিগুলি কাশীর দশাশ্বমেধ ঘাট থেকে পোষ্ট করা। স্বাক্ষর করেছে কে এক নিতাই।

"কাকোরী মামলার অন্যতম সাক্ষী ইন্দুভূষণ মিত্র রামপ্রসাদের চিঠির পোষ্টবক্স ছিল। এই দুজনের কাছে আসা চিঠিগুলি পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে একই লোকের কাছে থেকেই সব চিঠি এসেছে। আর নিতাই অন্য কেউ নয়—রাজেন লাহিড়ী নিজে—যাকে দক্ষিণেশ্বর বোমার মামলায় দণ্ড দেওয়া হয়েছে এবং কাকোরী মামলায় আনা হয়েছে।

"দক্ষিণেশ্বর বোমার কারখানা ধরা পড়ার পরই যতীন দাস আত্মগোপন করে। সেপ্টেম্বর মাসে মীরাটের এক গোপন সভায় সে হাজির ছিল। এই সভাতে রামপ্রসাদ বিসমিলও ছিল। ওপরে উল্লিখিত চিঠিগুলিতে এক কালীবাবুর নাম আছে যাকে শাড়ি ও বইপত্র নিয়ে আসতে বলা হয়েছে।

"গত সেপ্টেম্বর মাসে রবীন (ওরফে যতীন) ইউরোপীয় পোশাকে অস্ত্র নিয়ে আসে এবং সেই অস্ত্রই কাকোরী ডাকাতিতে ব্যবহার করা হয়। সংগঠনের কাজের জন্যে রামপ্রসাদ রবীনকে পাঁচশো টাকা দেয়।

... ...

"১৯২৩ সালে দিল্লী কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে বিভিন্ন প্রদেশের নেতারা মিলিত হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন বিপিন গাঙ্গুলী, শচীন সান্যাল ও রামপ্রসাদ বিসমিল। হিংসাত্মক কর্মসূচী, অস্ত্রসংগ্রহ ও আত্মগোপনকারীদের লুকিয়ে রাখা ইত্যাদি ব্যাপারে তাঁরা আলোচনা করেন। রামপ্রসাদের স্বীকারোক্তি থেকেও জানা যায় যে, হিংসাত্মক পথ গ্রহণের প্রস্তাব প্রথমে সেখানেই নেওয়া হয়। এই প্রস্তাবকে কাজে রূপ দেন শচীন সান্যাল; উত্তর প্রদেশের সংগঠনের ভার দেওয়া হয় যোগেশ চ্যাটার্জীকে।"

১৯২৬ সালের ৪ঠা জানুয়ারি তারিখে কাকোরি মামলার আরম্ভ। মোট একুশজন ব্যক্তির বিরুদ্ধে

অভিযোগ দায়ের করা হয়। মামলার অন্যান্য কাগজ-পত্রের সঙ্গে হিন্দুস্থান রিপাবলিক্যান এ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠা পত্র ও নিয়মাবলী এবং শচীন্দ্রনাথ সান্যালের লেখা 'দি রেভোলিউশনরি' পুস্তিকাটিও প্রদর্শিত হয়। ১লা জানুয়ারি তারিখের 'রেভোলিউশনরি' থেকে একটি অনুচ্ছেদ নীচে তুলে দিচ্ছি।

"Young Indian, shake off illusion, face realities with a stout heart, and do not avoid struggles, difficulties and sacrifices. The inevitable is to come. Do not be misguided any more. Peace and tranquility you cannot have and India's liberty can never be achieved through peaceful and legal means."

সেসন জজ মিঃ হ্যামিলটন এই মামলার রায়ে উল্লেখ করেন, "অভিযুক্তদের মধ্যে দশজনই বাঙালী।" এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন যে, দক্ষিণেশ্বরে রাজেন লাহিড়ীকে ধরা হয়। এই লাহিড়ীই ১৯২৫ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখের মীরাট মিটিং-এ উপস্থিত ছিলেন। লাহিড়ী যাঁদের কাছে নিয়মিত চিঠি লিখতেন, তাঁদের একজনের নাম কালীবাবু আর একজনের কামিনী কাকা। আসলে কিন্তু এই কালীবাবু ও কামিনী কাকা একই লোকের দুটি গোপন দলীয় নাম। এবং সে লোকটি হলেন যতীন্দ্রনাথ দাস।

কাকোরী মামলায় যাঁদের শাস্তি দেওয়া হয়, তাঁদের মধ্যে ছিলেন—

রামপ্রসাদ বিসমিল—ফাঁসি হয়
রোশন সিং — ,, ,,
আসফাক উল্লা — ,, ,,
রাজেন লাহিড়ী — ,, ,,

শচীন্দ্রনাথ সান্যাল, যোগেশ চ্যাটার্জী, শচীন্দ্রনাথ বক্সী, গোবিন্দচরণ কর প্রমুখের হয় যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। অন্যতম আসামী চন্দ্রশেখর আজাদকে পুলিশ ধরতে পারেনি। আর যতীন্দ্রনাথ দাসের বিরুদ্ধে কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ না থাকায় তাঁকে বেঙ্গল অর্ডিন্যান্সের আওতায় ফেলে আটক করা হয়।

ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের ইতিহাসে একটি উল্লেখ-যোগ্য দুর্ঘটনা হ'ল ১৯২৫ সালের জুন মাসে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের আকস্মিক মৃত্যু। দেশবন্ধুর প্রয়াণের সঙ্গে সঙ্গেই যেন দেশ জুড়ে সাম্প্রদায়িকতার ঢেউ জেগে উঠ্‌ল। কংগ্রেসের মধ্যেও নেতৃত্বের বিরোধ দেখা দিল। ১৯২৬ সালের মে মাসে কলকাতায় সাম্প্রদায়িক সংঘাত এক মর্মান্তিক ঘটনা। ১৯২৭ সালের মার্চ মাসে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় স্বরাজিষ্টদের হাতে মন্ত্রীসভার পতন ঘটল। ইতিপূর্বে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় শাসন সংস্কার সংক্রান্ত বিলের বিতর্ক চলার সময়ে পণ্ডিত মতিলাল নেহরু রাউণ্ড টেবল কনফারেন্স-এর যে প্রস্তাব এনেছিলেন, সরকার সেটি অগ্রাহ্য করে।

যে ঘটনাকে কেন্দ্র করে সমস্ত দেশ উত্তেজনায় মুখর হ'য়ে উঠ্‌ল, তা হল 'সাইমন কমিশন' গঠনের সংবাদ ১৯২৭ সালের ১০ই নভেম্বর তারিখে বড়লাট আরউইনই এ কমিশন গঠনের সংবাদ ঘোষণা করলেন।

এই কমিশনের কাজ হ'ল শাসনতন্ত্র সংশোধনের ব্যাপারে সরকারকে পরামর্শ দেওয়া। কমিশনে জাতীয় কংগ্রেসের কাউকে এমন কি কোন ভারতীয়কেই গ্রহণ করা হ'ল না। কমিশনের সভ্যদের মধ্যে ছিলেন: স্তর জন সাইমন (সভাপতি) বার্ণহাম, ষ্ট্রাথকোনা, এডওয়ার্ড কেডোগান, ষ্টিফেন ওয়ালস্, ক্লিমেণ্ট এ্যাট্‌লি ও লেন ফক্স্।

এই কমিশনকে বর্জন করা এবং এর সঙ্গে অসহ-যোগিতা করার সিদ্ধান্তও গ্রহণ করা হল।

১৯২৭ সালের ডিসেম্বর অধিবেশনে (মাদ্রাজে) জাতীয় কংগ্রেস পূর্ণ স্বাধীনতাই আমাদের লক্ষ্য—এ কথা ঘোষণা করা হ'ল। ১৯২৮ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারি এই কমিশন কলকাতা এলে বঙ্গীয় কংগ্রেস কমিটির নির্দেশে কলকাতায় পূর্ণ হরতাল পালিত হয়। ৩০শে অক্টোবর তারিখে কমিশন লাহোরে এসে উপস্থিত হ'ল।

লাহোরে তখন বৃদ্ধ জাতীয়নেতা লালা লাজপত রায়ের একাধিপত্য। লাহোরে তখন প্রথম সূর্যের মত বিকাশ ঘটছে তরুণ বিপ্লবীনেতা সর্দার ভগৎ সিং-এর।

ভগৎ সিং ছিলেন শচীন্দ্রনাথ সান্যালের অনুগত। ১৯২৪ সালে যখন তাঁর বয়স মাত্র সতেরো, তখনই তাঁর শিক্ষক জয়চাঁদ বিদ্যালঙ্কার তাঁকে বিপ্লবের মন্ত্রে দীক্ষা দেন। তাঁর এই শিক্ষকের মাধ্যমেই তিনি শচীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচিত হ'লেন এবং তাঁর নির্দেশে হিন্দুস্থান রিপাবলিকান এ্যাসোসিয়েশনের সভ্য হিসেবে কানপুরে এসে উঠলেন। কানপুরে তখন এইচ আর এ'র কর্ণধার যোগেশ চ্যাটার্জী।

কানপুরেই তিনি বিপ্লবীসংস্থা 'নবজীবন ভারত সভার' প্রতিষ্ঠা করলেন। ১৯২৭ সালে যখন কাকোরী মামলার আসামীদের বিচার শেষ হ'ল তখন ভগৎ সিং গোপনে কোর্টের রায় শুনতে যেতেন। তাঁর চোখের সামনে ফাঁসীতে প্রাণ দিলেন, রামপ্রসাদ বিসমিল, রাজেন লাহিড়ী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। শচীন্দ্রনাথের হ'ল দ্বীপান্তর। ব্রিটিশ সরকার বোধহয় ভাবলেন, এই সর্বভারতীয় বিপ্লবীদলের এখানেই শেষ।

কিন্তু পলাতক বিপ্লবী চন্দ্রশেখর আজাদ ও তরুণ নায়ক ভগৎ সিং সক্রিয় হ'লেন এইচ আর এ কে পুনর্গঠিত করতে। তাঁদের সঙ্গে যোগ দিলেন ভগবতীচরণ ভোরা, রাজগুরু যশপাল, বিজয় কুমার সিংহ, শুকদেব, শিববর্মা প্রমুখ বিপ্লবীরা। ১৯২৮ সালের ৮ই ও ৯ই সেপ্টেম্বর তারিখে দিল্লীর ফিরোজ শা কোটলাতে পার্টির গোপন অধিবেশন বসল। এই অধিবেশনে পার্টির নাম 'হিন্দুস্থান রিপাবলিকান এ্যাসোসিয়েশন' বদলে 'হিন্দুস্থান সোস্যালিষ্ট রিপাবলিকান আর্মি' রাখার প্রস্তাব গৃহীত হয়। পার্টির মূল কেন্দ্র হ'ল লাহোর।

সোস্যালিষ্ট কথাটি যুক্ত হওয়ার মূলে যে কম্যুনিষ্ট ভাবধারার প্রভাব এ'কথা সমসাময়িক কম্যুনিষ্ট পন্থী বিপ্লবী সওকৎ ওসমানি তাঁর বিভিন্ন প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন।

৩০শে অক্টোবর তারিখে লাহোরে সাইমন কমিশন এসে পৌঁছল। লালা লাজপত রায়ের নেতৃত্বে সেদিন এক বিরাট শোভাযাত্রা ষ্টেশন অবরোধ করে ধ্বনি তুলল—সাইমন ফিরে যাও। গো ব্যাক সাইমন। পাঞ্জাব পুলিশের সাধ্য হ'ল না সেই মিছিল নিয়ন্ত্রণ করার।

সে সময়ে পাঞ্জাবে পুলিশ প্রধান ছিলেন স্কট নামের এক দুর্বিনীত ইংরেজ। স্কট তার সহকারী স্যাণ্ডার্স'কে নিয়ে চেষ্টা করছিল কমিশনের সভ্যদের জন্যে পথ করে দিতে। একসময়ে স্কট যখন বুঝল যে লালাজীকে না সরালে মিছিল ভাঙ্গা যাবে না, সে হুকুম দিল লাঠি চার্জ করতে। স্কটের সহচর ডি এস পি সণ্ডার্স নিজেই এগিয়ে এলো। লালাজীর চারপাশের তরুণদের ব্যূহভেদ করে সে লালা লাজপত রায়ের মাথায় ও বুকের ওপরে লাঠি চালাল। রক্তারক্তির সূত্রপাত দেখে আহত লালাজী মিছিল ভেঙ্গে দিতে নির্দেশ দিলেন।

সেদিন সন্ধ্যেতেই লাহোরে এক বিরাট জনসভায় পুলিশি অত্যাচারের তীব্র নিন্দা করা হল। দুর্ভাগ্যক্রমে লালা লাজপত রায়ের ওপর লাঠির আঘাতের ফল মারাত্মক হ'ল। ১৭ই নভেম্বর তারিখে তাঁর জীবনান্ত ঘটল।

লালাজীর নশ্বর দেহ বহন করে লক্ষ লক্ষ লোক সেদিন নদীতীরে সমবেত হল। সর্বজনমান্য বয়স্ক নেতার এই শোচনীয় মৃত্যু পাঞ্জাবের জনমনকে অভিভূত করেছিল। হিন্দুস্থান সোস্যালিষ্ট রিপাবলিকান আর্মির তরুণ সভ্যরা—সর্দার ভগৎ সিং, চন্দ্রশেখর আজাদ ও তাঁদের অনুগত তরুণ পাঞ্জাবী বিপ্লবীরা সারারাত জলন্ত চিতার দিকে চেয়ে বসে রইল। তাদের মনে শুধু চিন্তা যে পরাধীন দেশেই এমনটা সম্ভব। যেখানে পুলিশ বেপরোয়া অত্যাচারী। যেখানে মানুষের সম্ভ্রম নেই, অধিকার নেই; অসহায়ের ওপর অত্যাচারের কোন প্রতিকার নেই। আগুনের জলন্ত শিখার দিকে চেয়ে তারা শপথ নিলো, এর শোধ নেবেই।

লাহোরের মাচাং নামক স্থানে চন্দ্রশেখর আজাদের নেতৃত্বে একটি গোপন সভায় এইচ এস আর এ'র সভ্যরা স্থির করল লালাজীর হত্যাকারী স্কট ও স্যাণ্ডার্স'কে

হত্যা করে এর শোধ তুলতে হবে। দিন স্থির হ'ল ১৭ই ডিসেম্বর; এবং কাজ সম্পাদনার ভার পড়ল সর্দার ভগৎ সিং ও রাজগুরুর ওপর।

১৭ই ডিসেম্বর। নির্দিষ্ট দিনে চন্দ্রশেখর আজাদ ভগৎ সিং, শুকদেব, রাজগুরু ও জয়গোপাল একত্রে মিলিত হ'লেন। জয়গোপালের ওপর ভার পড়ল পুলিশ অফিসারদের গতিবিধির দিকে দৃষ্টি রাখার। ভগৎ সিং ও রাজগুরু দুজনেই একটি করে অটোমেটিক রিভলভার সঙ্গে নিলেন। আজাদের কাছে ছিল মাউজার পিস্তল। স্থির হ'ল রাজগুরুই প্রথম গুলি করবে। তাকে সাহায্য করবে ভগৎ সিং।

নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট সময়ে পরিকল্পনামত দয়ানন্দ বৈদিক মহাবিদ্যালয়ের সামনে প্রকাশ্য দিবালোকে রাজগুরু ও ভগৎ সিং সণ্ডার্স ও তার সহকারী পুলিশ কনষ্টেবল চন্দন সিংকে গুলি করে হত্যা করলেন। এবং কাজ শেষ হ'লে নিঃশব্দে গা ঢাকা দিলেন।

পুলিশ প্রথমটা হকচকিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তারপরেই গোটা লাহোর শহরটা তারা তোলপাড় করে তুলল। লাহোরে আত্মগোপন করে থাকা অসম্ভব বুঝে দলের সভ্যরা বাইরে চলে গেলেন। পুলিশ রেল-ষ্টেশন, এমনকি রেলের কামরাগুলিতেও তল্লাসী চালিয়েছিল। ভগৎ সিং দাড়ি গোঁফ কামিয়ে ইউরোপীয় পোশাকে সস্ত্রীক এসে একটি কামরায় উঠলেন কিন্তু ভগৎ সিং ত বিবাহিত নন। তাঁর সহকর্মী ভগবতী চরণ ভোরার স্ত্রী দুর্গা দেবী স্ত্রীর ভূমিকা নিলেন। তাঁরই সহায়তায় ভগৎ সিং কলকাতায় পাড়ি দিলেন।

সণ্ডার্স'কে হত্যা করার কারণ দেখানোর প্রয়োজন আছে জেনে হিন্দুস্থান সোস্যালিষ্ট রিপাবলিক্যান আর্মির সভ্যেরা লাহোরের পথে পথে ইস্তাহার ছড়িয়ে দিয়েছিল। সেই ইস্তাহারে বলা হয়েছিল, লালা লাজপত রায়কে যারা খুন করেছে তাদের ওপর শোধ নেওয়ার প্রথম পদক্ষেপ এটি। ইস্তাহার ঘোষণা করল।

Beware Bureaucracy

The killing of J. P. Saunders was only to avenge the murder of Lala Lajpat Rai......... We are sorry that we had to shed blood on the altar of Revolution, which will end all exploitation of man in the hands of man.

পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে চন্দ্রশেখর আজাদও পালালেন তীর্থযাত্রীর দলের সঙ্গে। পুলিশ তাঁকে কখনও ধরতে পারে নি। ১৯৩১ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারী এলাহাবাদের আলফ্রেড পার্কে পুলিশের মুখোমুখী পড়ে যান আজাদ। কিন্তু তখনও ধরা দেন নি। আহত অবস্থায় নিজের পিস্তলের গুলিতেই মৃত্যু বরণ করেন।

* Jogesh Chatterjee—In Search of Freedom. Page 367.

ভারতের প্রথম যুদ্ধ-সাংবাদিক

সুধীন্দ্রলাল রায়

যুদ্ধ হইলেই যুদ্ধের সংবাদ জানিবার ঔৎসুক্য হয়। পুরাকালে রাজায় রাজায় যুদ্ধ হইত, সাধারণ জনগণ থাকিত নির্লিপ্ত। সুতরাং যুদ্ধক্ষেত্রে স্বয়ং উপস্থিত থাকিতে সক্ষম না হইলে রাজা সংবাদ জানিতে আগ্রহশীল হইতেন। তখন যুদ্ধক্ষেত্রে বিশেষ সংবাদদাতা পাঠাইতে হইত। রিপোর্টার বা সংবাদদাতার পেশা বেশ প্রাচীন। আজ যেমন, তখনও বিচক্ষণ, সাহসী, অক্লান্তকর্ম্মী ব্যক্তিই এ কাজের জন্য নির্বাচিত হইতেন।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে প্রাচীনতম যুদ্ধ হইল কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ, যাহার লিখিত বর্ণনা আমরা মহাভারত গ্রন্থে লিপিবদ্ধ পাইতেছি। এই বিরাট গ্রন্থের যে অংশে অষ্টাদশ দিনের যুদ্ধ বর্ণিত আছে তাহার প্রায় অধিকাংশ ধৃতরাষ্ট্র রাজার স্পেশাল ওয়ার করেসপণ্ডেন্ট সঞ্জয়ের বর্ণনা।

কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধের প্রস্তুতি যখন দুই পক্ষেরই সম্পূর্ণ, কুরুক্ষেত্রের মহতী প্রাঙ্গনে যখন উভয় পক্ষেরই সৈন্য সমাবেশ হইয়াছে, তখন হস্তিনাপুরে অন্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্র বড়ই উন্মনা হইয়া পড়িলেন। স্বয়ং বৃদ্ধ ও অন্ধ, যুদ্ধে অংশ গ্রহণে অসমর্থ, সুতরাং যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিয়াও লাভ নাই। প্রতিদিনের যুদ্ধের গতি জানিবার বাসনা তাঁহার প্রবল হইল।

ভীষ্মপর্ব্বের দ্বিতীয় অধ্যায়ে মহাভারতের সম্পাদক মহাশয় (ব্যাস) স্বয়ং ধৃতরাষ্ট্রের নিকট উপস্থিত হইলেন। তখনও যুদ্ধ আরম্ভ হয় নাই। ব্যাস ঠাকুর ধৃতরাষ্ট্রের মনের কথা জানিতে পারিয়া বলিলেন, "দিব্য চক্ষু দিয়ে দিচ্ছি, নিজেই যুদ্ধ প্রত্যক্ষ কর।" ধৃতরাষ্ট্র আপত্তি করিলেন, "আমি নিজের চোখে জ্ঞাতিবধ দেখতে চাই না। আপনার তেজেই আমি যুদ্ধের খবর শুনতে চাই।" তখন বেদব্যাস সঞ্জয়কে ধৃতরাষ্ট্র সমীপে আনিয়া তাহাকে বরদান করিয়া বলিলেন—"এই সঞ্জয় তোমার নিকট যুদ্ধবৃত্তান্ত বর্ণনা করিবেন। ইনি কি দিবা কি রাত্রি, কি প্রকাশ বা কি অপ্রকাশ সকল বিষয়ই জানিতে পারিবেন এবং অন্যে যাহা মনে মনে কল্পনা করিবে তাহাও অবগত হইবেন। ইহার শরীরে শস্ত্রস্পর্শ হইবে না, এবং ইনি পরিশ্রমেও শ্রান্ত বা ক্লান্ত হইবেন না।"

আসল কথা সেই দিনেও যুদ্ধ সাংবাদিক ছিলেন অবধ্য (সুতরাং শস্ত্র স্পর্শ হইবে না) এবং আধুনিক সাংবাদিকের মতই কঠোর পরিশ্রমী হইতেন। বুঝা যাইতেছে সঞ্জয় ছিলেন একজন দক্ষ সুশিক্ষিত এবং সুপরিচিত সাংবাদিক।

ভীষ্মপর্ব্ব হইতে আরম্ভ করিয়া যুদ্ধের যে বর্ণনা "সঞ্জয় উবাচ" বলিয়া আছে তাহার সবটাই সঞ্জয় স্বয়ং যাহা দেখিয়াছেন, ধৃতরাষ্ট্রের নিকট আসিয়া তাহারই বর্ণনা দিতেন।

এখানে আর একটি বিষয়ের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। উপরে উদ্ধৃত বেদব্যাসের সঞ্জয়কে বরদান করিয়া ধৃতরাষ্ট্রের সহিত সঞ্জয়কে পরিচয় করাইয়া দেওয়ার কাহিনীটি যিনি মহাভারতে ঢুকাইয়াছেন, তিনি উদ্যোগ পর্বটি পড়েন নাই। পড়িয়া থাকিলে জানিতে পারিতেন যে সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রের নিকট

আদৌ অপরিচিত ছিলেন না। বরং বলা যায় যে সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রের ডিপ্লোম্যাটিক দপ্তরের একজন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী ছিলেন। কেননা, উদ্যোগপর্বে দেখি, কুটিল ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে গোপন দূত হিসাবে যুধিষ্ঠিরের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। যুধিষ্ঠির যাতে যুদ্ধ না করেন সে জন্য সঞ্জয় অনেক কূটতর্ক যুধিষ্ঠিরের নিকট পেশ করেন। আদি মহাভারতের রচয়িতা যুধিষ্ঠিরকে যুদ্ধে অটল রাখিয়া, সঞ্জয়ের দৌত্য ও ধৃতরাষ্ট্রের চক্রান্ত বিফল করিয়াছেন। সুতরাং মনে হয় বেদব্যাস কর্ত্তৃক সঞ্জয়কে ধৃতরাষ্ট্রের কাছে হাজির করিয়া যুদ্ধ বর্ণনার জন্য বর দেওয়ার কাহিনী পরে প্রক্ষিপ্ত।

এখানে হস্তিনাপুর ও কুরুক্ষেত্রের ভৌগোলিক অবস্থানের প্রশ্ন আসিয়া পড়ে। সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রের নিকট দিনের যুদ্ধ বর্ণনা রাতে করিতেন এবং সকাল হইলেই যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরিয়া যাইতেন। তখন অশ্বপৃষ্ঠে বা অশ্ব-চালিত রথে (একায়) যাতায়াত হইত। সুতরাং হস্তিনা-পুর কুরুক্ষেত্র হইতে ৪।৫ মাইলের অধিক দূরে অবস্থিত ছিল বলিয়া মনে হয় না। ইহার অকাট্য প্রমাণ দ্রোণপর্বে জয়দ্রথ বধ পর্বাধ্যায়ে রহিয়াছে। ইহার দ্বিতীয় প্যারাগ্রাফে দেখি ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে বলিতেছেন—"আজি আর আনন্দধ্বনি আমার শ্রবণ গোচর হইতেছে না। জয়দ্রথের ভবনে (অর্থাৎ ক্যাম্প ভবনে) যে সকল মনোহর শ্রুতিমধুর ধ্বনি হইত (অর্থাৎ রাতে নাচগান হইত) আজি তাহা তিরোহিত হইয়াছে। আজি আমার পুত্রগণের শিবির হইতে সুত ও মাগধগণের স্তুতিবাদ এবং নর্তকগণের শব্দ আমার শ্রবণ বিবরে প্রবেশ করিতেছে না। কৌরবদের যে বীরনাদ আমার কর্ণকুহর নিরন্তর নিনাদিত হইত, আজি তাহা দীনভাবাপন্ন হওয়াতে সেই শব্দ শ্রুতিগোচর হইতেছে না।"

ঘরে বসিয়া ধৃতরাষ্ট্র যখন যুদ্ধক্ষেত্রের আওয়াজ শুনিতেন, তখন হস্তিনাপুর যে কুরুক্ষেত্রের খুব নিকটে ছিল, ইহা ধরিয়া লইতে হয়। এদেশের ঐতিহাসিকরা নাম সাদৃশ্য দেখিয়া মীরাট জেলার গঙ্গা তীরবর্ত্তী এক গ্রামকে হস্তিনাপুর বলিয়া নির্দ্দেশিত করেন। কিন্তু সে স্থান কুরুক্ষেত্র হইতে পূর্ব্বে প্রায় একশত মাইল দূরে। ঐতিহাসিকরা মহাভারত ভাল করিয়া পড়েন নাই দেখা যাইতেছে। এতদ্ব্যতীত, মহাভারতের কোনও স্থানে হস্তিনাপুরের সঙ্গে গঙ্গার কোন ছোঁয়াচের উল্লেখ নাই। মহাভারত যখন লেখা হয় তখনই গঙ্গা ভারতের পূত-নদী হিসাবে গণ্য। মহাভারত লেখক গঙ্গাকে উপেক্ষা করিতেন না, যদি হস্তিনাপুর তাহার তীরবর্ত্তী হইত।

দেখা যাইতেছে, একজন মহারথীর মৃত্যু হওয়া মাত্র সঞ্জয় হস্তিনাপুর আসিয়া উপস্থিত হইতেন এবং ধৃতরাষ্ট্রকে ওয়াকিবহাল করিতেন। কুরুপক্ষের প্রথম সেনাপতি ছিলেন ভীষ্ম। ভীষ্মপর্ব্বে দেখিতেছি সঞ্জয় প্রথমেই ভীষ্মের মৃত্যু সংবাদ দিলেন, পরে যুদ্ধের বিশদ বর্ণণা করিলেন।

ভীষ্মপর্ব্বের ১৩ অধ্যায়ে জনমেজয়কে বৈশম্পায়ন বলিতেছেন—"সঞ্জয় রণক্ষেত্র হইতে প্রত্যাগমন ও ধৃতরাষ্ট্রের সমীপে সহসা সমুপস্থিত হইয়া দীনবচনে" ভীষ্মের মৃত্যু সংবাদ দিলেন। যুদ্ধের বর্ণণা আরম্ভ হইল। কিন্তু এইখানে গীতা ঢুকাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ১৩ হইতে ৪২ অধ্যায় পর্য্যন্ত গীতা। তারপরই ভীষ্মবধ-পর্ব্বাধ্যায়। সঞ্জয় আসিয়াই বলিলেন—"ভীষ্ম...... অযোগ্য ব্যক্তির ন্যায় নিহত হইয়া বাতভগ্ন তরুর ন্যায় ধরাশায়ী হইয়াছেন।"

লক্ষ্য করিতে হইবে যে বৈশম্পায়ন ভীষ্মের মৃত্যুর কথা যেখানে বলিলেন তাহার পরই আদি ও মূল মহাভারতে সঞ্জয়ের কথা আরম্ভ হইয়াছিল। অনেক পরে কেহ গীতা এইখানে প্রবেশ করাইয়াছে। এখন যে মহাভারত আমরা পাইতেছি তাহাতে এমন প্রচুর ভেজাল বা প্রক্ষেপ আছে। ভীষ্ম যে "নিহত" হইয়াছিলেন তাহা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। ভীষ্ম "নিহত" হওয়াটাই ছিল বড় খবর বা নিউজ। শরশয্যার কাহিনী অনেক পরে গীতার মত প্রক্ষিপ্ত।

বৌদ্ধধর্মকে সমূলে বিনাশ করিয়া যখন ব্রাহ্মণগণ

এদেশে পৌরাণিক ধর্ম্ম প্রচলন করিলেন, তখন তাঁদের প্রবর্ত্তিত আচারনীতি জনসাধারণে প্রচার করিবার জন্য মহাভারতকে প্রোপাগাণ্ডা মিডিয়ম বা প্রচার-মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করিলেন। মনে হইতেছে এই মহাভারত কাহিনী গ্রামে গ্রামে কথকতা মারফত লোকের মনোরঞ্জন করিত। তাই ভীষ্মকে তিনমাস শরশয্যায় শোয়াইয়া, জীবিত রাখিয়া যুধিষ্ঠিরকে উপদেশের আছিলায় আধুনিক হিন্দু ধর্ম্মের অনুশাসনগুলি প্রচার করা হইল। মাত্র ১৮ দিন যুদ্ধ হয় তাতেই কুরুবংশ শেষ এবং পাণ্ডব-তনয়রাও নিহত। যাঁরা পরে এই শরশয্যা কাহিনী ঢুকাইলেন, তাঁদের মাথায় সময়ের অসামঞ্জস্য ধরা পড়িল না। মহাভারতে এ ধরণের অসমঞ্জস্যতা অনেক আছে। মহাভারতের মূল রচয়িতা পঞ্জিকা-নিষ্ঠ ছিলেন না।

তাই সঞ্জয়ের মুখে পাইতেছি—"ভীষ্ম নিহত হইয়া ইত্যাদি।" শুধু সঞ্জয়ের মুখেই নয়। দ্রোণপর্ব্বের প্রথম অধ্যায়ে বৈশম্পায়নকে বলিতে দেখিতেছি ভীষ্ম মারা গেলে "যখন রজনী সমুপস্থিত হইল, তখন সঞ্জয়ও শিবির হইতে হস্তিনাপুরে ধৃতরাষ্ট্র সমীপে আগমন করিলেন।" আর ভীষ্মের মৃত্যু পর্য্যন্ত যুদ্ধ বর্ণনা করিলেন। ইহা নিশ্চিত যে ভীষ্মের মৃত্যু সঞ্জয় স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াই বলিলেন—"ভীষ্ম নিপাতিত হইতেছেন দেখিয়া আমাদের হৃদয়ও তাঁহার সহিত নিপাতিত হইল।" (ভীষ্মপর্ব্ব, ১২০ অধ্যায়)

দ্রোণপর্ব্বের অষ্টম অধ্যায়েই দেখিতেছি আগে দ্রোণের মৃত্যু সংবাদ তার পর ২০৩ অধ্যায় পর্য্যন্ত যুদ্ধের বর্ণনা।

সঞ্জয়ের প্রত্যক্ষ দর্শনের আরও কয়েকটি প্রমাণ দিয়া এ প্রবন্ধ শেষ করিতেছি।

(১) দ্রোণপর্ব্ব, ১২ অধ্যায়। "সঞ্জয় কহিলেন আমি সমুদয় স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, অতএব আচার্য্য দ্রোণ যেরূপে বিনাশিত ও নিপাতিত হইলেন তাহা কীর্ত্তন করিব।"

(২) দ্রোণপর্ব্ব, ৩০ অধ্যায়, ৪র্থ প্যারা—সঞ্জয় বলিতেছেন, "দক্ষিণ দিকে ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। আমি দ্রোণাচার্য্যের অনুসরণ করিলাম।"

(৩) দ্রোণপর্ব্ব ৫০ অধ্যায়—সঞ্জয়ের উক্তি "হে রাজন, আমরা শত্রুপক্ষীয় বীর শ্রেষ্ঠকে (অভিমন্যু) নিহত করিয়া তাহাদের শরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া রুধিরাক্ত-কলেবরে সায়ংকালে শিবিরে যাত্রা করিলাম। ......সমর ব্যায়ামে বিমোহিত প্রায় হইয়া সংগ্রামস্থল অবলোকন করত: মন্দ মন্দ গমন করিতে লাগিলাম।"

(৪) ঐ, ১৮৪ অধ্যায় দ্বিতীয় প্যারা—"সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ, আমরা প্রতিদিন সমরাঙ্গন হইতে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক রজনীযোগে পরামর্শ করিয়া কর্ণকে কহিতাম ইত্যাদি।" এখানে দেখা যায় কুরু পক্ষের হাইকমাণ্ডের মন্ত্রনা সভায় সঞ্জয় উপস্থিত থাকিতেন।

(৫) কর্ণপর্ব্ব, ১ম অধ্যায়। বৈশম্পায়ন বলিতেছেন যে "দ্রোণ মারা গেলে দুর্য্যোধন কর্ণকে সেনাপতি করিয়া যুদ্ধে গেলেন। কর্ণ অনেক সৈন্য মারিয়া দুই দিন পরেই অর্জ্জুন শরে কলেবর পরিত্যাগ করিলেন মহামাত্ত সঞ্জয় তদ্দর্শনে অবিলম্বে হস্তিনাপুরে গমন করিয়া মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে কুরুক্ষেত্রের সমর-সংবাদ দিতে প্রবৃত্ত হইলেন।"

অতএব, সঞ্জয়কে ভারতের প্রথম প্রত্যক্ষদর্শী সমর-সাংবাদিক বলা যায়।

এ প্রবন্ধে কোটেশন মধ্যস্থ উক্তি কালী সিংহের মহাভারত হইতে উদ্ধৃত।

ঋতুসংহার ও কবি কালিদাস

রাধিকা রঞ্জন চক্রবর্ত্তী

ঋতুসংহার কাব্য-গ্রন্থটির প্রকৃত রচয়িতা সম্পর্কে আজও পণ্ডিতমহলে যথেষ্ট সংশয় রয়েছে। কাব্য-গ্রন্থটি কালিদাস-কৃত রচনাবলীর অন্তর্ভুক্ত হলেও, রচনার প্রস্তাবনায় কবি কোথাও নিজের ব্যক্তিপরিচয় প্রদান করেন নি। এমন কি রচনার কাল পরিমাণ সম্পর্কেও কোন নির্ভরযোগ্য তথ্য গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়নি। কবির নিজের লেখা সন-তারিখ-যুক্ত এমন কোন নিদর্শন নেই, যার ভিত্তিতে রচনার কাল নির্ণয় এবং সেই সঙ্গে গ্রন্থকারের আবির্ভাবকাল ও আয়ুষ্কাল সম্বন্ধে কোনরূপ স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। কালিদাসের আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে নানা মত প্রচলিত থাকায় রবীন্দ্রনাথও ঐ সময়ের ওপর নির্দিষ্টতার ছাপ দিতে চাননি। তাই উক্ত প্রসঙ্গে কবি তাঁর নিজস্ব অভিমতটি উল্লেখ করে বলেছেন,—

'হায় রে কবে কেটে গেছে কালিদাসের কাল,
পণ্ডিতেরা বিবাদ করে লয়ে তারিখ সাল।
হারিয়ে গেছে সে সব অব্দ, ইতিবৃত্ত আছে স্তব্ধ—
গেছে যদি আপদ গেছে, মিথ্যা কোলাহল।

কালিদাসের আবির্ভাব কাল সম্বন্ধে গবেষকেরা বিভিন্ন পর্য্যায়ে আলোচনা করেছেন। অনেকের মতে, তিনি খুব সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকের শেষ চতুর্থাংশ ও পঞ্চম শতকের প্রথমার্দ্ধের মধ্যে জীবিত ছিলেন। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত নিতান্তই আনুমানিক; কারণ যে সমস্ত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন, কিম্বদন্তী এবং ঘটনা বিবরণকে ভিত্তি করে ঐ সিদ্ধান্তটি প্রতিপাদিত, সেগুলির প্রামাণিকতা ও স্বরূপ সম্বন্ধে যথেষ্ট দ্বিধা রয়েছে। সেই হেতু ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ও নাট্যকার কালিদাসের জীবন-পরিচয় আজও অস্পষ্ট রহস্যে আচ্ছন্ন।

প্রাচীন কাব্য ও নাটকে অর্থবোধের সুবিধার্থে দুরূহ শব্দের টীকা রচনার প্রথা প্রচলিত আছে। টীকাকার গ্রন্থ-রচয়িতার পরিচয় এবং সেই সঙ্গে কাব্যাস্থিত দুরূহ শব্দাবলীর ব্যাখ্যা-পরিপোষক অর্থ নিবদ্ধ করে রচনাটি পাঠকের কাছে হৃদ্য করে তোলেন। টীকাকারের সুকর ব্যাখ্যা গ্রন্থের কালনির্ণয় সম্পর্কেও যথেষ্ট সাহায্য করে। এমনি একজন বিদগ্ধ টীকাকার মল্লিনাথ পাঠকের সাতিশয় অনুগ্রহে কালিদাসের কাব্যত্রয় ('কুমারসম্ভব', 'রঘুবংশ' ও মেঘদূত')' ব্যাখ্যা ও টীকা রচনা করেছেন; কিন্তু ঋতুসংহারের ওপর তাঁর কোন টীকা নেই। ফলে, উক্ত গ্রন্থটির প্রকৃত রচনাকার সম্বন্ধে অল্প বিস্তর সংশয় থেকে যায়। এ প্রসঙ্গে খ্যাতনামা সমালোচক P. Harichand-এর মন্তব্যটি উল্লেখযোগ্য। কালিদাসের রচনাবলী সম্পর্কে লিখিত একটি নিবন্ধে তিনি তাঁর অভিমত প্রকাশ করে লিখেছেন,—"Six works are by universal consent considered the authentic production of the great poet: the three dramas, 'Sakuntala', 'Vikramorvasi' and 'Malavikagnimitra'; the two epics, 'Raghu-vamsa' and 'Kumarasambhava' and the lyric 'Meghaduta'। বিদগ্ধ সমালোচক হরিচাঁদ 'ঋতুসংহার'

কাব্যটিকে কালিদাসের রচনা বলে স্বীকার করতে চাননি। তাঁর উক্ত মন্তব্যটিকে সরাসরি সমর্থন না করে অধ্যাপক Ryder লিখেছেন,—'Regarding 'Ritusamhara' Kalidasa's authorship has been doubted without cogent reasons'। অবশ্য তাঁর এই মন্তব্যটি সম্পূর্ণ দ্ব্যর্থতামুক্ত নয়। মন্তব্যকালে তিনি কোনরূপ বিশ্লেষণাত্মক সমালোচনায় অবতীর্ণ হননি। 'ঋতুসংহার' কাব্যটিকে যাঁরা কালিদাসের রচনা বলে স্বীকার করতে কুণ্ঠিত, তাঁদের ঐরূপ সিদ্ধান্তের প্রতি তিনি কেবল নিজের সংশয় প্রকাশ করেছেন মাত্র। তাঁর মন্তব্যটি সেই কারণে যুক্তিবহ হয়ে উঠতে পারেনি।

'ঋতুসংহার' কাব্যটিকে আরও একটি কারণে অনেকে কালিদাসের রচনা বলে স্বীকার করেন না; কারণটি কালিদাসের রচনাবলী সম্পর্কিত বিচার বিশ্লেষণের মধ্যে নিহিত। কবি-রচিত গ্রন্থাবলীর পৌর্ব্বাপর্য্য নির্ণয় করা কঠিন; কারণ গ্রন্থগুলিতে কবি-প্রতিভার পূর্ব্বাভাস হতে গভীর পরিণতি পর্য্যন্ত এমন কোন স্বাক্ষর নেই যার সাহায্যে পৌর্ব্বাপর্য্যের মূল সূত্রটি নির্ণয় করা সম্ভব। কয়েকটি গ্রন্থে কবিপ্রতিভার যথেষ্ট তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। ঋতুসংহারেও এই তারতম্য বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত। সেই কারণে অনেকে ঐ কাব্যটিকে কালিদাসের রচনা বলে স্বীকার করতে কুণ্ঠিত। এক্ষেত্রে আচার্য্য ডঃ বিমানচন্দ্র ভট্টাচার্যের মন্তব্যটি উল্লেখযোগ্য। কালিদাস রচনাবলীর কালানুক্রম সম্পর্কে আলোচনা কালে তিনি তাঁর অভিমত প্রকাশ করে বলেছেন,—'কালিদাসের প্রতিভার প্রথম ও শেষ সৃষ্টির মধ্যে উৎকর্ষের এমন কোন তারতম্য নেই যাহা হইতে একটি আগের এবং একটি পরের বলিয়া মনে হয়।' (১) উপরন্তু আর একটি প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন যথা মান্দাশোর শিলালিপি হতে 'ঋতুসংহার' কাব্যের অস্তিত্বের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। উক্ত শিলালিপিতে বৎসভট্টি ঋতুসংহারের দু'টি শ্লোকের অনুকরণ করেছেন। ঐ তথ্য নিদর্শনের ওপর নির্ভর করে প্রখ্যাত জার্মান সংস্কৃতবিদ্ ও লিপি-বিশেষজ্ঞ কীলহর্ণ লিখেছেন, মান্দাশোর শিলালিপিতে উৎকীর্ণ শ্লোক দু'টি ঋতুসংহারের শিশির বর্ণনার দ্বারা প্রভাবিত। যাই হোক, কীলহর্ণের অভিমতটিকে এক্ষেত্রে যথার্থ বলে স্বীকার করে নিলে ঋতুসংহারের প্রাচীনত্বই শুধু প্রমাণিত হয়; কিন্তু শ্লোক দু'টি যে প্রকৃত কালিদাসেরই রচনা সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সংশয় থেকে যায়।

পক্ষান্তরে, 'ঋতুসংহার' কাব্যটিকে কালিদাসের রচনা বলে অনেকেই স্বীকৃতি দান করেছেন। প্রখ্যাত সমালোচক Keith সাহেব অতি দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন,—In point of fact the Ritusamhara is far from unworthy of Kalidasa, and if the poem is denied him, his reputation would suffer real loss। (২)

Keith সাহেবের বিশ্বাস,—'ঋতুসংহার' কালিদাসেরই রচনা। এই রচনাটিকে কালিদাসের অপরাপর রচনা হতে পৃথক করলে মহাকবির যশ অনেকখানি ক্ষুণ্ণ হয়ে পড়ে। পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ কালিদাস রচনাবলীর সম্পাদন কালে অনুরূপ একটি মন্তব্য করে লিখেছেন,—'এই কাব্য অন্য কোন কবির নামে যদি প্রচলিত থাকিত, তবুও ইহার রচনার পারিপাট্যে পাঠক অতি সহজেই ধরিতে পারিতেন যে, কালিদাসই ইহার কবি। (৩) ম্যাকডোনেল সাহেব তাঁর একটি নিবন্ধে ঋতুসংহার কাব্যটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে বলেছেন,—'Perhaps no other work of Kalidasa's manifests so strikingly the poet's deep sympathy with nature'। পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীও ঐ কাব্যগ্রন্থটিকে কালিদাসের রচনা বলে স্বীকার করেছেন: 'There cannot be the least shadow of a doubt that all the seven poems including Ritusamhara are by the same great poet'। তিনি আরো বলেছেন, কবি 'ঋতুসংহার' কাব্যখানির রচনা শেষ করে একখানি নাটক লিখেছিলেন; আর ঐ নাটকখানিই কালিদাসের

দ্বিতীয় গ্রন্থ। তবে 'ঋতুসংহার' কাব্যখানি যে তাঁর প্রথম গ্রন্থ সে বিষয়ে যথেষ্ট যুক্তি আছে এবং যুক্তির ভিত্তিও নেহাৎ দুর্ব্বল নয়।

কালিদাস রচনাবলীর কালানুক্রম, কবির ব্যক্তি পরিচয় ও দেশকাল সম্পর্কে পণ্ডিতেরা দীর্ঘকাল গবেষণা করলেও কোন তথ্য আজও অবিসম্বাদিত রূপে নির্ণীত হয়নি। ঐতিহাসিক সত্য নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে অবশ্য তাঁরা নানা যুক্তিতর্কের অবতারণা করেছেন এবং বিচার বিশ্লেষণের দ্বারা নিজেদের অভিমতও প্রকাশ করেছেন। ঐ অভিমত সমূহে আবার যুক্তিতর্ক সম্বলিত নানা জ্ঞাতব্য তথ্যও প্রদত্ত হয়েছে। কিন্তু তাঁদের এই বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী বা দৃগ্‌ভঙ্গীর মধ্যে কোন ঐকমত্য খুঁজে পাওয়া যায় না। এর কারণ কালিদাস বিষয়ে আজ পর্য্যন্ত যতটুকু তথ্য পাওয়া গেছে, ঐতিহাসিক বিচারে তার মূল্য অতি সামান্য। এর ওপর ভিত্তি করে কবির ব্যক্তিজীবন ও তাঁর রচনাবলীর কালানুক্রম নির্ণয় করা সত্যই কঠিন। কবির 'ঋতুসংহার' কাব্যটি সম্পর্কেও ঐ একই কথা প্রযোজ্য। কবির প্রামাণ্য জীবনেতিহাস আবিষ্কৃত না হলে বোধহয় এই মতান্তর বা সংশয়ের নিরসন হবে না। নচেৎ ঐতিহাসিক বিচারে তর্কের জন্য তর্ক, যুক্তির জন্য যুক্তি কেবল এগিয়ে চলবে। কালিদাসের জীবন ইতিবৃত্ত কোনদিনই প্রকাশ পাবে না।

'ঋতুসংহার' কাব্যের প্রকৃত রচয়িতা এবং তাঁর ব্যক্তি-পরিচয় সম্বন্ধে কোন সমস্যারই আশু সমাধান যে সম্ভব নয়, তা সহজেই অনুমেয়। তবু আলোচ্য প্রসঙ্গে বিভিন্ন মনীষীদের প্রচলিত সিদ্ধান্তগুলি পর্য্যালোচনা করলে তার স্বরূপ এবং সেই সঙ্গে কবি-জীবনের মূল প্রেরণা সম্পর্কে কিঞ্চিৎ অবগত হওয়া যায়। এক পক্ষ মুক্ত কণ্ঠে প্রচার করেছেন, 'ঋতুসংহার' কাব্যে কালিদাসীয় প্রভাব যথেষ্ট বিদ্যমান। তাঁদের মতে, কাব্যখানি কবির নবীন বয়সের রচনা; আবার কেউ বলেছেন, রচনাটি 'কবির অতি কাঁচা বয়সের লেখা।' এরূপ অনুমান কোনটিই সমর্থনযোগ্য বলে মনে হয় না। কাব্যখানি যে কবির পরিণত বয়সের রচনা তার বলিষ্ঠ নিদর্শন গ্রন্থখানিতে যত্র তত্র ছড়িয়ে আছে। বলা বাহুল্য, কবি এখানে একটি বিশিষ্ট সত্তায় সংবৃত,—জ্ঞান ও সংযমের আধার রূপে বিকশিত। তাঁর লেখনী-শৈলী রীতিনীতির আচারে দৃঢ়বদ্ধ,—সুগভীর জীবন-বোধের প্রতি স্থিরলক্ষ্য। উপরন্তু, এই কাব্যে তাঁর পাণ্ডিত্য ও রসজ্ঞতার পরিচয় তুলনারহিত। এখানে তিনি যেন আপন প্রাণদীপ্তিতে স্বয়ং সমুজ্জ্বল। এমন একটি সরস, প্রাঞ্জল, যুক্তিপূর্ণ রচনা কখনো কবির নবীন বয়সের রচনা হতে পারে না। কবি-চেতনার গভীরে প্রবেশ করলে তবেই এমন একটি সার্থক রচনা সৃষ্টি সম্ভব। 'ঋতুসংহার' কবির পরিণত মনের এক গভীর উপলব্ধি ছাড়া কিছু নয়। পরিণত বয়সে কবি তাঁর কাব্য চেতনার গভীরে প্রবেশ করেছিলেন বলেই এই কাব্যে একটি বিস্ময়কর কবিত্বশক্তি প্রত্যক্ষ করা যায়।

ঋতুসংহারে কবি ছয়টি ঋতুর বর্ণনা করেছেন। এই বর্ণনার মধ্যে গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত ঋতুর প্রাসঙ্গিক বর্ণনা বিবৃত হয়েছে। ভারতবর্ষে ছয়টি ঋতু। প্রত্যেকটি ঋতু পৃথক বর্ণবৈচিত্র্যে রূপরম্য হয়ে নিসর্গের অক্ষয়পটে আবির্ভূত হয়। প্রকৃতির রাজ্যে কোন ঋতুই বৈশিষ্ট্য-বর্জিত নয়, পরন্তু নিজ নিজ মহিমায় প্রতিষ্ঠিত। রূপ ও বর্ণের বিচিত্র সম্ভার নিয়ে ঋতুগুলির প্রকাশ ও বিকাশ; আর এই প্রকাশ ও বিকাশের এক মাধুর্য্য ধারায় এরা মানুষের চিত্তকে পরিষিক্ত করে।

কালিদাস নিসর্গ-প্রীতি রসিক; আবার তিনি মর্ত্ত্য প্রীতির প্রথম কবি। নিসর্গ ও জীবনের প্রতি তাঁর দৃষ্টি কোনরূপ বৈদান্তিক তত্ত্বদর্শীর দৃষ্টি নয়। বাস্তব জগৎ হতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে কবি প্রকৃতির স্বপ্নালোকে বিচরণ করেন নি। বরং প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে তিনি চরম ও পরম সার্থকতার সন্ধান করেছিলেন। কাব্যানুভূতির উৎসার কালে তাঁর এই একাত্মবোধ একটি বিশিষ্ট সত্তায় সংবৃত।—জীবন উদ্দেশ্যেই স্থিরলক্ষ্য। এ শুধু কল্পনার সূক্ষ্মতা ও ব্যাপকতাই নয়, একটি আশ্চর্য্য ভঙ্গি, একটি নতুন দৃষ্টিকোণ।

কালিদাসের কাব্যের মধ্যে জড় ও চেতনের একটা আশ্চর্য্য সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়। এই বিষয়টি লক্ষ্য করে স্বর্গত ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত লিখেছেন,—'এর পশ্চাতে কবির নিছক একটি তত্ত্বদৃষ্টিই নাই, এ মিল কবির কাব্যে স ত্রই এমন সহজ ভাবে দেখা দিয়াছে যে, কোথাও তাহার সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে আমাদের মনে কোন প্রশ্নই জাগে না। কবি তাঁহার চিত্তের ভিতর প্রকৃতির এমন একটি রাজ্য প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, যাহার ভিতর জড় সত্তা এবং চেতন সত্তা ওতপ্রোত ভাবে অন্বিত হইয়া আছে।'(৪) শকুন্তলার চরিত্র এমন একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। প্রকৃতির কোলে লালিত শকুন্তলা প্রথমাবধি হতে প্রকৃতির সাজাতীয়ত্ব ও সোদরত্ব লাভ করেছে। কালিদাস শকুন্তলাকে প্রকৃতির শিশু রূপে যতদূর সম্ভব সহজ প্রাণধর্মের উন্মুক্ত পথে স্বাধীন ভাবে সঞ্চরণ করার সুযোগ দিয়েছেন। মূক প্রকৃতির মতই শকুন্তলা আত্মবিস্মৃত,—স্বভাবের উদ্দামতায় আত্মসংবৃত। তপোবন ভূমির সঙ্গে তার সম্পর্কটি লতা-পুষ্পের সম্বন্ধেরই অনুরূপ অর্থাৎ অচ্ছেদ্য। অরণ্য প্রকৃতি বনবালা শকুন্তলার চরিত্রের গভীরে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে।

নিসর্গ-প্রেমিক কালিদাস নিসর্গ দেবীর একনিষ্ঠ সেবক। 'ঋতুসংহার' কাব্যে তিনি প্রকৃতির পূজা করেছেন। এই পূজায় তাঁর প্রাণময় ভক্তি নিষ্ঠা উৎসৃষ্ট হয়েছে। এখানে কবির আর একটি বড় পরিচয়;—তিনি সুদক্ষ চিত্রকর। উপমা ও শব্দ-চাতুর্য্যের এক আশ্চর্য্য সমন্বয়ে সার্থক চিত্রসৃষ্টি করতে তিনি অসাধারণ নিপুণ। তাঁর পাণ্ডিত্য প্রভায় ও রসজ্ঞতায় ঋতুলীলা বর্ণনার নানা চিত্ররূপ সৃষ্টি হয়েছে। 'ঋতুসংহার' ষড় ঋতুর যেন এক অপরূপ চিত্রশালা। প্রতিটি ঋতুর মোহিনী [illegible] আবরণে প্রকৃতি-প্রেমিক মানুষ স্বভাবতই আত্মবিস্মৃত ও উন্মত্তবৎ। কোন ঋতু কামী ও প্রণয়ীর কাছে একান্ত কাম্য, ঋতু বিশেষে কোন বস্তু মানুষের কাছে অধিকতর উপভোগ্য, আবার কোন ঋতুর বিচিত্র আকর্ষণে প্রেয়সী তার সকল সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য উন্মুক্ত করে প্রেমাস্পদের দেহ উপাচার করে সতত ব্যাকুল,—'ঋতুসংহার' তারই এক সবিশেষ লিপিমালা। ঐন্দ্রজালিক রূপকার কালিদাসের হাতে ঋতু-সৌন্দর্য্যের কল্পলোক যেন উন্মুক্ত হয়েছে। কবির কাছে ঋতুগুলি যেন জীবন সৌন্দর্য্যের প্রতীক স্বরূপ। সেখানে জৈবিক লালসার কোন স্থান নেই, দেহাশ্রিত-ইন্দ্রিয়জ কামনার কোন মূল্য নেই। বাস্তব জীবনের সকল কামনা-বাসনাকে তিনি বিশ্বকামনার উর্ধ্বে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এখানেই কবির অক্ষয় সিদ্ধি।

কালিদাসের ভাব, ভাষা, উপমা ও উৎপ্রেক্ষার মূলে বাল্মীকির অবদান অনস্বীকার্য্য। পণ্ডিতেরা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেছেন যে বাল্মীকির সারস্বত নিঃষন্দই কালিদাসের আকর স্বরূপ। বাল্মীকির পরিণত মনের গভীরতর ভাব কল্পনাকে আশ্রয় করেই কালিদাসের মনোভূমি রচিত হয়েছিল। তাঁর আধ্যাত্মিক ভাবাদর্শ কালিদাসকে নবচেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল। তাই প্রায়শঃ ক্ষেত্রে কালিদাসের রচনায় মানবাত্মার একটি বলিষ্ঠ রূপ আত্মপ্রকাশ করেছে। বাল্মীকির কাব্যাদর্শ যেন তাঁর নতুন ভাবে পরীক্ষিত হয়েছে। এ আদর্শ অকৃত্রিম ও উপলব্ধিলব্ধ। এই দুই মহাকবির ভাব কল্পনায় সাধর্ম্য ও সজাতীয়ত্ব লক্ষ্য করা গেলেও, মৌলিকতার বিচারে তাঁরা আপন আপন প্রাণদীপ্তিতে স্বয়ং সমুজ্জ্বল। দুই মহাকবির প্রতিভায় বাহ্য সাদৃশ্য থাকলেও, আন্তরিক অনৈক্যটি আলোচনা করে দেখার বিষয়। কবিদ্বয়ের প্রতিভার মধ্যে যতটুকু অনৈক্য দৃশ্যমান তা শুধু কালের মাপকাঠিতেই বিচার্য্য। কালগত পার্থক্যের মধ্যে প্রকারগত অনৈক্যের মূলসূত্রটি নিহিত। ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তের ভাষায়, "দুই কবির প্রতিভার মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে, তা যুগ ধর্ম্মেরই পার্থক্য।" বাল্মীকির ভাব কল্পনা যেন যুগবাহিত সৌহৃদ্য ক্রমে কালিদাসের রচনায় প্রক্ষিপ্ত হয়েছে। একই ভাব কল্পনার দুই প্রকাশ,—নিসর্গ থেকে সৌন্দর্য্যস্পৃহা আবার নিসর্গ থেকেই বিশ্বাত্মবোধের বাসনা। এই বিশেষ ভাব প্রবাহ যুগবাহিত বিষয় বৈভবের দ্বারা আবিষ্ট হয়ে কবির মানসলোকে স্বতঃ উৎসারিত। তবে এ কথাও

মনে রাখা উচিত বাল্মীকির কাব্য-সাধনার ফুলকে কালিদাস ফলে পরিণতি দান করেছেন। এই ক্রম-বিকাশের মধ্যে এতটুকু অস্বাভাবিকতার স্পর্শ নেই। বাল্মীকির কাছে তিনি অনেকাংশে ঋণী। বাল্মীকির শব্দ-সৌষ্ঠব ও উপমা-সম্ভার কালিদাসের রচনায় ছায়াপাত করেছে। এগুলির মধ্যে মৌলিক পার্থক্য থাকলেও, সজাতীয়ত্বকে অস্বীকার করা চলে না। কালিদাস কেবল বাল্মীকির উত্তরসূরীই নন, বাল্মীকির জাগ্রত আত্মার প্রতিরূপ। তাঁদের সম্পর্কটি অনেকের মতে, গুরুশিষ্যেরই সম্পর্ক।

ঋতুসংহারের বর্ণনাগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে রামায়ণ হতে সমাহৃত। কবি খুব সম্ভবত 'রামায়ণ' হতে ঋতু-সংহারের কল্পনা গ্রহণ করেছেন। রামায়ণান্তর্গত কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডের বর্ষাশরদ্বর্ণনার (সর্গ ২৭-৩১) সঙ্গে ঋতুসংহারের কয়েকটি ঋতু বর্ণনার সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। এই সাদৃশ্য লক্ষ্য করে আচার্য্য শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য্য মন্তব্য করেছেন,—রামায়ণে মহাকবি বাল্মীকির নিপুণ লেখনীতে বর্ষা, শরৎ হেমন্ত, শীত, প্রভৃতি ঋতুর যে জীবন্ত চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, খুব সম্ভবত কালিদাসের 'ঋতুসংহার' প্রণয়নে তাহাই মূল প্রেরণা যোগাইয়াছিল। মনে হয়, ঋতু চিত্রণে রামায়ণে বর্ণিত বর্ণনার প্রতি কবি স্বভাবতই আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তবে ঋতুসংহারের ভাব কল্পনা রামায়ণ কাব্যের প্রতিধ্বনি হলেও, কবির রচনা শৈলী, চিত্র-চিত্রণ ও বিষয় সমৃদ্ধি স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল।

তাপদগ্ধ গ্রীষ্মের বর্ণনা দিয়ে কবি তাঁর কাব্য শুরু করেছেন। গ্রীষ্মের মধ্যাহ্ন কাল সূর্য্যের প্রখর কিরণে দুঃসহ। সূর্য্যের খরতাপ এ সময়ে বড়ই প্রচণ্ড। তাপাধিক্যে সারা প্রকৃতি যেন উত্তপ্ত। নিসর্গ প্রকৃতি প্রতপ্ত ধূলিপটলে দগ্ধ ও বিশুষ্কপ্রায়। প্রকৃতিলোকে সর্ব্বত্রই শুষ্কতা ও শূন্যতা। বিশ্বের জীবকুল অসহ্য তাপ প্রদাহে দগ্ধপ্রায়। তাপাতিশয্যে বৃক্ষরাজির পর্ণরাশি শুষ্ক ও ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। দাবানলের প্রবল প্রদাহে বনস্থলীর রূপ যেন সর্ব্বরিক্ত,—জীর্ণ মূর্তির মতই বীভৎস।

খরাংশুর চণ্ডকিরণে শস্যমাঠ তৃষাদীর্ণ, নদ-নদীগুলি শুষ্কজল। কবির কল্পনায় গ্রীষ্মের এ এক ভয়াবহ রুদ্র রূপ। নিম্নোক্ত শ্লোকনিচয়ে গ্রীষ্ম ঋতুর যে বর্ণনা প্রদত্ত হয়েছে তার মধ্যে কবির বাস্তবানুভূতির পরিচয় মূল্যাই:

> রবিপ্রভোদ্ভিন্নশিরোমণিপ্রভো
> বিলোলজিহ্বাদ্বয়লীঢ়মারুতঃ।
> বিষাগ্নিসূর্য্যাতপতাপিতঃ ফণী
> ন হন্তি মণ্ডূককুলং তৃষাকুলঃ॥

মানুষের চিত্ত প্রাঙ্গণে নিদাঘতপ্ত দিবাবসানের মুহূর্ত কালটি অতিশয় মনোরম। দিবাবসানের সঙ্গে সঙ্গে ধরনীর উত্তাপও ক্রমশঃ হ্রাস পেতে শুরু করে। তাপক্লিষ্ট মানুষেরা এ সময়ে তাপ শান্তির জন্য বিভিন্ন প্রয়াসে তৎপর হয়ে ওঠে। কখনো জ্যোৎস্না-পুলকিত যামিনীর স্নিগ্ধ ছায়াবিতানে আশ্রয় নিয়ে, আবার কখনো সুশীতল মন্দির অঙ্গনে কিংবা মণিময় প্রাসাদ পৃষ্ঠে অবস্থান করে তারা হৃদয়ের তাপ দূরীকরণে সচেষ্ট হয়। হৃদয়ের তাপ শান্ত করে তাপাতুর লোকেরা সরস চন্দনে নিজেদের সর্ব্বাঙ্গ চর্চিত করে। নিদাঘের মধু যামিনী সকলের কাছেই স্পৃহনীয়। এ সময়ে প্রণয়ীদের হৃদয়ে মদনাগ্নি সন্ধুক্ষিত করে তোলে। তাই রজনীর প্রারম্ভ কালে ঐশ্বর্য্যবিলাসী কামিগণ সুরম্য হর্ম্যের বিলাসকক্ষে আশ্রয় গ্রহণ করে নানা গীত উৎসবে মুখর হয়ে ওঠে। তাদের হৃদয়ে এক বিচিত্র ভাবাবেগ। দেহে যৌবন-প্রেমের নিদাঘী স্বপ্ন। ঈপ্সিত প্রণয়াস্পদার সরস ওষ্ঠাধরের স্পৃহনীয় মধুপানে তারা বাসনা-বিহ্বল। কঠোর-যৌবনা কামিনীদের হৃদয়ও অনুরূপ ভাবে প্রণয়ীর প্রতীক্ষায় উদ্বেল-সঙ্কুল।

গ্রীষ্ম ঋতু বর্ণনার প্রতি সর্গে কবিপ্রতিভার পরিচয় সুস্পষ্ট। প্রকৃত ভাবুক কবির কল্পনায় গ্রীষ্ম ঋতু প্রপ্তি-প্রধান। নিসর্গ লোক এ সময়ে শুষ্করস হইয়া উঠিলেও

মানুষের চিত্তলোকে কখনো রসের অভাব ঘটে না। গ্রীষ্মের শুষ্ক-কঠোর রূপের মধ্যে রয়েছে চিত্তহারী রসের অকুণ্ঠ প্রাচুর্য্য, যে রস প্রাণদস্পর্শে সতত সঞ্জীবিত। গ্রীষ্ম ঋতু যেন এক বিচিত্র ভাবরসের রসিক। তার রসিক মনে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য লক্ষণগুলির প্রকাশ সুপরিস্ফুট। সূর্য্যের খর তাপের মতই সে বহন করে আনে যৌবনের খর দীপ্তি। বিচিত্র বর্ণ ও ভঙ্গিতে আত্মপ্রকাশ করতেই সেই উন্মুখ।

মহাকবি বাল্মীকির দৃষ্টিতেও গ্রীষ্ম ঋতু এক উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্যে দীপ্যমান। ঋতু বর্ণনায় তাঁর দৃষ্টি রূপবদ্ধ। —ভাষাও চিত্রবহুল। রবীন্দ্রনাথের বর্ণনায় গ্রীষ্ম ঋতু তপোরত এক সন্ন্যাসী। সে তপস্যার আগুন জ্বেলে নিবৃত্তি মার্গের মন্ত্র সাধন করে। গ্রীষ্মের প্রতিনিধি বৈশাখকে কবি রুদ্র সন্ন্যাসী রূপে কল্পনা করেছেন :

'দীপ্তচক্ষু হে শীর্ণ সন্ন্যাসী,
পদ্মাসনে বস আসি রক্তনেত্র তুলিয়া ললাটে,
শুষ্কজল নদীতীরে শস্যশূন্য তৃষাদীর্ণ মাঠে,
উদাসী প্রবাসী,
দীপ্তচক্ষু হে শীর্ণ সন্ন্যাসী।'

ত্যাগমন্ত্রের দীক্ষা নিয়েছে বলে গ্রীষ্ম ঋতু সকল ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করেছে। সে যখন শ্বাস রুদ্ধ করে থাকে, তখন চারিদিকে গুমোট, আর যখন রুদ্ধশ্বাস ছেড়ে দেয় তখন ঝঞ্ঝাদির আত্মপ্রকাশ।

রবীন্দ্রনাথ গ্রীষ্মকে ব্রাহ্মণ বলে উল্লেখ করেছেন। রসের ধারাকে শুষ্ক করে সে কঠোর তপস্যায় নিমগ্ন। তার কণ্ঠ হতে নিঃশব্দে সাবিত্রী মন্ত্র উচ্চারিত হচ্ছে। তার শুষ্ক-কঠোর রূপের গভীরে তপোবহ্নির দীপ্ত শিখা। অন্য ঋতুর সঙ্গে তার কোন মিল নেই। তপোরত গ্রীষ্মের বন্দনা করে কবি বলেছেন,—

'নমো নমো, হে বৈরাগী।
তপোবহ্নির শিখা জ্বালো জ্বালো,
নির্বাণহীন নির্মল আলো
অন্তরে থাক্ জাগি।'

কালিদাসের মত রবীন্দ্রনাথও প্রকৃতি-ভাবুক। বিচিত্ররূপা নিসর্গের অপরূপ সৌন্দর্য্য তিনি সমগ্র সত্তা দিয়ে উপভোগ করেছেন। ঋতু-উপভোগে তাঁর ক্লান্তি নেই। প্রকৃতির রাজ্যে কবি ঋতুগুলির বর্ণভেদের সঙ্গে সঙ্গে বৃত্তিভেদও লক্ষ্য করেছেন। গ্রীষ্মঋতুর লীলা-বৈচিত্র্য তাঁকে কম মুগ্ধ করেনি। ব্রাহ্মণ গ্রীষ্মের তপস্যারত মূর্ত্তির মধ্যে তিনি ভোগবৈরাগ্যের স্বরূপ উপলব্ধি করেছেন। পক্ষান্তরে, কালিদাসের বর্ণনায় গ্রীষ্মঋতু প্রবৃত্তি-মার্গের সাধক। তার সাধনায় চিত্তবৃত্তি নিরোধের কোন সঙ্কল্প নেই; বরং রসবাহুল্যের সে মন্ত্রসাধন করে। অবশ্য ভোগও বৈরাগ্য-পরিণামী—প্রবৃত্তির স্রোত নিবৃত্তির সমুদ্রে একদিন আত্মদান করে।

ঋতুসংহারের দ্বিতীয় সর্গে কবি বর্ষাঋতুর বর্ণনা করেছেন। বর্ষা সৌন্দর্য্য রচনার ঋতু। তার শ্যামসুন্দর রূপের মধ্যে মননের গাঢ়তা আছে, অনুভবের প্রেরণা আছে এবং চেতনার বিস্তার আছে। প্রকৃতির অঙ্গনে তার চিত্তোন্মাদী সৌন্দর্য্য একটি বিশিষ্ট মহিমায় সংবৃত। কেবল প্রকৃতির অঙ্গনেই নয়, মানুষের চিত্ত-প্রাঙ্গণেও তার সতত সঞ্চরণ। নিসর্গ দেশকে সে কেবল প্লাবিত করে না, মানুষের হৃদয় দেশটিকেও আপন সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যের পীযূষধারায় সিক্ত করে তোলে। বর্ষার চিত্তহারী সৌন্দর্য্য মূর্ত্তিটি বিচিত্র ভাবরসে মূর্ত্ত। এই ভাবরস, মাধুর্য্য ও সৌন্দর্য্য চেতনার স্পর্শে প্রাণের জাগরণ ঘটে। প্রাণচেতনা অবশেষে বিস্ফারিত হয়ে বিশ্বপ্রকৃতির দিকে ছড়িয়ে পড়ে। বলিষ্ঠ প্রাণচেতনাই প্রকৃত আনন্দ-চেতনা, যার স্পর্শে মানুষ সতত সঞ্জীবিত।

সজল মেঘমেদুর নববর্ষার রূপ হৃদস্পর্শী। জলভারে অবনত মেঘের অবিরাম ধারাবর্ষণ সঙ্গীতের মতই শ্রুতি-বিনোদন। বর্ষার চতুষ্পার্শে সবুজের বিচিত্র সমারোহ, বৃক্ষলতায় ঘনপল্লবের শ্যামলতা, নবোদ্গত তৃণ তরুলতায় নিবিড় কোমলতা, শ্যামল তৃণাঙ্কুরে দলিত বৈদূর্য্যমণির দ্যুতিপ্রভা, বনরাজিতে আচ্ছাদিত পর্ব্বতমালায় সবুজের নর্মলীলা, খরস্রোতা তটিনীর ভুজঙ্গসম কুটিল গতিবেগ,

সমস্তই যেন এক বিচিত্র সৌন্দর্য্যের মোহিনী-মায়ায় অনুলিপ্ত।

বর্ষা যেন সমর-সাজে সজ্জিত হয়ে ঋতুর অক্ষয়পটে আবির্ভূত হয়। অশনির গুরুনিনাদ যেন তার রণ-দামামার প্রতিধ্বনি, তড়িৎমালা যেন তার তূণাধার এবং সুতীক্ষ্ণ বারিধারা যেন তূণাধার হতে নিক্ষিপ্ত বাণ। রণসাজে সজ্জিত হয়ে বর্ষা যেন প্রণয়ার্ত প্রবাসীদের ওপর অজস্র বাণ নিক্ষেপ করছে। কালিদাসের বর্ণনায়:

'বলাহকাশ্চাশনিশব্দমর্দলাঃ সুরেন্দ্রচাপম্
দধতস্তড়িদ্গুণম্।
সুতীক্ষ্ণধারাপতনোগ্রসায়কৈস্তুদন্তি চেতঃ
প্রসভম্ প্রবাসিনাম্॥'

বর্ষার সাজ-সজ্জায় সজ্জিত রমণীদেহের রূপলাবণ্য যেন সৌন্দর্য্যের মোহিনীমায়ায় অনুলিপ্ত। নব বর্ষা তাদের অপূর্ব্ব লাবণ্যশ্রী দান করেছে। তাদের অঙ্গযষ্টি চন্দনে চর্চিত, কুসুমরচিত কর্ণভূষণে সুশোভিত, মেখলা-দামে ও মণিময় কুণ্ডলে সুসজ্জিত। বর্ষা প্রকৃতির দ্বারা উদ্দীপিত হয়ে তারা যেন এক অপরূপ ভাবলোকে ডানা বিস্তার করেছে।

বর্ষা প্রেমানুভবের ঋতু। এই ঋতুর প্রাকৃতিক পরিবেশে চিত্ত স্বভাবতঃই প্রিয়-মিলনের নিমিত্ত ব্যাকুল হয়। হৃদয়ের মিলন ব্যাকুলিত বাণীটি উচ্চারিত না হলে যেন বিরহ-বেদনার নিরাত্তি ঘটে না। মিলন-ব্যাকুল দুটি হৃদয়ে তাই বহু প্রত্যাশা, বহুতর অভিলাষ। বর্ষার মেঘরাজির অবিরাম ধারাপতন প্রণয়ার্ত হৃদয়ে দুর্ণ্মর আসঙ্গলিপ্সা সঙ্কুচিত করে তোলে।

বর্ষা বিরহ-ভাবুকতার ঋতু। এই ঋতুতে প্রণয়ী-যুগলের বিরহ ও মিলন-পিপাসার দিকটি কবি লক্ষ্য করেছেন। দ্বিতীয় সর্গের শেষ শ্লোকে বর্ষার উদ্দেশে কবির প্রার্থনা উচ্চারিত হয়েছে:

'জলদসময় এষ প্রাণিনাং প্রাণভূতো দিশতু
তব হিতানি প্রায়শো বাঞ্ছিতানি।

বর্ষা ঋতু-বর্ণনায় কালিদাস পূর্ব্বেকার মতই বাল্মীকির ভাবকল্পনাকে অনুসরণ করেছেন। তাঁর বর্ষা বর্ণনার সঙ্গে রামায়ণীয় বর্ণনার ঘনিষ্ঠ সাম্য লক্ষ্য করা যায়। শব্দ, উপমা, রূপক ও উৎপ্রেক্ষাগুলি রামায়ণের কাব্য-ভাণ্ডার হতে সমাহৃত। রামায়ণীয় বর্ণনার খণ্ডচিত্রগুলি এখানে ভিড় করে আছে। এ থেকে অনুমিত হয় যে ঋতুসংহারের বর্ষা বর্ণন রামায়ণের বর্ষা বর্ণন (কিষ্কিন্ধ্যা-কাণ্ড) অনুকরণে লিখিত।

দুই প্রথিতযশা কবি বর্ষা ঋতুর মহিমা খ্যাপন করেছেন। উভয়েই বর্ষা ঋতুকে ভাব ও চিত্ররূপে ধ্যান করেছেন এবং বর্ষার সমারোহপূর্ণ রাজকীয় আবির্ভাবের বর্ণনা দিয়েছেন। তাঁদের প্রতিভার মৌলিক পার্থক্য-টুকু এই যে বাল্মীকির সৌন্দর্য্যানুভব আবেগ-চঞ্চল। বাস্তব জগতে সৌন্দর্য্যময়ী অপ্রাপ্য বলেই হয়ত কবি-চিত্তে সৌন্দর্য্য বাসনার এই মত্ত-আবেগ এবং চঞ্চলতা। অবশ্য এ-ক্ষেত্রে স্মরণযোগ্য যে, অপ্রাপ্যকে পাওয়ার ব্যাকুল আগ্রহ কবি-হৃদয়ের চিরন্তন অভীপ্সা। কালিদাসের সৌন্দর্য্যানুভব যৌবনময় রূপ-রসে অভি-ষিক্ত। সেখানে রসাপ্লুত সত্তার স্পন্দনটি গভীরভাবে অনুভূত। কেবল মধুময় নিসর্গ ঋতুর মধ্যেই নয়, বাসনাময় নারীরূপের মধ্যেও তিনি নিখিলের অন্তরশায়ী একটি সৌন্দর্য্য-মূর্ত্তিকে অনুসন্ধান করতে প্রয়াসী হয়েছেন। এই সৌন্দর্য্যানুভবের পশ্চাতে নিসর্গ প্রবল-ভাবে কাজ করেছে। বাল্মীকির মত কালিদাসের নিসর্গাশ্রিত সৌন্দর্য্য উপলব্ধির বর্ণনা অতি সুন্দর ও অতি পল্লবিত।

বাল্মীকি ও কালিদাসের মত রবীন্দ্রনাথও বর্ষার মহিমাখ্যাপন করেছেন। এই দুই মহাকবির মত তিনিও বর্ষা ঋতুকে ভাব ও চিত্ররূপে ধ্যান করেছেন। কবি রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে বর্ষা ক্ষত্রিয়। প্রকৃতিরাজ্যে দিগ্‌বিজয়ী রাজার মত বিপুল সমারোহে তার আবির্ভাব। মাথায় তার মেঘের পাগড়ি, মেঘের গুরু গর্জন তার আগমন ঘোষণার মাদল, বিদ্যুতের চমক যেন তার কোষমুক্ত খরশান তলোয়ার, অবিরল ধারা বর্ষণ তার তূণাধার হতে নিক্ষিপ্ত বাণ। সে যেন দিক্ চক্রবর্তী, অর্থাৎ বহু-বিস্তৃত রাজ্যের একচ্ছত্র অধিপতি।

বর্ষার রূপক বর্ণনায় কবি রবীন্দ্র কালিদাসের বর্ণনাকে অনুসরণ করেছেন। তাঁর বর্ষা-বর্ণনা অধিকাংশ ক্ষেত্রে কালিদাসের বর্ষা-বর্ণনাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। বর্ণনার মধ্যে অনেকগুলি যে ঋতুসংহারের কাব্যভাণ্ডার হতে সমাহৃত সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সমজাতীয় কয়েকটি উপমা ও রূপক পাশাপাশি রেখে বক্তব্য বিষয়ের যৌক্তিকতা বিচার করা যেতে পারে। কালিদাসের বর্ষা বর্ণনায়,—'বলাহকাশ্চাশনিশব্দমর্দ্দলাঃ', 'দধতস্তড়িদ্‌গুণম্‌' ইত্যাদি রূপক মিশ্রিত শব্দসমূহ রবীন্দ্রনাথের বর্ণনায় ঈষৎ পরিবর্ধিত আকারে প্রযুক্ত হয়েছে। সমুজ্জ্বল-কান্তি বর্ষা ঋতুকে রবীন্দ্রনাথ রাজার সহিত তুলনা করেছেন। উপমাটি ঋতুসংহারাস্থিত উপমারই যে পরিবর্ধিত রূপ, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। বর্ষা মানুষের মনে বিরহীভাব জাগায়। মানবচিত্ত প্রিয়-মিলন আকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল হয়ে ওঠে। এরূপ ভাব-ব্যঞ্জনা কি কালিদাসীয় শ্লোকের প্রতিধ্বনি নয়? তাই রবীন্দ্রনাথের বর্ষা-বন্দনা অধিকাংশ ক্ষেত্রে কালিদাসের বর্ষা-বর্ণনাকে স্মরণ করিয়ে দেয়, যেমন করে স্মরণ করিয়ে দেয় কালিদাসের বর্ষা-বর্ণনা বাল্মীকির বর্ষা-বর্ণনাকে। তবু এই কবিত্রয়ের বর্ষা-বর্ণনার মধ্যে ভিন্ন মৌলিকতার ছাপ আছে। বাল্মীকির বর্ষা-বর্ণনায় কল্পনার দীপ্তি আছে, কালিদাসের বর্ণনায় মননের গভীরতা আছে এবং রবীন্দ্রনাথের বর্ণনায় তত্ত্বের স্পর্শ আছে। রবীন্দ্র-রচনায় কবির নিসর্গ পর্য্যবেক্ষণের মধ্যে সূক্ষ্মতার পরিচয়টি সুস্পষ্ট। বর্ষাকে তিনি বলেছেন,—'ঋতুর মধ্যে একা এবং একমাত্র। বাইরের রহস্যময় বিপুল বিশ্বপ্রকৃতি বর্ষাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে। কে যেন অনির্দেশ্য সৌন্দর্য্যলোকে অবস্থান করে তার প্রতীক্ষায় দিনাতিপাত করে।'

ঋতুসংহারের তৃতীয় সর্গে কালিদাস শরৎকালের প্রশস্তি জ্ঞাপন করেছেন। প্রকৃতির রঙ্গমঞ্চে শরৎ যেন রমণীয় রূপসজ্জায় সজ্জিত এক নববধূ। রূপরম্যা নববধূর সাজেই তার আবির্ভাব। দেহে তার কাশফুলের সুচিক্কণ বসন। মুখশ্রী প্রস্ফুটিত কমলসদৃশ। হংসের সুমধুর কলকৈবল্য যেন শারদলক্ষ্মীর সুমধুর নূপুরনাদ। শারদের গাত্রাবরণে নানা রূপ-রঙের কুণ্ঠাহীন প্রাচুর্য্য। রূপ-সৌন্দর্য্যের প্রেক্ষাপটে সে যেন বাস্তব সম্পর্ক বিরহিত এক অপরূপ সৌন্দর্য্য-সত্তা।

শরতের রূপ ছটায় প্রকৃতির চতুষ্পার্শ্ব শুভ্র বর্ণ ধারণ করে। কাশ কুসুমে পরিপূর্ণ ধরিত্রী, কৌমুদী স্নাত রজনী, শিশির কান্তি জ্যোৎস্না, কুমুদ শোভিত সরোবর, হংসকুল পরিবেষ্টিত তটিনী, তৃণ তরুলতায় আকীর্ণ বনভূমি,—সমস্তই যেন শরতের রৌপ্যকলা ধারায় পরিস্নাত। শরতের অপরূপ সৌন্দর্য্যকে কবি মনোজ্ঞ ভাষায় রূপায়িত করেছেন :

'কাশৈর্মহী শিশিরদীধিতিনা রজন্যো
হংসৈর্জলানি সরিতাং কুমুদৈঃ সরাংসি।
সপ্তচ্ছদৈঃ কুসুমভারনতৈর্বনান্তাঃ
শুক্লী-কৃতান্যুপবনানি চ মালতীভিঃ॥'

শরতের এই রূপচিত্র অঙ্কনে কবি কালিদাস বাল্মীকির মানসলোকে বিচরণ করেছেন। অন্যান্য ঋতু বর্ণনার মত তিনি এখানেও বাল্মীকির ভাব কল্পনাকে অনুসরণ করেছেন। বাল্মীকির শারদ বর্ণনার মধ্যে পাই,—

'সচক্রবাকানি সশৈবালানি,
কাশৈর্দুকূলৈরিব সংবৃতানি
সপত্র রেখানি সরোচনানে
বধূমুখানীব নদীমুখানি।'

রমণীয় রূপশালিনী শরৎ বাল্মীকির কল্পনায় নব বধূর ন্যায় কমনীয় কান্তি ধারণ করেছে। কাশ কুসুম তার সুচিক্কণ পরিধেয় বস্ত্র, মনোজ্ঞ মুখশ্রীতে প্রস্ফুটিত পদ্মের শোভা, হংসের নাদে তার মধুর নূপুর-নাদ।

রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক ও রূপাবিষ্ট কবি-মানস শরৎ ঋতুকে কোন বিশেষ মর্য্যাদা দান করেনি। ঋতু সমাজে শরৎ-এর কোন উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য কবির চোখে ধরা পড়ে নি। বর্ণ বিচারে কবি শরৎ ও বসন্ত ঋতুকে শূদ্র পর্য্যায়ে বিন্যস্ত করেছেন। একমাত্র সেবাই তাদের

ধর্ম। প্রকৃতি রাজ্যে তাদের কোনরূপ স্বকীয় স্বাতন্ত্র্য নেই। শরৎ শীতের তলাপি বহন করে মাত্র। রবীন্দ্রনাথ অতি স্বল্প পরিসরে শরৎ কালের মনোজ্ঞ চিত্র রচনা করেছেন। বর্ণ বিচারে কবির চোখে শরৎ ক্ষুদ্র রূপে পরিগণিত হলেও, এই ঋতুর নয়নাভিরাম দেহসজ্জা ও বিচিত্র পুষ্পাভরণ, ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য-চিত্র স্বরূপতায় কবির রচনায় মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে।

ঋতুসংহারের চতুর্থ সর্গে কবি কালিদাস অতি স্বল্প পরিসরে হেমন্ত ঋতুর প্রাকৃতিক রূপ চিত্র তুলে ধরেছেন। কবির কল্পনায় হেমন্ত ঋতু সর্ব্বাঙ্গসুন্দর। হেমন্তের নির্মেঘ আকাশ, হিম শীতল বাতাস, শস্য পল্লবের রমণীয় শোভা, কুয়াশাচ্ছন্ন বনস্থলী, ক্রৌঞ্চ মিথুনের মনোহর কলধ্বনি,—সকল মানুষকেই আকৃষ্ট করে।

হৈমন্তী সাজে রমণী-দেহের রূপ অনিন্দ্য সুন্দর। তাদের আলোল কুন্তলে কুসুমের সাজ, অঙ্গলতিকায় মনোহর কুঙ্কুমের রাগলতা, ভুজলতায় বলয়, নিতম্বে নবীন বসন, চরণ-কমলে নূপুর ভূষণ ও অঙ্গদের মণিময় বিভূষণ,—সকলকে রসাক্লিপ্ত করে তোলে।

কালিদাসের কাছে হেমন্তের মর্ম্মবাণী রসেরই বাণী। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে মর্ত্য-প্রেমিক কবি মানুষের প্রাত্যহিক জীবনলীলার কতকগুলি চিত্র তুলে ধরেছেন। এই বাণীচিত্রগুলি সাবলীল প্রকাশধর্ম্মে সমুজ্জ্বল।

বাল্মীকির রচনায় হেমন্ত বর্ণনার সবিশেষ উল্লেখ পাওয়া যায় না। রবীন্দ্রনাথ এই ঋতুটির বর্ণ-বৈচিত্র্য সম্বন্ধে নীরব থাকেন নি। হেমন্তকে কবি কল্যাণী বধূ রূপে চিত্রিত করেছেন,—

'হায় হেমন্ত লক্ষ্মী, তোমার নয়ন কেন ঢাকা,
হিমের ঘন ঘোমটাখানি ধূমল রঙে আঁকা'।

ভাষা ও ছন্দ বিন্যাসে কল্পচিত্রটি সার্থক। হেমন্তের ভরা মাঠ ভরা নদী মনকে আকৃষ্ট করলেও তা কবির কাছে নিতান্তই বৈশিষ্ট্যবর্জিত। হেমন্তকালে উৎসবের শেষ নেই, তবু ঋতু রাগিণীতে তার প্রকাশ নেই। এর কারণ স্বরূপ কবি বলেছেন,—'ঐ ঋতুতে বাস্তব ব্যস্ত হইয়া আসিয়া মাঠ ঘাট জুড়িয়া বসে। বাস্তবের সভায় সংগীত মুজরা দিতে আসে না। যেখানে অখণ্ড অবকাশ, সেখানেই সে সেলাম করিয়া বসিয়া যায়।' রবীন্দ্রনাথ এখানে অবকাশ তত্ত্বের আধারে হেমন্ত ঋতুর বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করেছেন। বিষয়টি নিঃসন্দেহে ভাবধর্মী। কবির নিসর্গ পর্য্যবেক্ষণের সূক্ষ্ম পরিচয়টিও এখানে সুস্পষ্ট।

কালিদাসের শিশির ঋতুর বর্ণনা ঋতুসংহারের পঞ্চম সর্গের উপজীব্য বিষয়। ক্ষুদ্র পরিসরে এই ঋতুর বৈশিষ্ট্য—পরিচয় বিধৃত হয়েছে। হেমন্তের ন্যায় শিশির ঋতুর রূপ চিত্রের মধ্যেও মানব মানবীর নিরাবরণ দেহ কামনা ও শৃঙ্গার রসোদ্বোধক কামকেলির ক্লিন্নতা প্রকাশ পেয়েছে। শিশির বর্ণনের প্রারম্ভিক শ্লোকটি বড়ই মধুর:

'প্ররূঢ় শাল্যংশুচয়ৈর্মনোহরং
ক্বচিৎ স্থিতক্রৌঞ্চনিনাদরাজিতম্।
প্রকামকামং প্রমদাজনপ্রিয়ং
বরোরু কালং শিশিরাহ্বয়ং শৃণু॥"

কবি বলেছে এই কালের সমস্তই সুন্দর। পরিষ্কার শালিধান্যের বর্ণচ্ছটাতে চারিদিক মনোহর। ক্রৌঞ্চ-কুলের মধুর নাদে দিগন্তব্যাপী মুখরিত। এই অপরূপ রমণীয় শিশিরকালে হৃদয় দুঃসহ কামানলে সন্ধুক্ষিত হয়। কামমোহিতা ললনাদের ক্ষেত্রে এ কাল পরমপ্রিয়।

শিশিরকালে সূর্য্যের কিরণ বড়ই উপভোগ্য। শীতের সমীরণ, সিতাংশু কিরণ, দ্যুতিময় নক্ষত্র, কমল-কর সরোবর হিমপাতে বিধ্বস্ত হয়ে প্রকৃতির সৌন্দর্য্য-বাসরে কোনরূপ শোভাবর্দ্ধন করতে পারে না। শীতের বৈচিত্র্য জনগণের চিত্তলোকে কোন মধুর ভাবাবেগ সৃষ্টি করতে অক্ষম। এই ঋতুতে কেবলই ভোগ প্রাচুর্য্যের নর্মলীলা। প্রবৃত্তি জীবনের ভোগবাসনাই এই ঋতুর মর্মবাণী।

কবি কালিদাস জীবন রসের রসিক। শিশির বর্ণনার মধ্যে তাঁর রসিক মনের পরিচয়টি উৎসারিত। এই ঋতুর প্রাকৃতিক চিত্র অবলোকনে কবি-চিত্তে মাদকতার তুফান উঠেছে। প্রকৃতির পরিবেশে কবি ভোগের আরতি করেছেন এবং ভোগ প্রাচুর্য্যের মধ্যে তিনি প্রকৃতির মহিমা প্রতিষ্ঠার প্রয়াসী হয়েছেন।

বাল্মীকির বর্ণনায় শিশির ঋতুর পরিপূর্ণ চিত্রালেখ্য পাওয়া যায় না। তবে যে কয়টি খণ্ডচিত্র তাঁর কাব্যে স্থান পেয়েছে সেগুলি কবির ভাব কল্পনায় সমুজ্জ্বল।

শিশির ঋতু বর্ণনায়, রবীন্দ্রনাথের কবিকল্পনা ভিন্নমুখী। তাঁর মতে, শিশির ঋতু বৈশ্য। শীতের শস্য-প্রাচুর্য এবং মানুষের প্রয়োজনমুখী বহুধা উদ্যম এই ঋতুকে বৈশিষ্ট্য দান করেছে। বাল্মীকির মত রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি ক্ষেত্রে শীতের সর্ব্বরিক্ত জীর্ণ মূর্ত্তি চিত্রিত করেছেন;—যেমন:

'এ কী মায়া লুকাও কায়া জীর্ণ শীতের সাজে
আমার সয় না প্রাণে কিছুতে সয় না যে।'

আবার শীতের শস্যসমৃদ্ধ রূপ চিত্রটিও কবিকে মুগ্ধ করেছে:

'এলো যে শীতের বেলা বরষ পরে।
এবার ফসল কাটো, লও গো ঘরে॥'

শীতে বাংলাদেশের গ্রামগুলি যে বিচিত্র আনন্দ উৎসবে মেতে ওঠে তার বাস্তব চিত্রগুলি রবীন্দ্র সাহিত্যে ইতস্ততঃ ছড়িয়ে আছে। তবু ঋতু সম্পর্কিত এই চিত্রগুলি রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি অনুভবের চরম কথা নয়। ঋতুর ভিন্ন পরিচয়ও তাঁর সাহিত্যে বিদ্যমান। সেখানে তাঁর কবিচিত্ত আত্মভাবনামূলক নানা ভাব তরঙ্গ ও বিচিত্র ভাবনাস্রোতেআন্দোলিত।

ঋতুসংহারের ষষ্ঠ সর্গে বসন্ত বর্ণনা বিধৃত হয়েছে। এখানেও কবি উদ্দাম ভোগের আরতি করেছেন। বসন্ত বর্ণনার মধ্যে কবির কোন বৈশিষ্ট্যই প্রকাশ পায় নি। ঋতুটিকে কবি নিছক সম্ভোগবিলাসী রসিকের দৃষ্টিতেই দেখেছেন। এক বিচিত্র রসপ্রেরণা কবি-চিত্তকে উদ্বেল করেছে। কামবিধুর লীলা-বিলাসের ভাবতরঙ্গ কবির কল্পনাকে উদ্দীপিত করেছে। প্রকৃতির মাধুর্য্য রস পানে বিহ্বল কবি প্রবৃত্তি সত্তার মহিমা বোধে আনন্দে অধীর।

রমণীয় ঋতু বসন্তের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কটি ভোগ বাসনায় অচ্ছেদ্য। কেবল বসন্ত ঋতুই নয়, সকল ঋতুই মানুষের কাছে কামোদ্দীপক। কবি কালিদাস শৃঙ্গার রসের পথ বেয়ে ষড়্ ঋতুর অঙ্গনে পদচারণা করেছেন। প্রকৃতি ভাবনায় তিনি বাল্মীকির উত্তরসূরী। উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গি প্রধানতঃ শৃঙ্গার রসাশ্রিত।

নিসর্গপটে রণবীরের মতই বসন্ত ঋতুর আবির্ভাব। কবির ভাষায়:

'প্রফুল্লচূতাঙ্কুর-তীক্ষ্ণ-সায়কো দ্বিরেফমালাবিলসদ্ধনুর্গুণঃ'

বসন্ত বর্ণনায় কবির বিরহ ভাবুকতাময় স্বপ্ন-বিলাসের একটি সুন্দর পরিচয় বিধৃত হয়েছে। এমন একটি ভাবব্যাকুলতা এবং কল্পনাশীলতার বৈশিষ্ট্য বাল্মীকির বসন্ত বর্ণনাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। পম্পা সরোবরের চারিদিকে বসন্ত ঋতুর আবির্ভাব রামচন্দ্রকে তাপাতুর করে তুলেছিল। সীতা বিরহে রামচন্দ্র ঐ সময়ে কামশরে ব্যথিত হয়েছিলেন। বাল্মীকির বসন্ত বর্ণনায় রঘুবীরের সেই বিরহকাতর বিলাপধ্বনি গীতাত্মক ভঙ্গিতে বাণীবদ্ধ হয়েছে; যেমন,—

'অশোকস্তবকাঙ্গারঃ ষট্পদস্বননিস্বনঃ।
মাং হি পল্লবতাম্রার্চির্বসন্তাগ্নিঃ প্রধক্ষ্যতি॥'

'অশোক স্তবক যার প্রদীপ্ত অঙ্গার, ভ্রমরগুঞ্জন যার নিঃস্বন, তাম্রবর্ণ কোমল পল্লব যার শিখা, সেই বসন্তাগ্নি আমাকে দগ্ধ করছে। আমি মন্মথশরে আক্রান্ত, তাতে আবার ময়ূরীগণ মদনমোহিত হয়ে আমার কাম আরও বৃদ্ধি করছে।'

রবীন্দ্রনাথের বসন্ত বর্ণনা উপলব্ধির প্রাণদস্পর্শে সঞ্জীবিত। বসন্তের রাগরাগিণী কবিচিত্তকে মুগ্ধ করেছে। কবি লিখেছেন –

'বসন্ত তার গান লিখে যায় ধূলির পরে
কি আদরে।'

প্রতি বৎসর নবীন সাজেই বসন্ত প্রকৃতির অক্ষয়পটে আবির্ভূত হয়। তার কণ্ঠে যৌবনের ললিতবাণী, সঙ্গে নবীনের সরস লাবণ্য। এমন একটি চিরনবীন, প্রাণময় মূর্ত্তির কাছে সকল পুরাতন হার মানে। কবির ভাষায়:

'সেই পুরাতন সেই চিরন্তন অনন্তপ্রবীণ
নব পুষ্পরাজি
বর্ষে বর্ষে আনিয়াছ, তাই লয়ে আজো পুনর্ব্বার
সাজাইলে সাজি।'

কালিদাসের ঋতুসংহার মূলতঃ কামপ্রধান। ঋতু-ষষ্ঠকের চিত্র চিত্রণে কবি দেহসত্তা ও মানস, এই দুয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য সৃষ্টি করতে চাননি; বরং দু'য়ের সমন্বয়ে এক সার্থক শিল্প সৃষ্টি করতে প্রয়াসী হয়েছেন। কবির রচনায় যে দুটি বিশেষ নীতি অনুসৃত, তার মধ্যে একটি সৌন্দর্য্যনীতি, অপরটি রসনীতি। রস ও সৌন্দর্যে আবিষ্ট হয়ে কবি তাঁর কাব্যবস্তু নির্বাচন করেছেন। মুখ্যতঃ ঐ দুটি উপাদানেই তাঁর কবি-মানস গড়ে উঠেছে।

সংস্কৃত-সাহিত্য বস্তুতঃ রস-সাহিত্য। সাহিত্যের শেষ কথাটি রয়েছে রসে। এ প্রসঙ্গে আলঙ্কারিকদের সিদ্ধান্তটি স্মরণ করা যেতে পারে,—'বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্' অর্থাৎ রসাত্মক বাক্যই কাব্য। রসের আস্বাদন অলৌকিক; কিন্তু রসসৃষ্টির উপাদানগুলি লৌকিকভাবে পরিপুষ্ট। কবি-প্রতিভার স্পর্শে ঐ উপাদানগুলি যখন রসে রূপান্তরিত হয় তখনই সেগুলি লৌকিকতার সীমা অতিক্রম করে। কালিদাসের কাব্যে জীবনস্ফুরণ ও শিল্পকলার শাশ্বত-সৌন্দর্য্য রূপটি যেন চির অম্লান হয়ে আছে।

কালিদাসীয় সাহিত্য শ্লীলতা-অশ্লীলতা বিচারে বিধাম্বিত। তাঁর রস-সাহিত্যে শৃঙ্গার-রসই প্রধান। কেবল তাঁর সাহিত্যেই নয়, সংস্কৃত রস-সাহিত্যে শৃঙ্গার রসের আধিক্য পরিদৃশ্যমান। দেহ ও দেহজ কামনাকে কেন্দ্র করে তৎকালীন সংস্কৃত সাহিত্যের কবিকুল রসের আরতি-প্রদীপ জ্বেলেছিলেন। বলা বাহুল্য সে-যুগের শিল্পী ও কবিগণ ছিলেন জীবন-রসের রসিক। এমনি একজন রসিক পুরুষ ছিলেন মহাকবি কালিদাস। তিনি যে-যুগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সে-যুগ ঐশ্বর্য্য-বিলাসী সামন্ততন্ত্রের যুগ। নাগরিক জীবন ছিল সে-যুগে স্বচ্ছ, সুন্দর ও বিলাসময়। ঋষি অরবিন্দের ভাষায়:

"With the supreme gifts Kalidasa had the advantage of being born into an age with which he was in temperamental sympathy and a civilisation which lent itself naturally to his peculiar descriptive genius. It was an aristocratic civilisation, as indeed were those which had preceded it, but it far more nearly resembled the aristocratic civilisations of Europe by its material luxury, its aesthetic tastes, its poetic culture, its keen worldly wisdom and its excessive appreciation of wit and learning."(৬)

ভারতবর্ষ ঋতু-ষট্ককে চিরদিনই হৃদয়ের অন্তঃপুরে স্বাগত জানিয়েছে। এদেশে মানুষ ও প্রকৃতির সম্পর্কটি অতি নিবিড়। ভারতবাসী প্রকৃতিকে কখনো মানব-সংসার হতে দূরে সরিয়ে রাখেনি। ভারতের কবিকুল যুগান্তক্রমে ষড়্ঋতুকে ভাব ও চিত্ররূপে ধ্যান করেছেন। নিসর্গের মর্ম্মবাণীকে তাঁরা সাধারণের আয়ত্তগম্য সীমায় উন্নীত করতে প্রয়াসী হয়েছেন। তাঁদের এই প্রচেষ্টা যথার্থ-সার্থক। কালিদাসের 'ঋতুসংহার' নিসর্গ সৌন্দর্য্য ও ভোগ-ঐশ্বর্য্যের চিত্রলেখা। কাব্যখানি ষড়্ঋতুর গৌরবর্দ্ধনি। কবি এখানে প্রকৃতির মাহাত্ম্য কথনে পঞ্চমুখ। কাব্যখানিতে ভারতীয় জীবন-সাধনার প্রতি-ফলন স্পষ্টরেখ। এর মধ্যে ঐশ্বর্য্য ও সজীবতা দুই-ই আছে। কাব্যের অন্তর্নিহিত সুষমা, অতুলনীয় শব্দ-সৌষ্ঠব, উপমার অসীমতা ও নবীনতা পাঠক-চিত্তকে প্রলোভিত করে।...বস্তু ও ব্যক্তির আলঙ্কারিক সৌন্দর্য্য মহিমা-বিন্যাসেই সেকালের কবিকৃতির পরিচয়। সেই হেতু ঋতুসংহারের কাব্যসৌন্দর্য্য আজও অপরিম্লান।

(১) 'সংস্কৃত সাহিত্যের রূপরেখা'—ডঃ বিমানচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।
(২) 'History of Sanskrit Literature: Keith.
(৩) কালিদাসের গ্রন্থাবলী (প্রথম ভাগ): পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত।
(৪) 'ত্রয়ী': ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত।
(৫) 'কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ': শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য্য।
(৬) 'Kalidasa': Sri Aurobindo.

একখানি ঐতিহাসিক চিঠি

(মীরজাফর, মীরকাশিম ও ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি)

শচীন্দ্রলাল রায়

॥ ভূমিকা ॥

১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের ২৩শে জুন ভাগীরথীর তীরে পলাশী প্রান্তরে সিরাজদ্দৌলার সঙ্গে ইংরাজদের যুদ্ধে চক্রান্তকারী জগৎশেঠ, মীরজাফর, রাজবল্লভ, রায়দুর্লভ, উমিচাঁদের দলের অভিপ্রায় সিদ্ধ হলো। সিরাজ যুদ্ধে জয়ী হতে চলেছেন এমন সময় বিশ্বস্ত সেনাপতি মীরমদন নিহত হলেন। তখন স্বজাতি শত্রুদের দ্বারা পরিবেষ্টিত রয়েছেন সিরাজ। নিরপেক্ষ দর্শকের ভূমিকায় বাংলার 'সিপাইশালা'র মীরজাফর যুদ্ধ শিবিরে অবস্থান করছেন। মীরমদনকে যুদ্ধে নিহত হতে দেখে সিরাজ ব্যাকুল হয়ে ছুটে এলেন মীরজাফরের কাছে। তাঁকে অনুনয় করলেন যুদ্ধ-পরিচালনার ভার নিতে। মীরজাফরের পরামর্শে নবাব-বাহিনীকে যুদ্ধ-বিরতির আদেশ দেওয়া হলো। সুযোগ বুঝে ইংরাজরা করলো পাল্টা আক্রমণ। পরাজিত হয়েও ইংরাজরা হলো জয়ী। সিরাজ পালালেন। তারপর ধৃত হয়ে তাঁকে আনা হলো মুর্শিদাবাদে। মীরজাফরের পুত্র মীরণের আদেশে সিরাজের মস্তক ছিন্ন হলো। বাংলার সূর্য্য হলো অস্তমিত। মীরজাফরের প্রাসাদের প্রথম ফটকের নাম হয়ে রইলো—'নেমকহারাম দেউড়ি'।

পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্রেই ক্লাইভ পূর্ব্বচুক্তি অনুযায়ী মীরজাফরকে কুর্নিশ করে জানিয়ে দিলেন- তিনি হলেন নূতন নবাব। এখন তাঁরই অনুগত হয়ে চলবেন ক্লাইভ আর তাঁর দলবল। মুর্শিদাবাদ ফিরে এসে মীরজাফর বসলেন নবাবের সিংহাসনে।

সিংহাসন কিন্তু মীরজাফরের পক্ষে কণ্টকের আসন হয়ে উঠলো। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি বুঝলেন যে তাঁর আর্থিক দুরবস্থা চরমে দাঁড়িয়েছে। সিংহাসনে বসার সঙ্গে সঙ্গে নবাব দিয়েছিলেন দেড়কোটি টাকা ইংরাজদের—তাঁর নবাবি লাভের খেসারত স্বরূপ। তাছাড়া ক্লাইভকে দিতে হয় একুশ লক্ষ টাকা পুরস্কার আর একটা মোটা আয়ের জায়গীর যার বাৎসরিক আয় প্রায় পাঁচলক্ষ টাকার মত। নৌবহর ও সেনাবাহিনীর জন্যও আরও পাঁচলক্ষ টাকা দিতে বাধ্য হলেন মীরজাফর। চুক্তি অনুযায়ী সব দাবী-দাওয়া মিটিয়ে দিয়েও ইংরাজদের শেষ পর্যন্ত সন্তুষ্ট করতে পারেন নি।

কোনও রকমে তিনবছর কয়েকমাস নবাবি করলেন মীরজাফর। পুত্র মীরণের অকালমৃত্যু, নিজের বার্দ্ধক্য ও তজ্জনিত মানসিক জড়তা, শূন্য রাজকোষ, ইংরাজদের অর্থ গৃধ্নুতা— এইসব কারণে বাংলার শাসনযন্ত্র একেবারে বিকল হয়ে পড়লো।

ক্লাইভ তখন দেশে ফিরে গেছেন। গভর্ণর ভান্সিটার্ট। তাঁর অর্থলোলুপতা মীরজাফরের জীবন দুর্বিষহ করে তুললো। শেষ পর্যন্ত ভান্সিটার্ট মীরজাফরের জামাতা মীরকাসিমের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে মীরজাফরকে সিংহাসনচ্যুত করলেন। নবাব হয়ে বসলেন মীরকাসিম ১৭৬০ সালে। তারপর তাঁর ভাগ্যে যা ঘটেছিল তা হচ্ছে ইতিহাসের কথা।

মীরজাফর সিংহাসনচ্যুত হওয়ার প্রায় দুবছর পর ১৭৬২ সালের ১০ই মার্চ কয়েকজন ইংরাজ ভদ্রলোক—

যাঁরা ছিলেন বেঙ্গল কাউন্সিলের সদস্য—একখানি চিঠি লেখেন তাঁদের ওপরওয়ালা—প্রাচ্যে ব্যবসায়ও ইংলণ্ডের মাননীয় সংযুক্ত বণিক কোম্পানীর গোপন সমিতির সদস্যদের নিকট। এতে আছে মীরকাসিম আলির পক্ষে যে বিপ্লব গভর্ণর ভান্সিটার্ট তাঁর বঙ্গদেশে আসার কিছু দিন পরেই সুরু করে মীরজাফরকে পদচ্যুত করেন তারই বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।

এই ঐতিহাসিক লিপিটি লণ্ডনে ছাপা হয় পুস্তিকাকারে ১৭৬৪ সালে। মূল্য এক শিলিং। প্রকাশক টি. বেকেট ও পি. এ. ডি. হন. ডেট।

বইখানির সঙ্গে একটি বিজ্ঞাপনও ছাপা হয়। তাতে আছে—নিম্নলিখিত পত্রখানি প্রকাশিত হলো মালিক পক্ষকে বর্তমান আন্দোলনের মুখ্য কারণ জানানোর এবং জাফর আলি খাঁকে সিংহাসনচ্যুত করার প্রকৃত মতলব উদ্ঘাটনের জন্য।

ভদ্রলোকের (মীরকাসিমের) হিতৈষীগণ যে বিপ্লব ঘটালেন তাঁরা কি উদ্দেশ্যে এই বিশেষ ঘটনার অবতারণা করেছেন তার কৈফিয়ৎ তাঁদেরই দিয়েছেন। সুতরাং তার পাল্টা জবাব প্রকাশ করা নিশ্চয় অসঙ্গত বিবেচিত হবে না যাতে জনসাধারণ প্রতিপক্ষের যুক্তিও অনুধাবন করিতে পারেন।

এইরকম প্রশ্নের গুরুত্ব সম্বন্ধে স্থির নিশ্চয় হতে হলে এই চিঠির লেখকদের মধ্যে কর্ণেল কুট ও মেজর কার্ণাকের মত বিজ্ঞদের নাম নিশ্চয়ই সাহায্য করবে কারণ তাঁদের নাম দেশপ্রেমিকদের কাছে বিশেষ শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে থাকে।

যা হোক, এ কথা ন্যায়-বিচারে অবশ্য স্বীকার্য যে যখন আঘাত হানা হলো তখন যারা বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন অমায়িক চরিত্রের লোক তাঁদের মধ্যে অনেকেই যা করা হয়েছে তাতে সম্মতি দান করেছেন।

জ্ঞানী ও মহান ব্যক্তিদেরও মাঝে মাঝে মতপার্থক্য ঘটে থাকে এইরকম চিত্তাকর্ষক বিষয়ের নানা সূত্র অনুধাবনে। অপরপক্ষের উপস্থাপিত বিষয়বস্তু এবং যুক্তি প্রদর্শিত হলে নিরপেক্ষ ব্যক্তি দুই দিক বিচার করে একটা সিদ্ধান্তে আসতে পারবেন আশা করা যায়।

———

পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ব্যবসারত ইংল্যাণ্ডের মাননীয় সংযুক্ত বণিক সমিতির গুপ্ত সংস্থার সদস্যগণের প্রতি :—

মাননীয় মহোদয়গণ,

(১) নিতান্ত প্রয়োজনবোধে যেভাবে বক্তব্য পেশ করতে বাধ্য হচ্ছি তাতে আমরাও অত্যন্ত সঙ্কোচ বোধ করছি। কিন্তু বঙ্গদেশে যে বিপ্লব ঘটানো হয়েছে এবং যেভাবে তা করা হয়েছে তার সম্বন্ধে প্রকাশ্যেই আমাদের ভিন্ন মতের কথা যখন ব্যক্ত করেছি তখন বিপরীত মনোভাব কেন আমরা গ্রহণ করেছি এবং কেনই বা যে ভদ্রলোকেরা এই বিপ্লব ঘটিয়েছেন তাঁদের সঙ্গে একমত হতে পারিনি তার কারণ আপনাদিগকে জানানো আমাদের কর্তব্য বলে মনে করি। তা না করলে দুরভিসন্ধিপরায়ণ লোকেরা এই বিরোধিতা সত্যই আমরা যে ন্যায়সঙ্গত মনোভাব নিয়ে করেছি সে কথা না বুঝে অপবাদ করে বলবে যে আমরা বিরোধ বাধানোর জন্যই ওটা করেছি। আমরা বিরোধিতা করেছি আমাদের মহান্ দেশের সম্ভ্রম রক্ষার উদ্দেশ্যে এবং আমাদের কর্মচারীদের স্বার্থ রক্ষার্থে। যদি এই ব্যাপারে বোর্ডের সমস্ত সদস্যের সঙ্গে আলোচনা করে মতামত নেওয়া হতো, তাহলে একথা জোর করেই বলতে পারি যে অধিকাংশ সদস্যই এর বিরোধিতা করতেন এবং এই বিপ্লবের প্রস্তাব নাকচ করে দিতেন। আমরা বিনীতভাবে আপনাদের জানাচ্ছি যে এইরূপ সরকার পরিবর্ত্তনের মত গুরুতর বিষয়ে প্রেসিডেন্ট কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করার পূর্বে তাঁর কি প্রত্যেক সদস্যের মতামত জেনে নেওয়া উচিত ছিল না?

(২) গত বছরেই মীরমহম্মদ কাসিম আলির পক্ষে এই বিস্ময়কর বিপ্লব সমর্থনকারীরা তাঁদের পক্ষের যুক্তিগুলি ফলাও করে আপনাদের জানিয়ে দিয়েছেন।

তাঁদের দেওয়া বিবরণ জ্ঞাত হয়ে আপনারা যে রায়ই দিয়ে থাকুন না কেন, এখন আমরা যে কথা আপনাদের জানাচ্ছি সেটা সম্যক উপলব্ধি করলে যেভাবে এই বিপ্লব ঘটানো হয়েছে তার সমস্ত খুঁটিনাটি ব্যাপার জ্ঞাত হলে আপনারা আমাদের সঙ্গে একই ধারণা পোষণ করবেন যে ব্যাপারটি সত্যই কদর্য্য বলে গণ্য হওয়া উচিত। আমরা সেই ঘটনার বিবরণ যতটা সম্ভব বিস্তারিতভাবে দেওয়ার চেষ্টা করবো।

(৩) যে সময় আমাদের এবং নবাব জাফর আলি খাঁর মধ্যে বিন্দুমাত্র মত-বিরোধ অথবা ঘৃণার ভাব বিদ্যমান ছিল না বরং বন্ধুত্ব ও সমপ্রাণতা বিদ্যমান ছিল, সে সময়েই নবাবের জামাতা মীরকাসিম খাঁ কোনও না কোনও ছল-চাতুরীর আশ্রয় নিয়ে মিস্টার ভ্যান্সিটার্টের সঙ্গে দেখা করার জন্য কলকাতা আসেন এবং অল্প কিছু-দিন কলকাতায় থেকে মুর্শিদাবাদ ফিরে যান। মীর-কাসিম কলকাতা থেকে চলে যাওয়ার কয়েকদিন পরেই মিস্টার ভ্যান্সিটার্ট নবাবের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছেন এই ছল করে মুর্শিদাবাদ রওনা হন। কর্ণেল ক্যালড (Caillaud) দুইশ' ইউরোপীয় সৈন্য এবং কিছু সিপাই নিয়ে তাঁর সঙ্গে যান। এতগুলি সৈন্য সঙ্গে নেওয়ায় যাতে কোনও সন্দেহের উদ্রেক না হয় সে জন্য তিনি এই ভান করলেন যে সৈন্যদের পাটনা পর্য্যন্ত পাঠানো হচ্ছে সেখানকার সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধির প্রয়োজনে। মিস্টার ভ্যান্সিটার্ট মেরোদবাগ পৌঁছিলে নবাব তাঁর সঙ্গে দুই বার দেখা করেন। দ্বিতীয়বারের সাক্ষাৎকালে মিস্টার ভ্যান্সিটার্ট পূর্ব্বে তাঁর মতলবের কোনওরূপ আভাস না দিয়ে ১৭৬০ সালের ১০ই নভেম্বরের আলোচনায় যার উল্লেখ আছে এবং যার নকল আপনাদের কাছে পাঠানো হয়েছে সেই তিনখানি চিঠি নবাবের হাতে দেন। এমন আকস্মিকভাবে একের পর এক চিঠিগুলি নবাবকে দেওয়া হলো এবং যে-সব অকল্পনীয় প্রস্তাব এতে ছিল তা দেখে নবাব ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন। তিনি যে তখন কি করবেন তা স্থির করাও তাঁর পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠলো। অবশেষে, কি করবেন তা একটু ভেবে-চিন্তে দেখার জন্য নবাব সময় চাইলেন। মিস্টার ভ্যান্সিটার্ট নবাবের কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় ভাব দেখে জোর দিয়ে বললেন তাঁকে তখনই তাঁর আত্মীয়ের মধ্যে কারও নাম করতে হবে যাঁকে সুবার ভার দেওয়া যেতে পারে। বিশেষ করে কাসিম আলি খাঁয়ের নামই মিস্টার ভ্যান্সিটার্ট সুপারিশ করলেন। কাশিম আলিকে ডেকে পাঠানো হলো। নবাবকেও অনুরোধ করা হলো যে তিনি যেন কাসিম আলি না আসা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করেন। কাসিম আলি আসতে খুব দেরী করে ফেললেন। এদিকে নবাবের উৎকণ্ঠা তখন চরমে উঠেছে। তিনি চলে যাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন তিনি। মিস্টার ভ্যান্সিটার্ট নবাবের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁকে আটকিয়ে রেখেছেন অনেকক্ষণ। মুখ রক্ষার জন্য তিনি নবাবকে প্রাসাদে ফিরে যেতে বললেন।

সেই রাতে এবং পরদিন কাসিম আলির সঙ্গে গোপন আলোচনায় কাটলো। কি ভাবে মতলব হাসিল করা হবে তা পূর্ব্বে কলকাতাতেই ঠিক হয়ে আছে।

১৭৬০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কাসিম আলি যখন কলকাতায় যান তখনই উভয়ের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর হয়ে গিয়েছে। তাঁদের আলোচনার ফলে আমাদের সৈন্যরা অসঙ্গতভাবে কর্ণেল কালাডের পরিচালনায় নদী পার হলো। তাদের সঙ্গে কাসিম আলি খাঁও দলবল নিয়ে যোগ দেয়। তারপর নবাব-প্রাসাদ ঘিরে ফেলা হলে ভ্যান্সিটার্টের কাছ থেকে একটি চিঠি যায় নবাবের কাছে। তাতে অবিলম্বে তাঁর কাছে যে প্রস্তাব পূর্ব্বেই করা হয়েছে তা মেনে নিতে বলা হয়েছে। উত্তরে নবাব লেখেন যে তিনি এ-রকম ব্যবহার ইংরাজদের কাছ থেকে কখনও আশা করেননি। যতক্ষণ তাঁর ফটকের সামনে সৈন্য থাকবে ততক্ষণ তিনি কোন চুক্তিই স্বীকার করে নেবেন না। তাঁর ইচ্ছা যে ইংরেজ সৈন্য অবিলম্বে মেরোদবাগ ফিরে যাক।

তারপর নবাবের কাছে এই সাবধান-বাণী পাঠানো হয় যে তিনি যদি অবিলম্বে প্রস্তাব মেনে না নেন তাহলে

তাঁর প্রাসাদ আক্রমণ করার আদেশ দেওয়া হবে। এই অভাবনীয় ঝঞ্ঝাটে নবাব বিচলিত ও ভীত হয়ে প্রাসাদ দরজা খুলে দিয়ে চীৎকার করে বলতে লাগলেন যে তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে। ইংরাজরা শঠতা ও বিশ্বাসভঙ্গের দায়ে দোষী। তাঁর সরকারের বিরুদ্ধে যে একটা ষড়যন্ত্র চলছে তা তিনি আগে থেকেই বুঝতে পেরেছিলেন। তাঁর এমন শুভানুধ্যায়ী এখনও আছে যে তারা অন্ততঃ একটা যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারে, তাঁকে সমর্থন করার জন্য। যদিও ইংরাজ জাতির তরফ থেকে কোনও প্রতিশ্রুতিরই মূল্য নাই, তবুও তিনি যখন তাঁদের বিশ্বস্ত বন্ধুরূপে থাকবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তখন তিনি তাঁর সেই কথার খেলাপ কখনও করবেন না। তিনি বরং মৃত্যুবরণ করবেন তবুও ইংরাজদের বিরুদ্ধে তরবারি ধরবেন না। তাঁকে বিক্রয় করা হয়েছে এমনি একটা সন্দেহ তাঁর মনে জেগেছে। তিনি জানতে চান, কত টাকা কাসিম আলি খাঁ তার সুবেদারি পদের জন্য দিয়েছে। তিনি তার দেড়গুণ টাকা দেবেন, যদি তাঁকে তাঁর সুবেদারির পদ চালিয়ে যেতে দেওয়া হয়। যা হোক, তিনি আশা করেন যে যদি তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করাই উদ্দেশ্য হয় তা হলে তাঁকে যেন তাঁর জামাতার ওপর ছেড়ে না দেওয়া হয়। কারণ তার হাতে চরমতম নিগ্রহ হতে পারে এ-ভয় তাঁর আছে। বরং মুর্শিদাবাদ থেকে তাঁকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হোক আর কলকাতার একটা নিরাপদ আস্তানার ব্যবস্থা করা হোক।

নবাবের এই শেষ অনুরোধ তাঁর ভয় ও হতাশা থেকে উদ্ভূত হলেও সেইটাই তাঁর স্বেচ্ছায় পদত্যাগ বলে ধরে নিয়ে তা প্রচার করা হলো। তদনুসারে আমাদের সেনারা প্রাসাদ দখল করলো। মীরকাসিমকে মসনদে বসানো হলো। বৃদ্ধ নবাবকে তাড়াতাড়ি একটা নৌকায় তুলে দেওয়া হলো কয়েকজন স্ত্রীলোক ও কিছু কিছু জিনিসপত্র সঙ্গে দিয়ে। এমনভাবে তাঁকে পাঠানো হলো কলকাতায় যা ক্ষণপূর্বের উচ্চ সম্ভ্রান্ত পদাধিকারীর পক্ষে মর্ম্মান্তক। তাঁর উত্তরাধিকারী যে স্বল্প মাসোহারার ব্যবস্থা তাঁর জন্য করেছেন তাও বিসদৃশ।

(৪) এইভাবে জাফর আলি খাঁকে গদিচ্যুত করা হলো। যে পবিত্র শপথ নিয়ে তাঁকে গদিতে বসানো হয়েছিল তা ভেঙ্গে ফেলা হলো। সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজ জাতির মহান্ নৈতিক ধর্মকেও জলাঞ্জলি দেওয়া হলো। এই রাজপুরুষের মিত্রতা ও সহানুভূতির নিদর্শন আপনারা বহুক্ষেত্রে পেয়েছেন। তাঁকে সাহায্য করার জন্য আমাদের অস্ত্র কত সম্মানের সঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছে। তাঁর সঙ্গে গভীর প্রীতিতে আবদ্ধ থেকে ইংরাজ জাতি এমন বিশ্বস্ততা ও আনুগত্যের বিশ্বজনীন আদর্শ দেখিয়েছে যা দেখে এখানকার নেটিভরা ইংরাজ জাতির ওপর সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করেছে।

(৫) এই বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তন ঘটানোর ফলে কোম্পানি যে যে সুবিধা পাবে তা হচ্ছে—বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রামের জমিদারি, নবাব জাফর আলি খাঁর কাছে যে অবশিষ্ট টাকা পাওনা আছে সেই প্রাপ্য টাকা এবং বারমণ্ডলের তীরে ফরাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ব্যয়স্বরূপ পাঁচলক্ষ টাকার উপঢৌকন। এগুলি পাওয়া যাবে কাসিম আলি খাঁর কাছ থেকে। মিস্টার ভ্যান্সিটার্ট কলকাতায় ফিরে আসার পরেই এসব কথা বোর্ডকে জানিয়ে দেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর কার্য্যের সমর্থনে বোর্ডে একটি স্মারকলিপিও পেশ করেন যার নকল গত বছরের জাহাজে আপনাদের নিকটও পাঠানো হয়েছে।

(৬) ঐ স্মারকলিপিতে জাফর আলি খাঁর বিরুদ্ধে এমন কতকগুলি অপরাধের তালিকা সন্নিবিষ্ট হয়েছে তা যাঁরা পূর্ব্বদেশীয় রাজাগুলির সঙ্গে পরিচিত নন এরূপ সভ্যজাতির মানুষের কাছে ঘৃণ্যতম ব্যাপার ব'লে গণ্য হবে। কিন্তু এশিয়া মহাদেশের প্রতিটি দরবারের রাজনীতির সঙ্গে যারা পরিচিত তাঁরা জানেন যে রাজপুরুষদের মনে দুর্ভাবনা থাকলেও তাঁদের ঘিরে যে-সব উচ্চপদস্থ ব্যক্তি রয়েছেন তাঁদের ছলনা ও ষড়যন্ত্রের ফলে অনেক নিষ্ঠুর অত্যাচারের ঘটনা প্রায়ই ঘটে থাকে। তাঁদের মধ্যে অতি জনপ্রিয় রাজপুরুষও এইসব লোকদের চক্রান্তে অতিমাত্রায় বিব্রত হয়ে হিংসার কাজে

জড়িয়ে পড়েন অথবা তাতে সায় দিতে বাধ্য হন। কিন্তু একথা বিশেষভাবে বিবেচনা করা উচিত যে রাজাদের ঘিরে যে-সব ক্ষমতাশালী ব্যক্তি রয়েছে তারাই রাজপুরুষদের অজ্ঞাতে বেশীরভাগ ক্ষেত্রে এইসব অপকর্ম করে থাকে। এখানে ক্ষমতাশালী পদস্থ দুর্বৃত্তদের রীতিমাফিক শাস্তি দেওয়ার রেওয়াজ নাই। তাছাড়া এমন কোন্ দৃঢ়চেতা শাসক আছেন যে এইসব দুর্বৃত্তদের প্রকাশ্যে বিচার করে নিজের বিপদ্ ঘনিয়ে আনবেন? দোষীকে শাস্তি দিতে অনেকসময় গুপ্তভাবে ছুরিকাঘাত ও বিষ প্রয়োগের পন্থা ধরতে হয়। জাফর আলি খাঁর বিরুদ্ধে যে-সব তথাকথিত অপরাধের তালিকা দেওয়া হয়েছে সে-গুলির বেশীর ভাগই মূলতঃ এই ধরণের। কিন্তু তার মধ্যে কোনওটিতেই চরম নিষ্ঠুরতার পরিচয় নাই যে নিষ্ঠুরতার মনোভাব কাসিম আলি খাঁ দেখিয়েছেন। নবাব-প্রাসাদে প্রবেশ করবার পর তাঁর প্রথম অভিলাষই ছিল প্রাসাদের মধ্যেই জাফর আলি খাঁকে হত্যা করে তাঁর ক্ষমতা জাহির করা। কিন্তু তাঁকে আমরা কলকাতায় আশ্রয় দেওয়ার ব্যবস্থা করায় তিনি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন। সুবেদার পদে অভিষিক্ত হওয়ার পর তিনি যেসব নিষ্ঠুরতার দৃষ্টান্ত রেখেছেন তা জানাতে হলে আমাদের তালিকা অত্যন্ত দীর্ঘ হবে। তাঁর মনের দুরাভিসন্ধি প্রকাশ পায় যখন প্রথমেই ইংরাজদের শুভানুধ্যায়ী বিশিষ্ট বন্ধুদের খতম করার জন্য সক্রিয় হয়ে ওঠেন। আমরা এখানে রামনারায়ণের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করছি। পাটনার নায়েবি থেকে তাকে বরখাস্ত করার পর তাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে অমানুষিক নিপীড়ন করা হয়েছে এবং শেষ পর্য্যন্ত তাকে মৃত্যুর পথেই ঠেলে দেওয়া হয়েছে। রামনারায়ণ আমাদের প্রতি বিশ্বস্ত থাকায় আমাদের তাঁকে সাহায্য করার নীতিই গ্রহণ করা উচিত ছিল। সকলকে না হলেও বেশীর ভাগ লোককেই যারা ইংরাজদের স্বার্থের জন্য চেষ্টা করে এসেছে তাদের ওপর মোটা অঙ্কের জরিমানা ধার্য্য করে চাপ দেওয়া হয়েছে। অনেককেই টাকা না দিতে পারার দরুণ অকথ্য অত্যাচারে প্রাণ বিসর্জন দিতে হয়েছে। অনেককে অতি ঘৃণিতভাবে হত্যা করা হয়েছে কিংবা জেন্টুদের সাধারণ রীতি অনুযায়ী হতমান হওয়ার আশঙ্কায় অনেকে আত্মহত্যা করেছে।

( ) স্মারকলিপিতে অভিসন্ধিবশতঃ বলা হয়েছে যে অর্থগৃধ্নুতা ও নৃশংসতার জন্য নবাব সমস্ত লোকের কাছে ঘৃণ্য হয়ে উঠেছিলেন। তিনি দুষ্ট কর্মচারীদের হাতের পুতুল হয়েছিলেন। তাদের কুশাসনে দেশ পীড়িত ও বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। তার একটা দৃষ্টান্ত স্বরূপ নগরীতে খাদ্য-শস্যের অভাবের কথা বলা হয়েছে। নবাব যে-সব অসুবিধায় পড়েছিলেন তার কারণ দেখানো হয়েছে কর্মচারীদের ওপর নির্ভরতা। অর্থাভাবের জন্য সরকারি ব্যয় নির্বাহ করা কঠিন হয়ে উঠেছিল। সেন্যরাও তাদের বকেয়া মাহিয়ানা না পাওয়ায় বিদ্রোহের ভাব দেখা দিল। এ ছাড়াও আছে অন্তর্বিপ্লবের বিপদ। প্রদেশগুলির আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা আছে সাহাজাদার প্রবল সেন্যবাহিনীর দ্বারা। কয়েকজন রাজা ও জমিদারও বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। এ-সব বিপদের মোকাবিলা করার জন্য অসন্তুষ্ট সৈনিকদল ছাড়া আর কিছুই নাই। মিস্টার ভ্যান্সিটার্ট প্রত্যেকের কাছে এইসব বিষয়ের সত্যতা উপলব্ধি করার জন্য আবেদন জানিয়েছেন। দেশ যে নিদারুণ ধ্বংসের মুখে চলেছে সে-কথাও বলেছেন। আর বলেছেন তাঁর উদ্দেশ্য হচ্ছে দুষ্ট মন্ত্রীদের অপসারণ করা। সেইজন্যই তিনি তাঁর সঙ্গে কিছু ইউরোপীয় সৈন্য নিয়ে এসেছেন। তারপর তিনি বলে চলেছেন কিভাবে শাসন ক্ষমতা থেকে নবাবকে সরিয়ে আনা হয়েছে এবং কাসিম আলি খাঁকে সিংহাসনে বসানো হয়েছে। তিনি বলেছেন প্রজা-সাধারণ এই বিপ্লবে খুব খুশী। নগরে কোনও রকম গোলমাল হয়নি, একফোঁটা রক্তপাতও হয়নি। তিনি এই বলে তাঁর বক্তব্য শেষ করেছেন যে কাসিম আলি খাঁর ভয়ে নবাব নগর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য অত্যন্ত উদ্গ্রীব হয়ে তাঁর সেই ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। সর্বশেষে এই মন্তব্য করেছেন যে নবাব

ক্ষমতাচ্যুতিতে মোটেই বিচলিত হননি। সেইটাই ঠিক হয়েছে বলে মেনে নিয়েছেন। কারণ তাঁর সুবেদারি পদকে আনন্দের ব্যাপার না হয়ে একটা বোঝার মত তাঁর মনে হচ্ছিল। তাঁর পুত্রের মৃত্যুর পর শাসনক্ষমতা পরিচালনার ক্ষমতাও স্তিমিত হয়ে এসেছিল। তাছাড়া, তিনি তাঁর অবশিষ্ট জীবন ইংরাজের আশ্রয়ে নিরাপত্তায় ও শান্তিতে কাটাতে চান। তাঁর সমস্ত ইচ্ছার মধ্যে এইটাই প্রধান হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

(৮) এটা খুবই স্বাভাবিক যে লোক একটা অসাধারণ ব্যাপার ঘটাতে চায়, সে তার কার্য্যকে সমর্থন করার জন্য নানা আজগুবি যুক্তি এবং সম্ভব-অসম্ভব ব্যাখ্যা উদ্ভাবন করে থাকে। এইরকম অকল্পনীয় বিপ্লব-সাধন করার জন্য মিস্টার ভ্যান্সিটার্ট ঐ রকম পন্থা অবলম্বন করবেন না এ আশা করা ভুল। তিনি তাঁর কাহিনী বলে গিয়েছেন যা প্রকৃত ঘটনা তার ওপর রঙ চড়িয়ে এবং বিকৃত করে। সে যাই হোক, আমরা এরূপ কল্পনাও করতে পারছি না যে, তাঁর কৃত এই বিপ্লবের সমর্থনে তিনি যে-সব প্রবল যুক্তি দেখানোর চেষ্টা করেছেন, তা পৃথিবীর জনসমাজের কাছে সন্তোষজনক বলে বিবেচিত হবে। লোকের মনকে বিষাক্ত করে তোলার জন্য তিনি মীরজাফরের চরিত্রকে মসীলিপ্ত করে দেখিয়েছেন এবং নগরে খাদ্যশস্যের অপ্রতুলতার ওপর বড় বেশী জোর দিয়েছেন। কিন্তু আমাদের ধারণা এই যে মিস্টার ভ্যান্সিটার্টের এইরকম রূঢ়ভাবে গত বছরের ব্যাপারটি বিচার করা উচিত হয়নি যা তাঁর নিজের জ্ঞাতসারেই ঘটেছে। আমরা যতদূর জানি তিনি আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও কলকাতায় গত বছরের খাদ্য-শস্যের নিদারুণ অভাব মোচন করতে পারেননি। এরকম ঘটনা পূর্বে আর কখনও সেখানে ঘটেনি যার ফলে অনেক লোক খাদ্যাভাবে মারা গিয়েছে।

(৯) অর্থাভাবের দরুণ নবাব অত্যন্ত অসুবিধায় পড়েছিলেন। কিন্তু এটা তাঁর নিজের দোষে ঘটেনি। এটা ঘটেছিল কর্ণেল ক্লাইভের এ-দেশ থেকে প্রস্থানের পর। এ-দেশে তখন একটা বিপর্যয়কর অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল যার ফলে নবাবের কোষাগারে সামান্য রাজস্বই জমা হতো। নবাবের ঋণ শোধের জন্য বর্দ্ধমান ও নদীয়া জেলা কোম্পানীকে দেওয়া হয়েছিল। দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত মেদিনীপুর বর্গীদ্বারা লুণ্ঠিত। বীরভূম ও অন্যান্য জায়গায় জমিদার এবং কুদ্দুস হোসেন খাঁর অধীনস্থ পূর্ণিয়া প্রদেশ সাহাজাদার পক্ষে। পাটনা নগর ও তার সংলগ্ন একটা ছোট্ট সহর ভিন্ন সমস্ত বেহার প্রদেশ তাঁর অধীনে চলে গিয়েছে। পূর্ব-সীমান্ত চট্টগ্রাম আরাকানবাসী মগদের আক্রমণের সম্মুখে অসহায় হয়ে পড়েছে। এই মগরা লুট-তরাজের জন্য প্রতি বছর বাংলাদেশে এসে থাকে। যুদ্ধের জরুরি ব্যয় সঙ্কুলানের জন্য শুধু ছিল ঢাকা অঞ্চল। মুর্শিদাবাদ ছিরে জেলাগুলি, রাজসাহী আর দিনাজপুর নবাবের দুর্দ্দশার কারণ হয়েছিল এখানেই। যে রাজস্ব নবাবের আদায়যোগ্য ছিল তার এক-চতুর্থ অংশ (যদিও এতটা রাজস্বও আদায় হতো কিনা সন্দেহ) রাজস্বের ওপর নির্ভর করে নবাবকে এমন বিপুল সৈন্যবাহিনী রাখতে হতো যা অন্য কোনও নবাবকে রাখতে হয়নি। আর তার ব্যয়ভার আরও অনেক অংশে বাড়িয়ে তুলেছিল ইংরাজ বাহিনী। তাদের ওপরই বেশী বিশ্বাস ও নির্ভর করার জন্য ওদের মাহিয়ানা দিতেন আগে। এই পক্ষপাতিত্বের জন্য দেশীয় সেনাদের অসন্তোষের কারণ হয়ে উঠেছিল। কর্ণেল ক্লাইভ যে সৈন্যবাহিনী দিয়ে দেশ থেকে অল্প কিছুদিন আগেও শত্রুদের বিতাড়িত করেছিলেন, তিনি চলে যাওয়ার পরই আরও অনেক বেশী সৈন্য রাখা হয়েছে অথচ তাদের দিয়ে কোনও উপকার হয়নি। আক্রমণকারী শত্রুরা দেশকে মথিত ও বিপর্য্যস্ত করেছে। আমাদের সৈন্যরা তাদের পেছনে অনবরত ধাওয়া করেছে অথবা পিছিয়ে এসেছে। সেই সময় আমাদের নিজেদের সেনাবাহিনী আক্রমণকারীদের মতই এই দেশের ওপর ধ্বংসলীলা চালিয়েছে। একথা মোটেই অস্বাভাবিক কিছুই নয় যে এই সময় মীরজাফরকে কি দুঃসহ দুরবস্থার মধ্যে পড়তে হয়েছিল। তাঁর এই রকম সঙ্গিন অবস্থার সময় তাঁকে সাহায্যের জন্য আমাদের

আপ্রাণ চেষ্টা করা উচিত ছিল। তার পরিবর্ত্তে আমরা তাঁকে দিয়েছি চরম অসম্মান। অত্যন্ত হীন আচরণ করে তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করেছি।

(১০) একজন রাজপুরুষের কাছে থেকে দুষ্ট মন্ত্রীদের সরিয়ে নেওয়া নিশ্চয়ই ভাল কাজ। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস হয় না যে নবাবের দুষ্ট কর্মচারীদের বিরুদ্ধে কিছু করার জন্যই মতলব করা হয়েছিল। বিপরীত পক্ষে একমাত্র মতলব ছিল স্বয়ং নবাবকে ক্ষমতাচ্যুত করা। তার প্রমাণ পূর্ব-উল্লিখিত চুক্তি। যদি নবাবকে তাঁর শাসন-প্রণালীর ভুলভ্রান্তি সম্বন্ধে বন্ধুভাবে বোঝানোর চেষ্টা করা হতো এবং তাঁর কুপরামর্শদাতাদের তাঁর কাছ থেকে সরিয়ে দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া হতো তাহলে তিনি নিশ্চয়ই সে উপদেশ শুনতেন এ-বিষয়ে আমাদের কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। তিনি যে কোনও সৎ উপদেশের অমর্য্যাদা করতেন না সেটা বোঝা যায় যে কি অদ্ভুত প্রভাব ছিল কর্ণেল ক্লাইভের তাঁর ওপর। এর প্রমাণ পাওয়া যায় যখন আমরা স্মরণ করি সেইসব ঘটনার কথা যখন নবাব রাজা রামনারায়ণ ও রায় দুর্ল্লভের ওপর ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে ওঠেন এবং কর্ণেল তাঁর ওপর কোনওরকম বল প্রয়োগ না করে শান্তভাবে বুঝিয়ে রাজা রামনারায়ণের সঙ্গে সম্পূর্ণ মিল ঘটিয়েছিলেন। আর রায়দুর্ল্লভের কলকাতা-বাসের এবং তাঁর সঙ্গে পরিবারবর্গ ও জিনিষপত্র নিয়ে যাওয়ারও অনুমতি মিলেছিল।

(১১) জন-সাধারণ এই বিপ্লবে সন্তুষ্ট (স্মারকলিপিতে যা বলা হয়েছে) হওয়া দূরে থাক অত্যন্ত অসন্তুষ্ট। কাসিম আলির প্রতি পূর্ব্বেই যদি তারা শ্রদ্ধাপরায়ণ থাকতো কিংবা তাদের ওপর তাঁর প্রভাব অথবা ক্ষমতা থাকতো তাহলে যেভাবে তাঁকে শাসন ক্ষমতায় আনা হয়েছে সে দিকটা তারা উপেক্ষা করতো এবং তিনি কতকগুলি জনপ্রিয় কাজ করতে পারলে তারা হয়তো এই ক্ষমতা অধিকারকে মেনে নিতো। কিন্তু তিনি মসনদে বসার পূর্ব্ব থেকেই লোকে তাঁকে অপছন্দ ও ঘৃণা করে এসেছে। এখন তাঁর পীড়নমূলক আচরণ ও স্বৈরাচার সেই ঘৃণাকে আরও বদ্ধমূল করেছে।

(১২) এই ঘটনা মুর্শিদাবাদে যে কোনও আলোড়ন সৃষ্টি করেনি তার কারণ এই বিপুল সৈন্য যে মুর্শিদাবাদে আনা হবে তা মুর্শিদাবাদবাসীরা ধারণা করতে পারেনি। তাছাড়া, গভীর রাত্রে এই সৈন্য সেখানে আনা হয়েছিল। মীরজাফরের ইংরাজের প্রতি এমন আস্থা ছিল যে এইরকমের ঘটনা যে ঘটতে পারে সে সম্বন্ধে একটুও তিনি সন্দেহ করেননি। সেইজন্য তাঁর নিজের নিরাপত্তার জন্য কোনও সাবধানতা অবলম্বন করেননি তিনি। আমাদের অস্ত্র এমন উন্নত ধরণের এবং আমাদের সৈনিকগণকে এদেশের লোক এমন ভীতির চক্ষে দেখে থাকে যে যদি আমরা প্রকাশ্যভাবেই কাজ করতাম তাহলেও আমাদের কোনও অসুবিধায় পড়তে হতো না। এই কারণেই এরূপ চোরের মত চুপিচুপি এবং বিশ্বাসঘাতকের মত অগ্রসর হওয়া আরও অমার্জ্জনীয় হয়ে উঠেছে। আমরা সত্যই একথা বলতে দুঃখ বোধ করছি যে এই ঘটনা আমাদের জাতীয় চরিত্রকে মসীলিপ্ত করেছে যার জন্য নেটিভদের এবং এই দিকের অন্যান্য ইউরোপীয় কলোনিগুলির দৃষ্টিতে আমরা হীন হয়ে পড়েছি।

(১৩) স্মারকলিপিতে জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে মীরজাফর তাঁর ক্ষমতাচ্যুতি বেশ সহজভাবেই নিয়েছেন। কারণ ক্ষমতার আসন তাঁর কাছে অসহনীয় হয়ে উঠেছিল। কিন্তু তাঁর পরবর্ত্তী উক্তি এবং কর্ণেল ক্লাইভের কাছে লেখা তাঁর চিঠিগুলি এই কথাই প্রমাণ করে যে তিনি শাসনভার থেকে সরে যেতে মোটেই ইচ্ছা করেননি বরং ক্ষমতাচ্যুত হওয়ায় তিনি অত্যন্ত মর্ম্মাহত হয়েছেন। বাস্তবপক্ষে তাঁর নতিস্বীকারই প্রয়োজন হয়েছিল। তিনি এই আশা পোষণ করেছিলেন যে, কোনও না কোনও সময় কোম্পানি তাঁর অভিযোগ দূর করবেন কেননা যে ব্যাপার ঘটানো হয়েছে তা কখনই আমাদের দেশে সমর্থন লাভ করবে না। তিনি খুবই বিচক্ষণতা দেখিয়েছেন তাঁর জামাতার ওপর ভরসা না করে কলকাতায় নিরাপত্তার মধ্যে ধৈর্য্য ধরে অন্যায়ের প্রতিকারের জন্য অপেক্ষা করে। তিনি ভাগ্যের ওপর

নির্ভর করে আছেন এ ধারণা হলেও এ কথা কিছুতেই বলা চলে না যে তিনি তাঁর গদি স্বেচ্ছায় ত্যাগ করে এসেছেন যদিও বিশ্বের কাছে এইভাবেই ব্যাপারটি দেখানোর চেষ্টা চলছে।

(১৪) মাননীয় মহাশয়গণ, যে বিপ্লব ঘটানো হয়েছে তার যথার্থ বিবরণ আমরা আপনাদের কাছে নিবেদন করেছি। পরিকল্পনাকারীরা সম্ভবতঃ মনে করেছিলেন যে এই বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তনে কোম্পানির যে সুবিধা হবে তাতেই তাঁদের ক্রিয়াকলাপের দূষণীয় দিকটা যথেষ্ট হ্রাস পাবে। তাঁরা তাঁদের মনিবদেরও প্রশংসাভাজন হবেন। একথা সত্য যে কোম্পানীর ভূসম্পত্তি অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এখন একটা মোটা বাৎসরিক রাজস্ব কোম্পানী পাবেন। কিন্তু সমপরিমাণ এমন কি এর চাইতেও বেশী সুবিধা সম্মানজনক পথ অবলম্বন করলেও কি পাওয়া যেত না? এ দেশের বর্ত্তমান শান্ত অবস্থা কোম্পানী এবং নবাবকে তাঁদের প্রাপ্য রাজস্ব আদায় ও উপভোগ করার স্থায়িত্ব দিয়েছে। কিন্তু মীর কাসিম নবাবি লাভের ফলে এটি হয়েছে তা নয়। জাফর আলি খাঁও যদি মসনদে থাকতেন তা হলেও একই ফল দেখা যেত যা খুব সহজেই ধারণা করা যায়।

(১৫) কাসিম আলি খাঁকে নবাবিতে বসানোর কিছুদিন পরেই কোম্পানির বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রামের জমিদারীতে নামে মাত্র অধিকার দেওয়া হ্যা· শুধু নামে মাত্র। কারণ, প্রথম দুইটি ক্ষেত্রে আমাদের প্রাপ্য রাজস্বের দাবী মেটাতে অস্বীকার করা হলো।

(১৬) এই বিপ্লব এ দেশের জন-সাধারণের মনের ওপর এমন একটা বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে যে বর্দ্ধমান-রাজ যিনি জাফর আলি খাঁর সময়ে প্রায়ই এই বিশেষ ইচ্ছা প্রকাশ করতেন যে কোম্পানি তাঁর জেলার রাজস্ব আদায় বরাবরের জন্য করতে থাকুন যেমন তাঁরা করে আসছেন তাঁদের প্রাপ্য তনখার জন্য এবং তাঁরা জমিদারের সম্পূর্ণ ভারও গ্রহণ করতে পারেন নবাবের কাছ থেকে। সেই বর্দ্ধমানের রাজাই বৃদ্ধ নবাবের সঙ্গে আমাদের বিশ্বাসভঙ্গের পর আমাদের সঙ্গে চুক্তির অসারতা উপলব্ধি করে তাঁর আগেকার ঘোষণা থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন এবং আমাদের সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা না করে খোলাখুলিভাবেই বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। তিনি আমাদের ব্যবসা বন্ধ করেছেন, বিপুল সৈন্যবাহিনী গঠন করেছেন, তাঁর দেশে মারহাটিদের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, তাঁর রাজস্ব দেওয়া বন্ধ করেছেন। বীরভূমের রাজার সঙ্গে যোগ দিয়ে সাহাজাদার পক্ষ অবলম্বন করে তাঁর সঙ্গে পত্রের আদান-প্রদান চালাচ্ছেন।

(১৭) আরও কয়েকজন জমিদার যাঁরা জাফর আলি খাঁর নবাবির সময় শান্ত হয়েছিলেন তাঁরাও এখন নবাবীর পরিবর্ত্তন দেখে তাঁদের আনুগত্যও তুলে নিয়েছেন। তাঁরা মীরকাসিমকে নবাব বলে মানতে চান না। তাঁরা সাহাজাদার সঙ্গে মিলেছেন। এইসব দলত্যাগীরা সাহাজাদাকে সেনাবাহিনী ও অর্থ সরবরাহ করে জোরদার করেছেন। সাহাজাদার সহযোগীরা এ দেশে তাঁর প্রতিপত্তি বজায় রেখে চলেছেন। ইংরাজ সেনাবাহিনীকে উপেক্ষা করে তাঁর দল এগিয়ে আসছে জেনে অত্যন্ত উৎসাহিত হয়ে উঠেছেন।

(১৮) এই বিপ্লবের সংবাদে নবাব-সৈন্যরা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। তারা বলতে থাকে যে, তারা কাসিম আলি সম্বন্ধে কিছুই জানে না। তারা তাদের পুরাতন মনিবকে হারিয়েছে। এখন তাদের প্রাপ্য বহু বকেয়া বেতনের কোনও অংশ পাওয়ারও সম্ভাবনা নাই। পাটনার তদানীন্তন প্রধান মিস্টার অমিয়টের অদ্ভুত বিচক্ষণতা ও প্রভাব না থাকলে তাদের চরম পন্থা অবলম্বন থেকে নিরস্ত করার উপায় ছিল না।

(১৯) অবস্থা যখন এইরকম তখন কর্ণেল ক্যালড্ (Caillaud) পাটনা ছেড়ে এলেন আর তাঁর কাছ থেকে সেনাবাহিনীর ভার নিলেন মেজর কার্ণাক। মেজর দেখলেন দেশের সামনে এমন বিপদ এসে পড়েছে যে তার থেকে উদ্ধার পেতে হলে এখনই প্রচণ্ড আঘাত না হানলে সাহাজাদার সমস্ত দেশের দখল নিতে বিলম্ব

হবে না। সেইজন্য তিনি তাঁকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব যুদ্ধে নামানো যায় সে সম্বন্ধে কৃতসঙ্কল্প হলেন। পাটনা দুর্গনগর পাহারা দেওয়ার জন্য কিছু সৈন্য রেখে—পাছে উচ্ছৃঙ্খল সৈন্য দ্বারা দুর্গ লুণ্ঠিত হয়—তিনি বৃটিশ সৈন্য নিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সাহাজাদার সম্মুখীন হতে এগিয়ে গেলেন। নগর থেকে বেরিয়ে তিনদিন মার্চ করার পর তিনি সাহাজাদার সম্মুখীন হয়ে সম্পূর্ণভাবে জয়ী হলেন। এই যুদ্ধ এমন বিশেষ ধরণের হয়েছিল যে ভারতে এমন যুদ্ধ সাম্প্রতিককালে ঘটেনি, এমন কি পলাশীর যুদ্ধেরও এর সঙ্গে তুলনা চলে না। আলেক-জাণ্ডারের পুরুর যুদ্ধের সঙ্গে এই যুদ্ধের তুলনা চলতে পারে। তিনি সাহজাদাকে এমন কায়দার মধ্যে এনে ফেলেন যে তাঁকেও ইংরাজের আশ্রয়ই নিতে হলো। এর ফলে বিদ্রোহী রাজা জমিদারদেরও সমস্ত আশা বিলুপ্ত হলো। চারিদিকের সমস্ত আন্দোলন বন্ধ হয়ে গেল। দেশে প্রার্থিত শান্তি ফিরে এলো। বিভিন্ন প্রদেশে শৃঙ্খলা ফিরে আসায় রাজস্ব আদায়ের আর কোনও বিঘ্ন রইলো না। নবাবের কোষাগারে অর্থ সঞ্চিত হলো। তিনি তাঁর সেনাবাহিনীর বকেয়া টাকা মিটিয়ে দিতে সক্ষম হলেন। কোম্পানীকে যে টাকা দিতে প্রতিশ্রুতি দিলেন তা দিতেও সক্ষম হলেন।

(২০) দেশব্যাপী এই যে শান্তির হাওয়া বইছে তার যে ব্যাখ্যাই করা হোক না কেন তা লাভ হয়েছে সাহাজাদার বিরুদ্ধে যুদ্ধে আমাদের জয়। যুদ্ধের ব্যাপারে সমাপ্তি আনার পর দেশ সম্পূর্ণ বশে এসেছে। বৃদ্ধ নবাবের সমস্ত অসুবিধার হেতুই ছিল—তাঁর রাজ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ-জনিত বিশৃঙ্খলা। এই কারণেই তাঁর রাজস্বের ঘাটতি। এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই যে তাঁর শাসন-কালে আমাদের সৈন্যরা যদি এখনকার মত ব্যবস্থা গ্রহণ করতো তাহলে তিনিও অনুরূপভাবে নিজের অসুবিধা থেকে মুক্ত হতে পারতেন।

(২১) উপরে যে বিবরণ দেওয়া হয়েছে আমাদের বিশ্বাস তা থেকে অনেকেই বুঝতে পারবেন যে মীরজাফরকে গদিচ্যুত করার কারণ হিসাবে তাঁর রাজ্য চালনার অক্ষমতা অথবা কুনীতির যে দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে তা মোটেই যুক্তিগ্রাহ্য নয়। আমরা মনে করি যে এই পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে দেশের নীতির বাস্তব-জ্ঞানের অভাবে অথবা বিচারের ভুলে। আমরা আরও বিশ্বাস করি যে এটা ঘটানো হয়েছে আর্থিক ব্যাপারের জন্য। কারণ, মিস্টার ভ্যান্সিটার্ট এবং তাঁর সঙ্গী কয়েকজন পরামর্শদাতা একথা গোপন করেন নাই যে কাসিম আলি খাঁ তাদের কুড়ি লক্ষ টাকা উপহার দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তবে একথাও তাঁরা চান না যতদিন না কোম্পানির ঋণ শোধ হয় এবং তাঁর সৈন্যদের তুষ্টিসাধন করা হয়। আমরা এখানে এই মন্তব্য রাখতে চাই যে তাঁর পক্ষে যোগ দেওয়ার জন্য নবাব আমাদের অনেককে প্রভূত অর্থ দিতে চান যা আমরা প্রকাশ্যেই বলেছি এবং তাঁর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছি। যে পন্থা অবলম্বন করা হয়েছে তার বিরুদ্ধাচরণ করে এসেছি আমরা বরাবর। তা সত্ত্বেও যদি আমাদের অর্থের প্রলোভন দেখানো হয়ে থাকে তাহলে যারা সর্বদাই সকল কাজে নবাবকে সমর্থন করে আসছেন সেই ভদ্রলোকদের সম্বন্ধে কি সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে?

(২২) নবাবকে যে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করা হয়েছে তা যদি মূল্য দিয়েই ক্রয় করতে হয়ে থাকে তাঁকে তাহলে এটা ধারণা করা অনুচিত হবে না যে তিনি তাঁর ক্ষমতাকে যতদূর সম্ভব প্রয়োগ করবেন প্রজাগণের ওপর জুলুম করে টাকা আদায় করতে। তাঁর যতটা ক্ষমতায় কুলায় ততখানি উৎপীড়ন প্রতিটি প্রদেশের ওপর চালিয়ে যাবেন। কারণ, তিনি জাফর আলি খাঁর দুর্ভোগ দেখেই বেশ বুঝতে পেরেছেন আমাদের পবিত্র চুক্তিকে আমরা কতটা মর্য্যাদা দিয়েছি। সুতরাং ইংরাজদের বন্ধুত্বের ওপর অযথা বিশ্বাস স্থাপন না করে তিনি নিজেই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়োজনীয়তার নীতিকেই অল্প বিপদসঙ্কুল মনে করেছেন। তিনি যে তাঁর নীতিকে কার্য্যকর করতে সুরু করেছেন তার প্রমাণ এই যে এখনও তিনি সৈন্যসংখ্যা বাড়িয়েই চলেছেন যদিও দেশে শান্তি

বিরাজ করছে। আর সৈন্যসংখ্যাকে বাড়িয়েই ক্ষান্ত হন নি তাদের প্রচণ্ড শক্তিশালী করার জন্য তাদের ইউরোপীয় কায়দায় তালিম দিচ্ছেন। আমাদের সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকার জন্য তাঁর রাজধানী মুর্শিদাবাদ—যেখানে তাঁর পূর্ববর্তী নবাবের পতন ঘটেছে—ছেড়ে রাজমহলে এক বিরাট দুর্গ তৈয়ারী করার জন্য উদ্যোগ করছেন এই আশা করে যে তিনি আমাদের নাগালের বাইরে থাকতে পারবেন।

(২৩) তখন বোর্ডের কোনও সদস্য বলেন যে নবাবের ব্যবহার আমাদের সন্দেহের উদ্রেক করে। কারণ, তিনি যদি আমাদের ওপর বিশ্বাস রাখেন ও আন্তরিকতার সঙ্গেই আমাদের সঙ্গে ব্যবহার করেন তাহলে মাইনে দিয়ে এত বড় সেনাবাহিনী রেখে অনাবশ্যক ব্যয় করার কারণ কি? আর আমাদের যাঁরা প্রকৃত বন্ধু তাঁদের সঙ্গেই বা কেন কুৎসিত ব্যবহার করা হয় তার জবাবে বলা হয়ে থাকে—'নবাব তাঁর দেশের প্রভু; আমাদের অধীনে তিনি নন। তাঁর খুশীমত কাজ করা ও দেশ-শাসন করার স্বাধীনতা আছে।' কিন্তু একথা কি বলা যায় না যে কাসিম আলি খাঁ তাঁর পূর্ববর্তী নবাবের চেয়ে বেশী স্বাধীন হতে পারেন না। আর যদি এই কথাই সত্যি হয় যে বাংলার নবাব ইংরাজের অধীন নয়। তিনি তাঁর ইচ্ছামত কাজ করতে পারেন তাহলে কি করে ঐ ভদ্রলোকরা মীরজাফরের বিরুদ্ধে তাঁদের আচরণের সমর্থন লাভ করতে পারেন? তাঁর সরকারের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ এনে তাঁকে গদিচ্যুত করতে পারেন? কিন্তু মীরজাফর আমাদের জাতির প্রতি কোনও অন্যায়ের দায়ে দোষী নন। তিনি আমাদের সঙ্গে চুক্তির কোনও খেলাপই করেন নি।

(২৪) বর্ত্তমান নবাবের ক্রমবর্দ্ধমান ক্ষমতাকে খর্ব না করে তা প্রতিদিন বাড়তে দেওয়া হচ্ছে। পাটনায় আমাদের যে সেনাবাহিনী আছে তার ওপরও পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে নবাবকে। সেখানকার সৈন্যবাহিনীর অধিনায়কের কাছে এই নির্দ্দেশ গিয়েছে যে নবাব যত সৈন্য চাইবেন সে সম্বন্ধে কিছুমাত্র বিচার-বিবেচনা না করে যেন তাঁকে তাঁর চাহিদা মত সৈন্য সরবরাহ করা হয়। মাননীয় মহোদয়গণ, আপনারা দেখতে পাবেন গত ২২শে সেপ্টেম্বরের নির্দ্দেশনামায় এই নির্দ্দেশই গিয়েছে মিস্টার এলিসের কাছে। এই ব্যাপারে আমাদের কিছু কিছু অভিমত সেদিনকার কার্য্য বিবরণীতে লিপিবদ্ধ হয়েছে। আমাদের এই আশঙ্কা ব্যক্ত না করে কিছুতেই পারছিনে যে আমাদের সেনাবাহিনীর ওপর নবাবকে যে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে তার কতখানি অপব্যবহার তিনি করতে পারেন। শীঘ্রই হোক অথবা কিছু বিলম্বেই হোক এই সেনাবাহিনীকে তিনি এমন কাজে নিযুক্ত করবেন যে আমরা সমগ্র দেশের কাছে হাস্যাস্পদ হব। আমাদের সৈন্যবাহিনীকে অধিকতর দুর্নামের ভাগী হতে হবে এবং আমাদের জাতির ওপর অধিকতর অসম্মানের বোঝা চাপবে।

(২৫) কাসিম আলি খাঁর ওপর এইরকম তীব্র আসক্তি দেখানো হলেও এমন আশা করার কোনও কারণ নাই যে তিনি আমাদের সঙ্গে বিশ্বস্ত মিত্রের মত কাজ করবেন। এমন চরিত্রের ব্যক্তির ওপর কি কোনও আস্থা রাখা যেতে পারে যিনি শুধু তাঁর আইনসম্মত মনিবকে গদিচ্যুত করার চক্রান্তেই যোগ দেন নি যিনি ছিলেন তাঁর শুভানুধ্যায়ী আত্মীয়, তাঁর স্নেহচ্ছায়ায় তিনি লালিত হয়েছেন? তাঁর মত এমন কে আর আছেন যিনি প্রকৃত ওপরওয়ালার অর্থাৎ হিন্দুস্থানের সম্রাটের প্রতি এমন আনুগত্যহীন ব্যবহার করতে পারেন যতক্ষণ না আমাদের বারংবার চেষ্টার ফলে আনুগত্য স্বীকার করতে বাধ্য করা হয়? এমন কে আছেন যিনি আমাদের প্রতি অনুরক্ত ব্যক্তিদের ক্রমাগত অবিশ্বাস করে চলেন। (হিন্দুস্থানের বাদশাহ্ হয়েছেন সাহাজাদা যিনি পাটনার কাছে সেই প্রসিদ্ধ যুদ্ধে মেজর কার্ণাকের কাছে পরাজিত হন। হিন্দুস্থানের সম্রাটের মৃত্যুর পর তিনিই হিন্দুস্থানের সম্রাটের সিংহাসনে বসেছেন যার ফলে তিনি বাংলারও সম্রাট-পদ লাভ করেছেন যে বাংলা তাঁর সাম্রাজ্যের অধীনস্থ একটি প্রদেশ।)

(২৬) নবাবের বিগর্হিত আচরণের অনেকটাই আমরা সম্রাটকে যে ন্যায্য সম্মান দিয়ে থাকি তার প্রতি ঈর্ষা-পরায়ণতা থেকে সঞ্জাত। নবাবের ভয়ের কারণ এই যে আমরা তাঁর কর্ত্তৃত্ব খর্ব্ব করে মোগলের অধীনে পূর্ব্বের মত সুবেদারি রাখার ব্যবস্থা করবো এবং মোগল সম্রাটের প্রাপ্য রাজস্ব দেওয়ার জন্য বাধ্য করবো। সেই জন্য তিনি আমাদের মধ্যে (মোগল সম্রাট ও ইংরাজদের) বিচ্ছেদ সৃষ্টি করার জন্য নানা ষড়যন্ত্র করেছেন। আমাদের দিক থেকে সম্রাটের যে বিপদ ঘনীভূত হয়ে আসছে এই ধারণা তাঁর মনে বদ্ধমূল করার জন্য চেষ্টা করেছেন যাতে সম্রাট এ দেশ ছেড়ে চলে যান। তিনি সম্রাটের শিবিরে বিদ্রোহের ইন্ধন জুগিয়েছেন। যদি না মেজর কার্ণাকের সাহায্য সময়মত পৌঁছাতেন তাহলে সেই বিদ্রোহ সম্রাটের পক্ষে মারাত্মক হয়ে দাঁড়াতো। নবাব পুনঃপুন মিস্টার ভ্যান্সিটার্টকে জোর তাগিদ দিয়েছেন মেজর কার্ণাককে পদচ্যুত করার জন্য। যেন সম্রাটের কাছ থেকে প্রেসিডেন্ট ও তাঁর কাছে চিঠি আসছে এইভাবে চিঠি জাল করেছেন। সম্রাট সেই চিঠিগুলিতে এই অভিযোগ করেছেন যে মেজর তাঁর ওপর জোর-জবরদস্তি চালিয়ে তাঁকে এখানে আটকে রেখেছেন। তিনি তাঁকে এই দেশ ছেড়ে যেতে না দেওয়ার জন্য উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেছেন। এই চিঠিগুলি যে জাল সে-কথা সম্রাট নিজের হাতে লিখেছেন শপথ সহকারে এবং এই জঘন্য কাজের জন্য ঘৃণা প্রকাশ করেছেন। নবাব অতঃপর কয়েকজন সভাসদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে এমন দূষিত হাওয়ার সৃষ্টি করেন যে তাতে তাঁর মনের বাসনা পূর্ণ হয়। সম্রাট আমাদের কাছ থেকে কোনও সাহায্য না নিয়ে এবং এই সুবার রাজস্বের কোনও অংশ না পেয়ে তাঁকে চলে যেতে হয়। নবাবের এই বিদ্রোহীর মত ব্যবহার সম্রাটকে ন্যায্যভাবেই ক্রুদ্ধ করে তুলেছে। তিনি প্রকাশ্যেই ঘোষণা করেছেন যে তিনি তাঁর ক্ষমতা প্রয়োগ করার সুযোগ পাওয়ামাত্র নবাবকে সুবেদার পদ থেকে চ্যুত করবেন।

(২৭) মহামান্য সম্রাট তাঁর প্রস্থানের পূর্বে কাসিম আলি খাঁর প্রতি ঘৃণা এবং ইংরাজদের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধার অভিব্যক্তির প্রমাণ রেখে গিয়েছেন। তিনি অযাচিত ভাবে সুবে বাংলার দেওয়ানি ইংরাজদের দেওয়ার প্রস্তাব করে গিয়েছেন। দেওয়ানি পদের অর্থ নবাবের অধীনে যে সব প্রদেশ আছে তার রাজস্ব আদায়ের ভার ও যার হিসাব-নিকাস দিল্লীর দরবারের সঙ্গেই হবে। দেওয়ানি সুবেদারি পদ থেকে পৃথক। শেষোক্ত পদাধিকারীর সৈন্যবাহিনী ও প্রদেশগুলির ওপর শাসন কর্ত্তৃত্ব পরিচালনার দায়িত্ব থাকে। তার ব্যয় দেওয়ানের আদায়ী রাজস্ব থেকে মেটানো হয়। পূর্ব্বে সুবেদারি ও দেওয়ানি পৃথক ছিল। কিন্তু বাংলার নবাবরা সাম্রাজ্যের মধ্যে নানা আলোড়নের সুযোগ নিয়ে নিজেরাই দেওয়ানি পদেও আত্মসাৎ করেছেন। দেওয়ানি পদটি এমন ধরণের যে সম্রাট নবাবকে অবিশ্বাস করে আর এই পদে রাখতে চান না। তাঁর ইচ্ছা যে আমরা নবাবের ওপর এ কার্য্যের ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখবো এবং আমরা রাজস্ব আদায় করে তার হিসাবপত্র ঠিক রাখবো। কাসিম আলি খাঁর কাছ থেকে তিনি কোনও হিসাবই পান নি। সব টাকাই তিনি নিজের ব্যয়ের জন্য রেখে দিয়েছেন। এই পদ কোম্পানিকে বছরে পনের লক্ষ টাকা এনে দিতে পারে। এ-ছাড়া সম্রাট বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর এবং চট্টগ্রাম জেলাও দিতে সম্মত। শুধু প্রদেশগুলিতেই নয় ইংরাজদের স্বার্থ ও প্রভাব সুদূর দিল্লী নগরী পর্য্যন্ত নিরাপত্তার সঙ্গে বিস্তৃত হয় তারও সুবিধা করে দিতে চেয়েছেন।

(২৮) এটা ধারণা করা কঠিন কেন এমন একটা সম্মানজনক ও সুবিধাপ্রদ প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যাত হতে পারে। এই কথা বলা হয় যে ঐ প্রস্তাব স্বীকার করে নিলে আমাদের ও নবাবের মধ্যে ক্রমাগত যোগাযোগ চলতে থাকবে এবং নবাবের ক্ষমতা অতিরিক্ত খর্ব্ব করা হবে। এই যুক্তির সত্যতা মেনে নিলেও কোম্পানীর স্বার্থ ও সম্মানের জন্য এই প্রস্তাব উপেক্ষা করা মোটেই উচিত হচ্ছে না কারণ দেওয়ানি পদ স্বীকার করে নিলে কোম্পানীর প্রভূত উন্নতি হতো। এই প্রস্তাব গ্রহণে

অসম্মতি বিস্ময়কর এই কারণে যে এ-কথা ভালভাবেই জানা আছে যে মিস্টার ভ্যান্সিটার্টের এ দেশে পৌঁছানোর কিছু পরে জাফর আলি খাঁর সময়েই সুবা বাংলার রাজস্ব আদায়ের সনদের জন্য দিল্লীর সম্রাটের কাছে আবেদন করা হয়েছিল। সেই সনদ আমাদের কাছে পাঠানোর জন্য লেখাও হয়েছিল। কিন্তু সেইসময় কাসিম আলি খাঁর পক্ষে বিপ্লব ঘটানোর জন্য এ সম্বন্ধে অলোপ-আলোচনা একেবারে বন্ধ হয়ে যায়।

(০৯) যে-সব নেটিভ আমাদের স্বার্থে কাজ করে থাকে তাদের ওপর নবাব এমন রুষ্ট যে কর্ণেল কুট এবং মেজর কার্ণাককে তিনি আমাদের ঐসব হিতৈষীদের ওপর বিশেষ করে রাজা রামনারায়ণের ওপর জুলুম চালানোর জন্য প্ররোচনা দিতে থাকেন। কর্ণেলকে তিনি পাঁচলাখ টাকা দেওয়ার প্রস্তাব দেন যদি তিনি সেই হতভাগা লোকটির ধ্বংসের ব্যবস্থা করতে নবাবের সঙ্গে একমত হন যাকে বোর্ড ইতিমধ্যে নবাবের হাতেই তুলে দিয়েছে। কর্ণেলের ঐ টাকা নিতে অসম্মতির জন্যই, আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, তাঁর ওপর বিরূপতা ও অন্যায় সন্দেহ আরোপ করেছেন নবাব। বোর্ডের প্রসিডিংয়ের ওপর কর্ণেলের চিঠিগুলিই যে শুধু আমাদের বিশ্বাসকে দৃঢ় করেছে তা নয়; তাঁর কাছে নবাবের উক্তি যে তিনি নবাবের উপহার গ্রহণ না করলে তিনি তাঁকে বন্ধু বলে ভাববেন না—তাও আমাদের ঐ বিশ্বাসকে দৃঢ় করেছে।

(৩০) নবাবের মন যে কারণে কর্ণেল কুটের প্রতি বিতৃষ্ণায় পূর্ণ হয়ে আছে সেই একই কারণে মেজর কার্ণাকের প্রতি তাঁর বিদ্বেষ প্রবল হয়ে উঠেছে। তাঁকেও নবাব তাঁর নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য অর্থ দিয়ে কিনতে বৃথাই চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর ওপর সম্রাটের বিশেষ অনুগ্রহ নবাব ঈর্ষার দৃষ্টিতে দেখেছিল। সম্রাট ও মেজরের মধ্যে যাতে মনোমালিন্য ঘটে তার জন্য নানা চেষ্টা করে বিফল মনোরথ হয়ে তাঁর বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ করে প্রেসিডেন্টের কাছে কতকগুলি চিঠি লিখেছেন। প্রেসিডেন্টও সেই অভিযোগগুলি বিশ্বাস-যোগ্যই মনে করতে চান এবং যখনই সুবিধা পেয়েছেন তাঁর আচরণের ওপর দোষারোপ করে বোর্ডের সম্মুখে এনেছেন। মেজর তাঁর কর্তব্য কাজ যথারীতি সম্পন্ন করার জন্য যতই চেষ্টা করুন না কেন তার যে কু-অর্থ করা হয়েছে তার ভূরি ভূরি প্রমাণ উপস্থিত করা যেতে পারে।

(৩১) মেজর কার্ণাকের প্রতি গুরুতর অন্যায় করা হয়েছে তাঁকে পাটনা থেকে তলব করে। যে সেনা-বাহিনী এখনও সেখানে আছে তা এত বিপুল যে মেজরের মত পদাধিকারী ব্যক্তিকেই অধিনায়ক করে সেখানে রাখা উচিত ছিল। সেখানে তিনি অনেক কাজ দেখাতে পারতেন। তাঁকে কলকাতায় নিয়ে আসার কোনও হেতু নাই যখন কর্ণেল সেখানে যাচ্ছেন।

(৩২) কাসিম আলি খাঁ ইংরাজ জাতিকে গুরুতর-ভাবে অপমান করেছেন। যে চিঠি মেজর কার্ণাক সৈন্য পরিচালনার সময় সম্রাটকে লিখেছিলেন সেটা আটকানো হয়। সেই চিঠি খুলে নবাব প্রেসিডেন্টের কাছে পাঠিয়ে দেন। এই চিঠিখানি এবং নবাবের অন্যান্য চিঠি ৫ই আগষ্ট বোর্ডের সভায় আলোচনার জন্য স্থির হয় এবং কটাক্ষ করা হয় যে কর্ণেল, মেজর, রামনারায়ণ ও সিতাব রায়ের মধ্যে একটা ষড়যন্ত্র চলছে আর একটা টাটকা বিপ্লব ঘটানোর জন্য। চিঠির মধ্যে যেন অনেক রহস্যময় কথা আছে যার অর্থ উদ্ঘাটনের জন্য যথেষ্ট কসরৎ করা হয়। বোর্ডকে এ-কথা বোঝানোর চেষ্টা চলে যে ঐ কয়জন মিলে এমনি একটা ষড়যন্ত্র পাকিয়ে তুলতে যাচ্ছে। যা হোক্, চিঠি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষার পর ও পাটনা থেকে সিতাব রায়কে ডেকে এনে তাকে বাড়াবাড়িভাবে জেরা করে বোর্ড সম্মিলিতভাবে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছান যে এ-কথা মনে করার কোনও কারণ নাই যে এমনি একটা ষড়যন্ত্র সত্যই চলছে। ব্যাপারটা এমন হাস্যকর যে আমরা ধারণা করতে পারছি না যে যারা তদন্তের জন্য এমন মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন তাঁরা সত্যই এই ষড়যন্ত্রের কথা নিজেরাই বিশ্বাস করেছিলেন।

(৩৩) যে চিঠিখানি মেজর লিখেছিলেন (কর্ণেল কুটের নির্দেশ মত) তার বিষয়বস্তু ছিল সম্রাটের কাছে আবেদন যাতে তিনি গঙ্গার তীরে অবস্থিত সুজাউদ্দৌল্লার দেশে কোনও একটি দুর্গ আমাদের দখলে দেন। আমাদের সৈন্য যদি সম্রাটের সঙ্গে সহযোগিতা করতো তাহলে আমরা নিশ্চয়ই সুজাউদ্দৌল্লার রাজ্যের ভেতর প্রবেশ করতে পারতাম। সেখানে আমাদের অস্ত্র-শস্ত্র রাখার একটা উপযুক্ত স্থানের প্রয়োজন হতো। সেখান থেকে আমাদের যোগাযোগ ব্যবস্থা সচল করে রাখতে পারতাম। মেজরের মত উচ্চ পদ-মর্য্যাদাসম্পন্ন কর্ম্মচারীর চিঠি আটকানোর ফল অতি মারাত্মক হতে পারতো কারণ এটা জনমতের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শন যা এর আগে কোনও নবাব করেন নি। নবাবের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এ-বিষয়ে প্রকাশ্যভাবে লেখা হলেও কোনও সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া যায় নি।

(৩৪) মাননীয় মহোদয়গণ, এখন আপনারা বর্ত্তমান সরকারের সঙ্গে পুরাতন সরকারের তুলনামূলক বিচার করে দেখুন। আমরা মনে করি যে ক্ষমতায় আসীন সরকারকে সরাবার মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে এত তাড়াতাড়ি কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ায় কারণ ছিল না। এরূপ জটিল বিষয় স্থির করতে হলে এ-দেশ সম্বন্ধে পূর্ণ অভিজ্ঞতা আমাদের সঙ্গে এ-দেশের স্বার্থ সম্বন্ধে উপযুক্ত আলোচনার প্রয়োজন ছিল। মিস্টার ভ্যান্সিটার্ট মাত্র তিন মাস আগে বাংলাদেশে এসেছিলেন। এত অল্প সময়ের মধ্যে এ-দেশ সম্বন্ধে এমন সঠিক অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করতে পারেন নি যার ওপর নির্ভর করে তিনি সেই মহান্ চুক্তি যা এ্যাড্‌মিরাল ওয়াটসন্ এবং কর্ণেল ক্লাইভ সিলেক্ট্ কমিটির অনুমোদনে কোম্পানীর স্বার্থে এবং জাতীয় সম্মান রক্ষার উদ্দেশ্যে সম্পাদন করেছিলেন তা নাকচ করে দিতে পারেন।

(৩৫) যে ভদ্রলোকগণ এই বিপ্লবের ইন্ধন জুগিয়েছেন তাঁরা গত বছরের আলোচনায় সুন্দরভাবে নিজেদের মধ্যে মতের মিল দেখিয়েছেন। তার প্রতিদানে প্রেসিডেন্ট তাঁদের ওপর অনুগ্রহ দেখাতে কার্পণ্য করেন নি—যার একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত আপনাদের কাছে উপস্থাপিত করছি। আপনাদের ২১শে জানুয়ারি, ১৭৬১ সালের চিঠিতে সোজাসুজি সাম্নার প্লাভডেল ও ম্যাক্‌গুইনির বরখাস্তের আদেশ ছিল। তবুও ম্যাক্‌গুইনির পদচ্যুতির আদেশের অনেকদিন পর অর্থাৎ ১০ই আগষ্ট যখন পাটনায় মিস্টার এলিস প্রধান অধিনায়করূপে নিযুক্ত হলেন তখনও মিস্টার ভ্যান্সিটার্ট কাউন্সিলে প্রস্তাব আনলেন যে মিস্টার এলিসের পাটনায় না পৌঁছানো পর্য্যন্ত অর্থাৎ আরও দুইমাস ম্যাক্‌গুইনিই পাটনার প্রধান রূপে থাকুন। তাঁর প্রস্তাব কাউন্সিলে উঠলে তা বাতিল হয়ে যায়, কেন না কাউন্সিলের অন্যান্য সদস্যরা তাঁদের মনিবদের আদেশের বিপরীত কিছু করে দোষী হতে ইচ্ছুক হলেন না। মিস্টার ভ্যান্সিটার্টের ইচ্ছানুসারে তাঁর প্রস্তাবটি আলোচিত হলেও লিপিবদ্ধ হলো না। এখানে আর একটি মন্তব্য করারও প্রয়োজন বোধ করছি। মিস্টার হল্‌ওয়েলের প্রতি মাননীয় কোম্পানীর বিরূপ মন্তব্য এবং তাঁকে সভাপতি পদ থেকে সরিয়ে কাউন্সিলের সপ্তম সদস্যরূপে গণ্য করার আদেশ থাকায় তাঁকে প্রথমে সতর্ক করে জানানো হয় যে তিনি চাকুরিতে থাকবেন, না চলে যাবেন তা স্পষ্ট করে বলুন। তিনি মিস্টার ভ্যান্সিটার্টের সঙ্গে গোপনে আলোচনা করে কাউন্সিলে এবং সিলেক্ট কমিটি দুই জায়গাতেই থেকে যান। যেদিন মিস্টার ভ্যান্সিটার্ট বোর্ডের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তাঁর মতলব হাসিলের জন্য মুর্শিদাবাদ রওনা হয়ে যান সেইদিনেই তিনি পদত্যাগ করেন।

(৩৬) এই বিপ্লবের আর্মেনিয়ান ষড়যন্ত্রকারী কোজা পেট্রুস্ ও কোজা গ্রেগরী নবাবের এবং তাঁর অনুচরদের অত্যন্ত বিশ্বাসভাজন। প্রথম উল্লিখিত ব্যক্তিটিকে কাসিম আলি খাঁ কলকাতায় রেখেছেন। সে যে ইংরেজদের প্রতি কাজে নজর রেখে গুপ্তচর বৃত্তি করে থাকে তা সকলেরই জানা আছে। সে নবাবকে নিয়মিতভাবে ইংরেজদের সমস্ত সংবাদ জানিয়ে দেয়। এ ব্যাপারে কর্ণেল কুট ও মেজর

কার্ণাক উভয়েরই জানা ছিল যখন তাঁরা পাটনায় ছিলেন। শেষোক্ত আর্মেনিয়ানটি নবাবের কাছে থাকে এবং তাঁর সর্বাপেক্ষা বিশ্বাসভাজন। এই দুই জন আর্মেনিয়ানের প্রভাব, প্রতিপত্তি এদেশে ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে আর্মেনিয়ানদের স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ এনে দিয়েছে। যার ফলে আমাদের বাণিজ্য কেন্দ্রগুলিতে ব্যবসার প্রভূত ক্ষতি হচ্ছে। তারা প্রত্যহ এমন সব জোর জুলুমের কাজ করে যার প্রতিক্রিয়া ইংরাজদের ওপর এসে পড়ে যেন ইংরেজরা তাদের উৎসাহিত করে জুলুম-বাজি চালাচ্ছে।

(৩৭) যে ধরণের কার্য পরিচালনার রীতি এখানে চলছে তার বিরুদ্ধাচরণ আমরা অনবরত করে যাচ্ছি এই কথা মনে করে যে এইভাবে কাজ চালালে আপনাদের কাজের কিছুতেই উন্নতি হতে পারবে না। আপনারা এখন অনুধাবন করতে পারবেন কেন এত মতানৈক্য যা আমাদের আলোচনার মাধ্যমে প্রকাশ পায় এবং প্রকৃত কারণ না জানা থাকলে এইরকম মতানৈক্য আপনাদের নিঃসন্দেহে বিস্মিত করে তুলবে। এ পর্যন্ত যে-সমস্ত কর্মপদ্ধতিতে আমাদের সম্মতি প্রদান করিনি তার কারণ এই যে তা আপনাদের স্বার্থের প্রতিকূল বলে ভেবেছি যদিও ঐসব কাজে সায় দিয়ে চললে আমাদের ব্যক্তিগত উপার্জ্জন বেড়ে যেত। সুতরাং আপনারা এ-বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন যে আমাদের অপরিবর্ত্তনীয় নীতি এই যে আপনাদের সম্মান ও সুবিধার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা।

(৩৮) মহামান্য ভদ্র মহোদয়গণ, আপনারা অবগত আছেন যে সম্রাট আপনাদের সাহায্য প্রার্থনা করেছেন তাঁর সিংহাসন আরোহন নির্ব্বিঘ্ন এবং যে সব দেশ এখনও বিদ্রোহীদের কবলে আছে তা উদ্ধার করার জন্য। আমাদের অভিমত এই যে আমাদের এমন সৈন্য আছে যা দিয়ে একটা বাহিনী গড়ে এই কাজে তাঁকে সাহায্য করা চলে। আমাদের এখন ইউরোপীয় শত্রুর ভীতি না থাকায় সম্রাটকে সাহায্য করার জন্য যে সৈন্য নিয়োগ করা দরকার কোনও বিপদের ঝুঁকি না নিয়েও তা করতে পারি। নবাবের বিপুল সৈন্যবাহিনী এই প্রদেশের ওপর একটা বোঝার মত হয়ে দাঁড়িয়েছে। সম্রাটের ক্ষমতা নিয়ে নিজেকে আড়াল করে রাখবার জন্য এবং আমাদের ওপর ঈর্ষাবশত এই বাহিনী নবাব পুষছেন। নবাবের সৈন্যবাহিনী আমাদের সৈন্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সম্রাটের সাহায্যে এগিয়ে গেলে আরও ভাল হবে। তাহলে এই প্রদেশও একটা বিরাট জঞ্জালকে অনেকটা মুক্ত হবে। সুজা দৌলিত সংগ্রামে একজন প্রকৃত ক্ষমতাশালী ব্যক্তি। তিনি তাঁর সৈন্য নিয়ে এই অভিযানে যোগ দেবেন। তা ছাড়া সাম্রাজ্যের নানা অংশের আরও অনেক ক্ষমতাশালী ব্যক্তি। তিনি তাঁর সৈন্য নিয়ে এই অভিযানে যোগ দেবেন। তা ছাড়া সাম্রাজ্যের নানা অংশের আরও অনেক ক্ষমতা-শালী ব্যক্তি যাঁরা সম্রাটের বন্ধু রাজকীয় পতাকার তলে সমবেত হবেন— যদি আমরা যুদ্ধক্ষেত্রে নামি। আমাদের সেনাবাহিনী খুব সম্ভব (যে কথা সম্রাট প্রায়ই বলে থাকেন) বিনা বাধার অগ্রসর হয়ে দিল্লীর ফাটক পর্যায় পৌঁছাতে পারবে। আমরা অত্যন্ত বিনীতভাবে এই আবেদন করছি মহাশয়দের কাছে যে—যে কোম্পানিকে সমগ্র হিন্দুস্থানে গৌরবজনকভাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যে সুযোগ এসেছে তা গ্রহণ করা উচিত বিশেষ তা ভেবে দেখা দরকার। আপনাদের বিশেষ ভাবে বিচার করে দেখতে অনুরোধ করছি যে যে ইংরাজ সৈন্যদের সহায়ে সম্রাট যদি তাঁর সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেন তাহলে ইংরাজ জাতি বিপুল সম্মান ও সুবিধাভোগী হতে পারবে। আমাদের সাহায্যের অভাবে তিনি স্থাণুবৎ হয়ে আসছেন। তিনি রাজধানীর দিকে যাত্রা করতে অক্ষম বোধ করছেন।

(৩৯) যদি আপনারা বাংলাদেশের বাইরে কর্ম্মক্ষেত্র বিস্তৃত করতে অনিচ্ছুক হন এবং বাংলার দেওয়ানি পদ গ্রহণ করা অপেক্ষা কেবলমাত্র বঙ্গদেশে অর্জিত সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ এবং কেবল বাংলাদেশে মধ্যেই ব্যবসা পরিচালনা করলেই আগ্রহী হন— তা হলেও আমাদের

এই অভিমত আপনাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করছি যে এদেশে আমাদের স্বার্থ বজায় রাখতে নবাবের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক না রেখে স্বাধীনভাবেই কাজ করে যেতে হবে এবং এই জন্য ক্ষমতায় আসীন এমন ব্যক্তিদের সাহায্য করে যেতে হবে বন্ধু বলে প্রমাণিত হয়েছে। যদি নবাব আমাদের বিরুদ্ধে কোনও অভিসন্ধি করে থাকেন তাহলে উপরোক্ত নীতিই তাঁর বিরুদ্ধে ভার সাম্যের কাজ করবে।

(৪০) এখানকার ব্যাপারের মোটামুটি বিবরণ আপনাদের কাছে পেশ করলাম। আমরা এই বিশ্বাস রাখি যে আমাদের সদিচ্ছার পরিচয় ভালোভাবেই আপনাদের দিতে পেরেছি এবং এজন্য নিজেদের কৃতার্থ মনে করছি। আমরা এই ব্যাপারে যে অংশগ্রহণ করেছি তা আপনাদের সমর্থন পাবে এই আশা করি। এখন এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে আমাদের বক্তব্য শেষ করছি যে আমাদের নিয়োগকর্তা মনিবদের সম্মান ও স্বার্থ যাতে বজায় থাকে তার জন্য কাজ করতে কখনও আমরা পশ্চাৎপদ হব না এবং তাঁদের কৃতকার্য্যতাই হবে আমাদের সবচেয়ে প্রার্থনীয় বস্তু।

আপনাদের বিশ্বস্ত ও

কর্তব্যপরায়ণ ভৃত্য—

(স্বাক্ষর) আয়ারকুট, পি. অমিয়ট,

জন কার্ণাক, উইলিয়ম্ এলিস,

এস্‌ল্যাটসন্, এইচ ভেংলেস্ট

অশ্বঘোষের প্রেম ও পরিণতি

শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

সুদূর অতীতের এক ঐতিহাসিক কাহিনী। আজ হতে দুই সহস্র বৎসর আগেকার কথা। তার ছয় শত বৎসর পূর্বে তথাগত যে মানব-কল্যাণের ধর্ম প্রচার করেছিলেন, তখনো তা জীবন্ত আদর্শ হয়ে ভারতীয় জীবনে বিদ্যমান ছিল।

সেকালের স্বনাম-প্রসিদ্ধ বিদ্বান্ ও রচনাকার অশ্বঘোষ। কাব্য, নাটক ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ চরিত-গ্রন্থের লেখকরূপে তাঁর নাম স্মরণীয় হয়ে আছে ভারতীয় ইতিহাসের সেই প্রভাতকালে থেকে।

সংস্কৃত ভাষায় রচিত সাহিত্য জগতে অশ্বঘোষের 'বুদ্ধচরিত' জীবনী কাব্য, 'উর্বশী' নাটক প্রভৃতির জন্যেই তাঁর বিশেষ খ্যাতি ও পরিচিতি। কিন্তু সেই প্রসিদ্ধির অন্তরালে তাঁর বিচিত্র ব্যক্তিজীবনের কাহিনী অজ্ঞাত রয়ে গেছে সাধারণ্যে।

অশ্বঘোষের সকরুণ জীবন-কাব্য অথবা বিয়োগান্তক জীবন নাট্যের কথা। হৃদয় বিনিময়ের সেই অপরূপ গাথা। অনিন্দ্য সুন্দরী গ্রীক কুমারীর সঙ্গে তাঁর প্রণয় এবং ঘাত-প্রতিঘাতের ফলে অভাবিত পরিণতি। সে যেন এক আশ্চর্য রমন্যাস। কবি-নাট্যকার অশ্বঘোষ ও রূপমতী প্রভাবতীর প্রেম-জীবন এক অন্ধ প্রথার আবর্তে কেমন রুদ্ধ হয়ে যায়। ভাগ্যচক্রের আলোড়নে নিষ্পেষিত হয়ে পড়ে দুটি উন্মুখ হৃদয়-কমল। তারই কাহিনী।

খৃষ্টাব্দের প্রথম শতক তখন প্রায় শেষ হয়েছে। ঘটনাস্থল উত্তরাপথের এক সমৃদ্ধ অঞ্চল। প্রবাহিনী সরযূর তীরে সাকেত নগরী সে সময় সাংস্কৃতিক ও বৈষয়িক নানা কারণে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছে উত্তর পশ্চিম ভারতে। সেই সাকেত নিবাসী এক সম্পন্ন ব্রাহ্মণ দম্পতি ছিলেন সুবর্ণাক্ষ ও সুবর্ণাক্ষী। অশ্বঘোষ তাঁদের একমাত্র সন্তান।

বাল্যকাল থেকেই অশ্বঘোষকে অতি মেধাবী দেখা গেল। বিদ্যার নানা শাখায় তিনি পারংগম হলেন অল্প বয়সে। সেই সংগে ক্রমে তাঁর সৃজনশীল প্রতিভারও স্ফুরণ হতে থাকে। তিনি রচনা করতে আরম্ভ করেন সংস্কৃত ভাষায়। কবিতা, গীতিকা ও ও নাটকাদি সৃষ্টি করতে থাকেন।

তরুণ বয়সেই কবি, গীত-রচয়িতা ও নাট্যকার-রূপে প্রসিদ্ধ হলেন অশ্বঘোষ। আরো নানা সদ্‌গুণের আধার বলে তাঁর পরিচয় পাওয়া যায়। একদিকে যেমন তিনি অমিত শক্তিশালী, অপরদিকে তেমনি অতিশয় সুকণ্ঠ সঙ্গীতবিদ্যারও তিনি অধিকারী। তাঁর কথোপকথন ও বাচনভঙ্গী চিত্তাকর্ষক ও শ্রুতিমধুর। অতি আনন্দ-দায়ক তাঁর ব্যক্তিত্ব। উপরন্তু অতিশয় রূপবান্ পুরুষ অশ্বঘোষ। দুর্লভ-দর্শন সুকুমার আকৃতি। একাধারে বীর্য ও মাধুর্যের প্রতিমূর্তি।

তাঁর প্রধান পরিচয় কবি-রূপে। কিন্তু তাঁর কাব্য রচনার মধ্যে সব চেয়ে জনপ্রিয়তা লাভ করে ভজনাত্মক গীতাবলী। তাঁর রচিত সেই সব কাব্য দেবস্তুতি বাচক সঙ্গীত শুধু সাকেত নগরে নয়, পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চলেও সাদরে অনুষ্ঠিত হতে থাকে। সাধারণের মুখে মুখে শোনা যায় গীত-রচয়িতা অশ্বঘোষের নাম। সুমধুর সঙ্গীত সৃষ্টির মাধ্যমে তাঁর যশের রশ্মি বিকীর্ণ হয়।

তাঁর স্বভাব-চরিত্রেরও নিজস্ব বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে। একদিকে তিনি যেমন ধীর স্থির

বিনম্র, অন্যদিকে তেমনি তাঁর মুক্তচিত্ত, স্বাধীনতা-প্রিয় এবং অনমনীয় সত্তা।

সে যুগের এক রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ পরিবারে অশ্বঘোষের জন্ম এবং আবাল্য সেই দৃঢ়বদ্ধ ব্রাহ্মণ্য সংস্কারের পরিবেশে তিনি লালিত পালিত হয়েছিলেন। কিন্তু সংস্কারাচ্ছন্ন হয়নি তাঁর মন ও বুদ্ধি। ভবিষ্যৎ-মুখী তাঁর উদার দৃষ্টি। কালের যাত্রার সমতালে তিনি অগ্রসরমান স্বকীয় চিন্তায় নবযুগের ধ্যান-ধারণার তিনি পক্ষপাতী।

পারিবারিক গণ্ডী থেকে মুক্ত তাঁর চিত্ত। বিবাহ এবং অন্যান্য সামাজিক প্রথা, রীতিনীতিকে তিনি যুগোচিত যুক্তি দিয়ে বিচার করেন। বাধা স্বরূপ অচলায়তন বর্জিত হয় তাঁর চিন্তাধারায়। কিন্তু আপন মতামতে কঠিন হলেও ঔদ্ধত্যের চিহ্নমাত্র তাঁর মধ্যে দেখে না কেউ। যেমন মধুর তাঁর ভাষণ, তেমনি বিনীত তাঁর আচরণ। সংশুদ্ধ এক আদর্শচরিত্র যুবক অশ্বঘোষ। তাঁর কবিখ্যাতির সঙ্গে স্বভাব-মাধুর্যও সাকেত-বাসীদের প্রশংসা অর্জন করেছে। প্রথম যৌবনকালেই তাঁর এই সামাজিক প্রতিষ্ঠা।...

অশ্বঘোষের প্রায় চার শত বৎসর আগে আলেকজান্দারের কাল। সেই দুর্ধর্ষ গ্রীক দিগ্বিজয়ীর অভিযান ভারতের উত্তর পশ্চিম দিগন্তে বহিরাক্রমণের পথ উন্মুক্ত করে দেয়। আলেকজান্দারের পরবর্তী যুগের উত্তর পশ্চিম সীমান্তেও হানা দিতে থাকে গ্রীক অভিযাত্রীরা। তার ফলে ভারতবর্ষের এই অংশে একটি গ্রীক পর্যায়ের অধ্যায় রচিত হয়। পরে পরে নানা শ্রেণীর গ্রীসবাসী আগমন করে বসতি স্থাপন করে এ অঞ্চলে। কালক্রমে তারা ভারতভূমির স্থানীয় অধিবাসীতে রূপান্তরিত হয়ে যায়।

যুগে যুগে ভারতের আতিথ্য গ্রহণ করে গ্রীক রাজপুত্র রাজপুরুষ, অভিজাতবর্গ, সৈন্যসামন্ত, নানা অসামরিক ব্যক্তি ও পরিবার। স্বদেশ ও জাতীয় আচার আচরণ থেকে সময়ধর্মে তাদের বিচ্ছেদ ঘটে যায়। স্বদেশীয় সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে তারা। তারপর কালের ব্যবধানে ও ভারতীয় ঐতিহ্যের পরিবেশে তাদের ভারতীয়করণ সম্পূর্ণ হয়ে যায়। ভারতবর্ষীয় জীবনযাত্রা ও প্রাণধারার সঙ্গে একাত্মতা জন্মায় তাদের। ভারতের ভাষা, রীতিনীতি, সামাজিক আচার বিচার ও আদর্শ, ভারতবাসীর সুখ দুঃখ সবই তারা আপন, আত্মস্থ করে নেয়। এক কথায়, সেই বহিরাগত গ্রীকরা ভারতীয় হয়ে পড়ে বংশানুক্রমে। সসাগরা ভারতবর্ষই হয় তাদের স্বদেশ, বংশধরদের জন্মভূমি। আদি বাসভূমি তাদের স্মৃতিলোকে বিরাজ করে। শুধু বহিরঙ্গের দেহসৌষ্ঠবে ও সৌন্দর্যময় আকৃতিতে ভাস্বর থাকে যাবনিক বৈশিষ্ট্য।

ভারতের উত্তর পশ্চিম অঞ্চল থেকে কালক্রমে এমনি কোন কোন পরিবার আরো পূর্বদিকে চলে আসে।

বসতি করে উত্তরাপথে। পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের প্রায় মর্মকেন্দ্রে তাদের বাস আরম্ভ হয়। উত্তর প্রদেশ নিবাসী হয়ে যায় তারা।

অশ্বঘোষের সময়ে এমনি একটি গ্রীক পরিবার সাকেত নগরেও বাস করত। ঐতিহাসিকভাবে মাত্র তারা যবন। কিন্তু অন্তরে ও সামাজিকভাবে, নাম পরিচয়ে ও বেশভূষায়, আচার আচরণে ও অশন. ভাষণে একান্তই ভারতবর্ষীয়। শুধু তাই নয়, বর্ণাশ্রমধর্মে ক্ষত্রিয় বলে তারা সমাজে চিহ্নিত ছিল।

পরিবারটির গৃহপতির নাম দত্তপুত্র। সাকেতে তাঁর নিবাস পিতৃপুরুষ থেকে। ক্ষত্রিয় বৃত্তিতে দত্তপুত্র রাজার সেনাবাহিনীতে নিযুক্ত।

সংসারে তাঁর স্ত্রী ও একটিমাত্র সন্তান—কন্যা প্রভাবতী। দত্তপুত্রের প্রাণসমা আদরিণী দুহিতা।

প্রভাবতীর রূপের ছটা এমনি যে বর্ণনা করলে মনে হবে অতিকথন।

কন্যা অতিশয় সুলক্ষণা। অপরূপা এক লক্ষ্মী-প্রতিমা যেন। রূপের বিধাতার অজস্র দাক্ষিণ্যে ধন্যা। কিন্তু সে যৌবনবতী সৌন্দর্যে কোন দহন জ্বালা নেই, এমনি শ্রেয়সী। অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যেন স্নিগ্ধ লাবনীতে গড়া। যেন অশরীরী তনুমায়া' এমনি পেলব। শরৎকালীন

জ্যোৎস্না কিরণ কিংবা নব বসন্তের প্রভাত-শিশির যেন তাতে অবয়ব লাভ করেছে। কায়া ধরেছে স্বপ্নচ্ছায়া। যূথিকার সুরভি নির্য্যাস তার বরাঙ্গে। এক বাক্যে বলা যায়, প্রভাবতী যেন রূপকথা রাজ্যের রূপবতী—অলকাপুরীর অপ্সরা।

দেহ-সৌন্দর্যের উপযুক্ত প্রভাবতীর জ্ঞানসম্পদও। দত্তপুত্র যে বলতেন, 'কন্যা আমার বিদ্যায় সাক্ষাৎ সরস্বতী', তা শুধুই পিতৃস্নেহের উক্তি নয়। রূপৈশ্বর্যের সঙ্গে গুণ-বৈভবেও সে গরীয়সী। বিদ্যার চর্চায় তার এমনি অনুরাগ ও অধিকার যে তাকে এই বয়সেই বিদুষী বলা যায়। নারীদের নানা মাধুর্যে ধন্যা প্রভাবতী।

সাকেত নগরির যে অংশে দত্তপুত্রের বাস সেখানে প্রভাবতীর রূপগুণের কথা কারো অজানা নয়। তার অলোকসামান্য সৌন্দর্যের খ্যাতিও স্থানীয় সকলের মুখে। কারণ সবাই তাকে দেখেছে। সেকালের মুক্ত সমাজে কোন অবরোধ প্রথা ছিল না ভারতীয় পুর-নারীদের মধ্যে। বহু বিষয়েই স্বাধীনা ছিল নারীরা, নানা ক্ষেত্রে পুরুষের সমকক্ষাও। কোন কোন শিল্পকর্মে বরং তাদের পারদর্শিতা পুরুষের তুলনায় অধিকতর স্বীকৃত ছিল।

প্রাচীনকালের সেই স্বতন্ত্র ভারতবর্ষের সে এক পরম গৌরবজ্জ্বল যুগ। দেশ যেমন সমৃদ্ধ, সুরক্ষিত, সমাজে তেমনি অবাধ স্বাচ্ছন্দ্যের পরিবেশ। স্বাধীন দেশের নাগরিকদের সঙ্গে নারী সমাজেও সেই নিরাবিল মুক্তির আবহ। নানা বিষয়ে পুরুষ-নারীর সুসম অধিকারের সুসভ্য কাল। বর্বর বিদেশী শাসনের অন্ধ মধ্যযুগ তখন সুদূরে এবং অচিন্তনীয়।......

সেই নিরবরোধ সমাজে সাকেত-বাসিনীরাও সান্ধ্য ভ্রমণ করত সরযূর ধারে। মনোরম নদীতীরের স্নিগ্ধ মলয় পুরুষও নারী সকলেই স্বচ্ছন্দে উপভোগ করত। পুরপালক কর্তৃপক্ষ সেখানে একটি স্থান নির্দিষ্ট রেখেছিল শুধু পুরাঙ্গনাদের বিচরণের জন্যে। উদ্যানের একাংশে ললনাদের ভ্রমণে, আলাপনে কিছু বিশেষ সুবিধা; নিভৃত অবকাশ যাপন তথা বায়ু সেবনের এক বিশেষ অধিকার। উদ্যানের অপরাপর অংশ পুরুষ সাধারণের জন্য উন্মুক্ত থাকত।

সেখানকার সরযূ তীরের দৃশ্য ছিল অতি মনোমুগ্ধকর বিশেষত গোধূলি বেলায় তা অপরূপ শোভাময় হয়ে উঠত। নীচে বিস্তীর্ণ নদীবক্ষে, আর অপর দিগন্তে লীন উদার আকাশপটে সূর্যাস্তকালের সে কি নয়নানন্দ বর্ণচ্ছটা। দিনমণির অস্তাচলে যাবার আগে ও পরে নভোলোকে কত রঙের রূপান্তর। বিরাট পট-ভূমিকায় সে যেন ক্ষণে ক্ষণে নব নব বর্ণলেপনে চিত্র রচনা। সেই নৈসর্গিক সৌন্দর্যের মায়ায় কতজন নৌকা ভ্রমণে নির্গত হত। সরযূর বুকে ভেসে যেত নানা সুসজ্জিত জলযান। নদীবক্ষের বিচিত্র অলঙ্কার যেন।

অনেকে তখন সরযূতীরের কোন শ্যামল নির্জনে পক্ষী শিকারে অবসর যাপন করত। কেউ বা সবান্ধবে কিংবা একাকী বসে উপভোগ করত সেই অনুপম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য।

প্রকৃতি-প্রেমিক অশ্বঘোষও প্রায়ই সেখানে উপস্থিত হতেন। পারিপার্শ্বিক দৃশ্যে আকৃষ্ট হয়ে মগ্ন থাকতেন একান্তে। মনের সঙ্গোপনে নানা ভাব কোরক প্রস্ফুটিত, বিকশিত হয়ে উঠত। প্রেরণা লাভ করতেন তিনি।

সরযূতীরের অপরাহ্ন বড়ই প্রিয় ছিল অশ্বঘোষের। আপন মনে তাঁর কত অনুভবের সময় সেখানে অতি-বাহিত হয়ে যেত। কখনো তিনি লক্ষ্য করতেন নভোচারী পক্ষীকুলের ছন্দোময় গতি। কখনো স্রোতস্বিনীর তরঙ্গ-কলস্বর কান পেতে শুনতেন। কখনো বা উপভোগ করতেন মহাকাশের বর্ণ-বৈচিত্র্য। জনসমাজ থেকে দূরে নদীতটের সেই নিভৃতিতে তাঁর মানস-বিলাস স্ফূর্তি লাভ করত।

সরযূরতীরে এই গতায়াতে তাঁর দৃষ্টিপথে কিন্তু কোনদিন আসেনি প্রভাবতী। গ্রীক কুমারীর এখানে নিয়মিত আগমণ ঘটলেও এ যাবৎ কখনো দুজনের

যোগাযোগ ঘটেনি। কারণ কবি থাকতেন আপন মনে বিজনে। এবং পুরপালক-নির্দিষ্ট স্থানটিতে সঙ্গিনীদের সঙ্গে প্রভাবতী বিচরণ করত। ঘনিষ্ঠ বান্ধবীদের সঙ্গে অবসর যাপন করে যেত সেখানে। কখনো কখনো দীর্ঘ সময় শেষে সখাদের নিয়ে গৃহে প্রত্যাবর্তন করত। সেই তরুণ কবি ও অপরূপা তরুণীর কাছে এইভাবে অজ্ঞাত ছিল পরস্পরের পরিচয়।

কিন্তু চিরকাল এমনিভাবে গেল না একদিন অলক্ষ্য ফুলশর নিক্ষেপ করে দুজনের যোগাযোগ ঘটিয়ে দিলেন মদনদেব।

সেদিন সঙ্গিনীদের কাছে বিদায় নিয়ে প্রভাবতী একাকিনী গৃহে ফিরছিল। অন্যদিন তার প্রত্যাগমনে আরো বিলম্ব হয়, কিন্তু সেদিন যাত্রা করেছিল কিছু পূর্বাহ্নে।

সূর্য তখনো অস্তাচলে যায়নি বটে, তবে তার রক্তিমাভায় চতুর্দিক মায়াময় হয়ে উঠেছিল। প্রভাবতীর মুখপদ্মেও সেই লালিমার প্রসাধন-লাবণ্য অপেক্ষা করে ছিল কবির দৃষ্টিপাতের জন্যে।

অশ্বঘোষও সময় তার লক্ষ্য করে অন্য মনে চলেছিলেন। স্বপ্নময় চোখে অপলক দৃষ্টি। অন্তরে অস্ফুট কাব্য কলিকার গুঞ্জন। বাহ্য কোন দিকেই তাঁর মনোযোগ ছিল না। জনবিরল পথ।

এমন সময় প্রভাবতীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটে গেল, পথের এক প্রান্তে। একান্তই সম্মুখে।

অশ্বঘোষ চমৎকৃত হলেন। সেই মূর্তিমতী লাবণ্য দর্শনে অভিভূত হয়ে পড়ল তাঁর কবিচিত্ত। মুগ্ধ বিস্ময়ের আবেশে চলৎশক্তি-রহিত হলেন তিনি। গতি তাঁর স্তব্ধ হল, কিন্তু অন্তরে এক অপূর্ব পুলকের উচ্ছ্বাস উত্তাল হয়ে উঠল। আর এক প্রকারের আত্ম-বিস্মৃতি ঘটল কবির। বসন্তের সঞ্জীবিত সমীরণ উতল পাথাল হল। অনাস্বাদিত অনুভবে ভরে গেল তাঁর মন। অস্তরবির বর্ণাঢ্য আভায় কবির হৃদয় প্রথম দর্শনেই জয় করে নিলে সৌন্দর্যময়ী। আঁখিতে আঁখিতে দুই আত্মার সম্মিলন ঘটে গেল। আচ্ছন্ন বিশ্ব চরাচরে দুটি জাগত প্রাণ।

অশ্বঘোষের সমগ্র ইন্দ্রিয়-চৈতন্য কেন্দ্রীভূত হল তাঁর চক্ষুতে। সম্মোহিত দৃষ্টিতে তিনি নির্বাক হয়ে রইলেন।

কিন্তু কৌতূহলের আবেগে চঞ্চলা হল গ্রীক নন্দিনী। অস্ফুট স্বরে জিজ্ঞাসা করলে, 'কে আপনি, আর্য?'

সংবিৎ ফিরে পেলেন কবি। বললেন, 'বরাঙ্গনে, আমি অশ্বঘোষ।'

সচকিতা হল প্রভাবতী। তার বীনানিন্দিত কণ্ঠে উচ্চারিত হল, 'আপনিই সেই মহান্ কবি?'

অশ্বঘোষ স্মিতহাস্যে বললেন, 'সাধারণ কবি মাত্র।'

মধুর ব্রীড়ায় অধোবদন হল কনকাঙ্গী। অন্তরে কেমন বিবশা বোধ করলে। সেইক্ষণে তারও হৃদয় দান করে দিলে নবীন বর-কবিকে। অশ্বঘোষের ভাব-বিহ্বল দৃষ্টি প্রভাবতীর আত্মার দর্পণ হল। সেখানে আপন প্রতিচ্ছায়া দর্শনে অপূর্ব শিহরে আত্মহারা হল কুমারী মন।

অশ্বঘোষ এবার মানসীর ব্যক্তি পরিচয় জানতে চাইলেন—'ভদ্রে, কি আপনার নাম? কোথায় নিবাস আপনার পরিবারের?'

'ক্ষত্রবীর দণ্ডপুত্র আমার পিতা। আমি প্রভাবতী।'

গভীর ভাবাবেগে পুনরাবৃত্তি করলেন অশ্বঘোষ, 'প্রভাবতী......প্রভাবতী......প্রভায় প্রোজ্জলা......কি সার্থকনামা...' এমন কাব্যময়, ভাব-গাঢ় নাম-সম্বোধনে নায়িকার তনু-মনে শিহরণ জাগল।...

এমনিভাবে সেই মধু গোধূলি লগ্নে মধুর পরিচয়ের সূচনা। ক্রমে শশিকলার তুল্য শ্রীবৃদ্ধি।

পরদিন নদীতটে পুনরায় দুজনের সাক্ষাৎ হল। নিভৃতে, বৃক্ষতলে। অচিরেই সুগোচর হল পরস্পরের হৃদয় রহস্য।

তারপর প্রায় প্রতিদিন, নিয়মিত দুজনের সাক্ষাৎ হতে লাগল। সন্দর্শন, সম্ভাষণ, ভাবনা ধারণার আদান প্রদান। অপরাহ্নে, দিন শেষের ছায়ায়, চন্দ্রালোকে। কখনো কথোপকথনে মগ্ন। কখনো বাক্যহারা স্তব্ধতায় গহিন অনুভব। পরস্পরের সান্নিধ্য জীবনের শ্রেষ্ঠ আনন্দ স্বরূপ দুজনেরই।

সেই আনন্দের আকর্ষণে তাঁদের প্রাত্যহিক সাক্ষাৎ। নদীতীরের এক উদ্যানের উপান্তে প্রেমিক প্রেমিকার সন্দর্শন স্থল। দিনেকের বিরতিতে দুজনেরই অসহ বোধ হয়। দর্শনে হৃদয়ের কি দ্রুততর উতরোল গতি —অসাধ্য-বর্ণন তার পুলকোচ্ছ্বাস।

সরযূ সৈকতের সেই লীলানিকেতনে অশ্বঘোষ প্রভাবতীর কনক প্রহরগুলি মুক্তপক্ষ বিহঙ্গের তুল্য ভেসে যায়। নিসর্গ শোভার পটভূমিতে আর একটি সুশোভন যুগলের চিত্র যেন। নদীজলে বর্ণবিচ্ছুরণ, নভোমণ্ডলে মেঘমালার বিহার, তরুশাখায় পুষ্পসম্ভার। এই বিশ্বসুন্দরের অঙ্গনে পরস্পরের রূপগুণে মুগ্ধ দুই তরুণ তরুণী। সময়ের গতিপথের প্রতি লক্ষ্য দেবার অবসর কারো নেই। অন্তর্লোক ও বাহির্লোক থেকে যুগপৎ অমৃতধারা নামে দুজনের প্রাণ মনে।

কখনো ধীর পদক্ষেপে উদ্যানের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বিচরণ করতে তাদের দেখা যায়। কখনো কয়েকটি মাত্র কথা। কখনো সঙ্গীতে ভাব বিনিময়, অন্তরের উদ্‌ঘাটন। এমনি নানাভাবে কাল উত্তীর্ণ হয়ে চলে। বৃদ্ধ উদ্যানরক্ষক সকৌতুক আনন্দে তত্ত্বাবধান করে প্রেমিক যুগলের। দুজনে তার বড়ই প্রিয়।

অশ্বঘোষ-প্রভাবতীর প্রেম-সাক্ষাৎ প্রতিদিনই অবশ্য বসন্তকূজিত হয় না। কোনো কোনো দিন ভবিষ্যৎ চিন্তার বাষ্প আচ্ছন্ন করে দুজনের মন। সন্দেহ জাগে, এত সুখ কি স্থায়ী হবে উত্তর জীবনেও? এই মিলন কি পরিপূর্ণতায় শ্রীমণ্ডিত হবে?

দুজনের মধ্যে দুই প্রকারে উদয় হয় এই ভাবনা।

নায়িকার মনে নানা প্রশ্নের জাল এক-এক সময় রচিত হতে থাকে। কারণ দুই পক্ষে পারিবারিক ব্যবধান সম্পর্কে প্রভাবতী সচেতন। সামাজিক দূরত্বও তার অজানা নয়। এসবের সু-সমাধান কি সম্ভব হবে শেষ পর্যন্ত? অবশ্য আপন পরিবার সম্পর্কে এ বিষয়ে কোন বিপত্তির কথা তার মনে আসে না। কারণ পিতার একান্ত স্নেহ ও মতামত দুয়েই সে নিশ্চিন্ত। কিন্তু কবির পরিবার? তাঁদের সামাজিক রীতিনীতি বোধ? সেক্ষেত্রে কোন অলঙ্ঘ্য বাধা যদি দেখা দেয়?

অশ্বঘোষের মনে কিন্তু কোন দ্বিধা চিন্তা নেই এ বিষয়ে। অতি দৃঢ় তাঁর আত্মবিশ্বাস। পারিবারিক অর্থাৎ পিতার বিরোধিতা আসবে এ সম্পর্কে তিনি যেমন সুনিশ্চিত, তার সম্মুখস্থ হয়ে তা জয় করতেও তিনি তেমনি বদ্ধপরিকর। আপন অভীষ্ট থেকে কোন সামাজিক বা পরিবারগত ভ্রূকুটিতেই তিনি বিচ্যুত হবেন না। কোন রুদ্ধকর প্রথাই অবরোধ করতে পারবে না তাঁর অন্তরের স্বচ্ছন্দ গতিকে।

এমনি পরিস্থিতিতে তাঁদের আরো কিছুদিন চলে গেল।

দুই হৃদয়ের প্রেমের মুকুল পুষ্পিত, বিকশিত হল সৌরভে, সৌকর্যে। অশ্বঘোষ অন্তরে কাব্য সৃষ্টির বিচিত্র অনুপ্রেরণা লাভ করলেন। তাঁর কবি-প্রতিভা আত্মপ্রকাশ করতে লাগল নব নব সৃজনশীল পথে। আত্মস্ফুরণের এই পথেই তিনি অনবদ্য সংস্কৃত নাটক 'উর্বশী' রচনা করলেন। এ সৃষ্টির প্রেরণাও তিনি পেলেন প্রভাবতীর সান্নিধ্যে ভূলোকের অপ্সরার রূপ-তনু কবির ধ্যানে অলকাপুরীর সৌন্দর্যময়ী হয়ে দেখা দিলে। কবি-প্রিয়ার হৃদয়াবেগ রূপ ধারণ করলে নন্দনবাসিনী মানসীর প্রেমে। মর্ত-নন্দিনীর সমস্ত মাধুর্য নাট্যকারের মনের মাধুরীতে মিশে উর্বশীর প্রতিমা গঠিত হল।

শুধু নাটক নয়, 'উর্বশী' পাদপ্রদীপের সামনেও দেখা দিলে অশ্বঘোষের উদ্‌যোগে।

সাকেত নগরীতে গ্রীক সমাজের একটি নাট্যমঞ্চ ছিল। তারা এই প্রেক্ষাগার গঠন করলেও সকল

নাগরিকদের সাংস্কৃতিক জীবনের সঙ্গেই যুক্ত ছিল সেটি। অশ্বঘোষের নাটকও সেই নাট্যমন্দিরে মঞ্চস্থ হল।

নাট্য উপাদান ভিন্ন আরো এক অভিনব কারণে 'উর্বশী' সাড়া জাগাল নাট্যরসিক সমাজে।

স্বয়ং নাট্যকার ও প্রভাবতী দুজনকেই এই নাটকে নায়ক-নায়িকারূপে মঞ্চাবতরণ করতে দেখা গেল। প্রাণ পেলে পুরূরবা ও উর্বশীর চরিত্রাভিনয়। বাস্তব ও কল্পনা, মূর্তিমতী ও আদর্শ ভাবনা অন্তরঙ্গ একাকারে সার্থক হয়ে উঠল।

এত মঞ্চসফল হল, এমন প্রসিদ্ধি অর্জন করলে অশ্বঘোষের 'উর্বশী' যে তা গ্রীক ভাষায় অনূদিত হয়ে অভিনীত হতে লাগল গ্রীস দেশে পর্যন্ত। সেকালের ভারতবর্ষের নাট্যক্ষেত্রে সে এক স্মরণীয় কীর্তি। দেশের চতুঃসীমা পার হয়ে দেশীয় নাট্য সৃষ্টির বিদেশে এক বিজয় অভিযান।......

এদিকে সাকেত নগরে 'উর্বশী'র অভিনয় থেকে নায়ক-নায়িকার ব্যক্তিজীবনও প্রচারিত হয়ে পড়ল। অশ্বঘোষ ও প্রভাবতীর ঘনিষ্ঠতার কথা মুখে মুখে আলোচিত হতে লাগল সাধারণ্যে। নাটকের সঙ্গে নায়ক-নায়িকার প্রণয়কাহিনী অনেক নাগরিকেরই কানে গেল।

ক্রমে নাট্যকারের পিতা সুবর্ণাক্ষও শুনলেন এই বিষম অভাবিত সংবাদ।

প্রাচীনপন্থী ব্রাহ্মণ ক্রোধে ক্ষিপ্তপ্রায় হলেন। পুত্রকে আহ্বান করে কঠোর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন 'এ জনরব কি সত্য? ম্লেচ্ছ গ্রীক কন্যার সঙ্গে তোমার এই সংসর্গের কথা?'

অশ্বঘোষও সবিনয়ে কিন্তু দৃঢ়ভাবে সত্য প্রকাশ করলেন। গ্রীক নন্দিনীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের বিষয় গোপন রাখলেন না কিছুই। প্রভাবতীর প্রতি গভীর আসক্তি এবং তাকে পরিণীতা বধূরূপে লাভের ইচ্ছাও অকপটে জানালেন।

উপসংহারে নত মস্তকে নিবেদন করলেন, 'প্রভাবতীর সঙ্গে বিবাহ যদি অসম্ভব হয় তাহলে আমি চির কৌমার্য পালন করব।'

সংস্কারাচ্ছন্ন মন সুবর্ণাক্ষের। তরুণ পুত্রের হৃদয়-গতি তিনি অনুধাবন করতে পারলেন না। প্রথমে বিস্ময়ে, ক্রোধে হতবাক হলেন অশ্বঘোষের ঔদ্ধত্য দেখে। তারপর নানা প্রকারে পুত্রের মনোবাঞ্ছা পরিবর্তনের প্রয়াস করলেন। বিস্তর তর্ক-বিতর্ক হল দুজনে। কিন্তু অশ্বঘোষ আপন মতামতে অটল। সুবর্ণাক্ষও পুত্রের যুক্তি মেনে নিতে একান্তই অপারগ হলেন।

অবশেষে বিষম মনান্তর ঘটে গেল পিতা পুত্রে। দুস্তর ব্যবধান দুজনের ধ্যান-ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গীতে। সেতুবন্ধনের সেখানে আর কোন আশাই রইল না। অশ্বঘোষের জননী যথাসাধ্য চেষ্টা করলেন এই দ্বন্দ্ব নিরসনের জন্যে। কিন্তু তিনিও কারো মতি পরিবর্তন ঘটাতে পারলেন না। অন্তর্ধান করলে পারিবারিক শান্তি।

অশ্বঘোষ তখনি গৃহত্যাগ করলেন না বটে, কিন্তু পিতার সঙ্গে মানসিকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন। কথাবার্তা বন্ধ হল দুজনের মধ্যে।

মাতার মধ্যস্থতায় অশ্বঘোষ জানিয়ে দিলেন যে, অন্য নারীকে তিনি বিয়ে করবেন না এবং প্রভাবতী ভিন্ন তাঁর জীবন অর্থহীন, অকল্পনীয়।

সুবর্ণাক্ষও আপন মতামতে অনমনীয় রইলেন। বিশ্বজগৎ পরিবর্তিত হয়ে গেলেও এমন অসামাজিক বিবাহ সমর্থন করবেন না তিনি।

সুবর্ণাক্ষী পুত্রের পক্ষে সহানুভূতি জানালেন। স্বামীকে নানাভাবে অনুরোধ উপরোধ করলেন, পুত্রের মুখ চাইবার জন্যে। কিন্তু সুবর্ণাক্ষীর সমস্ত প্রযত্নই ব্যর্থ হল। গৃহপতি কিছুতেই সম্মতি দিলেন না এই প্রস্তাবিত বিবাহে।

পারিবারিক পরিস্থিতি আরো কিছুকাল এমনি অশান্তিকর রইল।

অবশেষে একদিন অশ্বঘোষ গৃহত্যাগ করলেন ভগ্ন হৃদয়ে।

ভবিষ্যৎ তখন তাঁর নিতান্তই অনিশ্চিত। কোন

কিছুই স্থির হয়নি। সেজন্যে তাঁর মনে হল, প্রভাবতীকে এ বিষয়ে এখন জানাবার প্রয়োজন কি? তা ভিন্ন, এ সংবাদে প্রভাবতীর মন অতিশয় ব্যথা পাবে। সুতরাং গৃহত্যাগের কথা তাকে এখন না জানানোই মঙ্গল।

কিন্তু তার সঙ্গে সাক্ষাতে বিরত হলেন না অশ্বঘোষ। প্রতিদিন যথানিয়মে তিনি সরযূতটের সেই উদ্যানে উপস্থিত হতেন। সন্ধ্যা যাপন করতে লাগলেন প্রভাবতীর সান্নিধ্যে। সকল বিষয়েই তার সঙ্গে কথোপকথন করতেন, শুধু আপন পারিবারিক প্রসঙ্গ ভিন্ন। সেজন্য প্রভাবতীর সম্পূর্ণ অজ্ঞাত রয়ে গেল অশ্বঘোষের গৃহ-জীবনে এই বিপর্যয়ের কথা। কবি প্রেমিকের সঙ্গে বিবাহিত জীবনের সুখস্বপ্নে সে যথা-পূর্ব মগ্ন হয়ে রইল।

অপর পক্ষে পুত্রের গৃহত্যাগেও ক্ষান্ত হলেন না সুবর্ণাক্ষ। অশ্বঘোষের মনোবাসনা ব্যর্থ করবার জন্যে যে কোন উপায় অবলম্বন করতেও তিনি দ্বিধা করলেন না। নানা কূট চিন্তার পর একটি চক্রান্ত মনোমত হল তাঁর। এ বিষয়ে পত্নীকেও কোন কথা তিনি জানালেন না। এই পন্থা তাঁর পক্ষে বয়সোচিত কিংবা মঙ্গলকর কিনা এ ভাবনা একবারও তাঁর মনে উদয় হল না। কারণ তাঁর একমাত্র লক্ষ্য ছিল আপন দম্ভে জয়ী হওয়া, পুত্রকে পরাস্ত করা। তিনি চান অশ্বঘোষের স্বপ্ন চূর্ণ করে তাকে ঘরে ফিরিয়ে আনতে, আপন সমাজস্থ পাত্রীর সঙ্গে বিবাহ দিতে। একমাত্র পুত্রের এই অবাধ্যতা তাঁর অসহ্য।...

সুবর্ণাক্ষ গোপনে প্রভাবতীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। সেই বৃদ্ধ উদ্যানরক্ষক তাঁর সঙ্গে এই যোগাযোগ ঘটিয়ে দেয়। কিন্তু তার জানা ছিল না সুবর্ণাক্ষের প্রকৃত উদ্দেশ্য। অশ্বঘোষের পিতা পুত্রের বাগ্‌দত্তার সঙ্গে পরিচিত হবেন, এই কথায় উদ্যানরক্ষক কোন অকল্যাণের আশঙ্কা করতে পারে নি।

নির্দিষ্ট সময়ে উদ্যানে উপস্থিত হলেন সুবর্ণাক্ষ কিন্তু প্রভাবতী সন্দর্শনে প্রথমে তাঁর বাক্‌স্ফূরণ হল না। অভাবিত চমকে চেয়ে রইলেন অপলক চোখে। প্রীক-নন্দিনীর অনুপম রূপ-লাবণ্য দেখে মনে মনে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে পড়লেন। ক্ষণেকের জন্যে বিস্মৃত হলেন আপন উদ্দেশ্য। এমন শান্তিময়ী রূপ-কান্তি তাঁর কল্পনার অতীত ছিল।

স্বগতোক্তি করলেন—পুত্রের পক্ষে এমন বধূ জগতে দুর্লভ। সাক্ষাৎ কল্যাণরূপিণী এই স্বর্ণপ্রতিমা গৃহে সাদরে বরণীয়া।

কিন্তু পরক্ষণেই কঠিন হলেন সুবর্ণাক্ষ। আত্ম-সংবরণ করলেন। কঠোর কর্তব্যের জন্যে প্রস্তুত করে নিলেন আপনাকে।

অশ্বঘোষের পিতাকে প্রভাবতী সসম্মানে প্রণাম নিবেদন করলে। পুনরায় অভিভূত হলেন সুবর্ণাক্ষ। কিন্তু পরক্ষণেই আত্মসচেতন হয়ে প্রভাবতীকে সম্ভাষণ করলেন। আপন যুক্তিজাল বিস্তার করতে লাগলেন নতমুখী সুভদ্রার উদ্দেশে।

কতভাবে তাকে বোঝালেন—তাঁর পুত্রকে বিবাহ করা বিদেশিনীর পক্ষে অনুচিত কাজ হবে। অশোভনও, কারণ এমন অবাধ মিলন সামাজিক অনুশাসন বিরোধী। লজ্জাহীনভাবে সমাজের বৈরিতা করলে সে বিবাহ কখনো সার্থক ও মঙ্গলকর হতে পারে না। আরো এক কথা। আমার নিষ্ঠাবান্ পরিবার। তোমাদের এই প্রকার অসবর্ণ বিবাহ আমার গৃহের পবিত্রতা নষ্ট করে দেবে। তা ভিন্ন, তোমার আরো বিচার বিবেচনা প্রয়োজন। যথার্থ প্রেম আত্মবিলোপ করে। কখনো তা আত্মসুখকেই সর্বস্ব কিংবা একমাত্র লক্ষ্য জ্ঞান করে না। আপন ক্ষুদ্র স্বার্থের আশায় ধ্বংস করে দেয় না অপর একটি সংসারের সুখশান্তি। যা একটি সমগ্র পরিবারের পক্ষে অকল্যাণকর তা প্রকৃত বিবাহ নয়। বিবাহের নামে স্থূল সম্ভোগ মাত্র। এ কামনা তুমি পরিত্যাগ কর। পিতার অনভিপ্রেত বিবাহ অশ্বঘোষের পক্ষেও মঙ্গলকর হতে পারে না।

এই প্রকার অনুযোগ অভিযোগে বিহ্বল, বিভ্রান্ত

হয়ে পড়ল প্রভাবতী। নারীর স্বভাবজ লজ্জাও তার বাক্‌রোধ করলে। তরুণী উচ্চ অন্তঃকরণের অধিকারিণী। বৃদ্ধ পিতামাতার অন্তরে কশাঘাত করা হবে এই অপরাধবোধ তার চিত্তে সুবর্ণাক্ষ অতি চতুরতায় জাগ্রত করে দিয়েছিলেন। সেই আঘাতেই জর্জরিতা হল প্রভাবতী।' নিতান্ত উদ্‌ভ্রান্ত বোধ করলে। পরিণতবয়স্ক গুরুজনের উপরোধ অগ্রাহ্য করতে সঙ্কুচিতা হল। এমন একান্ত ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ আলোচনায় যোগ দিতেও লজ্জিতা বোধ করলে অশ্বঘোষের প্রণয়পাত্রী।

নিদারুণ দ্বিধায় প্রভাবতীর অন্তর মথিত হতে লাগল। কবি-প্রেমিকের উচ্ছ্বসিত হৃদয়াঞ্জলি জীবনের সম্পদ হয়ে আছে তার। এই ক্ষীণদৃষ্টি বৃদ্ধের আবেদনে কেমন করে সেই ঐশ্বর্য প্রত্যাখ্যান করবে সে? অশ্বঘোষকে বর্জন ত আপনারই আত্মবিসর্জন। এ কি ক্ষুদ্র আত্মসুখ? মহত্তর আত্মোপলব্ধি নয়? কিন্তু এই সম্মানিত বয়োবৃদ্ধকে কেমন করে নিজমুখে সে কথা ব্যক্ত করা যায়। ব্রীড়ায়, সঙ্কোচে অধোবদনে রইল বিমূঢ় কুমারী।

অবশেষে সুবর্ণাক্ষের করুণ আবেদনে প্রভাবতীর কন্যা-মন বিচলিত হল। সে সম্মতি জানালে বৃদ্ধের প্রার্থনায়। তাঁর সামাজিক ও পারিবারিক সম্মান-শান্তির পথে তার নারী-জীবন কণ্টকস্বরূপ হবে না। তাঁকে প্রতিশ্রুতি দিলে যে, তাঁর পুত্রকে বিবাহের ইচ্ছা ত্যাগ করবে চিরতরে।

হৃষ্টচিত্তে অশ্বঘোষের পিতা গৃহ-প্রত্যাগত হলেন।

তিনি বিদায় নিতেই হাহাকার করে উঠল প্রভাবতীর অন্তর। নিরুপায় বেদনায় সে বিদীর্ণ হতে লাগল। হায়, আপন হাতেই সে স্বাক্ষর করে দিয়েছে আপনারই মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞায়। এখন আর উদ্ধারের কোন পথই নেই। বৃদ্ধের নিকটে কৃত প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্যে আপনার হৃদয়কেই উৎপাটন করে দিতে হবে।

আত্মপীড়নে আকুল হল প্রভাবতী। কবি অশ্বঘোষের মূর্তি মনের পটে রূপ ধারণ করতে লাগল। তাঁকে বিস্মৃত হওয়া? কেমন করে এই অসম্ভবকে সম্ভব করা যাবে? উদ্যানে ইতস্তত দৃষ্টিপাত করতে থাকে দয়িতা। প্রতি তরু, প্রতিটি পুষ্পশাখা, কুসুম, তৃণদল যে স্মরণ করিয়ে দেয় কবির সুখ-সান্নিধ্যের কত অতিবাহিত প্রহর। গোধূলিবেলার আকাশতল, এই নদীতীর সবই তার অনুরাগে রঞ্জিত। অশ্বঘোষ বিহনে এই উদ্যান কল্পনার অতীত। তাঁর সঙ্গবিহীন হয়ে এখানে আর উপস্থিতির কথা চিন্তাও করা যাবে না।

এমনি নানা মানসিক আলোড়নের মধ্যে বহুক্ষণ বয়ে গেল প্রভাবতীর। নিতান্ত অসময়েই আজ সুবর্ণাক্ষের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্যে উদ্যানে এসেছিল। বৃদ্ধ চলে যাবার অনেক পরে এ স্থল ত্যাগ করলে হৃদয়ে পাষাণ ভার বহন করে। অতি শ্লথ পদে প্রভাবতী গৃহের পথে ফিরতে লাগল। কিন্তু সর্বাঙ্গ এমন অবশ, চিত্ত এত বিকল যে সংজ্ঞা হারাবার ভয় হল প্রতি মুহূর্ত্তে। জীবনের সব স্বাদ তার বিরস হয়ে গেছে। বাতাসের গতিও বুঝি রুদ্ধ। নিস্তব্ধ চরাচর। অন্তর বাহির সব তার রিক্ত। সর্বস্ব বিসর্জন দিয়ে একাকিনী আজ প্রভাবতী গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করলে।

সরযূর তীরে সেই উদ্যান ভ্রমণে আর সে যাবে না স্থির করেছিল। কিন্তু অপরাহ্ণ হতেই মন এমন উচাটন হল যে কিছুতেই থাকতে পারলে না গৃহকোণে। পায়ে পায়ে কোনক্রমে পথটুকু পার হয়ে সেই মিলন স্থানে উপনীত হল।

অশ্বঘোষ তার আগে থেকেই প্রতীক্ষায় ছিলেন সেখানে। তিনি প্রভাবতীকে দেখে অগ্রসর হয়ে এলেন। পিতার সঙ্গে তার সাক্ষাতের কথা তাঁর অজ্ঞাত ছিল, সেজন্যে প্রভাবতীর মানসিক সংঘাত তাঁর ধারণার অতীত। তা ভিন্ন, তাঁর নিজের তখন এক বিষম বিপদ! সে কথা প্রভাবতীকে জানাতেই তিনি তখন এসেছিলেন। তাই তার নিষ্প্রাণ হাসি ও অন্যমনস্কতা কিংবা ছায়াচ্ছন্ন মুখভাব তাঁর লক্ষ্যগোচর হল না।

প্রভাবতীও আপনাকে প্রস্তুত করলে কবিকে আপন সিদ্ধান্ত জানাবার জন্য।

কিন্তু সে কোন কথা উচ্চারণ করবার আগেই অশ্বঘোষ ব্যাকুল কণ্ঠে বললেন, 'আমার জননী মৃত্যুশয্যায়। তিনি তোমাকে একবার দেখবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। সত্বর আমার সঙ্গে চল।'

প্রভাবতী কিছুই প্রকাশ করবার অবকাশ পেলে না। অচিরে অশ্বঘোষের সঙ্গে উপস্থিত হল তাঁদের গৃহে। পথে আর বিশেষ কোন কথা হল না। আপন আপন সমস্যা ও দুর্ভাবনায় আত্মমগ্ন হয়ে ছিলেন দুজনে। ঘটনার গতি এমন অকস্মাৎ পরিবর্তিত হয়ে যাওয়া প্রভাবতী অশ্বঘোষকে তাঁর পিতার কথা জানাবার কোন সুযোগ পেলে না।

অশ্বঘোষ যখন প্রভাবতীকে সঙ্গে নিয়ে গৃহে প্রবেশ করলেন সুবর্ণাক্ষ সে সময়ে ছিলেন না, অন্যত্র গিয়েছিলেন।

পালঙ্কে শয়ান ছিলেন মৃত্যুপথযাত্রিণী সুবর্ণাক্ষী। তাঁর শয্যাপার্শ্বে অশ্বঘোষ প্রভাবতীকে উপস্থিত করতেই রোগিণীর পাণ্ডুর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। আশীর্বাদের ভঙ্গিমায় তাঁর দক্ষিণ হস্ত ঈষৎ আন্দোলিত হল মাত্র। বাক্য উচ্চারণ করবার ক্ষমতা আর তাঁর ছিল না। শুধু দৃষ্টিতে প্রকাশ পেলে গভীর পরিতৃপ্তির আভাস।

অশ্বঘোষ প্রভাবতীকে বললেন, 'আমি চিকিৎসকের সন্ধানে যাই। তুমি মাতার দিকে লক্ষ্য রেখো।'

নিরুপায় প্রভাবতী এখনও অশ্বঘোষকে কিছু প্রকাশ করতে পারলেন না। অশ্বঘোষ নিক্রান্ত হতে রোগিণীর পাশে উপবেশন করলে ক্লিষ্ট মনে। কিন্তু এই অদ্ভুত পরিস্থিতিতে অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। এবং আরো যে অপ্রীতিকর অবস্থার আশঙ্কা করছিল তাও ঘটে গেল জটিল আকারে।

অকস্মাৎ রোগিণীর কক্ষে উপস্থিত হলেন স্বয়ং গৃহপতি সুবর্ণাক্ষ।

পত্নীর সান্নিধ্যে প্রভাবতীকে এমন ঘনিষ্ঠভাবে দেখে তিনি হতবাক্ হয়ে গেলেন। যত বিস্মিত ততোধিক ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন বৃদ্ধ। অতি কটু কণ্ঠে প্রভাবতীকে কুৎসিত তিরস্কার করতে লাগলেন।

'মিথ্যাবাদিনী নির্লজ্জা। এই তোর প্রতিশ্রুতির মূল্য? পাপীয়সী, কোন্ সাহসে তুই আমার গৃহ অপবিত্র করতে এসেছিস? প্রতিজ্ঞার ছল করে আমায় প্রতারণা করেছিলি। এখন আমার অগোচরে আমার স্ত্রীকে ছলনা করতে এসেছিস? বিশ্বাসহন্ত্রী! নীচাশয়! আমি কিছুতেই তোর উদ্দেশ্য সাধন করতে দেব না'

স্বামীর এই চূড়ান্ত দুর্বাক্যের প্রতিবাদ বা প্রতিরোধের কোন সামর্থ্যই সুবর্ণাক্ষীর ছিল না। অতি প্রিয়পাত্রীকে এমন হীনভাবে অপমানিতা হতে দেখে মনোকষ্টের সীমা রইল না তাঁর। অসহায়ভাবে তিনি শুধু অশ্রু বিসর্জন করতে লাগলেন।

প্রভাবতীর মর্মযাতনা বর্ণনার অতীত। সুবর্ণাক্ষের কশাঘাতের প্রত্যুত্তরে একটি বাক্যও তার মুখে উচ্চারিত হল না। অসম্মানের চূড়ান্ত! উদ্গত অশ্রু কোন ক্রমে রুদ্ধ করে প্রভাবতী উঠে দাঁড়ায়। সুবর্ণাক্ষীর কাছে নীরবে বিদায় নিয়ে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল ধীর পদে। অশ্বঘোষের জন্যেও অপেক্ষা করলে না। ক্ষতবিক্ষত হৃদয়ে উপস্থিত হল নদীতীরের উদ্যানে। কোথাও যাবার আর পথ নেই। জীবনের সমস্ত আশা আকাঙ্খা সাধ আনন্দ, সমস্তই তার চিরতরে নিঃশেষ হয়ে গেছে। বৃথা এ জীবন।

মনে মনে প্রভাবতী চূড়ান্ত সংকল্প করে নিলে। আর বিলম্ব নয়। কবি যদি এখন উপস্থিত হন, হয়ত চিত্ত-দৌর্বল্য দেখা দেবে। এ জীবন জলাঞ্জলি যাক।

সরযূর তীরে নেমে এসে নদীবক্ষে ঝম্প প্রদান করলে প্রভাবতী। তারপর সেই অগাধ জলরাশির তরঙ্গে তরঙ্গে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল কনক-প্রতিমা।

বৃদ্ধ উদ্যান-রক্ষক দূর থেকে দেখতে পেয়ে ছুটে এসেছিল। কিন্তু তার আগেই ঘটে গেল দুর্ঘটনা।

ওদিকে চিকিৎসককে নিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই

অশ্বঘোষ গৃহে এলেন। রোগিণীর কক্ষে ছিলেন সুবর্ণাক্ষ। কিন্তু প্রভাবতী নেই।

উৎকণ্ঠ অশ্বঘোষ জননীকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'প্রভাবতী কোথায়?'

সুবর্ণাক্ষী বাহির দ্বারের দিকে ইঙ্গিত করে জানালেন —সে চলে গেছে!

অশ্বঘোষ আর মুহূর্তও বিলম্ব করলেন না। অতি দ্রুত চলে এলে নদীতীরে। তাঁর কেমন ধারণা হয়েছিল, তাঁদের এই অভ্যস্ত মিলন স্থানেই প্রভাবতীর সাক্ষাৎ পাবেন।

অনুমান তাঁর মিথ্যা হয়নি, কিন্তু বড়ই বিলম্ব হয়ে গিয়েছিল। উদ্যানে উপস্থিত হতেই তাঁর কানে এল নদীজলে একটা পতনের শব্দ। এক অজানা আশঙ্কায় তাঁর বক্ষ কম্পিত হয়ে উঠল। শব্দ শ্রবণ মাত্র তিনি উধ্বর্শ্বাসে ছুটে এলেন জলের ধারে। কিন্তু নদীতে আর দেখবার কিছু ছিল না।

উদ্যানরক্ষক শুধু দাঁড়িয়ে ছিল নিকটে। রোরুদ্যমান কণ্ঠে সে প্রভাবতীর আত্মবিসর্জনের বিবরণ দিলে।

উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তে অশ্বঘোষ চেয়ে রইলেন নদীর দিকে, শূণ্য দৃষ্টিতে।

বহুক্ষণ এইভাবে চলে গেল। তারপর রাত্রি গভীর হয়ে এলে তিনি প্রত্যাবর্তন করলেন গৃহের পথে।

কিন্তু গৃহে আর গেলেন না। সে ত আগেই ত্যাগ করে এসেছিলেন, জননীর পীড়ার সংবাদে আজ গিয়েছিলেন মাত্র।......

তাঁর মনে হল, ঘটনাচক্রে গৃহসংসারের সকল বন্ধন ছিন্ন হয়ে গেল।

অশ্বঘোষ শান্তির সন্ধানে নির্গত হলেন আকুল অন্তরে। গণ্ডীমুক্ত হয়ে বৃহত্তর জগতে, মহত্তর মুক্তির সাধনায় হৃদয়ের দাব দাহ নির্বাপিত করতে চাইলেন। সংসার অরণ্যে কোথাও সুখ নেই!

অবশেষে বাঞ্ছিত শান্তির বাণী শুনলেন তথাগত প্রচারিত ধর্মে।

অশ্বঘোষের জীবনের লক্ষ্য ও পথও সেই সূত্রে নির্ধারিত হল। তিনি চিরকুমার ব্রত গ্রহণ করলেন বৌদ্ধ ধর্মের ও বুদ্ধ-বাণী প্রচার করবার আকাঙ্ক্ষায়। সেই মহৎ উদ্দেশ্যে তিনি দেশের অঞ্চলে অঞ্চলে পরিভ্রমণ করতে লাগলেন। লেখনী ধারণ করলেন বুদ্ধ-জীবন-কথা, বৌদ্ধ ভাবধারার সঙ্গে সাধারণের পরিচয় ঘটাতে। দুঃখজর্জর মানবসমাজে শান্তি ও সামাজিক সাম্যের বাণী, ক্লিষ্ট মানবতার নিকটে দুঃখজয়ের মন্ত্র প্রচারে জীবন উৎসর্গ করলেন।...

প্রভাবতীর বিয়োগানলের পরিণতিতে আর এক মহত্তর উত্তরণ হল অশ্বঘোষের জীবনে।

আমার ইউরোপ ভ্রমণ

(১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত গ্রন্থের মূল ইংরেজী হইতে অনুবাদ : পরিমল গোস্বামী)

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়

আমাদের গ্রামে গত কয়েক বৎসরের মধ্যে জমিদারগণ যে সব গোচারণ ভূমি স্মরণাতীত কাল হইতে সকলের গবাদি পশুর জন্য ব্যবহৃত হইত তাহা গ্রাস করিয়া বসিয়াছে, এবং আমি যত দূর জানি, কেউ ইহার বিরুদ্ধে একটি প্রতিবাদ জানায় নাই, গ্রামবাসীরাও নহে, সভাসমিতির বক্তারাও নহে, গভর্মেণ্টও নহে। অথচ গোপ্রেমী সম্প্রদায়ের পক্ষে ইহা অপেক্ষা যোগ্যতর প্রতিবাদের বিষয় আর কি হইতে পারে? "আপনার নিকট আবেদনকারীগণ বিনীত ভাবে এই প্রার্থনা জানায় যে, আইন করিয়া গোহত্যা বন্ধ করিতে আজ্ঞা হয়, এবং কৃষিবিভাগে নিযুক্ত ইংরেজ অফিসারগণকে তাঁহাদের এদেশে পশুখাদ্য বৃদ্ধির চেষ্টা করিয়া সর্ববিষয়ে সর্দারি করিবার অপরাধে গ্রেফতার করিতে আজ্ঞা হয়, এবং আবেদনকারীগণকে তাহাদের গোজাতিকে শনৈঃ শনৈঃ অনাহারে মারিবার নবলব্ধ অধিকারকে স্বাধীনভাবে ভোগ করিবার অধিকার দিতে আজ্ঞা হয়,"—বর্তমানে এদেশে গোজাতির দুর্দশা দেখিলে এইরূপ একটি আবেদনই গভর্মেণ্টের নিকট পাঠাইবার জন্য বলিতে ইচ্ছা হইবে। আমাদের ত্রুটি কোথায় তাহা সাহসের সঙ্গে প্রকাশের শিক্ষা করিতে হইবে, অবশ্য যদি আমাদের শত্রুদের চোখেও আমরা সম্মানিত হইতে চাহি।

মিষ্টার নিউল্যাণ্ড এবং আমি ব্যালমোরাল এস্টেট পার হইয়া গেলাম। নিকটস্থ অনেক খামার বাড়িও দেখিলেই তাহাদিগের কাছে অনেকদিনের ব্যবহৃত দেখিলাম, এবং পুরাতন বাসিন্দাদের পায়ে চলার পথের কথা আমার সঙ্গী জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন। যেখানেই যাই, সেখানকার লোকেরাই আমাদিগকে হুইস্কি ও চা দিতে লাগিল, আমাদের দেশে যেমন মাননীয় অতিথি আসিলে কিছু মিষ্টি, জল ও পান দেওয়া হয়, এও তেমনি। এক স্থানে আমরা অনেকগুলি স্ত্রী পুরুষ গৃহহীন ভবঘুরের সাক্ষাৎ পাইলাম। ইহাদের কোনও নির্দিষ্ট বাসস্থান অথবা বৃত্তি নাই, ইহারা ঘুরিয়া ঘুরিয়া ভিক্ষা করে। সুযোগ পাইলে চুরিও করে। ভারতের ফকির জীবন তুলনীয়। শুধু ইহাদের ধর্মের বাহ্যাবরণটি নাই। আমরা আমাদের দেশে ধর্মীয় ব্যক্তিদের ভিক্ষা করিয়া বেড়ান দেখিতে অভ্যস্ত, তাই ইংল্যাণ্ডের মত অপ্রচুর খাদ্যের এবং প্রচুর শীত, সম্বৎসর বৃষ্টি এবং শীতকালের তুষারপাতের দেশে, ভবঘুরে জীবনে ইহারা কি সুখ পায় তাহা বুঝিতে পারিলাম না। এমন দেশে যেখানে লোকে সদর দরজা বন্ধ রাখে, যে দেশে বহুদিনের অভ্যাসে লোকেরা ভবঘুরেবিরোধী হইয়াছে, যেখানে বাগানে মানুষধরা প্রহরী ও বুলডগ রাত্রিতে পাহারা দেয়, 'ছত্র'-এর মত উন্মুক্ত দ্বার কোথাও নাই, জমি সব ঘেরা থাকে, এবং অনধিকার প্রবেশের দায়ে বহু লোকের বিচার হয়, সেখানে ইহাদের অস্তিত্ব দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। এই কারণে জিপসিদের এখন আর ইংল্যাণ্ডে খুব দেখা যায় না। যে অল্পসংখ্যক জিপসি আছে, তারা ভাঙা ফুটা পাত্র মেরামতের কাজ করিয়া থাকে। কিলিক্র্যাংকি গিরিসঙ্কটে আমরা জিপসিদের ছোট একটি আড্ডা দেখিতে পাইলাম।

ব্যালাটারে সার উইলিয়াম মুইয়র-এর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইল। ইংল্যাণ্ড ও ভারতের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে ইহার জন্য তিনি উদ্বিগ্ন।

আমিও এজন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিলাম, "ইহা দূর করিতে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। কিন্তু ভারতে ইংরেজ চালিত কয়েকখানি প্রভাবশালী সংবাদপত্র যদি ভারতীয়দের প্রতি সহানুভূতিশীল না হয়, তাহা হইলে সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইবে। দলীয় ধর্ম বজায় রাখিয়া সংবাদপত্র পরিচালনা ভারতের পক্ষে অনুপযুক্ত, এবং শুধু তাহাই নহে,ইহা ভারতীয়দের দ্বারা পরিচালিত ইংরেজী ও দেশীয় ভাষায় সংবাদপত্রের পক্ষে বিপজ্জনক শিক্ষা।" সন্দেহ নাই যে এরূপ ভুল বোঝাবুঝির জন্য দায়ী পরস্পরের সম্পর্কে অজ্ঞতা। মুসলমান রাজত্বেও এই ব্যাপার ঘটিয়াছিল। আবুল ফজল রাজ্‌ম নামার ভূমিকায় বলিয়াছেন, "সম্রাট্‌ আকবর, হিন্দুমুসলমানের মধ্যে পরস্পর অজ্ঞতাই প্রধানতঃ ভুল বোঝার কারণ ইহা নিশ্চিত হৃদয়ঙ্গম করিয়া হিন্দুদের গ্রন্থ মুসলমানদের মধ্যে প্রচারের জন্য অনুবাদ করাইয়াছিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি মহাভারত অনুবাদ করাইবার জন্য নির্বাচিত করিয়াছিলেন।" আমার মনে হয় তিনশত বৎসর পূবে শাসক ও শাসিত বর্ত্তমান অপেক্ষা পরস্পর অধিক পরিচিত ছিলেন। অবশ্য ইংরেজী সংবাদপত্র যেমন ভারতীয়দের বোঝে না, দেশীসংবাদপত্রও তেমনি ইংরেজ গভর্ণমেন্টকে সমালোচনা করিয়া থাকে। দুইদিকেই কড়া ভাষা ব্যবহৃত হয়। তাহাতে সাংবাদিকতার স্তর নিচে নামিয়া যায়।

ব্যালাটার হইতে আমি রেলপথে অ্যাবারডীনে আসিলাম। আমার এই ভ্রমণ সময়ে যত স্থানে গিয়াছি তাহার সকলগুলির বর্ণনা দেওয়া আমার পক্ষে অসাধ্য। অ্যাবারডীন শহরটি সমুদ্রের উপকূলে, লোকসংখ্যা ১,১০,০০০। এখানে একটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে, একটি সুন্দর চিত্রশালা আছে, শিল্প বিষয়ক মিউজীয়াম আছে, একটি যন্ত্রকুশলীদের ইনস্টিট্যুট আছে এবং একটি আর্ট স্কুল আছে। এই শেষেরটি ব্যক্তিগত দানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। দানের পরিমাণ ৬০০০ পাউণ্ড। শহরে দুইখানি দৈনিক সংবাদপত্র, একটি সান্ধ্য সংস্করণ ও দুইখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হয়। গ্রেট ব্রিটেনে শিক্ষা কত দূর অগ্রসর ইহা হইতে তাহা বুঝিতে পারা যায়।

ভারতের পক্ষে পুনর্জীবন লাভ করিতে হইলে সর্বাপেক্ষা বড় প্রয়োজন শিক্ষা, সর্বজনীন শিক্ষা, বাধ্যতামূলক শিক্ষা এবং সম্ভব হইলে অবৈতনিক শিক্ষা। জাতীয় কংগ্রেস ও হিন্দুমুসলমান, ইংরেজ এবং ভারতীয়গণকে একত্র হইয়া আমাদের দেশে সর্বজনীন শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। প্রশ্ন—টাকা আসিবে কোথা হইতে? পল্লীগ্রামের স্কুলের জন্য আমরা বিবাহের উপর কর ধার্য করিয়াছি। এই প্রথাটি সরকার কর্তৃক বিধিবদ্ধ হওয়া উচিত। তাহা ব্যতীত এদেশে যে সব সোনা ও রূপা আমদানি করা হয় তাহার উপর কর ধার্য্য করা উচিত। যে কোনও জিনিসের উপর কর ধার্য করা হউক আপত্তি নাই, কিন্তু আমরা শিক্ষা চাই। পশুর জীবন যাপন করা অপেক্ষা অনাহারে মৃত্যু শ্রেয়।

অ্যাবারডীনে একদিন আমি ঐ শহরের প্রান্তে অবস্থিত সমুদ্র-উপকূলে আসিয়া দেখিলাম, বড় বড় নৌকা-হেরিং মাছে বোঝাই হইয়া তীরে আসিয়া ভিড়িয়াছে। ওখানে স্টীমারে করিয়াও খোলা সমুদ্রে মাছ ধরা হইয়া থাকে। হেরিং অনেকটা আমাদের ইলিশ মাছের মত, একই রকম কাঁটা ও তৈলাক্ত, কিন্তু ইলিশের মত অত সুমিষ্ট নহে। ইংল্যাণ্ডের সেরা মাছ স্যামন (Salmon salar, Linn ; salmonidac)। মেরু সাগরের সর্বত্র ইহা প্রচুর পাওয়া যায়। বসন্তকালে ইহারা ডিম ছাড়িবার জন্য নদীতে প্রবেশ করে। উজান স্রোতে যাইবার পথে কোনো বাধা পাইলে তাহা লাফাইয়া পার হইয়া যায়। জলস্রোত যেখানে খাড়া নিচে পড়িতেছে সেখানেও উহারা লাফাইয়া পার হয়। সোল মাছও উহাদের খুব প্রিয়। চ্যাপটা লবণাক্ত জলের মাছ, ইহার দুটি চক্ষুই এক পাশে। বালিতে গা ঢাকিয়া নিদ্রা যায়। টেবিলে অন্য যেসব মাছের সাক্ষাৎ পাইয়াছি, তাহারা হইতেছে: স্টার্জন, পাইক, রোচ, হ্যাডক, কড, টেঞ্চ, টার্বট, প্লেইস, ঈল (বাইন), ম্যাকেরেল, ল্যাম্প্রি, লক, হোয়াইটবেইট ইত্যাদি।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ হইতে আনীত গ্রীণ টার্টল (Chelonia Midas) উহাদের একটি প্রিয় খাদ্য। টার্টল কচ্ছপ। কিন্তু উহাদের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় অয়েস্টার বা ঝিনুকের শাঁস, এবং ইহার একটি মাত্র প্রজাতি খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়—Ostrea edulis। লণ্ডনের অনেক দোকানের সাইনবোর্ডে লেখা আছে "নেটিভস"। অবশ্য সেখানে ভারতীয় কাহাকেও বিক্রয়ের জন্য রাখা হয় না, উহার অর্থ, সেখানে উৎকৃষ্ট অয়েস্টার—যাহা কেবল ইংল্যাণ্ডের উপকূলে ধরা হয়, বিদেশ হইতে আমদানি করা নহে। অর্থাৎ 'নেটিভ' অয়েস্টারের দোকান। খুব বড় আকারের চিংড়ি ক্রে মাছ ও কাঁকড়া ও দেশে পাওয়া যায়।

ডাণ্ডীর পথ দিয়া আমি অ্যাবারডীন হইতে পার্থে ফিরিয়া আসিলাম, এবং আসিয়াই হাইল্যাণ্ডে অবস্থিত অ্যাবারফেল্ডিতে গেলাম। ওখান হইতে কিলিন পিয়ারে গেলাম লক টে ছোট স্টীমারে পার হইয়া। এখানকার দৃশ্য অবর্ণনীয়রূপে সুন্দর। নীল হ্রদের বুকে স্টীমারে সে সঙ্গীত বাজিতেছিল, সবুজ ঘাসে ঢাকা ঢালু তীরভূমি, উচ্চ ভূমিতে ঘনগাছের জঙ্গল, পাতাঝরা গাছের হেমন্ত কালীন হলুদ রঙের ঝরা পাতা, এবং সর্বোপরি দৈত্যের মত মাথা তোলা বর্হ্মাশর পর্বত—এই সব মিলিয়া দৃশ্যটি রূপকথা জগতের দৃশ্যের মত বোধ হইতেছিল। আমি কাশ্মীর দেখি নাই, তাই কাশ্মীরের সৌন্দর্য স্কটল্যাণ্ডের সঙ্গে তুলনীয় হইতে পারে কি না আমি বলিতে পারিলাম না। কিন্তু আমি ভারতের বহু স্থান—পর্বতসঙ্কুল অথবা সমভূমি—দেখিয়াছি, তাই আমি এ কথা জোর করিয়া বলিতে পারি যে, স্কটল্যাণ্ডের মত অপূর্ব সুন্দর দেশ আমি আর দেখি নাই। হিমালয় বড়ই উদ্দাম এবং অতি মহান্। মনে উহা ভয়মিশ্রিত বিস্ময় সৃষ্টি করে, কিন্তু মনকে শান্ত করিয়া তোলে না, মনকে মোহগ্রস্ত করে না। নীলগিরিতে হ্রদ থাকিলে স্কটল্যাণ্ডের সঙ্গে সৌন্দর্যে তুলিত হইতে পারিত।

লক টেতে একটি ছোট্ট দ্বীপ আছে, তাহার উপরে ভগ্নদশা-প্রাপ্ত একটি প্রাচীন কাসল-এর কঙ্কাল মাত্র আছে। একদা ম্যাকগ্রেগরেরা এই কাস্‌ল-এর রক্ষকদিগকে পরাভূত করিয়াছিল। তাহার পর হইতে এ সব স্থানের কত না পরিবর্তন ঘটিয়াছে। এ সবের উপরে রোমান্সের রশ্মি নিক্ষেপ করিবার জন্য ইহারা স্যার ওয়ালটার স্কটের যাদুদণ্ডের অপেক্ষায় ছিল। অদূরে বেনমোর, তাহার ৩৮৪৩ ফুট উচ্চ শিখর লইয়া দাঁড়াইয়া আছে, সে এখানকার রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ দেখিয়াছে, যে যুদ্ধে ক্ল্যান ম্যাকন্যাবদের জমি বেহাত হইয়া গেল, শুধু তাহাদের জন্য থাকিল কিলিনের সমাধিক্ষেত্রে। সেই-খানে আমি ভারী মন লইয়া কিছুক্ষণ বসিয়া ছিলাম। ট্রেন আসিল। আমরা ড্যালরি নামক ছোট্ট গ্রামে আসিয়া পৌঁছলাম। ১৩০৬ সনে এইখানে ব্রুস, লরনের ম্যাগডুগালের অনুচরদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ইহার পরে আসিলাম টিনড্রামে। তাহার পর ড্যালম্যালি, এটি ব্রেডালবেন ক্যাম্পবেল অঞ্চলের কেন্দ্রে অবস্থিত। ইহার পাশে বেন ক্রুয়াকান, এবং অন্যান্য উল্লেখযোগ্য বেন, গ্লেন অর্কি, গ্লেন স্ট্রী এবং আরও কত সুন্দর উপত্যকা। ইহারা সকলেই বিতাড়িত ম্যাকগ্রেগর গোষ্ঠীর দূরাগত ক্রন্দন বার বার শ্রবণ করিয়াছে—

> Glen-Orchy's proud mountains, Kilchurn and he towers
> Glen-Strae and Glen Lyon no longer are ours,
> We're landless, landless, Grigalach !
> Landless, landless, landless !

পাহাড় পথ উপত্যকাপথ এবং এখানকার সমস্ত পরিবেশই ভালবাসা ও লড়াই, গৌরবময় বীরত্ব এবং জঘন্যতম লুণ্ঠতরঙ্গ-এর কাহিনী দ্বারা স্মরণীয় হইয়া আছে সেই সব পথ অতিক্রম করিয়া স্কটল্যাণ্ডের পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত ওব্যানে গিয়া পৌঁছলাম। ডালম্যালি হইতে কিলচার্ণে আসিয়াছিলাম। রেলওয়ে 'অ' হ্রদের পাশ দিয়া কিছুদূর পর্যন্ত গিয়াছে। এই হ্রদকে পশ্চাতে ফেলিয়া যাইতে আমরা প্রথম লক এটি'র দৃশ্য দেখিতে

পাইলাম, এবং অল্প সময়ের মধ্যেই আক-না-ক্রইক নামক স্থানে পৌঁছিলাম। এই স্থান হইতে লক এটিভহেড পর্যন্ত ছোট একটি স্টীমার যাতায়াত করে। এখান হইতে গ্লেনকো এবং ব্যালাচুলিশ যাইবার কোচ মেলে। ইহার পর কোনেল ফেরি স্টেশনে পৌঁছিলাম। এবং এখান হইতে লক নেল। লক নেল হইতে ফোর্ট উইলিয়াম ও বেন নেভিসের দৃশ্য অতি মনোরম। ওব্যানে বাস করিবার পর সেখান হইতে স্টীমারে গ্ল্যাসগো পৌঁছিলাম।

গ্ল্যাসগো গত শতাব্দীতে ১২০০০ অধিবাসী সম্বলিত একটি মাছের ব্যবসায়ের শহর ছিল, এখন সে পৃথিবীর মধ্যে একটি বৃহত্তম শহর। এখন এখানকার জনসংখ্যা অন্তত পাঁচ লক্ষ হইবে। স্কটল্যাণ্ড-বাসীদের অক্লান্ত শ্রম এবং প্রখর বাণিজ্য-বুদ্ধিতে গ্লাসগোর এই উন্নতি। প্রচুর অর্থব্যয় করিয়া ক্লাইড নামক একটি ছোট নদীকে ইহারা প্রশস্ত করিয়াছে, জাহাজ ভিড়িবার উপযুক্ত বন্দর বানাইয়াছে, ডক নির্মাণ করিয়াছে—সে এক বিরাট ব্যাপার। শত শত জাহাজ এখানে আসা যাওয়া করিতেছে। জাহাজ এখান হইতে পৃথিবীর সর্বত্র যায়, বিশেষ করিয়া ভারতে এবং অ্যামেরিকায়। গ্ল্যাসগোর পথের নগ্নপদ ছোকরারা অশ্বেত রোদে-পোড়া নাবিকদের চেহারার সঙ্গে পরিচিত নহে, কিংবা শুল্কহীন দেশ হইতে যে সব সিগারেট লুকাইয়া আনে তাহাও তাহারা দেখে নাই, নারিকেলও অপরিচিত। নাবিকেরা এই সব জিনিস ছোকরাদের মাঝে মাঝে দিয়া তাহাদের সহিত ভাব জমায়। সেজন্য পাগড়ি মাথায় আমাকে দেখিয়া একদল ছোকরা আমাকে অনুসরণ করিতে লাগিল—এবং বলিতে লাগিল—"Johny give us a cigarette, Johny give us a cocoanut"—অর্থাৎ "একটা সিগারেট, কিংবা একটা নারিকেল দাও না গো।" নদীতে অনেকগুলি সেতু আছে, শহরের ভিতর চমৎকার সব পথ, দুপাশে বহু উচ্চ অট্টালিকা। শহরের প্রধান পথ আরগাইল স্ট্রীট, সর্বদাই জনবহুল। ট্রাম ও কোচ সব দিকে চলিতেছে। এই পথ এক স্থানে হাই স্ট্রীটকে দুই ভাগে ভাগ করিয়া ইতিহাস-প্রসিদ্ধ "বেল ও ব্রী"তে গিয়া পৌঁছিয়াছে, এইখানে স্কটিশ বীর উইলিয়াম ওয়ালেস ইংরেজদিগকে পরাভূত করিয়াছিল। বুকানন স্ট্রীট ফ্যাশ অঞ্চল। নিকটেই জর্জ স্কয়ার। অনেক খ্যাত ব্যক্তির মর্মর মূর্তি আছে এখানে, তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য সার ওয়ালটার স্কটের বৃহৎ মূর্তি ডোরিক স্তম্ভে স্থাপিত। এখানকার নিউ ইউনিভার্সিটি পঞ্চাশ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত। অনেক ভারতীয় এখান হইতে ডিগ্রী লইয়া ফিরিয়াছে। এইখানে অল্পদিনের মধ্যেই (১৮৮৮তে) একটি আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী খোলার ব্যবস্থা করা হইয়াছে, ভারতীয় হস্তশিল্পও অবশ্যই এখানে স্থান পাইবে। ইউনিভার্সিটির গৃহে বড় একটি গ্রন্থাগার আছে, ইহার মিউজিয়ামে বিখ্যাত হান্টারিয়ান সংগ্রহগুলি স্থান পাইয়াছে। গ্ল্যাসগোর ক্যাথিড্রালই সম্ভবত এখানকার প্রাচীনতম স্থাপত্য। এটি দ্বাদশ শতাব্দীতে এবং বিশ্ববিদ্যালয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে নির্মিত। গ্ল্যাসগোর নিকট দুইটি উল্লেখযোগ্য স্থান আছে, পেইসলি ও গ্রীনক। কাশ্মীরের শালের অনুকরণে পূর্বে এই পেইসলিতে শাল প্রস্তুত হইত, ফলে কাশ্মীরের শালের কারবার এবং নকল শালের কারবার দুইই ধ্বংস হইয়াছে। নিকটস্থ হ্রদগুলির দৃশ্য অপূর্ব। আমরা লক লমণ্ড এবং লক ফাইন দেখিয়া আরও অনেকগুলি হ্রদ ও মনোহর দৃশ্যপূর্ণ স্থান দেখিলাম। গ্ল্যাসগোতে থাকিবার সময় পৃথিবীর বৃহত্তম জাহাজ "দি গ্রেট ইষ্টার্ণ" গ্রীনকের অদূরে অবস্থান করিতেছিল। আমি তাহা দেখিতে গিয়াছিলাম। ইহা যাত্রী বহন অথবা মাল বহন দুইয়েরই অনুপযুক্ত বিবেচিত হওয়ায় ইহার মালিক ইহাকে ভাঙ্গিয়া ফেলিবার ব্যবস্থা করিতেছেন।

মিস্টার জন মুইয়র (ডানস্টন হাউস, ডুন) আমাকে স্কটের 'লেডি অভ দি লেক'-খ্যাত ট্রোসাক্‌স-এ লইয়া গেলেন।

"Where the rude Trosach's dread defile
Opens on Katrine's lake and isle."

ডুন হইতে আমরা রেলপথে যে স্থানে গিয়া পৌঁছিলাম সেখানে ক্যালাণ্ডারের খাড়া মাথাগুলি, অন্যান্য পর্বতচূড়াদের সহিত ভূতুড়ে অঞ্চলগুলি পাহারা দিতেছে। যেখানে রোডেরিক ঢু বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিল এবং যেখানে এলেনের হৃদয় ভালবাসার মধুর বেদনায় স্পন্দিত হইয়াছিল। কিন্তু কবি স্কটের কাব্যে যেখানকার পাহাড় পর্বত হ্রদ ও উপত্যকাসমূহ পবিত্র রূপ ধরিয়াছে, সেখানকার শোভা বর্ণনা করিবার দুঃসাহস আমার নাই। অতএব আমি সবিনয়ে ইহা হইতে বিরত হইলাম। আমরা ক্যালাণ্ডার হইতে কোচ লইয়া ট্রোসাকস-এর অভিমুখে যাত্রা করিলাম। লক ভেনাচারের পাশ দিয়া পথ কিয়দ্দূর পর্যন্ত গিয়াছে। উপকূল অল্পবিস্তর ঘন অরণ্যে পূর্ণ, অনেক স্রোতস্বিনী ইহার ভিতর দিয়া আসিয়া হ্রদের জলে পড়িতেছে। আমরা কয়েলানটোগল ফোর্ড পার হইলাম। এইখানে রোডেরিক রোডনের নাইটের সঙ্গে লড়াই করিয়াছিল। অতঃপর আমরা 'উড অভ ওয়েইলিং'-বা বিলাপ অরণ্যে আসিয়া পৌঁছিলাম। ইহার সম্পর্কে একটি কাহিনী প্রচলিত আছে এই যে, এখানকার জল-দৈত্য অনেকগুলি শিশুকে খাইয়া ফেলিয়াছে। এক দিন ছেলেরা এখানে খেলা করিতেছিল, এমন সময় একটি সুন্দর ঘোড়া জল হইতে উঠিয়া আসিল, তখন তাহার চমৎকার চেহারা দেখিয়া একটি সাহসী ছেলে তাহার পিঠে গিয়া চড়িয়া বসিল। অন্য ছেলেরাও তাহা দেখিয়া তাহাকে অনুকরণ করিল, সবাই একসঙ্গে সেই ঘোড়ার পিঠে চড়িল। ঘোড়াটি সকলের জন্য জায়গা করিবার উদ্দেশ্যে পিঠটাকে আরও লম্বা করিয়া দিল। সবাই যখন চড়িয়া বসিল, তখন ঘোড়াটি সহসা ছেলেদের লইয়া হ্রদের জলে ডুবিয়া গেল। জলের নিচে তাহার একটি গুহা ছিল, সেখানে গিয়া সে একটি বাদে অন্য সব ছেলেকে খাইয়া ফেলিল। একটিকে খাইতে পারে নাই, কারণ সে ওখান হইতে পলাইয়া চলিয়া আসিয়া এই কাহিনীটি বিবৃত করিয়াছে। ঐ জল-দৈত্যটা ওয়াটার-কেল্পি নামে পরিচিত। এই কেল্পি বাংলার পুকুরের জটাবুড়ি, বীরভূম নদীর পাথুরে ভূত, এবং গণ্ডক নদীর পাণ্ডুবার সমগোত্রীয়। নাইল নদীর কুমীরের মত ঐ কেল্পির অসাধারণ ধৈর্য, শিকারের জন্য সে বহুকাল অপেক্ষা করিতে পারে। তাহার উদর পূর্ণ করিয়া আহার করিবার আর একটি মাত্র কাহিনী আছে। সার ওয়ালটার স্কটের মতে সে একটি মৃতদেহ বহনকারী দলকে ধরিয়া উদরস্থ করিয়াছিল। ইহার পর আমরা লক আক্রে ও পরে ব্রিগ অভ টার্ক-এ আসিলাম। এটি ছোট একটি স্রোতস্বিনীর উপরের সেতু, ইহা রূপকথায় স্থান পাইয়াছে। আমরা লক আক্রে পিছনে ফেলিয়া চলিলাম, তাহার পর ট্রোসাক্স-এর গিরি-সঙ্কটের ভিতর প্রবেশ করিলাম। ইহার দক্ষিণ পাশে বেন অ্যালাম, ও বাম পাশে বেন ভেনু। দুটিই খাড়া পাহাড়। ইহাদের গায়ে ঘন অরণ্য, নানা জাতীয় গাছ —রোয়ান, বার্চ, হথর্ণ, ওক, এবং অন্যান্য। সমস্ত দৃশ্যটাই হিমালয়ের গর্জ বা গিরিসঙ্কটের ন্যায়। ট্রোসাক্স-এর অন্তসীমায় লক ক্যাট্রিন। পূর্বে এই হ্রদে ট্রোসাকস হইতে সহজে আসা যাইত না। আসিতে হইলে বিপদসঙ্কুল এবং দুর্গম পথ মাত্র সম্বল ছিল। ইহাকে "ল্যাডার্স" বলা হইত। মৈ-পথ বলা চলে। খাড়া পাহাড়ের গায়ে ধাপ কাটা, এবং ইহার উপর দিয়া গাছের ডালের সঙ্গে দড়ি বাঁধা ছিল। সাহসী যাত্রীর ইহাই ছিল একমাত্র অবলম্বন। বর্তমানে প্রশস্ত এবং সহজ পথ নির্মিত হইয়াছে, এই পথে আমাদের কোচ হ্রদের ধার পর্যন্ত যাইতে সক্ষম হইল। "রব রয়" নামক একটি ছোট স্টীমার আমাদিগকে হ্রদের ওপারে লইয়া গেল। আমরা এলেন দ্বীপ ছাড়াইয়া গেলাম। এই এলেন ডগলাস রোডনের নাইটকে বহন করিয়া আনিয়াছিল। একখানি বোট আসিয়া স্টীমার হইতে আমাদিগকে কুইনস্ কটেজে লইয়া গেল। এটি একটি সুরঙ্গ মুখে অবস্থিত। এই সুরঙ্গ পথে ক্যাট্রিন হ্রদ হইতে আটচল্লিশ মাইল দূরে গ্ল্যাসগোতে জল লইয়া যাওয়া হয়। গ্ল্যাসগোর এক ম্যাজিস্ট্রেট কুইনস কটেজের অতিথি

রূপে আমাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া গেলেন। তিনি অতঃপর একটি বোটে করিয়া হ্রদের আর এক প্রান্তে লইয়া গেলেন। স্থানটি বড়ই জনশূন্য, প্রাণহীন। পাহাড়গুলিতে শুধু ভাঙা পাথর আর বড় বড় পাথরের চাঁই। এ সব স্থান পূর্বে ম্যাকগ্রিগর গোষ্ঠির সম্পত্তি ছিল। ইহা হ্রদের ধারে একটি পাহাড় ঘেরা স্থান, বহু টুকরো পাথর চতুর্দিকে ছড়ান। শোনা গেল, ভারত সেনাবাহিনীর জেনারেল ম্যাকগ্রিগর সম্প্রতি ঈজিপ্টে মারা গিয়াছেন, তাঁহার দেহ এইখানে তখন আনিব চেষ্টা করা হইতেছিল। ম্যাকগ্রিগরদের সব বৃত্ত জানিতে হইলে পাঠকদিগকে স্কটের "লেডি অভ' লেক" পড়িতে অনুরোধ করি। ক্রমশঃ

অন্তবিহীন পথ

(উপন্যাস)

যমুনা নাগ

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

দশম অধ্যায়

জয়তী ও অবিনাশের বিয়েতে নির্মল ও পারিজাত নিমন্ত্রিত ছিল। নিতান্ত ঘনিষ্ঠ দু-চারজন ছাড়া আর কেউই ছিল না। শীলার তত্ত্বাবধানে সকলে প্রচুর আহার করল। বিয়ের ক'দিন পর অবিনাশ জয়তীকে নিয়ে আহ্‌মেদাবাদে প্রত্যাবর্তন করল। আশা ও তার স্বামী বিয়ে উপলক্ষ্যে কলকাতা গিয়েছিল। আহ্‌মেদাবাদে কয়েকদিন কাটিয়ে আশা শ্বশুরালয়ে ফিরে যাবে—প্রায় একশ' মাইল দূরে। জয়তীকে আহ্‌মেদাবাদের বাড়ীর সব ভার দিয়ে সে নিশ্চিন্ত মনে রওনা দিল।

সোমেন ও মালার দুরন্ত সন্তানদের নিয়ে শীলা ব্যস্ত হয়ে পড়ল। দেবাশিসের ঘর আজ আবার ভরে উঠেছে। চঞ্চল শিশুদের উপদ্রব তার ভালই লাগছিল। বাগানে ছেলেরা খেলা করে বেড়ায় তার বড় ভাল লাগে—তারা প্রজাপতির পেছনে ক্রমাগত ছুটছে আর মৌচাকের চাকে পাথর ছুঁড়ছে কিনা ভাবছে। দেবাশিস বিশাল শূন্যতার থেকে নিষ্কৃতি পেলো—পারিবারিক মিলনোৎসব পুনর্বার তাকে অভিভূত করল।

জয়তী আহ্‌মেদাবাদে পৌঁছে নূতন সংসারে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তার অবিনাশের জন্য উৎকণ্ঠা। অবিনাশের স্টুডিও গুছিয়ে দিতে সে ব্যস্ত, তাকে সাহায্য করতে

পারছে দেখে মন তার রীতিমত উৎফুল্ল হয়ে উঠেছে। দেওয়ার আনন্দও যে পাবার আনন্দ থেকে কোন অংশে কম নয় তা সে ভাল করেই জানত। কিন্তু সেই আনন্দ থেকে এতদিন যে সে বঞ্চিত ছিল। দ্বিধাপূর্ণ ভাষায় সে যেটুকু দুঃখ প্রকাশ করেছিল, অবিনাশই তা বুঝেছিল। আর বুঝেছিল তার বৃদ্ধ বাবা।

দেখতে দেখতে—বছর ঘুরে গেল—যেন কদিনের মত, অবিনাশ বহু ঘণ্টা স্টুডিওতে কাজ করে—জয়তী বসে বসে দেখে। সেও ছবি আঁকে মধ্যে মধ্যে।

কাজের ফাঁকে ফাঁকে জয়তীর 'দিগন্ত'র কথা মনে পড়ে যায়—জিনিসপত্রগুলির সুব্যবস্থা না করে সে শান্তি পাচ্ছিল না। কোথায় যেন তার কর্তব্যহানী হয়েছে—বারবার খোঁচা লাগছিল মনে। অবশেষে সে স্থির করল শিক্ষায়তনের পরিচালকদের হাতে দিগন্তের সম্পূর্ণ ভার দিয়ে দেবে। বাড়ীখানা দান করে দিতে সে একটুও কুণ্ঠিত হ'ল না। যে সব মূল্যবান চিত্র টাঙানো ছিল সেগুলি শিক্ষাকেন্দ্রেরই সম্পত্তি হবে। যাঁরা এই প্রতিষ্ঠান পরিচালনার ভার নিয়েছিলেন তাঁদেরই সব কিছুই সব দায়িত্ব দিয়ে দেওয়া হ'ল। দিগন্তর সমস্যা এবার মিটল। জয়তী যে মুহূর্তে এই মীমাংসায় পৌঁছতে পারল সে পরম শান্তি লাভ করলে। এতদিন যে বিষয় সে চিন্তা করতে চাইছিল না আজ অতি সহজেই সব ঠিক হয়ে গেল। কত দুশ্চিন্তা সে ডেকে এনেছিল, নিজের ওপর এত অবিচার তার অর্থহীন। দুঃস্বপ্নের দৈত্য তাকে যেন পিষে ফেলেছিল—আজ সে মুক্তি পেয়েছে সন্দেহ নেই।

'দিগন্ত' এখন মুকুটের গড়া ললিত কলাকেন্দ্রের একটি অংশ। জয়তী স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে ঐ বাড়ীতে বিরাট প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন হ'ল। কৌতুহলপূর্ণ দর্শকের দল প্রবেশ করছে—কেউ চিত্রের দিকে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে আছে, কেউ ছবি কিনছে। ছাত্রছাত্রীরা নিয়মিত কাজ করে চলেছে, পরিশ্রম করছে—তপস্যা—উৎসাহ তাদের দিয়েছে কখনও গরীব শিল্পী পরিধানে তার আধ ময়লা কাপড়। একদল ছাত্র তাকে ঘিরে বসে কাজ শিখছে —পরিচালকদের কাছে বৃত্তির জন্য কেউ অনুরোধ জানাচ্ছে—কোন মুহূর্তে আনন্দ কোলাহল, কখনও বিরাট সভা। কল্পিত দৃশ্যগুলি জয়তী মানসপটে সত্যিই দেখতে পাচ্ছে—কখনও উৎসাহিত হয়ে উঠছে কখনও কৌতূহলী হয়ে পড়ছে। কিন্তু পরমুহূর্তেই তার উদ্বিগ্নতা দূর হয়ে গেল। তার নিজস্ব দায়িত্ব আর কিছুই রইল না—সেও দর্শকের মতই সবকিছু উপভোগ করছে। বিচ্ছিন্ন স্মৃতির বাতায়ন খুলে দেখছে—ভারী অপূর্ব এই বাস্তব কল্পনা। জনকোলাহল আর তাকে অস্থির করছে না—ভিড় তাকে তিক্ত করছে না—অতি শান্ত মনে, নিশ্চিন্ত হয়ে সে দিগন্তর উৎসব লীলায় আজ যোগ দিতে পারল। দূরের পটভূমিকা এখন নতুন হলেও অপরিচিত নয়। আজ আর কোন বিদ্বেষ তাকে স্পর্শ করতে পারছে না—কোন সমস্যা তাকে পীড়া দিচ্ছে না—এই মঙ্গল কামনাই তার পরম শান্তি।

* * *

জয়তী অন্তঃসত্ত্বা—দ্রুতগতিতে সে আর চলতে পারে না—অতি সহজেই ক্লান্ত হয়ে পড়ছে। প্রত্যহ ভোরে স্নান করে শুভ্র বসনে জয়তী ধীরে ধীরে সিঁড়ি নেমে এসে অবিনাশের স্টুডিওতে গিয়ে বসে। সেখানে অবিনাশ একমনে কাজ করে—জয়তী মুগ্ধ নেত্রে তাকিয়ে থাকে আর ভাবে—

'এই সেদিন অবিনাশ কী অন্য রকমই ছিল—আজ সে রীতিমত একটি দায়িত্বপূর্ণ পুরুষ।' প্রেমান্ধ জয়তী সব অভিযোগ ভুলে গেল।

দেবাশিসের কাছ থেকে চিঠি এলো—সে একটু সুস্থ বোধ করলেই আমেদাবাদ রওনা দেবে। জয়তীর সন্তান সম্ভাবনার সংবাদ জেনে উল্লসিত হয়ে সুন্দর চিঠি লিখেছেন।

পূর্ণ নয়টি মাস শেষ হলে ডাক্তার অবিনাশকে সাবধান করে দিলেন। জয়তী হয়তো একটু কষ্টও পেতে পারে। অবিনাশের উৎকণ্ঠার শেষ নেই। ডাক্তাররা অনুমতি চাইলেন সিজারিয়ান অপারেশনের জন্য। অবিনাশ তো হতভম্ব।

'আমি আপনাদের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করছি—যা প্রয়োজন আপনারা করুন—'সে উত্তর দিল।

প্রত্যেকটি মুহূর্ত অবিনাশের সুদীর্ঘ প্রহর বলে মনে হ'ত লাগল। এত বড় পরীক্ষার মধ্যে অবিনাশ আর কখনও পড়েনি। জয়ন্তী নিজের মনকে আশ্চর্য শান্ত রেখেছিল। সময় পেরিয়ে যাচ্ছে দেখে ডাক্তাররা আন্দাজ করেছিলেন হয়তো—অপারেশন করতে হবে। একটি মোটর গেটে এসে থামল। খবর পৌছল জয়ন্তীর বাবা এসেছেন। অবিনাশ ছুটে গেল জয়ন্তীর কাছে—

'তোমার বাবা এসেছেন। আমি তাঁর সঙ্গে আছি' —বলে অবিনাশ দৌড়ে নেমে গিয়ে দেবাশিসকে বসালো। তার সঙ্গে কথা বলে হালকা হল। অবিনাশের মুখের ভাব দেখে দেবাশিস বলে উঠল—

'জয়ন্তী কেমন আছে? তুমি এবার যাও উপরে অবিনাশ—ওকে গিয়ে বল আমি এসে গেছি—শুনে সে খুব আনন্দ পাবে।'

জয়ন্তীর মনে আজ দুর্জয় সাহস, অসীম ধৈর্য। অবিনাশ উপরে উঠে এসে পৌঁছতেই শুভ সংবাদ জানতে পেল—'জয়ন্তী কন্যা লাভ করেছে। অপারেশনের প্রয়োজন হয়নি। ডাক্তাররা বলাবলি করছেন—miracle 'রীতিমত ফাঁড়া কেটেছে এখন শুধু বিশ্রামের প্রয়োজন। জয়ন্তী বেশ দুর্বল হয়ে পড়েছে।'

কেউ ঘরে ঢুকতে পেলো না—অবিনাশকে নার্স এসে খবর দিল—

'নয় পাউণ্ডের মেয়ে—মাকে ও মেয়েকে এখন বিশ্রাম করতে দিন।'

অবিনাশ ঘাম মুছে নিচে গিয়ে দেবাশিসকে খবর দিল। দুজনেই সিগারেট নেবাতে শুরু করল—দুজনের সম্পর্কটা এতদিনে বন্ধুর মতই হয়ে গেছে।

ঘণ্টা দুয়েক পর দেবাশিস ধীরে ধীরে জয়ন্তীর ঘরে গিয়ে দেখল গোলাপী রঙের একটি পুতুল শুয়ে আছে মাথায় ঝাঁকড়া কালো চুল। জয়ন্তীর ঘন চুল পরিষ্কার করে আঁচড়ানো—মুখে ক্লান্তির রেখা কিন্তু হাসিটি আজ বড়ই মধুর। বিশ্ব জননীর সমগ্র সুষমা জয়ন্তীর মুখমণ্ডলে প্রকাশ হয়েছে।

দেবাশিস বিছানার কাছে এগিয়ে যেতে জয়ন্তী উৎসুক হয়ে বলল—

'কার মতো দেখতে হয়েছে মেয়ে বল বাবা?'

'একেবারে তোমার মত—যেদিন জন্মালে ঠিক সেদিন তোমায় এ রকমই দেখিয়েছিল।'

অবিনাশ এতক্ষণে একটু নিশ্চিন্ত হয়ে ঘরে ঢুকল।

'জয়ন্তী বলছিলাম মেয়ে হবে।' অবিনাশ জয়ন্তীর খাটের পাশে এগিয়ে গেল একটি ক্ষুদ্র কৌটো বালিশের তলায় রেখে এক দৃষ্টিতে কন্যার দিকে চেয়ে রইল।

জয়ন্তী ধীরে ধীরে হাত বাড়িয়ে বালিশের নিচ থেকে কৌটোটি বার করে আনল বিস্ময়ের সহিত বলল—

'বাবা দেখো, অবিনাশ কি এনেছে।'

দেবাশিস তার পকেট থেকে এক জোড়া সোনার বালা শিশুকন্যার কাছে রাখল—আনন্দাশ্রুধারা ঝরে গেল তার চোখ বেয়ে, জয়ন্তী নীরব হয়ে রইল।

চোখ মুছে দেবাশিস বলল—

"নবাগতার কপালের ওপর চুলের গোছা দেখে মনে পড়ছে জয়ন্তীর জন্মের কথা। শান্তা বলত—'ও আমার দেবকন্যা—পরীর দেশের মেয়ে।' আজ সেই কথা কানে বাজছে। অবিনাশ বসো এখানে। জীবনে আমার অনেক অভিজ্ঞতা হয়েছে—কত ঘটনার ভিতর দিয়ে দিন কেটেছে। রাত, মাস, বছর, যুগ কেটে গেছে সব স্মৃতি প্রায় ম্লান হয়ে এসেছে কিন্তু এক জয়ন্তীর জন্ম তিথি এখনও উজ্জ্বল হয়ে আছে—সেই মাধুর্য মাখানো বিস্ময়ের মুহূর্ত এখনও চির নূতন হয়ে আছে। সেই স্মৃতি কোনদিন ম্লান হবে না। শান্তা কন্যার পাশে শুয়েছিল—দুটি ছেলের পর এই মেয়ে হ'ল—আমাদের সাধ মিটল। তোমার উদ্বিগ্ন মুখ দেখে নিজের কথা মনে হচ্ছে—কী দুর্ভাবনাতেই আমার দিন কেটেছিল সেদিন। কৌটোটি যখন বার করলে তখন আর চোখের জল সামলাতে পারলাম না আমিও একটি কানফুল

দিয়েছিলাম সেদিন। শান্তাকে যারা প্রাণ দিয়ে ভালবাসতে জানে প্রেমের প্রকাশের মধ্যে তাদের অদ্ভুত মিল দেখছি। জয়ন্তীকে আজ ঠিক শান্তার মত দেখাচ্ছে। শান্তার ঘন কেশরাশি বালিশের ওপর ছড়ানো ছিল অপরূপ মানস প্রতিমা শিশুকন্যার পাশে। সে হাত দুখানি বাড়িয়ে দিল আমার দিকে। অবিনাশ জয়ন্তী আমার মহাসম্পদ, এখন তোমায় দিলাম। কন্যার নাম কী দেবে ?'

জয়ন্তী অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছে তবু দেবাশিসের দিকে তাকিয়ে বলল—

'বাবা, আজই রাতে ভেবে রেখো—কালকেই যেন নাম ধরে ডাকতে পারি। দেবাশিস লক্ষ্য করল জয়ন্তী নিতান্তই কাহিল সুরে কথা বলছে—

'আমি তো মস্ত লিস্ট করে রেখেছিলাম—তোমার পুত্রধন হলে কি নাম দিতাম তাও ভেবেছি। কন্যাকে 'তুলিকা' বলে ডাকবো ভাবছি। শিল্পীর সন্তান—এই কন্যা—আজ থেকে ভুবনেশ্বরের তুলিকা হোক। সৃষ্টির ইতিহাস, পৌরাণিক ও ভাগবৎ কাহিনী, মানব জীবনের সুখ দুঃখের বাস্তব চিত্র তুলিকার হাতেই আঁকা হবে। চিত্রকরের জীবনের আদর্শ রক্ষা করতে গেলে বিশাল কর্মক্ষেত্রে নিজেকে সমর্পণ করে দিতে হয়—নিঃস্বার্থভাবে প্রবেশ করতে হয় সেখানে তবেই সাফল্য ও সার্থকতা। সত্য ও সুন্দরকে প্রকাশ করুক তুলিকার রঙিন রেখা।'

জয়ন্তীর মুখে আর কথা নেই। অবিনাশ ও দেবাশিস তুলিকার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে—জয়ন্তী তখনও নিদ্রালোকে। শিশুকন্যা কেঁদে উঠল—তাকে কোলে তুলে নিতে সে আরও জোরে কেঁদে উঠল—জয়ন্তী তবু জাগলো না—ডেকে ডেকে কেউ সাড়া পেলো না।

কন্যাকে রেখে সে চির বিদায় নিলো। এই দু'দিনের সুখের জন্যই যেন সে এতদিন প্রতীক্ষা করেছিল।

একটি চিঠি নিয়ে নার্স ছুটতে ছুটতে এসে অবিনাশের হাতে দিল—একটি বইয়ের ভেতর থেকে সে খুঁজে পেয়েছে—

'অবিনাশ সত্যি মনে হচ্ছে মরুতীর হতে সুধাশ্যামলীম পারে এসেছি। যদি মেয়ে হয় তাকে বুঝিও আমার মত যেন খামখেয়ালী না হয়। সে কিন্তু আমার বাবার কাছে থাকবে—তুমিও সেখানে থাকবে তো ? আমার ছোট বেলাকার স্টুডিও-তে বসে তোমরা দুজনে ছবি আঁকবে। ভয় আমার নিজের জন্য একটুও নেই কিন্তু বাবাকে দেখো। তোমার ও বাবার হাত ধরে আমি এতখানি পথ পেরিয়ে এসেছি—যদি আরও যেতে হয় মা তাঁর কোমল হাতখানা নিশ্চয় বাড়াবেন। আমি নাকি স্বাধীন হ'তে চেয়েছিলাম ? তুমি যে বলেছিলে আমি নিজেকে বুঝি না, তাই কি সত্যি ? পথের শেষ যে কোথায় কিছুই যেন অনুমান করতে পারছি না—এক একবার মনে হচ্ছে বেশী দূরে নয়......'

জঙ্গলের অভিজ্ঞতা

দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

১

শিকার মানুষের একটি আদিম বুনো প্রবৃত্তি। প্রাগৈতিহাসিক যুগে একান্তই বাঁচার প্রয়োজনে বন্য পশুকে বধ করা দরকার হয়েছিল। একদিকে ক্ষুন্নিবৃত্তির তাড়না, অপর দিকে ভয়ংকর হিংস্র জন্তুর অতর্কিতে আক্রমণের আশঙ্কা সব সময় অরণ্যবাসী মানুষকে সন্ত্রস্ত করে রাখত। তখনকার দিনে মানুষ গুহার আশ্রয় পেলেও বাঘ, সিংহ কিম্বা অন্য কোন হিংস্র মাংসভুক জানোয়ার গুহার ভিতর প্রবেশাধিকার পেলে পরিত্রাণ ছিল না।

সে যুগকে পিছনে ফেলে মানুষ এগিয়ে এল সভ্যতার সামনে। পাহাড় ও জঙ্গলের ভীতিপ্রদ আবেষ্টনী ছেড়ে মানুষ সভ্যতার আওতায় গড়ে তুলল গ্রাম, শহর। বাঁচার ধারায় চলল নিরাপদ হওয়ার চেষ্টা, এবং স্বাচ্ছন্দ্যকে পাওয়ার জন্য চলল বিবিধ আয়োজন। চেষ্টা সত্ত্বেও ক্রমপরিবর্তিত জীবনধারায় বাঁচার জন্য সংগ্রাম বহুদিকে থেকেই গেল। আহার সংস্থানের জন্য জঙ্গলে ঘোরার প্রয়োজন কেটে গেল বটে, কিন্তু বাঁচার দ্বন্দ্বে মানুষের উপর মানুষের আধিপত্য স্থাপনের চেষ্টা এবং ভিন্ন প্রকারের হিংসা এমনভাবেই এল যে মানুষ জানোয়ারকে মারা ছাড়াও শত্রু দমনের জন্য নিত্য নতুন ভয়ঙ্কর অস্ত্রের আবিষ্কার করতে লাগল।

আজ যে যুগে আমরা এসে পৌঁছেছি সেখানে শিকার এসে দাঁড়াল শৌখীনতার পর্য্যায়ে। দল বেঁধে হাতী চড়ে শিকারের শৌখীনতাকে মানুষ হত্যার বিলাস করে তুলল তার সঙ্গে গোপনে যোগ দিল Poachers-দের দল। তাদের অস্ত্রাঘাতে মরতে আরম্ভ করল এমন জানোয়ার যাদের চামড়া ফ্যাশানমত্তা শৌখীন মেয়েদের গলাবন্ধের স্থান নিল অথবা পদদলিত করার জন্য ড্রইংরুমে চামড়া শোভা বৃদ্ধির কাজে লাগতে লাগল। দুদিক থেকেই ফ্যাশানের আশ্রয় লওয়ায় মানুষ হিংস্র পশুকেও নৃশংসতায় হার মানিয়ে দিল। ঘটনার প্রতিক্রিয়া থেকে জঙ্গলবাসী পশুদের বাঁচাবার জন্য অনেকে সচেষ্ট হলেন, হওয়া প্রয়োজনও ছিল, কিন্তু চেষ্টা কত সাফল্য লাভ করেছে তা এখনও জানা যায় নি।

উপস্থিত শিকারের কথায় আমার বক্তব্যের ঘটনাগুলি আমাকে জড়িয়েই। শিকারী আমি নিজে, সুতরাং আমার বুনো প্রবৃত্তিকে কোন অছিলায় আড়াল দেওয়ার চেষ্টা ফলপ্রদ হবে বলে মনে করি না। তবে এই প্রবৃত্তির সূত্র খুঁজলে দেখা যাবে, আদিম যুগের মানুষের সঙ্গে আজকের মানুষের হিংস্র আচরণে যে তফাৎ আছে তা বহুক্ষেত্রে সাজিয়ে সত্যকে আড়াল দেওয়া। এখানে আমার সমর্থনে যেটুকু দৃষ্টান্ত আদিম মানুষের জীবনধারার সঙ্গে মিল ঘটে, তা বলতে পারলে অন্ততঃ সান্ত্বনা থাকে যে আমি প্রয়োজনীয়তার খাতিরে হিংস্র জন্তু বধ করে অন্যায় কিছু করিনি। ন্যায় অন্যায়ের প্রশ্নে আমার শিকারের শৌখীনতাকে সাত্ত্বিক ধর্মবলম্বীরা নিন্দনীয় ভাবতে পারেন। এতবড় ন্যায় অধিকার থেকে তাঁদের বঞ্চিত করার চেষ্টা আমি করব না।

তথাপি বলব, ক্ষেত্র বিশেষে হিংসা প্রবৃত্তিই মানুষের উপকারে লেগেছে। নরভুক বাঘ মেরে জঙ্গল-ঘেঁষা গ্রামের মানুষকে আতঙ্কের কবল থেকে শিকারী নিষ্কৃতি দিয়েছে। গ্রাম্য জীবনধারায় পল্লীবাসী সহজ চলা-ফেরার সুবিধা পেয়েছে। তা ছাড়া এমন বাঘের সংস্পর্শে শিকারী এসেছে, যারা আহার সম্বন্ধে বিশেষ রুচির অনুগত। গোয়াল ঘর থেকে পুষ্ট গাভীন গরুকে মারতে পারলে তারা প্রকৃতিদত্ত স্বাভাবিক আহার জঙ্গল থেকে সংগ্রহ করতে চায় না। কয়েকটি ঘটনা থেকে জানতে পারা যাবে যে, শিকারী কি রকম বিপদ সঙ্গে নিয়ে সাহস দেখিয়ে বাহবা পেতে চায়।

অনেকের ধারণা যে আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র এমনই শক্তিশালী যে বাঘ, সিংহ, হাতী, ভালুক, গণ্ডার অথবা মহিষ কিম্বা বাইসন এক গুলীতেই মরে, সুতরাং শিকারে বধ্যজীব যতই ভয়ংকর হোক, যতই শক্তিশালী হোক, মানুষের আবিষ্কৃত আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্রের কাছে পাশবিক শক্তিকে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনা চলে না। আনা তো চলেই না, বরং শিকারীর তুলনায় শিকারকে নিরীহ বলতেও বাধে না। কথাটা হয়ত ঠিক; তবে যেখানে গুলী লাগলে জানোয়ার দ্বিতীয়বার বন্দুকের আওয়াজ শুনতে পায় না, সেই জায়গায় লক্ষ্যভেদ করতে হলে দীর্ঘকালের অভ্যাস দরকার, কারণ মারের মারাত্মক স্থান নিতান্তই ক্ষুদ্রাকার। একটি পূর্ণকায় হাতীর মারণস্থলের মাপ নিলে বার হবে, তার কর্ণগহ্বরই শ্রেষ্ঠস্থান, মানে কয়েক ইঞ্চির ঘেরাও মাত্র। দ্বিতীয়, দুই চোখের উপরের মধ্যস্থল। যতটা কাছ থেকে vital spot-এ নির্ভুল লক্ষ্যভেদের উপর নির্ভর করা যায়, তাও বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই অতি নিকট থেকেই সম্পন্ন করতে হয়, অর্থাৎ গুলী ঠিক জায়গায় লাগাতে না পারলে শিকারীকেই শিকার হয়ে যেতে হয়। এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নেই। তাগমারীর প্রশ্নে আরও একটা কথা আছে যার সঙ্গে ধৈর্য ও আত্মসংযমের যোগ অবিচ্ছেদ্য। ভয়ে হোক, উত্তেজনায় হোক, যে কোন কারণে লক্ষ্যভেদের সময়ে অতি সামান্য হাত কেঁপে গেলেই, বন্দুকের নল থেকে বার হওয়া গুলী যে লক্ষ্য ভ্রষ্ট হবে তাতে সন্দেহ নেই, এবং যেখানে গুলীর মারে সামান্য ক্ষতের বেশী কিছু হবে না, সেখানে ভয়ঙ্কর ক্রুদ্ধ জানোয়ার আততায়ীকে নিকটে পেলে কিভাবে আপ্যায়ন জানাবে তা সহজেই অনুমেয়। এইরূপ অবস্থায় বহু শিকারী অসাবধানতা-বশতঃ মৃত্যুকে বরণ করেছেন। সুতরাং নিশ্চিন্তমনে বলা চলে যে, অতি শক্তিশালী অস্ত্র সহায় থাকলেও শিকারীর বিপদ থেকে নিশ্চিন্ত হবার উপায় নেই।

এই প্রসঙ্গে বিপদ সংক্রান্ত কয়েকটি ঘটনা আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে চাই, যা ইতিপূর্বে বিভিন্ন পত্রিকায় বিশদ বর্ণনার দ্বারা প্রকাশিত হয়ে গিয়েছে, সুতরাং উপস্থিত ক্ষেত্রে প্রতিটি ঘটনা সংক্ষেপে বল্লেই হবে।

প্রথমেই বন্দুকের ব্যবহারে সতর্কতা সম্বন্ধে বলি। অনেকদিন আগের কথা। দীর্ঘকাল বন্দুক ব্যবহার না করার পর কিছু মোটা টাকা হাতে আসায় কয়েকটি High Velocity Rifle কিনে ফেল্লাম, তার সঙ্গে সাধারণ দোনলা Shot Gun ছাড়াও Pistol এবং Revolver-ও ছিল। বহুদিন আগে রংপুরে বন্যবরাহ ইত্যাদি মারায় ছেলেবেলা থেকেই Rifle চালানোয় অভ্যস্ত ছিলাম। অনেকদিন পরে শিকারের অস্ত্রগুলি আবার হাতে আসায় জঙ্গলের ডাক অনুভব করতে লাগলাম। শিকারের নেশায় যারা উত্তেজনা যোগায় তাদেরকে আমরা বলি খোবুরী, অর্থাৎ যারা খবর দেয় কোথায় বাঘ, লেপার্ড, বা বুনো শুয়োর পাওয়া যাবে। খবর এল, মাদ্রাজের কাছেই ২৫৩০ মাইলের মধ্যে একটি গ্রামে দুটি লেপার্ড বেজায় উৎপাত শুরু করে দিয়েছে। একদিন দুদিন অন্তর কুকুর অথবা ছাগল, ঘর থেকে টেনে নিয়ে গিয়ে ঝোপঝাড়ের আড়ালে আহারের সুব্যবস্থায় রীতিমত অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে।

মাদ্রাজে তখন আমি আর্ট কলেজের অধ্যক্ষ। খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শিকারে যাওয়ার তোড়জড় শুরু হয়ে গেল। কালীকিঙ্কর ঘোষ দস্তিদার (চিত্রশিল্পী) তখন মাদ্রাজে আর্ট কলেজে আমার কাছে শিখতে

এসেছিলেন। আমি যে শিক্ষাপীঠে শিক্ষাদানের কর্ত্তব্য নিয়েছিলাম সেখানে গুরুকুল পদ্ধতি প্রচলনের চেষ্টায় একেবারে অসফল হইনি; এই কারণে বিদ্যাপীঠে হাজিরা দেওয়ার পর ক্লাশের শেষে গুরু-শিষ্যের সম্বন্ধ দাঁড়াত বন্ধুর মত। সুবিধাটি কাজে লাগালেন কালীকিঙ্কর। জানালেন—"আমিও যাব আপনার সঙ্গে শিকার করতে।" বন্দুকের অভাব ছিল না, কিন্তু বন্দুক চালনায় কালীকিঙ্করের অজ্ঞতা ছিল বিশ্বাসযোগ্য। কাজেই ভয় পেলাম তার হাতে ভরা বন্দুক দিতে। কালীকিঙ্কর দমে যাবার পাত্র নন। তিনি বন্দুক না পাওয়ায় কসাই-এর মাংস-কাটা ছুরী হাতে পাওয়াতেই সন্তুষ্ট হলেন। ছুরীটি অতি বৃহৎ নেপালী কুক্রীর মত। অস্ত্রটি নতুন এবং বেজায় চকচকে। বিঘ্নকারী ডাল-পালা কাটার জন্য অস্ত্রটি সঙ্গে নেওয়া হয়েছিল।

সন্ধ্যার আগেই খবোয়া মোটর গাড়ী করে একেবারে খোবুরীর দেওয়া ঠিকানায় এসে পৌছান গেল। চারধারে অনেক ছোটখাট পাহাড়, বড় রকমের টিলা ছাড়া আর কিছু নয়। এরই মাঝখানে একটি নোংরা ছোট্ট ডোবা; ডোবার চারপাশে ঘন বাঁশঝাড়, আশশেওড়ার ঝোপ এবং আরও কত কি অজানা গাছের ভিড়। জায়গাটা লাগল ভাল। মনে হল খবরটা মিথ্যা নয়। দেখতে দেখতে সন্ধ্যা এগিয়ে এল, অন্ধকার গাঢ় হয়ে আসতে লাগল, বিভিন্ন গাছের এডালে ওডালে খট্ খট্ করে কোন অবাঞ্ছনীয় কীটের কর্মব্যস্ততার নির্দ্দেশ পাওয়া যাচ্ছিল। কালীকিঙ্কর আমার পাশেই বসে ছিলেন। দেখি তিনি সেই উজ্জ্বল ধারাল অস্ত্রটি নিয়ে ওলোট পালোট করে কি দেখছেন।

ইস্পাতের উজ্জ্বলতা যে ছটা এদিক ওদিক ছড়াচ্ছিল তা বিনা ক্লেশে ডোবার ওপার থেকেও দেখা যায়। কালীর কানের কাছে গিয়ে চুপি চুপি বারণ করলাম—"নড়াচড়া করো না। চিতা কাছে এলেও পালাবে।" কিছুক্ষণের জন্য কালী অস্ত্রটি নামিয়ে রাখলেও, স্থির হয়ে বসে থাকা কালীর ধাতে সয় না। সে থেকে থেকে পিঠের দিকটা আচম্কা চুলকোতে আরম্ভ করেছিল। শুধু কি চুলকানো? চুলকানি পাবার একটা signal-ও সঙ্গে থাকল। হাত নাড়ার আগেই বেশ জোরেই 'উঃ' শব্দের পর চুলকানির দ্বারা আরাম সংগ্রহ হতে লাগল। বুঝলাম, কালী শিকারের সব কিছু পণ্ড করে দেবে।

শিকারে সহ্যশক্তি ও সংযম একটি প্রধান সহায়। এবং কালীকিঙ্কর সহ্য ও সংযম, কোনটিকেই মানতে রাজী নয়। এখানে বক্তৃতা দ্বারা চরিত্রশুদ্ধির চেষ্টা বৃথা। রাগ এসে গিয়েছিল, তার প্রকাশ হল সাবধানতার বাণী দিয়ে। বল্লাম—"উঃ, আঃ, এ সব চলবে না" কালী বোধ হয় আদেশটি মানলেন, কিন্তু বেশীক্ষণ নয়। আবার শব্দ শুনলাম, উঃ। নিশ্চিত হলাম শিকার নিশ্চয়ই কাছে এসেছিল, কালীই তাকে তাড়ালেন। হতাশ হয়ে মাটিতে চাপড় মেরে তাকে বল্লাম—"কি করছ কালী?" কালী এবার করুণ স্বরে আমারই মত চুপি চুপি বল্লেন—"স্যার, আমার জামার তলা দিয়ে একটা বড় এবং শক্ত পোকা ঢুকে গিয়েছে। সে কিল-বিল করে চলছে আর থেকে থেকে কামড়াচ্ছে।" এতটা বলার পরই সে আবার বলে উঠল—'উঃ।'

এতক্ষণ ব্যাঙের কোলাহল শুনিনি, এইবার দাদুরীর ডাকে বাঘের বদলে কবিতা এল তেড়ে সব কিছু মোলায়েম করে দেবার জন্য। শিকারের আশা ছেড়ে মাটিতে পাতা শতরঞ্জির উপর কোন প্রকারে হাঁটু মুড়ে শুয়ে পড়লাম। কালী স্বেচ্ছায় পাহারায় বসে রইলেন। তার বিশ্বাস ছিল বাঘ যদি দাদার কাছে আসে, তাহলে এক কোপেই ঐ বৃহৎ ছুরীর দ্বারা তার মুণ্ডচ্ছেদ করে দেবে।

বাঘ, লেপার্ড, বোন-বিড়াল, এমন কি একটা নেউল পর্য্যন্ত আসেনি। সকালবেলা শিকারের সব আকর্ষণ বর্জ্জন করে ওঠা গেল। Ready Trigger-এ ভরা Rifle পাশেই গাছের ডালে ঠেসান দিয়ে রাখা ছিল। যত রাগ গিয়ে পড়ল ঐ বন্দুকটার ওপর। বন্দুক তুলে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে 'দুৎ তোর' বলে মাটিতে বন্দুকের বাঁটটা দিলাম ঠুকে। তারপরেই শুনলাম কানের পাশেই কামান দাগার বিকট আওয়াজ। ৫০০ বোরের High

নেপালী কুকরীর মত কসাই-এর বড় ছুরিটা কালী ঘুরিয়ে দেখছেন

Velocity Rifle থেকে গুলী বেরিয়ে গেল ঠিক আমার কানের পাশ দিয়ে। Ready Trigger-এ আমার আঙ্গুল লাগানই ছিল, বন্দুকের বাঁট জোরে মাটিতে ঠুকে যাওয়ায় আমার অজ্ঞাতেই Trigger-এ টান পড়েছিল। মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে গেলাম, এবং প্রতিজ্ঞা করলাম, ভবিষ্যতে প্রয়োজন না হলে কখনও Ready Trigger-এ হাত রাখব না। অস্ত্রও যে শিকারীর কাছে মারাত্মক বিপদ হতে পারে তা এই দৃষ্টান্ত থেকে পাওয়া যায়।

অস্ত্র সম্বন্ধেই আর একটা ঘটনা শুনেছি। বন্দুকের নল দীর্ঘকাল পরিষ্কার না হওয়ায় নলের ভিতর এমনভাবেই মরচে পড়েছিল যে, সেগুলোকে ছোটখাট লোহার দানা বলা যায়। এই বন্দুক নিয়েই শিকারীর বাঘ মেরে সাহস দেখাবার প্রয়োজন হয়েছিল। কিন্তু

বন্দুকের নল ফেটে শিকারীর দুটি চোখ, ও কপালের খুলী উঁড়িয়ে দিয়েছিল। ভদ্রলোকের কপাল ভাল যে যন্ত্রণা ভোগের জন্য তিনি বেশীক্ষণ বাঁচেন নি।

নতুন জায়গায় এলাম। এখানে ঘোর ঘটা করে পিকনিকের আছিলায় মেয়ে-পুরুষ মিলে শিকারে আসা হয়েছিল। স্থানীয় লোকেরা বাংলো থেকে বেশ খানিকটা দূরে আমাকে নিয়ে গিয়ে বল্ল—"এইখানে পাঠা বাঁধলে—১৫ মিনিটের মধ্যে লেপার্ড এসে পাঠাকে নিয়ে যাবে এবং লেপার্ড এমনই জল্দি কাজ সারবে যে আপনি গুলী চালাবারও সময় পাবেন না। তাই বলি, পাঠা এইখানে বাঁধার আগে ওখানে একটা পাঠার মাথার সাইজের পাথর রাখি, আমি মারুন বল্লেই গুলী চালাবেন, এক সেকেণ্ড যেন দেরী না হয়।" তাগমারীর দম্ভে আমার ছিল নির্ভরশীল দাবী, কাজেই এই সামান্য শর্ত্তকে তাচ্ছিল্যের সহিতই গ্রহণ করলাম। বল্লাম—"রাখ পাথরের নুড়ি, চেঁচাও মারুন বলে, দেখবে তোমার কথা শেষ হওয়ার আগেই আমার গুলী চলে গিয়েছে।" তাই। সর্ত্তানুসারে গুলী চলল, কিন্তু পাথরে লাগা গুলী পিছলে গিয়ে পড়ল একটি চাষার পায়ের সামনে। সে হাঁউ মাঁউ করে চেঁচিয়ে ওঠাতে আমরা সকলে সেইদিকে গেলাম। লোকটা বেশ দূরেই ছিল। আমাদের ভাগ্য ভালো। সে তেড়ে ছুটে এল একটা কড়া অভিযোগ জানাবার জন্য। সোজা কথায় সে বলতে চেয়েছিল—"আর একটু হলেই যে মরেছিলাম।" আমার ত্রুটি স্বীকার করার উপরও নালিশ থামানর জন্য কিছু ঘুষ দিতে হল। এইরূপটি ঘটতোনা, যদি আমি পাথরের ওপাশে কি আছে দেখে নিতাম।

এবারেও শিকারের জায়গা অন্ধ্র প্রদেশেই স্থির হলো, মানুষ-খেকো বাঘের খবরে। নরখাদকের সঙ্গে এর আগে আমার পরিচয় হয়নি; এই কারণেই জানতাম না যে সাধারণ বাঘ ও নরমাংসভুক বাঘের আচরণে অনেক গরমিল থাকতে পারে। মানুষখেকো বাঘের চলাফেরা, শিকার ধরার প্রথা সবই সাধারণ বাঘের সঙ্গে বহুক্ষেত্রে তফাৎ। একে তার ভয়ডর অনেক কম, তার উপর বেজায় চালাক। যাই হোক, শিকারের নেশায় তখন রঙ লেগে গিয়েছিল, ভয় বা বা বিপদের সম্বন্ধে খবর নেবার ধৈর্য্য ছিল না।

এখানে পাহাড়ী পথে বাঘের পদচিহ্ন খোবুরীর দেওয়া ঠিকানা অনুসারে খুঁজে পেতে কষ্ট হয়নি। দেখলাম, যে জীব পদচিহ্ন রেখে গিয়েছে সে একটি বিরাট বাঘ। ছোট খাট কুলোর মতো সামনের দুটো থাবা। নরম ধূলোর উপর টাট্কা দাগ দেখে কিছুমাত্র ভুল রইল না যে জানোয়ারটি সুস্থ শরীরে ঘোরাফেরা করে না। ডান দিককার পায়ের থাবার পুরোপুরি চিহ্ন মাটিতে পড়েনি। অন্যত্র শিকারের অভিজ্ঞতা দিয়ে ধরেছিলাম, বাঘ কোন্ দিক থেকে আসবে। ছাউনী দেওয়া গরুর গাড়ীতে এসেছিলাম, সঙ্গে একটি ছোট্ট মোষের বাচ্চাও ছিল, জন্তুটিকে Live Bait হিসাবে ব্যবহারের জন্য আনা হয়েছিল। যেখানে ছোট্ট মোষটা বাঁধা হল, তার কাছাকাছি মাচান বাঁধার উপযুক্ত কোন গাছ পাওয়া গেল না, এবং মাটিতে গর্ত্ত করে বসার জন্য কোন আয়োজনও সঙ্গে করে আনিনি। গত্যন্তরে ঠিক করলাম, গরুর গাড়ীর তলায় বসব। সামনে বিরাট চাকা। এত কাছ থেকে গুলী চালালে বাঘ এক গুলীতেই মরবে, তবু সাবধানতার জন্য ৩ ইঞ্চি এল জি বন্দুকের নলে ভরে নিলাম। যদি গুলী খেয়েও বাঘ লাফ মারে তাহলে চাকার কাছে এসে পৌছবার আগেই ৩ ইঞ্চি ম্যাগ্নাম্ এল জি তার দফা শেষ করে দেবে। বেলা থাকতেই এদিকে এসেছিলাম। আমার সঙ্গে ছিল আর একটি ছাত্র। গাড়োয়ানও সঙ্গে এনেছিল তার একটি দেহরক্ষী, কারণ শর্ত্ত ছিল, আমাদের শিকারের জায়গায় পৌছিয়ে দিয়ে গাড়োয়ান তার দুটো বলদ নিয়ে ফিরে চলে যাবে। এ অঞ্চলে কোন মানুষ একলা চলাফেরা করে না, এমন কি দিনের বেলাতেও না। তাই তার সঙ্গীর প্রয়োজন হয়েছিল। আমার সঙ্গে যে ছাত্রটি এসেছিল, তার মধ্যে শিকারের বাতিক কে

নিরাপদের স্থান সন্ধানের পর রাজারা ইষ্টদেবতাদের স্মরণ করে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন আর কখন শিকারে আসবেন না বলে।

এসেছিল জানি না; কিন্তু বন্দুক কাছে থাকা সত্ত্বেও সে কিছুতেই মাটিতে বসতে রাজী হল না; ছাউনী ঢাকা গাড়ীর উপর উঠে পড়ল। গাড়ীর সমভাবে ওঠানামার কোন সম্ভাবনা ছিল না, দু দিকেই বাঁশের ঠেকো দেওয়া হয়েছিল। আমি যে চাকার তলায় বসেছিলাম সে জায়গাটি পাহাড়ী রাস্তার একটি মোড়ের কাছে, তার মানে রাস্তাটি আমার বসার জায়গা থেকে মোড় ফেরার পথে আমি যেখানে বসে আছি তার উপর দিকে উঠে গিয়েছে। আরও সোজা করে বলতে গেলে দাঁড়ায়, যেখানে আমার ছাত্রটি ছাউনী দেওয়া গাড়ীর উপর বসেছিল, সে জায়গাটি উপর দিকে যাবার পথ থেকে সামান্য উঁচু; এখান থেকে গাড়ীর উপরে বসে মোড়ের দিক থেকে উপরে ওঠার পথে রাস্তার কিনারায় অনেক ঝোপঝাপ থাকা সত্ত্বেও সব কিছু দেখতে পাওয়া যায়, এবং ছেলেটি দেখেও ছিল। দেখার বর্ণনা দিচ্ছি। গাড়ীর ছাউনীকে ছোটখাট ডালপালা দিয়ে আড়াল দেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু ক্যামুফ্লাজ (Camouflage) কাজে আসেনি। বিকালে, লাগান সবুজ পাতা কড়া রোদে প্রায় শুকিয়ে গিয়েছিল, একটু নড়াচড়াতেই খড়খড়ে আওয়াজ সুস্পষ্ট হয়ে উঠল। আওয়াজের কথা গোড়ার দিকে ভাবিনি, কারণ ঠিক ছিল, আমরা দুজনেই চাকার আড়ালে পিঠাপিঠি বিপরীত দিকে মুখ রেখে বসব। কিন্তু ছাত্র শিকারী আবেষ্টনীতে যা দেখল তাতে মাটিতে বসা তার পোষাল না। তিনি গুরুভক্তি দেখালেন, যা শত্রু পরে পরে ভেবে।

ইতিমধ্যে জঙ্গলে সন্ধ্যার অন্ধকার এগিয়ে আসতে শুরু করেছে, চতুর্দিকে কোন শব্দ নেই, একটি পাখীও উড়ছে না। বাঘের জঙ্গলে আড়ালহীন জায়গায় মাটিতে বসলে এইরকম সময়ে কেমন একটা আতঙ্ক নিজের অজ্ঞাতেই কাছে আসতে থাকে। আমার মনের যখন এই রকম অবস্থা তখন দেখলাম ছাউনীর উপরটা বশ কাঁপছে, আর আমার ছাত্র 'উঁ-হুঁ-হুঁ-হুঁ' শব্দ শুরু করে দিয়েছে। কালীকিঙ্করকে যেভাবে ধমক দিয়েছিলাম, এবারেও সেইভাবে তাকে আস্তে ধমক দিয়ে বল্লাম—"আওয়াজ করো না, বাঘ আসার সময় হয়ে গিয়েছে।" ধমক কাজে এল। বেশ কিছুক্ষণ আবার সব চুপচাপ হয়ে গেল। কিন্তু বদভ্যাস যাবে কোথায়? আবার "উঁহু হুঁ-হুঁ" শব্দ। এবার মাত্রাও যেমন বেশী তেমনি ছাউনীর দোলাও বেড়ে উঠল। মনে হল, 'উঁ-হুঁ হুঁ' শব্দের সাথে ছেলেটি বলছে, "ব্ঃ-ব্ঃ-ব্ঃ-বাঘ।" সন্দেহ রইল না যে, ছেলেটিকে ম্যালেরিয়ায় ধরেছে এবং সে ভুল বকছে। এখন করি কি? সে যেভাবে গোঙানির আওয়াজ শুরু করল তাতে বাঘ যে এদিকে আর আসবে না তাতে সন্দেহ নেই। কিছুক্ষণ বাদে গোঙানির শব্দ থেমে গেল, তার সঙ্গে ছাউনীতে বাঁধা ডালও গেল মাটিতে পড়ে, যা সরু পচা দাড় দিয়ে কোন প্রকারে ছাউনীর চাঁচাড়িতে বাঁধা হয়েছিল। উঁহু-হুঁ হুঁ-হুঁ শব্দের সঙ্গে দেহের যে কাঁপুনি এসেছিল তারই ঝাঁকুনিতে ডালটা বেশ সশব্দেই মাটিতে পড়ল। উপরে উঠে সান্ত্বনা দিয়ে ম্যালেরিয়া রোগ সারাবার চেষ্টা বৃথা ভেবে, ঐ বাঁধা মোষটার দিকে তাকিয়েই বসে রইলাম। সময় এগিয়ে চলল গভীর রাতের দিকে, রাতও এগিয়ে চলল। এরই মধ্যে বেশ কয়েকবার ঝিমুনোর সময় মাথা গিয়েছিল চাকায় ঠুকে, চমকে উঠে বসেছি; অভ্যাস মত বন্দুকের দিকে হাতও চলে গিয়েছিল। বাঘ আসে নি।

শেষ পর্য্যন্ত ভোর হয়ে গেল, চাকার তলা থেকে বেরিয়ে এলাম। বেরিয়ে এসে রাগকে শাসন করে রুগীকে দেখতে গেলাম; দেখলাম সে চমৎকার সুস্থ শরীরে বসে আছে চোখ দুটো বড় বড় করে মোড়ের ঝোপটার দিকে তাকিয়ে। প্রথম কথাতেই জিজ্ঞেস করলাম—"জ্বর কি খুব বেশী হয়েছিল?" বল্লে—"না স্যার, বাঘ।" বলেই দেখিয়ে দিল কোন্ জায়গায় বাঘকে সে আসতে দেখেছে। জায়গাটি পরীক্ষা করার প্রয়োজন থাকায় বন্দুক নিয়ে মোড়ের দিকে চল্লাম, ছাত্রটিও আমার সঙ্গ নিল। সে এইটুকু ব্যবধানেও একলা থাকতে চায়

গাড়ীর উপরে দেখি ছেলেটা ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে বসে আছে। বললে "ব্ ব্ ব্ বাঘ"

না। মোড় ঘুরে দেখলাম, সত্যই আমার চেনা বাঘের থাবা পড়েছে রাস্তার উপরে এবং এসে থেমেছে ঠিক আমার গাড়ীর চাকার পিছনে। বাঘ এইখানেই বসেছিল, এবং ল্যাজের নড়াচড়ায় খানিকটা জায়গা প্রায় ঝাঁট দেওয়ায় মত হয়ে গিয়েছিল। বসার ভঙ্গী দেখলে বেশ বোঝা যায় যে আক্রমণের জন্য সে প্রস্তুত হয়েছিল, কিন্তু আমার ছাত্রটি আমাকে বাঁচিয়ে দিল। উঁহু-হুঁ-হুঁ-শব্দ এবং ছাউনী থেকে ডাল যদি সশব্দে ছিঁড়ে মাটিতে না পড়ত তাহলে বাঘ কত সহজে হাত বাড়িয়ে আমাকে টেনে নিতে পারত তা অনুমান করা চলে, কারণ পিছন থেকে থাবার একটি থাপ্পড়েই আমার মাথা ধড় থেকে বিচ্যুত হত। আত্মরক্ষার কোনরকম উপায়ই পেতাম না। এখানে আমার সাহসের কোন পরিচয়ই নেই, নিরবচ্ছিন্ন অজ্ঞতা এবং দৈবকৃপায় যদি ছাত্রটি রীতিমত ভয় না পেত তাহলে আজকে সত্য ঘটনার বিবৃতি দেওয়ার সুবিধা পেতাম না।

পরের ঘটনা কর্ণুলের জঙ্গলে। বাঘ মারতে এসেছিলাম। বাঘের বসতি এখানেও কম নেই। যে বাঘের খবর পেয়ে এখানে এসেছিলাম, শুনলাম সে নাকি মন্ত্রপূত। এ পর্যন্ত বহুবার তার উপর গুলী চলেছে কিন্তু কেউই তাকে মারতে পারেনি। ঐ বাঘকে বিজলী বাতির আলো দিয়ে দেখবার চেষ্টা করলে সে নাকি সুইচ টেপার সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে অদৃশ্য করে দেয়।

বর্ণনাটি তেমন উৎসাহপূর্ণ বলে মনে হল না তথাপি মন্ত্রকে মারার অস্ত্র আমার কাছে ছিল। একটি গরু মারার খবর পেয়ে যথাস্থানে উপস্থিত হলাম। গরুটি একটি শুকনো নালার তলায় পড়ে ছিল। চারধার একেবারে ফাঁকা। কিছু দূরে কয়েকটি বাঁশের ঝোপ থাকলেও তার ভিতরে বসে নালার তলায় লক্ষ্যভেদ অসম্ভব, বাঘ এলেও তাকে দেখা যাবে না। লক্ষ্য ভেদে সুবিধার জন্য শিকারের একটি নীতিবিরুদ্ধ কাজ করে বসলাম। আমরা ছিলাম দলে ৭।৮ জন। গরুর গলায় কোনপ্রকারে আলগোছে দড়ির ফাঁস লাগিয়ে তাকে টেনে পাড়ের উপর তুলতে আমরা হিমশিম খেয়ে গেলাম। গলায় দড়ি পরাবার প্রথায় দুটি ডালের সাহায্যে মাথা তোলা হয়েছিল এবং এবারেও সেইভাবে মাথা তুলে গলার ফাঁস আলগোছে খোলা হল, যাতে মানুষের ছোঁয়া গরুর উপর না লাগে। বাঘকে সন্দিগ্ধ করার ইচ্ছা ছিল না। তবু এইটুকু সাবধানতা কোন কাজে আসবে বলে মনে হল না, কারণ মরা গরু যে চলে না বাঘও জানে এবং সেই মরা খালের উপর উঠে আসায় যে সন্দেহের কারণ হয়েছিল তা বাঘ কাছে এলেই জানতে পারবে। তবে পথ চলতে বাঘ মানুষের গন্ধ প্রায়ই পেয়ে থাকে। কাজেই এ বিষয়ে চিন্তিত হবার কোন প্রয়োজন ছিল না; এখন কাছাকাছি বসার জন্য কৃত্রিম বাঁশের ঝোপ যদি করা যায় তবেই শিকারে বসা চলে।

শিকারে বহু ক্ষেত্রে মনকে দৃঢ় করায় অনভ্যস্ত ছিলাম না। লোকগুলিকে বোল্লাম—"বেশ দূরে গিয়ে যতগুলো পারিস বাঁশ কেটে নিয়ে আয়।" ডালপালা সমেত অনেকগুলো গোটা গোটা বাঁশ যথাসময়ে এসে উপস্থিত হল। কিন্তু মাটিতে গর্ত করার জন্য শাবল, কোদাল আনলেও সেগুলো কাজে লাগান গেল না। এখানে মাটির বালাই নেই, সবই নুড়ি। কয়েক ইঞ্চি গর্ত করার চেষ্টা করলেই শাবলের মুখ ভোঁতা হয়ে যাবে, সুতরাং বাঁশগুলো একের উপর আর-একটা ঠেকা দিয়ে সাজান ছাড়া আর কোন পথ পাওয়া গেল না। ব্যাপারটি দাঁড়াল, বাঘ যদি গুলী খেয়ে লাফ মারে তাহলে বাঁশের কেল্লার মধ্যেই আমার গোর হয়ে যাবে। মাঝখানে ফাঁক রাখায় কোনপ্রকারে বসলাম। চলতি নিয়মানুসারে আমাকে ভিতরে বসিয়ে সঙ্গের লোকগুলো কথা বলতে বলতে গ্রামের দিকে চলে গেল।

এখানেও এত কাছ থেকে Rifle-এর ব্যাবহার অর্থহীন তাই দোনলা Shot Gun নিয়ে বসেছিলাম। মাথার

গাড়ীর উপরে দেখি ছেলেটা ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে বসে আছে। বললে "বু বু বু বাঘ"

উপর একটি ডালে মোটর গাড়ীর Spot Light লাগিয়ে switch রাখলাম আমার হাতে। বাঘ ঠিকই এল, কিন্তু যখন সুইচ টিপলাম তখন আলো পড়ল আমার মুখের সামনে, কারণ উপরের Spot Lightটা কি ভাবে বেঁকে গিয়েছিল। বাঘ আমাকে দেখল জ্যোতির্ম্ময় রূপে আর বাঘ নিজে রইল অন্ধকারে ডুবে। জন্তুটিকে দেখবার সুযোগও পেলাম না। এরপরই সে একটি হুংকার দিয়ে স্থানটি পরিত্যাগ করল। আলো দেখে ভড়কানো অভ্যাস না থাকলে বাঘ ঐ ভাবে পালাত না।

সারারাত বসেই থাকলাম। ভোরের দিকে কয়েকটা ভালুক এসে ঠিক আমার পিছনেই উইয়ের ঢিপিতে জোরে শোষণকার্য্য শুরু করে দিল। উইয়ের গর্ত্তে মনমত আহার পাওয়ায় আনন্দের উচ্ছ্বাস এমনভাবেই রুখে উঠল যে শোষণ কালীন যে যার নিজের অংশে ভাগ বাড়িয়ে নেবার জন্য হুড়োমুড়ি পড়ে গেল। আমার পাশেই ভাগবাঁটোয়ার গোল বাধায় হুড়োমুড়ির ধাক্কা এসে পড়তে লাগল আড়াল দেওয়া বাঁশের উপর। বাঁশগুলি একটার উপর আর-একটা হেলান দিয়ে বাঁধা হয়েছিল, অনবরত ধাক্কা লাগায় বাঁশের ঘরেও দোলা শুরু হয়ে গেল। বেশিক্ষণ এইভাবে দোলা চললে ভালুক আমাকে ছেড়ে দিত না। কপাল ভাল যে আহারের আকর্ষণ ওদের এমন ভাবেই অন্যমনস্ক করে রেখেছিল যে আমি ওদের অত কাছে থাকা সত্ত্বেও গোঁজ নেবার অবসর পায়নি।

বেশ খানিকক্ষণ পরে ভালুকের দল চলে গেল, তখন প্রায় সকাল হয়ে গিয়েছে। লোকদের অপেক্ষায় বসে থাকলাম, কারণ বাইরে থেকে ঠিক জায়গায় বাঁধন না খুললে সবকয়টি বাঁশ আমার উপরে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। যাক্, এবারেও বাঁচলাম।

অন্য ঘটনায় ফিরে আসি। মাচানেই বসেছিলাম তবে মাচান বাঁধা হয়েছিল বাবলাগাছের সরু ডালে, মাটি থেকে ৮।৯ ফুটের বেশী হবে না। বাঘ উল্টো পথে এলে আমার সঙ্গে শেকহ্যাণ্ড করতে চাইলে আপত্তি করার অবসর দেবে না। তবে মরা গরুটার সামনেই ছিল কাঁটাঝোপ, বড় মোটা পেরেকের মত কাঁটায় ভরা ঝোপ, বেশ অনেকখানি জায়গা জুড়ে গরু আর আমার মাঝে ব্যবধান সৃষ্টি করেছিল। কাঁটাঝোপের ত্রিসীমানায় বাঘ আসতে চায় না তাই সামনে থেকে আক্রমণের কোন ভয় ছিল না।

চুপচাপ বসে আছি হঠাৎ সামনের হাড় ভাঙ্গার শব্দ শুনলাম। বুঝলাম বাঘ এসেছে। ক্ষিপ্র গুলী চালানর অভ্যস্ত থাকায় বাঘকে খেতে দিয়ে, রয়ে সয়ে লক্ষ করে টিপ করার প্রয়োজন বোধ করিনি। তাই শব্দের সঙ্গে সঙ্গে Electric Torch টিপে দিলাম। দেখলাম, বাঘ আহারে বসেছিল আমারই দিকে মুখ করে। গুলী চলার সঙ্গে সঙ্গে আহত জানোয়ার সোজা লাফিয়ে উঠল প্রায় ৮।১০ ফুট উপরে, তারপরই শূন্য থেকে ধপ করে মাটিতে পড়ে গেল। ভাবলাম, গুলী কাজ করেছে; কিন্তু ভাবা কাজে এল না। বাঘ আবার লাফ দিল এবং কাটাবন পার হয়ে আমার মাচানের উপর এসে পড়ল। দুটো থাবাই তখন আমার পায়ের সামনে। সমস্ত মুখের গহ্বর দেখতে পাচ্ছিলাম, হয়ত তার হুঙ্কারের সঙ্গে কিছু লালাও আমার মুখে এসে পড়েছিল। আমি তখন হতভম্ব হয়ে গিয়েছি, বন্দুকের নল ঘোরাবার উপায় ছিল না। বাঘ কিন্তু মাচানে বেশীক্ষণ ঝুলতে পারল না কাঁটাবনের উপরেই আছাড় খেল, তারপর সেখান থেকে লাফের পর লাফ মেরে দূরে চলে গেল এবং কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই মনে হল কোন শক্ত জিনিষের সঙ্গে তার জোরে মাথা ঠুকে গিয়েছে। এরপর পরিচিত গোঙানির শব্দ শুনলাম, নিশ্চিন্ত হলাম বাঘ এখন চলৎশক্তিহীন, মৃত্যুর সঙ্গে বোঝাপড়া চালিয়েছে। কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই ঝড় উঠল বিকট শব্দ করে। কয়েকটি জোর ঝাঁকানিতে আমি যে মাচানে বসেছিলাম তার একটি ডাল দোফাল হয়ে গেল। প্রতিটি দমকা হাওয়ায় নাগরদোলার অভিজ্ঞতা

এক লাফে বাঘ মাচানের উপর এসে পড়ল।

সংগ্রহ করতে লাগলাম। একবার মাচান সমেত প্রায় মাটি ছুঁয়ে আবার উপরে উঠে যাচ্ছি, এই অবস্থায় Ready Trigger সহ ভরা বন্দুক তলায় পড়ে গেল। বন্দুকটি আমার নয়, আমার সঙ্গে যে শিকারী এসেছিলেন তাঁর। ডাল দোফালা হওয়ার সঙ্গে শিকারী মাটিতে না পড়লেও আমার কাছ থেকে সরে গিয়েছিলেন। নলের মুখ ছিল ঠিক আমার নীচেই। বন্দুকের পতন কালীন একটি কাঁটা Trigger-এ লাগলেই আমার অস্তিত্বকে অস্বীকার করতে হত, তবে সান্ত্বনা থাকত এইটুকু যে, বাঘ মেরে মরেছি। এমন কৃতিত্বকে কি বাজে বলা চলে ?

শিকারে বিপদ কি কেবল বাঘ, ভালুকের সংস্পর্শে আসাতেই শেষ ? সময় মত সাবধান হতে পারলে ওদের কাছ থেকে পার আছে, কিন্তু সাপের সঙ্গে গা ঘেঁষাঘেঁষি হলে পরিত্রাণ নেই, বিশেষ করে রাজগোক্ষুর, কাল কেউটে, করায়ত বা চিতি বোরা। মানুষ তাদের শান্তিভঙ্গ করলে আর রক্ষা নেই। রাজগোক্ষুর বা কাল কেউটের কথা ছেড়ে দিই, ওদের অনেক সময় বড় আকৃতির জন্য দেখতে পাওয়া যায় ; কিন্তু চিতি বোরা বা করায়তের বাচ্চা কয়েকটা নুড়ি পেলেই তার তলায় বেমালুম আত্মগোপন করে ফেলে।

এবারকার কাহিনী এই বিষাক্ত জীবদের নিয়ে। লেপার্ড শিকারে এসেছিলাম, সঙ্গে ছিলেন একজন নব দীক্ষিত শিকারী, ইতিপূর্বে কখনও তিনি বন্দুক নিয়ে জঙ্গলে ঢোকেন নি। আমি এদিকে আসছি শুনে বন্ধুবর একেবারে সাহেবী মল্ল বেশে শিকারের তাঁবু থেকে বেরিয়ে এলেন, দেহে জড়িয়ে থাকল গাঢ় সবুজ রঙের বুশশার্ট, নিম্নাঙ্গে হাফপ্যান্ট. তারও তলায় দেখা গেল ব্যাণ্ডেজের প্রথায় বাঁধা পট্টি। পট্টির তলায় জবরদস্ত মোটা চামড়ার বুট। প্রতি পদক্ষেপেই জুতোর মচ্‌মচ্‌ শব্দ যেন জঙ্গলের জানোয়ারদের জানিয়ে দিতে চায়,—"তফাৎ যাও, তফাৎ যাও।" শিকারীর আগমন বার্তা এইভাবে প্রচার হওয়ায় লেপার্ড আমাদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলা শুরু করে দিল। প্রথম দর্শনেই তার আকার আন্দাজে বুঝেছিলাম, যে তার প্রাপ্তবয়স্ক হতে এখনও অনেকদিন সময় আছে। শিশু বয়সে হয়ত মা পরিত্যাগ করায় তার নিজের সাবধানতা সম্বন্ধে উপযুক্ত ভাবে চালাক হয়ে উঠতে পারেনি। তাই আমরা ওর পিছু নেওয়ায় চোখে চোখ পড়লেই একটু পালিয়ে কাছেই যে কোন ঝোপ পেলেই তার মধ্যে ঢুকে পড়ছিল। এই পালাবার ব্যাপারে বুঝলাম, বন্ধুর জুতোই যত সব গণ্ডগোল বাধিয়েছে।

সারা সকাল ঘুরতে ঘুরতে দুপুর পার হয়ে গেল। দুজনের মধ্যে কেউই লেপার্ডকে জুৎসইভাবে বন্দুকের সামনে পেলাম না। ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। পা থেকে কেডস্ দুটো ফেলে দিয়ে বাবু হয়ে ছায়ার তলায় একটি বড় পাথরের উপর দুজনে বসে পড়লাম। বসার সুবিধা পাওয়ায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলাম, কিন্তু সহজলব্ধ আরামটি বন্ধুবর বুট ও পট্টির বাঁধন থাকায় ভোগে লাগাতে পারলেন না. গত্যন্তরে পা ঝুলিয়েই বসতে হল ; পায়ের চারধারে ডিমের আকারের ছোট বড় পাথরের নুড়ি। কোন কাজ না থাকায় বন্ধুবর ঝোলান পা-কে ঠক্ ঠক্ শব্দ করে আমরা যে পাথরে বসেছিলাম সেইটায় ঠুকতে লাগলেন। তাছাড়া বুটের ঠোক্করে পায়ের তলার নুড়িগুলি চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়তে লাগল। বেশীক্ষণ এই অস্থিরতার আরাম বন্ধুবরকে ভোগ করতে হয়নি। আমি তাঁর পায়ের দিকে তাকাতে দেখি, ফুট খানেক লম্বা একটি সাপ বন্ধুর পায়ের দোলার সঙ্গে একটু দূরে মাথা তুলে দুলছে। হাঁ-করা মুখ। ছোট্ট হলে কি হয়, মুখের তুলনায় দাঁত দুটি বেজায় বড়। বন্ধু নিশ্চয়ই এ দৃশ্যটি দেখেননি। সাপের নজর বুটের দিকে থাকায় আমি ধীরে একটি বড় নুড়ি তুলে নিলাম ; তারপর বেশ জোরেই নুড়িটি সাপের মাথা লক্ষ্য করে ছুঁড়লাম। কাজ হল ; বিষধরের মাথা থেঁৎলে গেল।

ইচ্ছা করেই 'সাপ সাপ' করে চিৎকার করিনি।

ঝড়ের বেগে মাচানের ডাল দোফলা হয়ে গেল।

যদি এরূপ সাবধানতার বাণী ভদ্রলোক শুনতেন, তাহলে তাড়াহুড়ায় দাঁড়াবার চেষ্টা করলেই সাপ ছোবল মারায় কোন অসুবিধা বোধ করত না। যে সাপটি মারা পড়ল, সেটি কলায়ত। এই জাতীয় সাপের প্রেম অতি সাঙ্ঘাতিক সহজে এদের কেউ কখনও বেজোড় হতে দেখেনি। বন্ধুকে বললাম -"এখান থেকে উঠে পড়, আমার মনে হয় জোড়ের সাপ তোমারই পায়ের তলায় কোথাও লুকিয়ে আছে।" মরা সাপ এবং বাঁচা সাপের অস্তিত্ব অত নিকটে থাকায় আমার বন্ধুর মুখশ্রী ভয়ে কিরকম হয়েছিল তার বর্ণনা দেবার চেষ্টা করব না। তবে এইটুকু বলতে পারি, তিনি কর্ণ ও নাসিকা মর্দ্দনের পর তাঁহার ইষ্ট দেবতাকে স্মরণ করে ও আমাকে সাক্ষী রেখে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন এই বলে যে—"জীবনে আর কখনও শিকারে আসব না।"

এরপরেও বহু প্রকারের বিপদের কথা বলার ইচ্ছা ছিল। হয়ত ভবিষ্যতে কোনদিন সুবিধা পেলে বলবও।

কংগ্রেস স্মৃতি

(সপ্তত্রিংশ অধিবেশন—গয়া—১৯২২

শ্রীগিরিজামোহন সান্যাল

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

(৫)

গত কয়েকদিন ধরে উভয়দলের নেতাদের মধ্যে আপোষের চেষ্টা চলে আসছিল কিন্তু সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হল। তখন স্বরাজ্য পার্টীর নেতাগণ দেশবন্ধু দাশ, পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু, বিঠলভাই প্যাটেল, নরসিংহ চিন্তামন কেলকার এবং হাকিম আজমল খাঁ একটি যুক্ত বিবৃতি প্রকাশ করে জানালেন যে আপোষের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছে, এখন এই কাউন্সিল প্রবেশের প্রশ্ন নির্ভর করছে বিষয় নির্ব্বাচনী সভা ও কংগ্রেসের ভোটের উপর।

প্রথম দিনের অধিবেশনের পর সন্ধ্যার সময় বিষয় নির্বাচনী সভা আহুত হয়। সেখানে মৌলানা মহম্মদ আলি কাউন্সিল প্রবেশ সম্বন্ধে একটি আপোষজনক প্রস্তাব উপস্থাপিত করেন। প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ, শিবপ্রসাদ গুপ্ত প্রভৃতি নেতাগণ।

বিষয় নিবাচনী সভায় উপস্থিত ছিলেন দর্শক হিসাবে নো-চেঞ্জার দলের প্রতিনিধি (বাতিল) শ্রীমতী মোহিনী দেবী। অধিবেশনের পর আমি তাঁকে নো-চেঞ্জারদের ক্যাম্পে পৌছে দিতে যাই। আমাকে দেখামাত্র নো-চেঞ্জার প্রতিনিধিরা আমাকে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করে নানাপ্রকার উক্তি করল। আমি সেগুলি নীরবে হজম করে ফিরে এলাম।

(৬)

১৬ই সেপ্টেম্বর বেলা ১টার সময় কংগ্রেসের দ্বিতীয় দিনের অধিবেশন আরম্ভ হল। যথারীতি শোভাযাত্রাসহ সভাপতি মশায় প্যাণ্ডেলে প্রবেশ করে ডায়াসে তাঁর আসনে উপবেশন করলেন।

এদিন সভায় উপস্থিত দর্শকের সংখ্যা পূর্ব্বদিন অপেক্ষা বেশী ছিল।

দেশবন্ধু দাশ যখন প্যাণ্ডেলে প্রবেশ করলেন তখন বাংলার প্রতিনিধিগণ সহর্ষ জয়ধ্বনি দ্বারা তাঁকে অভ্যর্থনা জানাল।

প্রথমে কয়েকজন মহিলা সমবেত কণ্ঠে একটি জাতীয় সঙ্গীত গাইলেন।

তারপর সভাপতি মশায়ের নির্দ্দেশে মৌলানা মহম্মদ আলী তাঁর প্রস্তাব উপস্থিত করলেন।

এই প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে, এই কংগ্রেস অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের নীতি পুনরায় স্বীকার করে এই মত প্রকাশ করছে যে, যে-সকল কংগ্রেস সদস্যের কাউন্সিল প্রবেশ সম্বন্ধে ধর্ম্ম বা বিবেক অনুসারে কোন আপত্তি নেই তাঁদের আগামী নির্বাচনে কাউন্সিলে সদস্যপদ প্রার্থীরূপে দাঁড়ানোর ও ভোট দেওয়ার স্বাধীনতা থাকবে এবং সেই কারণে এই কংগ্রেস কাউন্সিল প্রবেশের বিরুদ্ধে সর্ব্বপ্রকার প্রচারকার্য্য স্থগিত রাখছে এবং সঙ্গে সঙ্গে যথাসম্ভব সত্বর স্বরাজ অর্জনের জন্য তাঁদের মহান্ নেতা মহাত্মা গান্ধীর গঠনমূলক কর্ম্মসূচী চালিয়ে যাওয়ার জন্য এই কংগ্রেস সকল কংগ্রেস কর্মীকে তাঁদের চেষ্টা দ্বিগুণিত করতে আহ্বান করছে।

প্রস্তাব উপস্থিত করে মৌলানা সাহেব অন্যান্য কথার পর বললেন যে এই আপোষের প্রস্তাব দ্বারা তিনি উভয় পক্ষের মধ্যে বিবাদ বন্ধ করতে চান।

দেশের বর্তমান পরিস্থিতি সম্বন্ধে তিনি জানান যে তিনি এবং সন্ত কারামুক্ত বন্ধুগণ অত্যন্ত বিস্মিত হয়েছেন এই দেখে যে, তাঁরা যে সবুজ বাগান রেখে গিয়েছিলেন তা ধ্বংস হয়েছে। তাঁর জেলে যাওয়ার পর দু' বৎসরের মধ্যে খিলাফৎ, আদালত বয়কট বা অন্যান্য কর্মসূচী সম্বন্ধে সামান্যমাত্রও উন্নতি হয়নি।

তিনি উর্দ্দুতে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। ডাঃ আনসারী বা মৌলানা আবুল কালাম আজাদের উর্দ্দুর মত অতটা দুর্বোধ্য না হলেও অনেকের পক্ষে তা বোঝা দুষ্কর হচ্ছিল। বাংলার প্রতিনিধিদের তরফ থেকে তাঁকে ইংরাজিতে ভাষণ দেওয়ার অনুরোধ করে একটি 'চিট' দেওয়া হল। 'চিট' পেয়ে তিনি বাংলার প্রতিনিধিদের হিন্দুস্থানী শিখতে উপদেশ দিলেন।

মৌলানা সাহেব জানালেন যে কাউন্সিল প্রবেশের নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হচ্ছে এই শর্তে যে স্বরাজ্য দল পারস্পরিক সহযোগিতার জন্য কাউন্সিলে প্রবেশ করছেন না। যাচ্ছেন, গভর্ণমেণ্ট যে দাবি করেন যে তাঁদের কাজে ভারতের নাগরিকগণের অধিকাংশের সমর্থন আছে সেই দাবি থেকে তাঁদের বঞ্চিত করতে।

এরপর মৌলানা সাহেব তাঁর প্রস্তাবের সমর্থনে এক মোক্ষম অস্ত্র ব্যবহার করলেন। তিনি জানালেন যে জেলে আবদ্ধ মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে তাঁর আত্মিক বলে ও নিগূঢ় বেতার-বার্ত্তায় কথা-বার্তা হয়েছে। বিষয় নির্বাচনী সভায় বলেছিলেন "by a process of soul force and by some mysterious soul force) এবং তিনি মহাত্মাকে "টেলিপ্যাথিক কল" দ্বারা জানিয়েছেন যে তিনি যদিও পূর্ণ অসহযোগে বিশ্বাসী তথাপি দেশের বর্তমান অবস্থায় স্বরাজ্য দলের কাউন্সিলে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া কর্তব্য এবং দেশের স্বার্থের জন্য যদি প্রয়োজন হয় তা হলে কাউন্সিল বয়কটের কর্ম্মসূচী পরিবর্তন করতে দ্বিধা না করার জন্য তিনি মহাত্মা কর্তৃক আদিষ্ট হয়েছেন।

এই অপূর্ব্ব কথা শোনামাত্র অধিকাংশ প্রতিনিধি ও শ্রোতৃমণ্ডলী "মহাত্মা গান্ধীকী—জয়" ধ্বনি দিয়ে উঠল। সুতরাং প্রস্তাব পাশ করা সম্বন্ধে আর কোন সংশয়ই রইল না।

এই প্রস্তাব সমর্থন করলেন পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, ডঃ সইফুদ্দিন কিচলু, বদরুদ্দিন তায়েবজী ও শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু।

এমন সময় সভাপতি বাইরে যাওয়ায় কোণ্ডা ভেঙ্কাটাপ্পায়া সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ, বাবু শিবপ্রসাদ গুপ্ত, ফজলুল রহমন ও বরদাচারী।

মাদ্রাজের বরদাচারী প্রস্তাবের বিরোধিতা করতে উঠে বললেন যে এই আপোষের প্রস্তাব গৃহীত হলে আগামী কাঁকিনাড়া কংগ্রেসের একই মাত্র আলোচ্য বিষয় হবে কাউন্সিল প্রবেশের কর্ম্মসূচী এবং এর ফলে কংগ্রেস দাশ-নেহেরু কংগ্রেসে পরিণত হবে যাতে মৌলানা মহম্মদ আলীর মত লোকের স্থান থাকবে না।

অধিকাংশের ভোটে প্রস্তাব গৃহীত হওয়ায় সেদিনের মত অধিবেশনের পরিসমাপ্তি হল।

(৭)

১৬ই তারিখে সন্ধ্যার পর বিষয় নির্ব্বাচনী সমিতির সভা আরম্ভ হল। এই সভায় প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল—আইন অমান্য আন্দোলন।

ডঃ কিচলু আইন অমান্য আন্দোলন চালানোর জন্য কয়েকজন বিশিষ্ট নেতাকে নিয়ে একটি কমিটী গঠন করার প্রস্তাব করেন। জর্জ যোসেফ প্রস্তাবের বিরোধিতা করে বলেন যে প্রস্তাবটী কার্য্যকর করা যাবে না। পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু মন্তব্য করেন যে যদিও তিনি যথাসম্ভব শীঘ্র আইন অমান্য বাঞ্ছনীয় মনে করেন তথাপি তাঁর আশঙ্কা যে এই প্রকার বৃহৎ কমিটীর কোন অধিবেশনই হবে না। যদিও বা অধিবেশন হয় সেখানে ঐকমত্য হবে না এবং যদিও ঐকমত্য হয় তা হলেও তা কার্য্যে পরিণত করা যাবে না।

বোধরাজ .লতানের হিন্দুদের প্রেরিত একটী টেলিগ্রাম উল্লেখ করে বললেন যে মুলতানের হিন্দুরা আইন

অমান্য আন্দোলনের কর্মসূচীতে জাজিরাত-উল-আরবের উল্লেখ করার বিরোধী। তিনি আরও বললেন, এখন জনগণের মনোভাবের এমন পরিবর্তন হয়েছে যে বর্তমানে আইন অমান্য কোনক্রমেই কার্য্যকর হবে না।

ডাঃ সত্যপালও খুব জোরের সহিত এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ প্রস্তাব সমর্থন করে বললেন যে প্রস্তাবটা কেবল স্বরাজ অর্জনের জন্য করা হোক। এই প্রস্তাব থেকে মহাত্মা গান্ধীর কারামুক্তির উদ্দেশ্য বাদ দিতে হবে কারণ তিনি নিশ্চিত বলতে পারেন যে মহাত্মা গান্ধী তাঁর মুক্তি এই প্রস্তাবের প্রধান ইস্যু স্বরূপ গণ্য করতে চাইবেন না।

পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন।

হাকিম আজমল খাঁ এই প্রস্তাব সমর্থন করে বললেন যে তিনি স্বীকার করেন যে, বর্তমানে হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যই সবচেয়ে বড় ইস্যু কিন্তু তিনি মনে করেন যে হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যের চেষ্টা এবং আইন অমান্য একই সঙ্গে চালানো উচিত। তিনি এই প্রস্তাব থেকে জাজিরাত-উল-আরবের উল্লেখ বাদ দিতে চান না কারণ বর্তমানে মুসলমান সম্প্রদায়ের সকলেই স্বরাজ সম্বন্ধে আগ্রহান্বিত নন, সুতরাং তাদের সমর্থনের জন্য জাজিরাত-উল্-আরবের ইস্যু প্রস্তাবের অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন।

হরি সর্বোত্তম রাও হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্কের উন্নতি না হওয়া পর্য্যন্ত এই প্রস্তাব স্থগিত রাখার কথা বললেন। কালেশ্বর রাও হরি সর্বোত্তম রাওকে সমর্থন করলেন।

পুরুষোত্তম দাস ট্যাণ্ডন বললেন গয়া কংগ্রেসের প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রস্তাব অপ্রয়োজনীয়।

এই সময় একজন সদস্য ডঃ কিচলুকে প্রস্তাব প্রত্যাহার করতে অনুরোধ জানিয়ে বললেন যে এই প্রস্তাবের দরুণ কংগ্রেসের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হতে পারে, অতএব প্রস্তাবটা না তোলাই সমীচীন।

তিলক অভিমত প্রকাশ করলেন যে যখন হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য স্থাপন এবং অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের উপায়েরই অভাব তখন আইন অমান্য আরম্ভ করা অচিন্ত্যনীয়।

বল্লভভাই প্যাটেল ও প্রফেসর ইন্দ্র প্রস্তাব সমর্থন করলেন।

আবদুল রহমান ও পাঞ্জাবের ফিরোজ উদ্দিন কেবল মাত্র নামে প্রস্তাব গ্রহণ করার নিন্দা করলেন।

ভেঙ্কটরাম প্রস্তাব সমর্থন করলেন।

নেকিরাম বললেন যে প্রস্তাবটা অনাবশ্যক।

পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু এই প্রকার মতভেদের দরুণ আগামীকাল পর্য্যন্ত প্রস্তাবের আলোচনা মুলতুবি রাখার জন্য বললেন যাতে ডঃ কিচলু অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে পরামর্শ করে সকলের গ্রহণযোগ্য একটা প্রস্তাব প্রণয়ন করতে পারেন।

গৌরীশঙ্কর মিশ্র খুব জোরালো ভাষায় প্রস্তাব সমর্থন করলেন। ফজলুল রহমান, প্রিন্সিপ্যাল গিডোয়ানী ও মৌলানা মহম্মদ আলী প্রস্তাব সমর্থন করলেন।

এফ সন্তানম্, বরদাচারী, তেজাসিং, জ্ঞানী শেরসিং প্রভৃতি সদস্যেরাও এই আলোচনায় যোগ দিলেন।

প্রায় ৫ ঘণ্টা আলোচনার পর রাত্রি ১ টায় সময় প্রস্তাব গৃহীত হল।

তারপর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পণ্যবর্জন ও হিন্দু-মুসলমান সম্বন্ধে দুটা প্রস্তাব আলোচনান্তে গৃহীত হল।

॥ ৮ ॥

১৭ই সেপ্টেম্বর বেলা ২টার সময় কংগ্রেসের তৃতীয় দিনের অধিবেশন আরম্ভ হল।

পূর্ব পূর্ব দিনের মত সভাপতি মশায় শোভাযাত্রা সহ প্যাণ্ডেলে প্রবেশ করে আসন গ্রহণ করার পর জাতীয় সঙ্গীত কয়েক জন মহিলা কর্তৃক গীত হল।

সঙ্গীতের পর সভার কার্য্য শুরু হল।

প্রথমে সভাপতি মশায় স্বয়ং দুইটি প্রস্তাব উপস্থিত করলেন—

প্রথম প্রস্তাবে প্রধান কংগ্রেসকর্মী ও সমাজসংস্কারক পণ্ডিত রামভুজ দত্ত চৌধুরীর পরলোকগমনে গভীর শোক প্রকাশ করে তাঁর পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা প্রকাশ করা হল।

দ্বিতীয় প্রস্তাবে জাপানে ভয়ানক দুর্ঘটনার জন্য জাপানের জনগণের জন্য গভীর শোক প্রকাশ কংগ্রেসের পক্ষ থেকে করা হল এবং এশিয়ার এই প্রাতৃগণের প্রতি সহানুভূতির চিহ্নস্বরূপ জাপানী জনগণের কষ্ট লাঘবের জন্য সাহায্য দান করতে কংগ্রেস কর্তৃক দেশের জনসাধারণের নিকট আবেদন জানানো হ'ল।

সকলে দণ্ডায়মান হয়ে প্রস্তাব দুটি গ্রহণ করলেন।

এরপর সভাপতি মশায় ডঃ কিচলুকে তাঁর প্রস্তাব উপস্থিত করতে আহ্বান করলেন।

ডঃ কিচলু আইন অমান্য আন্দোলন সম্বন্ধে প্রস্তাব সভায় পেশ করলেন।

এই প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে যে স্বরাজ মহাত্মা গান্ধী ও অন্যান্য রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির গ্যারাণ্টি দিতে পারে সেই স্বরাজ দ্রুত অর্জনের জন্য এবং জাজিরাত-উল্-আরবের স্বাধীনতা ও পাঞ্জাবের অত্যাচারের সন্তোষজনক মীমাংসার জন্য অবিলম্বে আইন অমান্য আন্দোলন পরিচালন করতে এবং অনুরূপ ভাবে প্রাদেশিক ও আঞ্চলিক আন্দোলন চালানো সম্বন্ধে উপদেশ ও নির্দেশ দিতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে নিয়ে একটি কমিটী গঠন করা হোক :—

সি. আর. দাশ. মৌলানা মহম্মদ আলী, বল্লভভাই প্যাটেল, রাজেন্দ্র প্রসাদ, মঙ্গল সিং, ডঃ সইফুদ্দিন কিচলু, পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু ও বিঠলভাই প্যাটেল।

এই প্রস্তাব উত্থাপন করে অন্যান্য কথার পর ডঃ কিচলু বললেন, নেতাগণের জেল হওয়ার পর যে সকল ব্যক্তি বরাবর গভর্ণমেণ্টের পক্ষাবলম্বন করে এসেছে এবং জঙ্গী শাসনের সময় যারা ফরিয়াদী পক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছে বর্তমান সংগ্রামে তারাই উভয় সম্প্রদায়ের নেতা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এটা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, জনসাধারণের উপর কংগ্রেসের প্রভাব লোপ পেতে দেওয়া হয়েছে! এই প্রভাব পুনরায় অর্জনের জন্য একটি কর্মসূচী প্রস্তুত করা প্রয়োজন। দেশকে পুনরায় একতাবদ্ধ করতে ১৯২১ সালে দেশে যে উদ্দীপনা দেখা দিয়েছিল জনসাধারণের মধ্যে অবিলম্বে সেই উদ্দীপনা সৃষ্টি করতে হবে। এ বিষয়ে তিনি শিখ ও মুসলমানদের একাংশের সমর্থনের আশ্বাস পেয়েছেন।

বল্লভভাই প্যাটেল এই প্রস্তাব সমর্থন করলেন।

মার্শাল ল' আমলের ডঃ কিচলুর সহকর্মী ডাঃ সত্য পাল এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে বললেন যে অতীতে বড় বড় প্রতিশ্রুতি অপূরনের জন্য কংগ্রেসের উপর জনসাধারণের বিশ্বাস হ্রাস পেয়েছে। তিনি এই রকম ভুলের পুনরাবৃত্তির বিরুদ্ধে কংগ্রেসকে সতর্ক করলেন।

হাবিবর রহমন প্রস্তাব সমর্থন করতে উঠে বললেন যে তিনি ডাঃ সত্যপালের সহিত একমত নন। তিনি জানালেন যে পাঞ্জাব বরাবরের মতই প্রস্তুত আছে।

মৌলভী মনজর আলী প্রস্তাবের বিরোধিতা করে বললেন যে হিন্দু মুসলমানের ঐক্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত এই প্রস্তাব মুলতুবি রাখা হোক।

লালা দুনী চাঁদ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে বললেন এবং মহম্মদ নইম প্রস্তাব সমর্থন করলেন।

দেওয়ান চমন লাল খুব জোরের সহিত প্রস্তাব সমর্থন করে বললেন যে আইন আদালত ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে অসহযোগিতা করে স্বরাজ অর্জন করা যাবে না। এ কেবল প্রত্যক্ষ সংগ্রাম করেই লাভ করা যায়। সমস্ত পৃথিবীময় এই পন্থাই সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। অনেকে বলেছেন যে আইন অমান্যের জন্য পাঞ্জাব প্রস্তুত নয়। তিনি জানতে চান গুরুকা-কা-বাগ কি পাঞ্জাবের অন্তর্গত নয় বা সেখানে আইন অমান্য সাফল্যমণ্ডিত হয় নি?

মৌলানা মহম্মদ আলী টিপ্পনী কাটলেন—হাঁ। কিন্তু তা হিন্দু বা মুসলমান দ্বারা হয় নি।

চমন লাল উত্তর দিলেন—ভগবানের অভিপ্রায়ে এমন দিন আসবে যখন হিন্দু ও মুসলমান ভাইরা শিখ ভাইদের সঙ্গে যোগ দেবে।

কেন্দ্রীয় শিখ লীগের সভাপতি সর্দার মঙ্গল সিং প্রস্তাব সমর্থন করে বললেন যে কংগ্রেসের নীতি সম্বন্ধে ভুল বোঝাবুঝি দূর করার জন্য এই প্রস্তাবের প্রয়োজনীয়তা আছে।

মালকা সিং প্রস্তাবের বিরোধিতা করে অন্যান্য কথার পর ব্যঙ্গের সঙ্গে বললেন, তাঁদের প্রস্তুতির পরিচয় এতেই বোঝা যাবে যে প্যাণ্ডেলের অভ্যন্তরে ব্যবহৃত কাপড়। স্বেচ্ছাসেবকগণের পোশাক এবং তাদের ব্যাজ পর্যন্ত সম্পূর্ণ খদ্দরে প্রস্তুত নয়।

এরপর মৌলানা মহম্মদ আলী সুদীর্ঘ বক্তৃতা দিয়ে প্রস্তাব সমর্থন করলেন।

গোপীচাঁদ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিলেন এবং এই প্রসঙ্গে লালা লাজপত রায়ের অভিমত "দেশ আইন অমান্যের জন্য প্রস্তুত নয়" তা শুনিয়ে দিলেন।

বিঠলভাই একটি সংশোধনী প্রস্তাব উপস্থিত করলেন—

এই প্রস্তাবে বলা হয়েছে প্রস্তাবিত কমিটী অল-ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটী ও কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর কর্তৃত্বাধীনে কাজ করবে এবং প্রদেশগুলির স্থানীয় প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলার স্বাধীনতা থাকায় স্থায়ী কমিটীর পক্ষে স্বাধীন আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষমতা ছাড়াও প্রাদেশিক ও আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠানগুলির কার্য্যাবলী সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়ার ও নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা থাকবে।

আসফ আলী এই প্রস্তাব সমর্থন করলেন।

আলোচনা অসমাপ্ত রেখে সভা এক ঘন্টার জন্য মুলতুবি হল।

সভার পুনরায় অধিবেশনের সময় সভাপতি মশায়ের অনুপস্থিতিতে সভাপতির আসন গ্রহণ করলেন কংগ্রেসের অন্যতম ভূতপূর্ব সভাপতি পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু।

সভার কাজ আরম্ভ হলে দাশ সাহেব উঠে বললেন, কংগ্রেসের বর্তমান সংবিধান অনুসারে সমস্ত কমিটীই কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধীন। সুতরাং প্যাটেল সাহেবের সংশোধনী প্রস্তাবের কোন প্রয়োজন নেই।

সভাপতির আসন থেকে পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু দাশ মশায়ের অভিমত সমর্থন করে আসফ আলীকে জানালেন যে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটী সবার উপর।

দাশ মশায়ের আপত্তির পর সংশোধনী প্রস্তাব প্রত্যাহৃত হল।

এরপর শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু তাঁর অপূর্ব ভাষণে প্রস্তাব সমর্থন করলেন।

তারপর পণ্ডিত মদন মোহন মালবীয় সুদীর্ঘ বক্তৃতা দিয়ে প্রস্তাবের বিরোধিতা করলেন। তিনি প্রতিনিধিবর্গকে স্মরণ করিয়ে দিলেন যে যখন মহাত্মা গান্ধী নেতৃত্ব নিয়ে অন্দোলন পরিচালনা করছিলেন, যখন খিলাফতের প্রশ্নে ভারতের প্রত্যেক মুসলমান একযোগে দাঁড়িয়েছিলেন, যখন গভর্ণমেণ্টের অন্যায় ও নিষ্ঠুর অত্যাচারের বিরুদ্ধে হিন্দু মুসলমানদের পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন তখনও মহাত্মা গান্ধী আগ্রাসী আইন অমান্য আন্দোলন চালান নি। মহাত্মাজী ঘোষণা করেছিলেন যে আইন অমান্য একটি বিপজ্জনক অস্ত্র। সেই জন্য মহাত্মা সর্বদাই অত্যন্ত সতর্কতার সহিত অগ্রসর হতেন। বর্তমানে অবস্থা কী? তাঁরা দুর্বল হয়ে পড়েছেন। তাঁদের নিজেদের মধ্যে বিদ্রোহ দেখা দিয়েছে। এ সময় তিনি এই প্রস্তাবের সমীচীনতা সম্বন্ধে সন্দেহ করেন। তিনি এই প্রস্তাব বিপজ্জনক ও অনাবশ্যক মনে করেন। তার পর তিনি গয়া কংগ্রেসের প্রস্তাবের উল্লেখ করে বললেন যে ঐ প্রস্তাব এখনও বলবৎ আছে। তিনি প্রতিনিধিদের নিকট আবেদন করলেন যেন তাঁরা এই প্রস্তাবের সহিত মহাত্মা গান্ধীর নাম যুক্ত করে সেই সম্মানিত নাম নিয়ে খেলা না করেন।

বক্তৃতান্তে তিনি যখন মঞ্চ থেকে অবতরণ করলেন তখন জনৈক প্রতিনিধি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, যদি অর্থ ও স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ সম্বন্ধে গয়া কংগ্রেসের কর্ম-সূচী সাফল্য লাভ করে তা হলে তিনি আইন অমান্য আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করবেন কি না? পণ্ডিতজী প্রত্যুত্তরে বললেন যে তিনি বিশ্বাস করেন যে আইন অমান্য একটি বড় লড়াই। তার জন্য অস্ত্রসমূহ প্রস্তুত রাখতে হবে এবং উপযুক্ত সময়ে তা শুরু করা হবে। তিনি সকলকে আশ্বাস দিলেন যে যদি সেই সময় আসে তা হলে তিনি আইন অমান্য আন্দোলনে কেবল যোগদানই করবেন না। তিনি সর্বপ্রথম একে কার্য্যে পরিণত করবেন। তাঁর এই উক্তিতে প্রবল হর্ষধ্বনি হল।

এরপর বোধরাজ একটি সংশোধনী প্রস্তাব দ্বারা মূল প্রস্তাবের উদ্দেশ্য স্বরাজ অর্জনে সীমাবদ্ধ রাখার কথা বললেন।

প্রস্তাব অগ্রাহ্য হল।

তারপর ডঃ কিচলুর মূল প্রস্তাব ভোটাধিক্যে গৃহীত হল।

পরবর্তী প্রস্তাব সভাপতি মশায় স্বয়ং উপস্থিত করলেন।

এই প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে ভারত গভর্ণমেন্ট কর্তৃক নাভার মহারাজা রিপুদমন সিং মানবেন্দ্র বাহাদুরকে জোর করে সিংহাসনের দাবি ত্যাগ করানো অন্যায় বেআইনী এবং ভারতীয় রাজন্যবর্গের সম্বন্ধে একটি নজির সৃষ্টি করা হয়েছে, এই কারণে এই কংগ্রেস ভারত-গভর্ণমেন্টের কাজকে তীব্র ভাবে নিন্দা করছে। যে গুরুতর অবিচার তাঁর প্রতি করা হয়েছে তজ্জন্য এই কংগ্রেস মহারাজা সাহেবকে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করছে।

প্রস্তাব সর্বসম্মতি ক্রমে গৃহীত হল।

এই প্রস্তাবের পর একটি জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া হয়। তারপর সেদিনের মত সভার অধিবেশন শেষ হয়। পরবর্তী অধিবেশন বেলা ২টায় আরম্ভ হবে ঘোষণা করা হল।

ক্রমশঃ

ফিল্ম-পরিচালকের স্বপ্নভঙ্গ

পরিমল গোস্বামী

॥ এক ॥

খবরের কাগজে মাঝে মাঝে সিনেমাছবির সমালোচনা পড়ি। তাতে দেখতে পাই কোনো কোনো ছবির কাহিনীতে সঙ্গতি খুঁজে পাওয়া যায় না, এই কথাটাই সমালোচকেরা বিদ্রূপ করে বলে থাকেন। কিন্তু আমি বুঝতে পেরেছি, যে সব পরিচালক সত্যনিষ্ঠ এবং কোনো অবস্থাতেই সত্যকে ছাড়তে রাজি নন, তাঁরা সবাই নিজ নিজ আদর্শে নির্ভয়ে এগিয়ে যান, এবং এই কারণেই তাঁরা অবুঝ সমালোচকের কাছে তিরস্কার লাভ করেন, যদিও তা তাঁরা গ্রাহ্যই করেন না। আক্রমণটা সবই প্রায় হিন্দি ছবির বিরুদ্ধে। হিন্দি পাথর যদি জলে ভাসে, হিন্দি আগুন যদি বরফশীতল বোধ হয়, তবে তা স্বীকার করতে এত দ্বিধা কেন?

আমি নিজে সম্প্রতি একখানা বাংলা ছবির পরিচালক হতে চলেছি, এবং আমি দেখিয়ে দিতে চাই যে বাংলা ছবিও কাউকে গ্রাহ্য না করে সত্যনিষ্ঠ হতে জানে। কিন্তু তার আগে যে গল্পটা সাময়িক ভাবে বন্ধ রাখতে বাধ্য হয়েছিলাম, তার কাহিনীটার একটুখানি পরিচয় দিই। সে একটি প্রেমের গল্প। তার আরম্ভটা ছিল এই রকম: পুরীর সমুদ্রতীরে এক যুবকের সঙ্গে এক যুবতীর দেখা। দেখামাত্র যুবক বলল, 'তোমাকে আমার খুব ভাল লেগেছে।' যুবতী বলল, 'আমারও, তোমাকে।' এর আধঘণ্টার মধ্যে পুরুত ডেকে বিবাহকার্য্য সমাধা হল। তারপর অনেক ঘটনা। কিন্তু সে সব কথা থাক। কিন্তু তবু দুজনের বিয়ের আগে দুজনের আর দুটি মাত্র কথা হয়েছিল, তা বলে দেওয়াই ভাল, নইলে ভূমিকাটা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। যুবক বলেছিল 'তুমি আকাশ', যুবতী বলেছিল 'তুমি সমুদ্র'। আকাশ আর সমুদ্র পুরীর দিগন্তে সুন্দর ভাবে মিলেছে, এ তারই ইঙ্গিত।

কিন্তু এতটাই যখন বলা হল, তখন আর একটুখানির জন্য ভূমিকাটা বাকা রেখে লাভ কি। ওদের তো বিয়ে হয়ে গেল, আচ্ছা, শেষ করেই ফেলি গল্পটা। বিয়ের মাসখানেকের মধ্যে ওদের সামান্য একটা ব্যাপারে মনান্তর ঘটল। এবং যে দিন এই দুর্ঘটনাটা ঘটল, সেই দিন থেকে ওদের কথা বন্ধ হয়ে গেল, এবং দুজন দুদিকে নিরুদ্দেশ যাত্রা করল। কে কোথায় যে চলে গেল তা কেউ জানতে পারল না।

এরপর থেকে দুজনের মনেই ভীষণ অনুতাপ জাগল, এবং দুজনে দুজনকে খুঁজতে বেরিয়ে গেল। ফিলমের বারো আনা ভাগ এই খোঁজার কাজেই ব্যয় হবে। এই উপলক্ষে ভারতবর্ষের নানা দর্শনীয় স্থানও দর্শকেরা দেখে মাঝে মাঝে হাততালি দেবে। ওরা দুজনে ক্রমে বেশি বেশি অনুতপ্ত হচ্ছে, আর বেশি বেশি উৎসাহের সঙ্গে খুঁজছে।

এরপর চরম অনুতপ্ত হয়ে পাঁচ বছর ধরে (এটাও পঞ্চবর্ষ পরিকল্পনা!) খুঁজে বেড়ানোর পর দার্জিলিঙের পাহাড়ে হঠাৎ দুজনের দেখা। এবং এইখানেই পুনর্মিলন এবং তৎক্ষণাৎ দ্বৈত সঙ্গীত। তারপর অদ্বৈত সঙ্গীত, এবং পরে দ্বৈতাদ্বৈত সঙ্গীত। তারপর দেখা গেল ওরা দুজনে তেনজিংএর মাউন্টেনিয়ারিং স্কুলে ভর্তি হয়েছে। তারপর শেষ দৃশ্যে দুজনে তুষারের শাদা পটে ধীরে ধীরে বিন্দুবৎ মিলিয়ে যাচ্ছে। দূরে একটি গান শোনা যাবে শূন্য তুষার ক্ষেত্রে।

গল্পটি গরমে আরম্ভ, ঠাণ্ডায় শেষ।

মোটের উপর এটাই গল্পের কাঠামো। এর দুটিমাত্র প্রধান লোকেশন, একটি সমুদ্রের ধারে অন্যটি পাহাড়ে। পুরীতেই আসা গেছে প্রথম দৃশ্যগুলি তুলতে। বহু সাজ-সরঞ্জাম, অর্থাৎ স্টুডিও-প্রপ সঙ্গে আনতে হয়েছে। তাছাড়া ক্যামেরা শব্দযন্ত্র ইত্যাদি যত ছোটখাটো

জিনিস। স্নানঘাট থেকে অনেকটা দূরে আমাদের চারটি তাঁবু খাটানো হয়েছে। মিস্ত্রী ডেকে কাঠ, বোর্ড, ইত্যাদি মিলিয়ে সেট তৈরির ব্যবস্থা হচ্ছে ইনডোর শটের জন্য। আলো আনা হয়নি দরকার ছিল না বলে। সবই দিনের আলোর জন্য ব্যবস্থা।

প্রথম দৃশ্যগুলি আরম্ভ করতে দিন পাঁচেক দেরি হবে, ইতিমধ্যে হঠাৎ গল্পের নায়িকা শ্রীমতী সঞ্চারিণী সেন বায়না ধরল, দেরি যখন আছে তখন দুদিনের জন্য ওয়ালটেয়ারে তার বান্ধবীর কাছ থেকে একবার সে ঘুরে আসতে চায়। নায়িকার আবদার, অনিচ্ছা সত্ত্বেও রাজি না হয়ে উপায় ছিল না। কারণ, সে বিগড়ে গেলে সব পণ্ড হবে; অনেক টাকার ব্যাপার।

কিন্তু নির্দিষ্ট দিনে সে এলো না। শুটিং-এর দিনেও না। তার পাঠানো হল, কোনো উত্তর নেই। দ্বিতীয় বার তারের উত্তরে জানা গেল, 'সঞ্চারিণী মিসিং, নো ট্রেস।' ঠিকানা দিয়ে গিয়েছিল বুদ্ধি করে, কিন্তু এত বুদ্ধি সত্ত্বেও হারিয়ে গেল কোথায়? পাঁচ হাজার টাকা অগ্রিম দেওয়া হয়েছে তাকে। এদিকে কয়েক হাজার টাকা খরচ করে পুরী আগমন এবং এত আয়োজন। বহু সন্ধান করা হল, পুলিসের চেষ্টাও ব্যর্থ হল। তারপর আরো কয়েকদিন অপেক্ষা করে ফিরে যাওয়াই ঠিক করা হচ্ছে এমন সময় দ্বিতীয় আর এক বিপর্যয়। প্রচণ্ড ঝড় উঠে এলো আকাশ অন্ধকার করে। রেডিও সংবাদে জানা গেল, সমুদ্রে ডিপ্রেশন ঘটেছে, এবং তার ফলে সাইক্লোনের আবির্ভাব, ঘণ্টায় ৮০ মাইল বেগে ঝড়ো হাওয়া বয়ে যাবে এবং প্রবল বৃষ্টি হবে। এক বেলার মধ্যে সব গড়া জিনিস ভেঙে খুলে ভূমিসাৎ করা হল, এবং তাঁবুর বাঁধন বিশেষ ভাবে শক্ত করে সবাই মিলে তাইতেই শেষ আশ্রয় নিলাম। চারটি তাঁবু ছিল মোট। কিন্তু খুবই ভাগ্য বলতে হবে, ঝড়টা রেঙ্গুন থেকে আসার পথে কোনো প্রলুব্ধকারীর পাল্লায় পড়ে যথাসময়ের কিছু পরে এলো, এবং দুর্বল অবস্থায়। যেন রেঙ্গুন থেকে আকাশজোড়া বিরাটকায় এক অ্যালব্যাট্রস আসতে আসতে পুরীর কাছাকাছি এসে একটা ছোট্ট চিলে পরিণত হল। ভালই হল। তবে বৃষ্টিটা ঠেকানো গেল না, ঝড়ের বেগও তখন ঘণ্টায় মাত্র ২০ মাইলের কাছাকাছি।

এমনি সময় সেই দুর্যোগের মধ্যে সেই অবিস্মরণীয় ঘটনা।

বিশ্বাস করা শক্ত, কিন্তু সত্য ঘটনা।

এমন মিরাক্‌ল এখনো ঘটতে পারে তা ভাবতে পারি নি। কিন্তু মিরাক্‌লই বা বলি কেন? প্রকৃতিতে যা ঘটে তা সবই প্রাকৃতিক ঘটনা, অতএব মিরাক্‌ল নয়, কিন্তু দুর্লভ ঘটনা।

সন্ধ্যার কিছু আগেই বেশ অন্ধকার হয়ে এসেছে। বসে বসে ভাবছি। ভবিষ্যৎও তো অন্ধকার, তাই মন অত্যন্ত বিমর্ষ। সবাই একটা নিরাশায় ডুবে আছি, বৃষ্টির শব্দ অনুভব করছি, তাঁবুর উপর বৃষ্টি ভেঙে পড়ছে। এমন সময় অত্যন্ত কাছে একটা পতনের শব্দ। ধপ করে কি যেন পড়ল। বজ্র নয় অবশ্যই। একটা দেহ উঁচু থেকে মাটিতে পড়লে যেমন শব্দ হয় তেমনি। ইংরেজিতে যাকে বলে thud, তাই। মনে বেশ একটা আতঙ্ক হল। আমরা সেই বৃষ্টির মধ্যেও চার-পাঁচ জনে ছুটে বাইরে গিয়ে যা দেখলাম তাতে বিস্মিত স্তম্ভিত এবং আরো বহু রকম মিশ্র ভাবে অভিভূত। হৈ হৈ কাণ্ড! সবাই বেরিয়ে এলো তাঁবু থেকে। একটা মেয়ে পড়েছে আকাশ থেকে, হাতে একটা রেনকোট, শক্ত মুঠোয় ধরা। মেয়েটি সম্পূর্ণ অচেতন। টর্চের আলোয় দেখি, এ কি ব্যাপার! আমাদের সঞ্চারিণী সেন অজ্ঞান অবস্থায় এসে পড়েছে ঠিক আমাদেরই সামনে। কেউ কি হেলিকপ্টারে তাকে নামিয়ে দিল এখানে? কিন্তু তাই বা কেমন করে হবে?

যাই হোক, অচেতন সঞ্চারিণীকে মেয়েদের তাঁবুতে নিয়ে তোলা গেল। সঙ্গে ডাক্তার ছিল, সে সঞ্চারিণীর জ্ঞান সঞ্চারের চেষ্টা করতে লাগল। তার আগেই মেয়েরা তার পোশাক বদল করে দিয়েছে।

অনেক চেষ্টাতেও জ্ঞান ফিরে আসতে দেরি হচ্ছে। ডাক্তার ভালভাবে পরীক্ষা করে বলল, ভয়ের কোনো

কারণ নেই, শক্‌ পেয়েছে, তারই চিকিৎসা দরকার। সমস্ত রাত চেষ্টা করে পরদিন বেলা ১০টায় সঞ্চারিণী চোখ খুলল। সবাই উৎসুক, কি হয়েছিল জানতে। কিন্তু ডাক্তারের নির্দেশে কাউকে কাছে আসতে দেওয়া হল না। মাত্র একজন মেয়ে তার শুশ্রূষার জন্য রইল কাছে। নানা রকম তরল খাদ্য খাইয়ে তাকে কিছু সুস্থ করা হল, এবং সে কথা বলল সন্ধ্যার সময়। তার প্রথম কথা—আমি কোথায়? আমার কি হয়েছিল?

ভয় নেই, তুমি পুরীতে আমাদের সঙ্গেই আছ, তোমার কি হয়েছিল তা তোমার মনে আসতে হয় তো কিছু দেরি হবে, যখন মনে পড়বে সব তখন ব'লো। কারণ এ কথা তোমার মুখ থেকেই আমরা শুনতে চাই, আমরা তো কিছুই জানি না।

সব কথা বলার সময় আসতে আরো একটা রাত কেটে গেল। পরদিন সে অনেকটা সুস্থ। সবাই মিলে তখন তাকে ঘিরে বসলাম। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার কি হয়েছিল এখন মনে পড়ে?

ক্ষীণ কণ্ঠে সঞ্চারিণী বলল, একটু একটু। সব হয় তো গুছিয়ে বলতে পারব না, কারণ আমি নিজেও সব জানি না। ওয়ালটেয়ারে ঘণ্টাখানেকের জন্য একটু একা বেরিয়েছিলাম, বান্ধবী সেই সময়টা বাড়িতে ছিল না।

তারপর আমি ঘুরতে ঘুরতে সমুদ্রের ধারে নেমে গেলাম একটা খারাপ পথ দিয়ে। দূরে ভাল পথ ছিল, তা পছন্দ হল না।

সঞ্চারিণী এরপর মিনিট খানেক চোখ বুঁজে চুপ করে থেকে আবার একটু একটু করে বলতে লাগল। পাহাড়ী দুর্গম পথ। অ্যাডভেনচার হচ্ছে ভেবে ভারি খুশি হয়ে উঠলাম মনে মনে। নিজের নাম করে হাসছিলাম একা একাই। সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতার মতো মোটেই না। বেশ শক্ত আমার পা। মনও কম নয়। এককালে নাম ছিল গেছো মেয়ে। উঁচু পথ থেকে সমুদ্রের বালির তীরে গিয়ে পৌঁছলাম। তারপর এক অপূর্ব দৃশ্য। আকাশে মেঘ ছিল। সেই মেঘ থেকে একটা হাতীর শুঁড় নেমে এলো জলে। মোটা কালো শুঁড়। প্রকাণ্ড ফানেলের মতন দেখতে। এমন কাণ্ড আগে দেখিনি কোথাও। সেই শুঁড় ঘুরতে ঘুরতে ছুটে এলো আমার দিকে, তারপর দেখি আমি বনবন করে ঘুরছি, শূন্যে উঠে যাচ্ছি। তারপর কি হল মনে নেই সব। মাঝে মাঝে জ্ঞান হচ্ছে আর বুঝতে পারছি আমি আকাশে, প্রবল ঝড় আমাকে উড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। হঠাৎ হাতে ঠেকল একটা কি যেন। ঝড়ে আকাশে কত কি উড়ে বেড়াচ্ছিল আমার সঙ্গে। সেই জিনিসটি হাতে ঠেকোমাত্র তাকে শক্ত করে ধরলাম। দেখি সেটা কার যেন একটা রেনকোট। সেটায় হাওয়া লেগে ফেঁপে উঠল, আর ঐ রেনকোটটাই আমাকে প্যারাশুটের মতন এখানে নামিয়ে এনেছে। এ এক আশ্চর্য কাণ্ড।

এই পর্যন্ত বলেই সঞ্চারিণী আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে পড়ল।

॥ দুই ॥

আমাদের সঙ্গে যে শব্দযন্ত্রী ছিল, সে বিজ্ঞানের অনেক কিছু পড়াশোনা করেছে এবং বাইরের অনেক খবর জানে। সে বলল, সে বছরকুড়ি আগে এ রকম ঘূর্ণিঝড় দেখেছে, যদিও ওয়াটার স্পাউট কখনো দেখেনি। গ্রামের লোকেরা একে বলে বাওছোঁচ। মানে বোধ হয় দুষ্ট বায়ুর ছোঁয়াচ। তারই বাড়ির একেবারে পাশ দিয়ে তিন-চারখানা বাড়ি যতটা চওড়া ততটা জায়গায় যা কিছু ছিল সব মুচড়িয়ে দুমড়িয়ে উপড়িয়ে উঁচুতে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে অনেক দূরে নিয়ে ফেলেছিল। প্রায় এক মাইল দীর্ঘ জায়গায় কিছুই প্রায় অবশিষ্ট ছিল না। একটি লোককে তুলে নিয়ে পঞ্চাশ গজ দূরে নিয়ে ফেলেছিল। তার একখানা পা ভেঙে গিয়েছিল। এ ঘূর্ণি, স্ক্রুর প্যাঁচের মতন ঘুরতে ঘুরতে যায়। বাড়ির চাল সব গ্রামের বাইরে মাঠের মধ্যে নানা স্থানে পাওয়া গিয়েছিল। লোক মারা গিয়েছিল ১৫ জন।

আমি শুনে বললাম, আরে, এ তো আমিও দেখেছি—এই তোমার ধুলোবালির ঘূর্ণি। ছোট ছোট পরিধিতে তো প্রায় সব সময়েই হচ্ছে। তা ছাড়া ওয়াটার স্পাউটের

ছবি দেখেছি একখানা বিজ্ঞানের বইতে। সেই বইতেই —সে একখানা বিদেশী মাসিক পত্র—দেখেছি সব। তাতে লেখা ছিল ১৮৬১ সনে, রবি ঠাকুরের জন্ম বছরে মালয় দেশে বৃষ্টির সঙ্গে হাজার হাজার ব্যাঙ পড়েছিল।

শব্দযন্ত্রী বলল, তবে তুমিই সব বুঝিয়ে বল না?

না না, সবটা আমার মনে নেই। ঘূর্ণিতে মেঘ নামে নিচে আর জল ওঠে উপরে, কেমন করে হয় আমার মনে নেই।

ক্যামেরাম্যান জিজ্ঞাসা করল, ওয়াটার স্পাউট ব্যাপারটা আসলে কি?

শব্দযন্ত্রী বলল আসল এটা টরন্যাডো, ঘূর্ণি ঝড়। কিন্তু ঘুর্ণনটা খুব অল্প পরিসরে ঘটলে তার শক্তি অতি প্রচণ্ড হয়ে ওঠে। আকাশ থেকে মেঘ মোচড় খেয়ে ফানেলের মতন চেহারায় পাক খেতে খেতে নিচে নেমে আসে, আর সেই সঙ্গে আর এক ঘূর্ণি তাকে বেষ্টন করে উপরে উঠতে থাকে। তখন তার সঙ্গে কত কি আকাশে উঠে যায়।

শুনতে শুনতে ক্যামেরাম্যান চোখ বুঁজে কি যেন ভাবতে লাগল। সে বড়ই অন্যমনস্ক, গভীর চিন্তায় ডুবে গেছে।

কি ভাবছ এত?—জিজ্ঞাসা করলাম।

ভাবছি আমাদের সঞ্চারিণী সেনের দৃশ্যটা ক্যামেরায় রিক্রিয়েট করা যায় কি না। এই শূন্যে উত্থান ও ভূমিতে পতন।

কি মনে হল?

মনে হল, যে-গল্প তৈরি করতে যাচ্ছি ফিলমে, সেটায় যখন এমন একটা বাধার সৃষ্টি হল, তখন ওটা একেবারে বাদ দিয়ে আকাশে ওড়া ও পতন ইত্যাদি যা ঘটল তাই নিয়ে এক অদ্ভুত গল্প ফাঁদা যায়। ওয়াটার স্পাউটের দৃশ্য স্টুডিও ঘরেই করা যায়। বাইরের ছবি বাইরেই তুলতে হবে এবং তার জন্য পুরীতেও আসতেও হবে, ওয়ালটেয়ারেও যেতে হবে। তবে বেশি খরচ করলে ওয়ালটেয়ারেও স্টুডিওতে তৈরি হতে পারে। সবই এর মধ্যে ভেবে দেখলাম।

আমি তো শুনে আনন্দে প্রায় লাফিয়ে উঠলাম। আর চিন্তা নেই, চল ফিরে কলকাতায়। আগে গিয়ে সব এস্টিমেট করা যাক। যদি সফল হই তবে এতদিনের বাজে খরচ সব উঠে আসবে সেই একখানা ছবিতেই।

শব্দযন্ত্রী বলল, কিন্তু যদি ছবি করার পর এ সব ঘটনা অসম্ভব, অবাস্তব, স্রেফ ফাঁকি বলে ওঠে দর্শকেরা?

ক্যামেরাম্যান বলল, সে কথা কি আর ভাবি নি? যদি ঘটনাগুলো যথেষ্ট বাস্তবের ভ্রান্তি না ঘটায়, সেজন্য প্রথমেই ছবিটি হিন্দিতে করতে হবে। হিন্দিতে হলে সব রকম বুজরুকির ভাল খদ্দের পাওয়া যাবে। দেখছ তো বাজার? বাঙালীরাও হিন্দি ছবির মধ্যে সব রকম উদ্ভট ঘটনা দেখে আনন্দ পায়, কিন্তু সেই ঘটনাই বাংলা ছবিতে দেখলে রেগে যায়। কিন্তু তা সম্ভবত এ ছবিতে হবে না, যদি যথেষ্ট খরচ করা হয়। যদি দেখি ঠিক ঠিক হচ্ছে, তা হলে না হয় বাংলাতেই করা যাবে আগে। কিন্তু যাই হোক, পৃথিবীতে এমন ছবি এর আগে আর হয় নি।

এ প্রস্তাবে সবাই আমরা ভীষণ খুশি। আরো ভাল লাগছে এ জন্য যে, যন্ত্রপাতি এখনো প্যাকিং থেকে খোলা হয়নি, যেমন ছিল তেমনি আছে। শুধু সেট্ যা তৈরি হয়েছে সে সব, আর তাঁবু, ক্যাম্প খাট, ইত্যাদি গুছিয়ে নিতে পারলেই এখানকার কাজ আপাতত শেষ।

কিন্তু সেও তো দু-তিন দিনের ব্যাপার। শহর থেকে মজুর আনতে হবে অনেক, খরচও আছে বেশ। তাঁবুর ভিতরকার প্ল্যাংকিং-এর কাজ যা হয়েছে, না হয় এখানকার মিস্ত্রীদের কাছে বিক্রি করে দেওয়া যাবে।

॥ তিন ॥

রাত্রিটা মন্দ কাটল না, অর্থাৎ ভবিষ্যৎ নানা বিষয় আলোচনা করতে করতে কেটে গেল। খুব একটা আশার আলো সবার মনে। রাত্রিটা কেটে গেল বলেছি, কিন্তু তখনও সূর্যোদয়ের ঘণ্টা দেড়েক বাকি।

সমস্ত রাতই প্রবল হাওয়া ছিল, একটু একটু বৃষ্টিও হচ্ছিল। কিন্তু হাওয়াটা দপ করে বন্ধ হয়ে গেল ভোর সাড়ে চারটার সময়। পুরীতে হাওয়া বন্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গে গুমোট গরম বোধ হয়। এমন সময় ঘরে বন্ধ থাকায় বড় কষ্ট হয়। আমরা অনেকেই একটুখানি তাঁবুর বাইরে এসে দাঁড়িয়েছি—এমন সময় সমুদ্রে হঠাৎ একটা কালো দৈত্যের আবির্ভাব ঘটল। একটি মেয়ে চিৎকার করে উঠল ঐ—ঐ—ঐ বুঝি সেই হাতিশুঁড়ো। ছুটে সবাই তাঁবুর মধ্যে গিয়ে আশ্রয় নিলাম। তারপর কি যে হল, হৈ হৈ চিৎকার করতে না করতে সবাই মিলে চললাম আকাশে। তারপর কি হয়েছে কিছুই মনে পড়ে না। যখন খেয়াল হল, চেতনা হল, তখন দেখি, আমরা তাঁবু সমেত, সমস্ত সাজ-সরঞ্জাম সমেত এবং আমাদের সঙ্গে একটি কুকুর ছিল সেটা সমেত এবং তাঁবুর ভিতরের প্যাংকিং সমেত, একটা তাঁবুতে দুটো ব্যাঙ ঢুকেছিল সে দুটো ব্যাঙ সমেত, এসে পড়েছি কার এক বাগান বাড়িতে। তখন রাত বারো। তাঁবু থেকে বেরিয়ে ঘুরে দেখি সেটা আমাদেরই প্রোডিউসারের বাগান বাড়ি, কলকাতা শহরের বাইরে। এ তো ভারি আশ্চর্য কাণ্ড।

ক্যামেরাম্যান বলল, এ ঘটনাকে মিরাকল না বলে পারবে?

আমি চিন্তান্বিত। কিন্তু কি বলা উচিত, সেটা এখানে বড় কথা নয়। বড় কথা হচ্ছে, এ সমস্তগুলো ঘটনাই যখন আমাদের এতগুলো লোকের জ্ঞাতসারে ঘটেছে, তখন এটাকে যাই বলি না কেন, এ নিয়ে ছবি করলে তা লোকে কি ভাবে নেবে, সেই কথা ভাবছি।

ক্যামেরাম্যান বলল, হিন্দিতে করলেই চলবে। এবং বোধ হয় এখানে এ ছবি তৈরি করাও যাবে না। বম্বের কোনো ফিলম প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আলাপ চালাতে হবে। কিন্তু তবু তার আগে আমাদের প্রোডিউসারের সঙ্গে আলোচনা করা দরকার।

সঞ্চারিণীর ঘুম ভাঙল সকাল আটটায়। কুকুরটাও ঘুমিয়ে ছিল, সেও উঠে ল্যাজ নাড়তে লাগল। এবং তাঁবু থেকে বেরিয়ে গিয়ে ল্যাজ নাড়ার গতি বাড়িয়ে দিল, কারণ এ বাড়ি তার বিশেষ পরিচিত।

এ বাড়িতে এসে পড়াতে সমস্ত ব্যাপারটা বাইরের লোকের কাছে গোপন রাখার বিশেষ সুবিধা হওয়াতে আমরা যে ছবি করব তার প্লটটাও গোপন রাখার সুবিধা হল। কোনো ঘটনাই বাইরে কোথাও প্রকাশ করা হবে না, কারণ আমাদের প্লট অন্যে নিয়ে নিতে পারে, এ ভয় আছে। আপাতত কিছুকাল এই বাড়িতেই অজ্ঞাতবাস করাই ঠিক হল। মস্ত বড় বাড়ী, কোনো অসুবিধা হবে না।

এরপরেই প্রোডিউসারের সঙ্গে দেখা করে সমস্ত তাঁকে নিবেদন করা হল। এবং আমরা হিসাব করে দেখেছি এ ছবি করতে অন্তত দশ লক্ষ টাকা দরকার হবে। অনেক জিনিস বিদেশ থেকেও আনতে হবে, কিন্তু সেজন্য সরকারের অনুমতি পাওয়া যাবে কি না, সেও এক সমস্যা। প্রোডিউসার নিজেই সমস্ত ঘটনাকে একটা বিরাট ধাপ্পা ভেবেছিলেন। কিন্তু সবাই মিলে তাঁকে বোঝাতে এবং সবটা ঘটনা বিশ্বাস করাতে দুটি দিন কেটে গেল। এবং যখন তিনি প্রকৃতই বিশ্বাস করলেন, তখন বললেন, দশ লাখ টাকার ঝুঁকি নেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। আমরা তো অত্যন্ত হতাশ হয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু এখন তো সবসুদ্ধ আবার পুরী গিয়ে আগের গল্পটাও ফিলম করা সম্ভব নয়।

অবশেষে আমি অত্যন্ত হতাশ হয়ে বম্বের এক প্রতিষ্ঠানকে চিঠি লিখে তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম, এবং দেখা করে সব বললাম। আমার উদ্দেশ্য ছিল জানা, গল্পটা তাঁরা কিনতে রাজি আছেন কিনা। পুরো সাহেব সেজে গিয়েছিলাম, যাতে খুব রেসপেকটেবল দেখায়।

মালিক আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনে একচোট খুব হাসলেন, এবং বললেন, গল্পটা বানিয়েছেন বেশ। বাহাদুরি আছে আপনার। কিন্তু আমরা এখন যে ছবি করার আয়োজন করছি তার কাছে এ কাহিনী একেবারেই জলো।

মালিকের কথা শুনে আহত হলাম খুবই। বিশেষ করে তিনি যখন বললেন গল্পটা বানিয়েছ বেশ। বোঝানো গেল না যে এটা বানানো গল্প নয়।

আমার মনের ভাব বুঝতে পেরে মালিক বললেন, শুনুন, আমরা এখন যে গল্পে হাত দিচ্ছি তা শুনলে আপনি বুঝতে পারবেন আপনার গল্প তার পাশে দাঁড়াতে পারবে কি না। আমাদের গল্পের নায়ক যেমন ধনী তেমনি খেয়ালি। তাঁর এত টাকা যে তার হিসাব রাখতে পঞ্চাশ হাজার কর্মচারী দরকার হয়। এবং ইনকাম ট্যাক্স ফাঁকি কি করে দেওয়া যায় তার জন্য ১০০ জন উপদেষ্টা ও আইনজীবী নিযুক্ত আছে।

এখন এই নায়কের খেয়াল হয়েছে গোটা হিমালয় পাহাড় ভাড়া নিয়ে উত্তর পূর্ব ভারত থেকে তাকে সরিয়ে সোজা নিয়ে আসবেন ভারত মহাসাগরে। এই পর্বত-মালার নিচে এমন সব যন্ত্রপাতি থাকবে যাতে পর্বত জাহাজের মতো সমুদ্রে ভাসবে। হিমালয়ে যারা বাস করে তারা যেমন ছিল তেমনি থাকবে। তেনজিং-এর মাউন্টেনিয়ারিং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও ঠিক থাকবে। আমাদের নায়ক এই হিমালয়ের এক হোটেলে বসে মাস খানেক সমুদ্র-বিহার করবেন। তারপর নির্দিষ্ট সময় পার হলেই পর্বতটিকে আবার যথাস্থানে রেখে আসবেন। কিন্তু এই একমাস কাল হিমালয় যখন সমুদ্রে ভাসতে থাকবে তখন তাতে নাচ-গানের যে আয়োজন করা হয়েছে একমাত্র তাইতেই পাঁচ লাখ টাকার বরাদ্দ হয়েছে। তাহলে ভেবে দেখুন, আপনার ঐ হাতীর শুঁড় না মশার শুড় এর কাছে দাঁড়াবে না। তা ছাড়া এ ছবি দেখার পর আপনার ছবি কি আর জমবে? আপনাদের বাংলা ভাষা, বাংলা সংস্কৃতি, আপনাদের সূক্ষ্ম সৌন্দর্যবোধ, আর্টের উচ্চমান প্রভৃতি একেবারে ভুলে যান। ও সব কি কখনো সিনেমায় চলে? মানুষকে—নায়ক-নায়িকাকে, বিনা পাখায় আকাশে ওড়ান। বিনা মুখোশে, বিনা জলের চাপ নিবারক আবরণে, খালি গায়ে একদল খেলোয়াড়কে নামিয়ে দিন সমুদ্রের তলায় ফুটবল খেলতে। সেখানে লড়াই বাধান। নায়ক-নায়িকাকে এভারেস্টের মাথায় তুলে দিন। সেখানে দুজনের মান অভিমান দেখান। তারপর দুজনে আত্ম হত্যার জন্য দুদিকে ঝাঁপ দিক। একজন পড়ুক নেপালে আর একজন পড়ুক তিব্বতে। মারবেন না তাদের। পতনের সঙ্গে সঙ্গে দুজনে দুদেশের মাটিতে নেচে নেচে গান গাইতে থাক। গান যেন হিন্দি হয়। আসল কথা সবই হিন্দিতে করুন, দেখবেন দর্শকরা সবাই আপনাদের রবি ঠাকুরের ভাষায় বলবে "ন্যায় অন্যায় জানি না, শুধু হিন্দি জানি।" হিন্দিতে হাজার খুন মাপ। পারবেন এমন সব করতে?

আমি ধৈর্য ধরে সব শুনলাম। কিছুই বললাম না। তারপর ধীরে ধীরে উঠে হাতে ধরা সাহেবী টুপিটি মালিকের পায়ের কাছে নামিয়ে রেখে নীরবে চলে এলাম। চলতে চলতে ভাবছিলাম, আমাদের সেই পুরীতে পাওয়া গল্পটা বয়ে মালিকের পায়ে সমর্পণ না করে ভালই করেছি। টুপিটাও না দিলেই ভাল হত। আমার ছবি অমিই করব, এবং বাংলাতেই, এবং বাংলা ভাষা সম্পূর্ণ ধ্বংস হওয়ার আগেই। টাকা যেখান থেকে হোক সংগ্রহ করতে হবে।

কিন্তু এখন ক্রমেই মনে হচ্ছে সমস্ত ব্যাপারটাই অবাস্তব। পুরী, ওয়ালটেয়ার ওয়াটার স্পাউট, কিছুই সত্য নয়। কারণ আমি স্টুডিওর বিছানায় শুয়ে আছি। ঘুম ভেঙ্গেছে পাঁচ মিনিট হল। সবাই বলছে বেলা নটা পর্যন্ত আমি ঘুমই না। আগামী কাল শুটিং-এর জন্য পুরী যেতে হবে, অথচ আমি এখনও নিশ্চিন্ত। সাজ-সরঞ্জাম সব রওনা হয়ে গেছে।

প্রোডিউসার আমার পাশে বসে আছেন। জিজ্ঞাসা করলাম, আবার পুরী?

আবার মানে? কাল যেতে হবে মনে নেই?

মাথার মধ্যে সব যেন কেমন গণ্ডগোল বোধ হচ্ছে। কিছু বললাম না। উঠে পড়লাম। উঠতেই গোটা দুই ব্যাঙ খাটের নিচে থেকে লাফিয়ে চলে গেল। কখন স্টুডিওতে ঢুকেছিল দেখিনি।

ছেলেদের পাততাড়ি

পাহাড়ী রূপকথা

লক্ষ্মী চট্টোপাধ্যায়

বহুদিন আগে পৃথিবীর বাসিন্দাদের চালচলন অন্য রকম ছিল। জন্তু জানোয়ার পশুপক্ষী সকলেই মানুষের সঙ্গে কথা বলত ও মানুষও তাদের ভয় পেত না। কোন্ যুগ থেকে যে এই প্রথাগুলি ভেঙ্গে গেল তা কেউ সঠিক বলতে পারে না। নানা দেশের নানা রকম গল্প শোনা যায় এ বিষয়। এই রকম একটি গল্প আমাদের পাহাড়ী জাতিদের মধ্যে বহু লোকে বলাবলি করে।

হিমালয় পর্বতশ্রেণীর পাদদেশে একটি ছোট গ্রামে এক চাষী ও তার বউ বাস করত। সুন্দর গ্রামটি, পাহাড়ের কোলে বসান—দূরের থেকে যেন একটি ছবির মত দেখাত। চাষীরা গরীব ছিল, তবু তারা তাদের জীবনে যথেষ্ট আনন্দ উপভোগ করত।—চাষবাস ভাল হলে গ্রামের লোকেরা সকলে মিলে আনন্দ করে নাচ গান খাওয়া দাওয়ার আসর বসাত, আর ঝড়জল বেশি হলে তাদের চাষবাসও নষ্ট হয়ে যেত, এমন কি দু'বেলা পেট ভরে খাবারও জুটত না। চাষী কিন্তু খুবই পরিশ্রম করত—সে সময় পেলেই বসে বসে চমৎকার কাঠের পশুপক্ষী তৈরি করত। তীর্থের সময় বা মেলা বসলে বহু যাত্রী এই গ্রামের ভিতর দিয়ে যাওয়া-আসা করত। এই লোকেরা চাষীর ওই কাঠের পশুপক্ষীগুলি খুব আগ্রহ করে কিনত।

চাষীরা স্বামী-স্ত্রী দু'জনই পশুপক্ষী খুব ভালবাসত ও বহু পাখী তাদের বিশেষ বন্ধু ছিল। এদের সুদিনে পাখীগুলি এদের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষেতে যেত ও ফসলের উপর নেচে নেচে চাষীদের কাজের তালে তাল ঠুকে চলত। তাদের দুর্দিনে তারা তাদের বাড়ির দরজার গোড়ায় একটি ছোট ঝাউ গাছের উপর ঘন্টার পর ঘন্টা চুপচাপ বসে থাকত, আর চাষী তাদের অনুকরণ করে বহু কাঠের চড়াই তৈরি করত। সর্ব্বদা তারা সকলে একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করত। রাত্রে একটি চড়াই পাখী চাষীর দরজার কোণে চুপচাপ গুড়িশুড়ি মেরে বসে ঘুমত।

চাষীদের পাশেই একটি বদ-মেজাজী ধোপাবউ থাকত। এই সব পাখীর ডাক ও চাষীর ঘরে পাখী-গুলির মজলিস সে মোটেই পছন্দ করত না। পাখী দেখলেই সে ঝাঁটা মেরে তাদের তাড়াত আর কোন কোন পশুপক্ষীকে কোন সময় সে নিজের বাগানে বা বাড়িতে ঢুকতেও দিত না।

এইভাবে বছরের পর বছর কেটে চলেছে এমন সময় এক বছরের বসন্তকালে চাষীদের অবস্থা খুবই খারাপ হয়েছে দেখা গেল। নিজেদের পেটে ভাত জোটে না তো চড়াইকে কি খেতে দেবে? একদিন তারা মাত্র আধ হাতা ভাত চড়াইকে খেতে দিয়েছে এমন সময় পাঁচিলের অন্য দিকে ধোপাবউ এক গামলা ভাতের মাড় এনে বসাল। তার খদ্দেরদের সুতি কাপড়গুলিতে ঠিকমত মাড় দিতে হবে সুতরাং মাড়ের গামলা রোদে রেখে সে ধোওয়া কাপড়গুলি আনতে গেল। চড়াই পাখী এত-খানি খাবার দেখে লোভ সামলাতে পারল না। সেই সুন্দর থকথকে মাড়ে বার বার ঠোঁট ডুবিয়ে খেতে লাগল এমন সময় ধোপাবৌ পিছন থেকে এসে তাকে ধরে ফেল্ল।

"হতভাগা, চোর চড়াই, তোমার চুরি করা আমি বরাবরের মত শেষ করছি," বলে চিৎকার করতে করতে সে পাখীটাকে ধরে ঘরে নিয়ে গেল। সেখানে একটি শাণ দেওয়া ছুরি দিয়ে কচ্‌ করে বেচারা চড়াইটার জিবটা কেটে দিয়ে পাখীটাকে পাঁচিলের বাইরে একটা ঝোপের উপর ছুঁড়ে ফেলে দিল। পাখীটা সেই ক্ষত আহত অবস্থায় কোন মতে তার চাষী বন্ধুর বাড়ি গিয়ে পৌছল। তারা দু'জনে তার এই অবস্থা দেখে কান্নাকাটি শুরু করে দিল। চাষীবউ পাখীটাকে হাতের উপর তুলে নিয়ে তার গায়ে হাত বোলাতে লাগল আর চাষী তাকে তাদের জামবাটিতে যেটুকু দুধ ছিল সেটুকু গরম করে খাওয়াবার চেষ্টা করতে লাগল। ছোট চড়াই কিছুক্ষণ এভাবে আরামে বিশ্রাম করল, তারপর হঠাৎ বাড়ি ছেড়ে উড়ে বেরিয়ে পাহাড়ের দিকে কোথায় উধাও হয়ে গেল।

"আহা, ওকে কে খাওয়াবে?" "হায়, হায়, ওকে কাক, চিলে ঠুকরে মেরে ফেলবে" বলে চাষী ও তার বউ বিলাপ করতে লাগল। সারারাত এ'ভাবে কাটিয়ে পরদিন সকালে তারা দু'জনে ঠিক করল যে চড়াইকে খুঁজে নিয়ে আসতে হবে জঙ্গল থেকে, নয়ত সে মরে যাবে। এই রকম মনস্থির করে দু'জনে তাদের ঘরবাড়ি ছেড়ে জঙ্গলের ভিতরে গিয়ে ঘুরতে লাগল পাখীটার খোঁজে।

কিছুদূর যেতেই একটা বিরাট বড় হিংস্র কুকুর তাদের দিকে তেড়ে এল—"কুকুর রাজ্যে তোমাদের কে প্রবেশ করবার অধিকার দিয়েছে? আমি এখানের প্রহরী—শীঘ্র পালাও নয়ত তোমাদের শেষ করব।"

চাষী হেসে বল্ল, 'আরে ভাই ডালকুত্তা, আমার এই শুকনো হাড় চিবিয়ে তুমি আর কি আনন্দ পাবে? আমরা তো এ'দেশে শান্তিতেই এসেছি, তোমাদের তো কোন অনিষ্ট করতে আসিনি। তুমি কি একটি বোবা চড়াই পাখীকে এদিক দিয়ে যেতে দেখেছ?"

কুকুর বল্ল, "হ্যাঁ, কিছুদিন আগে এ পথ দিয়ে একটি চড়াই গিয়েছিল বটে। আচ্ছা চল, তোমাদের একটু এগিয়ে দিয়ে আসি। উঠে আমার পিঠে চড়ে বস।"

চাষী ও তার বউ কুকুরের পিঠে উঠে বসতেই সে তীব্রবেগে ছুটে চল্ল। বহদূর গিয়ে আরো ঘোর জঙ্গলে পৌছতেই কুকুরটা তাদের পিঠের থেকে নামতে বল্ল—"এবার তোমরা বানর রাজ্যে এসেছ আর আমি তোমাদের নিয়ে যেতে পারব না।" বলতে না বলতে একটা প্রকাণ্ড বানর গাছ থেকে লাফিয়ে এসে তাদের রাস্তা আটকে দাঁড়াল। "কোথায় যাওয়া হচ্ছে? সাবধান, এটা বানর রাজ্য। এখানে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ নিষেধ।"

চাষী তাকেও বল্ল,-'ভাই বানর, আমি তো আমার বন্ধুর খোঁজে ঘুরে বেড়াচ্ছি। তুমি কি একটি ছোট চড়াই পাখীকে দেখেছ?"

বানর বল্ল, "একটি পাখীকে কিছুদিন আগে অনেক-গুলি চড়াই পাখী কোথায় যেন নিয়ে গেল। 'আচ্ছা, তোমরা এক কাজ কর, ওই ঈগল পাখীটার পিঠে উঠে পড়, সে তোমাদের ঠিক পৌছে দেবে।" ঈগলটা কিছুদূরে ছিল, সে, এগিয়ে এসে তাদের দু'জনকে পিঠে তুলে নিল। বিরাট ডানা মেলে তাদের উর্ধ্বে উড়িয়ে নিয়ে চল্ল। বহুক্ষণ এভাবে যাবার পর তারা নীচে

তাকিয়ে দেখল যে,অনেকগুলি পাখী গাছের ডালে বসে আছে। চাষী বল্লো, "ঈগল ভাই, আমাদের এখানে নামিয়ে দাও, এবার বোধ হয় কিছু খবর পাওয়া যাবে।" ঈগল তাদের নীচে নামিয়ে দিয়ে আবার আকাশে উড়ে চলে গেল। কিছুক্ষণ হেঁটে তারা দেখল যে জঙ্গলটা দূরে গিয়ে শেষ হয়ে গেছে ও তার ধার দিয়ে সুন্দর একটি ছোট্ট নদী এঁকেবেঁকে চলেছে। শ্রান্ত পথিকরা সেই জল খেয়ে শরীর ঠাণ্ডা করল।

নদীর ওপারে তারা দেখল যে, একটা প্রকাণ্ড গাছের গুঁড়ির উপর অনেকগুলি চড়াই বসে আছে। চাষী বল্ল—"বন্ধুগণ, আমরা আমাদের বন্ধু বোবা চড়াইকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। তোমরা কি তাকে কোথাও দেখেছ?"

চড়াইদের বাবা বল্ল, "তোমাদের বন্ধু আমার ছেলে। তোমাদের ফসল ইত্যাদিতে আমরা সকলেই বহুবার ভাগ বসিয়েছি—এখন এই দুর্দিনে চল, তোমাদের আমি ভিতরে নিয়ে যাই। আজ আমাদের বাড়িতে তোমাদের খাওয়া দাওয়া করতে হবে। চল বন্ধু।"

চাষী ও চাষীবউ তাদের চড়াই বন্ধুকে আবার দেখতে পাবে বলে খুব উৎফুল্ল হয়ে উঠল ও চড়াইদের সঙ্গে সঙ্গে জঙ্গলের ভিতর প্রবেশ করল। কিছুদূর গিয়ে তারা দেখল একটি ছোট্ট কাঠের বাড়ী, চারিদিকে সুন্দর বাগান নানা রংএর ফুলে ভরা। সদর দরজায় তাদের বন্ধু বোবা চড়াই দাঁড়িয়ে আছে। সে তাদের আদর করে ভিতরে ডেকে নিয়ে গিয়ে বল্ল, "এস বন্ধু, দেখো, আমি আবার কথা বলতে পারছি। এইখানে তোমরা বসে বিশ্রাম কর তারপর ভাল করে খাওয়া দাওয়া করো।"

চাষী ও চাষীর বউ হতবাক্ হয়ে এসব দেখল। ভিতরে গিয়ে তারা পাত পেড়ে বসে মনের আনন্দে ভূরি ভোজন করল। পোলাও প্রভৃতি খাবার, নানা রকম মিষ্টান্ন ও সুমিষ্ট ফল তারা খুব তৃপ্তি করে খেল। খাওয়া দাওয়া শেষ করে চাষী চড়াইকে জিজ্ঞেস করল, "ভাই পাখী, তোমার ওই ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় কি করে এখানে এলে?"

পাখী উত্তর দিল, "আমি কিছুদূর উড়ে যাবার পর আমার ভাইবোনের দেখা পাই। তারা সকলে মিলে আমাকে পিঠে তুলে এখানে নিয়ে এসেছে। তারপর নানা রকম ঘাস-পাতার রস খেয়ে আমার জিব জোড়া লেগে গেছে আর আমি এখন আগের মত সব কিছু বলতে ও করতে পারি। কিছুদিন পরে আমি আবার তোমাদের গ্রামে যাব আর তোমার বাড়ি গিয়ে থাকব।"

চাষী তার কথা শুনে খুব আনন্দিত হল। তারপর অন্য পাখীদের ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিল—"বন্ধুগণ, তোমাদের আদর যত্নে আমরা দু'জনে খুব আনন্দ পেয়েছি কিন্তু এখন আমাদের বাড়ি ফিরে যেতে হবে। যাত্রা বহুদূরের আর আমাদের বয়েস হয়েছে, কাজেই তাড়াতাড়ি যেতে পারব না। এবার আমরা বিদায় নিচ্ছি কিন্তু তোমাদের সকলকে আবার আমাদের বাড়ি আসতে হবে।"

চড়াইগুলি বল্ল, "যাবার আগে, বন্ধু, আমাদের একটি উপহার গ্রহণ কর। ঐ বাক্সগুলোর মধ্যে যেটা ইচ্ছাহয় নাও, কারণ, আমরা তোমাদের কাছে খুব ঋণী।"

চাষী ও চাষীবউ সব থেকে হালকা ও ছোট্ট বাক্সটি বেছে নিল ও দু'জনে ধরাধরি করে সেটিকে কাঁধে করে বাড়ির পথে রওনা হল। জঙ্গলে পৌঁছাবামাত্র সেই ঈগল এসে তাদের দু'জনকে ও বাক্সটিকে তুলে নিল ও খুব দ্রুতবেগে বানর রাজ্যে এনে নামাল। সেখানে বানর প্রহরী তাদের আবার কাঁধে তুলে গাছের উপর লাফাতে লাফাতে কুকুর রাজ্যে এনে পৌঁছে দিল। কুকুরটা এরপর তাদের একেবারে নিজেদের গ্রামে নিয়ে গেল। অতি অল্প সময়েই দুজনে নিজেদের বাড়ি এসে পৌঁছল।

বাড়ি গিয়ে বাক্সটি খুলতেই তারা দেখল যে সেটি বহুমূল্য কাপড় ও গহনায় ভরা—"দেখ, দেখ, আমরা এখন ধনী হলাম। আমাদের পাখী বন্ধুরা কত ধন-

দৌলত দিয়েছে দেখ।" দুজনে মহানন্দে নাচতে লাগল। গ্রামের সকলকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়াল। এরপর তাদের আর অভাব রইল না।

এদিকে পাঁচিলের ওপার থেকে কুচুটে ধোপাবউ হিংসেয় জলে মরে আর কি! প্রতিবেশীর সৌভাগ্যের কথা শুনে তার মন-মেজাজ খুব খারাপ হয়ে গেল। তারপর যত দিন যেতে লাগল তার মনখারাপ ততই বাড়তে লাগল. নিজের মনে বক্‌বক্ করতে শুরু করল সে, "কি বোকা দেখ না—পয়সা দিয়ে খাবার কিনে পাখীগুলোকে খাওয়াচ্ছে। এদের কেন পয়সা হল এত, হায় হায়!" কিছুদিন পর সে ঠিক করল যে সেও যাবে চড়াইদের দেশে আর সেখানে গিয়ে সেও কিছু সম্পত্তি যোগাড় করে বাড়ি ফিরবে।

জঙ্গলে ঢুকতেই তাকে ডালকুত্তাটা তেড়ে এসে কাপড় কামড়ে ধরল। কিছুতেই সে কাপড় ছাড়াতে পারে না এমন সময় আরো অনেকগুলো কুকুর তাকে ঘিরে চিৎকার করতে শুরু করল। ডালকুত্তা তাক তেড়ে যাওয়াতে ধোপাবউ দৌড়ে পালাতে লাগল। দৌড়তে দৌড়তে সে বানর রাজ্য যখন পৌছল তখন অনেকগুলো বড় বানর তাকে তাড়া করতে লাগল। কোন মতে হোঁচট খেতে খেতে সে জঙ্গলের সীমায় পৌছতে ঈগলটা সোঁ করে নেমে এসে তার চোখ উপড়ে নেবার চেষ্টা করল। দিক দৃষ্টি হারিয়ে সে নদীর জলে পা পিছলে পড়ে গেল। অন্য তীরে হাঁপাতে হাঁপাতে উঠতে তার চোখ পড়ল সেই চড়াইদের মজলিসের উপর। সে তাদের চিৎকার করে বলতে লাগল, "দেখ তো তোমাদের জ্বালায় আমার কি দশা হয়েছে? শীগগির আমাকে শুকনো কাপড় ও খাবার দাবার কিছু দাও। তারপর আমার পয়সাকড়ি নিয়ে আমি বাড়ী ফিরে যাব।"

চড়াই পাখীরা সকলে খুব উত্তেজিত হয়ে উঠল। শেষে তাদের দলের সর্দার ধোপাবউ বল্ল, "বেশ, চলো, আমাদের সঙ্গে বাড়ি চল, তারপর তোমার যা প্রাপ্য তা তোমাকে আমরা দেব।" চড়াইদের বাড়ি গিয়ে বোবা চড়াইকে দেখে নির্লজ্জ ধোপাবউ বল্লো"—"এই যে চড়াইভাই, তুমি কেমন আছো তাই দেখতে এলাম। তোমাকে তো আমি ঠাট্টা করে জিব কেটে দেব বলেছিলাম। এই তো বেশ কথা বলছ, গান করছ, নেচে বেড়াচ্ছ; আসলে তোমাকে আমি মোটেই জখম করিনি তাহলে কি আর তুমি কোনদিন কথা বলতে পারতে? কই, আমাকে কি খেতে দেবে দাও। পাখীরা তাকে মোটা চালের ভাত, হড়-হড়ে ডাল, বাসি তরকারি খেতে দিল। ধোপাবউ নাকমুখ সিঁটকে তাই খেল, পরে বল্ল, "এবার আমি যাই। আমার বাক্সটা দাও তো।"

বাক্সর ঘরে গিয়ে সব থেকে বড় ও ভারি বাক্সটা নিল ও কোনমতে হোঁচট খেতে খেতে সেটা সে বাড়ি নিয়ে যাবার চেষ্টা করল। কিন্তু জঙ্গলের মাঝখানে এসে তার কৌতূহল এত বেড়ে উঠল যে সে বাক্সটা সেখানেই খুলে ফেল্ল। আর কোথা যায়, যত ইঁদুর বাদুড় মাকড়সা সাপ ব্যাঙ প্রভৃতি তার ভিতর থেকে বেরিয়ে ধোপাবউকে ঘিরে দাঁড়িয়ে তাকে খোঁচা দিতে দিতে বল্ল—"হতভাগী নিষ্ঠুর ধোপানী, তুমি কোন্ মুখে চড়াইদের কাছে ধনরত্ন চাইতে গিয়েছিলে? তোমাকে আমরা এখন সবাই মিলে মেরে খাব।" এই বলে তারা সদলবলে ধোপাবউয়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

এই ঘটনার পর কিন্তু পাখীরা মানুষের সঙ্গে কথা-বার্ত্তা বন্ধ করে দিল। আজকাল যারা পশু পক্ষী খুব ভালবাসে শুধু তারাই এদের হাভভাব ও ভাষা বোঝে। মানুষের হিংস্রতা ও লোভের জন্য তারা আর এই সব প্রাণীদের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস পায় না।

দ্বিশতবর্ষের শ্রদ্ধাঞ্জলি

শিবনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

আজো বুদ্‌বুদ্ ওঠে সাগরের সুনীল বিস্তারে
আবার হারিয়ে যায়
জীবনের অলৌকিক অন্তরালে।
পৃথিবীর রাজ্যপাটে সূর্য-স্নাত মায়াবী আঙিনায়
অসংখ্য অস্তিত্ব আসে
শব্দের নদী বেয়ে বেয়ে,
পরক্ষণেই হারিয়ে যায় ক্লান্ত মৃত্যুর শীতল অন্ধকারে
তবু মাঝে মাঝে
দু'টি একটি অনবদ্য প্রাণ
মৃত্যুর তমিস্রা পেরিয়ে গন্ধের ভাঙা হাটে
নিয়ে আসে জীবনের ছন্দিত শব্দ-বিন্যাস।
রামমোহন, তুমি সেই প্রাণ।
সেদিন জীবনের চারিপাশে
চৈত্রের ভাঙা গোধূলি,
নিরন্তর সন্ধ্যা-বাসরে
বিবর্ণ প্রাণের মিছিলে
আগামী দিনের সূর্য্য-শপথ অনুপস্থিত।
তুমি এলে—
সূর্য্য-কণা তিল তিল আলোর বকুলে
নিয়ে এলো যুগান্তরের ইঙ্গিত
বিভ্রান্ত জীবনের দিগন্তে।
বিভ্রান্তি, হতাশ্বাস, প্রতিহত জীবন
আর মৃত্যুর কালিমা মুছে
শতাব্দীর পরিকীর্ণ জীবন-কিনারে
নিয়ে এলে উদার পৃথিবীর আলো।
তুমি বিপ্লবী এক,
তাই স্বাদহীন সমাজের প্রচণ্ড বিকার মুছে
নোতুনের শুভ্র বেদীমূলে
জাগিয়ে দিলে জাগর হৃদয়-গোধূলি।
আমরা এখনো ক্লান্ত রজনী জেগে
ভোরের আলোর স্বপ্ন দেখি,
আর সেই কল্পিত আলোর দর্পণে
আজো বার বার তোমারই মুখ ফুটে ওঠে।

অন্বেষণ

মানসী বসু

জীবনের কি উদ্দেশ্য
কে জানাবে মোরে?
যোগী ক'বে ঈশ্বর সাধনা,
ভোগী ক'বে পুরাও বাসনা,
তত্ত্ব-সমস্যা হবে জ্ঞানীর ভাষণ,
গুণী ক'বে না হও উতলা
স্থির করো মন।
কোথা সেই সত্যান্বেষী
হৃদয়ের সত্য যে জানাবে,
কোথা কর্ম্মী কর্ম্মমাঝে
সংসারে যে মুক্তি এনে দেবে,
কোথা ত্যাগী ত্যাগমন্ত্র যার
আলো করে চির অন্ধকূপ,
কোথা সেই ধ্যানী মহারাজ
ধ্যানে দেখে ঈশ্বর স্বরূপ।
এক তুমি সত্যান্বেষী
জাল আলো হৃদয়ে আমার,
কর্ম্মী তুমি কর্ম্ম দিয়ে
লঘু কর জীবনের ভার,
ত্যাগী তুমি ত্যাগমন্ত্রে
উদ্দীপিত কর মোরে আজ,
ঈশ্বরের উপলব্ধি যেন হয়
মোর ধ্যানী মহারাজ।

এই নদী পেরোলে খোয়াই

সন্তোষকুমার অধিকারী

আপাততঃ ধুলোভর্তি দু'পায়ে ভাঙছি মেঠো পথ
ধারালো কাঁকরে রক্ত, হাতে গায়ে রক্তের আঁচর ;
দুধারে পাথরে ঝোপে সাপের নিঃশ্বাস, ক্যাকটাস,
তবুও আশ্বাস নাচে তালের ছায়ায় নিরন্তর—
এই পথ ফুরোলে কোপাই ।

বিকেল পড়ছে ঝরে গাছে গাছে, পাতায় পাতায়
শোনিত রঙের পথে হৃদয়ের দীর্ণ শ্রান্তি রেখা।
সামনে নির্জন নীল আঁধারের শূন্যতায় তবু
এখনও প্রত্যাশা কাঁপে আলোর লেখায় নিরন্তর—
এই নদী পেরোলে খোয়াই।

এই পথ হেঁটে গেলে ওপারে বিস্তৃত সীমারেখা—
বালির পাহাড় ঠেলে আকাশকে দুই চোখে মেখে
জলের কচিৎ স্রোত ঝরে যায়—আমি যাকে চেয়ে
সারাটি জীবন শুধু হতাশায় কাঁপি থরোথর—
ওপারে খোয়াই—নদী পেরোলে এবার।

প্রশ্ন ঃ বিস্ময় ঃ বেদনা

শান্তশীল দাশ

মানুষ কেন যে এত নৃশংস হৃদয়
হয়, তার অর্থ কিছু বুঝতে পারি না।
হত্যা করে কী যে লাভ। চিরজীবী হয়ে
থাকবে না কেউ ; তবে কেন এই পথ
ধরে যে মানুষ। শুধু ঘৃণার আসন
সৃষ্টি করে। মানুষের রয়েছে কত না
শুভ কর্ম। সেই পথে গিয়েছে তো কত।
তারা মরণের পরে অমর জীবন
মানুষের স্মৃতিপটে লাভ ক'রে আছে।
সেই স্মৃতি আনন্দের, প্রীতির, শ্রদ্ধার।
কেন যে মানুষ তবু বেছে নেয় এই
ঘৃণ্য পথ হননের আঘাতের ; তার
অর্থ কিছু বুঝি নাকো, শুধু দেখে যাই
বেদনায় ভরে ওঠে সারা মন প্রাণ।

ছবি

ডাঃ নন্দলাল পাল

কোন্ দিকে যাব ?

অচেনা জায়গা, অপরিচিত পরিবেশ। ওরা আমাকে লিখেছিল,—

'Get down at Amguri Station and contact Supply Officer, Naga Hills to go to Tuensang.'

সম্বল ছিল মাত্র এই টেলিগ্রাম।

বিকাল পাঁচটায় তিনসুকিয়াগামী প্যাসেঞ্জার থেকে আমগুড়ি ষ্টেশনে নেমে খোঁজ করলাম। কিন্তু কোথায় সাপ্লাই অফিসার! কুলির মাথায় বিছানাপত্র চাপিয়ে এদিক ওদিক অনেক জিজ্ঞাসা করলাম, কিন্তু নাগা হিল্‌স্-এর সাপ্লাই অফিসারের হদিস কেউ আমাকে দিতে পারল না। যা'কেই জিজ্ঞেস করি, সে-ই বলে এখানে নাগা হিল্‌স্-এর কোন সাপ্লাই অফিসার থাকেন বলে জান না।

তবে কি টেলিগ্রামটাই ভুল ? তাই বা হতে যাবে কেন। ব্যাগ থেকে টেলিগ্রামটা আবার বের করলাম। স্পষ্ট লেখা আছে -

'Get down at Amguri Station and contact Supply Officer, Naga Hills to go to Tuensang.'

সুতরাং ভুল হওয়ার ত কথা নয়।

শেষ পর্যন্ত রেলের মালবাবুর শরণাপন্ন হলাম। সাপ্লাই অফিসার যখন, তখন মালবাবুর সঙ্গে যোগাযোগ না থাকাটা অস্বাভাবিক।

মালবাবুকে জিজ্ঞেস করতেই তিনি আমার দিকে কয়েক মুহূর্ত এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। এই অপলক দৃষ্টিপাতে কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করলাম। ভদ্রলোক বললেন, 'নাগা হিল্‌স্-এ কি চাকুরি নিয়ে যাচ্ছেন, না বেড়াতে ?' কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে শুধরে নিয়ে স্বগতোক্তির মত বললেন, 'চাকুরি নিয়েই হবে! কারণ নেহাৎ মাথায় ছিট না থাকলে ত আর কেউ ওখানে বেড়াতে যায় না ?'

মাঝবয়সী বাঙ্গালী ভদ্রলোক। গোলগাল চেহারা। বাঙ্গালী বলে ভরসা হয়েছিল। কিন্তু আমাকে নিয়ে রসিকতা করতে দেখে বেশ দমে গেলাম।

আমি বললাম, 'রসিকতা পরে করবেন। নাগা হিল্‌স্ -এর সাপ্লাই অফিসার কোথায় থাকেন, যদি জানেন, বলুন।'

ভদ্রলোক বললেন, এখানে সাপ্লাই অফিসার টফিসার কেউ নেই। তবে ষ্টোরকীপার একজন আছে। ছোকরা হামেশাই আমার এখানে আড্ডা দিতে আসে। আজ এখনো আসেনি।'

যা হোক, মালবাবু পথের নিশানা দিলেন। কুলির মাথায় আবার বিছানাপত্র চাপিয়ে রওয়ানা হলাম সেই ষ্টোরকীপার ভদ্রলোকের উদ্দেশে।

আমগুড়ি ষ্টেশন ছাড়িয়ে টাউনের একপাশ দিয়ে একটি আধা কাঁচা রাস্তা ধরে কুলি চলল।

শহর থেকে বাইরে এসে পড়লাম। সূর্য ডুবে গেছে। ফেব্রুয়ারীর শীত ঝাপটে ধরতে লাগল। আমি কুলিকে জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি ঠিক পথে চলেছ ত ? অনেকটা রাস্তা ত এলাম, আর কত দূর ?'

কুলি পুঙ্গব বাঁ হাতে তার গোঁফ জোড়ায় তা দিয়ে বলল, 'আইয়ে সাব। ঘাবড়াইয়ে মাৎ। আমগুড়ি ষ্টেশনে জীবনটা কাটল, আর চিনব না রাস্তা?'

অদূরে গোটা কয়েক বাঁশের কাঁচা ঘর দেখা গেল। সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে ঘরগুলোকে দূর থেকে কয়েকটা খড়ের ঢিবির মত দেখাচ্ছিল। সেই ঘরগুলোর পাশে গিয়েই কুলি মাথা থেকে মোট নামিয়ে বলল, 'এই হল নাগা পাহাড়ের ষ্টোর। মালুম হচ্ছে। কোই আদমী লোক নহী।'

আমি কুলিকে বললাম, 'একটু ডাকাডাকি কর। কেউ থাকলে নিশ্চয়ই সাড়া দেবে।'

অনেকক্ষণ ডাকাডাকি করার পর পাশের নদীর গা বেয়ে দু'টি ছায়ামূর্তি এগিয়ে এল। সবাঙ্গ কম্বলে ঢাকা। তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে কুলি আমাকে বলল যে, এরাই এখানকার চৌকিদার। নদীতে জল আনতে গিয়েছিল।

আমি বললাম, আমি তুয়েনসাং যাব। আমাকে এখানে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে।'

ওদের হাবভাব দেখে মনে হল ওরা আমার কথা বুঝতে পারে নি। কিন্তু কুলি ওদের বুঝিয়ে বলল, আমি নতুন ডাক্তার। তুয়েনসাং যাব।

এবার ওরা বুঝল। এবং সঙ্গে সঙ্গে চটপট আমার বিছানাপত্র ট্রাঙ্ক ইত্যাদি ঘরের ভিতরে নিয়ে গেল।

ভিতরে কাঠের দু'খানা তক্তপোশ। ওরা একখানা তক্তাপোশের ওপর আমার বিছানা পেতে দিল।

ষ্টোরকীপার ভদ্রলোক কোথায় জানতে চাইলাম। ওরা বলল, 'বিকালে উনি কোথায় বেড়িয়ে গেছেন। ফিরতে অনেক রাত হবে।'

কুলি এবার বিদায় চাইল। তা'কে বিদায় দিয়ে বসে রইলাম খাটের ওপর। সম্পূর্ণ নতুন পরিবেশ। গাটা কেমন যেন ছমছম করতে লাগল। সবচেয়ে মুশকিল হল, যা'রা এখানে আছে তা'রা আমার কথা বুঝতে পারছে না, আর আমি বুঝতে পারছি না ওদের কথা। সুতরাং হারিকেনের স্তিমিত আলোকে বসে বসে ঘরের কড়িকাঠ গোনা ছাড়া আমার কোন কাজ রইল না।

বিছানার ওপর বসে বসে আকাশ পাতাল ভাবছিলাম। এলোমেলো নানা কথা মনে ভিড় করে এল।

ছাত্রজীবনটা যেন একটা চশমা। সে চশমার কাঁচ সাদা নয় — রঙীন তার ভেতর দিয়ে আকাশ, পৃথিবী, গাছপালা সবই রঙীন মনে হয়।

'জীবনে তুই কি হবি, রাখাল?'

'তুমিই বল মা, কী হব।'

'তুই ডাক্তার হ' বাবা। যে রোগ তোর মা'কে কুরে কুরে খাচ্ছে, তার হদিস বের করিস তুই।'

সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র রাখাল মায়ের কথায় কেমন যেন তন্ময় হয়ে যেত। মায়ের রোগজীর্ণ পাণ্ডুর মুখের দিকে তাকিয়ে তার চোখ ফেটে জল আসত। মা বলতেন, 'ডাক্তার হ' বাবা।' সপ্তম শ্রেণীর দরজায় দাঁড়িয়ে রাখাল বুঝতে পারত না কতটা পড়াশুনা করলে ডাক্তার ভৌমিকের মত হওয়া যায়। ভৌমিক কাকার কথা মনে করে অবাক হয়ে যেত রাখাল। কত বড় ডাক্তার তিনি। এম বি পাশ ডাক্তার এ তল্লাটে কেউ নেই। বাবা বলতেন, সরকারী চাকুরিতে ঢুকলে ভৌমিক কাকা কবেই নাকি সিভিল সার্জ্জন হয়ে যেতেন। কিন্তু কাকা সে পথে যান নি। মহকুমা শহরে স্বাধীনভাবে প্রাক্‌টিস্ করতেন। অর্থ এবং নামের অন্ত ছিল না ভৌমিক কাকার। তাঁর সে নাম মহকুমার সীমানা ছাড়িয়ে জেলা সদরেও পৌঁছেছিল।

খাকী হ্যাফপ্যান্টের ওপর শাদা হাফশার্ট পরে এবং মাথায় খাকী রঙের টুপি পরে সপ্তাহে একদিন সাইকেলে চড়ে আসতেন এবং মা'কে অনেকক্ষণ ধরে দেখে নানা রকম ঔষধ ও ইনজেকশন দিতেন। যেদিনই ভৌমিক কাকা আসতেন, মা বলতেন, 'ভৌমিক ঠাকুরপো, আর ত পারি না। আমায় হয় বাঁচান, না হয় এমন ইন্‌জেক-

শন দিন যা'তে আপনাকে এসে আর কষ্ট করতে না হয়।'

ভৌমিক কাকা বলতেন, 'ষাট ষাট বৌদি, অমন কথা বলবেন না। আজ আপনাকে যে ইনজেকশন দিলাম, তা'তে আপনি নিশ্চয়ই সেরে উঠবেন।' মা, কিন্তু সেরে উঠতেন না। বরং দিনের পর দিন তাঁর অবস্থা খারাপের দিকে যাচ্ছিল. রাখাল তা বুঝতে পারত।

মায়ের কী অসুখ হয়েছিল রাখাল তখন তা জানত না। শুধু বুঝত, মায়ের শরীর ক্রমশঃ খারাপ হচ্ছে। বড় বড় কাপড়ের টুকরো করে মা তা গোপন করার আপ্রাণ চেষ্টা করতেন, কিন্তু মাঝে মাঝে রাখালের চোখে তা ধরা পড়ত।

মা বলতেন, 'ভাল করে লেখাপড়া কর্ বাবা। তোকে যে ডাক্তার হতে হবে। ডাক্তার হতে গেলে অনেক পড়াশোনা করতে হয় রাখাল। তোর ভৌমিক কাকা কতটা পাশ করে তবে ডাক্তার হয়েছেন।'

মায়ের কাছে শুনে শুনে রাখালের সত্যি ডাক্তার হবার ইচ্ছা হ'ত। কিন্তু অনেক পড়াশুনার কথা শুনলেই ভাল লাগত না। কুকুরের ছানা, টিয়ার বাচ্চা, লাটাই-ঘুড়ি—এ সবই পড়াশোনার চেয়ে ভাল লাগল।

তারপর একদিন মেট্রিক, আই এস সি পাশ করে রাখাল সত্যি সত্যি মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হয়েছিল। কিন্তু ডাক্তারি পড়ার শুরুতেই মা একদিন হঠাৎ চলে গেলেন। আকাশ ফাটিয়ে চীৎকার করে কেঁদেছিল রাখাল। আমি ত ডাক্তারি পড়ছি মা তোমার অসুখ সারাব বলে, কিন্তু আমাকে ত তার সময় দিলে না। শোকের প্রথম ধাক্কা সামলে ওঠার পর কেমন যেন হয়ে গিয়েছিল রাখাল। অনেকবার ভেবেছে, ডাক্তারী পড়াই ছেড়ে দেবে—ডাক্তারী পড়ে আর কি হবে?

বাবা টের পেয়েছিলেন রাখালের মনের কথা। আজীবন স্কুল-শিক্ষক বাবার রাখালের মনের কথা বুঝতে অসুবিধা হয়নি। একদিন নিভৃতে ডেকে বললেন, 'এত ভেবে কী হবে, রাখাল? তোমার দুঃখের কথা বুঝতে পারি। ডাক্তার হয়ে মা'কে চিকিৎসা করতে পারনি, তা'তে দুঃখ তোমার হবে। কিন্তু তোমাকে এখন আরো ভাল করে পড়তে হবে, অনেক বড় ডাক্তার তোমাকে হতে হবে। তোমার মা'কে চিকিৎসা করার সুযোগ তুমি পাওনি, কিন্তু তোমার মায়ের মত যারা অসুখে ভুগছে, তা'দের যদি তুমি নিরাময় করতে পার, তবেই তোমার মায়ের আত্মা তৃপ্ত হবে। তুমি ত জান রাখাল, মানুষের দেহের মৃত্যু হয় কিন্তু আত্মার মৃত্যু হয় না। আত্মা অমর। গীতার সেই শ্লোকটা ত তোমার মনে আছে—

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥

অস্ত্র দিয়ে এই আত্মাকে কাটা যায় না, আগুন ইহাকে পোড়াতে পারে না, জল ইহাকে ভিজাতে পারে না এবং বাতাস ইহাকে শুকিয়ে ফেলতে পারে না।

আত্মা মানে কি? আত্মা মানে শক্তি। যে শক্তির বলে জীব জীবনধারণ করে এবং যে শক্তির অভাবে জীবনের পরিসমাপ্তি হয়, তা-ই আত্মা। জীবনের পরিসমাপ্তি হলেও আত্মার বিনাশ হয় না—হয় শুধু তার রূপান্তর। এই শক্তিকে ত বিজ্ঞান স্বীকার করে। ফিজিক্স তাই ত বলে, Energy can neither be created, nor can be destroyed.'

রাখাল বাবার সঙ্গে তর্ক করেনি। বাবার কাছে বহুবার শোনা কথাটা যেন সে আজ নতুন করে জেনেছে। আত্মার মৃত্যু নেই। তা'হলে মায়ের আত্মারও মৃত্যু হয়নি।

রাখাল আবার বই হাতে তুলে নিয়েছিল। রাখাল এবার অন্য লোক। একমাত্র বই ছাড়া তার কাছে আর দ্বিতীয় কোন সত্তা নেই। তা'কে ডাক্তার হতে হবে—বড় ডাক্তার। তা'কে অনেক রোগী ভাল করতে হবে, যারা তার মায়ের মত রোগে ভুগে যন্ত্রণায় বিবর্ণ হয়ে মরছে। তবেই তার মায়ের আত্মা তৃপ্ত হবে। বাবা বলেছেন, মানুষের দেহের মৃত্যু হয়, কিন্তু আত্মার মৃত্যু হয় না।

ডাক্তারী পরীক্ষার ফল বেরুবার পর রাখালের চোখ ফেটে জল বেরিয়েছিল। আজ যিনি সবচেয়ে বেশী খুশী হতেন সেই মা-ই নেই।

হাউস সার্জন হিসাবে মাত্র ছ' মাস কাজ করার পরই একদিন বিনা নোটিসে বাবাও চলে গেলেন। আবার ভেঙ্গে পড়ল রাখাল।

পিতার পারলৌকিক কাজ সম্পন্ন করেই হাউস সার্জনের কাজে ইস্তফা দিল রাখাল। পিতৃসম প্রাচীন অধ্যাপক ডেকে বললেন, 'তুমি কি আর কাজ করবে না?'

'না, স্যার।'

'কী করবে?'

'জানি না।'

'তুমি যে আমার কাছে এসেছিলে ফাদার হাউড করবে বলে, তার কী হবে?'

'আর প্রয়োজন নেই।'

পুরু চশমার কাচের ভেতর দিয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে-ছিলেন অধ্যাপক। কী যে তিনি বুঝেছিলেন, তিনিই জানেন। তারপর বলেছিলেন, 'বুঝেছি। তবে হ্যাঁ, যখনই প্রয়োজন বোধ করবে, আমার কাছে আসতে সঙ্কোচ করো না।'

অধ্যাপকের পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে বেরিয়ে এসেছিল রাখাল।

'গুড্ ইভনিং, ডক্টর।' চমকে ওঠে রাখাল। চিন্তার সূত্র ছিঁড়ে যায়।

'আমি মিস্টার জামির। এ, সি,—আই মীন এ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার লংলেং।'

উঠে হাত বাড়িয়ে করমর্দন করলাম। মিস্টার জামির বলে চললেন, 'আমগুড়ি থেকে লংলেং যাচ্ছিলাম। পথে জীপের চাকা ফুটো হয়ে গেল। তাই ফিরে আসতে হল। এখানে এসে শুনলাম আপনার কথা। ভালই হল, আপনার সঙ্গে পরিচয় হল। আপনি কালসকালে তৈরী থাকবেন। আপনাকে আমার জীপে নিয়ে যাব।'

মিঃ জামির চলে গেলেন। আমি আবার সাত পাঁচ ভাবতে লাগলাম। ঘড়ির কাঁটা টিক টিক করে অবিশ্রাম ছুটে চলেছে। আমার চোখে ঘুম নেই। গভীর রাত্রি পর্যন্ত চৌর-কাঁপার ভদ্রলোক ফিরে এলেন না।

মিঃ জামিরের ডাকাডাকিতে ধড়মড় করে উঠে বসলাম। ক্লান্ত চোখের পাতা শেষ রাত্রিতে কখন বুজে এসেছিল জানি না। চোখ খুলেই দেখি মিঃ জামির একেবারে আমার সামনে দাঁড়িয়ে।

মিঃ জামির উত্তেজিতভাবে বললেন, 'আপনি তাড়াতাড়ি তৈরী হোন, নইলে আমরা যেতে পারব না। গেট বন্ধ হয়ে যাবে। কনভয় অলরেডি চলতে শুরু করেছে।'

আমি তাড়াতাড়ি বিছানাপত্র গুছিয়ে মিঃ জামিরের জীপে গিয়ে বসলাম। আমার জিনিষপত্র সব মিঃ জামিরের চাকর জীপের ভেতর দিয়ে দিল। সোঁ করে জীপ ছুটে চলল।

জীপ আমগুড়ির গেটে এল। আমার চমক ভাঙল। এতক্ষণ যে কথাটা ভাবতে ভাবতে আসছিলাম, তার উত্তর এখানে এসে আপনা থেকেই পেয়ে গেলাম।

আমগুড় গেটে অনেক গাড়ি দাঁড়িয়ে। প্রায় সবই মিলিটারী গাড়ি সৈন্য ভর্তি। তার সঙ্গে কিছু অসামরিক গাড়ি ও জীপ। এ সব গাড়িতে বেশীর ভাগই সরকারী কর্মচারী—কয়েকজন ব্যবসায়ী। বুঝতে পারলাম, নাগা পাহাড়ে যাতায়াত মিলিটারীর সঙ্গে ছাড়া হয় না। তাই এই বিরাট আয়োজন। মিলিটারী গাড়িতে সৈন্যরা সশস্ত্র।

আমগুড়ি গেটে বেশ কিছু দোকানপাট গড়ে উঠেছে। কনভয়ের যাতায়াতের সময়ে এখানে বেশ ভাল বেচা-কেনা হয়। কয়েকটা রেষ্টুরান্ট ও হোটেল বেশ ভাল।

এমনি একটা রেষ্টুরেন্টে আমাকে নিয়ে গেলেন মিঃ জামির। উনি নিজেই চা ও জলখাবারের অর্ডার

দিলেন। আমরা চা খাচ্ছি—এসে বসলেন আরো দু'জন আমাদের টেবিলে। ওঁরা দু'জনই মিলিটারীর লোক। আমার দিকে তাকিয়ে একজন পরিষ্কার বাংলায় বললেন, 'আপনি নিশ্চয়ই প্রথম নাগা পাহাড়ে যাচ্ছেন। পেশায় আপনি ডাক্তার এবং সম্ভ পাশ করা।'

আমি আশ্চর্য হলাম। ভদ্রলোক কি জ্যোতিষী নাকি।

আমি বললাম, 'হ্যাঁ, তবে আপনি জানলেন কি করে?'

হো হো করে হেসে উঠলেন ভদ্রলোক। তারপর বললেন, 'ডক্টর, আমাদের জানতে হয়। আপনাকেও জানতে হবে। আসুন, আগে পরিচয় হোক। আমি মেজর ঘোষ এবং উনি ক্যাপ্টেন আচার্য।'

আমি বললাম, 'কিন্তু আপনি কি করে জানলেন যে আমি ডাক্তার?'

মেজর ঘোষ বললেন, 'শার্লক হোম্‌সের মত পরিবেশ এবং পরিস্থিতিকে বিশ্লেষণ করে। তারপর সেই আমটা-আঁশটার গল্প নিশ্চয় মনে আছে।'

নিজের দিকে তাকিয়ে নিজেই হেসে উঠলাম। আমার কোটের বুক পকেটে ঔষধের কোম্পানীর দেওয়া যে ছোট্ট একটা রেডক্রশ রয়েছে, তা আমার নিজেরই খেয়াল ছিল না।

এবার মেজর ঘোষের দিকে তাকালাম। উনি বললেন, 'কী? বাঙ্গালী বলে মনে হচ্ছে না, এই-ত? তা আর হবে কি করে? বিহারের ভাগলপুরে তিন-পুরুষ হয়ে গেল, তাই চেহারায় বাঙ্গালীর কোমলতা যদি খুঁজে না পান, তবে সেটা কি আমার দোষ?'

আমরা সবাই হেসে উঠলাম। মিঃ জামির কেমন যেন অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন। ক্যাপ্টেন আচার্য, মেজর ঘোষ এবং আমি এমনভাবে প্রাণ খুলে বাংলায় কথা-বার্তা বলছিলাম যে মিঃ জামিরের অস্তিত্বই যেন কিছুক্ষণের জন্য ভুলে গিয়েছিলাম। তাই পরিস্থিতিকে একটু সহজ করার জন্য আমরা ইংরেজীতে কথাবার্তা বলতে শুরু করলাম।

মিঃ জামির আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ডক্টর, ইউ ওয়ান্টেড্ টু গো ব্যাক্ ফ্রম আমগুড়ি। নাউ আই থিঙ্ক ইউ আর হ্যাপি টু মীট দিজ্ ফ্রেণ্ড্‌স্।'

আমি বললাম, 'সিওর্‌লি ইয়েস্, বাট্ ইনক্লুডিং ইউ'।

আবার সবাই হেসে উঠল।

মিঃ জামির ঠিকই বলেছেন। গত রাত্রিতে আমগুড়িতে নাগা হিল্‌স্-এর মালগুদামে বসে বসে আকাশপাতাল ভাবছিলাম। ওরা অমাকো টেলিগ্রাম করেছিল, আমগুড়িতে নাগা হিল্‌স্-এর সাপ্লাই অফিসারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে। কিন্তু সাপ্লাই অফিসারের সন্ধানে বেরিয়ে যে অভিজ্ঞতা হল, তা'তে মিঃ জামিরের সঙ্গে দেখা হতেই কিছুটা অভিমান ভরেই বলেছিলাম, 'ভাবছি ফিরেই যাব।'

মিঃ জামির অতিশয় সহৃদয় সুশিক্ষিত এবং মার্জিতরুচি 'ভদ্রলোক'। আমাকে বলেছিলেন, 'ডক্টর, বিজ্ঞাপনে মুগ্ধ হয়ে অনেক ডাক্তারই নাগা হিল্‌স-এ চাকুরি করতে আসেন। হামেশাই নতুন ডাক্তারদের সঙ্গে দেখা হয়। কেউ কেউ আমগুড়ি ষ্টেশন থেকেই ফিরে যান, দেখেছি। কেউ কেউ তুয়েনসাং পর্যন্ত যান বটে, কিন্তু কাজে যোগ-দান না করেই ফেরৎ কনভয়ের সঙ্গে ফিরে আসেন। আর কেউ কেউ দু'চার-ছ' মাস—বড় জোর বছরখানেক চাকুরি করেন। কিন্তু কাউকে আজ পর্যন্ত একটানা তিন বছর চাকুরি করতে দেখতে পেলাম না। কেবল এক ডঃ ব্যানার্জি এসেছিলেন যিনি আড়াই বছর ছিলেন এবং কিছু টাকা জমিয়ে এখান থেকেই সোজা ইংল্যাণ্ড চলে গিয়েছিলেন এম আর সি পি পড়তে।,

ডঃ ব্যানার্জির আশংকাতে মিঃ জামির যেন আমাকে স্পষ্ট দেখতে পেলেন।

মিঃ জামির আমাকে কথা বলার অবকাশ না দিয়েই বলেছিলেন, "ডক্টর, ইউ আর এ ইয়ংম্যান্। হোয়াই আর ইউ থিঙ্কিং অফ্ গোয়িং ব্যাক্? ইফ্ ইউ ডু নট লাইক টু স্টে এ্যাট নাগা হিল্‌স্, কাম্ উইথ মি আপ টু

তুয়েনসাং। ইট উইল্ বি এ্যান্ এ্যাডভেঞ্চার ফর ইউ।”

কথাটা আমার ভারী পছন্দ হয়েছিল। এ্যাডভেঞ্চার। ছোটবেলায় দাদিভাই-এর মুখে শোনা গল্পের নাগা পাহাড় যেন আমায় হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

হঠাৎ ক্যাপ্টেন আচার্য এবং মেজর ঘোষ যেন অতি-মাত্রায় চঞ্চল হয়ে উঠলেন। বললেন, “দি কনভয় হ্যাজ স্টার্টেড মুভিং। লেট আস্ বি কুইক্।” তাড়াতাড়ি চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়ে আমরা চারজন উঠে পড়লাম। ক্যাপ্টেন আচার্য তাঁর জীপে চলে গেলেন। মেজর ঘোষ বললেন, “আপনি চলুন আমার জীপে।” আমি তা-ই করলাম।

মিঃ জামির বললেন, “ভাল ব্যবস্থা হল। আমি ও মুকুকচং-এর আগেই অন্য রাস্তা ধরে লংলেং চলে যাব। রাস্তায় গাড়ি পাল্টানো আপনার পক্ষে অসুবিধাজনক হত।”

অসংখ্য গাড়ির এক বিরাট শোভাযাত্রা চলেছে। একে একে গাড়গুলি আমগুড়ি গেট পার হল। আমরা শোভাযাত্রার একেবারে শেষের দিকে।

গেট পার হয়ে মাইলখানেক মোটামুটি সমতল রাস্তা ধরেই গাড়ি চলল। দুপাশে চায়ের বাগান। ভারী সুন্দর দৃশ্য—যেন একখানা প্রকাণ্ড সবুজ গালিচা বিছানো।

হঠাৎ এক ঝাঁকুনি খেলাম। দেহটা পেছনদিকে হেলে গেল। দেখলাম, সমতল-ভূমির গা ঘেঁষে খাড়া পর্বত এবং আমাদের জীপ ঐ পর্বতের গা বেয়ে উঠছে। সামনের সমস্ত গাড়িও আঁকাবাঁকা রাস্তা দিয়ে সামনের পর্বতের গায়ে উঠে পড়েছে।

মেজর ঘোষ বললেন, “এই হল নাগা পাহাড়ের শুরু।”

আমরা এগিয়ে চলেছি। সামনে পেছনে ডাইনে-বাঁয়ে উচ্চ পর্বতশ্রেণী। কোথাও অরণ্য গভীর, কোথাও অগভীর। গাড়ির ঘর্ঘর শব্দ কোথাও ঝর্ণার ঝর্ঝর শব্দের নীচে চাপা পড়ে যাচ্ছে।

রাস্তা কাঁচা। এমন কি খুব বেশী চওড়াও নয়। এখানে-ওখানে পাহাড় কেটে রাস্তাকে চওড়া করা হচ্ছে।

গৈরিক ধুলায় আকাশ ভরে উঠেছে। দূরের গাড়ি-গুলোকে কখনো কখনো দেখাই যাচ্ছে না। কেবলমাত্র শব্দে ওদের অস্তিত্ব টের পাওয়া যাচ্ছে। ধুলায় আমাদের পরণের কাপড়-চোপড় একাকার।

মেজর ঘোষ এবং আমি পাশাপাশি বসেছিলাম। এতক্ষণ একটাও কথা হয়নি। হঠাৎ মেজর ঘোষ বললেন, “ডক্টর, কেমন লাগছে?”

আমি বললাম, ‘খুব ভাল। মিস্টার জামিরকে ধন্য-বাদ। ভাগ্যিস্ ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, নইলে হয়ত আমগুড়ি গেট থেকে ফিরেই যেতাম এবং ফিরে গেলে এমন সুন্দর অভিজ্ঞতা হত না।’

হঠাৎ দূরে একটা ছোট শহর দেখা গেল। ছবির মত সুন্দর ঘরবাড়ী। কিন্তু পরের বাঁকে সে শহর অদৃশ্য হয়ে গেল। এ যেন পাহাড়ের গায়ে এক লুকো-চুরি খেলা।

মেজর ঘোষ বললেন, ‘ডক্টর, পাহাড়ের ঘরবাড়িগুলো আলেয়ার মত। এই দেখছেন, আবার এই নেই। ওটা মেরাংকং। এখনো অনেক দূরে।’

মেজর ঘোষ বলে চললেন, ‘শহরটা সবে গজিয়ে উঠেছে মরুভূমির বুকে মরূদ্যানের মত। আমগুড়ি থেকে মুকুকচং যাওয়ার পথে গজিয়ে ওঠায় আসা এবং যাওয়ার সময় সমস্ত গাড়ি ও যাত্রী এখানে বিশ্রাম করে, আমরাও ওখানে গিয়ে বিশ্রাম করব।’

আমরা যখন মেরাংকং পৌছলাম, তখন বেলা একটা বেজে গিয়েছে। সবগুলো গাড়ী লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল, যেন একটা মস্ত বড় রেলগাড়ী চলতে চলতে হঠাৎ থেমে গেছে। গাড়ী থেকে প্রায় সবাই লাফিয়ে পড়ল। যে ক'খানা চায়ের দোকান ছিল, তা মানুষের ভিড়ে ভরে গেল। ক্ষিধেয় আমার পেট জ্বলে যাচ্ছিল।

মেজর ঘোষ বললেন, "চলুন, আপনার খাওয়ার একটা ব্যবস্থা করি। আমরা খাব একেবারে মুকুকচং পৌছে।'

আমি বললাম, 'জলদি চলুন। আমার আর সহ্য হচ্ছে না।'

রাস্তার পাশে খড়ের ছাউনি দেওয়া একখানা ঘরে আমাকে নিয়ে গেলেন মেজর ঘোষ। ঘরের মেঝে, দেওয়াল সব বাঁশের। মাঝখানে দু'খানা উঁচু বেঞ্চ। তার দু'পাশে দুখানা নীচু বেঞ্চ, সেই বেঞ্চে বসে কয়েক জন তাড়াতাড়ি খাচ্ছে।

আমাদের দেখে একটি নাগা মেয়ে এগিয়ে এল। মেজর ঘোষ বললেন, 'সাহেব-কো ভাত খিলাও।' তার পর আমাকে বললেন, 'বসে পড়ুন ঐ বেঞ্চে। কনভয় খুব বেশী সময় থামবে না।'

নাগা মেয়েটি একটা প্লেটে ভাত ও একটা বাটিতে ডাল নিয়ে এল এবং আর একটা বাটিতে খানিকটা তরকারী দিল। আমি ঐ তরকারী দিয়ে দু'টো ভাত মেখে মুখে দিয়েই মেজর ঘোষের দিকে তাকালাম।

মেজর ঘোষ ঠোঁটের ফাঁকে সিগারেট রেখে মুচকি হেসে বললেন, 'আপনি ঠিকই ধরেছেন। জিনিষটা না মাছ, না শুঁটকি, কিন্তু খেতে মন্দ নয়।'

আমি বললাম, 'খেতে মন্দ নয় ঠিকই। ঝালটা একটু যা বেশী। কিন্তু না মাছ, না শুঁটকি—সেটা আবার কি?'

মেজর ঘোষ বললেন, 'ডক্টর, ওটা হল স্মোক্‌ট্‌ ফিস (smoked fish)। এসব পাহাড়ী জায়গায় মাছ খুব সহজলভ্য নয়। যদি পাওয়া যায়, তবে কিছুটা মাছ সবাই উনুনের ওপর ঝুলিয়ে রাখে। আর উনুন যেহেতু এখানে রাতদিন জ্বলে তাই উনুনের তাপে শুকিয়ে শুকিয়ে মাছের একটা বিচিত্র রূপান্তর হয়। নাগা পাহাড়ে যদি স্মোক্‌ট্‌ ফিশের তরকারী পান তবে আপনি ভাগ্যবান্‌।'

কনভয় চলতে শুরু করেছে। আমরাও তাড়াতাড়ি এসে জীপে উঠলাম।

বেশ কয়েক বছর আগের কথা। তাই লিখতে বসেও কেমন যেন সব গুছিয়ে লিখতে পারছি না।

সে এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা। পাহাড়ের গায়ে খাঁজ কেটে রাস্তা তৈরী হয়েছে। তার উপর দিয়ে সরীসৃপের মত চলেছে বিরাট কনভয়। এক পাশে তাকাতে গেলে মাথাটাকে ঘুরিয়ে প্রায় পিঠের ওপর ঠেকাতে হয়। উঁচু—কেবল উঁচু—প্রায় গগনস্পর্শী পাহাড়ের চুড়ো। কোনোটার গায়ে জঙ্গলের চিহ্নমাত্র নেই। কেবল পাথর আর পাথর—স্তরে স্তরে সাজানো পাথর। কোনোটার গায়ে ছোট ছোট গুল্ম বা ঘাস। কোন্‌ এক সুদূর অতীতে পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ আলোড়নের ফলে পর্বত সৃষ্টি হয়েছিল, আবহমান কালের সাক্ষী সে পর্বত ধ্যানমগ্ন সন্ন্যাসীর মত নির্বিকার, স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

অন্যপাশে তাকাতে গেলে প্রাণ কেঁপে ওঠে। নীচু আর নীচু। সে ঢালু কোথায় গিয়ে কোন্‌ পাহাড়ী নদী বা ঝর্ণার গায়ে ঠেকেছে, তা সব সময় অনুমান করা শক্ত।

প্রাচীন ভারতের অধিবাসীদের অন্যতম মঙ্গোলীয় জাতি। কখন্‌—কোন্‌ অতীতে এসে এরা ভারতের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের নিবিড় অরণ্যভূমিতে বসতি স্থাপন করেছিল, তা গবেষণার বিষয়। নাগারা সেই মঙ্গোলীয় জাতিরই একটা প্রশাখা। ভারতবর্ষে বহু সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন ঘটেছে, কিন্তু নাগা পাহাড়ে তার ছোঁয়াচ প্রায় লাগেনি। স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে যে সামগ্রিক উন্নয়নের কর্মকাণ্ড শুরু হয়েছে, তার থেকে নাগা পাহাড়ও বাদ পড়েনি। হাজার হাজার বছরের নিদ্রিত পর্বত আজ বহুমুখী উন্নয়নের কলকোলাহলে মুখরিত হয়ে উঠেছে। প্রচুর রাস্তাঘাট তৈরী হয়েছে—তৈরী হয়েছে বাড়ীঘর, অফিস-আদালত। আদিম জীবনকে বিদায় দিয়ে নাগা পাহাড় আজ গোটা ভারতবর্ষের ঐক্যতানের সঙ্গে গলা মিলিয়েছে।

আমরা এগিয়ে চলেছি। এ যেন একমুখো যাত্রা। সামনে চল—এগিয়ে চল। পিছনে তাকিও না, তাকাতে নেই।

আকাশে মেঘ জমেছে। ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মত মেঘের টুকরো আমাদের পাশ কেটে যাচ্ছে, আর যাওয়ার সময় গায়ে শীতের সূচ ফুটিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ সিরসিরে হাড়-কাঁপানো হাওয়া বইতে শুরু করল।

দূরে—বহুদূরে মেঘের জাল ভেদ করে ভেসে উঠল লাল এক পাহাড়ী শহর। ঘরগুলির ছাদ সব লাল রঙের। সব হিলটাইপ (Hill type) বাড়ী। দেয়াল সব সাদা চূণকাম করা, আর উপরে লাল রঙের টিনের ছাউনি।

আমি বললাম, 'মেজর ঘোষ, আমার মনে হচ্ছে আমরা মুকুকচং এসে গেছি।'

মেজর ঘোষ বললেন, 'আপনার অনুমান ঠিক। তবে আমরা এসে যাইনি। পৌছতে আরও ঘণ্টা দুই লাগবে।'

ঘড়িতে তখন তিনটে। তার মানে আমরা সন্ধ্যা পাঁচটার আগে মুকুকচং পৌছতে পারছি না। হলও ঠিক তাই। পাঁচটা বাজতে দশ মিনিট আগে আমরা মুকুকচং শহরে প্রবেশ করলাম।

মুকুকচং মোটামুটি পুরনো শহর। তবে তার বর্তমান অঙ্গসজ্জা একেবারে হাল আমলের।

বর্তমান নাগাল্যাণ্ডের কোহিমা ও মুকুকচং জেলা দুটি ইংরেজ আমলে 'নাগা হিল্‌স্' নামক একই জেলার দুটি সাবডিভিশন্ ছিল। 'নাগা হিল্‌স্' আসামের একটি জেলা মাত্র ছিল। তুয়েনসাং অঞ্চল তার অধীনে ছিল না।

আসামের সমতল অঞ্চলের মত একই তালে তার পর্ব্বত অঞ্চলের উন্নতি হয়নি। অনেকে বলেন নাগা-বিদ্রোহের ইহাও নাকি অন্যতম কারণ।

নামে মহকুমা শহর হলেও কোহিমা ও মুকুকচং শহরে কাঁচা ও আধা-পাকা কিছু বাড়ী, কয়েকটি সরকারী অফিস এবং কিছুসংখ্যক আসাম রাইফেলের লোক ছাড়া বিশেষ কিছু ছিল না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় কোহিমার কিছু উন্নয়ন হয়েছিল। নাগাবিদ্রোহ সম্বন্ধে যখন আর কোন অবহেলা বা ঔদাসীন্যের অবকাশ রইল না, তখন কেন্দ্রীয় সরকার এর দ্রুত উন্নয়নের জন্য আসাম থেকে 'নাগা হিল্‌স্' জেলাকে পৃথক করে তার সঙ্গে তুয়েনসাং অঞ্চলকে যুক্ত করে ১৯৫৭ সালে 'নাগা হিল্‌স্' তুয়েনসাং এরিয়া' নামক কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের সৃষ্টি করলেন। তখন থেকে কোহিমা ও মুকুকচং মহকুমা দুটিকে জেলার মর্য্যাদা দেওয়া হল।

মুকুকচং-এর অধিবাসীরা প্রধানতঃ আও নাগা। খৃষ্টান মিশনারীদের চেষ্টায় আও-রা পাশ্চাত্ত শিক্ষা এবং কিছুটা আদব-কায়দায় অভ্যস্ত। আওদের মধ্যে প্রচুর শিক্ষিত। ছেলে এবং মেয়েরা প্রায় সমান তালে পাশা-পাশি চলেছে।

এতক্ষণ তো এলাম। এবার আজকের মত আশ্রয়ের দরকার। আমার দিক থেকে তার প্রস্তুতি দরকার। আমি মেজর ঘোষকে বললাম, 'আমাকে একটা হোটেলে থাকার ব্যবস্থা করে দিন।'

নাগা পাহাড়ের বুকে শীতের সন্ধ্যা নেমে এল। চারিদিকে অসংখ্য ইলেকৃট্রিক বাতি জ্বলে উঠল।

মেজর ঘোষ শহরের ভেতরে রাস্তার কয়েকটা বাঁক ঘুরে একটা বাড়ীর সামনে জীপ থামালেন। তারপর আমাকে বসতে বলে নীচে নামলেন। ফিরে এসে আমাকে বললেন, 'ডক্টর, এখানে চলবে না। এটা এখানকার এক এবং অদ্বিতীয় হোটেল। ডাল-ভাত যদিও বা জোটে, থাকবার জায়গা নেই।'

আমি একটু চিন্তিত হলাম। মেজর ঘোষকে বললাম, 'যদি ডাকবাংলো বা ঐ জাতীয় কিছু থাকে, তবে আমাকে সেখানে পৌছে দিন।'

লাইটার জেলে সিগারেট ধরিয়ে মেজর ঘোষ বললেন, 'চলুন, আপনাকে আবার আমগুড়ি রেখে আসি।' তারপর আমাকে কিছু বলবার অবকাশ না দিয়েই জীপ চালিয়ে দিলেন।

অনেক ঘরবাড়ী পার হয়ে অনেক রাস্তা অতিক্রম করে প্রায় শহরের এক কিনারে একটা চমৎকার বাংলোর

সামনে এসে মেজর ঘোষ জীপ থামালেন। তারপর জীপে বসেই ডাকলেন, 'উদয় বাহাদুর, ও উদয় বাহাদুর, কঁহা তুম?'

বাংলোর ভেতর থেকে এক নেপালী সিপাই বেরিয়ে এসে মেজর ঘোষকে স্যালুট করে দাঁড়াল।

মেজর ঘোষ বললেন, 'সাহেব কী সামান জীপ-সে নিকালকে ঘর কে ভিতর রাখো, আউর বাথরুম মে দো আদমীয়ো কে লিয়ে গরম পানি দো।'

উদয় বাহাদুর বুটে বুট ঠুকে 'জী হ্যাঁ' বলে চলে গেল।

মেজর ঘোষ আমাকে বললেন, 'জলদি ভিতরে চলুন। ঠাণ্ডায় শরীর জমে যাচ্ছে।'

মেজর ঘোষের সহৃদয়তায় মুগ্ধ হলাম। আমি শুধু বললাম, 'আমগুড়ি তবে এসে গেছি।

মুচকি হেসে মেজর ঘোষ বললেন, 'প্রায় তাই।'

মেজর ঘোষের ড্রয়িং রুমে ঢুকে দেখলাম, আরো একজন মিলিটারী অফিসার বসে আছেন। পরিচয় হল। উনি দার্জিলিং-এর লোক। ক্যাপ্টেন রায়। উনিও মেজর ঘোষের ওখানে প্রায় এক মাস ধরে আছেন।

* * * *

রাত তখন গভীর। ক্লান্ত ও অবসন্ন দেহ নিয়ে অঘোরে ঘুমুচ্ছিলাম। হঠাৎ একটা খট্ খট্ শব্দে ঘুমটা ভেঙে গেল। চুপ করে বিছানায় শুয়ে শব্দটা শুনবার চেষ্টা করতে লাগলাম। প্রথমে মনে হয়েছিল কে যেন কাঠের খড়ম পায়ে আমাদের ঘরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ঘরের মেঝেটা কাঠের, দেয়ালও কাঠের। উপরে টিনের ছাউনি। আসামের পার্বত্য অঞ্চলে এরূপ বাড়ীরই প্রাধান্য।

অনেকক্ষণ কান পেতে থাকার পর মনে হল, শব্দটা আমাদের ঘরে নয়, পাশের ঘরে।

পাশের ঘরে মেজর ঘোষ আছেন। এত রাত্রে মেজর ঘোষ সারাঘরে এতক্ষণ ধরে পায়চারি করছেন কেন? ক্রমশঃ মনে হল, শুধু পায়চারি নয়, কী যেন বিড়বিড় করে বলছেন ও।

আমি বিছানায় উঠে বসলাম। সঙ্গে সঙ্গে ছোট টর্চের একটা তীব্র আলো আমার চোখে মুখে এসে পড়ল। আলোর দিকে তাকিয়ে দেখলাম, ক্যাপ্টেন রায় আমার মুখে বাঁ হাতে টর্চ টিপে ধরে ডান হাতের তর্জনী নিজের দু'ঠোঁটের ওপর চেপে ধরে আছেন, যার সহজ অর্থ, তিনি আমাকে কোনও শব্দ করতে নিষেধ করছেন।

ক্যাপ্টেন রায়ের নির্দেশ মত আমি চুপচাপ বসে রইলাম। আমি যে ঘরে শুয়েছিলাম, সেই ঘরেই পাশে আর একটা খাটে ক্যাপ্টেন রায়। নিস্তব্ধ রাত্রি। প্রচণ্ড শীত। আমরা দু'খাটে দু'জন নিশ্বাস প্রায় বন্ধ করে উৎকর্ণ হয়ে বসে আছি। পাশের ঘরে মেজর ঘোষ অবিশ্রাম পায়চারি করছেন। আর কী যেন আবৃত্তি করছেন।

ক্যাপ্টেন রায় আবার ছোট টর্চের আলো আমার মুখে ফেললেন। ইসারায় দেয়ালের গায়ে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় আঙুল নির্দেশ করলেন এবং আমাকে বিছানা থেকে উঠে ওখানে যেতে আবার ইসারা করলেন।

দেয়ালের পাশে গিয়ে দেখলাম, এক জায়গায় দু'টো কাঠের মধ্যে একটুখানি ফাঁক রয়েছে। সেখানে চোখ রেখে যা দেখলাম তা'তে বিস্মিত এবং স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

মেজর ঘোষের ঘরে স্বল্প আলো জ্বলছে।

দীর্ঘদেহী মেজর ঘোষ পায়চারি করছেন সারা ঘর ময়। তাঁর পরনে স্লিপিং স্যুট—গায়ে অলষ্টার। তাঁর বাঁ হাতে একখানা ফটো এবং সে ফটোকে সম্বোধন করে আবৃত্তি করছেন, ''তুমি কি কেবলি ছবি, শুধু পটে লিখা।

... ...

নয়ন সম্মুখে তুমি নাই,
নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই ;
আজি তাই
শ্যামলে শ্যামল তুমি, নীলিমায় নীল।
আমার নিখিল
তোমাতে পেয়েছে তার অন্তরের মিল।
নাহি জানি, কেহ নাহি জানে
তব সুর বাজে মোর গানে ;
কবির অন্তরে তুমি কবি
নও ছবি, নও ছবি, নও শুধু ছবি।"

মেজর ঘোষ সারা ঘরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। হাতে যে ছবি তা এক অপূর্ব সুন্দরী রমণীর। মেজর ঘোষের দু'চোখ বেয়ে দরদর করে জল পড়ছে। কখনো সে ছবিকে বুকে চেপে ধরে ক্ষ্যাপার মত আবৃত্তি করছেন, "তুমি কি কেবলি ছবি—"

রাত কত হয়েছে জানি না। তবে খুব গভীর রাত —সন্দেহ নেই। ক্যাপ্টেন রায়কে ইঙ্গিতে টর্চটা জ্বালাতে বললাম। টর্চের আলোতে দেখলাম, রাত তিনটে।

এক সময় অবসন্ন এবং আচ্ছন্নের মত মেজর ঘোষ বিছানায় লুটিয়ে পড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন।

আমি বিছানায় এসে শুয়ে পড়লাম এবং কোন্ সময় আবার ঘুমিয়ে পড়লাম, জানি না।

মেজর ঘোষের ডাকাডাকিতে ঘুম ভাঙ্গল। ধড়মড় করে উঠে দেখি ঘড়িতে ছ'টা বেজে গেছে। মেজর ঘোষ এখন সম্পূর্ণ আলাদা মানুষ। বিগত রাত্রির ঘটনাকে আমার একটা স্বপ্ন বলে মনে হল।

মেজর ঘোষ এখন পুরোপুরি মিলিটারী ইউনিফর্মে সজ্জিত। দেখে বোঝাই যায় না যে তাঁর মনের কোথাও কোন দুর্বল স্থান আছে।

মেজর ঘোষ বললেন, 'ডক্টর, হুয়েনসাং-এর কনভয় এখনি রওয়ানা হবে। আমি আর্দালীকে বলে গেলাম, এখনি আপনার ব্রেকফাস্ট দিয়ে দেবে। আপনি খেয়ে তৈরী হয়ে নিন। আমাকে এখনি আবার যোড়হাট যেতে হচ্ছে। সুতরাং আপনার সঙ্গে যাওয়ার সময় আর দেখা হবে না। গুড্‌বাই। মুকুকচং দিয়ে যাতায়াতের সময় নিঃসঙ্কোচে এখানে চলে আসবেন কিন্তু।

মেজর ঘোষ চলে গেলেন। মেজর ঘোষকে এবং গত রাত্রিতে যা দেখলাম, তা যেন একটা প্রহেলিকা বলে মনে হচ্ছে।

ক্যাপ্টেন রায় আমার দিকে চেয়ে বললেন, 'ডক্টর, কিছু আন্দাজ করতে পারলেন?'

আমি বললাম, আন্দাজ হয়ত একটা করা যায়। কিন্তু আপনি ত এখানে এক মাস আছেন। এর মধ্যে আপনি কিছু বুঝলেন?'

ক্যাপ্টেন রায় বললেন, 'কিছুই না। তবে এক মাসে পাঁচ-ছ' দিন আমাকে এ দৃশ্য দেখতে হয়েছে। জানি না রোজ রাত্রেই মেজর ঘোষ এমনি করে কাটান কি না।'

... ...

১৯৬২ সালের চীন আক্রমণের সময় মিলিটারীর আনাগোনার অন্ত ছিল না গৌহাটিতে।

ইতিমধ্যে দু'বছর হয়ে গেছে। আমি কবেই নাগা হিল্‌স্ থেকে চলে এসেছি।

একদিন গৌহাটিতে রেলষ্টেশনের রেস্তরাঁয় বসে চা খাচ্ছিলাম। হঠাৎ পিঠে করে হাত পড়ায় পিছন ফিরে তাকালাম।

আমার পিঠে হাত দিয়ে যিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনি এক মিলিটারী অফিসার। ভদ্রলোকের মুখে পাইপ। পাইপটা কামড়ে ধরেই আমাকে বললেন, 'ক্যান্ ইউ রিকগ্‌নাইজ্ মী?'

আপাদমস্তক মিলিটারী পোশাকপরা। তবু কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই চিনতে আমার অসুবিধা হল না। আমি সোল্লাসে বললাম, 'হাউ নাইস্ ইট্ ইজ। ইউ আর ক্যাপ্টেন রায়।'

'নো, আই এ্যাম্ নো লংগার ক্যাপ্টেন রায়। আই এ্যাম নাউ মেজর রায়।'

উভয়ের কুশল বিনিময়ের পর মেজর রায়ের সঙ্গে অনেক আলাপ হল। উনি নাগা হিল্‌স্ থেকে বদলী হয়ে পশ্চিমে কাশ্মীর সীমান্তে যাচ্ছেন।

এক সময় আমি বললাম, 'মেজর ঘোষ কেমন আছেন? তিনি এখন কোথায়?'

মুহূর্তে মেজর রায়ের মুখটা ম্লান হয়ে গেল। তিনি বললেন, 'ছাট্ ইজ্ এ স্যাড্ ষ্টোরি, ডক্টর। হি ইজ্ নো মোর।'

'হি ইজ নো মোর।' মেজর ঘোষ বেঁচে নেই। মিলিটারী জীবনে এটা এমন কিছু আশ্চর্যের ঘটনা নয়। আজ না হয় চীনা যুদ্ধ। কিন্তু মেজর ঘোষ যেখানে পোষ্টেড ছিলেন, সেখানে হামেশা বিদ্রোহী নাগাদের সঙ্গে সংঘর্ষ হচ্ছে। কিন্তু মেজর ঘোষ জীবিত নেই শুনে আমার অন্তরটা কেমন যেন মুচড়ে উঠল।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'মেজর ঘোষ কোথায় কোন্ এন্‌কাউন্টারে মারা গেলেন?'

মেজর রায় পাইপটা বাঁ হাতে নিয়ে চুপ করে রইলেন। তারপর একটু নীচু গলায় বললেন, 'ডক্টর, হি ডিড্ নট্ ডাই ইন এ্যানি এন্‌কাউন্টার,—এ্যাণ্ড ট্রেজেডি লাইজ দেয়ার।'

আমি একটু উত্তেজিত ভাবে বললাম, 'তবে কী হয়েছিল, কোন অসুখ না এ্যাক্সিডেন্ট?'

'কোনটাই নয়।'

'কোনটাই নয় তবে কী হয়েছিল? বলুন মেজর রায়, শীগ্‌গীর বলুন।' আমার গলাটা শেষের দিকে কেমন যেন মিনতির মত শোনাল।

মেজর রায় জানালা দিয়ে দূর আকাশের গায়ে তাকিয়ে রইলেন। তাঁর মুখে কোন কথা নেই। হাতের পাইপটা প্রায় নিবে এল।

আগ্রহ ও উত্তেজনায় আমি অধৈর্য হয়ে উঠলাম। শালীনতা ভুলে গিয়ে আমি প্রায় চেঁচিয়ে বললাম, 'বলুন মেজর রায়, কী হয়েছিল তাঁর?'

আকাশের গা থেকে চোখ ঘুরিয়ে আবার ঘরের ভেতরে দৃষ্টি নিয়ে এলেন মেজর রায়। তারপর প্রায় ফিস্ ফিস্ করে বললেন, 'হি কমিটেড্ সুইসাইড্।'

'সুইসাইড্।' আমার চোখের ওপর দিয়ে দ্রুতবেগে অনেকগুলি ছবি চলে গেল। আমি বলাম, 'সুইসাইড্' কিন্তু কেন?'

মেজর রায় বললেন, 'সেই কেনটার সম্পূর্ণ উত্তর ত জানি না, ডক্টর। তবে অনুমান করতে পারি, তার কিছুটা আপনিও পারেন।'

মেজর রায় বলে চললেন, 'আপনি যেদিন মুকুকচং-এ মেজর ঘোষের অতিথি হয়েছিলেন, সেদিন রাত্রের কথা মনে পড়ে?'

আমি বললাম, 'খুব মনে পড়ে।'

মেজর রায় বললেন, 'আমাকে আরো কয়েক মাস থাকতে হয়েছিল মেজর ঘোষের ওখানে। ঐ দৃশ্য আমাকে

কুষ্ঠ ও ধবল

৭০ বৎসরের চিকিৎসাকেন্দ্রে হাওড়া কুষ্ঠ-কুটীর হইতে নব আবিষ্কৃত ঔষধ দ্বারা দুঃসাধ্য কুষ্ঠ ও ধবল রোগীও অল্প দিনে সম্পূর্ণ রোগমুক্ত হইতেছেন। উহা ছাড়া একজিমা, সোরাইসিস, দুষ্টক্ষতাদিসহ কঠিন কঠিন চর্ম্ম-রোগও এখানকার সুনিপুণ চিকিৎসায় আরোগ্য হয়। বিনামূল্যে ব্যবস্থা ও চিকিৎসা-পুস্তকের জন্য লিখুন।

পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্ম্মা কবিরাজ, পি,বি, নং ৭, হাওড়া

শাখা :—৩৬নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা-৯

দি বেঙ্গল আর্ট প্রিণ্টার

৭, ইণ্ডিয়ান মিরার ষ্ট্রীট,

কলিকাতা-১৩

প্রায়ই দেখতে হত। তবে শেষের দিকে খুবই ঘন ঘন। শেষের দিকে মেজর ঘোষ খুব প্রকৃতিস্থ ছিলেন না। সারাদিন কাজের মধ্যে ডুবে থাকতেন, কেউ কিছু টের পেত না। তবে আমি টের পেতাম। প্রায়ই যেন তিনি কাজের মধ্যেও অন্যমনস্ক হয়ে যেতেন। প্রায় রাতেই কিছু খেতেন না। শরীটাও শেষের দিকে খারাপ হয়ে গিয়েছিল।

'কী ভয়ঙ্কর মানসিক কষ্টেমেজর ঘোষ ভুগছেন, আমি বুঝতে পারতাম। কারণ এ মর্মান্তিক দৃশ্য আমাকে প্রায়ই দেখতে হ'ত। অবশ্য তখন আমার আর কোন ঔৎসুক্য ছিল না। বিছানা থেকে উঠে আর দেয়ালের গায়ে চোখ রাখতাম না। তবে মেজর ঘোষের যন্ত্রণায় আমিও যন্ত্রণা অনুভব করতাম। একান্ত সুহৃৎ হিসাবে স্থিরই করেছিলাম, উপরওয়ালাদের বলব, মেজর ঘোষকে কোনও সাইকিয়াট্রীষ্টের কাছে পাঠাতে। কিন্তু তার সুযোগ পেলাম না।

'সেদিনও মেজর ঘোষ সারারাত্রি ঘরময় পায়চারি করেছিলেন। আমিও অনেক রাত্রি জেগেছিলাম। কিন্তু শেষ রাত্রিতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, জানি না। রিভলবারের আওয়াজে হঠাৎ ঘুম ভাঙল। দেয়ালের গায়ে চোখ রেখে যা দেখলাম, তা'তে শিউরে উঠলাম। মেজর ঘোষ মেঝেতে লুটোচ্ছেন। রক্তে নাক মুখ কপাল একাকার। দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকলাম। আর্দালীকে ডেকে তুললাম। ফোনে হাসপাতালে খবর দিলাম। কিন্তু ততক্ষণে যা হবার হয়ে গিয়েছে। মেজর ঘোষ ডান হাতে কপালে গুলি করেছেন। বাঁ হাতে তখনো ঐ ফটো। জানি না ঐ ফটো কা'র জায়ার না দয়িতার।'

আসাম মেলের ঘণ্টা বেজে উঠল। ট্রেন ছাড়বে। মেজর রায় উঠে দাঁড়ালেন। টুপিটা টেবিলের ওপর থেকে তুলে মাথায় দিতে দিতে বললেন, 'ডক্টর, জীবনে বহু লোক দেখলাম, কিন্তু মেজর ঘোষের মত এমন মহাপ্রাণ লোক বেশী দেখিনি।' মেজর রায়ের গলাটা যেন ভারী শোনাল।

ট্রেন ছেড়ে দিল। ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে কেমন যেন একটা যন্ত্রণা অনুভব করলাম। মেজর ঘোষ জীবিত নেই। দু'বছর আগের সে দৃশ্য আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল, আর কানে যেন বাজতে লাগল মেজর ঘোষের সেদিনের গলা, "তুমি কি কেবলি ছবি, শুধু পটে লিখা—।"

প্রিন্স দ্বারকানাথ ও নারায়ণ কুড়ী

শক্তি গড়াই

সমাজ-সংস্কার ও জনকল্যাণের পরিপ্রেক্ষিতে উনবিংশ শতাব্দী ভারতের ইতিহাসে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। বৈপ্লবিক চিন্তা ও ব্যক্তিত্বের সমন্বয়ে সমাজ, শিক্ষা, সাহিত্য, শিল্প, ব্যবসা, ব্যক্তি ও বাক্ স্বাধীনতার ক্ষেত্রে ঘটেছিল অভূতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন। উন্নততর বিদেশী ভাবধারা এই নবজাগরণের জন্য অনেকাংশে দায়ী। প্রগতিশীল চিন্তাধারার পথিকৃৎ রামমোহন রায়ের বিশিষ্ট সহযোগী হিসাবে দ্বারকানাথ ঠাকুর ধর্মীয় কুসংস্কার, ও অন্যায় এবং দুর্দ্দশাগ্রস্ত দেশের উন্নয়ন উভয়ক্ষেত্রেই সার্থক প্রচেষ্টা করেছেন। বিদেশী বণিকদের অনুসৃত পদ্ধতিতে ভারতীয়দের স্বাধীন ব্যবসার সূত্রপাত দ্বারকানাথের মাধ্যমেই হয়েছিল। পক্ষপাতপূর্ণ শাসন ব্যবস্থা ও রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় বৃটিশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীরা যখন ভারতের বিপুল খনিজ সম্পদ কয়লার দিকে লোলুপ দৃষ্টি দিয়েছিল, সেই সময় দ্বারকানাথ ঠাকুর—'কার, টেগোর এণ্ড কোং প্রতিষ্ঠা করে কয়লা ব্যবসার ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন। এই সম্পর্কে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্ম-জীবনী থেকে প্রয়োজনী অংশ উদ্ধৃত করা যেতে পারে।

"১৮৩৪ সালের জুলাই মাসে দ্বারকানাথ আরও স্বাধীনভাবে ব্যবসায়ে নিযুক্ত হইবার অভিপ্রায়ে তাঁহার সরকারী চাকরীটি (Customs, Salt and Opium Board এর দেওয়ানী) পরিত্যাগ করিলেন এবং অল্প দিনের মধ্যেই কার ঠাকুর কোম্পানী (Carr Tagore & Co.) নামক হৌস স্থাপন করিলেন। কলিকাতা নগরীতে য়ুরোপীয় আদর্শে ব্যবসায়ের কুঠী প্রতিষ্ঠা করিয়া স্বাধীন ভাবে বিলাতের সহিত বাণিজ্য করিবার দৃষ্টান্ত দেশীয়-দিগের মধ্যে ইহাই প্রথম। দ্বারকানাথ, মিঃ উইলিয়াম

নারায়ণ কুড়ী বাংলো

কার ও মিঃ উইলিয়াম প্রিন্সেপ, এই তিন জন কার ঠাকুর কোম্পানীর প্রথম অংশীদার ছিলেন।"......

কয়লা খননের ইতিহাস আলোচনা করতে গেলে আরও প্রায় ৫০ বছর পিছিয়ে যেতে হবে। যদিও ১৮ শতকের শেষ দিকে জানা গিয়েছিল রাণীগঞ্জের মাটীর নীচে কয়লা আছে, কিন্তু কয়লা যে জ্বালানীর কাজে লাগানো যায় তা স্থানীয় লোকেরা অনেক আগে থেকেই জানত। দামোদর নদের কোলে সীমান্ত বাংলার এই অঞ্চলে অনেক জায়গাতেই জমির ওপর কয়লার চাঙড় পাওয়া যেত। প্রাকৃতিক কারণে আগুন লাগা কয়লা এই খনিজ পদার্থের গুণাগুণ প্রচার করেছে। তার প্রমাণ দামোদর, বরাকর, কালিপাহাড়ী এ সব নামের মধ্যেই আছে।

আমাদের দেশে রাণীগঞ্জেই প্রথম কয়লার সন্ধান পাওয়া যায়। যদিও স্থানীয় লোকেরা কয়লার ব্যবহার জানত, কিন্তু খাদ কেটে কয়লা তোলা বা বিক্রী করার কোন নজীর পাওয়া যায় নি ১৭৭৪ সাল পর্য্যন্ত। ১৭৭৪ সালে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ছোটনাগপুর এলাকায় নিযুক্ত দুজন কর্মচারী John Sumner এবং S.G.Heatly বাংলার ফোর্ট উইলিয়ামের গভর্ণর ওয়ারেন হেষ্টিংসের কাছে কয়লা কাটার ও বিক্রীর অনুমতি চেয়ে দরখাস্ত করলেন। তাঁদের এই আবেদন ১৮ বছরের জন্য মঞ্জুর করা হয়। ইতিমধ্যে Redferne নামের আর একজন এই প্রচেষ্টায় যোগ দেন। এঁদের চেষ্টায় তেমন ফল হয়নি, কারণ অবশ্য অনেক ছিল।

H. D. G. Humphrey "The Early History of Coal Mining in Bengal" প্রবন্ধে লিখেছেন যে উক্ত দরখাস্তকারীদের কয়লাখনি সম্বন্ধে কোন জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা ছিল না। স্থানীয় অধিবাসীরাও এই কাজে ছিল অনভিজ্ঞ। তাছাড়া বিলেত থেকে কয়লা আমদানী দেশী কয়লা উৎপাদনের প্রতিবন্ধক ছিল। এই অবস্থার মধ্যে দামোদর-নারায়ণ-কুড়ী এগারো এলাকায় প্রথম কয়লা সংগ্রহের কাজ চলে। পরবর্তী চল্লিশ বৎসর ধরে অনিয়মিত কয়লা খনন চালু থাকে। তারপর এল বড়লাট ময়রার আমল—১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দ, লর্ড ময়রার উৎসাহে উইলিয়াম জোন্স নামে একজন কয়লাখনি বিশেষজ্ঞকে রাণীগঞ্জে কয়লার সন্ধান ও জরীপের কাজে লাগানো হল। ১৮১৪

প্রাচীনতম সিঁড়ি খাদের ধ্বংসাবশেষ
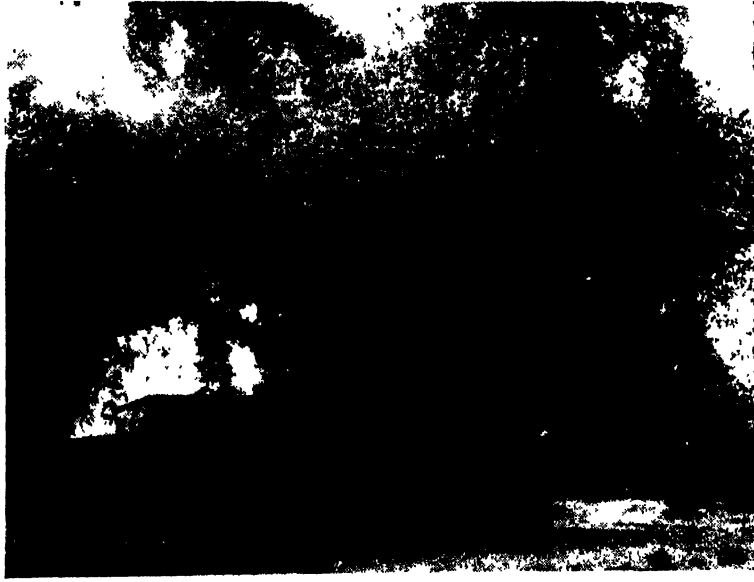
ঐতিহাসিক বট গাছ

সালের ১০ই এপ্রিল তিনি চুনিয়াজোড়ের কাছে (বর্ত্তমান নারায়ণকুড়ী-এগারা) প্রথম কয়লার খাদ আরম্ভ করেন। পরবর্ত্তী কয়েক বছর সাহেবরা একক অথবা যৌথ সংস্থার মাধ্যমে কয়লা সংগ্রহ ও বিক্রী চালিয়ে যান।

১৮৩৩ সালে আলেকজাণ্ডার কোম্পানী ফেল করল। কোম্পানীর সম্পত্তি নিলাম হল। ২৫০০০০ মন কয়লাসহ সমস্ত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি কিনে নিলেন দ্বারকানাথ ঠাকুর কার, টেগোর কোম্পানীর তরফে, মাত্র ৭০০০ পাউণ্ড মূল্যে।

"দ্বারকানাথই কার, ঠাকুর কোম্পানীর প্রাণ ছিলেন। ইহার কাজকর্ম তিনিই যোগাইতেন।" প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের খনি অঞ্চলের বাসস্থান "নারায়ণ কুড়ী বাংলো" আজও ভারতের কয়লা উত্তোলনের ইতিহাসে ভারতীয়ের সদম্ভ পদক্ষেপের সাক্ষ্য বহন করে চলেছে। বাংলোর পাশেই গোলাকার বেদী পরিবেষ্টিত বিরাট বটগাছ পুরনো দিনের স্মৃতি মনে করিয়ে দেয়। প্রিন্স দ্বারকানাথ এই বটগাছের তলায় বসতেন বলে জনশ্রুতি আছে। এখনও নারায়ণ-কুড়ী বাংলোর অনতিদূরে দামোদরের পাড়ে কার ঠাকুর কোম্পানীর সিঁড়ি-খাদের বাহরাবয়বের ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। কয়লা খনন ও চালানের আদি পর্ব্বের নীরব সাক্ষী দামোদরের ওপর তৈরী জেটী এখনও আংশিক ভগ্নাবস্থায় বিদ্যমান। প্রাপ্ত তথ্যাদি পর্য্যালোচনা করলে দেখা যায় দেশের মূল্যবান্ খনিজ সম্পদ কয়লা উত্তোলনের ইতিহাসে প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর ও নারায়ণ-কুড়ীর অবদান অবিস্মরণীয়।

অলৌকিক দৈবশক্তিসম্পন্ন ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তান্ত্রিক ও জ্যোতির্ব্বিদ্

জ্যোতিষ-সম্রাট পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, জ্যোতিষার্ণব, রাজজ্যোতিষী এম্-আর-এ-এস্ (লণ্ডন)

জ্যোতিষ-সম্রাট

অখিল ভারত ফলিত ও গণিত সভার স্থায়ী সভাপতি ও উপদেশক এবং কাশীস্থ বারাণসী পণ্ডিত মহাসভার স্থায়ীসভাপতি এই দিব্যদেহধারী মহামানবের বিস্ময়কর ভবিষ্যদ্বাণী, হস্তরেখা ও কোষ্ঠী-বিচার, এবং তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের চিন্তাবিদেরা মুগ্ধ হইয়া শ্রদ্ধাপ্লুত অন্তরে তাঁহাকে স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন জানাইয়াছেন ও জানাইতেছেন। ১৯৩৯ সালের যুদ্ধে বৃটিশ সরকারের জয়লাভ, ১৯৪৬ সালে পণ্ডিত জহরলালের প্রধানমন্ত্রিত্ব গ্রহণ এবং অন্তর্বর্তী সরকার কর্তৃক স্বাধীনতা লাভ, ভবিষ্যৎ পাক-ভারত সম্পর্ক এবং ১৯৬২ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী অষ্টগ্রহ সম্মেলনে 'মানবজাতির অমূলক আতঙ্ক', পণ্ডিতজীর এই সকল অত্যাশ্চর্য্য ও অভ্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীগুলি সারাবিশ্বে তাঁহার জয়ধ্বনি বিঘোষিত করিয়াছে।

.৫০ পয়সার ডাকটিকিটসহ প্রশংসাপত্রসমেত ক্যাটলগের জন্য লিখুন।

★ পণ্ডিতজীর অলৌকিক শক্তিতে যাঁহারা মুগ্ধ তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজন — ★

আটগড়ের মাননীয় মহারাজা, মাননীয়া ষষ্ঠমাতা মহারাণী ত্রিপুরা ষ্টেট, কলিকাতা হাইকোর্টের মাননীয় প্রধান বিচারপতি শ্রী ডি, এন, সিন্‌হা বার-এ্যাট-ল, উড়িষ্যা হাইকোর্টের মাননীয় প্রধান বিচারপতি শ্রী বি,কে,রায়, বিহারের মাননীয় রাজ্যপাল শ্রীনিত্যানন্দ কানুনগো, পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার মাননীয় অধ্যক্ষ শ্রী বি, কে, ব্যানার্জী, পশ্চিমবঙ্গের এ্যাড্‌ভোকেট জেনারেল শ্রীশঙ্করদাস ব্যানার্জী, আমেরিকার মিঃ এ্রিটেম্পি, ওয়েষ্ট আফ্রিকার মিঃ এম্, এ, বেলো, লণ্ডনের মিসেস এম, এ, নেইল, চীন মহাদেশের সাংহাই নগরীর মিঃ কে, রুচপল। কলিকাতা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি শ্রীশঙ্করপ্রসাদ মিত্র।

★ প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ বহু পরীক্ষিত কয়েকটি তন্ত্রোক্ত অত্যাশ্চর্য্য কবচ ★

ধনদাকবচ—ধারণে স্বল্পায়াসে প্রভূত ধনলাভ, মানসিক শান্তি, প্রতিষ্ঠা ও মান বৃদ্ধি হয় (তন্ত্রোক্ত)। সাধারণ ১১·৪৩, শক্তিশালী বৃহৎ ৪৪·৫৪, মহাশক্তিশালী ও সত্বর ফলদায়ক ১৬২·১১ (সর্বপ্রকার আর্থিক উন্নতি ও লক্ষ্মীর কৃপা লাভের জন্য প্রত্যেক গৃহী ও ব্যবসায়ীর অবশ্য ধারণ কর্তব্য)। **সরস্বতী কবচ**—বিদ্যোন্নতি ও পরীক্ষায় সুফল। সাধারণ ১৪·৩৪, বৃহৎ ৫৭·৮৪, মহাশক্তিশালী—৫৩৪·৬৯। **মোহিনী কবচ**—ধারণে চিরশত্রুও মিত্র হয়। সাধারণ—১৭·২৫, বৃহৎ—৫১·১৮, মহাশক্তিশালী—৪৮৪·৮৪। **বগলামুখী কবচ**—ধারণে অভিলষিত কর্মোন্নতি, মামলায় সুফল এবং শত্রুনাশ। সাধারণ—১৩·৬৮, বৃহৎ শক্তিশালী—৫১·১৮, মহাশক্তিশালী—২৩০·৩১।

—জ্যোতিষ শাস্ত্রের মূল্যবান গ্রন্থাদি—

জ্যোতিষ-সম্রাট মহোদয়ের বহু অলৌকিক ঘটনাবলী ও অত্যাশ্চর্য্য ভবিষ্যদ্বাণী শতাধিক চিত্র সম্বলিত—২·০০ ঐ জীবনী (ইংরাজী) "Jyotish Samrat" His Life and Achievement পড়ুন মূল্য—১·০০। Questions & Answers Rs. 2·25. Interpretation of Dreams Rs. 7.00 জন্মমাস রহস্য—১·০০। খনার বচন—২·৫০। জ্যোতিষ শিক্ষা—১০·০০; বাঁধান—১১·০০। নারী জাতক—১·০০। বিবাহ রহস্য—৩·০০। স্বপ্নফল বিজ্ঞানম্—মূল্য—১·০০ (স্বপ্ন সম্পর্কিত বিশদ বিবরণ সম্বলিত) Mystery of the month you are born—Rs. 7·00

মূল্যাদি সর্বদা অগ্রিম দেয়।

(স্থাপিতাব্দ ১৯০৭ খৃঃ) **দি অল ইণ্ডিয়া এষ্ট্রোলজিক্যাল এণ্ড এষ্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটী** (রেজিষ্টার্ড)

কার্য্যকরী সভাপতি. পুত্র ও ছাত্র

পণ্ডিত শ্রীসুকুমার ভট্টাচার্য্য, জ্যোতিঃশাস্ত্রী এম্,এ,এ,এস্

হেড অফিস: ৮৮-২ (প্র) রফি আহমেদ কিদোয়াই রোড্ (সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারের দক্ষিণ মোড় ও ধর্মতলা ষ্ট্রীটের সংযোগস্থল) "জ্যোতিষ-সম্রাট ভবন", কলিকাতা—১৩। ফোন ২৪-৪০৬৫।

সাক্ষাতের সময়—প্রাতে ১০টা হইতে ১১টা ও বৈকাল ৫টা হইতে ৭টা।

পশ্চিমবঙ্গের রাষ্ট্রীয় দলগুলির কার্য্যকলাপ

পশ্চিমবঙ্গের রাষ্ট্রীয় দলগুলি সকল সময়েই পশ্চিম বঙ্গকে মানস ক্ষেত্রে প্রধান স্থান না দিয়া দিল্লী, পিকিং ওয়াশিংটন অথবা মস্কোকে লইয়াই মাতামাতি করিয়া থাকেন। ফলে রাষ্ট্রক্ষেত্রে পশ্চিম বঙ্গ সকল সময়েই তৃতীয় পক্ষের স্থান অধিকার করিয়া অনাদরে পড়িয়া থাকে। বর্ত্তমান কালে এই রীতির কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। এই প্রসঙ্গে "যুগবাণী" সাপ্তাহিকে যাহা বলা হইয়াছে তাহা উল্লেখনীয় ও আমরা ঐ পত্রিকা হইতে কিছুটা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :—

ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি ও তাদের অনুগামী যুবসংঘ সহ অপরাপর বামপন্থী দলগুলি পূজার ঠিক আগে আন্দোলনে নামার হুমকি দিয়েছে। সি পি আই ইতি-মধ্যেই কয়েকটি মিছিল ও সমাবেশের আয়োজন করেছে। সি পি এম পরিচালিত যুক্তফ্রন্ট বিশেষভাবে সরকারী ও বেসরকারী কর্মচারীদের পথে নামাতে চেষ্টা করছে। পূজার এক সপ্তাহ আগে যে আন্দোলন শুরু করা হবে তার মেয়াদ দুদিনের বেশি হবে না। পূজার মুখে বাঙালী কোনো আন্দোলন চায় না – এটা বামপন্থী নেতারা জানেন। রাজনৈতিক পরিবেশকে উত্তপ্ত করে তোলা ছাড়া প্রস্তাবিত আন্দোলনের আর কোনো উদ্দেশ্য নাই। মুখ্যমন্ত্রী তাই এই আন্দোলনকে ধাপ্পা বলে বর্ণনা করেছেন।

পশ্চিমবঙ্গে আজ যদি কোনো আন্দোলন করতেই হয় তবে দল মত নির্বিশেষে সে আন্দোলন করতে হবে বাংলার প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার যাতে সুবিচার করেন সেজন্য। বিধান সভায় বাংলার দাবীগুলি সম্পর্কে আলোচনা হওয়া দরকার ও উপযুক্ত প্রস্তাব গ্রহণ করা দরকার। রাজ্য সরকার বাংলার জনমতের প্রতিভূ কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে নিরবচ্ছিন্নভাবে বাংলার দাবী-গুলির বিষয়ে চাপ সৃষ্টি করবেন এটাই আমার চাই। পার্লামেন্টে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধিরা বাংলা ও বাঙালীর সমস্যা ও দাবীগুলির বিষয়ে তথ্য ও যুক্তিপূর্ণ আলোচনা করবেন এটাই সবাই আশা করে। বস্তুতঃ বিধানসভা, পার্লামেন্ট ও রাজ্য সরকার এই তিনটি স্তর থেকে বাংলার দাবী কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পেশ হওয়া চাই। বামপন্থী যুক্তফ্রন্ট বিধান সভাকে বর্জন করে, রাজ্য সরকারকে পাশ কাটিয়ে যাবার চেষ্টা করে এবং পার্লামেন্টে একমাত্র ইন্দিরা-বিরোধিতাকে সম্বল করে বাঙালীর আন্দোলনের গোড়াতেই কুঠারাঘাত করেছে। অন্যান্য রাজ্যের কংগ্রেস ও বিরোধী দলগুলি একযোগে দিল্লীর সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করে ও তার ফলে দাবী আদায়ও করে। আর আমরা? সিদ্ধার্থ-শঙ্কর রায়কে কিভাবে পদচ্যুত করা যায় সেটাই আমাদের রাজনৈতিক নেতাদের একমাত্র লক্ষ্য। সি পি আই, সি পি এম, আদি কংগ্রেস ও এমনকি নব কংগ্রেসের ও অংশ বিশেষ সিদ্ধার্থ রায়কে বেইজ্জত করতে যতটা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বাঙালীর স্বার্থ সংরক্ষণে তাদের ততটাই আগ্রহের অভাব।

যুব কংগ্রেস সম্প্রতি মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে কলকাতার বাজারে বাজারে আন্দোলন করেছিল। মূল্যবৃদ্ধির মূল কারণ খুচরা বাজারে নিহিত থাকে না। মূল্যস্ফীতির মূল কারণ সরকারী কর নীতি। ডেফিসিট ফাইনান্সিংও মূল্যস্ফীতির অন্যতম প্রধান কারণ। গত বছর বাংলা দেশের মুক্তিযুদ্ধ ও শরণার্থীদের ত্রাণ বাবত কয়েক শত কোটি টাকা খরচ করা হয়েছিল, যে টাকা উৎপাদন

বাড়ানোর কাজে লাগেনি, ভোগ্যপণ্য খাতেই খরচা হয়েছে—তার ফলে এ বছর অস্বাভাবিক হারে মূল্যস্ফীতি অনিবার্য ছিল। তদুপরি জুটেছে খরা। যুব কংগ্রেস যদি মূল্যবৃদ্ধি সত্যই রোধ করতে চায় তবে কেন্দ্রীয় সরকারের করনীতি পরিবর্তনের দাবী তাদের করতে হবে—একথা আমরা আগেও বলেছি। কিন্তু দেশের সঙ্কটজনক পরিস্থিতির সুযোগে অসৎ ব্যবসায়ী ও মজুতদাররা যে খুশিমতো দাম বাড়ায় তার প্রতিকারে বাজারে বাজারে, বিশেষত খোদ বড় বাজারে আন্দোলন গড়ার প্রয়োজন আছে। বামপন্থীরা এ বিষয়ে এত লজ্জাকাতর কেন আমরা জানি না। মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে আন্দোলনে সামিল হতে আজ পর্যন্ত বামপন্থীদের দেখা যায় নি। বিশেষত বড় বাজারে এরা কখনোই আন্দোলন করতে যায় না। নকশালপন্থী সি পি এম প্রভৃতি সব বামপন্থী পক্ষই বড়বাজারকে সমীহ ও শ্রদ্ধা করে—কেন তার কারণ অবশ্য আমাদের জানা নেই।

পুঁজিবাদী দেশ ও কম্যুনিষ্ট দেশের আন্তর্জাতিক অর্থনীতি

রুশিয়ার মতে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলির অর্থ-নৈতিক কার্য্যকলাপের একটা বিশেষত্ব আছে যাহা কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রগুলিতে নাই। কলিকাতার রুশিয়ান কনসুলের প্রকাশিত এক বিবৃতিতে দেখা যায় :—

মস্কো।—সাপ্তাহিক ইকনমিচেসকাইয়া গাজেটার ৩৬শ সংখ্যা "পুঁজিবাদী দেশগুলির মধ্যে বিরোধ" শীর্ষক এক প্রবন্ধে ম. মেভেদেলকিনা পুঁজিবাদী দেশগুলির মধ্যে ক্রমবর্ধমান প্রতিযোগিতার লড়াই সম্পর্কে লিখতে গিয়ে বিশেষভাবে যেসব কথা বলেছেন সেগুলি নিম্নরূপ :

মোট অঙ্কের দিক থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পুঁজি রপ্তানীর ক্ষেত্রে পৃথিবীতে সর্বাগ্রগণ্য। সম্প্রতি কয়েক বছরের মার্কিন একচেটিয়া পুঁজিপতিরা প্রধানত: লগ্নী করছেন কানাডা ও পশ্চিম ইয়োরোপে। তাদের প্রত্যক্ষ লগ্নী অন্যান্য রাষ্ট্রের শিল্পসংস্থাগুলি তাদের আয়ত্তে আনতে সাহায্য করছে। এই প্রত্যক্ষ লগ্নী বেশ দ্রুত-গতিতে বেড়ে চলেছে। যেমন, ১৯৬৮ সালে যেখানে কমন মারকেট-ভুক্ত দেশগুলিতে ৮৯১ কোটি ২০ লক্ষ ডলার লগ্নী করা হয়েছিল, সেখানে ১৮৬৯এ লগ্নী করা হয় ১ হাজার ১৯ কোটি ৪০ লক্ষ ডলার। ১৯৬২ সালে পশ্চিম ইয়োরোপে বৃহত্তম মার্কিন কোম্পানিগুলির মাত্র অর্ধেকের বিভিন্ন শাখা প্রতিষ্ঠান ছিল, আর এখন পশ্চিম ইয়োরোপে এইসব কোম্পানির শতকরা ৮০টিরই শাখা প্রতিষ্ঠান আছে।

বিভিন্ন শিল্পে মার্কিন কোম্পানিগুলির লগ্নী বিশ্লেষণ করলে তাদের মুনাফা আরও বাড়ানোর উদ্দেশ্যে প্রযুক্তি বিস্তার দিক থেকে অগ্রগামী শিল্পগুলির উপর মার্কিন কোম্পানিগুলির আধিপত্য বিস্তারে আকাঙ্ক্ষার প্রমাণ পাওয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিম ইয়োরোপ থেকেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পশ্চিম ইয়োরোপীয় একচেটিয়া পুঁজিপতিদের প্রত্যক্ষ পুঁজি লগ্নী চার গুণ বেড়ে গেছে। তাদের দেশেই তাদের উপর প্রতিশোধমূলক পাল্টা আঘাত হানার চেষ্টায় পশ্চিম ইয়োরোপীয় দেশগুলি মার্কিন পণ্যোৎপাদন শিল্পে পুঁজি নিয়োগ করতে চাইছে। যেমন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে লগ্নীকৃত মোট ডাচ বা ওলন্দাজ পুঁজির ০৪.৩ শতাংশই লগ্নী করা হয়েছে পণ্যোৎপাদন শিল্পে। সুইজারল্যাণ্ডের লগ্নীকৃত পুঁজির ৬৯.১ শতাংশ অনুরূপভাবে লগ্নী করা হয়েছে। পশ্চিম জার্মানির একচেটিয়া পুঁজিপতিরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইলেকট্রোনিক কমপিউটার, রসায়ন ও তৈলশিল্পে শাখা প্রতিষ্ঠানসমূহ গড়ে তুলেছে।

সম্প্রতি কয়েক বছরে পশ্চিম ইয়োরোপের দেশগুলির মধ্যে বিশেষ করে কমন মারকেট-ভুক্ত দেশগুলির পুঁজির স্রোত আরও জোরে বইতে শুরু করেছে।

এক্ষেত্রে শীর্ষস্থান অধিকার করেছে পশ্চিম জার্মানির প্রতিষ্ঠানগুলি। ১৯৭১ সালে এইসব প্রতিষ্ঠান ফ্রান্সে বৈদেশিক পুঁজি লগ্নীর ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে পিছনে ফেলে দিয়ে প্রথম স্থান অধিকার করে। বেলজিয়াম, লুকসেমবুর্গ এবং হল্যাণ্ডেও পশ্চিম জার্মানি ব্যাপকভাবে শাখাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করে এবং এইসব দেশে তার পুঁজির পরিমাণ প্রায় ১৫ গুণ বৃদ্ধি পায়। আবার ফ্রান্স,

হল্যাণ্ড ও সুইডেন থেকে পশ্চিম জার্মানিতে প্রচুর পুঁজি আসে।

পুঁজির পারস্পরিক অনুপ্রবেশ পুঁজির প্রকৃতিকে আরও আন্তর্জাতিক করে তুলেছে। অবশ্য, পুঁজিবাদী অবস্থায় এর ভূলে আন্তঃসাম্রাজ্যবাদী বিরোধ আরও বেড়েছে এবং ধনিক রাষ্ট্রগুলি বহু জটিল ও সমাধানের অযোগ্য সমস্যাসমূহের সম্মুখীন হয়েছে। এইসব সমস্যা হল : পাওনার চেয়ে দেনা বাড়ছে, অর্থ-নৈতিক স্বাধীনতা হারানোর বিপদ দেখা দিয়েছে, মুদ্রা ব্যবস্থা টলমল করছে, বেকারের সংখ্যা বাড়ছে।

৭০-এর দশকের শুরুতে সাম্রাজ্যবাদী প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রধান কেন্দ্রগুলি পরিষ্কার ভাবে চোখে পড়েছে। এগুলি হল : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পশ্চিম ইয়োরোপ (প্রধানতঃ কমন মারকেট ভুক্ত ৬টি দেশ) এবং জাপান। এদের মধ্যে প্রতিযোগিতা ক্রমেই তীব্র হয়ে উঠছে। ইয়োরোপও জাপানের বহু পণ্যের রপ্তানী সরকারীভাবে নিষিদ্ধ করা এবং ইয়োরোপের দেশগুলি কর্তৃক মার্কিন পুঁজির শোষণ সীমিত করার চেষ্টা এই লড়াইয়ের কয়েকটি অভিব্যক্তি মাত্র।

রুশিয়া এবং চীনও অপরাপর রাষ্ট্রে নিজ দেশের জাতীয় পুঁজি লগ্নী করিয়া থাকেন। সুদ অর্জ্জন উদ্দেশ্যে না করিলেও উদ্দেশ্য নিছক পরহিত নহে ; কারণ রাষ্ট্রীয় ভাবে যে লাভ হয় তাহা সকল সময় লগ্নী হইতে লব্ধ আর্থিক পাওনা দিয়াই বিচার করা যায় না। অন্য লাভ অনেক সময় অধিক মূল্যবান্ বিবেচিত হইতে পারে। পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলিও বিনা সুদে অনেক সময় টাকা দিয়া থাকেন।

টিটাগড়ে অবাঙ্গালী গুণ্ডার বাঙ্গালীর উপর অত্যাচার

নিম্নোক্ত পত্রটি "যুগবাণী" পত্রিকার ১৬ সেপ্টেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে :—

মহাশয়,

গত সপ্তাহের "যুগবাণী"তে টিটাগড় মহাবীর ক্লাবের সম্বন্ধে আপনার সংবাদ খুবই সময়োচিত। এই মহাবীর ক্লাব ঠিক টিটাগড় পেপার মিলের ১নং ফটকের খুবই সন্নিকটে এবং মিল কম্পাউণ্ডের পাঁচিলের সংলগ্ন। ইহাদের অত্যাচার ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিছুদিন পূর্বে ইহাদের সদস্যরা পেপার মিলের জেনারেল ম্যানেজার শ্রীসৌরেন বিশ্বাস মহাশয়ের গাড়ি টিটাগড়ের রাস্তায় পাইপ গান ও অন্যান্য মারাত্মক অস্ত্র দেখিয়ে আটক করে এবং চাকুরীর দাবি আদায় করে—ফলে প্রয়োজন না থাকা সত্বেও তাদের কয়েকজন প্রধানকে কাজ দেওয়া হয়—তার মধ্যে একজন পান্নালাল। তার কোন কাজই নাই—দারাদিনে একবার দেখা দিয়ে উধাও। তারা মনে করে তারা স্থানীয় লোক এবং টিটাগড়ে ভবিষ্যতে যে চাকুরী খালি হবে, সব তাদেরই প্রাপ্য। পেপার মিলের পরিচালকগণ ইহাদের নিকট অসহায়। এদের মধ্যে ওয়াগন ব্রেকারও প্রচুর।

টিটাগড় রেলওয়ে ওয়ার্ডে প্রতি রাত্রে কাগজ কলের জন্য প্রেরিত বাঁশ চুণ,কয়লা ইত্যাদি প্রচুর চুরি হয়—এমনকি প্রকাশ্য দিবালোকে বাণ্ডিল বাঁধা এই বিশেষ জাতীয় বাঁশ, যাহা স্থানীয় বাঁশ হতে অন্যরকম দেখতে, প্রকাশ্য দিবালোকে, পুলিসের সামনে স্থানান্তরিত করে। জুয়া, মদের দোকান (অ-অনুমোদিত) যত্রতত্র। টিটাগড় রেল ষ্টেশনে অন্ততঃ ২০।৩০ জন পকেটমার সর্বদাই উপস্থিত থাকে—পুলিশ নিস্ক্রিয়। রাস্তার (টিটাগড় বাজার) দুধারে ফেরিওয়ালাদের দোকান—পুলিশ সময় মত তাঁদের কাছে নিয়মিত দৈনিক টাকা আদায় করে। বড় রাস্তায় পি ডাব্লউ ডি-এর জায়গায় এত ছাপড়াজাতীয় ঘর এই অবাঙালীরা তৈরী করেছে যা দেখলে মনে হবে আপনি বিহারে কোথাও ঘুরছেন। আপনার নির্ভীক পত্রিকায় টিটাগড় পুলিসকে একটু সক্রিয় হবার উপদেশ দিতে পারেন—টিটাগড় থানার অধীনে চুরি, সিঁদকাটা, ছিনতাই নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার।

মাননীয় শ্রমমন্ত্রী মাসিক ৪০ টাকা করে বেতন বৃদ্ধি করে কাগজ কলের শ্রমিকদের একটি দাবী মিটিয়ে দেন—কিন্তু কাগজ কলের মজদুর ইউনিয়ন, যেখানে সব সি পি এম-এর কট্টর শ্রমিকরা আশ্রয় নিয়েছে, এবং যাহার সভাপতি শ্রীকৃষ্ণকুমার শুক্লা, তাহা অবমাননা করে মিল বন্ধ করে দেয় প্রায় ১৫।২০ দিন—একই খেলা কেলভিন অ্যাণ্ড এমপায়ার জুট মিল, সেখানেও মুখ্যমন্ত্রী বিরোধ মিটিয়ে দেবার পর মিল বন্ধ করে কৃষ্ণকুমারের দল। কৃষ্ণকুমার এখন ভীষণ সরকার বিরোধী এবং বাঙালী বিরোধী হয়েছেন। ইতি

স্বপন ভট্টাচার্য
টিটাগড়

সাময়িকী

নেশার প্রভুত্ব

নেশা করা কথাটার সহজ অর্থ হইল কোন মাদকদ্রব্য সেবন বা ব্যবহার করিয়া মানুষ যে কৃত্রিম উত্তেজনা অথবা আরাম ও আনন্দ অনুভূতির অবস্থা সৃজন করে সেই প্রকার কার্য্য। পৃথিবীতে বহু প্রকারের নেশা আছে। কোনটি প্রবল শক্তিতে মানুষকে নিজ কবলে আনিয়া তাহার মনুষ্যত্বকে নেশার দাসত্বে পরিণত করে, কোনওটি আবার ততটা শক্তি ধারণ করে না বলিয়া মানুষকে শুধু আকর্ষণ করে, অমানুষ করিয়া তোলে না। প্রথম জাতীয় নেশার মধ্যে নানা প্রকার বিষাক্ত পদার্থ আছে যাহা মানুষ সাধারণভাবে খাইয়া, ধূমপান করিয়া অথবা সূচিকা ব্যবহারে নিজ অঙ্গে প্রবিষ্ট করাইয়া নেশার উদ্দেশ্য সিদ্ধি করে। এই সকল বস্তুর মধ্যে পানীয় মদ্য পৃথিবীতে সকল দেশেই বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। ইহা অপেক্ষা অধিক ক্ষতিকর মাদকদ্রব্য হইল অহিফেন, গঞ্জিকা, কোকেন প্রভৃতি মাদক সকল, যাহার ব্যবহারবিধি সেবন, ধূম্রপান ও "ইনজেক্শন" ইত্যাদি উপায়ে চালিত হয়। শুধু আমেরিকাতেই বাৎসরিক প্রায় চার সহস্র কোটি টাকা "হেরইন" নামক অহিফেন-লব্ধ স্নায়ুবোধঅবশকারক মাদক ব্যবহৃত হয়। ঐ দেশে বহু লক্ষ ব্যক্তি নিয়মিত উক্ত মাদক ব্যবহার করিয়া থাকে ও তাহার জন্য দৈনিক ১৫০।২০০ টাকা ব্যয় করিতে বাধ্য হয়। গঞ্জিকা ব্যবহার ধূমপান করিয়া অথবা সিদ্ধির সরবত পান করিয়া হইয়া থাকে এবং আমাদের দরিদ্র দেশেও শত শত কোটি টাকা ঐ মাদকতার পশ্চাতে অপব্যয় করা হইয়া থাকে। এই মাদকতার সহিত ধর্ম্মের একটা বিকৃত সংযোগ স্থাপন করিয়া দুশ্চরিত্র সমাজবিরোধী ব্যক্তিগণ পথে ঘাটে সর্ব্বত্র গঞ্জিকা বিক্রয় ও ব্যবহার প্রচলিত করিয়া থাকে। কোকেন ব্যবহার বহু দেশে প্রচলিত আছে ও তাহার জন্য শত সহস্র কোটি টাকা সর্ব্বত্র অপব্যয় করা হইয়া থাকে। মদ্যপান অবশ্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রচলিত নেশার বিষয়। বহুদেশেই সাধারণ খাদ্য পানীয়ের সহিত উহা একান্তভাবে মিলিত হইয়া আছে এবং অনেকেই নেশা করিবার কথা না ভাবিয়াই মদ্যপান করিয়া থাকে। মদ্যের জন্য কত অর্থ ব্যয় হয় তাহার হিসাব করা সহজ নহে। তবে বলা যাইতে পারে তাহার পরিমাণ লক্ষ কোটি টাকার অধিক দাঁড়াইবে। যে সকল নেশা উপ-রোক্ত নেশাগুলির তুলনায় ততটা ক্ষতিকর নহে তাহার মধ্যে তামাক সর্ব্বাধিক ব্যবহৃত। ইহাতে মানুষের শারীরিক অবস্থা খারাপ হয় কিন্তু কোন প্রবল মাদকতা সৃজন শক্তি তাম্রকূটে লক্ষিত হয় না। চা পান অথবা পান চর্ব্বণকেও নেশা বলা যাইতে পারে, কিন্তু ঐ সকল অভ্যাস মানুষকে কোনও ভাবে অমানুষ করিয়া তোলে না। এই সকল নেশার সহিত বহু অবাস্তব বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ তুলনীয়। ঐ সকল বিষয়ের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া মানুষ নিজ মানবতা ভুলিয়া বহুক্ষেত্রে উন্মাদনার পথে চলিয়া যায় ও তাহার ন্যায় অন্যায় বোধ নষ্ট হইয়া যায়। এই সকল মানসিক নেশাগ্রস্তভাবের মধ্যে ধর্ম্মান্ধতা ও রাষ্ট্রনৈতিক মতবাদের মাতামাতি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এই জাতীয় মনোভাবের আবেগে মানুষ অকাতরে অর্থব্যয় করে এবং অনেক ক্ষেত্রে সকল অন্যায়কে ন্যায় বলিয়া প্রমাণ করিয়া লয়। ধর্ম্মান্ধতা ও রাষ্ট্রক্ষেত্রের অন্ধ বিশ্বাসের তাড়নায় কত কোটি কোটি মানুষ প্রাণ হারাইয়াছে, কত শত শত নগর গ্রাম ধ্বংস হইয়াছে ও মানব সভ্যতা কতভাবে আহত আড়ষ্ট ও বিনষ্ট হইয়াছে তাহার হিসাব অফুরন্ত। মানুষকে যদি সকল অন্যায়ের বশ্যতা হইতে বাঁচাইতে হয় তাহা হইলে চিন্তা ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রের অন্ধ তথা ভ্রান্ত ধারণার বশ্য তার কথা ভুলিলে চলিবে না। মনের ক্ষেত্রে যে

কৃত্রিম উপায়ে উৎপন্ন উন্মাদনা তাহা শরীরের মাদক সেবনজাত উন্মাদনা অপেক্ষা অনেক সময় অধিক ক্ষতি-কর হইয়া থাকে। সুতরাং অহিফেন, গঞ্জিকা কোকেন ও মদ্যের ব্যবহার সীমিত করিবার জন্য বিশ্বব্যাপী যে প্রচেষ্টা চলিয়াছে; যুক্তিহীন, অন্যায়, মানবতা-ধ্বংস-কারী তথাকথিত আদর্শবাদের বিস্তার নিবারণের জন্য সেইরূপই আয়োজন করা আবশ্যক। ইহা না করিতে পারিলে মানব জাতির উন্নতি কখনও সম্ভব হইবে না।

পশ্চিমবঙ্গের আর্থিক উন্নতির কথা

পশ্চিমবঙ্গের ব্যক্তিগত ব্যবসায় ও আর্থিক প্রচেষ্টা নানাভাবে স্বাভাবিক স্বাস্থ্য হারাইয়া ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। যথা বহু ব্যবসায় এখন জাতীয় করিয়া লওয়া হইয়াছে যাহা পূর্ব্বে ব্যক্তিগত কর্ম্ম প্রেরণায় চালিত হইত। বীমা ইহার মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এবং পরে যখন ১৪টি ব্যাঙ্ক জাতীয় করা হয় তখন সেইগুলির শাখা-প্রশাখা সকলও ব্যক্তিগত প্রতিভার প্রকাশ ক্ষেত্রের বাহিরে চলিয়া যায়। অনেকগুলি কাজ-কারবারও ক্রমে ক্রমে জাতীয় নিয়ন্ত্রণের অধীনে চলিয়া গিয়াছে ও তাহার ফলে যে সকল ব্যক্তি প্রতি অবশ্যই আমলাদিগের অপেক্ষা অনেক অধিক কর্ম্মক্ষমতা সম্পন্ন বলিয়া বিবেচিত হইতেন তাঁহারা কর্ম্ম পরিচালনা কার্য্য হইতে অপসৃত হইয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমানে অর্থনীতি ক্ষেত্রে আমলাদিগের বুদ্ধি ও কর্ম্মশক্তিই সর্ব্বোচ্চ স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ও ইহার ফলে অর্থ-নৈতিক উন্নতির সম্ভাবনা ক্রমশঃ সুদূর পরাহত হইয়া যাইতেছে। কারণ আমলাদিগের কর্ম্ম-ক্ষমতার পূর্ণ পরিচয় আমরা ডাক ও তার বিভাগে (টেলিফোনকে মনে রাখিবেন) পাইয়াছি এবং রেলওয়ে, ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইনস, হিন্দুস্থান স্টীল প্রভৃতিতে পাইতেছি। একটা কথা এই সম্পর্কে বিশেষ করিয়া বলা প্রয়োজন। যদিও সরকারী নিয়ন্ত্রণ প্রবল শক্তিতেই পশ্চিমবঙ্গে প্রয়োগ করা হইতেছে তবুও সেই নিয়ন্ত্রণের যেটা লাভের দিক সেইখানে পশ্চিমবঙ্গ কোনও লভ্যাংশ পাইতেছে না। যথা সম্প্রতি ইণ্ডাস্টীয়াল ফাইন্যান্স কর্পোরেশন ১৯৭১-৭২ বৎসরের হিসাবে যে ৩৯.১৬ কোটি টাকা সাহায্য দান করিতেছেন তাহার মধ্যে ১০.০৯ কোটি টাকা পাইতেছে মহারাষ্ট্র এবং পশ্চিমবঙ্গ পাইতেছে মাত্র ৬৫ লক্ষ টাকা। পশ্চিমবঙ্গের যে সকল দরখাস্ত লওয়া হইয়াছে এবং নামঞ্জুর করা হয় নাই সেইগুলির টাকার পরিমাণ কয়েক কোটি টাকা। আগে অন্যান্য প্রদেশকে খাওয়াইয়া পরে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষুধা নিবৃত্তির ব্যবস্থা হইবে বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। তাহারও কোন নিশ্চয়তা নাই। সাধারণভাবে বলা যায় যে পশ্চিমবঙ্গকে ভারত সরকারের বিশেষ আদরের প্রদেশ বলা যায় না। বহুকাল হইতেই দেখা যাইতেছে যে উপুড় হস্ত হইবার বেলায় অধিকাংশ সময়েই ভারত সরকার পশ্চিমবঙ্গকে যথা সম্ভব ভুলিয়া থাকেন।

হলদিয়াতে জাহাজ নির্ম্মান করা হইবে

ভারত সরকার বলিয়াছেন যে বর্ত্তমান কালে দুইটি জাহাজ নির্ম্মাণ কেন্দ্র স্থাপন করা হইবে ও তাহার মধ্যে একটি হইবে হলদিয়াতে অথবা তাহার নিকটবর্ত্তী কোনও স্থানে। ইহাতে কলিকাতার সুদক্ষ কর্ম্মকৌশলী কারিগরদিগের ঐ কর্ম্মে নিযুক্ত হওয়া সহজ হইবে। কোনও বৃহৎ কারবার করিতে হইলে প্রয়োজনীয় কর্ম্মী পাওয়া একটা বড় কথা। কলিকাতা একটা বিরাট কৌশলী শ্রমিকের কেন্দ্রস্থল বলা যায়। এই কারণে কলিকাতার বাজারে শ্রমিক সংগ্রহ সহজ। হলদিয়া কলিকাতার এত নিকটে যে যথাযথ রেলগাড়ীর ব্যবস্থা থাকিলে বহু কর্ম্মী কলিকাতা অঞ্চল হইতে প্রত্যহ হলদিয়াতে গিয়া কার্য্য করিতে সক্ষম হইতে পারে। কলিকাতা যন্ত্রকৌশলের কার্য্যের জন্য প্রসিদ্ধ এবং জাহাজ নির্ম্মাণ কলিকাতার নিকটে হইলে জাহাজের বহু প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি এই অঞ্চল হইতে নির্মিত হইয়া জাহাজে লাগান সহজ হইবে। যে সকল অংশ অপরাপর দেশ হইতে আনান প্রয়োজন হয় সেই সকল আমদানি কার্য্যও কলিকাতাস্থিত আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কার্য্যে সংযুক্ত কারবারগুলির সাহায্যে সহজেই

হইবে। এই সকল সুবিধাজনক পরিস্থিতি আছে বলিয়াই হলদিয়া শীঘ্রই জাহাজ নির্ম্মাণ কেন্দ্র হিসাবে গড়িয়া উঠিবে বলিয়া মনে হয়।

বেকার সমস্যার অতিক্রান্ত সমাধান

প্রথম উৎসাহের আবেগে অভিভূত সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় বলিয়া ফেলিয়াছিলেন যে তিনি শুধু হলদিয়াতে এক লক্ষ বেকারকে কর্মে নিয়োগ করিবেন। দেবী চট্টোপাধ্যায় ঐ বিষয়ে কমে যাইতে চাহেন না। তিনি বলিয়াছিলেন স্বাস্থ্যবিভাগে অন্ততঃ ৮০,০০০ হাজার ব্যক্তির কার্য্য জুটিয়া যাইবে। কিন্তু বাক্য কার্যে পরিণত হইবার বহু পূর্বেই কথার সুর বদলাইতে আরম্ভ করে ও কয়েকদিন পূর্ব্বে সিদ্ধার্থশঙ্কর বলিয়াছেন যে তিনি এই বৎসরের মধ্যেই ১৭,০০০ হাজার ব্যক্তির বেকারত্বের অবসান ঘটাইবেন। কোথায় এক লক্ষ আশি হাজার আর কোথায় সতর হাজার। এক দশমাংশও হয় না। যদি বলা যায় যে এক বৎসরে আর কত হইবে? তাহা হইলে মানিয়া লইতে হইবে যে এক বৎসরে এক দশমাংশ হইলে দশ বৎসরে পূর্ণ সংখ্যায় কার্য জুটিয়া যাইবে নিশ্চয়ই। কিন্তু দশ বৎসরে বেকারের সংখ্যাও যে কতগুণ বাড়িয়া যাইবে তাহার হিসাব কে করিবে? এখন যে সকল বালক-বালিকা ৮ হইতে ১৮ বৎসর বয়স্ক তাহারা ক্রমে ক্রমে বেকারত্বে পূর্ণপ্রতিষ্ঠিত হইয়া যাইবে। যে অর্থনৈতিক ভ্রান্তির পথে চলিয়া দেশবাসীকে আজ দেশনেতারা এই চরম অবস্থায় আনিয়া বসাইয়াছেন আগামী দশ বৎসরে যে তাঁহারা নিজেদের ভ্রান্তি সংশোধন করিয়া ফেলিবেন তাহার কোনও লক্ষণ এখনও দেখা যাইতেছে না। বরঞ্চ মনে হইতেছে যে ভ্রান্তি আরও প্রবল ভাবেই তাঁহাদের মস্তিষ্কে অধিকার বিস্তার করিতেছে। ব্যক্তি-স্বাধীনতা সকল স্বাধীনতার মূল বস্তু। ব্যক্তির আত্মপ্রতিষ্ঠা ভুলিয়া ব্যক্তিকে নেতাদের দাসত্বে প্রতিষ্ঠিত করিলে স্বাধীনতার পথে উন্নয়ন বা পূর্ণ বিকাশ জাতির পক্ষে কদাপি বাস্তব হইতে পারে না। বিশেষ করিয়া নেতারা যদি আমলাতন্ত্রের উপর নির্ভরশীল হইয়া চলিতে থাকেন।

দেশ-বিদেশের কথা

গুপ্তঘাতকদিগের মরসুম

"টাইম" পত্রিকায় প্রকাশ যে মিউনিখের হত্যা-লীলার অবসান হইবার পরেই গুপ্তঘাতকগণ নানাভাবে ইসরায়েলের কর্ম্মচারীদিগকে ইয়োরোপের সর্বত্র হত্যা করিবার চেষ্টা আরম্ভ করিয়াছে। চারটি চিঠি এমস্টারডাম হইতে লণ্ডনের ইসরায়েল রাজদূত দফতরে প্রেরিত হয়। ইহার মধ্যে তিনটি কেহ খুলে নাই। চতুর্থ টি আমি সাহাচোরী নামক এক কর্মচারীর নামে আসিয়াছিল। ঐ ব্যক্তি এমস্টারডাম হইতে কিছু বীজ আসিবে বলিয়া জানিতেন ও পত্রটিতে সেই বীজগুলি আছে ভাবিয়া চিঠিখানা একপাশ হইতে ছিঁড়িয়া খুলিয়া ফেলিলেন। সঙ্গে সঙ্গে একটা প্রবল বিস্ফোরণ হইয়া আমি সাচোর মারাত্মকভাবে আহত হইলেন, পরে তাঁহার মৃত্যু হয়। বিস্ফোরণটি এতই জোরাল হইয়াছিল যে ঐ কর্ম্মচারীর টেবিলে একটা বিরাট গর্ত্ত হইয়া যায়। অতঃপর সকল কর্ম্মচারীগণ খুব সাবধান হইয়া চিঠিপত্র পরীক্ষা করাইয়া খুলিবার ব্যবস্থা করিতে আরম্ভ করিলেন। এক সপ্তাহ গত হইতে না হইতে ৬৪টি চিঠি-বোমা ধরা পড়িল। সেইগুলি পাঠান হইয়াছিল ইসরায়েলের নানান দফতরে। নিউইয়র্ক, ওটাওয়া, মনট্রিয়ল, প্যারীস, ভিয়েনা, জেনিভা ব্রুসেলস, বুয়েনস এয়াস, কিনশাশা, টেল অ্যাভিভ ও জেরুসালেম; সকল সহরেই চিঠি-বোমা পাঠাইয়া নরহত্যা চেষ্টা করা হয়। কিন্তু সকলে সাবধান হইয়া যাওয়াতে পূর্ব্বে উল্লিখিত দুর্ভাগ্য কর্ম্মচারীটি ব্যতীত আর কাহারও কোন আঘাত লাগে নাই। চিঠি-বোমা প্রস্তুত করা সহজ কার্য্য নহে। বিশেষভাবে বিস্ফোরকগুলি চিঠিতে স্থাপন করা শিখিতে হইলে সে কার্য্যে বিশেষজ্ঞ হওয়া আবশ্যক হয়। ইহাতে বুঝা যায় যে আরব গুপ্তঘাতকগণ নিজেদের ঘৃণ্য কার্য্য সাধনের উদ্দেশ্যে বহু কষ্টসাধ্য কৌশল আরত্ত করিবার জন্য প্রগাঢ় ভাবে বিজ্ঞান অনুশীলন করিয়া থাকে ও ঐ কার্যে ক্ষমতা অর্জ্জনে তাহারা পৃথিবীর অন্যান্য জাতির সমকক্ষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু যদি আরবগণ ঐ ক্ষমতা নিজ জাতির গঠনমূলক কার্য্যে দেখাইতে পারিত তাহা হইলে তাহাদিগের কোনও অভাবই থাকিত না এবং তাহাদিগকে ইসরায়েল রাষ্ট্রের প্রতি কোনও শত্রুতার ভাব পোষণ করিতেই হইত না। আরব দেশ আকারে বিরাট ও বিজ্ঞানের সাহায্যে ঐ দেশকে যথাযথভাবে গড়িয়া লইলে ঐ দেশের বর্ত্তমান লোকসংখ্যার বহুগুণ অধিক সংখ্যক মানুষ সেখানে সুখে স্বচ্ছন্দে বসবাস করিতে পারিত। আরবগণ গঠনমূলক কার্য্যে উন্নতি করিতে পারে না। ইসরায়েলের মানুষ তাহা উত্তমরূপেই পারে। আরবদিগকে রুশিয়া বহু সাহায্য করা সত্ত্বেও তাহারা নিজ দেশের বিশেষ উন্নতি করিতে পারে নাই। ইসরায়েল কেন আরবের অল্প কিছু দখল করিয়া নিজ রাষ্ট্র গঠন করিয়াছে এখন আরবগণ শুধু সেই চিন্তা লইয়াই সদা ব্যস্ত। ইসরায়েল অন্যায়ভাবে গঠিত হইয়াছে বলিয়া নিজ জাতির সকল উন্নতির কথা ভুলিয়া ও অবহেলা করিয়া আরবগণ শুধু ইসরায়েল বিরোধেই মগ্ন থাকিবে ও তজ্জন্য সুনীতির পথ ছাড়িয়া গুপ্ত হত্যা ইত্যাদিতে লিপ্ত হইবে, ইহা কোন উচ্চ আদর্শ নহে। আরবদিগের উন্নতি ও ইসরায়েল ফিরাইয়া পাওয়াও ইহা দ্বারা সুসিদ্ধ হইবে না।

আফিং এর ব্যবসায়ে চীনাদিগের অংশীদারী

প্রাচীনকালে ইয়োরোপীয়গণ চীনাদিগকে আফিং খাওয়াইবার ব্যবস্থা করিয়া প্রচুর অর্থোপার্জ্জন করিত। চীনাগণ যদি এই ইয়োরোপীয় ব্যবস্থার বিরুদ্ধাচরণ করিত তাহা হইলে তাহাদের গায়ের জোরে সমাজ-সংস্কার কার্য্য হইতে বিরত করা হইত। ঐ সময় ইংরেজই বিশেষ করিয়া আফিং লইয়া যাইত ভারতবর্ষ হইতে চীন

পরিমল গোস্বামী রচিত সর্বাধুনিক গ্রন্থ

প ত্র স্মৃ তি

লেখক কর্তৃক গৃহীত ৩৬ খানি ফোটোগ্রাফ, মূল্যবান্ মুদ্রণ, ৭৫ জন পত্র লেখক ও লেখিকার ৩১০ খানি পত্র ও পত্রাংশ—আর তাদের ঘিরে লেখকের বিচিত্র স্মৃতি। বাংলা সাহিত্যে সম্পূর্ণ অভিনব। মূল্য বাইশ টাকা।

যাঁদের পত্র ঘিরে লেখকের স্মৃতি রচিত হয়েছে

অজিতকৃষ্ণ বসু—অঞ্জনা ভৌমিক—অতুলচন্দ্র বসু—অতুলানন্দ চক্রবর্তী—অমল হোম—অমিতা রায়—অমিয়া চৌধুরাণী—অশোক মৈত্র—আবদুল আজীজ আমান—আশু দে—ইন্দিরা দেবীচৌধুরাণী—কালিদাস নাগ—কালিদাস রায়—কিরণকুমার রায়—গীতশ্রী বন্দনা সেনগুপ্ত—গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য—গোপাল ঘোষ—গোপাল হালদার—চন্দ্রশেখর বেঙ্কট রামন্—জয়ন্তনাথ রায়—জয়ন্তী সেন—জাহান আরা বেগম—জীবনময় রায়—জ্যোতির্ময় ঘোষ—তপতী বিশ্বাস—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়—দিগিন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য—দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী—নলিনীকান্ত সরকার—নিখিলচন্দ্র দাস—নিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী—নীরদচন্দ্র চৌধুরী—নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়—পুলিন বিহারী সেন—পি. সি. সরকার—প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়—প্রমথ চৌধুরী—প্রমথনাথ বিশী—প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়—প্রেমেন্দ্র মিত্র—বনফুল—বনবিহারী মুখোপাধ্যায়—বারীন্দ্রকুমার ঘোষ—বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়—বিনয়কুমার সরকার—বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়—বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়—বিমলাকান্ত রায়চৌধুরী—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—মণীন্দ্রচন্দ্র সমাদ্দার—মণীশ ঘটক—মায়া বসু—মার্গারেট চ্যাটার্জী—মৈত্রেয়ী দেবী—রাজশেখর বসু—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—লীলা বন্দ্যোপাধ্যায়—লীলা মজুমদার—লীলা সিং—শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়—শশিশেখর বসু—শিবরাম চক্রবর্তী—শিশিরকুমার ভাদুড়ি—শীতলাকান্ত শীল—শোভা সেন—সতীনাথ ভাদুড়ী—সবিতা সেনগুপ্ত—সুধাকান্ত রায়চৌধুরী—সুধীরকুমার চৌধুরী—সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী—সৈয়দ মুজতবা আলী—হারীতকৃষ্ণ দেব—হেমলতা ঠাকুর।

পরিবেশক: রূপা অ্যাণ্ড কোং কলিকাতা-১২

পরিমল গোস্বামী রচিত

আধুনিক ব্যঙ্গ পরিচয়

মূল্য ছয় টাকা

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী বলেন—

বাংলা ভাষায় ব্যঙ্গ সাহিত্য সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ।

●

প্রেসিডেন্সি কলেজের বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক

শ্রীভবতোষ দত্ত বলেন—

আধুনিক ব্যঙ্গ পরিচয়ের ভূমিকাতে ব্যঙ্গের লক্ষ্য যে রকম সুনির্দিষ্ট এবং পরিষ্কার করে বলা হয়েছে এমন আর কোন বইতে হয়েছে বলে জানি না।

পরিবেশক: নবগ্রন্থনা, ৮, কৈলাস বসু স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

দেশে এবং ঐ ব্যবসায়ের লাভ ভারতবর্ষের আফিং প্রস্তুতকারক চাষীদিগের ভাগে অল্পই পড়িত। ইংরেজ আফিং রপ্তানিকারকদিগের ঐ লাভের বেশীর ভাগ প্রাপ্য হইত। চীনা দেশনেতা সান-ইয়ত-সান প্রথম বিশ্ব মহাযুদ্ধের কয়েক বৎসর পূর্ব্বে চীনাদিগকে লম্বা টিকি রাখা, স্ত্রীলোকদিগের পা বাঁধিয়া রাখা ও আফিং সেবন হইতে মুক্ত করিবার চেষ্টা করেন এবং ঐ কার্য্যে সক্ষমও হন। ইহার পর হইতে চীনাদিগের জাতীয় উন্নতি অবাধ গতিতে বৃদ্ধি পাইতে থাকে ও চীনা সেনাপতি-দিগের পরস্পর বিরোধজাত যুদ্ধ-বিগ্রহ ব্যতীত অপর কোনও সামাজিক কারণে সে উন্নতি ব্যাহত হয় নাই। তবে আফিং বিক্রয় আর চীনদেশে চলিত না।

বর্ত্তমানে যে বিরাট আফিং ও আফিংজাত অপরাপর বিষাক্ত মাদক দ্রব্যের ব্যবসায় পৃথিবীর সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে তাহাতে বহু জাতির মানুষের অংশ আছে। কিন্তু আফিংএর চাষ করে যাহারা তাহারা প্রধানতঃ দক্ষিণ-পূব এশিয়ার, অর্থাৎ লাওস ও ভিয়েতনাম অঞ্চলের বাসিন্দা। এইসকল স্থানে অনেক চীনদেশীয় লোকও পূর্বকাল হইতে বসবাস করিয়া আসিতেছে। ইহারা আফিং প্রস্তুত ও তাহা হইতে হেরয়েন প্রভৃতি মাদক রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত করিয়া থাকে। রাসায়নিক বিদ্যা আহরণের জন্য ইহারা নানাভাবে শিক্ষালাভ ব্যবস্থার আয়োজন করে ও ঐ হেরয়েন প্রধানতঃ আমেরিকায় চালান করিয়া ইহারা প্রচুর লাভ করিয়া থাকে। এই চালানকার্য্যের জন্য ইহারা যাহাদের সাহায্য গ্রহণ করে তাহারা হইল প্রধানতঃ ইয়োরোপীয় ও আমেরিকান। চীনা বিশেষজ্ঞগণ মাদক দ্রব্যাদি কোনও একটা বিমান বন্দরে অথবা জাহাজ ঘাটে পৌঁছাইয়া নিজেদের কাজ শেষ করে। ইহার পরে চালান ও বিক্রয় ব্যবস্থা নানা গুপ্ত উপায়ে চালিত হইয়া থাকে এবং আন্তর্জাতিক প্রহরীগণ অল্প ক্ষেত্রেই ঐ সকল মাদক দ্রব্যগুলির চালান ও বিক্রয় নিবারণ করিতে সক্ষম হয়। গুপ্ত রপ্তানির উপায় বিচিত্র ও মানব উদ্ভাবনী শক্তির অপরূপ ক্ষমতার পরিচায়ক। বাঘ-ছালের বাঘের মস্তকের ভিতরে রক্ষিত হেরয়েন, বিমান হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বয়ার সাহায্যে ভাসমান সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হেরয়েনের প্লাসটিক শিশি, আরও কত কিছু। চীনা অহিফেন ব্যবসায়ীগণের অনেকে পূর্ব্বে চাংকাই শেখের সৈন্যদলভুক্ত ছিল। আরও নূতন নূতন চীনা গুপ্ত সভার সভ্য ফুকিয়ান প্রদেশ হইতে আসিয়া দলবদ্ধভাবে এই অবৈধ ব্যবসায় করিয়া থাকে। এ যেন পূর্ব্বযুগের শ্বেতকায় পরিচালিত চীনাদিগকে আফিং ব্যবহার করিতে শিখাইবার কারবারের প্রতিশোধ ব্যবস্থা। এখন চীনাগণ শ্বেতকায়দিগকে হেরয়েন ব্যবহার করিতে শিখাইয়া প্রচুর অর্থোপার্জ্জন করিতেছে। শুধু আমেরিকাতেই কয়েক লক্ষ শ্বেতকায় হেরয়েনের নেশার জন্য মাসিক বহু সহস্র ডলার ব্যয় করিতেছে। তাহাদের নিকট ঐ মাদক দ্রব্য পৌঁছাইয়া দিবার যে ব্যবস্থা তাহা একটা অতি বিরাট শাখা-প্রশাখাবহুল মাল সরবরাহ ও বিক্রয়ের কারবার। সুদূর দক্ষিণ-পূব এশিয়া হইতে কাঁচা আফিং হেরয়েনে পরিণত হইয়া কিভাবে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে আসিয়া বিক্রয় হয় তাহা একটা রোমাঞ্চকর কাহিনী।

শিক্ষা ব্যবস্থার অভিনব আয়োজন

ভারত সরকারের শিক্ষা দফতর ৩২০০ কোটি টাকা ব্যয় করিয়া এই দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় এরূপ অভি-নবত্বের সৃষ্টি করিবেন যে সকলের বোধ হইবে শিক্ষা-ক্ষেত্রে একটা বিপ্লব আনয়ন করা হইয়াছে। এই দেশে এখনও বাধ্যতামূলকভাবে সকল বালক-বালিকাকে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হয় নাই। বহু লোকে এখনও শিক্ষা না পাইয়া নিরক্ষরভাবেই জীবনযাত্রা নির্বাহ করে। যদি সকলকে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা হয় তাহা হইলে ঐ ৩২০০ কোটি টাকা অতি সহজেই ব্যয় হইয়া যাইবে। কারণ এই দেশে অন্ততঃ দশ কোটি বালক বালিকা স্কুলে যাইতে পারে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীও এক কোটির অধিক হইবে। সুতরাং যদি ছাত্র

প্রবাসী

ষষ্টিবার্ষিকী স্মারকগ্রন্থ

১৩৬৭ সাল প্রবাসী-প্রকাশনার ষষ্টিতম বর্ষ। এই উপলক্ষে প্রকাশিত স্মারক গ্রন্থটি রচনা-সম্পদে সমৃদ্ধ এবং বহুচিত্র দ্বারা অলঙ্কৃত।

এতে আছে :

বাংলার শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের আঁকা অন্ততঃ চব্বিশটি তিন-রঙা ছবি।

অন্ততঃ কুড়িটি এক-রঙা ছবি।

এ গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট গল্প, উপন্যাস এবং নাটকের অলঙ্করণের জন্য অঙ্কিত ছবি।

এ ছাড়া অন্যান্য নানা বহুসংখ্যক ছবি।

প্রবাসীর আকারের ন্যূনাধিক পাঁচশত পৃষ্ঠা সম্বলিত এই গ্রন্থে বিভিন্ন বিষয়ে যাঁরা লিখেছেন তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের নাম :

প্রবাসী-প্রসঙ্গ—শ্রীনন্দলাল বসু, শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমতী শান্তা দেবী, শ্রীহরিহর শেঠ, যামিনীকান্ত সোম, শ্রীপ্রমথনাথ বিশী।

রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ—শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীদিলীপকুমার রায়, শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র রায়, শ্রীতপনমোহন চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমতী সীতা দেবী, শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।

স্মৃতিকথা (বাংলার শ্রেষ্ঠ মনীষীদের সম্পর্কে)—শ্রীক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত, শ্রীনরেন্দ্র দেব, শ্রীরত্নমণি চট্টোপাধ্যায়, শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীকাত্তিকচন্দ্র দাশ গুপ্ত।

ষাট বৎসরের বাংলা সাহিত্য—শ্রীসজনীকান্ত দাস, বুদ্ধদেব বসু, শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীঅজিত দত্ত, শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়।

চিত্রকলা ও ভাস্কর্য্যে বাংলার ষাট বৎসর—শ্রীসুধীর খাস্তগীর, শ্রীবিষ্ণু দে, শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী, শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়।

শিক্ষায় বাংলার ষাট বৎসর—শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন, শ্রীভূপতিমোহন সেন, শ্রীত্রিগুনাচরণ সেন, শ্রীযতীন্দ্র মোহন দত্ত।

মূল্য ঃ—১২.৫০ পয়সা

পিছু ৩০০ টাকা ব্যয় করা হয় তাহাতে অভিনব কিছু হইবে বলিয়া মনে হয় না। ক্যানাডাতে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৫০।৬০ লক্ষ মাত্র। ঐ দেশে শিক্ষার জন্য সরকারী খরচের পরিমাণ হইল বাৎসরিক প্রায় ২২০০ কোটি টাকা। অর্থাৎ মাথা পিছু ৩৬৬৬ টাকা। ভারতের প্রস্তাবিত অভিনবত্ব সৃজনকারী মাথা পিছু ৩০০ শত টাকার দশ গুণেরও অধিক। অবশ্য ভারতের ব্যয় পূর্ব্বে ছিল মাথা পিছু ১৫।৮০ টাকা মাত্র। তাহার তুলনায় নূতন খরচের পরিমাণ নিশ্চয়ই উন্নতির পরিচায়ক। অস্ট্রেলিয়া ২৫ লক্ষ ছাত্রছাত্রীর পাঠের ব্যবস্থার জন্য ব্যয় করে ১৪০০ কোটি টাকা। অর্থাৎ মাথা পিছু ৫৬০০ টাকা। বাহিরের দেশে স্কুলের শিক্ষকদিগের বেতন হয় মাসিক ৩০০০।৪০০০ হাজার টাকা। এই দেশে সেই অনুপাতে কি হওয়া উচিত তাহা আলোচনার বিষয়। তবে যে-রূপ বেতনে স্কুলে কলেজে শিক্ষক নিযুক্ত করা হয় তাহা কারখানার শ্রমিকদিগের বেতন অপেক্ষাও অনেক অল্প। এইজন্য শিক্ষাও যথাযথভাবে দেওয়া হইতে পারে না।
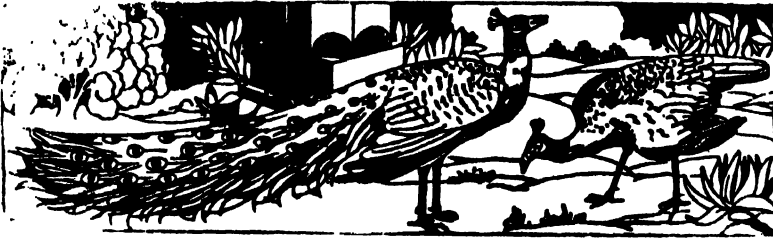
(৮ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

অন্ধকার বিনাশ করিয়া সত্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তাঁহার কার্য্য ছিল নানা ক্ষেত্রে সত্য প্রচার। এই জন্য তিনি শুধু যে পুস্তিকা রচনা করিয়া প্রকাশ করিতেন তাহাই নহে, তিনি স   করিয়াছিলেন ও
জন্য সংগ্রাম চালাইয়াছিলেন।
সরকারী প্রেস অর্ডিন্যান্স উঠাইয়া দিবার জন্য তিনি যে আন্দোলন করেন তাহাও ঐতিহ্যের ক্ষেত্রের একটা বড় কথা। রামমোহনের সহকর্মী ছিলেন চন্দ্রকুমার ঠাকুর, দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, হরচন্দ্র ঘোষ এবং গৌরীচরণ বন্দোপাধ্যায়। তাঁহারা সকলেই ছিলেন যোদ্ধা।

রামমোহন রায় সামাজিক সকল কুপ্রথা দূর করিবার চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করিতেন। জাতিভেদ প্রথা ভাঙ্গিয়া অসবর্ণ বিবাহেরও তিনি সমর্থক ছিলেন। বিধবা বিবাহ সমর্থনের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। দরিদ্র চাষীদিগের খাজনা যাহাতে বৃদ্ধি না পায় তাহার চেষ্টাও তিনি করিয়াছিলেন। অর্থাৎ সমাজ সংস্কার, অর্থ-নৈতিক সংস্কার, রাষ্ট্রীয় রীতিপদ্ধতিকে সুযুক্তিও সুনীতি দ্বারা নূতন আকার দান, আইন-কানুন এরূপ করা যাহাতে ন্যায় প্রতিষ্ঠা সহজ হয়, প্রভৃতি বহু বিষয়েই তিনি নূতন চিন্তার আলোক প্রক্ষেপ করিয়াছিলেন। একথা ভারতের বহু গুণীজন বলিয়াছেন যে রামমোহনের চিন্তার ধারা ও কার্য্যক্ষেত্রে নানান নূতন পথে জাতীয় জীবনকে চালিত করিবার চেষ্টাই ভারতবর্ষে আধুনিকতাকে জাগ্রত ও জীবন্তভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। ইহার উপর ছিল তাঁহার আধ্যাত্মিকতা। তিনি ফরাসী বিপ্লবের যুগের মানুষ হইলেও নিরীশ্বরবাদী যুক্তি-পুজারী হইতে পারেন নাই। অতি অল্প বয়স হইতেই তিনি ঈশ্বরে বিশ্বাস ও ভক্তির পথেই চলিতে আরম্ভ করেন ও ভগবৎ উপলব্ধির আগ্রহ ও প্রেরণাই তাঁহাকে দিকে দিকে ঘুরাইয়া জগতের সহিত ঘনিষ্ঠতর পরিচয় লাভ করিতে শিক্ষা দেয়। তিনি যে আরবী, ফারসী, ইংরেজী, হিব্রু, গ্রীক, ল্যাটিন, পালি প্রভৃতি বহু ভাষায় ব্যুৎপত্তি অর্জ্জন করিয়াছিলে, তাহার মূলেও ছিল নানা ধর্ম্মের মূল গ্রন্থ সকল পাঠ করিবার আবেগ। একেশ্বর বাদ ও ঈশ্বরে বিশ্বাসের উপরই রামমোহনের কর্ম্মময় জীবনের ভিত্তি অনড় ভাবে স্থাপিত হইয়াছিল। ভাষার গঠন ও ভাব প্রকাশ শক্তি বৃদ্ধি, লিখিত ভাবে মনোভাব ব্যক্ত করিবার পদ্ধতি, দলবদ্ধভাবে সমাজ সংস্কার চেষ্টা, আন্দোলন ও প্রচার, এই সকল ক্ষেত্রেই রামমোহন ছিলেন আধুনিক কালের ভারতীয়দিগের পথপ্রদর্শক। জাতীয়তার আদর্শ নির্ণয়, আন্তর্জাতিকতার মূল যে মানবতাবোধ তাহার স্বরূপ ব্যাখ্যা, দেশের মানুষের নানা ক্ষেত্রের অধিকার অনধিকার বিচার, গঠন ও সংস্কার রামমোহন না আসিলে কিছুরই আরম্ভ সেই যুগে সহজে সম্ভব হইত না।

ছন্দ

ঃঃ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ঃঃ

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৭২তম ভাগ
দ্বিতীয় খণ্ড

অগ্রহায়ণ, ১৩৭৯

২য় সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

বৃটেনে কৃষ্ণকায়দের বিরুদ্ধে পুলিসের অপ-প্রচার

বৃটেনে অনেক সহরে বর্ত্তমানে বহু কৃষ্ণকায় ব্যক্তি বাস করিতেছেন। এই সকল ব্যক্তির মধ্যে অনেকে অবস্থাপন্ন এবং আরও অনেকে আছেন যাঁহারা ততটা অবস্থাপন্ন নহেন। যাহারা আর্থিকভাবে সচ্ছল অবস্থায় নাই তাঁহাদের পরিবারের তরুণ-বয়স্ক ব্যক্তিদিগকে অপরাধপ্রবণ বলিয়া ধরিয়া লওয়া বৃটেনের পুলিসের একটা অভ্যাসে দাঁড়াইয়াছে। এই সকল কৃষ্ণকায় যুবক যদি রাস্তায় ঘোরাফেরা করেন তাহা হইলে পুলিস তাঁহাদিগকে ধরিয়া চালান করিয়া দিয়া থাকে। তাঁহারা কিছু না করিলেও "অপরাধের সুবিধা সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে ও ঘুরিয়া বেড়াইবার কোন ন্যায়সঙ্গত কারণ দেখা যাইতেছে না" ইত্যাদি বলিয়া তাঁহাদিগকে চালান করা হয় ও কখন কখন আদালতে তাঁহাদের সাজাও হইয়া যায়। সাজা হইলে তাঁহাদের পক্ষে কাজ পাওয়া কঠিন হইয়া দাঁড়ায় ও তাঁহারা ক্রমে ক্রমে অপরাধের দিকেই চলিয়া যাইতে বাধ্য হইয়া পড়েন। কিছু কিছু কৃষ্ণকায় তরুণ রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইবার সময় সুবিধা পাইলে চুরি, ছিনতাই প্রভৃতি করিয়া থাকেন কিন্তু অনেকেই কোনও অপরাধ কখনও করিতে চেষ্টাও করেন নাই, শুধু গায়ের রং কৃষ্ণবর্ণ বলিয়াই তাঁহাদিগকে জোর করিয়া অপরাধ-প্রবণতার দিকে ঠেলিয়া দেওয়া হইয়াছে ও সেইরূপ অবস্থায় তাঁহারা ক্রমে ক্রমে অপরাধের সহিত জড়িত হইয়া পড়িতে বাধ্য হইয়াছেন। একথা নিঃসন্দেহভাবেই প্রমাণ করা যায় যে বৃটেনে

পথে ঘাটে যাহারা নানা প্রকার অপরাধে লিপ্ত হইয়া থাকে তাহাদিগের অধিকাংশই কৃষ্ণকায় নহে। কিন্তু পুলিসের কর্মপদ্ধতির ধাক্কায় বহু কৃষ্ণকায় ব্যক্তিই ক্রমে ক্রমে বে-আইনী কার্য্যের সহিত সংযুক্ত হইয়া যাইতেছেন। ইহার জন্য পুলিসই দায়ী এবং কৃষ্ণকায়গণ ... সকল কার্য্যের সহিত জাতিগতভাবে সংযুক্ত নহেন। কিছু কিছু কৃষ্ণকায় যুবক অপরাধ করিয়া থাকেন কিন্তু শ্বেতকায় যুবকগণ আরও অধিক সংখ্যায় ঐরূপ কার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন। পুলিসের বর্ণবিদ্বেষজাত উৎপীড়ন নীতিই অধিক ক্ষেত্রে কৃষ্ণকায়দিগকে অপরাধের কার্য্যের সহিত জড়াইয়া দিয়া থাকে।

বৃটিশ পুলিসের এইরূপ আচরণ কোনও উদ্দেশ্যবর্জিত হইতে পারে না এমন নহে। অথবা উদ্দেশ্য থাকিতেও পারে। অর্থাৎ কৃষ্ণকায়দিগকে ক্রমশঃ অপরাধপ্রবণ জাতি বলিয়া ঘোষণা করা যাহাতে সম্ভব হইতে পারে বর্ত্তমানের অপ-প্রচার তাহারই প্রস্তুতি বলা যাইতে পারে। কিন্তু কৃষ্ণকায়গণ সকলে এক জাতির মানুষ নহেন। কেহ আফ্রিকান, কেহ পশ্চিম অতলান্তিকের দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসী, কেহ কেহ আফ্রিকা হইতে বহিষ্কৃত এশিয়ার নানা দেশের মানুষ এবং কিছু কিছু মানুষ ভারতের ও পাকিস্থানের ভিন্ন ভিন্ন জাতির ব্যক্তি। হিন্দুদিগের কোন কোন জাতির মানুষকে বৃটিশ শাসকগণ এক সময় অপরাধপ্রবণ জাতি বলিয়া প্রচার করিত। বর্ত্তমানে সেই সকল জাতি সাধারণ সকল জাতির মতই অপরাধ-প্রবণতাহীন বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। অর্থাৎ অপরাধ-প্রবণতার অপবাদ কোন সময়েই কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল বলিয়া মনে করিবার কোনও ন্যায়সঙ্গত কারণ কখনও দেখা যায় নাই। এখন যে বৃটিশ পুলিস বৃটেনবাসী সকল কৃষ্ণকায় তরুণদিগকে অপরাধী সাব্যস্ত করিবার চেষ্টা করিতেছে তাহারও কোন বৈজ্ঞানিকভাবে সমর্থনযোগ্য কারণ দেখা যাইতে পারে না। কিন্তু অপবাদ প্রচলন দ্বারা জনমত গঠিত হয়। এবং জনমত যদি প্রবলভাবে কৃষ্ণকায়-বিরুদ্ধ হইয়া দাঁড়ায় তাহা হইলে বৃটেন হইতে কৃষ্ণকায়দিগকে বিতাড়িত করিবার একটি সহজ উপায় সৃষ্টি হইতে পারে।

জাতিগত অপরাধ-প্রবণতা বিচার করিলে আর একটা কথা সতত‌ই উত্থাপিত হইতে পারে। তাহা হইল এই যে যদি কোন জাতির মানুষ অপরাধপ্রবণ হয় তাহা হইলে সেই জাতির নরনারী উভয়ই অপরাধে নিযুক্ত হইতে দেখা যাইবে। কৃষ্ণকায় তরুণীদিগের মধ্যে কোন অপরাধ-স্পৃহা লক্ষ্য করা যায় না; কিন্তু শ্বেতকায় তরুণীদিগের মধ্যে অনেকে নানা স্থানে মহিলাদিগকে আক্রমণ করিয়া তাহাদের গহনা, টাকা প্রভৃতি কাড়িয়া লইয়াছে বলিয়া খবর পাওয়া গিয়া থাকে। সুতরাং অপরাধ-প্রবণতার ব্যাপক জাতিগত রূপ শুধু শ্বেতকায়দিগের মধ্যেই দেখা দিতেছে; কৃষ্ণকায়দিগের মধ্যে সেই স্বভাবজাত দোষ শুধু কিছু সংখ্যক পুরুষের মধ্যেই লক্ষিত হইতেছে। কৃষ্ণকায় নারীগণ এখন অবধি ঐ দোষমুক্ত রহিয়াছেন বলিয়া দেখা যাইতেছে। বৃটিশ পুলিস যে বৃটেনের কোন কোন সহরে পথে ঘাটে আক্রমণ ও ছিনতাই অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কৃষ্ণকায় তরুণগণ করিতেছে বলিয়া প্রচার করিতেছে, সে প্রচার মিথ্যা অপবাদ দিবার চেষ্টা মাত্র।

দেশাত্মবোধের তিনজন পূজারীর কথা

২রা অক্টোবর শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস শাস্ত্রী, ডাঃ অ্যানি বেসান্ট ও মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিবস। দুইজন ভারতের মানুষ ও একজন ভারতকে নিজদেশ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। মহামতি গোখলে ১৯০৫ খৃঃ অব্দে সারভেন্টস্ অব ইণ্ডিয়া সোসাইটি গঠন করেন। শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস শাস্ত্রী ১৯০৬ খৃঃ অব্দে ঐ সংঘে যোগদান করেন। মহামতি গোখলের মৃত্যুর পরে ১৯১৫ খৃঃ অব্দে শ্রীনিবাস শাস্ত্রী ঐ সংঘের সভাপতি পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। গোখলে আধুনিক রাজনীতি ক্ষেত্রে মহাজ্ঞানী ও কর্মী বলিয়া প্রসিদ্ধ; কিন্তু নিজ জীবনযাত্রা পথে তিনি ছিলেন সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী; শুধু দেশের মঙ্গলের কথাই তাঁহার প্রাণের প্রেরণা ছিল এবং ভারতের জাতীয়তাবাদের আদর্শ গোখলের অন্তরের উৎস হইতেই প্রধানত

প্রবাহমান হইয়াছিল বলিলে কোনও ভুল করা হইবে না। মহাত্মা গান্ধী মহামতি গোখলেকে গুরু বলিয়া মনে করিতেন ও শ্রীনিবাস শাস্ত্রীকেও তিনি নানান গুণে গুণবান্ বলিয়া শ্রদ্ধা করিতেন। গান্ধী হয়ত গোখলে প্রতিষ্ঠিত সারভেন্টস অফ ইণ্ডিয়া সোসাইটিতেই যোগদান করিতেন যদি না ঐ প্রতিষ্ঠানের সভ্যগণ তাঁহাকে ভিন্ন পথের পথিক বলিয়া মনে করিতেন। গোখলে ও শ্রীনিবাস শাস্ত্রী বিধান-সঙ্গত উপায়ে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা অর্জনে বিশ্বাস করিতেন। গান্ধী ছিলেন বিপ্লববাদী, যদিও তাঁহার বিপ্লব ছিল অহিংস ও রক্তপাতবর্জিত। ডাঃ অ্যানি বেসাণ্ট স্বাধীনতা লাভের জন্য বিপ্লব প্রয়োজন হইলে তাহার জন্য প্রস্তুত থাকা অন্যায় মনে করিতেন না এবং প্রথম বিশ্ব মহাযুদ্ধের সময় বৃটিশদিগকে ভারত হইতে বিপ্লবাত্মকভাবে দূর করিবার চেষ্টা সম্বন্ধে তাঁহার অমত ছিল না; কিন্তু গান্ধীজি বৃটেনকে বিপদ কালে সাহায্য করাই উচিত মনে করিতেন ও সেইজন্য তিনি ঐ সময় স্বাধীনতা লাভ করিবার জন্য কোনও আন্দোলন ও সংগ্রাম চালনায় মত দিবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে গান্ধীজি শ্রীনিবাস শাস্ত্রীকে বহুগুণের আধার বলিয়া মনে করিতেন। গোখলের সম্বন্ধে তাঁহার ভক্তি ছিল অগাধ ও তিনি তাঁহার শেষ জীবন অবধি গোখলেকে জাতীয়তাবাদের মহা-পুরোহিত বলিয়া মনে করিতেন। সারভেন্টস অফ ইণ্ডিয়া সোসাইটি সম্বন্ধেও গান্ধীজির মনোভাব ছিল বিশেষ করিয়া সমর্থনেরই। তাঁহাকে যদি উক্ত সোসাইটির সভ্যগণ সাদরে নিজেদের মধ্যে গ্রহণ করিতেন তাহা হইলে সোসাইটির স্বরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইলেও গান্ধীজি সানন্দেই সোসাইটির সভ্যতা গ্রহণ করিতেন বলিয়া অনেকে মনে করেন। কিন্তু সোসাইটির সভ্যগণ গান্ধীজিকে বিপ্লববাদী মনে করিতেন ও তাঁহাকে সভ্য করিয়া লইলে নিজেদের বিধান-সঙ্গত পথে চলিয়া স্বাধীনতা অর্জন নীতি তাহার পরে আর অক্ষুণ্ণ রাখা সম্ভব হইবে না মনে করিয়া তাঁহারা গান্ধীজিকে সারভেন্টস্ অফ ইণ্ডিয়া সোসাইটিতে না আনাই স্থির করেন। ডাঃ অ্যানি বেসাণ্ট ভারতীয় সভ্যতার সারবস্তু থিওজফির মধ্যে পাইয়াছিলেন। গান্ধীজি ছিলেন গীতাবাদী ও গীতাকে তিনি অনাসক্তি যোগ নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। সর্ব্বোপরি অবশ্য তিনি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের মহা সেনাপতির কার্য্যেই পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন।

এই সকল কথা বিচার করিলে দেশাত্মবোধের এ তিন মহাপূজারীর মনোভাবের পার্থক্য সহজ বুঝিতে পারা যায়।

রাজা রামমোহন রায়ের জাতি গঠন পরিকল্পনা

রাজা রামমোহন রায় ছিলেন ভারতীয় সমাজকে নানাভাবে সংস্কার ও উন্নতির পথে চালাইবার এই যুগের প্রধান ও প্রথম উদ্যোক্তা। সমাজ-সংস্কার ও জাতীয় উন্নতির ক্ষেত্রে তিনি যে সকল চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হইল সতীদাহ প্রথার উচ্ছেদ, নারীজাতির শিক্ষা ও মানবীয় অধিকারের যথাযথ স্বীকৃতি, জাতিভেদের সমাজ ধ্বংসকারী ব্যবহার নিবারণ, শিক্ষা পদ্ধতি পরিবর্ত্তন করিয়া ইংরেজীর মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা, রায়তদিগের অধিকার সুগঠিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা, সর্ব্ব মানবের স্বাধীনতার অধিকার স্বীকার, ভারতীয় কৃষ্টি ও সভ্যতার পুনরুদ্ধার এবং বাংলা ও ইংরেজীতে তাহার ব্যাপক প্রচার, হিন্দু-ধর্ম্মের প্রচলিত রীতি-নীতির পুরাতন শাস্ত্রানুগতভাবে সংস্কার—মূর্ত্তিপূজা ও বহু-দেবতার পূজার স্থলে নিরাকার একেশ্বরবাদের প্রতিষ্ঠা —ইত্যাদি, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

সতীদাহ প্রথার উচ্ছেদে বিশেষ অংশ গ্রহণ করেন লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিং। তিনি আইন প্রণয়ন করিবার পূর্ব্বে রামমোহন রায়ের সহিত আলোচনা করিয়াছিলেন ও রামমোহন তাঁহাকে এই বিষয়ে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিতে বলিয়াছিলেন; কারণ সমাজ-সংস্কার-

বিরুদ্ধতা তখন প্রবলভাবেই উপস্থিত ছিল এবং রাজা রামমোহন রায় জানিতেন যে, সতীদাহ প্রথা উঠাইয়া দিলে বহু ভারতীয় ও ইংরেজ তাহার বিরুদ্ধে আন্দোলন করিবেন। এই বিরুদ্ধতা বেণ্টিং-এর আইনের উচ্ছেদ চেষ্টায় অনেক ব্যক্তিই করিয়াছিলেন এবং বেণ্টিং-এর আইন রদ করাইবার জন্য বহু স্বাক্ষর সমন্বিত আবেদনও ভারতে ও ইংলণ্ডে পাঠান হইয়াছিল। রাজা রামমোহন রায়ও সেই বিরুদ্ধতা যাহাতে সফলকাম না হয় সেইজন্য লোকমত জাগ্রত করিয়া সেই চেষ্টা বিফল করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। বেণ্টিং এই ক্ষেত্রে ক্রিয়াশীল হইবার অনেক পূর্ব্ব হইতেই রাজা রামমোহন সতীদাহ প্রথার উচ্ছেদের জন্য বহু পুস্তিকা রচনা ও প্রচার করিয়া আসিতেছিলেন। তাঁহার প্রচার হইতেই বেণ্টিং-এর আইন প্রণয়ন করিয়া সতীদাহ নিবারণের চেষ্টার উদ্ভব হয়। এই সকল কথা জানিয়াও যাহারা রাজা রামমোহন রায় সতীদাহ প্রথার সপক্ষে ছিলেন বলিয়া সত্যের অপলাপ করিয়া থাকেন তাঁহারা জানিয়া বুঝিয়া ঐরূপ প্রচার করেন বলিয়াই বহুলোকে বলিয়া থাকেন। ভারতীয় জনমত সমর্থিত না হইলে লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিং-এর সতীদাহ-নিবারক আইন কখনই প্রণীত হইত না; এবং সেই জনমত গঠন কার্য্যে রাজা রামমোহনের অক্লান্ত চেষ্টার কথা ভারতে সর্ব্বজন-বিদিত।

নারী কল্যাণ ও প্রগতির জন্য রাজা রামমোহন রায়ের আগ্রহ ও চেষ্টার কথা আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, তিনি নারীজাতির বিরুদ্ধে যাহারা অপপ্রচার করিত তাহাদিগকে তর্কে কোণঠাসা করিয়া সর্ব্বদাই মুখ বন্ধ করিয়া দিবার ব্যবস্থা করিতেন। নারীদিগের বুদ্ধি কম, তাঁহারা ভীরু, তাঁহারা নির্ভরযোগ্য নহেন, তাঁহারা প্রতারণা করিয়া অপরকে বিপদে ফেলেন, ইত্যাদি নানা মিথ্যা অপবাদ নারীউৎপীড়কগণ তৎকালে রাষ্ট্র করিতেন। রাজা রামমোহন বলিতেন, শিক্ষা কখনও না দিয়া 'বুদ্ধি নাই' বলা শুধু অন্যায় নহে, তাহা মিথ্যাবাদও। শিক্ষা দিলে দেখা যাইবে, নারীগণ পুরুষ অপেক্ষা কোন অংশে অল্পবুদ্ধি নহেন। আরও দেখা যাইবে যে, পুরুষ প্রতারকগণ সংখ্যায় নারী প্রতারকদিগের দশগুণ। মৃত্যুর নাম শুনিলে যে ক্ষেত্রে পুরুষদিগের হৃদ্‌কম্প হয় সেই ক্ষেত্রে নারীদিগের নিন্দাবাদীগণ বলিয়া থাকেন যে, নারীরা স্বেচ্ছায় ও অবলীলা ক্রমে মৃত স্বামীর চিতায় আরোহণ করিয়া মৃত্যু বরণ করেন। তাহাদিগের এই কথার সহিত তাহাদিগের 'নারীরা ভীরু' বলার কোনও মিল দেখা যায় না। নারীরা নির্ভরযোগ্যা নহেন যাহারা বলেন তাঁহারাই নারীদিগের সম্পত্তি হস্তান্তরে সর্ব্বাপেক্ষা তৎপরতা দেখাইয়া থাকেন। ইহাতে কি প্রমাণ হয় যে, নারীগণের নির্ভরশীলতার অভাব আছে?

রাজা রামমোহন রায় বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ প্রভৃতির কঠিন সমালোচক ছিলেন। অসবর্ণ বিবাহ, বিধবা-বিবাহ প্রচলন বিষয়ে তাঁহার সমর্থন ছিল। তিনি যদি ইংলণ্ড হইতে ফিরিয়া আসিতেন তাহা হইলে তিনি উপরোক্ত সকল বিষয়েই কার্য্যকর ভাবে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেন। তাঁহার অকাল মৃত্যুতে ঐ সকল কার্য্য হইতে পরে বহু বৎসর লাগিয়াছিল।

রাজা রামমোহন রায় ভারতের শিক্ষাপদ্ধতি পাশ্চাত্য রীতি অনুগতভাবে পরিবর্ত্তিত করিয়া বৈজ্ঞানিক শিক্ষার প্রচলন ব্যবস্থা চাহিয়াছিলেন এবং ইহার জন্য ইংরেজী ভাষা শিক্ষার জন্যও তাঁহার বিশেষ উৎসাহ ছিল। হিন্দু কলেজ স্থাপনের সময় তাঁহার বিরুদ্ধ পক্ষের লোকেরা ইংরেজী শিক্ষার সহায়তা করিতে প্রস্তুত ছিলেন; কিন্তু তাঁহারা রামমোহন রায়ের ঐ কলেজ পরিচালনা কার্যে সংযোগে আপত্তি জানাইলে রামমোহন নিজ হইতেই হিন্দু কলেজের সংশ্রব ত্যাগ করেন। রামমোহন রায় নিজে ৩০ বৎসরের অধিক বয়সে ইংরেজী শিক্ষা আরম্ভ করিয়া অল্পদিনের মধ্যেই ঐ ভাষায় বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করেন। পরে যখন তিনি ইংলণ্ডে গমন করেন তখন কোন একজন বিশেষজ্ঞ তাঁহার ইংরেজী লেখা জন স্টুয়ার্ট মিল-এর

লেখার সহিত তুলনা করিয়া তাঁহাকেই উচ্চতর স্থান দান করিয়াছিলেন।

রাজা রামমোহন রায়ের অন্তরে জাতীয় উন্নতিকর সকল বিষয় সম্বন্ধেই অনুসন্ধিৎসা চির জাগ্রত ছিল। ভারতীয় কৃষকদিগের রায়তী স্বত্ব ও খাজনা লইয়া তিনি যে সকল উন্নততর ব্যবস্থার আলোচনা উঠাইয়াছিলেন তাহাতে কৃষকদিগের অধিকার যথাযথ ও ন্যায়সঙ্গত ভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হইত। জমিদারের রাজস্ব হ্রাস করিয়া প্রজার খাজনা বৃদ্ধি তৎকালে অনেক ক্ষেত্রেই হইত। রাজা রামমোহন প্রজার খাজনা হ্রাস ও স্বত্ব চিরস্থায়ী করিবার জন্য বিশেষভাবে আগ্রহান্বিত ছিলেন। প্রজা সুখী হইলে রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত ও নিরাপদ হয় এই কথাই রাজা রামমোহনের বক্তব্য ছিল। সংবাদ-পত্রের মত-প্রকাশের স্বাধীনতা লইয়াও রাজা রামমোহন আন্দোলন করিয়াছিলেন। সরকারী পরীক্ষক দিয়া লিখিত বিষয় দেখাইয়া লইয়া তৎপরে ছাপাইবার নিয়ম উঠাইয়া দিবার জন্য রামমোহন ও তাঁহার সহকর্মী-গণ বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। সকল দেশের সকল জাতির রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা প্রাপ্তি বিষয়ে রাজা রামমোহন মহা উৎসাহী ছিলেন। দক্ষিণ আমেরিকার স্পেনের উপনিবেশগুলির মুক্তি কিংবা ফরাসীদিগের স্বাধীনতা সংগ্রাম তাঁহাকে এমন করিয়াই উত্তেজিত করিত যে তিনি অনেক সময় আত্মহারা হইয়া পড়িতেন। দক্ষিণ আমেরিকার উপনিবেশগুলি যখন স্বাধীন হইল তখন রাজা রামমোহন কলিকাতায় একটা ভোজের আয়োজন করেন। ফরাসী জাহাজে স্বাধীনতার ত্রিবর্ণ পতাকা দেখিবার জন্য উত্তেজিত হইয়া যাইতে গিয়া তিনি পড়িয়া যান এবং ফলে তাঁহার পায়ে জখম লাগিয়া যায়। ইংলণ্ডে রিফরম বিল লইয়াও তিনি অনেকের সহিত তর্কাতর্কি করিতেন এবং ঐ বিল পাস হইলে পরে তবেই তিনি শান্ত ও সুস্থ অবস্থায় ফিরিয়া যাইতে পারেন।

নিজ দেশের ধর্ম্ম, দার্শনিক মতবাদ, কৃষ্টি ও আচার ব্যবহার লইয়া রাজা রামমোহন রায়ের পাঠ, আলোচনা, বিচার ও প্রচারের শেষ ছিল না। তিনি বহু শাস্ত্র গ্রন্থের ইংরেজী ও বাংলা অনুবাদ করিয়াছিলেন এবং এই কার্য্যসূত্রেই তিনি বাংলা গদ্য সাহিত্যের গঠন ও রচনা ক্ষেত্রে স্রষ্টা ও পথপ্রদর্শক বলিয়া খ্যাত হইয়াছিলেন। তাঁহাকে যে বাংলা গদ্যের উদ্ভাবক বলা হয় ইহার অর্থ এই নহে যে তাঁহার পূর্ব্বে অপর কোন ব্যক্তি কখনও বাংলা ভাষায় চিঠিপত্র, দলিল, বিবরণ, প্রচারার্থে তর্জ্জমাকৃত পুস্তিকা লেখন করে নাই। অর্থ ইহাই যে, তিনিই প্রথমে বাংলা গদ্যকে সেই রূপ দান করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন যাহাকে সাহিত্যে গ্রহণীয় বলা যাইতে পারে। রামমোহনের লিখিত বাংলা গদ্য অতি প্রাচীন রচনা-ভঙ্গীর কারাগার হইতে বাহির হইয়া আসিয়া মুক্তির বিস্তৃত অঙ্গনে নিজ স্বরূপ সৃজনে সক্ষম হয় এবং সেই কারণে তাহা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গদ্য রচনার সহিত জাতিগত সম্বন্ধের বাঁধনে বাঁধা। বাইবেলের বাংলা অনুবাদের কষ্টকল্পিত রচনা-ভঙ্গীকে সাহিত্যের গোষ্ঠীতে পারিবারিক সম্বন্ধযুক্ত করিয়া উপস্থিত করা যায় না। রামমোহন উপনিষদ বাংলায় লিখিলে তাহাতে থাকিত আন্তরিক উপলব্ধি ও অনুভূতির অভি-ব্যক্তি। পণ্ডিত মহাশয়গণের সঠিক নথি লিখিত সুসমা-চারের সাহিত্য সৃষ্টির সহিত যথাযথ সম্বন্ধ রক্ষা তৎকালে সম্ভব হয় নাই। রাজা রামমোহন রায় বহুভাষা বিদ্ ছিলেন। তিনি আরবী, ফারসী, ইংরেজী, ও বাংলা উত্তমরূপে লিখিতে পারিতেন এবং হিব্রু, ল্যাটিন, গ্রীক, সংস্কৃত সঠিক ভাবে শিক্ষা করিয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত তিনি উর্দ্দু, হিন্দী, পালি, ফরাসী, ইতালীয় ও তিব্বতী ভাষাও জানিতেন। এই অগাধ ভাষা জ্ঞানের ভাণ্ডারে সঞ্চিত ভাব-প্রকাশ-শক্তি ব্যবহারে তিনি বাংলা গদ্য রচনা পদ্ধতির আকৃতি নির্ণয় করিতে বিশেষ ভাবে সক্ষম হইয়াছিলেন। অন্য কেহ তাহা করিতে পারে নাই।

ইহা ব্যতীত লেখার পরিমাণের কথাও বিবেচ্য। রাজা রামমোহন রায় হিন্দু শাস্ত্র ও সামাজিক রীতিনীতি লইয়া বহু সংখ্যক পুস্তক পুস্তিকা বাংলায় রচনা

করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া তিনি সংবাদ পত্রেও বাংলায় লিখিতেন। অর্থাৎ তাঁহার বাংলা লেখা সে যুগে সকল শিক্ষিত বাঙ্গালীর নিকট সুপরিচিত হইয়াছিল। এই কারণে তাঁহাকে আধুনিক বাংলা গদ্য সাহিত্য রচনার রীতি ও পদ্ধতির জনক বলা হয়।

রাজা রামমোহন রায়ের সর্বমুখী প্রতিভা মানবীয়তার নানান আদর্শ গঠনেই নিযুক্ত হইয়াছিল ও তিনিই ভারতকে সভ্যতার নূতন আলোক স্নাত করিয়া নব যুগের উচ্চ শিখরের সোপান পথে অগ্রগমনে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। যাঁহারা এখনও নিজেদের প্রাচীন পন্থার অনুসরণকারী বলিয়া মনে করেন ও সেই কারণে রামমোহন-বিরুদ্ধতাকে কর্ত্তব্য কার্য্যের অন্তর্গত বিচার করিয়া রাজর্ষি রামমোহনের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন, তাঁহারাও জীবনের সকল ক্ষেত্রেই; অর্থাৎ স্ত্রীশিক্ষা ও স্বাধীনতায়, জাতিভেদগত কুসংস্কার পরিহার কার্য্যে, বৈজ্ঞানিক শিক্ষা পদ্ধতি গ্রহণে, রাষ্ট্রীয় অধিকার প্রাপ্তিতে, যুক্তিবাদ অনুগত জীবন-যাত্রা গঠনে রামমোহনেরই প্রদর্শিত পথে চলিতে দ্বিধা করেন না। তিনি যাহা দিয়া গিয়াছেন তাহা গ্রহণ ও ব্যবহারে যাঁহাদের আগ্রহের অভাব নাই; শুধু রামমোহনের নিকট কিছু পাইয়াছেন এইকথা স্বীকার করিতেই ঘোরতর আপত্তি ও নানান মিথ্যা অজুহাত দেখাইবার চেষ্টা, সেই সকল ব্যক্তির সম্বন্ধে এইটুকুই বলা যায় যে রামমোহনের যাহা জগতের নিকট প্রাপ্য তাহা তিনি দুই চারিজন বিরুদ্ধবাদীর অপপ্রচারের জন্য পাইবেন না মনে করিবার কোনও কারণ নাই। রামমোহনের জীবদ্দশায় আরও শতগুণ বিরুদ্ধ সমালোচনা তাঁহার প্রতি প্রযুক্ত হইয়াছিল ও বিরুদ্ধবাদীদিগের মধ্যে বহু ক্ষমতাশালী ব্যক্তিও ছিলেন। কিন্তু তাহা হইলেও রাজা রামমোহনের খ্যাতি ও সভ্যতার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা কিছু মাত্র ম্লান ও ভঙ্গুর হইয়া যায় নাই।

রাজস্ব বৃদ্ধির অযৌক্তিক পদ্ধতি

রাজস্ব বলিয়া দেশবাসীগণ শাসকদিগকে যাহা দিয়া থাকেন তাহা হইল দেশবাসীর ব্যবসা-বাণিজ্য ও কর্ম্মলব্ধ উপার্জ্জনেরই একটা অংশ। বহু ব্যক্তি নিজ নিজ সঞ্চিত অর্থ যৌথ কারবারের অংশীদারীতে লাগাইয়াও নিজেদের উপার্জ্জন বৃদ্ধি করেন ও সেই বর্দ্ধিত উপার্জ্জন হইতেও রাজস্ব আদায় করিয়া লওয়া হয়। বর্ত্তমান কালে শাসকদিগের চেষ্টা হইতেছে, সাক্ষাৎ ভাবে জাতীয় ব্যবসা-বাণিজ্য ও কারখানা কারবার আরম্ভ করিয়া জাতীয় ভাবে লাভ করিয়া সরকারী উপার্জ্জন বর্দ্ধন করার ব্যবস্থা করিবার। ইহা যে করা হইতেছে তাহার জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন দেশবাসীর নিকট হইতেই আসিতেছে। কিছু মূলধন ঋণ করিয়া আহরণ করা হইতেছে, অর্থাৎ তাহা জাতীয় তথা দেশবাসীরই ঋণ এবং কিছুকিছু রাজস্ব বৃদ্ধি করিয়া কারবার স্থাপনার্থে ব্যয় করা হইতেছে,তাহাও দেশবাসীরই উপার্জ্জনের অংশ। সুতরাং এই যে জাতীয় মূলধন সৃষ্টি ব্যবস্থা চলিতেছে ইহার ব্যয়ভার যখন দেশবাসীই বহন করিতেছেন তখন ইহার ফলভোগও দেশবাসীই করিতে আশা করিতে পারেন। অর্থাৎ ঋণ ভারও রাজস্ব বৃদ্ধির পরিমাণ বিচারে দেশবাসী আশা করেন যে ভবিষ্যতে রাজস্ব-হ্রাস করা হইবে। শাসক গোষ্ঠী যতই জাতীয় মূলধন বাড়াইয়া সাক্ষাৎ জাতীয় উপার্জ্জন বৃদ্ধির ব্যবস্থা করিবেন ততই তাঁহাদিগকে ভবিষ্যতে রাজস্ব হ্রাস করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে। বর্ত্তমানে যদি ২০০০০ কোটি টাকা জাতীয় মূলধন গঠিত হইয়া থাকে তাহা হইলে দেশবাসী আশা করিতে পারেন যে আগামী বৎসর হইতে সকল রাজস্ব শতকরা এক দশমাংশ কমান হইবে। পরে রাজস্ব আদায় ক্ষেত্রে ওয়ানচু কমিটির দ্বারা নির্দ্দিষ্ট ৬৫% উচ্চতম সীমা ইত্যাদি মানিয়া সকল আদায় হ্রাস করিতে হইবে। কিন্তু শাসকদিগের মানসিক গতিবিধি লক্ষ্য করিয়া মনে হয় যে,তাঁহারা দেশবাসীর উপার্জ্জন ক্ষমতাও সীমাবদ্ধ করিবেন, এবং উপার্জ্জনের অধিক অংশ রাজস্ব হিসাবে আদায় করিয়া লইবেন। নিজেদের যে তহবিল সৃজন হইতেছে তাহাও লাভ-বর্জ্জিত ভাবে ব্যবহৃত হইবে এবং আমলা ব্যতীত কাহারও কোনও সুবিধা হইবে না। এই নীতিকে ঠিক যুক্তিজাত অর্থনীতি বলা চলে না।

আমলা অথবা ভোট-সৃষ্ট মন্ত্রীদিগের যথেচ্ছাচারকে মানিয়া লওয়া সাধারণতন্ত্র নহে। ইহা কম্যুনিজম কি না বলিতে পারি না। তবে ইহা কম্যুনিজম-ফ্যাশিজম প্রভৃতির নিকট আত্মীয় বলিয়াই অনেকে মনে করেন। বলা যাইতে পারে যে আমাদের জাতীয় অর্থনীতি এখনও গড়িয়া উঠে নাই। গড়িয়া উঠিলে পরে রাজস্ব হ্রাস হইবে। যেখানে বলা হইতেছে যে বাৎসরিক শতকরা জাতীয় আয় শতকরা ৫ ভাগ বাড়িয়া চলিতেছে; সেখানে ঐ কথার কি মূল্য থাকিতে পারে? রাজস্ব হ্রাস বাৎসরিক শতকরা ২॥. ভাগ অন্ততঃ করা চলিতে পারে, ধরা যায়।

বঙ্গভূমিতে পেট্রোল ও দাহ্য বাষ্প পাইবার সম্ভাবনা

ভারত সরকার যে সকল রুশ বিশেষজ্ঞদিগের দ্বারা ভারতের সর্ব্বত্র প্রাকৃতিক দাহ্য তৈল ও বাষ্পের অনুসন্ধানকার্য্য করাইয়াছিলেন তাঁহাদের প্রায় সকলেরই মতে বাংলার সুন্দরবন অঞ্চলে, বজবজ, বারাসত ও চৈতন্যপুরে প্রচুর প্রাকৃতিক দাহ্য তৈল ও বাষ্প ভূগর্ভে স্বাভাবিক ভাবে সঞ্চিত আছে। ক্যানিংএ যে ধরাপৃষ্ঠ বিদীর্ণ করিয়া অনুসন্ধান কার্য্য করা হইয়াছিল তাহা করিবার পূর্ব্বে বৈজ্ঞানিকগণ বলিয়াছিলেন ৫০০০ হাজার মিটার গভীর ছিদ্র করিলে তৈল পাওয়া যাইবে; কিন্তু ৪০০০ মিটার অবধি রন্ধ্র পথ কাটিবার পরে যে সময় পেট্রোল থাকিবার লক্ষণ দেখা যাইতে আরম্ভ করে তখন হঠাৎ ঐ কার্য্য স্থগিত করিয়া দেওয়া হয়। অয়েল এণ্ড ন্যাচারাল গ্যাস কমিশন নানা অজুহাত দিয়া বঙ্গভূমিতে নিজেদের অনুসন্ধান কার্য্য বন্ধ করিয়া দেন। এই কার্য্যের জন্য তাঁহারা ৪০০ শত কোটি টাকা কয়েক বৎসরে ব্যয় করিবেন স্থির করিয়াছেন; কিন্তু মালবীয় কমিটি পশ্চিম বঙ্গে ভারতের শ্রেষ্ঠ পেট্রোল ও গ্যাস এলাকাগুলি আছে বলা সত্ত্বেও এই অঞ্চলে অনুসন্ধান কার্য্য কিছুই করা হইতেছে না। গুজরাটে ৭১টি জায়গায় খনন কার্য্য চালিত হইবে এবং আসামে ১৮টি জায়গায়। যে সকল কারণ দেখাইয়া পশ্চিমবঙ্গে ঐ কার্য্য বন্ধ করা হইয়াছে সেই সকল কারণ গুজরাটে ও আসামে পূর্ণরূপে বর্ত্তমান থাকিলেও ঐ সকল প্রদেশে দাহ্য তৈল ও বাষ্প আছে কি না তাহার অনুসন্ধান পুরাপুরি চালান হইতেছে। পশ্চিমবঙ্গে ঐ প্রাকৃতিক সম্পদ বহুল পরিমাণে থাকিবার সম্ভাবনা সকল বিশেষজ্ঞদিগের দ্বারা স্বীকৃত হইয়া থাকিলেও এই প্রদেশে অনুসন্ধান করা হইতেছে না। ইহাতে যদি এই প্রদেশের জনসাধারণের মনে এই ধারণা হয় যে, ভারতের অপরাপর প্রদেশের ক্ষমতাশালী ব্যক্তিগণ পশ্চিবঙ্গের যাহাতে কোনও উন্নতি না হয় সেই চেষ্টাতেই সদা নিরত, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে কোনও দোষ দেওয়া চলিতে পারিবে না।

জাতীয় বয়ন প্রতিষ্ঠান

ন্যাশনাল টেক্সটাইল কর্পোরেশন অথবা জাতীয় বয়ন প্রতিষ্ঠান এখন অবধি ৫০টি ন্যায্য মূল্যের দোকান গ্রামাঞ্চলে খুলিয়াছেন ও আরও ১০০শতটি দোকান ছয় মাসের ভিতরে খুলিবেন মনস্থ করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত লরীতে বসান ভ্রাম্যমাণ দোকানও খোলা হইতেছে যাহাতে দোকান ক্রেতার গৃহের দরজায় গিয়া পৌছাইবে। এই সকল চলন্ত দোকান গরীবদিগের নিবাসক্ষেত্রে যাইবে এবং শ্রমিকদিগের বাসস্থানে ও গ্রামে হাটেও যাইতে থাকিবে। এই জাতীয় বয়ন প্রতিষ্ঠান পরিচালিত মিলগুলিতে বর্ত্তমানে বাৎসরিক প্রায় দশ কোটি বর্গ মিটার নির্দ্দিষ্ট মূল্যের বস্ত্র উৎপন্ন করা হইতেছে। ইহা ৫৪টি অচল মিল পরিচালনার জন্য হাতে লইয়াছে এবং সেইগুলির মধ্যে ৪৪টিতে উৎপাদন কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে ও তাহার মধ্যে ২২টি লাভজনক ভাবে চলিতেছে। এই সকল কারখানা হাতে লইয়া ও চালিত করিয়া ১ লক্ষ ২০ হাজার শ্রমিককে উপার্জ্জনক্ষম করা হইয়াছে অর্থাৎ ইহার ফলে প্রায় ছয় লক্ষ ব্যক্তির অন্ন সংস্থান ব্যবস্থা হইয়াছে। প্রতিষ্ঠানটি এখন যত বস্ত্র রপ্তানী করিবে তাহা দ্বারা ৮ কোটি টাকার সমমূল্য বিদেশী অর্থ ভারতের তহবিলে আসিবে। অর্থাৎ এইভাবে অনেকগুলি বস্ত্রবয়ন কারখানা

জাতীয় পরিচালনার অন্তর্গত করাতে প্রথমতঃ বহু লোকের অন্নসংস্থান হইবার সুবিধা হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ অতি প্রয়োজনীয় বস্ত্রাদি উৎপন্ন হইবার ফলে বস্ত্রের অভাবও কিছু কিছু লাঘব হইয়াছে এবং বিক্রয় ব্যবস্থা সরকারী ভাবে করা হওয়াতে মূল্য বাড়াইয়া ক্রেতাদিগকে প্রবঞ্চনা করাও পূর্ব্বের ন্যায় আর সম্ভব হইবে না। ন্যাশনাল টেক্সটাইল কর্পোরেশনের উপরোক্ত বর্ণনা আমরা একটি সরকারী বিজ্ঞপ্তি হইতে পাইয়াছি ও ঐ বর্ণনার একটি উল্টা দিক আছে কি না তাহা আমরা জানি না। সরকারী ভাবে দেশবাসীর বহু অর্থ ব্যয় করিয়া ও দেশবাসীর স্কন্ধে বহু ঋণভার চাপাইয়া যে সকল কার্য্যের সূচনা করা হইয়াছে তাহার অধিকাংশই লাভের দিক হইতে অকৃতকার্য্য বলিয়া সকলে বলিয়া থাকেন। জাতীয় বয়ন প্রতিষ্ঠান যদি সফলতা অর্জ্জন করিতে পারিয়া থাকে তাহা খুবই আনন্দের বিষয় বলিয়া গ্রাহ্য হইবে বলা যাইতে পারে।

এজরা পাউণ্ড

যে সকল কবি আধুনিক কবিতাকে নূতন রূপ ও পরিচিতি দান করিতে বিশেষ ক্ষমতা প্রদর্শন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন; এজরা পাউণ্ড তাঁহাদিগের মধ্যে উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তিনি ১৮৮৫ খৃঃ অব্দে আমেরিকার ইডাহো প্রদেশে জন্ম গ্রহণ করেন ও প্রথম জীবনে ঐ দেশেই শিক্ষা লাভ করেন। ১৯০৭ খৃঃ অব্দে তিনি ইয়োরোপে গমন করেন ও স্পেন ইটালি প্রভৃতি দেশে জ্ঞানানুশীলনে নিযুক্ত থাকেন। ১৯০৮ খৃঃ অব্দে তিনি ভেনিস হইতে তাঁহার প্রথম কবিতা পুস্তক প্রকাশ করেন। অতঃপর তিনি লণ্ডন গমন করেন ও সেইখানে কবিতা প্রবন্ধ ইত্যাদি লিখিয়া খ্যাতিলাভ করেন। তাঁহার দুইটি কবিতা পুস্তকও এই সময় প্রকাশিত হয় ও সমালোচকগণ তাঁহার প্রাচীন সাহিত্যের সহিত পরিচয় ও স্থানীয় কাব্য বিষয়ে জ্ঞান দেখিয়া আকৃষ্ট হ'ন. তিনি আধুনিক কবিতা লেখকদিগের একটি বিশেষ গণ্ডি গঠন করিতে সক্ষম হ'ন এবং নানা উপায়ে আধুনিকতার প্রচার সাধন চেষ্টা করেন। একটি পত্রিকাও ইঁহারা প্রকাশ করেন। এজরা পাউণ্ড ইহার পরে ইংলণ্ড ত্যাগ করিয়া প্যারিসে চলিয়া যান ও সেখান হইতে নিজের রচনা ও প্রকাশ কার্য্য সম্পাদন করিতে থাকেন। তাঁহাকে সাহিত্য জগতের দু-একটি পুরস্কারও এই সময় দিবার কথা উঠে কিন্তু কোন কোন পাঠক ও লেখক গোষ্ঠী তাহাতে ঘোরতর আপত্তি করেন। কারণ, তাঁহার লোকমত-বিরুদ্ধতা ও অন্যান্য জনপ্রীতি-প্রতিকূল প্রচার চেষ্টা। তিনি বহু কবির কাব্য ও নাট্যরীতিপদ্ধতির প্রশংসা করিয়া নিজের প্রচার চেষ্টা চালাইতেন এবং যে সকল কবির কাব্য সে সময়ে অজ্ঞাত অথবা অল্পজ্ঞাত ছিল তাঁহাদের পরিচয় দিবার চেষ্টা করিতেন। জাপানী নো থিয়েটার, কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাব্য প্রভৃতি নানান কৃষ্টি কলা বিষয়ক কথা তিনি সেযুগের পাঠক সমাজকে জানাইয়াছিলেন। কবি ইয়েটস ও টি এস এলিয়টের তিনি বিশেষ বন্ধু ছিলেন।

তাঁহার যে সকল বিষয়ে গভীর বিতৃষ্ণা ছিল বলিয়া সে সময়ে লক্ষিত হয় তাহার মধ্যে আমেরিকার ধনিক সম্প্রদায়ের মানবীয়তা-বিনাশ-কারক কার্য্যকলাপ, যাহারা গরীবকে ঋণদান করিয়া তাহাদের শোষনে নিবিষ্ট থাকে সেই সকল ব্যক্তির নিন্দাবাদ, প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। তিনি যুদ্ধের সময় আমেরিকানদিগের বিরুদ্ধবাদ করায় প্রথমে তাঁহাকে আইনতঃ দণ্ডিত করিবার চেষ্টা হয় ও পরে তাঁহাকে উন্মাদ বলিয়া বদ্ধ করিয়া রাখা হয়। ১৯৫৮ খৃঃ অব্দে তাঁহাকে ছাড়িয়া দিবার পরে তিনি পুনর্ব্বার ইটালিতে ফিরিয়া যান। তিনি সম্প্রতি ঐ দেশেই ভেনিস সহরে দেহত্যাগ করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৮৭ বৎসর।

লোক দেখান কার্য্যের মূল্য বিচার

কোন কোন সর্পের বিষ থাকে না কিন্তু অপর জীবদিগকে ভীতি প্রদর্শনের জন্য বিরাট ফণা থাকে। ইহা হইতেই একটা বাংলা প্রবাদবাক্যের সৃষ্টি হইয়াছে—বিষের সঙ্গে সম্পর্ক নেই, কুলোপানা চক্কর—অর্থাৎ কোনও কর্মক্ষমতা নাই কিন্তু লোক দেখাইয়া নাম

কিনিবার ক্ষমতার অভাব নাই। আমাদের দেশে এই জাতীয় প্রদর্শন ব্যবস্থার বাহুল্য ও বাহার দিয়া আসল কার্য্যের স্বল্পতা বা সম্পূর্ণ অভাব ঢাকা দিবার চেষ্টা ক্রমাগতই লক্ষিত হইয়া থাকে। ফলে যে অর্থ ব্যয় করিলে আসল কাজ বেশ কিছুটা হইয়া যাইতে পারে, সেই অর্থ লোক দেখাইয়া নাম কিনিবার কার্য্যেই খরচ হইয়া গিয়া তহবিল শূন্য হইয়া যায়। বিজ্ঞাপন দেওয়ার আবশ্যকতা তখনই জাগ্রত হওয়া উচিত যখন বিজ্ঞাপনের বস্তু-সামগ্রী প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া ক্রেতাজন সমক্ষে উপস্থিত করিলে বিক্রয়ের সম্ভাবনা থাকে। বস্তু-সামগ্রী না থাকিলে শুধু বিজ্ঞাপন দিয়া কোনও লাভ হইতে পারে না। এমন কি বিজ্ঞাপন দিবার বিষয়ে যাহারা বিশেষজ্ঞ তাহাদের মত বস্তুসামগ্রী যে সকল অঞ্চলে সরবরাহ করা হয় শুধু সেই সকল অঞ্চলেই বিজ্ঞাপন দেওয়া উচিত নতুবা বিজ্ঞাপন দেখিয়া ক্রেতাগণ যদি দোকানে গিয়া মাল না পায় তাহা হইলে তাহার ফল বিশেষ ক্ষতিকর হয়। ঠিক ঐ রীতি অনুসরণ করিয়াই দ্রব্যবিক্রয়ক্ষেত্র-বহির্ভূত অপরাপর ক্ষেত্রেও যাহা নাই তাহার প্রচার করিবার চেষ্টা কখনও কাহারও পক্ষে লাভজনক হইতে পারে না। পরন্তু সত্য অবস্থানুরূপ প্রচার না করিয়া যদি তদপেক্ষা অধিক সুখ-সুবিধা কর্মব্যবস্থা বা দ্রব্যসামগ্রী আছে বলিয়া প্রচার করা হয়, এমন কি যাহা নাই তাহা আছে এইরূপ ইঙ্গিতও করা হয়, তাহার ফল কদাপি শুভ হয় না। সুতরাং বৃহৎ বৃহৎ আড়ম্বরবহুল প্রদর্শনীর আয়োজন করিয়া এই দেশের উৎপাদনী শক্তির অভাব সম্বন্ধে লোকমনে ভুল ধারণা সৃষ্টি হইলে তাহাতে কর্ম্মের ক্ষেত্রে কোনও লাভ হইতে পারে না। এই সকল প্রচারকার্য্যে যে অর্থ ব্যয় করা হয় সেই অর্থ যদি সত্যকার উৎপাদন কার্য্যে লাগান হইত তাহা হইলে কয়েক হাজার ব্যক্তির শ্রমশক্তির পূর্ণ ব্যবহার সম্ভব হইত এবং বৎসরে বহুলক্ষ টাকার বস্তু-সামগ্রীও উৎপন্ন হইবার ব্যবস্থা হইতে পারিত। ইংরেজীতে একটা কথা আছে যাহার অর্থ লোক দেখাইয়া কর্মশক্তির অপচয় করা। এই জনতা প্রীতিকর প্রচেষ্টা অনেক সময়েই কোন যথার্থ ফল ফলাইতে পারে না ও সেইজন্য ঐ জাতীয় কার্য্যের কোন প্রকৃত মূল্য থাকে না। আমাদের দেশে হৈ চৈ ও হাল্লা হাঙ্গামা করিয়া জনসাধারণের নিকট আত্ম জাহির প্রচেষ্টা বহু পুরাতন কাল হইতে প্রচলিত আছে। ভিতরে ভিতরে অধর্ম্মে ডুবিয়া থাকিয়া প্রকাশ্যে সশব্দে শাস্ত্রপাঠ কীর্ত্তনাদি করাইয়া লোকচক্ষে শ্রেয় প্রমাণিত হইবার চেষ্টা পুরাতন লোক ঠকাইবার পন্থা। ধর্ম্মের অভিনয়, দেশভক্তির অভিনয়, পাণ্ডিত্যের অভিনয় ইত্যাদি সর্বজনপরিচিত প্রবঞ্চনা পদ্ধতি। পাশ্চাত্ত্য দেশগুলির চেষ্টায় স্থাপিত বিশ্ববাসীর উন্নতিকর ও লাভজনক বিভিন্ন বহু প্রতিষ্ঠানই সকল ক্ষেত্রে যাহা বলা হয় সেইরূপ কার্য্য করিয়া থাকে বলিয়া লোকে বিশ্বাস করে না। লীগ অফ নেশনস, ইউনাইটেড নেশনস, সিকিউরিটি কাউনসিল প্রভৃতি সকল প্রতিষ্ঠানই মহা-শক্তিশালী জাতিগুলির সুবিধাবাদ আশ্রয়েই গঠিত ও চালিত হইয়াছে। আমাদের পাশ্চাত্ত্যের নিকট অনেক শিখিবার আছে। কিন্তু যাহার মূল্য আছে তাহা না শিখিয়া আমরা যদি পাশ্চাত্ত্যের অনুকরণে লোকচক্ষে নিজেদের বড় প্রমাণ করিতেই ব্যস্ত থাকি—বড় না হইয়াই অথবা বড় হইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা না করিয়াই—তাহা হইলে সেইরূপ আচরণ আমাদের পক্ষে কখনও মঙ্গলজনক হইবে না। এক মন প্রচার ও বিজ্ঞাপন অপেক্ষা একসের কার্য্য অধিক মূল্যবান্। অর্থাৎ এক সের কার্য্য করাই এক মন প্রচার করা অপেক্ষা জাতির পক্ষে অধিক লাভের বিষয়। সুতরাং জাতির কর্ম্মশক্তি পূর্ণতমভাবে শুধু কার্য্যেই নিয়োগ করা আবশ্যক। ঘটা করিয়া অর্থ নষ্ট করিয়া পৃথিবীর নিকট নিজেদের নাম জাহির করিবার কথা তখনই উঠিবে যখন কার্য্যের ফসল যথেষ্ট পরিমাণে ফলিতে দেখা যাইবে।

যুগ-প্রবর্ত্তক রাজা রামমোহন রায়

উনবিংশ শতাব্দীর আরম্ভকালে যখন পৃথিবীর সর্বত্র আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম ও ফরাসী বিপ্লবের ফলে প্রাচীন অন্ধ বিশ্বাসের প্রাকার ভাঙিয়া পড়িতেছিল,

ভারতে তখন তৎকালীন রক্ষণশীল সনাতনীগণ বাল্য বিবাহ, শিশুহত্যা, নারীনির্য্যাতন, সতীদাহ, স্ত্রীশিক্ষা ও বিধবা-বিবাহ নিবারণ, অস্পৃশ্যতা সংরক্ষণ, জাতিভেদ প্রথার নির্মম অভিব্যক্তি প্রভৃতি সামাজিক কু-প্রথাসকল চিরস্থায়ী করিয়া বাঁচাইয়া রাখিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছিলেন। যে সকল সমাজ-সংস্কারকগণ সেইসময় রাজা রামমোহন রায়ের নেতৃত্বে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার বিস্তার, সামাজিক রীতিনীতির শোধন ও স্বাস্থ্যকরভাবে পুনর্গঠন, নারীজাতির উন্নতিসাধন, হিন্দুধর্মের প্রচলিত পন্থা পরিবর্তন করিয়া তাহাকে প্রাচীন শাস্ত্রানুগত রূপদান ব্যবস্থা ইত্যাদি সাধন চেষ্টা করিতেছিলেন, তাঁহারা তাঁহাদের নূতন পথে চলিবার চেষ্টার জন্য সনাতনী রক্ষণশীলদিগের নিকট সমাজশত্রু বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন। যে কেহ প্রচলিত কোনও প্রথার সমালোচনা করিত তাহাকেই তীব্র নিন্দা ও আক্রমণ করিয়া একঘরে করিয়া রাখিবার চেষ্টা হইত। সতীদাহ প্রথার উচ্ছেদ লইয়া লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিং ১৮২৯ খৃঃ অব্দে যে আইন প্রণয়ন করিলেন তাহার দশ বৎসর পূর্ব হইতেই রাজা রামমোহন রায় ঐ জঘন্য নারী হত্যা-কার্য্যের ঘোরতর সমালোচনা করিয়া আসিতেছিলেন। সতীদাহ যে শাস্ত্রানুমোদিত নহে, বিধবা নারীদিগের ধর্মানুগতভাবে জীবন যাপন করাই যে বৈধব্যে শ্রেষ্ঠ পন্থা, সহমরণের প্রচলিত রীতি-পদ্ধতি যে একান্তভাবেই ন্যায় ও ধর্মবিরুদ্ধ এইসকল কথা রামমোহন রায় লিখিতভাবে বারবার প্রমাণ করিয়াছিলেন। লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিং তাঁহার সহিত এ-বিষয়ে সাক্ষাৎ পরামর্শও করিয়াছিলেন। তিনি বেণ্টিংকে এ-কথাও বলিয়াছিলেন যে সতীদাহের বহু উচ্চপদস্থ সমর্থক আছে ও তিনি ঐ প্রথার উচ্ছেদ চেষ্টা করিলে তাঁহাকে ঘোরতর বিরোধিতা অতিক্রম করিয়াই অগ্রসর হইতে হইবে। লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিং সকল কথা শুনিয়া বুঝিয়া তবেই সতীদাহ নিবারক আইন প্রণয়ন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার সৎসাহস এই কারণে সর্বজন-প্রশংসিত। কিন্তু তিনিই এই কার্য্যের অগ্রদূত এবং রাজা রামমোহন সতীদাহ প্রথার সমর্থক ছিলেন প্রভৃতি মিথ্যার প্রচার কেহ কেহ যে করেন তাহা উনবিংশ শতাব্দীর রক্ষণশীল গোষ্ঠীর উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত প্রেরণাজাত হইলেও বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে সেইরূপ প্রচারের কোনও মূল্য কেহ ধার্য্য করিতে পারে না। রামমোহন-নিন্দুকদিগের এই একই ধরণের আর একটা কথা হইল এই যে, রামমোহন ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তনের জন্য বিশেষ কিছু করেন নাই। সেই কার্য্যের খ্যাতির দাবি হইল বিদেশীদিগের। ইতিহাস বলে যে, রামমোহন লর্ড আমহার্স্টকে ইংরেজী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে যে পত্র লেখেন ও যে পত্র লেখার পরেও ইংরেজ সরকার সংস্কৃত শিক্ষার জন্যই টাকা দিবার পন্থাই ধরিয়া থাকেন, সেই চিঠির দ্বারাই প্রমাণ হয় যে রাজা রামমোহন রায় কিভাবে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য সচেষ্ট ছিলেন। তিনি অনেকগুলি ইংরেজী স্কুলের জন্য টাকা দিতেন, কোন কোনটির সকল ব্যয় তিনিই বহন করিতেন। ইহার মধ্যে মিশনারীদিগের দ্বারা চালিত স্কুলও ছিল। ভারত সরকার ইংরেজী শিক্ষাপদ্ধতি সমর্থন করিতে আরও প্রায় ১২ বৎসর পরে রাজী হইয়াছিলেন। এই সময় মেকলে ইংরেজী শিক্ষার সমর্থনে ইংরেজ সরকারকে পরামর্শ দেন। অর্থাৎ যেরূপ সতীদাহ প্রথা আইনতঃ নিবারণ করা হয় রামমোহনের আন্দোলনের আরম্ভের দশ বৎসর পরে, তেমনি ইংরেজী শিক্ষাও সরকারীভাবে গ্রাহ্য হইতে রামমোহনের প্রচারের পরে ১২ বৎসর লাগিয়াছিল রামমোহনই সকল উন্নত রীতি-পদ্ধতি অবলম্বন ও সমাজ সংস্কার কার্য্যের পথে অগ্রগামী ও পথপ্রদর্শক ছিলেন। তাঁহার আন্দোলন ও তর্ক-বিতর্কাদি প্রবলভাবে চালাইবার জন্য এবং হিন্দুশাস্ত্র গ্রন্থাদি সকলকে বুঝিতে সমর্থ করাইবার পন্থা হিসাবে তিনি বহু পুস্তিকা ও সংস্কৃত গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার বহু ভাষা ও ব্যাকরণ জ্ঞান বিশেষভাবে থাকাতে বাংলা গদ্য রচনার রীতি-পদ্ধতি গঠনে তিনি সহজেই সক্ষমতা দেখাইতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার সমালোচক-গণের মতে রামমোহনের পূর্বে কোন কোন ব্যক্তি গদ্য লিখিয়াছিলেন সুতরাং রামমোহনকে বাংলা গদ্য রচনাপদ্ধতির স্রষ্টা বলিলে ভুল করা হয়। কিন্তু তাঁহার পূর্বে যদি গদ্য রচনার অক্ষম প্রচেষ্টা অপরে করিয়া থাকে এবং তিনিই যদি সর্বপ্রথমে উৎকৃষ্ট ও সহজবোধ্য বাংলা গদ্য লিখিয়া থাকেন তাহা হইলে তাঁহাকেই বাংলা গদ্য রচনাক্ষেত্রে প্রথম সক্ষম লেখক বলা ন্যায়ানুগত হয়। বাইবেলের কষ্টরচিত বাংলা অনুবাদ হইয়া থাকিলেও সেই অনুবাদকে কেহ যথাযথ গদ্য রচনার উদাহরণ বলিয়া মানিয়া লয় নাই। ইহা ব্যতীত রাজা রামমোহন রায় বাংলা গদ্যে বহু পুস্তিকাও রচনা করিয়াছিলেন ও তাহাতে বাংলার গদ্য রচনাপদ্ধতির বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল।

রামমোহনের সতী ও ঐতিহাসিক সতীত্ব

লেখক : জনৈক যজুর্বেদীয় ব্রাহ্মণ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর এক কবিতায় লিখেছেন, "ফিরে দাও সে অরণ্য।" এক ব্যাখ্যাকার এই কথাটি সম্বল করে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বলেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ অরণ্য-সভ্যতার পক্ষপাতী ছিলেন, তিনি আধুনিক নগর-সভ্যতা এবং বিজ্ঞানজাত যান্ত্রিক সভ্যতার বিরোধী ছিলেন। এবং রবীন্দ্রনাথ যে প্রাচীন অরণ্য যুগেই ফিরে যেতে চান, এ-বিষয়ে সমালোচক নিঃসন্দেহ হয়েছিলেন।

প্রশ্ন করেছিলাম, রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কে এই সিদ্ধান্তের আগে তিনি কেন এমন কথা বলেছিলেন, বলবার সময় তাঁর মনে কি ভাবের উদয় হয়েছিল, এবং সমস্ত জীবন তিনি ঐ একই কথা বলেছেন কি না, তা কি আপনি অনুসন্ধান করেছেন? কিংবা, ধরুন, আমি যদি বলি রবীন্দ্রনাথ এক স্থানে বলেছেন—

> "ভদ্রলোকের তকমা-তাবিজ ছিঁড়ে
> উড়িয়ে দেবে মদোন্মত্ত হাওয়া,
> শপথ করে বিপথ-ব্রত নেব—
> মাতাল হয়ে পাতাল পানে ধাওয়া।"

এবং যদি বলি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ওটাই ছিল জীবনের আদর্শ, তাহলে অরণ্য-সভ্যতার আদর্শটা খণ্ডিত হয়ে যায় না কি?

সমালোচক নীরব রইলেন। থাকাই স্বাভাবিক।

কিন্তু আমি এই উপলক্ষে যা বলতে যাচ্ছি, তার সঙ্গে এসব কথার খুব নিকট সম্বন্ধ নেই। এবং যা বলব তার সম্পর্কেও এই উপমা খুব যে মিলবে তা নয়। আমি শুধু বলতে চাই যে, কোন খ্যাত ব্যক্তি কোনো একটা কথা বললে, তা কেন বলেছেন সে-বিষয়ে সম্পূর্ণ অনুসন্ধান না করে, সেই কথাটিই তাঁর বিষয়ে শেষ কথা রূপে গ্রহণ করায় কিছু অসুবিধা আছে। সেই উক্তির পটভূমিটি কি, এবং তা সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে সাময়িক ভাবে সত্য, না সেটাই একমাত্র নিরপেক্ষ সত্য, তার অনুসন্ধান না করে কোনো মত প্রকাশ করলে তা ইতিহাসের দিক্ থেকে যেমন অসত্য হতে পারে, বিজ্ঞানের দিক্ থেকেও তেমনি অসত্য হবার সম্ভাবনা।

ভূমিকাটা একটু বড় হল, কিন্তু বড় হবার দরকার ছিল। আমি এবারে আসল বিষয়ে আসি। গত ২৯শে অক্টোবর (১৯৭২) তারিখের স্টেট্‌স্‌ম্যানে একটি খবর দেখলাম, ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার চণ্ডীগড়ের ভারতীয় ইতিহাস সম্মিলনের ১০ম অধিবেশনে পূর্বাদন বলেছেন Distortions of History Must Be Stopped। আসলে এটাই ছিল সংবাদটির শিরোনাম। ঐ শিরোনামটিই যদি কেবল ছাপা থাকত, তাহলে তাঁর এই উক্তিটি অভিনন্দনযোগ্য হত সন্দেহ নেই। কিন্তু তিনি এই সাধারণ নির্দ্দেশবাণীটিকে সহসা অতি উৎসাহের সঙ্গে রামমোহন রায়ের শিরে এনে স্থাপন করেছেন। তাতে আমাদের মতন সাধারণ পাঠকের এ-কথা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, রামমোহন রায়ের যা কিছু কীর্তি-খ্যাতি তা সবই সম্পূর্ণ মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত এবং আমাদের উচিত এই কল্পিত মিথ্যা মূর্তিটিকে চূর্ণ করে তার স্থানে অন্য কাউকে প্রতিষ্ঠা করা। এবং তা হলেই ইতিহাসের মান রক্ষা হয়, এবং দেশের উপর থেকে এতবড় মিথ্যার বোঝাটা অপসারিত হলে আমরাও হাঁফ ছেড়ে বাঁচতে পারি।

ডক্টর মজুমদারের ইতিহাসপ্রীতি প্রশংসনীয়, কিন্তু মনে হয় তিনি ঠিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অগ্রসর হতে মনের গঠনের দিক্ থেকে কিছু বাধা অনুভব করেছেন। অথচ ইতিহাস একদিকে যেমন বিজ্ঞান, অপর দিকে তেমনি আর্ট। এক বিজ্ঞ ব্যক্তির

ভাষায় আবার এক কথা শুনি। তিনি বলেছেন, There is no history, there are only historians। এ-কথার অর্থ এই যে, মানুষের ইতিহাস-বিচারে অনেক সময় ব্যক্তি-মানুষের মনোগত বিশ্বাস বা প্রবণতার ছাপ পড়ে। সাধারণ প্রকৃতি-বিজ্ঞানে যেমন কোনো একটি পরীক্ষার পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে সত্যাসত্য নির্ণয় করা যায়, ইতিহাসের ক্ষেত্রে তা সম্ভব হয় না, তাই সমসাময়িক অনেক তথ্যের উপর নির্ভর করতেই হয় ঐতিহাসিকের। কিন্তু এইখানে কিছু পরিমাণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করার সুযোগ আছে। অর্থাৎ যে-সব এভিডেন্স পাওয়া যায় তার মধ্যে পক্ষে কতটা, এবং বিপক্ষে যদি কিছু থাকে তবে তা কতটা, তা নিয়ে বিশেষভাবে চিন্তা করতে হয়। যদি দেখা যায়, পক্ষে অতিমাত্রায় বেশি তাহলে বিপক্ষের এভিডেন্সকে বাতিল করে অন্যটা গ্রহণ করতে হয়। এর বিপরীতটাও সত্য।

রামমোহন রায়ের ক্ষেত্রে তাঁর 'সতী'-সম্পর্কিত মনোভাব কি ছিল, এবং স্বাধীন মত, অনেক দিন ধরে যা প্রচার করেছিলেন, তা কি ছিল, এবং তিনি হঠাৎ আইন করে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের চেয়ে সামাজিক একটি প্রাচীন অন্যায় অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলার পক্ষপাতী ছিলেন কি না, এ-বিষয়ে যাবতীয় এভিডেন্স পরীক্ষা করে দেখে, তবে ডক্টর মজুমদার তাঁর মত ব্যক্ত করেছেন কি না সে-বিষয়ে সন্দেহের কারণ ঘটেছে। তাঁর মনে পূর্ব থেকেই একটি বিশেষ প্রবণতা বা বিশ্বাস বা 'বায়াস' দেখা দেওয়া খুব অস্বাভাবিক মনে হয় না। মানুষ মাত্রেরই মনে কোনো এক বা একাধিক বিষয়ে দুর্বলতা থাকা অস্বাভাবিক নয় আদৌ। ঐ যে কথাটি আগেই বলেছি, There is no history,—there are only historians—এও সেই ব্যাপার। তবে এই 'বায়াস' যথাসাধ্য ত্যাগ করা ঐতিহাসিকের পক্ষে সম্ভব, যদি তিনি একমাত্র সত্যকেই প্রতিষ্ঠা করতে তৎপর হন।

আমি এক অনৈতিহাসিক,সত্যসন্ধানী ব্যক্তির দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। তাঁর নাম রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। তিনি বায়াস বা প্রেজুডিস বা কোনো অন্ধবিশ্বাসকে অবলম্বন করলে দুর্ধর্ষ ঐতিহাসিক ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে রামমোহনের বিরুদ্ধে প্রবন্ধ তাঁর সম্পাদিত প্রবাসীতে লিখতে দিতেন না। কিন্তু তিনি দিয়েছিলেন এই কারণে যে, তিনি চেয়েছিলেন সত্য প্রতিষ্ঠিত হোক। ব্রজেন্দ্রনাথের সঙ্গে রমাপ্রসাদ চন্দের তর্কযুদ্ধ আরম্ভ হয়েছিল প্রবাসীর পাতায়। ব্রজেন্দ্রনাথ রামানন্দের বেতনভুক্ সহকারী সম্পাদক ছিলেন। গোঁড়ামি থাকলে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ব্রজেন্দ্রনাথের প্রবন্ধ অনায়াসে অমনোনীত করতে পারতেন। এতেই প্রমাণ হয় রামমোহন রায় প্রকৃতই কি ছিলেন তা জানবার আগ্রহ সম্পাদকের কম ছিল না। তিনি ঐতিহাসিক সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে কিছুমাত্র দ্বিধা করেননি এবং তিনি ব্রাহ্ম ছিলেন। ব্রাহ্মগণ মিথ্যা দেবতারূপে কাউকে খাড়া করতে চাননি। এতে তাঁদের বিশেষ কি উদ্দেশ্য সাধিত হতে পারে তা আমার বুদ্ধির অগম্য। অর্থাৎ তা কেন করবেন?

বরং আমি একটি বিপরীত দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। ইতিহাস-নিষ্ঠ হতে গিয়ে সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও গবেষক অমূল্যচন্দ্র সেন কিভাবে ধিকৃকৃত হয়েছিলেন সে কাহিনী অল্প দিনের, অতএব তা অনেকের মনে থাকতে পারে। তিনি কিরণকুমার রায় সম্পাদিত 'প্রবাহ' পত্রিকায় প্রথমে 'ইতিহাসের শ্রীচৈতন্য' নামক তাঁর গবেষণালব্ধ প্রবন্ধগুলি ছাপেন। পরে ১৯৬৫ সনে তা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু সম্প্রদায়ের নাম করা ভক্তগণ ঐ পুস্তকের বিরুদ্ধে ভীষণ আন্দোলন আরম্ভ করলেন এবং শেষ পর্যন্ত তার আইনত প্রচার নিষিদ্ধ করিয়ে ছাড়লেন। ইতিহাসের দিক্ থেকে কিন্তু বিচার চলল না। সাধারণ মানুষ রূপে শ্রীচৈতন্যকে তাঁরা মানতে রাজী হলেন না। অথচ রামমোহন রায়কে নিয়ে কত আন্দোলন, তাঁর বিরুদ্ধে কত কুৎসা রটনা করা হল, কিন্তু তাতে রামমোহনের মহত্ব খাটো হয়নি। সে সব কুৎসা প্রচার আইনত 'ব্যান' করার কথাও ওঠেনি কখনো। আগেই বলেছি, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এ-জাতীয় রচনার স্থান তাঁর নিজের কাগজেই দিয়েছিলেন।

পার্থক্যটা এইখানে। কারণ, রামমোহনের যেখানে মহত্ত্ব, যে উচ্চতায় তিনি অধিষ্ঠিত, সে মহত্ত্ব বা সে উচ্চতার আসন তো তিনি কৃত্রিম উপায়ে পাননি? তাঁর অনুরক্তগণ তাঁকে দিয়ে কোনো অলৌকিক কাজও করাননি, তাঁর প্রতিকৃতিকে বেষ্টন করে জ্যোতির্বলয় আঁকেননি। রামমোহন রায় সাধারণ মানুষই ছিলেন, এবং যে-যুগে জন্মেছিলেন সে-যুগে তিনি অবতার রূপে খ্যাত হতে পারতেন। তিনি তা করেননি। যুক্তির পথে চলতে এবং সমাজকে চালাতে চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর বহুমুখী সমাজ-সংস্কারের কাহিনী কিংবদন্তী নয়, সবই ইতিহাসে গ্রথিত আছে। এবং তার সংখ্যা এত বেশি যে সতীদাহ বিষয়ে আইন করার ব্যাপারে কোনো বিশেষ কারণে (সে কারণও গোপন নেই) কি বলেছিলেন, তা তাঁর সতীদাহের বিরুদ্ধে সমস্ত অভিযানকে উড়িয়ে দিতে পারে না। ডক্টর মজুমদার তবু কেন যে, সমস্ত এভিডেন্সের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে একটিমাত্র এভিডেন্সের উপর জোর দিচ্ছেন, তা তিনিই জানেন। এবং যেটুকুর উপরে তাঁর ভরসা, সেইটুকুর ইতিহাস তাঁর অজ্ঞাত থাকবার কথা নয়।

বরং পালটা আমরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে চাই, যখন ইতিহাসের শ্রীচৈতন্য ব্যান করা হল, তখন তিনি একটি কথাও বলেননি কেন? সে বইখানা পরীক্ষা করে দেখলেন না কেন? যদি ইতিহাসনিষ্ঠ ডক্টর অমূল্যচন্দ্র সেন, এন্-এ, এল্এল্-বি, পি-এইচ-ডি (হামবুর্গ), সত্য কথা লিখে থাকেন, তবে ডক্টর মজুমদার সেই ব্যানিং-এর বিরুদ্ধে কেন বলেননি যে ইতিহাসে সত্যটাই বড়, তাতে মহৎ মানুষের মহত্ত্ব খর্ব হয় না, অতএব ইতিহাসের শ্রীচৈতন্য ব্যান করা অন্যায়? হয়তো এ-খবরটাই তাঁর অজানা। জানা থাকলে অন্তত চণ্ডীগড়েও এ-কথাটা তিনি তুলতে পারতেন, কিন্তু সেখানকার বক্তৃতার রিপোর্ট আমি দেখিনি, আমি কেবল খবরের কাগজের সংক্ষিপ্ত রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে এতটা বলছি। হয়তো তিনি ইতিহাসের শ্রীচৈতন্য বিষয়েও বলে থাকবেন। বললে সে-কথাও ঐ সংক্ষিপ্ত খবরে সংক্ষিপ্ততর আকারে থাকলে ভাল হত। তাই সন্দেহ হয়, বলেননি।

আমার শুধু প্রশ্ন, ধাপ্পার উপরে একটি ব্যক্তি এত বিখ্যাত এত শ্রদ্ধেয় কি করে হলেন? রামমোহনের সমকালের এত দেশী-বিদেশী ভদ্র ব্যক্তিরা তাঁর বিষয়ে এত মিথ্যা বলে তাঁকে বিখ্যাত করলেন কেন? কি তাঁদের গরজ?

আমাদের দেশের ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় ১৮৮৬ সনে ইউরোপ ভ্রমণ আরম্ভ করেন। তারপর A Visit to Europe নামক ৪০০ পৃষ্ঠার একখানা গ্রন্থ রচনা করেন। তার ধারাবাহিক অনুবাদ প্রবাসীতে প্রকাশিত হচ্ছে। সেই অনুবাদের অংশ প্রবাসী ভাদ্র সংখ্যা থেকে আমি এখানে কিছু তুলে দিচ্ছি (লেখক ব্রিস্টলে রামমোহনের সমাধি-মন্দিরের সম্মুখে বসে চিন্তা করছিলেন):

> "প্রত্যেক ভারতীয়ের পক্ষে রামমোহন রায়ের সমাধিকে শ্রদ্ধা নিবেদন করা একটি ধর্মীয় কর্তব্য। ...১৮৮৬ সনের ৭ই সেপ্টেম্বর, আমি সেই সমাধির পাদদেশে জানু পাতিয়া বসিয়া প্রার্থনা জানাইলাম —'ঈশ্বর, আমাদিগকে সত্যের পথ দেখাও, এবং আমি যাঁহার সমাধিক্ষেত্রে বসিয়া আছি, তিনি জীবনে যেরূপ করিয়াছেন, তেমনি আমাদিগকে শক্তি দাও, মনের বল দাও, যাহাতে তাঁহার ন্যায় সমস্ত জীবন সত্যপথে চলিতে পারি। আমি ব্যাকুল হৃদয়ে প্রার্থনা জানাইলাম যেন আমি কখনও ভীরু না হই।'—আরও আমার মনে তখন যে-সব ভাবের উদয় হইয়াছিল তাহা আমি প্রকাশ করিতে পারিব না, আমার স্বদেশবাসীগণ তাহা অনুমান করিয়া লইবেন।"
>
> "...ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আমি ঐ স্থান ত্যাগ করিলাম; শুধু বেদনাপূর্ণ হৃদয়ে ভাবিতে লাগিলাম, রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যুর পর আমরা আমাদের সমাজের বহু আবর্জনা দূর করিতে কতটুকু চেষ্টা করিয়াছি।"

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের জন্ম রামমোহনের মৃত্যুর তেরো-চোদ্দ বছর পরে। অতএব তিনি রামমোহনের বিষয়ে টাটকা বহু কাহিনীর পরিবেশে বেড়ে উঠেছেন, এবং তিনি ব্রাহ্মণ-সন্তান ও আমৃত্যু (১৯১৯) তাই ছিলেন। রামমোহন-বিরোধী পরিবেশ তিনি পাননি অনুমান করা যেতে পারে। এবং তাঁর প্রায় ৪০ বছর বয়সে তিনি ব্রিস্টলে রামমোহনের সমাধি দেখে হঠাৎ ভাবাবেশে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেননি এটি সহজেই অনুমান করা যায়। রামমোহনের প্রতি শ্রদ্ধা তাঁর যুক্তি-জাত শ্রদ্ধা।

আমার বক্তব্য হচ্ছে এই যে, রামমোহন কোনো অলীক কাল্পনিক এবং মিথ্যা প্রচারের দ্বারা লোকশ্রদ্ধেয় হননি, সতীদাহ-বিরোধ থেকে আরম্ভ করে বহু সমাজ-হিতকর পরিকল্পনা ও কাজ যুক্তি ও হৃদয়ের পথে চালিত হয়ে করেছিলেন এ-বিষয়ে সন্দেহ থাকে না।

এ-বিষয়ে যদি সমস্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ কেউ দাবি করেন তবে তাঁকে রামমোহন রায় বিশেষজ্ঞদের শরণাপন্ন হতে হবে। ছাপা অক্ষরে অনেক বই আছে, এবং জানা গেল অন্যতম বিশেষজ্ঞ যোগানন্দ দাস বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে রামমোহন অনুশীলন আরম্ভ করেছেন। ছাপা হলে তাও পড়া যাবে।

আমি শুধু ১৮৮৪ সনে লেখা ম্যাক্স মুয়েলারের একটি রচনা থেকে কিছু তুলে আমার প্রায়-অনধিকার চর্চা শেষ করছি:

"Rammohan Roy was to my mind a truly great man, a man who did a truly great work, and whose name, if it is right to prophesy, will be remembered for ever with some of his fellow-labourers and followers, as one of the great benefactors of mankind......"

"......I wish that those who seem so jealous of greatness would at least explain on what grounds they would bestow that ancient title..."

"...he would not have ritual, because it helped the weak; he would not allow Suttee because it was a time-hallowed custom... ..He would have no compromising, no economising, no playing with words, no shifting of responsibility from his own shoulders to others. And, therefore, whatever narrow-minded critics may say, I say once more that Rammohan Roy was an unselfish, an honest, a bold man—a great man in the highest sense of the word."

প্রবাসীর পাঠক-পাঠিকাগণ ইংরেজী-অভিজ্ঞ, অতএব এর বাংলা অনুবাদ দেওয়া অনাবশ্যক বোধ করছি।

ভারত, বাংলা-দেশ এবং অবাধ বাণিজ্য-নীতি

সুবিমল সিংহ

(এই রচনা অথবা ইহার কোন অংশ লেখকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত বাংলা ভাষায় অথবা ভাষান্তরে কোন পুস্তকে সন্নিবেশ নিষিদ্ধ)

ভারত এবং বাংলাদেশের মধ্যে ব্যাপক ব্যবসা-বাণিজ্য চালু হওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা আপাততঃ দেখা যাইতেছে না। ইহার কারণ অর্থনীতির সহিত রাষ্ট্র-নীতির বিরোধ। অর্থনীতি বলে যে, পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে বৈষয়িক কার্য্যাবলী যত অবাধে চলিবে সমগ্র মানব-সমাজের বৈষয়িক সমৃদ্ধিও তত বেশী হইবে, কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা চলে না। কারণ গোটা পৃথিবীটা একটি মাত্র রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত নহে। ইহা ছোট বড় কম বেশী দেড় শতটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে বিভক্ত। এবং প্রত্যেক রাষ্ট্রের চতুঃসীমায় ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতি-বন্ধক এক একটি দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর দণ্ডায়মান।

তবে বিভিন্ন রাষ্ট্রের অস্তিত্ব মানিয়া লইয়াও অর্থ-শাস্ত্রের অবাধ-বাণিজ্য-নীতি (Free Trade Policy) অনুসারে একই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে যেরূপ, বিভিন্ন দেশের মধ্যেও সেরূপ, ব্যবসা-বাণিজ্য যত অবাধে চলিবে ততই সর্ব্বজনীন এবং সর্ব্বদেশিক বৈষয়িক সমৃদ্ধি হইবে। এই সত্যটি অবশেষে পশ্চিম ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলি সবিশেষ উপলব্ধি করিয়াছেন বলিয়া অনুমান হয়, যাহার ফলে "ইউরোপীয় অবাধ বাণিজ্য অঞ্চল" ওরফে "ইউরোপীয় সাধারণ বাজার (European Common Market)"-এর সাম্প্রতিক উদ্ভব।

এই অবাধ-বাণিজ্য-নীতিটি পশ্চিম ইউরোপীয় দেশ-গুলির ক্ষেত্রে যেরূপ প্রযোজ্য, ভারত এবং বাংলা-দেশের ক্ষেত্রে, এমন কি সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব্ব-এসিয়ার দেশ সমূহের ক্ষেত্রেও তদপেক্ষা কিছুমাত্র কম নহে। সম্ভবতঃ বেশীই। কারণ ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চল কয়েক শতাব্দী যাবৎই কয়েকটি পরস্পর বিবদমান রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত থাকায় বাধ্য হইয়াই অনেকটা বৈষয়িক স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া চলিতে অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। পক্ষান্তরে বিগত বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী দুই শতাব্দী কাল বৃটিশের রাষ্ট্রিক এবং আর্থনীতিক নিয়ন্ত্রণাধীন ভারতীয় উপমহাদেশের, এমন কি সিংহল ব্রহ্মদেশ মালয়েশিয়াদি সমেত প্রায় সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব্ব এসিয়ারই একটা অবিচ্ছেদ্য বৈষয়িক অস্তিত্ব গড়িয়া উঠিয়াছিল। অধুনা-ত্রিধা-বিভক্ত ভারতীয় উপমহাদেশ সহ সিংহল ব্রহ্মদেশ মালয়েশিয়া প্রভৃতি দেশের রাষ্ট্রীয় স্বাতন্ত্র্য লাভের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই অঞ্চলে কোন দেশের আর্থনীতিক স্বাতন্ত্র্য অথবা স্বয়ংসম্পূর্ণতার কোন প্রশ্নই উঠে নাই।

অথচ ব্যক্তির জীবনে যেমন, রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও তেমনই বৈষয়িক স্বয়ংসম্পূর্ণতা এবং বৈষয়িক সমৃদ্ধি পরস্পর পরিপন্থী। প্রত্যেক ব্যক্তিকে যদি তাঁহার প্রয়োজনীয় যাবতীয় দ্রব্য স্বয়ং উৎপাদন অথবা আহরণ করিতে হইত তাহা হইলে তাঁহার প্রয়োজনও আদি মানুষের মতই সীমিত করিতে হইত। কিন্তু আধুনিক মানুষ অপরের প্রয়োজন যোগাইয়া তার বিনিময়ে নিজের প্রয়োজন মিটায়। বিভিন্ন রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও এই কথা সমানই প্রযোজ্য। তবে রাষ্ট্র ছোটও আছে, বড়ও আছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রুশিয়া, চীন প্রভৃতি বিচিত্র প্রাকৃতিক-সম্পদ-বহুল বড় বড় রাষ্ট্রের পক্ষে অর্থ-নৈতিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা এবং আর্থনীতিক সমৃদ্ধি উভয়ই যুগপৎ লাভ করা বহুলাংশে সম্ভব। এমন কি অঙ্গব্যবচ্ছিন্ন না হইলে এবং অধিবাসীদের বৈষয়িক শুভবুদ্ধি এবং সঙ্কল্প, অথবা চীন কিম্বা রুশিয়ার মত রাষ্ট্রিক বাধ্যবাধকতা থাকিলে,

ভারতীয় উপমহাদেশের পক্ষেও বহুলাংশে সম্ভব ছিল। কিন্তু গ্রেট ব্রিটেন অথবা জাপানের পক্ষে বৈষয়িক দিক্ দিয়া স্বয়ংসম্পূর্ণ হইতে গেলে অর্থাৎ দেশের জনসাধারণের প্রয়োজনীয় যাবতীয় বস্তু দেশেই উৎপন্ন করিতে গেলে দেশের মানুষগুলিকে বাঁচাইয়া রাখাই দায় হইত। অথচ ক্ষুদ্রায়তন এই দুই দেশ বহির্বিশ্বের প্রয়োজন মিটাইয়া বৈষয়িক সমৃদ্ধির উচ্চতম সোপানে আরূঢ়।

তখন স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠে, এই রহস্যটা কি? নিজের সমুদয় প্রয়োজন নিজে মিটাইতে গেলে বেশী দূর অগ্রসর হওয়া যায় না, অথচ অপরের প্রয়োজন মিটাইয়া চলিলে অনেকদূর যাওয়া যায়। অনেকটা যেন ধর্ম্মীয় উপদেশ অথবা নীতিকথার মত শোনায়। অথচ বিষয়টা মোটেই ধর্ম্ম্য অথবা নৈতিক ব্যাপার নহে। নেহাৎই স্বার্থপর বৈষয়িক ব্যাপার। অর্থশাস্ত্রে বিভিন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রে বিষয়টিকে প্রকাশ করা হয় "সামাজিক শ্রম-বিভাগ (social division of labour)" অথবা বৈষয়িক কার্য্যাবলীর 'বিশেষায়ণ' অথবা "স্বাতন্ত্র্যায়ণ (specialization অথবা differentiationof functions)," এই কথাগুলি দ্বারা অর্থাৎ যে ব্যক্তি যে কার্য্যে অপেক্ষাকৃত দক্ষ তিনি সেই কার্য্যে নিয়োজিত থাকিবেন এবং সকলে তাঁহাদের কার্য্যের ফল প্রয়োজনানুরূপ একে অন্যের সহিত বিনিময় করিয়া লইবেন। ফলে সকলের সম্মিলিত উৎপাদন অপেক্ষাকৃত বেশী হইবে এবং সকলেই তাহার ভাগী হইবে এবং সকলেই তাহার ভাগী এবং ভোগী হইবেন। বিভিন্ন অঞ্চলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য অনুরূপ নীতিকে বলা হয় "আঞ্চলিক শ্রম-বিভাগ" অথবা "আঞ্চলিক বিশেষায়ণ" (territorial/geographical/regional division of labour/specialization)। তবে বিষয়টিকে সম্যক্ উপলব্ধি করিতে হইলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ভিত্তি বলিয়া কথিত যে একটি নীতি অথবা তত্ত্ব আছে তাহার পর্য্যালোচনা প্রয়োজন।

এই তত্ত্বটির সংজ্ঞা দেওয়া হয়, বিভিন্ন দেশে জাত একাধিক বস্তুর "আপেক্ষিক উৎপাদন ব্যয় তত্ত্ব" (theory of comparative cost) অথবা উৎপাদনে "আপেক্ষিক সুযোগ-সুবিধা তত্ত্ব" (theory of comparative advantage)। বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে অথবা একই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে শ্রম-বিভাগ মূলক উৎপাদন, বৈষয়িক কার্য্যাবলীর বিশেষায়ণ, পারস্পরিক বিনিময়ের মাধ্যমে উৎপাদনের বণ্টন, ইত্যাদি বৈষয়িক কার্য্যাবলী যে মূল নীতি অথবা ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যাদিও সেই একই নীতি অথবা ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহাদের একটির রহস্য বুঝিলেই অপরটিরও বুঝা যায়। অতএব আমরা এই তত্ত্বটির অনুধাবনার্থে বৈষয়িক সমাজ সংগঠনের প্রাথমিক অবস্থার একটি কাল্পনিক দৃষ্টান্তের অবতারণা করিব।

মনে করা যাক বৈষয়িক ব্যাপারে "স্বয়ংসম্পূর্ণ" দুই প্রতিবাসী ব্যক্তি নিজেদের "অন্ন-বস্ত্র" নিজেরাই উৎপাদন করিয়া ভোগ করিতেছেন। উভয়েই বৎসরের অর্দ্ধেক সময় কৃষিকার্য্যে এবং বাকী অর্দ্ধেক সময় বস্ত্রবয়নে নিয়োজিত থাকিলে প্রথম ব্যক্তি ৫ (পাঁচ)টি বস্ত্র এবং ১০ (দশ) মন ধান্য এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি ২ (দুই) টি বস্ত্র এবং ৮ (আট) মন ধান্য উৎপাদন করিতে পারেন। এবং তাঁহারা আপাততঃ তাহাই করিতেছেন। তবে প্রয়োজন বোধে অথবা ইচ্ছা করিলেই উভয়েই ধান্যের উৎপাদন কমাইয়া বস্ত্রের, অথবা বস্ত্রের উৎপাদন কমাইয়া ধান্যের উৎপাদন বাড়াইতে পারেন।

এক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে যে, কৃষিকার্য্য এবং বস্ত্রবয়ন এই উভয় কার্য্যেই প্রথম ব্যক্তি দ্বিতীয় ব্যক্তি অপেক্ষা অধিকতর দক্ষ। শ্রম-বিভাগ করিতে হইলে যিনি কৃষিকার্য্যে অপেক্ষাকৃত দক্ষ তিনি কেবল মাত্র অথবা প্রধানতঃ কৃষিকার্য্যে, এবং যিনি বস্ত্র-বয়নে অপেক্ষাকৃত দক্ষ তিনি কেবলমাত্র অথবা প্রধানতঃ বস্ত্র বয়নে নিয়োজিত থাকিবেন, তারপর তাঁহারা পরস্পরের প্রয়োজনানুরূপ ধান্যের সহিত বস্ত্রের বিনিময় করিয়া লইবেন, ইহাই আমরা জানি। কিন্তু এক্ষেত্রে মুশকিল এই যে,উভয় কার্য্যেই প্রথম ব্যক্তি দ্বিতীয় ব্যক্তি অপেক্ষা দক্ষতর হওয়ায়, কোন কাজটি প্রথম ব্যক্তি রাখিবেন আর কোন কাজটিই বা দ্বিতীয় ব্যক্তি লইবেন? অতএব আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় যে এ ক্ষেত্রে কোনরূপ শ্রমের

বিভাগ অথবা কার্যাবলীর বিশেষায়ণ অথবা স্বাতন্ত্র্যায়ণ সম্ভব নহে। অর্থাৎ এই দুই ব্যক্তির "স্বয়ংসম্পূর্ণ" থাকা ছাড়া গত্যন্তর নাই।

কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে যাহা মনে হয়, তাহাই সব সময় সত্য নয়। কারণ অর্থশাস্ত্রীয় বিশ্লেষণে দেখা যাইবে যে এক্ষেত্রেও সার্থক শ্রম-বিভাগ এবং কার্য্যাবলীর বিশেষায়ণ সম্ভব। এবং ইহাই বিভিন্ন বস্তুর উৎপাদনে "আপেক্ষিক ব্যয় অথবা আপেক্ষিক সুযোগ-সুবিধা তত্ত্বের" (theory of comparative cost or comparative advantage) গূঢ় রহস্য।

আমাদের আলোচ্য দুই প্রতিবেশীর কৃতিত্বের প্রতি একটু মনোযোগ দিলে দেখা যাইবে যে, যদিও প্রথম ব্যক্তি উভয় কার্য্যেই দ্বিতীয় ব্যক্তি অপেক্ষা পটু, তবুও এই পটুত্বেরও একটু তারতম্য আছে। কারণ কৃষিকার্য্যে তিনি দ্বিতীয় ব্যক্তিকে যতদূর ছাড়াইয়া যান, বস্ত্র-বয়নে ছাড়াইয়া যান, তদপেক্ষা অনেক বেশী। তেমনি দ্বিতীয় ব্যক্তি যদিও উভয় কার্য্যেই প্রথম ব্যক্তির পিছনে তবুও তিনি বস্ত্র-বয়নে যতদূর পিছনে, কৃষিকার্য্যে ততদূর নহেন। অর্থাৎ এক্ষেত্রে স্বতন্ত্র ভাবে কৃষিকার্য্যে অথবা বস্ত্রবয়নে একে অন্যের দক্ষতার তুলনা করিলে চলিবে না। একজনের কৃষিকার্য্যের তুলনায় বস্ত্রবয়নে আপেক্ষিক দক্ষতার সহিত অপরের কৃষিকার্য্যের তুলনায় বস্ত্রবয়নে আপেক্ষিক দক্ষতার তুলনা করিতে হইবে। অথবা কৃষিকার্য্যে দুই ব্যক্তির আপেক্ষিক অথবা আনুপাতিক দক্ষতার সহিত বস্ত্রবয়নে দুই ব্যক্তির আপেক্ষিক অথবা আনুপাতিক দক্ষতার তুলনা করিতে হইবে। বৎসরের অর্দ্ধেক সময় কাজ করিয়া প্রথম ব্যক্তি উৎপাদন করেন ৫ (পাঁচ)টি বস্ত্র, দ্বিতীয় ব্যক্তি করেন ২ (দুই)টি। এক্ষেত্রে প্রথম ব্যক্তির দক্ষতা দ্বিতীয় ব্যক্তির আড়াই গুণ (৫:২)। পক্ষান্তরে এই একই সময়ে প্রথম ব্যক্তি উৎপাদন করেন ১০ (দশ) মন ধান্য, এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি করেন ৮ (আট) মন। এ ক্ষেত্রে প্রথম ব্যক্তির দক্ষতা দ্বিতীয় ব্যক্তির সওয়া গুণ (১০:৮ অর্থাৎ ৫:৪)। অর্থাৎ দ্বিতীয় ব্যক্তির সহিত তুলনায় প্রথম ব্যক্তির আপেক্ষিক শ্রেষ্ঠতা ধান্যোৎপাদনে যে-রূপ বস্ত্রবয়নে তাহার দ্বিগুণ। অপর দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে প্রথম ব্যক্তি যে-সময়ে অর্থাৎ বৎসরের অর্দ্ধেক সময়ে উৎপাদন করেন ৫ (পাঁচ)টি বস্ত্র, সেই সময়েই উৎপাদন করিতে পারেন ১০ (দশ) মন ধান্য। অর্থাৎ শ্রমের হিসাবে তাঁহার নিকট একটি বস্ত্র এবং দুই মন ধান্যের উৎপাদন-ব্যয় সমান। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় ব্যক্তি ঐ একই সময়ে হয় ২ (দুই)টি বস্ত্র, নতুবা ৮ (আট) মন ধান্য উৎপাদন করিতে পারেন। অতএব তাঁহার নিকট শ্রমের হিসাবে ১টি বস্ত্রের এবং ৪ মন ধান্যের উৎপাদন-ব্যয় সমান। অর্থাৎ একমন ধান্যের তুলনায় একটি বস্ত্রের আপেক্ষিক উৎপাদন-ব্যয় দ্বিতীয় ব্যক্তির নিকট যাহা, প্রথম ব্যক্তির নিকট তাহার অর্দ্ধেক। পক্ষান্তরে একটি বস্ত্রের তুলনায় একমন ধান্যের উৎপাদন-ব্যয় প্রথম ব্যক্তির নিকট যত, দ্বিতীয় ব্যক্তির নিকট তাহার অর্দ্ধেক। ফলে একটি বস্ত্রের উৎপাদন বাড়াইতে হইলে যে ক্ষেত্রে প্রথম ব্যক্তির দুই মন ধান্যের উৎপাদন কমাইতে হয়, দ্বিতীয় ব্যক্তির কমাইতে হয় চার মন ধান্যের। এই একই ব্যাপার বিপরীত দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে একটি বস্ত্রের উৎপাদন কমাইয়া প্রথম ব্যক্তি যে ক্ষেত্রে মাত্র দুই মন ধান্যের উৎপাদন বাড়াইতে পারেন, দ্বিতীয় ব্যক্তি পারেন চারমন ধান্যের। অতএব এখানে কেহই কাহারও চেয়ে কম নহেন। ফলে সমানে সমানেই একটা বুঝাপড়া হইতে পারে।

অতএব মনে করা যাক এই দুই প্রতিবেশী এতদিনের আচরিত "স্বয়ংসম্পূর্ণ"-তার নীতি পরিহার পূর্ব্বক শ্রম-বিভাগ এবং সহযোগিতা তথা পারস্পরিক নির্ভরশীলতার নীতি গ্রহণ করিলেন। প্রথম ব্যক্তি দুই মন ধান্যের উৎপাদন কমাইয়া একটি বস্ত্রের উৎপাদন বাড়াইলেন। এদিকে দ্বিতীয় ব্যক্তি একটি বস্ত্রের উৎপাদন কমাইয়া চার মন ধান্যের উৎপাদন বাড়াইলেন। ইহাতে দুই জনের মোট বস্ত্রের উৎপাদন একই রহিল অথচ মোট ধান্যের উৎপাদন দুই মন বাড়িল। এখন প্রথম ব্যক্তির হইল ৬টি বস্ত্র এবং ৮ মন ধান্য এবং দ্বিতীয় ব্যক্তির হইল একটি

মাত্র বস্ত্র এবং ১২ মন ধান্য। একটি বস্ত্রের উৎপাদন বাড়াইতে প্রথম ব্যক্তির ছাড়িতে হইল দুই মন ধান্য। একটি বস্ত্রের উৎপাদন কমাইয়া দ্বিতীয় ব্যক্তির বাড়িল চার মন ধান্য। এখন যদি প্রথম ব্যক্তি তিন মন ধান্য লইয়া বস্ত্রটি দ্বিতীয় ব্যক্তিকে দিয়া দেন এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি তিন মন ধান্য দিয়া বস্ত্রটি প্রথম ব্যক্তির নিকট হইতে পাইয়া যান, তাহা হইলে উভয়ের বস্ত্রের সংখ্যা পূর্ব্ববৎই অর্থাৎ "স্বয়ংসম্পূর্ণ" অবস্থার অনুরূপই থাকে অথচ প্রত্যেকেরই এক মন করিয়া ধান্য বাড়িয়া যায়। তাহা হইলে শুধু একটি বস্ত্র কেন? দ্বিতীয় ব্যক্তির দুইটি বস্ত্র উৎপাদনের ভারই ত প্রথম ব্যক্তি লইতে পারেন। অর্থাৎ প্রথম ব্যক্তি করিবেন নিজের জন্য পূর্ব্ববৎ পাঁচটি এবং দ্বিতীয় ব্যক্তির জন্য দুইটি মোট ৭(সাত)টি বস্ত্র। ফলে তাঁহার ধান্যের উৎপাদন স্বয়ং-সম্পূর্ণ অবস্থার ১০(দশ) মন হইতে কমিয়া দাঁড়াইবে ৬(ছয়) মন-এ। এদিকে দ্বিতীয় ব্যক্তি বস্ত্র-বয়নের দায়িত্ব মুক্ত হইয়া শুধু ধান্য উৎপাদন করিবেন পূর্ব্বের "স্বয়ংসম্পূর্ণ" অবস্থার দ্বিগুণ অর্থাৎ ১৬(ষোল) মন। তারপর তাঁহারা প্রতি বস্ত্রে তিন মন হিসাবে দুইটি বস্ত্রের সহিত ৬(ছয়) মন ধান্যের বিনিময় করিয়া লইবেন। ফলে প্রথম ব্যক্তির স্বয়ংসম্পূর্ণ অবস্থার অনুরূপই ৫(পাঁচ)টি বস্ত্র রহিয়া গেল অথচ ধান্যের পরিমাণ স্বয়ংসম্পূর্ণ অবস্থার ১০(দশ) মন হইতে বাড়িয়া হইল ১২(বার) মন। তেমনি দ্বিতীয় ব্যক্তিরও বস্ত্রের সংখ্যা "স্বয়ংসম্পূর্ণ" অবস্থার অনুরূপই দুইটিই রহিল, অথচ ধান্যের পরিমাণ স্বয়ংসম্পূর্ণ অবস্থার ৮(আট) মন হইতে বাড়িয়া হইল ১০(দশ) মন।

এযাবৎ আসিয়া আমরা দেখিতেছি যে দ্বিতীয় ব্যক্তি যদিও বস্ত্রোৎপাদনের দায়িত্ব হইতে সম্পূর্ণ রেহাই পাইলেন, প্রথম ব্যক্তি এখনও ধান্যোৎপাদন-এর দায় হইতে সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি পান নাই। এখন তাঁহাকে নিজের জন্য পাঁচটি এবং দ্বিতীয় ব্যক্তির জন্য দুইটি মোট ৭(সাত)টি বস্ত্র উৎপাদন করিয়া আরও ৬(ছয়) মন ধান্য উৎপাদন করিতে হয়। তবে অনুরূপ আরও সুযোগ পাইলে তিনিও কৃষিকার্য্য সম্পূর্ণ বর্জ্জন করিয়া আরও তিনটি বস্ত্রের উৎপাদন বাড়াইয়া (ইহাই তাঁহার সীমা) সংবৎসর শুধু বস্ত্রোৎপাদনেই নিয়োজিত থাকিতেন। এই সুযোগ তাঁহার মিলিয়া যায় যদি তিনি আরেক জন "স্বয়ংসম্পূর্ণ" প্রতিবেশীর সন্ধান পান যিনি বৎসরের অর্দ্ধেক সময় বস্ত্র বয়ন করিয়া ৩(তিন)টি বস্ত্র উৎপাদন করিতে পারেন এবং যিনি দ্বিতীয় ব্যক্তির মতই একটি বস্ত্রের উৎপাদন কমাইলে ৪(চার) মন ধান্যের উৎপাদন বাড়াইতে পারেন। অর্থাৎ যিনি বর্ত্তমানে বৎসরের অর্দ্ধেক সময় বস্ত্রবয়নেএবং বাকী অর্দ্ধেক সময় ধান্যোৎপাদনে নিয়োজিত থাকিয়া মোট ৩(তিন)টি বস্ত্র এবং ১২(বার) মন ধান উৎপাদন করিয়া "স্বয়ংসম্পূর্ণতা" উপভোগ করিতেছেন। মনে করা যাক এরূপ আরেকজন প্রতিবেশী আসিয়া জুটিলেন যিনি প্রথম এবং দ্বিতীয় ব্যক্তির শ্রমবিভাগ, সহযোগিতা, এবং পরস্পর নির্ভরশীলতার সুফল প্রত্যক্ষ করিয়া নিজেও এযাবৎ আচরিত "স্বয়ংসম্পূর্ণতার" নীতি বর্জ্জন-এর সিদ্ধান্ত করিলেন। এক্ষণে এই তিন ব্যক্তির মধ্যে প্রথম ব্যক্তি কৃষিকার্য্য সম্পূর্ণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সারা বৎসর বস্ত্রবয়নে নিয়োজিত থাকিয়া মোট ১০(দশ)টি বস্ত্র তৈয়ারী করিবেন। এদিকে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ব্যক্তি বস্ত্র বয়ন সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র কৃষিকার্য্যে নিয়ো-জিত থাকিয়া যথাক্রমে ১৬(ষোল) মন এবং ২৪ (চব্বিশ) মন ধান্য উৎপাদন করিবেন। তারপর প্রথম ব্যক্তি দ্বিতীয় ব্যক্তিকে পূর্ব্বের মত দুইটি বস্ত্র দিয়া প্রতি বস্ত্রে তিন মন হিসাবে মোট ৬(ছয়) মন এবং তৃতীয় ব্যক্তিকে আরও তিনটি বস্ত্র দিয়া প্রতি বস্ত্রে তিন মন হিসাবে মোট ৯(নয়) মন ধান্য লইবেন। ফলে প্রথম ব্যক্তির হইবে ৫(পাঁচ)টি বস্ত্র এবং ১৫(পনর) মন ধান্য দ্বিতীয় ব্যক্তির হইবে ২(দুই)টি বস্ত্র এবং ১০(দশ) মন ধান্য, এবং তৃতীয় ব্যক্তির হইবে ৩(তিন) টি বস্ত্র এবং ১৫(পনের) মন ধান্য। অর্থাৎ প্রত্যেকেরই "স্বয়ংসম্পূর্ণ" অবস্থার অনুরূপ বস্ত্র ত হইবেই, অধিকন্তু যাঁহার যতখানি বস্ত্র তাঁহার তত মন ধান্যও উপরি হইবে।

এখানে লক্ষণীয় যে, একদিকে প্রথম ব্যক্তি, এবং

অপর দিকে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ব্যক্তি, এই দুই পক্ষের মধ্যে ধান্য এবং বস্ত্র এই দুই বস্তুর আপেক্ষিক উৎপাদন-দক্ষতায়, অথবা শ্রমের হিসাবে আপেক্ষিক উৎপাদন-ব্যয়ের পার্থক্য আছে।

অতএব এই দুই পক্ষের মধ্যে শ্রম-বিভাগ তথা বৈষয়িক কার্য্যাবলীর স্বাতন্ত্র্যায়ণ সম্ভব এবং সার্থক। কিন্তু দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ব্যক্তির একে অন্যের দক্ষতার বিচার করিলে দেখা যাইবে যে তৃতীয় ব্যক্তিও প্রথম ব্যক্তির মতই কৃষিকার্য্য এবং বস্ত্রবয়ন এই উভয় কার্য্যেই দ্বিতীয় ব্যক্তি অপেক্ষা দক্ষতর। কারণ দ্বিতীয় ব্যক্তি বৎসরের অর্দ্ধেক সময়ে যে ক্ষেত্রে উৎপাদন করিতে পারেন ২(দুই)টি বস্ত্র অথবা ৮(আট) মন ধান্য, তৃতীয় ব্যক্তি সে ক্ষেত্রে করিতে পারেন ৩(তিন)টি বস্ত্র অথবা ১২(বার) মন ধান্য, অর্থাৎ এই উভয় কার্য্যেই তৃতীয় ব্যক্তি দ্বিতীয় ব্যক্তি অপেক্ষা দেড়গুণ দক্ষ। কিন্তু ধান্য উৎপাদনের তুলনায় বস্ত্র-বয়নে অথবা বস্ত্রবয়নের তুলনায় ধান্যোৎপাদনে এই দুই ব্যক্তির মধ্যে আপেক্ষিক দক্ষতার কোন তারতম্য নাই। ফলে উভয়েরই একটি বস্ত্র উৎপাদনে যে শ্রম এবং সময় লাগে সেই শ্রমে এবং সময়ে ৪(চার) মন ধান্যই উৎপাদন করিতে পারেন। অর্থাৎ একটি বস্ত্রের উৎপাদন কমাইয়া দ্বিতীয় ব্যক্তি যেমন ৪(চার)মন ধান্যের উৎপাদন বাড়াইতে পারেন, তৃতীয় ব্যক্তিরও তেমনি একটি বস্ত্রের উৎপাদন বাড়াইতে হইলে সেই ৪(চার) মন ধান্যেরই উৎপাদন কমাইতে হয়। ইহাতে দুই জনের মোট বস্ত্র এবং মোট ধান্য এই উভয় বস্তুরই সংখ্যা অথবা পরিমাণ সমান থাকে। অতএব এই দুই ব্যক্তির মধ্যে সার্থক শ্রম-বিভাগ অথবা কার্য্যাবলীর স্বাতন্ত্র্যায়ণ সম্ভব নয়।

এখন আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এই তত্ত্বের প্রয়োগ বুঝিতে বিশেষ অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। বস্তুতঃ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পরিপ্রেক্ষিতেই এই তত্ত্বের প্রথম উদ্ভব হয়। মনে করা যাক ভারত এবং বাংলা-দেশের মধ্যে কোন রূপ ব্যবসা-বাণিজ্য নাই। বাঙ্গালীর "মাছ-ভাতই" প্রধান অবলম্বন। অতএব মনে করা যাক্ এই দুই স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য চালু না থাকায় ভারতের অন্তর্ভুক্ত বাঙ্গালীদের এবং বাংলা-দেশবাসীদের এই দুইটি অপরিহার্য্য খাদ্যবস্তুর জন্য স্ব স্ব দেশের উৎপাদনের উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে হয়। তবে শস্যশ্যামলা নদীমাতৃক সোনার বাংলাদেশে ধান্যও ফলে যেরূপ প্রচুর, মৎস্যও ধরা পড়ে তেমনই অপর্য্যাপ্ত। পক্ষান্তরে পশ্চিম বঙ্গে তথা ভারতে এই উভয় বস্তুর উৎপাদনই অপেক্ষাকৃত কষ্টসাধ্য, তবে বাংলা-দেশে ধান্যের তুলনায় মৎস্যের উৎপাদন যেরূপ কষ্টসাধ্য, ভারতে ধান্যের তুলনায় মৎস্যের উৎপাদন তদপেক্ষা অনেক বেশী কষ্টসাধ্য। ফলে, মনে করা যাক ভারতে যে শ্রমে এক মন মৎস্য উৎপাদন করা যায়; সেই শ্রমেই ভারতে ৪(চার) মন ধান্য উৎপাদন করা যায়। পক্ষান্তরে বাংলা-দেশে অনুরূপ শ্রমেই ভারতের চতুর্গুণ মৎস্য অর্থাৎ ৪(চার) মন মৎস্য, এবং ভারতের দ্বিগুণ ধান্য অর্থাৎ ৮(আট) মন ধান্য উৎপাদন করা যায়।

এখন আমরা ধরিয়া লইব যে, ভারতে যখন শ্রমের হিসাবে এক মন মৎস্য এবং চার মন ধান্যের উৎপাদন ব্যয় সমান তখন ভারতের বাজারেও এক মন মৎস্য এবং চার মন ধান্যের মূল্য সমান। তেমনই বাংলা-দেশে যখন চারমন মৎস্য এবং আট মন ধান্যের, উৎপাদন-ব্যয় সমান সমান তখন বাংলা-দেশের বাজারেও চার মন মৎস্য এবং এবং আট মন ধান্যের অর্থাৎ একমন মৎস্য এবং দুই মন ধান্যের মূল্যও সমান।

মনে করা যাক বাংলা-দেশ যখন পাকিস্তান রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল তখন ইহার চতুর্দ্দিকে অর্থাৎ ভারত এবং বাংলা-দেশের সীমান্ত বরাবর একটা কণ্টকিত লৌহ জাল-বেষ্টনীর (barbed wire) প্রাচীর তুলিয়া দেওয়া হইয়াছিল। ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যও বন্ধ ছিল এবং দুই রাষ্ট্রের মুদ্রারও কোন বিনিময় ব্যবস্থা ছিল না। তারপর মনে করা যাক্ বাংলা-দেশ স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সহসা সেই প্রাচীর তুলিয়া লওয়া হইল। এখন অবাধে পণ্য চলাচল করিতে পারে। তবে আমরা ধরিয়া লইব যে, এখনও ভারতীয় মুদ্রার সহিত নূতন

বাংলা-দেশীয় মুদ্রার সরকারী অথবা বেসরকারী কোন বিনিময় ব্যবস্থাও নাই. এমন কি কোন বিনিময় হারও নির্দিষ্ট নাই। কেহ হয়ত বলিবেন, এ অবস্থায় ব্যবসা-বাণিজ্য চলিবে কি করিয়া? জবাবে আমরা বলিব, এ অবস্থায়ও ব্যবসা-বাণিজ্য চলিবে। এবং খুব স্বচ্ছন্দ গতিতেই চলিবে। কারণ আমরা দেখিয়াছি যে দুই রাষ্ট্রের "স্বয়ংসম্পূর্ণ" অবস্থায় ভারতের বাজারে একমন মৎস্য এবং চারমন ধান্যের মূল্য সমান। পক্ষান্তরে বাংলা-দেশের বাজারে একমন মৎস্য এবং দু: মন ধান্যের মূল্য সমান। অর্থাৎ ভারতের বাজারে একমন মৎস্য বিক্রয় করিয়া সেই টাকায় সেখানে চারমন ধান্য ক্রয় করা যায়। এদিকে বাংলা-দেশের বাজারে চারমন ধান্য বিক্রয় করিয়া সেই টাকায় সেখানে দুই মন মৎস্য ক্রয় করা যায়। অতএব বাংলা-দেশ হইতে একমন মৎস্য লইয়া ভারতের বাজারে যান। সেখানে তাহা বিক্রয় করিয়া সেই টাকায় সেই বাজারেই চার মন ধান্য ক্রয় করিয়া দুইমন মৎস্যের দাম পাইবেন। শতকরা একশত টাকা লাভ। তাহা হইতে পরিবহনের ব্যয় বাদ দিয়া যাহা থাকে। অথবা ভারত হইতে একমন ধান্য লইয়া বাংলা দেশের বাজারে যান। সেখানে তাহা বিক্রয় করিয়া সেই টাকায় সেই বাজারেই আধ মন মৎস্য ক্রয় করিয়া ভারতে লইয়া আসুন। ভারতের বাজারে তাহা বিক্রয় করিয়া দুই মন ধান্যের মূল্য পাইবেন। শতকরা একশত টাকা লাভ। তাহা হইতে পরিবহনের ব্যয় বাদ দিয়া যাহা থাকে।

অতএব অনুমান করা যায় যে, ব্যবসা-বাণিজ্য যদি অবাধে চলিতে দেওয়া হয়, তবে অসংখ্য লোক মুনাফার লোভে এই কারবারে লাগিবেন। ফলে বাংলাদেশ হইতে ভারতে মৎস্যের, এবং ভারত হইতে বাংলাদেশে ধান্যের, ভারবাহীরা পিপীলিকার শ্রেণীর মত সীমান্ত অতিক্রম করিতে থাকিবেন।

এই অবস্থা অবলোকন করিয়া বাংলাদেশবাসীরা হয়ত বলিবেন, বাংলাদেশের সব মাছ যদি ভারতে চলিয়া গেল, তবে আমরা কি দিয়া ভাত খাইব? ভারতবাসীরা হয়ত বলিবেন, ভারতের সব ধান্য যদি বাংলাদেশে চলিয়া গেল, তবে আমরা কি খাইয়া বাঁচিব? এবং দুই পক্ষই হয়ত বলিবেন যে দুই দেশের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের পথ সম্পূর্ণ রুদ্ধ থাকাই উভয় দেশের পক্ষে কল্যাণকর। অবশ্য এ-কথাও অনুমান করা যায় যে, পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে ভারত এবং বাংলাদেশ তথা পাকিস্থান যখন অভিন্ন ছিল, তখন এরূপ বুদ্ধি কাহারও মাথায় গজাইলে তাঁহাকে অনতিবিলম্বে উন্মাদ-আশ্রমে প্রেরণের যৌক্তিকতা সম্পর্কেও এই উভয় পক্ষই একমত হইতেন। এ-সবই রাষ্ট্রনীতির ভেলকি।

তবে বর্ত্তমানে ভারত ভারত, বাংলাদেশ বাংলাদেশ। অতএব "মাছ-ভাত"-এর উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল বাংলা-দেশবাসীরা যদি মাছের আকাল এবং "অন্নগত-প্রাণ" ভারতবাসীরা যদি ভাতের আকালের সম্ভাবনা দেখিয়া উৎকণ্ঠিত অথবা শঙ্কিত হন, তবে তাহা অস্বাভাবিক অথবা নিন্দনীয় বলা যায় না। কিন্তু প্রাগুক্ত প্রতিবেশীদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিলে তাঁহাদিগকে আশ্বস্ত করিবার মত একটা যুক্তি দিয়া বলা যায় যে তাঁহাদের উদ্বেগ অথবা শঙ্কা বহুলাংশে অমূলক। যুক্তিটা এইরূপ। বাংলাদেশ হইতে ভারতে মৎস্যের, এবং ভারত হইতে বাংলাদেশে ধান্যের চলাচল শুরু হইলেই একদিকে বাংলাদেশে মৎস্যের যোগান কমিয়া ধান্যের যোগান বাড়িবে, অপরদিকে ভারতে ধান্যের যোগান কমিয়া মৎস্যের যোগান বাড়িবে। ইহার আসন্ন ফলস্বরূপ বাংলাদেশে ধান্যের অনুপাতে মৎস্যের মূল্য চড়িবে, ভারতে ধান্যের অনুপাতে মৎস্যের মূল্য নামিবে। বাংলাদেশে একমন মৎস্যের মূল্য দুইমণ ধান্যের মূল্যের উপরে উঠিবে, ভারতে একমন মৎস্যের মূল্য চারমন ধান্যের মূল্যের নীচে নামিবে। অতএব বাংলাদেশে দুইমণ ধান্যের উৎপাদন কমাইয়া একমণ মৎস্যের উৎপাদন বাড়াইলে, এবং ভারতে একমন মৎস্যের উৎপাদন কমাইয়া চারমন ধান্যের উৎপাদন বাড়াইলে,উভয়দেশের কৃষিজীবী বনাম মৎস্যজীবীদের লাভ হইবে। ইহাতে দুই দেশের মোট মৎস্যের উৎপাদন সমানই থাকিবে কিন্তু মোট ধান্যের উৎপাদন বাড়িবে। এইরূপে যতক্ষণ বাংলাদেশে

ধান্যের অনুপাতে মৎস্যের মূল্য ধান্যের অনুপাতে মৎস্যের উৎপাদন-ব্যয়ের উপরে উঠিয়া থাকিবে ততক্ষণ বাংলাদেশে ধান্যের উৎপাদন কমিয়া মৎস্যের উৎপাদন বাড়িতে থাকিবে। পক্ষান্তরে যতক্ষণ ভারতে ধান্যের অনুপাতে মৎস্যের মূল্য ধান্যের অনুপাতে মৎস্যের উৎপাদন-ব্যয়ের নীচে নামিয়া থাকিবে ততক্ষণ ভারতে মৎস্যের উৎপাদন কমিয়া ধান্যের উৎপাদন বাড়িতে থাকিবে। এইরূপ চলিতে থাকিলে, যদি উভয় দেশের মোট মৎস্যের উৎপাদন সমান থাকে তবে মোট ধান্যের উৎপাদন বাড়িবে; যদি মোট ধান্যের উৎপাদন সমান থাকে তবে মোট মৎস্যের উৎপাদন বাড়িবে। আবার দুই দেশের মোট মৎস্য এবং মোট ধান্য এই উভয়েরই পরিমাণ কিছু কিছু বাড়িতে পারে, কিন্তু কোনটিরই কমিবার কোন সম্ভাবনা নাই। ইহার কারণ এই যে, যতক্ষন দুই দেশের মধ্যে মৎস্য এবং ধান্য এই দুই বস্তুর আপেক্ষিক উৎপাদন-ব্যয়ে পার্থক্য থাকিবে ততক্ষণ বাংলাদেশে একমণ মৎস্যের উৎপাদন বাড়াইতে যে পরিমাণ ধান্যের উৎপাদন কমাইতে হইবে, ভারতে একমন মৎস্যের উৎপাদন কমাইলে তদপেক্ষা অধিক পরিমাণ ধান্যের উৎপাদন বাড়িবে। অথবা ভারতে একমন ধান্যের উৎপাদন বাড়াইতে যে পরিমাণ মৎস্যের উৎপাদন কমাইতে হইবে, বাংলাদেশে একমণ ধান্যের উৎপাদন কমাইলে তদপেক্ষা অধিক পরিমাণ মৎস্যের উৎপাদন বাড়িবে। আর কোন দেশেই কোন বস্তুরই উৎপাদন কমিবে না এই কারণে যে, উভয় বস্তুরই চাহিদার পরিধি (extent of the market) বিস্তৃত অথবা প্রসারিত হইবে, কোনটিই সঙ্কুচিত হইবে না। মোট ফল হইবে এই যে, বাংলাদেশবাসীরা যদি মাছ পূর্ববৎই খান তবে ভাত কিছু বেশী খাইতে পাইবেন। ভারতীয়েরা যদি ভাত পূর্ববৎই খান তবে মাছ কিছু বেশী খাইতে পাইবেন। অথবা উভয়পক্ষই এই উভয় বস্তুই কিছু কিছু বেশী খাইতে পাইবেন।

এক্ষণে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এই আলোচনায় আমরা দুই দেশের অর্থ অর্থাৎ মুদ্রা অথবা টাকা-পয়সা, এবং ইহাদের বিনিময়ের প্রশ্ন স্বেচ্ছাকৃতভাবে এবং সযত্নে পরিহার করিয়াছি। কারণ অর্থশাস্ত্রের অনেক গূঢ় রহস্য বুঝিতে হইলে অনেক সময় 'অর্থচিন্তা'ও বর্জন করিতে হয়। আলোচ্য ক্ষেত্রে দুইটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের স্বতন্ত্র মুদ্রার পরস্পর বিনিময়ের জটিল প্রশ্ন জড়িত। বাংলাদেশীয় টাকার নিকট ভারতীয় টাকার চাহিদা যদি খুব প্রবল হয়, অথচ ইহার প্রতি ভারতীয় টাকার তেমন আকর্ষণ না থাকে, তবে বাংলাদেশীয় টাকা খুব নামমাত্র মূল্যে ভারতীয় টাকার নিকট নিজেকে বিকাইয়া দিতে পারে। আবার বিপরীত অবস্থায় বিপরীত ঘটিতে পারে। অতএব আমরা এইসব অনর্থক জটিলতা পরিহারার্থে 'অর্থম্ অনর্থম্' এই নীতিবাক্যটি স্মরণে রাখিয়া মনে করিব যে বাংলাদেশীয় টাকা বাংলাদেশে আছে, ভারতীয় টাকা ভারতে আছে, ইহাদের কোন মুখ-দেখাদেখি নাই, দেহ-বিনিময় ত দূরের কথা। তবে আমরা অর্থের নেপথ্য-অস্তিত্ব সম্পর্কে সদা সচেতন থাকিব। কেননা দৃশ্য-কাব্যে নেপথ্যের গুরুত্বও আদৌ বিস্মরণীয় নহে। কারণ 'নেপথ্য' শব্দটির যথার্থ অভিধেয়ই হইল "নায়কের (নের) উপযুক্ত স্থান (পথ্য)"। এবং বৈষয়িক জগৎ-ব্যাপারের রঙ্গমঞ্চে অর্থ-ই নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করেন।

সার্দ্ধ-শতাব্দী পূর্ব্বে উদ্ঘাটিত অবাধ আন্তর্জ্জাতিক-বাণিজ্যনীতির দৃঢ় সমর্থক এই তত্ত্বটি সম্পর্কে অনেক আধুনিক অর্থশাস্ত্রী* মন্তব্য করেন যে, তরুণীদের দেহশ্রী প্রতিযোগিতার (beauty contest) মত যদি বিভিন্ন তত্ত্বের মধ্যে শ্রী প্রতিযোগিতা থাকিত তবে যৌক্তিক-অঙ্গ-সৌষ্টবের বিচারে এই তত্ত্ব নিঃসন্দেহে অতি উচ্চস্থানের অধিকারী হইত। আমরাও মনে করিতে পারি যে, এই তত্ত্বের প্রবক্তার যদি কাশীরাম দাসের মহাভারত পড়িবার সুযোগ হইত তবে তিনিও ভণিতা করিয়া বলিতে পারিতেন।

অর্থশাস্ত্র কথা অমৃত সমান।
ডেভিড্ রিকার্ডো কহে শুনে বুদ্ধিমান্॥

কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় রাষ্ট্রনীতির সহিত বুদ্ধির সম্পর্ক ততটা নাই, যতটা আছে স্বজাতির উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা দ্বারা ব্যক্তিগত অথবা দলগত স্বার্থসিদ্ধির প্রয়াসের।

* P. A. Samuelson.

সতী সাবিত্রী

অমল সরকার

দেবনাথনের মেয়ে সাবিত্রী। গ্রামের সবাই তাকে খুব ভালবাসে। সাবিত্রী দেখতে যেমন সুন্দর, স্বভাবেও তেমনি মিষ্টি। সাবিত্রীকে নিয়ে তার মা সুগতার গর্বের শেষ নেই। সুগতা স্বামী দেবনাথনকে একদিন বলে, 'জানো, পার্বতীর মা বলছিল।'

দেবনাথন স্ত্রীর কথায় ঔৎসুক্য প্রকাশ করে জিজ্ঞেস করে', কি বলছিল?'

'বলছিল, সাবিত্রী রাজরাণী হবে।'

স্ত্রীর কথায় দেবনাথন উল্লসিত হয়ে বলে, 'হবেই তো, দেখতে হবে তো কার মেয়ে।' বলে স্ত্রীকে হাত ধরে কাছে টানে।

'ছাড়ো, কি হচ্ছে, কেউ এসে পড়বে।' হাত ছাড়িয়ে নিয়ে সুগতা বলে, 'হ্যাঁ, পার্বতীর মা বলছিল যে পাশের গাঁয়ে মানে পুডুপেট্টার জমিদার কৃষ্ণমূর্তির এক ছেলে আছে, বড় ভাল ছেলে। একবার পার্বতীর মার সঙ্গে আমাদের সাবিত্রী ওঁদের বাড়ী বেড়াতে গিয়েছিল। সাবিত্রীকে ওঁদের খুব পছন্দ হয়েছে। ওঁদের ইচ্ছে যে ওঁদের একমাত্র ছেলে রামনের সঙ্গে সাবিত্রীর বিয়ে হয়।'

দেবনাথন স্ত্রীর কথাগুলো মন দিয়া শুনছিল। বলল, 'বেশ তো, এ উত্তম প্রস্তাব। কিন্তু সাবিত্রী আরও একটু বড় হ'ক। এখন ওর বয়সই বা কি? আচ্ছা, ওর বয়স কত হল?'

সুগতা সুর উঁচিয়ে বলে, 'বলিহারী বাপু, একটি মাত্র মেয়ে, তার বয়সেরও খেয়াল নেই? না ঠিকেদারি করে করে দেখছি তোমার মগজে কিছু নেই।'

'তা যা বলেছ বউ, ঠিকেদারী করতে করতে বাইরের লোকেদের ব্যাপারে এত হিসেব রাখতে হয় যে নিজের মেয়ের বয়সের হিসেব প্রায় ভুলেই গিয়েছি।'

সুগতা স্বামীর কথায় গম্ভীর হয়ে উত্তর দেয় 'হ্যাঁ, তাই তো দেখছি।'

দেবনাথন বুঝতে পারে যে স্ত্রীর অভিমান হয়েছে, একটু হেসে বলে, 'সত্যি, আমি একেবারে অমানুষ হয়ে গেছি।'

দেবনাথনের কথায় সুগতার অভিমান ভেঙে যায়, বলে, 'এই তো আসছে আষাঢ়ে পনেরো পেরিয়ে ষোলয় পড়বে।'

'মাত্র পনেরো, না বউ, আরও কিছু বড় হতে দাও।'

'কেন, তোমার সঙ্গে যখন আমার বিয়ে হয়েছিল তখন আমার বয়স কত ছিল? এই নয় কিংবা দশ।'

'আরে সে আমাদের সময়ে ছিল, এখন সময় বদলিয়ে গেছে। না, অন্তত বছর কুড়ি হক।'

'কুড়ি বছর? আমাদের দেশে মেয়েরা কুড়ি পেরুলেই বুড়ি হয়ে যায়।'

'তা হতে পারে, কিন্তু আমাদের মেয়ে সাবিত্রী এর ব্যতিক্রম,' বলে দেবনাথন হেসে ওঠে।

আর কথা না বাড়িয়ে সুগতা আস্তে করে বলে, 'বেশ, তোমার যখন ইচ্ছে। আর তোমারই তো মেয়ে। আমি আর কিছু বলব না। কিন্তু অদ্দিন ওদিকে'...

গ্রামের আর এক ঠিকেদার পল্লবন চেট্টি স্ত্রীকে নিয়ে ততক্ষণ দেবনাথনের বাড়ীর মধ্যে ঢুকে পড়েছিল। শেষের কথাগুলো কানে এসে পড়ার পল্লবন জিজ্ঞেস করে, 'অদ্দিন ওদিকে কি বউদি?'

পল্লবন ও পল্লবনের স্ত্রীকে সামনে দেখে সুগতা ও দেবনাথন দুজনেই লজ্জায় পড়ে যায়। আমতা আমতা করে দেবনাথন বলে, 'না ভাই পল্লব, ও কিছু না, এই মেয়েটার বিয়ে নিয়ে কথা হচ্ছিল সুগতার সঙ্গে।'

পল্লবন বলে, 'কার, সাবিত্রী মার? তা কবে হচ্ছে? ওরকম মেয়ে যে নিয়ে যাবে সে অনেক ভাগ্যবান্ দেবনাথ। আমি বাড়িয়ে বলছি না, সাবিত্রীর মত মেয়ে হয় না। সত্যি, ও গুণে সরস্বতী রূপে লক্ষ্মী।'

পল্লবনের স্ত্রী সায় দিয়ে বলে, 'হ্যাঁ, আমাদের গ্রামে কেন, সমগ্র দেশে সাবিত্রীর মত মেয়ে পাওয়া ভার।' সুগতার দিকে তাকিয়ে বলে, 'তা কোথায় সম্বন্ধ করেছ ভাই?'

সুগতা একটু বিব্রত হয়ে বলে, 'না, সে সব কিছুই হয় নি, পার্বতীর মা বলছিল পাশের গাঁয়ের কৃষ্ণমূর্তি পরিবারের সকলের আমাদের সাবিত্রীকে খুব পছন্দ।'

পল্লবন উৎফুল্ল হয়ে বলে, 'কৃষ্ণমূর্তি, মানে জমিদার কৃষ্ণমূর্তি?'

দেবনাথন আস্তে করে উত্তর দেয় 'হুঁ।'

'আরে সে তো খুব ভাল কথা। ওরা পয়সাওয়ালা লোক। মেয়ে তোমার সুখে থাকতে পারবে। তা ছাড়া শুনেছি ওদের ছেলে রামনেরও স্বভাব-চরিত্র খুব ভাল। নাও নাও, আর দেরী করো না, ওদের দুহাত এক করে দাও।'

দেবনাথন বলে, 'ভাই, সবই ভগবানের ইচ্ছে। তবে ভাবছি মেয়েটা আর একটু বড় হক। এই আর দু' তিন বছর। যতদিন কাছে থাকে, এই আর কি।'

'না তুমি নেহাতই ছেলেমানুষ। মেয়েকে তো পরের ঘরে পাঠাতেই হবে। মায়া যত না বাড়াও ততই ভাল।'

'সব বুঝি ভাই, কিন্তু মন যে মানতে চায় না।'

ইতিমধ্যে সাবিত্রী দৌড়তে দৌড়তে এসে ঘরে ঢোকে। বলে, 'ওমা, রাধাকাকী, পল্লবকাকা, তোমরা কখন এলে?'

পল্লবন উত্তর দেয়, 'এই কিছুক্ষণ মা, তুমি কোথায় ছিলে?

'রান্না করছিলাম।' গম্ভীর হয়ে সাবিত্রী বলে।

পল্লবনের স্ত্রী সাবিত্রীকে জড়িয়ে নিয়ে বলে, 'ওমা, তুমি রান্না করতে পারো -'

সুগতা পল্লবনের স্ত্রীর কথা কেড়ে নিয়ে বলে, 'পারে মানে, ওই তো আজকাল সব রান্না সেরে রাখে, রান্না ঘরে আমাকে ঢুকতেই দেয় না, বলে, মেয়েদের রান্না-বান্না ঘরকন্নার সব কাজ দেখা উচিত।'

পল্লবনের স্ত্রী সুগতাকে বলে, 'না তোমার মেয়ে সাক্ষাৎ লক্ষ্মী, ও নিশ্চয় কোন অভিশপ্তা দেবী, মানবীর রূপে এসেছে।'

সাবিত্রী বলে, 'কি যে বল কাকী, দেবী কখনও মানুষ হতে পারে।'

পল্লবন চুপ করে সব কথা শুনছিল। বলে, 'দেবনাথ, আমারও মনে হয় সাবিত্রী দেবী, আচ্ছা, ওর হাতটা একবার গুনিয়ে নাও না।'

পল্লবনের স্ত্রী বলে, 'হ্যাঁ, আমারও মনে হয় একবার গুনিয়ে নাও ঠাকুরপো। বিয়ের ব্যাপারটাও জানতে পারবে।'

সাবিত্রী বলে, 'না বাপু, আমি কিন্তু হাত-টাত দেখাতে পারব না, ওসবে আমার বিশ্বাস নেই আর ঐ যে বিয়ে না কি বলছ ওটাও কিন্তু আমি করতে-টরতে পারব না।'

পল্লবনের স্ত্রী বলে, 'তাই কি হয় মা, পাগলী মেয়ে। মেয়ে হয়ে জন্মেছিস, বিয়ে যে তোকে করতেই হবে, স্বামীর ঘরে যেতে হবে, সেখানে নতুন সংসার পাততে হবে।'

সাবিত্রী বলে,, 'মা ওসব আমি কিছু পারব না, আমি এ বাড়ী, মা-বাবাকে ছেড়ে কোথাও যেতে পারব না।'

পল্লবনের স্ত্রী হেসে সাবিত্রীকে কাছে টেনে নিয়ে বলে, 'ওরে, এ রকম সব মেয়েরই প্রথম প্রথম মনে হয়। আমারও হয়েছিল, তোর মারও হয়েছিল।'

সুগতার দিকে তাকায়।

সুগতা মুখটা নীচু করে নেয়।

* *

সেদিন ছুটি। দেবনাথ একটা খাতা খুলে হিসেব করছে। সুগতা ভেতর ঘরে বসে মেয়ের চুল বেঁধে

দিচ্ছে। পল্লবন এক জ্যোতিষীকে নিয়ে হাজির হল। দরজার কড়া নাড়তে দেবনাথ দরজা খুলে দিয়ে বলে, আয়ে পল্লব। ভেতরে এস, এস।'

পল্লব জ্যোতিষীকে হাত দিয়ে ইশারা করে, 'চলুন, ভেতরে।' জ্যোতিষীর পরনে গেরুয়া রং-এর একটা আলখাল্লা, মাথায় পাগড়ি, কপালের মাঝখানে লাল রং-এর তিলক, হাতে দু'তিনখানা লম্বা গোছের বই।

পল্লব ঢুকে জ্যোতিষীকে চারপাই-এর ওপর বসতে অনুরোধ করে দেবনাথনকে বলে, 'দেবনাথ, ইনি হচ্ছেন কৌশিক আচার্য। নির্ভুল গণনা করতে পারেন। বাবার মৃত্যু, রতনের বিয়ে, বৈজয়ন্তীর জন্ম সব একেবারে এঁর কথামত হয়েছিল। সাবিত্রীকে একবার দেখিয়ে নাও।

ভেতর ঘরে সুগতা পল্লবনের কথা শুনতে পায়। দরজার আড়াল থেকে আস্তে করে স্বামীকে বলে, 'আমি সাবিত্রীকে এক্ষুণি পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

দেবনাথনের খুব একটা ইচ্ছে না থাকলেও বন্ধুর আগ্রহ এবং স্ত্রীর আশাকে অস্বীকার করতে পারে না। 'বেশ পাঠিয়ে দাও,' ব'লে আচার্যকে জিজ্ঞেস করে, 'আচ্ছা, সাধুবাবা, গণনা কি ঠিক হয়?'

আচার্য পাকা দাড়িতে হাত বুলাতে বুলাতে বলেন, 'কেন, তোমার সন্দেহ আছে নাকি? দেখ, আমাদের জন্ম-মুহূর্ত থেকেই আমাদের ভাগ্য তৈরী হয়ে যায়। গণিতশাস্ত্রের গণনায় যেমন ভুল হতে পারে না তেমনি যদি তুমি গণনার পদ্ধতি জানো, জ্যোতিষ-শাস্ত্রের বেলায়ও ঠিক তাই। গণনায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি আছে, এবং সে পদ্ধতি অনুসরণে গণনা কোনমতেই ভুল হতে পারে না। হস্ত-গণনা বা ভাগ্য-গণনার সঙ্গে আকাশের গ্রহ-নক্ষত্রের নিবিড় সম্বন্ধ, এবং তাদের গতিবিধি যেমন আমরা পৃথিবীতে বসেই নির্দ্ধারিত করতে পারি, ঠিক তেমনি জীবনের উপর তাদের প্রভাবও আমরা নির্ভুল নিরূপণ করতে পারি। তা ছাড়া জন্ম, বিবাহ ও মৃত্যু, এ তিনটের ওপর মানুষের কোন হাত নেই।'

সাবিত্রী প্রথম 'না, না' করলেও শেষ পর্যন্ত মায়ের কথায় জ্যোতিষীর সামনে এসে বসে।

পল্লবন আচার্যকে বলে, 'এই সেই মেয়ে সাধুবাবা। এরই কথা আপনাকে বলছিলাম।'

আচার্য সাবিত্রীকে দেখে প্রথমটা কেমন যেন চমকে উঠলেন। মনের ভাব সংযত করে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার নাম কি, মা?'

'সাবিত্রী।'

'দেখি মা, তোমার হাতখানা দেখি।'

সাবিত্রী ডান হাতখানা বাড়িয়ে দেয়।

আচার্য বলেন, 'না, ডান হাত নয় মা, বাঁ হাতখানা দাও।'

সাবিত্রী ফোঁস করে উঠে বলে, 'কেন ডান হাতে বুঝি ভাগ্য থাকে না, বাঁ হাতেই কেবল ভাগ্য থাকে। ডান হাতেতেও তো অনেক রেখা আছে, আপনারা রেখা দেখে তো ভাগ্য বলেন।'

আচার্য বালিকার ধৃষ্টতায় একটু বিরক্ত হয়ে বলেন, 'কোন্ হাতে ভাগ্য আছে সে বিচার করার ভার আমার, মা। তবে তুমি যখন প্রশ্ন তুলেছ, আমি তোমার প্রশ্নের উত্তর নিশ্চয়ই দেব। তুমি বোধ হয় জানো মা যে মেয়েদের এক নাম বামা। তারা সব সময় পুরুষের বাঁ দিকে থাকে। এই দেখো না, মন্দিরে রাধা-কৃষ্ণ, হর-পার্ব্বতী, বিষ্ণু-লক্ষ্মী বা অন্য কোন দেব-দেবীর বেলায় দেবতা থাকেন ডানদিকে আর তাঁর শক্তিদেবী থাকেন বাঁ দিকে। তাই মেয়েদের ভাগ্য বাঁ হাতে থাকে, আর পুরুষের থাকে ডান হাতে।'

আচার্যের বিশ্লেষণে সাবিত্রী খুব একটা সায় দিল না। বলে, 'ঠিক আছে, বাঁ হাতই দেখুন। আমার কিন্তু এসবে বিশ্বাস নেই।'

পল্লবন বলে, 'ছিঃ মা' ও কথা বলতে নেই।'

সাবিত্রী—'আচ্ছা কাকা, তুমিই বল, আমার ভাগ্যে যা আছে, ধর মৃত্যু আছে—'

দেবনাথন—'পাগলের মত কি আজে-বাজে বকছ, সাবিত্রী, চুপ কর, উনি কি বলেন শোন।'

সাবিত্রী চুপ করে যায়।

আচার্য সাবিত্রীর হাতখানা মিনিট কয়েক দেখেই রেখে দিলেন। চুপ করে চোখ বুঁজে রইলেন। কিছুক্ষণ পর চোখ খুলেও চুপ করে রইলেন। কোন কথা বলছেন না দেখে দেবনাথন জিজ্ঞেস করে, 'বাবা, কিছু বলছেন না যে?'

আচার্য্য সাবিত্রীকে ভেতরে যেতে বললেন। সাবিত্রী চলে গেলে আচার্য্য দেবনাথনকে বলেন, 'দেখ তোমার মেয়ে সুলক্ষণা, বুদ্ধিমতী, কিন্তু......'

'কিন্তু কি? চুপ করে থাকবেন না, বলুন।' দেবনাথন ব্যস্ত হয়ে বলে।

'কিন্তু, ওর উনিশ বছরের সময় বৈধব্য যোগ দেখা যায়।'

'এ্যাঁ, বলছেন কি?' দেবনাথন ও পল্লবন একসঙ্গে বলে ওঠে।

'তবে একটা উপায় আছে। ও যদি প্রতি মাসের শেষ শনিবার পাঁচজন ব্রাহ্মণ ও পাঁচজন চণ্ডালকে ভোজনে সন্তুষ্ট করতে পারে এবং প্রতি শনিবারে শনিদেবের এবং মঙ্গলবারে মঙ্গলদেবের পূজা করতে পারে তাহলে এ বৈধব্য যোগ কেটে যাবে।'

দেবনাথন কোন কথা বলে না।

পল্লবন দেবনাথনের দিকে একবার তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে, 'বাবা, তাহলে মেয়ের বিয়ের কি হবে? এক জায়গা থেকে সম্বন্ধ এসেছে যে।'

আচার্য্য উত্তর দেন, 'কি আবার হবে। বিয়ে দেবে।'

'তবে আপনি যে বললেন মেয়ের বৈধব্য যোগ আছে।'

'আরে দোষ থাকলে দোষ কাটাবার ব্যবস্থাও তো আছে, তা ছাড়া আমি যা বললাম মেয়েটি যদি মেনে চলে তাহলে কোন আশঙ্কাই নেই। মেয়েটিকে কিন্তু বৈধব্য যোগ-টোগের কথা বলো না, অন্যভাবে আমি যা বললাম তাই করিও।'

পল্লবন দেবনাথনের দিকে তাকিয়ে বলে, 'বেশ, আপনি যে ভাবে আদেশ করছেন সেই ভাবেই পালন করা হবে।

'বেশ, আমি তাহলে উঠি। আমায় আবার একবার ষন্মুখমের বাড়ী হয়ে যেতে হবে।' বলে উঠে দাঁড়ালেন আচার্য।

'চলুন, বাবা, আমরা আপনাকে এগিয়ে দি' পল্লবন বলে।

'না, না, তোমাদের ব্যস্ত হতে হবে না। আমি নিজেই যেতে পারব। তোমরা থাক।' আচার্য্য আশীর্ব্বাদ করে বেরিয়ে যান।

আচার্য চলে গেলে পল্লবন দেবনাথনকে বলে, 'দেব, আচার্যের কথা তো শুনলে, এখন কি করবে ঠিক করলে?'

'কি আবার করব। সাবিত্রীর ওখানে বিয়েই হবে, তবে কদিন পর।'

পল্লবন দেবনাথনের কথায় তার দিকে আশ্চর্য্য হয়ে তাকিয়ে থাকে।

দেবনাথন বলে, 'দেখ, আমাদের সমস্ত দেশটা কুসংস্কারে ভরা আর এইজন্য আমরা এখনও এত পিছিয়ে আছি। আমার যদি ক্ষমতা থাকত তাহলে দেখতে, এই সব অন্ধ আচার,সংস্কার ভেঙ্গে চুরমার করে দিতাম।'

এই সময় সুগতা মেয়েকে নিয়ে ঘরে ঢুকতেই দুজনাই প্রসঙ্গটা চাপা দেবার চেষ্টা করে। শেষের কথাগুলো সুগতা শুনে ফেলেছিল, বলে, 'কি ভেঙ্গে চুরমার করে দেবেন উনি, ঠাকুরপো?'

'ও কিছু না বউদি, এমনি আমার ও দেবের মধ্যে শাস্ত্র নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল।'

সুগতা আশ্বস্ত হয়ে বলে, 'ও, আমি ভাবলাম তোমার বন্ধু কি একটা অঘটন ঘটাচ্ছেন। হ্যাঁ, ভাল কথা, সাবিত্রী সম্বন্ধে কি বললেন সাধুবাবা?'

পল্লবন দেবনাথনের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে বলে, 'ভালই বললেন।' সাবিত্রীর দিকে তাকিয়ে বলে, 'বললেন, বিয়ে হবে, যেখানে সম্বন্ধ করেছ সেখানেই।'

সুগতা আনন্দে বলে ওঠে, 'তোমার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক, ঠাকুরপো।'

* * *

বছর খানেক পর এক শুভদিন দেখে জমিদার কৃষ্ণমূর্তির একমাত্র ছেলে রামনের সঙ্গে সাবিত্রীর ধুমধাম করে বিয়ে হয়ে গেল। দুই গ্রামের প্রায় সব লোকই খুব আমোদ আহ্লাদ করল বিয়ের কদিন, কিছুদিন সাবিত্রী-রামনকে নিয়ে আলাপ আলোচনা হল, তারপর যে যার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

সাবিত্রী তার নতুন সংসার সাজিয়ে নিয়েছে। প্রথম প্রথম মা-বাবার জন্যে মন খারাপ লাগত কিন্তু ক্রমে রামন আর তার বাবা-মাকে নিয়েই তার দিন কাটতে লাগল। রামন ছেলেটি ছিল খুব বুদ্ধিমান্, জমিদারি থাকলেও ব্যবসা শুরু করল এবং বেশ দু'পয়সা রোজগার করতে লাগল। ইদানীং ব্যবসার তাগিদেই রামনকে প্রায়ই বাইরে যেতে হত। সাবিত্রীর ভাল লাগে না। একদিন রামনকে বলে, 'দেখ, আমাদের তো কোন অভাব নেই, তবে তুমি এত টাকা টাকা করছ কেন? এত পরিশ্রম তোমার সইবে না, দেখ তো শরীরের কি হাল হয়েছে।'

রামন উত্তর দেয়, 'না, আমি তো ভালই আছি। তা ছাড়া নিজের পরিশ্রমে টাকা রোজগার করা ভাল, লোকে কিছু বলতে পারবে না।'

সাবিত্রী বলে, 'হ্যাঁ, তা ঠিক। তবে অত পরিশ্রম তুমি সইতে পারবে না।'

'কি যে বল, আমি যদি দিনরাতও পরিশ্রম করি তাহলেও কিস্সু হবে না।'

সাবিত্রী রামনের ঠোঁটের উপর হাত রেখে বলে, 'ওভাবে বলতে নেই।'

এই সময় কৃষ্ণমূর্তির বাড়ীতে একটি ছেলে এসে উপস্থিত হল। নাম সূর্যনারায়ণ। কৃষ্ণমূর্তির মামাতো বোনের ছেলে। শহরে থেকে শাস্ত্রাধ্যয়ন করছিল। সম্প্রতি গ্রামে ফিরেছে। ইচ্ছে গ্রামে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য পড়ার একটা স্কুল খুলবে। মামা কৃষ্ণমূর্তি আশ্বাসও দিয়েছেন। সূর্যনারায়ণ ছেলেটি খুব ভাল, বয়সে রামনের চেয়ে দু এক বছরের ছোট। টাকা পয়সার লিপ্সা নেই, জ্ঞান আহরণই নেশা। কয়েকদিনের মধ্যে সাবিত্রীর সঙ্গে বেশ ভাব হয়ে গেল। সাবিত্রীকে দেখে নিজের বউদির মত। সাবিত্রীও তাকে দেখে দেওরের মত। রামন বাইরে গেলে সাবিত্রীর গল্প করার সঙ্গী হয় ঐ সূর্যনারায়ণ। এর মধ্যে রামন কাজে বাইরে গেছে। যেদিন ফিরবার কথা তার দুদিন পরেও রামন বাড়ী ফেরে নি। সবাই চিন্তান্বিত। বাড়ীর দাওয়ায় কৃষ্ণমূর্তি সূর্যনারায়ণ ও সাবিত্রীর সঙ্গে রামনের সম্বন্ধে আলোচনা করছেন। কৃষ্ণমূর্তি জিজ্ঞেস করেন, 'বউমা, রামু ঠিক কবে ফিরবে বলে গেছে, বেশ কদিন হয়ে গেল।'

সাবিত্রী উত্তর দেয়, 'না বাবা, নিশ্চয় করে কিছু বলেন নি, তবে বলেছিলেন দুচারদিনের মধ্যেই ফিরবেন।'

কৃষ্ণ—'তাই তো ভাবছি এমন তো করে না। অসুখ-বিসুখে পড়ে গেল না তো। আবার শুনছি ওদিকে কলেরা লেগেছে।' একটু চিন্তা করে আবার বলেন, 'না, ছেলেটা বড় অবুঝ। ওর কি যে দরকার ব্যবসা করবার। নিজে টাকা রোজগার করবে।'

সূর্য বলে, 'বউদি, এবার দাদা ফিরে এলে আর যেতে দিও না। আর যদি যায় তো তোমাকে যেন সঙ্গে করে নিয়ে যায়।'

সাবিত্রী হেসে বলে, 'আচ্ছা তাই বলব।' কিন্তু কৃষ্ণমূর্তির কথায় মনের ভেতর একটা চাপা আশঙ্কা হয় সাবিত্রীর। আস্তে আস্তে বলে, 'বাবা, কাকেও একবার পাঠালে হত না?'

কৃষ্ণ—'আমিও তো তাই ভাবছি। ভাবছি গোবিন্দকে একবার পাঠাই।'

সূর্য—'হ্যাঁ মামা, তাই পাঠান, আজই পাঠান। বলেন তো আমিও সঙ্গে যাই।

কৃষ্ণ—'না, তোমার যাবার দরকার নেই। ও একাই সামলাতে পারবে। একবার গোবিন্দকে ডাকো তো?'

সেই রাতেই নায়েব গোবিন্দ রাও রামনের খোঁজে বেরিয়ে পড়ল। অনেক খোঁজাখুঁজির পর রামনের খোঁজ পেল বটে কিন্তু একেবারে শেষ অবস্থায়। কলেরার শিকার রামনের তখন শেষ কটা নিশ্বাস নেওয়া বাকী। নায়েব গোবিন্দকে দেখে রামন বলে, 'নায়েব কাকা, কোত্থেকে যে কি হয়ে গেল। আমি তো কোন অপরাধ করি নি তবে ভগবান আমায় এমন শাস্তি দিলেন কেন ?'

গোবিন্দ রামনকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলেন। রামন বলল, 'বড় দেরী করে এলেন। আগে এলে হয়ত বাঁচাতে পারতেন। সাবিত্রীকে দেখতে বলবেন বাবা-মাকে। ওরকম মেয়ে হয় না, নায়েব কাকা।' রামন আর বেশী কথা বলতে পারে না, ক্রমেই স্বর ক্ষীণ হয়ে আসতে লাগল। ডাক্তার যখন এসে পৌঁছল তখন সব শেষ হয়ে গেছে।

গোবিন্দ রাও সেই রাতেই গরুর গাড়ী করে মৃত রামনকে নিয়ে রওনা হলেন। এদিকে সাবিত্রীর চোখে ঘুম নেই, অধীর প্রতীক্ষা করছে স্বামীর প্রত্যাবর্তনের। গরুর গাড়ীর আওয়াজ শুনতেই সবাই ব্যস্ত হয়ে দৌড়িয়ে যায় ফটকের কাছে। গোবিন্দ রাও নতমুখে নিঃশব্দে গাড়ী থেকে নেমে এসে কৃষ্ণমূর্তির সামনে জোরে কেঁদে উঠে বলে, 'হুজুর, ছোটবাবু নেই।'

'এ্যাঁ।' বলে কৃষ্ণমূর্তি বসে পড়েন।

সাবিত্রী নিস্পন্দ নির্বাক্ দাঁড়িয়ে থাকে।

মৃত রামনকে ধরাধরি করে ওর ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়। ঘরে গিয়ে সাবিত্রী স্বামীর দেহের দিকে তাকিয়ে থাকে কয়েক মুহূর্ত, তারপর স্বামীর বুকের ওপর মাথা রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে। তখনও রাত শেষ হয় নি, একদিকে সাবিত্রী কেঁদে চলেছে, আর একদিকে একটা কাক বারবার জানালার কাছে এসে কা...কা...করে ডেকে যেতে লাগল।

রামনের মারা যাবার খবর গ্রামে পৌঁছতেই কৃষ্ণমূর্তির বাড়ীতে পরের দিন ভোর থেকেই গ্রামের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের ভিড় জমতে লাগল। প্রধান ব্রাহ্মণ ওঙ্কারনাথন কৃষ্ণমূর্তিকে ডেকে বলেন, 'কৃষ্ণ, সমাজের বিধি' অনুসারে রামনের স্ত্রীকে যে সহমরণে যেতে হবে।

কৃষ্ণমূর্তি এতক্ষণ ওদিকটা একেবারেই ভাবেন নি, ওঙ্কারনাথনের কথা শুনে চমকে ওঠেন। কৃষ্ণমূর্তি হতবিহ্বল হয়ে কোন উত্তর দিতে পারেন না। ওঙ্কারনাথন বলেন, 'কেন, এতে দ্বিধা করছ কেন। এ তো বিধির বিধান। গত বছর পেরুবলের স্ত্রীকে সতী হতে হয়েছিল, মনে পড়ছে ?'

কৃষ্ণমূর্তি এবারেও কোন উত্তর দেন না। ওঙ্কারনাথন আবার বলেন, 'আরে, এ তো রমনের স্ত্রীর সৌভাগ্য। এমন সৌভাগ্য কজন নারীর হয়, বল।' সঙ্গী ব্রাহ্মণেরা মাথা নেড়ে ওঙ্কারনাথের উক্তির যথার্থতা সম্বন্ধে সায় দিতে লাগল।

ইতিমধ্যে সূর্যনারায়ণ সাবিত্রীর বাবা দেবনাথনকে নিয়ে উপস্থিত হল। সমবেত ব্রাহ্মণদের আলোচনার বিষয়বস্তু জানা না থাকায় সূর্য সরলভাবে বলে, 'ও, আপনারা সবাই এসে গেছেন। আপনারা দ্বিজশ্রেষ্ঠ, আশীর্বাদ করুন আমরা যেন দাদার শেষকৃত্য নির্বিঘ্নে সমাধা করতে পারি।'

ব্রাহ্মণদের মধ্যে একজন বলে উঠে, 'সেইজন্যই তো আমাদের এখানে আসা। তা ছাড়া শেষকৃত্য সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত আমরা তোমাদের সঙ্গে সঙ্গেই থাকব।'

সূর্য বলে, 'অতি উত্তম, আপনারা সত্যই মহান্।'

কৃষ্ণমূর্তি কোন কথা বলছেন না দেখে দেবনাথন জিজ্ঞেস করে, 'বেয়াই, আপনি যে কোন কথা বলছেন না ? শরীর ভাল আছে তো ?'

কৃষ্ণমূর্তি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে গম্ভীর ভাবে বললেন, 'বেয়াই, এঁরা এসেছেন এই জানাতে যে আমাদের সাবিত্রী মাকে···।' বলে একটু কেঁপে উঠলেন।

'সাবিত্রী মাকে-কি। বলুন, চুপ করে থাকবেন না, বলুন।'

কৃষ্ণ—'সাবিত্রী মাকে সহমরণে যেতে হবে।'

'এঁ্যা!' বলে দেবনাথন মাথাটা চেপে ধরে। তার মাথাটা কেমন ঘুরে ওঠে।

সূর্য এবার ব্রাহ্মণদের আগমনের হেতু বুঝতে পারে। সে দেবনাথনের কাছে এগিয়ে এসে মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বলে, ভাই মশায়, আপনি কিছু ভাববেন না। আমি দেখছি।' তারপর ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের সামনে এসে দাঁড়িয়ে বলে,'আপনারা ব্রাহ্মণ ও সমাজের সেরা পণ্ডিত, কিন্তু কি কারণে আপনারা একটি নির্দোষ নিরীহ স্ত্রীলোকের মৃত্যুদণ্ডের বিধান দিচ্ছেন? এ কি শুধু এইজন্যে যে সে স্ত্রীলোক, অবলা, নিজেকে রক্ষা করার শক্তি তার নেই?'

একজন ব্রাহ্মণ সূর্যের কথায় কিঞ্চিৎ বিরক্তি প্রকাশ করে উত্তর দেয়,'না, তুমি নেহাৎ অজ্ঞান, শাস্ত্র সম্বন্ধে, তোমার কোন জ্ঞান নেই তাই অর্বাচীনের মত ঐ কথা বলছ। তুমি জানো না যে এ সংসারে কোন স্ত্রী পতিহীন হয়ে জীবন কাটাতে পারে না, এরকম জীবন কাটাবার তার অধিকার নেই। পতির গতিই সতী স্ত্রীর একমাত্র গতি। এ শাস্ত্রের বিধান।'

সূর্য দীপ্তকণ্ঠে বলে উঠে, 'না, আপনার কথা আমি মানতে পারলাম না। আমি বেদ ও ব্রাহ্মণ পড়েছি, কোথাও এমন বিধানের কোন উল্লেখ নাই। বেদ অথবা সূত্রগ্রন্থের কোন স্থানেই বিধবাদের সহমরণে পাঠানোর কথা বলা হয় নি। বরং এই সব শাস্ত্রগ্রন্থে নিয়োগ-প্রথা দ্বারা এই সব বিধবাদের পুনর্বিবাহ দেওয়া যেতে পারে, এই রকম উক্তিই পাওয়া যায়।'

ওঙ্কারনাথ সূর্যের কথা শুনে গায়ের চাদরটা একটু টেনে নিয়ে বলেন, 'তুমি জানো না তাই মূর্খের মত এই অবান্তর প্রশ্ন তুলেছ। স্মৃতি ও পুরাণে এই মহান্ ব্রত উদ্‌যাপনের বহু দৃষ্টান্ত আছে। যদি মহাভারতের কথা বল তাহলে শোন। পাণ্ডুরাজা তপস্যায় দিন অতিবাহিত করবেন বলে তাঁর দুই স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে গভীর বনের দিকে যাবার প্রস্তুতি করতে লাগলেন। এই সময়ে দৈববাণীতে তিনি এক অভিশাপের কথা শুনলেন। পাণ্ডুরাজার উপর অভিশাপ হল যে তপস্যারত অবস্থায় তিনি যদি কোন দুর্বল মুহূর্তে তাঁর যে কোন একজন স্ত্রীর সঙ্গে সম্ভোগের ইচ্ছা প্রকাশ করেন তাহলেই তাঁকে মৃত্যু বরণ করতে হবে। কনিষ্ঠা স্ত্রী কুন্তী ছিলেন অপরূপ সুন্দরী, গভীর বনে তাকে গ্রহণ করবার বাসনা রাজাকে বারবার পীড়ন করতে থাকে। রাণী তাঁকে অভিশাপের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে এই কাজ থেকে নিরস্ত করবার চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু একদিন নিজেকে সম্বরণ করা রাজার পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠল এবং কনিষ্ঠা স্ত্রীকে গ্রহণ করলেন। ফলে পাণ্ডুরাজার মৃত্যু হয়। এখন প্রশ্ন উঠল তাঁর দুই স্ত্রীর মধ্যে কে সহমরণে যাবে। জ্যেষ্ঠা মাদ্রী প্রথমে এগিয়ে এলেন কিন্তু কনিষ্ঠা এই সুযোগ ছাড়তে রাজী নন। তিনি সমবেত ব্রাহ্মণদের বললেন যে, তাঁর সন্তান-সন্ততির ওপর জ্যেষ্ঠারও সমান অধিকার আছে এবং তিনি সতী হলে জ্যেষ্ঠাই তাদের ভার নিতে পারবেন। কিন্তু ব্রাহ্মণগণ শেষ পর্য্যন্ত রায় দিলেন যে, যেহেতু কনিষ্ঠার সন্তান আছে জ্যেষ্ঠাকেই সতী হতে হবে। সহমরণে যাবার সৌভাগ্যে জ্যেষ্ঠা স্ত্রী মাদ্রী গর্ব অনুভব করলেন, এদিকে কনিষ্ঠা স্ত্রী কুন্তী এই সৌভাগ্যে বঞ্চিত হয়ে যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হলেন।'

সূর্য উত্তর দেয়, 'চমৎকার, এই না হলে আর পণ্ডিতের বিধান। কিন্তু আমার মনে হয় কি জানেন? কুন্তীকে সহমরণে যেতে দেওয়া হয় নি কারণ কে তাহলে তার অনাথ শিশুদের ভার নেবে। আপনারা জোর করে এই নিরীহ স্ত্রীদের পুড়িয়ে মারার বিধান দিতেন কারণ তাদের স্বামীদের সম্পত্তি তাহলে আপনাদেরই মনোনীত বা বাঞ্ছিত প্রার্থীরা পেতে পারবে।'

সূর্যের কথায় ওঙ্কারনাথ ভ্রূকুঞ্চিত করলেন, অন্যান্য ব্রাহ্মণরা সূর্যের দিকে রোষ দৃষ্টিতে তাকাতে লাগলেন।

কথায় কথা বেড়ে চলেছে দেখে কৃষ্ণমূর্তি সূর্যকে বলেন. 'সূর্য, থাক্, কোন লাভ হবে না, দেখছ তো! বউমাকে সহমরণে যেতেই হবে।' দেবনাথন কোন কথা বলে না।

সূর্য তবুও বলে চলে' 'না, এ হতে পারে না। কয়েকজন তথাকথিত ব্রাহ্মণের বিধান অনুসারে বউদিকে জ্যান্ত পুড়িয়া মারা হবে? না, এ আমি কিছুতেই হতে দেব না।'

একজন ব্রাহ্মণ বলে, 'আচ্ছা বাপু, সবাই বিধান মেনে নিচ্ছে, তোমার এত মাথা ব্যথা কেন, শুভকাজে বাধা দিচ্ছ।'

আর একজন বলে, 'হ্যাঁ, এত দেখছি, মার চেয়ে মাসীর দরদ বেশী। বউদির সঙ্গে কি একটু আধটু...।'

সূর্য ব্রাহ্মণের এই অশালীন উক্তিতে ভীষণ রেগে উঠে বলে, 'দেখুন, আপনি অভদ্রের মত, ইতরের মত কথা বলছেন। বউদির সম্বন্ধে এ জাতীয় কিছু বললে আমি আপনাকে...'

'কি করবে, মারবে নাকি?' ব্রাহ্মণটি বলে।

'হ্যাঁ, দরকার হলে...'

কৃষ্ণমূর্তি সূর্যের হাত ধরে বলেন, 'সূর্য, তুমি বৃথা উত্তেজিত হচ্ছ। তর্ক করে, ঝগড়া করে কোন লাভ নেই। এ সমাজের বিধান। আমাদের মানতেই হবে।'

দেবনাথন এতক্ষণ কোন কথা বলে নি, ব্রাহ্মণদের সামনে এগিয়ে এসে বলে, 'আপনারা যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, যাকে বিধান বলছেন, সেটা আমার মতে নিছক কুসংস্কার। তবুও সমাজের বিরুদ্ধে আমাদের কোন শক্তি নেই। তবে সে সতী হবে তারও একটা মতামত নেওয়া প্রয়োজন, অন্ততঃ শাস্ত্রে সে রকমই একটা উক্তি আছে আমার মনে হয়। তার অনিচ্ছায় তাকে সহমরণে কি পাঠানো যায়?'

ব্রাহ্মণরা ওঙ্কারনাথের দিকে তাকিয়ে মুখ চাওয়া চাওয়ি করে। ওঙ্কারনাথন বলেন, 'হ্যাঁ, এ কথাটা আমি একেবারেই ভুলে গিয়েছিলাম। তবে আমার বিশ্বাস এত বড় সৌভাগ্যকে কোন সতী-সাধ্বী স্ত্রীই অস্বীকার করতে পারে না। আচ্ছা, মেয়েটিকে ডাকা হক।'

দেবনাথন বলে, 'না,' তাকে ডাকবার কোন প্রয়োজন নেই। আমিই আমার মেয়েকে এ কথা জিজ্ঞেস করছি। বেয়াই মশাই, সূর্য আপনারা আমার সঙ্গে আসুন।'

ভেতরের ঘরে তখনও সাবিত্রী স্বামীর মৃতদেহের ওপর মাথা রেখে চুপ করে বসে আছে। কেঁদে কেঁদে বোধ হয় ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।

দেবনাথন ঐ অবস্থায় মেয়েকে দেখে নিজেকে ঠিক রাখতে পারে না। চিৎকার করে বলে ওঠে, 'মা সাবিত্রী?'

সাবিত্রী বাবার কথা শুনে মাথা তোলে।

দেবনাথন কিছু বলতে পারে না।

তখন কৃষ্ণমূর্তি বলেন, 'বউমা, তোমার কাছে আমরা একটা অনুমতি নিতে এসেছি।'

সাবিত্রী মুখ তুলে ক্ষীণ স্বরে জিজ্ঞেস করে, 'কিসের অনুমতি বাবা?'

'মা, শাস্ত্রের বিধান অনুসারে স্বামীর মৃত্যু হলে প্রতি স্ত্রীকে সহমরণে যেতে হয়। তাই তোমাকে...'

'আমাকে বুঝি যেতে হবে?'

কেউ কোন কথা বলে না।

সাবিত্রী মুখ তুলে সবার দিকে তাকিয়ে নিয়ে বলে, 'হ্যাঁ, আমি যাব, নিশ্চয় যাব।'

কৃষ্ণমূর্তি বলেন, বউমা, তুমি সত্যিই সতী।'

দেবনাথ কিছু বলতে গিয়ে বলতে পারে না।

সূর্য কোন কথা বলে না।

সাবিত্রীর স্বীকৃতিতে উপস্থিত ব্রাহ্মণপণ্ডিতরা খুশী হলেন। ওঙ্কারনাথ কৃষ্ণমূর্তিকে বলেন, 'এবার তবে আর দেরী করো না। যাত্রার বন্দোবস্ত কর।'

'হ্যাঁ, এই করি প্রভু।' সবাইকে ডাকাডাকি করতে করতে কৃষ্ণমূর্তি ভেতরে চলে গেলেন।

* * * *

সারা গ্রামে সবাইকে জানিয়ে দেওয়া হল যে সাবিত্রী স্বামীর চিতায় সহমরণ বরণ করবে। খবরটা দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে, এবং আশেপাশের বিভিন্ন গ্রাম থেকে লোকেরা কাতারে কাতারে পুড়ুপেট্টা গ্রামে সেই মহান্ দৃশ্য দেখবার জন্যে জড়ো হতে লাগল। সাবিত্রীকে নানারকম অলঙ্কারে ভূষিত করে রাণীর সাজে সাজানো হল। এদিকে মৃত রামনকেও মুখের ভেতর

প্রথা অনুসারে কয়েক খিলি পান দিয়ে যুবরাজের বেশ পরানো হল। মন্দিরাকৃতি একটি বিশেষ শবাধারে রমণের মৃতদেহ এমনভাবে রাখা হল, দূর থেকে মনে হতে লাগল যে মন্দিরের বেদীর ওপর রামন বসে আছে। শবাধারটি লতাপাতা, ফুল, রত্নাদি দিয়ে বেশ করে মুড়ে দেওয়া হল।

কৃষ্ণমূর্তি ওঙ্কারনাথনকে জিজ্ঞেস করেন, 'প্রভু, নিয়ম মত সব পালন করা হয়েছে তো?'

ওঙ্কারনাথন মৃদু হেসে বলেন, 'আমি তোমার নিষ্ঠা দেখে সত্যিই মুগ্ধ হয়েছি, কৃষ্ণ।'

সূর্য পাশে দাঁড়িয়েছিল, ওঙ্কারনাথনের কথাগুলো তাকে বৃশ্চিকের মত দংশন করতে লাগল। ওঙ্কারনাথন বলে, 'কৃষ্ণ, আর কালবিলম্ব নয়। বেলা ক্রমেই বাড়ছে, অনেকটা পথ, মধ্যাহ্নের রোদে সবার কষ্ট হবে, তা ছাড়া কাজ শেষ করে সন্ধ্যার প্রাক্কালে তো ফিরে আসতে হবে।'

'হ্যাঁ, যাই প্রভু, রওনা হবার বন্দোবস্ত করি।'

কৃষ্ণমূর্তির আদেশ পেতেই মন্দিররূপী শবযান চলতে শুরু করল। পিছনে কারুকার্য্য করা এক পাল্কিতে সাবিত্রী স্বামীর অনুগমন করল।

শ্মশান-ঘাট পর্য্যন্ত পথের দুধারে অগণিত মানুষের ভিড়, অধীর আগ্রহে তারা শোভাযাত্রা করে জীবন্ত সাবিত্রী ও মৃত রামনকে সোল্লাসে চিৎকার করতে করতে এগিয়ে নিয়ে চলল। সাবিত্রীর মহান্ ত্যাগে তারা সবাই বিহ্বল। সে আজ তাদের কাছে দেবী, তাই তাকে এক পলক দেখবার জন্য সবাই আকুল।

সাবিত্রীর পাল্কির অনতিদূরেই দেবনাথন তার স্ত্রী সুগতাকে নিয়ে চলেছেন, পাশে পল্লবন। রামনের শবযানের পাশে পাশে চলেছেন কৃষ্ণমূর্তি ও তাঁর স্ত্রী। মাঝখানে রয়েছে সূর্যনারায়ণ ও গোবিন্দ রাও। পুড়ুপেট্টায় এরকম জনসমাগম বহুদিন হয় নি।

দেবনাথন তার স্ত্রীকে বলে, 'সুগতা, আমারই দোষে মেয়েকে আজ সহমরণে যেতে হচ্ছে।'

সুগতা স্বামীর দিকে তাকিয়ে মুখ নীচু করে নেয়, কোন কথা বলে না।

দেবনাথন বলে, 'জানো, পল্লব যে জ্যোতিষীকে নিয়ে সাবিত্রীর হাত গোনাতে এসেছিল, তিনি কয়েকটা কথা বলেছিলেন, তোমাকে সে কথা আমি বলি নি, কারণ আমি তাঁর কথা সেদিন বিশ্বাস করি নি।'

সুগতা এবারেও কোন কথা বলে না, চোখ তুলে শুধু স্বামীর দিকে তাকায়। দেবনাথন আবার বলে, 'হ্যাঁ বউ, সেদিন সাধুবাবা বলেছিলেন যে বিয়ের দুবছরের মধ্যে সাবিত্রীর বৈধব্যযোগ আছে আর সে যোগ কেটে যাবে যদি মেয়ে আমাদের প্রত্যেক মাসের শেষ শনিবারে পাঁচজন ব্রাহ্মণ ও পাঁচজন চণ্ডালকে ভোজন করিয়ে সন্তুষ্ট করে এবং প্রতি শনিবারে শনি দেবের ও প্রতি মঙ্গলবারে মঙ্গলদেবের পুজো করে।

সুগতা চোখের ভাষায় দেবনাথনকে জানায় যে দেবনাথন কি ভীষণ ভুলই না করেছে। পল্লবন দেবনাথনের কথাগুলো শোনে, কিছু বলে না। আর ভিড়ের চিৎকারে সাবিত্রী দেবনাথনের কোন কথাই শুনতে পায় না।

শবাধার নিয়ে শোভাযাত্রা অনেক দূর এগিয়ে এসেছে। সাবিত্রী চুপচাপ বসে আছে পাল্কিতে, মুখে কিন্তু প্রগাঢ় প্রশান্তি। কাল সন্ধ্যা থেকে কিছু খায় নি কিন্তু চেহারায় একটা রক্তিম আভা। সহমরণে যেতে রাজী হবার পর ওঙ্কারনাথন নিজে হাতে বানানো এক গেলাস সরবৎ পাঠিয়ে আশীর্বাদ করেছিলেন। সাবিত্রী ঐ সরবৎটুকুই শুধু খেয়েছিল। যে সব মেয়েরা এই শোভাযাত্রায় যোগ দিয়েছিল তাদের কাছে সাবিত্রী তখন দেবী, অলৌকিক শক্তির অধিকারী। তাদের বিশ্বাস যে এই সময় সাবিত্রী যা বলবে তাই ফলবে। তারা একের পর এক নানান্ প্রশ্ন করতে থাকে সাবিত্রীকে, সাবিত্রীও প্রত্যেককে একটা করে পান পাতা দিতে আরম্ভ করে, সেই পাতা নেবার জন্যে মেয়েদের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে যায়।

শ্মশানের কাছাকাছি শোভাযাত্রা আসতেই মেয়েরা আর এগুতে রাজী হল না, তাদের পক্ষে সাবিত্রীর

চিতায় আরোহণের নিদারুণ দৃশ্য দেখা সহ্যাতীত ছিল, তারা সাবিত্রীকে দেবীজ্ঞানে প্রণাম জানিয়ে একের পর এক বিদায় নিতে লাগল। ধীরে ধীরে শোভাযাত্রা চিতার কাছে এসে পৌঁছল।

এতক্ষণ সাবিত্রীর চোখে মুখে একটা আনন্দের ছাপ ছিল কিন্তু চিতার কাছে পৌঁছতেই সমস্ত আনন্দ কোথায় উড়ে গেল। ঐ সময় সেই সাবিত্রীকে দেখল সে-ই বুঝতে পারল যে সাবিত্রী ভীষণ ভয় পেয়েছে। দেবনাথন ও সুগতা দুজনই মেয়ের অবস্থা অনুভব করলেন, কিন্তু তখন কিছু করতে তাঁরা অক্ষম। তাঁদের মেয়ে সাবিত্রীর ওপর তখন তাঁদের কোন অধিকার নেই, কোন সম্বন্ধ নেই। সূর্যও বুঝল বউদির অসহায় অবস্থা, কিন্তু সমাজের বিধানের কাছে সেও অপারগ।

কিছুক্ষণ এইভাবে থেকে সাবিত্রী ভয়ে মূর্চ্ছা গেল। কিন্তু সমাজের বিধানে তবুও তার নিস্তার নেই। মূর্চ্ছা ভাঙল একটি ব্রাহ্মণ সাবিত্রীর কাছে এসে বলে, 'এ সময় কি ভেঙ্গে পড়লে চলে মা! এরকম পুণ্য কজন করে মা!'

আর একজন বলে, 'আর তো কিছুক্ষণ। তারপর পতির সঙ্গে একেবারে স্বর্গদ্বারে গিয়ে পৌঁছবে, কজনের এমন সৌভাগ্য হয় বল।'

সাবিত্রী নীরবে ব্রাহ্মণদের দিকে তাকিয়ে থাকে, মৌনভাষায় বলে উঠে, 'আমি মরতে চাই না, আমি বাঁচতে চাই, আমাকে তোমরা চিতায় চড়িও না।'

ওঙ্কারনাথন কৃষ্ণমূর্তিকে বলেন, 'এবার মেয়েটিকে পাল্কি থেকে নামিয়ে পাশের ঐ পুকুরটায় স্নান করিয়ে আনবার ব্যবস্থা কর।'

কৃষ্ণমূর্তি সাবিত্রীর পাল্কির কাছে গিয়ে বললেন, বউমা, এবার নামতে হবে যে।'

সাবিত্রী নির্বাক্, বড় বড় চোখ করে কৃষ্ণমূর্তির দিকে তাকিয়ে নামবার চেষ্টা করে। কিন্তু তার সমস্ত শক্তি তখন হারিয়ে গেছে, নামতে গিয়ে পড়ে যায়।

ওঙ্কারনাথন সাবিত্রীর অবস্থা দেখে পাশের এক ব্রাহ্মণকে বলেন, 'হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখছ কি, দেখছ মেয়েটা পারছে না, যাও ওকে নিয়ে পুকুরে ডুব দিয়ে আনো।'

ব্রাহ্মণ গুরুর কথায় উৎসাহ নিয়ে সাবিত্রীকে একরকম টানতে টানতে পুকুরের ধারে নিয়ে আসে। বলে, 'নাও গো, স্নান করে এস।'

'সাবিত্রী ততক্ষন বসে পড়েছে। সে এই অত্যাচার আর সহ্য করতে পারছিল না। ব্রাহ্মণ সাবিত্রীকে একরকম জোর করে কাপড় পরা অবস্থায় পুকুরের মধ্যে টেনে নামিয়ে মাথাটা চেপে ধরে দুটো ডুব দিইয়ে ডাঙ্গায় নিয়ে এল।

পাশেই আর এক ব্রাহ্মণ দাঁড়িয়েছিল। বলে, 'মেয়েটা যেন কি, শুভকাজে বিলম্ব ঘটাচ্ছে।'

চারিদিকের অগণিত মানুষ এই দৃশ্য দেখল, ব্রাহ্মণদের সমাজ বিধানের নির্মম পরিহাস প্রত্যক্ষ করল, কিন্তু কেউ কোন অভিযোগ করল না। সবাই নীরব দর্শক। ব্রাহ্মণেরা চিতার চারিদিক্ ঘিরে দাঁড়িয়ে মন্ত্র উচ্চারণ করে চলেছে নেহাৎই কৃত্রিমভাবে। প্রত্যেক ব্রাহ্মণের এক হাতে ঘিয়ের বাটি, অন্য হাতে প্রদীপ। এবং অন্যান্য যাঁরা দাঁড়িয়ে আছেন তাঁদের হাতে তলোয়ার বা অন্য কোন অস্ত্র। ওঙ্কারনাথন সবাইকে অস্ত্র হাতে দাঁড়িয়ে থাকতে বলেছেন। কারণ অস্ত্রাঘাতের ভয় দেখিয়ে সাবিত্রীকে অতি সহজে চিতায় চড়ানো যাবে অথবা সাবিত্রীকে চিতায় চড়ানোর সময় কেউ যদি বাধা দিতে আসে তাকে নিরস্ত করা যাবে।

মন্ত্র উচ্চারণের পর শেষ হলে ওঙ্কারনাথের ইঙ্গিতে এই দুঃখপূর্ণ নাটকের শেষ দৃশ্য আরম্ভ হল। ব্রাহ্মণরা সাবিত্রীর গা থেকে সমস্ত অলঙ্কার খুলে নিল। সাবিত্রী তখন অচৈতন্য। ওঙ্কারনাথন বলেন 'ও যখন নিজে চিতায় চড়তে অপারগ তখন তোমরাই ওকে চিতার চারিদিকে তিনবার প্রদক্ষিণ করিয়ে চিতায় ওর স্বামীর কাছে চড়িয়ে দাও। সময় নষ্ট করো না।' আকাশের

দিকে তাকিয়ে নিয়ে বললেন, 'আমার আর বেশীক্ষণ থাকা সম্ভব নয়।'

সংকেত পাওয়া মাত্র কয়েকজন ব্রাহ্মণ অচৈতন্য সাবিত্রীকে টেনে হিঁচড়ে কোনরকমে তিনবার চিতা প্রদক্ষিণ করিয়ে রামনের মৃতদেহের ওপর শুইয়ে দিল। ওঙ্কারনাথন ও ব্রাহ্মণের দল শেষবারের মত মন্ত্র উচ্চারণ করলেন, চারিদিক কোলাহলে আকাশ বাতাস ধ্বনিত হয়ে উঠল। ওঙ্কারনাথনের ইঙ্গিত পাওয়া মাত্র ব্রাহ্মণগণ তাদের হাতের বাটি থেকে সব ঘিটুকু চিতার শুকনো কাঠের ওপর ছড়িয়ে দিল এবং অন্য হাতের প্রদীপ নিয়ে কাঠগুলো একের পর এক ছুঁয়ে যেতে লাগল। চিতা দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। সমবেত জনগণ একসঙ্গে সাবিত্রীর নাম ধরে তিনবার চিৎকার করে উঠল। কিন্তু সাবিত্রী কোন সাড়া দিল না। চিতা জ্বলতে লাগল, মৃত স্বামীর দেহের ওপর শুয়ে মূর্চ্ছিতা সাবিত্রীও পুড়ে যেতে লাগল।*

———

* কুঙ্কুম-নির্য্যাস দিয়ে এই সরবৎ তৈরী করা হত। সহমরণে যাবার আগে অসহায় নারীদের বেশ খানিকটা কুঙ্কুম-নির্য্যাস খাইয়ে দেওয়া হত। এই নির্য্যাসের বৈজ্ঞানিক নাম Crocus Sativus এবং এর মাত্রাধিক্য হলে মৃত্যুও পর্য্যন্ত হতে পারে। কুঙ্কুমের এই সরবৎ খাওয়ার পর ঐ সব নারীরা তদানীন্তন পরিস্থিতি একেবারে বুঝতে পারত না, তাদের দেহ-মন নেশায় আচ্ছন্ন থাকত এবং একটা হাল্‌কা আনন্দ অনুভব করত।

* এই সময় বিশ্বাস ছিল যে সহমরণে প্রস্তুত সতী স্ত্রীর হাত থেকে নেওয়া পান পাতার ঐশ্বরীয় ক্ষমতা থাকে।

* উপরিউক্ত কাহিনী দক্ষিণভারতের একটি সত্য ঘটনার ছায়া অবলম্বনে লেখা। ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি তাঞ্জোরের পুড়ুপেট্টা নামক গ্রামে এই ঘটনাটি ঘটে। তখন ভারতের প্রায় সব স্থানেই সতীদাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। অন্ধ সংস্কারের প্ররোচনায় এবং স্বার্থসিদ্ধির প্রকল্পে শত শত জীবন্ত নারীকে এইভাবে পুড়িয়ে মারা হত। অবিভক্ত বাংলাদেশও এই কুপ্রথার কবল থেকে রেহাই পায় নি। কথিত হয় যে, কেবল ১৮১৭ সালেই গঙ্গা উপত্যকার দুইপাশের গ্রামে ৭০৬ জন নারীকে এভাবে প্রাণ হারাতে হয়েছিল। তারপর রাজা রামমোহন প্রমুখ সমাজ সংস্কারকদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় স্যার উইলিয়াম বেন্টিঙ্কের আমলে (১৮২৫-৩৫ খৃঃ) আইন প্রণয়ন করে ভারতীয় দণ্ডবিধি অনুসারে এই প্রথা নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়।

পরীক্ষায় ছাত্রদের আবোল তাবোল

পরিমল গোস্বামী

পরীক্ষা দিতে গিয়ে স্কুল ও কলেজের ছাত্ররা অনেক সময় অজ্ঞতা বশত অথবা সাময়িকভাবে বিভ্রান্ত হয়ে যে সব অদ্ভুত উত্তর খাতায় লিখে আসে তা নানা দিক থেকে কৌতূহলোদ্দীপক। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ভুলে যাওয়া পাঠের ক্ষীণ স্মৃতি থেকে দুঃসাহসিকভাবে কল্পনার সাহায্যে একটা কিছু যা গড়ে তোলে তাতে চতুর বুদ্ধির যে পরিচয় মেলে তাকে প্রশংসা না করে পারা যায় না। আবার অনেক সময় পরীক্ষা কর্মকে অতি পবিত্র একটি জীবন-মরণ সন্ধিক্ষণের নিয়ন্তা জ্ঞানে পরীক্ষার হলে যাবার আগে গুরুজনদের পায়ে এবং আশেপাশে কোনো দেবতা থাকলে সেই দেবতা-দের দরজায় মাথা ঠেকিয়ে ভয়ে ভয়ে গিয়ে পরীক্ষা দিতে বসে। এই জাতীয় পরীক্ষার্থী খুব সহজে স্নায়ু-পীড়িত হয়ে সম্পূর্ণ জানা জিনিস ভুলে যায় এবং লিখতে গিয়ে সব ওলট-পালট করে ফেলে। পরীক্ষাকে একটি অতি সাধারণ ঘটনারূপে এরা দেখে না, এবং এদের অভিভাবকরাই এদের মনে পরীক্ষাকে একটা অতি ভয়ানক ব্যাপার ভাবতে শিখিয়ে দেন। গুরুজন বা দেবতাদের আশীর্বাদ ভিক্ষার মধ্যে একটা ভীরুতা লুকিয়ে থাকে। আর তার ফলে কোনো ছাত্র প্রশ্নপত্র হাতে পেয়ে ছাপা অক্ষর একটিও চোখে দেখতে পায় না, সব শাদা দেখতে থাকে, এবং কাঁপতে কাঁপতে আসন থেকে মাটিতে পড়ে যায়। আমি নিজে এমন ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছি। এ রকম পরীক্ষার্থী নির্বোধ না হয়েও, এবং পাস করার উপযুক্ত বিদ্যা আয়ত্ত করেও পরীক্ষার বসে কিছু লিখতে পারে না। সেজন্য পরীক্ষা যে একটি অতি সাধারণ ঘটনা এ ধারণা স্কুল থেকে এবং বাড়ি থেকে তাদের মনে সঞ্চারিত করে দেওয়া উচিত। অতি আধুনিক কালে অবশ্য পরীক্ষার্থীরা অধিকাংশই পরীক্ষা-ভীতি সম্পূর্ণ দূর করে সোজা বই খুলে টোকা অভ্যাস করে নিয়েছে, তাদের সম্পর্কে আমার কোনো বক্তব্য নেই।

অবশ্য নকল করার প্রথা বহুদিন থেকেই প্রচলিত আছে, কিন্তু পূর্বের প্রথা ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল না। দু'চার জন যারা নকল করত তারা অত্যন্ত সাবধানে এবং ভয়ে ভয়ে করত। সম্প্রতিকালে পরীক্ষার্থীরা নির্ভীক, তাদের ভয় এখন সঞ্চারিত হয়েছে ইনভিজিলেটরদের মনে। আগে পরীক্ষার্থীরা ধরা পড়লে অনেকে রাস্-টিকেটেড হত, এখন যারা ধরিয়ে দেয় তাদের প্রাণ নিয়ে টানাটানি ঘটে।

তবে এই পরিণাম বিষয়ে আমি গত ১৯৪৮ সনে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলাম। একটি গল্প লিখেছিলাম প্রবাসীতে ১৩৫৫ সালের কার্তিক সংখ্যায়। গল্পটির নাম 'বাতিল পরীক্ষার কাহিনী'। আমি নিজে ম্যাট্রিক থেকে স্কুল ফাইনাল ও পরে ইনটারমীডিয়েট বাংলার পরীক্ষক ছিলাম (১৯৪০-১৯৬০) মোট ২১ বছর। এরই মধ্যে কোনো এক বছরে (১৯৪৮-এর পূর্বে) পরীক্ষার ফল প্রকাশে খুব বিলম্ব ঘটে। শুনতে পেলাম কোনো এক পরীক্ষা-কেন্দ্রে সবাই নকল করেছে, সেজন্য সে কেন্দ্রের পরীক্ষা বাতিল হওয়াতে এই বিলম্ব।

নকল করা বর্তমান পরীক্ষা-পদ্ধতিতে যে অনিবার্য, তারই কথা ছিল গল্পটিতে। যে পরীক্ষা-কেন্দ্রে পরীক্ষা বাতিল হয়েছিল, সেখানে কি ঘটেছিল তারই একটি কাল্পনিক ছবি এঁকেছিলাম। গল্পটি সংক্ষেপে একটুখানি বলি।

প্রাইভেট পরীক্ষার্থীদের কেন্দ্র। সাধারণ পরীক্ষার্থী-দের অপেক্ষা এদের অনেকেরই বয়স বেশি। নকল করছিল প্রায় সবাই। কিন্তু ভয়ে ভয়ে। ফিসফাস

আলোচনাও শোনা যাচ্ছিল। ইনভিজিলেটর নিরীহ মানুষ তিনি দেখেও দেখছিলেন না এমনি ভাব। তবে তিনি ঘুরে ঘুরে যাদের খুব কাছে আসছিলেন তারা বই লুকিয়ে ফেলছিল। মাত্র একজনকে দেখা গেল বেপরোয়া। সে কাউকে গ্রাহ্য না করে বই খুলে নকল চালিয়ে যেতে লাগল। তখন তাকে ধরতেই হল। তারপর তাকে নিয়ে যাওয়া হল পরীক্ষা-পরিচালক অফিসার-ইন-চার্জের সম্মুখে। সেখানে অন্যান্য সহ-কারীরাও ছিলেন। পরীক্ষার্থীর নাম সমীরণ। তার চেহারায় কিছু ভদ্র ভাব ছিল। পরীক্ষা-পরিচালক তার কৈফিয়ৎ শুনতে ইচ্ছা করলেন সোজা বিতাড়িত না করে।

অনেক কথা বলতে লাগল সে আত্মপক্ষ সমর্থনে। আমি মাঝখান থেকে কিছু উদ্ধৃত করছি—

সমীরণ বলতে লাগল "এভাবে পাস করে কেউ যে সমাজের পক্ষে বিপজ্জনক লোক হয়েছে তার প্রমাণ নেই, পক্ষান্তরে যারা দেশের শত্রু তাদের মধ্যে অনেকেই হয়তো নকল না করে পাস করেছে। সুতরাং দুইয়ের মধ্যে তফাৎ নেই। কিন্তু কিছু শেখার কথা যে বলছেন, তাই যদি এ শিক্ষার উদ্দেশ্য হত তা হলে নোট মুখস্থ করে পাস করা সম্ভব হয় কি করে? বলতে পারেন সে কথা? পারেন না। কিছু শেখানোই যদি আপনাদের উদ্দেশ্য হত তা হলে শিক্ষা-পদ্ধতি, এবং পরীক্ষার পদ্ধতি এরকম থাকত না। না শিখে পাস করায় যদি আপনারা বাধা দিতেন, তা হলে বিশ্ববিদ্যালয় টাকার অভাবে কবে উঠে যেত।"

এরপর সে দীর্ঘ আধ ঘণ্টা ধরে শিক্ষা বিষয়ে বহু জ্ঞানগর্ভ কথা বলতে লাগল সে-সব কথা পুনরুদ্ধৃত করব না, অনেক স্থান দরকার। আর অল্প কয়েকটি কথা উদ্ধৃত করি। সে বলেছিল—

'ধরা যাক কিছু শেখাই উদ্দেশ্য, কিন্তু তবু আজ যে ষাট হাজার পরীক্ষার্থী প্রবেশিকা পরীক্ষা দিচ্ছে তাদের মধ্যে পাস করবে অনুমান চল্লিশ হাজার, এবং তাদের মধ্যেও বেকার হয়ে বসে থাকবে অন্তত কুড়ি হাজার। তারা নানা স্থানে চাকরির চেষ্টা করে বেড়াবে এবং তার ফলে ঐ কুড়ি হাজার ছেলের মধ্যে দু'চারশ ছেলে হয় তো চাকরি পাবে। কিন্তু তার সঙ্গে শিক্ষার কোনো সম্পর্ক থাকবে না। সুতরাং এই যদি অবস্থা তবে কিছু শেখার উপর জোর দিচ্ছেন কেন আপনারা?..."

অফিসার-ইন-চার্জের মনে এসব কথায় ঘোর সন্দেহ জাগছিল প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীর মুখে এই সব কথা শুনে। সমীরণ তা বুঝতে পেরে আরো জোরের সঙ্গে বলতে লাগল, "আমার কথা যে কত সত্য তা আপনার মুখের ভাব দেখে বুঝতে পারছি—আপনি আমাকে সন্দেহ করছেন, অর্থাৎ গৌণভাবে আপনি এই কথাই ভাবছেন যে, প্রবেশিকা পরীক্ষা যে দেবে সে তো মূর্খ, সে আবার এত কথা বলবে কোথেকে।..."

অফিসার ক্রমে সমীরণের উপর সশ্রদ্ধ হয়ে উঠে-ছিলেন। বললেন "তুমি...ইয়ে..আপনি এত জেনে ...অর্থাৎ আপনি নিশ্চয় অন্যের হয়ে পরীক্ষা দিচ্ছেন।"

সমীরণ বলল, "অবশ্যই দিচ্ছি। কারণ আমার ভ্রাতুষ্পুত্র এমনই নির্বোধ যে কোথায় টুকতে হবে তা জানে না, আর আমি এম-এ পাস করেও না টুকে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাস করতে পারব না জেনেই টুকছি। কোথায় টুকতে হবে এম-এ পাস করে এই চতুরতাটি লাভ করেছি, আমার এম-এ পাসের সার্থকতা এইখানে।"

পরবর্তী পরীক্ষার ঘণ্টা বাজল। অফিসার ইন-ভিজিলেটরদের নির্দেশ দিলেন "টুকতে কাউকে বাধা দিও না।" দারোগা বললেন, "আমারও তাই মত। যদি দরকার হয় আমার কনস্টেবল আপনাকে এ কাজে সাহায্য করতে পারে।"...

২৪ বছর আগে প্রবাসীতে কালীকিঙ্কর ঘোষ-দস্তিদারের আঁকা চমৎকার অনেকগুলি চিত্রযোগে এই গল্পটি বেরিয়েছিল। বর্তমান পাঠকের তা পড়া না থাকতে পারে, তাই অনেকটা বলতে হল। অর্থাৎ যে পরীক্ষা-পদ্ধতি চলছিল দেশের প্রয়োজনের দাবির সঙ্গে তার সঙ্গতি ছিল না, তাই ব্যাপক টোকার দিন যে সমাগত সে বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলাম পরীক্ষক বৃত্তির অভিজ্ঞতা থেকে।

প্রথম থেকে আমি অদ্ভুত উত্তর সংগ্রহ করিনি, পরে যে দরকার হতে পারে ততটা খেয়াল হয়নি। শুধু দেখেছি ইংরেজীতে কয়েকখানা "হাউলার" নামক বই। এই সব অদ্ভুত উত্তরকে ওরা হাউলার বলে। তবে কিছু দিন পরে আমিও সংগ্রহ করতে আরম্ভ করি। তার কিছু কিছু নানা কাগজে প্রকাশিতও হয়েছে।

ইংরেজী একখানা বইতে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য হাউলার পেয়েছি। প্রথমে একখানা বইতে চমৎকার একটি পাই। বইখানার নাম 'এ কুকু ইন দি নেস্ট'—বেন ট্র্যাভার্স'এর লেখা। তিনি তাঁর টাইটল পেজে বইয়ের নামের নীচে যে স্কুলবয় হাউলারটি উদ্ধৃত করেছেন তা বইয়ের নামের সঙ্গে বেশ মিলেছে। যথা A cuckoo is a bird which lays other birds' eggs in its own nest। অর্থাৎ কোকিল এমন এক জাতীয় পাখী যে অন্য পাখীর ডিম নিজের বাসায় পাড়ে। একজন Papal Bull মানে লিখেছে পোপের গোরু—যে গোরু পোপের সন্তানদের দুধ দেয়। বিবেকের স্বাধীনতা মানে অন্যায় ক'রে পরে অনুতাপের স্বাধীনতা, A widower is the husband of a widow! কিংবা George Washington was a remarkable person because he was an American and told the truth,—এর ঠিক বাংলা হয় না। আরো কয়েকটি ইংরেজী হাউলারের নমুনা দিচ্ছি।—টম সয়ারের চরিত্র বর্ণনায় একজন লিখেছিল His character was always good sometimes।

অন্যান্য নমুনা:

১. A relative pronoun is a family pronoun—such as mother brother sister aunt.

২. Degree of comparison of BAD:—Bad, very bad, dead.

৩. Bacon was the man who thought he wrote Shakespeare.

৪. A pessimist is a man who is never happy unless he is miserable; even then he is not pleased.

(Best Howlers, Cecil Hunt, 1928)

এখন দেখছি বিজ্ঞান বিষয়ক মাসিক পত্রেও হাউলার প্রকাশিত হচ্ছে। জনৈক পনের বছরের অভিজ্ঞ এক শিক্ষক বিজ্ঞান বিষয়ক প্রশ্নের উত্তরে ছেলেমেয়েরা যা লিখেছে তার মধ্যে বাছাই করে অনেকগুলি ঐ মাসিকে প্রকাশ করেছেন। আমি কয়েকটি নমুনা দিচ্ছি। একজন লিখেছে, "বিজ্ঞানীরা যখন অণু (মোলিকিউল) ভাঙলেন তখন দেখলেন তা শুধু পরমাণুতে (অ্যাটমে) বোঝাই। যখন পরমাণু ভাঙলেন তখন দেখলেন তা বিস্ফোরণে বোঝাই।" একজন লিখেছে, "জল ও বায়ুর মধ্যকার পার্থক্য এই যে, বায়ুকে ভেজানো যায়, জলকে ভেজানো যায় না।" একজন লিখেছে—"আজকাল অধিকাংশ বইতেই দেখা যায় সূর্যকে একটি তারকা বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু এই তারকা দিনের বেলা সূর্যের রূপ ধরার বিদ্যাটা এখনো ভোলেনি।"

(সায়েন্স ডাইজেস্ট, জুন ১৯১১, লেখক ষ্ট্যানলে ডান)

সরল মনের কল্পনা থেকে এ লেখা খুব ভাল লাগে।

বিদেশী হাউলার হাজার হাজার সংগৃহীত হয়েছে কিন্তু বাংলা ভাষায় আমাদের ছেলেমেয়েদের অদ্ভুত সব উত্তরের কোনো সংগ্রহ নেই। সেই উদ্দেশ্যেই আমার এই সদিচ্ছা।

যখন পূজা সংখ্যা বসুমতীতে আমার একটি হাউলার সংকলন প্রকাশিত হয়, তা পড়ে অনেকের ভাল লেগেছিল। পাঠকদের কাছ থেকেও কিছু কিছু উপহার পেয়েছিলাম। এবং সেগুলিও পরে আর একটি রচনায় ছেপে দিয়েছিলাম।

অধ্যাপক চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য লিখলেন—"এবার ম্যাট্রিকের সায়েন্সে আমারই একটি প্রশ্ন ছিল—Describe the circulation of blood in the human body। একটি ছেলে এর (মানবদেহে রক্ত চলাচলের) উত্তরটা ঠিকই লিখেছে, কিন্তু শেষে লিখেছে, কিন্তু আজ সাম্প্রদায়িক যে অত্যাচার চলেছে তাতে আমাদের রক্ত স্বাভাবিক অপেক্ষা দ্রুত চলেছে, ইচ্ছে হচ্ছে অস্ত্র নিয়ে বেরোই। আমি আর থাকতে পারছি না, আমি একটি কবিতা লিখি। এর পর তিন পাতা কবিতা চলল।

শেষে লিখেছে, কবিতাটি আমি এখানেই রচনা করলুম। কি রকম হয়েছে সার ?"

চারুবাবু অতঃপর আরো কয়েকটি হাউলার এর সঙ্গে পাঠিয়েছিলেন, তা থেকে কয়েকটি আমি বেছে নিয়েছিলাম, যথা—

বাতেন উদরং পূরয়িত্বা অনুবাদ : Filling the belly with gout।

বাংলা থেকে অনুবাদ : এক শৃগাল এক দ্রাক্ষাস্তবক দেখিয়া—A jackal seeing a heron in grapes (ভেবেছে দ্রাক্ষাস্থ বক)।

রামের সুমতি গল্প বিষয়ে লিখেছে—"রাম অনেকবার সুমতির পরিচয় দিয়েছে। দশরথ যখন তাকে বনে যেতে বলল, সে কোন প্রতিবাদ না করে গেল।"

আমি নিজে ১৯১৫তে ম্যাট্রিকুলেশন্ পাশ করে এক মাস মাত্র রাজসাহী কলেজে পড়েছিলাম। সেইসময় চতুর্থ বার্ষিক ছাত্রদের মধ্যে একজনের সংস্কৃত একটি প্রশ্নের অদ্ভুত উত্তর নিয়ে খুব হাসি ও উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল, দেখেছি।

"ইদং কর্ম্মং সুকরং" এই বাক্যটিতে যে ভুল আছে তা সংশোধন করতে বলা হয়েছিল। সংশোধিত রূপটি হবে ইদং কর্ম্ম সুকরং। অর্থাৎ কর্ম্মং হবে না। কিন্তু পরীক্ষার্থী অনেক চিন্তা করে বুঝতে পারলেন সুকরং (অর্থাৎ বা দুষ্করং নয়) শব্দটি নিশ্চয় সংস্কৃত নয়। সুকর মানে শুয়োর ধরে নিয়ে তিনি লিখেছিলেন ইদং কর্ম্মং বরাহং।

চমকপ্রদ সন্দেহ নেই। তবে চারুবাবুর প্রেরিত দ্রাক্ষাস্তবককে দ্রাক্ষাস্থ বক ভাবা অথবা 'বাতেন'কে বায়ু দ্বারা না ভেবে বাতব্যাধির দ্বারা ভাবার কথায়, মজাস্পষ্টির জন্য বর্তমান প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিউর সম্পাদক অশোক চট্টোপাধ্যায় তাঁর নিজস্ব অনুবাদ-কৌশলের যে নমুনা শুনিয়েছিলেন (১৯.৩ বা ৩৪ সনে) তা মনে পড়ে গেল। তিনি রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি কবিতা বা গানের লাইনের অনুবাদ এইভাবে করেছিলেন :

১। ওগো তুমি কোথা যাও— O cow, where do you go ?

২। তিমির আড়ালে নীরবে দাঁড়ায়ে আছে—Standing silently behind the whale (তিমির = তিমি মাছের)।

৩। মম যৌবন-নিকুঞ্জে গাহে পাখী— Birds are singing my bowerless jow forest (যৌ+বন= যৌ ফরেস্ট।)

(তিমির যদি তিমি মাছের হয় তবে বিখ্যাত) শরৎচন্দ্র পণ্ডিত যিনি দাদাঠাকুর নামে পরিচিত, তিনি যে শিশির ভাদুড়ি সম্পর্কে বলেছিলেন, শিশির নয় বোতলের ভাদুড়ি, সে অর্থটিও এখানে উল্লেখযোগ্য মনে করি, কারণ শিশিরকুমারও এ-কথা শুনে খুব আমোদ অনুভব করেছিলেন।)

আমার সেই হাউলার প্রবন্ধ পাঠাতে সৈয়দ মুজতবা আলি আমাকে লিখলেন— আপনার হাউলার অনবদ্য, আমার একটা উপহার নিন—

নৃপতি বিম্বিসার
নমিয়া বুদ্ধে মাগিয়া লইল
পদ নাক কান তার।

ক্রমশঃ

যোগেশ বাগল ঃ একটি সাহিত্যিক ব্যক্তিত্ব

মিনতি মিত্র

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের চত্বরে যোগেশ চন্দ্র বগল—একটি সুপরিচিত নাম। শ্রী বাগল বিগত যুগের ধারাবাহী। যে যুগে যোগেশচন্দ্র জন্ম গ্রহণ করেছিলেন, সে যুগের একটা বৈশিষ্ট্য ছিল একথা অনস্বীকার্য। যে যুগে একটা জাতির, একটা দেশের নবজাগরণ সূচিত হয়, সে যুগটি জাতির পক্ষে দেশের পক্ষে নিশ্চয়ই অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। সেই অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনাবহুল পরিবেশে যোগেশচন্দ্র দেখবার চোখ নিয়েই জন্মেছিলেন। নিজের জীবনের বিন্দুটিকে কেন্দ্র করে যেখান থেকে তিনি সমগ্র দেশের উত্থানপতনের ঢেউগুলি বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছিলেন।

শ্রী বাগল প্রখ্যাত গবেষক। তাঁর অন্তরে জ্ঞানর্চ্চার স্পৃহা ছিল সহজাত। তাঁর নিজের স্বীকারোক্তি থেকে জানা যায়, গবেষণার প্রেরণাটি তিনি পেয়েছিলেন আচার্য যদুনাথ সরকারের সান্নিধ্য থেকে। তথ্যনিষ্ঠা, ঐতিহাসিক ক্রম-নির্ণয়—এইগুলি ছিল তাঁর রচনার বৈশিষ্ট্য। জাতীয় অধ্যাপক ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর ঐতিহাসিকতার প্রতি নিষ্ঠায় মুগ্ধ হয়ে বলেছেন "শ্রী যোগেশচন্দ্র বাগলের গ্রন্থাবলী জীবনের সর্বক্ষেত্রে বাংলার অগ্রগতির ইতিহাসের চিরন্তন তথ্যের উৎস।"

সপ্তদশ থেকে বিংশ শতাব্দীর এই বহুবিতর্কিত যুগসন্ধিক্ষণটিকে তিনি বেছে নিয়েছিলেন নিজের কর্মক্ষেত্র হিসাবে। এই যুগটি বাংলার ইতিহাসে এখনও পূর্ণ প্রস্ফুটিত হয়নি। তাই এই সময়কার ইতিহাস যেমন রহস্যময় তেমনই বিস্ময়কর। যোগেশচন্দ্র একযোগে যেমন এ যুগের ইতিহাসকার তেমনই নব ভাষ্যকারও বটে। বাংলা এবং ইংরেজীতে তিনি এ যুগের বিভিন্ন এবং বিচিত্র বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি এই দুরূহ ব্রতে আগ্রহী না হলে হয়ত কত মূল্যবান্ সংবাদ চিরদিনের জন্যে লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে যেত। ধূলার আস্তরণ থেকে তিনি সে সমস্ত বহুমূল্য দলিল সংগ্রহ করে তাকে পূর্ণ মূল্য দিয়ে নবজাগরণের যুগটিকে বিবৃত করেন তাঁর রচনায়। বাংলা ও ভারতের কাছে যে যুগটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, সেই যুগের সাহিত্য ও সংস্কৃতি এইভাবে তাঁর হাতে শোচনীয় অবলুপ্তি থেকে রক্ষা পেয়েছে। শুধু তাই নয়, সেই সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাস পূর্ণ মর্যাদায় লিপিবদ্ধ হয়ে বাঙালী জাতি ও বাংলা সাহিত্যের শ্রী এবং সৌন্দর্য নিশ্চিত ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

সে যুগের অগ্রগতির প্রতিটি পদক্ষেপ স্বর্ণাক্ষরে ফুটে উঠেছে তাঁর গবেষণায়। ব্যক্তির প্রতি ছিল তাঁর বিশ্বাস। তাই ব্যক্তি দিয়ে যে সমাজ তৈরী, সেই ব্যক্তিবিশেষের মূল্যায়নকেই তিনি ইতিহাস রচনার যথার্থ উপকরণ মনে করতেন। যুগের হাওয়াকে ধরতে গেলে কোন নৈর্ব্যক্তিক চেতনাকে মূল্য দেওয়ার চেয়ে সজীব ব্যক্তিমানসের বিশ্লেষণ তিনি যথোচিত মনে করেছিলেন। 'মুক্তির সন্ধানে ভারত' বা 'ভারতের নবজাগরণের ইতিবৃত্ত' এবং 'উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা' বই দুখানির সূচীপত্রের দিকে চোখ ফেরালেই এ কথা

বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করা যায়। অনেকেই জানেন 'মুক্তির সন্ধানে ভারত' বইটি যেমন তথ্যসমৃদ্ধ তেমনই সুখপাঠ্য। ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর এদেশের শাসন ভার গ্রহণ, বাঙ্গালীর অন্তর অধিকার আবার অচিরেই তাদের দংষ্ট্রাকরাল মূর্ত্তির প্রকাশ, সে যেন এক বিস্ময়কর কাহিনী। দ্বিতীয় গ্রন্থখানি তৎকালীন সমাজ-সংগঠক প্রসিদ্ধ ব্যক্তিবর্গের জীবনেতিহাস। এই ধরণের আরও একখানি গ্রন্থ অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগে(১৯৫১)প্রকাশিত হয়েছিল, নাম 'বরণীয়'। এতে তদানীন্তন বরেণ্য কবি, বৈজ্ঞানিক, দেশপ্রেমিক প্রভৃতির ব্যক্তিত্বের ইতিহাস বিবৃত হয়েছে। এই প্রকার একদিকে যেমন ব্যক্তির ইতিহাস অপরদিকে তেমনই নব্য কলকাতার সাংস্কৃতিক কেন্দ্র সমূহের ইতিবৃত্তও বর্ণিত হয়েছে আরও কয়েকখানি গ্রন্থে। মানুষ ও তার কীর্তিকে ঠিক পাশাপাশি রেখে এই তিনটি শতকের মানচিত্র রচনার দুরূহ কাজটি সম্পন্ন হয়েছে শ্রীবাগলের প্রচেষ্টায়। 'নবমন্ত্র বা হিন্দুমেলার ইতিবৃত্ত', 'কলকাতায় সংস্কৃতিকেন্দ্র', 'বেথুন সোসাইটি' প্রভৃতি গ্রন্থগুলিতে একদিকে যেমন বাংলায় নব উদ্বোধন, বিদেশী আলোক প্রাপ্ত নবীন সভ্যতার ইতিহাস, অন্যদিকে তেমনই তাঁর দেশপ্রেমের পরিচয় পাওয়া যায়।

অকৃত্রিম দেশপ্রেম বিভিন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রে বিভিন্ন ভাবে সার্থকতা লাভ করে। শ্রী বাগলের ক্ষেত্রে মনে হয় দেশপ্রেম এইভাবে তার পথ করে নিয়েছিল। বঙ্কিম চন্দ্র বলেছিলেন, 'যদি মনে এমন বুঝিতে পারেন যে, লিখিয়া দেশের বা মনুষ্য জাতির কিছু মঙ্গল সাধন করিতে পারেন...তবে অবশ্য লিখিবেন।' জানি না স্বদেশ মন্ত্রের উদ্গাতা বঙ্কিমের এই বাণী তাঁর মনে কোন্ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু তাঁর লেখার বিষয় এবং উদ্দেশ্য বিচার করলে সংশয় থাকে না তাঁর সাহিত্য-ভাবনা স্বদেশ-পূজারই নামান্তর। জাতীয়তা বোধের উন্মেষ, স্বাদেশিকতার ভাব ও ভাবনা, জাতীয় শিক্ষার মান নিরূপণ, সমগ্র ভারতের পটভূমিকায় বাঙ্গালীর জাতীয়তা, বাংলায় নূতন অভ্যুদয়ের কথা, পরিবর্তমান রাজনীতির ক্ষেত্রে বাঙ্গালীর অবস্থা ইত্যাদি প্রসঙ্গ তাঁর নানা রচনায় ছড়িয়ে আছে। উদীয়মান সামাজিক চেতনার সঙ্গে নারী প্রগতি ও মুসলমান সংস্কৃতির কথাও বাদ যায় নি। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র মুক্তির 'সন্ধানে ভারত' গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন, 'কাব্য ও উপন্যাস প্লাবিত বাংলা সাহিত্যের হাটে সামান্য যে কয়জন সাহিত্যিক অপেক্ষাকৃত চিন্তাশীল প্রবন্ধের বেসাতি করেন যোগেশ চন্দ্র তাঁহাদের মধ্যে একজন।'

একদিকে শ্রীবাগলের সাহিত্য প্রীতি-যেমন প্রখর অন্যদিকে সংবাদিকতার ক্ষেত্রেও তাঁর যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। সাহিত্যিক যোগেশ চন্দ্রের আড়ালে সাংবাদিক যোগেশচন্দ্র যেন অনেকটা চাপা পড়ে গেছেন। কিন্তু তিনি নিজেই তাঁর স্মৃতিকথায় (অপ্রকাশিত) সাংবাদিক জীবনের প্রারম্ভ কালটিকে সুন্দর ভাবে বর্ণনা করেছেন। তাঁরই কথায়,

"প্রথম জীবনের কয়েকটি বাঁক ঘুরিয়া এক বিশিষ্ট স্থলে পৌঁছি।

"প্রবাসী' ও 'মডার্ণ রিভিউ'র সম্পাদকীয় বিভাগে স্থিত হই ১৯২৯, ১৪ই জানুয়ারী। আমার সহকর্মীরা সকলেই বয়সে বড় ও জ্ঞানে প্রবীণ। আমি ছাত্রজীবন সবেমাত্র অতিক্রম করিয়াছি। পত্রিকার সম্বন্ধে কোন রূপ অভিজ্ঞতাই আমার ছিল না। তবে 'প্রবাসী'র প্রতি আমার আকর্ষণ কৈশোর হইতেই। 'প্রবাসী'র সঙ্গে যুক্ত হইবার সুযোগ লাভ করিয়া নিজেকে ধন্য মানিলাম। আমি তখন শিক্ষানবিস মাত্র।"

"পত্রিকাদুইখানির সম্পাদক সুবিখ্যাত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। অফিসে তাঁহার সহকারী পাইলাম স্বর্গত ব্রজেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত নীরদচন্দ্র চৌধুরীকে।"

১৯৩৫ সালের ১লা নভেম্বর তিনি 'দেশ'-এর সহকারী সম্পাদকের পদে যোগ দেন। চার বছর এই পত্রিকায় সম্পাদনা করার পর প্রথম তাঁর চোখের ব্যাধি দেখা দেয়। অস্ত্রোপচারের ফলে তিনি অল্পদিনের মধ্যেই সুস্থ হয়ে ওঠেন এবং পুনরায় ১৯৪১ সালের

ফেব্রুয়ারী মাসে 'প্রবাসী' ও 'মডার্ণ রিভিউ'তে যোগদান করেন। পুনরায় দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তিনি এখানে সাংবাদিকতার কাজেই লিপ্ত ছিলেন।

একদিকে গগাঢ় পাণ্ডিত্য, অন্যদিকে সাধারণের জন্যে বুকভরা ভালবাসা থাকা সত্ত্বেও দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতার জন্যে তাঁর সকল কাজে ইস্তফা দিতে হল ১৯৬০ সাল নাগাদ। দৃষ্টিশক্তি দিন দিন ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হতে লাগল। এমন একজন মানুষ যিনি সারা জীবন সমগ্র জাতির জন্য পরিশ্রম করে গেলেন, তাঁর এমন দুর্দিনে একটি মানুষও তাঁকে সান্ত্বনা দিতে পারল না। অন্ধ তমিস্রা তাঁকে গ্রাস করল। তিনি দৃষ্টিশক্তি হারালেন।

জাতিকে তিনি যা দিয়ে গেলেন, অর্থে তার মূল্যায়ন হয় না। তবে অর্থ ছাড়াও দেশবাসীর শ্রদ্ধা তিনি পেয়েছেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৫৮ সালে তাঁকে বিদ্যাসাগর অধ্যাপক পদে বরণ করেন। এখানে তিনি পাচটি বক্তৃতা করেন। ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে পশ্চিমবঙ্গ ও অন্যান্য প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস সঙ্কলনের যে কমিটি গঠিত হয় যোগেশচন্দ্র বাগল তার সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৫৬ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ শ্রী বাগলকে 'রামপ্রাণ গুপ্ত' পুরস্কারে ভূষিত করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যে 'সরোজিনী বসু' স্বর্ণপদক দিয়ে আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি থেকে আরম্ভ করে মোহিতলাল, বসন্ত রঞ্জন রায় প্রভৃতি বহু গুণী ব্যক্তিকে সম্মানিত করেছেন, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গবেষক রূপে যোগেশ চন্দ্রকেও কর্তৃপক্ষ ঐ পুরস্কার দান করেন।

যোগেশবাবুর একান্ত গুণগ্রাহী বঙ্গভাষাবিদ্ শ্রীযুক্ত সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের কথায় যোগেশচন্দ্রের স্মৃতিকথার সমাপ্তি টানি। 'কলিকাতার সংস্কৃতি কেন্দ্র' গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি বলেছেন, "......(যোগেশবাবু) দীর্ঘকাল ধরিয়া নিজ নির্বাচিত ক্ষেত্রে নীরব সাধনা করিয়া আসিতেছেন। এবং আমাদিগের সমক্ষে যে সমস্ত গ্রন্থ ও প্রবন্ধ উপস্থাপিত করিয়া দিয়াছেন, তজ্জন্য বাঙ্গালী সমাজ তাঁহাকে আত্মজ্ঞান লাভের পথে কল্যাণ মিত্র বলিয়া চিরকাল সাধুবাদ দিবে।"

যোগেশচন্দ্র বাগলের লোকান্তর গমনে, সুনীতি বাবুর এই কথাটি আজ সুধী বাঙ্গালী মাত্রেই মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে পারবেন।

সিকি শতাব্দীর স্বাধীনতার পাতায় মাহেন্দ্রক্ষণে

জ্যোতির্ময়ী দেবী

১৯৭২ খৃষ্টাব্দ। স্বাধীন ভারতের সিকি শতাব্দীর জয়ন্তী উৎসব। এবং এই উৎসবের বছরে সবচেয়ে আশ্চর্য্য সমাবেশও এক নিগূঢ় ইঙ্গিতময় ঘটনার যোগাযোগ হয়েছে তিনটি ঐতিহাসিক বিশেষ বিশেষ ঘটনার অকল্পনীয় সমাবেশে।

প্রথমটি হল এই বছরের যুগপথিক ভারতপথিক রাজা রামমোহন রায়ের দ্বিশতবার্ষিকী জন্মবর্ষ স্মরণ।

দ্বিতীয়, জাতীয় সঙ্গীতমন্ত্র 'বন্দেমাতরম্' স্রষ্টা 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকারও শতবার্ষিকী স্মরণ।

তৃতীয় হল সঙ্গে সঙ্গে প্রথম মহাবিপ্লবী মহা দেশপ্রেমিক "স্বদেশ আত্মার বাণীমূর্ত্তি" ধ্যানমূর্তি—মহা যোগী শ্রীঅরবিন্দেরও শতবার্ষিকী জন্মোৎসব।

তিনটিরই বিশেষত্ব জাতিপ্রেম—দেশপ্রেম - মূঢ়তাহীন ভ:বৎ প্রেম। পঁচিশ বছরের স্বাধীনতা উৎসবে এক মহা ইঙ্গিতময় ঘটনা। দ্বিশত এবং দুটী শত বছরের এমন সমাবেশ কোনোদেশের স্বাধীনতার ইতিহাসে এমন ভাবে আছে বা হয়েছিল কি না আমার জানা নেই।

মনে পড়ে যায় ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে বাদশা ঔরঙ্গজেবের লোকান্তর। মোগল সাম্রাজ্য প্রায় খান খান। বাদশার পর বাদশা বদল।

ইউরোপীয় বণিক্ ব্যবসায়ী পর্যটকদের তার আগে থেকেই ভারতে আসা শুরু হয়ে গিয়েছিল। পর্তুগীজ দিনেমার ওলন্দাজ ফরাসী জাতির।—সবার পিছনে ইংরেজ।

রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "পশ্চিম আজি খুলিয়াছে দ্বার"। কিন্তু ওরা অস্থরা নয়, ইংরেজই—ইউরোপীয় সভ্যতা শিক্ষার একটা দুয়ার খুলে দিয়েছিল মোগল-পাঠান-ভীত পরাধীন অসাড়চিত্ত মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষে।

রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেই আবার দেখি, "সেই সময়েই ইংরাজ আসিবার প্রয়োজন ছিল। যখন আমরা গৌরব হারাইয়া পোঁটলা-পুঁটলী লইয়া ঘরের কোণে ভীতচিত্তে বসিয়া আছি, তখনই ইংরাজ আসিবার প্রয়োজন ছিল। সে বাহির হইতে হুড়মুড় করিয়া ঘাড়ের ওপর আসিয়া পড়িল। এই উৎপাত দরকার ছিল।—আমরা আবিষ্কার করিলাম কি আশ্চর্য্য শক্তি আমাদের মধ্যে ছিল আর কি অশক্তই না হইয়া পড়িয়াছি।"

তখনো আঠারো শতক চলছে, ইংরেজ ভারত অধিকার করতে শুরু করেছে। শ্রীঅরবিন্দের ভাষায় "ওরা এসেছিল বাণিজ্য করতে। পেয়ে গিয়েছিল অনায়াসে একটা বিশাল সাম্রাজ্য। এবং তখনো ভারত মধ্যযুগের আচার-সংস্কারের লেপ মুড়ি দিয়ে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে আছে।"

[illegible] ভারতে যথেচ্ছ বহুবিবাহ। রাজস্থানে শিশু-কন্যা হত্যা। সারা ভারতে উচ্চবর্ণের মধ্যে সতী সহমরণ প্রথা।

শুনি যোধপুরের রাজা অভয়সিংহের চিতায় তাঁর আশীজন রাণী একত্রে সহমৃতা হয়েছিলেন। বাংলার বিধবাদের সহমরণ আর বৈধব্যের আচারের কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন একসঙ্গেই প্রচলিত ছিল। সমাজের প্রথা ইচ্ছা আদেশ ইঙ্গিত অনুসারে। শিক্ষা মাত্র উচ্চবর্ণে সীমাবদ্ধ।

সব মিলিয়ে শিশুকন্যা হত্যা, সহমরণ, বৈধব্যের কৃচ্ছ্রতা বাল্যবিবাহ, বালবৈধব্য, সবসুদ্ধ সমাজ ও পুরুষ যেমন নারীকে সম্পত্তির মত রেখেছিল, নিজেদেরও তেমনি অধোগামী করে রেখেছিল। আর অশিক্ষা ও মূঢ় আচারে সমাজ নিমজ্জিত।

সেই সময় ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে এক মহামানবের জন্ম হল—রাজা রামমোহন রায়। যিনি দেশের দুর্গত বর্বর অনাচারময় অবস্থা, ধর্ম্মের আচার মূঢ় গ্লানি, সমাজের দিকে দিকে মূঢ় আচারের লোকাচারের অত্যাচার দেখতে পেয়েছিলেন। এবং শুধু দেখা নয়, প্রতিবাদ করেছিলেন কিশোর বয়স থেকেই। যার ফল গৃহচ্যুত হওয়া।

তার আগে কি কেউ দেখেননি? দেখেছেন বইকি। ভেবেছেনও হয়ত। কিন্তু বলিষ্ঠভাবে প্রতিবাদ করেন নি। সেই গ্লানি কলুষ মোচনের চেষ্টাও করেননি। নিজেদের চরিত্র ও দুর্বলের জীবন হত্যা একত্রেই চলেছিল।

তারপর বঙ্গদর্শন শতবর্ষ। দেশের—এই বাংলা দেশেরই সাহিত্যে চিন্তায় কল্পনায় আবির্ভূত হল দেশ-প্রেম, জাতিপ্রেম, পরাধীনতার গ্লানিবোধ, সঙ্গে সঙ্গে প্রতীচ্য সাহিত্যের স্পর্শে প্রেরণায় আমাদের এই নতুন এই কালের বঙ্গদর্শনের বুকে এল এক মহা সাহিত্য-জগৎ। তার কথাও সেই রবীন্দ্রনাথের "বঙ্কিমচন্দ্রেই" পাওয়া যাবে। "পূর্বে কি ছিল এবং পরে কি পাইলাম ......। কোথায় গেল সেই অন্ধকার—বালক-ভুলানো কথা। বিজয়বসন্ত গোলে বকাবলী—। 'বঙ্গদর্শন' যেন তখন আষাঢ়ের প্রথম বর্ষার মত আবির্ভূত হইল। মুষলধারে ভাবর্ষণে বঙ্গসাহিত্যের পূর্ববাহিনী পশ্চিমবাহিনী সমস্ত নদী নির্ঝরিণী অকস্মাৎ পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া যৌবনের আনন্দে বেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল। ......বঙ্গসাহিত্য প্রতিদিন গৌরবে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল......।

"বঙ্গদর্শনের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বঙ্গসাহিত্যের মধ্যে যে উচ্চনীচতা অপরিমিত ......।"

বঙ্কিমচন্দ্র ও বঙ্গদর্শনের আবির্ভাবকে দেশের মানুষের চিত্ত কি ভাবে বরণ করে নিয়েছিল সকলের বা সাধারণের সে ভাবপ্রকাশ করার ক্ষমতা কোথায়, সেই শ্রদ্ধা প্রীতিই বা কোথায় কার ছিল। বলবার মত ভাষাই বা রবীন্দ্রনাথের মত ভাষা ভাব সম্পদই বা কার আছে বা ছিল।

এই সেই সেদিনের শতবর্ষ আগের 'বঙ্গদর্শন' প্রশস্তি। তখনো যিনি মহাকবি হননি, কিন্তু মহা সাহিত্যস্রষ্টার হাতেই ভবিষ্যৎ স্রষ্টা ইঙ্গিতময় বরমাল্য পেয়েছিলেন। সেই তরুণ কবি রবীন্দ্রনাথের বঙ্কিম ও ও তাঁর 'বঙ্গদর্শন' মূর্তি প্রতিমাকে অঞ্জলি দান।

এরপর শুদ্ধ বাংলা নিজেকে নিয়ে নিজের সংগঠন কাজ ভাবনা আশা নিরাশা দুরাশায় অভিভূত আচ্ছন্ন ও ব্যাপৃত হয়ে চলেছে।

কংগ্রেসের জন্ম আগেই হয়েছে (১৮৮৫ খৃঃ)। দেশনেতারা বিক্ষিপ্ত আদর্শে ও চিন্তায় অভিভূত। সমাজ-নেতারাও নানা কর্ম সমাজসেবা সাহিত্যের পথ খুঁজে বেড়াচ্ছেন।

বিবেকানন্দের আবির্ভাব ও তিরোভাব হয়ে গেছে। সহসা একসময়ে বিলাতফেরৎ বিদেশী শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে পরিপুষ্ট লালিত 'একৃরয়েড' অরবিন্দ ঘোষের আবির্ভাব হল স্বদেশে—ভারতে। জন্ম ১৮৭২ খৃঃ। যার ঠিক শতবর্ষ আগে জন্ম হয় মহাত্মা রামমোহনের—১৭৭২ খৃষ্টাব্দে।

১৯০৮ সালের মে মাস।

সমস্ত দেশ সচকিত হয়ে উঠল মাণিকতলার বাগানে বিপ্লবী বারীন্দ্র উপেন্দ্র উল্লাসকর দলের গ্রেপ্তারে। এবং গ্রে ষ্ট্রীটের বাড়ীতে শ্রীঅরবিন্দের গ্রেপ্তারে।

আমরা সভয়ে উৎকণ্ঠায় প্রবাসের বাড়ীতে বসে কাগজে সব পড়লাম। পড়লাম অরবিন্দ-ভগিনী সরোজিনী দেবীর আবেদনপত্র দেশবাসীকে—সাহায্যের জন্য।

পড়লাম একবছরের বেশীদিন ধরে তাঁদের সকলের বিচার-কাহিনী। শ্রীঅরবিন্দের বিচার। অরবিন্দের শরণাগতি। চাদর মুড়ি দিয়ে নির্লিপ্তভাবে যোগধ্যানের পূর্বসাধনা। ব্রাহ্মসমাজের রক্ষণশীল ব্রাহ্ম রাজনারায়ণ বসুর দৌহিত্র—প্রায় সাহেব-'ব্রিটিশবন্ধু' সন্তান লাভেচ্ছু আকাঙ্ক্ষিত বারীন্দ্র ঘোষদের পিতা কৃষ্ণধন ঘোষের পুত্র,—সেই সেকালের ব্রাহ্ম অরবিন্দের শ্রীকৃষ্ণের নূপুরধ্বনি শ্রবণ, দর্শন, মুক্তির আশ্বাসলাভ। ('কারা-কাহিনী'—শ্রীঅরবিন্দ) ('সুপ্রভাত' পত্রিকায় প্রকাশিত কুমুদিনী মিত্রবসুর) দেশের অসংখ্য নরনারীর সঙ্গে আমরাও পাটনায় বসে পড়লাম।

এবং পড়লাম (দেশবন্ধু) চিত্তরঞ্জনের সওয়াল জবাব। সেই ঐতিহাসিক সওয়াল জবাব, স্বাধীনতার কামনা মানুষের দোষের কথা কি না।

বিদেশী বিচারপতির কাছে নির্ভীক প্রশ্ন এবং সেই বিদেশী স্বাধীন দেশের মানুষ বিস্ময়কর তাঁর ঐ প্রশ্নের প্রত্যক্ষ উত্তর দান যেন, অরবিন্দের মুক্তিলাভ।

সঙ্গে সঙ্গে ব্যাকুলচিত্তে শুনলাম—পড়লাম বারীন্দ্রদের বড় বড় ক'জনের ফাঁসীর হুকুম।

এবং সে ফাঁসীর হুকুম অপ্রত্যাশিত ভাবে বন্ধ হওয়া।

এই তিনটি ইঙ্গিতবহ একটি দ্বিশতবার্ষিকী শতবার্ষিকী দুটী পাশে নিয়ে আমাদের পাঁচশ বছর বয়সের স্বাধীনতা দিনটি চিহ্নিত হয়ে এসেছে। তাঁদের সকলকে প্রণাম দেশবাসীর।

বন্দেমাতরম্।

মনীষী বসন্তরঞ্জন

ভাগবতদাস বরাট

শৈশবে বসন্তরঞ্জন বিদ্বদ্বল্লভের নাম শুনিনি। পরে শুনেছি। বাঁকুড়ার জ্ঞানীগুণী মনীষীদের নামের তালিকায় ওঁর নাম দেখেছি। এবং তিনি যে তখনও জীবিত তা শুনেছি। কিন্তু তাঁর প্রসিদ্ধি বা প্রখ্যাতির বিষয় কিছুই জানতাম না। এমনকি তখনও তাঁকে দেখি নি, যদিও দেখার ইচ্ছা অত্যুগ্র ছিল।

তারপর বহুদিন কেটে গেল। কয়েক মাস ও বৎসরের অতিক্রমণ। আমার টবে রাখা সখের গোলাপ চারা বড়সড় হয়ে ফুল ফুটতে শুরু করল। স্বরচিত কয়েকটা কবিতা হেথাহোথা নানা কাগজে ছাপা হল। তখন তাঁর দেখা পেলাম। তরী যেমন ভাসতে ভাসতে হঠাৎ কোন বন্দরে পৌঁছে, তেমনি আমিও বয়সের ধাপে ধাপে পা ফেলে উঠতে উঠতে একদা এক সান্ধ্য সম্মেলনে বসন্তরঞ্জনের সম্মুখীন হলাম। দূরের মানুষকে কাছে দেখলাম। মাত্র কয়েক গজের তফাৎ। আর একটু এগিয়ে গেলাম। কিন্তু কাছে গিয়েও দূরেই রয়ে গেলাম। তার কারণ, তিনি বিশাল বারিধি, আর আমি তীরস্থিত সামান্য একটি ঝিনুকমাত্র। এবং বয়সের দিক থেকেও যথেষ্ট তারতম্য। সুতরাং কথা বলে সখ্যতা স্থাপনের সাহস হয়নি।

ছাত্রজীবনের কথা। আমি তখন স্কুলের ছাত্র। সাহিত্য বিষয়ে কোথাও কোন আলোচনা বা সম্মেলনের সংবাদ পেলেই ছুটে যেতাম। আহ্বান বা আমন্ত্রণের প্রত্যাশী ছিলাম না। মধুকর যেমন ফুলের সুবাসে অস্থির হয়ে ছুটে যায়, আমিও তেমনি ছুটে গেছি। কিন্তু মধুর স্বাদ পাইনি। তবু কেন যে যেতাম তা বলতে পারি না। হয়ত মনের নেশা। আর তৎকালে ঐ নেশা খুব জোরালো ছিল বলেই মনীষী বসন্তরঞ্জনের দর্শন পেয়েছিলাম। ওঁর কিছু কথাও শুনেছিলাম।

১৯৩৭-৩৮ সালের কথা। বাঁকুড়া কলেজে সাহিত্য পরিষদের এক সাহিত্য সম্মেলনে বসন্তরঞ্জন উপস্থিত ছিলেন। সেই সভায় আচার্য্য যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি প্রমুখ বাঁকুড়ার বিশিষ্ট জ্ঞানী মনীষীর সমাবেশ হয়েছিল। বহুদিন আগের কথা। যখন আমার মন ছিল কাঁচা ফলের মত অপরিপক্ব। সুতরাং কি উদ্দেশ্যে যে সভার আহ্বান এবং সেই সম্মেলনে যে কি বিষয়ে আলোচনা হয়েছিল তা এখন মনে নেই। শুধু মনে আছে সাহিত্যের ডেফিনিশন্ সেদিন নানাজনের নানা উক্তির মধ্যে ঘোষিত হয়েছিল। বসন্তরঞ্জন বলেছিলেন, "সাহিত্য সেবা তাঁরই সার্থক হবে যিনি পাঠককে জ্ঞান দানে কিছুটা সক্ষম হবেন। আমাদের পূর্ব্বসূরীদের লেখা বই বা পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ সাহিত্য সেবার অঙ্গস্বরূপ। শুধু সংগ্রহ করেই নিশ্চেষ্ট হওয়া চলবে না, সেইসব রচনাবলীর পাঠেরও প্রয়োজন আছে। এবং পাঠককে লেখকের ভাবধারার সঙ্গে মিশে সেই ভাবে ভাবিত হতে হবে। শুধু লেখক নয়, - পাঠকও সাহিত্যসেবী।"

বাঁকুড়া শহর থেকে বেশ কয়েক মাইল দূরে বেলিয়াতোড় গ্রামে রায় পরিবারে ১২৭২ বঙ্গাব্দে বসন্তরঞ্জন জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম রামনারায়ণ রায়। শৈশব তাঁর ঐ বেলিয়াতোড় গ্রামেই কাটে। তারপর পুরুলিয়া চলে যান এবং পুরুলিয়া জেলা স্কুলে ভর্ত্তি হন। কিন্তু বিদ্যালয়ের শিক্ষা তাঁর শেষ হয়নি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন ডিগ্রীও তাঁর ছিল না। কিন্তু সুদৃঢ় মনীষা ও অধ্যবসায় ওঁকে সম্মানের উচ্চ শিখরে তুলে ধরেছিল।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা ও

সাহিত্যের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শিক্ষার ব্যবস্থা হয়। কিন্তু তৎকালে প্রাচীন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব বোধ হওয়ায় তিনি বেশ চিন্তিত হয়ে পড়েন। সেই সময় তিনি রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর কাছ থেকে বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয়ের খোঁজ পান এবং তাঁর পাণ্ডিত্য ও অধ্যবসায়ে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে সেই সময় প্রাচীন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক নিযুক্ত করেন। সেই থেকে ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে পর্য্যন্ত বিদ্বদ্বল্লভ ঐ পদে সমাসীন ছিলেন এবং সুনাম ও দক্ষতার সঙ্গে কর্ম-সম্পাদন করেছিলেন।

বসন্তরঞ্জন অনুসন্ধিৎসু মন নিয়েই জন্মগ্রহণ করে-ছিলেন। শৈশব থেকে তাঁর খুঁটিনাটি সকল বিষয়ে অত্যুগ্র আগ্রহ ছিল। পুরাতন কোন দ্রব্য, যেমন, পুরাতন মুদ্রা, চিঠি অথবা ডাক টিকিট ইত্যাদি যা হাতের কাছে পেতেন তাই সযত্নে সংগ্রহ করতেন। পরবর্তীকালে তাঁর এই সংগ্রহানুরাগ অভ্যাস দেশ ও দশের কাজে নিয়োজিত হয়েছিল।

আজকাল যেমন কোথাও যাওয়া আসা করতে গেলে যান-বাহনের অভাব নেই, পূর্বে তা ছিল না। তখন পদব্রজে কিম্বা গো-যান ছাড়া যাতায়াতের অন্য কোন ব্যবস্থা ছিল না। এবং তা বেশ কষ্টকর ছিল। বেলিয়া-তোড়ে বসবাস কালে বসন্তরঞ্জন বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহে আগ্রহী হন এবং তাতেই তিনি মেতে উঠেন। তিনি বাঁকুড়া জেলার বিভিন্ন পল্লীতে ঘোরা-ঘুরি করে পুঁথি সংগ্রহ সুরু করেন। যেখানেই তিনি প্রাচীন পুঁথির সন্ধান পেয়েছেন, সেখানেই ছুটে গেছেন। পদব্রজে এবং গো-যানে অত্যন্ত কষ্ট স্বীকার করে দূর থেকে দূরতম স্থান পরিভ্রমণ করে বহু পুঁথি সংগ্রহ করেন। তাঁর অদম্য আগ্রহে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থান থেকে প্রায় ১২০০ পুঁথি সংগৃহীত হয়েছিল। শুধু পুঁথি সংগ্রহ করেই তিনি ক্ষান্ত হতেন না। সংগৃহীত পুঁথির পাঠোদ্ধার করে তা নবরূপে প্রকাশ করতেন। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। এবং ভাষাতত্ত্বের আলোচনায়ও সুনিপুণ ছিলেন। ভগ্ন-প্রায় মাটির মূর্ত্তি যেমন দক্ষ মৃৎশিল্পীর হাতের ছোঁয়ায় নবজীবন লাভ করে তেমনি পোকা ও উই-এ কাটা জীর্ণ গ্রন্থরাজীও তাঁর সম্পাদনায় নবরূপে বিকশিত হয়েছে। তিনি ভাষাকুশলী ও জ্ঞানীগুণী ছিলেন বলেই তা সম্ভব হয়েছিল।

কথায় কথায় অন্য কথা মনে পড়ল। বসন্তরঞ্জন শৈশবে অপরের দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে পারতেন না। এ-বিষয়ে সে পরিচয় শুনেছিলাম আমাদের মাষ্টারমশায় পঞ্চানন নিয়োগীর কাছ থেকে। নিয়োগী মশায় বেলিয়াতোড়ের বাসিন্দা ছিলেন এবং তিনি বাঁকুড়া জেলা স্কুলে যে কোন শিক্ষকের ছুটি ছাঁটাই-এর অজু-হাতে শিক্ষকপদে বহাল হতেন। কথা প্রসঙ্গে তিনি একদা আমাদের ক্লাসে বিদ্বদ্বল্লভের বিষয় যা বলেছিলেন তা এখনও মনে আছে। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে বাংলাদেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে বেলিয়াতোড়ের পথে-ঘাটে বুভুক্ষু জনগণের আকুল ক্রন্দন শোনা যেত। উচ্ছিষ্ট অন্ন নিয়ে মানুষ কুকুরে কাড়াকাড়ি, সে এক বীভৎস দৃশ্য। মানব-দরদী বসন্তরঞ্জনের তা দেখে প্রাণ কেঁদে উঠেছিল। তাঁর পিতাও দানশীল ছিলেন। সুতরাং পিতাপুত্রের আগ্রহে সেকালে দুর্ভিক্ষ-পীড়িত মানুষজনের আহার জুটত বেলিয়াতোড়ের রায় পরিবারের রন্ধনশালায়।

মানবদরদী বিদ্বদ্বল্লভ ছিলেন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রকৃত কর্মী ও বিদ্যোৎসাহী। তাঁর পরিচয় জ্ঞাপন ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের আলোচনা আমার মত সাধারণ মানুষের পক্ষে পঙ্গুর পর্বতারোহণের মতই দুঃসাধ্য। তা ছাড়া তাঁর সম্বন্ধে আমি কতটুকুই বা জানি। এখানে ওখানে শোনা কথা ও পুঁথিপত্রের লেখালেখিতে যা জেনেছি তা দিয়ে তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করলাম। তবে এটুকু বলতে পারি যে তাঁর চরিত্রের অন্যান্য গুণাবলীর মূলে ছিল মানুষকে ভালবাসা। যেসব কবি-সাহিত্যিকের অম্লান প্রতিভা পুঁথিপত্রে নিহিত ছিল তা হয়ত কালগ্রাসে একদিন বিলুপ্ত হত। আজকার মানুষ তার কোন হদিসই পেতেন না। মানব-প্রেমিক বসন্তরঞ্জনের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায়

সেইসব পুঁথিপত্র রক্ষিত হওয়ায় লেখকের প্রতিভার পরিচয় জ্ঞাপন এবং সেই সঙ্গে পাঠকের জ্ঞান-পিপাসাও চরিতার্থ হল।

আমাদের মাষ্টারমশায় পঞ্চাননবাবু বলেছিলেন, বেলিয়াতোড় গ্রামের ক্ষেত্রনাথ রায়ের প্রচেষ্টায় উক্ত গ্রামে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে বিদ্বদ্বল্লভের পৃষ্ঠপোষকতায় যে বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল তা গ্রাম্য দলাদলিতে ১৯১১ খৃষ্টাব্দে ভস্মীভূত হওয়ায় গ্রামবাসীর নগ্ন আচরণে বিদ্বদ্বল্লভ এতখানি মর্মাহত হয়েছিলেন যে তিনি গ্রাম ছেড়ে চলে যান।

১৩০০ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়। বসন্তরঞ্জন সাহিত্য পরিষদের অন্যতম ছিলেন। তাঁর আবিষ্কৃত পুঁথিসমূহ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক নব কলেবরে প্রকাশিত হয়। তাঁর সম্পাদনায় কৃষ্ণপ্রেম-তরঙ্গিণী ও মনসামঙ্গলের পুঁথি প্রকাশিত হওয়ায় তিনি নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলী কর্তৃক বিদ্বদ্বল্লভ উপাধিতে ভূষিত হন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাঁর নাম দিয়েছিলেন পুঁথিখানার মালিক। সংগৃহীত পুঁথির পাঠোদ্ধার করতে তাঁর অ.নক ক্ষেত্রে প্রায় সাত-আট বৎসর সময়ও অতিবাহিত হয়েছে। পুঁথির পাঠোদ্ধার ব্যাপারে তাঁর অবিচল ধৈর্য্য ও মনীষার পরিচয় পাওয়া যায়। কলম্বাস যেমন ভারতে আসার জলপথ খুঁজতে গিয়ে আমেরিকা আবিষ্কার করেন, তেমনি তিনিও অশ্রান্ত শ্রম স্বীকারে পুঁথিপত্রের সন্ধান করতে গিয়ে বাংলা সাহিত্যের এক যুগান্তরকারী পুঁথি কারেম করেন।

বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরের সন্নিকটে কাঁকিল্যা গ্রামে সন ১৩১৬ বঙ্গাব্দে শ্রীনিবাস আচার্য্যের দৌহিত্র বংশীয় দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের গোয়ালঘরে অযত্নে রক্ষিত একগাদা পুঁথির মধ্যে তিনি চণ্ডীদাসের বড়ু একখানি পুঁথি পান। বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয়ের কাছে সেদিন মনে হয়েছিল এ যেন অভাবনীয় ঘটনা। আস্তাকুঁড়ে পদ্মের দর্শন। তিনি এর নাম দেন শ্রীকৃষ্ণকীর্তন। ১৩২৩ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের মাধ্যমে পুঁথিখানি নবরূপে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থ সংস্কারে তিনি প্রাচীন ও নবীন ভাষায় অশেষ জ্ঞান উদ্ঘাটন করেন। বহু পণ্ডিত-মণ্ডলী এই গ্রন্থ সম্পাদনায় তাঁকে অশেষ সাহায্য করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন আবিষ্কার ও সম্পাদনা বিদ্বদ্বল্লভের অক্ষয় কীর্তি। গ্রন্থখানি বাংলা সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ্।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় এই গ্রন্থখানি সম্বন্ধে বলেছেন,—"আমি তখন সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক ছিলাম। একদিন বসন্তবাবু আমাকে সংবাদ দিলেন, তিনি চণ্ডীদাসের একখানি নূতন পুস্তক আবিষ্কার করিয়াছেন। এ পর্য্যন্ত কেহ উহার অস্তিত্ব জানিত না। শুনিয়া চমকিয়া উঠিলাম। পরে যখন পুঁথিখানি দেখিলাম, তখন দেখিলাম, একটা নূতন জিনিস বটে।"

সম্পাদক পুঁথির বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেছেন, "পুঁথির আকার দৈর্ঘ্যে সওয়া তের ইঞ্চি এবং প্রস্থে পৌনে চার ইঞ্চি। দু'ভাঁজ করা তুলোট কাগজের উভয় পৃষ্ঠে লেখা। মধ্যস্থলে ছিদ্র। এখানে ওখানে জলের দাগ। একটু-আধটু পোকায় কাটা। পাতার দুধার আরশুলা খাওয়া বা উই ধরা ছাড়া বাহ্যবয়ব মোটের উপর মন্দ নয়। কালি উজ্জ্বল। পুঁথি খণ্ডিত। সুখপাঠ্য না হইলেও অক্ষর সুন্দর ও সুগঠিত। পুঁথিতে দুই হাতের লেখা বেশ সুস্পষ্ট।"

পুঁথিখানির অক্ষর দেখে প্রাচীন লিপিবিদ্ স্বর্গত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, "গ্রন্থখানি ১৩০০ থেকে ১৪০০ সালের মধ্যে লেখা।"

ভাষা সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, "বইখানির ভাষা খুঁটিয়ে আলোচনা করে আমার এই ধ্রুব বিশ্বাস দাঁড়িয়েছে যে, এ ভাষা ১৪০০ বা ১৪৫০ খৃষ্টাব্দের এধারে কিছুতেই হইতে পারে না।"

যাক্, বারান্তরে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও বড়ু চণ্ডীদাস নিয়ে বিশেষভাবে আলোচনায় প্রবৃত্ত হব। এখন যা বলতে চাইছি তাই বলি।

চরিত্র-মাধুর্য্যে বিদ্বদ্বল্লভ ছিলেন অতুলনীয়। তিনি

অতি নম্র ও বিনয়ী স্বভাবের ছিলেন। 'বিদ্যা দদাতি বিনয়ং' শ্লোকের জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি স্বরূপ। কেউ যদি তাঁর কাছে বিদ্বদ্বল্লভ উপাধির অর্থ 'বিদ্যার বল্লভ' বলতেন, তাহলে তিনি তখুনি তার প্রতিবাদে বলতেন, "তা কখনই নয়। বিদ্যাই আমার বল্লভ। আমার মাথার মণি।"

জীবনে ঘাত-প্রতিঘাত হতে তিনিও বঞ্চিত হননি। সুখ ও দুঃখের ঘটনা তাঁর জীবনে সমভাবে সমুপস্থিত হয়েছে। কিন্তু তিনি অবিচল অবস্থায় সংসারে একটানা একক জীবন দীর্ঘদিন ভোগ করেছেন। মাত্র বত্রিশ বৎসর বয়সে তিনি বিপত্নীক হয়েছেন। তারপর আর দার-পরিগ্রহ করেননি। বৃদ্ধাবস্থায় দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়েছিল, শ্রবণশক্তি আরও ক্ষীণ, শরীরের শক্তি সামর্থ্যও খানিকটা হারিয়েছিলেন, কিন্তু তাতেও তিনি অবিচল অবস্থায় শেষ জীবন কাটিয়েছেন। বৈকালিক বিশ্রান্ত তপন তাপের মত জীবন-সন্ধ্যায় তাঁরও কর্ম্মোদ্যম আর সব মানুষের মত হ্রাসপ্রাপ্ত হয়েছিল। কিন্তু তাপ হারিয়েও সূর্য্য যেমন আলো হারায় না, তেমনি জ্ঞান বিদ্যার চর্চা হতে তিনিও শেষ জীবনে বিরত হননি। তাঁর একমাত্র পুত্র রামপ্রসাদ রায়ের বিভিন্ন কর্ম্মক্ষেত্রে শেষ জীবন কেটেছে। মৃত্যুকালে তিনি ছিলেন মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রামে। এবং সেখানে ইংরেজী ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই নভেম্বর তারিখে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বাহ্যতঃ তিনি বসন্তের মত ভীতিপ্রদ মনে হলেও ওঁর অন্তর ছিল বসন্তের মত মনোরম।

কালে কাল গত হয়। কালের অমোঘ প্রভাব। কালগ্রাসে পতিত মানুষ কালপ্রবাহে বিলীন হয়। কিন্তু তাঁর পদক্ষেপ তাঁর কীর্ত্তির মাঝে অক্ষয় থাকে। তবু আমরা অনেক সময় কীর্ত্তির কথা মনে রাখি না। যার ফলে মনীষী বসন্তরঞ্জনকে আমরা ভুলতে বসেছি। তাই এই আলোচনা। কিন্তু শুধু আলোচনাই তাঁকে মানস-পটে জীইয়ে রাখার প্রধান অবলম্বন নয়। তাঁর অনু-সরণে পা ফেলে অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন। পুরাকৃতি সংগ্রহ ও সংরক্ষণের মাধ্যমে যদি কেউ দেশ ও দশের উপকারে হাত বাড়ান তাহলে তিনিই তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে নিজেও ধন্য হবেন।

সাহিত্যের definition যিনি যেভাবেই করুন না, আমার মনে হয় হিতসাধনই সাহিত্যের ধর্ম্ম। এবং সেজন্য সহযোগিতার প্রয়োজন। বিদ্বদ্বল্লভ একদা যা বলেছিলেন এখন সেই কথাই মনে পড়ল,—লেখক ও পাঠক উভয়ের ওতপ্রোত ভাবধারায় মিলিত ভাবনায় সাহিত্যসেবা সার্থক হয়। কিন্তু এ-কথার অর্থ যে কি তা আমি বুঝিনি। যা লিখি তা নিজের খেয়ালে। পাগলের প্রলাপ ছাড়া তাকে আর কি বলব ভেবে পাই না। যা লিখেছি তা মূল্যবান্ নয়, মূল্যহীন। ভাবছি আর লিখব না। কিন্তু পারব কি?

ব্রহ্মাস্ত্র ও ব্রহ্মশাপগ্রস্ত রাজর্ষি পরীক্ষিৎ

সুরেশ চন্দ্র নাথ মজুমদার

শ্রীকৃষ্ণ সাত্যকি এবং উদ্ধব সহ দ্বারকায় গমন করিবার জন্য রথে আরোহণ করিবার উদ্যোগ করিতেছেন এমন সময় অভিমন্যুর স্ত্রী উত্তরা ভয় বিহ্বলা হইয়া বেগে শ্রীকৃষ্ণের অভিমুখে আগমন করিতেছেন, এবং উচ্চৈঃস্বরে কহিতেছেন,—হে দেবদেব, হে জগন্নাথ! আমাকে রক্ষা করুন, এসংসারে তুমি ভিন্ন অন্য রক্ষাকর্তা দেখিতেছি না—"উপলেভেঽভিধাবন্তীমুত্তরাং ভয়-বিহ্বলাম্" ইত্যাদি (শ্রীমদ্‌ভাগবত—১।৮।৭—৯)।

হে প্রভো! জলন্ত লৌহদণ্ডতুল্য একটা ভয়ঙ্কর বাণ আমার অভিমুখে আসিতেছে। আমি দগ্ধ হই, কিছু মাত্র খেদ নাই, কিন্তু যেন আমার গর্ভস্থ সন্তানের কোনও অনিষ্ট না হয়—"কামং দহতু মাং নাথ মা মে গর্ভোনিপাত্যতাম্" (ঐ—১।৮।১০। ভক্তবৎসল ভগবান উত্তরার ঐ সব কথা শুনিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন, অশ্বত্থামা পৃথিবী পাণ্ডবশূন্য করিবার জন্য ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াছে—"অপাণ্ডবমিদং কর্ত্তুং দ্রৌণেরস্ত্রমবুধ্যত" (ঐ—১।৯।১১)। প্রদীপ্ত অস্ত্র আপনাদের অভিমুখে আসিতেছে দেখিয়া পাণ্ডবেরা তখন তখনই নিজ নিজ অস্ত্র গ্রহণ করিতেছিলেন। কিন্তু অন্য অস্ত্র দ্বারা ব্রহ্মাস্ত্র নিবারিত হয় না। শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদের মহাবিপদ উপস্থিত দেখিয়া নিজ সুদর্শন অস্ত্র দ্বারা ব্রহ্মাস্ত্রকে প্রতিহত করিয়া পাণ্ডবদের রক্ষা করিয়াছিলেন, এবং শ্রীকৃষ্ণ বিরাটদুহিতা উত্তরার গর্ভ মধ্যে প্রবেশ করিয়া নিজ মায়া দ্বারা গর্ভটি আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছিলেন—"স্বমায়য়াবৃণোদ্‌গর্ভং বৈরাট্যাঃ কুরুতন্তবে" (ঐ—১।৮।১৩—১৪)।

উত্তরার গর্ভস্থ শিশু পরীক্ষিৎ অস্ত্র তেজে দগ্ধ হইতে হইতে দেখিয়াছিলেন, তাঁহার সম্মুখে শ্যাম সুন্দর অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত একটী পুরুষ বিরাজ করিতেছেন। তাঁহার পরিধানে পীতবসন, মস্তকে সুবর্ণ-কিরীট, কর্ণে তপ্ত কাঞ্চনময় কুণ্ডলযুগল, আজানুলম্বিত চতুর্ব্বাহু। তিনি ক্রোধে আরক্তচক্ষু, হস্তে গদাধারণ পূর্ব্বক দুইটি উলকা দণ্ডের সহিত গদা বিঘূর্ণিত করতঃ চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন—। "পরিভ্রমন্তমুল্কাভাং ভ্রাময়ন্তং গদাং মুহুঃ" (ঐ—১।১২।৭—৯)। এ ভাবে শ্রীকৃষ্ণ নিজ গদাদ্বারা অস্ত্রতেজ প্রশমিত করিয়াছিলেন। দশমাস বয়স্ক পরীক্ষিৎ মাতৃগর্ভে থাকিয়া ভাবিতেছিলেন, ইনি কে? তখনি সেই অচিন্ত্য স্বরূপ সর্ব্বব্যাপী ধর্ম্ম গোপ্তা ভগবান শ্রীহরি অন্তর্হিত হইয়াছিলেন—"মিষতো দশমাস্যস্য তত্রৈবান্তর্দধে হরিঃ" (ঐ—১।১২।১১)।

পরীক্ষিৎ মাতৃগর্ভে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিলেন, দুর্নিবার দৈববশে সর্ব্বশক্তিমান বিষ্ণুই ইঁহার জীবন দান করিয়াছেন তাই ইঁহার নাম বিষ্ণুরাত অর্থাৎ বিষ্ণুদত্ত—"তস্মান্নাম্না বিষ্ণুরাত ইতি লোকে ভবিষ্যতি" (ঐ—১।১২।১৭)। অভিমন্যুতনয় মাতৃগর্ভে থাকিয়া যে পুরুষকে দর্শন করিয়াছিলেন, ভূমিষ্ঠ হইবার পর তাহা স্মরণ করিয়া মনুষ্য দেখিলেই, মনে করিতেন ইনিই কি সেই পুরুষ? এ ভাবে তিনি মনুষ্য পরীক্ষা করিতেছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম হইয়াছিল পরীক্ষিৎ—

"স এব লোকে বিখ্যাতঃ পরীক্ষিদিতি যৎপ্রভুঃ।
সঞ্চং দৃষ্টমনুধ্যায়ম্ পরীক্ষেত নরে ষিহ॥"
(ঐ—১।১২।৩০)

বাল্যকাল হইতে তিনি স্বভাবতঃ কৃষ্ণভক্ত, ধর্ম্মপ্রাণ, পরমভাগবত। তাঁহার জন্মের পর ব্রাহ্মণেরা বলিয়াছিলেন,

এই শিশু মনুপুত্র সাক্ষাৎ ইক্ষাকুর মত এবং দাশরথি রামচন্দ্রের মত ব্রাহ্মণগণের হিতকারী সত্যসন্ধ প্রজাপালক হইবেন "ব্রহ্মণ্যঃ সত্যসন্ধশ্চ রামো দাশরথির্যথা" (ঐ—১।১২।১৯। উশীনরতনয় শিবির মত দাতা এবং শরণাগতরক্ষক হইবেন। দুষ্মন্তনন্দন ভরতের ন্যায় যশোবিস্তার কারি, কার্তবীর্য এবং অর্জ্জুনের ন্যায় ধনুর্দ্ধারিগণের শ্রেষ্ঠ হইবেন। ইনি অগ্নিসদৃশ দুর্দ্ধর্ষ, সিংহতুল্য বিক্রমশালী, পৃথিবীর মত ক্ষমাশীল, ব্রহ্মার তুল্য সমদর্শী, শিবসদৃশ সদাপ্রসন্ন, এবং নারায়ণ তুল্য সর্বজীবের আশ্রয় স্বরূপ হইবেন। ব্রহ্মশাপে তক্ষকদংশনে নিজ মৃত্যু জ্ঞাত হইয়া ইনি সমস্ত মায়াজাল ছিন্ন করতঃ অন্তে শ্রীহরির পাদপদ্ম লাভ করিবেন। অন্তিম কালে ইনি ব্যাস তনয় শুকদেবের নিকট হইতে আত্মজ্ঞান বিষয়ক উপদেশ শ্রবণ করিতে করিতে গঙ্গার পবিত্র সলিলে নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া অভয় পদ লাভ করিবেন—"হিত্বেদং নৃপগঙ্গায়াং যাস্যত্যদ্ধাকুতোভয়ম্" ইত্যাদি (ঐ—১।১২।২০—২৮)।

শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় রাজর্ষি পরীক্ষিৎ ব্রহ্মাস্ত্রের আক্রমন হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মশাপে তক্ষকদংশনে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। একদিন রাজা পরীক্ষিৎ একাকী মৃগয়ায় গমন করিয়া কতকগুলি হরিণের পিছু পিছু ছুটিতে ছুটিতে অত্যন্ত শ্রান্ত, তৃষিত, ক্ষুধিত হইয়া শমীক মুনির আশ্রমে উপস্থিত হইয়াছিলেন। মুনি ধ্যানরত থাকায় তাঁহার আগমন জানিতে পারেন নাই। তৃষ্ণায় কাতর রাজা জল চাহিয়া পাইলেন না, তাঁহার মনে হইল মুনি ধ্যানের ভান করিয়া তাঁহাকে উপেক্ষা করিতেছেন। রাজা পরীক্ষিতের সহ্যের সীমা অতিক্রান্ত হইয়া পড়িল, তিনি আশ্রম ত্যাগ কালে ধনুর অগ্রভাগ দ্বারা একটী মৃত সর্প মুনির গলদেশে ঝুলাইয়া দিয়া আশ্রম ত্যাগ করিয়া স্বনগরে পৌছিয়াছিলেন—"বিনির্গচ্ছন্ ধনুষ্কোট্যা নিধায় পুরমাগতঃ" (ঐ—১।১৮।৩০)।

এই সংবাদ অবগত হইয়া মুনির তেজস্বী পুত্র শৃঙ্গী কহিলেন—কি, প্রজারক্ষক রাজার এরূপ অধর্ম প্রবৃত্তি? দেখ আমার শক্তি আমি রাজাকে শাসন করিতেছি। যে মর্যাদা লঙ্ঘন করিয়া আমার পিতার অপমান করিয়াছে, আমার আজ্ঞায় মহাসর্প তক্ষক অদ্য হইতে সাতদিনের মধ্যে তাঁহাকে দংশন করিবে—"ইতি লঙ্ঘিতমর্য্যাদং তক্ষকঃ সপ্তমেঽহনি" ইত্যাদি (ঐ—১।১৮।৩)। পুত্রের ক্রন্দনধ্বনিতে মুনির ধ্যানভঙ্গ হইল, তিনি কণ্ঠদেশ হইতে মৃতসর্প ফেলিয়া দিয়া শৃঙ্গীকে বলিলেন, হে বৎস! তুমি মহাপাপে লিপ্ত হইয়াছে, রাজা নরনাথ সাক্ষাৎ বিষ্ণুতুল্য, তাঁহাকে সাধারণ মানুষ মনে করা অন্যায়, ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর রাজাকে শাপ দেওয়া উচিত হয় নাই। রাজা যে তাঁহার গলায় মৃত সর্প ঝুলাইয়া দিয়া তাঁহার অপমান করিয়াছেন, সে কথাটী মুনির মনে উদিতই হইল না। সাধু মহাজনেরা পরকৃত ইষ্ট বা অনিষ্টের দ্বারা সুখ বা দুঃখ অনুভব করেন না, কারণ আত্মা সুখদুঃখাদি গুণের অতীত—

"প্রায়শঃ সাধবো লোকে পরৈর্দ্বন্দ্বেষু-যোজিতাঃ।
ন ব্যথন্তি ন হৃষ্যন্তি যত আত্মাঽগুণাশ্রয়ঃ॥"
(শ্রীমদ্ভাগবত—১।১৮।৫০)

রাজা পরীক্ষিৎ আত্মকৃত গর্হিত কার্যের জন্য অতিশয় অনুতপ্ত হইলেন। তিনি তক্ষকের বিষাগ্নিকে বরণীয় মনে করিলেন। শ্রীকৃষ্ণচরণ সেবাই সমস্ত পুরুষার্থের শ্রেষ্ঠ, তাঁহার এই জ্ঞান জন্মিল। তিনি মায়াচ্ছন্ন বিষয় বাসনা বর্জন করিয়া সুরধুনী তীরে প্রয়োপবেশন আরম্ভ করিলেন——"কৃষ্ণাঙ্ঘ্রিসেবামধিমন্যমান উপাবিশৎ প্রায়মমর্ত্ত্যনদ্যান" (ঐ ১।১৯।৫)।

মুনিঋষি রাজর্ষি দেবর্ষিরা শিষ্যগণ সহ রাজদর্শনার্থ আগমন করিলেন। রাজা পরীক্ষিৎ পুত্র জনমেজয়ের হাতে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া গঙ্গার দক্ষিণতীরে কুশাসন বিছাইয়া উত্তর মুখে উপবেশন করিলেন। মুনিঋষি রাজর্ষি দেবর্ষিগণের মধ্যে ধর্ম আলোচনা চলিতেছিল। এমন সময় ষোড়শ বৎসর বয়স্ক ব্যাসনন্দন শুকদেব ঋষি অযাচিত ভাবে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সকলে আসন হইতে উঠিয়া তাঁহার সম্বর্ধনা করিলেন। রাজা পরীক্ষিৎ কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া মহাভাগবত শুকদেব ঋষি ভাগবতপাঠ আরম্ভ করিয়াছিলেন।(১)

রাজর্ষি পরীক্ষিৎ মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন।

কি ভাবে মরিতে হয় এই শিক্ষা দিবেন শুকদেব ঋষি। তিনি স্বস্তিকাসনে বসিয়া ১৬৮ ঘণ্টা ভাগবত মহাগ্রন্থ শুনাইতে লাগিলেন। বিশ্রাম নাই, আহার নিদ্রা নাই, বাহ্য প্রস্রাবাদি নাই, তিনি আসন হইতে উঠিলেন না, একটানা ভাগবত শুনাইতে লাগিলেন। সাতদিন ১৬৮ ঘণ্টা অবিশ্রান্ত ভাবে অত্যন্ত পরিশ্রম করিলেন বটে; কিন্তু সেই শ্রম তাঁহার মনে উদিত হয় নাই। অনুক্ষণ কর্ম করার অভ্যাস গঠিত হইয়া গেলে শ্রমের বোধ মনে উদিত হয় না। তাৎপর্য সন্ন্যাস এবং কর্মযোগ মূলে ভিন্ন নহে। (গীতা প্রবচন—আচার্য বিনোবা ভাবে।)

ব্রহ্মশাপ সফল হইল। তক্ষকের—

"ভয়ঙ্কর মূর্তি দেখি সবে হৈল ডর।
জড়াইল লাঙ্গুলে রাজার কলেবর॥
সহস্রেক ফণা ধরে ছত্রের আকার।
শব্দ করি ব্রহ্মতালু দংশিল রাজার॥
* * * *
অগ্নিহোত্রী ঘৃতে তনু করিল দাহন।
শ্রাদ্ধ শান্তি কৈল তার বিহিত লক্ষণ॥
মন্ত্রীগণ সহ যুক্তি করি সব প্রজা।
তাঁর পুত্র জন্মেজয় তাঁরে কৈল রাজা॥
(মহাভারত—আদিপর্ব, কাশীরাম দাস।)

(১) বসুমতী সাহিত্যমন্দিরের শ্রীমদ্‌ভাগবত-বঙ্গানুবাদ সংক্ষেপীকৃত এবং সরলীকৃত।

ভারতীয় বাংলা কবিতার ভবিষ্যৎ

অজিতকুমার দত্ত

ভারতীয় বাংলা কবিতার ভবিষ্যৎ কোন্ পথে—ভালো পথে কি মন্দ পথে—এ প্রশ্নের উত্তর সরাসরি-ভাবে জবাব দেওয়া মুশকিল। কারণ এই সরাসরি জবাবের মধ্যে অনেক বিতর্কিত বিষয় প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করে থাকতে পারে। তবে বাংলা কবিতার বর্তমান যে গতিধারা সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণভাবে ওয়াকেফহাল থাকলে কিংবা সে সম্বন্ধে বিচার বিশ্লেষণ করে দেখলে অতি সহজেই প্রতীয়মান হবে যে ভারতীয় বাংলা কাব্যের ভবিষ্যৎ শরৎকালীন মেঘের ন্যায় নিঃস্ব অসহায় অবলম্বনহীন। ভারতীয় বাংলা কবিতা ক্রমশঃ একটা চরম বিপর্যয়ের কেন্দ্রবিন্দুর দিকে ধাবিত হচ্ছে। এবং এই বিপর্যয় যে চূড়ান্ত পর্যায়ে না গিয়ে ক্ষান্ত হবে না—এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কারণ যে বিপর্যয় একবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠে তা অতি সহজে দমে যায় না—মারাত্মক একটা আঘাত দিয়ে তারপর সে ক্ষান্ত হয় এবং ভারতীয় বাংলা কাব্যের এই বিপর্যয়ের জন্য দায়ী যে বিশেষ করে আধুনিক ও অতি-আধুনিক কবিরা অর্থাৎ পঞ্চম দশকের পরবর্তী কবিরাই—এ বিষয়ে কোনো অত্যুক্তি করা হবে না মনে হয়।

ভারতীয় বাংলা কাব্যের এই বিপর্যয় কয়েকটি সমস্যা থেকে সৃষ্ট। এই কয়েকটি সমস্যাই প্রধানতঃ বাংলা কবিতাকে বিপথগামী করে দিচ্ছে—একটা অকাট্য ট্র্যাজিক পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। যার ফলে বাংলা কবিতার চাহিদা কাল থেকে কালান্তরে ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। এই সমস্যাগুলোর মধ্যে নিছক পাণ্ডিত্য প্রদর্শন, দলীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতাবোধের

অভাবই হচ্ছে ভারতীয় বাংলা কাব্যে সবচাইতে কঠিনতম সমস্যা।

আজকাল অনেক ভারতীয় বাঙালী কবি খেদ করে বলে থাকেন, সাধারণে কবিতা মোটেই পড়তে চায় না—অবহেলা করে। এ কথাটি যে কতদূর সমর্থনযোগ্য তা বোঝা যাবে মাইকেল মধুসূদন দত্ত, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ইসলাম, জীবনানন্দ দাস, সমর সেন, সুকান্ত ভট্টাচার্য এবং আরো অন্যান্য কবিদের পাঠক সংখ্যা নির্ণয় করলে। এইসব শ্রেষ্ঠ কবির কবিতা এমন কোনো শিক্ষিত বাঙালী পরিবার নেই যে না পড়ে ক্ষান্ত হয়েছেন। নিজে কিনতে না পেরেছেন তো পাঠাগার কিংবা প্রতিবেশী কিংবা বন্ধু-বান্ধবের কাছ থেকে সংগ্রহ করে পড়েছেন। আর মুদ্রণ ও বিক্রীর তো কোনো কথাই নেই। সংস্করণের পর সংস্করণ এইসব কবিদের কাব্যগ্রন্থ আজও প্রকাশক কর্তৃক প্রকাশিত হচ্ছে। সুতরাং লোকে কবিতা চায় না বা পড়ে না কথাটা বাজে। আসল কথা হচ্ছে কি, একালের কবিরা পাঠকদের মনের খোরাক পরিপূরকভাবে জোগাতে পারছেন না। অনুভূতি, উপলব্ধি এবং আবেগকে গৌণ করে তাঁরা বুদ্ধির মারপ্যাচ দেখিয়ে, দুরূহ শব্দ প্রয়োগ করে এবং উদ্ভট কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করে intellectual হবার চেষ্টা করে থাকেন। এইরূপ অবস্থায় পাঠকগণ একালের কবিতা পড়বে কেন। (এই অবস্থার উৎপত্তি সেই রবীন্দ্রোত্তর কাল থেকেই। তারপর দানা বাঁধতে বাঁধতে বর্তমানে এসে মহা আকার ধারণ করেছে।) যেখানে স্বতঃস্ফূর্ত আবেগকে ছাড়িয়ে বুদ্ধিই হয়ে উঠে মুখ্যধর্মে সেখানে কোন সাধারণ পাঠক স্বেচ্ছায় নাক গলাতে চাইবে। সব পাঠক তো আর intellectual নয়। এই প্রসঙ্গে প্রমথনাথ বিশী মহাশয়ের উক্তি স্মরণযোগ্য—

> "......অনুভূতি ও উপলব্ধির উদার রাজপথ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারা উদ্ভট কল্পনার অকারণ পাণ্ডিত্যের, ব্যক্তিগত গোষ্ঠীর গলিঘুঁজিতে কি প্রবেশ করেন নাই? সেই সংকীর্ণ, অন্ধকার, অপঘাতবন্ধুর পথে স্বভাবতঃই সাধারণের প্রবেশ দুষ্কর। তাহারা যদি কবিকে অনুসরণ না করে তবে সে দায়িত্ব কাহার? আমি যতদূর বুঝি, পাঠক কবিকে ত্যাগ করে নাই, কবিই পাঠককে ত্যাগ করিয়াছে......।"
>
> "কবিরা যে পরিমাণে পাঠককে ত্যাগ করিয়াছে, ঔপন্যাসিকরা সেই পরিমাণে তাহাকে কাছে টানিয়া লইয়াছে। আগেকার দিনে কাব্যের যে জনপ্রিয়তা ছিল এখন উপন্যাস তাহা অধিকার করিয়া লইয়াছে। কোনোরূপ ষড়যন্ত্রের ফলে নয়—কবির পাঠকবিমুখতার ফলে, কবির পাঠককে মনের খাদ্য জোগাইবার অক্ষমতার ফলে এই পরিবর্তনটি ঘটিয়া গিয়াছে।"

('আধুনিক কাব্য': বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য।)

এই 'খাদ্য জোগাইবার অক্ষমতা'র মূলে রয়েছে পাশ্চাত্য রেনেসাঁসের হাওয়া। (এই হাওয়া পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি দেশের কাব্যে এখনও সমভাবে প্রবহমান। তাই এই সমস্যা যে শুধু ভারতীয় বাঙালী কবিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ তা নয়-পৃথিবীর সকল দেশের আধুনিক কবিদের মধ্যে তা বিরাজমান।) ভারতীয় বাঙালী কবিগণ আত্মস্থ না হয়ে কেবল অন্ধের মত অনুকরণ করেই যাচ্ছে। বিচার করে দেখছে না ভবিষ্যৎ কেমন হবে এবং পাঠকের মনমতো হবে কি না। তাঁরা ভারতীয় জীবনাদর্শকে পরিত্যাগ করে পাশ্চাত্য রীতিনীতিকে শুধ অনুসরণ না করে একেবারে অনুকরণে লিপ্ত আছে। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু এটাকে মনের মতন করে গ্রহণ করতে পারেননি। এই কারণে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন -

> "আধুনিক উদ্ভাবনা হচ্ছে পাকের মাতুনি, এতে মাঝিগিরির দরকার নেই - এটা তলিয়ে যাওয়া রিয়ালিটি। ভাষাটাকে বেঁকিয়েচুরিয়ে অর্থের বিপর্যয় ঘটিয়ে, ভাবগুলোকে স্থানে অস্থানে ডিগবাজি খেলিয়ে, পাঠকের মনকে পদে পদে ঠেলা মেরে চমক লাগিয়ে দেওয়াই সাহিত্যের চরম উৎকর্ষ। চরম

উৎকর্ষ সন্দেহ নেই। সেই চরমের নমুনা যুরোপীয় সাহিত্যের ডাডায়িজম।"

('সাহিত্যের পথে': সাহিত্যে নবত্ব)।

ভারতীয় বাংলা কবিতার দ্বিতীয়তম কঠিন সমস্যা হল দলীয়তাবাদ। এই দলীয়তাবাদ বাংলা কাব্যে এই সাম্প্রতিক কালে ভীষণ প্রকট রূপ ধারণ করেছে। দলাদলী বাংলাদেশে চিরকালই ছিল—রাজনীতি মানেই তো দলাদলি। কিন্তু সে দলাদলি রাজনীতির গণ্ডির মধ্যেই থেকে গিয়েছিল তখন—আধুনিক কালের মতো সে সমগ্র মানবজীবনকে আক্রমণ করে নাই—সাহিত্য-শিল্পকে স্বকীয় আয়ত্তের বন্ধনে আবদ্ধ করে নাই। কেন, রবীন্দ্রনাথ রাজনীতি করেন নাই—তারাশঙ্কর রাজনীতি করেন নাই? তাই বলে কি তাঁরা কবিতাকে দলীয় প্রচারপত্রে পর্যবসিত করেছেন? উত্তর হবে—না। কারণ তাঁরা জানতেন শিল্পের লক্ষ্য সারা মানবসমাজ, আর দলীয়তাবাদের লক্ষ্য শুধু একটি গোষ্ঠীর মানুষ। তাঁরা যদি দরিদ্রের দুঃখ দেখে থাকেন তবে দরদী মানুষের দৃষ্টিতেই দেখেছেন—তার জন্য রাজনৈতিক মতবাদের দরকষাকষি করেন নাই।

এই দলীয়তাবাদই আজ ভারতীয় বাংলা কাব্যকে (বিশেষ করে ষষ্ঠ দশকের পরবর্তীকালের কাব্যকে) অনেকাংশে সীমাবদ্ধ করে রেখেছে। যে শিল্পের মুক্তি সর্বকালে, সবদেশে, সর্বমানবে, সর্বপরিস্থিতিতে সে শিল্প আজ শৃঙ্খলাবদ্ধ। যে শিল্প আজ দলীয় মতবাদের মধ্যে আবদ্ধ সে শিল্প-সাহিত্যের ভবিষ্যৎ কি হতে পারে? উত্তরে বলা যেতে পারে—কালের বিচারে এইসব কবিতা না টেকারই সম্ভাবনা। যে কবিতা জর্নালিজমে পরিণত হয় সে সাহিত্য কবিতা টিকবে বা কতদিন। পশ্চিমবাংলার সাম্প্রতিক সাহিত্য-কবিতা ও রাজনীতির সম্পর্ক সম্বন্ধে বলতে গিয়ে শ্রদ্ধেয় মনীষী প্রমথনাথ বিশী মহাশয় বলেছেন—

"সার্কাসের দল যেমন সগর্বে ঘোষণা করে যে, তার দলে কটা রয়াল বেঙ্গল টাইগার, হাতী, ভালুক প্রভৃতি আছে, আর তাই দিয়েই তার কৌলীন্যের বিচার হয়, রাজনৈতিক দলগুলোও তেমনি ঘোষণা করে যে, তার দলে কোন্ সাহিত্যিক, সঙ্গীতজ্ঞ, নৃত্যশিল্পী প্রভৃতি রয়েছেন।"

('শিল্পের মুক্তি': বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য।)

কেন, রাজনীতি ব্যতীত কি কাব্য সাহিত্য করা চলে না? কাব্য সাহিত্য রাজনীতির প্রচারপত্র নাকি? একজন সাহিত্যিক কিংবা কবি হতে হলে তাকে কি করতে হবে? তিনি জীবনের দুঃখ-বেদনা, ঘাত-প্রতিঘাত, আবেগ-অনুরাগ, আশা-আকাঙ্ক্ষাকে তুলে ধরবেন, না কি তাঁর দলীয় মতবাদকে প্রচার করবেন? হ্যাঁ, জীবনের সুখ-দুঃখ, ঘাত-প্রতিঘাত ইত্যাদির সঙ্গে রাজনীতি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত এটা ঠিক। কিন্তু তা বলে সাহিত্য-কবিতা দলীয় মতবাদকে বইতে যাবে কেন? সাহিত্য-শিল্প দলে উপদলে ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যাবে কেন? তা'হলে তো সে সাহিত্য কবিতা দলীয় প্রচারপত্ররূপে পরিগণিত হবে—সে সাহিত্য-কবিতা শুধু তার গোষ্ঠীর মধ্যেই বেঁচে থাকবে। সর্বমানব, সর্বকাল ও সর্বদেশের কল্যাণার্থে তো সে সাহিত্য-কবিতা নয়।

মহাশিল্প কখনও পুরাতন হবার নয়। শিল্প চির নূতন—হাজার হাজার বছর পরেও সেই শিল্পের আদর্শ নিত্যনূতনভাবে প্রতীয়মান থাকে। কিন্তু দলীয়তাবাদরূপ শিল্পের ভবিষ্যৎ মৃত্যু। ইহার আয়ু কেবলমাত্র জীবের আয়ুর ন্যায় নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ। কালের ভগ্নস্তূপেই তার সমাধি রচিত হয়ে থাকে। শিল্প ও দলীয়তাবাদের মধ্যে কতবড় ফারাক রয়েছে এ সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে প্রমথনাথ বিশীই বলেছেন—

"শিল্পের লক্ষ্য মানুষ, দলীয়তাবাদের লক্ষ্য দলীয় মানুষ; শিল্পের আদর্শ মানুষের প্রতিষ্ঠা, দলীয়তাবাদের আদর্শ দলীয়তা প্রতিষ্ঠা; শিল্প শাশ্বত বলে একটা নিত্যবস্তু স্বীকার করে, দলীয়তাবাদ বলে মানুষের ইতিহাস মুহূর্ত

থেকে মুহূর্তে, ঘটনা থেকে ঘটনান্তরে লাফিয়ে চলছে—নিত্য কিছু নেই। কাজেই দেখা যাচ্ছে, শিল্প ও দলীয়তাবাদের ভিত্তিই ভিন্ন।"

('শিল্পের মুক্তি'।)

সুতরাং এই ক্লেদাক্ত অবস্থায় বাংলা কবিতায় আন্তর্জাতিকতাবোধ কল্পনা করা বৃথা। সৎসাহিত্যের উদ্দেশ্য বিশ্বমানবকল্যাণ। বিশ্বজনীন ভাবধারা সৎসাহিত্যের মূল ভিত্তি। সেই কারণে স্থান-কাল-পাত্র নির্বিশেষে এই মহৎ সাহিত্যের আদর্শ স্বকীয় ঔজ্জ্বল্যে সর্বদা বিরাজমান। এইরূপ সাহিত্যের আদরও হয় যথেষ্ট—সম্মানও যথেষ্ট এই সাহিত্য স্রষ্টার। সর্বকালের মানবের নিকট পূজনীয় হয়ে থাকেন তিনি। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধের ভারতীয় বাংলা কবিতার যে স্বাস্থ্য—তা দেখে মনে হয় না যে সে মহাবিশ্বের জন্য কিছু একটা করছে।

ভারতীয় বাংলা কাব্য জগতে যে আন্তর্জাতিকতা-বোধমূলক কবিতা একেবারে নেই কিংবা ছিল না (রবীন্দ্রোত্তরে) তা নয়। রবীন্দ্রনাথ ব্যতীতও কয়েকজন বাঙালী প্রবীণ (মৃত ও জীবিত) ও নবীন কবির কবিতায় এই বিশ্ববোধ প্রকটরূপে প্রকাশমান। তাঁদের কবিতার মূল সুর হচ্ছে একটা আন্তর্জাতিকতাবোধ কিংবা চিন্তা। তাঁদের শিল্পীমন সর্বমানব কল্যাণার্থেই উৎসারিত হয়েছে কাব্য রচনায়। তাই তাঁরা এবং তাঁদের সৃষ্টি চিরকাল বেঁচে থাকার যোগ্য। সে তো মুষ্টিমেয়। এই কয়েকজনের উপর নির্ভর করে কি বাংলা কাব্যের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কল্পনা করা যায়, যে পশ্চিম বাংলায় প্রায় চারশত কি পাঁচশত পরিচিত ও প্রতিষ্ঠিত কবিতা-লেখক (প্রবীণ ও নবীন নিয়ে) রয়ে গেছেন? (জানি না ভবিষ্যতে কতদূর পরিচিত ও প্রতিষ্ঠিত থাকবেন এঁরা।) এ ছাড়া তো আরো রয়ে গেছেন। সুতরাং এ কথা বললে বাড়াবাড়ি করা হবে না যে, বিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধের ভারতীয় বাংলা কবিতা আজ প্রাদেশিকতাবোধ ও দলীয়তাবোধের করাল গ্রাসে পড়ে আকাশফাটা মরণ-চিৎকার করছে। হয়ত এমন একদিন আসবে এই প্রাদেশিকতাবোধ ও দলীয়তাবোধের চরম পেষণে ভীষণভাবে রোগগ্রস্ত হয়ে পড়বে—এগিয়ে যাওয়ার আর শক্তি পাবে না।

সুতরাং উপরে বর্ণিত কঠিন সমস্যাগুলো নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলে সহজেই অনুমান করা যাবে যে, বাংলা কবিতার ভবিষ্যৎ ক্ষয়িষ্ণু। যদি সময়মতো এর প্রতিবিধান না করা হয় তবে নূতন প্রতিভার উদ্ভব না হওয়া পর্যন্ত আবার বাংলা কাব্য-জগতে নেমে আসবে আর একটি অন্ধকারময় যুগ।

শতবর্ষে বঙ্গ-রঙ্গ-মঞ্চ

চিত্তরঞ্জন দাস

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই ডিসেম্বর, শনিবার, কলিকাতার বাগবাজার অঞ্চলের কতিপয় নাট্যোৎসাহী যুবকের অদম্য প্রচেষ্টায়, তৎকালীন চাঁৎপুরস্থ মধুসূদন সান্যাল মহাশয়ের বাটীর উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে, দীনবন্ধু মিত্রের "নীল-দর্পণ" নাটকের অভিনয় অনুষ্ঠানদ্বারা শুরু হয়েছিল বঙ্গ দেশে পেশাদারী সাধারণ রঙ্গালয়। উক্ত দিবস টিকিট বিক্রয়-লব্ধ অর্থের পরিমাণ ছিল মাত্র দু'শ টাকা এবং পরবর্তী নিয়মিত অভিনয় অনুষ্ঠানে উক্ত অর্থের পরিমাণ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেয়েছিল আশাতীতরূপে। অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তাফী ছিলেন উক্ত নাট্যানুষ্ঠানের প্রধান উদ্যোক্তা, সংগঠক ও পরিচালক। নটগুরু গিরীশচন্দ্র ঘোষ সংস্থার সদস্যদের সহিত মতানৈক্য হেতু উক্ত নাটকে কিম্বা অনুষ্ঠানে কোন অংশ গ্রহণ করেন নি। সুতরাং অর্দ্ধেন্দু শেখর মুস্তাফীই ছিলেন প্রকৃতপক্ষে বঙ্গ-রঙ্গ-মঞ্চের প্রবর্ত্তক বা প্রতিষ্ঠাতা।

অবশ্য তৎপূর্বে উক্ত বাগবাজার অঞ্চলেই ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে গিরীশচন্দ্র ঘোষ একটি সৌখীন নাট্য-সংস্থা গঠন ক'রে যাত্রাভিনয় ক'রেছিলেন মাইকেল মধুসূদন দত্তের "শর্মিষ্ঠা"। অতঃপর তিনি মঞ্চাভিনয়ের প্রতি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হ'য়ে, "বাগবাজার এ্যামেচার থিয়েটার" নামে পূর্বোক্ত সংস্থার পুনর্গঠন ক'রে মঞ্চস্থ করেছিলেন দীনবন্ধু মিত্রের "সধবার একাদশী।" উক্ত নাটকের প্রথম অভিনয় অনুষ্ঠান সম্পন্ন হ'য়েছিল সপ্তমী পূজা উপলক্ষে বাগবাজার নিবাসী প্রাণকৃষ্ণ হালদার মহাশয়ের বাটীতে ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে। অতঃপর উক্ত নাটকের আরও কয়েকটি অভিনয় অনুষ্ঠান হ'য়েছিল এই অঞ্চলেরই বিভিন্ন ধনীর গৃহে বিশেষ কোন পূজা-পার্বণ উপলক্ষে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য তৎকালীন নাট্যামোদী ধনী ব্যক্তিদের অর্থেই সম্পন্ন হোত সখের নাট্যানুষ্ঠান নিজ গৃহ প্রাঙ্গণে। বৃটিশ প্রদত্ত খেতাবধারী রাজা-মহারাজাগণ বাস করতেন কলিকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে এবং তন্মধ্যে যাঁরা ছিলেন বিশিষ্ট নাট্যামোদী, তাঁরাই প্রচুর অর্থব্যয় ক'রে করতেন সখের থিয়েটার। অবশ্য সে সব অনুষ্ঠানে একমাত্র আমন্ত্রিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ভিন্ন, জনসাধারণের কোনও প্রবেশাধিকার থাকত না। বেল-গাছিয়া, জোড়াসাঁকো, শোভাবাজার রাজবাটী প্রভৃতি তৎসম্পর্কে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাই প্রয়োজন হ'য়েছিল তখন জনসাধারণের জন্য সাধারণ রঙ্গালয় স্থাপন করা এবং তদুদ্দেশ্যেই বাগবাজারের উক্ত যুবকবৃন্দ ছিলেন অতিশয় উদ্যোগী এবং তাঁদেরই অদম্য উৎসাহ ও প্রচেষ্টার ফলে সৃষ্ট হ'য়েছিল বাংলার সাধারণ রঙ্গ-মঞ্চ, যার গর্বোন্নত শির অদ্যাবধি দাঁড়িয়ে আছে স্থির ভাবে। সুতরাং বাংলার নাট্যক্ষেত্রে উক্ত-যুবকদের তৎকালীন অমূল্য ও অতুলনীয় অবদান স্বভাবতই অনস্বীকার্য্য এবং অবিস্মরণীয়। বাংলার নাট্য ইতিহাসে নাট্য-পীঠ বাগবাজার এবং তৎস্থানীয় নাট্য-স্রষ্টা যুবকদের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ থাকা উচিত।

"বাগবাজার এ্যামেচার থিয়েটার" অবলুপ্ত হ'য়েছিল ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে প্রধানতঃ দু'টি কারণে। তার একটি হ'ল অর্থাভাব, অপরটি: সদস্যদের সঙ্গে গিরীশচন্দ্রের মত-বিরোধ। অতঃপর উক্ত সদস্যবৃন্দ গিরীশচন্দ্রকে বাদ দিয়েই শুরু ক'রেছিলেন দীনবন্ধু মিত্রের "লীলাবতী" নাটকের নিয়মিত রিহারসেল বা মহলা।

উক্ত নাটক মঞ্চস্থ হ'য়েছিল ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই মে শ্যামবাজার নিবাসী রাজেন্দ্রনাথ পাল মহাশয়ের বাটীতে, সংস্থার পরিবর্তিত নাম "শ্যামবাজার নাট্য সমাজ" কর্তৃক। অবশ্য উক্ত "লীলাবতী" নাটকেও সদস্যদের বিশেষ অনুরোধে শেষ পর্য্যন্ত অংশ গ্রহণ করেছিলেন গিরীশ

চন্দ্র ঘোষ। "লিলাবতী" নাট্যাভিনয়ের পর উক্ত সংস্থা কর্ত্তৃক পরবর্তী নাটক নির্বাচিত হ'য়েছিল দীনবন্ধু মিত্রের "নীলদর্পণ"। দীর্ঘদিন মহলা ও প্রস্তুতির পরেও যখন একমাত্র অর্থাভাবেই অভিনয় অনুষ্ঠানের কোনও ব্যবস্থা করা সম্ভবপর হ'ল না, তখন অর্দ্ধেন্দুশেখর সহ অধিকাংশ সদস্যই টিকিট বিক্রয় ক'রে অভিনয় অনুষ্ঠান সম্পন্ন করবার প্রস্তাব উত্থাপন করলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এঁরা সকলেই প্রায় ছিলেন তখন পেশাদারী সাধারণ রঙ্গালয় স্থাপনের জন্য সচেষ্ট। সুতরাং উক্ত নাটকের অভিনয় অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয় অর্থ, ধনীর নিকট থেকে পাবার আশায় বৃথা কালক্ষয় না ক'রে, টিকিট বিক্রয় ক'রেই নিয়মিত অভিনয় অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। কিন্তু গিরীশচন্দ্র ছিলেন উক্ত সিদ্ধান্তের ঘোর বিরোধী। তিনি চেয়েছিলেন, আগে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ ক'রে, পরে সাধারণ রঙ্গালয় স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে। কিন্তু অন্যান্য সদস্যরা বহু চেষ্টা ক'রেও যখন গিরীশ ঘোষ প্রস্তাবিত পাঁচ হাজার টাকা সংগ্রহ করতে কৃতকার্য্য হলেন না, তখন তাঁরা উপরোক্ত সিদ্ধান্তই গ্রহণ করলেন। সুতরাং উক্ত ব্যাপারে সদস্যদের সঙ্গে একমত হ'তে না পারায়, গিরীশচন্দ্র তখন দলত্যাগ করলেন।

অতঃপর এ ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহী সদস্যবৃন্দ যথা : অর্দ্ধেন্দু শেখর মুস্তাফী, ধর্ম্মদাস সুর, অমৃতলাল বসু, নগেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় প্রমুখ যুবকবৃন্দ মাসিক ৪০টাকা ভাড়ায় পূর্বোক্ত সান্যাল বাটীর মুক্ত অঙ্গণে অস্থায়ী মঞ্চ নির্মাণ ক'রে শুরু করেছিলেন বাংলার পেশাদারী সাধারণ রঙ্গ-মঞ্চ! নবগোপাল মিত্র সংস্থার নামকরণ করেছিলেন "ন্যাশনাল থিয়েটার।" বাগবাজার নিবাসী ভুবনমোহন নিয়োগী ছিলেন তখন উক্ত থিয়েটারের প্রধান পৃষ্ঠপোষক। কয়েক সপ্তাহ নিয়মিত অভিনয় অনুষ্ঠানের পর, টিকিট বিক্রয় লব্ধ অর্থের সঠিক হিসাব-পত্র নিয়ে সদস্যদের মধ্যে দারুণ মত-বিরোধের ফলে থিয়েটার হ'য়ে গেল বন্ধ। অবশ্য অনতিবিলম্বে উক্ত সদস্যদের বিরোধ মিটিয়ে দিলেন—নবগোপাল মিত্র, মনমোহন বসু এবং হেমন্তকুমার ঘোষ। ন্যাশনাল থিয়েটারে তখন তিনজন সদস্য বিশিষ্ট একটি ডিরেক্টর বোর্ডও গঠিত হ'য়েছিল। বোর্ডের সদস্য ছিলেন শিশির কুমার ঘোষ, গিরীশচন্দ্র ঘোষ এবং দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। অতঃপর কয়েক সপ্তাহ থিয়েটার সেখানে বেশ ভালভাবেই চলেছিল। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে ফেব্রুয়ারী ন্যাশনাল থিয়েটার কর্ত্তৃক মঞ্চস্থ হ'য়েছিল মাইকেল মধুসূদন দত্তের "কৃষ্ণকুমারী" নাটক এবং উক্ত নাটকেই ভীম সিংহের ভূমিকায় সাধারণ রঙ্গ-মঞ্চে সর্ব্ব-প্রথম অবতীর্ণ হ'য়েছিলেন নটগুরু গিরীশচন্দ্র ঘোষ। সান্যাল বাটীর মুক্ত অঙ্গণে ন্যাশনাল থিয়েটারের শেষ অভিনয় অনুষ্ঠিত হ'য়েছিল ৮ই মার্চ, ১৮৭৩। বর্ষারম্ভের নিমিত্ত সান্যাল বাটীর অস্থায়ী মঞ্চে অতঃপর আর নাট্যানুষ্ঠান করা সম্ভব হয় নি।

টিকিট বিক্রয় লব্ধ অর্থ-বন্টনের ব্যাপার নিয়ে সদস্য-দের মধ্যে পুনরায় বাক্‌বিতণ্ডার ফলে, ন্যাশনাল থিয়েটার তখন বিভক্ত হ'য়ে দু'টি সংস্থায় পরিণত হ'ল। যথা :—ন্যাশনাল এবং হিন্দু ন্যাশনাল (পরবর্ত্তী নাম গ্রেট ন্যাশনাল) থিয়েটার। সংস্থাদ্বয় যথাক্রমে গিরীশ-চন্দ্র ও অর্দ্ধেন্দুশেখরের পরিচালনাধীন ছিল। উভয় সংস্থাই তখন কয়েকমাস কলিকাতা এবং বাংলার বিভিন্ন জেলায়, এমন কি বহিবঙ্গেও বিভিন্ন নাটকের অভিনয় প্রদর্শন ক'রে, ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন ক'রে, সম্মিলিত ভাবে সম্পন্ন করেছিল ৭ই ডিসেম্বর ন্যাশনাল থিয়েটারের প্রথম জন্ম-বার্ষিকী অনুষ্ঠান এবং উভয় দলের সদস্যদের মধ্যে তখন পরস্পর-বিরোধী মনোভাবও শিথিল হ'য়েছিল বহুলাংশে।

ইতিমধ্যে কলিকাতায় বেঙ্গল থিয়েটার এবং ওরিয়েন্টাল থিয়েটার নামে অপর দু'টি পেশাদারী থিয়েটারের জন্ম হ'য়েছিল। তৎসম্পর্কে বিশেষ উল্লেখ্য এই যে বেঙ্গল থিয়েটার-এর অভিনয় অনুষ্ঠিত হ'ত নিজস্ব গৃহে এবং নাটকের স্ত্রী-ভূমিকায় সর্ব্বপ্রথম স্ত্রীলোকদ্বারা অভিনয় করাবার কৃতিত্ব উক্ত থিয়েটারই অর্জন করেছিল।

১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই এপ্রিল ন্যাশনাল ও গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার পুনরায় যুক্ত হ'য়ে মঞ্চস্থ করেছিল "হেমলতা" নাটক। অতঃপর গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের তৎকালীন স্বত্বাধিকারী ভুবনমোহন নিয়োগী স্বাভাবিক উত্থান পতনের মাধ্যমে ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত উক্ত থিয়েটার চালিয়ে প্রভূত দেনাগ্রস্ত হ'য়ে পড়ায়, থিয়েটারটি লীজ দিলেন গিরীশচন্দ্র ঘোষকে। গিরীশচন্দ্র পুনরায় ন্যাশনাল থিয়েটার নামেই উক্ত প্রতিষ্ঠান সগৌরবে চালিয়েছিলেন কিছুকাল। কিন্তু তাঁর ভ্রাতা এ্যাটর্ণী অতুলকৃষ্ণ ঘোষের বিশেষ আপত্তির জন্য গিরীশচন্দ্র তখন উক্ত থিয়েটারের লীজ প্রদান করেছিলেন দ্বারকানাথ দেবকে। অতঃপর আরও দু'তিন হাত বদল হবার পরে উক্ত ন্যাশনাল থিয়েটার পরিচালন ভার গ্রহণ করেছিলেন ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে একজন মাড়োয়ারী ব্যবসায়ী—প্রতাপচাঁদ জহুরী এবং তাঁরই বিশেষ অনুরোধে গিরীশচন্দ্র তখন অফিসের ১৫০ টাকা বেতনের স্থায়ী চাকুরী পরিত্যাগ ক'রে, উক্ত থিয়েটারে স্থায়ীভাবে যোগদান করেছিলেন ম্যানেজারের পদে মাত্র ১০০ টাকা বেতনে। বাংলার জাতীয় নাট্যশালা প্রতিষ্ঠা কল্পেই গিরীশচন্দ্র তখন এবম্বিধ আর্থিক ত্যাগ স্বীকার করতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা বোধ করেন নি।

প্রতাপচাঁদের আমলে ন্যাশনাল থিয়েটার দু'তিন বছর চলেছিল সগৌরবে। কিন্তু ক্রমশঃ নানা কারণে প্রতাপচাঁদের সঙ্গে গিরীশচন্দ্রের মনোমালিন্যের ফলে হঠাৎ একদিন উক্ত থিয়েটারের অধিকাংশ নট-নটী সহ গিরীশচন্দ্র ন্যাশনাল থিয়েটার ছেড়ে চলে গেলেন। অতঃপর একটি নতুন থিয়েটার স্থাপনের নিমিত্ত কিছুদিন চলল উদ্যোগ পর্ব। সহকর্মীদের অদম্য প্রচেষ্টার ফলে অনতিবিলম্বে অপর একজন অবাঙ্গালী ব্যবসায়ীর প্রদত্ত প্রয়োজনীয় অর্থদ্বারা গিরীশচন্দ্র গঠন করেছিলেন "ষ্টার থিয়েটার" ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে। উক্ত ব্যবসায়ীর নাম ছিল গুর্মুখ রায় এবং উক্ত "ষ্টার থিয়েটার" ভবনটি নির্মিত হ'য়েছিল তখন বর্ত্তমান চিত্তরঞ্জন এ্যাভিনিউ ও দানী ঘোষ সরণির (বীডন ষ্ট্রীট) সংযোগস্থলে। নবগঠিত "ষ্টার থিয়েটার" তখন চ'লেছিল কয়েক বছর সগৌরবে এবং প্রচুর খ্যাতি অর্জনেও সক্ষম হ'য়েছিল উক্ত সংস্থা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য: ষ্টার থিয়েটার-এর জমিটি ছিল লীজ নেওয়া এবং সেই জমিটি ক্রয় করলেন মতিলাল শীলের পৌত্র গোপাললাল শীল। জমি দখলের নিমিত্ত গোপাল লাল নোটিস্ দিলেন ষ্টার থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষের উদ্দেশে থিয়েটার ভবনটি ভেঙ্গে ফেলবার জন্য। কিন্তু তা কি ক'রে সম্ভব? সুতরাং উক্ত থিয়েটার কর্ত্তৃপক্ষ তখন বাধ্য হ'লেন গোপাল লাল শীলের নিকট বাড়ীটি বিক্রয় করতে, মাত্র ত্রিশ হাজার টাকায় এবং উক্ত টাকার কহকাংশ দিয়ে ক্রয় করলেন বর্ত্তমান ষ্টার থিয়েটারের জমি হাতীবাগানে। গোপাল লাল শীল বাড়ীটি ক্রয় করবার পর সেখানে তিনি শুরু করলেন "এমারেল্ড থিয়েটার"। প্রথমে কেদারনাথ চৌধুরীর ব্যবস্থাপনায় থিয়েটার চালিয়ে লোকসানের মাত্রাই বৃদ্ধি হচ্ছে দেখে, বন্ধুদের পরামর্শে গোপাললাল তখন গিরীশচন্দ্র ঘোষকে উক্ত থিয়েটারের ম্যানেজারের পদে নিয়োগ করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। কিন্তু গিরীশচন্দ্র গোপাল শীলের প্রস্তাবে প্রথমে রাজী ছিলেন না। পরে অবশ্য গোপাল শীলের বিশেষ অনুরোধ এবং পীড়াপীড়িতে গিরীশচন্দ্র বিশ হাজার টাকা দাদন নিয়ে পাঁচ বছরের চুক্তিতে এমারেল্ড থিয়েটারের ম্যানেজারের পদে যোগদান করেছিলেন। ইতিমধ্যে হাতীবাগানে "ষ্টার থিয়েটার" ভবনের নির্ম্মাণ কার্য্য শুরু হ'য়েছিল এবং গিরীশচন্দ্রের নিজস্ব উক্ত বিশ হাজার টাকা থেকে ষোল হাজার টাকা দেবার পর বর্ত্তমান ষ্টার থিয়েটার তৈরী হয় ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে। গিরীশ-রচিত "নসীরাম" নাটক দ্বারা ষ্টার থিয়েটারের উদ্বোধন অনুষ্ঠান সম্পন্ন হ'য়েছিল এবং নাম-ভূমিকায় ছিলেন রসরাজ অমৃতলাল বসু।

গিরীশচন্দ্র ঘোষ এমারেল্ড থিয়েটারে যোগদান করার পরে গোপাললাল শীলের মৃত্যু হয়। অতঃপর গিরীশ চন্দ্র উক্ত থিয়েটার ছেড়ে আসেন এবং ষ্টার থিয়েটারে পুনরায় যোগদান করেন। গোপাল শীলের

মৃত্যুর পর তাঁর ভ্রাতা কিছুদিন এমারেল্ড থিয়েটার চালিয়েছিলেন, কিন্তু তার পরেই প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ হ'য়ে যায়। অতঃপর উক্ত মঞ্চে ১৯৩০ সাল পর্য্যন্ত বিভিন্ন থিয়েটার যথা :—কোহিনুর, ক্লাসিক, মনমোহন, মনমোহন নাট্যমন্দির প্রভৃতি বহু প্রতিষ্ঠানের জন্ম-মৃত্যু পরিদৃষ্ট হ'য়েছে। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে চিত্তরঞ্জন এ্যাভিনিউ-এর সম্প্রসারণের নিমিত্ত, কলিকাতা ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাষ্ট উক্ত ঐতিহ্যবাহী রঙ্গালয়টি ভেঙে ফেলে। ক্ষতিপূরণ বাবদ লক্ষাধিক টাকা তৎকালীন উক্ত থিয়েটারের দখলদার প্রবোধচন্দ্র গুহঠাকুরতা ট্রাষ্টের নিকট থেকে পেয়ে তদ্দ্বারা নির্মাণ করেছিলেন "নাট্য নিকেতন" (বর্ত্তমান বিশ্বরূপা) ১৯৩১ সালে। রঙমহলও নির্মিত হ'য়েছিল ঐ বছর প্রখ্যাত অভিনেতা রবি রায়ের প্রচেষ্টায়। মিনার্ভা থিয়েটার স্থাপিত হ'য়েছিল ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে। বাংলার নাট্য ইতিহাসের সুদীর্ঘ শতবর্ষে বহু থিয়েটারের সৃষ্টি ও লয় হ'য়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নাট্যোন্নয়ন কতটা কী হ'য়েছে, সে সম্বন্ধে যথেষ্ট গবেষণার প্রয়োজন। তবে বাংলার পেশাদারী মঞ্চ-দীপ যে অদ্যাবধি নির্বাপিত হয়নি, নাট্যামোদীদের পক্ষে উহা কম সান্ত্বনার বিষয় নয়।

গত ৭ই ডিসেম্বর, ৭১, বঙ্গ-রঙ্গ-মঞ্চের প্রাক্ শত বর্ষানুষ্ঠান সম্পন্ন হ'য়েছিল কলিকাতার বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন নাট্য-সংস্থা ও বিশিষ্ট নাট্যবিদদের দ্বারা। অনুষ্ঠান উদ্যোক্তাদের উদ্দেশ্য ও প্রচেষ্টা অতি মহৎ, সন্দেহ নাই। কিন্তু তৎসঙ্গে তাঁদের কাছে অতি ক্ষুদ্র একটি প্রশ্ন এই : সুদীর্ঘ শতবর্ষব্যাপী বঙ্গ-রঙ্গ-মঞ্চের ঐতিহ্য সঠিকভাবে সংরক্ষিত হ'য়েছে কি না, কারণ, যদি তা হত, তা হ'লে সম্ভবত রঙ্গ-মঞ্চ এতদিনে সুপ্রতিষ্ঠই হ'ত। নাটকের এত অধিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজন হ'ত না। সুতরাং যেখানে ঐতিহ্যের কোন গুরুত্ব নেই, সেখানে শুধু শতবর্ষানুষ্ঠান দ্বারা আধুনিক রঙ্গ-মঞ্চের বিশেষ কোন উন্নতি-সাধন হবে কি না, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে গিরীশ যুগ কিম্বা শিশির যুগেও সুদীর্ঘ চার-পাঁচ ঘণ্টা নাটক দেখে দর্শকগণ বিশেষ কোন ক্লান্তি বা বিরক্তি বোধ করতেন না, তার প্রধান কারণ ছিল তৎকালীন অভিনয় হ'ত মর্মস্পর্শী। নাটকের শুরু থেকে শেষ পর্য্যন্ত প্রেক্ষাগৃহের নির্দিষ্ট আসন ছেড়ে খুব কম দর্শকই বাইরে গমনাগমন করতেন নিতান্ত প্রয়োজন বোধেও। নাটকের সঙ্গে একাত্ম হ'য়ে অতি নিবিষ্ট চিত্তে দর্শন ও শ্রবণ করতেন। কিন্তু আজকের দিনে হাল্কা নাটকের ২-২॥. ঘণ্টার অনুষ্ঠানেও সচরাচর দেখা যায় যে, দর্শকগণ প্রেক্ষাগৃহে নিজ আসনে উপবিষ্ট থেকে নাট্যরস পান না ক'রে, অধিকাংশ সময়ই বাইরে গিয়ে ধূমপান করেন। অতএব আধুনিক বঙ্গ-রঙ্গ-মঞ্চ কোন পথে?

সনাতন পিছু টানে

(গল্প)

মতিলাল ধর

ভূমিকা

[নবীন পুরাতনের অনুশাসন মানে না। তার ভ্রূকুটি সহ্য করে না, নবীন ও পুরাতনের সংঘর্ষে পুরাতনীর অপমৃত্যু ঘটে। কিন্তু সে একেবারে লুপ্ত হ'য়ে যায় না। তার আত্মা প্রাচীন প্রকাণ্ড বৃক্ষ, পড়ো বাড়ী প্রভৃতিতে তথাকথিত আশ্রয়প্রাপ্ত প্রেতের মত আচরণ করে, বহন করে সনাতনের সংস্কারের বোঝা, তাই সনাতনের প্রভাব নবীনকেও পিছুটানে, নবীন তার মুখে বড়াই করলে কি হবে?

আলোচ্যমান গল্পের নায়ক নায়িকা ঠিক সেই সনাতনী পিছুটানে থমকে দাঁড়িয়েছে কিনা প্রাজ্ঞ পাঠক পাঠিকা তাই বিচার করে দেখবেন]

"ঢং ঢং" শব্দে গাড়ী ছাড়বার ঘণ্টা বেজে উঠল। "হাত চালান মশাই হাত চালান। গাড়ী ছেড়ে দিচ্ছে, টিকিট দিন।" টিকিট কাউণ্টারে তখনও ভিড়, ঠেলা-ঠেলি। কাউণ্টারের খুপরির মধ্য দিয়ে একটা হাত বেরিয়ে আসতে না আসতে আর একটা হাত ঢুকছে। প্রণব এই ভিড় ঠেলে কোনরকমে টিকিট নিয়ে তাড়াহুড়া করে গাড়ীতে উঠে পড়ে। লালগোলা মেইল। বাষ্পীয় ইঞ্জিন উষ্ণ নিশ্বাস ছেড়ে স্টেশন থেকে আস্তে আস্তে বিদায় হ'লো। সেকেণ্ড-ক্লাস কম্পার্টমেন্ট। ভিড় তেমন ছিল না। কম্বলটা পেতে বসে পড়ে প্রণব।

দেশ স্বাধীন হবার ফলে সদ্যমুক্ত অকৃতদার বিপ্লবী প্রণব মুক্তির আনন্দ পেল কই? সংসারে বন্ধনহীন হয়েও সে কলিকাতার এক গলির মধ্যে আবদ্ধ। সরকারী ভাতা এবং একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা সম্পাদনের জন্য যৎকিঞ্চিৎ পারিশ্রমিকই তার জীবন-যাত্রার পথ সুগম করে দিয়েছে। বয়স এখন চল্লিশের চরম প্রান্তে। দীর্ঘ কারাবাসে চেহারা কিছুটা ভেঙে পড়েছে। আসক্তি-অনাসক্তির দ্বন্দ্বে তার জীবনে বৈরাগ্যই এখন এসে জয়ের সূচনা করেছে। তবু সময় সময় প্রথম জীবনের বন্ধু-বান্ধবীদের কথা মনের কোণে উঁকি মারে। হঠাৎ সেদিন তার মাসতুতো বোন সোমার সঙ্গে কোন এক আত্মীয়ের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ উপলক্ষ্যে দেখা হয়। সোমা প্রণবের বিপ্লবী জীবনের এক সহকর্মী ও প্রিয় বান্ধবী মানসীর কথা বলে কি যেন একটা কথা প্রসঙ্গে। এই সোমা, মানসীও একদিন সন্ত্রাসবাদীদের শাগরেদি করেছে। তাই ওরা আজ ওদের অতীত জীবনের

কাহিনীগুলি রোমন্থনকারী জীবের মত অবসর সময়ে মন থেকে উদ্‌গিরণ করে মুখে টেনে এনে আরাম উপভোগ করে। মানসীর কথা মনে পড়াতে প্রণবের মনে যেন কিরকম একটা প্রতিক্রিয়া হ'লো। তাই তার পরদিনই মুর্শিদাবাদ যাত্রার দিন স্থির হ'লো। সোমার কাছে মানুর ঠিকানা পাওয়াতে লালগোলা মেইলের গতিবেগের চেয়েও তার মনের গতি অধিকতর দ্রুত হয়ে উঠেছিল। তার বহুদিনের সখ মুর্শিদাবাদের ঐতিহাসিক নিদর্শন দর্শন করবে। এবার একসঙ্গে তার 'রথ দেখা আর কলা বেচা' দুটোই হবে।

কয়লার ইঞ্জিন প্রচণ্ড শব্দে প্রবলবেগে চলেছে। ব্যারাকপুর, নৈহাটি প্রভৃতি কয়েকটা স্টেশন কখন একটু ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলেছে, তা তার মনে ছাপ দিতে পারেনি। এই শীতের হাওয়া ইঞ্জিনের ধোঁয়া কোনটারই সে পরোয়া করেনি। জানালার ভিতর দিয়ে মাথাটা বের করে সে নিবিষ্ট-মনে বাইরের দৃশ্য দেখছে। সবুজ ধান-ক্ষেত, কল-কারখানা, গাছপালা যেন পেছন থেকে তাড়া খেয়ে প্রাণের ভয়ে ছুটেছে। মাঝে মাঝে কতকগুলি রেল-স্টেশন সবুজ নিশান দেখিয়ে তার নিরাপদ যাত্রার ইঙ্গিত করছে। প্রণব মাঝে মাঝে মাথাটা গাড়ীর মধ্যে এনে দর্শনের বিরতি জানায়। চোখ-মুখটা রুমাল দিয়ে মুছে ফেলে। গাড়ীর গতি বেশ কিছুটা কমে এল। এর মধ্যেই শোনা গেল—"চা য়া—চা—শিঙ্গাড়া—ফুল-কপির শিঙ্গাড়া—নলেন গুড়ের সন্দেশ—সরপুলী—।"

প্রণব জানালা থেকে মুখ বের করে দেখে রাণাঘাট স্টেশন। প্রণবের ধূমপানের নেশা নেই। অন্য নেশাই বা কি আছে? তবে প্রণব নামকরা চাতাল। অর্থাৎ চায়ের নেশাটা তার চিরকালই বেশী। প্রণব ডাকল একটা চা-এর ভেণ্ডারকে—"এই যে চা—"

ডাকা মাত্রই চাওয়ালা হাজির। চা দিতে না দিতেই শিঙ্গাড়াওয়ালাকে সে ইঙ্গিত করে। সে বলে,—"বাবু শিঙ্গাড়া দেই—" বাবু বলে, "একটা—"

"—সে কি বাবু? দেখুন না খেয়ে।" হাতে গরম শাল পাতার ঠোঙায় করে দুটো শিঙ্গাড়া দিয়েই বাঁহাত পেতে বলে, "বাবু পয়সা দিন তো, গাড়ী ছেড়ে দিচ্ছে।"

"—টাকার ভাঙানি হবে তো? এই নাও চাএর দামটাও একসঙ্গে রেখে ওকে দিয়ে দাও।"

—"দিচ্ছি বাবু" বলে আর একটা খরিদ্দারের পয়সা হাতে নিয়ে প্রণবের হাতে ফিরতি পয়সা দিয়ে সে সরে পড়ল। গাড়ী ছেড়ে দিল। প্রণব পয়সা হাতে নিয়ে দেখে আধুলিটা একেবারে খাঁটি সীসার তৈরী। লোকটা ইচ্ছে করেই যে অচল আধুলিটা দিয়ে সরে পড়েছে, তা তার প্রস্থানের তৎপরতার কথা স্মরণ করেই সে বেশ বুঝতে পারল।

অদিন অক্ষণে যাত্রার ফল কি তবে ফলবে? এটা কি তার সূচনা? তার মেসের বন্ধু (আশুনাথ জ্যোতিষ শাস্ত্রী) নামকরা জ্যোতিষী, তার যাত্রাকালে নিষেধ-বাক্য প্রণব ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে উড়িয়ে দিয়ে বলেছিল, "আজ তাহলে ট্রেনে অন্ততঃ হিন্দু যাত্রী তো উঠবেই না। আরামে যাওয়া যাবে।" এখন প্রণবের সে-কথা মনে পড়ে। যাক্, আট-আনার উপর দিয়ে যাত্রাফল ফললে যাহোক মন্দের ভাল। গাড়ী অদূরবর্তী ধুবুলিয়া উদ্বাস্তু শিবিরের রুগ্ন জীর্ণ, শীর্ণ, শিশু-বৃদ্ধ অধিবাসীদের দুর্দশা দেখে দমে গেল নাকি? গতিবেগ যেন কমেই গেল। আসলে লালগোলা মেইল এখান থেকে লোকাল প্যাসেঞ্জার ট্রেনের সামিল হয়। সব স্টেশনেই তাকে এখন থামতে হবে।

দেখতে দেখতে সন্ধ্যা ম্লানমুখে বিদায় হলো। রাত্রি তার রাশি রাশি অন্ধকার নিয়ে রেল লাইনের দুধারে ঝোপ-জঙ্গল ও বাবলা বনের দিকে এগিয়ে আসছে। অদূরে দেখা যাচ্ছে সেই লাল পলাসীর আম্রকানন। প্রণবের মন ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। সেই লাল পলাসীর রক্তমাখা স্মৃতি তার মনে গভীর রেখাপাত করে। সেই আম্রকানন নেই বটে, আছে হয়ত তাদের বংশধররা। তাদেরও ভাল করে দেখা গেল না। রেলে বসে দেখা তো। তারা যেন বাঙালীর কলঙ্কের বোঝা মাথায় নিয়ে গাড়ীর বিপরীত দিকে লাফে-ঝোপে দ্রুত পলায়ন করছে।

গাড়ী আধঘণ্টা লেটে সেদিন করিমপুর স্টেশনে প্রবেশ করে। রাত তখন এগারটার মতই হবে। শীতের রাত। পৌষের রাত—রাস্তায় সামান্য কয়েকজন যাত্রী ছাড়া আর কোন লোক দেখা যায় না। রিক্‌শা স্ট্যাণ্ডে রিক্‌শার সংখ্যাও খুব বেশী নয়। প্রণবের সেদিনকার গন্তব্যস্থল শহর থেকে দূরে কোন এক গ্রামের ভিতরকার কলোনী। কেউ সেখানে অত রাত্রে সহজে যেতে চায় না। তবে ভাড়া বেশী পেলে আপত্তি বড় একটা থাকে না। দর কষাকষির পর বেশী লাভের আশায় এক রিক্‌শওয়ালা রাজী হল। এক বৃদ্ধ এসে চাপা গলায় বললে, "একা যাচ্ছেন তো? আমাকে পার্টনার করে নিন না, রিক্‌শ খাগড়ার ওপাশে যাবে না। তারপর আমি বরং আপনাকে পথ দেখিয়ে দেব। আমার বাড়ী খাগড়ার থেকে দশ মিনিটের পথ। রিক্‌শওয়ালার কাছে আপনি যা বললেন সে তো অনেক দূর। আমি এখানকার লোক। ওদের বাড়ীটা হবে জলার মধ্যে। তবে পথ-ঘাট ভাল। আমি দেখিয়ে দেব।" বৃদ্ধের কথাটা নেহাৎ মন্দ বলে মনে হচ্ছে না, তবে দিন-কাল ভাল নয়। শেষে বিপদে ফেলবে নাকি? প্রণব একটু ইতস্ততঃ করছে।

রিক্‌শওয়ালা বলে "উঠুন বাবু...।" যাক্‌গে, ওর বয়সটাকে অন্ততঃ বিশ্বাস করা যাক। আর অবিশ্বাসেরই বা কি আছে। আমার সঙ্গে তো তেমন কিছু নেই। ঘড়িটা নেয় তো নেবে। কুদিনের যাত্রাফল ফলে যাবে। এই কথা ভাবতে ভাবতে উভয়েই রিক্‌শ চেপে বসল। গাড়ী ঠুং ঠাং শব্দ করতে করতে চলল। বৃদ্ধ ব্যক্তি প্রণবকে পথের নির্দেশটা দিলেন খুব আন্তরিকতার সঙ্গেই। রিক্‌শওয়ালা খাগড়া রোডের পর পনের-বিশ গজ গিয়েই বলে, "নেমে পড়ুন বাবু। আর যাওয়া যাবে না।" বৃদ্ধ তাঁর বাড়ীর কাছেই এসে পড়েছেন। সুতরাং তিনি আর তেমন কিছু বলেন না। বাবু বলেন, —"আর যাবেনা? সে কি...?" বৃদ্ধ বলেন, 'যাওনা বাবা, বক্‌শিস পাবে।"

"—বক্‌শিস। টাকার জন্য জান দেব? ঐ তেঁতুল তলা দিয়ে এত রাতে কেউ যায়-আসে?"

—"কেন? কেন? চোর-ডাকাত আছে নাকি?" প্রণব জিজ্ঞেস করে গভীর উৎকণ্ঠায়।

রিক্‌শওয়ালা বলে—"ডাকাত কোথা? থাকলেই বা আমাদের গায় হাত দেবে কে?"

"—তবে?"

" —আপনি জানো না বুড়োদা?"

বৃদ্ধ মাথা চুলকাতে চুলকাতে বলেন, "ঐ সনাতনের প্রেতাত্মার কথা তো অনেকে বলে..."

"—কেন, আপনি বুঝি জানেন না। সনাতন পেছন থেকে কাপড় টেনে ধরে না? অনেকে মারা যায়নি? দিন তো আমার ভাড়ার পয়সা।"

রিক্‌শওয়ালার কথায় বুঝা গেল, ওখানে ভূতের ভয় আছে। প্রণব সহজকণ্ঠে বলে, "ভূতের ভয়। ভূত আমাদের ধরে না। ওরা তো আমাদের জ্ঞাতি। এই নাও তোমার ভাড়া..."

বৃদ্ধ পকেটে হাত দিয়ে কিছু দিতে হবে কি না তা জানবার অপেক্ষা করছেন, বাবু বলেন, "আপনাকে কিছু দিতে হবে না। ওকি করছেন দাদা, আমিই দিয়ে দিচ্ছি।"

"সে কি, সে কি" বলে বৃদ্ধ তাঁর ভদ্রতা রক্ষা করলেন এবং সহর্ষে বললেন, "বাবু ভূত মানেন না তো। তবে আর কি? আমি বরং একটু এগিয়ে দিচ্ছি।" এই বলে বৃদ্ধ বাবুকে একটু এগিয়ে পথ দেখিয়ে নমস্কার জানিয়ে নিজের বাড়ীর দিকে চলে যান। রিক্‌শওয়ালা ইতিমধ্যেই বিদায় হয়ে গেছে।

—"সনাতন পিছু টানে" কথাটা মন্দ নয়।

বেটা ভূতের ভয় দেখিয়ে অর্দ্ধেক পথ না গিয়েই পুরা ভাড়া আদায় করে চম্পট দিল। অজানা অচেনা জায়গায় রিক্‌শওয়ালাদের পাল্লায় পড়ে অনেকেই বিপদে পড়ে। এ-কথা প্রণবের অজানা ছিল না। বিশেষতঃ ওর কাটা কাটা কথাগুলো শুনলেই বেশ বোঝা যায় যে ওর মেজাজ তেমন ভাল নয়।

প্রণব চলতে আরম্ভ করে। পথ ভাল। জন-প্রাণী-শূন্য। শীতের রাত। পল্লীর পথ সর্ব্বত্রই এইরূপ।

চলতে চলতে সে এসে পড়ে সেই তেঁতুল-তলায়। সেই প্রকাণ্ড তেঁতুল গাছ। বড় বড় কোটরযুক্ত এক বিশাল তিন্তিড়ী বৃক্ষ। কতকাল ধরে কত সাপ, শিয়াল, পেঁচক এখানে আশ্রয় নিয়ে আছে কে জানে। এতদ্ অঞ্চলে এ-বৃক্ষটি বহু প্রাচীন ঘটনার সাক্ষ্য দেয়। বৃক্ষটির চারি দিক জঙ্গলে ঘেরা। পাশ দিয়ে সরু রাস্তা চলছে এঁকে-বেঁকে। দু'ধারে বাসক, বন-তুলসীর ঝোপ-জঙ্গল। সহসা তেঁতুল বৃক্ষের প্রাক্তন অধিবাসী এই নবাগত ব্যক্তির আগমনে বিরক্ত হয়ে তার প্রতি "কোপ কোপ" শব্দ করে নিজের কোপের কথা জানিয়ে দিল। অধি-বাসী একটি হুতুম পেঁচা। আর একটা নিশাচর পাখী মাথার উপর দিয়ে উড়ে যায়। প্রণব আঁতকে ওঠে। প্রণব চলছে। তারপর ওর সামনে দশ-বার ফুট দূর হতে ছুটো কালো রঙ-এর খাটাস গোঁ গোঁ করতে করতে নির্ভয়ে রাস্তা পার হয়ে গেল। প্রণব শুনতে পায় একটা কড়্ কড়্ শব্দ বাঁশ-ঝাড়ের মধ্যে। প্রণব ভাবে বোধ হয় বাঁশে বাঁশে ঘর্ষণের শব্দ। তার পথ ফুরায় না। তার পা যেন চলে না।

সত্যিই কি পিছু টানে?

"সনাতন পিছু টানে –" রিক্শওয়ালার সেই কথাটা এখন প্রণবের মনে নিঃশব্দে সাড়া দেয়। প্রণব শাস্ত্রমতে প্রৌঢ়। তবুও প্রণব পুরাতনকে অবজ্ঞা করে নবীন যুগের নিশানা ধরে এগিয়ে চলতে চির-অভ্যস্ত। চলছে প্রবলবেগে। পায়ের গতির সঙ্গে তাঁর হৃদ্‌যন্ত্রের গতিও চলছে সমতা রেখে। কিয়দ্দুর এগিয়ে যেতেই এক কুটীরে সে একটা কেরোসিনের বাতির আলো দেখতে পেল। মিট্‌মিট্ করে বাতি জ্বলে। তার পাশে বসে এক বৃদ্ধ গুন্ গুন্ করে আপন মনে গান গায়। আর বাঁশের চটা দিয়ে ঝুড়ি বুনায়। প্রণব বৃদ্ধের কুটীরের দরজার কাছে গিয়ে ডাকে,—"ও দাদা, দুয়োরটা একটু খুলুন তো।"

পৌষের শীত। সেবারে শীতের প্রকোপটাও একটু বেশী ছিল। বাঁশের মুড়ো দিয়ে অগ্নিকুণ্ড জেলে দাওয়ার দরজা দিয়ে দিব্যি কাজ করে আর রামপ্রসাদী গান গায়। "মা আমায় ঘুরাবি কত।" রসভঙ্গ হয়ে গেল। এবার উত্তর দিল—"কে গা—আঁ?"

"—দেখুন না।"

বৃদ্ধ এই অপরিচিত ভদ্রলোকটিকে একটু জড়সড় হয়ে পরিচয় জিজ্ঞাসা করে। প্রণব সংক্ষেপে নিজ পরিচয় দিয়ে মানসীর স্বামীর নাম বলতে তার বাড়ীর সন্ধান পায়। তাকে নমস্কার করে ধন্যবাদ জানায়। বৃদ্ধ বাইরে দাঁড়িয়ে বাড়ী দেখিয়ে দিয়ে বলে,—"ঐ তো বাবুর বাড়ী। রাস্তার মোড় ঘুরলেই প্রথমে তাঁর বাড়ী। বৃদ্ধ প্রতিনমস্কার করে ঘরে প্রবেশ করে। মণীন্দ্র মিলের বাঁশী শুনে সে শুয়ে পড়ে। পল্লীগ্রামের লোক। আহারাদি সে সন্ধ্যার পরই সেরে ফেলেছে।

প্রণব মানসীর বাড়ী উপস্থিত হল। মানসী অতি অপ্রত্যাশিতভাবে প্রণবকে পেয়ে ভারি খুশী। প্রণবেরও আনন্দের সীমা নেই। পথের ক্লেশ সে যেন ভুলে গেছে। মানসীর স্বামীর খবরটা প্রণব প্রথমেই জেনে নিল। মানু বললে—"উনি এবার কুচবিহারে ট্রান্সফার হয়ে গেছেন; এই অল্প কয়েকদিন হলো—"

—"উনি ওখানে একাই থাকবেন? সোমা—সোমাকে তোমার মনে পড়ে? তার কাছেই শুনলাম ওর স্বাস্থ্যের কথা। তোমার স্বামী নাকি…"

—"বেশ বলছ। মনে পড়ে মানে—? সেকি আমার ভোলাবার মত আত্মীয়। সে তো আমাদের সব কথাই জানে। শুধু রুগ্ন খিট্‌খিটে মেজাজ। একা থাকতেই নাকি তার ভাল লাগে।"

—"তা বেশ আছ তাহলে।"

প্রণবের কথার জবাব না দিয়ে মানু রান্নাঘরে চলে যায়। শুধু বলে যায়, "তুমি বস এই বিছানাটার ওপর। আমি আসছি এখুনি।"

মানসীর সংসার গড়ে উঠেছে তার চিররুগ্ন স্বামী আর দুটি শিশু-সন্তান নিয়ে। তার উপর উপসর্গ তার স্বামীর বিধবা বৃদ্ধা পিসী।

মানসীর ঘর মাটির। এই মাটির ঘরে আধুনিক

সাজ-সরঞ্জামের অভাব নেই। তবে তার প্রত্যেকটি দ্রব্যের উপর প্রাচীনের প্রভাব বর্তমান। প্রণব মানসীর সাজান-গুছান সংসার, গৃহিণী-সুলভ চালচলন দেখে অবাক্। এ কি সেই মানসী? ক্ষুরধার যার বচনে, হাতের আয়ুধ যার বোমা-পিস্তল, তার হাতে আজ হাতা-খুন্তি। মেয়েটার প্রগতির সমাধি রচনা হল এখানেই। একেই বলে বিবাহ-বন্ধন।

আলগা চুলায় কয়েকখানা ঘুঁটে এবং কাঠের টুকরো দিয়ে কেরোসিন ঢেলে মানু আগুন জ্বালে। ইতিমধ্যে বৃদ্ধা পিসীমা গায়ে একটা কম্বল জড়িয়ে বারান্দায় গিয়ে একটা ছাগীর বাঁট থেকে টেনে প্রায় একপো দুধ নিয়ে এসে বলে, "এই ধর বৌমা। এই দুধটা গরম করে দাও। গাঁও-গেরামের এত শীত ওদের সহ্য হবে কেনে? ছাগীর দুধ চলে ত বাবা। গন্ধ নেই।"

"—ছাগীর দুধ তো ভাল। কেন চলবে না। তা আপনি এই শীতে কেন উঠলেন।"

"—সে কি, অতিথি নারায়ণ। অতিথির আদর-যত্ন করা আমাদের সনাতন প্রথা। আচ্ছা বাবা, বৌমা তোমার কে হয়?"

"—আমার বোন।"

"—বৌমার তো ভাই নেই শুনেছিলাম।"

—"তা ঠিকই শুনেছেন। ও আমার এক মাসীর মেয়ে।"

বৃদ্ধা আর কিছু বলল না। রান্নাঘরে মানসী আহার্য্যের ব্যবস্থা করতে ব্যস্ত। প্রণব সেখানে গিয়ে বলে,—"এত রাতে এসব কি আরম্ভ করেছ? দুধ-মুড়িই তো যথেষ্ট।"

—"কি আর তেমন করছি? দুটো ডিমসিদ্ধ করে দিচ্ছি। শীতে সকালে রান্না করা চিতল মাছের ঝোল বেশ জমাট বেঁধে আছে। এই নাও, এবার চা খেয়ে নাও।"

প্রণব নিজেই আসন পেতে মানুর পাশে বসে চা পান করে।

মানু দুধ, মুড়ি তার কাছে দিয়ে একটা ছোট পাত্রে কিছু চাল চাপিয়ে দিয়ে বলে, "তোমরা শহরে লোক। বাসী জিনিষ মানুষে খায়, এ-কথা শুনলেও শিউরে উঠবে। আমাদের ওতে কিছু হয় না। বিশেষ করে শীতকালে মাগুর-চিতলের জমাট-বাঁধা ঝোল আর গরম গরম ভাত, শীতের ভোরে ছেলে-মেয়েদের এটা হচ্ছে প্রিয় খাদ্য।"

—"আমরাও কি ছেলেবেলায় ওসব খাইনি? গাঁও গেরামের সেকালের কথা স্বপ্নের মত মনে হচ্ছে।"

গল্প বেশ জমে উঠেছে। মানসীর গা দিয়ে গরম চাদরটা জড়িয়ে জলন্ত উনানের কাছে বসে গল্প করছে প্রণব। মানসী মাঝে মাঝে দু-একটা মন্তব্য করে। বৃদ্ধা উঁকি মেরে দেখে নিজ শয্যায় শুয়ে পড়ে। কি যেন বিড়বিড় করে বলে। বৃদ্ধার চোখে এ দৃশ্য সহ্য হয় না। কোথাকার কে তার ঠিক নেই! কোন্ কুটুমটা? হোক না কুটুম। তা বলে ঘরের বৌ ওরকম বসে ফিস্ ফিস্ করে কথা কইবে পর-পুরুষের সঙ্গে?

কিছুক্ষণ পর বৃদ্ধা টানা গলায় হাঁক ছাড়েন—"ও বৌমা, একবার শোনা এদিকে..."

মানসী ঘরে এসে বলে, "আমায় ডাকলেন পিসীমা?"

"—বলি কদ্দুর হলো?"

"—আর দেরী নেই—"

"—আচ্ছা বৌমা, এই ভদ্রলোক তোমার কে হন?"

মানু একটু ইতস্ততঃ করে বলে, "আমার এক মাসীর ছেলে।"

"—তাই বল। আমি ঠিক ভেবেছিলুম। যাও একটু হাত নেড়ে কাজ সেরে ফেল। রাত কম হয়নি। চারটি খেয়ে শুয়ে পড়ুকগে। বারান্দায় ওর জন্য বিছানাটা ঠিক করে রেখেছি।"

তাড়াহুড়ো করে মানু প্রণবের নৈশ ভোজনের ব্যবস্থাটা ভালই করেছে।

মানুর শয্যার বিপরীত দিকে তার স্বামীর যে খাট-খানায় বিছানা পাতা ছিল সেখানেই গা ঢেলে দিল। তার ধারণা, এখানেই বোধহয় রাত্রি-যাপনের ব্যবস্থা

করা হয়েছে। মাটির ঘর। তবু কি সুন্দর সাজানো-গোছানো।

টেবিল ল্যাম্পটি তার নির্দিষ্ট স্থানই অধিকার করে বসে আছে। কিন্তু নিষ্প্রাণ। ঘরের এক কোণে একটি রেড়ির তেলের বাতি জ্বলছে মিট্‌মিট্ করে। তার শিখায় ছিল একটা নৈরাশ্যের ভাব।

বৃদ্ধা প্রণবকে জিজ্ঞাসা করে—"হ্যাঁ বাবা, তুমি কি চাকরি কর? ছেলেমেয়ে ক'টি?"

প্রণব হেসে বলে—"ওর কোনটার মধ্যেই আমি নাই। চাকুরীতেও নাই, পিতৃত্বেও নাই।"

"—ও—ও—তাই নাকি?" বৃদ্ধার কণ্ঠস্বরে একটা অশ্রদ্ধার রেশ পাওয়া গেল। প্রণব প্রসঙ্গটা ঘুরিয়ে দেবার জন্য প্রশ্ন করে, "হ্যাঁ পিসী, ওই তেঁতুলতলায় ভূতের ভয় আছে নাকি?"

—"কেন ভয় পেয়েছ নাকি?"

—"না, না। রিক্‌শওয়ালা ওর জন্য আপনাদের বাড়ী পর্য্যন্ত রাত হয়েছে বলে ভয়ে আসতে চাইল না।"

—"হ্যাঁ, আছে বৈকি। লোকে বলে সনাতন বুড়ো মনের দুঃখে ঐখানে গলাফাঁস দিয়ে মরে। সে কোন্ যুগের কথা কেউই বলতে পারে না। অর্থাৎ সনাতন মরে ভূত হয়েছে। সেই ভূত অধিক রাত্রে কাকেও ওপথে একা পেলে তাকে পিছু টানে। আর নতুন লোকের তো অব্যাহতি নেই। তাই লোকে বলে সনাতন পিছু টানে।"

—"তাই নাকি?" হাসিমুখে প্রণব বলে, "মাম্নু দেখ তো আমার গায়ে হাত দিয়ে। মাথাটাও টন্‌টন্ করছে। তবে কি ভয় পেলুম নাকি?"

—"ঠাট্টা করছ কেন প্রণবদা, অনেক লোক ভয় পেয়ে মারাও গিয়েছে।"

ওরা দুজনে হাসাহাসি করে ভূতের কথা নিয়ে। বুড়ী একটু কালা। কানে খাট হলেও দৃষ্টিশক্তি প্রখর। বৌমা কোথায় কি ভাবে কি করে তার বক্র দৃষ্টিতে ধরা পড়ে। সেদিকেও সে সচেতন। বৃদ্ধার স্বভাব তার অজানা নেই। সে জানে প্রবীণ নবীনের প্রগতি সইতে পারে না। তাই সে সর্বদা অনর্থ এড়াবার জন্য নিজেকে সামলিয়ে বলে।

মাম্নু রেড়ির তেলের প্রদীপটি হাতে করে বারান্দার পথে আগে আগে চলে। প্রণব তার অনুগমন করে। প্রণব সেখানে বিছানার উপর উঠে বসে। মাম্নু হারিকেনটি জেলে একটু নিষ্প্রভ করে রেখে বিদায় হতে চলেছে। প্রণব বাধা দিয়ে বলে, "বসনা একটু। তোমার যাত্রা দেখে আমার তো ভয় হয়। তোমার সাজ-সরঞ্জাম, আচার-ব্যবহার দেখে আমার মনে হয় তলোয়ারের খাপে খড়্গ ভরার ব্যর্থ প্রয়াস। কি করে তুমি বেঁচে আছ?"

"—এ বাড়ীতে রেড়ির তেলের প্রদীপটি যেমন বেঁচে আছে, আমিও তেমনিভাবেই বেঁচে আছি। ঘুমোও এখন, আমি যাই এবার।"

"—ভাল কথা, তোমাদের সনাতনের অপমৃত্যুর কথাটা অন্ততঃ বলে যাও।"

—"বলি—সনাতন ছিল রেজিষ্ট্রি অফিসের একজন নকল-নবীস। তার বাপ-দাদার আমল থেকে এই কাজে সে পাকা-পোক্ত। তাছাড়া ভাল বেহালা-বাদক। ইংরেজ কালেক্টার সাহেব তার বাজনা শুনে তাকে প্রমশন দেবার জন্য রিকমেণ্ড করেন। সে তা নিল না। সে তার বাপ-দাদার আমলের টেবিলটির মায়া কাটাতে পারল না।"

"—মাম্নু বসে যাওনা। তোমাকেও বোধ হয় পিছু টানছে।"

মাম্নু স্মিতহাস্যে বলে, "তোমাকেও কি বাদ দেয়। হ্যাঁ, শোন, মেয়েটি বুঝি কাঁদছে।"

—"রবিবার দিন রামায়ণ গানের দলে বুড়ো বাজাতে যেত। তার ঐ বেহালা আর তার সহচর ছিল একটি কালরঙের আলখাল্লা। সেকালে উকিল এটর্নীরা যে রকম কাল পোশাক পরত ঠিক সেরকম। কতবার যে সেটা মেরামত করেছে তার ঠিক নেই। ওটাও তার ঠাকুরদাদার আমলের

"একদিন রাতে চোর ঘরে ঢুকে তার বেহালার বাক্সটি নিয়ে চম্পট দেয়। ঐ বাক্সটায় শুধু বেহালাটাই থাকত না, ওর টাকাকড়িও থাকত। বেহালার বাক্সটা ভেঙে টাকাগুলি ত নিয়েই গেল, তাছাড়া ভেঙে ফেলল তার প্রিয় পুরাতনের প্রতীক সেই বেহালাটি। ছিঁড়ে ফেলে দিল তার লম্বা কালো জামাটা। বৃদ্ধ পরদিন তেঁতুল তলায় গিয়ে ঐ দৃশ্য দেখে দীর্ঘস্বরে ক্রন্দন করে। মাটিতে মাথা কোটে। কার সাধ্যি তাকে ঘরে ফেরায়। নাতি-নাতনীরা হেসে খুন। বৃদ্ধ তার পুরাতনকে পুনরুজ্জীবিত করবার জন্য কত মিস্ত্রী দর্জির কাছে গেল। সবায় এক কথা বলে ওটাকে আর প্রাণ-দান করা সম্ভব হবে না। ওটা যে খরচায় মেরামত হবে তাতে অমন দু-তিনটা বেহালা কেনা যাবে। জামাটা মেশিনে তুলে সামান্য একটু টান দিলেই সব ফেঁসে যাবে। তারপর বৃদ্ধ পাগল হয়ে গেল। পুরাতনের শোকে সে একদিন আত্মহত্যা করে ঐ গাছতলায়। সেই থেকে ঐ প্রবাদ—সনাতন পিছু টেনে ধরে পথে অধিক রাতে লোক পেলে।"

',—মাসু তোমার গল্প শেষ ?"...

—"হ্যাঁ...আসি তবে, ঘুমোও। ঐ শোন, বুড়ী ডাকে।

—"ঘুমের ঘোরেও ডেকে ওঠে বুঝি ?"

—"না, মেয়ে কাঁদছে...যাই—"

বৃদ্ধা লেপে আপাদমস্তক ঢেকে তার পেটের সঙ্গে হাঁটু দুটির মিলন ঘটিয়ে একটি কেওড়া পোকার মত বৃত্তাকার হয়ে একটু আরাম বোধ করছে। চোখে ঘুম নেই, আছে তন্দ্রা। বৌমা মশারীর মধ্যে আছে কি না দেখতে পায় না রেড়ির তেলের ক্ষীণ আলোক-রশ্মিতে। খুকীর কান্না শুনে বৃদ্ধা বলে, 'ও বৌমা, ও কাঁদছে কেন ?'

মাসু প্রণবের মশারীটা ফেলে দিয়ে নিঃশব্দে তার ঘরে গিয়ে লেপের মধ্যে ঢুকে ঘুম ভাঙার শব্দসূচক হাই তোলে। মেয়েও মায়ের কোলে মাথা ঢুকিয়ে শান্ত হয়। বৃদ্ধাও নিশ্চিন্ত মনে নাক ডাকিয়ে নিদ্রা যায়। কেবল একটি প্রাণীর তখনও ঘুম আসে না। সে প্রণব। সে মনে মনে ভাবে সনাতনের প্রভাব এ নবীন যুগেও তো কম নয়।

বেটা মরে ভূত হয়েছে। সে ভূত এখন কিংবদন্তীতে পরিণত হয়ে সকলকেই পিছু টানে। মাসুর মত দুর্দান্ত মেয়েও এড়াতে পারছে না। প্রণবের দুটি চোখে ঘুমের স্থান নেই। সেখানে বসে আছে একটি নিখুঁত সুন্দরী শিক্ষিতা বাঙালী বধূ। সে তার বান্ধবী নয়। প্রিয় বান্ধবীকে সে যেন কোথায় হারিয়ে ফেলেছে। সনাতন বোধ হয় তাকেও পিছু টানছে।

বড় ঘরের বড় কথা

(উপন্যাস)

পুষ্পদেবী সরস্বতী

ছাঃ এই সহজ কথাটা বুঝতে এত দেরী হচ্ছে কেন? আমাদের পিসীমার বিয়ে হয়েছিল তাঁর পিসেমশায়ের সঙ্গে—।

শিব্রামবাবুর ভাষায় অবিশ্যি পরে তিনি আমাদেরও পিসেমশাই হলেন। এতে অবাক হবার কি আছে?

তাহলে ত জজ সাহেবের মেয়ের রূপোর বালা রূপোর বাঁক মল শুনেও তোমরা অবাক হবে। এখন সব অবাক হলে শেষে কর্ব্বে কি? এখন অবিশ্যি রূপোর গয়না ফ্যাশান হয়েছে।

তাছাড়া লাভ ম্যারেজও নয়।

লাভ ম্যারেজে পিসতুতো ভাই বোন বা ছোট ভাইটাকে বিয়ে করলেও বুড়ো পিসেমশাইকে বিয়ে কখনো কর্ব্বেনা কেউ।

অবিশ্যি যদি লক্ষ্যস্থলে টাকার অঙ্ক না থাকে। না, টাকার অঙ্ক ছিল না। টাকাই ছিল না তাঁর। আজীবন শ্বশুরবাড়ীতে ছিলেন।

শ্বশুরের জুড়ি গাড়ী করে হেঁদোয় গিয়ে সারা দুপুর দাবা খেলতেন যাকে পেতেন হাতের কাছে। একদিন তো আমাকেই ডাকলেন, অ-খোকা, খোকা এসোনা এক হাত হয়ে যাক।

আমি ত অবাক আমি জানি শামলা পরে পিসেমশাই আপিস যান। অ হরি? এই জন্য?

আসলে মাথার একটু গোলমাল ছিল পিসেমশায়ের। তাই তাঁকে সকাল সকাল নাইয়ে ধুইয়ে পোশাক পরিয়ে হেদোয় পাঠিয়ে দেয়া হত।

যাক বাব্বা বাঁচা গেল অবধি নিশ্চিন্দি—। আবার হয়ত তোমরা ভাবছো তবে তাঁর হাতে মেয়ে দেবার আয়োজন কেন?

আয়োজন হবে না? খরচ খরচা নেই তার ওপর কত বড় কুলীনের সন্তান? মেয়েও বলতে গেলে সাত পেরিয়ে আটে পড়লো—তখন তো চাল চিড়ে বেঁধে ছুটতে হবে সেই পাত্তরের সন্ধানে—। আর সেই পাত্তর কিনা হাতের ভেতর। তাই পিসীমা মারা যেতেই পিসেমশাইটিকে গেঁথে ফেললেন বাবা নিজের মেয়েটিকে দান করে। পিসেমশাই যথারীতি রয়ে গেলেন। বদল হল পিসীমার। রূপোর মল খাড়ু পরে বড় হয়ে বছর বছর তিনি বাড়তে লাগলেন চন্দ্রকলার মত। বাড়ীশুদ্ধ লোকের মত পিসেমশাইকে তিনিও পিসেমশাই বলেই ডাকতেন। ডাকটা বদলালো না কখন। পিসেমশাইও সেই এক ঘরে শোয়া, একঘরে খাওয়া, বারান্দায় বসে গড় গড়া টানা করে শ্বশুরবাড়ীর মোরসী পাট্টায় কায়েম রইলেন। লোকে কথায় বলে শালার বেটা শালা—ওর ত সত্যিই তাই। শালীর বিষয়েও ওকে শালীবাহন দি গ্রেট আখ্যা দেয়া যেত। কারণ চতুর্দ্দিকে শালীর ছড়াছড়ি—। আগে কর্ত্তার কন্যারা শালী ছিলেন, এখন কর্ত্তার নাতনীরাও শালীর রত্নমালা হয়ে বিরাজমানা। আগেকার লোকেরা পরিবর্ত্তন ভালোবাসত না—তাদের যেমন দীর্ঘ জীবন ছিল তেমনি সবই মজবুত দীর্ঘ জিনিষটা ছিল তাদের রুচিকর। এমন কি ঘুনসী ওলা ঘুনসী বিক্রি কর্ত্তে এসেও বলতো, নিয়ে যান বাবু নিয়ে যান মজবুত ঘুনসী—ছেলে মরে যাবে তবু ঘুনসী ছিড়বে না। এই স্লোগান গেয়ে যে ঘুনসী বিক্রি কর্ত্ত, তার

ঘুনসীও বিক্রি হত। হ্যা যা বলছিলুম, শুধু পরিবর্ত্তন হল পিসীমার, যথারীতি বছর বছর যেতে লাগলেন আতুড় ঘরে। আবার পিসীমার সতীনের মেয়েদেরও মানুষ করে তুলতে লাগলেন।

কিন্তু শুধু আতুড় ঘরে গেলেই ত হবে না? আতুড় ঘরের অতিথিরা বড় হয়ে রাতে কান্নাকাটি করলেই পিসেমশাই যেতেন ক্ষেপে। তারপর খাট থেকে পিসীমার হত নির্ব্বাসন গোয়াল ঘরে।

আবার শুনেছি প্রসব ব্যথা উঠলেও নাকি ছাতি হাতে করে পিসীমা যেতেন পিসেমশাইকে ডেড়ে। সে সব নিভৃত দৃশ্য নয়, প্রকাশ্য দিবালোকেই ঘটতো এই সব অঘটন।

তখনকার দিনে মেয়ে সন্তানকে মানুষে আবর্জ্জনাই মনে করতো—। তাদের ওপর খরচ-খরচাটা বড্ড লাগতো গায়ে। অবিশ্যি কিই বা খরচ ছিলো—না লাগতো দর্জ্জি খরচ, না ছিল কিণ্ডার গার্ডেন স্কুল, না ছিল আয়া, খানসামার বা অমলেটের খরচ। জজবাবুর মেয়েও দশ আনা দামের হাটে কেনা তাঁতের ডুরে পরে অবলীলা-ক্রমে মাঠে ঘাটে ঘুরে বেড়াত—।

আর প্রথম ভাগ থেকে বড় জোর কথামালা পড়তে পড়তে হয়ে যেত বিয়ে।

বিয়েতেই বা কি খরচ বলো? একপ্রস্থ কাঁসার বাসন, একখানা তসরের বেনারসী কানের চেড়ী ঝুমকো পায়ে মল হাতে বালা—। পনের টাকা ভরি সোনা তবুও জজবাবু সেটাকা খরচ না করে সেটা রূপোতেই সারলেন।

সতীনের মানে পিসীমার গয়নাগুলো তো বড় হয়ে পুঁটিই পরবে। পুঁটী কিন্তু তার ধার পাশও ঘেসলো না। ঐ রূপোর মল আর বালার সঙ্গে একান্ত বেমানান হলেও পিসেমশাই-এর শার্টগুলো অনায়াসে পরে বেড়াতে লাগলো।

এদেরই ছেলে গোবিন্দ আর বলরাম বিয়ে করলো অনেক—মানে কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে দিয়ে—লিখতো কে আছে কন্যাদায়গ্রস্ত জানাও, দায় উদ্ধার কর্ব্ব"।

এই কন্যাদায় উদ্ধার ছাড়া বিয়ের আর কিন্তু কোন দায় তিনি মানতেন না। কাজেই গজিয়ে উঠলো কাজুড়ার বৌ বাঁতলার বৌ সাঁতলার বৌ যত্রতত্র। আর গোবিন্দ দিন কাটালো তাস আর মাছধরা নিয়ে। জজ-বাবুর আর্থিক কতটা সুবিধে হল জানি না। জজবাবুর ছেলেরা জজবাবুর দোয়া বাড়ীঘরের সঙ্গে ভাগনে ভাগনীও পেলেন মন্দ নয়। কিন্তু জজবাবুর ছেলে লেখা-পড়া না শিখলেও বুদ্ধিতে ছিল দড়। জজবাবুর দুই ছেলে। বড়ছেলে হারু খুব মতলববাজ সে তখন ওদের দিয়েই শুরু করলো ব্যবসা। ভাগনীগুলি বরাত গুণে সুন্দরী, অত কুলীনের খোঁজ না করে খুঁজতে লাগলো বড় বড় জমিদার। তাদের মাতাল নাবালক ছেলে পেলেই ভাগনীদের বিয়ে দিয়ে অভিভাবক হয়ে বসতো—

অবিভাবক তো শুধু নয়। বেনামীতে সব শুষে নোয়া—। বড় ভাগ্নী গোলাপের বিয়েতে ত সব খরচাও তারা দিয়ে দিলে। তারপর মদের ঝোঁকে বেদম প্রহারের ফলে গোলাপ আর যেতে চাইত না শ্বশুরবাড়ীতে। মামলা করে মাসোহারার মোটা টাকা আদায় করে নিলো হারুবাবু। গোলাপ ত নাম সই করতেও জানতো না। তাকে টিপ সই করিয়ে দুটো রূপোর টাকা হাতে দিয়ে নির্ব্বিবাদে দুশো টাকা ঘরে তুলতেন। তাছাড়া তাদের জমিদারি থেকে আমটা কাঁটালটা ঘিটা তো আসতই।

চারটে ভাগ্নীকে খেলিয়ে মন্দ টাকা ঘরে তোলেনি হারু খুড়ো—। ভাগে দুজন বিয়ের খেয়ালে মেতে বেড়াচ্ছে। শুধু তা নয়, তাছাড়া রাজজ্যোতিষীও হয়েছিল।

খবরের কাগজে কাগজে বিজ্ঞাপন দেখনি? রাজা পঞ্চম জর্জের কুষ্ঠি প্রস্তুত কারক—শ্রীশ্রী বলরাম জ্যোতির্বার্ণব—অর্ণব হতে আর অসুবিধে কি বলো, সংসারটাই তো সমুদ্র। অর্ণব না হলে ভাসবে কি করে? আর রাজা প্রজা যারই তুমি কুষ্ঠি কর না, কে আর হাত বেঁধে রাখবে বলো?

আবার দেশ বিদেশে পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করার জন্ত ডাক পড়তো তার। তখন কপালে চন্দনের ফোঁটা গায়ে নামাবলী গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, কী সাজের ঘটা—এরি একটি গল্প শুনেছিলুম কল্পনার কাছে। কল্পনা হয় বলরামের মামাত শালাজ—।

কল্পনারা গেছে মধুপুরে হাওয়া খেতে। সেখানে গিয়ে হবে ত হ মেয়ের খুব হাম বেরুল। সেকালের যুগ তখন হাম বসন্ত হলে বাড়ীতে মাছ মাংস ঢুকতো না। এদিকে কল্পনার বরের কজন বন্ধুকে কল্পনার বর বলেছিল, যাস ভাই আমাদের মধুপুরের বাড়ীতে, খুব মুর্গি খাওয়াবো। তখন বাড়ীতে রান্নাঘরে মুর্গির চলন ছিল না। বাইরে টাইরে গিয়ে লোকে ও সব খেয়ে আসতো।

মেয়েরও গা ভরে হাম বেরিয়েছে আর বন্ধুর দলও কলকাতা থেকে গিয়ে হাজির। কল্পনার বর প্রশান্ত বেচারা কী করে? বললো "আমরা নিজরাই রেঁধে নোব মুর্গি ও ধারের আস্তাবলে"। না হলে বন্ধুর কাছে মান থাকে না। এমন সময় বলরাম গিয়ে হাজির, কোন রাণীর পুত্রেষ্টি যজ্ঞ সেরে ফিরেছে।

কল্পনার বর দেখলো সর্ব্বনাশ। কল্পনা সেই জর-ওলা মেয়েকে ঝি-এর কাছে রেখে পিঠে পায়েস মোচার চপ থোড়ের ডালনা বাঁধতে বসলো, শত হোক বাড়ীর জামাই তাকে ত আর ডাল ভাত ধরে দোয়া যায় না। ওধারে মাংসর গন্ধে বাড়ী ম ম করছে—ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে আছে প্রশান্ত—।

যাই হোক, খাওয়া দাওয়া সেরে ত বলরাম স্টেশানে চললো। প্রশান্তর ফ্যাৎসাদের একশেষ, ভাবলো যাই আপদকে ট্রেনে তুলে দিয়ে আসি।

স্টেশানে যেতে যেতে বলরাম বললো, তোমার ব্রাহ্মণীটি খুব গোঁড়া বুঝি? হবে না ভট্টাচার্য্যি বাড়ীর মেয়ে ত? আমি শালা কোথায় ভাবলুম অত দিন গাওয়া ঘি আর সন্দেশ ছানা খেয়ে জিভটা মরে গেছে —যাই মধুপুরে একটু মুর্গি টুর্গি খেয়ে আসবো তা, সবই মাটার।—এরকম এক-একটি ব্রাহ্মণী জুটলেই তো জীবনটা মরুভূমি ব্রাদার—আগে মামাবাবু থাকতে যখনই আসতুম মুর্গি টুর্গি খেতুম।

তখন প্রশান্ত বেচারা ত হতভম্ব। আগে জানলে কত সহজ হত ব্যবস্থাটা কিন্তু ঐ রুদ্রাক্ষর বোঝা দেখে কে সাহস করে কথাটা বলবে বলো?

বাড়ী ফিরে কল্পনাকে কথাটা বললো প্রশান্ত। সে বললো তোমার ভগ্নীপতি তাকে তুমি চেন না? কনে ঠাকুরজামাই-এর কত বেশই দেখলুম।

বন্ধুর দল তো শুনে হেসে গড়াগড়ি, মাঝে বোকার মত শুধু প্রশান্ত।

হারুবাবুর এক বোনের বিয়ে হয়েছিল জয় নগরে—। জয়নগরের মোয়াই শুধু বিখ্যাত নয়, বিখ্যাত জমীদার বাড়ীও। সেই জমীদারের বাড়ীতে বিয়ে হল গোলাপের মেজ বোন মেবীর। বিপদে পড়লো হারুবাবু।

বরটা লেখাপড়াই যা শেখেনি, মদ ছোঁয় না অবধি। মাথা খাটিয়ে বুদ্ধি বের করলো—তখন। বললো, জানিস জ্যোতিষী বলেছে তোর কুষ্ঠীতে পুত্রশোক আছে। তিরিশ বছরের পুত্রশোক—। বিয়ে না দিলে ত পতিত হবো—তাই বিয়ে দিয়েছি। পুত্রশোক থেকে যদি বাঁচতে চাস জয়নগরের ধার পাশ ঘেঁষবি না। ন'বছরের শিশু মেবী স্বামীবিরহের শোকের চেয়ে পুত্রশোকটাই বড় করে দেখলো।—শিউরে উঠে বললো, আমি কখনো যাবো না গেলে ত? দিনে দিনে পুষ্পিত হয়ে উঠলো দেহবল্লরী। আগেই বলেছি, হারুবাবুর ভাগ্নীরা ছিল অপূর্ব্ব রূপসী—। কিন্তু মেবীকে আটকে রাখা হল— মাকে ছেড়ে যেতে চায় না অজুহাতে—। তারি সঙ্গে ইনিয়ে বিনিয়ে চিঠি দোয়া হল পূর্ণচন্দ্রকে, আমি ভাই ছাপোষা মানুষ, তোমার পরিবারের খরচ চালাই কি করে? থাকবে ভায়ের ঘাড়ে অথচ মেজাজ মহারাণীর মত।—কথায় কথায় বলবে আমি জমিদার বাড়ীর বৌ। হাত লম্বা, দুহাতে টাকা ছড়ায়, আমি কি করে পার্ব্ব বলো।—সহজ সরল মানুষ পূর্ণবাবু তখুনি জানালেন মাসে পাঁচশো টাকা হাত খরচ বলে যাবে। নব

বিবাহিতর মধ্যে দেখা নেই, বর অধীর হয়ে উঠলো—বললো, একবার মেরীকে দেখতে ইচ্ছে করে। লম্বা গোঁফে তা দিয়ে হারুবাবু বুদ্ধি বের করলেন। লিখলেন, সবুর করো ব্রাদার সবুর করো কথায় বলে সবুরে মেওয়া ফলে। মেওয়াও খাবে অথচ সবুরও কর্ব্বে না এ কি হয়? বর কিন্তু সবুর করলো না। আত্মহত্যা করে বসলো নিদারুণ অভিমানে। স্ত্রী যাকে চায় না তার বেঁচে থেকে ফল কি? সামান্য শ্মশান বৈরাগ্য এসেছিল হারুবাবুর মনে, মনে হল এতটা বাড়াবাড়ি না করলেই হত। কিন্তু মস্ত বড় সম্পত্তি করতলগত হতেই সে বেদনা বেশীক্ষণ রইল না।

মেরী ভারি ভালোমানুষ ছিল, তার একটা হাসির অসুখ ছিল। হাসতে আরম্ভ করলে হাসি আর থামতে চাইত না তার। একবার মেরীর অসুখ করেছিল, ডাক্তার বাবুকে ডাকা হয়েছে। বেশ বাড়াবাড়ি অসুখ। এমন সময় খবর এলো তার বোনের শ্বশুরবাড়ী থেকে তত্ত্ব আসবে। তত্ত্ব আসবে বরানগর থেকে, বারণ করাও চলে না অথচ ডাক্তারও ঠিক সেই সময় আসবে। কি করে মেরীর মা যতজন লোক আসবে তার জন্যে তত থালা জলখাবার গুছিয়ে আসন পেতে জায়গা করে। এমনকি পাশে ছোট ছোট রেকাবি করে পান দিয়ে মেরীর বোনের হাতে দুটো করে টাকা দিয়ে দাঁড় করিয়ে দিলো। মেরীর বোন ছোট সে বলার মধ্যে বলে ফেলেছে, ঐ আসনের পাশে দুটো করে টাকা রেখে দিলেই হত ভোজন দক্ষিণে। ব্যাস আর যায় কোথা, মেরীর হাসি আরম্ভ হল, হাসতে হাসতে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো সে। শেষে দুপেট চেপে ধরে হাসি। যত বারণ করা হয় যত ধমক দেওয়া হয় তত তার হাসি বাড়ে, এ ধারে ডাক্তার এসে উপস্থিত। ব্রঙ্কাইটিস শুনে রুগী দেখতে এসেছেন, এসে দেখেন রুগী পেট চেপে বিছানায় লুটুচ্ছে—। তিনি ত অবাক বললেন, কই ডাঃ ভৌমিক ত পেটে যন্ত্রণার কথা বলেননি। বাড়ীর লোকও অপ্রস্তুত। বলে, না পেটে যন্ত্রণা তো নয়। যন্ত্রণা মাথায়। বুকে একটা শ্বাসকষ্ট। ডাক্তার রোগীকে যা প্রশ্ন করেন রুগী হেসেই সারা—। ডাক্তার বিরক্ত হয়ে বললেন মেণ্টাল কেস। ফী এর টাকা গুলোই জলে গেল চিকিৎসার ব্যাবস্থা হল না। শুধু এই বারই নয়, কোনো একটা ঘটনা ঘটলেই হল। বিধু ঝির আচার বিচারের চোটে বাড়ীর লোকের প্রাণান্ত অথচ ঠাকুমার প্রিয়পাত্রী বলে তাকে কিছু বলা যায় না। সেই বিধু ঝির ডসরের থানের মধ্যে থেকে মস্ত বড় মাছের টুকরো যেদিন বেরুল সেদিনও মেরী সারাদিন হেসে বাড়ীময় গড়াগড়ি খেলো। বিধু ঝি তটস্থ হয়ে মাছ কোটে। তাই ত বিশ্বাস করে তার হাতে মাছ ছেড়ে সবাই নিশ্চিন্দি ছিল। সে যে ও ভাবে হাত সাফাই কর্ব্বে কে জানত বলো? জ্যান্ত মাছ কুটতে গেলে মুখে কিটো কিটো বলে নুন ছড়িয়ে তবে কাটে। কাটার আগে বলে, আহা অবোলা জীব বৈকুণ্ঠে গতি হয়ে গেল, এ হেন বিধু ঝি গায়ের মধ্যে রক্ত-মাখা আঁশশুদ্ধ মাছ কি করে নেয় আর কিজন্যেই বা নেয়—তাই ভেবে সবাই সারা—। বিধু বাড়ী আবিশ্যি যায়। বলে অনাচারের খাওয়া খেতে পারি না বাবা। বাড়ী গিয়ে গঙ্গা চান করে তবে ভিজে কাপড়ে রান্না করে গব্য ভরানো। কাজেই বাড়ীতে পুজো আচ্চা হলে তার অগ্রভাগ বিধু পায়—ঠাকুমার ঘরে রান্না ভালো নিরিমিষ তরকারি থাকলে ঠাকুমা রাখেন বিধুর জন্যে—। আচারে বিচারে বিধু বাড়ীশুদ্ধ লোকের দোষ ধরে বেড়ায়। সেই বিধুর এই কাণ্ড। মেরী হাসছে আর বলছে, সব রেখানি বাড়ী যায় ঐ মাছ দিয়ে ভাত খাবার জন্যে—। ভালো নিরিমিষ তরকারিও থাকবে আবার মাছের ভালো বড় বড় পেটির টুকরোও চললো, মন্দ কি?

ঠিক এই রকম কথা মনে পড়ে দিদিমণির শ্রাদ্ধের দিন। তিনি কঠিন বিচারী মানুষ ছিলেন। অল্প বয়েসে বিধবা হয়েছিলেন, দারুণ কৃচ্ছ্রসাধন করে গেছেন সারা জীবন। অমন টকটকে রং কিন্তু ওই একঢাল কালো কোঁকড়া চুলের ওপর কোন মমতা না করেই মাথা কামিয়ে ফেললেন স্বামীর শ্রাদ্ধের দিন। তখনকার দিনে গুরুজনদের দৃষ্টিও ছিল অন্য রকম। বাবা একমাত্র মেয়ের এই

চেহারা দেখে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন না, বললেন কি সুন্দর তোকে দেখাচ্ছে অশুমণি, ঠিক যেন মুনি ঋষির মত। নিরিমিষ্যি রান্নাঘরের ভেতর কুয়ো কাটিয়ে নিয়ে তার থেকে নিজে হাতে জল তুলে রান্না করতেন। শেষে যখন শয্যাশায়ী হলেন, নিজের গোত্রের যে মুহুরীর বিধবা স্ত্রী ছিল তাকে দীক্ষা দিইয়ে তাকে দিয়ে রান্না করিয়ে খেতেন। সেই মানুষের শ্রাদ্ধ, ব্রাহ্মণদের তেমনি বিচার করে খাওয়াতে হবে—নাতবৌ মনোরমা হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে। অশুমণির বিচার ছিল যেমনি, লোককে খাওয়াতেও ভালোবাসতেন তেমনি। কাজেই এধারে সাধারণের জন্যে মাংস পোলাও চপ কাটলেট করলে। ও ধারে ব্রাহ্মণদের জন্য শুদ্ধাচারে শ্রীধরের ভোগ দেয়া হচ্ছে। আর সাধারণ ব্রাহ্মণেরা খেতে পাবে বলেই জাতি ভোজনের পর খাওয়ান। শ্রীধরের ভোগও কম নয়, পোলাও ছানার ডালনা ধোকা পোরের ভাজা পায়েস পিঠে দই রাবড়ী, এর মধ্যে আমাদের মাধব ঠাকুর হুজুক তুললো, কে জানে সব শুদ্ধ করে করা হয়েছে কি না। আমি ছানা আর ফল খাবো—। সেদিন ফলের তত আয়োজন ছিল না কারণ শ্রাদ্ধের দিন ফল মিষ্টি ছানায় শতাধিক ব্রাহ্মণ বিদায় হয়েছে। কাজেই নিরুপায় হয়ে মনোরমা বললো, নৈর্বিত্তির শসা কলা শাক আলু তুলেই দেয়া হোক। ওধারে শ্রীধরের ভোগ দেখে মাধবের নোলায় জল ধরে না—। পোলাও ছানার ডানলাই তো শুধু নয়, মুগ মটর ডালের চাপড়ী ঘন্ট নাকি মাংসের কান কেটে ছাড়ে। ওধারে ছানার পায়েস রাবড়ী, তোমরা হয়ত ভাববে কেন ওদ্রুটোত খেতে পারে মাধব ঠাকুর? কন্তু খাবে কি করে? সব যে ভাতের সকড়ি।

মনোরমার বাবা ত শান্ত মানুষ, শুধু বললেন মাধবটা ত অনবরত ঐ বেগুনী ফুলুরীর দোকানে বসে বসে পেঁয়াজী দিয়ে মগে করা চা খায়, ওর আবার এত বিচার। নারায়ণ যা খেতে পারেন ও তা খেতে পারে না আবার নিজের বাড়ীতে লিখে রেখেছে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ। এখানে অর্থ হচ্ছে বেদ অজ্ঞ। ব্যাস আর যায় কোথা, মেরী ধরে বসেছে বলোনা মামা মাধব ঠাকুরের গল্প। কোথায় পাইখানার মগে ও চা খাচ্ছিল। শান্ত মানুষ হরিবাবু বলেন, আমি গেছলুম তোশকের দোকানে তোশক করাতে দেখি মাধব বসে বসে তেলেভাজা আর মগে করে চা খাচ্ছে। বড্ড টিকি নাড়ে ত? তাই নজরে পড়লো। আর যায় কোথা, মেরীর হাসি শুরু হল, হেসে গড়িয়ে পড়ল সে। হরিবাবু বল্লেন আজ মাধবকে দেখে আমার হারু বাবুর কথা মনে পড়ছে, আমরা তখন হিন্দু হোষ্টেলে থেকে পড়তুম। ওখানে দুরকম খাওয়া ছিল আমিষ আর নিরামিষ। রবিবার রবিবার মাংস হত। যারা মাংস খেতেন না তাঁরা রাবড়ী পেতেন। হারুবাবু মাংসও খেতেন আবার রাবড়ীও খেতেন, বলতেন আমি মাংস খাই বলে কি রাবড়ী খাই না। গল্প শুনে মেরীর হাসি আরো বেড়ে গেল। ঐ হাসি নিয়ে বাড়ীতে মা কাকীদের ভাবনার অন্ত ছিল না। সেই হাসি স্বামী মারা যাওয়ার পর থেকে চিরদিনের মত বন্ধ হয়ে গেল মেরীর। শুধু মেরীর হাসিই বন্ধ হল না, বাড়ীর আবহাওয়া যেন আর সচল রইল না। বাড়ীটা যেন থমথমে হয়ে রইল বরাবরের মত।

ক্রমশঃ

ক্রীড়া-জনিত আঘাত

রবীন্দ্রনাথ ভট্ট

শারীরিক সক্ষমতা (physical fitness) এবং ক্রীড়া জনিত আঘাত (sports injury) সম্বন্ধে বহু সমস্যাই-এখনও পর্য্যন্ত সমাধান করা সম্ভব হয়নি। এই সকল বিভিন্ন বিষয়ের বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধীয় যথাযোগ্য চিন্তা-ধারা বর্তমান পর্য্যায়ে এমন স্তরে উপাস্থত হয়েছে যখন আমরা বুঝতে পারছি, মানুষ স্বীয় গবেষণার দ্বারা অনতিবিলম্বেই এই সকল সমস্যার সমাধানে সমর্থ হবে।

এই সকল সমস্যা সমাধানের জন্য আজ থেকে প্রায় তিন দশক পূর্বে আমেরিকায় কয়েকটি কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছিল। বর্তমানে প্রতীচ্যে ইটালীয়ান চিকিৎসকদের সহযোগিতায় এ বিষয়ে একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা স্থাপিত হয়েছে। এই সংস্থাটির নাম "Federtion Internationale Medico Sportive।" বিংশশতাব্দীর ষষ্ঠ দশকে ইংলণ্ডেও এ বিষয়ে গবেষণা আরম্ভ হয়েছে এবং তারাও F.I.M. S.-এর সদস্য শ্রেণীভুক্ত হয়েছে। বর্তমানে ইংলণ্ডেও এ বিষয়ে যথেষ্ট উৎসাহ বৃদ্ধি এবং তৎপরতা পরিলক্ষিত হচ্ছে।

ক্রীড়া জগতের বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে আজ এখানে ক্রীড়া-জনিত আঘাতের বিষয়ই কিছু আলোচনা করা হবে।

Sports Injury বা ক্রীড়া-জনিত আঘাতের বিষয়ে পৃথিবীর অন্যান্য দেশ আজ বিশেষ সচেতন। বর্তমানে আমেরিকা রাশিয়া ইংলণ্ড জার্মানী প্রভৃতি বিশ্বের উন্নত দেশগুলিতেও এ বিষয়ে ব্যাপক গবেষণা আরম্ভ হয়েছে।

ক্রীড়া-জনিত আঘাতের জন্য বিশ্বের অনেক মানুষই তাঁদের স্কুল-জীবন ও কর্ম-জীবনের প্রারম্ভ থেকেই স্বীয় ভবিষ্যতের জন্য বিশেষ চিন্তান্বিত হয়ে পড়েন।

অনেক সময় শরীর-তত্ত্ব বিষয়ে অনভিজ্ঞতার জন্যই 'আমাদের আঘাত-জনিত কষ্টে ভুগতে হয়। বর্তমান জগৎ এ বিষয়ে বহুদূর অগ্রসর হলেও এখন পর্যন্ত বহু জিনিষই আমাদের অজ্ঞাত হয়ে আছে।

ক্রীড়া-ঘটিত আঘাত বা Sports Injury-কে সাধারণতঃ তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা :—

(১) সংঘাতিক বা জটিল আঘাত (Fatal Injury)।

(২) অপেক্ষাকৃত কম জটিল আঘাত (Medium Risk Injury)

(৩) অল্প আঘাত বা সাধারণ আঘাত (Safe Injury)

প্রধানতঃ রাগবী, ফুটবল, সাইকেল, পোলো, কুস্তি প্রভৃতি ক্রীড়ায় সাংঘাতিক আঘাত সংঘটিত হয়। বাক্সিং, বাস্কেটবল প্রভৃতি প্রতিযোগিতা সাধারণতঃ দ্বিতীয় পর্য্যায়ে পড়ে। এ্যাথলেটিক্স্, সাঁতার, রোয়িং প্রভৃতি ক্রীড়ায় সচরাচর তৃতীয় পর্যায়ের আঘাত প্রাপ্তিরই সম্ভাবনা থাকে।

ক্রীড়া জগতের আঘাতকে অন্য একভাবেও ভাগ করা যেতে পারে, যথা :—

Injury due to body contact sports and non-body cantact sports।

খেলাধুলায় নিম্নাঙ্গের আঘাতের সংখ্যাই সর্বাপেক্ষা অধিক অর্থাৎ প্রায় সমস্ত আঘাতের প্রায় শতকরা ৪৫ ভাগ। উর্দ্ধাঙ্গ এবং মাথায় আঘাতের স্থান ঠিক তারপরে অর্থাৎ প্রায় ১১ ভাগ। এই অনুপাতে কাঁধ (shoulder) এবং তল পেটের (pelvis) আঘাত ৭ ভাগ। পৃষ্ঠদেশের (back) ৪ ভাগ, বক্ষদেশ ৩ ভাগ এবং পেটের আঘাত ১ ভাগ।

শুধু মাত্র ক্রীড়ার মাধ্যমেই যে ক্রীড়াঘাত সংঘটিত হয় তাহা নয়। ক্রীড়া-সরঞ্জাম অথবা ক্রীড়াঙ্গনে উপস্থিত থেকেও ক্রীড়াঘাত সংঘটিত হতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়—উপুড় করা দৌড়ানর জুতার কাঁটা, বর্শা নিক্ষেপের বর্শার ফলক, সন্তরণ-দীঘির পারিপার্শ্বিক পিচ্ছিল কর্দমাক্ত ক্রীড়াঙ্গন থেকেও ক্রীড়া-জনিত আঘাত প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকে।

অধিকাংশ ক্রীড়াঘাতই শরীর কিংবা জীবনের পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকর নয় তবুও এ সকল আঘাত শরীর এবং মনের দিক থেকে বেশ বিরক্তিকর যথা, মচকানো ব্যথা অথবা অস্থিবন্ধনী ছিন্ন হওয়ার (tearing of ligaments) দরুন ব্যথা।

এই সকল আঘাত আরোগ্য হয়, কিন্তু এর জন্ম প্রভূত সময়ের প্রয়োজন। কিন্তু ক্রীড়া-বিদ্‌দের পক্ষে সময়ের জন্ম নিশ্চেষ্ট অবস্থায় বসে থাকা বিশেষ কষ্টকর। ক্রীড়াঙ্গনে সত্বর ফিরে আসার জন্ম উপযুক্ত বিশ্রামের অভাবই অনেক সময় ঐ আঘাত ভীতিজনকভাবে আমাদের স্বাস্থ্যকে প্রভাবিত করে। এ বিষয়ে ক্রীড়াবিদ্ (Athlete) এবং চিকিৎসক(Medical Officer) উভয়েরই মনে রাখা প্রয়োজন যে আঘাত প্রাপ্তির প্রথম দিকে বিশ্রামের জন্য কিছুটা সময় ব্যয় করিলে ভবিষ্যতের কষ্টকর পরিণতি দূর করা সম্ভব হয়।

বিভিন্ন ক্রীড়া জনিত আঘাতের কথা চিন্তা করে সেই সকলের চিকিৎসার বিষয়ও আমাদের স্মরণ রাখা কর্তব্য। বিষয়টিকে সাধারণ ভাবে আমাদের তিনটি ভাগে আলোচনা করতে হবে—

(১) প্রাথমিক চিকিৎসা (First Aid)
(২) নির্দিষ্ট চিকিৎসা (Definitive Treatment)
(৩) ক্রীড়াবিদ্‌কে পুনরায় ক্রীড়াক্ষেত্রে ফিরিয়ে আনার জন্য পুনর্বাসন পদ্ধতি (Rehabilitation)।

প্রাথমিক চিকিৎসা বা First Aid :

এখানে সাধারণ ভাবে কয়েকটি বিষয় নিয়েই আলোচনা সম্ভব। এ বিষয়ের বিশদ বিবরণ যে কোন প্রাথমিক চিকিৎসার বইএ পাওয়া যাবে।

চিকিৎসা আরম্ভের প্রথমেই আমাদের আকস্মিক আঘাত (Local Injury) থেকে সামগ্রিক আঘাতকে (General Injury)-কে পৃথকীকরণ বিষয়ে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। এই শেষোক্ত আঘাতে সুস্পষ্ট লক্ষণগুলি হবে রোগীর ফ্যাকাসে বা পাণ্ডুর ভাব (Paleness) দ্রুত স্পন্দিত নাড়ী (Rapid Pulse) এবং স্বেদনিঃসরণ (Perspiration)।

আমাদের জানা প্রয়োজন, যে কোন আঘাতেই প্রকৃতির নিজস্ব চিকিৎসা-পদ্ধতি হলো আঘাত-প্রাপ্ত স্থানকে বিশ্রাম প্রদান। সুতরাং আঘাত-প্রাপ্ত যে কোন অঙ্গেরই প্রাথমিক চিকিৎসা হলো অঙ্গ-সঞ্চালন নিয়ন্ত্রিত করে সেই স্থানটিকে পূর্ণ বিশ্রাম প্রদান।

নির্দিষ্ট চিকিৎসা (Definitive Treatment) :

এই বিষয়টিকে দুই ভাগে ভাগ করা হইয়াছে, যথা—শারীরিক চিকিৎসা এবং মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধীয় চিকিৎসা।

পূর্বেই বলা হয়েছে ক্রীড়াবিদ্ সর্বদাই শীঘ্র ভাল হয়ে উঠতে চান। আঘাতের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গী ও মনোভাব তার সবদাই ভাবোদ্দীপক এবং উত্তেজনা প্রসূত। সুতরাং আঘাত সম্বন্ধে ন্যায়সঙ্গত ও যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা এবং সুবিজ্ঞ চিকিৎসা ব্যবস্থা প্রণালী একান্ত প্রয়োজন।

এই প্রবন্ধে পৃথক পৃথক আঘাতের বিশদ বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয়। আমাদের মনে রাখা উচিত বেশীর ভাগ আঘাতই শরীরের তন্তুরাজি (Fibres) হইতে উদ্ভূত। এই ছিন্নতন্তু পেশী (Muscles) অস্থিবন্ধনী (Ligaments) অথবা অস্থি (Bones) ও হতে পারে। শরীরের তন্তুরাজি ছিন্ন হলে তথায় এক প্রকার তরল পদার্থ এসে জমা হয়। এই তরল পদার্থ রক্ত অথবা শরীরনিঃসৃত এক প্রকার বর্ণহীন রস বা লসিকা। এই পদার্থের সঞ্চরণের ফলে স্থানটি ফুলে ওঠে। আঘাতের তারতম্য অনুসারে এই স্ফীত স্থানের আকারেরও তারতম্য ঘটে। তরল পদার্থ সঞ্চরণে বাধাদানই হল ফোলার একমাত্র চিকিৎসা। এই পদ্ধতির চিকিৎসাপ্রণালীতে চাপ বা পেষণই একমাত্র উপায়। এই জন্যই আঘাত-প্রাপ্ত স্থানে

বহু প্রকার ব্যাণ্ডেজ বা বন্ধন পট্টি আরোপণের কৌশল আবিষ্কার হয়েছে।

আঘাতপ্রাপ্তির অব্যবহিত পরেই স্থানটিকে বরফ অথবা ঠাণ্ডা জলের দ্বারা আবৃত করতে হয়। ইহার দ্বারা রক্তবাহী শিরা সঙ্কুচিত হয় এবং স্থানটিতে রক্ত বা লসিকা সঞ্চয়ণের সম্ভাবনাও কম হয়। তরল পদার্থ সঞ্চিত হয়ে স্থানটি যদি ফুলে ওঠে তবে উহার উপযুক্ত চিকিৎসা হবে উক্ত তরল পদার্থের উপরোক্ত স্থান থেকে নিক্রমণ। অনেক সময় স্ফীত স্থানের আবদ্ধ তরল পদার্থ সার্জিক্যাল ছুঁচ দ্বারা টেনে অথবা ছুরি দিয়ে কেটে বাহির করে দিতে হয়।

উক্ত স্থানে Hyalase নামক এক প্রকার ঔষধ প্রয়োগও বর্ত্তমানে বেশ কার্য্যকর বলে প্রমাণিত হয়েছে। আঘাত-প্রাপ্ত স্থানে Hyalase প্রবেশ করাইয়া দিলে উহা ঐ স্থানের রক্তবাহী শিরাসমূহের দেওয়াল-গুলিকে সহজভেদ্য করে দেয়। উক্ত সহজভেদ্য দেওয়াল দ্বারাই ঐ আবদ্ধ তরল পদার্থ সাধারণ রক্ত চলাচল প্রক্রিয়াতে আঘাতপ্রাপ্ত স্থান থেকে অপসারিত হয়। এইভাবে আঘাতপ্রাপ্ত স্থানের স্ফীতি নিয়ন্ত্রিত হলে 'পর Physiotherapy চিকিৎসার প্রয়োজন হয়।

এই চিকিৎসার পরবর্তী অধ্যায়ের প্রাথমিক পর্য্যায়ে Ionisation, Short-wave Diathermy এবং নিশ্চেষ্ট অঙ্গ সঞ্চালনের (passive movement) প্রয়োজন হয়।

নির্দিষ্ট কোন বেদনাদায়ক স্থানের পক্ষে Hydro-cortisone injectionও বিশেষ উপকারী। আঘাত-প্রাপ্ত স্থানটিকে ঔষধ দ্বারা অবশ করে বেদনার নিরসন অপেক্ষা উপরোক্ত পদ্ধতিতে আঘাত নিরাময় অনেক ভাল। Hydrocortisone-এর কার্য্যকারিতা অসাড়তা প্রদানকারী ঔষধ অপেক্ষা অধিক স্থায়ী।

বর্ত্তমান পর্য্যায়ে ক্রীড়াজনিত আঘাতে ব্যথা বেদনা প্রভৃতি নিরাময়ের জন্য Tanderil নামক আর এক প্রকার ঔষধেরও বহুল প্রচলন দেখা যায়।

Hydrocortisone-এর অযৌক্তিক ব্যবহার অনেক সময় উত্তম ফল প্রদান অপেক্ষা মন্দ ফলই প্রদান করে। এই জন্য ইহার ব্যবহার বিশেষ উদ্দেশ্যে কোন নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবহারের জন্যই সীমাবদ্ধ রাখা উচিত।

বেদনাহত স্থানে অঙ্গ সংবাহন অথবা মালিশেরও বিশেষ উপকারিতা আছে। শারীরিক উপকার অপেক্ষা মনের উপরই ইহার কার্যকারিতা বেশী। মালিশে রক্ত চলাচলের কিছুটা উন্নতি সংঘটিত হয় এবং যথাযথ অঙ্গ সংবাহনে শারীরিক ও মানসিক অবসাদ দূরীভূত হয়।

পুনর্ব্বাসন (Rehabilitation)

পুনর্বাসন কালই এই চিকিৎসার সবচেয়ে কঠিন সময়। এই সময় অস্থিরতা, অধৈর্য্য, চাঞ্চল্য, প্রভৃতি আঘাতজনিত মানসিক প্রতিক্রিয়ার প্রাবল্যে সহানুভূতি এবং যথাযোগ্য তত্ত্বাবধানের প্রয়োজন।

আঘাতজনিত ব্যথা ও বেদনার জন্য প্রয়োজন Physiotherapy এবং Electrotherapy পদ্ধতির অব-লম্বন। আমাদের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য ব্যথা এবং শারীরিক অস্বস্তি প্রকৃতির বিপদ-সঙ্কেত। এইরূপ পরিস্থিতিতে পূর্ণ ক্ষমতার সহিত প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণের সম্ভাবনা কম।

ক্রীড়াজনিত আঘাত থেকে আরও বহু সমস্যা উদ্ভূত হতে পারে, যথা,—চিকিৎসাজনিত সমস্যা, ক্রীড়া সমস্যা, শিক্ষা সমস্যা ও অর্থনৈতিক সমস্যা। বিশ্বের বহু দেশে ক্রীড়াজনিত আঘাতের বিষয়টি গবেষণার ক্ষেত্রে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে।

এই সমস্যার সকল দিক বিবেচনা করলে আমরা বুঝতে পারি সমষ্টিগতভাবে ক্রীড়াঘাত ঘটিত সমস্যা একটি জাতীয় সমস্যা। সুতরাং অন্যান্য দেশের ন্যায় আমাদের দেশেও এ বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।

আমার ইউরোপ ভ্রমণ

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়

(১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত গ্রন্থের মূল ইংরেজী হইতে অনুবাদ : পরিমল গোস্বামী)

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

১৮৮৬ সনের অক্টোবরে আমি অক্সফোর্ডে যাই এবং সেখানে সার মোনিয়ের উইলিয়াম্‌স্‌-এর অধীনে ইণ্ডিয়ান ইনস্টিট্যুটে কাজ করি। বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পর্কে তিনি এটি গঠন করিয়াছেন। বলা বাহুল্য যে, সার মোনিয়ের উইলিয়াম্‌স্‌ ভারতবাসীদের প্রতি সহানুভূতিশীল। প্রাচ্য বিষয়ের পণ্ডিত মাত্রেরই মনে এই সহানুভূতি বিদ্যমান। তিনি উচ্চস্তরের ইংরেজ জেণ্টল্‌ম্যান্‌দের এই শিক্ষাটি দিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, ভারতীয়দের সঙ্গে ব্যবহারে তাঁহারা যেন স্মরণ রাখেন, ভারতীয়গণ প্রাচীন কাল হইতেই এমন একটি সুগভীর চিন্তাশীল মন ও প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়াছেন যাহা আধুনিক ইউরোপীয়গণও অতিক্রম করিতে পারেন নাই। এই শিক্ষা আরও গুরুত্বপূর্ণ এ-কারণে যে, ব্রিটিশ জাতি আমেরিকা, আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়াবাসীদের সংস্পর্শে আসিয়া যাহারা ইউরোপীয় নহে তাহাদের সম্পর্কে এমন একটি ধারণা গড়িয়া লইয়াছে যাহা ভারতীয়দের পক্ষে আদৌ গৌরবজনক অথবা কল্যাণকর নহে। ইউরোপীয়গণ যতই শিক্ষা ও সংস্কৃতির পথে অগ্রসর হইতেছে ততই তাহাদের ও অপেক্ষাকৃত মন্থরগামী ভারতীয়দের মধ্যে ব্যবধান বাড়িয়া যাইতেছে। জ্ঞান ও শক্তি মানুষকে যে পরিমাণ পশুত্বের স্তর হইতে দূরে লইয়া যাইতেছে, তাহা সেই পরিমাণে বর্বর মানুষ হইতে সভ্য মানুষকে দূরে লইয়া যাইতেছে। দুইয়ের মধ্যে যাহা পার্থক্য তাহা শুধু মাত্রার। ক্ষমতার চেতনা ইউরোপীয়দের মনে একটা নিরাপত্তাবোধ জাগাইয়া তুলিতেছে, আর এইজন্যই ইউরোপীয়েতর জাতির নিকট হইতে তাহাদের সম্পত্তি কাড়িয়া লইবার সময় তাহারা যাবতীয় নীতি ও ন্যায়বোধ বিসর্জন দিয়া তাহাদের নরহত্যাক্ষম বন্দুক ও মেশিন-গানের উপর ষোল আনা নির্ভর করিয়া থাকে। এই অস্ত্র লইয়া তাহারা আফ্রিকায় নেগাসদের জমির উপর যেমন তেমনি তাহারা পূর্ব এশিয়ায় আনামীদের উপরেও ঝাঁপাইয়া পড়িবার জন্য উদ্যত হইয়া রহিয়াছে। বিস্মৃতি বশতঃ ভাববিলাসীগণ যে পুরাকালকে স্বর্ণযুগ বলিয়া মনে করে, এবং যাহাকে আমরা নিষ্ঠুর হত্যা ও শঠতাময় প্রস্তর যুগ অথবা ব্রঞ্জ যুগ বলিয়া মনে করি, তাহা আর নাই, এবং আশা করি তাহা চিরদিনের জন্য পৃথিবী হইতে লুপ্ত হইবে। রেলওয়ে কিংবা টেলিগ্রাফে মানুষকে পশু হইতে পৃথক করে না। দয়া, করুণা, উদারতা, ন্যায়, ক্ষমা ইহাই মানুষকে পশু হইতে পৃথক করে। এবং ইউরোপীয়গণ এ-কথা ভুলিয়া যায় যে "আছে বল দুর্বলেরও"—এবং যাহারা অশ্বেত এবং অর্দ্ধউলঙ্গ থাকা সত্ত্বেও একদা

যাহাদের মনে ইউরোপীয়দিগের অপেক্ষা বহুপূর্বে জ্ঞানের আলো উজ্জ্বলতর হইয়া জ্বলিতেছিল, তাহারাও ন্যায়ধর্ম উপেক্ষাকারীদের বিরুদ্ধে তাহাদের দুর্বল হাত তুলিতে পারে। ইংল্যাণ্ড হইতে যাহারা ভারতবাসীদের মধ্যে আসে, তাহারা যদি মনে করে, ইহারা কৃষ্ণাঙ্গ অথবা অর্দ্ধউলঙ্গ, অতএব ইহাদিগকে অসভ্য বুশম্যান অথবা পাপুয়ান তুল্য মনে করিতে হইবে, তাহা হইলে তাহা উভয়ের পক্ষেই মহা অনিষ্টের কারণ হইবে।

পুরাকালে মানুষ যখন অনুন্নত ছিল, তখন মানুষের মনে আত্মত্যাগের স্থান ছিল না। ইহা এক্ষণে সম্মানিত স্থান অধিকার করিয়াছে।...

আমাদের সমুদ্র-উপকূলগুলি পোর্টুগীজ শাসনের তিক্ত স্বাদ পাইয়াছে, স্প্যানিশদের আমেরিকা শাসন হইতে তাহার পার্থক্য বিশেষ নাই। ইংরেজগণ আমাদের জন্য যাহা করিয়াছে তাহার জন্য আমরা সহযোগিতা দান করিয়াছি। মেটকাফগণ ও মেকলেদের আমরা নিরাশ করি নাই। আমরা বিশ্বাস করি আমাদের উন্নতি তাহাদের লক্ষ্য, সাম্রাজ্য সেই লক্ষ্যের উপর। তবু ব্রিটিশদের এই সম্পর্কে ভুল হইলে ভারতীয়গণ নীচের স্তরে নামিয়া যাইবে। প্রয়োজন উপস্থিত হইলে আমাদের আত্মরক্ষা করিবার উপযুক্ত শিক্ষা দিতে ইংরেজগণ অবিরাম অস্বীকার করিতেছে। ভারতীয়গণ কি গৃহ-পালিত পশুর স্তরে থাকিয়া যাইবে? ভারতবর্ষকে হারাইলে ইংল্যাণ্ডের খুব ক্ষতি হইবে না, কিন্তু তাহা হইলে আমাদের স্তর নীচেই থাকিয়া যাইবে। আমাদের সামরিক শিক্ষা দিতে হইবে, ইহাতে ইংরেজের কোনও বিপদ্ হইবে না। ইহাতে সাম্রাজ্যেরই শক্তি বৃদ্ধি হইবে।

সার মোনিয়ের উইলিয়াম্‌স্ ব্রিটিশ ছাত্রদের মনে ভারতবর্ষ ও ভারতবাসী সম্পর্কে সত্য অবস্থার কথা গাঁথিয়া দিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। এবং এজন্য তাঁহাকে দুই জাতির পক্ষ হইতেই কল্যাণকামী মনে করা উচিত। পাশ্চাত্য শিক্ষালাভ করিয়া ভারতীয় মনে তাহার নিজস্ব সত্তা সম্পর্কে চেতনা জাগিতেছে। একদিকে পাশ্চাত্য শিক্ষার দরুণ মানুষের সম অধিকারের বোধ, অন্যদিকে ক্ষমতার ও প্রভুত্বের চাপ—আমরা বর্তমানে এই দুইয়ের সংঘর্ষের মধ্যে পড়িয়াছি। এই সংঘর্ষ যিনি রোধ করিতে পারিবেন, তিনি উভয় জাতিরই কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইবেন। সার মোনিয়ের এই চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহার স্ত্রীও তাঁহার এই মহৎ চেষ্টায় সাহায্য করিতেছেন। তাঁহার সাহায্য হাতে-কলমে। প্রথমদিন যখন আমি সার মোনিয়ের উইলিয়াম্‌স্-এর নিকট যাই, তিনি আমাকে বলিলেন, "আপনি আমার 'অভ্যাগত'।" সংস্কৃত অভ্যাগত শব্দটি উচ্চারণ করিলেন। সার মোনিয়ের সংস্কৃতে পণ্ডিত সুতরাং তিনি ঐ শব্দে আমরা যে অতিথিকে পবিত্র জ্ঞান করি, তাহাই বুঝাইতে চাহিলেন। অক্সফোর্ডে আমি যতদিন ছিলাম, ততদিন তিনি ও তাঁহার স্ত্রী আমার প্রতি 'অভ্যাগত'-এর ব্যবহার করিয়াছিলেন।

অক্সফোর্ডের কলেজগুলি দেখিলাম। ক্রাইস্ট কলেজ, ও সংলগ্ন ডাইওসিসান ক্যাথীড্রাল, ওরিয়েল, ব্যালিওল, কুইন্‌স্ ও ম্যাগ্‌ডালেন কলেজ। ইহার টাওয়ার, ক্লইস্টার ও ছায়াবীথি স্মরণ করাইয়া দিল অতীত যুগে ওয়ালশ, অ্যাডিসন এবং জন্ হ্যাম্পডেন্ এই পথে তাঁহাদের পদচিহ্ন রাখিয়া গিয়াছেন। অন্যান্য আরও অনেকগুলি কলেজ দেখিলাম, কলেজের রান্নাঘরে বহু ছাত্রের জন্য বৈজ্ঞানিক উপায়ে কিরূপ রান্না হয় তাহা দেখিলাম। পরীক্ষার হল্ দেখিলাম। নানা স্থানের নানা রঙের পাথর বসান হলটি চমৎকার। বডলিয়ান্ ও র‍্যাডক্লিফ গ্রন্থশালা দেখিলাম। ইউনিভার্সিটি মিউজিয়াম ও মানমন্দির দেখিলাম। এই প্রাচীন নগরীতে এত দ্রষ্টব্য রহিয়াছে যাহা বর্ণনা করা অসম্ভব।

অক্সফোর্ডে সার উইলিয়াম হান্টারের জ্যেষ্ঠপুত্র ব্রাউটন শেরিডান হান্টারের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। সে যখন ছয়-সাত বৎসরের বালক তখন তাহার সহিত আমার খুব ভাব হইয়াছিল। ইংল্যাণ্ডে যাইবার পর হইতে তাহার কথা অনেককে জিজ্ঞাসা করিয়াছি। কেহ বলিয়াছে সে জার্মানিতে আছে, তাহা শুনিয়া মনে

হইয়াছিল সেখানে গিয়া তাহার সহিত দেখা করি। হঠাৎ শুনিলাম সে অক্সফোর্ডে আছে। লেডি মোনিয়ের উইলিয়াম্‌স্‌ আমাকে এই সংবাদটি দিলেন। তাহাকে অবাক্‌ করিয়া দিবার জন্য একদিন সন্ধ্যাবেলা তাহাকে না জানাইয়া তাহার সহিত দেখা করিতে গেলাম। সে আমাকে দেখিয়া সত্যই অবাক্‌ হইল। পাগড়িপরা, ঢিলা পোশাকে সজ্জিত এক অশ্বেতাঙ্গকে দেখিবে সে কল্পনাও করে নাই। সে আমতা আমতা করিয়া কহিল, আমি নিশ্চয় ভুল করিয়া তাহার ঘরে প্রবেশ করিয়াছি। সে আরও বিস্মিত হইল যখন বলিলাম, আমি ভুল করি নাই। তাহার স্ত্রী এতক্ষণ মজা দেখিতেছিল। যাহা হউক, শেষ পর্য্যন্ত সবই প্রকাশ হইয়া পড়িল। ব্রাউটন মহা খুশী। প্রত্যেকেই খুব খুশী হইল। সেদিন হইতে অক্সফোর্ডে আরও অনেকগুলি সন্ধ্যা আমরা আনন্দে একত্র কাটাইয়াছিলাম।

অক্সফোর্ডে যে হোটেলে ছিলাম সেটি সম্পূর্ণভাবে এক যুবতী স্ত্রীলোকের পরিচালনাধীন ছিল। হোটেলটি একটি প্রথম শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান এবং ইহার সঙ্গে অনেক প্রাচীন স্মৃতি বিজড়িত রহিয়াছে। শুধু এখানেই নহে, অন্যত্রও যেখানেই গিয়াছি দেখিয়াছি, মেয়েরা সেখানেই হোটেলে, দোকানে, পানগৃহে, ডাকঘরে, কল-কারখানায় দায়িত্বপূর্ণভাবে কাজ করিতেছে। তাহারা যে পরিমাণ কাজ করে আমাদের দেশের লোক সম্ভত তাহা বিশ্বাস করিতেই চাহিবেন না। গ্ল্যাসগোতে একটি বড় হোটেলে এক মেয়ে কেরানিকে দেখিলাম, তাহাকে সকাল নয়টা হইতে মধ্যরাত্রি পার হইয়া রাত্রি একটা পর্য্যন্ত মোট ষোল ঘণ্টা কাজ করিতে হয়। লণ্ডনের অনেক রেস্টোরাণ্টে মেয়েরা সকাল সাড়ে সাতটা হইতে রাত্রি বারোটা পর্যন্ত কাজ করে। এবং যাহা করে তাহা সহজ কাজ নহে। আমাদের দেশের মেয়েরা এত কাজ করায় অভ্যস্ত নহে। ইহারা সুন্দর পরিমার্জিত পোশাকে, পরিচ্ছন্ন আচরণে সহজেই আমাদের সহানুভূতি দাবি করিতে পারে। পুরুষেরা একটু স্বাধীনতাপ্রিয়, কিন্তু ওদেশের স্ত্রী স্বামীকে কোনও স্বাধীনতা দিতে নারাজ। আমাদের দেশের স্ত্রী তাহার স্বামীর খেয়াল-খুশিতে চলে, কি ওদেশের স্বামী স্ত্রীর খেয়াল-খুশিতে চলে? ইহার উত্তর দিয়া বিপন্ন হইতে চাহি না। ওদেশের জীবনযাত্রার মান উচ্চ, পরিবার প্রতিপালন করা তাই অনেকের পক্ষে দুঃসাধ্য, সেজন্য অনেক পুরুষ অবিবাহিত থাকে। উপরন্তু উহাদের মেয়ের সংখ্যা পুরুষদের সংখ্যা হইতে অধিক, সেজন্য অনেক মেয়েকেও অবিবাহিত থাকিতে হয়। আমাদের দেশের শিক্ষা-সংস্কৃতির মান যদি উন্নত হইত এবং গাত্র-বর্ণ ও জাতি-বৈষম্যবোধ ভারতীয় ইউরোপীয়দের কম হইত, তাহা হইলে আমি আমাদের দেশের যে-সব পুরুষ পৈতৃক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া স্ত্রী লাভ করিয়া থাকে তাহাদিগকে ইউরোপীয় স্ত্রী গ্রহণ করিতে বলিতাম। ব্রাহ্মণেরাও যখন জুতা বিক্রয়, মদ বিক্রয় এবং টিনের গো ও শূকর মাংস বিক্রয় আরম্ভ করিয়াছে, তখন ভারতের জাতিভেদ প্রথার আর এক পয়সাও মূল্য নাই। যাহা হউক, শ্বেত ও অশ্বেত জাতির মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন আপাততঃ সম্ভব হইবে না। ইংল্যাণ্ডের এইসব দোকানের মেয়েদের মধ্যে একটি সততা আমি মনো-যোগের সহিত লক্ষ্য করিয়াছি। সমস্ত দিন ধরিয়া কত পয়সা তাহাদের হাতে আসে, কিন্তু চুরির অভ্যাসের সঙ্গে তাহাদের পরিচয় নাই। শুধু মেয়েরা নহে, ছেলেরা বা দোকানের কর্মচারীরা সাধারণতঃ সততায় অভ্যস্ত। কোনও প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব তাহাদের উপর অর্পিত হইলে, কিংবা দূরদেশে—আসামের পাহাড়ী অঞ্চলে অথবা আফ্রিকার হীরক-ক্ষেত্রে এজেণ্টরূপে প্রেরিত হইলে—সর্বত্রই তাহারা সততার সঙ্গে কর্তব্য সমাপন করিবে। এজন্য ব্রিটিশ বাণিজ্যের উন্নতি হয়, আর এই জন্যই ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি সাম্রাজ্য লাভ করে।

পূর্বে আমি একস্থানে আশা প্রকাশ করিয়াছি যে পাইকারি হারে হত্যাকাণ্ড, নিষ্ঠুর প্রতারণা, একটা সম্পূর্ণ জাতিকে দাসে পরিণত করা, ধরাপৃষ্ঠ হইতে লোপ পাইয়াছে। সংবাদপত্রে যাহা পড়িতেছি তাহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে কিছুই লুপ্ত হয় নাই।

এ-ঘটনা দূর পশ্চিমে ব্রাজিলে ঘটিতেছে। বলা হইয়াছে সেখানে খ্রীস্টানগণ—সভ্য ইউরোপীয়গণ অসহায় ইণ্ডিয়ানদের জমি দখল করিবার জন্য তাহাদিগকে স্ট্রিকনিন এবং পারদ দ্বারা নির্মমভাবে হত্যা করিতেছে। আমাদের বন্ধু খ্রীস্টান স্পেনবাসীগণ তাহাদের কূপের ভিতর, শস্যের গোলায় এবং তাহাদের রক্ষিত মাংসে বিষ মিশাইয়া দিতেছে এবং ইহার কার্যফল দেখিবার জন্য উৎসাহিত হইয়া তাহারা গিয়া দেখিতেছে নর-নারী-শিশু শত শত—সহস্র সহস্র প্রবলভাবে আক্ষেপিত দেহে মরিয়া শক্ত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। দেখিয়া তাহাদের কি তৃপ্তি! হা ঈশ্বর! এই বীভৎস কাণ্ডে সমস্ত ইউরোপ কেমন চুপ করিয়া আছে! বাল-গেরিয়াতে মুসলমানদের কুকার্যে তাহারা যে অশ্রুপাত করিয়াছে তাহাতেই বোধ করি তাহাদের সকল অশ্রু শেষ হইয়া গিয়াছে। কিংবা ধর্ম এবং বিজ্ঞান ব্রাজিলের ঐসব ইণ্ডিয়ান কীটদের ধ্বংস করিবার অধিকার দিতেছে? ইংল্যাণ্ডও এ-বিষয়ে উচ্চবাচ্য করিতেছে না, ইহাতে আমি বিস্ময় বোধ করিতেছি। অথবা ইউরোপীয়গণ কিছু করিলে অন্যায় হয় না, অ-ইউরোপীয়ান কোনও অন্যায় করিলে তাহারা ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে। দুইজন পরহিতব্রতী ইংরেজ ভদ্রলোক সম্প্রতি হায়দ্রাবাদে নিম্নশ্রেণীর লোকদের দ্বারা বসন্ত-রোগের দেবতার নিকট মহিষ ও ছাগ বলি দিতে দেখিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধভাবে লিখিয়াছেন—"And these (low castes) are the brethren of the men whom a slight veneer of English education presumptuously leads to National Congress and demands for Native Parliaments." অর্থাৎ "এরা (এই নিম্ন-শ্রেণীর লোকেরা) তাহাদেরই আত্মীয় যাহারা গায়ে ইংরেজী শিক্ষার একটুখানি পালিশ লাগাইয়া ন্যাশন্যাল কংগ্রেসে নেটিভ পার্লামেন্টের দাবী করে।" এই দুই ভদ্রলোক বড়ই দয়ালু এবং ব্রাহ্মণ, রাজপুত, শিখ, জৈন, শেখ এবং সৈয়দদের লইয়া যে পঁচিশ কোটি ভারতবাসী —তাহারা সকলেই নরখাদক। খ্রীষ্টানদের মিশন এদেশে বৎসরে যত টাকা খরচ করিয়া থাকে, তাহা আমাদিগকে দিলে, আমরা মৌখিক প্রচার ও দৃষ্টান্ত দ্বারা আমাদের মধ্যে যে খ্রীষ্টানী হিতাকাঙ্ক্ষা স্বভাবতঃই আছে তাহা ইউরোপের জাতিগুলির উপকারে লাগাইতে পারি।

১৮৮৬ সনের নভেম্বর মাসে আমার বন্ধু মিস্টার টমাস ওয়ার্ডল আমাকে তাঁহার লীকে অবস্থিত গৃহে নিমন্ত্রণ করিলেন। লীক স্ট্যাফোর্ডশিয়রে অবস্থিত। তথাকার নিকলসন ইন্‌স্টিট্যুটের মেম্বারগণ আমাকে ভারতবর্ষ সম্পর্কে বক্তৃতা দিতে বলিলেন। কি করিয়া বক্তৃতা দিতে হয় তাহা আমি জানিতাম না, তবে মোটামুটিভাবে বলিয়াছিলাম, আমাদের স্বার্থ অভিন্ন। আমি বলিয়াছিলাম, আমরা এখন যাহা উপার্জ্জন করি, তাহা অপেক্ষা অধিক উপার্জ্জন কি করিয়া করিতে হয়, ইংরেজদের উচিত তাহা আমাদিগকে শিক্ষা দেওয়া। ভয়ের কারণ নাই, সেই বেশী উপার্জ্জনের অনেকখানি অংশ ইংল্যাণ্ডেই ফিরিয়া আসিবে, যখন আমরা তাহাদের উৎপন্ন দ্রব্য কিনিব। ইংল্যাণ্ড বর্তমানে অন্য সব দেশ হইতে যে-সব কাঁচামাল কিনিতেছে, তাহার অনেকখানি অংশ ভারতবর্ষ হইতে কিনিতে পারে। কেন সে তুরস্ক হইতে ৩৪৮০০০ পাউণ্ড মূল্যের আফিঙ ক্রয় করে? বিদেশ হইতে সে বৎসরে ৩৪৮০০০ পাউণ্ড মূল্যের উদ্ভিজ্জ রঞ্জক সার আমদানি করে সেগুলি কী বস্তু? আসল কথা, ভারতের বাণিজ্যিক স্বার্থ দেখিবার কেহ নাই—ইংল্যাণ্ডেও না, বাহিরেও না। অথচ ছোট্ট দেশ বেলজিয়াম—তাহারও বাণিজ্য-দূত পৃথিবীর সকল স্থানে রহিয়াছে। আমি বলিলাম ইংল্যাণ্ডের উচিত ভারতীয়দিগকে তাহাদের গ্রাম্য বেষ্টনীর বাহিরে কি করিয়া দৃষ্টি দিতে হয় তাহা শিক্ষা দেওয়া। ভারতের কাঁচামাল কেমন করিয়া সোনায় পরিণত করিতে হয় তাহা তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া। বহুজাতীয় কাঁচামাল অকারণে অরণ্যে পড়িয়া নষ্ট হইতেছে। আধুনিক বিজ্ঞান সেগুলিকে কাজে লাগাইবার কৌশল আয়ত্ত করিয়াছে। আরও ছোটখাটো জিনিস যাহা ভারতকে বিদেশ হইতে আমদানি করিতে হয়, তাহা তাহাকে

প্রস্তুত করিতে শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। ইংল্যাণ্ড বর্তমানে হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম ও ফ্রান্স হইতে বৎসরে দশ লক্ষ পাউণ্ডের অধিক মূল্যের লেস্ আমদানি করে, এই লেস্ কি আমরা ইংল্যাণ্ডের জন্য প্রস্তুত করিতে পারি না? এইসব বলিবার পর মঞ্চ হইতে নামিবার সময় একটি ছোট্ট সুন্দরী বালিকা আমার নিকট হিন্দুস্থানীতে আলাপ করিল। এ-রকম স্থানে এই ভাষা অপ্রত্যাশিতভাবে শুনিয়া ভাল লাগিল। মেয়েটি গ্রেট ঈস্টার্ণ হোটেলের সেক্রেটারি মিস্টার লংলির কন্যা।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ইংল্যাণ্ডের শেষ কয়েকটি দিন

শেষ কয়েকটি দিন আমি লণ্ডনের ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চল সমূহের নানা দৃশ্য ও দর্শনীয় বস্তু দেখিয়া বেড়াইলাম। দুইবার পার্লামেন্টে গিয়াছি, এবং আয়ার্ল্যাণ্ডের চিরন্তন সমস্যা লইয়া বিতর্ক শুনিয়াছি। দূর হইতে পার্লামেন্টের নাম শুনিলে যেমন সম্ভ্রম জাগে, ঐখানে ভিজিটর্স্ গ্যালারিতে বসিয়া সমস্ত দেখিয়া এবং শুনিয়া সে সম্ভ্রম কিছু বৃদ্ধি পাইল না। ঐখানে যে সব কথা উচ্চারিত হইতেছিল তাহা যে কোনও জাতির ভাগ্য নির্ণয় করিতে পারে ইহা বোধ হইল না। মনে হইল যে বয়স্ক বালকদের এটি একটি ডিবেটিং ক্লাব। পার্লামেন্ট গৃহগুলিও মনে খুব ছাপ রাখে না। যেন একটা প্রকাণ্ড শেড, গথিক ভঙ্গিতে নির্মিত, ভিতরে বহুসংখ্যক বিচার-সভা কক্ষ এবং অন্ধকার অনেকগুলি যোগাযোগের পথ। সৌধটি ১৮৪০ হইতে ১৮৫৭ সনের মধ্যে নির্মিত। পূর্বে এখানে ওয়েস্টমিনস্টার প্রাসাদ ও সেণ্ট স্টিফেনের চ্যাপেল ছিল। বাহিরে সর্বাপেক্ষা লক্ষণীয় কুক টাওয়ার। উচ্চতায় ৩২০ ফুট, প্রকাণ্ড ঘড়ি তাহার সঙ্গে, পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঘড়ি বলিয়া খ্যাত। দৈনিক ৪ সেকেণ্ডের বেশি তফাৎ চলে না। সপ্তাহে দুইবার দম দিতে হয়, এবং যে অংশ বাজে, তাহাতে দম দিতে পাঁচ ঘণ্টা লাগে। যে ঘণ্টাটি বাজে তাহার নাম বিগ্ বেন। এই বিগ্ বেনের কাজ পূর্বে করিত 'গ্রেট টম অভ ওয়েস্টমিনস্টার।' এটিকে ১৬৯৯ সনে উইলিয়াম-৩'এর অনুমতি ক্রমে সেণ্ট পল্স্ ক্যাথীড্রালে স্থানান্তরিত করা হয়। উইলিয়াম ও মেরির রাজত্বকালে গ্রেট টম একবার একটি মজার ভুল করিয়াছিল। রাত্রি দ্বিপ্রহরে একদিন ১২টার স্থলে ১৩টা ঘণ্টা বাজিয়াছিল। ইহা ধরা পড়ে কয়েক মাইল দূরবর্তী উইণ্ডসর প্রাসাদের এক প্রহরীর নিকট। উইণ্ডসর ক্যাসেলের এক টেরাসের উপর কর্তব্যরত কালে সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। এই অপরাধে সামরিক আইনে তাহার বিচার হয় এবং দণ্ডাদেশ হয়। কিন্তু সে বলে সে নিরপরাধ, কারণ তাহাকে গ্রেট টম বিভ্রান্ত করিয়াছে, মধ্যরাত্রিতে সে ১৩টা বাজাইয়াছে। বিচারকগণ তাহার কথা বিশ্বাস করেন নাই কিন্তু দ্বিপ্রহরে সব প্রকাশ হইয়া পড়িল, অপর কয়েকজন ব্যক্তি আসিয়া সাক্ষ্য দিল, প্রহরীর কথা সত্য। প্রহরীকে ক্ষমা করা হইল।

পার্লামেন্ট হাউসগুলির নিকট বিখ্যাত ওয়েস্টমিনস্টার অ্যাবি। এইখানে ইংল্যাণ্ডের রাজাদিগের রাজ্যাভিষেক হয়, মাথায় মুকুট পরান হয়। ইংল্যাণ্ডের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের ভস্ম এইখানে রক্ষিত আছে। ওয়েস্টমিনস্টার অ্যাবি এমন একটি মনুমেণ্ট ও চ্যাপেল প্রভৃতির জটিল স্তূপ যে ইহার বর্ণনা এখানে অসম্ভব। শুধু রাজা রাণীদের সমাধি ও স্মৃতিফলক নহে, বহু অখ্যাত ব্যক্তির সমাধি বা স্মৃতিফলকও এখানে আছে। এই কারণেই গোল্ডস্মিথ তাঁহার চীনা দার্শনিকের মুখ দিয়া বলাইয়াছেন,—"ঐটি আমার মনে হইতেছে কোনও বিখ্যাত ব্যক্তির সমাধি। কি চমৎকার অলঙ্করণ, কি সুন্দর কারুকার্য, মনে হইতেছে ইহা কোনও রাজার স্মৃতি সমাধি হইবে—যিনি দেশকে ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন...কিন্তু উক্ত দার্শনিক শুনিয়া হতবাক্ হইলেন যে, এই অ্যাবিতে সমাধি লাভ করিবার জন্য কাহারও পক্ষে কোনও বিষয় কৃতী হওয়া অত্যাবশ্যক নহে যে বিভাগে বিখ্যাত ব্যক্তিদের হাড় সমাহিত রহিয়াছে,

অথবা স্মারক রক্ষিত আছে সে বিভাগের নাম "পোয়েট্স্ কর্নার।" এখানে সমাধি, পদক, আবক্ষ মূর্তি, ফলক, কিংবা স্তম্ভ আছে। এবং এমন সব ব্যক্তির আছে, যাঁহাদের নাম ভারতবর্ষেও পরিচিত। যথা বেন জনসন, স্যামুয়েল বাটলার, জন মিলটন, টমাস গ্রে, ম্যাথিউ প্রাইয়র ইত্যাদি। এডওয়ার্ড দি কনফেসরের নামে যে চ্যাপেলটি উৎসর্গীকৃত সেখানে দুইটি করোনেশন চেয়ার আছে, এখনও উহা অভিষেকে ব্যবহৃত হয়। তাহার একটিতে স্কটল্যাণ্ডের স্কোন নামক গ্রামের একটি ধূসরাভ লাল প্রস্তর আছে, ইহার উপরে স্কটিশ রাজাদের অভিষেক সম্পন্ন হইত। ইহা তাহাদের নিকট অতিশ্রদ্ধার বস্তু। যাহা হউক অ্যাডিসন আমাকে এবং যাঁহারা ভবিষ্যতে এইস্থানের ভস্ম ও অন্যান্য মৃতদের স্মারক উপলক্ষে ভাবপূর্ণ লেখা লিখিতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহাদের রক্ষা করিয়াছেন। তিনি 'স্পেকটেটর'-এ লিখিয়াছেন, "যখন আমি রাজাদের ও সেই রাজাদের উচ্ছেদকারীদের একত্র এই সমাধিতে শায়িত দেখি, যখন দেখি প্রতিদ্বন্দ্বী বুদ্ধিজীবীগণ পাশাপাশি রহিয়াছেন, ধর্মীয় ব্যক্তিগণ, যাঁহারা তাঁহাদের নিজস্ব মত দ্বারা পৃথিবীকে ভাগ করিয়া দিয়াছেন, তাঁহারা এইখানে সহ-অবস্থান করিতেছেন, তখন আমি দুঃখের সঙ্গে নৈরাশ্যের সঙ্গে এই কথাই ভাবি যে, এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা, এই বিবাদ বিতর্কের কতটুকু দাম আছে মানুষের সমাজে?"—এই কথাগুলির সঙ্গে আরও এক কবির কথা যোগ করা যাইতে পারে—শেখ সাদির কথা—

> "কত না ছিল বসুধাধীশ, রাজোষ্ণীষ শিরে,
> কত না ছিল তুমুল বলী মুলুক মলি' ফিরে।...
> প্রাণের পাকা শস্য তারা উড়ায়ে দেছে বায়,
> কেহই আর কদাপি তার চিহ্ন নাহি পায়।"

(মূল পারসিক হইতে বিহারীলাল গোস্বামী প্রণীত সাদির পন্দ্‌নামা (১৯২৫) হইতে উদ্ধৃত। 'এ ভিজিট টু ইউরোপ' গ্রন্থের লেখক যে উদ্ধৃতি ও তাহার ইংরেজী অনুবাদ দিয়াছেন, তাহার পরিবর্তে এই ছন্দানুবাদটিই দেওয়া হইল।—অনুবাদক।)

ক্রমশঃ

সর্ব্বভারতীয় ব্যাঙ্ক কর্ম্মচারী আন্দোলনের পথরেখা

সমর দত্ত

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯১৮ সাল থেকে ১৯২৪ সাল পর্য্যন্ত যে কাল সেই কালটিকে ভারতবর্ষে শ্রমিক শ্রেণীর নব জাগরণের কাল বলা যেতে পারে। সেই কালটিতেই ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশে বিশেষ ক'রে বাঙলাদেশে (ভারতীয় স্বাধীনতার পূর্ব্ববর্ত্তী অবিভক্ত বাঙলায়) বহু নতুন শ্রমিক সংস্থা গড়ে ওঠে এবং শ্রমিক আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। নব প্রতিষ্ঠিত শ্রমিক সংস্থাগুলির প্রচেষ্টায় এদেশের শ্রমিকগণ পারস্পরিক ঐক্য প্রতিষ্ঠায় এবং আত্ম-সচেতনতা ও আত্ম-প্রত্যয় লাভে সমর্থ হয়। শুধু তাই নয় এই শ্রমিক সংস্থাগুলির অনুকূলতায় বহু শিল্পে ধর্ম্মঘটও অনুষ্ঠিত হয়। ১৯২০ সালের ১লা জুলাই থেকে ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত কলকাতার শিল্পাঞ্চলে ৮৯টি, বর্দ্ধমানের কয়লা খনি অঞ্চলে ১৮টি, খড়্গপুরে ১টি এবং বরিশালে ২টি ধর্ম্মঘট হয়। ১৯২১ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত মোট ৩৩৪টি ধর্ম্মঘট হয়। ১৯২০ সালের ১লা জুলাই থেকে ১৯২১ সালের ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত যে ১৩৭টি প্রধান ধর্ম্মঘট হয় তার মধ্যে ১১০টি হয় মজুরী বৃদ্ধির জন্য। এই ধর্ম্মঘটগুলি লৌহ, কয়লা, চট, বস্ত্র, রেলপথ, ছাপাখানা এবং কলিকাতার শহর ও বন্দরের মালপত্র সংরক্ষণ ও পরিবহন শিল্পেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

১৯২৬ সালে ভারতবর্ষে ট্রেড ইউনিয়ন এ্যাক্ট প্রবর্ত্তিত হয়। এই আইনে শ্রমিকগণের ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন সৃষ্টির অধিকার স্বীকার করে নেওয়া হয়। সংগঠনগুলি ধর্ম্মঘট পরিচালনার জন্য তহবিল গঠনেরও অধিকার লাভ করে। এরপর ১৯২৯ সালে শিল্প-বিরোধ আইন প্রবর্ত্তিত হয়। ১৯৪৭ সালে এই আইনটি পরিবর্ত্তিত আকারে শ্রমিক সমস্যা সমাধানে বিশেষ গুরুত্ব অর্জ্জন করে। ইতিমধ্যে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের নেতৃত্বে রাজনৈতিক মতবাদের দ্বন্দ্বে জাতীয়তাবাদী নেতারা নরম ও চরম দুটি দলে বিভক্ত হয়ে পড়েন। ১৯২৯ সালে নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের নাগপুর অধিবেশনে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের নেতৃত্বে ভাঙনের সৃষ্টি হয়। তৎকালীন ভারতবর্ষে শ্রমিক সমস্যা অনুসন্ধানের জন্য হুইটলি কমিশন বয়কট করার প্রশ্নে মতভেদ তীব্রতর হয়ে ওঠে। ১৯৩০ সালে পৃথিবী-ব্যাপী মন্দার প্রতিক্রিয়া ভারতবর্ষেও দেখা দেয়। ভারতে শ্রমিক আন্দোলনের অগ্রগতি কিছুকালের জন্য ব্যাহত হয়।

১৯৪৬ সালের ১১ই জুলাই ডাকও তার বিভাগের ধর্ম্মঘটকে কেন্দ্র ক'রে এদেশে সর্ব্বভারতীয় ভিত্তিতে একটি ব্যাপক শ্রমিক আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। এই ঐতিহাসিক শ্রমিক আন্দোলনের সমর্থনে ১৯৪৬ সালের ২৯শে জুলাই সারা বাঙলায় সাধারণ ধর্ম্মঘট পালিত হয়। শ্রমিক শ্রেণীর সমর্থনে এটাই ছিল সর্ব্বপ্রথম সাধারণ ধর্ম্মঘট। এই ধর্ম্মঘটের পর অনতি বিলম্বে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের (বর্ত্তমান ষ্টেট ব্যাঙ্কের) কর্ম্মচারীগণের উদ্যোগে আরও একটি ঐতিহাসিক ধর্ম্মঘট অনুষ্ঠিত হয়। এই ধর্ম্মঘটটি ৪৬ দিন স্থায়ী হয়। এই ধর্ম্মঘটের পরবর্ত্তী কাল থেকে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের, বিশেষ ক'রে বাঙলা দেশের, ব্যাঙ্ক-কর্ম্মচারীগণ সাংগঠনিক কর্ম্মে মনপ্রাণ নিয়োগ করে।

৩, হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীট (বর্ত্তমান কিরণশঙ্কর রায় রোড,) যেখানে এখন নগর দেওয়ানী আদালতের প্রকাণ্ড বাড়ী,

সেইখানে ১৯৪৬ সাল থেকে ১৯৫৩ সাল পর্য্যন্ত ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক ষ্টাফ এ্যাসোসিয়েশনের কার্য্যালয় ছিল। ষ্টাফ এ্যাসোসিয়েশনের এই কার্য্যালয়ে অনেক ট্রেড ইউনিয়ন নেতা এবং বহু ট্রেড ইউনিয়ন কর্ম্মীর সমাগম হ'ত। চার্টার্ড ব্যাঙ্ক, লয়েডস্ ব্যাঙ্ক, মার্কেনটাইল ব্যাঙ্ক, ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক, হংকং ব্যাঙ্ক, ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক এবং ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দকে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক ষ্টাফ এ্যাসোসিয়েশনের উক্ত কার্য্যালয়ে প্রায়ই দেখা যেত। তাদের উদ্দেশ্য ছিল ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক ষ্টাফ এ্যাসোসিয়েশনের নেতৃত্বে এবং অন্যান্য ব্যাঙ্ক ইউনিয়নের সহযোগিতায় সর্ব্বভারতীয় ভিত্তিতে ব্যাঙ্ক-কর্ম্মচারীগণের একটি ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন গড়ে তোলা। এই উদ্দেশ্যে উল্লিখিত ব্যাঙ্ক-কর্ম্মচারী ইউনিয়নগুলির প্রতিনিধিগণকে নিয়ে একটি সাব কমিটি গঠিত হয়। ১৯৪৬ সালের শেষের দিকে এই সাব কমিটির কাজ আরম্ভ হয়। কিন্তু ইতিপূর্ব্বে ১৯৪৫ সালের নভেম্বর অথবা ডিসেম্বর মাসে কয়েকজন বিশেষ উৎসাহী ব্যাঙ্ক কর্ম্মচারীর চেষ্টায় অল ইণ্ডিয়া ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ (নিখিল ভারত ব্যাঙ্ক-কর্মচারী সমিতি) প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বিশেষ উৎসাহী ব্যাঙ্ক কর্ম্মচারীগণের পূর্ণ পরিচয় সম্বন্ধে কারুরই সুস্পষ্ট ধারণা নাই। তবে ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার শ্রীরমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী (সম্ভবতঃ বর্ত্তমানে তিনি ঐ ব্যাঙ্কের দিল্লী শাখার একজন উচ্চপদস্থ অফিসার) যে এই বিশেষ উৎসাহী ব্যাঙ্ক-কর্ম্মচারীগণের অন্যতম সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই।

১৯৪৬ সালের ১লা এপ্রিল কলকাতায় অল ইণ্ডিয়া ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ এ্যাসোসিয়েশনের (সংক্ষেপে এ আই বি ই-র) প্রথম অধিবেশন হয়। সেই অধিবেশনে শ্রী কে সি নিয়োগী এবং শ্রীরমেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী যথাক্রমে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্ব্বাচিত হ'ন। শ্রীনিয়োগী স্বাধীন ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের একজন মন্ত্রী এবং যোজনা কমিশনের সদস্য ছিলেন। শ্রীচক্রবর্ত্তী যে ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার কর্ম্মচারী ছিলেন সে কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করেছি। এই অধিবেশনে বহু উচ্চপদস্থ অফিসার যোগদান করে এবং অধিবেশনের কার্য্যাবলী সম্বন্ধে ব্যাঙ্ক-কর্ম্মচারীগণ অপেক্ষা অফিসারদেরই অধিকতর আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়। এটা নিশ্চয় একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার। শোনা যায় এই প্রতিষ্ঠানটি তখন ব্যাঙ্ক মালিকগণের নিকট আবেদন নিবেদন জানিয়েই সন্তুষ্ট থাকত। উত্তরোত্তর শক্তিশালী হওয়ার পরিবর্ত্তে প্রতিষ্ঠানটি ক্রমশঃ দুর্ব্বল হয়ে পড়ে এবং এর অস্তিত্ব বিলুপ্ত হবার উপক্রম হয়। ঠিক এমনি সময়ে অর্থাৎ ১৯৪৭ সালের গোড়ার দিকে ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত সাব কমিটি যেটি ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক ষ্টাফ এ্যাসোসিয়েশনের নেতৃত্বে এবং অন্যান্য ব্যাঙ্ক কর্ম্মচারী ইউনিয়নের সহযোগিতায় গঠিত হয়েছিল সেই সাব কমিটি এই মৃত-প্রায় সংগঠনটিকে নবজীবন দান করে। প্রকৃতপক্ষে এই সাব-কমিটির পরিশ্রম ও প্রচেষ্টার ফল হ'ল এক নতুন এ আই বি ই এ।

১৯৪৬ সালে বম্বের ন্যাশনাল ব্যাঙ্কে প্রথম ধর্ম্মঘট হয়। এই ধর্ম্মঘটের সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার কর্ম্মচারীগণও ধর্ম্মঘট করে। এই ধর্ম্মঘটের ফল এই দু'টি ব্যাঙ্কের মালিকগণ সংগ্রামরত ব্যাঙ্ক-কর্ম্মচারীগণের সঙ্গে তাদের মূল বেতন ও চাকুরির অবস্থা সম্বন্ধে চুক্তি করতে বাধ্য হয়। এই সময়ে কলকাতার ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্কেও (বর্ত্তমানে অস্তিত্বহীন) একটি ধর্ম্মঘট হয়। এর পর ১৯৪৬ সালের ১লা আগষ্ট ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কে যে ধর্ম্মঘট হয় সে সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে আলোচিত হয়েছে।

১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর মাসে এ আই বি ই-এর দ্বিতীয় অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে বাঙলা, বিহার, উত্তর প্রদেশ এবং বম্বের প্রতিনিধিগণ যোগ দেয়। স্বনামখ্যাত দেশনেতা শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই অধিবেশনে এই সংগঠনের সভাপতি নির্ব্বাচিত হ'ন। শ্রীঠাকুরের অক্লান্ত চেষ্টার ফলে এই প্রতিষ্ঠানটির কতক-গুলি আঞ্চলিক সংস্থা গড়ে ওঠে। এই আঞ্চলিক সংস্থা গুলির মধ্যে বঙ্গীয় প্রাদেশিক ব্যাঙ্ক-কর্ম্মচারী সমিতি, উত্তর প্রদেশ ব্যাঙ্ক-কর্মচারী ইউনিয়ন এবং বম্বের ব্যাঙ্ক-কর্ম্মচারী ফেডারেশন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই

অধিবেশনে সংগঠনটির (এ আই বি ই-র) সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হ'ন শ্রীঈশ্বর তেওয়ারী। শ্রীতেওয়ারী একজন ব্যাঙ্ক-কর্মচারী।

১৯৪৮ সালে ব্যাঙ্ক কর্মচারী আন্দোলন অত্যন্ত বেগবান্ হয়। বিভিন্ন ব্যাঙ্ক কর্মচারী ইউনিয়ন নিজ নিজ ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের নিকট দাবীপত্র পেশ করে। দাবীগুলির বিচার বিবেচনার জন্য ব্যাঙ্ক-কর্তৃপক্ষ সরকারের সহায়তায় সালিসির আশ্রয় নেয়। এই ১৯৪৮ সালেই ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের ব্যাঙ্ক কর্মচারীগণের মূল বেতন ও চাকুরীর শর্ত্তাদি সম্বন্ধে সালিসির রোয়েদাদ প্রকাশিত হয়। এই সময়ে দিল্লীর ব্যাঙ্ক-কর্মচারীগণ সাংগঠনিক কর্মে বিশেষ ভাবে লিপ্ত হয়। কলকাতার ভারত ব্যাঙ্কের কর্মচারীগণ এই সময়ে দু'বার ধর্মঘট করে, কলকাতার সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের কর্মচারীগণ ১৯দিন ব্যাপী তাদের ব্যাঙ্কের দরজা বন্ধ ক'রে রাখে, তাদের দাবী-দাওয়া সম্বন্ধে ট্রাইবুনাল-প্রদত্ত রোয়েদাদ ব্যাঙ্ক-মালিক কর্তৃক উপেক্ষিত হওয়ার জন্য সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কে এই ধর্মঘট হয়। ১৯৪৮ সালের ১৭ই আগষ্ট পশ্চিম বঙ্গে বিভিন্ন ব্যাঙ্কের প্রায় ২০ হাজার কর্মচারী সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক কর্মচারীগণের এই সংগ্রামের সমর্থনে এক দিনের সহানুভূতিসূচক ধর্মঘট পালন করে। সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের ধর্মঘটের প্রতি সমর্থনের উদ্দেশ্যে ১৭ই আগষ্টের কয়েকদিন পূর্ব্বে কলকাতার ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিট্যুট হলে একটি বিশাল জন-সমাবেশ হয়। বিভিন্ন ব্যাঙ্কের কর্মচারীগণ ব্যতীত অন্যান্য বহু শ্রমজীবী মানুষ এই সভায় উপস্থিত হয়। সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের তৎকালীন সম্পাদক শ্রীনরেশ পাল, লয়েড্‌স্ ব্যাঙ্কের শ্রীপ্রভাত কর, ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের শ্রীজ্যোতি ঘোষ এবং শ্রীভবানী চট্টোপাধ্যায়ের বক্তৃতার পর প্রত্যেক ব্যাঙ্ক ইউনিয়নের এক-একজন প্রতিনিধি বক্তব্য রাখে। তারপর সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের ধর্মঘটের সমর্থনে সমগ্র পশ্চিম বঙ্গে যাতে ১৭ই আগষ্টে এক দিনের সাধারণ ধর্মঘট হয় সে সম্বন্ধে সর্ব্বসম্মতিক্রমে সঙ্কল্প গৃহীত হয়। সর্ব্বশেষে প্রচলিত রীতি অনুসারে সভাপতি শ্রীসৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর বক্তৃতা করতে ওঠেন। প্রথমে তিনি সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের দাবীদাওয়ার যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করেন, তারপর ট্রাইবুনালের রায় মেনে না নেওয়ার জন্য ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে প্রচণ্ড ভাবে আক্রমণ করেন। প্রকৃতপক্ষে শ্রীঠাকুরের সেই বক্তৃতা ভাষায় বর্ণনা করা কঠিন। সংক্ষেপে বলা যেতে পারে, সেদিন তাঁর বক্তৃতা শ্রোতৃবৃন্দকে মন্ত্রমুগ্ধ ক'রে তোলে এবং প্রতিটি ব্যাঙ্ক-কর্মচারী অনিঃশেষ উৎসাহ ও অনবদ্য প্রেরণা লাভ করে।

১৯৪৮ সালের অক্টোবর মাসে লয়েড্‌স্ ব্যাঙ্কের কর্মচারীগণ ২৬ দিন ধর্মঘট করে। এই ধর্মঘটের ফলে ৪০ জন কর্মচারী দণ্ডিত হয়। লয়েড্‌স্ ব্যাঙ্ক-কর্তৃপক্ষ আরও ১১ জন কর্মচারীকে সরাসরি বরখাস্ত করে দেয়। শুধু তাই নয়, নানাভাবে দোষারোপ ক'রে কর্তৃপক্ষ এই ১১ জন কর্মীর বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা রুজু করে দেয়। সেদিন লয়েড্‌স্ ব্যাঙ্কের চাকুরী থেকে যে ১১ জন ব্যাঙ্ক-কর্মচারীকে বিদায় নিতে হয়েছিল তাদের মধ্যে ব্যাঙ্ক-কর্মচারী আন্দোলনের প্রসিদ্ধ নেতা এবং নিখিল ভারত ব্যাঙ্ক কর্মচারী সমিতির অভিজ্ঞ সাধারণ সম্পাদক শ্রীপ্রভাত কর অন্যতম। শ্রীকর যখন চাকুরী হারান তখন তিনি ছিলেন একজন সাধারণ ব্যাঙ্ক-কর্মচারী। সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের একজন যুবক চাকুরী হারাবার পর কেবল মাত্র যে অসহায় হয়ে পড়ে তা নয়। এই রকম অবস্থায় অধিকাংশ যুবকই তার মত ও পথ পরিবর্তন ক'রে মালিকের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করে অথবা কমপক্ষে অনুতাপ প্রকাশ করে যাতে সে চাকুরীতে পুনর্বহাল হতে পারে। হৃত চাকুরী ফিরে পাওয়া যদি একান্তই অসম্ভব হয় তাহলে চাকুরীহারা মানুষ অন্যত্র চাকুরীর সন্ধান করে। কিন্তু শ্রীপ্রভাত করকে দেখা গেল সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের মানুষ রূপে। সংসারের বহু দুঃখকষ্ট সত্ত্বেও ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের কণ্টকাকীর্ণ পথে তাঁর নব যাত্রা শুরু হ'ল। আজও তিনি সেই দুর্গম পথের যাত্রী।

১৯৪৯ সালের গোড়া থেকেই ভারতবর্ষের বিভিন্ন

অঞ্চলে বেতন বৃদ্ধি এবং উন্নততর চাকুরীর অবস্থার জন্য ব্যাঙ্ক-কর্ম্মচারী আন্দোলন আরম্ভ হয়। সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলির সরকার কয়েকটি ক্ষেত্রে কর্মচারীগণের দাবী-দাওয়া মেটাবার জন্য ট্রাইবুনাল নিযুক্ত করে। এই বৎসর দিল্লীর ভারত ব্যাঙ্কে ২১ দিন ধর্ম্মঘট হয়। ধর্ম্মঘটকারী কর্ম্মচারীগণের উপর পুলিশের লাঠি চলে এবং অনেক কর্মচারীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। এই ধর্ম্মঘটের জন্য ২৬ জন কর্ম্মচারী শাস্তি প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ তাদের চাকুরী যায়। কর্ম্মচারীরগণের দাবী দাওয়া পূরণের ব্যাপারে মালিক পক্ষ যতই অনমনীয় মনোভাব পোষণ করে আন্দোলনের গতি ততই দুর্ব্বার হয়ে ওঠে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে ব্যাঙ্ক-কর্ম্মচারীগণের বিক্ষোভ প্রদর্শন, সাময়িক কর্ম্ম বিরতি, কলম ধর্ম্মঘট, এমনকি পূর্ণাঙ্গ ধর্ম্মঘট নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। এই রকম পরিস্থিতিতে মালিকপক্ষ এবং বিভিন্ন রাজ্য সরকার অত্যন্ত বিব্রত হয়ে পড়ে। সারা দেশে ব্যাঙ্ক কর্ম্মচারী আন্দোলনের দুর্দ্দমনীয় গতির কথা বিবেচনা ক'রে এবং ব্যাঙ্ক কর্ম্মচারীগণের অনুন্নত চাকুরীর অবস্থার প্রতিবিধানের উদ্দেশ্যে ভারত সরকার ১৯৪৯ সালে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ডিস্‌পিউট এ্যাক্টটিকে পুনরায় সংশোধন করে নেয়। এরপর অনতিবিলম্বে সরকার একটি অর্ডিনান্স জারী ক'রে ব্যাঙ্ক শিল্পে শ্রমিক-মালিক-বিরোধনিষ্পত্তির জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের উপর দায়িত্ব অর্পণ করে। ১৯৪৯ সালের ১০ই জুন ভারত সরকারের শ্রমমন্ত্রণালয় একটি বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ব্যাঙ্ক শিল্পে শ্রমিক-মালিক-বিরোধ মীমাংসার জন্য একটি সর্ব্বভারতীয় ট্রাইবুনাল গঠনের কথা প্রকাশ করে। এই ট্রাইবুনালটির নাম অল ইণ্ডিয়া ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ট্রাইবুনাল (ব্যাঙ্কডিসপিউট)। এটি একটি তিনজন সদস্য বিশিষ্ট ট্রাইবুনাল। বম্বে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কোর্টের সভাপতি এবং বম্বে হাইকোর্টের অবসর প্রাপ্ত বিচারপতি শ্রী কে সি সেন এই ট্রাইবুনালের সভাপতি নিযুক্ত হ'ন। অন্য দু'জন সদস্যের মধ্যে ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি শ্রী জে, এন মজুমদার ও মাদ্রাজ হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি শ্রী সি এস আয়ার। সভাপতি কে সি সেনের নামানুসারে এই ট্রাইবুণাল সেন ট্রাইবুনাল নামে পরিচিতি লাভ করে। ১৯৫০ সালের ১১ই আগষ্ট সেন ট্রাইবুনালের রোয়েদাদ প্রকাশিত হয়।

১৯৫০ সালের অক্টোবর মাসে জলন্ধরে এ আই বি ই-র তৃতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনে শ্রীসৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর সভাপতিরূপে পুনর্নির্ব্বাচিত হ'ন। সাধারণ সম্পাদক নির্ব্বাচিত হ'ন শ্রীদয়ালদাস খান্না। শ্রী খান্না একজন ব্যাঙ্ক-কর্ম্মচারী। জলন্ধর অধিবেশনে পশ্চিম বঙ্গ, বিহার, উত্তর প্রদেশ, পাঞ্জাব, দিল্লী এবং বম্বের প্রতিনিধিগণ যোগদান করে। ১৯৫১ সালের মার্চ মাসে দিল্লীতে এ আই বি ই-এর চতুর্থ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনে উল্লিখিত রাজ্যগুলির প্রতিনিধিগণ ব্যতীত রাজস্থানের প্রতিনিধিগণ অংশ গ্রহণ করে। এই অধিবেশনে তৎকালীন সোস্যালিষ্ট পার্টি'র অন্যতম নেতা এবং বম্বের আইনজীবী শ্রী জি জি মেটা সভাপতি নিযুক্ত হ'ন। সাধারণ সম্পাদক নির্ব্বাচিত হ'ন ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের কর্ম্মচারী এবং ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক ষ্টাফ এ্যাসোসিয়েশনের অন্যতম নেতা শ্রীরোশনলাল মালহোত্রা। এই রোশনলাল মালহোত্রা ব্যাঙ্ক-কর্ম্মচারীগণের তরফ থেকে জেনেভায় আন্তর্জ্জাতিক শ্রম-প্রতিষ্ঠানে (আই এল ও) সর্ব্বপ্রথম প্রতিনিধিত্ব করেন।

১৯৫১ সালের ৯ই এপ্রিল পূর্ব্বোক্ত সেন ট্রাইবুনালের রোয়েদাদ ভারতের সুপ্রিম কোর্ট কর্ত্তৃক বে-আইনী ব'লে ঘোষিত হয়। সুপ্রীম কোর্টে'র এইরকম হুকুম জারীর ফলে সমগ্র ভারতবর্ষে প্রায় ৬৬০০০ হাজার ব্যাঙ্ক-কর্ম্মচারী বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। ব্যাঙ্ক-কর্ম্মচারীগণের প্রতিকূলে ঘোষিত সুপ্রিম কোর্টে'র নির্দ্দেশের সুযোগ নিয়ে ব্যাঙ্ক-মালিকগণ কর্ম্মচারীগণের পূর্ব্ববর্ত্তী চাকুরীর অবস্থায় (যে অবস্থায় তারা সেন ট্রাইবুনালের রোয়েদাদ প্রচলিত হবার পূর্ব্বে ছিল) ফিরে নেবার চেষ্টা করে। এ আই বি ই এ, ষ্টেট ব্যাঙ্ক ষ্টাফ ফেডারেশন এবং অন্যান্য ব্যাঙ্ক-কর্ম্মচারী সংস্থা অত্যন্ত যৌক্তিকতার সঙ্গে এক

বাক্যে ভারত সরকারের নিকট দাবী জানায় যে সরকার পার্লামেন্টে আইন পাশ করে অথবা পার্লামেন্টের অধিবেশন না হওয়া পর্য্যন্ত অর্ডিনান্সজারী করে সেন ট্রাইবুনালের রোয়েদাদ আইনসম্মত ব'লে ঘোষণা করে দিক। প্রথমদিকে এ বিষয়ে সরকারের নিকট থেকে আশানুরূপ সাড়া পাওয়া যায় নি। ইতিমধ্যে ১৯৫১ সালের ১৭ই এপ্রিল থেকে পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের কর্মচারীগণ সারা ভারত ব্যাপী ধর্মঘট শুরু করে। এই ধর্মঘট ৪৯ দিন স্থায়ী হয় এবং এই ধর্মঘটের ফলে ১৫০ জন কর্মচারী শাস্তি পায়। এমনি করে ব্যাঙ্ক কর্মচারী আন্দোলনের উত্তাল তরঙ্গে দেশ যখন আলোড়িত ভারত সরকার তখন দিল্লীতে শ্রমিক মালিক এবং সরকারী প্রতিনিধিগণকে নিয়ে একটি ত্রি-পাক্ষিক অধিবেশনের ব্যবস্থা করে। এই অধিবেশনে ভারত সরকারের তরফ থেকে এই আশ্বাস দেওয়া হয় যে মালিক পক্ষের খেয়াল-খুশিমত ব্যাঙ্ক-কর্মচারীগণের চাকুরীর অবস্থার অবনতি যাতে না ঘটে সে সম্বন্ধে সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করবে।

এই অধিবেশনের পর অনতিবিলম্বে ভারত সরকার ঘোষণা করে যে ব্যাঙ্ক-কর্মচারীগণ সেন ট্রাইবুনালের রোয়েদাদ অনুসারে ১৯৫১ সালের ১লা এপ্রিল পর্য্যন্ত যে পরিমাণ মাহিনা, ভাতা ইত্যাদি পেয়েছিল মালিক পক্ষ তাদের সেই পরিমাণ প্রাপ্য কমিয়ে দিতে পারবে না। এইভাবে ব্যাঙ্ক-কর্মচারীগণের স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে ভারত সরকার ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ডিসপিউট এ্যাক্টটিকে আবশ্যক মত সংশোধন ক'রে নেয়।

কিন্তু এটা তো হ'ল একটা সাময়িক ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থা সত্ত্বেও ব্যাঙ্ক শিল্পে শ্রমিক-মালিক বিরোধ থেকেই গেল। এই বিরোধের অবসান ঘটিয়ে যাতে কর্মচারীগণের দাবী-দাওয়া পূরণ করা যায় সেজন্য আন্দোলন চলতে থাকল। আলোচ্য বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য ভারত সরকার ১৯৫১ সালের মে মাসে বিচারপতি শ্রী এস এন সেনকে সভাপতি নিযুক্ত ক'রে একটি কনসিলিয়েশন বোর্ড গঠন করে। কিন্তু এই বোর্ডটির গঠনের মধ্যে কয়েকটি গলদ পরিলক্ষিত হয়। সেইজন্য সরকার এটি বাতিল ক'রে দেয়। এরপর ভারত সরকার একটি সর্বভারতীয় ট্রাইবুনাল গঠন করে। এটি একটি তিনজন সদস্যবিশিষ্ট ট্রাইবুনাল। এর সভাপতি নিযুক্ত হ'ন শ্রী এইচ ভি দিভেতিয়া। কিন্তু এই ট্রাইবুনালের তিনজন সদস্যের মধ্যে দু'জন সদস্য কোন কোন ব্যাঙ্কের শেয়ারহোল্ডার ছিলেন। সেইজন্য ব্যাঙ্ক-কর্মচারীগণ এই রকম একটা ট্রাইবুনালকে স্বীকার ক'রে নিতে অসম্মত হয়। এ বিষয়ে সরকারী মতামত প্রকাশিত হবার পূর্বেই ট্রাইবুনালের তিনজন সদস্যই পদত্যাগ করেন। ইতিমধ্যে ১৯৫১ সালের ডিসেম্বর মাসে ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার কর্মচারীগণ সারাভারতব্যাপী ধর্মঘট করে। এই ধর্মঘটের সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঙ্ক অব বরোদা এবং ব্যাঙ্ক অব জয়পুরেও ধর্মঘট হয়। ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার কর্তৃপক্ষ ১৩জন কর্মচারীকে দণ্ডিত করে। অবশেষে ১৯৫২ সালের ৫ই জানুয়ারী ভারত সরকার তিনজন সদস্যবিশিষ্ট আর একটি সর্বভারতীয় ট্রাইবুনাল গঠন করে। এই ট্রাইবুনালের উপর ব্যাঙ্ক শিল্পে শ্রমিক-মালিক বিরোধের দায়িত্ব অর্পিত হয়। মাদ্রাজ হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি শ্রী এম পঞ্চপাগে শাস্ত্রী এই ট্রাইবুনালের সভাপতি নিযুক্ত হ'ন। অপর দু'জন সদস্যের মধ্যে ছিলেন ব্যাঙ্কিং বিশারদ শ্রী এম এন ট্যানন এবং মহীশুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক শ্রী ডি এল ডি-সোজা। এই সর্বভারতীয় ট্রাইবুনাল এ আই বি ইকে ব্যাঙ্ক-কর্মচারীগণের প্রধান মুখপাত্র হিসাবে স্বীকার করে নেয়। যথাসময়ে শাস্ত্রী ট্রাইবুনালের রোয়েদাদ প্রকাশিত হয়। কিন্তু কর্মচারীগণ অবাক্ বিস্ময়ে দেখে যে, এটি একটি শ্রমিক-বিরোধী রোয়েদাদ। ব্যাঙ্ক-কর্মচারী মহলে আবার সাজ সাজ রব ওঠে। শ্রমিক-বিরোধী শাস্ত্রী ট্রাইবুনাল ব্যাঙ্ক-কর্মচারীগণের সম্মুখে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের নতুন দিগন্ত উন্মুক্ত ক'রে দেয়।

১৯৫৩ সালের ১লা আগষ্ট লক্ষ্মৌতে এ আই বি ই-র পঞ্চম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনে

শ্রীবিনয় রায় ও শ্রীপ্রভাত কর যথাক্রমে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্ব্বাচিত হ'ন। এই লক্ষ্ণৌ অধিবেশনে এ আই বি ই-র আভ্যন্তরীণ রাজনীতির পট পরিবর্ত্তন হয়। ১৯৪৬ সালের পরবর্ত্তী কাল থেকে প্রায় ছয় বৎসর কাল ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক ষ্টাফ এ্যাসোসিয়েশন এবং ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক ষ্টাফ ফেডারেশন সর্ব্বভারতীয় ভিত্তিতে ব্যাঙ্ক-কর্ম্মচারী আন্দোলনের নেতৃত্ব দেয়। কিন্তু জলস্রোতের মত রাজনীতির স্রোত একভাবে বয় না। রাজনীতির নদীও বাঁক নেয়। এ আই বি ই-র রাজনীতির নদী বাঁক নিল উল্লিখিত লক্ষ্ণৌ অধিবেশনে।

এই অধিবেশনে সভাপতি নির্ব্বাচনের ব্যাপারে বিশেষ কোন জটিলতা পরিলক্ষিত হয়নি। তথাপি সংগঠনের উচ্চতম পদে একজন সাংবাদিকের নির্ব্বাচনে বেশ খানিকটা কৌতূহলের সৃষ্টি হয়েছিল। নব নির্ব্বাচিত সভাপতি শ্রীবিনয় রায় তখন পাটনার একজন বিশিষ্ট সাংবাদিক ছিলেন। বিহারের মধ্যবিত্ত কর্ম্মচারী গণের ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থাগুলির, বিশেষ ক'রে ডাক ও তার বিভাগের এবং ব্যাঙ্ক শিল্পের কর্ম্মচারীগণের ইউনিয়নগুলির সঙ্গে শ্রী রায়ের বিশেষ পরিচয় ছিল। ১৯৪৮-৪৯ সালে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের পাটনা শাখার কর্ম্মচারী এবং ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক ষ্টাফ এ্যাসোসিয়েশনের বিশিষ্ট ট্রেড ইউনিয়ন কর্ম্মী স্বর্গীয় সৌরেন্দ্রনাথ পালিত শ্রীরায়কে ব্যাঙ্ক কর্ম্মচারী আন্দোলনে নেতৃত্ব দেবার জন্য আহ্বান জানান। শ্রীরায় কয়েক বৎসরের মধ্যেই বিভিন্ন ব্যাঙ্ক-কর্ম্মচারী ইউনিয়ন, বিশেষ ক'রে এ আই বি ই-র বিভিন্ন অধিবেশনে অংশ গ্রহণ করেন। এই সময়ে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক স্টাফ এ্যাসোসিয়শনের প্রসিদ্ধ নেতা শ্রীমোহনলাল মজুমদারের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন, বিশেষ ক'রে ব্যাঙ্ক-কর্ম্মচারী আন্দোলন সম্বন্ধে শ্রীমজুমদারের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, ধৈর্য্যশীলতা এবং অন্যান্য 'গুণাবলী শ্রীরায়কে মুগ্ধ ক'রে। এ আই বি ই-এর লক্ষ্ণৌ অধিবেশনে শ্রীমোহন লাল মজুমদার ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক ষ্টাফ এ্যাসোসিয়েশনের তরফ থেকে সাধারণ সম্পাদকের পদপ্রার্থী হ'ন। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন শ্রীপ্রভাত কর। কিন্তু শ্রীমজুমদার শ্রীবিনয় রায়ের সমর্থন লাভে বঞ্চিত হ'ন। শ্রীরায় সমর্থন করেন শ্রীপ্রভাত করকে। এ কথা ঠিক যে শ্রীবিনয় রায় এই দু'জন প্রতিদ্বন্দ্বির মধ্যে সরাসরিভাবে কোন একজনকে সমর্থন এবং অপরজনের বিরুদ্ধাচারণ করেন নি। তথাপি বিহার প্রতিনিধি-গণের নেতা শ্রীবিনয় রায়ের উদ্যোগে শ্রীপ্রভাত কর বিহার প্রতিনিধিগণের অধিকতর সমর্থন লাভ করেন। এর ফলে শ্রীপ্রভাত কর সাধারণ সম্পাদকের নির্ব্বাচনে জয়যুক্ত হ'ন। শ্রীমোহন লাল মজুমদারের অপ্রত্যাশিত পরাজয় ঘটে।

এই সময়ে এ আই বি ই-র তত্ত্বাবধানের মাদ্রাজ, মধ্যপ্রদেশ, সৌরাষ্ট্র, উড়িষ্যা এবং আসামে সাংগঠনিক কর্ম্ম সুসম্পন্ন হয়।

১৯৫৪ সালে মাদ্রাজে এ আই বি ই-র ষষ্ঠ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনে বহিরাগতের পরিবর্ত্তে একজন ব্যাঙ্ক কর্ম্মচারী সর্ব্বপ্রথম সংগঠনের সভাপতি নির্ব্বাচিত হ'ন। এই ব্যাঙ্ক কর্ম্মচারীর নাম শ্রী এ সি কক্কর। শ্রীপ্রভাত কর সাধারণ সম্পাদক রূপে পুনর্নির্ব্বাচিত হ'ন। এই অধিবেশনে ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যের প্রতিনিধিগণ ব্যতীত আহামেদাবাদ, কেরালা এবং অন্ধ্রপ্রদেশের প্রতিনিধিগণ যোগদান করে।

এমনিভাবে বহু কর্ম্মচারীর কৃচ্ছ্র সাধনায় এবং বিশিষ্ট ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দের সহায়তায় ভারতবর্ষে ব্যাঙ্ক কর্মচারী আন্দোলনের ধারা প্রবাহিত হয়। এই প্রবহমান ধারা বহু পথ অতিক্রম ক'রে লক্ষ্যাভিমুখে ছুটে চলেছে।

কংগ্রেস স্মৃতি

(সপ্তত্রিংশ অধিবেশন—গয়া—১৯২২

শ্রীগিরিজামোহন সান্যাল

৯

১৮ই সেপ্টেম্বর বেলা ২টার সময় কংগ্রেসের চতুর্থ দিনের অধিবেশন আরম্ভ হল।

এদিন সভাপতি মশায় অসুস্থ থাকায় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ সভাপতির আসন গ্রহণ করলেন।

যথারীতি জাতীয় সঙ্গীতের পর সভার কার্য্য আরম্ভ হল।

সভাপতি মশায় স্বয়ং নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি উত্থাপন করলেন :—

এই কংগ্রেস বিহার কানাড়া ও বর্মার সাম্প্রতিক জল প্লাবনে বিপন্ন নরনারীর প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করছে এবং ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলসমূহের ভাইবোনদের সাহায্যের জন্য ওয়ার্কিং কমিটীর অর্থসংগ্রহের সহযোগিতা করার জন্য দেশের জনসাধারণকে আহ্বান করছে।

এই কংগ্রেস কংগ্রেসের সংবিধান ও তৎসংক্রান্ত নিয়মাবলী সংশোধন করে একটি রিপোর্ট কংগ্রেসের আগামী কাকিনাড়া অধিবেশনে পেশ করার জন্য নিম্নলিখিত ছয়জন সদস্যকে নিয়ে একটি কমিটী গঠন করছে :—

জর্জ যোসেফ, পণ্ডিত জওহর লাল নেহেরু (আহ্বায়ক), সুভাষচন্দ্র বসু, ডাঃ পট্টভি সীতারামায়া, পুরুষোত্তমদাস ট্যাণ্ডন ও জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

এই কংগ্রেস কারামুক্ত নেতাদের, বিশেষ করে লালা লাজপত রায় ও মৌলানা মহম্মদ আলীকে—অভিনন্দন জানাচ্ছে।

এই প্রস্তাব সম্বন্ধে কয়েকজন আপত্তি তুললেন। শেঠ যমনালাল বাজাজ, ডঃ কিচলু ও জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম অন্তর্ভুক্ত করার দাবি উঠল।

একজন প্রতিনিধি বললেন যে হয় প্রস্তাবে সকল সর্বজনপরিচিত নেতাদের নাম উল্লেখ করা হোক, নচেৎ কারুর নামই উল্লেখ না করা হোক।

এই আপত্তি গ্রাহ্য হল না।

এই কংগ্রেস গত ১২ মাসে কতকগুলি শহর ও নগরের অধিবাসিগণ ধর্ম ও মানবতার নীতি লঙ্ঘন করে তাদের প্রতিবেশীর ধন, প্রাণ ও উপাসনার স্থানগুলি আক্রমণ করে ক্ষতি করেছে তজ্জন্য গভীর দুঃখ প্রকাশ করে এবং এই সকল আক্রমণাত্মক কার্য্য তীব্র নিন্দার যোগ্য বিবেচনা করে প্রস্তাব করছে যে, যে সকল স্থানে এই সকল ঘটনা ঘটেছে সেই সকল স্থান পরিদর্শনান্তে বিষয়গুলি তদন্ত করে দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক যারা এই সকল ঘৃণ্য কাজের জন্য দোষী সাব্যস্ত হবে তাদের প্রকাশ্যে ধিক্কার দেওয়ার জন্য নিম্নলিখিত সদস্যগণকে নিয়ে একটি কমিটী গঠন করা হোক।

এই কংগ্রেস আরও প্রস্তাব করছে যে—ভবিষ্যতে এই সকল ঘটনা বন্ধ করার উদ্দেশ্যে এমন উপায় কমিটীকে সুপারিশ করতে বলা হোক যাতে—সকল সম্প্রদায় পরস্পরের মনে আঘাত না দিয়ে তাদের নিজ নিজ ধর্মানুষ্ঠান করতে পারে এবং জাতীয় ব্যাপারে পারস্পরিক সদিচ্ছা ও বিশ্বাসের সঙ্গে—সহযোগিতা করতে পারে।

এই কংগ্রেস প্রস্তাব করছে যে উপরোক্ত কমিটী নিম্নলিখিত সদস্য দ্বারা গঠিত হোক :—

আব্বাস তায়েবজী, টি এ নোরওয়ানী, বাবু ভগবান দাস, বাবু পুরুষোত্তম দাস ট্যাণ্ডন, মাষ্টার সুন্দর সিং, জর্জ যোসেফ ও টি বি এক ভারুয়া।

এই কংগ্রেস আরও প্রস্তাব করছে যে উপরোক্ত কমিটীকে অনুরোধ করা হোক, যেন তারা সাহারাণপুর

থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন পূর্বক দু-মাসের মধ্যে অল-ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটীর নিকট রিপোর্ট দাখিল করেন।

এই কংগ্রেস প্রস্তাব করছে যে, একটি ন্যাশানাল প্যাক্টের খসড়া প্রস্তুত করে তার সম্বন্ধে মতামত জানার জন্য দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় প্রতিনিধিদের এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিদের নিকট বিতরণ করে এবং তাঁদের নিকট হতে প্রাপ্ত অভিমত-গুলি বিবেচনা করে আগামী কাঁকিনাড়া কংগ্রেসে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য একটি রিপোর্ট, অল-ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটীর নিকট দাখিল করতে নিম্নলিখিত সদস্য-গণকে নিয়ে একটা কমিটি গঠিত হোক—

(১) লালা লাজপত রায় (অসুস্থতার জন্য অপারগ হলে তাঁর স্থলে পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়)।

(২) সর্দার মহাতাব সিং।

(৩) ডাঃ এম্. এ. আনসারী।

কমিটীর সদস্যদের নাম পড়ার সময় একজন পাঞ্জাবী মুসলমান প্রতিনিধি উঠে ডাঃ আনসারীর নামে আপত্তি জানিয়ে বললেন, ডাঃ আনসারী হিন্দুদের মত সমর্থন করে থাকেন, সুতরাং তিনি মুসলমানের প্রতিনিধি হওয়ার অযোগ্য। তাঁর মত অগ্রাহ্য হল।

এই কংগ্রেস প্রস্তাব করছে যে, যে-সকল বিষয়ে পারস্পরিক সাম্প্রদায়িক সম্পর্কে আঘাত লাগার সম্ভাবনা সে বিষয়ে আলোচনার সময় এবং তার উপর মত প্রকাশের সময় অত্যন্ত সংযত হওয়ার আবশ্যকীয়তার প্রতি ভারতীয় সংবাদপত্রগুলির দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং এমন দৃষ্টিভঙ্গী যা দেশের স্বার্থের পরিপন্থী হতে পারে এবং বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক সম্পর্ক তিক্ত হতে পারে তা না গ্রহণ করার জন্য ওয়ার্কিং কমিটীকে পাবলিক ম্যানিফেস্টো প্রচার—করতে উপদেশ দেওয়া হোক।

এই কংগ্রেস আরও প্রস্তাব করছে যে প্রত্যেক প্রদেশে একটি ছোট কমিটী গঠন করার জন্য ওয়ার্কিং কমিটীকে উপদেশ দেওয়া হোক, যার কাজ হবে যে-সকল সংবাদ-পত্র বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করতে পারে এমত সংবাদ প্রকাশ করে তাদের সেই কাজ থেকে বিরত হওয়ার জন্য অনুরোধ করা এবং বন্ধুর মত উপদেশ দেওয়া সত্ত্বেও কোন ফল না হলে সেই সংবাদপত্রগুলির নাম ঘোষণা করা।

এই কংগ্রেস আরও প্রস্তাব করছে যে, যদি ঐ সকল সংবাদপত্র তাদের দৃষ্টিভঙ্গী না বদলায় তাহলে শেষ পর্য্যন্ত কংগ্রেস কর্মীরা সেগুলি বয়কট করার জন্য ঘোষণা করবে।

সভাপতি কর্তৃক উত্থাপিত উপরোক্ত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হল।

পরবর্তী প্রস্তাব উত্থাপন করলেন সন্তানম্।

এই প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে এই কংগ্রেস বাবর আকালীদের দমন করার অজুহাতে পাঞ্জাব গভর্ণমেন্ট দোয়াবে যে নির্য্যাতনের অভিযান চালাচ্ছে যার পরিণতি গুরুদ্বার প্রবন্ধক কমিটী কর্তৃক প্রেরিত অনুসন্ধান কমিটীর সভ্যদের গ্রেপ্তার,—সেই নির্য্যাতনের বিরুদ্ধে সাহসিক ভূমিকার জন্য আকালীদের অভিনন্দন জানাচ্ছে এবং তাদের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের প্রতি পূর্ণ সহানুভূতি প্রকাশ করছে।

অধ্যাপক তেজা সিং প্রস্তাব সমর্থন করার পর তা গৃহীত হল।

পরবর্তী প্রস্তাব উপস্থিত করলেন—ডাঃ আনসারী।

এই প্রস্তাবে বলা হয়েছে

(ক) এই কংগ্রেস পুনরায় তার দৃঢ় বিশ্বাস প্রকাশ করছে যে ব্যাপক ভাবে হাতে কাটা সুতো ও হাতে বোনা খদ্দরের উৎপাদন ও ব্যবহার ভারতের অর্থ-নৈতিক উন্নতির জন্য একান্ত আবশ্যক এবং সেই হেতু ভারতের জনগণকে হাতে সুতা কাটা ও খদ্দরের ব্যবহার দেশের মধ্যে সর্বজনীন করতে এবং বিদেশী বস্ত্রের বয়কট সম্পূর্ণ করতে তাদের চেষ্টা দ্বিগুণিত করার আহ্বান করছে।

(খ) এই কংগ্রেস কেবল ভারতে প্রস্তুত দ্রব্য খরিদ করে এবং যেখানে সম্ভব বিদেশী দ্রব্য ক্রয় ও

ব্যবহার বন্ধ করে দেশের শিল্পকে উৎসাহ দিতে জনগণকে পুনরায় আহ্বান করছে।

(গ) যেহেতু বর্তমানে ভারতবর্ষ স্বাধীনতার সংগ্রাম চালাচ্ছে এবং ইংলণ্ড তা ব্যর্থ করার জন্য প্রতিপদে বাধা দিচ্ছে এবং ব্রিটিশ উপনিবেশ ও ডোমিনিয়নে ভারতীয়েরা অপমানিত ও ক্রীতদাসের ন্যায় ব্যবহৃত হচ্ছে অতএব এই কংগ্রেস বিশেষ করে গ্রেট ব্রিটেনে এবং তার উপনিবেশ ও ডোমিনিয়নে প্রস্তুত দ্রব্য ক্রয় পরিহার করে সমুদয় ব্রিটিশ দ্রব্যের পূর্ণ বয়কট সাফল্যমণ্ডিত করতে জনগণকে আহ্বান করছে।

(ঘ) এই প্রস্তাবের (খ) ও (গ) ধারার নির্দেশ কার্য্যকর করার জন্য এবং ভারতে উৎপাদনে উৎসাহ দেওয়ার জন্য এবং বিশেষ করে ব্রিটিশ পণ্য বয়কটের জন্য উপায় উদ্ভাবন করতে নিম্নলিখিত সদস্যদের নিয়ে একটি কমিটী গঠন করছে এবং এ বিষয়ে তাদের উপর আবশ্যকীয় নির্দেশ দেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া হচ্ছে।—

পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু, মৌলানা মহম্মদ-আলী, জে. কে. মেহেতা, সুভাষচন্দ্র বসু, শেঠ ওমর শোভানী, ডঃ সইফুদ্দিন কিচলু, নরসিংহ চিন্তামন কেলকার এবং ডাঃ গোপাল কৃষ্ণায়া।

বিঠলভাই প্যাটেল প্রস্তাব সমর্থন করে একটি সুযুক্তিপূর্ণ ভাষণ দিলেন।

বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদ প্রস্তাবের (গ) ধারা সম্বন্ধে আপত্তি করলেন। তিনি এই প্রস্তাবের মধ্যে হিংসার গন্ধ পেলেন।

পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু প্রস্তাব সমর্থন করতে উঠে অন্যান্য কথার পর বললেন যে, কংগ্রেস অহিংসা সম্বন্ধে কোন প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে নি এবং যদিও মহাত্মা গান্ধীর অহিংসায় ব্যক্তিগত আস্থা আছে কিন্তু মহাত্মা তা কংগ্রেসে নীতিরূপে গ্রহণ করেন নি। এর কারণ কংগ্রেসের বিভিন্ন মতাবলীর লোক আছে। এর মধ্যে যাঁরা হিংসায় বিশ্বাসী তাঁরাও আছেন। ব্যক্তিগত ভাবে তিনি (পণ্ডিতজী) কখনও অহিংসাতে বিশ্বাস করেন নি। অহিংসার পথ গ্রহণ করা হয়েছে কারণ হিংসার পথ গ্রহণ করা সম্ভব নয়। যদি তাঁরা হিংসাত্মক কাজ করতে পারতেন তা হলে তাঁরা তা করতেন। (এই উক্তি শুনে অনেকে "হিয়ার হিয়ার" ধ্বনি দিলেন।) তিনি স্বীকার করছেন যে তিনি ব্রিটিশের প্রতি ঘৃণা পোষণ করেন এবং দিন দিন এই ঘৃণা বেড়েই যাচ্ছে।

পণ্ডিতজীর পর ইণ্ডিয়ান মার্চেন্টস চেম্বারের সভাপতি জে. কে. মেহেতা প্রস্তাব সমর্থন করতে উঠে বললেন, গয়া কংগ্রেসে তিনি ব্রিটিশ পণ্য বয়কটের বিরুদ্ধে বলেছিলেন কিন্তু কেনিয়ার ঘটনায় তাঁর মতের পরিবর্তন হয়েছে।

গৌরীশঙ্কর মিশ্র প্রস্তাবের বিরোধিতা করে বক্তৃতা দিলেন। তাঁর মতে যদি বয়কট করতেই হয় তা হলে সমুদয় বিদেশী দ্রব্য বয়কট করা উচিত। কেবল মাত্র ব্রিটিশ দ্রব্য বয়কটে তাঁর আপত্তি।

প্রসিদ্ধ বাগ্মী অধ্যাপক জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রস্তাব সমর্থন করে জ্বালাময়ী ভাষায় বক্তৃতা দিলেন। তিনি ওজস্বিনী ভাষায় জালিয়ানওয়ালা বাগ ও গুরু-কা-বাগের অত্যাচারের মর্মন্তুদ কাহিনী বিবৃত করলেন। বাংলার অন্তরীন রাজবন্দী সম্বন্ধে এবং নাগপুর পতাকা সত্যাগ্রহ সম্বন্ধে বললেন। তিনি আবেগ ভরে বললেন যে তিনি এই সকল ঘটনা ভুলতে পারেন না এবং সেই জন্যই এই প্রস্তাব সমর্থন করলেন।

প্রিন্সিপাল গিডোয়ানী প্রস্তাবের বিরোধিতা করলেন এবং ইয়াকুব হোসেন প্রস্তাব সমর্থন করলেন।

এমন সময় বোম্বাইয়ের জে. সি. একনজী আলোচনা সমাপ্তির (ক্লোজার) দাবি তুললেন এবং তা গ্রাহ্য হল।

তারপর এই প্রস্তাবের উপর ভোট গ্রহণের জন্য প্যাণ্ডেল থেকে প্রতিনিধি ছাড়া—অন্যান্য সকলকে প্যাণ্ডেল ত্যাগ করতে নির্দেশ দেওয়া হল।

তারপর প্রস্তাবের উপর ভোট নেওয়া হল। সংখ্যাধিক্যের ভোটে প্রস্তাব গৃহীত হল।

এরপর সেদিনের মত অধিবেশন শেষ হ'ল।

কংগ্রেসের পঞ্চম বা শেষ দিনের অধিবেশন পরদিন ১১টার বসবে ঘোষণা করা হল।

১০

কংগ্রেসের শেষ দিনের অধিবেশন আরম্ভ হয় ১৯শে সেপ্টেম্বর বেলা ১১টার সময়।

এ দিনের অধিবেশনে প্রতিনিধিদের সংখ্যা অনেক কম ছিল। দীর্ঘ অধিবেশনের জন্য অনেকেই দিল্লী ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন।

এদিন সভাপতি মশায় যথারীতি শোভাযাত্রাসহ প্যাণ্ডেলে প্রবেশ করে ডায়াসে তাঁর আসন গ্রহণ করলেন।

একটি জাতীয় সঙ্গীতের পর সভার কার্য্য আরম্ভ হল।

প্রথম প্রস্তাব উপস্থিত করলেন পুরুষোত্তম দাস ট্যাণ্ডন।

এই প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে যেহেতু কেনিয়ার প্রশ্নে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের সিদ্ধান্ত সুস্পষ্ট ভাবে জানিয়ে দিচ্ছে যে কোন ভারতীয়ের পক্ষে ব্রিটেন বা তার কোন উপনিবেশের শ্বেতাঙ্গের সঙ্গে স্বার্থের সংঘর্ষে সমান মর্য্যাদা, সুষ্ঠু ব্যবহার এবং ন্যায় বিচার পাওয়া অসম্ভব অতএব কংগ্রেস এই মত প্রকাশ করছে যে ভারতের জনগণ সম্মানের সহিত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সদস্যরূপে থাকতে পারে না, সুতরাং তাদের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বহির্ভূত স্বরাজ প্রতিষ্ঠার যৌক্তিকতা গভীর ভাবে বিবেচনা করা প্রয়োজন।

ট্যাণ্ডন মশায় এই প্রস্তাবের স্বপক্ষে অন্যান্য কথা বলার পর বললেন যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য থেকে বেরিয়ে আসাই ভারতবাসীর একমাত্র পথ এবং জানালেন এর অনুকূলে ঘোষণায় পৃথিবীর নিকট কংগ্রেসের মর্য্যাদা বৃদ্ধি পাবে।

একজন প্রতিনিধি জানতে চাইলেন যে প্রস্তাব কংগ্রেসের মূল নীতির (ক্রীডের) পরিপন্থী কি না। সভাপতি মশায় উত্তর দিলেন যে না, প্রস্তাব মূলনীতির পরিপন্থী নয়।

ঢাকার শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই প্রস্তাব সমর্থন করলেন।

কেনিয়া থেকে আগত এম্ এ দেশাই ও ডি ডি দেশাই তথাকার ভারতীয়দের অবস্থা বর্ণনা করলেন এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্য থেকে ভারতের বেরিয়ে আসার প্রস্তাব খুব জোরের সঙ্গে সমর্থন করলেন।

প্রিন্সিপাল গিডোয়ানী প্রস্তাবের বিরোধিতা করে একটি সংশোধনী প্রস্তাব পেশ করলেন।

এই প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে এই কংগ্রেস কেনিয়ার ভারতীয়দের পদমর্য্যাদা সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট গ্রহণ করেছে তা ভারতকে একটি পরাধীন দেশরূপে শাসন করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞার সঙ্গে সামঞ্জস্য পূর্ণ এবং সেই হেতু এই কংগ্রেস যথাসম্ভব শীঘ্র পরাধীনতার কালিমা মুছে ফেলার চেষ্টা ভারতের জনগণকে দ্বিগুনিত করতে আহ্বান করছে।

এই কংগ্রেস কলোনীগুলিতে ভারতীয়দের অবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞান বিস্তারের জন্য দেশের ভিতর প্রচার কার্য্য চালাতে এবং কেনিয়ার ভারতীয়দের যে কোন কার্য্যকর কর্মসূচী সাফল্যমণ্ডিত করতে ওয়ার্কিং কমিটীকে নির্দেশ দিচ্ছে।

ইয়াকুব খাঁ এই প্রস্তাব সমর্থন করলেন।

ভেঙ্কটরামন আর একটি সংশোধনী প্রস্তাব উপস্থিত করলেন।

এই প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে এই কংগ্রেস প্রস্তাব করছে যে, প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা হিসাবে ডোমিনয়ন ও কলোনীগুলির সঙ্গে অর্থ-নৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিন্ন করা হোক এবং কেনিয়ার ভারতীয়দের প্রতিরোধের কার্য্যে সাহায্য করা হোক।

কৃষ্ণস্বামী আয়ার এই প্রস্তাব সমর্থন করলেন।

মৌলানা মহম্মদ আলী গিডোয়ানীর সংশোধনী প্রস্তাব সমর্থন করতে উঠে বললেন যে বর্তমানে দেশে মতানৈক্য এবং স্বাধীনতা লাভের জন্য প্রস্তুতির অভাবের পরিপ্রেক্ষিতে মূল প্রস্তাবটি বালকোচিত।

আস . আলী মূল প্রস্তাবের বিরোধিতা করতে উঠে বললেন, ট্যাণ্ডন মশায়ের প্রস্তাবের বয়ানে বর্তমান ক্রীড

তার ব্যাপকতা, যাতে বিভিন্ন মতাবলম্বীর স্থান আছে, থেকে বঞ্চিত হবে।

তকির সাহেব মূল প্রস্তাবের বিরোধিতা করতে উঠে বললেন যে দেশকে মতামত প্রকাশের অবসর না দিয়ে পরোক্ষ ভাবে কংগ্রেসের মূলনীতি পরিবর্তনের বৃহৎ প্রশ্ন কংগ্রেসে উপস্থিত করা হয়েছে।

হরি সর্বোত্তম রাও ও বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ মৌলানা মহম্মদ আলীর মত সমর্থন করলেন।

কেনিয়ার সঙ্গে ব্যবসার সূত্রে জড়িত বোম্বাইয়ের হোসেন ভাই বললেন যে কেনিয়াতে ভারতীয়েরাই অগ্রদূত ছিলেন। তাঁদের অত্যন্ত ভুল হয়েছিল শ্বেতাঙ্গদের ঐ দেশে আমন্ত্রণ করে নিয়ে আসা। তিনি জানালেন কেনিয়ার ভারতীয়েরা নিজ শক্তিতেই দাঁড়াতে পারে, কেবল তারা প্রতিশ্রুতি চায় তাদের গুলি করতে ভারতীয় সৈন্য পাঠানো হবে না।

ট্যাণ্ডন মশায় বিতর্কের জবাব দিতে উঠে অন্যান্য কথার মধ্যে বললেন যে মৌলানা মহম্মদ আলী অন্যান্য বিষয়ে মহাত্মার বিরুদ্ধাচারণ করেছেন কিন্তু তাঁর প্রস্তাবের বেলায় তিনি গান্ধীজীর মতের উপর জোর দিলেন। এটা অন্যায়।

মূল প্রস্তাব ভোটে দেওয়া হল। যদিও বিষয় নির্বাচনী সভায় এই প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল কিন্তু প্রকাশ্য ভোটাধিক্যে প্রস্তাব অগ্রাহ্য হল। প্রস্তাবের পক্ষে ২১৭ জন ভোট দিয়েছিলেন আর বিপক্ষে ভোট দিয়েছিলেন ২৮৪ জন।

এরপর গিডোয়ানীর সংশোধনী প্রস্তাব বিপুল ভোটাধিক্যে গৃহীত হল।

তারপর শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু তাঁর অপূর্ব ভাষায় নাগপুর পতাকা সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সংঘটনকর্তা ও স্বেচ্ছা সেবকদের ত্যাগ ও কষ্টস্বীকার দ্বারা সংগ্রাম সাফল্যমণ্ডিত করে দেশের সম্মান রক্ষার জন্য ধন্যবাদের প্রস্তাব উপস্থিত করলেন।

পণ্ডিত নেকিরাম, মজহর আলী অর্জুন শেঠী ও হরি সর্বোত্তম রাও কর্তৃক সমর্থিত হয়ে প্রস্তাব গৃহীত হল।

তারপর সভাপতি স্বয়ং নিম্নলিখিত প্রস্তাব ২টি উপস্থিত করলেন।

এই কংগ্রেস তাঁদের জয়ের জন্য তুর্কীদের অভিনন্দন জানাচ্ছে এবং অভিমত প্রকাশ করছে যে এই জয় জাজিরাত-উল-আরবের উপর বৈদেশিক নিয়ন্ত্রণ অবসানের ও পৃথিবীর যাবতীয় জাতির স্বাধীনতা লাভের পূর্ব সূচনা।

এই কংগ্রেস শুদ্ধি আন্দোলন সম্বন্ধে সীতারাম (মিরাট), পণ্ডিত নেকিরাম (দিল্লী), মহম্মদ শাহ (বিহার), জুলফিকার আলী কাদিয়ান এবং গুরুদ্বারা কমিটী দ্বারা মনোনীত একজন শিখকে নিয়ে একটি কমিটী গঠন করছে এবং; নির্দেশ দিচ্ছে যেন তাঁরা অকুস্থলে গিয়ে যে কোন সম্প্রদায়ের ধর্মান্তরণ আন্দোলনে অন্যায় ও অধর্মোচিত আচরণের তদন্ত করে এবং সেই সকল কাজ বন্ধ করার উপায় সুপারিশ করে একটি পূর্ণাঙ্গ, অন্ততঃ পক্ষে একটি অন্তর্বর্তী রিপোর্ট আগামী ১৫ই ডিসেম্বরের মধ্যে অল-ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটীর নিকট দাখিল করতে এবং যারা এই রকম নীতিবহির্ভূত কাজ করেছে তাদের নিন্দা করতে নির্দেশ দিচ্ছে।

একজন প্রতিনিধি কমিটিতে অকংগ্রেসী সদস্য নিয়োগের বিরুদ্ধে আপত্তি তুললেন।

পণ্ডিত মালবীয় ও মৌলানা মহম্মদ আলী জানালেন ৫জন সদস্যের মধ্যে মাত্র ২ জন অকংগ্রেসী; তাঁরা এই কাজের জন্য বিশেষ উপযুক্ত বিবেচনা করে তাঁদের কমিটীতে নেওয়া হয়েছে।

প্রস্তাব ২টি গৃহীত হল।

পরবর্তী প্রস্তাব উপস্থিত করলেন মৌলানা মহম্মদ আলী।

এই কংগ্রেস আঞ্চলিক কংগ্রেস কমিটীদের তাদের তত্ত্বাবধানে ও কর্তৃত্বাধীনে দেশের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য অসামরিক রক্ষা-বাহিনী গঠন করতে উপদেশ দিচ্ছে। এই রক্ষা বাহিনী সকল ভারতীয়ের জন্যই উন্মুক্ত থাকবে এবং তাদের কাজ হবে নাগরিক কর্তব্য প্রতিপালন করা এবং বাহিনীর

সভ্যদের দৈহিক ব্যায়াম চর্চার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া যাতে তারা শক্তিশালী হয়ে নিজকে ও সমাজকে রক্ষা করতে পারে। এই রক্ষা-বাহিনীর গঠন ও কার্য্য সম্বন্ধে নিয়মাবলী ওয়ার্কিং কমিটী প্রস্তুত করবে। অন্যান্য আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠান যথা খিলাফৎ বাহিনী প্রভৃতিকে এই রক্ষা-বাহিনীর সহিত সহযোগিতা করার জন্য কংগ্রেস অনুরোধ করছে।

প্রস্তাব উপস্থিত করে মৌলানা মহম্মদ আলী আশা প্রকাশ করলেন যে অন্যান্য বাহিনীগুলি কংগ্রেস রক্ষা-বাহিনীর সহিত মিলিত হওয়ার সার্থকতা বুঝতে পারবে।

যথারীতি সমর্থিত হয়ে প্রস্তাব গৃহীত হল।

এই প্রস্তাব গ্রহণের পর মৌলানা মহম্মদ আলী জানালেন যে নেতৃস্থানীয় উলেমা, পণ্ডিত এবং ভারতের সকল সম্প্রদায়ের ধর্মযাজক ও রাজনৈতিক নেতাদের স্বাক্ষরে একটি ঘোষণা পত্র প্রস্তুত করা হয়েছে তাতে তাঁরা বলেছেন যে তাঁদের সম্প্রদায়ের যে কোন সদস্যের পক্ষে কোন সম্পত্তি, ব্যক্তি, মহিলার সম্মান অথবা ধর্মস্থানগুলির উপর আক্রমণ পাপ এবং আক্রান্ত ব্যক্তিকে আততায়ীর(যদি সেই আততায়ী তাঁর নিজ সম্প্রদায়েরও হয়) হাত থেকে রক্ষা করা এবং অন্যের ধর্মের প্রতি সম্মান ও সহনশীলতা প্রদর্শন করা তাঁদের কর্তব্য।

পণ্ডিত মদন মোহন মালবীয় দুটি প্রধান প্রশ্নে কাউনসিল প্রবেশ ও হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্কে যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তজ্জন্য প্রতিনিধিদের পক্ষ থেকে সকলকে ধন্যবাদ দিলেন।

তারপর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ডাঃ আনসারী সভাপতি মৌলানা আজাদের পাণ্ডিত্য ও দেশসেবা ও অন্যান্য গুণাবলীর প্রশংসা করে যথোচিত ভাষায় ধন্যবাদ দিলেন।

তারপর সভাপতি মশায় নাতিদীর্ঘ অভিভাষণ দিলেন। অন্যান্য কথার পর তিনি যার ভূমিতে কংগ্রেসে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত দ্বারা দেশে নবজীবন এসেছে সেই দিল্লীকে তিনি ধন্যবাদ দিলেন। তিনি বললেন দেশে মতানৈক্য প্রবল ছিল এবং সমাধান দুঃসাধ্য বলে মনে হয়েছিল কিন্তু তার সমাধানের ফলে কংগ্রেসে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু তাঁদের কর্তব্য এতেই শেষ হয় নি। তিনি প্রতিনিধিদের নিকট আবেদন জানালেন তাঁরা যেন কংগ্রেসের অধিবেশনের পর জনগণের মধ্যে যাতে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয় তার প্রতি লক্ষ্য রাখেন।

সভাপতি মশায় তারপর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ও সভ্যবৃন্দকে ও স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীকে যথোচিত ভাষায় ধন্যবাদ দিয়ে কংগ্রেস অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করলেন।

বন্দেমাতরম্ ধ্বনির মধ্যে অধিবেশনের সমাপ্তি হল।

১১

কংগ্রেস অধিবেশনের পর আমার মা, বড় ভগ্নীপতি ও মেজ বিধবা দিদি এবং আমাদের দেশের একজন বৈষ্ণবীকে সঙ্গে করে কুরুক্ষেত্র, হরিদ্বার, কনখল, লছমন ঝোলা, হৃষিকেশ, দেখে পুনরায় দিল্লী এলাম। সেখান থেকে মথুরা, বৃন্দাবন ও আগ্রা দেখতে গেলাম। আগ্রাতে মাদের রেখে আমি একাকী গোয়ালিয়রে গিয়ে গোয়ালিয়র পটারির ম্যানেজার পরলোকগত দীনেশ চন্দ্র মজুমদারের গৃহে অতিথি হলাম। সেখানে তখন আমার সৌভাগ্যক্রমে প্রসিদ্ধ মনীষী ও সুগায়ক দিলীপ কুমারও অতিথি হয়েছিলেন। দিলীপবাবুর সঙ্গে আমার পূর্বেই আলাপ ছিল।

আমার তাতখণ্ডের সঙ্গীত মহা বিদ্যালয় পরিদর্শন ও প্রসিদ্ধা গায়িকা মুন্না বাই ও অপর এক বাইজীর অপূর্ব গান শোনার সৌভাগ্য হত না।

যাই হোক, তিনদিন গোয়ালিয়রে অবস্থানের পর আগ্রায় ফিরে মাদের নিয়ে আজমীর, জয়পুর, অম্বর প্রভৃতি দেখে কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করলাম।

ছেলেদের পাততাড়ি

ছয় বন্ধুর কথা

লক্ষ্মী চট্টোপাধ্যায়

বহুদিন আগে এক গরীব বিধবার একমাত্র ছেলে রাজবাড়িতে শিকারীর কাজ করত।—রাজামশাইয়ের জন্য রোজ তাকে জঙ্গলে গিয়ে পশুপক্ষী মেরে নিয়ে আসতে হতো, আর সে এত নিপুণ লক্ষ্যবিদ্ ছিল যে এক গোলায় তার দু'টো পাখী পড়ত।

রাজার মন্ত্রী কিন্তু অতি চতুর, বলতে গেলে সে একটু বেশি চালাক ছিল। একদিন শিকারী জঙ্গল থেকে কতগুলি পাখী মেরে নিয়ে আসছে এমন সময় রাজবাড়ির দরজায় তার মন্ত্রী মশাইয়ের সঙ্গে দেখা হলো। তিনি পাখীগুলি দেখে মনে মনে ভাবলেন, "বাঃ, এগুলো তো বেশ হৃষ্টপুষ্ট দেখছি। ছেলেটাকে কিছু দিয়ে একটা পাওয়া যায় কি না দেখা যাক্।" এগিয়ে গিয়ে শিকারীকে তিনি বল্লেন, "এই পাখীগুলো বেচো তো আমি কিনে নিতে পারি। তোমারও কিছু লাভ হয় আর আমারও কিছু মুখরোচক খাবার জোটে।"

কিন্তু যুবক মাথা নেড়ে বল্লো, "না মন্ত্রী মশাই, আমি যা কিছু শিকারে পাই সবই রাজা মশাইকে দেবার কথা। আপনাকে এগুলি দিলে আমার চাকরি যাবে।"

মন্ত্রীর ভীষণ রাগ হলো। এতবড় কথা ক'টা সামান্ত পাখী নিয়ে। তিনি ঠিক করলেন যেমন করে হোক ছেলেটাকে রাজবাড়ি থেকে তাড়াতে হবে। কিছুদিন পরেই তিনি সে সুযোগ পেলেন। সেদিন শিকারী হরিণ শিকার করেছে। রাজামশাই খুব খুশী হয়ে তার প্রশংসা করছেন এমন সময় মন্ত্রী মশাই বলে উঠলেন, "রাজা মশাই, সত্যিই ছেলেটি বেশ ভাল শিকার করে, কিন্তু অনেকেই তো এরকম পাখী হরিণ ইত্যাদি মারতে পারে। এ আর এমন কি আশ্চর্য্য কথা? তবে যে আপনার বনের ওই বড় হাতির দলটিকে মেরে ফেলতে পারবে তাকে বড় শিকারী বলা হবে। আর ভেবে দেখুন ওই একশটা হাতির দাঁতের একটি প্রাসাদ তৈরী করতে পারলে কি চমৎকার হবে? দেশবিদেশের লোকেরা আসবে আপনার সেই প্রাসাদ দেখতে।"

রাজার মনে লোভ জেগে উঠল। সত্যিই তো এরকম প্রাসাদ তো কারুর নেই। তিনি শিকারীকে ডেকে হুকুম দিলেন, "ওহে, তুমি গিয়ে ওই হাতিগুলি মেরে তাদের দাঁত আমার জন্য সংগ্রহ করো। এতে সফল না হলে তোমার গর্দান যাবে।"

শিকারীর মনে খুব ভয় হলো। সে কেবল পশুপক্ষী

শিকার করেছে কিন্তু কোনদিন হাতি শিকার তো করেনি? মনের দুঃখে সে বাড়ি গিয়ে তার মাকে এই অদ্ভুত হুকুমের কথা বল্লো।

তার মা সব শুনে বল্লেন, "বাছা, এ আর কি শক্ত কাজ?—আমি তোমাকে বলছি কি করতে হবে। কিছু ভয় পেয়ো না। তোমার বাপও শিকারী ছিল—সে বহুবার আমার সঙ্গে হাতি শিকারের কথা বলেছে। আমার কথাগুলি তুমি মন দিয়ে শোনো। ওই জঙ্গলের প্রায় মাঝখানে একটি বড় শুকনো হ্রদ আছে। সেটিকে লাল, মিষ্টি মদে ভরে ফেলো! তারপর হাতিগুলি যখন জল খেতে আসবে তখন এটা খেয়ে তারা বেহুঁস হয়ে পড়লেই তুমি তাদের মেরে ফেলবে।"

শিকারী মনে কিছু আশ্বাস পেলো। সে পরদিন সকালে রাজসভায় ফিরে গিয়ে রাজাকে বল্লো, "রাজা মশাই, আমি কাল হাতিশিকারে বেরব। কিন্তু আমার কিছু জিনিস চাই।"

তিনি বল্লেন, "তোমার যা দরকার তুমি নিয়ে যাও।"

শিকারী বল্লো, "আমার এক-শ পিপে মিষ্টি মদ চাই আর কিছু লোকজন সঙ্গে চাই। হাতিগুলি মারবার পর এরা দাঁত তুলে নিয়ে আসবে।" রাজা তখনি এ সব ব্যবস্থা করতে হুকুম দিলেন।

পরদিন সকালে শিকারী সেই লোকজন ও মদের পিপে নিয়ে জঙ্গলে চলে গেল। কিছুক্ষণ পরেই দেখলো একটি শুকনো হ্রদ। তখন সে সকলকে থামিয়ে তাতে মদের পিপেগুলি খালি করে ঢেলে দিল। তারপর তারা সকলে জঙ্গলের গাছের আড়ালে লুকিয়ে বসে রইল হাতিগুলির অপেক্ষায়। আস্তে আস্তে সূর্য্য ডুবলো, চারিদিক অন্ধকার হতে লাগল। সকলে চুপচাপ বসে আছে হাতির অপেক্ষায়, এমন সময় একটি বিরাট হাতির দল এসে হাজির হলো। হ্রদে জল আছে ভেবে সেগুলি সোজা তাতে নেবে জল খেতে শুরু করল আর কিছুক্ষণ পরে এক-একটি হাতি বেঁহুস হয়ে শুয়ে পড়ল। এবার শিকারী বেরিয়ে এসে তাদের এক-একটি করে মারতে লাগল। সারা রাত ধরে হাতি মারা হলো ও তাদের দাঁত সংগ্রহ করা হলো। পরদিন শিকারী লোকজন নিয়ে রাজবাড়ির পথে রওনা হলো।

যুবক এই শিকারের কথা যখন রাজসভায় বলছে তখন মন্ত্রী হিংসায় জ্বলে উঠলেন। কিছুতেই এই ছেলেটাকে তাড়ান গেল না। রাজা মশাই হাতির দাঁত পেয়ে তক্ষুনি তাঁর প্রাসাদের ব্যবস্থা করতে শুরু করে দিলেন। অল্প দিনেই এটি তৈরী হয়ে গেল আর দেশবিদেশের লোকে এসে দেখতে লাগল। মন্ত্রী মশাইয়ের গাত্রদাহ বেড়েই চল্লো। নানা রকম জল্পনা কল্পনা করে শেষে একদিন সকালে রাজসভায় তিনি বল্লেন, "রাজা, সুন্দর প্রাসাদ হলো আপনার কিন্তু সেখানে থাকবার আসল লোক তো নেই। আপনার রাণী নেই। এক কাজ করুন। ওই পাহাড়ের ওপারের দেশের রাজকন্যার জুড়ি পৃথিবীতে নেই শুনেছি। মনে হচ্ছে তিনি এ দেশের রাণী হলে এই প্রাসাদ আলো করে থাকবেন। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে যে ওই রাজকন্যার সাত ভায়েরা তাকে বন্দী করে রেখেছে। আপনার এই শিকারী হয় তো তাকে সেখান থেকে বার করে আনতে পারবে।"

রাজা বল্লেন, "বটে—পৃথিবীতে এঁর মত আর কেউ নেই? তবে তো আমার রাণী হবার যোগ্য। শিকারী তুমি কালকেই রওনা হও। যেমন করে পারবে রাজকন্যাকে নিয়ে এস নয়ত তোমার গর্দ্দান যাবে।"

বেচারা শিকারী একেবারে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল। হাতি মারা তো তবু কোন প্রকার শিকার করা, কিন্তু সাত রাজপুত্রের কবল থেকে তাদের বোনকে উদ্ধার করা তো একেবারে অন্য ব্যাপার। কি করা যায়? শেষে সে আবার তার মায়ের কাছে দৌড়াল।

ব্যাপার সব শুনে মা তাকে আশ্বাস দিয়ে বল্লেন, "এত ভয় পাচ্ছ কেন? সাবধানে যাও আর পথে বহু সাথী জুটবে—তাদের সকলকে নিয়ে যেও।" শিকারী এতেই খুশি মনে রাজি হ'ল।

পরদিন সকালে কিছু খাবার দাবার নিয়ে সে

পাহাড়ের দিকে রওনা হলো। কিছুদূর গিয়ে সে একটি নদীর ধারে গিয়ে পৌঁছল। সেখানে একটা বুড়ো মাথা নিচু করে এক মনে নদীর জল খেয়ে চলেছে। তাকে এভাবে বেশ কিছুক্ষণ জল খেতে দেখে শিকারী জিজ্ঞেস করল—"কি দাদু, এত জল খাচ্ছ কেন?"

বুড়ো মাথা তুলে বল্লো, "আর কি করব বলো ভায়া—আমার তো তেষ্টাই মেটে না। যত জল খাই তত তেষ্টা বেড়ে চলে। তা তুমি কে, আর কোথায় যাচ্ছ?"

শিকারী বল্লো, "আমি এদেশের রাজার প্রধান শিকারী। রাজার হুকুমে আমি পাহাড় পার হয়ে ওপারে ওই দেশের রাজকন্যাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসব। তাই ওদিকে চলেছি।"

বুড়ো বল্লো, "ওহো, তবে তুমিই সেই বিখ্যাত শিকারী যে এক-শ হাতি মেরেছে। আমার নাম তেষ্টাদাদু, বল ত তোমার সঙ্গে যাই।"

শিকারী সঙ্গী পেয়ে খুব খুশী হলো। এর কিছুক্ষণ পর দু'জনে আবার পাহাড়ের দিকে রওনা হলো। কিছুদূর গিয়ে তারা একটা ছোট কুঁড়ে ঘর সামনে দেখল। তার ভিতরে যেতে দেখল একটা লোক থালার পর থালা, খাবার গিলে চলেছে, কিছুতেই যেন তার পেট ভরে না।

বুড়ো তাকে বল্লো, "আরে ভায়া, তোমার তো দেখছি খুব ক্ষিদে—কি ব্যাপার বল ত।"

লোকটা বল্লো, "আমার কিছুতেই পেট ভরে না তো আমি কি করব? তোমরা কে আর কোথায় যাচ্ছ?"

শিকারী বল্লো, আমরা পাহাড় পারের দেশের রাজকন্যাকে নিয়ে আসতে যাচ্ছি। আমি এ রাজ্যের প্রধান শিকারী আর ইনি হলেন তেষ্টাদাদু।"

লোকটা বল্লো, "তুমিই নিশ্চয় সেই হাতি মেরেছিলে? বেশ, বেশ, আমার নাম ভোজনবিলাসী রাম—বল ত আমিও যাই তোমাদের সঙ্গে।"

অন্য দু'জন খুব সহজেই তাকে নিয়ে যেতে রাজি হলো আর তারা তিনজনেই গল্প করতে করতে পাহাড়ের দিকে এগিয়ে চল্লো।

হঠাৎ পিছন থেকে একটা লোক লাফাতে লাফাতে তাদের সামনে এসে হাজির হলো। তার লাফান দেখে সকলে অবাক্। সে তখন বল্লো, "তোমরা কে? আমি লাফিয়ে চলেছি কেন জান? শুনেছি যে আমার সামনে এক বিখ্যাত শিকারী ওদেশের রাজকন্যাকে উদ্ধার করতে চলেছে। সে ই অল্পদিন হলো এক শ হাতি মেরেছে। আমি তার সঙ্গে যাব বলে তাকে খুঁজছি।"

শিকারী হেসে বল্লো, "আরে আমিই তো সেই শিকারী। তা চলনা আমাদের সঙ্গে। তোমার নাম কি?"

লোকটা বল্লো, "আমার নাম লম্ফঝম্পবান,—আমি লাফানতে সকলের সেরা।"

চারজন এতক্ষণে গভীর বনে প্রবেশ করেছে। চারিদিকে গাছগুলি আরও ঘন হয়ে আসছে। যেতে যেতে তারা দেখল যে একটা লোক উপুড় হয়ে শুয়ে মাটিতে কান পেতে কি যেন শুনছে। শিকারী আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞেস করল, "ওহে বন্ধু, তুমি এত মন দিয়ে কি শুনছ?"

লোকটা বল্লো, "শুনছি এপথ দিয়ে এক বিখ্যাত শিকারী আসছে—তার জন্য আমি এখানে অপেক্ষা করছি। আমার নাম কান-পাতলা বাবাজি—আমি তার দলে যোগ দিতে চাই।"

শিকারী খুশী হয়ে তাকে নিতে রাজি হলো। এরপর তারা পাঁচজন জঙ্গলের ভিতর এগোতে লাগল। ক্রমে সন্ধ্যে হয়ে এলো।—সকলেই ভাবছে কোথায় রাত্তির কাটাবার ব্যবস্থা করা যায় এমন সময় আশে পাশের গাছগুলি কাঁপতে শুরু করল। ঠিক যেন ভূমিকম্প হচ্ছে। চারিদিক কাঁপছে—সকলে ভয় পেয়ে এদিক ওদিক তাকাতে লাগল। তেষ্টাদাদু কান-পাতলা বাবাজিকে জড়িয়ে ধরে ফেল্লো, এমন কি শিকারীও অন্য দু'জনের হাত ধরে দাঁড়াল। এমন সময় একটা বড় গাছের পিছন থেকে একটা বিরাট লোক দাপাদাপি করতে করতে তাদের দিকে এগিয়ে এলো। শরীর

তার প্রকাণ্ড, যেমন লম্বা তেমন চওড়া আর হাত-পা-গুলি এক-একটি গাছের গুঁড়ির মত। তার দাপাদাপিতেই সব কিছু কাঁপছে।

লোকটা বল্লো, "এদিকে কোন বড় শিকারীকে যেতে দেখেছ? এক শ হাতি মেরেছে সে এমন পালোয়ান —আমি তার দলে যোগ দেব বলে তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি।"

সকলেই হো হো করে হেসে উঠল। এই ভাবেই তখন হস্ত পালোয়ান তাদের দলে যোগ দিল। এতক্ষণে তারা পাহাড়ের তলায় এসে পৌছেছে।

কিছুদূর পাহাড় বেয়ে ওঠার পর সাতটি রাজপুত্র তলোয়ার হাতে নিয়ে তাদের পথ আটকে দাঁড়াল।

বড় রাজকুমার বল্লো, "তোমরা কে, আর এখানে কেন এসেছ?"

শিকারী তার উত্তরে বল্লো, "আমরা পাহাড়ের ওপারের দেশ থেকে এসেছি। আমাদের রাজা আপনাদের রাজকন্যাকে বিয়ে করতে চান। সেইজন্য আমাদের এ দেশে পাঠিয়েছেন।—আমরা রাজকন্যাকে নিয়ে যেতে এসেছি।"

এ কথা শুনে রাজপুত্ররা ভীষণ রেগে উঠল। তারা বল্লো, "তোমাদের রাজার তো কম আস্পর্দ্ধা নয়। তোমাদের পাঠিয়েছে রাজকন্যা নিয়ে যেতে। আচ্ছা বেশ, দেখি তোমাদের ক্ষমতা আছে কি না তাকে নেবার।"

শিকারী বল্লো, "আমাদের কি ভাবে এ ক্ষমতার পরিচয় দিতে হবে বলুন?"

তেষ্টাদাদু রেগে বল্লো, "ওহে রাজপুত্র, মুখ সামলে কথা বলো। এ লোকটা একা এক-শটা হাতি মেরেছে— তোমরা তো মাত্র সাতটি প্রাণী।"

রাজপুত্রগুলি কিছুক্ষণ শিকারীকে ভাল করে দেখে বল্লো, "বেশ, আমরা যুদ্ধ করব না তোমাদের সঙ্গে, কিন্তু অন্য ভাবে তোমাদের পরীক্ষা করব। চলো, এবার উপরে রাজপ্রাসাদে চলো, তারপর দেখা যাবে।"

সকলে ঘণ্টা পাঁচেক ধরে পাহাড় বেয়ে উঠে একটা প্রাসাদে পৌছল। রাজপুত্ররা তাদের একটি খুব বড় ঘরে নিয়ে গিয়ে বল্লো, "প্রথমে ওই সাত ঘড়া জল খেতে হবে।"

তেষ্টাদাদু হেসে বল্লো, "আরে এটা আবার কি রকম কথা হলো। ওতে আমার তেষ্টা মিটবে কি না দেখি"। সে এগিয়ে গিয়ে চোঁ চোঁ করে সাত ঘড়া জল আধ ঘণ্টায় খেয়ে ফেলে আরও জল চাইল। সারাদিন রাজপুত্ররা হায়রান হয়ে তাকে ঘড়ার পর ঘড়া জল এনে দিতে লাগল আর সে অল্পক্ষণেই সেগুলিকে শেষ করে ফেলতে লাগল। শেষে রাজপ্রাসাদের সব জল খেয়ে নিয়ে বুড়ো তাদের রেহাই দিল।

পরদিন রাজপুত্ররা তাদের সাত গামলা ভাত দিয়ে বল্লো, "জল তো সব শেষ করলে—এবার ভাতগুলি খাও দেখি কেমন পার।" ভোজনবিলাসী রাম গামলাগুলি টেনে নিয়ে খেতে আরম্ভ করল। দেখতে দেখতে সাত গামলা ভাত কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল, তারপর সারা বাড়ির যত খাবার ছিল সব খেয়ে তবুও তার পেট ভরল না। রাজপুত্ররা হাঁ করে তার খাওয়া দেখতে লাগল। এইভাবে সেদিনও শিকারীর দলের জয় হলো।

তিন দিনের দিন সকালে উঠে রাজপুত্ররা বল্লো, "খাওয়া দাওয়া তো যে কোন লোক করতে পারে। এবার যে কাজ দেওয়া হবে তাতে তোমরা বিফল হতে বাধ্য। ওই রূপোর পাত্রে তোমাদের অমৃত সরোবরের জল ভরে নিয়ে আসতে হবে। সে সরোবর পৃথিবীর ভূমি যেখানে শেষ হয় সেই জায়গায়।—সেইখানে গিয়ে জল এই পাত্রে ভরে নিয়ে এসো আর আমাদের বোনও তোমাদের সঙ্গে যাবে। যদি তোমরা জল নিয়ে আগে ফেরো তবে সে তোমাদের সঙ্গে যাবে, নয়ত তোমাদের সকলের গর্দ্দান যাবে।"

লম্ফঝম্পবান এগিয়ে এসে রূপোর পাত্রটা হাতে নিল। সঙ্গেসঙ্গে রাজকন্যা বাড়ির ভিতর থেকে তার পাশে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর রূপে ঘর আলো হয়ে গেল। শিকারীরা সকলেই হাঁ করে তাঁকে দেখতে লাগল। রাজপুত্ররা তাদের দেরি না করে রওনা হতে

বলার সঙ্গে সঙ্গে লম্ফঝম্পবান এক লাফে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সে এই ভাবে লাফিয়ে লাফিয়ে অমৃত সরোবরের জল পাত্রে ভরে ফিরে আসছে এমন সময় দেখল রাজকন্যা ক্লান্ত হয়ে এক জায়গায় গাছের তলায় বসে বিশ্রাম করছেন। রাজকন্যা তাকে ডেকে বল্লেন, "আরে পালোয়ান, তুমি এত লাফালাফি করছ কেন? এখানে বসে একটু সরবৎ খাও, তারপর আবার এগিয়ে যাও। তোমার তো জিত হবেই।"

লম্ফঝম্পবান ভাবল, "তাই তো, একটু বসেই যাই যখন রাজকন্যা বলছেন।" সে বসে পড়ে আরাম করে সরবৎ খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। রাজকন্যা তাড়াতাড়ি রূপোর পাত্রটা নিয়ে বাড়ির দিকে রওনা হলেন।

এদিকে পাঁচ বন্ধু অন্যজনের অপেক্ষায় পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে আছে। শিকারী বল্লো, "তাই তো, ওর এত দেরি কেন হচ্ছে? কিছু হলো কি না কে জানে।"

কানপাতলা বাবাজি মাটিতে কান রেখে শুয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ পরে সে চেঁচিয়ে বল্লো, "সর্বনাশ—লম্ফঝম্পবান ঘুমিয়ে পড়েছে। তার নাক ডাকার আওয়াজ আমি শুনতে পাচ্ছি। আর রাজকন্যার পায়ের আওয়াজও শোনা যাচ্ছে—সে এখানে ফিরে এলো বলে।"

শিকারী ছক্কু পালোয়ানকে বল্লো, "দেখো বন্ধু, তোমার গায়ে যত জোর আছে তা দিয়ে পৃথিবীকে কাঁপিয়ে দাও, যাতে ওর ঘুম ভাঙে।"

ছক্কু দাপাদাপি করতে শুরু করলেন। গাছপালা পাহাড়, পর্বত কাঁপতে লাগল। যে গাছের নিচে লম্ফঝম্প বান ঘুমচ্ছিল সেটা ভেঙ্গে ওর ঘাড়ে পড়ল আর সে চমকে জেগে উঠল। 'আরে, রাজকন্যা গেল কোথায়? আমার জলটা নিয়ে পালিয়েছে দেখছি।' সে এক লাফে রাজকন্যাকে ধ'রে ফেল্লো ও তার হাতের থেকে রূপোর পাত্রটা কেড়ে নিয়ে আর এক লাফে পাহাড়ের উপর ফিরে গেল।

"এই লও অমৃত সরোবরের জল।"

এবার সাত রাজপুত্র আর কিছু বলতে পারল না। বোনকে অনেক ধন দৌলত দিয়ে শিকারীদের সঙ্গে অন্য দেশে পাঠিয়ে দিল। রাজ্যে ফিরে আসতেই রাজকন্যাকে রাজা বিয়ে করে ফেল্লেন আর শিকারীদের সকলকে অনেক ধন-সম্পত্তি দিলেন। মন্ত্রী মশাই এসব দেখে রেগে কাঁই—শেষে হিংসায় ফেটে মরে গেলেন একদিন। তখন শিকারীকে রাজা মন্ত্রী করে দিলেন আর তারপর সকলের সুখে দিন কাটতে লাগল।

শিব করুণাময়

শ্রীদিলীপকুমার রায়

চরণে তোমার জীবন অর্ঘ দিতে চাই শিব, করুণাময়,
সব বন্ধন কাটে পলে যার প্রসাদে—গাহিয়া তাহার
জয়।
তোমার হাসিতে নন্দন ফুল ফোটে কণ্টকে
চিরবসান,
তোমার কণ্ঠ হ'তে যুগে যুগে ঝরে মুক্তির রাগ মহান্।

আশুতোষ, তুমি দিলে বরাভয় : যে চায় শরণ
তোমার পায়
আঁধারের অধীনতা হ'তে লভে মুক্তি তোমার
চরণছায়।
তোমার উদার শঙ্খ বাজাও প্রেমের মন্ত্রঝঙ্কারে,
চণ্ড অসুর বেতাল বেসুর রূপান্তরিয়া ওঙ্কারে।

নৃত্যে তোমার নির্ঝরে চিরশান্তি—যাহার নাই
বিলয়,
বেদনার বুকে এই আনন্দচেতনা জাগাও হিরণ্ময়।

...টির আশ্বিন

করুণাময় বসু

এ জীবনে ছুটি নেই, আমি যেন মরানদী,
দিনগুলি ভাঙা চোরা সাঁকো :
তুমি যদি কাছে এসে হাতে মোর হাতখানি রাখো,
পার হয়ে চলে যাবো মরা নদী, ঝরা পাতা,
মেঘ মেঘ দিন :
খড়কুটো, লতাপাতা দিয়ে গাঁথা এতটুকু বাসা,
তার মাঝে মুক্তো হবে এক ফোঁটা স্নিগ্ধ
ভালোবাসা ;
হাসি মুখে চেয়ে রবো, কানে কানে বলে যাবো
তুমি তো এনেছ কাছে ছুটির আশ্বিন।

বেদবানী

সুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

প্রিয়তম
(ঋগ্বেদ)

হে সুন্দর! নমি' তোমা নানা স্তুতিগানে
চলেছে মানবযাত্রী সবে তোমা পানে।
কেহ মোক্ষ, কেহ ধনরত্ন অভিলাষী।
প্রেমাতুরা পত্নী যথা যায় ভালবাসি
প্রেমাতুর পতি-পাশে; ওহে শক্তিমান্
চলেছে তোমার পানে সেই স্তুতিগান।
স্পর্শে তাহা প্রীতিভরে তোমারে তেমতি
প্রেমাস্পদ-পতি-অঙ্গ স্পর্শে যথা সতী।

মধুর
(অথর্ববেদ)

মধুময় আমার জীবন। মধুর আমার আচরণ।
অন্তর মাধুর্যরসে ভরা, বাক্যে তাই মধুর ক্ষরণ।
যা দেখি তা সব মধুময়, মধুর কাজল চোখে আঁকা
মধুময় এই বনস্পতি, আমি এর মধুমতী শাখা।
মাধুরী বরষে পদক্ষেপ, সুমধুর সমুখে গমন,
মধুময় মোর নিষ্ক্রমণ, মধুময় পুনরাগমন।

মহাপ্রয়াণ
(ঋগ্বেদ)

যাত্রা করো! যাত্রা করো সনাতন পথে!
যে পথে মোদের পূর্ব পিতামহগণ
গিয়েছেন অনাদি অনন্ত কাল হ'তে।
তাঁহাদের সাথে তব হউক মিলন।

তব ইষ্টাপূর্ত আদি ধর্মকর্ম সহ
মিলন হউক আজি ধর্মরাজ সনে—
সংযত করেন বিশ্ব যিনি অহরহ,
করেন নিয়ন্ত্রণ জীবনে মরণে।

পরম অসীম মাঝে হও নিমজ্জিত।
ধৌত হোক মলিনতা। লভ নব কায়
জ্যোতির্ময় কায়া লভি উল্লসিত চিত্ত
আপনার গৃহে তুমি যাও পুনরায়।

শাপলা

শ্রীসুধীর গুপ্ত

বাংলা দেশের পুষ্প রাণী, শাপলা তোমার শুভ্র রূপে
নয়ন ভরে ; কখন সে রূপ পরাণ হরে চুপে চুপে।
দীঘির জলে রাতের বেলা চন্দ্র-তারার সূক্ষ্ম স্বপন
ঝরে যখন, তোমায় আরও স্বপ্নাবেশে দেখায়
লোভন ;
দেখায় শোভন শুভ্র হাসি ; দেখায় মোহন স্নেহ-
মৃণাল ;
রোমাঞ্চময় সলিল আরও রূপ-ছায়াতে হয় যে রসাল।
সমীরণের তালে তালে সরসী কয় হরষ-ভরে
যতেক কথা, তা'র বারতা তোমায় আরও মধুর করে।
তোমার স্বপ্ন তাই সারা রাত পল্লী দেখে, পল্লীবাসী
ঝিল্লী-রবের মধুরিমায় দেখে তোমার অবাক্ হাসি।

বাংলা দেশে ফুলের মেলা, পুষ্প আছে অযুত রকম।
জল পরী গো, তোমার মত আর কেহ তো নয় অনুপম
সর্ব ভাবে ; লাবণ্যে আর সারল্যে আর বিনম্রতায়,
স্নিগ্ধতাতে—শুভ্রতাতে বাংলা দেশের জলায়—জলায়
দীঘি—পুকুর—বিলে বিলে মনঃ মাতানো মিষ্ট হাসি
নয়ন ভ'রে দেখবে যে জন, বলবে সে-ই—
'ভালোবাসি'।

শ্যামা মায়ের ঋতুর লীলায় বর্ষা-শরৎ চুপে চুপে
ফুলকুমারী, মাতিয়ে রাখো সবায় তোমার অমল
রূপে।
সোনা-গলা সূর্যালোকে, রৌদ্র-মেঘের ছায়ায়—
মায়ায়
শূন্য লোকে অপূর্বতা যাদু মাখায় তোমার কায়ায়।

কুমুদ ব'লে আদর ক'রে যুগে যুগেই কবিরা সব
কাব্যে-গাথায় রূপময়ী, রচে সুখে তোমারই স্তব।
আনন্দ-লোক উজাড় ক'রে জলের স্থলের মিতালিতে
ফুট্‌লে তুমি বাংলা দেশে—বঙ্গবাসীর সরল চিতে।
গরল-ভরা ধরণীতে তোমার তরল রূপের বিভা
মৈত্রী-মধুর সাম্য বিলায়, শান্তি বিলায়, রাত্রি-দিবা।
তাই তোমারে প্রতীক করি' বাংলা দেশের ঘরে ঘরে
ফুল-মিছিলের মৈত্রীময়ী, স্বস্তিবাচন সবাই করে।
মৃত্যুজয়ী নিত্যকালের সভ্যতাতে বঙ্গবাসী
বিলাতে চায় শাপ্‌লা তোমার বক্ষে-ধরা প্রীতির
হাসি।

অ্যারিজোনার ভয়ঙ্কর মরুভূমির মধ্য দিয়ে গ্র্যাণ্ড ক্যানিওন যাত্রা

গৌরমোহন দাস দে

আমাদের Grey Hound বাস্‌টি New Mexicoর আলবুকার্কি শহরটা পার হয়ে ৪০ নং interstateএ (বড় রাস্তা) এসে পড়লো। দুপাশের বাড়ীগুলি ধীরে ধীরে মিলেয়ে যেতে লাগলো। তারপর পড়লো ছোট বড় পাহাড়ের শ্রেণী আর ধূ ধূ করছে শুষ্ক মাঠের পর মাঠ—দূরে আকাশের নীচে গিয়ে মিশে গেছে। এই প্রচণ্ড রৌদ্রের তাপের মধ্যে কোথাও একটা প্রাণীও দেখতে পেলাম না। মাঝে মাঝে কয়েকটা মোটর গাড়ী ও truck আমাদের পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যায় আবার আমরাও কয়েকটা truck ও গাড়ীকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে চলে যাই। আমরা New Mexicoর Grants, Gallup ও অন্যান্য ছোট ছোট শহরগুলি পার হয়ে Arizonaর ভয়ঙ্কর মরুভূমির মধ্যে গিয়ে পড়লাম। ধীরে ধীরে বাড়ী ঘর শহর গাছপালা কোথায় মিলিয়ে গেল। শুধু দেখতে পেলাম কৃষ্ণবর্ণ পাহাড় আর পাহাড় আর ধূ ধূ করছে শুষ্ক মাঠের পর মাঠ। এদিকে কোথাও সবুজের একটু চিহ্নও দেখতে পেলাম না। আমার স্ত্রী জানালেন যে আমরা মরুভূমির মধ্যে দিয়ে চলেছি। আমার ত মোটেই বিশ্বাস হচ্ছিল না কেননা মরুভূমি ত বালুকার সাগরে তৈরী। এদিকে বালির চিহ্নও দেখতে পেলাম না। তিনি ভূগোল পড়াশোনা করেন তাঁর সঙ্গে পারবো কি করে? তিনি বল্লেন যে এ মরুভূমি সাহারার মত নয়—এখানে শুধু শুষ্ক জমি থাকে, সবুজের কোন চিহ্নই থাকে না, তবে মাঝে মাঝে cactus জাতীয় গাছপালা দেখতে পাওয়া যায়। সত্যই ত, মাঝে মাঝে নানা রকমের cactus গাছ দেখলাম। পরে বুঝেছিলাম যে তাদের মধ্যে অনেক প্রকারের cactus গাছ রয়েছে। কোন কোন cactus গাছে ছোট ছোট ফুল রয়েছে। Sagura cactusগুলো লম্বা লম্বা ত্রিশূলের মত দেখতে হয় আর এদের ছাল কাটলে জল বের হয়। তারপর রয়েছে barrel cactus, yucca—বড় বড় ঘাসের ঝোপের মত, মাঝখান থেকে একটা লম্বা ডাঁটা থেকে ফুল বের হয়েছে। এ সব ফুল ফুটতে দশ বছর লাগে আবার কয়েক সপ্তাহের মধ্যেও কোন কোন গাছেও ফুল ফুটে যায়। বেশীর ভাগ এদিকে shrubs গাছ পাওয়া যায়। আমাদের পেছনে একজন আমেরিকান বসেছিলেন। তিনি আমাকে note নিতে দেখে জিজ্ঞাসা করেন যে আমি কি মরুভূমির নোট নিচ্ছি। মাথা নেড়ে উত্তর দিই। তিনি বল্লেন যে এই Arizona stateটা সাত ভাগ জঙ্গলে ভরা, ২৭ ভাগ বড় বড় fir গাছে ভর্ত্তি আর ২১ ভাগ রয়েছে মরুভূমি যা এই shrubs গাছ দিয়ে ভর্ত্তি হয়। তিনিই সব বুঝিয়ে দিলেন। ভদ্রলোক কোন stateএ ভূগোলের একজন অধ্যাপক—stateটার নাম আমার মনে নেই। আমরা প্রকৃতির এই লীলা দেখতে দেখতে Navajo নামক স্থানে এলাম। এইখানে তিনটা

জায়গায় প্রায় ৬০০ একরের মত জমিতে ত্রয়োদশ শতাব্দীর Red Indian Puebloদের গ্রামের ধ্বংসাবশেষ আজও রয়েছে। এদিকে Navajo Indianদের reservation রয়েছে। আশেপাশে তাদের Indian styleএর অনেক বাড়ীঘর দেখতে পেলাম। তারপর আমরা Painted Desertএর মধ্যে দিয়ে চললাম। Arizonaর এই দিকটা উত্তর-পূর্ব্ব দিক। এখান থেকে Colo ado নদীর ধার ধরে Grand Canyonএর উত্তর-পূর্ব্ব দিক পর্য্যন্ত সমস্ত মরুভূমির মধ্যে নানা রঙের sandstone, saales ও clays দেখতে পাওয়া যায়। এখানে জল বা কোন গাছপালা নেই। এই জায়গাগুলো দেখতে নানা রঙের। মরুভূমির এই অঞ্চলটাতে ঈশ্বর তাঁর অদৃশ্য হস্তে নানা রঙের দ্বারা চিত্র বিচিত্র করে রেখেছেন। তাই এই জায়গায়টির নাম হয়েছে Painted Desert। এই জায়গাগুলোর ওদিকে রয়েছে Petrified Forest National Park—এর মধ্যে কতগুলো গাছের ডালপালা ও কয়েকটি গুঁড়ি টুকরো টুকরো ভাবে কাটা দেখতে পেলাম। দেখে মনে হলো কে বা বা কারা যেন কেটে ফেলে রেখেছে। কিন্তু এরকাছে গিয়ে হাত দিতেই এর রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয়ে গেল। এগুলি পাথরে পরিণত হয়েছে। এইগুলি দেখবার জন্যই শত শত লোক এখানে আসে। এদের বলে fossil plants—এখানে নানা রকমের coniferous গাছগুলো যুগ যুগ ধরে petrified অবস্থায় রয়েছে, অনেক হাড়ের fossi এখানে পাওয়া গেছে। এই parkটী ৯০৪১৮৯ একর দিয়ে তৈরী। এখানে touristদের দেখবার জন্যে মোটর বাস ও গাইড পাওয়া যায়। Geologistরা বলেন যে ১১০ মিলিয়ন বছর পূর্ব্বে এইসব জায়গায় volcanic eruptionএর দরুণ এই গাছগুলি এই রকম দশা প্রাপ্ত হয়েছে। আমরা এসব দেখে Grand Canyonএর দিক রওনা হলাম। এই মরুভূমির মধ্যে এক এক জায়গায় ছোট ছোট হ্রদ রয়েছে আর তার পাশে পাশে ছোট ছোট শহর গড়ে উঠেছে, যেমন Hallbrook, Joseph City, Hibbart, আর Winslow। Hallbrook আর Winslow শহর-দুটাই এখানকার মধ্যে সবচেয়ে বড় গ্রামীন শহর। লোকজনের বসতি মন্দ নয়। এর আশে পাশে ছোট ছোট হ্রদ রয়েছে—জলে ভরপুর। বাড়ীর আশে পাশের মাঠগুলো শস্যে ভরা দেখলাম। গরু ভেড়া প্রত্যেকেরই আছে আর motorcar প্রত্যেকেরই বাড়ীতে রয়েছে। দোকান, Petrol station Po ice, থানা, Post Office সবই রয়েছে। তবে বড় বড় বাড়ী এদিকে দেখলাম না। কয়েকটা কারখানাও রয়েছে। এটা একটা গ্রামীন শহর—অর্থাৎ এটা একটা গ্রাম তবে শহরের সুখ সুবিধা সবই রয়েছে। টেলিফোন, electricity সব জায়গাতেই আছে। এই শহরগুলি পার হয়ে আবার আমরা মরুভূমিতে গিয়ে পড়লাম। বাসটি air-conditioned, ভিতরে বসতে বেশ আরাম-প্রদ তবে লোকজন ওঠা নামা করতে গেলেই দরজার মধ্যে দিয়ে গরম হাওয়া বাসের মধ্যে এসে ঢুকলে খুবই কষ্টদায়ক। তাই সব সময় দরজাটা তাড়াতাড়ি খোলা ও বন্ধ করা হয়। Bus driverএর মুখে চোখে প্রচণ্ড সূর্য্যের তাপ এসে লাগছে—তাঁর সামনে একটা ছোট electric fan সব সময় ঘুরছে। তিনি মাঝে মাঝে কপালের ঘাম মুছছেন। ভদ্রলোকের বয়স ৫০ পার হয়ে গেছে, মাথার চুলগুলো সবই সাদা, কপালের রেখা-গুলো সব ফুটে উঠেছে। আমরা Coconino country-তে এসে ঢুকলাম। রাস্তার ওপর বড় সাইনবোর্ডে লেখা রয়েছে—দশ মাইল এগিয়ে বাঁদিকে দেড় মাইল গেলে meteor crater দেখতে পাওয়া যাবে। এই জায়গাটিতে ৪০ হাজার বছর পূর্ব্বে একটা বড় meteor এখানে পড়েছিল ও এই জায়গাটীতে একটা বড় গর্ত্ত তৈরী হয়েছে। গর্ত্তটীর ব্যাস হবে প্রায় এক মাইল। ৬০০ফুট গভীর, আর জমির ওপর থেকে মাটী উঠেছে ১৬০ ফুট উঁচু। Geologistরা এটাকে পরীক্ষা করে বলেছেন যে এই meteorটী পড়ে এখানকার ৬০০ মিলিয়ন টন পাথর ও মাটী এখান থেকে সরিয়ে চতুর্দ্দিকে ছড়িয়ে দিয়েছে। আর যে টুকরোগুলো এদিকে

ওদিকে ছড়ানো আছে তা থেকে লোহা, নিকেল, প্লাটীনাম পাওয়া গেছে। বেশীর ভাগ রয়েছে লোহা। আমাদের বাস্ এবার Flagstaffএর দিকে দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। দুধারে চলেছে cactus ও ছোট ছোট কালো পাহাড়ে ভরা মরুভূমি দূর দুরান্তরে গিয়ে পাহাড়ের কোলে গিয়ে মিশেছে। শুষ্ক মরুভূমির ওপর শুধু cactus আর shrubs দেখা যাচ্ছে। আর তাদের বাহারে ফুলগুলো দেখলে মনে হয় কিছুটা ছিঁড়ে নিয়ে আসি। ঈশ্বরের এই সুন্দর প্রকৃতি দেখে মনে মনে তাঁর পায়ে মাথা ঠেকালাম, এ তাঁর এক অভাবনীয় সৃষ্টি। এদিকে কোথাও এক ফোঁটা জল নেই। যে ছোট নদীটা ধীরে ধীরে পাহাড়ের কোল ঘেঁসে চলেছে তার কাছে মাথা খুঁড়লেও এক ফোটা জল পাওয়া যাবে না। সে শুকিয়ে গিয়ে পাহাড়ের কোলে যেন ঘুমুচ্ছে। হয়ত বর্ষাকালে ঘন বারিবর্ষণে অল্প নদীর জলের প্রবাহ এর মধ্যে দিয়ে কিছুটা যাবে কিন্তু তারপর কয়েক দিনের মধ্যেই বর্ষার শেষে আবার জলশূন্য অবস্থায় সে আবার ঘুমিয়ে পড়বে। এ জায়গাটি এত নির্জ্জন ও কষ্টদায়ক যে মনে হয় এখানে বসে ঈশ্বরকে আরাধনা করলে তাঁকে পাওয়া যাবে। কিন্তু তা তো হবার যো নেই, গাইডের মুখে শুনলাম যে এখানে আছে অজস্র হিংস্র প্রাণী, এ ওকে ধরে খাচ্ছে, ও আবার অন্যকে ধরে খাচ্ছে। বড় খাচ্ছে ছোটকে আবার ছোট খাচ্ছে তার ছোটকে,—পৃথিবীর এই ত নিয়ম। শুনলাম এখানে নানারকমের প্রাণী বাস করে। ৬১০ রকমের বিভিন্ন স্তন্যপায়ী প্রাণী রয়েছে। কৃষ্ণকায় ভল্লুক, পার্ব্বতীয় সিংহ, লম্বা শিংএর ভেড়া, নানারকমের হরিণ এন্টিলোপ, জাগুয়ার, বন্য বিড়াল, জার্ভেলিনা, ইত্যাদি, তারপর রয়েছে মরুভূমির নানা রকমের সাপ, বিছা, আরিজোনার কোরাল সাপ, কৃষ্ণবর্ণের widow spider, গিলা মনস্টার ইত্যাদি বড় বড় গিরগিটি যা খুবই বিষাক্ত। তারপর হরেক রকমের পাখি। বেশ কয়েক ঘন্টা থামবার পর আমরা দুপাশে বড় বড় fir বৃক্ষের সারি দেখতে পেলাম। মাঝে মাঝে petrol station, restaura t, motel দেখতে পেলাম। বুঝতে পারলাম যে আমাদের Flagstaff শহরে পৌঁছতে আর দেরী নেই। এবার ধীরে ধীরে আমরা দু পাশে ঘন জঙ্গল দেখতে পেলাম, তারপর আশে পাশের সবুজ বৃক্ষরাজিদের দেখে মনে হলো, বিরাট শূন্যের পর প্রকৃতির সবুজ ভরা বিরাট বুক। এখানে মনে হলো পৃথিবীর সবুজ ঘাসের ওপর বনবৃক্ষতলে কিছুক্ষণ বসে বুকভরে খানিকটা নিশ্বাস নেই। দুঃখের পর সুখের আগমন' ভয়ঙ্করের পর শুভঙ্করের দর্শন। আমরা কিছুক্ষণ পরেই Flagstaff শহরে এসে পৌঁছলাম। এখানের motelএ এক রাত্রি থেকে আমরা পরদিন ভোরবেলায় অন্য বাসে করে Grand Canyon দেখতে বের হবো। এর ticket পূর্ব্বে থেকেই Wheelingএ কিনেছিলাম। বলতে ভুলে গেছি যে আমরা West Virgintaর Wheeling শহরে থাকতাম ও এখান থেকেই আমরা যাত্রা করি।

Flagstaff শহরের মধ্যে এসে Grey Hound busটী bus station-এ এসে থামলো। কয়েকদিন ধরে বাসে বাসে ঘুরছি। বাসে হেলান দিয়ে ঘুম আমাদের কয়েকদিন হয় নি। এবার motel-এর বিছানার ওপর পড়ে হাত পা লম্বা করে একটা বড় ঘুম দিতে হবে। দুটো হাঁটু আর কোমর পিঠ সব আড়ষ্ট ও ব্যথা হয়ে গেছে। সারা ইউরোপ প্লেনে ঘুরেছি কেবল Budapest ছাড়া। এখানে Vienna থেকে train করে যাতায়াত করেছি। Plane-এ গিয়ে দেখেছি ভালভাবে দেশকে চেনা ও জানা যায় না। বাসে করে গেলে সব কিছু দেখা যায়, বোঝা যায়, দেশকে একটু চেনা যায়। আর তার সঙ্গে দেশের জনসাধারণ মধ্যবিত্তদেরও, কারণ এদের সঙ্গে বাসে কত রকমের সুখদুঃখের গল্প করতে করতে এসেছি। Plane-এ যাতায়াত করতে খুব আরামপ্রদ হয় কিন্তু বাসে করে এলে যে কত কষ্ট হবে একথাও আমাদের প্রথম থেকে জানা ছিল। বাসের কষ্ট, খাবার শোবার কষ্ট, সব কষ্টেরই কথা মনে হয় না যখন আমরা যেতে যেতে ঈশ্বরের অপূর্ব্ব সৃষ্টি চোখ ভরে দেখি।

রাত্রে বাজার থেকে কিছু দুধ, ফল, রুটী মাখন নিয়ে এসে খাবার পর বিছানায় শয়ন। কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম মনে নেই, ভোর ৫টায় আমার বিছানা থেকে ওঠা অভ্যাস তাই ঐ সময়েই ঘুম ভেঙ্গে গেল। মুখ হাত পা ধুয়ে রাত্রের কিছু আহার্য্য সকালের breakfast এর জন্যে রেখেছিলাম সেগুলির সদ্ব্যবহার করে আমরা motel ছেড়ে Bus station-এ এসে উপস্থিত হলাম।

আমাদের বাসে ওঠবার জন্যে লাইন দিতে হল। একে একে আমরা সকলে উঠে পড়তেই বাসটী ভর্ত্তি হয়ে গেল। বাস ভাড়া ছাড়া ৫০ সেন্ট করে প্রত্যেকের কাছ থেকে নেবে। Grand Canyon দেখবার জন্যে ৫০ সেন্ট প্রবেশপত্র লাগে। যারা বিদেশী তাদের passport দেখালেই হবে, তাদের ঐ প্রবেশপত্রের ফি দিতে হয় না। আর ওখানকার লোকের বা যারা passport সঙ্গে আনে নি তাদের দিতে হবে। ভাগ্যক্রমে আমাদের সঙ্গে passport ছিল। Passengerদের মধ্যে একজন বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাকে নিয়ে একটু গোলমাল বাধলো। বৃদ্ধ ভদ্রলোকটী Grey Hound Bus-এর driver ছিলেন। এখন তিনি retired, তাই বছরে স্বামীস্ত্রীর দুবার করে ফ্রি pass পান যেখানে ইচ্ছে Grey Hound Busএ ঘুরতে পারবেন। অন্য যে কোন কোম্পানীর বাসে ঘুরতে পারবেন যদি আসন খালি থাকে। এখানে আসন খালি পেলেন না তাই তাঁকে বাসের ভাড়া দিতে হলো। প্রায় ৪৫ বছর চাকরী করে এখন তিনি pension ভোগ করছেন। ছেলেরা মানুষ হয়ে যে যার সংসার দেখে। Florida শহরে সমুদ্রের ধারে এঁরা বাড়ী কিনে রয়েছেন। খুব শীত নয়, সবসময়ই বসন্তকালের মত হাওয়া বয় আর snow ও পড়ে না। ছেলেরা বাবা ও মাকে নিয়ে রাখতে চায়, কিন্তু তাঁরা স্বাধীন ভাবেই বাস করতে চান। ভদ্রমহিলা ঠিক বৃদ্ধা নন, প্রৌঢ়া বলা যেতে পারে। এখন এঁরা দুজনে যেখানে ইচ্ছা যান, দুজনে এক সঙ্গে থাকেন। ছেলে-মেয়েরা কোন কোন পালাপার্ব্বণে আসে আর তাঁরাও ছেলেমেয়েদের বাড়ী যাতায়াত করেন। এই ৪৫ বছর busএর driverই করতে ভাল লাগে? জিজ্ঞাসা করি। ভদ্রমহিলা উত্তর দেন যে চিরকালের তাঁর গাড়ী চালাবার সখ, এখনও চালাতে পারলে চালান। কিন্তু স্ত্রী বাধা দেওয়াতে তিনি আর চালাতে সাহসী হন নি। ভদ্রলোক লেখাপড়া বেশী জানেন না, বেশ ভদ্র, অমায়িক আর হাসিখুশী। নিজেকে driver বলে জাহির করতে খুব গর্ব্ব অনুভব করলেন।

আমরা Los Angelesএর highway দিয়ে ছুটেছি। ভোর বেলার ঠাণ্ডার মধ্যে সূর্য্যের কিরণটা বেশ ভাল লাগছে। বাসের জানালাগুলো এ বাসে ইচ্ছা করলে খোলা যায়, Grey Hound busএ খোলা যেতো না। তাই খোলা জানালা দিয়ে ঠাণ্ডা বাতাসে মেশা সূর্য্যের কিরণটা বেশ অনুভব করতে করতে যাচ্ছি। এদিকটার দু পাশগুলো পাইন বৃক্ষের জঙ্গল ও বন্য পুষ্পে ভরা। মনে হয় যেন এরা আমাদের অভ্যর্থনা করবার জন্যে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

গত রাত্রে এখানে বৃষ্টি হয়ে গেছে। রাস্তা সব জলে ভেজা আর জমিগুলোতে বেশ জল জমেছে। আর সেই জমিতে মাথা উঁচু করে রয়েছে গমের ছোট ছোট চারাগুলো। আমরা বেশ কয়েক মাইল আসবার পর একটী মোড়ের মাথায় এলাম। ৪০নং সোজা রাস্তাটী চলে গেছে Los Angelesএর দিকে আর ডান দিকের ৬৪নং রাস্তাটী Grand Canyonএর দিকে চলে গেছে। আমরা শেষের পথটী ধরে এগিয়ে চল্লাম। Flagstaff থেকে Grand Canyon প্রায় ৮৬ মাইল। প্রায় কুড়ি মাইল যাবার পর আমরা দূরে ঘন বনরাজী দেখতে পেলাম। আর ঐ বনরাজীর মধ্যে দেখলাম এক রাশ মেঘ তার মধ্যে ঢুকে বসে আছে। গাড়ীর driver জানিয়ে দিলেন, যে-জায়গাটী সাদা মেঘে ঢাকা বা তুষারের মত সাদা দেখাচ্ছে ঐটাই হচ্ছে Grand Canyon। দূর থেকে এমনি ভাবেই ওকে দেখা যায়। এদিকটাও মরুভূমির একটী অংশ, cactus ও shrubs গাছে জায়গায় জায়গায় ভর্ত্তি রয়েছে। পাহাড় এদিকে

রয়েছে বেশ একটু দূরে দূরে। রাস্তাটা খুব নীচু ও উঁচু রয়েছে।

বেশ কয়েক মাইল আসবার পর আমরা Grand Canyon National Parkএর প্রবেশপথে এসে পৌঁছালাম। এখানে driverটা প্রবেশপত্রের অর্থ দিয়ে আবার আমাদের নিয়ে বনের মধ্যে আঁকা বাঁকা পথ দিয়ে Bus stationএ এসে নিয়ে ফেললো। এখানে ভিড়ে ভিড়ে অনেক tourist এই Grand Canyon দেখতে দেশ বিদেশ থেকে এসেছেন। আমরা বাস থেকে নেমে পড়লাম। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর guide আমাদের ডেকে নিয়ে গেলেন। দুটো বাস্ দাঁড়িয়ে রয়েছে, একটা যাবে desert tourএ আর একটা যাবে Hermit tourএ। আমাদের দুটা ticketই কেনা আছে—সকালে Hermit tourএ আর বৈকালে desert tourএ যাবো। আমাদের দুজনের tourএর ticket কিনতে ২০ ডলার আর তারপরে বাসের যাতায়াতের জন্তে ১৬ ডলার ৫০ সেণ্ট নিয়েছে। আমরা Hemit tourএর বাসে গিয়ে উঠলাম। যদি আলাদা করে টিকিট কিনতাম তাহলে Hermit tourএ পড়তো ৩ ডলার ৭৫ সেণ্ট ও Desert tourএ ৮ ডলার।

আমাদের বাসটি শীঘ্রই ভর্তি হয়ে গেল। আর যাঁরা আসন পেলেন না তাঁরা বৈকালের tourএর জন্তে বসে রইলেন। এদিকে একটা রেলওয়ে ষ্টেশন দেখলাম। অনেক বাড়ীঘর ও hotel motel অনেক দেখলমে। এই hotel থেকেও Grand Canyon দেখতে পাওয়া যায়।

আমাদের বাসটা ছাড়লো। driverটা বেশ আমুদে। আগেভাগেই ভয় দেখিয়ে দেন যে যেন আমরা একেবারে উপুড় হয়ে canyon না দেখি, পড়ে যাবার ভয় আছে। যেদিকে দেখবার জন্তে রেলিং দেওয়া আছে আমরা যেন সেদিক থেকে দেখি। আর তাঁর পেছু পেছু যেন যাই। বাস খুব ধার দিয়ে যাবে, পড়ে যাবার ভয় নেই কারণ অনেক বছর ধরে তিনি চালিয়ে আসছেন। তবে একেবারে ভরসাও নেই কারণ accident কখন হয় কেউ জানে না। একবার Passenger-ভর্তি নিয়ে একটা বাস একেবারে নীচে পড়ে যায়—সেই শুধু একবার। কবে কোথায় পড়েছে—উত্তর নাই। মনে হয় তাঁর ভয় দেখাবার জন্তে একটা অছিলা। যাবার সময় আমরা দক্ষিণ দিকে বসে আছি আর Grand Canyon দেখতে দেখতে যাচ্ছি। এটা একটা মস্তবড় জলশূন্য মরুভূমির খাদ। খুব ধার ঘেঁসে বাসটা চলেছে, ভয় বেশ পাচ্ছে। আমরা Crand Canyon দেখতে দেখতে চলেছি। বিরাট বিরাট তাঁর সৃষ্টি, তার কাছে মানুষের সৃষ্টি কত যে নগণ্য তাই ভাবছি। আমাদের বাসটা এক জায়গায় এসে থেমে গেল। সে-খানটা লোহার রেলিং দিয়ে ঘেরা। ঐ রেলিংএর পাশ থেকে canyonটাকে দেখতে হয়। এইরকম অনেকগুলি রেলিং ঘেরা দেখবার স্থান রয়েছে। এগুলিকে এরা Point (পয়েণ্ট) বলে। গাইড লেকচার দিতে শুরু করলেন। Canyonএর বিবরণ দিলেন। এর জন্ম কি ভাবে হয়েছে, আবিষ্কারক কে, আর এর মধ্যে দিয়ে যে সরু সুতার মত সরু নদীটা বয়ে যাচ্ছে তারও বিবরণ দিলেন। আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছি আর তাঁর কথা শুনছি।

১৫৩৯ সালে প্রথমে ককেশিয়ান explorerরা এই canyonএ প্রথম পদার্পণ করেন। আর এর প্রথম ভৌগোলিক ও geological বর্ণনা করে গেছেন Prof. John Newberry। Mexico থেকে ১৫৩৯ সালে একদল ককেশিয়ান তাদের দলপতি Fray Marcos de Niza সমভিব্যাহারে এখানে আসে। এরা Seven Golden Cities of ibolaর ধনরত্ন লুঠতে এসেছিল। পৌরাণিক গল্পে লিখিত আছে যে Seven Golden Cities of Cibola আমেরিকার মধ্যে অবস্থিত ও এই কল্পিত নগরীর মধ্যে বহু সোনার তাল ও মণি মুক্তা হীরা পাওয়া যায়। তারা Indianদের গ্রামগুলি দেখে যথার্থ Cibola নগরী বলে মনে করে। নগরীর মধ্যে প্রবেশ না করেই তারা Mexicoতে ফিরে যায় ও তাদের রাজাকে সমস্ত বর্ণনা দেয়।

এর পরের বছর অর্থাৎ ১৫৪০ সালে এই বর্ণনার ওপর নির্ভর করে Francis Vasquez de Coronado সৈন্য সামন্ত নিয়ে Red Indianদের গ্রামে এসে আক্রমণ চালায় ও তাদের মারধোর ও হত্যা পর্য্যন্ত করে। যখন তারা জানতে পারলো যে এখানে কোন সোনার তাল বা মণি মুক্তা হীরা জহরৎ নেই তখন তারা শান্ত হয় ও ঐখানেই তারা দু বছর থেকে যায়। তারা কৃষিকাজ ভাল ভাবেই জানতো। এই সব Red Indianদের তারা কৃষির কাজ শেখাতে আরম্ভ করে। দু বছর থাকবার পর তারা দেশে ফিরে যায়।

১৮৫৭ সালে লেফটেনান্ট Ives এই canyon দেখে চলে যান ও গিয়ে United States Govt.কে জানান যে এখানে কিছু পাওয়া যাবে না।

১৮৬৯ সালের মে মাসে দশজন লোক ও কয়েক মাসের খাদ্যদ্রব্য নিয়ে মেজর John Wesley Powell চারটী ছোট ছোট নৌকার ওপর চড়ে Wyoming State-এর Green River শহর থেকে Colorado নদীতে চড়ে বসেন। নদীর ওপর ভাসতে ভাসতে অনেক বিপদ্-সঙ্কুল পথ ও অনেক rapid অতিক্রম করে তিন মাসের পর আগষ্ট মাসের ৩০ তারিখে এই বিরাট canyonটী পার হয়ে খোলা মাঠের মধ্যে এসে পড়েন।

১৮৭০ সালে তিনি canyonএর মধ্যে কয়েক বছর থেকে সেখানকার geographical, geologic ও ethnologic study করেন। অবশ্য এর খরচ সবটাই তিনি Smithsonoin Institution থেকে পেয়েছিলেন। এর পর canyonটী সাধারণের নিকট খুব নাম করলো। তবে এখানে এসে ঘোরা বা ভেতরে নামাটা তখন খুব বিপদ্জনক ছিল। Touristরা দল বেঁধে এত আসতে লাগলো যার জন্যে ১৯০৮সালে Theodore Roosevelt এই জায়গাটীকে National Monument বলে অভিহিত করেন। Congress এটাকে ১৯১৯ সালে National Park বলে আইনে বিধিবদ্ধ করলেন। এই canyonটী ২১৭ মাইল লম্বায় ও একধার থেকে অন্য ধারে ৪ থেকে ১৮ মাইল প্রশস্ত হবে। এর গভীরতা উত্তর-ধার থেকে ৫৭০০ ফুট, দক্ষিণের ধার থেকে এর গভীরতা হবে ৪৫০০ ফুট। উত্তর দিকের altitude হবে ৭০০০ থেকে ৯০০ ফুট আর দক্ষিণ দিকের altitude হবে৫৭৫০ থেকে ৭৪০০ ফুট। National Parkটীর মধ্যে ১০৫ মাইল লম্বা canyon আছে আর বাকীটা Parkএর বাইরে পড়েছে। Canyonএর পূর্ব্বদিকের পাথরগুলো নানা রকমের আর canyonএ পাশেই Painted Desert দেখতে পাওয়া যায় যা আমরা আসবার সময় দেখে এসেছি। পশ্চিমদিকের canyonএর দেওয়ালের দিককে বলে Havasu Canyon। এখানকার gorgeএর মধ্যে Havasupai Indianদের পূর্ব্বপুরুষরা ১৫৪০ সালের পূর্ব্ব থেকে বসবাস করে আসছে। Spanish explorer-রা তাদের ডায়েরীতে এদের সম্বন্ধে অনেক কথা লিখে গেছেন। এরা সকলেই চাষবাস করে থাকে। Grand Canyonএর মধ্যে পাঁচ রকম আবহাওয়া রয়েছে। নদীর ধারে second বা lower Sonovan zoneএর আবহাওয়া বেশ গরম আর জমিগুলি মরুভূমির মত। ধীরে ধীরে ওদিক থেকে ওপর দিকে এলে ঠাণ্ডা আব-হাওয়া আর গাছের সমাবেশ দেখতে পাওয়া যায়। উত্তর ধারটী জঙ্গলে পরিপূর্ণ, এখানে প্রচুর spruce ও পাইন গাছ পাওয়া যায়। উত্তর ও দক্ষিণ rimsএর মধ্যে আবহাওয়া উত্তর মেক্সিকো ও দক্ষিণ কানাডার মত। এই পাহাড়ের স্তরগুলি নানা রঙের জালে জড়ানো। কোথায় চুনা পাথরগুলি সবুজ, কোথায় নীল সাদার মধ্যে লালের বাহার আবার sandstoneগুলি সাদা ও buff রংএর মিশ্রণে তৈরী হয়েছে। আর পাহাড়গুলি নানা প্রকারের আকৃতি নিয়েছে। কোথায় দুর্গের মত, পিরামিডের মত, বড় বড় মিনারের মত সব দাঁড়িয়ে রয়েছে। আবার আমার চোখে পড়লো কয়েকটী মন্দিরের মত আকৃতি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দিনের প্রত্যেক সময়ে সূর্য্যের আলোর প্রতিভাতে এই রঙগুলি নানা দৃশ্যে পরিবর্ত্তিত হয়ে থাকে। এরা এর নামকরণ করেছে endless pageants। এমন কি প্রত্যেক ঋতুতে এর দৃশ্য বদলায়। ওপর থেকে Colorado নদীটি দেখলে

মনে হয় যেন একটী সরু সুতা এর মধ্যে দিয়ে চলে গেছে। আর ঐ নদীর পাশের ৯০ ফুট উঁচু পাইন গাছ-গুলি দেখলে মনে হয় যেন এক মুঠো ঘাস ওখানে পড়ে আছে।

ওর মধ্যের প্রাণীরা এরা একদিক থেকে অন্য দিকে যাতায়াত করে না কারণ আবহাওয়া সবজায়গায় সমান নয়। এর মধ্যে যে বড় পাহাড়ের অংশটী মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে সেটীর নাম Kaibab পাহাড়। এর সবটাই চুনাপাথরে তৈরী। ২৩০ মিলিয়ন বছর পূর্বে canyon তৈরীর সময় থেকে এই Kaibab পাহাড়টী দাঁড়িয়ে আছে। Kaibabএর নীচে যে Toroweap formation ও Coconino sandstone পাহাড় রয়েছে সেগুলি তখন বালির পাহাড় ছিল পরে পাথরে পরিণত হয়েছে। এর মধ্যে fossilized পদচিহ্নগুলি বড় বড় lizardএর মত প্রাণীর। তারপর Hermit ও Supai আকৃতির পাহাড়গুলি পূর্বের Permian ও Pennsylv nian যুগের কাদার পাহাড় থেকে পাথরের পাহাড়ে পরিণত হয়েছে। এই পাহাড়ের থাকে থাকে (layer) উভচর ও fern গছের বহু পুরাতন চিহ্ন পাওয়া গেছে। Tonto Plateauর ওপরেই লাল দেওয়ালের পাহাড়টী চুনা পাথরের তৈরী (limestone)। এটী মহাসাগর থেকে মিসিসিপি যুগে তৈরী হয়েছে, তখন Gulf of Mexico থেকে Canada পর্য্যন্ত এই প্রকাণ্ড ভূমিটী মহাসাগরে নিমজ্জিত ছিল। লাল দেওয়ালের পাহাড় (Red wall rock) আর Tonto Plateauর মধ্যে যে ফাঁকটী (fissure) আছে সেটী ২০০ মিলিয়ন বছর ধরে রয়েছে। Red wall rockটী তৈরী হবার পূর্বে কয়েকটী মিলিয়ন বছর চলে গেছে। এখানে আরও অনেক layer রয়েছে যেখানে trilobites প্রাণীর fossil পাওয়া গেছে। এরাই প্রথম জীবন্ত প্রাণী বলে গণ্য হয়েছে। এখানে জীবন্ত primitive plant algae পাওয়া গেছে।

কেউ কেউ বলেন যে ১০ মিলিয়ন বছর পূর্বে ঐ Kaibab উপত্যকাটী দুটী নদীর স্রোতকে ভাগ করে দেয়। একটী স্রোত পশ্চিম দিকে চলে যায় আর অপরটী Utah State থেকে প্রবাহিত হয়ে Arizona Stateএর মধ্যে দিয়ে এখানে এসে একটী মস্ত বড় হ্রদ তৈরী করে। এই হ্রদটী sealevel থেকে অনেক উঁচুতে অবস্থিত ছিল। কত যুগ যুগ ধরে পশ্চিমের স্রোতটী Kaibab পাহাড়টীকে ক্ষইয়ে (erode) অন্য নদীটীর সঙ্গে মিলিত হয়। এর ফলে নদীটি বিশাল হয়ে পাহাড়টীর মধ্যদেশ গর্ত্ত করতে করতে সমুদ্রে গিয়ে মিশে যায়। তখন হ্রদটীর জল সেই নদীর সঙ্গে মিশে সাগরে গিয়ে পড়ে ও Grand Canyonকে এমনি ভাবে রেখে চলে যায়। আজও এই Colorado নদীটি canyon পাহাড়কে এখনও ক্ষয় করে চলেছে তার জন্যে canyonএর গভীরতা ও বিশালতা (প্রশস্ততা) রোজ রোজ বেড়েই যাচ্ছে। এই canyonএর মধ্যে নামবার জন্যে অনেক সরু রাস্তা নীচের দিকে নেমে গেছে দেখতে পেলাম। এর জন্যে tourএর বন্দোবস্ত আছে। ওখানে প্রতিদিন থাকবার জন্যে প্রত্যেক touristএর $17-50 cts দিতে হয় ও দুই ঘণ্টার জন্যে $7 50 cts। সঙ্গে থাকবে guide, খচ্চর ও lunchএর জন্যে এক বাক্স খাবার। নীচে নামতে হলে খচ্চরের পিঠে চড়ে যেতে হয়। আর এই নীচে যাবার রাস্তাটী Grand Canyon Trailer গ্রামে অবস্থিত। যদি সেখানে রাত্রে কেউ থাকতে চায় তাদের জন্যেও tour রয়েছে। নীচে Phantom ranch আছে, সেখানে শোবার ও খাবার জায়গা সবই রয়েছে। প্রত্যেক touristএর খাওয়া থাকা ও গাইড সমেত প্রত্যেক দিনের খরচ পড়ে ৬৪ ডলার ৫০ সেন্ট। নীচে নামবার tour নিতে হলে সুস্থ ও সবল ব্যক্তি হতে হবে। বৃদ্ধ অসুস্থ ২০০ পাউণ্ডের ওজনের বেশী বা ১২ বছর বয়সের ছেলেদের এই tour দেবার নিয়ম নেই। আর হেলিকপ্টারে করে সবটা ঘুরিয়ে দেখিয়ে দেয়, তার জন্যে প্রত্যেকের খরচ পড়ে ১১ থেকে কুড়ি ডলার।

আমরা পশ্চিম দিকের Hermit Rest পর্য্যন্ত ঘুরে ঘুরে canyonটী দেখলাম। এই Hermit Restএর নিকটেই ছুটো কাঠের গুঁড়ির নীচে একটী ঘণ্টা ঝোলানো রয়েছে। কয়েকটি আমেরিকান টুরিষ্ট

বলেন যে স্বামী স্ত্রী এর নীচে দাঁড়িয়ে যদি ঘণ্টাটা ছোঁয় তাহলে তাদের শুভ হয়। এই কথাগুলি শোনার পর সমস্ত টুরিষ্টরা সস্ত্রীক সেই ঘণ্টাটা ছুঁয়ে নীচে দাঁড়ালেন ও অন্যদের photo নিতে অনুরোধ করলেন। আমি কয়েকজনের photo নিয়ে সাহায্য করেছি ও আমরাও ঘণ্টার নীচে গিয়ে photo নিয়েছি। কিযে শুভ হয়েছে তা আজ পর্য্যন্ত বুঝতে পারলাম না। এখানে একটি রেস্তরাঁতে টুর কোম্পানী আমাদের সকলকে একটি বিস্কুট ও এক গেলাস পানীয় বিনামূল্যে দিলেন। কিছুক্ষণ এখানে অপেক্ষা করে আমরা পূর্ব্ব দিকে desert tour নিলাম। এই tourটীতে Grand Canyon-এর পূর্ব্বের শেষ প্রান্তের দেওয়ালটি দেখা যায়। পশ্চিম দিকের শেষ প্রান্তের দেওয়ালটি দেখা যায় না কারণ সমস্ত Grand Canyonটাকে এক National Parkএর মধ্যে ঢুকিয়ে নেওয়া হয়নি। এখান থেকে Colorado নদীটাকে ভালভাবে দেখা গেল। এই জায়গা থেকে নদীটা উত্তর দিকের কোণ থেকে বেয়ে নীচের দিকে নেমে দক্ষিণের কোল ঘেঁসে পশ্চিমে চলে যাচ্ছে।

Colorado নদীটা উত্তর Colorado Countyর মধ্যে Rocky পর্ব্বত থেকে বের হয়েছে। Colorado State-এর পশ্চিম দিক দিয়ে প্রবাহিত হয়ে Utah Stateএ পড়েছে। আবার Utah Stateএর দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিক দিয়ে বেয়ে দক্ষিণ-পশ্চিমের রাস্তা দিয়ে Arizona Stateএ গিয়ে পড়েছে। এই Stateএর উত্তর-পশ্চিম দিকের রাস্তা দিয়ে Grand Canyonএর মধ্যে প্রবেশ করেছে। তারপর এটা Arizona, Nevada, California, Baja Californiaর Norte ও Sonoraর দক্ষিণ দিক দিয়ে প্রবাহিত হয়ে Guif of California-তে গিয়ে মিশেছে। এখানে আসবার পথে প্রায় ৬০০ শত মাইল পাহাড় কেটে কেটে আসতে হয়েছে। এই নদীটা ১৪০০ মাইল লম্বা ও দুই লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার বর্গ মাইল জমিকে জল সরবরাহ করে চলেছে। এর দুটা শাখা আছে। এই নদীতে প্রতি বছর বন্যা লেগেই থাকতো, এখন মানুষের শাসনের ফলে বন্যা আর হয় না। এর ওপর অনেকগুলি dam তৈরী হয়েছে—Hoover Dam, Davis Dam, Parker Dam ও Imperial Dam। এদের জল দিয়ে ফসলের জন্যে নানা জায়গায় irrigation system তৈরী হয়েছে। Glen Canyon Dam তৈরী হবার পূর্ব্বে চব্বিশ ঘণ্টায় half million ton বালি কাদা ভর্ত্তি জল নিয়ে—Colorado নদীটা এই Gran Canyonএর মধ্যে দিয়ে Gulf of California তে গিয়ে পড়তো। এখন খুব কম কাদা বালি নিয়ে যায়।

আমরা দক্ষিণের ধার দিয়ে Grand Canyonএর পাশ দিয়ে পূর্ব্ব দিকে এগিয়ে চল্লাম। কখনও জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে আবার কখনও একেবারে canyonএর ধার দিয়ে আমাদের বাসটি চলেছে। একটু এদিক ওদিক চালালেই বাসটা হড়্‌কে ওলটপালট খেতে খেতে

কুষ্ঠ ও ধবল

১০ বৎসরের চিকিৎসাকেন্দ্রে হাওড়া কুষ্ঠ-কুটীর হইতে নব আবিষ্কৃত ঔষধ দ্বারা দুঃসাধ্য কুষ্ঠ ও ধবল রোগীও অল্প দিনে সম্পূর্ণ রোগমুক্ত হইতেছেন। উহা ছাড়া একজিমা, সোরাইসিস, দুষ্টক্ষতাদিসহ কঠিন কঠিন চর্ম্ম-রোগও এখানকার সুনিপুণ চিকিৎসায় আরোগ্য হয়। বিনামূল্যে ব্যবস্থা ও চিকিৎসা-পুস্তকের জন্য লিখুন।

পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্ম্মা কবিরাজ, পি, বি, নং ৭, হাওড়া

শাখা :—৩৬নং হারিসন রোড, কলিকাতা-৯

দি বেঙ্গল আর্ট প্রিণ্টার

৭, ইণ্ডিয়ান মিরার ষ্ট্রীট,

কলিকাতা-১৩

একেবারে ৪ হাজার পাঁচশত ফুট নীচে গিয়ে পড়বে। কয়েকটা জায়গায় বাসটি থামিয়ে আমাদের canyon দেখতে অনুরোধ করতে থাকে। আমরাও যে যার camera ও binoc lar নিয়ে নেমে পড়ি আবার দেখে দেখে বাসে ফিরে আসি। এসব জায়গাগুলিকে এরা point বলে থাকে। এ রকম point এদিকে ও পশ্চিম দিকে অনেক রয়েছে। এরকম করে আমাদের কতগুলি point থেকে Grand Canyon দেখিয়ে একটা বড় পাহাড়ের মাথায় ঘুরতে ঘুরতে বাসটাকে নিয়ে গেল। পাহাড়ের উপর উঠেই দেখতে পেলাম বিরাট একটি tower ও এদিক ওদিক কয়েকটা restaurant ও hotel রয়েছে। এই দিকটার জঙ্গলকে বলা হয় Kaibab National Forest। এই towerটার নাম Watch Tower, এটা Grand Canyon গ্রামে অবস্থিত। Canyonএর দেওয়ালের গা থেকে এই Watch Towerটা ঐখানকার পাথর দিয়ে তৈরী হয়েছে। এটা অনেক উঁচু। এর নীচে restaurant ও ভেতরে Indianদের একটা যাদুঘর রয়েছে। এই যাদুঘরে অনেক Indianদের ঘরের model ও প্রাগৈতিহাসিক Indianদের উৎসবের জন্য একটা জায়গা তৈরী করা আছে, এটাকে বলা হয় Kiva। আর অনেক pictograph ও বহু চিত্র ঝোলানো আছে। Indianদের মধ্যে একটি জাত আছে Hopi। এইগুলি Hopi artist Katotieএর তৈরী। যে জায়গাটাতে এই towerটা তৈরী হয়েছে সেই জায়গার উচ্চতা ৭৪৫০ ফুট। এখান থেকে ।us stationএর দূরত্ব ২৫ মাইল। এর মধ্যে দুটা বড় বড় telescope আছে তা দিয়ে দূরের Indian বস্তিগুলি দেখা যায়। এই watch tower থেকে Colorado নদীটি ও Arizona desertএর মধ্যে Painted desert খুব ভালভাবে দেখা যায়। আমরা ত desertএর মধ্যে দিয়েই এসেছি তাই যা তখন দেখেছিলাম তার তুলনা হয় না। পূর্ব্বেই বলেছি canyonকে দেখতে হলে কতগুলি নিরাপদ্ জায়গা থেকে দেখতে হয়। এই নিরাপদ জায়গাগুলোতে লোহার রেলিং দিয়ে ঘেরা আছে। এখানে মাঝে মাঝে খুব প্রচণ্ড বাতাস বয় আর সেই বাতাসের বেগ অনেককে canyonএর মধ্যে টেনে নিয়ে যেতে পারে। সেজন্যে এই সব রেলিং ঘেরা জায়গা ছাড়া অন্য কোন-খানে দাঁড়িয়ে দেখা উচিত হবে না, বিশেষতঃ যে সব মহিলারা শাড়ী পরেন।

এই সব নিরাপদ জায়গাগুলির নাম Navajo Point, Lipan Point, Pinal Point, Papago Point, Moran Point ইত্যাদি। অনেক point canyon-এর ধারে ধারে রয়েছে। Yavopai Pointএ canyon-এর একটা ছোট্ট যাদুঘর রয়েছে। এর মধ্যে canyonএর একটা model ও কতগুলি specimens, map ও charts আছে। এই canyonএর আশেপাশে Hopi, Navajo, Havasupai, Hualapai আর Pointe Indianদের reservation আছে। তারা এখানে থেকে চাষবাস করে জীবিকা নির্ব্বাহ করে। এই Parkটার মধ্যে ৬০ রকমের স্তন্যপায়ী প্রাণী, ২৫০ রকমের পাখী, ২৫ রকমের সরীসৃপ আর ৫ রকমের উভচর প্রাণী।

ঈশ্বরের সব সৃষ্টিই সুন্দর, অভাবনীয় ও আশ্চর্য্যজনক। তাঁর সৃষ্টি নায়েগ্রা জলপ্রপাত আর Grand Canyonটা দেখে মনে হয় যে তিনি এদুটাকে প্রকৃতির সমস্ত সম্পদ্ দিয়ে ভর্ত্তি করে নিজের হাতে নিপুণভাবে তৈরী করেছেন। মানুষের তৈরী আকাশচুম্বী Empire State Building, বড় বড় শহর, মাইলের পর মাইল লম্বা নদী বা উপসাগরের নীচে দিয়ে বড় বড় যাত্রীবাহী সুড়ঙ্গ দেখলে মনকে খুবই বিস্মিত করে। তবে মানুষের সৃষ্টি ও ঈশ্বরের সৃষ্টির যে কত তফাৎ তা এদুটাকে না দেখলে বোঝা যায় না।

আমরা Visitor Centreএ ফিরে এলাম। এই জায়গাটাতে অনেক বাড়ীঘর রয়েছে। El Tower Hotel, Bright Angle Lodge, Motor Lodge, Yavapai Lodge। এই Yavapai Lodgeএর নিকটেই Trailer Village রয়েছে। যে সকল Indianরা touristদের নীচে নামিয়ে নিয়ে tour দেয়, সেই সকল

Indianরা এই গ্রামে বসবাস করে থাকে। ছোট্ট গ্রামটীতে পাথর ও মাটির ছোট ছোট ঘরে তারা থাকে। এই গ্রামের নীচে দিয়ে একটী সরু রাস্তা নীচে নেমে গেছে। এই সরু রাস্তাটী দিয়ে touristরা পায়ে হেঁটে বা খচ্চরের পিঠে চড়ে নীচে নামে। আমরা ফিরে আসতেই দেখতে পেলাম আমাদের Flagstaffএ যাবার বাস্‌টী আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে। এইটাই শেষ বাস্, সন্ধ্যা ছটায় ছাড়ে। আমরা তাড়াতাড়ি উঠে পড়লাম। সূর্য্যের কিরণ খুবই প্রবল এখানে। কাঁচের মধ্যে থেকেও তার কিরণ ভেতরে প্রবেশ করে আমাদের গাগুলো সব পুড়িয়ে দিচ্ছে। গিন্নী ত আগেভাগে ছাওয়া দেখে ডান দিকের seatএ বসলেন—কিন্তু গাড়ী যে উল্টো দিকে যাবে সে খেয়াল তাঁর ছিল না। বাসটী ধীরে ধীরে ভর্ত্তি হয়ে গেল। বাসটী Flagstaff-এর রাস্তা ধরতেই তিনি সূর্য্যের মুখোমুখি হলেন। তিনি রৌদ্রের অসহ্য গরম সহ্য করতে না পেরে কনে বউটী হয়ে বসলেন—মাথায় ঘোমটা দিলেন টেনে। গিন্নীর ঘোমটা টানা দেখে অনেকে অবাক হয়ে যান—পরে বুঝতে পেরে আশ্বস্ত হন। আমি প্রথমেই তাঁকে সাবধান করে দিয়েছিলাম। কিন্তু তিনি কারও কথা শোনেন না—সেই গোঁ, আগে থেকে যেখানে বসে পড়েছেন সেখান থেকে তিনি নড়বেন না। আমাকেও বাধ্য হয়ে তাঁর কাছে বসতে হলো। আমি রোদের অসহ্য তেজ সহ্য করতে না পেরে গায়ের কোটটী খুলে আমার মুখের সামনে ঝুলিয়ে দিলাম। কিছুটা ছাওয়া পেয়ে শান্তি পেলাম। কিন্তু গিন্নী আমার পাকা কথিত ভাঙবেন তবু মচকাবেন না। সেই তীব্র রোদে আমার মাথা ধরে গেল। আর উনি হাসতে হাসতে বল্লেন যে তিনি ঈশ্বরের সৃষ্টি দেখতে দেখতে চলেছেন। বল্লেন যে রোদের মধ্যে যে মরুভূমিকে এত ভাল লাগে তিনি এই দেখলেন। তাই অসহ্য রোদের তেজে পুড়তে পুড়তে আর মরুভূমির দৃশ্য দেখতে দেখতে চললেন। আমরা কয়েক ঘণ্টার মধ্যে Flagstaffএ পৌঁছে গেলাম। Flagstaff থেকে Los Angelesএর বাস্ রাত সাড়ে নটায় ছাড়বে। এর মধ্যে আমাদের খাওয়া, তল্পিতল্পা গুছানো, ও বিশ্রাম নেওয়া এইগুলি সারতে হবে। তাই বাস্ থেকে নেমেই Los Angeles যাবার জন্যে আয়োজন করতে লাগলাম।

আমেরিকার রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচনে নিকসনের বিজয়ের ফলাফল

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে সম্প্রতি যে রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচন অনুষ্ঠিত হইয়াছে তাহাতে শ্রীযুক্ত নিকসন যেভাবে জয়লাভ করিয়াছেন তাহাকে বিশ্ববাসী মহাপ্লাবনাত্মক ও সর্ব্বগ্রাসী বিজয় অভিযান বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বি তাঁহার বিরুদ্ধে প্রায় কিছুই করিতে সক্ষম হয়েন নাই এবং নিকসন এখন চার বৎসর কাল তাঁহার এই অনায়সলব্ধ বিজয়ের ফলে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের একচ্ছত্র অধিপতিরূপে বিরাজ করিতে থাকিবেন। এই বিজয়ের ফলে শুধু যে আমেরিকার নিকসন ভক্তদিগের মধ্যেই উল্লাসের সঞ্চার হইয়াছে তাহা নহে, বিশ্বের সর্ব্বত্রই, যেখানে যেখানে নিকসনের আন্তর্জাতিক বা রাষ্ট্রনীতির প্রকাশ বিশেষ রূপে ব্যক্ত হইতেছিল, সেই সকল ক্ষেত্রেই তাঁহার ভক্তদিগের আত্মবিশ্বাস প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। অর্থাৎ এখন মনে করা যাইতে পারে যে পশ্চিম ইয়োরোপের দেশগুলির সহিত আমেরিকার কেনা বেচার ব্যাপারের সংঘর্ষণ আরও প্রবল হইয়া উঠিবে। রুশিয়ার সহিত আমেরিকার নানাক্ষেত্রের প্রাতিকূল্য সবলভাবে দেখা যাইবে। এইক্ষেত্রে বিভিন্ন গুপ্ত অভিপ্রায় সিদ্ধি করিবার জন্য আমেরিকা নানাভাবে চীন দেশের নেতাদিগের সহিত সহায়তা করিবেন এবং দক্ষিণ পূর্ব্ব এশিয়ার মার্কিন আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রনীতিও নুতন আকারে বিশ্বের রাষ্ট্রীয় আসরে আত্মপ্রদর্শন করিবে। আরবী-ইরাণী-মিসরী-ইসরায়েলী-তুর্কী রাষ্ট্রলীলা কেন্দ্রের প্রধান সহায়ক যে দুই মহাদেশ রুশিয়া ও আমেরিকা, তাহাদিগের পারস্পরিক সম্বন্ধের উপরেই এই আন্তর্জাতিক ক্রীড়া বৈচিত্র্য নির্ভর করে। নিকসনের বিজয়ের পরে এই ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক লীলা খেলা ঠিক কি আকার গ্রহণ করিবে সেই বিষয়ে আনুমানিক কথাবার্ত্তার যথাযথ মূল্যায়ণ কতটা সম্ভব তাহার বিচার একান্তই অজানাকে জানিবার চেষ্টা। তবে রুশিয়ার সহিত একটা যুদ্ধ লাগাইবার আগ্রহ যদি নিকসনের প্রাণে প্রবলভাবে জাগ্রত না হয় তাহা হইলে এশিয়ার নিকটস্থ পূর্ব্ব দেশগুলিকে নিকসন ইসরায়েলকে উসকাইয়া হঠাৎ কোন যুদ্ধে অবতীর্ণ করাইবার চেষ্টা নাও করিতে পারেন। আবার এ চেষ্টাও অসম্ভব নহে যে নিকসন কোন উপায়ে রুশিয়াকে ঐ অঞ্চলে বিপর্য্যস্ত করিয়া সামরিক শক্তির অপচয়ে নিযুক্ত হইতে বাধ্য করিয়া ফেলিবেন।

ভারতবর্ষের দিকে আসিলে দেখা যায় যে পাকিস্থান নিকসন নির্ব্বাচিত হইবার পর হইতেই কথায় বার্ত্তায় কিছু উগ্রতা প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। সামরিক অস্ত্রশস্ত্রও শুনা যাইতেছে পাকিস্থানকে আমেরিকা দরাজ হস্তে সরবরাহ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইহার অর্থ শুধু ভারত পাকিস্থান সম্বন্ধ শত্রুতার মনোভাবে গরম করিয়া রাখা অথবা সত্য সত্যই আর একটা যুদ্ধ লাগাইবার চেষ্টা, তাহা স্থির নিশ্চয়ভাবে কেহ বলিতে পারে না। তবে ইহা পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে যে ভারত পাকিস্থানের যে সকল তথাকথিত বিবাদ অমীমাংসিত আছে, সেগুলির কোনও দ্রুত সমাধান যাহাতে না হয় পাকিস্থান নিকসনের নির্ব্বাচনের পর হইতে সেইভাবেই কথাবার্ত্তা বলিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইহার মধ্যে বর্ত্তমানে যুদ্ধবিরতি সীমারেখা কোথা দিয়া টানা হইবে, যুদ্ধবন্দিদিগকে কিভাবে কখন

নিজ দেশে ফিরিয়া পাঠান হইবে, সে কথার আলোচনা এখনও প্রায়ই হয় কিন্তু উভয়পক্ষের মতের মিল কোনও ভাবেই হয় না। এখন যে মতামতের সংঘাত চলিতেছে তাহা কতটা বিবাদ জাগ্রত রাখিবার চেষ্টা মাত্র এবং কতটা কোন সত্যকার মতদ্বৈধজাত সে কথাও কেহ সঠিক বলিতে পারে না। তবে নিকসনের নির্ব্বাচনের পরে ভারত পাকিস্থান রাষ্ট্রীয় সম্বন্ধ উন্নতির পথে যাইতেছে না ইহা বলিলে কোনও ভুল হয় না। ঐ সম্বন্ধ যে দ্রুত গতিতে অবনতির গহ্বরেই গিয়া পড়িতেছে সে কথাও সুনিশ্চিতভাবে কেহ বলিতে পারে না। ভিতরে ভিতরে চীন ও আমেরিকা পাকিস্থানকে কোন পথে চালাইবার চেষ্টা করিতেছে সে বিষয়ে নানা প্রকার অনুমান চলিবে কিন্তু অবস্থাটা ঠিক যে কি তাহা কে বলিতে পারিবে? যখন তাহা বলা যাইবে, অর্থাৎ যখন যথাযথভাবে জানা যাইবে যে পাকিস্থান সত্যই যুদ্ধ চেষ্টা করিতেছে অথবা শুধু আমেরিকা ও চীনের নিকট আর্থিক ও সামরিক সাহায্য আহরণ চেষ্টাই করিতেছে, তখন বিষয়টা আর দূর ভবিষ্যতের কথা থাকিবে না। যুদ্ধ হইলে তাহা প্রায় আরম্ভই হইয়া যাইবে এবং সম্ভবত ভারতের উপর পাকিস্থানের আক্রমণের আরম্ভ দিয়াই তখন নুতন রাষ্ট্রীয় পরিস্থিতির কথা বিশ্ববাসী প্রথম জানিতে পারিবেন। ইহার উদাহরণ ইতি পূর্ব্বে ১৯৭১ খৃঃ অব্দের ভারত পাকিস্থান যুদ্ধে পূর্ণরূপে দেখা গিয়াছিল। সেই সময় পাকিস্থান নানা-ভাবে ভারতকে ঘোর অসুবিধায় ফেলা সত্ত্বেও, ভারত পাকিস্থানকে উল্টা কোন আক্রমণ না করিয়া নিজের নিরপেক্ষ স্বরূপ বজায় রাখিয়া চলিতেছিল। তৎপরে হঠাৎ পাকিস্থান এক কালীন ভারতের অনেকগুলি বিমান বন্দরের উপর বোমা বর্ষণ করিয়া ভারতের উপর সামরিক আক্রমণ আরম্ভ করিয়া দিল। ভারতের তখন পাকিস্থানকে প্রত্যাক্রমণ করা ব্যতীত গত্যান্তর রহিল না; এবং ইহার সঙ্গে সঙ্গেই ভারতের ও পাকিস্থানের ১৯৭১ খৃঃ অব্দের যুদ্ধের সূচনা হইল। বর্ত্তমান কালে পাকিস্থান ভারতের উপর সামরিক আক্রমণ চালাইতে সক্ষম নহে এবং হয়ত সেই কারণেই পাকিস্থান কোনও আক্রমণও চালাইবার চেষ্টা করিতেছে না। কিন্তু যদি সেই যুদ্ধ ক্ষমতা পাকিস্থানের হস্তে কোনও উপায়ে ফিরিয়া আইসে তাহা হইলে পাকিস্থান যে যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিবে না, এমন কথা কে বলিতে পারে? যেদিন হইতে নিকসন পুনর্ব্বার চার বৎসরের জন্য আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের অধিনায়ক নির্ব্বাচিত হইলেন তখন হইতেই তিনি পাকিস্থানের যুদ্ধ ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সচেষ্ট হইলেন এবং পাকিস্থানকে শত শত যুদ্ধ যান, বিমান, তোপ প্রভৃতি দান করিতে সুরু করিলেন। সুতরাং অদূর ভবিষ্যতে যে পাকিস্থান যুদ্ধ করিতে পুনরায় সমর্থ হইবে সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে না। আমেরিকা ব্যতীত চীনও পাকিস্থানকে অস্ত্র সরবরাহ করিতেছে এবং তাহাতে যে পাকিস্থানের শক্তি বৃদ্ধি হইতেছে তাহাও নিঃসন্দেহ বলা যাইতে পারে। এই উভয় ধারায় যে সামরিক শক্তি পাকিস্থানের ভিতরে প্রবাহিত হইয়া তাহাকে সমর সক্ষম ও রণ লিপ্সু করিয়া তুলিতেছে ইহা সকলেই জানেন। কেন না পাকিস্থানের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হইল ভারতকে আক্রমণ করিয়া বিধ্বস্ত করিয়া জব্দ করিয়া দিবার চেষ্টা। পাকিস্থান শুধু সেই সময়ই তাহার এই পাপ প্রচেষ্টা হইতে বিরত থাকিতে পারে যখন তাহার অন্তরে নিজ শক্তিতে বিশ্বাস থাকে না। সেই বিশ্বাস সম্পূর্ণরূপেই গোলা বারুদ ও যুদ্ধের ব্যয় নির্ব্বাহের টাকার সরবরাহের উপর নির্ভর করে। থলি যদি খালি থাকে এবং বন্দুকে যদি গুলির অভাব হয় তাহা হইলেই পাকিস্থান শান্তিপ্রিয় হইয়া উঠে। কিন্তু অর্থ ও অস্ত্র পাইলেই শান্তির আকাঙ্খা হাওয়ায় মিলাইয়া যায়।

অতএব নিকসনের পাকিস্থান সেনা বাহিনীকে সাজ সরঞ্জাম দিয়া যুদ্ধক্ষম করিয়া তুলিবার ফল কি হইবে ও হইতে পারে তাহা নিকসনও জানেন এবং পাকিস্থানের সৈন্যগণও আরও উত্তমরূপে জানেন। এই জন্যই মনে হয় যে নিকসনের উদ্দেশ্য সাধু নহে। তিনি সম্ভবত ভারত পাকিস্থানের আর এক দফা যুদ্ধ লাগাইবারই চেষ্টা

করিতেছেন। কেন করিতেছেন জিজ্ঞাসা করিলে তাহার উত্তরও সেই চিরপুরাতন রুশিয়া ও আমেরিকার শত্রুতার কথাতেই পাওয়া যায়। রুশিয়া যদি ভারতকে সামরিক সাহায্য দান ইচ্ছা করেন তাহা হইলে রুশিয়ার তাহাতে যে অর্থব্যয় ও শক্তিনাশ হইবে তাহার ফলে রুশিয়ার সমর ক্ষমতা খর্ব্ব হইবে বলিয়া ধরা যাইতে পারিবে। নিকট পূর্ব্ব এশিয়ায় যুদ্ধ লাগিলেও ঐ একই ফল হইবে, অর্থাৎ রুশিয়ার সামরিক শক্তিহানী ঘটিবে। আমেরিকা যদি ভিয়েৎনামের যুদ্ধ হইতে নিজের সৈন্য প্রভৃতি সরাইয়া ফেলিতে পারেন তাহা হইলে আমেরিকার যুদ্ধ ক্ষমতা সংরক্ষন অধিকতর ভাবে সম্ভব হইবে। নিকসন চেষ্টা করিতেছেন যাহাতে ঐ রূপ পরিস্থিতি সৃজিত হইতে পারে। কতদূর কি হইবে তাহা কেহ বলিতে পারে না বিভিন্ন কারণে। প্রথম কারণ পাকিস্থানের অভ্যন্তরের অবস্থা বিচারে মনে হয় যে কোনও কোন পাকিস্থানী প্রদেশে বিদ্রোহ সম্ভাবনা ক্রমশঃ প্রবল হইয়া উঠিতেছে। যথা, পূর্ব্ব হইতেই পাঠান দিগের মধ্যে স্বাধীন পাখতুনিস্থান আন্দোলন প্রবল হইতে প্রবলতর হইয়া উঠিতেছে। বালুচিস্থান ও সিন্ধু দেশেও ঐরূপ নিজ নিজ রাজ্য গঠন চেষ্টা মূর্ত্ত হইয়া দেখা দিতেছে। এই সকল কারণে পাকিস্থান ভিতরের অবস্থা সম্পূর্ণরূপে শান্তি পূর্ণ না থাকিলে সহসা যুদ্ধে জড়িত হইতে ইচ্ছা না করিতেই পারে। দ্বিতীয় কথা পাকিস্থানে রাষ্ট্রপতি জুলফিকার আলি ভূট্টোকে সরাইয়া অপর কোনও নেতা তাঁহার স্থান দখল করিতে চেষ্টিত থাকিলে ভূট্টোর যুদ্ধে লিপ্ত হইতে না চাওয়াই স্বাভাবিক মনে হইতে পারে। অধুনা কোন কোন নেতা এইরূপ মনোভাব যে প্রদর্শন করিতেছেন না এমনও বলা যায় না। সুতরাং ভূট্টো ঠিক একাগ্রচিত্তে ভারত আক্রমণের কথাতে আত্মনিবেশ করিতে পারিতেছেন না। এই অবস্থা যদি একইভাবে বর্ত্তমান থাকে তাহা হইলে

পাকিস্থানও যুদ্ধমুক্ত থাকিতেই চেষ্টা করিবে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু সকল কথা বিচার করিয়া দেখিলে একথা নিশ্চয়ই মানিতে হয় যে নিকসনের নির্ব্বাচন যুদ্ধ সম্ভাবনা বৃদ্ধিই করিয়াছে। শুধু ভারত-পাকিস্থান যুদ্ধই নহে। বহু ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে যুদ্ধ লাগিবার আশঙ্কা জন্ম লাভ করিয়াছে ও যে সকল স্থানে সে সম্ভাবনা পূর্ব্ব হইতেই বর্ত্তমান ছিল সেই সকল স্থানে তাহা আরও প্রবল হইয়া উঠিয়াছে।

আর একটা ভয়ের কথা এই যে আমেরিকা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া নানা ভাবে রুশিয়ার উপর সামরিক চাপ যাহাতে অধিক করিয়া ন্যস্ত হয় সেই রূপ আয়োজন করিতেই তৎপর রহিয়াছেন। সুতরাং নিকসনের রাজত্ব পুনর্ব্বার চার বৎসরের জন্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার একটা ফল হইল রুশ আমেরিকার যুদ্ধের অর্থাৎ আর একটা বিশ্ব-মহাযুদ্ধের সম্ভাবনার আবির্ভাব। এইরূপ হইলে তাহার ফল বিশ্বমানবের পক্ষে অতি ভয়াবহ হইবে। কেন না এইরূপ যুদ্ধে যে আনবিক অস্ত্র ব্যবহার হইবে সে বিষয়ে কাহারও প্রায় সন্দেহ নাই। এবং আনবিক অস্ত্র ব্যবহৃত হইলে যোদ্ধা ও নিরপেক্ষ নির্বিশেষে সকল জাতিরই অস্তিত্ব বিলোপের সম্ভাবনা বিভীষিকাময় রূপ ধারণ করিয়া বিশ্ব মানবের সম্মুখে উপস্থিত হইবে।

মাস মিডিয়া ইন এ ফ্রি সোসাইটি: ওয়ারেণ কে এজি সম্পাদিত। অক্‌স্‌ফোর্ড এণ্ড আই বি এইচ কোং কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য ৭.৫০। পৃঃ ১৮-।-১৭, কাপড়ে বাঁধাই স্বর্ণাক্ষরে নাম লেখা ও আর্ট কাগজের মলাট সম্বলিত। পুস্তকটি ছয়জন বিশ্ববিখ্যাত প্রচার বিদ্যা বিশারদের মতামতের ব্যাখ্যা। যে সকল ব্যক্তির প্রচার কার্য্য পরিচালনাই পেশা ও অবলম্বন তাঁহাদের এই পুস্তক হইতে বহু সাহায্য লাভ সম্ভব হইতে পারে। জনসাধারণের মধ্যেও যাহারা প্রচার করিয়া কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধি চেষ্টা করেন তাঁহাদিগেরও এই পুস্তকটি কার্যকরী বোধ হইবে। লিখিত, কথিত, চলচ্চিত্র, টেলিভিশন প্রভৃতি বিভিন্ন প্রচার পন্থার উপযুক্ত ব্যবহার শিক্ষার পক্ষে ইহার মূল্য স্বীকৃত হইবে সন্দেহ নাই।

কালিদাস

জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী

প্রেম যে কোথায় গেল।
সেকি উদ্দাম চৈত্রের বাতাসে
রুদ্রশাপে ভস্মীভূত মদনের দেহরেণু-সাথে ভাসে
আকাশে আকাশে।

হে কবি পেলেনা তারে খুঁজি ?
পৃথিবীর ঘরে ঘরে মানুষের অন্তরে অন্তরে
রয়েছে অ-তনু হয়ে বুঝি।

সহসা পড়িল বুঝি মনে—
—সতী-তনু বুকে ধরা শোকোন্মত্ত ধূর্জ্জটিরে ভ্রমিতে
ভুবনে।

আর কখন খসেছে তার স্কন্ধ হতে সেই তনুখানি।
ফিরিলা কৈলাসে শিব মোহ-মুগ্ধ জ্ঞানী।

তবু মধু ঋতু আসে।
কণ্ঠে পরি পুষ্পমাল্য বসন্তও আসে।
দাঁড়ালো সম্মুখে এসে কিশোরী পার্ব্বতী
চমকি চাহিল শিব। ওকি, ফিরে আসে সতী ?
ওকে রূপবতী।

হেরিল পিছনে তার কামনা-মূরতী।
রুদ্র হল রুদ্র রুদ্ররোষ মিশি শোকানলে,
কামনা পুড়িল সেই সতী প্রেমানলে।

* * *

মুঠো মুঠো সেই ভস্ম মেখে নিল ধরণী সেদিন রতিসহ ?
তাই তার কবিদের ঘুচিল না, ঘুচিল না মিলনেও অপার
বিরহ।

দেহ আছে প্রেম নাই। প্রেম আছে দেহ নাই।
আছে আছে দুই-ই বুঝি আছে।
মিলনে সে মিলিবে না। বিরহে সে হারাবে না।
কেহ কারে পায় নাকো কাছে।

বিশ্বভরা সব কবি সব ঋতু খুঁজে তারে সত্য-ত্রেতা
যুগ-যুগান্তরে—
পেয়েছে বা পায় নাই। হায় জানা যায় নাই।
কোথা আছে বিশ্ব-চরাচরে।

* * *

তুমি এলে। ভাষা এলো। হাতে নিলে ভূর্জ্জপত্র
ধ্যানমুগ্ধ লেখনী অমর।
শকুন্তলা-মেঘদূত-উমা-মহেশ্বর— কার কথা লিখেছিলে
আগে কবিবর।

উচ্চশিক্ষা সকলের জন্য নহে

মানুষের মানসিক কাঠামোর মন-বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে সকল মানুষের পক্ষে উচ্চশিক্ষা লাভ কদাপি সম্ভব হইতে পারে না। যাহাদের গভীর-ভাবে দর্শন-বিজ্ঞান-ইতিহাস-সাহিত্য বিচার ক্ষমতা আছে তাহাদের সংখ্যা সকল মানুষের সংখ্যার অনুপাতে শতকরা দশজনও হয় কিনা তাহা বলা যায় না। গার্ডিয়ান সাপ্তাহিকে বৃটেনের উচ্চশিক্ষার কথা আলোচনা করিয়া বলা হইয়াছে যে বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যেখানে বৃটেনে বাৎসরিক ৮০০০০০ (আট লক্ষ) মানুষের জন্ম হইত, অর্থাৎ নূতন শিক্ষার্থী বৎসরে আট লক্ষ স্কুল কলেজে প্রবেশের জন্য হাজির হইত ১৯৬৫ খৃঃ অব্দে সেই সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া দশ লক্ষে দাঁড়ায়। বর্ত্তমানে শিক্ষার্থীদিগের সংখ্যা আরও অধিক হইয়াছে কিন্তু স্কুলে যাহারা শেষ পর্য্যন্ত পাঠ সমাপ্ত করিয়া থাকে তাহাদের মধ্যে এক-পঞ্চমাংশ মাত্র স্কুল ছাড়িয়া আরও কোনও উচ্চতর শিক্ষালাভের জন্য অন্যত্র শিক্ষালাভ চেষ্টা করে। এইসকল শিক্ষার্থীর মাত্র এক-তৃতীয়াংশই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়া থাকে। এইভাবে ছাত্রসংখ্যা ক্রমশঃ ছাঁটিয়া হ্রাস হইয়া শেষ পর্য্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে যাহারা পাঠ করে অর্থাৎ তিন-চার বৎসরে যাহাদের বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি করিয়া লয়, তাহাদের পুরা সংখ্যা দাঁড়ায় মোটামুটি তিন লক্ষ প্রমাণ। বাৎসরিক যত নূতন ছাত্র শিক্ষা আরম্ভ করে তাহা হইতে দেখা যায় এক-দশমাংশেরও কম ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে যাইতে পারে। কিন্তু বৃটেনের বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালকগণ মনে করেন যে এইসকল ছাত্রই বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা লাভের উপযুক্ত বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। ইহাদের মধ্যে আরও অনেক-জনকে বাদ দিয়া শুধু যাহারা বিশেষ করিয়া উচ্চশিক্ষা লাভের উপযুক্ত তাহাদের রাখিলেই বিশ্ববিদ্যালয়-গুলিতে অযথা বহু ছাত্রের সমাবেশ না হইয়া শিক্ষার ব্যবস্থার আরও সুব্যবহার সম্ভব হইতে পারে। বৃটেনের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে এখন যাহারা প্রবেশ করে তাহাদিগের মধ্যে অনেকেই পরিষ্কারভাবে শুদ্ধ ইংরেজীতে নিজ নিজ মনোভাবও ব্যক্ত করিতে পারে না। ইহা অত্যন্তই লজ্জার কথা।

ভারতবর্ষের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অবস্থাও সুবিধার নহে। ছাত্রসংখ্যা অতিশয় অধিক এবং যাহারা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে প্রবেশ করে তাহারা প্রায়ই উচ্চশিক্ষা লাভের অনুপযুক্ত। ভাষাজ্ঞান প্রভৃতির কথা না বলাই উচিত। এই কারণে শিক্ষার ধাপে ধাপে যাহাতে বহু অক্ষম ছাত্রকে বাদ দেওয়ার ব্যবস্থা করা যায় তাহার জন্য সকলের চেষ্টা করা প্রয়োজন। এইরূপ ব্যবস্থা হইলে বি. এ. পাশের নামে অক্ষম ব্যক্তির সংখ্যা বৃদ্ধি হইবে না এবং যাহারা বি. এ. পাশ তাহারা সমাজে অধিকতর সম্মানীয় হইতে পারিবে। অধিক ছাত্র সমাবেশ হইলে অধ্যাপকদিগকে বিপর্য্যস্ত হইতে হয় এবং কাহারোই কোনও লাভ হইতে পারে না। এবং অপেক্ষাকৃত অল্প শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্রগণের নিজেদের বিদ্যা-বুদ্ধি বিষয়ে অকারণ উচ্চ ধারণা গঠিত হইয়া তাহাদিগের জীবনে নানাপ্রকার ভ্রান্ত বিশ্বাসজাত কষ্টের কারণ উপস্থিত হইতে আরম্ভ করে। ইহা ব্যতীত যাহারা সত্যই উচ্চ শিক্ষা পাইয়া মানসিকভাবে সুসক্ষম তাহাদেরও যথাযথ সমাদর প্রাপ্তি হয় না। উচ্চশিক্ষা লাভেচ্ছু ব্যক্তিদিগের সংখ্যা কমাইয়া এই অবস্থার যথাযথ পরিবর্তন করা

সমাজের পক্ষে লাভজনক হইবে বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

উইলফ্রেড রোডস্-এর ৯৫ বৎসর হইল

যাহারা ক্রীকেট খেলার ইতিহাস চর্চায় অনুরক্ত তাঁহারা সকলেই উইলফ্রেড্ রোডস্-এর নাম জানেন। ক্রীকেটের ইতিহাসে যাঁহাদের নাম উজ্জ্বলভাবে লিখিত আছে রোডস্ তাঁহাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি ক্রীকেট খেলাতে যাহা কিছু করিলে খ্যাতি অর্জন করা যায় তাহার প্রায় সবকিছুই করিয়াছিলেন। আজ তাঁর ৯৫ বৎসর বয়স হইলে পরে সকলে এই শক্তিমান্ ক্রীকেট খেলোয়াড়ের গুণাবলীর কথা পুনরাবৃত্তি করিতেছেন। ১৯০০ খৃঃ অব্দে তিনি ইয়র্কশায়ারের হইয়া খেলিবার সময় সেই বৎসর ২৬১টি উইকেট আউট করেন—মাথা পিছু ১৩·৮১ রান্ মোটের উপর করিতে দিয়া। তিনি সচরাচর শেষ খেলোয়াড় হিসাবে ব্যাটিং করিতে যাইতেন ও সিডনিতে শেষ খেলোয়াড় হইয়া আর. ই. ফস্টারের সহিত একত্রে খেলিয়া ফস্টারকে শেষ উইকেটে একশত ত্রিশ রান্ করিতে সক্ষম করেন। ইহা অদ্যাবধি একটা শেষ উইকেটের রান্ করার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ হইয়া রহিয়াছে। ১৯১২ খৃঃ অব্দে বার্ণস্ ও ফস্টার ইংলণ্ডের হইয়া প্রথম টেষ্টে অস্ট্রেলিয়ার নিকট হারিয়া তৎপরে চারটি টেষ্টে পরে পরে জয়লাভ করেন। এই টেষ্টে রোডস্-এর বাঁ-হাতের স্পিন্-বল দেওয়ার আবশ্যক না থাকায় তিনি জ্যাক্ হবস্ এর সহিত প্রথম জোড়ে খেলা আরম্ভ করেন এবং ১৭৯ রান্ করেন। এই জোড়ের দুইজনের মিলিত রান্ হয় ৩২৩টি। উহাও প্রথম উইকেটের জোড়ের রান্ করিবার একটি 'রেকর্ড'। তিনি ৫২ বৎসর বয়সেও টেষ্ট ক্রীকেটে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ইহাও বয়সের একটা রেকর্ড, কেন না ডব্লিউ. জি. গ্রেস বা জর্জগান্ ৫০ বৎসরের পরে আর টেষ্ট ক্রীকেটে খেলেন নাই। রোডস্ ৩২ বৎসর ক্রীকেট খেলিয়া ৩৯৭৯১ রান্ করিয়াছিলেন এবং ৪১৮৭টি উইকেট আউট করেন। তাঁহার এ-ক্ষেত্রে মাথাপিছু রান্ করিতে দিবার সংখ্যা হইয়াছিল ১৬·৭১। একই বৎসরে তিনি দুইবার ২০০০ রান্ ও ১০০টি উইকেট আউট করেন। ক্রীড়া জীবনে তিনি ষোলবার এক বৎসরে ১০০০ রান্ ও ১০০ উইকেট আউট করিয়াছিলেন।

সি আই এর দোষ

আজকাল একটা রেওয়াজ হইয়াছে কোথাও কোনও গোলমাল হইলেই তাহার জন্য আমেরিকার গুপ্তচর নিয়োগকর্তা সি. আই. এ.-কে দোষ দেওয়া হইয়া থাকে। ইহা লইয়া বিদেশী সংবাদপত্রগুলি ভারতবর্ষের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদিগকে ঠাট্টা করিয়া কথাটা মিথ্যা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিলেও কথাটা উড়িয়া যায় না। কারণ গুপ্তচর লাগাইয়া সি. আই. এ. যে নানা দেশ এবং নিজ দেশেও গোলযোগ সৃষ্টি করাইয়া থাকে একথা আমেরিকান্‌রাও স্বীকার করেন। এদেশে নানা লোকে যে সি. আই. এ.-র নিকট বক্‌শিশ পাইয়া থাকেন তাহাও সর্বজনবিদিত। শুধু দোষ হইয়াছে ডাঃ শঙ্কর দয়াল শর্মা ও শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর; কেন না তাঁহারা কথাটা প্রকাশ্যভাবে উচ্চারণ করিয়া ফেলিয়াছেন ও সে কথাটা আমেরিকান্ সরকার অস্বীকার না করিয়া বলিয়াছেন যে সি. আই. এ. যাহা করিয়া থাকে তাহাতে ভারতবর্ষের কোন ক্ষতি হয় না। গুপ্তচর লাগাইয়া ভালো কাজ করাইবার রীতি তাহা হইলে সি. আই. এ.-ই সর্বপ্রথমে পৃথিবীতে চালাইলেন; কারণ পূর্বযুগ হইতে সকল সময়েই গুপ্তচর দিয়া অপরের ক্ষতিকর কার্যাই করান হইয়া আসিয়াছে এবং গুপ্তচরকে কেহই কখনো সুহৃদ্ বলিয়া মনে করে নাই। সুতরাং বিদেশী কাগজে যে রসিকতা করিয়া মন্তব্য প্রকাশ করা হইয়াছে যে পূর্বে ক্ষতিকর কোনকিছু ঘটিলেই ভারতীয়গণ বৃটিশের দোষ দেখিতেন। পরে পাকিস্থানের অথবা চীনপন্থী কম্যুনিষ্টদিগের এবং এখন সি. আই. এ.-র; সে মন্তব্য সম্বন্ধে বলা যায় যে পূর্বে বৃটিশদিগের দ্বারা ভারতের বহু ক্ষতি সাধিত হইয়াছে এবং পরে পাকিস্থান ও চীনা কম্যুনিষ্টগণও ভারতের ক্ষতি করিবার চেষ্টা প্রাণপণেই করিয়াছে। রসিকতা করিয়া এই ঐতিহাসিক

সত্যের অবতারণা করিয়া বিদেশী লেখক জগতের নিকট ভারতকে ছোট করিতে সক্ষম হ'ন নাই। বরঞ্চ ভারত শত্রু হিসাবে বৃটিশ, পাকিস্থান, চীনপন্থী কমুনিষ্ট ও সি. আই. এ-কে এক পঙক্তিতে বসাইয়া ভারতের সি. আই. এ. সম্বন্ধে গভীর সন্দেহ যে ভিত্তিহীন নহে সেই কথাই প্রমাণ করিয়াছেন। সি. আই. এ.-এর ভারত সম্বন্ধে মনোভাব যদি পূর্বযুগের বৃটিশের মত কিম্বা পাকিস্থান ও চীনপন্থী কম্যুনিষ্টদিগের মতই ভারত-বিরুদ্ধ হয়, তাহা হইলে সি. আই. এ. যে ভারতের পরম শত্রু সে বিষয়ে কাহারও কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না।

বিমান ছিনতাই

যাত্রাকালে অথবা মধ্যাকাশে বিমান চালকদিগকে প্রাণের ভয় দেখাইয়া যথা ইচ্ছা চালাইয়া লইয়া যাইতে বাধ্য করা একটা নূতন ধরণের অপরাধরূপে দেখা দিয়াছে। ইহা একপ্রকার ডাকাইতি ও ইহার উদ্দেশ্য হয় টাকা আদায় করা নয়ত বিমান যে দেশের সেই দেশকে কোন একটা দাবি মানিয়া লইতে বাধ্য করা। বর্ত্তমানে প্রসিদ্ধ মিউনিথ বিমান ছিনতাই হইয়াছিল অন্য প্রকারে। এই ক্ষেত্রে দস্যুগণ কয়েকজন ইহুদি খেলোয়াড়কে ধরিয়া বিমানযোগে নিজেদের দেশে লইয়া যাইবার চেষ্টা করে এবং বিমান বন্দরে জার্মান পুলিশের সহিত সংঘর্ষে অনেক ইহুদি খেলোয়াড় ও আরব দস্যুর প্রাণ যায়। একজন জার্মান পুলিশও প্রাণ হারায়। সম্প্রতি জাপানের এক জায়গায় একটি বিমান এইভাবে কাড়িয়া লওয়া হইতেছিল। জাপানী পুলিশ ঐ বিমান-চোরদিগকে অনুসরণ করিয়া তাহাদের যাত্রারম্ভের শেষ মুহূর্ত্তে ধরিয়া ফেলে। অনেকদিন পূর্ব্বে পাকিস্থানী দস্যুগণ একটি ভারতীয় বিমান এইভাবে কাড়িয়া লইয়া লাহোরে লইয়া যায় ও পরে সেই বিমানটি বিস্ফোরক দিয়া উড়াইয়া দেয়। ইহার ফলে ভারতের আকাশ-পথে পাকিস্থানী বিমান চলা বন্ধ করা হয়। এইজাতীয় বিমান অপহরণ কার্য্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শক্তি লাগাইয়াছে আরব দস্যুগণ। ইহাদিগের প্রধান লক্ষ্য ইস্রায়েলবাসীগণ হইলেও ইহারা অনেক সময় অপরাপর জাতিরও বহু ক্ষতি করিয়া থাকে এবং ফলে বিশ্বের নানা জাতি আরবদিগকে শত্রু বলিয়া বিবেচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। অধিকবার অপরজাতির ক্ষতি করিলে আরবদিগের বিরুদ্ধে অপরাপর জাতির সংযুক্তভাবে প্রত্যাক্রমণ চেষ্টা ঘটিবার সম্ভাবনা উপস্থিত হইবে।

আসল কথা হইতেছে কেহ কাহারও সহিত সংগ্রামে লিপ্ত হইলে সেই সংগ্রাম যাহাদের সংগ্রাম তাহাদের দেশেই চালিত হওয়া উচিত। অপরের দেশ অথবা বিমান চড়াও করিয়া শত্রু-নিপাত চেষ্টা অপর জাতির ব্যক্তিগণ সহ্য করিতে প্রস্তুত থাকিবে না ইহাই ন্যায্য ও স্বাভাবিক বলিয়া ধরিলে কোন ভুল হয় না। সুতরাং যে প্রকারেরই দ্বন্দ্ব হউক না কেন তাহা নিজ নিজ এলাকায় চালিত হওয়া উচিত। অপরের এলাকায় না যাওয়ারই রীতি হওয়া উচিত।

সাময়িকী

আসামে সাম্প্রদায়িক খুনখারাবি

আসামের সংখ্যাগুরু আসামী ভাষাভাষী ব্যক্তিগণ বহুকাল হইতেই নিজেদের ভাষা জাতীয়তা সংরক্ষণের উপায় হিসাবে সংখ্যা লঘু সম্প্রদায়গুলির উপর বর্ব্বরোচিত আক্রমণ চালাইয়া আসিয়াছে। এই কারণে এবং আসামী ভাষাভাষীদিগের উপর ন্যায় ও সুনীতি অবলম্বনে চলার বিষয়ে আস্থা না থাকায় আসামের সংখ্যালঘু জাতিগুলি আসাম হইতে পৃথক হইয়া যাইবার ইচ্ছা জ্ঞাপন করিয়া থাকেন ও কিছু কিছু অঞ্চল পৃথক হইয়াও গিয়াছে। বর্ত্তমানে শিক্ষার ভাষা লইয়া আসামে বহু অন্যায় আক্রমণ সংখ্যালঘুদিগের উপর চালিত হইয়াছে। করিমগঞ্জ হইতে প্রকাশিত যুগশক্তি সাপ্তাহিকে ১৩ই অক্টোবর প্রকাশিত হয়:

ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় এখনো তীব্র উত্তেজনা বিরাজ করছে। খারুপেটিয়া, মঙ্গলদই, নওগাঁ, হোজাই, ধুবড়ী এবং গৌহাটিতে কার্ফ্যু চলেছে। গত মঙ্গলবার ধুবড়ীতে দু ঘণ্টার জন্য কার্ফ্যু তুলে নেওয়া হয়, তখন শহরে একাধিক সংঘর্ষ ঘটে এবং তার ফলে একজনের মৃত্যু হয়। এই নিয়ে সব শুদ্ধ তিনজন লোক এবার নিহত হলেন, আহত হয়েছেন শতাধিক লোক। নওগাঁ শহরে কার্ফ্যু বলবৎ থাকা অবস্থায়ই কয়েকটি অগ্নিসংযোগ ও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। গৌহাটি শহরে এবং উপকণ্ঠে এতদিন ১৪৪ ধারা বলবৎ ছিল, বৃহস্পতিবার ভোর পাঁচটা থেকে এখানেও সান্ধ্য আইন জারী করা হয়। আসাম ছাত্র সংস্থা শিক্ষার মাধ্যম সংক্রান্ত সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে সরকারী অফিস ইত্যাদিতে দুদিনব্যাপী ধর্মঘট করার যে কার্য্যসূচী নেন বুধবার ছিল তার প্রথম দিন। আসাম উপত্যকায় শত শত ছাত্রকে প্রথম দিনই গ্রেপ্তার করা হয়, গৌহাটিতে ঐদিন চার জন ছুরিকাহত হন। উপদ্রুত অঞ্চলগুলিতে পুলিশ ও সৈন্যবাহিনী ব্যাপকভাবে টহল দিচ্ছে বলে প্রকাশ। সরকার পরিস্থিতির দ্রুত উন্নতি হচ্ছে বলে দাবী করছেন। গত ১০ই অক্টোবর মুখ্যমন্ত্রী শ্রীশরৎচন্দ্র সিংহ আসামের জনগণকে বিশেষ করে ছাত্র, যুব ও শিক্ষকদের হিংসার পথ পরিত্যাগ করতে আবেদন জানান। ঐদিন ডিব্রুগড়ের ছাত্ররা ডেপুটি কমিশনারের কোর্টের ভিতর শ্রীসিংহের কুশপুত্তলিকা দাহ করে।

ঐ পত্রিকায় সম্পাদকীয় মন্তব্যে বলা হয়:

সরকারী আশ্বাস ও সতর্কতা সত্ত্বেও রাজ্যের হাঙ্গামা জনিত পরিস্থিতি আয়ত্তে আসে নাই, বরঞ্চ হাঙ্গামার ক্ষেত্র দিন দিনই বিস্তৃত হইতেছে। দীর্ঘদিন ধরিয়া এই হাঙ্গামার ক্ষেত্র প্রস্তুত করা হইয়াছে, সরকার প্রথম হইতে বিভেদকামী, শক্তিগুলিকে আয়ত্তে না আনায় এখন নিরীহ জনসাধারণকে ইহার খেসারৎ দিতে হইতেছে। প্রশাসন যন্ত্রও সর্বক্ষেত্রে নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করিতেছেন না বলিয়া অনেকে অভিযোগ করিতেছে, অনেক ক্ষেত্রেই আক্রান্তরা আক্রমণকারীর চাইতে অধিকতর পুলিশী তৎপরতার শিকার হইতেছেন বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। রাজ্য সরকারের শুভবুদ্ধির উপর সংখ্যালঘু জনসাধারণের আস্থা ছিল

পরিমল গোস্বামী রচিত সর্বাধুনিক গ্রন্থ

পত্রস্মৃতি

লেখক কর্তৃক গৃহীত ৩৬ খানি ফোটোগ্রাফ, মূল্যবান্ মুদ্রণ, ৭৮ জন পত্র লেখক ও লেখিকার ৩৫০ খানি পত্র ও পত্রাংশ—আর তাদের ঘিরে লেখকের বিচিত্র স্মৃতি। বাংলা সাহিত্যে সম্পূর্ণ অভিনব। মূল্য বাইশ টাকা।

যাঁদের পত্র ঘিরে লেখকের স্মৃতি রচিত হয়েছে

অজিতকৃষ্ণ বসু—অঞ্জনা ভৌমিক—অতুলচন্দ্র বসু—অতুলানন্দ চক্রবর্তী—অমল হোম—অমিতা রায়—অমিয়া চৌধুরাণী—অশোক মৈত্র—আবদুল আজীজ আমান—আশু দে—ইন্দিরা দেবীচৌধুরাণী—কালিদাস নাগ—কালিদাস রায়—কিরণকুমার রায়—গীতশ্রী বন্দনা সেনগুপ্ত—গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য—গোপাল ঘোষ—গোপাল হালদার—চন্দ্রশেখর বেঙ্কট রামন্—জয়ন্তনাথ রায়—জয়ন্তী সেন—জাহান আরা বেগম—জীবনময় রায়—জ্যোতির্ময় ঘোষ—তপতী বিশ্বাস—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়—দিগিন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য—দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী—নলিনীকান্ত সরকার—নিখিলচন্দ্র দাস—নিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী—নীরদচন্দ্র চৌধুরী—নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়—পুলিন বিহারী সেন—পি. সি. সরকার—প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়—প্রমথ চৌধুরী—প্রমথনাথ বিশী—প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়—প্রেমেন্দ্র মিত্র—বনফুল—বনবিহারী মুখোপাধ্যায়—বারীন্দ্রকুমার ঘোষ—বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়—বিনয়কুমার সরকার—বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়—বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়—বিমলাকান্ত রায়চৌধুরী—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—মণীন্দ্রচন্দ্র সমাদ্দার—মণীষ ঘটক—মায়া বসু—মার্গারেট চ্যাটার্জী—মৈত্রেয়ী দেবী—রাজশেখর বসু—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—লীলা বন্দ্যোপাধ্যায়—লীলা মজুমদার—লীলা সিং—শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়—শশিশেখর বসু—শিবরাম চক্রবর্তী—শিশিরকুমার ভাদুড়ী—শীতলাকান্ত শীল—শোভা সেন—সতীনাথ ভাদুড়ী—সবিতা সেনগুপ্ত—সুধাকান্ত রায়চৌধুরী—সুধীরকুমার চৌধুরী—সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী—সৈয়দ মুজতবা আলী—হারীতকৃষ্ণ দেব—হেমলতা ঠাকুর।

পরিবেশক : রূপা অ্যাণ্ড কোং কলিকাতা-১২

পরিমল গোস্বামী রচিত

আধুনিক ব্যঙ্গ পরিচয়

মূল্য ছয় টাকা

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী বলেন—

বাংলা ভাষায় ব্যঙ্গ সাহিত্য সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ।

●

প্রেসিডেন্সি কলেজের বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক

শ্রীভবতোষ দত্ত বলেন—

আধুনিক ব্যঙ্গ পরিচয়ের ভূমিকাতে ব্যঙ্গের লক্ষণ যে রকম সুনির্দিষ্ট এবং পরিষ্কার করে বলা হয়েছে এমন আর কোন বইতে হয়েছে বলে জানি না।

পরিবেশক : নবগ্রন্থনা, ৮, কৈলাস বসু ষ্ট্রীট কলিকাতা-৬

কিন্তু এই অবস্থায় সেই আস্থা অক্ষুণ্ণ রাখা সম্ভব নয়। অর্থাৎ পূর্ব্বে পণ্ডিত নেহেরুর আমলে আসাম সরকার যেভাবে আইন বিরুদ্ধতাকারী গুণ্ডা ও দাঙ্গাবাজদিগকে কড়া শাসনে রাখার কার্য্যে অবহেলা করিয়াছিলেন; বর্ত্তমান ক্ষেত্রেও সেইভাবেই তাঁহারা কর্ত্তব্যের প্রতি দৃষ্টি না দিয়া সাম্প্রদায়িকতা দোষদুষ্ট হইয়া আইন ও শৃঙ্খলা রসাতলে পাঠাইতেছেন।

২০ অক্টোবর তারিখের যুগ শক্তিতে যে খবর বাহির হয় তাহাতে দেখা যায় যে সংখ্যালঘুদিগের উপর আক্রমণ প্রবলভাবেই চালিত রহিয়াছে:

ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। এবারের দাঙ্গায় এ পর্য্যন্ত ১৪ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে সরকারী সূত্রের খবরে প্রকাশ। গৌহাটী, ডিব্রুগড়, ধুবড়ী, নওগাঁ, হোজাই, ডুলিয়াজান প্রভৃতি শহরে সান্ধ্য আইন জারী করা হয়। এখন উত্তেজনা প্রশমিত হয়েছে বলে সরকার পক্ষ দাবী করছেন যদিও বেসরকারী মতে যথেষ্ট উত্তেজনা এখনো বিদ্যমান। জানা যায় যে সাম্প্রতিক দাঙ্গায় উপক্রত এলাকাগুলিতে বিশেষতঃ নওগাঁ জেলায় সংখ্যালঘুদের প্রতি অমানুষিক আচরণ করা হয়। শহরাঞ্চলে এবং গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে অবাধ ভাবে লুণ্ঠন, হত্যা, অগ্নি-সংযোগ প্রভৃতি সংঘটিত হয়। প্রশাসন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন। ৬০-৬১ সনের দাঙ্গার চেয়েও এবারের দাঙ্গা বীভৎসতর বলে সাধারণ্যে ধারণা সৃষ্টি হয়েছে।

করিমগঞ্জের ডাঃ মনীন্দ্রচন্দ্র দাসের কনিষ্ঠ পুত্র ডাঃ মনীষী দাস ডিব্রুগড়ের কাছে বকপাড়া বাগানে দুষ্কৃতকারীদের আক্রমণের ফলে নিহত হন। মহাসপ্তমীর সন্ধ্যা যখন সবে আনন্দরোলে উদ্ভাসিত, তখনই করিমগঞ্জে এই অবিশ্বাস্য দুঃসংবাদ এসে পৌঁছে এবং সারা শহরে তীব্র শোকমগ্ন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। দুর্গোৎসবের আমোদ এখানেই স্তিমিত হয়ে যায়। সর্বজনপ্রিয় যুবা ডাঃ মনীষী দাস ডিব্রুগড় মেডিকেল কলেজে রেজিষ্ট্রার ছিলেন। তাঁর জ্যাঠামহাশয় শ্রীসতীন্দ্র দাসও গুরুতরভাবে আহত হন। ঐ ঘটনা সম্পর্কে সত্বর তদন্ত কমিশন গঠন করা উচিত বলে অনেকে মনে করেন।

ভারতে একনায়কত্ব ও সর্ব্বশক্তিধারী শাসন-ব্যবস্থার আশঙ্কা

অনেক বিশেষজ্ঞের মতে ভারতের শাসকগোষ্ঠী যেভাবে স্বেচ্ছাচার, প্রীতি ও জনমত সম্বন্ধে ঔদাসিন্য প্রদর্শন করিয়া দেশ-শাসনের ব্যবস্থা করিতেছেন তাহাতে তাঁহাদের একনায়কত্ব ও সর্ব্বশক্তিমান্ শাসক-গোষ্ঠী সৃজন চেষ্টারই লক্ষণ পূর্ণভাবে দেখা যাইতেছে। সাধারণতন্ত্র অবশ্যই বর্ত্তমান আছে; কিন্তু শাসকদিগের ক্ষমতা এতই প্রবল যে তাঁহারা সহজেই সাধারণতন্ত্রের কল-কব্জা নিজেদের ইচ্ছামত চালাইয়া জনসাধারণের প্রতিনিধিদিগকে কার্য্যতঃ শাসকদিগের প্রতিভূ হিসাবে উপস্থিত রাখিয়া নিজেদের ইচ্ছামত সকল কার্য্য করাইয়া লইতে সক্ষম হইতেছেন। সম্প্রতি সংবিধানের যে সকল সংশোধন বিধি ভারতীয় সাধারণতন্ত্র সরল চিত্তে মানিয়া লইয়াছে তাহাতে প্রমাণ হয় যে তাহারা সংবিধানের উপর নির্ভর না করিয়া লোকসভার উপরেই অধিক নির্ভরশীল এবং এই মনোভাব জনসাধারণের স্বাধীনতা সংরক্ষণের কার্য্যে বিশেষ সহায়ক হইতে পারে না। স্বাধীনতার ভিত্তি যে সকল অধিকারের ভিতরে প্রতিষ্ঠিত সেইসকল সাংবিধানিক অধিকার সুরক্ষিত না রাখিয়া শুধু ভোটের উপর নির্ভর করিয়া কোন সাধারণতন্ত্র নিজ স্বরূপ রক্ষা করিতে পারে না।

আচার্য্য কৃপালনী "স্বরাজ্য" পত্রিকায় সোসিয়ালিজম্-এর নামে স্বৈরাচারে নিমজ্জিত হইয়া যাইবার সম্ভাবনা বিচার করিয়া বলিয়াছেন যে যাহা ঘটিতেছে তাহাতে আমরা দেখিতেছি যে শাসকদিগের লক্ষ্য সর্ব্বশক্তিমান্ শাসন-ব্যবস্থা করিয়া ক্রমে ক্রমে সাধারণতন্ত্রের সকল অবয়ব নিজেদের ইচ্ছামত যাহাতে নড়ে চড়ে সেই ব্যবস্থা করা। কংগ্রেসে ও সর্ব্বভারতীয় কংগ্রেসী কর্ম্মসভায় আজকাল সকল প্রস্তাব অবাধে

কোনও প্রতিবাদ উত্থাপিত না হইয়া গৃহিত হইয়া থাকে। এইরূপ মতের অনৈক্যের অভাব এমন কি মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বকালেও কখনও দেখা যায় নাই। অহিংস অসহযোগ সংগ্রামকালেও নানা মত প্রকাশিত হইত। যদি কোন রাষ্ট্রীয় দল নিজের দলের অভ্যন্তরের কার্য্যে দলীয় জনগণের স্বাধীন মত প্রকাশ ইচ্ছা জাগ্রত রাখিতে না পারে তাহা হইলে সেই দল দেশবাসীর মতপ্রকাশ-ইচ্ছা সরলভাবে জীবন্ত রাখিবে বলিয়া কেহ আশা করিতে পারে না। বিরুদ্ধমত কেহ প্রকাশ করিলেই যদি তাহার উপর দলপতিদিগের রক্তচক্ষুর দৃষ্টি পড়ে ও চাপ দিয়া তাহাকে "জো হুকুম" বাদ অনুসরণে বাধ্য করা হয় অথবা দল হইতে বহিষ্করণ করিবার ব্যবস্থা হয়, তাহা হইলে সোসিয়ালিজম্ যে পথে আসে স্বাধীনতা সেই পথেই দেশত্যাগ করে। সুতরাং যাহারা সাধারণতন্ত্রে বিশ্বাসী এবং ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে পূর্ণরূপে বজায় রাখিয়া তবেই সোসিয়ালিজম্ আনিতে ইচ্ছুক তাহাদের উচিত দলবদ্ধভাবে শাসকগোষ্ঠীর স্বৈরাচারে বাধা দিয়া সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা দৃঢ় করা ও যথাকালে ন্যায়সঙ্গতভাবে সমাজবাদকে নিজের উচ্চ আসনে স্থাপন করা। বহুদেশেই সাধারণতন্ত্র ও সমাজবাদ একত্রে গড়িয়া উঠিয়াছে এবং সেইসকল দেশে কম্যুনিজমের আবির্ভাব সম্ভব হয় নাই। যথা অষ্ট্রেলিয়া নিউজিল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে। ইয়োরোপেও বহুদেশে কম্যুনিজম্ বর্জ্জিতভাবে সমাজবাদ যথাযথভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে। ভারতেও তাহা সম্ভব। শুধু যদি কংগ্রেসী কম্যুনিজম্ না বাড়িতে দেওয়া হয়।

দেশ-বিদেশের কথা

বারমিংহামে আন্তর্জাতিক সম্বন্ধ সপ্তাহ

এই বৎসর বারমিংহামে গত বৎসরের মতই আন্তর্জাতিক সম্বন্ধ গঠন সপ্তাহ পালিত হইতেছে। এই সপ্তাহে যে ছাপ্পান্ন দফা কার্য্যসূচি নির্ণয় করা হইয়াছে তাহাতে বহু জাতি ও কৃষ্টির পরিচয় সকলে পারস্পরিক ভাবে পাইবেন। গান বাজনা হইতে আরম্ভ করিয়া ধর্ম্মালোচনা অবধি নানা বিষয়েরই এই সপ্তাহে অবতারণা হইবে। বারমিংহাম সহরে বহু জাতি ও সম্প্রদায়ের নিবাস। বৃটেনের নানা স্থান হইতে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মানুষ এই সহরে আসেন এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মানুষও আসেন অনেকে। এই সপ্তাহে সকলে সকলের আচার ব্যবহার রীতিনীতি ও ঐতিহ্যের সহিত পরিচিত হইবার সুযোগ লাভ করিবেন এবং এই কারণে এই সপ্তাহটি ক্রমে ক্রমে অধিক ভাবে সকলের দ্বারা আদৃত হইতেছে।

অক্টোবর ২১ তারিখে বাঙ্গালী সংঘ বঙ্গীয় আচার ব্যবহার প্রদর্শক একটি ব্যবস্থা করেন। একটি চলচ্চিত্র ও ঐদিন প্রদর্শিত হয়। পরের রবিবারে বারমিংহামের হিন্দুগণ দশহারা অনুষ্ঠান করেন। ঐ সপ্তাহে জামাইকা হইতে আগত ব্যক্তিগণ নিজেদের শিল্পকলা সমাগত জনগণকে দেখাইবেন স্থির হয় ও একদিন বিশ্বের সকল ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে কিছু কিছু পাঠ করিয়া আন্তর্জাতিক মৈত্রী স্থাপনার্থে ২৪ ঘণ্টা ব্যাপী প্রার্থনা করা হইবে নির্দ্ধারিত হয়। বুধবার ২৫শে অক্টোবর ইংরেজীতে শকুন্তলা নাটক অভিনয় ব্যবস্থা হয় এবং এই প্রাচীন ভারতীয় উপাখ্যানের উপর রচিত নাটকের অভিনেতা অভিনেত্রীগণ ছিলেন বারমিংহামেরই একটি স্কুলের ছাত্রছাত্রী।

বৃহস্পতিবার একটি সভার আয়োজন করা হয় যেখানে উচ্চ শিক্ষিত শিক্ষার্থীগণ কর্ম্মপরিচালনা নিয়ন্ত্রণ বিধি অনুসারে বহুজাতি একত্রে থাকিলে পরিচালনা পদ্ধতির নিয়মাদির বৈশিষ্ট আলোচনা করেন। অক্টোবর ২৮শে শনিবার শিখেদের গুরুদ্বারে শিখধর্ম্মের ইতিহাস, ঈশ্বরবাদের স্বরূপ ও ধর্ম্মবিশ্বাস সম্পর্কিত ঘটনাবলীর আলোচনা করা হয়।

শেষদিনে অর্থাৎ রবিবারে নাগরিক সভাগৃহে সম্মিলিত জাতি সংঘের দ্বারা ব্যবস্থিত ভাবে নানা ধর্ম্ম, জাতি ও কৃষ্টির সমাবেশে ঐ নগরের জীবন ধারা কিরূপে প্রভাবান্বিত হইতেছে সেই বিষয়ের সম্যক আলোচনা করা হয়।

ভিয়েৎনামে শান্তি

ভিয়েৎনামে অতঃপর শান্তি প্রতিষ্ঠা হইবে। ভিয়েৎনামে যে যুদ্ধ বা শান্তির অভাব তাহা ঠিক কি ভাবে চলিতেছে তাহা না জানিলে শান্তি স্থাপনের কথাও পরিস্কারভাবে বোধগম্য হইতে পারে না। শুধু আমেরিকান সৈন্যবাহিনী ভিয়েৎনাম হইতে চলিয়া যাইলেই ঐ দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে একথা কেহ জোর করিয়া বলিতে পারে না; কারণ আমেরিকান সৈন্য বাহিনী চলিয়া যাইলেও উত্তর ভিয়েৎনাম যুদ্ধ থামাইতে নাও পারে। যুদ্ধ চালাইতে সদা প্রস্তুত আছে উত্তর ভিয়েৎনামের সৈন্যগণ, যাহাদের মধ্যে বহু সেনা দক্ষিণ ভিয়েৎনামে অনুপ্রবেশ করিয়া নানা স্থানে যুদ্ধ চালাইতেছে। এই সকল সৈন্য আমেরিকান সেনাদল চলিয়া যাইলেই যুদ্ধ বিরতিতে আত্মনিয়োগ করিবেই এইরূপ কথা কে বলিতে পারে? আমাদিগের মনে হয় উত্তর ভিয়েৎনামের সৈন্য বাহিনী আমেরিকান সৈন্যগণ পুরাপুরি চলিয়া যাইলেও যুদ্ধ বরাবরের মত বন্ধ করিবে না। নিজেদের জোর বাড়াইবার চেষ্টা চালাইয়া চলিবে বলিয়াই মনে হয়। এই সকল উত্তর ভিয়েৎনামী সৈন্য-

দিগের সহায়ক যে ভিয়েৎকং বাহিনী আছে তাহাদের কথাও মনে রাখা কর্ত্তব্য। বিপরীত পক্ষের যে সেনাদল অর্থাৎ দক্ষিণ ভিয়েৎনামের যাহারা সরকারী সৈন্য। তাহারা যুদ্ধের কথা যতক্ষণ ভিয়েৎকং আছে ততক্ষণ কোনমতেই ভুলিতে পারে না। তাহারা যেখানে যেখানে উত্তর ভিয়েৎনামের সৈন্য অথবা ভিয়েৎকং এর ঘাঁটি আছে সেই সকল স্থানে উপযুক্ত সংখ্যায় উপস্থিত থাকিতে অন্যথা করে না। সুতরাং আমেরিকান সৈন্য ভিয়েৎ-নাম হইতে সরিয়া যাইলে আমেরিকায় শান্তি হইলেও ভিয়েৎনামে শান্তি হইবে বলিয়া মনে হয় না।

এই যুদ্ধ বিভিন্ন আকারে প্রকারে ১৯৪৫ হইতেই চলিয়া আসিতেছে। আমেরিকা এই যুদ্ধে গভীর ভাবে জড়িত হইয়া পড়িয়াছে ১৯৬১ খৃঃ অব্দ হইতে। এখন যদি আমেরিকান সৈন্য ঐদেশ হইতে চলিয়া যায় তাহা হইলে আমেরিকার ভিয়েৎনাম অভিযান ১১ বৎসর কাল চলিল ধরিতে হইবে। এই এগার বৎসরে আমেরিকার সৈন্য মারা গিয়াছে ৪৫,৮৮৪ জন। আহত হইয়াছে ৩০৩,৪১৫ জন। নিখোঁজ ১১৫৪ জন। বন্দী হইয়াছে ৫৪৫ এবং সৈন্য ব্যতীত অপর আমেরিকান মরিয়াছে ১০,২৮১। দক্ষিণ ভিয়েৎনাম হারাইয়াছে ১৫৭৯১১ জন সৈন্য। মৃত ও আহত হইয়াছে তাহাদের ৪১৭১৬৭ জন। মৃত সাধারণ নাগরিকের সংখ্যা ৪২১০০০ (আনুমানিক)। আমেরিকানদিগের শত্রু পক্ষের মৃতের সংখ্যা ৯০০,০০০। আমেরিকা উত্তর ভিয়েৎনামকে নিজ দেশের বিধ্বস্ত অংশ প্রভৃতি ঠিকভাবে চালিত করিয়া লইবার জন্য অর্থ সাহায্য করিবেন বলিয়া আশা দিয়াছে। এই অর্থ সাহায্য পাইলে উত্তর ভিয়েৎনাম বিশেষ ভাবে উপকৃত হইবে। কিন্তু বিষয়টি অনেকদূর অবধি অজানার কুয়াশাচ্ছন্ন। তবে মনে হয় যে ক্ষেত্রে উত্তর ভিয়েৎনামের চীন ও রুশিয়ার সহিত মতবাদের কুটুম্বিতা আছে ও যে ক্ষেত্রে আমেরিকা চীন ও রুশিয়াকে খুসী করিয়া চলিতেছে; সে ক্ষেত্রে আমেরিকার পক্ষে উত্তর ভিয়েৎনামকে যেন-তেন প্রকারে সাহায্য করিবার চেষ্টা করাই স্বাভাবিক।

যুদ্ধ বিধ্বস্ত উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েৎনাম বিগত পঁচিশ বৎসরে দেড় কোটি টন উৎকট বিস্ফোরক আঘাতে ছিন্ন ভিন্ন হইয়াছে। দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধে আমেরিকা এত অধিক পরিমান বোমা বর্ষণ করে নাই। এই বিরাট বোমা বর্ষণের শতকরা ৮০ ভাগ দক্ষিণ ভিয়েৎনাম হইতে উত্তর ভিয়েৎনামের সৈন্য ও ভিয়েৎকং বিদ্রোহীদিগকে তাড়াইবার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে। দক্ষিণ ভিয়েৎনামে এবার মাথা পিছু ৫০০ পাউণ্ড বোমা পড়িয়াছে ও জন সংখ্যার মাথা পিছু ১৩৩৩ পাউণ্ড বোমার হিসাব দেখা যায়। উভয় পক্ষে অর্থাৎ উত্তর দক্ষিণ ভিয়েৎনামে সংযুক্ত ভাবে ১৫ লক্ষ মানুষ প্রাণ হারাইয়াছে ও আহত হইয়াছে আরও অনেক অধিক সংখ্যক লোক। বোমার তাড়নায় সর্ব্বত্র জনগণ ক্রমাগত পলাইয়া প্রাণরক্ষা চেষ্টা করিয়াছে এবং ঘুষ, চুরী, কালোবাজার, নেশার খোরাক সরবরাহ ও চরিত্র হীনতা প্রবল বন্যায় দেশের বক্ষপ্লাবিত করিয়াছে। কিন্তু জন সংখ্যা ইহা সত্ত্বেও বাড়িয়া চলিয়াছে। উভয় দেশেরই লোকসংখ্যা ১৯৬৫র তুলনায় ২০ লক্ষ করিয়া বৃদ্ধি পাইয়াছে। উভয় ভিয়েৎনামেরই চাষবাস ও অন্যান্য কাজ কারবার অর্থকরীভাবে উন্নত অবস্থায় অবস্থিত আছে ও যুদ্ধ থামিলে দ্রুত উন্নতি লাভ করিবে বলিয়া সকলের বিশ্বাস।

আমেরিকার সৈন্য ভিয়েৎনাম ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইলে দক্ষিণ ভিয়েৎনাম কি অবিলম্বেই কম্যুনিষ্ট হইয়া যাইবে? দক্ষিণ ভিয়েৎনামের অনেকাংশ ভিয়েৎকং দলের কবলে আছে কিন্তু সেই সকল অঞ্চলের লোক সংখ্যা খুবই অল্প। সুতরাং হঠাৎ কম্যুনিষ্ট রাজত্ব স্থাপন সম্ভাবনা দক্ষিণ ভিয়েৎনামে বিশেষ নাই। দক্ষিণ ভিয়েৎ-নামবাসী জনগণ কম্যুনিজমে বিশ্বাস করে না এবং তাহারা ব্যক্তিগত ও আঞ্চলিক স্বাধীনতা খর্ব্ব করিয়া কোনও প্রবল শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকারের প্রভুত্ব সহ্য করিতে সহজে প্রস্তুত হইবে না বলিয়াই মনে হয়।

বদ্রিনাথ মন্দির ও অলকানন্দা
রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী অঙ্কিত চিত্র হইতে
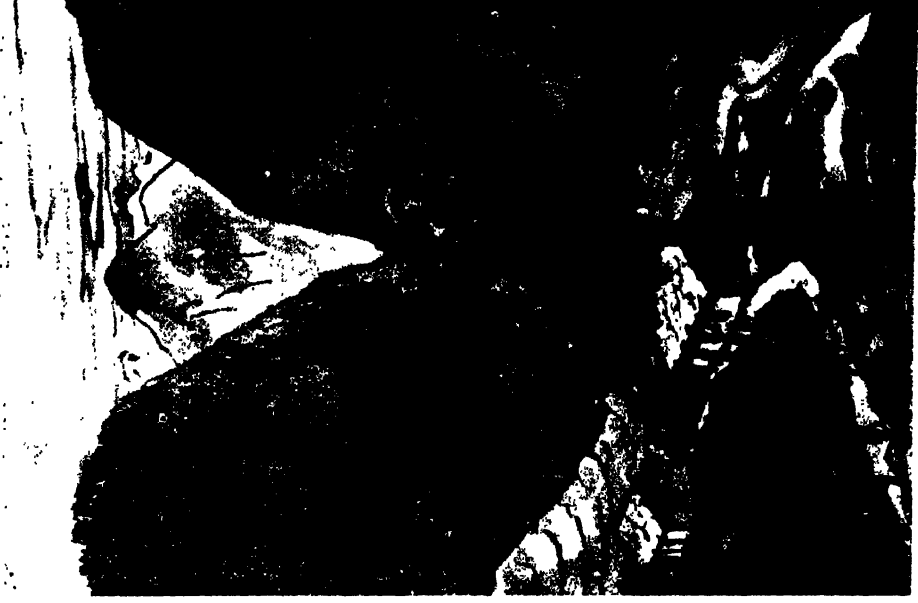
"লাংগাসো"র একটি পাঠশালা ও চটি
রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী অঙ্কিত চিত্র হইতে

ঃঃ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ঃঃ

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৭২তম ভাগ
দ্বিতীয় খণ্ড | পৌষ, ১৩৭৯ | ৩য় সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

কলিকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন

পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণের এইবার একটা বিশেষ সুযোগ প্রাপ্তি ঘটিবে যে তাঁহারা কংগ্রেসের মহা মহারথীদিগকে নিজেদের নিকটে দেখিতে পাইবেন। ইঁহারা কংগ্রেসের আদর্শ নিজেদের জীবনে পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিয়াছেন বলিয়া আমাদিগের বিশ্বাস এবং চিন্তা ও কার্য্যে ইঁহারা তেমনি করিয়াই ঐ সকল আদর্শ অনুসরণে জীবন পথে চলিয়াছেন যাহাতে ইঁহাদিগকে কংগ্রেসের আদর্শের প্রতীক বলিলে অন্যায় করা হইবে না। কংগ্রেসের অধিবেশনের জন্য যে শহর নির্ম্মাণ করা হইয়াছে তাহা প্রকৃষ্টরূপে ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতার সহিত সুর ও ছন্দ মিলাইয়া গঠিত হইয়াছে। বাঁশ, খড় ও মাটি দিয়াই সকল গৃহ প্রভৃতি নির্ম্মাণ করা হইয়াছে এবং এই সকল কার্য কংগ্রেসের সংযম ও মিতব্যয়িতার আদর্শ রক্ষা করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছে। যাঁহারা ভারতবর্ষের নানান কেন্দ্র হইতে এই অধিবেশনে যোগদান করিতে আসিবেন তাহারা এইখানে কোনও বিলাসিতার আভাসও দেখিতে পাইবেন না। খাওয়া থাকা ইত্যাদির গরীব দেশের পক্ষে উপযুক্ত সাদাসিদা-ভাবেই ব্যবস্থা করা হইবে। পর্ণকুটীরে বাস করিয়াই প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা তাহার উচ্চ শিখরে উঠিতে সক্ষম হইয়াছিল এবং এখনও সেই আদর্শই বজায় রাখিয়া চলিবার চেষ্টা হইতেছে। সুতরাং আমরা কংগ্রেসের এই অধিবেশন হইতে অন্ততঃ এই শিক্ষা লাভ করিব যে আদর্শবাদী কর্ম্মী ব্যক্তিদিগের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ পদ্ধতি কিরূপ হওয়া উচিত। পণ্ডিত নেহেরু তাঁহার ভারত শাসন পরিচালনা কালে কিছুদিন কংগ্রেসের আদি ও অকৃত্রিম আদর্শবাদ ভুলিয়া কারখানা গঠন ও শহরে সভ্যতার পূর্ণতর বিকাশের দিকে মন দিয়াছিলেন। তখন বহু সহস্র কোটি টাকা ঋণ করিয়া

ভারতের অর্থ-নৈতিক উন্নতির জন্য ব্যয় করা হইয়াছিল। ইহার ফলে ভারতের কারখানাজাত বস্তু উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি হইয়া থাকিলেও ভারতীয় মানুষের সুখ ও উন্নততর মানে জীবন নির্ব্বাহ ক্ষমতা বৃদ্ধি হয় নাই। সুতরাং কংগ্রেসের নবজন্ম লাভের পরে তাহার অর্থনৈতিক আদর্শ কিছুটা নূতন পথে চলিবে বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। সেই আদর্শ উপলব্ধি কিভাবে হইবে তাহার কিছু কিছু পরিচয় কংগ্রেসের বর্ত্তমান নেতাদিগের নিকট পাওয়া যাইবে আশা করা যায়। সেই জন্য তাঁহাদিগের সামীপ্য পশ্চিমবঙ্গের নরনারীর সহিত কংগ্রেসের সহিত ঘনিষ্ঠতা গভীরতর করিবার পক্ষে নিশ্চয়ই কার্য্যকারী হইবে।

কংগ্রেসের প্রতিনিধিগণের খাওয়া থাকার জন্য মাথা পিছু যে অর্থ ব্যয় করা হইবে তাহা হইতে বুঝা যাইবে যে গরীব দেশের মানুষের জীবন নির্ব্বাহের খরচ কিরূপ হওয়া উচিত। তাঁহাদিগের জন্য যে সকল গৃহ নির্ম্মাণ করা হইতেছে তাহার খরচ হইতে বুঝা যাইবে মিত-ব্যয়িতার আদর্শ বজায় রাখিয়া গৃহ নির্ম্মাণ করিলে অতি সস্তায় নির্ম্মিত পর্ণকুটীরের জন্য কত টাকা ব্যয় হয়। এবং সেই খরচের সহিত মিলাইয়া দেখিলে বুঝা যাইবে শহরের গৃহ প্রভৃতির জন্য যে নিয়ম প্রবর্ত্তন চেষ্টা চলিতেছে তাহা ন্যায্য কি না। কারণ, যদি দেখা যায় যে পর্ণকুটীরের এক-একটি ঘর নির্ম্মাণ করিতে কোনও নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ ব্যয় হইয়াছে তাহা হইলে পাকা ঘর নির্ম্মাণ করিতে কি ব্যয় হইতে পারে তাহা সহজেই অনুমেয় হইবে। শহরে যাঁহারা বাস করেন তাঁহাদের কতটা স্থান লাগে স্বচ্ছন্দ্যে বাস করিতে তাহাও বিশেষজ্ঞদিগের সাহায্যে হিসাব করা চলিবে। এক পরিবারে যদি স্বামী, স্ত্রী, দুইটি শিশু ও দুইজন স্কুল কলেজের ছাত্র ছাত্রী বাস করে ও তৎ সঙ্গে মাতা-পিতা ও বিধবা পিতৃস্বসা থাকেন তাহা হইলে অনায়াসেই অনেকগুলি ঘরের প্রয়োজন হইতে পারে এবং সেইরূপ গৃহের সহিত যদি ৮।১০ কাঠা জমি থাকে তাহা হইলে কলিকাতার পার্ক স্ট্রীটের দক্ষিণে শুধু জমির মূল্যই ৪।৫ লক্ষ টাকা হইতে পারে। এক বর্গফুট গৃহ নির্ম্মাণের খরচ যদি পঞ্চাশ হইতে পঁচাত্তর টাকা বর্গফুট হয় তাহা ৮।১০টি ছোট বড় ঘর থাকিলে ২৫০০।৩০০০ বর্গফুট স্থান জুড়িয়া গৃহ নির্ম্মাণ করাও সাধারণতঃ হইতে পারে ও তাহার মূল্যও ২।৩ লক্ষ টাকা হওয়া অসম্ভব নহে। বোম্বাই ও দিল্লীতে জমির মূল্য আরও অধিক হইতে পারে এবং দিল্লীতে বহু গৃহের সহিতই ১০ কাঠার অধিক জমি থাকে। অর্থাৎ একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী, ডাক্তার অথবা আইনজীবীর পক্ষে ১০ লক্ষ টাকা মূল্যের গৃহে বাস করা কিছু অসম্ভব নহে। এবং সেই গৃহ আকারে প্রাসাদতুল্যও হইবে না। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে বাসস্থান কিছুটা আকারে বড়ই হয় ও স্বাস্থ্যের জন্য সেইরূপ হওয়াই বাঞ্ছনীয়। আধুনিক কালে ওঠা নামার "লিফ্‌ট" ও গৃহ ঠাণ্ডা রাখার ব্যবস্থাও সাধারণ কথা হইয়া দাঁড়াইতেছে। এই সকল কথা বিবেচনা করিয়া তবেই গৃহাদির মূল্য বা আকারের সীমা নির্দ্ধারণ ব্যবস্থা করা সমীচীন হয়। মনে হয় কংগ্রেসের অধিবেশনে এই সকল কথা উত্থাপিত হইতে পারে। যদি হয় তাহা হইলে আরও দেখা কর্ত্তব্য হইবে যে দিল্লীতে লোকসভা রাজ্যসভার প্রতিনিধিগণ কিরূপ গৃহে বাস করেন। আমরা যতটা দেখিয়াছি, দিল্লীর ঐ জাতীয় গৃহগুলির সহিত বহুস্থলে দুই তিন বিঘা জমিও সংলগ্ন থাকে। এবং নির্ম্মিত স্থানও ৩০০০।৪০০০ হাজার বর্গফুট হয়। লোক-দেখান ভাবে বসবাস করা গরীব দেশে উচিত নহে অতি সত্য কথা। কিন্তু যেখানে দারিদ্র্য দূর করাই দেশ-শাসকদিগের আদর্শ সেখানে দারিদ্র্যের চিরস্থিরতা মানিয়া লইয়া চলাও ঠিক নহে। সামাজিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য যতটা হওয়া উচিত যে যে স্তরের লোকের জন্য, সেই সকল জীবন নির্ব্বাহের মান অনুসরণ করিয়াই অর্থ-নৈতিক ক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন।

সকল ক্ষেত্রেই যে মান উন্নততম তাহাই নির্দ্ধারণ করিয়া সকল মানুষকে তাহার দিকে লইয়া যাওয়ার চেষ্টা করা প্রয়োজন। দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা, দুর্নীতি-পরায়ণতা, স্বাস্থ্যহীনতা, সামাজিক রীতিনীতির

উৎকর্ষের অভাব—ইত্যাদি অনেক কিছুই ভারতবর্ষে বর্ত্তমান রহিয়াছে ও জনসংখ্যার মধ্যে অধিকাংশ মানুষই ঐ সকল অভাব জর্জ্জরিত। জাতীয় উন্নতি সাধন করিতে হইলে আমরা যাহারা উন্নত নহে তাহাদের অনুকরণ করিলে জাতি চিরকালই অনুন্নত থাকিয়া যাইবে। সুতরাং জনগণের সহিত ঘনিষ্ঠতা রক্ষা করিয়াও দেশনেতাগণ উন্নততর মান প্রতিষ্ঠা চেষ্টা করিতে সক্ষম হইতে পারেন এবং সেইরূপ চেষ্টা করাই একান্তভাবে কর্ত্তব্য। অন্ধকার গহ্বরের নিম্নতমভাগে দৃষ্টি নিবদ্ধ না করিয়া আকাশের তারার দিকেই চাহিয়া সম্মুখে অগ্রসর হওয়া উন্নতির পক্ষে উপযুক্ত পন্থা।

দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার অবস্থা

ভারত সরকার যদিও নিজেদের সর্ব্ব বিদ্যার জ্ঞান ও সকল কর্ম্ম কৌশলের পূর্ণ অধিকার সম্বন্ধে নিঃসন্দেহে আস্থাবান্, তাহা হইলেও রাজস্ব দিয়া যাহারা ভারত সরকারের পুষ্টি সাধন করিয়া থাকে তাহারা অনেক সময়ই ভারত সরকারের কার্য্যকলাপ দেখিয়া হতাশ হইয়া পড়েন। কারণ ভারত সরকারের দ্বারা পরিচালিত বহু প্রতিষ্ঠানই বারে বারে অকারণে অথবা অল্প কারণে লোকসানের সৃষ্টি করিয়া গরীব দেশের গরীব রাজস্ব দাতাদিগের কষ্ট-অর্জ্জিত অর্থের অপব্যয়ের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়া থাকে। সম্প্রতি দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানায় যে ধর্ম্মঘট হইয়া অনেকদিন চলিয়াছিল তাহাতে ৩০০০০ টনের অধিক ইস্পাত উৎপাদন হইতে পারে নাই। ইহার জন্য কত লোকসান হইবে তাহা বলা সহজ নহে, তবে ইস্পাতের মূল্য যদি ৫০০ শত টাকা টনও ধরা হয় তাহা হইলে ৩০০০০ টন ইস্পাতের মূল্য হইবে ১৫০০০০০০ দেড় কোটি টাকা। শ্রীযুক্ত ভুলপুলে, যিনি পূর্ব্বে ছিলেন একজন শ্রমিক আন্দোলনের পাণ্ডা ও এখন হইয়াছেন দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার পরিচালক, তিনি নানা প্রকার পরিচালনা নীতি আলোচনা করিয়াও কর্ম্মীদিগের সহায়তা লাভে সক্ষম হইতেছেন বলিয়া মনে হয় না। দুর্গাপুরের কর্ম্মীগণ পরিচালকদিগের সহিত একমত হইতে পারিতেছেন বলিয়া মনে হয় না। ইস্পাত নগরের আবহাওয়া চাঞ্চল্যপূর্ণ এবং কখন যে কি হইবে তাহা কেহ বলিতে পারিতেছে না। ভারত সরকারের ইস্পাত কারখানার পরিচালনা ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ ঠিক কিভাবে চলিলে সরকারী ইস্পাত কারখানাগুলি যথাযথ উৎপাদন কার্য করিতে পারিবে তাহা স্থির নিশ্চয় জানিতে পারিতেছেন বলিয়া মনে হয় না।

কথার কথা

যে ধরণের কথা বলিলে আশপাশের মুখ চাহিয়া অপেক্ষমান ব্যক্তিরা খুশী হয় সেইরূপ কথা বলার কোন সত্যকার মূল্য থাকে না। সেগুলি হইল লোক ভুলান কথার কথা। একজন শাসক গোষ্ঠীর মাতব্বর ব্যক্তি সম্প্রতি একটি কারখানায় গিয়া শ্রমিকদিগের সম্মুখে বলেন যে ঐ কারখানার অর্দ্ধেকের অধিক অংশ সরকার বাহাদুরের নিজস্ব হইয়া গিয়াছে; সুতরাং ঐ কারখানা এখন শ্রমিকদিগেরই নিজস্ব হইয়া গিয়াছে। কথাটা শ্রমিকদিগের শুনিতে খুবই ভালই লাগিয়াছে নিঃসন্দেহে কিন্তু কথাটা কতটা সত্য তাহা বিচার করিলে দেখা যাইবে যে রেলওয়ে, পোষ্ট টেলিগ্রাফ প্রতিষ্ঠান, পোর্ট কমিশনার ও সরকারী ইস্পাত কারখানাগুলি যতটা শ্রমিকদিগের নিজস্ব সম্পত্তি; ঐ উপরোল্লিখিত কারখানাটিও প্রায় সেইরূপই শ্রমিকদিগের একান্তভাবে নিজের সম্পদ। দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানাটি শতকরা একশত ভাগ শ্রমিকদিগের বলিলে প্রশ্ন উঠিবে, তাহা হইলে সেই কারখানায় প্রত্যহ শ্রমিকগণ কাহার বিরুদ্ধে হরতাল করে? নিজের বিরুদ্ধে কি কোনও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি নিজেই হরতাল করে? সরকারী কারখানাগুলিতে যে সকল "মাঙ্গ" পেশ করা হয় সেই মাঙ্গগুলি কি শ্রমিকগণ নিজের উপর নিজেই দাবী করিয়া থাকে? তাহা যদি হয় তাহা হইলে শ্রমিকগণ নিজেরাই ত তাহা মানিয়া লইতে পারে। সেইরূপ পাওনার দাবী আসামাত্র কেন মঞ্জুর হইয়া যায় না? নিজেদের দাবী

নিজেদেরই উপরে এবং মজুর করিবার মালিকও নিজেরাই। তাহা হইলে দাবী না-মঞ্জুর হইয়া পড়িয়া থাকে কেন? আর একটা কথা হইল আসল কথা। সরকারী অর্থে যদি কারখানার অধিকাংশ অংশ কেনা হইয়া যায় তাহা হইলে কারখানা সরকারী হইতে পারে কিন্তু শ্রমিকদিগের নিজস্ব হইয়া যাইতে পারে না। কারণ সরকারী সকল অর্থ শ্রমিকদিগের সম্পদ নহে। বহু টাকা সরকারের নিকট আসে যাহা শ্রমিকদিগের অর্জ্জিত অর্থের অংশ নহে। খাজনার টাকা, স্ট্যাম্প বিক্রয়ের টাকা, জাহাজী আমদানি মালের শুল্কের টাকা, আবকারীর সূত্রে পাওয়া টাকা—বহু কিছু আছে যাহা শ্রমিকদিগের উপার্জ্জিত অর্থ বা তাহার অংশ নহে। কারখানার অংশ ক্রয় করিবার টাকা অনেক সময় ঋণের টাকা হইতেও লওয়া হয় ও হইতে পারে। শ্রমিকগণ সরকারী ভাবে গঠিত অথবা ক্রীত কারখানার মালিক এ কথাটা একটা ভ্রমাত্মক কথা। শ্রমিকগণ অথবা কারখানার উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীগণ কারখানার মালিক নহে, শুধু বেতনভোগী কর্ম্মী মাত্র। ভারত সরকারের নিজ অর্থে গঠিত কারখানা ও অন্যান্য অর্থ-নৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির মালিক সংখ্যাগুরু রাষ্ট্রীয় দল-গুলিও তাহাদের মনসবদার আমলাগণ। জাতি, সমাজ, জনগণ, শ্রমিক ইত্যাদির নাম লওয়া হয় বাজারে সরকারের সুনাম প্রচারার্থে। মূলতঃ সরকারের সকল শক্তি ও সম্পদ জাতির উপর প্রতিষ্ঠিত হইলেও কার্য্যতঃ জাতি সেইহেতু মালিকানার কোনও সুখ সুবিধা সম্ভোগ করিতে কখনও পাইয়া থাকেন বলিয়া মনে হয় না।

বৃহৎ বৃহৎ কারখানায় শ্রমিক বলিতে যাহাদের কথা উঠে ভারতবর্ষে সেই জাতীয় কর্ম্মীর সংখ্যা মোট জন-সংখ্যার শতকরা ৫ জনও হইতে পারে না। সকল ব্যক্তির অর্থে গঠিত যাহা তাহা শুধু সকল ব্যক্তির শতকরা পাঁচজনের অধিকারে থাকিবে ইহাও চিন্তা করিবার কোন কারণ নাই।

সরকারী ইস্পাত কারখানাগুলির পরিচালনা ব্যবস্থা

কেন্দ্রীয় ইস্পাত মন্ত্রীর দফতর হইতে যে সকল ইস্পাত উৎপাদন পরিমাণের কথা সেপ্টেম্বরের শেষ অবধি প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে ভিলাই কারখানায় ছয় মাসে ৮৩০০০০ টন বিক্রয়যোগ্য ইস্পাত উৎপন্ন হইয়াছে। রাওরখেলায় হইয়াছে ৩৩১০০০ টন এবং দুর্গাপুরে হইয়াছে মাত্র ১৯৩০০০ টন। ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড স্টিল কোম্পানি উৎপাদনে কোনও উন্নতি দেখাইতে পারে নাই। ইহার কারণ যথাসময়ে যন্ত্রপাতি মেরামত ও বদল না হওয়া। শুনা যায় যে ভারত সরকার পূর্ব্বকার পরিচালকদিগকে যে আর্থিক সাহায্য দেওয়া উচিত ছিল তাহা যথা সময়ে না দেওয়াতে এই অতি প্রয়োজনীয় কার্য্য সাধিত হয় নাই। এখন সরকারী হস্তে পরিচালনা ভার গৃহীত হওয়ার পরে সকল সাহায্য ও ব্যবস্থা যথাযথরূপে হইবে মনে হয়। দুর্গাপুরে ঐ জাতীয় কোন বাধা ছিল না এবং দুর্গাপুর কারখানার উৎপাদন হ্রাস হওয়ার মূলে আছে পরিচালক ও শ্রমিকদিগের মধ্যে অসহযোগ। ঐ কারখানায় সম্ভবতঃ সহজে কোন উন্নতি সাধন সম্ভব হইবে না। কারণ, সম্ভব হইলে তাহা হয় নাই কেন? এখন সরকারী বিশেষজ্ঞগণ নিজেদের পরিচালনা বিস্তার ক্ষমতা কার্য্যক্ষেত্রে দেখাইবার যথেষ্ট সুবিধা পাইবেন।

দুর্গাপুরের ইস্পাত উৎপাদন ক্ষমতা কত?

ইস্পাত উৎপাদন সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞদিগের বিশ্বাস দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানাতে বৎসরে ১৬ লক্ষ টন অবধি ইস্পাত উৎপন্ন হইতে পারে। এই ধারণা অনুসারেই বলা হয় যে দুর্গাপুর কারখানায় উৎপাদন কার্য্য উৎপাদন ক্ষমতার অনুপাতে অত্যন্তই অল্প হইতেছে। এখন কেহ কেহ কথা তুলিয়াছেন যে উৎপাদন শক্তি যাহা বলা হয় তাহা অপেক্ষা বস্তুতঃ অনেক কম। অর্থাৎ দুর্গাপুর কারখানায় ১৬ লক্ষ টন ইস্পাত উৎপাদন সম্ভবই নহে। কথা হইল এই যে, যখন কারখানা নির্ম্মাণ করা হয় তখন যে বৃটিশ নির্ম্মাণকর্ত্তাগণ কার্য্যভার গ্রহণ করেন তাঁহারা কারখানায় উৎপাদন ক্ষমতা হিসাব করিয়াই কারখানার মূল্য স্থির করেন। অর্থাৎ কারখানা যদি ১৬ লক্ষ টন উৎপাদনের জন্য হইয়া থাকে তাহা হইলে সেই হিসাবে তাহাদিগকে একটা মূল্য ধার্য্য করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

যদি উৎপাদন তাহা অপেক্ষা কম হইবে ধরিয়া কারখানা নির্ম্মাণ করা হইয়া থাকে তাহাহইলে সেই মূল্য কারখানার উৎপাদন শক্তির ওজন বিচার করিয়া আরও অল্প হইবার কথা। যদি ১৬ লক্ষ টন না হইয়া ১২লক্ষ টনের উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন কারখানা হয় তাহা হইলে কারখানা নির্ম্মাণের মূল্য শতকরা ২০।২৫ টাকা কম হওয়া উচিত ছিল। সে টাকার পরিমাণ অল্প নহে। তাহা অনায়াসেই ১০।১৪ কোটি টাকা হইতে পারে। এতটা টাকা উৎপাদন শক্তির হিসাবে ভুল থাকায় পরহস্তগত হইয়া যাওয়া ভারত সরকারের আমলা ও মন্ত্রীদিগের কর্ম্মক্ষমতার পরিচায়ক হয় না। এখন দেখা আবশ্যক উৎপাদন ক্ষমতা কতটা হইবার কথা ছিল এবং সেই মত ক্ষমতা এই কারখানার আছে কি না। যদি না থাকে তাহা কেন হয় নাই। নির্ম্মাণ কারীগণ সেই পরিমাণের হানি শুধরাইতে বাধ্য কি না এবং বাধ্য হইলে উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির কোনও আয়োজন করা হইতেছে কি না? এত কাল যে সকল মন্ত্রী ও কর্ম্মচারীগণ এত বড় একটা ভুল বুঝিতে পারেন নাই তাঁহাদিগের সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করা হইতেছে? যে মানুষ একশত ঘোড়ার শক্তিশালী ইঞ্জিন একশত ত্রিশ ঘোড়ার শক্তি বলিয়া ধরিয়া বসিয়া থাকেন তাঁহার উপরে কোনও কার্যভার অর্পণ করা উচিত নহে। ব্লাস্ট ফারনেস, কনভার্টার, অপরাপর ফারনেসও মিলের আকার বিচার করিলে সহজেই উৎপাদন শক্তি কত তাহা বুঝিতে পারা উচিত।

গমের বাজারে বৃহত্তম ক্রয়ের কাহিনী

সোভিয়েট রুশিয়া পৃথিবীতে সর্ব্বাধিক গম উৎপাদন করিয়া থাকেন। সাধারণতঃ রুশিয়ায় বাৎসরিক আট কোটি টন গম ফলিয়া থাকে। কিন্তু ১৯৭১-১৯৭২ খৃঃ অব্দে দীর্ঘকাল স্থায়ী অনাবৃষ্টির কারণে রুশিয়ায় গমের ফসল শতকরা ২৫ ভাগ অল্প হয়; অর্থাৎ দুই কোটি টন গম ঐ বৎসর কম হইয়াছে। এই কারণে সোভিয়েট রুশিয়াকে নানা দেশ হইতে গম ক্রয় করিয়া নিজ ভাণ্ডার পূর্ণ করিতে হইয়াছে। এই সকল দেশের মধ্যে আমেরিকা, ক্যানাডা, অস্ট্রেলিয়া, ফ্রান্স, পশ্চিম জার্ম্মাণী, রুমেনিয়া ও সুইডেনের নাম বিশেষ করিয়া উল্লেখযোগ্য। সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গম ক্রয় করা হয় আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্র হইতে। ইহার পরিমাণ হয় প্রায় এক কোটি টন ও মূল্য ধার্য্য হয় ৭৫০ কোটি টাকা। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র হইতে বহু দেশ গম খরিদ করিয়া থাকেন। জাপান বহু বৎসর হইতেই ঐ দেশের গম ক্রেতাদিগের মধ্যে অধিকতম পরিমাণ গম ক্রয় করিয়া আসিয়াছেন। সুতরাং এই বৎসর যখন সোভিয়েট দেশ আমেরিকার নিকট অত অধিক গম ক্রয় করিলেন তখন জাপান ভয় পাইলেন যে হয়ত তাঁহাদের আবশ্যক মত গম তাঁহারা পাইবেন না। কিন্তু আমেরিকা জাপানকে আশ্বস্ত করিলেন যে তাঁহারা যাহা চাহিবেন তাহা ঠিক পাইবেন। অন্যান্য ক্রেতাদিগের মধ্যে ছিলেন চীন ও ভারতবর্ষ। চীন সম্প্রতি আমেরিকার নিকট চার লক্ষ টন গম ক্রয় করিয়াছেন। সোভিয়েটের গম কেনার ফলে গমের বাজার গরম হইয়া মূল্য বৃদ্ধি আরম্ভ হয়। ইহাতে সকল ক্রেতাকেই কিছু কিছু অধিক মূল্য দিতে হয় আমেরিকার অবশ্য গমের আড়ত এই সকল কেনা বেচা সত্ত্বেও খালি হইয়া যায় নাই। আমেরিকার নিকট এখনও প্রচুর গম মজুদ আছে এবং সেই গম স্বদেশের বিদেশের সকল অভাব মিটাইতে পারে বলিয়াই বিশেষজ্ঞদিগের বিশ্বাস। বর্ত্তমানে আন্ত-র্জাতিক সহায়তা কিভাবে খাদ্যবস্তুর অভাব দূর করিতে পারে তাহা বিস্ময়কর ও অভাবনীয়। দ্রুতগামী বৃহৎ বৃহৎ জাহাজ এই সাহায্য কার্য সহজ করিয়া দিতে পারে।

ত্রিপুরাতে সি পি এম আন্দোলন

বিগত ১১ই ডিসেম্বর ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলায় সি পি এম দল একটা বিরাট মিছিল বাহির করিয়া সহর পরিভ্রমণ করিয়া ত্রিপুরার খাদ্য সমস্যা লইয়া প্রবল আন্দোলন আরম্ভ করিবার চেষ্টা করে। ত্রিপুরাকে দুর্ভিক্ষ আক্রান্ত এলাকা বলিয়া যাহাতে ঘোষণা করা হয় সেই উদ্দেশ্যে এই গণ অভিযান চেষ্টা করা হয়। ত্রিপুরাতে যদিও সি পি এম সমর্থক লোক সংখ্যা অধিক নাই তাহা হইলেও সকল খাদ্য-

বস্তুর মূল্য বৃদ্ধির কারণে বহু লোক এখন বর্তমান শাসক গোষ্ঠীর কর্মক্ষমতা সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া উঠিয়াছেন এবং এই সকল ব্যক্তিই সি পি এম-এর অভিযানে যোগদান করিয়া মিছিলের আকার বর্ধন করিতে সাহায্য করিয়াছেন। বিষয়টা বৃহত্তর ভারতের রাষ্ট্র-নৈতিক পরিস্থিতির দিক দিয়া মহা গুরুত্বপূর্ণ না হইলেও, সি পি এমএর যে আত্মশক্তিতে বিশ্বাস পূর্ণ জাগ্রত হইয়াছে তাহার পরিচায়ক হিসাবে ইহার একটা মূল্য আছে স্বীকার করিতেই হয়। এইরূপ অভিযান অন্যত্রও হইয়াছে যদিও তাহার উদ্‌যোগকর্ত্তা সকল সময় সি পি এম দল হইয়ছেন বলা যায় না। সি পি আই ও অন্যান্য দলের ব্যক্তিদিগকেই অধিকভাবে এই কার্য করিতে দেখা গিয়াছে। কিন্তু সি পি এম আন্দোলন না করিয়া যদি অপর দলও আন্দোলন করিতে আরম্ভ করে তাহা কংগ্রেসের পক্ষে সুবিধাজনক হইবে না এবং সি পি আই প্রভৃতি দল ক্রমে ক্রমে কংগ্রেসের সহায়তা না করিতে আরম্ভ করিলে নব কংগ্রেসের দিকে দেশবাসীর সহায়তা ও সমর্থনের ক্ষেত্রে ক্রমশঃ দুর্ব্বলতা জাগ্রত হইতে আরম্ভ করিবে।

আসামী পন্থায় ভাষার উন্নতি সাধন

আসামে আসামী ভাষা যদি একমাত্র শিক্ষার মাধ্যম ও আদালত দরবারে ব্যবহৃত ভাষা বলিয়া গৃহীত হয় তাহা হইলে এই কথাই স্বীকার করা হইবে যে ঐ ভাষা ভারতের অন্যান্য ভাষা অপেক্ষা অধিক সুগঠিত ও সর্ব্বকার্য্যে ব্যবহারযোগ্য। কারণ পশ্চিমবঙ্গে বাংলা ভাষা একমাত্র শিক্ষার মাধ্যম নহে এবং পশ্চিমবঙ্গবাসী অবাঙ্গালী নাগরিকগণের পক্ষে নিজ নিজ মাতৃভাষা ব্যবহার করিয়া জীবন নির্ব্বাহ করা অসম্ভব নহে। এমন কি পশ্চিমবঙ্গবাসী অসমিয়াগণও ইচ্ছা থাকিলে ঃ ব্যবস্থা করিয়া লইলে এই দেশে আসামী ভাষাতে শিক্ষালাভ করিতে পারিবেন। সুতরাং আসামীদিগের নিজ ভাষার উন্নতি সাধন চেষ্টা ভুলিয়া যে অপর ভাষা-ভাষীর মস্তকে লগুড় চালাইয়া নিজ ভাষার উন্নয়ন চেষ্টা তাহা কোন কার্য্যকর পন্থা নহে। তাহার ফলে শুধু আসামীদিগের আত্মমর্য্যাদার হানি হইতেছে বিশ্ববাসী আসামীদিগকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতে আর করিতেছেন। শতাধিক ব্যক্তিকে প্রাণে মারিয়া, গৃ জ্বালাইয়া দিয়া, দোকান লুট করিয়া ও মাতৃজাতি অবমাননা করিয়া কাহারও কোন শুভ উদ্দেশ্য সিদ্ধি সম্ভব হইতে পারে না। এমন কি যদি সেইরূপ ঘৃণ কার্য্যাবলী কেন্দ্রীয় সরকারের সমর্থনও পরোক্ষভাবে পা ও বিদেশীজাতির গুপ্তচরদিগের সাহায্যে অর্থপুষ্টও হয় তাহা হইলেও ঘৃণ্য যাহা তাহা ঘৃণ্যই থাকিয়া যাইবে তাহা কখনও পাপ কার্য্যে লিপ্ত অপরাধী দিগের মাতৃ ভাষার অথবা তাহাদিগের অন্য পরিকল্পনার পূর্ণ গঠন ও পরিণতির সহায়ক হইবে না। শেষ অবধি আসামে আসামী রাজ সংখ্যাগুরুত্বের উপর নির্ভর করিতে বাধ্য। আসামী জাতির মানুষ যদি আসামে মাত্র শতকরা ৪৩ জন হয় তাহা হইলে আসামকে শীঘ্রই ভাঙ্গিয়া গড়িতে হইবে। এবং সেই ভাঙ্গা গড়াতে আসামের অর্থ-নৈতিক অবস্থা কিরূপ হইবে ও আসাম পরে আর্থিক ভাবে দেউলিয়া হইয়া যাইবে কি না, সে সকল কথার আলোচনা এখনই আরম্ভ করা হইতেছে বলিয়া মনে হয়। কারণ, কেন্দ্রীয় সরকার কাছাড়ে ও অন্য অন্য স্থানে যে ভাবে নিজেদের রাষ্ট্রশাসন রীতি ব্যক্ত করিতেছেন তাহাতে মনে হয় তাঁহারা আসাম বিভাগ সহজ ও সরল মনে করেন না। ইহার মূলে অর্থ-নৈতিক কথাই থাকা সম্ভব। কিন্তু যদি আসাম বিভাগ না করা হয় তাহা হইলে আসামে গণবিপ্লব রোধ করিতে হইলে আসামী গুণ্ডাদিগকে দমন করিতেই হইবে। আসাম সরকারের গুণ্ডা সমর্থন নীতি অধিক কাল বিপ্লবাত্মক প্রতিক্রিয়া নিরোধে সক্ষম হইবে বলিয়া কেহ মনে করেন না। গুণ্ডার দলের বিরুদ্ধে অপর গুণ্ডার দল ক্রমশঃ গঠিত হইবে এবং ফলে আসামে কেহ আর সহজ ও শান্তিপূর্ণ ভাবে জীবন নির্ব্বাহ করিতে পারিবে না। কেন্দ্রীয় সরকার এ কথাও শীঘ্রই উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

"মনোপলি" বা সর্ব্বগ্রাসী একচেটিয়া ব্যবসা

যদি কোনও কারবার আকার, প্রসার ও ব্যাপ্তিতে

হত বিরাট আকার ধারণ করে যে তাহার কোন প্রতি-দ্বন্দ্বী থাকে না ও সেই ব্যবসার ক্রেতা, কর্ম্মী ও সহযোগী-দিগের ব্যবসার মালিক বা পরিচালকদিগের কথা মানিয়া না চলিবার কোন উপায় থাকে না, তাহা হইলে সেই অবস্থায় সেই ব্যবসায়টিকে মনোপলিষ্ঠ বা একাধিপত্যের অধিকারী বলা হইয়া থাকে। একচেটিয়া ব্যবসায় নানা ভাবে সৃষ্ট হইতে পারে। যদি ব্যবসার মালিকগণ নিজেদের ঐশ্বর্য্যের জোরে ক্রমে ক্রমে সকল প্রতি-দ্বন্দ্বীকে কিনিয়া লইয়া অথবা কোণঠাসা করিয়া নিজেদের শক্তি সর্ব্বব্যাপ্ত করিয়া ফেলিতে পারেন তাহা হইলে তাঁহাদের একাধিপত্য স্থাপিত হইতে পারে। অথবা যদি ক্রেতাদিগের সকলকেই কোন রাষ্ট্রীয় অথবা অর্থ-নৈতিক উপায়ে ঐ ব্যবসার পূর্ণ সমর্থক করিয়া ফেলা যায় তাহাতেও একাধিপত্য স্থাপিত হইতে পারে। যথা, কোথাও যদি দশটি কারবার থাকে ও ক্রেতা বলিতে একমাত্র সরকারী অথবা সরকার সমর্থিত কয়েকটি প্রতিষ্ঠানই থাকে; এবং যদি সেই সব প্রতিষ্ঠানই সরকারী আদেশ নির্দ্দেশে একটি কোন ব্যবসায়কে বাছিয়া লইয়া সেইটির নিকট হইতেই সকল কিছু ক্রয় করিতে থাকে তাহা হইলে বিক্রয়কারী ব্যবসায় শীঘ্রই একটি "মনোপলি" হইয়া দাড়ায়। পশ্চিমবঙ্গে শুনা যায় অনেকগুলি "পাম্প" বা জল উঠাইয়া দূরে চালাইবার যন্ত্র ব্যবসায় আছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের মিলিত চেষ্টায় কৃষিক্ষেত্রে পাম্প ব্যবহার প্রবর্ত্তন করার কার্য্য চালানো হইয়া থাকে ও ব্যাঙ্কের নিকট ঋণ গ্রহণ করিয়া বহু চাষী পাম্প ক্রয় করেন। কিন্তু ব্যাঙ্ক ঋণ দিলেও কোন্ ব্যবসায়ী নির্ম্মিত পাম্প ক্রয় করা হইবে তাহা স্থির করেন কোনও সরকারী বিভাগ অথবা দফতর শুনা যায় যে পশ্চিমবঙ্গে অনেক। গুলি পাম্প নির্ম্মাণকারী ব্যবসায় থাকা সত্বেও এই বিভাগ বা দফতর পাম্প ক্রয়ের ব্যবস্থা করেন মহারাষ্ট্রের কোনও একটি সুবৃহৎ পাম্প নির্মানকারী ব্যবসায়ীর নিকট হইতে। ফলে ঐ ব্যবসায় ক্রমশঃ পাম্প বিক্রয় ক্ষেত্রে একটা "মনোপলি" গঠন করিয়া ফেলিতেছে। অর্থাৎ যদিও সরকার বাহাদুর মনোপলি গঠনের একান্তই বিরুদ্ধে তাহা হইলেও কার্য্যক্ষেত্রে তাঁহারা এমন ভাবে চলেন যাহাতে মনোপলি না থাকিলেও তাহা শাসকদিগের সহায়তায় শীঘ্রই গড়িয়া উঠে। হইতে পারে যে মহারাষ্ট্রের পাম্প অতি উৎকৃষ্ট। হইতে পারে যে পাম্প ক্রেতাদিগের তরফ হইতে যে সরকারী আমলা অথবা মন্ত্রীগণ কোন্ পাম্প লওয়া হইবে তাহা স্থির করেন তাঁহারা কোন কারণে ঐ মহারাষ্ট্রীয় কারবারটিকে পছন্দ করেন; কারণ যাহাই হউক, পাম্প ক্রয় করা হয় এমন ভাবে যাহাতে একচেটিয়া কারবার গড়িয়া উঠা সহজ হয়। সুতরাং সরকারী ক্রয়নীতি সরকারী অর্থ-নৈতিক আদর্শ বিরোধী। এইরূপ ভাবে নিজেদের আদর্শ নিজেরাই নষ্ট করা কখনই উচিত নহে। কিন্তু কে কি বলিবে, কে কি করিবে?

ফরক্কা বাঁধ ও ভাগীরথীর জলের মাছ

শুনা যায় যে ১৯৭৩ খৃঃ অব্দে কোন সময় হয়ত ফরক্কা বাঁধের গঙ্গাজল ২৬ মাইল দীর্ঘ ফরক্কা-জঙ্গিপুর খাল দিয়া আসিয়া ভাগীরথীর জলের সহিত মিলিত হইবে। এই জল বাঁধের জল বলিয়া ইহাতে পলি মাটির অংশ থাকিবে না বলিলেই চলে। ৪০০০০ কিউসেক জল ভাগীরথীতে পাড়তে আরম্ভ করিলেই ভাগীরথীর জল দুই ফুট বাড়িয়া যাইবে ও যে খালে এক কোটি ত্রিশ লক্ষটন পলি মাটি জমিয়া যাইত সেখানে মাত্র ১০ লক্ষ টন জমিবে। জলের লবণাংশও হ্রাস হইবে এবং জল পূর্ব্বের তুলনায় অতি পরিস্কার রূপ ধারণ করিবে। এইরূপ জলে মৎস্য বৃদ্ধি স্বাভাবিক এবং এখন যে সকল মৎস্য ভাগীরথীর নোনা ও কর্দ্দমাক্ত জল ছাড়িয়া পলাইয়া বাঁচে; জলের পরিস্কৃতি ও পরিমাণ বৃদ্ধির পরে সেই সকল মৎস্যই ভাগীরথীর জলে বাস করিতে বিশেষ আনন্দ অনুভব করিবে। যে ইলিশ ভাগীরথীর জলে অতি কষ্টে বিচরণক্ষম ছিল, সকলে আশা করেন যে সেই ইলিশই ভাগীরথীর জল সংস্কৃত হইলে সদলবলে আসিয়া "গঙ্গার ইলিশের" খ্যাতি ফিরাইয়া

আনিবে। মৎস্যজীবী ও মৎসভোক্তাদিগের পক্ষে ইহা একটা অতি বড় আশার বাণী। কিন্তু একটা কথা হইল এই যে ফরক্কার জল যথাসময়ে আসিবে কি না সে বিষয়ে গভীর সন্দেহ ও আশঙ্কা আছে। আসিলে নানা দিক দিয়াই পশ্চিমবঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গবাসীর প্রভূত লাভ হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু ফরক্কার উপর কেন্দ্রীয় সরকার সৃজিত যে শনির দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত ভাবে পাতিত হইয়াছে তাহা কাটাইয়া উঠিয়া ফরক্কা যে কখনও পূর্ণ পরিণতি লাভে সক্ষম হইবে একথা কে বলিতে পারে?

আর্থিক উন্নতি কোন পথে আসিবে?

ভারতবর্ষের জনসাধারণের অবস্থা আলোচনা করিলে দেখা যায় যে ৫৫ কোটি মানুষের মধ্যে ২২ কোটি মানুষ এখনও মহা দারিদ্র্যে নিমজ্জিত রহিয়াছেন। ইঁহাদিগের মাসিক আয় মাথা পিছু ২০ টাকারও কম এবং এই আয় যদি বাড়াইয়া অন্ততঃ দ্বিগুণ না করা যায় তাহা হইলে ইঁহারা মানুষের মত ভাবে জীবন নির্ব্বাহ করিতে সক্ষম হইবেন না। অর্থাৎ ২২ কোটি মানুষের ভাগে মাথা পিছু বার্ষিক আরও ২০০ শত টাকার মত অধিক আয় যদি হইতে পারে তাহা হইলেই ভারতের যে অতি দরিদ্র জনগণ তাহাদের অবস্থা কিছুটা মানুষের মত হইবে। এই হিসাবে তাহা হইলে শুধু দরিদ্র জনগণকেই দিতে হইবে বার্ষিক ৪৪০০ চার হাজার চার শত কোটি টাকা। জাতীয় আয়ের যে অংশ মানুষে বেতন, ব্যবসাগত লাভ ইত্যাদির হিসাবে পাইয়া থাকে তাহা যদি এইরূপে বাড়াইতে হয় তাহা হইলে মোট জাতীয় আয় বাড়াইয়া অন্ততঃ ঐ ৪৪০০ কোটি টাকার তিন গুণ পরিমাণ অতিরিক্ত আয় করিতে হয়। জাতীয় আয় তাহা হইলে বাৎসরিক আরও ১৩২০০ কোটি টাকা অধিক করিতে হইবে। ইহা বর্ত্তমান মোট জাতীয় আয়ের একটা খুবই বড় অংশ এবং এতটা আয় বাড়ান কি ভাবে সম্ভব তাহা জাতীয় অর্থনীতিবিদ্‌গণ মাথা খাটাইয়া স্থির করিতে পারেন। জাতীয় আয় বাড়াইতে হইলে তাহা ভূহর ভূমিজ বস্তু উৎপাদনের দ্বারা হইতে পারে, নয়ত কারখানাতে উৎপন্ন দ্রব্যাদির সাহায্য করা যাইতে পারে। যেভাবেই করা হইবে তাহার জন্য মূলধন প্রয়োজন হইবে এবং যদি পাঁচ টাকা ব্যয় করিয়া উৎপাদন বৃদ্ধির আয়োজন করা যায় তাহা হইলেই বার্ষিক একটাকা পরিমাণ উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব হইতে পারে। তাহা হইলে দারিদ্র্য দূর করার এই বিশেষ ব্যবস্থার জন্য প্রায় সত্তর হাজার কোটি টাকা (৭০০০০,০০০০০০০) মূলধন আবশ্যক হইবে। আরও অধিকই আবশ্যক হইবে কারণ সরকারী পরিকল্পনা অনুসারে যদি কোন কার্য্য করা হয় তাহা হইলে সেই কার্য্যের সফলতা শতকরা এক শত কখনও হয় না। যদি হিসাবে চার ভাগের তিন ভাগও কার্য্যকর হইতে পারে তাহা হইলেও সত্তর হাজার বাড়িয়া অন্ততঃ এক লক্ষে পৌঁছিয়া যায়। এক লক্ষ কোটি টাকা অল্প মূলধন নহে এবং বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে অতটা মূলধন একটা বিশেষ উদ্দেশ্যে লাগাইতে হইলে ভারতবর্ষের প্রায় ৪০।৫০ বৎসর সেই চেষ্টা করিতে হইবে। এই আয় বৃদ্ধি যদি জাতীয় বা সোসিয়ালিষ্ট পন্থায় সাধন চেষ্টা করা হয় তাহা হইলে টাকা ও সময় আরও অধিক লাগিবার সম্ভাবনা; কারণ সোসিয়ালিষ্ট প্রচেষ্টাতে জনসাধারণ সচরাচর কোন সাহায্য করিতে অবতীর্ণ হ'ন না। যদি সর্ব্বসাধারণ নিজেদের লাভ হইবে বোধ করিয়া কার্য্যে লাগিয়া যান তাহা হইলে ভারতবর্ষের যে ৩৩ কোটি মানুষ অতি দরিদ্র্য নহেন তাঁহারা সকলে দুই-দশ টাকা করিয়া মূলধন হিসাবে লাগাইলে কাজটা সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু তাঁহাদের যদি কোনও আর্থিক লাভ না হয় এবং টাকার বদলে যদি তাঁহারা শুধু সদুপদেশ শ্রবণ করিয়াই নিজেদের চেষ্টার ফল লাভ সম্পূর্ণ করেন তাহা হইলে এই দারিদ্র্য দূর করার কার্য্য দ্রুত অগ্রসর হইবে না।

শুধু আয়ের কথাই নহে। আরও বহু কিছু বাকি পড়িয়া আছে যাহা শীঘ্র সম্পূর্ণ করা অতি আবশ্যক। যথা ভারতবর্ষের মানুষের বাসগৃহের অভাব হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে আরও ৯ কোটি গৃহ নির্ম্মাণ করা অবিলম্বে প্রয়োজন। ইহার জন্য প্রায় ৩০০০০ (ত্রিশ

(এরপর ৩৬৭ পৃষ্ঠায়)

নিবেদিতা

সলীল বিশ্বাস

সেই যুগসন্ধির মুহূর্তে জাতীয় জাগরণের মহাঋত্বিক স্বামীজী অনুভব করেছিলেন যে, জাতীয় জাগরণের হোমযজ্ঞে ভারতবর্ষের নারী এবং পুরুষের মিলিত আহুতি-ই পূর্ণতার প্রসাদ নিয়ে আসবে,—তা ছাড়া এ পূজোর আয়োজন অঙ্গহীন হ'বে, তপস্যা সিদ্ধ হ'বে না। আর যদি এই পূজোর আহুতি ব্যর্থ হ'য়ে যায়, তা হ'লে ভারতবর্ষকে বীর্যহীনতা এবং আত্মবিস্মৃতির অতল অন্ধকার থেকে পৌরুষের আলোর জগতে উত্তীর্ণ করা যাবে না। এই আন্তর বিশ্বাসের প্রবণতা থেকেই স্বামীজী ভারতের নারী-শক্তির সামগ্রিক জাগরণ আনতে চেয়েছিলেন। অথবা তাঁর আন্তর বিশ্বাসের কারণ আরও গভীরতা-নিহিত ছিল।

বিবেকানন্দ বিশ্বাস করতেন যে, নারী-শক্তির অবমাননাই ভারতীয় জাতির পতনের অন্যতম কারণ। মানবতার অপমান যে কোন বিশাল সাম্রাজ্যের পতন অনিবার্য করে তুলতে পারে—ইতিহাস তার বিবর্তনের গতিধারায় বার বার এ সত্যি আমাদের জানিয়ে দিয়েছে। ভারতীয় মানসিকতায় নারী সমাজের প্রতি একটি মর্যাদা সংহত প্রবণতা ছিল। এই প্রবণতার কারণ কেবল মানবিক নয়, আমার বিশ্বাস, ভারতীয় পরাদর্শনের গভীরে এই প্রবণতার কারণ নিহিত রয়েছে। অথচ, সারাটা মধ্যযুগীয় সময় ঘিরে ভারতবর্ষ নারী সমাজের প্রতি যে আচরণ করেছে এবং যে প্রয়োজনীয় উপাদান হিসেবে নারী সমাজকে ব্যবহার করেছে—তার মধ্যে ভারতীয় জীবন দর্শনের পরিচয় খুঁজে পাওয়া সত্যি-ই কঠিন। বিবেকানন্দ তাই পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন,—"তোদের জাতের এত অধঃপতন ঘটেছে—তার প্রধান কারণ—এই সব নারী মূর্তির অবমাননা করা।—তাই, নব জাগরণের এই সাধক সন্ন্যাসী নারী শক্তিকে সচেতন জীবন বিশ্বাসে জাগিয়ে তোলার সাথে সাথে সমাজের সেই অবহেলিত জনশাখা—ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতির সংকীর্ণ দৃষ্টিতে যারা অন্ত্যজ জন—এবং নাগরিক সভ্যতা অভিমানীর চোখে যারা—অনুকাল-চাড়াল তাদেরও জাগরণ প্রার্থিত করতে চেয়েছেন। তাঁর এই মিলিত প্রয়াসের শিকড় যে কত গভীরতা-নিহিত ছিল,—আন্তরিকতাহীন ভাবনায় তা ভেবে ওঠা সম্ভব নয়।

রাষ্ট্র এবং সমাজে নারী এবং অবহেলিত জনশাখার মর্যাদার আসন প্রতিষ্ঠার জন্যে এশিয়ার প্রথম সমাজবাদী সন্ন্যাসী ঘোষণা করেছিলেন: "আমার জীবন ব্রত দু'টি—স্ত্রীজাতির এবং ভারতের নিম্ন সম্প্রদায়ের যথার্থ উন্নতি সাধন।"—কিন্তু, এ দুটো ব্রত উদ্‌যাপন যে সহজ সাধ্য নয়, স্বামীজী সে কথা খুব সহজেই বুঝেছিলেন। তাঁর পথ যে ফুল বিছানো নয়—এই সত্যই বোধ হয় তাঁকে অধিকতর শক্তি'প্রাণিত করেছিল।

স্বামীজী সত্যি-ই অনুভব করেছিলেন যে,—ভারতের নারী সমাজের মনে যদি কোন জঙ্গম প্রেরণা রণিয়ে দেওয়া না যায়, তা হ'লে, বহু শতক ধরে যে প্রাণটা অবচেতন পাথর চাপা হ'য়ে পড়ে আছে তাকে জাগানো যাবে না। মৃত আত্মায় প্রাণ সঞ্চার করতে সিদ্ধ

জঙ্গম সাধকেরই প্রয়োজন, যাঁর পরম ছোঁয়ায় শবের শরীরে প্রাণ-বন্যার জোয়ার বিদ্যুৎ তরঙ্গে দুলে উঠ্‌বে। এমন কাউকে চাই,—যিনি অবহেলিত নারী সমাজের আত্মার সঙ্গে আত্মা মিলিয়ে আপন শক্তির জঙ্গম আকর্ষণে তাদের শিকল ছেঁড়ার টান দেবেন। স্বামীজী জানতেন,—এই টান যখন পড়বে তখন নোনা ধরা সমাজ তরণীর পরতে পরতে আর্তনাদ উঠ্‌বে,—প্রতিরোধ জাগবে,—সেই প্রতিরোধের চরম মুহূর্তে অবিচল মনে তাকে দাঁড়াতে হ'বে—যিনি সেই শিকল ছেঁড়ার গান গাইবেন। স্বামীজী ভারতের মাটিতে সেই শক্তিময়ীর দেখা পান নি।

স্বামীজীর পাশ্চাত্য জগৎ পরিক্রমণ ভারতীয় জাতির জাগরণের প্রেক্ষিতে সত্যি প্রয়োজন ছিল। তাই হয়ত স্বামীজী উত্তর দিনে এই আকস্মিক সংঘটিত ঘটনাকে 'Will of Creator' বলে অভিহিত করেছেন। চিকাগোর ধর্ম মহাসভা ইউরোপের বিস্তৃত আকাশে শুধু ভারত সূর্যের আত্মপ্রকাশের সুযোগ-ই এনে দিল না—আত্ম-বিস্মৃত ভারতীয় জাতির শিরায় শিরায় পাশ্চাত্য জাতির প্রাণ-বেগ সঞ্চারিত হবার সম্ভাবনাও সৃষ্টি করল। এই সাগর পারের দেশেই তিনি মার্গারেট নোবলের দেখা পান।

স্বামীজী নিবেদিতার মধ্যে তাঁর বাঞ্ছিত জঙ্গম শক্তির প্রতীকী সত্তার সন্ধান পেয়েছিলেন। তিনি অনুভব করেছিলেন,—যে ব্রত উদ্‌যাপনের জন্যে তিনি আকুল হ'য়ে উঠেছেন—দুরন্ত উদ্দাম পাশ্চাত্যের জঙ্গম শক্তি ছাড়া তা' সম্ভব নয়। মার্গারেট তাঁর প্রতীক্ষিত মনের দুয়োরে সম্ভাবনার প্রতীক রূপেই এসেছিলেন। নিবেদিতা তাই স্বামীজীর মানস-কন্যা।

স্বামীজী নির্ভয় নির্ভরে নিবেদিতার ওপরেই নারী সমাজের ভার অর্পণ করেছিলেন। নিবেদিতা তাঁর জীবন-সাধনায় উত্তীর্ণা হয়েছিলেন। তিনি ভারতীয় নারী-সমাজের জীবনের শতক-সঞ্চিত জমাট অন্ধকার দূর করে নারী সমাজকে কেবল আত্মশক্তিতেই জাগরিত করে তুল্‌লেন না,—'নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার' —বলিষ্ঠ বিশ্বাসে অনির্বাণ করে তুল্‌লেন। নিবেদিতা তাঁর আত্মশক্তির আলোক শিখা অগণিত জীবনে জ্বালিয়ে দিলেন। রবীন্দ্রনাথ নিবেদিতাকে—'শিখাময়ি' বলে অভিহিত করেছেন—; নিবেদিতা যথার্থ-ই 'শিখাময়ি'।

সারদা-মা নিবেদিতাকে—'গুরুর প্রসাদী ফুল'-রূপে স্নেহ ও আদরে কোলে টেনে নিয়েছিলেন। নিবেদিতাও নিজেকে প্রসাদী ফুলের মতোই অঞ্জলি দিয়েছিলেন। স্বামীজীর সুর্বসনাথ জীবনের গভীর অনুভূতি, ভারতের গৌরবময় ঐতিহ্য এবং বিশ্বজীবন সংস্কৃতি, পরম-ধর্ম ও সামগ্রিক মানব-সত্তা সম্পর্কে শিবাত্মবোধ মার্গারেটের হৃদয়ে গভীরে নতুন জীবনের মনন-মন্ত্র নিয়ে এলো। ভারত-আত্মার বেদী তলে মার্গারেট নিজেকে নিবেদন করলেন। অসীম ত্যাগ, গভীর তিতিক্ষা, পরম সহিষ্ণুতা এবং নিবিড় মানব-প্রেমে তাঁর জীবন পরম সুষমায় ফুটে উঠল। মার্গারেট ভারত-কন্যা নিবেদিতা হ'য়ে উঠ্‌লেন। ভারতীয় ভাবাদর্শের গভীর প্রশান্তিতে নৈর্ব্যক্তিক সাধনার আনন্দে আত্ম-নিমগ্না নিবেদিতার আত্ম-অনুভূতিতে ভারতভূমি 'ভূমা'র প্রশান্তির পরমতা নিয়ে এলো;—বৈদিক ঋষি যেমন সারা জগতের সবই 'ওঁমধু'-রূপে এবং বৈষ্ণব সাধক যেমনি—সবার মধ্যে কৃষ্ণের প্রকাশ দেখেছিলেন—তেমনি, ভারতের আকাশ-বাতাস, আলোক-আঁধার, ফল-জল, তৃণলতা, পত্র-পুষ্প, মানব সমাজ ও জীবন-জগতের প্রতি নিবেদিতার সপ্রেম দৃষ্টি—সবই 'শিবময়' দেখল। নিবেদিতা তাঁর এই সময়কার মানস-প্রবণতা প্রসঙ্গে পরবর্তীতে বলেছেন যে, স্বামীজীর সামীপ্য মানুষের জীবনে তার আভ্যন্তরীণ অনভিব্যক্ত মহান্ উদ্দেশ্যকে জাগিয়ে তোলে,—মানুষকে আদর্শে আত্ম-নিয়োগ করতে প্রাণিত করে। মানুষ কালিমা মুক্ত হ'য়ে ওঠে। স্বামীজী প্রসঙ্গে নিবেদিতা বলেছেন: "এইরূপে প্রতি পদেই তাঁরই ভাবরাজির দ্বারা পরিবৃত ও তাঁরই গভীর স্বদেশ প্রেমের দ্বারা অনুপ্রাণিত হ'য়ে

আমি দেবলোকের স্নিগ্ধ জ্যোতির মধ্যে বিচরণ করতে লাগলাম;—যেখানে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে তাদের স্ব-ভাবের অপেক্ষা বৃহৎ হয়েই দেখা দিত।" নিবেদিতার এই উক্তিটির ভেতর দিয়ে তাঁর আত্ম অনুভূতির গভীরতা এবং প্রশান্তির নিবিড়তা অনুভব করা যায়।

ভারতীয় জাতীয়তার পুনর্জাগরণকেও নিবেদিতা তাঁর জীবনের অন্যতম ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। এই পরম প্রজ্ঞাশীলা মহীয়সী জাগরিত অধ্যাত্ম-বোধিকেই 'জাতীয়তা'—বলে অভিহিত করতেন। অধ্যাত্ম জাগরণের ভেতর দিয়ে এক একটি জাতির স্বাতন্ত্র্য-তীক্ষ্ণ স্বরূপ ফুটে ওঠে। এ সত্যি নিবেদিতার কাছে দুর্বোধ্য ছিল না। ভারতের আধ্যাত্মিকতার জাগরণই যে তার জাতীয় জাগরণ—নিবেদিতা বারে বারেই সে কথা বলেছেন। নিবেদিতা অনুভব করেছিলেন যে, ভারত যদি তার সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিক্ষা, শিল্প এবং সংস্কৃতিতে এই অধ্যাত্ম জাগরণকে পূর্ণায়ত্ত করতে না পারে—তা' হ'লে তার জাতীয়তা-বোধের স্রোতধারা ব্যর্থতার মরুভূ বালুরাশিতে হারিয়ে যাবে।

নিবেদিতা এ সত্যি অনুভব করেছিলেন যে,—আধুনিক পৃথিবীতে নাগরিক সভ্যতাকে অস্বীকার করে চলার স্বপ্ন—'day-dream'—ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু এই নাগরিক সভ্যতা যদি কেবল মাত্র যান্ত্রিক অনুস্থিতি-ই হ'য়ে ওঠে—তবে মানুষের অপ্রতিরোধ্য সর্বনাশ সাধিত হ'বে। তিনি তাই পৌর জীবনের সামগ্রিক বিস্তৃতিতে মানবিকতার প্রসাদ চেয়েছিলেন। মানবিকতার দর্শন এবং প্রবণতা বিচ্ছিন্ন মানব সভ্যতা বন্ধ্যা হয়ে যাবে—এ ভাবনা অন্যায় বলে মনে করা চলে না। অন্তত আমার তা' মনে হয় না। এ জন্যেই নিবেদিতার বাঞ্ছিত 'মানবিক পৌর-জীবন'—আমার কাছে একটি গভীর অর্থ বহন করে আনে। এই প্রসঙ্গে নিবেদিতার একটি উক্তি স্মরণ করছি। তিনি বলেছিলেন: "যে মানুষ গৃহপালিত পশুর চারণভূমি দখল করবার জন্যে একটা অঙ্গুলি তুলেও গ্রামকে সাহায্য করে না—সে কখনও দেশের জন্যে রক্তপাত এবং মৃত্যু বরণ করার মানুষ নয়। যে ব্যক্তি জাতির কল্যাণের জন্যে সামান্য বিপদকে স্বীকার করতে চায় না, তার হাতে বিশ্বাস করে সৈনিক দলের পতাকা অর্পণ করা চলে না।" কথাটি কি নিবিড় অর্থ-ব্যঞ্জক! ভারতের জাতীয় সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যের প্রতি গভীর শ্রদ্ধানতা নিবেদিতা বলেছিলেন:—"যে জাতীয়তাবাদে বিশ্বাস করে, সে ভারতকে নবীন বলে মনে করে; যৌবন সম্পন্ন ভারতবর্ষ তার হৃদয়ে পাঁচ হাজার বছরের স্মৃতি বহন করে চলেছে। সমগ্র জাতির মধ্যে ভারতবর্ষই ব্রহ্মচারিণী, নবযৌবনা, বীর্যশালিনী, সংগ্রামের জন্যে সর্বদা প্রস্তুত। ভারত এশিয়ার হৃদ-ভূমি।"

দেবাত্ম ভারতের প্রাণাত্মা অখণ্ড ধর্ম বিশ্বাসের পরমানুভূতিতে স্ফূর্ত হ'য়েছে। ভারতের ধর্ম বিশ্বাস শুধু মাত্র আচরণবাদেই নিঃশেষ হ'য়ে যায় নি,—চারিত্র এবং মানব-কল্যাণের শুদ্ধ সফলতাও এনেছে। ভারতের হিন্দু ধর্ম নিবেদিতাকে এক প্রবুদ্ধ জগতে উন্নীত করেছিল। কারণ হিন্দু ধর্মের চারিত্র-গভীরতা তাঁকে মুগ্ধ বিস্ময়ে রোমাঞ্চিত করে তুলেছিল। জগতের অন্যান্য ধর্মের সঙ্গে হিন্দু ধর্মের একটি বিশেষ পার্থক্য হ'লো এই যে,—এই ধর্মটি ভারতের সকল ধর্ম এবং সাধনার সমন্বয়ে নিজস্ব চারিত্র রচনা করেছে। বস্তুতঃ, যে সমন্বয়বাদী দর্শন ভারতের মৌলিক সত্যি,—তাই-ই হিন্দু ধর্মের মূল-সত্যি। নিবেদিতা তাই অনুভব করেছিলেন,—এমন উদার-মহৎ ধর্ম বিশ্বের আর কোথাও দেখা যায় না। তাঁর অভিজ্ঞতায় হিন্দু ধর্ম কেবল—শ্রেষ্ঠই নয়, সকল ধর্মের সারভূত সত্যিও। এই ধর্মের কেবল "সুন্দর ও সঙ্গতিপূর্ণ"—বর্দ্ধনাই ঘটেনি,—এই ধর্ম হিন্দুত্বের আচরণবাদের সীমানার ঊর্ধ্বে মহান্ হিন্দু চরিত্রেরও রচনা করেছে। এই হিন্দুত্ব সভ্যতা এবং সংস্কৃতিতে এক গভীর ব্যঞ্জনাময় প্রগতি নিয়ে এসেছে। তাই নিবেদিতা বলেছিলেন:—"হিন্দু ধর্মের মতো আর কোন ধর্ম বৈপ্লবিক পরিবর্তন করতে পারে নি।"—

এই বেদান্ত সন্ন্যাসিনী হিন্দু ধর্মকে জগতের ধারক শক্তির উৎস হিসেবে দেখেছিলেন।

স্বামীজী নিবেদিতাকে নারী শক্তির বোধন যজ্ঞের পৌরোহিত্য অর্পণ করেছিলেন। নিবেদিতা তাঁর ওপর অর্পিত ব্রত উদ্‌যাপন করতে গিয়ে বুঝেছিলেন যে, যদি ভারতের নারী সমাজের মনে শিক্ষার আলো সঞ্চারিত না করা যায়,—তা'হ'লে তাদের অন্তরের জমাট অন্ধকার অপসারিত হ'বে না। এই দৃষ্টিকোণ থেকেই তিনি এ কথাও অনুভব করেছিলেন যে, ভারতের সামগ্রিক জীবন ধর্ম থেকে নারী সমাজকে বিচ্ছিন্ন করে নেওয়া যাবে না। তাই তিনি ভারতের সামগ্রিক শিক্ষা জীবনে এক যুগান্তিক বৈপ্লবিক চেতনা আনতে চেয়েছিলেন। মানুষের অন্তরের ব্যঞ্জনাময় গভীর অনুভূতির প্রবুদ্ধ-উদ্ভিন্নতা-ই যে যথার্থ শিক্ষা—এ সত্য নিবেদিতার অজানা ছিল না। বস্তুতঃ, শিক্ষা অর্থে তিনি তাই-ই বুঝতেন। নিবেদিতা বলেছিলেন যে, ভারত সত্তার অন্তর্লীন মর্মবাণী, জাতীয় আদর্শ, ত্যাগ ও সেবার পরিণত সমন্বয়ে ভারতের জাতীয় শিক্ষা—তার বাঞ্ছিত পরিণতি অর্জন করবে। ভারতীয় শিক্ষা-সুন্দর জীবন--"তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা"-র আদর্শে সমুজ্জ্বল হ'বে—নিবেদিতা এই বিশ্বাস করেছিলেন। তাঁর মননায়—'সত্য'-ই শিক্ষার যথার্থ মৌলিক উপাদান।

নিবেদিতা ভারতীয় জীবন-ধর্ম অনুশীলন করে এই সত্যি বুঝেছিলেন যে আধ্যাত্মভাবের পরমানুভূতি ভারতীয় জীবন ধর্মকে রচনা করেছে। ভারতের বেদে-বিজ্ঞানে, সাহিত্য-দর্শনে, স্থাপত্যে-শিল্পে, সঙ্গীতে-সাধনায় এই পরম ভাবের নিগূঢ় অনুস্যূতি দেখা যায়। নিবেদিতার এই বিশ্বাস ছিল যে, অধ্যাত্ম ভাবের কেন্দ্র-চ্যুত ভারতীয় জীবন কোন সাধনারই পূর্ণতা পাবে না। উনিশ শতকের ভারত শিল্পের নব জাগরণের পুরোহিত অবনীন্দ্রনাথকে তাই তিনি ভারতীয় আদর্শে শিল্প-সাধনায় প্রাণিত করেছিলেন। এই নতুন প্রেরণা এবং প্রবণতায় অবনীন্দ্রনাথ শিল্পায়নে কেবল ভারত-পথিক-ই নন্,— তিনি বিশ্ব-শিল্প জগতে এক পৌরুষ-ধর্মী ঘরানা সৃষ্টি করেছেন।

নিবেদিতা ভারত শিল্পের নব জাগরণের অন্যতমা উদ্‌গাত্রী। নতুন আত্মবোধ তাঁকে নতুন সৃষ্টির ব্যঞ্জনায় প্রাণিত করেছিল। তিনি বুঝেছিলেন, যদি বিশ্ব-সভ্যতার শিল্প-লোকে ভারতকে পৌঁছুতে হয়,—তা' হ'লে তাকে শুধু পুরোনো রীতির জগতে বিচরণ করলে চলবে না,—নতুনকে বুঝতে ও গ্রহণ করতেও হ'বে। তিনি এ সম্পর্কেও স্বচ্ছ প্রজ্ঞাবতী ছিলেন যে, এই নতুনকে বোঝা আর গ্রহণ করার অর্থ এই নয় যে, ইতালীয় বা গ্রীসীয় শিল্প-রীতিতে ভারতীয় শিল্প-সাধনা করতে হ'বে নতুনকে গ্রহণ করেও শিল্প সাধনায় ভারতকে তার নিজস্ব-স্বাতন্ত্র্য সামগ্রিক ভাবে বজায় রাখতে হ'বে—তার স্বাতন্ত্র্য-চরিত্র কণা মাত্র ক্ষুণ্ণ হ'বে না—এই-ই নিবেদিতার ঈপ্সিত ছিল। নিবেদিতা বলেছিলেন: "যদি কোন ভারতীয় চিত্রকে প্রকৃত ভারতীয় ও মহৎ সৃষ্টি হ'তে হয়—তা, হ'লে তাকে ভারতীয় রীতিতে ভারতবাসীর হৃদয়ে আবেদন করতে হ'বে। তাকে এমন ভাব বা ধারণার ব্যঞ্জনা দিতে হ'বে—যা এ দেশীয় সকলের পরিচিত কিংবা তৎক্ষণাৎ উপলব্ধির যোগ্য।"—সৃষ্টির অনিন্দ্য সৌন্দর্য সাধনায় নিবেদিতার এই উক্তি অনস্বীকার্য। তাঁর এই বক্তব্যের সমর্থনে তিনি বলেছিলেন যে, যেমনি কোন কবি তাঁর সার্থক কবিতা বিদেশী ভাষাতে রচনা করেন না,—তেমনি কোন শিল্পীও তাঁর কালজয়ী সৃষ্টিকে অনুকৃত আঙ্গিকে রচনা করেন না। কারণ, চিত্রের উপাদান জাতীয় ভাষারই সগোত্রীয়। রচনা, অঙ্কন বা ভাস্কর্য—বা ওই জাতীয় যা' কিছু—কিছু মহৎ অভিব্যক্তির আবেদনে সমৃদ্ধ—এবং মানুষের মনের সহানুভূতি লাভ করতে চায়, নতুন প্রবণতা এবং প্রেরণা সৃষ্টি করতে চায়,—এক কথায় যা' শাশ্বত কিছু দিতে চায়— তা' কখনই অন্যভাষা, রীতি, বা অন্য রূপ আঙ্গিকে—মানুষের মনে সাড়া জাগায় না। 'চিত্রের ভাষা সার্বজনীন'—এই বিতর্ক তুলে লাভ নেই। জাতীয়

চরিত্রহীন সৃষ্টি কখন-ই শাশ্বতের আহ্বান আনতে পারে না। কিন্তু, একটী মনন-সর্ত স্মরণ রাখতে হ'বে যে, যথার্থ উচ্চ কোটির সৃষ্টি কেবল মাত্র জাতীয় রুচিসম্মত হ'লেই চলবে না,—সে শিল্পকে দর্শক মনে এমন দিব্য অনুভূতি সৃষ্টি করতে হ'বে—যার আবেদনে দর্শক নিজেকে উন্নততর ভাববে। নিবেদিতার কাছে এই নিহিত সত্য অজানা ছিল না।

শক্তির সাধনায় আত্ম নিবেদিতা এই প্রজ্ঞাময়ী ভারত সত্তার গভীরে এক পরমা শক্তির সক্রিয় অস্তিত্ব নিরীক্ষণ করেছিলেন। এই পরম অনুভূতিতে নিবেদিতার কাছে 'মৃন্ময়ী ভারতবর্ষ' 'চিন্ময়ী জগৎ মাতা'র স্বরূপে ব্যাপ্তত হ'য়ে উঠেছিল,—তিনি সমস্ত সৃষ্টি জুড়ে এক পরম সত্তার লীলা নিরীক্ষণ করেছিলেন। তিনি অনুভব করেছিলেন—সেই পরা মাতৃকা শক্তি,—সম্ভূতাস্তরাত্মিকা এবং ভারত মাতা বিচ্ছেদ বিচ্ছিন্ন নন,—একই অবিচ্ছিন্ন সত্তার লীলা প্রকাশ মাত্র। ভারতবর্ষ তাঁর কাছে তাই আত্ম-জননী ছিলেন। যার সত্তা থেকে সন্তানের সত্তাও মূলতঃ বিচ্ছিন্ন নয়। তিনি তাই বলেছিলেন যে : "মা!" এই সুন্দর শব্দটিতে সেই ভালোবাসার দিব্য অভিব্যক্তিই প্রকাশ পায়,—যে ভালোবাসা কোন পাবার দাবী না রেখে কেবল দিয়ে, কেবল ভালোবেসেই তৃপ্ত; যে ভালোবাসার জ্যোতি আমাদের স্বপ্নের অতীত, অথচ, তারই পুণ্য আলোক আমাদের স্নিগ্ধ স্নাত করে তোলে। শাশ্বত সূর্যের আলোর মতো যা আমাদের চারি দিকের জগৎকে উজ্জ্বল এবং পরিব্যাপ্ত করে রাখে। নিবেদিতা একান্ত ঘরোয়া বৃত্তের কথায় বলেছিলেন যে, মাতৃ-অঞ্জলি পাবার জন্যে কোন হিন্দু রমণীকে মূল্য দিতে হয় না। কারণ নিবেদিতা এই শাশ্বত সত্য উপলব্ধি করেছিলেন যে, ধর্ম এবং সংস্কৃতির পীঠভূমি ভারতবর্ষে—"মাতৃ পূজার অর্থ পবিত্রতা ও নিষ্ঠার পূজা।"

আমাদের সাম্প্রতিক জাতীয় জীবনে আজ যে দুর্যোগের ঝড় বয়ে যাচ্ছে—তার অনস্বীকার্য ঐতিহাসিক কারণ হ'লো—আমরা সংকীর্ণতা, প্রাদেশিকতা, সাম্প্রদায়িকতা এবং ক্ষুদ্র স্বার্থপরতা ভুলে একই ভারত আত্মার অখণ্ড জাতীয় ঐক্যের বিশ্বাসে আত্ম নিবেদন ক'রতে পারি নি,—বরং এক পাশবিক মাদকতার তামসিক মানসিকতায় আমরা আত্ম বিস্মৃত, পারস্পরিক হৃদয়হীন আচরণে মিথ্যার বেসাতি করে চলেছি। অথচ, ভারতবর্ষ কখনই এই তামসিক শিক্ষার স্রষ্টা নয়। আমাদের এ কালের যারা জাতির সেবক—দেশনেতা, তাঁদের কাছে ভারতবর্ষ আর 'চিন্ময়ী জগৎমাতা'—নন, —বিশ্ব ভূগোলের এক টুকরো ভূমিখণ্ড মাত্র। নেতাজী যে ভারতবর্ষকে - "My divine motherland"—বলে অভিহিত করেছিলেন, নিজের সত্তার গভীরে যে দেবী সত্তার অস্তিত্ব এবং অবিচ্ছিন্নতা অনুভব করেছিলেন—সমকালের আর কেউ সেই পরম সত্য অনুভব করলেন না কেন?—এই প্রশ্নের উত্তর আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথের উক্তিতেই হয়ত মিলবে : "আমরা যারা সংবাদ পত্রের শিরোনামায়,—তারা ভারতে জন্মেছি কিন্তু ভারতীয় নই।"—কি গভীর ব্যথার্দ্র এই উচ্চারণ! যদিও রাজনৈতিক আলোচনা আমার এ প্রবন্ধের কথা মাত্র উদ্দেশ্য নয়, তবুও এ কথা কি অস্বীকার করতে পারি যে, কেবল মাত্র বিশ্ব-যুদ্ধোত্তর দিনের নানান বিমিশ্র কারণেই ভারতীয় জীবন এবং জীবনবোধে এই চরম দুর্যোগ নেমে আসে নি,—এর জন্যে ভারতের মাটিতে অভারতীয় রাজনৈতিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়াও দায়ী। ঐ দু'টো বিশ্ব-যুদ্ধ বিশ্বের মানুষকে যে ক্ষতি করতে পারে নি—এক দেশ ভাগ তাই করেছে। অথচ স্বামীজীর মানস-পুত্র নেতাজী কি আগে নিয়েই না বলেছিলেন : "আমার কোন সন্দেহ-ই নেই যে, ভারত-বিভক্তি তার রাজনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক মৃত্যু অনিবার্য করে তুলবে। আমার দেবাত্ম মাতৃ-ভূমিকে খণ্ডিত কর না।"—কিন্তু ভারতের এই দেবাত্ম পরিচিতি অনুজদের পরিজ্ঞাত ছিল না। অথচ, নিবেদিতা এই সত্য-উপলব্ধির বলিষ্ঠ বিশ্বাস থেকেই বলেছিলেন : "ভারতবর্ষ এক, অখণ্ড, অবিভাজ্য। এক আবাস এক স্বার্থ ও এক সম্প্রীতির ওপরেই জাতীয় ঐক্য গঠিত।

আমি বিশ্বাস করি বেদ ও উপনিষদের বাণীতে, ধর্ম ও সংস্কৃতির সংগঠনে; মনীষী বুদ্ধের বিত্তানুশীলনে ও মহা মানবের ধ্যানায়তিতে যে শক্তি প্রকাশ পেয়েছিল—তাই পুনর্বার আমাদের মধ্যে উদ্ভূত হ'য়েছে,—আজকের দিনে তারই নাম—জাতীয়তা।"—জাতি ও জাতীয়তার প্রতি নিবেদিতা কি ভাব-মধুর শ্রদ্ধা-অর্ঘ্যই না নিবেদন করেছিলেন।

নিবেদিতার বিশ্বাস ছিল,-আধুনিক সভ্যতায় ভারতবর্ষই তার শ্রেষ্ঠ অবদান রাখবে। সৃষ্টির আদিম উষা কাল থেকেই ভারত বিশ্বকে চির কল্যাণের পথ নির্দেশ দিয়েই চলেছে। এ কোন আতিশয্যের উক্তি নয়,—ইতিহাসের শিক্ষা। নিবেদিতা ভারতের অন্তর্লীন শক্তিতে বিশ্বাস করতেন;—অনেক জন্ম-মৃত্যু পেরিয়েও যে শক্তিতে আজও—"চির যৌবনা, বীর্যশালিনী।"—হয়ত আগামী ভবিষ্যতে সেই নতুন দিনের নতুন প্রভাত আসবে।

দেবাত্ম ভারত মাতার পূজা বেদীতলে আত্ম নিবেদিতা—নিবেদিতার জীবন ধর্ম এবং বিশ্বাস ভারতের লোক জীবনে ভালোবাসার পবিত্র শিখায় জ্বলে উঠুক।

পৌরাণিক পিণ্ড

সন্তোষকুমার ঘোষ

স্বর্গরাজ্যে হঠাৎ বিপর্যয় কাণ্ড ঘটেছে। দেবতাদের প্রাণে আর লেশমাত্র ফুর্তি নেই। মনমরা হয়ে রীতিমত ঝিমিয়ে পড়েছেন সবাই। চিরবসন্ত, চিরযৌবন, চিরকালীন আয়ু—এসব অসহ্য ঠেকছে এখন। চাঁই-চাঁই হোমরা-চোমরাগোছের দেবতাদেরও একই হাল হয়েছে। মায় দেবরাজেরও। অমন যে বৈজয়ন্ত-প্যালেস্—যেখানে দিনরাত ফুর্তির ফোয়ারা ছোটে—তাও বিলকুল ঝিমিয়ে পড়েছে। যে সব পদস্থ আর মাতব্বর দেবতা দেবরাজের সভায় নিত্য হাজির দেন—তাঁদেরও মন আর কিছুতেই চাঙ্গা হচ্ছে না। খাঁটি সোমরস, নির্জলা সুরা, সুরাজাতীয় উত্তেজক পানীয়, গান-বাজনা, উর্বশী-মেনকা-রম্ভাদের নাচ—কোন কিছুরই আর মাদকতা নেই। অপ্সরাদের হাসির ঝিলিক, চোখের ইসারা, বিচিত্র অঙ্গভঙ্গী, ফষ্টি নষ্টি-ইয়ার্কি—সব কিছুই একঘেয়ে ঠেকছে। সবেতেই অরুচি ধরে গেছে।

কারণ অনুসন্ধানের জন্যে দেবরাজের দরবারে ঘন ঘন বৈঠক বসতে লাগল। নাওয়া-খাওয়া সব চুলোয় গেল। ঘুমেরও বারোটা বাজল। দিনে রাতে টন টন তেল পুড়তে লাগল। গ্রোস গ্রোস বাতিও জ্বলল ঝাড় ঝাড়। দেবতারা দিনের পর দিন বৃথাই গলদঘর্ম হয়ে উঠতে লাগলেন। কারণের কোন রকম পাত্তা মিলল না।

সাধারণ দেবতারাও একজোটে কোমর বেঁধে লাগলেন। নন্দনকানন সাফ করে বিরাট বিরাট সামিয়ানা টাঙিয়ে 'ম্যাস-মিটিং' শুরু হল। বিশদিন ধরে নাগাড়ে অধিবেশন চলল। বহুরকমের আলোচনা হ'ল। বহু তর্ক-বিতর্ক আর বাক্-বিতণ্ডার ঝড় উঠল। পিপে-পিপে স্বর্গীয়সুরা আর গাড়ি-গাড়ি দেবভোগ্য চানাচুর ইত্যাদিরও শ্রাদ্ধ হল। আসল কারণটির কিন্তু হদিস মিলল না। শেষে চিরাচরিত প্রথামত স্থির হল—সৃষ্টিকর্তার কাছে দলবেঁধে ডেপুটেশন যাবে। দরবারের

দেবতারাও উপায়ন্তর না দেখে একই রকমের প্রস্তাব গ্রহণ করলেন।

ব্রহ্মলোকে তখন ব্রাহ্মমুহূর্ত কেটে গিয়ে সবে ফরসা-ফরসা হচ্ছে। পিতামহ ব্রহ্মা প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে খাস কামরায় এসে বসলেন। ক'দিন ধরে ওঁর চার চারটে মাথা জুড়ে মহাদুর্ভাবনা ভর করেছে। উঠতে বসতে কেবলই ভাবছেন—মগজগুলো কত কল্পকাল ধরে তাহা অকেজো হয়ে পড়ে রয়েছে। ঘুণ ধরে ধরে দিন দিন বিগড়ে যাচ্ছে। এগুলোকে অবিলম্বে কাজে লাগানো দরকার। না হলে—

উনি তাড়াতাড়ি আফিঙের কৌটোটা খুললেন। ডবলমাত্রার বড় বড় চারটে বড়ি নিয়ে একে একে চার মুখে ফেলে দিয়ে চার ঢোঁক জলের সঙ্গে কোঁৎ কোঁৎ করে গলাধঃকরণ করলেন। অতঃপর নতুন কিছু একটা সৃষ্টি করবার মতলবে তাড়াতাড়ি পদ্মাসন করে বসলেন। দম এঁটে ধ্যানস্থও হলেন। নতুন একটা পরিকল্পনা খুলির মধ্যে সবেমাত্র দানা বাঁধবে-বাঁধবো করছে—মগজের ঠিক সেই মুহূর্তে দেবতাদের দু দল ডেপুটেশন হৈ হৈ করে এসে হাজির হল। ধ্যানে বাগড়া পড়ল।

নাটাও ভণ্ডুল হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। পিতামহ বিরক্তিভরে চোখ মেললেন। চারজোড়া ভুরুই ওঁর বেয়াড়াভাবে কুঁচকে উঠল। কিন্তু কোন কিছু বলার আগেই ডেপুটেশন দলের মুখপাত্ররা ওঁর সামনে এগিয়ে এলেন। করজোড়ে প্রার্থনার ভঙ্গীতে ওঁকে ঘিরে দাঁড়ালেন।

মুখপাত্রদের মুখচোখের অবস্থা দেখে পিতামহের বিরক্তভাবটুকু কেটে গেল। অল্পক্ষণের মধ্যেই করুণা-প্রবণ হয়ে উঠলেন উনি। সপ্রশ্ন দৃষ্টি তুলে বললেন—বৎসগণ, তোমাদের অভিপ্রায় কী?—শীঘ্র নিবেদন করো।

মুখপাত্রদের মুখপাত্র যিনি—তিনি বিনীতকণ্ঠে বললেন—পিতামহ, স্বর্গের সবকিছু একঘেয়ে হয়ে গেছে। ইন্দ্রপুরী, নন্দনকানন, পারিজাত-মন্দার, কল্পবৃক্ষ, অপ্সরা-অপ্সরী—সবাই নিতান্ত সেকেলে জিনিষ। কোন কিছুরই আর মাদকতা নেই। সবকিছুতেই অরুচি ধরে গেছে। আপনি স্বর্গটাকে ঢেলে সাজুন। দেবতাদের মনগুলোকে চাঙ্গা করে তুলুন।

অন্য মুখপাত্ররা সমস্বরে বললেন—তাই করুন পিতামহ।

পিতামহ বিস্মিত হয়ে বললেন—সে কি! স্বর্গে কি সুরা আর সোমরসের একান্ত অভাব হয়েছে! অত কাণ্ড করে সমুদ্রমন্থন করে তোমরা সুরাদেবীকে পেলে—তা তাকে কি স্বর্গ থেকে চিরকালের মত বিদায় করে দিয়েছ? সোমরসেরও আমদানি বন্ধ হয়ে গেছে নাকি হে?

মুখ্যমুখপাত্রটি সঙ্গে সঙ্গে বললেন—সুরাদেবীকেও বিদায় করা হয় নি। সোমেরও আমদানি বন্ধ হয় নি। শুনে আশ্চর্য হয়ে যাবেন পিতামহ—ভাঁড় ভাঁড় সোমরস আর হাঁড়া-হাঁড়া সুরা পান করেও দেহ মন আর আদৌ চাঙ্গা হয়ে ওঠে না।

অন্য মুখপাত্ররা সমস্বরে বললেন—ঠিক তাই পিতামহ।

বিস্মিত কণ্ঠে পিতামহ বললেন—তাই নাকি!

মুখ্য মুখপাত্রটি কাতর কণ্ঠে বললেন—আজ্ঞে হ্যাঁ পিতামহ। কিছুতেই আর তৃপ্তি পাচ্ছি না আমরা। সুরা বলুন—সুধাই বলুন—কোন কিছুতেই রুচি নেই আর। বিশ্বাস করুন, অমরতাতেও অরুচি ধরে গেছে।

অন্য মুখ পাত্ররা সমস্বরে বললেন—ঠিক তাই পিতামহ।

মহাবিস্ময়ের সুরে পিতামহ বললেন—অমরতায় অরুচি! বলো কি হে!

মুখ্যমুখপাত্রটি সঙ্গে সঙ্গে বললেন—আজ্ঞে হ্যাঁ পিতামহ। সেবার কাড়াকাড়ি করে অমৃত চেখেই আমরা কাল করেছিলুম। অমরতা এখন অভিশাপ বলে মনে হচ্ছে। অমৃতের বদলে আমরা এখন অন্য কিছুর ব্যবস্থা চাই।

অন্যমুখপাত্ররা সঙ্গে সঙ্গে সমস্বরে স্লোগান দিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন—ব্যবস্থা চাই—ব্যবস্থা চাই।

স্লোগান শুনে পিতামহ বিস্ময়ে প্রায় হতবাক্ হয়ে

গেলেন। চকিতের মধ্যে কিন্তু বিস্ময়ের ভাব কাটিয়ে উনি আবার ধ্যানস্থ হলেন। দেবতাদের অতৃপ্তির আসল কারণটা কী—ধ্যানযোগে তা চট্‌করে জেনে নিয়েই আবার চোখ মেললেন উনি। ওঁর চার মুখেই এবার স্মিতহাসি ঝিলিক দিয়ে উঠল। চারদিকে দন্তরুচি কৌমুদী ছড়িয়ে বললেন—তোমাদের আত্মাগুলোই বিগড়েছে দেখছি। অন্য কিছু নয়—অতৃপ্তির ব্যামো ধরেছে। অতৃপ্ত আত্মাগুলো নতুন স্বাদের কিছু চাখতে চাইছে।

পিতামহ আর বিলম্ব করলেন না। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিকারের উপায় বাৎলে দিলেন। বললেন—এক কাজ করো বৎসগণ, তাড়াতাড়ি বৈকুণ্ঠে গিয়ে বিষ্ণুকে খবর দাও। মহেশ্বরকেও ধরে পাকড়ে নিয়ে এসো। আবার ক্ষীরোদ সাগর মইতে হবে। তাছাড়া উপায় দেখছি নে।

আবার সমুদ্রমন্থন। সাবেক সব উপকরণই এল আবার। এবারও মন্দর পাহাড় হল মন্থনদণ্ড। নাগরাজ বাসুকী হলেন মন্থনরজ্জু। বেচারী বিষ্ণুকেও আবার কূর্মরূপ ধরে মন্থনদণ্ডটিকে পিঠে করে ধরতে হল। দেবতারা এলেন। মহামেহনতের ব্যাপার বলে দানবদেরও ডাক দেওয়া হল।

মন্থন শুরু হল। ত্রিভুবন জুড়ে রব উঠল—হেঁই-ও-জোয়ান—হিমন্ ওয়াস্ত।—হেঁই-ও-জোয়ান—হিমন্ ওয়াস্ত। মইতে মইতে দেব-দানব দুপক্ষই গলদ্‌ঘর্ম হয়ে উঠতে লাগল। সেবারে সব আগে দুধ আর ঘি উৎপন্ন হয়েছিল। এবারে সেরেফ চোনা আর গোময় উৎপন্ন হল। তারপর ক্রমান্বয়ে দুমুখো বলদ, পাঁচঠ্যাংওলা গাই, শিঙওলা গাধা, খুরওলা সিংহ, লাঙল-কোদাল, কাস্তে-কুড়ুল, শাবল-গাঁতি, বেলচে হাতুড়ি—এ সবই উঠতে লাগল। পিতামহ প্রমাদ গনলেন।—এ সব আবার কী! দেব-দানবদের দলপতিরা সঙ্গে সঙ্গে ভাগাভাগি করে নিলেন সব। পিতামহের নির্দেশে মন্থন চলতে লাগল। সেবারে শেষের দিকে অমৃতভাণ্ড নিয়ে ধন্বন্তরি উঠেছিলেন। এবারে পিণ্ডভরা একটি অক্ষয়ভাণ্ড নিয়ে উঠলেন—কূটনীতি দেবী। এঁর আসল চেহারাটা কারও দৃষ্টিগোচর হল না। মুখোশে ঢাকা মুখ। সর্বাঙ্গে নামাবলি জড়ান। কপট হাসি হেসে দেবী কূটনীতি অক্ষয়ভাণ্ডটিকে এগিয়ে ধরলেন। সঙ্গে সঙ্গে ভাণ্ড নিয়ে কাড়াকাড়ি শুরু হয়ে গেল। দেবাসুরে ঘোরতর সংগ্রাম বেধে গেল। বিষ্ণু তাড়াতাড়ি নিজ মূর্তি ধরে চার হাত তুলে গলা ফেড়ে চীৎকার করতে লাগলেন—তিষ্ঠ—তিষ্ঠ। ওটা অফুরন্ত ভাঁড়। অনন্তকাল ধরে গিললেও ও-ভাঁড়ের মাল ফতুর হবে না।

আশ্বস্ত হয়ে দেব-দানবরা রণে ক্ষান্ত দিলেন। পিণ্ড গেলা শুরু হল। তাল তাল পিণ্ড আকণ্ঠ গিলতে লাগল সবাই। নতুন জিনিষের স্বাদ পেয়ে দেবতারা তৃপ্তির নিশ্বাস ছাড়লেন। দানবেরাও তৃপ্তির ঢেঁকুর তুলে বললে—অহো, এতদিনে অমৃতের স্বাদ পেলাম।

পিণ্ডের অপার মহিমা। পিণ্ডি গেলার ফলে দেবতারাই শুধু চাঙ্গা হয়ে নেচে উঠলেন না—দেখতে দেখতে সারা স্বর্গের চেহারাও বিলকুল পাল্টে গেল। নন্দনকানন টুকরো টুকরো হয়ে ভাগাভাগি হয়ে গেল। দেবরাজের খাস মহলগুলোতেও একে একে জবরদস্ত দখলের নিশেন উঠতে লাগল। শেষে ইন্দ্রপুরীরও মৌরুসীস্বত্ব বেহাত হয়ে গেল। পারিজাত-মন্দারের কদর ঘুচে গেল। ঝুর ঝুর করে পাপড়ি খসতে শুরু হল। স্বর্গ মাতানো সুগন্ধও উধাও হয়ে গেল। কল্প-বৃক্ষেরও ডালে ডালে ঘুণ ধরল। নাচ-গানের পাট উঠে গিয়ে অপ্সরারাও তাই বেকার হয়ে পড়ল।

শাসন ব্যাপারেও সব কিছু ওলট-পালট হয়ে গেল। রাজতন্ত্র শিকেয় উঠল। গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, দলতন্ত্র, মজদুরতন্ত্র, হুজুরতন্ত্র—হরেক রকমের তন্ত্র একে একে মাথা চাড়া দিতে লাগল। সাম্যবাদ-একাকারবাদ-হুমকিবাদ-জুলুমবাদ-যথেচ্ছাচারবাদ—নানা রঙের আর নানা ঢঙের মতবাদও গলা চড়িয়ে আওয়াজ তুলতে শুরু করলে। বড় সাধের বৈজয়ন্ত-প্যালেস ছেড়ে বেচারী দেবরাজকে বউ-ছেলেদের হাত ধরে স্বর্গের একটেরে নিতান্ত সাদা-মাটা একটা বাসায় গিয়ে উঠতে হল। সিংহাসন নিয়েও কাড়াকাড়ি লেগে গেল। সারা স্বর্গ জুড়ে মহাউত্তেজনায়

বান ডাকলো। মতিস্থির রইল না আর কারও। বিশ গণ্ডা দলে বিভক্ত হয়ে গেলেন দেবতারা। যে যার দলীয় ঝাণ্ডা উঁচিয়ে আস্ফালন করতে শুরু করে দিলেন। পোষ্টারে-পোষ্টারে, ইস্তাহারে-ইস্তাহারে সারা স্বর্গ ছেয়ে গেল। পাঁচিল-দেওয়াল, রোয়াক-দালান, কার্নিস-করিডর—চিত্রবিচিত্র হয়ে উঠল। স্লোগানে স্লোগানে আকাশ বাতাস ভরে গেল। বাক্‌যুদ্ধ স্লোগানযুদ্ধ খিস্তিখেউরের যুদ্ধ—পোষ্টারের লড়াই, ইস্তাহারের লড়াই, হুমকি-আস্ফালনের লড়াই—এসব চলল দিন-কতক। তারপর যে যার হাতিয়ার নিয়ে তুমুল তাণ্ডবে মেতে উঠলেন। অনেকে হাত-পা খোয়ালেন—অনেকের ধড়-মুণ্ড বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। তবু উত্তেজনার তোড় থামল না। সমাজ-সংসারও তছনছ হয়ে গেল। দেবীরাও সব গাছকোমর বেঁধে হাতিয়ার নিয়ে দলাদলিতে মেতে উঠলেন। বাপ-ছেলে, মা-মেয়ে, ভাই-বোন, স্বামী-স্ত্রী—সব সম্পর্কের বাঁধনই ছিঁড়ে-খুঁড়ে গিয়ে কিম্ভূতকিমাকার হয়ে গেল। উদ্দাম আর উদ্দণ্ড হয়ে উঠিতে বাকি রইল না আর কেউই। কে কার কথা শোনে। কে কার কথা ভাবে। কেউ বা কার তোয়াক্কা করে। যে যার দলীয় মতবাদ নিয়ে উন্মত্ত হয়ে উঠলেন।

ব্রহ্মলোকে পিতামহের ঢুলুনি আসছিল। নিদ্রামগ্ন হবার আগে হঠাৎ উনি ধ্যানযোগে স্বর্গের অবস্থাটা একবার চট্ করে দেখে নিলেন। দেবতাদের মধ্যে পুরোদমে পিণ্ডের প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছে দেখে—উনি মুচকে মুচকে বার কয়েক হাসলেন। তারপর তাকিয়ায় হেলান দিয়ে চার জোড়া চোখই বুজিয়ে ফেললেন। সঙ্গে সঙ্গে নাক ডাকতে শুরু হল।

পুরো একটি কল্প কাটতে না কাটতেই পিতামহকে কিন্তু হঠাৎ চোখ খুলতে হ'ল। দেবতারা আবার দলে দলে এসে ওঁর দরজায় ধাক্কা দিতে লাগলেন। দরজা খুলতেই দলপতিরা সেবারের মত ওঁকে চারিদিক থেকে ছেঁকে ধরলেন।

দলপতিদের চেহারা দেখে চমকে উঠলেন পিতামহ। দেহের কোথাও মাংসের অস্তিত্ব বলতে আর কিছুই নেই। খট্‌খট্ করছে শুধু হাড় আর হাড়। পিতামহ বিস্ময়ের সুরে বললেন—কী ব্যাপার হে। এ কী হাল হয়েছে তোমাদের।

দলপতিরা সমস্বরে চিঁ চিঁ করে উঠলেন। গলার স্বরও বেয়াড়া রকম খোনা হয়ে গেছে বেচারীদের। খোনা গলায় কোন রকমে বললেন—পিণ্ডি গেলার ফলেই আমাদের এই হাল হয়েছে পিতামহ।

পিতামহ বিস্ময়ের সুরে বললেন—সে কি। তোমরা তো প্রথমটায় বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠেছিলে হে। টাট্টু ঘোড়ার মত লাফালাফি করতেও শুরু করে দিয়েছিলে।

দেববৈদ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয়ও এসেছিলেন। তাঁরা তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে বললেন--ম'রে ভূত হবার পরেই পিণ্ডিগেলার ব্যবস্থা আছে পিতামহ। আয়ুর্বেদেরও নির্দেশ তাই। দেবতারা জ্যান্ত অবস্থায় পিণ্ডি গিলেই কাল করেছেন। পুরোদমে প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছে। আসল ভূত-প্রেতদের মতই চেহারা হয়েছে তাই। দেবত্বও গোল্লায় গেছে।

অসময়ে ঘুম ভাঙার দরুণ পিতামহের চার মুখেই ঘন ঘন হাই উঠতে লাগল। তুড়ি দিতে দিতে উনি বললেন--তোবা—তোবা। দেহ তো গোল্লায় গেছেই দেখছি—তা মাথার ঘিলুটিলুগুলো আস্ত আছে তো হে?

দলপতিরা আবার চিঁ চিঁ করে উঠলেন। কোন রকমে বললেন—হরেক রকমের মতবাদ গজিয়েছে। মাথার মধ্যে সে সব পোকার মত গিজগিজ করছে পিতামহ। মগজগুলোকেও কুরে কুরে খেয়ে প্রায় সাফ করে এনেছে।

পিতামহ বিস্ময়ের সুরে শুধু বললেন—বলো কি হে।

দলপতিরা সঙ্গে সঙ্গে বললেন,—আজ্ঞে হ্যাঁ পিতামহ। একটু দক্ষিণ হাওয়া,—একফালি চাঁদের আলো—একছিটে গানের সুর—কি এক কলি কবিতার ঝঙ্কার—এসব আর মাথার মধ্যে ভরে সেঁদুতেই

পারে না। বিশ্বাস করুন—আমরা খাঁটি ভূত বনে গেছি পিতামহ।

পিতামহ আবার হাই তুললেন। আবার তুড়ি নিয়ে বলে উঠলেন—তোবা—তোবা। তা এখন কী চাও তোমরা?

দলপতিরা আবার খোনাগলায় চিঁ চিঁ করে উঠলেন। করজোড়ে বিনীত ভাবে বললেন—আমরা দেবত্ব ফিরে পেতে চাই পিতামহ।—আমাদের দেবত্ব ফিরিয়ে আনুন।

পিতামহ আবার হাই তুললেন। আবার তুড়ি মেরে শুধু বললেন—তোবা! তোবা! পরক্ষণেই চোখ বুজে ধ্যানস্থ হলেন উনি। মুহূর্তকয়েক পরেই কিন্তু আবার চোখ খুললেন। চোখ খোলার সঙ্গে সঙ্গেই উপায়ও বাৎলে দিলেন। উদাত্ত কণ্ঠে বললেন—বৎসগণ, দ্বিতীয় সমুদ্রমন্থনে যা-যা উঠেছিল—অর্থাৎ শাবল-গাঁতি থেকে শুরু করে মায় পিণ্ডের অক্ষয় ভাণ্ডটি পর্যন্ত—সবকিছুকে অবিলম্বে ঝেঁটিয়ে স্বর্গ থেকে বিদায় করে দাও। ওসব জঞ্জাল সাফ হয়ে গেলেই—আস্তে আস্তে তোমরা আবার দেবত্ব ফিরে পাবে। স্বর্গও আবার আগের মত হয়ে উঠবে।

আবার চিঁ চিঁ করে উঠলেন দলপতিরা। বিনীত কণ্ঠে বললেন—জঞ্জাল ঝেঁটিয়ে কোন্ ভাগাড়ে পাঠাব প্রভু?

পিতামহের চার মুখই এবার হাস্যমণ্ডিত হয়ে উঠল। বললেন—পিণ্ডি গেলার আগে তোমাদের যেমন অবস্থা হয়েছিল—মর্ত্যবাসীদেরও এখন ঠিক সেই ধরণের হাল হয়েছে। স্বর্গীয় কিছুর স্বাদ পাবার জন্যে হাঁই-হাঁই করে মরছে এখন মর্ত্যবাসীরা। তাড়াতাড়ি জঞ্জালগুলোকে ঝেঁটিয়ে মর্ত্যের দিকে পাঠিয়ে দাও।

অতঃপর ব্রহ্মার নির্দেশ মত স্বর্গে মহা আড়ম্বরে ঝাঁট দেওয়া শুরু হয়ে গেল। ঝাঁটানো জঞ্জাল সব একে একে মর্ত্যে গিয়ে পড়তে লাগল। দুমুখো বলদ, পাঁচ ঠ্যাঙ ওলা গাই, শিঙওলা গাধা, খুরওয়ালা সিংহ, লাঙল, কোদাল, শাবল, গাঁতি, বেলচে, হাতুড়ি—কোন কিছুই আর পড়তে বাকি রইল না। শেষে পিণ্ডভরা অক্ষয় ভাণ্ডটিও মর্ত্যের বুকে আছড়ে পড়ল। জঞ্জাল-পড়া জায়গাগুলো দেখতে দেখতে এক একটি পীঠস্থান হয়ে উঠল। তীর্থের কাকের মতই 'হা-পিত্যেশ' করে বসেছিল এতদিন মর্ত্যবাসীরা। মহাসম্পদ ভেবে স্বর্গীয় জঞ্জালগুলোকে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে কাড়াকাড়ি শুরু করে দিলে। পিণ্ডি গেলার জন্যেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়ে গেল। অমৃত ভেবে তাল তাল পিণ্ডি গিলতে লাগল সবাই। প্রতিক্রিয়াও শুরু হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে।

পিতামহ মুচকে হেসে আফিঙের কৌটো খুললেন। পুরোমাত্রার চারটি বড়ি চার মুখ দিয়ে গিলে চোখ বুজিয়ে যথারীতি ঝিমতে শুরু করলেন। সঙ্গে সঙ্গে নাকও ডাকতে লাগল। কবে যে আবার চোখ খুলবেন—তা পিতামহই জানেন।

আক্রমণমন্যতা, হিংস্রতা, ধ্বংসকামিতা প্রভৃতির মূলে

শ্রীসন্তোষ কুমার দে

জানি নে কেন হঠাৎ আজ সমগ্র দেশ হিংসায় উন্মত্ত হয়ে উঠেছে। "তুমি আমার শত্রু, তোমায় শেষ করে ফেলব", এই মনোভাব যেন সমাজকে পেয়ে বসেছে। ব্যক্তি ও দলের এই উন্মত্ত মনোভাবের প্রভাব ক্রমে এসে পড়েছে সমাজে আর তাকে করে তুলেছে অস্থির। তাই দেখি আকাশে বাতাসে যেন ধ্বনিত হচ্ছে বিদ্রোহ, হিংস্রতা, নৃশংসতা আর আক্রমণ-মন্যতার উন্মত্ত কোলাহল। বিচার, বিবেক, দয়া দাক্ষিণ্য, ক্ষমা, নীতিবোধ যেন দল বেঁধে এক সঙ্গে পাঁকের কুণ্ডে মুখ থুবড়ে আছড়ে পড়েছে। মানুষ যেন রাক্ষস হয়ে উঠেছে, তাই বুঝি রাক্ষসকেও ছাড়িয়ে গেছে।

এই কলকাতা শহরের কথাই ধরা যাক না কেন, যে কলকাতা একদিন ভারতের সমস্ত শহরের মধ্যে কহিনুরের মত আপন দীপ্তিতে ছিল উজ্জ্বল ও ভাস্বর, আজ সে হঠাৎ হয়ে উঠেছে এক দুঃস্বপ্নের নগরী; যেন বাইবেল বর্ণিত ব্যাবেল শহর—যেখানে কেউ কার ভাষা বোঝে না, কেউ কার মনোভাব জানে না। এখানে পথে পথে গুপ্ত হত্যা, মোড়ে মোড়ে আক্রমণ, গলিতে গলিতে লুণ্ঠন সাপের মত ফণা উঁচিয়ে আছে। কেউ জানে না কখন কার "আঁধার রজনী আসিবে মেলিয়া পাখা", কার শেষ নিঃশ্বাস কোথায় পড়বে। আজ এক পাড়ার লোক আর এক পাড়ায় পা বাড়াতে সাহস পাচ্ছে না, সন্ধ্যার পর শহরের রাস্তা নিঝুম, কেউ বাইরে আসে না, ট্যাক্সি-আলা অজানা যায়গায় যেতে রাজী হয় না। (অবশ্য এ-অবস্থা এখন আর নেই বললেই চলে, ভয়ের কালো মেঘ কেটে গেছে।) তরুণরা যেন হঠাৎ উন্মত্ত হয়ে রক্তস্নান ও নৃশংসতার মধ্যে রোমাঞ্চ ও পুলক সন্ধানে বার হয়েছে। অনেক ভাল ভাল ছেলেও উগ্রপন্থী হয়ে পড়েছে—উগ্রতাকে মূলধন করে, বিবেক বুদ্ধি সব বিসর্জন দিয়ে হিংস্র কাজে নেমে পড়েছে। "ওরা ঝঞ্ঝার মত উদ্দাম, ওরা ঝরণার মত চঞ্চল, ওরা বিধাতার মত নির্ভয়" হয়ে আত্মঘাতী ভ্রাতৃদ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হয়েছে। এরা ধ্বংস করছে "নব সৃষ্টির মহানন্দে" নয়—শুধু ধ্বংসের জন্যেই। সত্য শিব সুন্দরের স্বপ্ন দেখবার ক্ষমতা একেবারেই হারিয়ে ফেলেছে। ওরা "হিংসার উন্মায় দারুণ অধীর"।

আজকের এই অসহনীয় অবস্থা শুধু কলকাতাতেই নয়, আমেরিকার শিকাগো, বোষ্টন, ন্যু ইয়র্ক প্রভৃতি বড় বড় শহরের অবস্থা আরও ভয়ঙ্কর। বড় শহরের ৫৫ শতাংশ অধিবাসী বাড়িতে থাকার সময়েও দরজা তালা বন্ধ করে রাখে, ৪৮ শতাংশ লোক রাতে কোন পার্কে থাকে না, ৩৩ শতাংশ লোক দিনের বেলাতেও পার্কমুখো হয় না, ৪১ শতাংশ খুনোখুনি মারামারির ভয়ে শহরের জনাকীর্ণ অংশে ভোজনাগারে, পানশালায় ঢোকে না, থিয়েটার সিনেমা দেখতে পারত পক্ষে যায় না, ৩৯ শতাংশ লোক ঐ একই কারণে নিজেদের এলাকায় বাইরে যেতে ভয় পায়, ২৯ শতাংশ লোক আত্মরক্ষার জন্যে পাহারার বন্দোবস্ত করেছে আর ১৬ শতাংশ নিরাপত্তার জন্যে বন্দুক পিস্তলাদি ক্রয় করেছে। ভয় সেখানে এমন চরমে উঠেছে যে, যেসব বাড়ি নতুন তৈরি হচ্ছে সেগুলোর প্ল্যান সম্পূর্ণ নতুন ধরণের হচ্ছে—বাড়ির চার দিকে উঁচু দেওয়াল উঠছে, রাস্তার দিকে দরজাজানালা রাখা হচ্ছে না, বাড়ির সদর রাস্তার দিকে না করে ভেতর দিকে বা পিছন দিকে করা হচ্ছে; আর তার সঙ্গে

থাকছে ইলেকট্রনিক ব্যবস্থা—চোর ডাকাত ঢুকলেই আপনা থেকেই বিপদ-সূচক ঘন্টা বেজে উঠবে আর সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বাড়ি আলোকিত হয়ে উঠবে। এছাড়াও নগরবাসীরা দরজায় লাগাচ্ছে আধুনিকতম মজবুত তালা, আর দরজায় থাকছে বড় বড় হিংস্রজাতের কুকুর বা অবস্থা অনুসারে সশস্ত্র প্রহরী।

গত দশ বছরে সেখানে অপরাধের সংখ্যা অপ্রত্যাশিত ভাবে বেড়ে গিয়েছে। একখানি আমেরিকান পত্রিকার হিসেব অনুসারে অপরাধের সংখ্যা নিম্নরূপ :—

১৯৬০ সালে অপরাধের সংখ্যা ছিল	১০%
১৯৬১	১২%
১৯৬২	১৮%
১৯৬৩	২০%
১৯৬৪	২৫%
১৯৬৫	৪০%
১৯৬৬	৬০%
১৯৬৭	৮০%
১৯৬৮	১১০%

এইভাবে অপরাধের সংখ্যা প্রতি বছরেই বেড়ে চলেছে। এখন বোধ হয় অপরাধের সংখ্যা ২০০%। এই দেখে অনেকে মন্তব্য করেছেন, আমেরিকা কি পাগলামির পিঠস্থান হয়ে উঠল?

সাধারণ মনুষ এতই আতঙ্কগ্রস্ত যে দরকার না হলে বাড়ির বাইরে পা বাড়ায় না। যখন রাস্তায় বার হয় চোখের সুমুখে সাহায্যের জন্যে কাউকে প্রাণপণে চীৎকার করতে দেখলে, বা বন্দুক পিস্তলের আওয়াজ শুনলে সেদিকে কান দেয় না, বা সাহায্যের জন্যে এগিয়ে না গিয়ে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত ও উদাসীনভাবে রাস্তা পার হয়ে চলে যায়, ভয় পাছে আবার এই হাঙ্গামায় জড়িয়ে পড়ে। হয়ত কোন কোন স্ত্রীলোক বা বৃদ্ধ আক্রান্ত হয়ে সাহায্যের জন্যে চীৎকার করছে, হয়ত কোথাও ছিনতাই হচ্ছে, নয়ত পুলিশ আক্রমণকারীকে আয়ত্ত করবার জন্যে গুলি ছুড়ছে। চোখের সুমুখে এসব দেখেও, পথচারীরা নিজ নিজ জীবন বাঁচাবার জন্যে চটপট সেখান থেকে সরে পড়ছে। (ঠিক এমনি অবস্থা কিছুদিন আগে আমাদের এই কলকাতা শহরেই হয়েছিল।)

অবস্থা দেখে আমেরিকার সমাজ বিজ্ঞানী, মনোবিদ, শিক্ষাব্রতী ও বিজ্ঞানীরা মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন। ভাবতে লাগলেন, কেন এমন বিগড়ে গেল দেশের তরুণেরা, কোথায় গেল তাদের সামাজিক মূল্য বোধ, ন্যায়নীতির ধারণা। ঠিক এমনি সময় নিউহাভেন, কনেকটিকাটের ঈয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল আব মেডিসিনের অধ্যাপক ডাঃ এম আর ডেলগাডো তাঁর অভয় বাণী নিয়ে উপস্থিত হলেন। উগ্রপন্থী সমাজ-বিরোধীদের আক্রমণমুখিনতাকে দমন করবার এক নতুন উপায় তিনি আবিষ্কার করেছেন বললেন। তাঁর নিজের কথা হল, "আচরণতত্ত্ব অনুধাবন করবার জন্যে আমরা এক নতুন পন্থা, এক নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছি।" তিনি আশ্বাস দিচ্ছেন, তাঁর এই নতুন পদ্ধতি অনুসরণ করলে মানুষ সুস্থিত ও শুভবুদ্ধি সম্পন্ন নাগরিক হয়ে উঠবে। তাঁর এই পদ্ধতিটি হল—মস্তিষ্কের গভীরে বৈদ্যুতিক উদ্দীপনা উৎপাদন—সংক্ষেপে E.S.B. (Electric Stimulation of the Brain)। তিনি এক নতুন "মনস্তত্ত্ব-সম্মত সভ্য" সমাজের উদ্গাতা। এই সমাজের সভ্যেরা মানুষের মনন কার্য নিয়ন্ত্রিত ও প্রভাবিত করে মানুষকে এক নতুন সুষম সমাজ গঠনে সহায়তা করবে। তাঁর এই আবিষ্কারের কথা "ফিজিক্যাল কনট্রোল আব্ দি মাইণ্ড" নামে পুস্তকে তিনি বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। এই পুস্তকের এক সংক্ষিপ্ত বিবরণ আগষ্ট সংখ্যা 'স্প্যান' পত্রিকায় বার হয়েছে। মানুষের ক্রমবর্ধমান উগ্রতা আক্রমণ-মুখিনতার অবিচ্ছিন্ন আত্মপ্রকাশ এবং সব রকমের গর্হিত সমাজ-বিরোধী আচরণ দানা বাধবার আগেই অঙ্কুরে বিনাশ করা সম্ভব, আর মানুষের মনন কার্যও নিয়ন্ত্রিত করা এখন আয়ত্তের মধ্যে বলে তিনি জগৎ সভাকে জানিয়েছেন। তাঁর নিজের কথা হল,—

"We are very close to having the power to construct our own mental functions, through a

knowledge of genetics (which I think will be complete within the next 25 years), and through a knowledge of the cerebral mechanisms which underlie our behaviour."

তাঁর মতে উদ্বেগ ভয়, আক্রমণমগ্নতা সবারই অস্তিত্ব মস্তিষ্কের ভেতরে। মস্তিষ্কের যে অংশে এদের অবস্থিতি সেই অংশে বিদ্যুৎ শলাকা (ইলেকট্রোড) প্রবেশ করিয়ে দিয়ে এদের দূর করা সম্ভব।

এই জন্যে "উনবিংশ শতাব্দীর উন্মাদ আবিষ্কারক ও মায়াবী বিজ্ঞানকুশলী" (তাঁর সহকর্মীদের ভাষায়) ডাঃ ডেলগাডো ষ্টিমোরিসিভার নামে একটি যন্ত্র আবিষ্কার করেছেন। এই যন্ত্রটির সাহায্যে মস্তিষ্কের কিছু কোষকে বিদ্যুৎ প্রবাহ দিয়ে উদ্দীপিত করা যায়, আবার মস্তিস্কের উত্তেজনার বিদ্যুৎ তরঙ্গের অনুলেখন গ্রহণ করা সম্ভব।

এই ষ্টেমোরিসিভার যন্ত্রটী আবিষ্কারের ছ বছর পরে স্পেনের এক ষাঁড়ের লড়ায়ে অংশগ্রহণ করে কিভাবে ক্রোধ ও হিংস্রতাকে দমন করা যায় তার এক পরীক্ষা হাতে কলমে দেখিয়ে দেন। কারডোভার কাছে এক মাঠে ষাঁড়ের মল্লযুদ্ধের রঙ্গভূমির মধ্যে মাতাদোর বেশে প্রবেশ করে ডাঃ ডেলগাডো লাল রুমাল নেড়ে একটা দুর্দান্ত ষাঁড়কে ক্রোধমত্ত করলেন। ষাঁড়টি মাথা নিচু করে ধারালো শিং দিয়ে তাঁকে আক্রমণ করবার জন্যে সবেগে ছুটে এল, কিন্তু আক্রমণ করবার আগেই ডাঃ ডেলগাডোর হাতে যে ছোট্ট রেডিও ট্রান্সমিটার যন্ত্রটি ছিল, তার বোতাম টেপা মাত্র উন্মত্ত ষাঁড়টি যেন হঠাৎ "থমকি থেমে গেল পথ মাঝে"। তারপর ডেলগাডো সাহেব আর একটি বোতাম টিপলেন, ব্যস। আর যাবে কোথায়? ষাঁড়টা আস্তে আস্তে ভাল মানুষের মত বেড়ার দিকে চলে গেল। অবশ্য এর আগেই ষাঁড়টির ক্রেনিয়ান ভল্টের ভেতর তড়িৎবহ শলাকা প্রবিষ্ট করান হয়েছিল। রেডিও উদ্দীপন ষাঁড়টির মস্তিষ্কের নিস্তেজনা ক্ষেত্রকে প্রসারিত করে তার আগ্রাসন শক্তিকে একেবারে স্তিমিত করে দিয়েছিল। সাক্ষাৎ মৃত্যুর দূতস্বরূপ ঐ ভয়ঙ্কর ষাঁড়টিকে মুহূর্তের মধ্যে নিরীহ মেষশাবকে পরিণত করার খবরটি সেদিন সমস্ত সংবাদ পত্রে বড় বড় শিরোনামায় ফলাও করে প্রকাশিত হল, আর রাতারাতি ডাঃ ডেলগাডো হয়ে উঠলেন পৃথিবী বিখ্যাত। দূর থেকে রেডিও নির্দেশে আচরণ নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে এখন পণ্ডিত সমাজে নানা কল্পনা জল্পনা চলছে।

এই চমকপ্রদ প্রদর্শনীর পূর্বে ডাঃ ডেলগাডো অবশ্য শিম্পাঞ্জী ও রেশন বানরের মস্তিষ্কে তড়িৎ প্রবাহ উদ্দীপনায় ফল পরীক্ষা করে দেখতে পেয়েছিলেন, এর প্রভাবে আক্রমণের তীব্রতা বহুল পরিমাণে কমে যায়। তাঁর মত কয়েকজন ঈয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বানরের টেম্পোরাল লোবে অস্ত্রোপচার করে অনুরূপ ফল পেয়েছেন। ডেলগাডোর আগে James Olds প্রমাণ করেছিলেন, মানুষের মস্তিষ্কের Hypothalmus প্রদেশে সুখের কেন্দ্র, যন্ত্রণা কেন্দ্র, বিবাদ কেন্দ্র প্রভৃতি ছোট ছোট কেন্দ্র আছে।

ডাঃ ডেলগাডো এবং তাঁর সহকর্মীরা এখন আক্রমণ-প্রবণতা, হিংস্রতা প্রভৃতি টেম্পোরাল লোবের গভীরে বাসা বেঁধে থাকে বলে প্রমাণ করতে চাইছেন; কিন্তু স্নায়ুমস্তিষ্ক এবং শারীর বৃত্তিক মনোবিজ্ঞানীরা একথা এখনও পর্যন্ত মেনে নিতে চাইছেন না। সম্প্রতি ইউনেস্কোয় এক বিজ্ঞান সম্মিলনে ডাঃ ডেভিড হামবুর্গ নামে এক আমেরিকান বিজ্ঞানী বলেছেন, শিশুদের মধ্যে আক্রমণমগ্নতা ও হিংস্রতা প্রভৃতির মূলে রয়েছে Testosterone নামে পুরুষ দেহস্থ অন্তঃস্রাবী গ্ল্যাণ্ড নিঃসৃত রসের (হর্মোনের) আধিক্য। Dr. Hamburg attributed aggression in children to the presence of an abnormally high amount of male sex harmone Testosterone in their mothers। পুরুষের অণ্ডকোষ হইতে নিঃসৃত টেসটোসটার্ণ নামে এই হর্মোনের আধিক্য বালকদের হিংস্র ও নৃশংস করে তোলে। বর্তমানে এই টেসটোসটার্ণকে নিয়ন্ত্রিত করবার মত কোন উপায় আবিষ্কৃত হয় নি; তবে বিজ্ঞানীরা আশা করেন, আগামী দু তিন দশকের মধ্যেই এই হর্মোনকে নিয়ন্ত্রিত

করে সমাজে ভবিষ্যৎ চেঙ্গিজ খাঁ, ইয়াহিয়া খাঁর জন্ম চিরতরে বন্ধ করে দিতে পারবেন। গর্ভস্রাব না ঘটিয়ে স্ত্রীলোকদের মধ্যে এই হর্মোনের অতিক্ষরণ বন্ধ করে যতটুকু প্রয়োজন শুধু ততটুকুই রেখে সমাজকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে বিজ্ঞানীরা আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। তাঁদের এ চেষ্টা সফল হলে, অনেক নরপশু আর নতুন করে জন্মাবে না।

যাই হোক আমাদের ধারণা আক্রমণপ্রবণতা, ধ্বংসকামিতা প্রভৃতি বৃত্তিগুলো সহজাত বা বংশানুক্রমিক নয়। এরা হল পরিবেশগত অর্জিত অভ্যাস। এই ধারণার মূলে রয়েছে ডাঃ ডেলগাডোর এখন পর্যন্ত আক্রমণধর্মী কোন বংশাণু বা জিনের সন্ধান দেবার অক্ষমতা। যখন এই আক্রমণধর্মী জিনের প্রমাণ পাব তখন তাঁর কথা মেনে নিতেই হবে। তার আগে নয়। টেম্পোরাল লোবে অস্ত্রোপচার করে ধ্বংসকামিতার হাত থেকে মানব জাতিকে বাঁচানো সম্ভব বলে মনে হয় না। হলে মানুষ আর মানুষ থাকবে না—সে হবে ইলেকট্রনিক খেলনা। সেটা কি কাম্য? শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন, "মানুষকে সাহায্য কর, কিন্তু তাকে হীনবীর্য করো না। মানুষকে পথ দেখাও, শিক্ষা দাও, কিন্তু দেখো তাদের কর্মপ্রবণতার সামর্থ্য, তাদের স্বকীয়তা যেন অক্ষুণ্ণ থাকে। একথা ভাববার মতো।

আমাদের এখনও ধারণা জন্ম-অপরাধী কেউ নয়, অপরাধপ্রবণতা মানুষের ললাট লিখন নয়। সে অবস্থার ক্রীড়নক মাত্র—তার মধ্যে দানব ও দেবতা এক সঙ্গেই বাস করে। শিক্ষার অভাবে ও পরিবেশের প্রভাবেই মানুষ অপরাধী হয়ে ওঠে, তার হিংস্রতা, আক্রমণ মুখিনতা প্রবল হয়ে ওঠে। আমাদের এই মতের অনুকূলে যুক্তি প্রমাণাদি কিছু কিছু দিতে এখন চেষ্টা করছি।

অপরাধ-প্রবণতার নানা কারণ।

মানুষ ক্রোধী, অপরাধপ্রবণ ও হিংস্র হয়ে ওঠে অনেক কারণে। প্রথমে একটি সাধারণ কারণের কথা উল্লেখ করা যাক। কোলাহল মুখরিত, ঘনসংবদ্ধ জনাকীর্ণ শহরে "ইটের পরে ইট, মাঝে মানুষের কীট" যে ভাবে বাস করছে, বিরাট বিরাট রাজধানীর পাষাণ কারা যে ভাবে মানুষকে "বিরাট মুঠি তলে চাপিছে দৃঢ় বলে" তার প্রভাব কি মানুষের ওপর কিছুই পড়বে না? নিশ্চয়ই পড়বে। পরীক্ষা করলে দেখা যাবে, বড় বড় শহরের অধিবাসীরা মানসিক ও আবেগ-গত ভাবে নিশ্চয়ই সুস্থ ও স্বাভাবিক নয়। এবিষয়ে সেনেটর টমাস ডড কয়েক বছর আগে বড় বড় শহরের ছেলে-মেয়েদের নিয়ে এক সমীক্ষা চালিয়ে যে প্রতিবেদন পেস করেন তাতে দেখা যাচ্ছে যে, তিনি ৪৫ লক্ষ আমেরিকান কিশোর-কিশোরীদের মানসিক চিকিৎসার প্রয়োজন বলে উল্লেখ করেছেন। ঐ রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে যে, ৫-১৭ বছর বয়সের আমেরিকান ছেলে-মেয়েদের মধ্যে প্রতি দশজনের মধ্যে একজনকে অসুস্থ আচরণ করতে দেখা যায়। তরুণ অপরাধীদের বেশীর ভাগ এই অসুস্থ আচরণশীল ছেলেমেয়েদের মধ্যে থেকেই এসেছে। লসএঞ্জেলসের ন্যাশনাল ইনসটিটিউট অব্ মেন্টাল হেলথের বিশেষ পরামর্শদাতা ডাঃ এডউইন স্নাইডম্যান, ডাঃ টমাস এস ল্যাংগনার এবং ডাঃ ডানা ফারনস্ওয়ার্থ মিলিত ভাবে যে প্রতিবেদন দাখিল করেন তা উপরোক্ত রিপোর্টের সঙ্গে হুবহু মিলে যায়।

আমেরিকার মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরের লোকেরা অতি উচ্চ বিশালকায় গগনচুম্বী অট্টালিকার ফ্ল্যাটে বাস করে থাকেন। এই সব সুউচ্চ অট্টালিকায় ঠাসাঠাসি ভাবে বাস করার ফলে তাঁরা স্নায়ুসংক্রান্ত নানাবিধ রোগে ভুগে থাকেন; আর এই রোগে ভোগার ফলে তাঁদের মেজাজ স্বাভাবিক ভাবেই তিরিক্ষি হয়ে থাকে। তার ফলে তাঁদের তরুণ ছেলেমেয়েরা হয়ে ওঠে সমাজ-বিরোধী, ক্রোধপরায়ণ ও আক্রমণমুখী; একথা বললে বোধ হয় খুব ভুল বলা হবে না। আজ সেখানকার নরনারী রবীন্দ্রনাথের বালিকা বধূর মত আক্ষেপ করছেন, "কোথা সে খোলা মাঠ, উদার পথ ঘাট, পাখির গান কই, বনের ছায়া"।

আমেরিকার জনসংখ্যার অর্ধেকের বেশী এক শতাংশ স্থানে বাস করেন, ৭০ শতাংশ লোক গাদাগাদি

করে বাস করেন ২৫০টি সুবৃহৎ মেট্রোপলিটান শহরে। ম্যানহাটানে প্রতি বর্গমাইলে ৭৮,০০০ লোক, হারলেস, ব্রাউনভিলা, বেডফোর্ড ষ্টুডেষ্ট প্রভৃতি স্থানে প্রতি বর্গমাইলে দুই লক্ষ লোক বসবাস করে; কিন্তু এরা গগনচুম্বী অট্টালিকার সুবিধে পায় না, আমাদের দেশে বস্তিবাসীদের মত এদের বাস করতে হয়। ফলে এখানকার নিগ্রো, পিউরটোরিকান প্রভৃতিরা রুদ্ধশ্বাস হয়ে নিজেদের মধ্যে মারামারি, হানাহানিতে প্রায় লিপ্ত হয়। এও বাহ্য। এ যেন ভাসমান হিমশৈলের চক্ষুগ্রাহ্য উপরিভাগটুকু। মারামারি ছাড়াও কতরকম পাপ, অনাচার, ব্যভিচার, অত্যাচার যে তাদের মধ্যে দুরারোগ্য কর্কট রোগের মত বাসা বেঁধে আছে তার ইয়ত্তা নেই। এ সবই হল ঘন বসতির কুফল। এই পরিবেশের মধ্যে সুস্থ স্বাভাবিক জীবন কি করে আশা করা যাবে?

এই অসহ্য অবস্থা শুধু আমেরিকাতেই নয়। অষ্ট্রেলিয়ায় দেখা যায়, প্রায় অর্ধাংশ লোক দুটি সুবৃহৎ মেট্রোপলিটান শহরে বাস করে। গ্রেট ব্রিটেনে—যেখানকার লোকেরা সব চেয়ে বেশী শহর-ঘেঁষা—প্রায় ৯০% শহরগুলোতে বাস করছে। শুধু লণ্ডন শহরেই প্রতি বর্গ মাইলে ৩০ হাজার লোক বাস করে। প্যারিস শহরের অংশ বিশেষে প্রতি বর্গ মাইলে ৭৫ হাজার লোক বাস করে, টোকিও শহরেও প্রতি বর্গ মাইলে ৮০ হাজার লোক। আমাদের পশ্চিম বঙ্গে লোকসংখ্যা—৪৪৪,৪০,৩৪৫-এর মধ্যে বৃহত্তর কলকাতায় বাস করে ৭০,৪০,৩৪৫ জন। বৃহত্তর বোম্বাই শহর এখন লোক-সংখ্যায় দ্বিতীয়। সেখানে বাস করে ৫৯,৩১,১৮৯ জন, পুনায় বাস করে ১১,২৪,৩৯৯ জন। ভারতবর্ষের অন্যান্য বড় বড় শহরে লোকসংখ্যা নিম্নলিখিত রূপ:—দিল্লী—৩৬,২৯,৮৪২, মাদ্রাজ—২৪,৭০,২৮৮, হায়দ্রাবাদ—১৭,৯৮,৯১০, আমেদাবাদ—১৭,৪৬,১১১, ব্যাঙ্গালোর—১৬,৪৮,২৩২ জন। সব চেয়ে ভাবনার বিষয় হল, সমগ্র অষ্ট্রেলিয়ায় যে জনসংখ্যা, ভারতবর্ষে প্রতি বছর সেই সংখ্যক শিশু জন্ম গ্রহণ করছে।

এই বিপুল সংখ্যক লোক এক সঙ্গে ঠেসাঠাসি করে বাস করার যে কুফল, সে সম্বন্ধে যে পরীক্ষা হয়েছিল তার কথা এখানে না বলে পারা যাচ্ছে না। ওয়াশিংটনের ন্যাশনাল ইনসটিটিউট্ আব মেণ্টাল হেলথের ডাঃ জন কালহৌন ইঁদুর নিয়ে দুটি পরীক্ষা করেছিলেন। প্রথমটা ১৯৫৮ সালে আর দ্বিতীয়টা ১৯৬৮ সালে। তাতে দেখতে পান, ইঁদুরও ঠাসাসাসি করে বাস করলে তাদের মধ্যে অনেক দোষ ও বিষম আচরণ দেখা যায়। প্রথম পরীক্ষাটি নিম্নলিখিতভাবে করা হয়েছিল:—

একটি ১০ × ১৪ ঘরকে চারটি পরস্পর-সংযুক্ত খোপরে ভাগ করে তাতে ৩০টা নরওয়ে ইঁদুর রেখে প্রতিপালন করা হয়েছিল। এই চারটি খোপে ইঁদুরগুলোকে ১৬ মাস রাখা হল। অল্পদিনের মধ্যে ৩০টা ইঁদুর বেড়ে ৮০টা হল। ক্রমশঃ এদের সংখ্যা বেড়ে বেড়ে ইঁদুর বস্তির সৃষ্টি হল। সংখ্যা অত্যন্ত বেড়ে যাওয়ায় দেখা গেল, তাদের সমস্ত সহজ প্রবৃত্তি নষ্ট হয়ে গিয়েছে, যেমন, মায়েরা নিজেদের বাচ্চাদের যত্নকরা বন্ধ করে দিল, অনেকে হতবুদ্ধি হয়ে চারদিকে ছোটাছুটি আরম্ভ করে দিল, কতকগুলোর মধ্যে আবার সমকামিতা প্রভৃতি বিষম যৌন আচরণ (যা ইতর প্রাণীদের মধ্যে কদাচিৎ দেখা যায়। লক্ষ্য যায়) লক্ষ্য করা গেল, কতকগুলো অত্যন্ত নৃশংস হয়ে উঠল। মৃত্যুর হার ৯০% পর্যন্ত পৌছাল। এসব হল মাত্র ১৬ মাসে। দুচার বছর রাখলে কি হত ভাবতেই পারা যায় না।

১৯৬৮ সালে কালহৌন এবং তাঁর সহকর্মীরা আরও একটা পরীক্ষা চালালেন। ন্যাশনাল ইনসটিটিউট আব্ মেণ্টাল হেলথ আফিসের একটা গোলাবাড়িতে ইঁদুর নিয়ে আর একটা পরীক্ষা চালালেন। বিভিন্ন আকারের কয়েকটা টিনের খোপ তৈরি এদের নাম দিলেন 'ইউনিভারস'। প্রতিটি খোপে ৪টি পুরুষ ও ৪টি স্ত্রী ইঁদুর রেখে দিলেন। অচিরে তাদের সংখ্যা দ্বিগুণ—দ্বিগুণ থেকে চতুর্গুণ হল।. এবার তাদের ওপর ঘন বসতির কুফল সযত্নে লক্ষ্য করা হল।

সবচেয়ে বড় খোপটিতে ছিল ১০০ ইঁদুর। শীগগির

তাদের সংখ্যা দাঁড়াল ২০০০। ফলে তাদের সহজাত সামাজিক প্রবৃত্তির অবক্ষয় দেখা দিল। তারা পরস্পরকে অকারণে আক্রমণ করতে আরম্ভ করল—মায়েরা সন্তানদের পালন করতে বিরত হল, পুরুষ ইঁদুরেরা নির্লিপ্ত ভাবে নিজের নিজের লেজ চিবুতে লাগল, অথবা দৌড়াদৌড়ি আরম্ভ করে দিল। স্ত্রী ইঁদুরের মধ্যে পুরুষালি ভাব ও আক্রমণমুখিনতা লক্ষ্য হল। যৌন শক্তি প্রায় নষ্ট হয়ে গেল যেটুকু থাকল সেটা হল বিকৃত ও অপরাধ মূলক। স্ত্রী মূষিকেরা প্রজনন ক্রিয়ায় বাধা দিতে লাগল। এ ছাড়াও কতকগুলো অদ্ভুত ঘটনা লক্ষ্য করা গেল। এরই মধ্যে যে সব বাচ্চা জন্মেছিল, তাদের যেন এক নতুন ধরণের জীব বলে মনে হতে লাগল। তারা অসহ পরিবেশ থেকে নিজেদের গুটিয়ে নিয়ে উদাসীনভাবে খোপরের এক কোণে আশ্রয় নিয়ে নিজেদের পরিষ্কার রাখবার জন্যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে জলে স্নান করতে ও নিজেদের গাত্র মার্জনা করতে আরম্ভ করল। যেন রক্ত-স্রাত জন্মের পর শুচি প্রক্ষালন।

ঠিক এই রকম পরীক্ষা বিড়াল নিয়েও করা হয়েছিল। সেখানেও ঐ একই রকমের ফল দেখা গেল। তারাও আক্রমণশীল ও হিংস্র হয়ে উঠেছিল। তাদের অনবরত ফোঁস ফোঁস ও ঘড় ঘড় করতে শোনা গেল এবং নিজেদের মধ্যে কামড়াকামড়ি করতে আরম্ভ করে দিল। সহজাত প্রবৃত্তির প্যাটার্ণও একেবারে বদলে গেল।

(সাটারডে রিভিউ—নভেম্বর ৮, ১৯৬৯ দ্রষ্টব্য।)

এই পরিপ্রেক্ষিতে সহজেই বলা চলে, মানুষ নিয়ে এই রকম পরীক্ষা চালালেও তার ফল ঐ ইঁদুর ও বিড়ালের মতই হবে। তাদের অস্মিতার পরিবর্তন হবে। তারাও অকারণে অসহিষ্ণু, আক্রমণশীল ও ক্রোধপরায়ণ হয়ে উঠবে। এই ঘন বসতি ছাড়াও মানুষের মেজাজ বিগড়ে দেবার জন্যে আছে দূষিত আবহাওয়া, দূষিত সমুদ্র, নদীনালার প্রভাবও কতকটা।

[পিতামাতার দায়িত্ব]

আমাদের মতে অপরাধমূলক ব্যবহার স্বভাবজাত নয়, এটি হল অর্জিত অভ্যাস। মানুষ হল অভ্যাসের দাস। এই অপরাধপ্রবণ প্রজন্মের জন্যে গৃহ-পরিবেশ এবং বাপ-মাও কম দায়ী নন। বর্তমান যুগের মারামারি, হানা-হানি আবহাওয়ায় মধ্যে বাপমায়াও সন্তানের শিক্ষার ব্যবস্থা ঠিক পথে পরিচালিত করতে পারছেন না। অভাব, অভিযোগ, বেকারি দারিদ্র্যের জ্বালায় অনেক পরিবারে বাপ-মায়ের মধ্যেও নিত্য কলহ, অশান্তি, গালাগালি, চোখরাঙানি লেগেই আছে। শিশু নির্বাক্ দর্শকের মত এ সবই দেখছে, আর এর প্রভাব তার মনের গভীরে পড়ছে, ফলে সেও বড় হয়ে রগচটা, অসহিষ্ণু ও কলহপ্রিয় হয়ে উঠছে। ঠিক এই রকম কথাই বলেছেন ফেডারেল ব্যুরো অব্ ইনভেসটিগেশনসের অধিকর্তা, জে এডগার হুবার।

"গৃহই হল সৎ বা অসৎ আচরণ শেখার প্রথম পাঠশালা; আর সেই পাঠশালার প্রথম ও প্রধান শিক্ষক হলেন পিতামাতা। তাঁরাই সন্তানকে দেন মহৎ অনুপ্রেরণা। গৃহেই যেন শিশু শিক্ষা পায়, পরিবারের মধ্যে সে ছাড়া অন্যেরও অধিকার আছে এবং তাকে সে অধিকার মানতে হবে। এই শিক্ষা পেলে শিশু পরিণত বয়সে হয়ে উঠবে সৎ নাগরিক, ন্যায়নিষ্ঠ ও নিয়মানুগ। শিশুকাল থেকেই তাকে অপরকে সম্মান দেখাতে, সত্যবাদী হতে শিক্ষা দিতে হবে। সে-শিক্ষা শুধু মুখের কথায় নয়, বাপমাকে নিজেদের আদর্শ জীবন দিয়েই শিশুকে শিক্ষা দিতে হবে। বিপরীত পক্ষে মৃত্যু, স্ত্রীর কুলত্যাগ, বিবাহ-বিচ্ছেদ, পরিবার প্রতিপালনে অসামর্থ্য, যৌন শিথিলতার ফলে যে ঘর ভেঙে পড়েছে, সেই নষ্ট-নীড়ের সন্তানদের ওপর এ সবেরই এক দুরপনেয় ছাপ পড়ে যায়; ফলে তাদের পক্ষে আর সুনাগরিক হওয়া সম্ভবপর হয় না। তারা না পায় ভালবাসা, স্নেহযত্ন, না পায় যথার্থ পথের নির্দেশ; মহৎ আদর্শ তাদের সুমুখে তুলে ধরবার মত কেউ থাকে না; তাই এইসব সর্বহারা, ছন্নছাড়াদের নজর থাকে শুধু নিচের দিকে; সমাজের অন্ধকার গলিপথে হয় তাদের আনাগোনা। এরাই কিশোর অপরাধীদের দল করে তোলে ভারী।"

(৮১তম কংগ্রেসের অধিবেশনে "জুভেনাইল ডিলিংকুইনসি"র সংক্ষিপ্তসার দ্রষ্টব্য।)

তরুণ অপরাধীদের সমাজবিরোধী আচরণের এটি মনে হয় এক যুক্তিপূর্ণ ও যথার্থ বিশ্লেষণ।

[শিক্ষার প্রভাব]

শিক্ষাবিদ্‌দের মতে শিক্ষায় দ্বারা আক্রমণমনস্কতাকে নিয়ন্ত্রিত করা সম্ভব। অনেক সময় অতি দুঃখের সঙ্গে আমরা লক্ষ্য করেছি যে, গৃহে বয়স্কেরা প্রায়ই রাষ্ট্রের প্রচলিত বিধিবিধানের উদ্দেশে অযথা বিরূপ মন্তব্য ও ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করে থাকেন। তাঁদের এই সব মন্তব্য শিশুকে ভবিষ্যতে অশিষ্ট ও অভব্য হতে সহায়তা করে শিশুরা অত্যন্ত অনুকরণপ্রিয়। অজান্তেসব সময় তারা বড়দের অনুকরণ করে থাকে। অভ্যাসের দাস বলেই শিশু জন্মক্ষণ থেকেই অনুকরণের মাধ্যমে শিক্ষা লাভ করে। ভাল ভাল কথা বলে শিক্ষা দেবার চেষ্টা করার পরিবর্তে নিজের দৃষ্টান্ত দিয়ে শিক্ষা দেবার চেষ্টা করলে অনেক ভাল হবে। বিশিষ্ট শিক্ষা-বিজ্ঞানীরা এখন নিঃসন্দেহ যে, শিশুর জীবনে প্রথম ছয় বৎসর কাল হল তার ভবিষ্যৎ জীবনসৌধের সোপান স্বরূপ। এই প্রসঙ্গে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ বেনজামিন ব্লুমের মন্তব্য বেশ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন, শিশুর শিক্ষা করবার ক্ষমতা ও নতুন ধ্যানধারণা অধিগত করবার মত বুদ্ধিশক্তির বিকাশ চার বছর বয়সের মধ্যেই ৫০ শতাংশ বৃদ্ধি পায়, যখন আট বছরে পা দেয় তখন তার বুদ্ধির বিকাশ ৮০ শতাংশ বেড়ে যায়। কাজেই শিশুর এই উঠতি বয়সকে একেবারে উপেক্ষা করা উচিত নয়। যা কিছু ভাল আদর্শ, মহৎ দৃষ্টান্ত এই সময়েই তার সুমুখে তুলে ধরতে হবে। পিতামাতার আদর্শ চরিত্র শিশুর কাছে দিক্‌দর্শন। আজ তরুণেরা যে আদর্শভ্রষ্ট ও দিক্‌ভ্রান্ত হয়েছে, সে তাদের পিতামাতার দু-মুখো নীতির ফলেই। পিতামাতারা সন্তানদের বলেন এক, কিন্তু করেন আর। সন্তানদের সুনাগরিক, ন্যায়নিষ্ঠ ও কর্তব্যপরায়ণ করতে হলে পিতামাতাকে নিজেদের চরিত্র ও আচরণ সম্বন্ধে সজাগ থাকতে হবে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে দেখা যাচ্ছে, পিতামাতারা এ বিষয়ে উদাসীন, মনে করেন মাসে মাসে স্কুলের মাইনে গুনছি, সব ঠিক হয়ে যাবে। এ মনোভাব ঠিক নয়। সন্তানের শিক্ষার প্রতি ঔদাসীন্যের অপরাধের জন্যে বাপ মা, আমি আপনি সকলেই দায়ী। এ আমার, এ আপনার পাপ।

য়ুরোপ-আমেরিকায় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর পঞ্চাশের দশকে যখন পিতৃমাতৃহীন শিশুরা প্রথম যৌবনে পদার্পণ করল, তখন থেকেই সাক্ষাৎ মিলল তরুণ অপরাধীদের, আর পশ্চিম বঙ্গে বিশেষ করে কলকাতায় যখন দেশ বিভাগের ফলে লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু সর্বহারা, শিকরছেঁড়া হয়ে আশ্রয় নিল, তাদের সঙ্গে ছিল যে সব বাপ-মরা বা মা মরা ছেলে, তারা ষাটের দশকে প্রথম যৌবনে পদার্পণ করেই জটার বাঁধন খোলা নটরাজের প্রলয় নাচন আরম্ভ করে দিল—যার তালে তালে আজও দুলছে পশ্চিম বঙ্গ। তাই বলছি, পিতামাতার শিক্ষা ও আদর্শ হল সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ। এই আদর্শ পালনে পরাঙ্মুখ হলে সন্তানের মধ্যে দেখা দেবে ক্রোধ, আগ্রাসন, হিংস্রতা, ধ্বংস-কামিতা প্রভৃতি; আর তাতে ঘৃতাহুতি দেবে তার প্রতিকূল পরিবেশ। সন্তানের প্রতি পিতামাতার কর্তব্য বিষয়ে বারে বারে বলছি বলে, এটা একান্ত একঘেয়ে বলে মান হতে পারে।

মনোবিজ্ঞানী ওয়াটসনও বলেছেন, "সব ঘটনার বিশ্লেষণ করে এখন বিশ্বাস করতে বাধ্য হচ্ছি যে, এই সব আচরণ (ক্রোধ নৃশংসতা, ঘৃণা, বিদ্বেষ প্রভৃতি) বাপ মা এবং আমাদের পরিবেশ আমাদেরই মধ্যে অজান্তে গড়ে তোলে। সহজাত প্রবৃত্তি বলে কিছুই নেই। উত্তর কালে যা কিছু দেখা যায়, সে সবই আমরা শিশুর মনে প্রবেশ করিয়ে দেই (ওয়াটসন, সাইকোলজিক্যাল কেয়ার আব দি ইনফ্যাণ্ট, পৃঃ ৩৭ দ্রষ্টব্য।)

মনোবিজ্ঞানী উইলসনও সহজ প্রবৃত্তির কথা স্বীকার করতে চান না। তিনি বলেন, শিশু জন্মক্ষণে কিছুই জানে না। পঞ্চেন্দ্রিয়ের সাহায্যে সে সব রকম জ্ঞান আহরণ করে। হ্যারি হারলো, জে বি কলহৌউন এবং বয়েড বেষ্ট প্রভৃতি বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানীরা এখন

সহজাত প্রবৃত্তির সঙ্গে শিক্ষার (লার্ণিং) সম্বন্ধ নিয়ে গভীরভাবে গবেষণায় ব্যস্ত। আর অন্যান্য আমেরিকান মনোবিদ্‌রাও এখন প্রমাণ করতে চাইছেন, সহজাত প্রবৃত্তি বলে যদি কিছুই না থাকে তাহলে, পিতামাতার দায়িত্ব ও কর্তব্য বহুগুণে বেড়ে গেল। পিতামাতাকে হতে হবে শান্ত সংযত, সহনশীল; শিশুর সুমুখে ক্রোধ, লোভ ও ঈর্ষা প্রকাশ এবং প্রচলিত বিধিবিধানের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনে বিরত থাকতে হবে। তাঁদের হতে হবে "দুরূহ কর্তব্যভারে, দুঃসহ কঠোর"। এটা সম্ভব হলে, শিশু বড় হয়ে এই সব দোষত্রুটি থেকে মুক্ত হবে। কিন্তু এ উপদেশ দেওয়া যত সহজ, পালন করা তত সহজ নয়। এটা নির্মম সত্য হলেও, পিতামাতা যেন ভুলে না যান, তাঁদের দায়িত্ব অত্যন্ত কঠিন ও কঠোর।

আর একটা কথা পিতামাতার মনে রাখা দরকার যে, যে-পিতামাতা নিজের সন্তানকে ঠিক পথে চালিত করতে স্নেহ-ভালবাসা দিতে পারেন না, সেই পিতামাতারা নিজেরাও বাল্যে স্নেহযত্নে বঞ্চিত হয়েছিলেন, ওটা অতি সত্য। এই ভাবে এই পাপ বংশানুক্রমে চলতে থাকে। দক্ষিণ ক্যালিফর্ণিয়ার স্কুল আব মেডিসিনের অধ্যাপক ডাঃ জেমস এপথরস্ অনুরূপ উক্তি করেছেন।

এইবার আমাদের তরুণ সম্প্রদায়ের আগ্রাসন, হিংস্রতা প্রভৃতির আরও অন্য কারণ আছে কি না ভেবে দেখা যাক। এই প্রসঙ্গে সকলের আগে টেলিভিসন, সিনেমা ও বীর নায়ক (হিরো কমিক) নামে প্রহসনগুলোর কথাই মনে পড়ে। এগুলোর হওয়া উচিত ছিল সত্যিকারের জনশিক্ষার মাধ্যম; কিন্তু কার্যত তারা কুৎসিত দৃশ্যগুলো দেখিয়ে মানুষের অবদমিত ইচ্ছাকে উদগ্র করে সর্বসাধারণকে আনন্দ দেবার চেষ্টা করছে। দক্ষিণ ক্যালিফোর্ণিয়ার মিঃ গার্ণার টেড আরমষ্ট্রং আমেরিকায় রাত নটার আগে কিশোরদের জন্যে যে বিশেষ টেলিভিসনের ব্যবস্থা আছে তার এক সপ্তাহের বিষয় সূচী বিশ্লেষণ করে নিম্নলিখিতরূপ ভয়ঙ্কর কুৎসিত দৃশ্যগুলোর কথা ফাস করে দিয়েছেন :—

১৩৪১টা খুন, নরহত্যা ৬০টা, ১৫টা গুমখুন, ২৪টা খুন করবার ষড়যন্ত্র, ২১টা জেল ভেঙ্গে পালানোর দৃশ্য, ৭টা লিনচিং প্রচেষ্টা, ৬টা ডিনামাইট দিয়ে বিস্ফোরণের ঘটনা, ২টা অগ্নিসংযোগ, ২টা যন্ত্রণা সহ হত্যা। এ ছাড়া আছে অসংখ্য বহুক্ষণ ধরে নৃশংসভাবে মারামারি, কাটাকাটি, হত্যার হুমকি, হাত পা খোঁড়া করে দেওয়া এবং নরনারী শিশু নির্বিশেষে সকলকে নানাভাবে অপমান করা ও কুৎসিত অঙ্গভঙ্গীর ঘটনা।

টেলিভিসন, সিনেমা প্রভৃতিতে এই সব ভয়াবহ দৃশ্য দেখানো ছাড়াও সংবাদপত্রেও নানা রকম খুন জখম ও অপরাধজনক ঘটনা ফলাও করে লেখার ব্যবস্থাও তরুণ মনে কম উত্তেজনার সৃষ্টি করে না।

'হরর কমিক' নামে এক শ্রেণীর সস্তা ধরণের কামোদ্দীপক ও রোমহর্ষক ঘটনা সম্বলিত পুস্তকও তরুণ মনে রিরংসা জাগাতে কম সাহায্য করছে না। আমেরিকায় সবচেয়ে বেশি বিক্রীর বই হল সেইগুলো যাতে অবৈধ সংসর্গ, ব্যভিচার প্রভৃতি অপরাধ লাগামহীন ভাষায় লেখা থাকে। এই বইগুলো কাগজে বাঁধাই এবং প্রত্যেক বই-এর মলাটে থাকে নগ্ন বা অর্ধনগ্ন স্ত্রীলোকের নানা ভঙ্গিতে শুয়ে বা বসে থাকার ছবি। ওদেশের সব চেয়ে প্রিয় পপ সঙ্গীত হল,—"এস আজ রাতটা এক সঙ্গে কাটিয়ে দেই।" এই সব পুস্তক পুস্তিকা কিশোর মনে পাপ ও দুর্নীতি প্রবেশ করিয়ে দেয়। তাদের বিপথগামী হতে সাহায্য করে। তরুণ সম্প্রদায়কে বিদ্রোহীভাবাপন্ন করতে এরা সক্রিয়ভাবে কম দায়ী নয়।

শিকাগো মিউনিসিপ্যাল কোর্টের একজন বিচারক, তাঁর দীর্ঘ অভিজ্ঞতার ফলস্বরূপ মন্তব্য করেছেন,—কিশোর অপরাধীরা সব চেয়ে বেশি অনুপ্রেরণা পায় আজকের দিনের নিম্ন মানের চলচ্চিত্র, টেলিভিসন ও রেডিও থেকে—সেখানে খুনে, ডাকাত, বন্দুকবাজ, অবৈধ সংসর্গকারীকে নাটকের বীর নায়করূপে দেখাতে চেষ্টা করা হয়। শুধু তাই নয়, সেগুলোকে সমাজ জীবনের সাধারণ ঘটনা ও বর্তমান সভ্যতার প্রয়োজনীয় অঙ্গরূপে তুলে ধরবার চেষ্টা করা হয়।"

আজকের দিনের আমেরিকার আমোদ প্রমোদ ও

অবসর-বিনোদনের মাধ্যমগুলো হয়ে উঠেছে ভোগ-সুখাত্মক, একান্ত নাস্তিকতাবাদী ও বিরক্তিদায়ক। আর সেখানকার তরুণেরা কুৎসিত ও বর্বর আচরণ সম্বলিত দৃশ্য, নৃশংস ক্রিয়াকলাপ ও বর্বরতায় মধ্যে পুলক ও রোমাঞ্চ অনুভব করতে ক্রমেই অভ্যস্ত হয়ে পড়ছে। তবু সেখানকার অনেক শিক্ষিত লোক তর্ক জুড়ে দিয়েছেন, এই সব বীভৎস দৃশ্য তরুণদের ঐ সব কাজে উৎসাহিত না করে বরং তারা বিরেচকের (ক্যাথারশিস্) মত কাজ করছে। তাঁরা বলছেন, খুন জখম, হানাহানি দেখে তরুণদের মনে এইসব দুষ্ক্রিয়ার প্রতি একটা বিরাগ ও বিতৃষ্ণা জন্মাচ্ছে; তার ফলে তারা ঐরকম আচরণ করতে উৎসাহী হচ্ছে না। অন্যদল বলছেন, ধ্বংসই ধ্বংসকে ডেকে আনে, যে সব ভয়াবহ দৃশ্য তারা প্রতি দিন দেখছে, তারাই তাদের আক্রমণমুখী ও দুষ্কৃত-কারী করে তুলছে; সমস্ত নৃশংসতায় মূলে হল এই সব ছায়াচিত্র ও টেলিভিসন। প্রথমোক্ত দলের যুক্তি মেনেও নিতে পারি নে, মেনেও নিতে মন চায় না।

যাই হোক, এই তর্কের অবসানের জন্যে বানডুয়া ১৯৬৩ সালে এবং বারকোইজ ১৯৬৪ সালে রায় দেন, দ্বিতীয় মতটাই সত্যি। এটা অবশ্য তাঁদের মনগড়া কথা নয়। এর জন্যে তাঁরা অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা চালান। বানডুয়া এবং তাঁর সহকর্মীরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একদল ছাত্রকে আগ্রাসী এবং হিংস্র ঘটনা সম্বলিত একটি ছায়া ছবি দেখান। তারপর থেকেই লক্ষ্য করলেন, ঐ সব ছেলেরা ছবিতে দেখা হিংসাত্মক ঘটনা অনুকরণ করবার চেষ্টা করছে, হিরো সাজতে চাইছে।

(Bandua. A, Ross Dorothea and Ross Sheila,—1963—Imitation of Film meditated Aggressive Model—J. Abnorm. Sol Psychology দ্রষ্টব্য)।

বারকোইজ এবং রোলিংস একটা জটিল ধরণের অভীক্ষা তৈরি করে এক এক জোড়া কলেজের ছাত্রদের ওপর প্রয়োগ করে দেখতে পেলেন, হিংসাত্মক কাজের দিকে তাদের মনের মোড় ঘুরেছে।

(L. Berkowitz and E. Rowlings—Effects of Film Violence on Inhibitions against Subsequent Aggression, J. Abnorm. Sol. Psy 405-412 এবং L. Berkowitz—Aggression দ্রষ্টব্য)।

[মানব চরিত্রের পরিবর্তন প্রয়োজন]

সভ্যতার উষা লগ্ন থেকে যুগে যুগে মহামানবেরা মানুষের চরিত্র নানা উপায়ে—শিক্ষা, ভক্তি, প্রেম, উপদেশ ও ধর্মের মাধ্যমে—সুন্দর ও মঙ্গলময় করতে চেয়েছেন। বুদ্ধ, খ্রীষ্ট, নানক, চৈতন্য প্রমুখ সকলেই চেষ্টা করেছিলেন এবং সফলও হয়েছিলেন; কিন্তু কালক্রমে ধর্মের প্রভাব কমে এলে অল্পে অল্পে মানুষ সে সব ভুলে গেল। যে শিক্ষা, যে ব্রত অবলম্বন করে প্রাচীন কালে ছাত্রেরা বড়ো হয়েছিল, সেই শিক্ষা, সেই ব্রত গ্রহণের সঙ্কল্প আজ আর ছাত্রদের নেই। ধর্মের মাধ্যম ছাড়াও অন্যভাবে দুই হাজার বছর আগে গ্রীসে আর-একজন মহামানব মনুষ্য চরিত্র পরিবর্তন করতে চেষ্টা করেছিলেন। তিনি হলেন পণ্ডিত-প্রবর প্লেটো। তাঁর "রিপবলিক" নামক গ্রন্থে কিভাবে আদর্শ মানব ও রাষ্ট্র গড়ে তোলা যায়, তার একটা আভাষ দিয়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন একটা শ্রেষ্ঠ জাতি (সুপার রেস) তৈরী করতে। এই জন্যে প্রচলিত বিবাহ পদ্ধতি বর্জন করে শুধু মাত্র শ্রেষ্ঠ মানব ও মানবীর মিলনে অতিমানব সৃষ্টি করে এবং জনসংখ্যা সীমিত রেখে এই মহৎ ব্রত উদ্‌যাপন করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু গোড়াতেই একটা ভুল করে বসেছিলেন। মানব চরিত্র যে অজ্ঞেয়, তার সম্বন্ধে যে কোন ভবিষ্যদ্বাণী করা যায় না, এটা তিনি বুঝতে পারেন নি। মানব চরিত্র হল প্রহেলিকাময় আর মানুষ শুধু দেহসর্বস্ব নয়, সে উন্নত মানের মস্তিষ্কের অধিকারী, আর তার আছে অদম্য কৌতূহল, এ কথা হয়ত তাঁর মনে পড়ে নি। বিবর্তনবাদের ফল হল মানুষ আবার সেই মানুষই হল বিবর্তনবাদের প্রধান প্রবক্তা। তাঁর পরেও অনেক সংস্কারক এ-চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু বিফল হয়েছিলেন সকলেই।

টমাস মোর তাঁর কল্পরাজ্যে (ইউটোপিয়া) বলেছেন,

অভাব ও অনটনের ভয়েই মানুষের লোভ হয়ে ওঠে উদগ্র, আর অহঙ্কার বশে মানুষ চায় সকলকে ছাড়িয়ে একলা নিজে শ্রেষ্ঠ হতে। তাঁর মতে মানব চরিত্রের মৌল সমস্যা হল—লোভ, মোহ ও মাৎসর্য। জগতে সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি আনতে হলে, এই তিন রিপুকে জয় করতে পারলেই আক্রমণমুখিনতা ও হিংস্রতার ধার যাবে ভোঁতা হয়ে। কিন্তু তাঁর এই দার্শনিক তত্ত্ব কোনদিন পরীক্ষা করা হয়নি, কাজেই তার সত্যাসত্য যাচাই করা সম্ভব নয়; আর তত্ত্ব কিভাবে বাস্তবে রূপায়িত করা যায়, সে বিষয়েও তিনি কোন স্পষ্ট নির্দেশ দিয়ে যেতে পারেন নি।

কিন্তু বিংশ শতাব্দীর অভিনব দার্শনিক তত্ত্ব কম্যিউনিজম্ বলে, মানুষে মানুষে সৌভ্রাতৃত্ব আনতে এবং মানব চরিত্রের মৌল পরিবর্তনের বিষয়ে সে আশাবাদী। এ স্পারকিন লিখিত একখানি সরকারী প্রকাশন—Lenin on State and Democracy নামে পুস্তকের লেখক, মানুষ এতদিন যে সুখ ও শান্তি-পূর্ণ জীবনের স্বপ্ন দেখে আসছিল তার নব রূপায়ণের ইঙ্গিত দিয়েছেন। তিনি বলেন, "মানুষ বহুকাল ধরেই স্বাধীন ও সুখময় জীবনের স্বপ্ন দেখে আসছে। তাদের স্বপ্ন ছিল উপকথায় বর্ণিত ইউটোপিয়ার মত এক কাল্পনিক সর্বজনীন সমৃদ্ধি সম্পন্ন সমাজের সৃষ্টি; যেখানে ন্যায় সত্যের সঙ্গে মিলিত হয়ে দেশের প্রতিটি নাগরিককে করবে নিয়ন্ত্রিত। লজ্জাজনক ও অপমানকর শোষণ হতে মুক্ত হয়ে মানব জাতি দুরূহ বন্ধুর পথ অতিক্রম করে, বহুদূর অগ্রসর হয়ে যে সমাজ প্রতিষ্ঠিত করেছে সেখানে আজ তার যোগ্য জীবন যাপনের ও নির্ভয়ে আপন প্রতিভা প্রদর্শন করা সম্ভবপর হয়েছে।"

এখানে স্পারকিন সুখ আর অনন্যসাধারণ সর্বজনীন সমৃদ্ধিকে এক পর্যায়ভুক্ত করেছেন। মনে হয় তিনি যেন বলতে চান, দেশ যদি অতিমাত্রায় সমৃদ্ধি-সম্পন্ন হয়, প্রচুর টাকাকড়ি যদি তার থাকে, তাহলে দেশবাসী হবে সুখী, আত্মতৃপ্ত, অসন্তোষের আর কোন কারণ থাকবে না; ফলে আক্রমণমত্ততা প্রভৃতি দূর হয়ে যাবে।

একথা যদি সত্যি হয় তাহলে, আমেরিকার মত ধন-কুবেরের দেশে ক্রূরতা, নৃশংসতা প্রভৃতি থাকবার ত কোন কারণ দেখা যায় না। তবে কেন আজ ঐশ্বর্য-সমৃদ্ধ য়ুরোপ আমেরিকায় এত উচ্ছৃঙ্খলতা, মারামারি, হানাহানি? মানব-দরদী জন্ এফ্ কেনেডি আমেরিকার এক বাস্তব চিত্র বিপুল হাতে এঁকেছেন:—

> "What happened to us as a nation? Profits are up—our standard of living is up but so is our crime rate. So is the rate of divorce and juvenile delinquency and mental illness. ......Nearly one of our every two American men is rejected by selective service today as mentally, physically or morally unfit for any kind of military service."

যাক সে কথা। মার্কস এবং এনজেলস্ বিশ্বাস করতেন যে, মানব চরিত্র এমনভাবে পরিবর্তিত করা সম্ভব যাতে মানুষ নিঃস্বার্থ, বিবেচক ও সহানুভূতিশীল হতে পারে। তাঁরা এই বিশ্বাস পোষণ করে গিয়েছেন যে, বিধিসঙ্গত ক্ষমতার প্রতি রুষ্ট হওয়া, লোভ, স্বার্থপরতা, পরশ্রী-কাতরতা, কাম, ক্রোধ, ঘৃণা, সামাজিক পদমর্যাদা বৃদ্ধির চেষ্টা, আত্মম্ভরিতা, আলস্য, মিথ্যাকথন, চৌর্যবৃত্তি প্রভৃতি মানব চরিত্রের দোষগুলো সবই মানুষের ভৌত পরিবেশের প্রভাবে ঘটে থাকে। এই অসুস্থ পরিবেশের পরিবর্তন করতে পারলেই মানুষের চরিত্র আপনা থেকেই বদলে যাবে। ব্যক্তি-সম্প্রত্তির বিলোপ সাধন কর—দেখতে পাবে লোভ, অহংকার, ঈর্ষা, পরশ্রীকাতরতা, সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির জন্যে হানাহানি সব অদৃশ্য হয়ে যাবে। মানুষকে শ্রমের মার্যাদা শিক্ষা দাও—আলস্য দূর হবে। সমাজে উচ্চ নীচ ভেদাভেদ তুলে দাও আক্রমণমত্ততা, বর্বরতা, হিংস্রতা প্রভৃতি বিলুপ্ত হবে। Man's Dreams are Coming True নামে আর এক-খানি কম্যিউনিষ্ট পার্টির পুস্তকে বলা হয়েছে, "সমাজ-তন্ত্র বাদে অনুপ্রাণিত হলে জনগণ সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে কাজ করে যাবে, কারণ মানুষ সৃজনধর্মী কাজের মধ্যেই আনন্দ খুঁজে পাবে।"

এ কথা সত্য যে, সমাজতান্ত্রিক দেশে চুরি ডাকাতি,

মালগাড়ি ভাঙ্গা, চোরাবাজারি, মজুতদারি, মুনাফাবাজি, ছাত্র বিক্ষোভ (চেকোশ্লোভাকিয়া ছাড়া) নেই। কিন্তু এটা কতটা মানব প্রকৃতির পরিবর্তন সাধনের জন্যে (যা সমাজতান্ত্রিকেরা দাবি করেন) হয়েছে, আর কতটা কঠোর নিয়মানুবর্তিতা, দমননীতি ও জনসাধারণের কণ্ঠ রোধের ফলে হয়েছে, তা জানি নে। তবে সে দেশে আন্তরিক্তা, দ্বেষ হিংসা নেই, একথা মানতে রাজী নই। পলিটব্যুরোর মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, ঈর্ষা নেই একথা মনে ধরে না। তাছাড়া সমাজতান্ত্রিক দেশে যে রকম নির্মম ভাবে আইন কানুন পালন করতে বাধ্য করা হয়, গণতান্ত্রিক দেশে সেটা সম্ভব নয়।

এই প্রসঙ্গে লুই মমফোর্ডের কয়েকটা কথা মনে পড়ে। তিনি বলেছেন,—"অনেক প্রথম শ্রেণীর কন্ধ রাজ্যে একনায়কত্বের প্রতি প্রবণতার কথা জানি। তারা মানুষের সকল কর্মোদ্যোগকে এক ছাঁচে রচিত খিলানের মতো কঠোর নিয়মানুবর্তিতায় নিয়ন্ত্রিত করবার চেষ্টা করে। এরা যে সব নিয়ম কানুন, বিধিবিধান রচনা করে তা এত কঠিন ও অনমনীয় এবং তাদের শাসন প্রথা এত কেন্দ্রানুগ আর এত অপরিবর্তনীয় যে তারা সামান্য মাত্র পরিবর্তন সহ্য করতে পারে না, যাতে ঐ শাসনতন্ত্রের রূপরেখা বিন্দুমাত্র এদিক ওদিক হয়—আর পারে না জীবনের নবনব প্রয়োজনের তাগিদ মেটাতে।" (লুই মমফোর্ড, ষ্টোরি আব্ ইউটোপিয়াজ দ্রষ্টব্য।)

আমাদের এই গণতান্ত্রিক দেশে রাষ্ট্রতন্ত্রের মৌল রূপরেখা পরিবর্তন না করে বা নতুন কোন ইজমের' আশ্রয় না নিয়েই আমাদের মনে হয়, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষার সাহায্যে মানব চরিত্রের নব রূপায়ণ সাধন করে এই আক্রমণমুখিনতা, এই ধ্বংসবিলাসী রুদ্র ভৈরবের তাণ্ডব নৃত্যের মূলোৎপাটন করা সম্ভব। বালক বালিকাদের অল্প বয়স থেকেই বিনয়, নিয়মানুবর্তিতা, সৌজন্য, গুরুজনে শ্রদ্ধা প্রভৃতি শিক্ষা দিয়ে সুস্থিত জীবন যাপনের নিয়ম পালনে অভ্যস্ত করে মহৎ আদর্শ তাদের সুমুখে তুলে ধরলে এটা সম্ভবপর হবে। কারণ শিশু যখন জন্মায় ভালমন্দ, শুভ অশুভ কিছুই সঙ্গে নিয়ে জন্মায় না—শিক্ষা, পারিপার্শ্বিক অবস্থাই তাকে সৎ বা অসৎ করে তোলে। শিক্ষাই হল আসল কথা।

মনোবিজ্ঞানীদের মতামতের জন্যে অপেক্ষা না করেই কমিউনিজমের রূপকার কার্ল মার্কসও অনুরূপ মন্তব্য করেছেন। তাঁর কথা হল,—

"মানুষ প্রকৃতিগতভাবে সৎ নয় অসৎও নয়, হিতৈষী নয় বিদ্বিষ্টও নয়, মনোজ্ঞ নয় আত্মানুরাগীও নয়, দেবতা নয় দানবও নয়; শুধু সাদাসাপ্টা স্বাভাবিক জীব (যেন বেদান্তের ব্রহ্ম)। সে আপনার মধ্যস্থতায় আপনার ভালমন্দ নির্ণয় করে। এর সোজা অর্থ হল, অবস্থা বিশেষে সে নিজেকে দেবতা বা পশুতে পরিণত করতে পারে। (Meszaros—Marx's Theory of Alienation দ্রষ্টব্য।) খুবই সত্যি কথা। তবু প্রশ্ন জেগে রয়। পিতামাতা বা আত্মীয়-স্বজনের শিক্ষা ছাড়া সে কেমন করে যা হবার তাই হতে পারবে?

১৯৬২ সালে প্রকাশিত "দি হিউম্যানাইজেসন আব মান" নামে পুস্তকে এম. এফ. এশলি মনটেগু বলেছেন, "অসৎ প্রবৃত্তি মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি নয়। এটা শিক্ষাগত..সব রকম উগ্রত.র মতন হিংসাশ্রিত ধ্বংস-কামী মনোভাবও মানুষ শিক্ষাসূত্রে পেয়ে থাকে।"

ডাঃ ডেলগাডো মনে করেন মস্তিষ্কের টেম্পোরাল লোবের অভ্যন্তরে হিংস্রতার কেন্দ্র আছে। একথা সত্য হলে, আক্রমণপ্রবণতাকে সহজাত ধর্ম বলে মেনে নিতে হয়। কিন্তু একথা মেনে নেবার সময়, আমাদের মনে হয়, এখনও আসে নি। আধুনিক আমেরিকান বিজ্ঞানী-দের মতে হিংস্রতা, নৃশংসতা, আক্রমণমুখিনতা প্রভৃতি অসামাজিক অপরাধগুলি আক্রমণপ্রবণ সমাজ-ব্যবস্থার ফল। এই প্রসঙ্গে এইচ. জি. ওয়েলস বলেছেন,— "মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি বা স্বভাব অসৎ নয়, যে অসৎ সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে মানুষের বাস, সেই অসৎ প্রতিষ্ঠানই অসৎ মানুষ সৃষ্টি করে।"

উপসংহার

আবার ডাঃ ডেলগাডোর ইলেকট্রিক ষ্টিমুলেশন আব দি ব্রেনের কথায় ফিরে আসা যাক। সে খেলা তিনি

স্পেনের মল্ল ক্ষেত্রে দেখিয়েছিলেন, সেটা নিশ্চয়ই চমকপ্রদ। কিন্তু এ ব্যাপারে কতকগুলো প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে। ষাঁড়টির আক্রমণ-ক্ষমতা স্তব্ধ করে দেওয়া হয়েছিল নিঃসন্দেহ, কিন্তু সেটা সাময়িক না চিরতরে তার উল্লেখ নেই। চিরকালের জন্যে স্তব্ধ করে নিরীহ পোষ্য প্রাণীতে পরিণত করতে পারলে অবশ্য বেশ একটু আশার কথা বলতে হবে বই কি। কিন্তু মস্তিষ্কের গভীরে বিদ্যুৎ-স্পৃষ্ট হলে ভালমন্দ যে কেউ নিশ্চেষ্ট হয়ে যেতে পারে, তবে দূর থেকে রেডিও নির্দেশে সেটা করার মধ্যে কৃতিত্ব নিশ্চয়ই আছে। সেটা যন্ত্রের জয় প্রমাণ করে। তারপর টেম্পোরাল লোবে অস্ত্রোপচার করে কাওকে নিস্তেজ করার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা চলে, এতে শারীরিক এবং মানসিক কোন ক্ষতি হয় কি না সে বিষয়ে ডাঃ ডেলগাডো কিন্তু বলেন নি। অস্ত্রোপচারের ফলে যদি মানুষের শারীরিক কি মানসিক কোন ক্ষতি হয়, তার সৎগুণগুলো নষ্ট হয়ে গিয়ে মানুষ যদি ইলিকট্রনিক খেলনায় পরিণত হয়, তা হলে কেউ ডেলগাডোর প্রদর্শিত পথে মানুষের আক্রমণ-প্রবণতা, উগ্রতা, হিংস্রতা প্রভৃতিকে দমন করবার চেষ্টাকে স্বাগত জানাবে না। যতক্ষণ না তিনি শরীরাণুবাহিত কোনো আক্রমণাত্মক 'জিনের' বংশাণুর সন্ধান দিতে পারছেন ততক্ষণ বলতে পারব না, "আমরা শুনেছি ঐ, মাভৈ, মাভৈ"। তাই আমরা সেই চিরপুরাতন বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরে থাকতে বাধ্য হচ্ছি যে, জীবজন্তু হল সহজাত প্রবৃত্তির দাস আর সৃষ্টিকর্তার সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি যে মানুষ, সে সহজাত প্রবৃত্তির দ্বারা চালিত নয় (সাধারণভাবে)। সে হল মনন-বিশিষ্ট—সে মন দিয়ে যুগ-যুগান্তের জ্ঞান আহরণ করতে পারে, অজানাকে জানতে পারে, অবোধ্যকে বুঝতে পারে, আবার জানার মাঝে অজানারে সন্ধান করে, নতুন সৃষ্টি করতে পারে। ডাঃ ডেলগাডো যে মনোবিজ্ঞান-সম্মত সভ্য (সাইকোসিভিলাইজড) সমাজের কল্পনা করেছেন, সেটা আমাদের কাছে মনে হয়, প্রহেলিকার মধ্যে রহস্য-জড়িত এক কূট প্রশ্ন।

আবার বলি, আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, এই যুদ্ধং দেহি মনোভাব, হিংস্রতা, নৃশংসতা প্রভৃতি সমস্ত অসদ্ধর্মের মূলে রয়েছে আদর্শ শিক্ষা ও সংস্কৃতির অভাব, উঠতি বয়সের ছেলেমেয়েদের প্রতি বাপ-মার ঔদাসীন্য আর দূষিত আঘাত-সংঘাতময় পরিবেশের প্রভাব। বাল্যকালের শিক্ষায় শিশু হয়ে ওঠে একান্ত সহযোগী বা নির্মম উদ্ধত; সৃজনশীল বা ধ্বংসকামী কালাপাহাড়। তাই দেখতে পাই ১৯৪২ সালের চরম খাদ্যাভাবের সময়েও কলকাতার রাস্তায় অগণিত বুভুক্ষিত নরনারী থরে থরে সাজানো খাবারের দোকানের সামনে সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে তাকিয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে, তবু খাবারের দোকান লুট করে নি। বুভুক্ষিত কিং ন করোতি পাপং মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। এর কারণ হল যে-পরিবেশে তারা প্রতিপালিত হয়েছিল, সে পরিবেশে হিংস্রতা ছিল না, ন্যায় অন্যায় জ্ঞান ছিল।

কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার

রাধিকারঞ্জন চক্রবর্ত্তি

কবি কৃষ্ণচন্দ্র ছিলেন সুফীভাবের সাধক, সুফী কবি সাদী ও হাফিজের অন্যতম ভাবশিষ্য। বাংলা সাহিত্যে সুফি ঐতিহ্যকে তিনিই প্রথম বহন করে এনেছেন। মরমী সুফী কবিদের সহজ প্রেমের ভাব বিভূতিকে আশ্রয় করে কবি বাংলাভাষায় মানব প্রেমের এক তন্ময় কাব্যরূপ রচনা করেছেন। তাঁর রচনা প্রবাহ মানব স্বীকৃতি এবং প্রেমানুভূতির দ্বারা নতুন ভাবরূপে সঞ্জীবিত হয়েছে। বাঙালীর শিথিল প্রেম-চেতনাকে জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত করে তোলাই ছিল কবির উদ্দেশ্য। বাংলাসাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর এই ঐকান্তিক প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে অনন্য তুল্য।

কৃষ্ণচন্দ্রের জন্ম খুলনা জেলার সেনহাটি গ্রামে। জন্মকাল--ইংরেজী, ১৮৩১। তাঁর পিতার নাম মাণিক্যচন্দ্র। অল্প বয়সে কবির পিতৃ-বিয়োগ হয়। কৃষ্ণচন্দ্র আত্মপ্রকাশে ছিলেন স্বভাবকুণ্ঠ। নিজের জীবন পরিচয় সম্বন্ধে কোন তথ্য প্রকাশ করতে চাইতেন না। একবার কোন এক সূত্রে যশোহর নিবাসী তাঁর এক পরিচিত ব্যক্তির পত্রোত্তরে নিজের সম্বন্ধে কয়েকটি কথা লিখেছিলেন। উক্ত পত্রে নিজের জন্ম, তিথি, বার প্রভৃতির সুনিশ্চিত সংবাদ দিয়ে কবি লিখেছেন,—"আমার জন্ম সেনহাটি। ১২৪৪।৪৫ সালে জ্যৈষ্ঠ মাসে আমার জন্ম। ছেলেবেলায় আমায় গুপ্তনাম রামচন্দ্র দাস ছিল। দাশগুপ্ত আমাদের বংশোপাধি।" এই তথ্য থেকে কবির সঠিক জন্ম পরিচয় ও আবির্ভাব কাল সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়। কৃষ্ণচন্দ্রের অপর একটি কবিতায় তাঁর শৈশব জীবনের কিঞ্চিৎ পরিচয় বিধৃত হয়েছে; যেমন, তাঁর 'প্রবাসীর জন্মভূমি দর্শন' শীর্ষক কবিতায় তিনি লিখেছেন,—

"যখন পড়িনি আমি শুনেছি হু'মাসে,
ছাড়িয়া গেলেন পিতা ত্রিদিব নিবাসে।
অনাথা জননী কোলে করিয়া আমারে,
দিলেন সাঁতার ঘোর দুঃখের পাথারে।
ভাসিতেন দিবানিশি নয়নের জলে,
ছিল না এমন কেহ যে আমারে বলে।
যেদিন জুটিত যাহা কপালের জোরে,
আপনি না খেয়ে কিছু খাওয়াতেন মোরে।
ক্রমে ক্রমে জড়িত হলেন ঋণ জালে,
হায় বিধি এত দুঃখ ছিল তাঁর ভালে।"

আত্মবিবরণী মূলক এই কবিতাটিতে কবির দুঃখ ও দারিদ্রময় শৈশব জীবনের সকরুণ চিত্রটি স্বকীয় আন্তরিকতায় স্নিগ্ধ হয়ে উঠেছে।

এই দুঃখ ও দারিদ্রের মধ্যেই কবির জন্ম, আবার এরই মধ্যে তাঁর জীবনাবসান। তবু দারিদ্রকে কবি কোন সময় দুঃখের হেতুরূপে স্বীকার করে নেননি; বরং তাকে আত্মজীবনের সর্বতোমুখী বিকাশের সহায়করূপে গ্রহণ করে ছিলেন। দারিদ্রতার সঙ্গে তাঁর প্রগাঢ় মিতালি ছিল,—অনিবার দুঃখ আর দারিদ্রকে নিয়ে পথ চলেছেন। চলার পথে পাথেয় ছিল, প্রজ্ঞাময়ী সেই পুরাতনী বাণী।—সংসার দুঃখময়, এখানে সুখ কোথায়? এই বাণীর মধ্যেই নিহিত রয়েছে মহত্তর জীবনচর্যার প্রদীপ্ত আদর্শ। দারিদ্র মানুষকে অহংমুখী ভোগতন্ত্রে দীক্ষিত করে না, উদার প্রেমতন্ত্রে প্রাণিত করে।

কবি কৃষ্ণচন্দ্র দারিদ্র্যক্লিষ্ট গৃহজীবনের মধ্যে আত্মবোধের প্রেরণা পেয়েছিলেন। সুকঠোর জীবন সাধনাকে সহজ করার উদ্দেশ্যে তিনি পারস্য কবিদের মর্ম্মকথাকে সহায়করূপে গ্রহণ করেছিলেন। ঐ কবিদের ভাব-নিশ্চেষ্টতা তাঁকে লৌকিক জীবনে

নিস্পৃহ করেছিল। তাঁদের মধুর ভাবসাধনা এক সুগভীর জীবনবোধে উদ্বুদ্ধ করেছিল। বাংলাদেশের এক নিভৃত পল্লীতে অবস্থান করে কবি তাঁর মানস নেত্রে পারসিক কবিদের সেই দ্রাক্ষারসোচ্ছ্বসিত পেয়ালার সৌন্দর্য দেখে বিভোর হয়ে থাকতেন।

কৃষ্ণচন্দ্রের কাব্যসমূহে তাঁর ব্যক্তি-পরিচয় অতি সামান্যই উদ্ধৃত হয়েছে। তাঁর জীবনীকার, আচার্য্য ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন,—কবির বাল্য শিক্ষা সুরু হয় গ্রাম্য পাঠশালায়। সেখানেই তাঁর বাংলা লেখাপড়া সুরু এবং ঢাকা নর্মাল স্কুলে তার পরিসমাপ্তি। পাঠশালার পড়া শেষ করে কবি তাঁর এক আত্মীয়ের সঙ্গে উচ্চশিক্ষা লাভের আশায় ঢাকায় চলে আসেন। তারপর ঐ আত্মীয়ের আশ্রয়ে থেকে তিনি ফরাসী ও সংস্কৃত ভাষায় শিক্ষা লাভ করেন। সে যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফার্সী পণ্ডিত লালমোহন বসাক ছিলেন কৃষ্ণ চন্দ্রের শিক্ষা গুরু।

ফার্সী ভাষা এদেশে এক সময় রাজভাষার মর্য্যাদা পেয়েছিল। সেদিন অনেকেরই মত কৃষ্ণচন্দ্র ঐ ভাষা চর্চায় বৃত হয়েছিলেন; কিন্তু নিছক লাভের আশায় তিনি ফার্সী ভাষা চর্চা করেন নি। ঐ ভাষা অনুশীলনের মূলে তাঁর একটি মহৎ উদ্দেশ্য ছিল। বলা বাহুল্য পারসিক সাহিত্যের মনোজ্ঞ ভাব ও চিন্তা কবির প্রাণে এক নতুন বার্তা বহন করে এনেছিল। কবি সেই অনুভবকে উপেক্ষা করতে পারেন নি। তারই স্বীকৃতি স্বরূপ তিনি পারসিক কাব্যাদর্শের পোষকতা করেছিলেন। যদিও সাদী হাফিজ প্রমুখ কবিদের মত তাঁর অনুভূতি অতলস্পর্শী ছিলনা, তবু সেই অভাব তিনি পূরণ করেছেন নিজ অনুভূতির সত্যসন্ধতা এবং সহজ বাগ্‌বৈদগ্ধ্যের সার্থক পরিচয় বলে। অকৃত্রিম ও ঐকান্তিক কাব্যনিষ্ঠা কবিকে দুরবগাহ জ্ঞানের তপস্যায় নিমগ্ন করেছিল। কঠোর পরিশ্রম সহকারে তিনি ফার্সী ভাষায় বুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন। শিল্পীমনের ঐকান্তিক নিষ্ঠাবলে প্রতিবেশী সাহিত্যের ঐতিহ্যকে বাংলা ভাষায় দীপ্ত করে তুলেছিলেন। পারসিক কবিকুলের প্রেমানুভূতি ও জীবন-দর্শনকে ফার্সী সাহিত্যের মণিকোঠা হতে আহরণ করে বাঙালীর বিদগ্ধ রসলোকে একান্ত ভাবে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। এখানেই কবির শিল্পকৃতির উৎকর্ষ। বাংলা সাহিত্যে সেদিন এক নব চেতনার সঞ্চার হয়েছিল। যুগ-চেতনার মানদণ্ডে বিচার করলে, কবির এই আন্তরিক প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে অনন্যতুল্য।

কবি কৃষ্ণচন্দ্রের প্রথম কাব্যগ্রন্থ, 'সদ্ভাব শতক' (১৮৬১) বাংলা সাহিত্যে একটি উল্লেখযোগ্য রচনা। উক্ত গ্রন্থের অনেকগুলি কবিতায় সাদী ও হাফিজের অধ্যাত্ম ভাব-প্রতিবেশ মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে। সদ্ভাব শতকে সংকলিত অধিকাংশ কবিতা অধুনালুপ্ত 'কবিতা কুসুমাঞ্জলী' এবং 'ঢাকা প্রকাশ' পত্রিকায় পর্য্যায়ক্রমে প্রকাশিত হয়। কবি কি প্রকার হাফিজ ভক্ত ছিলেন, তার পরিচয় সদ্ভাব শতকে যত্র তত্র ছড়িয়ে আছে। আলোচ্য গ্রন্থের কতকগুলি কবিতায় তিনি ভনিতাস্বরূপ হাফিজের নাম ব্যবহার করেছেন। কিন্তু সুফী কবি কৃষ্ণচন্দ্র যে শুধু হাফিজের ভক্ত ছিলেন তা নয়, ফির্দৌসী, সাদী, ওমর খৈয়াম, জামী, জালালুদ্দিন, রুমি প্রভৃতি পারস্যের অন্যান্য কবিদের রচনাও তাঁকে গভীর ভাবে আকৃষ্ট করেছিল। যে সকল পারসিক কবির প্রভাব কৃষ্ণচন্দ্রের জীবন ও কাব্যে প্রতিফলিত হয়েছে, তাঁদের মধ্যে ফির্দৌসী, ওমর খৈয়াম, সাদী ও হাফিজের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। ঐ কবিদের রচনা পড়ে তিনি কেবল আকৃষ্টই হননি, তাঁদের সঙ্গে অন্তরে অন্তরে এমন সখ্য স্থাপন করেছিলেন যে লৌকিক আচারে তিনি হিন্দু হয়েও অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে সুফী ভক্ত হয়ে উঠেছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্রের এই ভাব-বিভঙ্গ লক্ষ করে আচার্য্য ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন,—'যে নিঃস্পৃহতা, যে নীরবতা, যে ধর্ম্মোন্মত্ততা সুফীদিগকে জগতের কাছে দুর্ব্বোধ্য করিয়া রাখিয়াছে; সেই নিঃস্পৃহতা, নীরবতা ও ঈশ্বরানুরাগ তাঁহার জীবনে উজ্জ্বলরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছিল।' কবির জীবন দর্শনে উক্ত মন্তব্যটি সুপ্রযুক্ত।

কৃষ্ণচন্দ্রের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'সদ্ভাব শতক' এক সময় পাঠ্যপুস্তকের মর্যাদা পেয়েছিল। কবির দ্বিতীয় রচনা 'মোহ ভোগ' (১৮৭১) একটি নীতিমূলক কাব্যগ্রন্থ। অপরাপর রচনাগুলির মধ্যে 'রা,-সের ইতিবৃত্ত' (১৮৬৮) ও 'কৈবল্যতত্ত্ব' (১৮৮৯) দু'টি উল্লেখযোগ্য গদ্য নিবন্ধ। 'কৈবল্যতত্ত্ব' গ্রন্থটিতে কবি-মনের গভীর উপলব্ধি তত্ত্বাকারে প্রকাশ পেয়েছে। এখানে কবি দার্শনিকের ভাব চিন্তায় ধ্যানমগ্ন। স্থানে স্থানে কবি-মনের গভীর উপলব্ধি ও সুমিত প্রকাশভঙ্গি উন্নত কবি-প্রতিভার পরিচয় বহন করে।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, একমাত্র 'সদ্ভাব শতক' ছাড়া কবির আর কোন রচনা পাঠকের কাছে তেমন সমাদর পায় নি। এর প্রধান কারণ, তিনি তাঁর রচনায় এমন কতকগুলি অপ্রচলিত ও উদ্ভট শব্দ ব্যবহার করেছেন যে সেগুলি পাঠকের কাছে দুরূহ হয়ে পড়েছে। বিশেষ করে, কৃষ্ণচন্দ্রের গদ্য-রচনায় এই ত্রুটি অধিক মাত্রায় পরিদৃষ্ট। অনেকের মতে, রচনাকার স্বইচ্ছায় এরূপ উদ্ভট শব্দ ব্যবহার করতেন। তাঁর যুক্তি ছিল, অভিধানে যত প্রকার শব্দ আছে, তার যথাযথ ব্যবহার হওয়া উচিত, নইলে সেগুলি থাকার সার্থকতা থাকে না। যাইহোক, এই এক প্রধান দোষে কৃষ্ণচন্দ্রের অধিকাংশ রচনা সর্ব্বসাধারণের কাছে অনধিগম্য ও অনাদরের সামগ্রী হয়ে রয়েছে; অথচ সাহিত্য বিচার রচনাগুলি নিঃসন্দেহে বিদগ্ধ কলাকর্ম।

কাব্য রচনা ছাড়াও কৃষ্ণচন্দ্র একজন আদর্শ শিক্ষক রূপে পরিচিত ছিলেন। প্রথম জীবনে তিনি ঢাকা নর্ম্যাল স্কুলে শিক্ষকতার কাজে নিযুক্ত হন, পরে যশোহর জিলা স্কুলে হেডপণ্ডিতের কাজে যোগদান করেন। প্রথম জীবনে ঢাকা এবং শেষ জীবনে যশোহর, —এই দু'টি স্থান কৃষ্ণচন্দ্রের বৃহৎ কর্ম্মক্ষেত্র। ঢাকায় অবস্থান কালে তিনি যেমন পারস্য ভাষা এবং সুফী সাহিত্যের অনুশীলন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, যশোহর অবস্থান কালে তেমনি বৌদ্ধ দর্শন ও সাহিত্য চর্চায় উৎসাহিত হয়েছিলেন। কবির 'সদ্ভাব শতক' কাব্য গ্রন্থটিতে যেমন সুফী দর্শনের মর্মবাণী উৎসারিত হয়েছে, আবার তেমনি তাঁর 'মোহভোগ' ও 'কৈবল্যতত্ত্ব' গ্রন্থদ্বয়ে বৌদ্ধ দর্শনের নানা বিষয়-সমূহ তত্ত্বাকারে আলোচিত হয়েছে।

শিক্ষক জীবনের ফাঁকে ফাঁকে কবি কিছুকাল সংবাদ পত্র পরিচালনার কাছে নিযুক্ত ছিলেন। এই কাজে নিযুক্ত থাকাকালীন তিনি সম্পাদকীয় কর্ম্মে অসামান্য দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন। তাঁর সম্পাদনায় 'ঢাকা প্রকাশ' তৎকালীন অল্পসংখ্যক সংবাদপত্রাদির মধ্যে উচ্চস্থান অধিকার করেছিল। সেকালের রাজনীতি, সমাজনীতি ও অর্থনীতি গত ভাবনার ছাপ ঐ পত্রিকায় সুস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে। কৃষ্ণচন্দ্রের সমাজ সন্দর্শনের ক্ষমতা উদার মুক্ত ছিল বলেই 'ঢাকা প্রকাশ' সে যুগে অশেষ জনশ্রদ্ধা লাভ করেছিল। কবির রাজনীতি-জ্ঞান ছিল তীক্ষ্ণ দীপ্ত। সেখানে কোনরূপ রক্ষণ শীলতার অন্ধ আবেগ ছিল না। কবির রচিত "ভারতেশ্বরীর নিকট প্রার্থনীয়া রাজনীতি" নামক গ্রন্থটি বাংলা সাহিত্যে একটি উৎকৃষ্ট রচনা। তৎকালীন রাজনীতির এমন সূক্ষ্ম ও সাবলীল আলোচনা বাংলা সাহিত্যে বিরল।

'ঢাকা প্রকাশ' সম্পাদনাকালে কবির 'সদ্ভাব শতক' কাব্য গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণচন্দ্রের কবিখ্যাতি বিদগ্ধ সমাজে ছড়িয়ে পড়ে এবং ঐ রচনার গুণ বৈশিষ্ট্যে তিনি সুকবির মর্য্যাদা লাভ করেন।

কিছুকালের মধ্যে 'ঢাকা প্রকাশ' এর স্বত্বাধিকারীর সঙ্গে কৃষ্ণচন্দ্রের মত-বিরোধ দেখা দেয়। স্বত্বাধিকারীর পক্ষ থেকে প্রায়ঃ সম্পাদকের কাজকর্ম্মে হস্তক্ষেপ শুরু হয়। ফলে, স্বাধীনভাবে লেখনী চালনা করতে না পারায় কৃষ্ণচন্দ্র 'ঢাকা প্রকাশ'-এর সংশ্রব ত্যাগ করেন। ঐ সময় ঢাকার সাহা বাবুরা 'বিজ্ঞাপনী' নামে একখানি সংবাদ পত্র প্রকাশ করার আয়োজন করছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্রকে তাঁরা ঐ পত্রিকার সম্পাদক পদের কার্য্যভার গ্রহণ করতে অনুরোধ জানান। কবি সেই অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারেননি। 'বিজ্ঞাপনী' পত্রিকার

সম্পাদক হিসেবে তিনি গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে কিছুকাল নিজ দায়িত্ব পালন করেন। সে সময় 'বিজ্ঞাপনী'তে প্রকাশিত তাঁর কয়েকটি সমাজ-মূলক নিবন্ধ পাঠক সমাজে যথেষ্ট সমাদার লাভ করে। পরে কৃষ্ণচন্দ্র 'ঢাকা প্রকাশ'-এর স্বত্বাধিকারীর সনির্বন্ধ অনুরোধে আবার ঐ পত্রিকার সম্পাদক পদে নিযুক্ত হন; কিন্তু হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় 'ঢাকা প্রকাশ' সম্পাদনা করা আর তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠেনি।

১২৯৩ বঙ্গাব্দে কৃষ্ণচন্দ্র যশোহর হতে সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে নিজ সম্পাদনায় 'দ্বৈভাষিণী' নামে একটি মাসিক পত্র প্রকাশ করেন। বাংলা এবং সংস্কৃত—এই দুই ভাষায় পত্রিকাটি প্রকাশিত হত বলে পত্রিকার নাম দেওয়া হয়েছিল"—'দ্বৈভাষিণী'। কিন্তু পত্রিকাটি তৎকালীন পাঠক সমাজে তেমন সমাদর পায়নি সৃজন শীল সাহিত্য রচনার অভাব এবং সমকালীন সমাজ সন্দর্শনের অক্ষমতা—এই দুই প্রধান ত্রুটি বাঙালী পাঠকবর্গকে আশাহত করেছিল। পত্রিকায় যে সকল রচনা প্রকাশিত হত, তার মধ্যে অধিকাংশই ছিল সংস্কৃত; বাংলা রচনা খুব কমই থাকত। তাছাড়া এর মধ্যে বাংলা সাহিত্য শিল্পকে গতিশীল করে তোলার কোন প্রচেষ্টা ছিল না বললেই চলে। ফলে, প্রয়াসের অপূর্ণতা পত্রিকাটিকে সার্থক সুন্দর করে তুলতে পারে নি। অনেকের মতে, ঐ সময়ে কৃষ্ণচন্দ্রের রচনা শক্তি একরকম হ্রাস পেয়েছিল।

মজুমদার কবির উল্লেখযোগ্য রচনা,—'সদ্ভাব শতক' একটি কবিতা-সংকলন। কবিতাগুলি অধিকাংশই নীতি-মূলক। সেকালের সমাজ-জীবনের সর্বব্যাপী অনিয়ম কবির মনে এক প্রবল আক্ষেপের সৃষ্টি করেছিল। নীতি-মূলক কবিতাগুলি সেই অনুভূতিরই এক সবেদন শিল্পরূপ। কবিতাগুলিতে সমকালীন জীবন চেতনার প্রতি কবির অবিহিত চিন্তার পরিচয় সুস্পষ্ট। এমন কয়েকটি চরমোৎকৃষ্ট রচনা নিদর্শন এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে; যথা :—অপব্যয়ের পরিণাম সম্বন্ধে কবি জাতিকে সচেতন করে বলেছেন,—

'যে জন দিবসে মনের হরষে,
জ্বালায় মোমের বাতি;
আশু গৃহে তার দেখিবে না, আর
নিশিতে প্রদীপ ভাতি।'

('অপব্যয়ের ফল' : সদ্ভাব শতক)

সঙ্গদোষে জাতির বিনাশ। সেই হেতু কুসঙ্গ সর্বদা পরিত্যাজ্য। সুস্থ সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কবি তাই জাতির উদ্দেশে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন,—

'মানিলাম মন তব দৃঢ় অতিশয়,
দূষিত কুসঙ্গে তাহা হইবার নয়।
কিন্তু ভ্রাতঃ! এই কথা নিশ্চয় জানিবে,
কলঙ্কের হাত কভু এড়াতে নারিবে।
উপাসনা জন্যে যদি ব'স শুড়ী ঘরে,
মদ খেয়ে এলে তবু কবে পরে প'রে।'

(কুসঙ্গ : সদ্ভাব শতক)

সে যুগের ক্ষুব্ধ আক্ষিপ্ত বাঙালীর জীবন চেতনাকে কবি এক নতুন ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। ক্ষয়িষ্ণু বাঙালী প্রাণে এক নতুন আত্মপ্রত্যয় ও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের বীজ ছড়িয়ে দিয়ে জাতিকে নব জীবন রচনায় উৎসাহিত করেছিলেন।

কয়েকটি কবিতায় কবি চিত্তের এই আবেগ-উন্মথিত অনুভব নীতি-নির্দেশ আকারে ব্যাপ্তিত হয়েছে :

'কমল তুলিতে যদি করহ বাসনা,
ভাব সহ্য হবে কি না কন্টক যাতনা,
ইচ্ছা যদি কর, কর মধু আহরণ,
ভাব সহ্য হবে কি না মক্ষিকা দংশন।'

('আত্মক্ষমতা চিন্তা' : সদ্ভাব শতক)

* * * *

'আত্মগুণ গাহকের যশ হয় কবে?
থাকুক যশের কথা, ঘৃণে তারে সবে।'

('আত্মশ্লাঘা' : সদ্ভাব শতক)

* * * *

'বিবেক বিজ্ঞানে বল কিবা ফল তার
সৎক্রিয়া সাহস নাই মানসে যাহার।

বল তার জীবনেতে কিবা প্রয়োজন,
জীবন সাফল্য লাভে বিমুখ যে জন।'

('জ্ঞাত বিষয় কার্য্যে পরিণত কর' : সদ্ভাব শতক)

কৃষ্ণচন্দ্রের রচনার বিষয় ছিল দ্বিবিধ। এক শ্রেণীর রচনা,—নীতিমূলক; অপর এক শ্রেণীর রচনা মধ্যে রয়েছে ঈশ্বর-ভক্তির অবিচলতা। কবি কখনো জাতির হৃদয়বৃত্তি ও চিত্ত বৃত্তির বিকাশ সাধনায় দৃঢ় সংকল্প; আবার কখনো আধ্যাত্ম সাধনায় ভাবমগ্ন। সদ্ভাব শতকে কবি-চিত্তের এই যুগপৎ প্রকাশ পরিলক্ষিত। কবির আধ্যাত্মমূলক রচনাগুলিতে ধ্যানী কল্পনার ভাব জ্যোতি এক অপূর্ব্ব কলারূপ রচনা করেছে। ঈশ্বর মহিমার রূপ রচনা করতে গিয়ে তিনি তাঁর সঙ্গে একাত্ম হয়ে পড়েছেন। প্রকাশ-বিভঙ্গের সঙ্গে অনুভব নিমগ্নতা যুক্ত হয়ে তাঁর পদে ঈশ্বর মহিমায় এক অপরূপ মন্ত্র উচ্চারিত হয়েছে :

'হে পুণ্য! তোমা কিবা মূর্ত্তি বিমোহন,
তুলনা কোথায় পাব কে আছে এমন।
তব এ বিশুদ্ধ বেশ হেরেছে যে জন,
পারে কি তোমায় সেই ভুলিতে কখন।
পাপী যদি তব মূর্ত্তি হেরে একবার,
কতক্ষণ পাপাসক্তি রহে তার আর?'

('ঈশ্বরের মূর্তি' : সদ্ভাব শতক)

আধ্যাত্ম কল্পনার কল্পতীর্থে অবগাহন করে কবি অলৌকিক মাহাত্ম্যের কীর্তন করেছেন :

'সীমা কে জানে? জননী!
স্নেহ জলধির তব।
আমাদের সুখ হেতু কতনা করেছ তুমি,
প্রতিক্ষণ সাক্ষ্য তার, দিতেছে বিনোদ ভব।'

দুঃখের দহনে কৃষ্ণচন্দ্রের কবিপ্রাণ সর্ব্বদা নিমগ্ন ছিল। দুঃখ ও দারিদ্র্যকে তিনি জীবন সাধনার সহায়ক রূপে গ্রহণ করেছিলেন। কবির মতে, এই দুঃখময় জীবনের একটা গভীরতর দিক আছে এবং সেটাই মানবাত্মার শ্রেষ্ঠতম দিক। তাই দুঃখময় বন্ধুর জীবনের প্রতি কবি মনের অভীপ্সা বাণীবদ্ধ হয়েছে :

'এই তুচ্ছ অন্ন বস্ত্রে তুষ্ট রও মন,
কার কাছে কোন কিছু মেগ না কখন।
আপন যতনে লাভ যখন যা হয়,
যাচিত রতন তার তুল্য মূল্য নয়।
যদ্যপি বল্কল পর, রহ উপবাসী
হও না হও না তবু পরের প্রত্যাশী।'

('ভিক্ষা' : সদ্ভাব শতক)

এ সংসারে সুখ বা শান্তির অন্বেষণ বৃথা। কবির মতে, প্রকৃত শান্তি রয়েছে অমৃতলোকে। শোক-সন্তাপিত মানুষ বৃথাই এখানে শান্তি অন্বেষণ করে বেড়ায়। অমৃত লোকের দ্বার সকলের জন্য মুক্ত। সেখানে আত্মা চির সুন্দর, চির শাশ্বত এবং চির মঙ্গলময় :

'শান্তি কোথা আছে আর?
অমৃত সাগর বিনা।
ওরে সন্তাপিত জীব, কেন বৃথা ভ্রমিতেছ,
কাঁদিতেছ ভবারণ্যে হারায়ে শান্তি,
অমৃত সাগরে যাও, যাবে তাপ পাবে শান্তি
সকলের প্রতি আছে মুক্ত তার দ্বার।'

('শান্তি' : সদ্ভাব শতক)

মহাজ্ঞানীরা স্ব স্ব কর্ম্ম সাধনায় নিযুক্ত থেকে অনেকেই বিশ্ববাসীর চোখে উন্মাদ প্রতিপন্ন হয়েছেন। কৃষ্ণচন্দ্র বিশ্ববাসীর চোখে না হলেও, বাঙালীর কাছে উন্মাদ রূপে দেখা দিয়েছিলেন। সুফী কবি হাফিজ তাঁকে পাগল করেছিল। হাফিজ পাঠের ফলেই তাঁর উন্মাদ রোগ দেখা দিয়েছিল। কিন্তু তা হলেও কৃষ্ণচন্দ্র কোন সময় ঈশ্বর প্রসঙ্গ ত্যাগ করেন নি। ঐশী মহিমায় তাঁর মন প্রাণ সদা তন্ময় হয়ে থাকত। ঈশ্বরের প্রেমময় স্বরূপটিকে স্মরণ করে কবি যেন আত্মনিবেদিত প্রাণ এক প্রাণময় ভক্তিনিষ্ঠায় শ্রদ্ধাবনত। কৃষ্ণচন্দ্রের মত শুদ্ধ ভক্তের মধ্যে ঐশ্বরিক ভাবের এই আবেশ মনস্তত্ত্ব সঙ্গত। এই ভাবের বেশেই তিনি সশ্রদ্ধ চিত্তে ঈশ্বর মহিমা প্রচার করে লিখেছেন,—

'কেন তারে ভুল, সে কি ভুলিবার ধন,
জান না যে সে তোমার জীবনের জীবন।

যে তোমারে একক্ষণ, ভুলে না ভুলে না মন,
তারে কি তোমার ভোলা উচিত কখন ?'
('ঈশ্বর ভুলিবার বস্তু নহেন' :
সদ্ভাব শতক)

কৃষ্ণচন্দ্রের একটি বড় পরিচয়, তিনি একজন ভক্তি বিহ্বল গীতিকবি। প্রাক্ বিহারীলালে কবি গোষ্ঠীর মধ্যে তিনি অন্যতম। বিহারীলালের পূর্ব্বেও গীতি কবিতার আবেগচিহ্নিত অনুশীলন বাংলা সাহিত্যে গীতরসধারায় অবারিত ছিল। এই অনুশীলনের মধ্যে বিদগ্ধ বাঙালী নিজের মানস অভীপ্সার প্রতিবিম্ব দেখতে পেয়েছিল। যদিও ঐ সমস্ত গীতি কবিতার মধ্যে উল্লেখযোগ্য উৎকর্ষের পরিচয় পাওয়া যায় না, তবু সেগুলির মধ্যেই উত্তর কালের যুগচেতনাশ্রিত গীতি কবিতার কাম্যতম স্পন্দনটি স্ফুরিত। কবি রচিত 'বিবিধ সঙ্গীত' কতকগুলি গীতি কবিতার সংকলন। উক্ত গ্রন্থে কয়েকটি উৎকৃষ্ট গীতি কবিতা সংকলিত হয়েছে। কবিতাগুলি একসময় 'ঢাকা প্রকাশ' ও 'কবিতা কুসুমাঞ্জলী' পত্রিকায় পর্য্যায় ক্রমে প্রকাশিত হয়েছিল।

মজুমদার কবির নীতিমূলক কবিতাগুলি বাঙালী পাঠকের গভীরতম জীবন প্রত্যাশারই সংকেত-বহ। গীতি কবিতা রচনার ক্ষেত্রে কবি জীবনবোধকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। কবিতাগুলি তাঁর আত্মচিন্তার অনুকূল অবসরে রচিত হয়েছে বলে অনুমিত হয়। অনেকের মতে, কৃষ্ণচন্দ্র ঈশ্বর গুপ্তের ভাবানুসারী। শ্রদ্ধেয় আচার্য্য সুকুমার সেন এ প্রসঙ্গে একটি মন্তব্য করে বলেছেন,— 'কৃষ্ণচন্দ্র ঈশ্বর গুপ্তের ধারা অনুসরণ করে প্রকৃতি বর্ণনা ও নীতিশিক্ষাত্মক গদ্য নিবন্ধ রচনা করেছিলেন। এই মন্তব্যটি যথার্থ বলে স্বীকার করে নিলে অনেক বিষয়ে সংশয় থেকে যায়। ঈশ্বর গুপ্তের কবি-কর্ম কবিয়ালদের ভাব রসে পরিপ্লুত। তাঁর কবিকৃতি কবিয়ালদের রঙ্গব্যঙ্গ শিক্ষাবোধহীন অগভীর রচনাশৈলীকে অনুসরণ করেছে। কবির রচনা সরস অথচ তির্য্যক, প্রকাশ ভঙ্গি বাগ্‌নিপুণ, কবিগান-সুলভ ভাব কল্পনা নিতান্ত অগভীর। উপরন্তু ভাষা ও সচেতন কলাকৃতির অভাবে তাঁর অনেক রচনা রসোত্তীর্ণ হতে পারেনি বা সার্থক শিল্পরূপে পরিমণ্ডিত হয়ে ওঠেনি। সচেতন শিল্পীর মত তাঁর কলাকর্ম্মে অনুভূতির অমিশ্র সত্য-সন্ধতা ও সমুচিত প্রকাশের পরিচ্ছন্নতা লক্ষ্য করা যায় না। সেখানে কেবল ব্যঙ্গ প্রহসনের প্রাধান্যই ঘোষিত হয়েছে কাব্যকলার অপরাপর বিষয়গুলি অস্পষ্ট র'য়ে গেছে। পক্ষান্তরে, লোক-জীবন রসে তন্ময় কৃষ্ণচন্দ্রের রচনায় মধুরভাবের অভিন্নতা, উন্নত কবি কল্পনা ও প্রকাশ-দক্ষতার পরিচয় সুপরিস্ফুট। সাদীর সঙ্গে তাঁর কবি প্রতিভা সাম্যের পরিচয় বহন করলেও কবির ভাবপ্রবাহ ও প্রকাশ ভঙ্গি একটি বিশেষ মৌলিকতায় পরিদৃষ্ট। কাব্যধর্ম্মে রূপাঙ্গিকের চেয়ে ভাবঋদ্ধকে তিনি অধিকতর প্রাধান্য দিয়েছেন। কৃষ্ণচন্দ্রের গীতি কবিতাগুলি জীবন রস সম্ভূত। কবির হৃদয় বেদনা এখানে প্রচলিত কাব্য রীতির সংযোগে গীত ধারায় উদ্গীত হয়েছে। সে যুগের রামপ্রসাদ সেন, রসিক রায় প্রমুখ গীত কবিদের তুলনায় তাঁর সংগীত রচনা অতি উচ্চাঙ্গের না হলেও, সেগুলি নিঃসন্দেহে মনন ধর্ম্মী। বিষয় নির্ব্বাচনের অভিনবতা, মননের অন্তর্নিগূঢ়তা, ছন্দ প্রবর্ত্তনের সম্ভাব্যতা ইত্যাদির অভাব হেতু কবি তাঁর মনের গভীর অনুভূতিকে ভাষায় তেমন স্পষ্ট করে তুলতে পারেন নি। বলা বাহুল্য, সুফীবাদের ধারক হিসেবে কৃষ্ণচন্দ্রের খ্যাতি যত, সার্থক কবি হিসেবে বাংলা সাহিত্যে তিনি ততটা প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে পারেন নি।

কৃষ্ণচন্দ্র ব্রাহ্মধর্ম্মে বিশ্বাসী ছিলেন। ঢাকায় অবস্থান কালে তিনি সময়ে সময়ে ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করতেন; কিছুকাল ব্রাহ্ম উপাচার্য্যের কাজেও নিযুক্ত ছিলেন। কবিপুত্র মহামহোপাধ্যায় প্রসন্নচন্দ্র বিদ্যারত্নের লিখিত একটি বিবরণ হতে জানা যায়, কৃষ্ণচন্দ্র ব্রজসুন্দর প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্ম স্কুলে (ঢাকায়) কিছুদিন শিক্ষকতা করেছিলেন। ঐ সময়ে তিনি ব্রাহ্মসমাজের জন্য অনেকগুলি সংগীত রচনা করেছিলেন। তার মধ্যে কয়েকটি সংগীত ব্রাহ্মসমাজে যথেষ্ট সমাদর লাভ করেছিল। ঐ সংগীতগুলির মোটমুটি একটা তালিকা দেওয়া গেল,—

'অয়ি সুখময়ি উষে'

'অয়ি সুখময়ি উষে ? কে তোমারে নিরমিল।
বালার্ক সিন্দুর ফোঁটা কে তোমার ভালে দিল ?'

(ললিত—আড়া)

*   *   *   *

তুমি আত্মীয় হতে পরমাত্মীয় হে

'তুমি আত্মীয় হতে পরমাত্মীয় হে।
আছে তোমা হতে কে সংসারে ?

(খাম্বাজ—জংলাঠুংরি)

*   *   *

পিতঃ ক্ষম অপরাধ

'পিতঃ ক্ষম অপরাধ, অবোধ সন্তান আমি,
না শুনে তোমার কথা, করেছি কুকাজ কত,
হেলায় সুপথ ছেড়ে হয়েছি কুপথগামী।'

(বেহাগ-আড়া)

*   *   *

সীমা কে জানে জননী

'সীমা কে জানে ? জননী।
স্নেহ জলধির তব।'

(বাগেশ্রী—আড়া)

*

প্রবল সংসার স্রোত

'প্রবল সংসার স্রোত, আমরা দুর্বল অতি,
কেমনে করিব নাথ—প্রতিকূল মুখে গতি।'

(খাম্বাজ—মধ্যমান)

উপরোক্ত সংগীতগুলির মধ্যে তিন-চারটি সংগীত আধুনিক ব্রহ্মসংগীত গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে। এ ছাড়া কবি রচিত আরও কয়েকটি ব্রহ্মসংগীত অন্যান্য সংগীত গ্রন্থে বাণীবদ্ধ হয়েছে। সংগীতগুলিতে কৃষ্ণ চন্দ্রের ব্যক্তিগত ধর্মানুভূতি ও আধ্যাত্ম বোধের পরিচয় সুস্পষ্ট। প্রসঙ্গ ক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে কবি নিজে উত্তম গায়ক রূপে পরিচিত না হলেও, সংগীতের প্রতি তাঁর যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। জীবনীকার ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায়,'তিনি শুধু গান শুনিতেন না, গানে মজিতেন।' মন্তব্যটি গীতকার কৃষ্ণচন্দ্রের জীবন সাধনার ক্ষেত্রে সুপ্রযুক্ত।

কবি ছিলেন উপনিষদের ঋষির মত ধ্যানী ও উদাসীন। আধ্যাত্ম ভাবচিন্তা ছিল তাঁর কাব্য সাধনার পাদপীঠ। একসময় বাগেরহাট মহকুমার অন্তর্গত পিলজঙ্গ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা কালে আত্মচিন্তায় মগ্ন কৃষ্ণচন্দ্রের হঠাৎ মনে হয়েছিল,জীবনে তিনি অনেক পাপ করেছেন, এর জন্য শাস্তি গ্রহণ করা উচিত। শেষে অনেক চিন্তার পর তিনি একদিন বাগেরহাটে উপস্থিত হলেন এবং সেখানে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে নিজের বিরুদ্ধে নিজেই একটি অভিযোগ পেশ করে বিচার প্রার্থনা করলেন। বিচারক সেদিন যারপর নাই বিস্মিত হয়েছিলেন। অতঃপর অভিযোগ রুজু হলে বিচারক কবির স্বপক্ষে রায় দিয়ে বলেছিলেন, 'আমি অপরাধীকে শাস্তি দিতে পারি, ক্ষমা করিতেও পারি,— আমি আপনাকে ক্ষমা করিলাম।'

সুফীরা জীবনের আনন্দকে সহজ ভাবে গ্রহণ করতে পারেন বলে তাঁরা সহজ। অন্তরের গভীরে তাঁরা তাত্ত্বিক আর এই তাত্ত্বিকতা যেন তাঁদের স্বভাবগত। এই পরমতত্ত্বের নামই লীলাবাদ; আবার লীলাবাদের এক অভিন্ন রূপ অদ্বৈতবাদ ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ। হিন্দু ধর্মের মর্মকথা এদের মধ্যেই নিহিত রয়েছে। পরম প্রিয় হিন্দু পুরাণের বা 'সোহহম্'—কোরানের তাই 'আ' নাল হক'। দুই অভিন্ন তত্ত্ব সুফী ধর্মের মর্মকথা। সুফী নিষ্ঠা কৃষ্ণচন্দ্রকে সোহহম জ্ঞানে উদ্বুদ্ধ করেছিল। মধুর ভাবের মধ্যে তিনি অভিন্নতার স্বরূপ উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁর কাব্য সাধনার সঙ্গে আধ্যাত্ম সাধনার একটি নিগূঢ় সংযোগ রচিত হয়েছিল। সাদীকে কবি তাঁর জীবনের একমাত্র স্মরণ্য বলে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর মত তিনিও শক্তিমদিরা পান করে সর্বক্ষণ এক বিচিত্র ভাবরসে বিভোর হয়ে থাকতেন।

১৩১৩ বঙ্গাব্দের ২৯শে পৌষ কবি স্বীয় জন্মভূমি সেনহাটিতে দেহত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র উনসত্তর বছর।

বাংলা সাহিত্যে কৃষ্ণচন্দ্র একজন উপেক্ষিত কবি। বাংলাভাষায় তাঁর কোন প্রামাণ্য জীবনচরিত নেই। ফলে

কবির ব্যক্তি পরিচয় সম্পর্কে সবিশেষ জানা যায় না। বহুকাল পূর্ব্বে শ্রদ্ধেয় ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা ভাষায় কবির একটি জীবনচরিত লিখেছিলেন। গ্রন্থটি এখন দুষ্প্রাপ্য। তাছাড়া কবির রচনাবলী সম্পর্কে কোন বিস্তৃত আলোচনা নেই। সেই হেতু তাঁর কাব্যের সার্থক রস বিচারও সম্ভব নয়; অথচ এই কবির রচনা 'সদ্ভাব শতক' একদা সার্থক রচনা হিসেবে পাঠক সমাজে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা অর্জন করেছিল।

কবি কৃষ্ণচন্দ্র অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তৎকালীন সাময়িক পত্র পত্রিকাদিতে প্রকাশিত কৃষ্ণচন্দ্র বিষয়ক কয়েকটি প্রবন্ধ হতে কবির রচনাবলী সম্পর্কে অল্পবিস্তর অবগত হওয়া যায়। ঐ তথ্যাদির ওপর ভিত্তি করে কবির একটি রচনা পঞ্জী প্রস্তুত করা গেল,—

১। সদ্ভাব শতক (কবিতা সংকলন)

২। 'রা', সের ইতিবৃত্ত (আত্মজীবনী-মূলক রচনা)

৩। মোহ ভোগ (তত্ত্ব বিষয়ক গদ্য নিবন্ধ)

৪। কৈবল্য তত্ত্ব (ঐ)

৫। নলোদয়ের বঙ্গানুবাদ (অনুবাদ রচনা)

৬। রাবণ বধ নাটক (নাট্য রচনা)

৭। সৎ প্রেক্ষন (দৃশ্য কাব্য বিশেষ)

৮। সংস্কৃত গদ্য পদ্য স্থাপনা বিধি (পাঠ্য পুস্তক)

৯। সংস্কৃত ব্যাকরণ (ঐ)

১০। অনুবাদ স্তোত্র (অনুবাদ রচনা)

১১। ভারতেশ্বরীর নিকট প্রার্থনীয়া রাজনীতি (রাজনীতিমূলক রচনা)

১২। বিবিধ সংগীত (সংগীত সংকলন)

অপ্রকাশিত রচনাবলী

১। চম্পূকাব্যম্ (কাব্য)

২। ছাত্রনীতি (রাজনীতি বিষয়ক রচনা)

৩। সংগীত বীথিকা (সংগীত সংকলন)

কবিত্বগুণেই কৃষ্ণচন্দ্র সাহিত্য সমাজে একজন স্মরণীয় পুরুষ। কিন্তু সাহিত্য বিচারের ক্ষেত্রে সমালোচক-গুণজ্ঞ দৃষ্টিভঙ্গির অভাব হেতু কবির গুণ গৌরব আজ অনেকাংশে সঙ্কুচিত। সারস্বত সমাজে এরূপ এক নীতি-নিষ্ঠ সাহিত্য-সাধকের অস্তিত্ব বিলোপ কোনমতেই বাঞ্ছনীয় নয়। অতএব সাহিত্যের ধারাবাহিকতা ও ঐতিহ্য সংরক্ষণার্থে কৃষ্ণচন্দ্রের রচনাবলীর পূর্ণাঙ্গ আলোচনা এবং সেই সঙ্গে তাঁর গ্রন্থসমূহের পুনঃপ্রকাশ প্রয়োজন। বলা বাহুল্য, কবিকৃতির মূল্যায়ন ও কাব্য প্রেরণার উৎস সন্ধান করাই আধুনিক সমালোচনার ধর্ম্ম। বাংলা সমালোচনা যখন এই নতুন পথ ধরে অগ্রসর হতে উৎসুক, তখন যে ভাবেই হ'ক, কৃষ্ণচন্দ্রের রচনাবলী ও ব্যক্তি পরিচয় সম্পর্কে প্রামাণ্য তথ্যাদি সংগ্রহ করা অত্যাবশ্যক বলে মনে করি।

পরলোকে বিপ্লবী নেতা যতীন্দ্রনাথ রায়

চিত্তরঞ্জন দাস

দীর্ঘদিন রোগ ভোগের পর বিগত ১লা অগ্রহায়ণ, শুক্রবার (ইং ১৭ই নভেম্বর, ১৯৭২) সকাল ৬-৪০ মিঃএ, বিপ্লবী নায়ক যতীন রায় রিষড়া সেবাসদনে ৮৩ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

পরাধীন ভারতে ব্রিটিশ সরকার ছিল বাঙলার সশস্ত্র বিপ্লবীদের ভয়ে সদা সন্ত্রস্ত। কঠোর দমন নীতির প্রয়োগও হ'য়েছিল তাই বঙ্গদেশেই সর্ব্বাধিক। নেতৃবৃন্দের সহ্য করতে হ'ত অশেষ সরকারী নির্যাতন। যতীন রায় ছিলেন সেই সমস্ত নির্যাতিত নেতৃবৃন্দেরই একজন। ডাক নাম ছিল তাঁর ফেগু এবং ফেগু রায় বা ফেগু ডাকাত নামেই তিনি ছিলেন সমধিক পরিচিত। দেশের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য জীবনব্যাপী তিনি করেছেন আপোষহীন সংগ্রাম। এমন কি বর্ত্তমান স্বাধীনোত্তর ভারতেও তিনি কোনদিন সরকারের নিকট অনুগ্রহপ্রার্থী হন নি কিম্বা সরকারের সঙ্গে সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে কখনও হস্ত প্রসারণ করেন নি। সারা জীবন তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ নীরব কর্ম্মী। সংবাদ পত্রের শীর্ষস্থানে bold typeএ নাম প্রকাশের উদ্দেশ্যে তিনি কখনও প্রকাশ্য সভা সমিতির অনুষ্ঠানে গালভরা বক্তৃতা করেন নি। কর্ম্মই ছিল তাঁর ধর্ম্ম। মহাকাল দেশবিভাগের পর তিনি পশ্চিমবঙ্গেই স্থায়ী ভাবে বসবাস করতেন এবং শেষ জীবনে কেবলমাত্র জন-সেবা-মূলক বিবিধ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকতেন।

১২৯৬ সালে পূর্ব্ব বাংলার বরিশাল জেলার নলছিটি থানার অন্তর্গত কুলকাঠি গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত কায়স্থ পরিবারে যতীন রায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম স্বর্গত পার্বতী চরণ রায়। ছয় ভ্রাতার মধ্যে যতীন রায় ছিলেন সর্ব্ব-কনিষ্ঠ ও অকৃতদার। ভ্রাতাদের সকলেই এখন স্বর্গত।

বাল্যকাল থেকে যতীন রায় ছিলেন অনুশীলন সমিতির সক্রিয় সদস্য। অন্য কোন রাজনৈতিক দলভুক্ত তিনি কখনও হন নি। বৈপ্লবিক চিন্তাধারাই ছিল তাঁর সারা জীবনের পাথেয়। স্বদেশী যুগে অনুশীলন সমিতির নির্দিষ্ট কর্মসূচী অনুযায়ী পূর্ব্ব বঙ্গে যতগুলি স্বদেশী ডাকাতি হ'য়েছে, তার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যতীন রায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছেন এবং সেজন্য তিনি ফেগু ডাকাত নামেই ছিলেন সর্বত্র সুপরিচিত। বিভিন্ন ডাকাতির অপরাধে তিনি বহুবার কারাদণ্ড ও অশেষ নির্যাতন ভোগ করেছেন। তাঁর কারাদণ্ডের কাল অন্ততঃ ২৫।২৬ বছরের কম নয়। ব্রিটিশ সরকার যতীন রায়ের বাড়ী তল্লাসী করে যাবতীয় গৃহসামগ্রী তৈজসপত্র তচ্‌নচ্‌ এবং বাজেয়াপ্ত করেছে বহুবার। কিন্তু সরকারের সর্বপ্রকার দমননীতি যতীন রায়কে কখনও দমন করতে পারে নি। তিনি ছিলেন একেবারেই অদম্য ও অসীম সাহসী। শারীরিক গঠন কিংবা শক্তি এমন বিশেষ কিছুই ছিল না যদ্দ্বারা লোকে অনায়াসে বিশ্বাস করতে পারেন যে তিনি ডাকাত বা তাঁর দ্বারা ডাকাতি করা কখনও সম্ভব। তবুও সে যুগে ফেগু ডাকাত নামটি ছিল অতীব পরিচিত।

একবার সুদূর মফস্বল থেকে কতিপয় মুসলমান প্রজা

এসেছিল তাঁদের বাড়ীতে দুর্গা পূজা উপলক্ষে। আহারের সময়ে প্রজাদের খাদ্য পরিবেশন করেছিলেন যতীন রায় স্বয়ং। একজন কৌতূহলী প্রজা তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, "বাবু! আপনাদের এখানে নাকি ফেগু ডাকাতের বাড়ী? একবার দেখাতে পারেন তাকে?" যতীন রায় বললেন:—"খেয়ে ওঠ, দেখবে'খন।" আহার শেষে প্রজারা ফেগু ডাকাতকে দেখবার জন্য বিশেষ উদ্‌গ্রীব। কিন্তু যতীন রায়কে তখন আর দেখতে না পেয়ে তাঁর দাদা হরেন রায়-এর নিকট অনুরূপ প্রস্তাব করল। তিনি বললেন:—"কেন? তোমরা তাকে দেখ নি? সেই তো তোমাদের পরিবেশন করল। আমার ছোট ভাই—ফেগু।" শুনে তারা তো একেবারে অবাক্। বলল:—"সে কি? ছোটবাবু ডাকাত? এই চেহারা নিয়ে কখনও ডাকাতি করা সম্ভব?" ইত্যাদি।

বাল্যকাল থেকেই আমি যতীন রায়ের সঙ্গে অতিশয় ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত এবং তাঁর সহকর্মী ছিলাম। আমাদের উভয়ের বাড়ীর দূরত্ব ছিল মাত্র এক মাইল। কিছুটা বোধশক্তি জন্মিবার পরেই যতীনদার সংস্পর্শে আসি এবং অনুশীলন সমিতির সদস্য হিসাবে যথা-সম্ভব কাজ করতে থাকি। যতীনদা তখন প্রায়ই আমাদের বাড়ীতে আসতেন এবং আমিও তাঁদের বাড়ীতে যেতাম। আমাদের মধ্যে খুব মধুর সম্পর্কই ছিল। কিন্তু ১৯২১ সালে তাঁর বারম্বার নিষেধ ও যথেষ্ট অনুরোধ সত্ত্বেও আমি কংগ্রেস অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করি, তিনি করেন না। সুতরাং সেই থেকে আমাদের মধ্যে রাজনৈতিক মতানৈক্য থাকলেও বন্ধুত্ব কখনও বিনষ্ট হয় নি। শেষ জীবনে অধিকাংশ সময়েই তিনি কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে অবস্থিত স্বদেশী শিল্প ফ্যাক্টরীতে অবসর যাপন করতেন এবং সেখানেই আমাদের মাঝে মাঝে দেখাসাক্ষাৎ ও আলাপ আলোচনা হ'ত। কিন্তু অসুস্থ হ'য়ে রিষড়া চলে যাবার পর তাঁর সঙ্গে আমার আর সাক্ষাৎ লাভ হয় নি। তিনি আজ বহু দূরে মানুষের নাগালের বাইরে। তাই তাঁর অমর আত্মার উদ্দেশে জানাই আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম।

দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গান

শৈলেনকুমার দত্ত

রবীন্দ্রনাথ যখন প্রতিভায় মধ্যগগনে তখন যে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩—১৯১৩) বাংলা সাহিত্যে নিজের একটি স্বতন্ত্র স্থান করে নিয়েছিলেন এতেই দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতিভার স্বাক্ষর কিছুটা প্রকাশিত। দ্বিজেন্দ্রলাল মৌলিকতা এবং প্রতিভার স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের গুণে বাঙালী পাঠকের হৃদয়ে নিজের আসন করে নিয়েছিলেন।

দ্বিজেন্দ্রলালের খ্যাতি মুখ্যত নাট্যকার হিসেবে। পৌরুষ আর ভাষার ঔজ্জ্বল্যে তাঁর নাটকগুলি বাঙালী পাঠকের মন হরণ করেছিল। কিন্তু নাট্যকার হিসেবে জনপ্রিয়তা বেশি হলেও কবি হিসেবে তাঁর খ্যাতি ছিল। জনপ্রিয়তা ছিল 'হাসির গানের' স্রষ্টা হিসেবে। তাঁর হাসির গান সংখ্যায় বেশি না হলেও বৈচিত্র্য এবং পরিহাস-সুলভ রঙ্গ-রসিকতা গুণে পাঠককে মুগ্ধ করেছিল।

দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গান প্রকাশিত হয় ১৯০০ খৃষ্টাব্দে। তবে এ গ্রন্থে গ্রথিত গানগুলি রচিত হয়েছিল অনেক আগে। তাঁর এই গানগুলির মধ্যে আমরা যেন বাঙালী প্রেমিক দ্বিজেন্দ্রলালকে নতুন মূর্তিতে দেখতে পাই। বিলেত থেকে ফিরে দ্বিজেন্দ্রলাল ইংরেজী গান গাইতেন, কিন্তু সে-সব গান অনেকে পছন্দ করতেন না, তাই তিনি বাংলা গান গাইতে শুরু করেন। হাসির গানের মধ্যে একটি 'নতুন সুরের ভঙ্গি'ও পাঠককে আকৃষ্ট করেছিল।

হাসির গানের মধ্যে যতগুলি কবিতা আছে তার মধ্যে আমরা তিন শ্রেণীর হাসির কবিতা দেখতে পাই, —ব্যঙ্গ, রঙ্গ এবং পরিহাস জাতীয়। কবিতা তিন শ্রেণীর হলেও দ্বিজেন্দ্রলালের কবি-মানসের প্রস্ফুরণ ছিল সর্বত্র সমান। তাঁর পৌরুষ সাহিত্য-সৃষ্টিকেও আচ্ছন্ন করেছিল। ঢিলেমি কিংবা সস্তা বাহাদুরিকে কোনদিনই তিনি ভাল চোখে দেখতে পারেন নি। তাই তদানীন্তন দেশ-প্রেমিকদের কীর্তিকলাপে তাঁর বেদনা উপচে পড়েছিল 'নন্দলাল' কবিতায়। কবিতাটির মধ্যে দুটি লাইন—'লেখে যত তার দ্বিগুণ ঘুমায়, খায় তার দশগুণ' কিংবা 'বল ক' বিঘৎ নাকে দিব খৎ, যা বল করিব তাহা' যেন ব্যঙ্গে ফেটে পড়েছে।

তবে এই ব্যঙ্গের আড়ালে যেমন ছিল তাঁর পরিহাস-মুখরতা, তেমনি ছিল বেদনার অশ্রু।

পাঁচশ' বছর এমনি ক'রে
আসছি স'য়ে সমুদায়,
এইটি কি আর সইবে না ক
দু ঘা বেশি জুতোর ঘায়?
সেটা নিয়ে মিছে ভাবা
দিবি দু'ঘা দে না-বাবা
দু'ঘা বেশি দু'ঘা কমে
এমনি কি আসে যায়?
(জিজিয়া কর)

কিংবা

ভোলানাথ শুয়ে আছেন—
ঈশ্বর তাঁরে সুখে রাখুন।
কালী জিভ মেলিয়ে আছেন
তা তিনি মেলিয়ে থাকুন।
শ্রীকৃষ্ণ হয়ে বাঁকা
থাকুন তিনি পটেই আঁকা:
আমরা সব নিয়ে শরণ
বৃটিশ রাজের চরণ তলায়
সাধে কি বাবা বলি,
গুঁতোর চোটে বাবা বলায়।
(খুস রোজ)

উদ্ধৃতি দু'টির মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলালের মানব-দরদী মনের অবিরাম অশ্রুধারা ঝরে পড়েছে।

দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যরচনার কালটিও তাঁর এই পরিহাস-রসিকতার পক্ষে খুব বেশি প্রভাব বিস্তার করেছিল। ইংরেজী শিক্ষার প্রকোপে তখন বাঙালী দিশাহারা, পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার বাঁধা বুলির তোতলামিতে দেশের শিক্ষা তখন ধূলায় লুণ্ঠিত। দ্বিজেন্দ্রলাল এ সব সহ্য করতে পারেন নি। জাতিধর্ম ভোলা সেই সব কুশীলবদের নিয়ে তাই তিনি লিখলেন—

আমাদের dress হবে
English কি Greek
তা এখনো করতে পারিনি ঠিক ;
আর ছেড়েছি টিকি
নইলে সাহেবরা বলে সব
Superstitious ও obtuse,
কিন্তু টিকিতে electricity নেই
if you think
তা'লে you are an awful goose '
(Reformed Hindoos)

এবং 'বিলাতফের্তা ক-ভাই'এর বিখ্যাত লাইন ক'টি—

আমরা বিলিতি ধরণে হাসি,
আমরা ফরাসী ধরণে কাশি,
আমরা পা ফাঁক করে
সিগারেট খেতে
বড্ডই ভালবাসি।
(বিলাত ফের্তা)

সমাজের সেই সব আকস্মিক পরিবর্তন তাঁর মোটেই ভাল লাগেনি। বরং তাঁকে বিস্মিত করেছে। 'হ'ল কি' কবিতার নামকরণের মধ্যেই তাঁর সেই বিস্ময় প্রকাশিত হয়েছে -

পুরুষরা সব শুনছে ব'সে
মেয়েরা আসর জমকাচ্ছে,
গাচ্ছে এমনি তালকানা যে
শুনে তা পীলে চমকাচ্ছে।
রাজা হচ্ছে শিষ্ট শান্ত
প্রজা হচ্ছে জবদ্দার
মুনিব করছে 'আজ্ঞা হুজুর'
চাকর ক'ছেন 'খবদ্দার'।
(হ'ল কি।)

শুধু একটি মাত্র ছত্র কেন, কবিতাটির প্রত্যেকটি শব্দ প্রয়োগেই দ্বিজেন্দ্রলালের ব্যঙ্গ যেন মূর্ত হয়ে আছে। প্রসঙ্গত আলোচ্য উদ্ধৃতিটির শেষ চরণের 'মুনিব করছে' এবং 'চাকর করছেন' শব্দ ক'টির প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

দ্বিজেন্দ্রলাল ছিলেন স্থিতধী শিল্পী। পৌরুষের কথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। পৌরুষ ছাড়া তাঁর আর একটি বস্তু ছিল, সেটি গোঁড়ামিশূন্যতা। 'এমন ধর্ম নাই' কবিতাটির মধ্যে হিন্দু ধর্মের গোঁড়ামির প্রতি যেমন কটাক্ষ করেছেন, তেমনি 'গীতার আবিষ্কার' কবিতার মধ্যে যেন তাঁর সমস্ত ঘৃণা উপচে পড়েছে ধর্মের মিথ্যা বড়াইবাদীদের উদ্দেশে। গীতার বীর ধর্মের যারা বড়াই করে, তাদের প্রকৃত অবস্থাটি যে আসলে—

দেখি যদি গৌর মূর্তির
রক্তবর্ণ আঁখি,
অমনি প্রাণের ভয়ে 'ওগো বাবা'
বলে ডাকি ;
পালাই ছুটে উর্ধ্বশ্বাসে
যেন বাঘে খেলে
চাদর এবং পরিবারে
সমভাবে ফেলে।
(গীতার আবিষ্কার)

এটি তাঁর দৃষ্টি এড়ায় নি।

দ্বিজেন্দ্রলালের দৃষ্টি ছিল অন্তর্ভেদী এবং সুদূর প্রসারী। নতুন যুগের প্লাবনে গা ভাসিয়ে যা কিছু করার পক্ষপাতী ছিলেন না তিনি। নতুনের আবাহন আর নতুনত্বের মোহ এক বস্তু নয়। এই মোহগ্রস্ততাকে তিনি সমর্থন করতে পারেন নি। নতুনের দোহাই দিয়ে যা কিছু করার উন্মাদনা তাঁর ছন্দের বন্ধনে রঙ্গ-প্রধান হয়েও যেন ব্যঙ্গের প্রতিমূর্তি লাভ করেছে—

আর কিছু না পারো,
স্ত্রীদের ধরে মারো ;
কিম্বা তাদের মাথায় তুলে নাচো
ভালো আরো।
একেবারে নিভে যাচ্ছে
দেশের স্ত্রীলোক ;
বি-এ, এম-এ, ঘোড়শোয়ার
যা একটা কিছু হোক।
যা হয়—একটা করো কিছু
রকম নতুনতরো ;
—নতুন কিছু করো একটা
নতুন কিছু করো।
(নতুন কিছু করো)

কটাক্ষ এবং ব্যঙ্গ বাদ দিলে তাঁর নিছক হাসির কবিতাগুলি আলোচনা করলে দেখতে পাওয়া যায়, সেখানে প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে দ্বিজেন্দ্রলালের একটি স্নিগ্ধ অন্তর। এই জাতীয় কবিতাগুলির মধ্যে স্থানে স্থানে তাঁর পরিহাস-রসিকতা থাকলেও এগুলি মুখ্যত রঙ্গ-প্রধান রচনা। স্ত্রীদের নিয়ে মাথায় নাচার কথা তিনি বলেছেন, কিন্তু 'যদি জানতে চাও আমি ঠিক কি রকম স্ত্রী চাই,—এ প্রশ্নের জবাব দিতেও ভোলেন নি—

বসন কম ছেঁড়ে ও বাসন কম ভাঙে
গয়না সে কদাচিৎ দুই একখান চায়
খরচ পত্র একটু গুছিয়ে করে
অল্পই ঘুমায় ও অল্পই খায়।
যদি তার উপর হয় একটু চলন
সই গড়ন
আর যদি হয় একটু বোকাটে ধরণ
তার ওপর ডাকে—আমায় সোহাগে
"পোড়ারমুখো, আপদ ও হতভাগা!"—
তাহলে হাঃ হাঃ—সে ত সোনায়
সোহাগা!
(স্ত্রীর উমেদার)

এবং অন্যত্র—

আমি চাই স্ত্রী হয় রূপে গুণে
অগ্রগণ্যা,
অথচ সাত চড় মারলেও
কথা কয় না।
(যেমনটি চাই তেমন হয় না)

কিন্তু শুধু স্বামী হিসেবেই নয়, জনক হয়েও কি চেয়ে পান না সে-দুঃখ প্রকাশ করতেও ভোলেন নি—

আমি চাই পুত্র বিবাহে
আনে বয়স্থা
কন্যাদায়গ্রস্ত টাকার বস্তা
আর নিজের মেয়ের বিয়ে হ'য়ে
যায় সস্তা—
তা' যেমনটি চাই তেমন হয় না।
(ঐ)

এ সমস্ত কবিতাগুলিতে একটি পরিচ্ছন্ন মন আর একটি স্বতঃস্ফূর্ত স্বাভাবিকতাই কবিতাগুলিকে এমন রসঘন সুন্দর সুমধুর করে তুলেছে।

পৌরুষ, মমতা প্রভৃতির সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলালের অন্তরে আরও একটি দুর্লভ সামগ্রী ছিল, সেটি রসবোধ। তাই—

আহা, ক্ষীর হ'ত যদি ভারত জলধি
ছানা হ'ত যদি হিমালয়
আহা, পারিতাম পিছু করে নিতে কিছু
সুবিধা হয়ত মহাশয়।
(সন্দেশ)

কিংবা,

বিরহেতে দিন দিন ওজনেতে
বেশি হই—
এতদিনে বুঝলেম প্রিয়ে (আমি)
তোমা বই আর কারো নই।
(বিরহ যাপন)

অথবা,

কৃষ্ণ বলে এমন বর্ণ দেখিনি ত কভু
আর রাধা বলে "হাঁ আজ সাবান
মাখিনি ত তবু—

নইলে আরও সাদা।

(কৃষ্ণ-রাধিকা সংবাদ)

উদ্ধৃতিগুলি এমন স্বাভাবিক বর্ণনাতেও অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

হাস্য দ্বিজেন্দ্রলালের 'একমাত্র সখা' না হলেও দ্বিজেন্দ্রলালের কবিখ্যাতির মূলে যে হাসির গানের দান সমধিক—এ কথা বলাই বাহুল্য। তাঁর হাসির গানে যে শুধু বৈচিত্র্যই আছে তা নয়। হাস্যরসের সব প্রকরণ-গুলিও বর্তমান। এবং সেগুলি 'নির্মল শুভ্র সংযত' বলেই বোধ হয় এত সুমধুর।

দ্বিজেন্দ্রলাল ছিলেন মর্মে মর্মে বাঙালী, দেশপ্রেম ছিল তাঁর ধমনীতে। শাজাহান, চন্দ্রগুপ্ত, মেবার-পতন, প্রতাপসিংহ প্রভৃতি নাটকের পৌরুষ-কঠিন কাঠামোর মধ্যে তাঁর যে ভাবাদর্শ ছিল—'হাসির যে দেশপ্রেমানুগত মমত্ববোধ ছিল গান এর কবিতা গুলির হাল্কা মোড়কের মধ্যেও সেগুলি অক্ষত-বর্তমান; এটা গৌরবের কথা নয়।

কবিয়ালদের খিস্তি-খেউড় এবং পাঁচালিকারদের স্থূলতা বাদ দিলে বাংলা সাহিত্যে সূক্ষ্ম সংযত হাস্য-রসের নজীর খুব বেশি মেলে না। তবু যে ক'জন স্রষ্টা বাংলা সাহিত্যে এই বিষয়টির চর্চা করেছেন, তাঁদের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলালের নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। এবং এ প্রসঙ্গে তিনি যে বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ রস-স্রষ্টাদের সারিতে আসন পাবার উপযুক্ত একথা আমরা গর্বভরে বলতে পারি।

ভোজ

(গল্প)

নীহাররঞ্জন সেনগুপ্ত

কিছুদিন হল দাক্ষিণাবর্তের এক ভূস্বর্গ-নগরে বদলি হয়ে এসেছি।

আসার কিছুদিন পর এক দিন-মজুরের বাড়ী যেতে হোলো।...

লোকটির নাম মাধবাচারিয়া।

জাতিতে কানাড়ী। বয়স ত্রিশ-বত্রিশের মধ্যে। শীর্ণকায়। খোঁচা খোঁচা দাড়ি।...

লোকটির নাম আছে কাঠের কাজে।

যেতে হোলো অবশ্য মাধবাচারিয়ার বিনীত অনুরোধেই।...

আজকালের দিনে স্ত্রী, পাঁচটি কাচ্চাবাচ্চার ঘরে দু'টাকার দিন-মজুরী কিছুই নয়। মুখে না বল্লেও সেটাই হয়ত আমার প্রত্যক্ষে আনতে চায় মাধবাচারিয়া তার ঘরে ডেকে এনে।

পুরানো প্রকাণ্ড বাড়ী।

পায়রার অন্ধকার খোপের মত এক-একটি ঘরে বিভিন্ন জাতির অন্ততঃ পঁচিশ-ত্রিশটি পরিবার নিজেদের ছোট ছোট স্বার্থ ও স্বতন্ত্রতাকে বাঁচিয়ে চলেছে বছরের পর বছর।...

মাধবাচারিয়ার আস্তানাটা আরো ভেতরে হওয়ায় দিনের বেলাতেও সহসা প্রথমে কিছু নজরে আসে না। হয় তো ঐ কারণে; অন্ন পাওয়ায়ের একটি বাধ মাধবা-

চারিয়াকে সারাক্ষণের জন্যে জ্বালিয়ে রাখতে হয়েছে ঘরে।

দশ-বাই-দশের সিমেন্ট-ওঠা ঘর মোটা চটের পার্টিশানে দু'ভাগ করা হ'য়েছে। একটি থাকার, একটি রসুই-এর।

আসবাব বল্‌তে একটি নড়বড়ে টেবিল ও হাতল ভাঙা চেয়ার।...আশ্চর্য্য, ঘরের অর্ধেকটা আবার ছোটবড় টুকরো-টুকরো কাঠে বোঝাই। অফিসের ছুটি ছাটার দিনে ঘরে বসে বাড়তি উপায়ের মাধবাচারিয়ার এগুলো অপরিহার্য উপকরণ।

মোট কথা কোন এক সংক্রামক ব্যাধির মত একটা সকরুণ দারিদ্র ছড়িয়ে আছে এই স্বল্পপরিসর আলো-আঁধারি ঘরখানাতে।...

চেয়ারে বস্‌তে দিয়ে নিজে একটা কাঠের পিঁড়ি টেনে বস্‌লো মাধবাচারিয়া।

কথাবার্তা বিশেষ কিছু হোলো না এদিন। সামান্য ঘরোয়া মাত্র। কিন্তু যে-কথা রইলো অপ্রকাশিত, মাধবাচারিয়ার ঘরের পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও তার ছেলেমেয়েদের নোংরা স্বল্পাচ্ছাদন কেবলই আমার বিবেক ও দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে দিতে থাকলো।...

আবার আস্‌তে হয়েছে মাধবাচারিয়ার বাসায় আরেকদিন।

বোধ হয় মাস তিনেক পর।...

মাধবচারিয়া এখন আর দিন-মজুর নয়। এখন সে আমাদের অফিসের এক স্থায়ী কর্মী।...

ভাল কাঠ খোদাইগার।

পারিশ্রমিক অবশ্য কিছু বেড়েছে, তাতে তার দারিদ্রতার বুকে একটা সান্ত্বনার প্রলেপ শুধু।

কাজের উন্নতি উপলক্ষে বাড়ীতে ছোট একটি ভোজের ব্যবস্থা করেছে সে।

ওরই মুষ্টিমেয় অন্তরঙ্গ আত্মীয়-বন্ধু আর আমাকে।

আপত্তি করতে পারিনি। আপত্তিতে পাছে কোন প্রকারের 'সুপিরিয়ারিটির কম্‌প্লেকস' না জন্মে মাধবাচারিয়ার মনে এই কারণ।...একদিন বারোয়ারী ভাবে মিষ্টি বিতরণও করেছে অফিসের সহকর্মীদের মধ্যে।

বাসাটি বদল করেছে মাধবাচারিয়া।

পরিবর্তন খুব বেশী নয়। একটু শ্রী-যুক্ত আর এক ফালি বাড়্‌তি জায়গা।

বাসাটা প্রকাণ্ড এক হোটেল বাড়ীর পাশে।...

সন্ধ্যার দিকেই আসতে বলেছে মাধবাচারিয়া।

সে-মত তার বাসায় যেতে হোটেল বাড়ীটায় নজর পড়্‌লো।

ঢোল-নাকাড়ার সঙ্গে বিচিত্রসুরে সানাই বাজছে কর্ণাটকী ঘরোয়ানায়। নকসা-কাটা সামিয়ানার বিরাট ম্যারাপ। তাতে বহু বিচিত্র বেশে নরনারীর আনাগোনা।

বাইরে কয়েকটা জাঁদরেল গাড়ী দাঁড়িয়ে। চতুর্দিকে কর্মচাঞ্চল্য।...

আমার জন্যেই অপেক্ষা করছিল মাধবাচারিয়া যেন।

ঘরে ঢুক্‌তে কয়েকটি লোক সমীহ করে উঠে দাঁড়াল।

মাধবাচারিয়া পরিচয় করিয়ে দিলে সকলের সঙ্গে। অতি সাধারণ শ্রেণীর লোক। বেশীর ভাগই কারিগর।

কয়েকটি ভাল চেয়ার সংগ্রহ করে আনা হয়েছে। লম্বা একটি টেবিল, তাতে প্লাস্টিকের ক্লথ। সাধারণ কয়েকটি কাঁচের গ্লাস বসানো রয়েছে টেবিল সাজিয়ে।

চেয়ারে যেখানে বস্‌লুম, পাশেই ছোট খোলা জান্‌লা। আশ্চর্যভাবে এই জান্‌লা দিয়ে বড় হোটেলের যাবতীয় ক্রিয়াকলাপ চোখে পড়ে।...

তখন সবে আলো জ্বলে উঠেছে।

দিনের মত উজ্জ্বল হয়ে উঠল সামিয়ানার নীচে। সেখানে 'দীয়তাম্‌, ভুজ্যতাম্‌'এর কাজ চলেছে তখন পুরাদমে। জানলা পথে ছুটে আসা দম্‌কা হাওয়ায় নানা খাদ্যের সংমিশ্রিত উগ্র খুস্‌বু ভেসে আস্‌ছে থেকে থেকে।...

মাধবাচারিয়ার পনেরো বছরের মেয়েটি ইতিমধ্যে টেবিলে কলার পাত বিছিয়ে দিয়েছে। ধীরে ধীরে খাদ্যগুলো এনে জমা করছে পাতে ওর স্ত্রী।...

অতি সামান্য আয়োজন। ভাত, দু'রকমের সব্জী, আলু ছোলার তরকারী, সাম্বার, রসম্ ও পাপর ভাজা।

পাশের লোকগুলো কী তৃপ্তির সঙ্গে খেল, দেখলুম।

অনভ্যাস বশতঃ কিছু ইতস্ততঃ লাগলো আমার, তবু কিছু খারাপ লাগলো না। উপরন্তু মাধবাচারিয়ার খাওয়ার পুনঃ পুনঃ সনির্বন্ধ অনুরোধ আরো মনকে ভিজিয়ে দিলে।

খাওয়ার শেষে কিছু অপ্রস্তুতের মত মাধবাচারিয়া বললে 'বাবুজী, তোমার বড় কষ্ট হোলো। ভেবেছিলাম, হোটেল থেকে তোমার 'খানা' আনাই, কিন্তু আমার স্ত্রী মানা করলে! বললে, বড় বড় খানা ত বাবুজী রোজ-ই খান্, আজ না-হয় কষ্টই করবেন— ।' উত্তরে হেসে বললুম, 'কোন কষ্ট হয়নি আমার মাধব!...

মনে মনে জানি, সম্মানিত অতিথির জন্যে এই দীনতম খাদ্য সংগ্রহ করতে বেশ বেগই পেতে হয়েছে মাধবাচারিয়াকে।

...উঠতে একটু দেরীই হয়ে গেল।

পাশের প্রকাণ্ড হোটেল বাড়ীর উৎসব তখন স্তিমিত। সানাইয়ের সুর থেমেছে!...

মাধবাচারিয়ার পরিবারকে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে রাস্তায় নেমে এলুম।

হোটেলের গেটের পাশে ডাষ্টবিন্। রাস্তার নিওনের আলো এজায়গায় তেমন রোমাঞ্চ সৃষ্টি করেনি। গোটা ডাষ্টবিনটাই এঁঠো কলা পাতা, আর শালপাতার ঠোঙ্গায় স্তূপীকৃত। দেখা গেল, তার ভেতর কয়েকটি অর্দ্ধোলঙ্গ জীব ছায়ার মত খুঁটে খুঁটে কি তুলছে...আর কয়েকজন হৈ হল্লা করে বুভুক্ষুআত্মা ও পাকস্থলীর অনির্বাণ জ্বালা নির্বাপে মহাব্যস্ত। অদূরে গোটা পাঁচেক পথচারী নিশাচর কুকুর ততোধিক ক্ষুধার্ত জঠরে ছল ছল চক্ষে ব্যর্থ তাকিয়ে আছে তাদের দিকে।

ধনীর ভোজের এমনি অপচয়ের সুষ্ঠু সমাধান দেখে আজ কিছুমাত্র আশ্চর্য হলুম না! কারণ এটি অনেকদিন থেকেই দেখে অভ্যস্ত!...আরো কতদিন দেখতে হয়, 'দেবাঃ ন জানন্তি!'

ছয়জন লেখিকার সম্বর্দ্ধনা

কিছুদিন পূর্ব্বে ছয়জন লেখিকাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের নারীসভা এবং লেখিকাদের সাংস্কৃতিক সংস্থা সাহিত্যিকা রবীন্দ্র সদনে আহ্বান করিয়া সম্মান প্রদর্শন করেন। যাঁহাদের সংবর্ধনা হয় তাঁহারা সকলেই সাহিত্য জগতে সুপরিচিত এবং বয়সে ৭৫ বৎসরের উপরে। বাংলা সাহিত্যের একটি বিশেষত্ব এই যে,ইহার ইতিহাসে বহু লেখিকার অবদান দেখা যায়। অতি প্রাচীন কাল হইতেই অবশ্য ভারতবর্ষের নরীগণ ধর্ম্ম, দর্শন ও বিজ্ঞান ক্ষেত্রে খ্যাতি অর্জ্জন করিয়া আসিয়াছেন এবং সাহিত্য যখন বর্ত্তমান যুগে জাতীয় চিন্তা ও প্রেরণাকে বিশেষ রূপ দান করিয়া জনসাধারণের মানসিক পুষ্টির জন্য প্রচারিত হইতে আরম্ভ করে, নারীগণ তখন হইতেই সাহিত্যরচনায় আত্মনিয়োগ করেন। সুতরাং খনা, লীলাবতী, মৈত্রেয়ী ও গার্গীর জন্মভূমি ভারতবর্ষে যে সুসাহিত্যের আসরে বহু লেখিকার আবির্ভাব হইবে ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই। উল্লিখিত সংবর্ধনায় যাঁহাদিগকে সম্মান প্রদর্শন করা হইয়াছে তাঁহারা হইলেন শ্রীমতী জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী, শ্রীমতী শৈলবালা ঘোষজায়া, শ্রীমতী গিরিবালা দেবী, শ্রীমতী শান্তা দেবী, শ্রীমতী পুণ্যলতা চক্রবর্ত্তী ও শ্রীমতী সীতা দেবী।

শ্রীমতী জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে জয়পুরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতামহ ৺সংসারচন্দ্র সেন জয়পুর রাজ্যে উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী ছিলেন। জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী বাল্যকালে তদ্দেশীয় অভিজাত মহলের পরিবেশেই লালিত পালিত হইয়াছিলেন ও তাঁহার লিখিত গল্পের মধ্যে অনেকগুলিতেই রাজস্থানের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন ও প্রবাসীর পাঠকদিগের নিকট তাঁহার রচনাশৈলীর কথা অজানা নাই। তাঁহার লেখন প্রতিভা এখনও অক্লান্ত শক্তিতে ও সবল গতিতে অভিব্যক্ত হইতেছে।

শ্রীমতী পুণ্যলতা চক্রবর্ত্তী ৺উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর কন্যা। তিনি সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রধানত শিশু সাহিত্যের আসরেই সুপরিচিতা। তাঁহার ভ্রাতা ৺সুকুমার রায়ের দ্বারা প্রকাশিত "সন্দেশ" পত্রিকায় তাঁহার অনেক ছোটদের গল্প প্রকাশিত হইয়াছিল। পূর্ণ বয়স্ক পাঠকপাঠিকাদিগের জন্যও তিনি লিখিতেন। কিন্তু নানা কারণে সাধারণ সাহিত্যে তাঁহার বিশেষ প্রতিভা থাকিলেও তিনি সেই ক্ষেত্রে অধিক গ্রন্থ রচনা করেন নাই।

শ্রীমতী শৈলবালা ঘোষজায়ার সাহিত্য ক্ষেত্রে সুনাম বহুকাল পূর্ব্বেই গভীর ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তাঁহার লিখিত 'শেখ আন্দু' উপন্যাস তৎকালীন পাঠক সমাজে বিশেষ আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছিল। তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন ও কোনও সময়েই তাঁহার গুণগ্রাহী পাঠকপাঠিকার অভাব হয় নাই।

শ্রীমতী শান্তা দেবীর জন্ম হয় ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে। তিনি বাল্যকালে এলাহাবাদে থাকিতেন ও সেইখানে নানান জাতীয় নরনারীর আচার ব্যবহার ও জীবনধারা পদ্ধতির সহিত পরিচিত হইবার সুযোগ লাভ করেন। তাঁহার যখন বয়স ১৫ বৎসর তখন তিনি কলিকাতায় আসেন ও বেথুন স্কুল ও কলেজে পাঠ সমাপ্ত করেন। বি এ পরীক্ষায় তিনি নারীদিগের মধ্যে প্রধান স্থান অধিকার করিয়া স্বর্ণপদক লাভ করেন। শ্রীমতী শান্তা দেবী অল্প বয়স হইতেই সাহিত্য ক্ষেত্রে খ্যাতি অর্জ্জন করেন। তাঁহার লিখিত গল্প উপন্যাস, প্রবন্ধাদি বাংলা রচনা ক্ষেত্রে সর্ব্বত্রই বিশেষ ভাবে আদৃত হইয়াছে। তিনি তাঁহার পিতার জীবনী "রামানন্দ ও অর্দ্ধশতাব্দীর বাঙ্গালা" লিখিয়া সাহিত্য ক্ষেত্রে নিজ প্রতিষ্ঠা আরও সুদৃঢ় করেন। এই গ্রন্থের একাধিক সংস্করণ হইয়াছে।

ভগ্নী সীতা দেবীর সহিত একত্রেও তিনি কয়েকটি গ্রন্থ লিখিয়াছেন।

শ্রীমতী গিরিবালা দেবীর প্রথম গল্প "ছলনা" প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত "মানসী ও মর্ম্মবাণী" মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তখন তাঁহার বয়স ২০।২১ বৎসর। পরে তাঁহার গল্প সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত "সাহিত্য" পত্রিকায় মুদ্রিত হইয়াছিল। "প্রবাসী" "ভারতবর্ষ" মাসিক "বসুমতী"তেও তাঁহার লিখিত গল্প বাহির হইয়াছে। গিরিবালাদেবী উপন্যাস, (একটি কিছুকাল পূর্ব্বে প্রবাসীতে ছাপা হয়েছে), ভ্রমণকাহিনী কবিতা ইত্যাদিও লিখিয়াছেন এবং লেখিকা সমাজে তাঁহার স্থান সুপ্রতিষ্ঠিত।

শ্রীমতী সীতা দেবী বাল্যকালে এলাহাবাদে ও পরে স্কুলে পড়িবার সময় কলিকাতায় আসিয়া বেথুন স্কুল কলেজে পাঠ শেষ করেন। তিনি কিছুকাল শিক্ষাক্ষেত্রে কর্ম্মে নিযুক্ত থাকেন। বিবাহের পরে তিনি ব্রহ্ম দেশে চলিয়া যান ও কয়েক বৎসর সেই দেশে বাস করেন। তিনি অল্প বয়সে লিখিতে আরম্ভ করেন এবং কয়েকটি পুস্তক ভগ্নী শান্তা দেবীর সহিত একত্রে রচনা করেন। তিনি বি এ পরীক্ষায় ইংরেজী অনার্স লইয়া উত্তীর্ণ হ'ন ও লেখাপড়ার জন্য অনেক পুরস্কার ও পদক অর্জ্জন করেন। শান্তাদেবী ও সীতা দেবী রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে থাকিবার সুযোগ পাওয়ায় তাঁহাদের রচনার মধ্যে বিশ্ব কবির প্রেরণা ও প্রভাব প্রকৃষ্টভাবে লক্ষিত হয়। সীতা দেবীর "পুণ্যস্মৃতি"তে তিনি কবির বিষয়ে এমন বহু কথা লিখিয়াছেন যাহা অন্যত্র পাওয়া যায় না। সীতা দেবী অনেক উপন্যাস, গল্প ইত্যাদি লিখিয়াছেন; ও সেই সকল রচনার অধিকাংশই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে।

কথারূপ শিল্পকার অবনীন্দ্রনাথ
তুলিকলমের জাদুকর অবনীন্দ্রনাথ

অচিন্ত্য বসু

কাকা ভাইপোর গল্প শুনে অবাক হয়েছিলেন। সোজা হয়ে বসে ভাইপোকে বলেছিলেন, লেখনা, যেরকম বল্লে, ও রকম করে লেখ। অবাক্ হয়ে অবন তাকিয়েছিল রবিকা'র দিকে। যে রকম বলা যায়—ওরকম লেখা চলে, প্রশ্নটাও তার মুখ উগরে এসেছিল—। কিন্তু রবিকা'র দিকে তারও সন্তোষজনক উত্তর জমা ছিল। অবনের সংশয় কেটে গেল—যে রকম ভাষায় কথা বলা চলে ওই ভাষাতেই লেখা চলে—এ এক আশ্চর্য আবিষ্কার। অবন হলেন অবনীন্দ্রনাথ—পৌঁছুলেন লেখার জগতে। শুরু হল অবনীন্দ্রনাথের কলমের।

১৮৭১ সালে যার জন্ম—তার হাতে ১৮৯১ সালেই বেরোল "ক্ষীরের পুতুল"—একটি রূপকার কাহিনী—মাত্র ২৪ বছর বয়সে। ঐ একই বছরে বেরোল 'শকুন্তলা'—আরো একটি রূপক কাহিনী। ইতোপূর্বেই তার হাতে সৃষ্টি হয়েছে ১৮৯৪ থেকে ১৮৯৬ সালের মধ্যে "রাধাকৃষ্ণের চিত্রাবলী", চিত্রাবলীতে অবনীন্দ্র খুঁজতে চাইলেন সংস্কৃতিকে, সাহিত্যে মাটির গন্ধকে, দেশের মুখকে। ই বি হ্যাভেলের মতানুযায়ী তা ছিল ভারতের সত্যমানস এবং প্রাচীন শিল্প চিন্তার অনুপ্রবাহে পূর্বতন বিলাপের নব প্রকাশের ঘটনা। সেই সার্থক শিল্পী ছিলেন অবনীন্দ্রনাথ—যিনি এটি অনুধাবন করে সত্যে উপনীত হলেন।

'বালকৃষ্ণের' চিত্রের মাধুর্য্য তাই শকুন্তলা এবং ক্ষীরের পুতুলে এসে কলম ছুঁয়েছে। তাইতো এই কথাটির জন্ম: অবনীন্দ্রনাথ ছবি লেখেন, কথা আঁকেন।

'ক্ষীরের পুতুল' কাহিনীটি একটি রূপসুন্দর কাহিনী,—তাতে ফুটে উঠেছে লেখকের মনের খেলা—যে খেলা লেখক একটি জানলার কোণ থেকে আসা আলোকে নিয়ে খেলতে পারেন, (আপন কথা (১৩৫৩); যে ভাষা তার ব্যক্তিগত ঘটনাতেও ছড়িয়ে পড়ে। রাণী চন্দের লেখায় আছে—একবার কি হোল, আমার (অবনীন্দ্রনাথের) চোখের চশমার একটা কাঁচের কোনা ভেঙ্গে গেল। তাই চোখে দিয়ে থাকি, বললুম আরো ভালো শার্সি ফাক হয়ে গেছে, ওর ভিতর দিয়ে রঙ আসবে। একদিন নন্দলালকে বললুম—দেখো তো আমার এই চশমাটি চোখে দিয়ে। নন্দলাল তা চোখে দিয়ে বল্লে—এ যে রামধনুকের রঙ দেখা যায়, অনেক দিন পরিষ্কার করেন নি বুঝি, কাঁচ? আমি বললুম, না, তা নয়। ছবিতে যত রঙ দিই; সেই রঙ এই রাস্তায় লেগেছে, এই কথাটাই প্রমাণ করে—অবনীন্দ্রনাথ কল্পনার কোন স্তরে সদা বিচরণ করতেন।

'ক্ষীরের পুতুল' রচনার সময় দেখে বোঝা যায় ক্ষীরের পুতুলে প্রাথমিক অভিজ্ঞান কাজ করেছে। নর্মাল স্কুলে পড়াশুনা শেষ করে সংস্কৃতি মহাবিদ্যায়তনে প্রবেশ করেছেন অবনীন্দ্রনাথ। প্রবেশিকা পরীক্ষার পূর্বেই তাঁর পড়াশুনা সাঙ্গ হয়। প্রবেশিকা পরীক্ষা সাঙ্গ না করে তিনি সংস্কৃত কলেজের পড়া সাঙ্গ করে এলেন। সেই সময়কার তাঁর কবিতায় ব্যাপারটি ব্যক্ত করেছেন।

এসো মা হৃদয়ে বসো
হৃদির আঁধার নাশো

দয়া করো আমারে মা
আমি ক্ষুদ্র প্রাণী।

এরপরে কলম ছেড়ে (কলমের চারা-বাগানের Grass house ছেড়েই) তিনি সঙ্গীতের দিকে (সঙ্গীতের তালগাছের দিকে) নজর দিলেন। তারই ছায়ায় যতটা তালগাছের দেওয়া সম্ভব সেইখানে বসে তাল সরস্বতীর ঢোলের পিঠে আর এক-একবার তার বীণার তারেও বাঁ হাত বোলাতে শুরু করলেন। উনত্রিশ পর্যন্ত এই-ভাবে বাঁ হাতে তানসেনের তান সরস্বতীর সেবা চলছিল। ফল কিন্তু পান নি।

ছোটবেলাতেই ছিল অবনীন্দ্রনাথের ছবি আঁকার দিকে নজর। চিত্রাঙ্কন দেখে রবি বলেছিলেন - বালকের সাহস তো কম নয়। এখন হইতেই এইরূপ গুরুতর বিষয় আঁকিবার চেষ্টা। (অসিত হালদার।) সঙ্গীত চর্চা এবং চিত্রাঙ্কন শিক্ষা সমানভাবে চলতে থাকে। প্রথমদিকে ইংরেজ শিক্ষকের হাতে হাতেখড়ি পাওয়া অবনের হাতে আঁকা ছবিতে ছিল বিলেতী ঢংএর ছাপ।

১৮৯৮ সালের পৈতৃক সংগ্রহের মোগল বাদশাহী আমলের আঁকা ছবি দেখে দেশীয়চিত্রাঙ্কনে নজর দেন। —এবং আধুনিক চিত্র শিল্পীর জন্ম হয়।—যে ধারার বাহক যামিনী রায়।

উল্লেখযোগ্য ১৮৯৫ সালে 'ক্ষীরের পুতুলের' জন্ম, জন্ম শকুন্তলার—একটি রূপকাহিনী অন্যটি রূপক। সুতরাং অন্তঃসলিলা নদীর মতো ছবির ক্ষেত্রে যেটি আসব আসব করেছে তা অনেক আগেই এসে গেছে 'কথা কাহিনী'তে।

এ প্রসঙ্গে ডাঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ বসুর উক্তিটি উল্লেখ-যোগ্য :- "চিত্রগুরু অবনীন্দ্রনাথ রূপকথা শ্রেণীর গল্প কথাটির ভাষাতেও তাঁর চিত্রাঙ্কের কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। এখানে তাঁর চিত্রণ অনেকটা আলাদা হাতের। একদিকে একটি আঁকড়ি, ওদিকে আরও একটি। লতার সঙ্গে "পাতায় পাতায় ফুলের বাহার এইভাবে তিনি কথার আল্পনা এঁকে চলেছেন।"

ক্ষীরের পুতুল ও শকুন্তলা সমকালের রচনা। প্রথমটি একালের রূপকথা; দ্বিতীয়টি সেকালের। অবনীন্দ্রনাথ ছিলেন ভারতী গোষ্ঠীর দীক্ষাগুরু। যেমন ভারতী গোষ্ঠীর চৈত্তগুরু ছিলেন রবীন্দ্রনাথ (সুকুমার সেন)।

ভারতীর অনেক শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির মধ্যে অন্যতম অবনীন্দ্রনাথ। ভারতী গোষ্ঠীর প্রচারে লেখার ক্ষেত্রে এলো শিল্পানুরাগ, ফারসী, আধুনিকতা। এই তিনটি মূলসূত্র অবনীন্দ্রনাথের দান।

'ক্ষীরের পুতুল' এবং 'শকুন্তলা'র চোদ্দ বৎসরের ব্যবধানে লেখা বাংলার ব্রত (১৯০৯) এবং একই সময়ে রচনা 'রাজকাহিনী' রচনার পটভূমি রাজপুত মোগল চিত্রাবলীর অনুশীলন। 'ক্ষীরের পুতুলে' আমরা পাই রোমান্টিক উচ্ছলতা, আবেগ বাহুল্য এবং ঘটনার গঙ্গা ধারার প্রবাহ। মিষ্টি এবং টক, তেতো ও সরস সব রকম পথ পার হয়ে 'ক্ষীরের পুতুল' পৌঁছে গেছে জীবনে। ভাষায় তার রূপকথা; কথায় যেন ছড়ির টান, ভাষায় লেখকের শিল্পানুরাগ লক্ষ্য করা যায়। তাই লেখা মূলতঃ চিত্রধর্মী। আকাশের মত মত নীল, বাতাসের মত ফুরফুরে, জলের মত চিকন শাড়ী। কিংবা ঘরের দেওয়াল মাণিক, ঘাটের থাম মাণিক, পথের কাঁকর মাণিক।"

> লেখকের গভীর ঔপন্যাসিক দৃষ্টি প্রমাণ করে সোনার আয়নার সামনে রেখে, সোনার কাঁকুইয়ে চুল চিরে, সোনার কাঁটা, সোনার দড়ি দিয়ে খোঁপা বেঁধে, সোনার সিঁদুর নিয়ে ভুরুর মাঝে টিপ পরছেন, কাজলতায় কাজল পেড়ে চোখের পাতায় কাজল পরেছেন "... ......" ইত্যাদি অসংখ্য উদাহরণ।

ডাঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ বসুর মতে 'ক্ষীরের পুতুলে'র কাহিনী লোক-সাহিত্যের। অথচ এই লোক সাহিত্যের কাহিনীতে সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তোলা লেখকের গুণ।

দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের কাহিনীতে রূপ-

কথা, রূপকথাতেই তার মূল্য খুঁজে পেয়েছেন। কিন্তু অবনীন্দ্রনাথের হাতে রূপকথা ঘরের কথা হয়ে উঠেছে। উল্লেখযোগ্য 'শকুন্তলা' কালিদাসের অমর কাহিনীর ফল। সেই কাহিনীর ভিত্তিভূমিতে দাঁড়িয়ে লেখক মিষ্টি কাহিনীর জন্ম দিয়েছেন।

'শকুন্তলা' একটি পৌরাণিক কাহিনীর রূপকথা। রূপকথার রাজ্যে যেমন সকলের সব কিছুর অধিকার আছে, মানুষের অধিকার ও ক্ষমতার যেমন সীমা আছে—প্রকৃতির তেমনি অকৃপণ আত্মপ্রকাশের অজস্র সুযোগ আছে। শকুন্তলা পড়ে মনে পড়ে না কালিদাসের শকুন্তলার কথা, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের শকুন্তলার কথাও—মনে হয় ছোটদের জন্য ছোটদের মতো করে বলা একটি গল্পের কথা। কাহিনীর শুরু মালিনী নদীর বর্ণনায়—তারপর কণ্বমুনির আশ্রম—তারপর শকুন্তলার কাহিনী। "খুব ভোরবেলায় তপোবনে যতো ঋষি-কুমার বনে বনে যতো ফলফুল কুড়োতে গিয়েছিল। ....তারপর ফুলের বনে পুজোর ফুল তুলতে তুলতে পাখীদের মাঝে ফুলের মতো সুন্দর শকুন্তলা মেয়েকে কুড়িয়ে পেলে।" সমগ্র কাহিনীর বিস্তার পর পর কয়েকটি কাহিনীর মধ্যে। কাহিনী কয়েকটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত: শকুন্তলা, দুষ্মন্ত, তপোবনে, রাজপুরে। রাজপুরেতে কাহিনী সমাপ্ত। লেখা দুইটিতেই রূপকথার রাজপুত্রের জয় দেখান হয়েছে। এখানে পংখীরাজ না এলেও শকুন্তলার দুঃখের অবসান ঘটিয়েছে তার পুত্র। অন্তঃসলিলা ধারা কিন্তু লেখক অবনীন্দ্রনাথকে নিয়ে গেছেন বাংলার ব্রত (১৯০৯) রচনায়। মেয়েলি ব্রত কথার অনুশীলনে, ষষ্ঠী ঠাকরুণের (ক্ষীরের পুতুল) কাহিনী থেকে আলপনার, ব্রতকথার অন্দর মহলে।

এদিকে মোগল চিত্রকলার অনুশীলনে লেখক কথার রাজ্যেও গিয়ে পৌছলেন রাজপুত কাহিনীতে।— "রাজকাহিনীর রাজ্যে" (১৯০৯) অনিবার্য্য টানে গল্পরসিক অবনীন্দ্রনাথ পৌছেছিলেন রাজপুত-ইতিহাস কাহিনীর রাজ্যে, "রাজ কাহিনী সেই নোতুন দিগন্ত আবিষ্কারের ফল" (উজ্জ্বল মজুমদার)।

কর্ণেল টডের রাজস্থানের ইতিবৃত্ত বরদাকান্ত মিত্র অনুবাদ করেন। এবং অঘোরনাথ বরাট এই কাহিনী "রাজদান" নাম দিয়ে প্রকাশ করেন। সে যুগে ভারতের পরাধীনতার যুগে রাজপুতনার কাহিনী ছিল অত্যন্ত জনপ্রিয়। রাজপুতদের বীরত্ব, তাদের চারিত্রিক দৃঢ়তা গুণ দোষ সব কিছুই সে যুগে ছিল মানুষের কাছে আদরণীয়। এই সব কাহিনী থেকে অবনীন্দ্রনাথ রাণা কুম্ভ, বীর হাম্বীর, চণ্ড, পদ্মিনী, শিলাদিত্য, বাপ্যাদিত্য গল্প কাহিনী, সেই কাহিনীতে এলো প্রেম, এলো ভালবাসা—ভীল সর্দার, রাগ, ক্ষোভ, বেদনা এবং সর্বোপরি বীরত্ব।

অবনীন্দ্রনাথ যেন লেখার আঁচড়ে অয়েল পেন্টিংস সৃষ্টি করেছেন।—মোগল রাজপুত যুগের, তাতে সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলো পর্যন্ত বাদ পড়ে নি।

লেখক অবনীন্দ্রনাথের হাতে মোগল পেন্টিংস হয়ে উঠেছে নোতুনতর নোতুনতম কাহিনী যেন—যা অভূত-পূর্ব এবং তুলনারহিত। প্রত্যেকটি চরিত্র যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে। বাস্তব জীবনের নানা ঘাতপ্রতিঘাত তার কথক ভঙ্গীতে লিখেছেন একটা সুন্দর কাহিনী বর্ণনার মধ্য দিয়ে। সুকুমার সেনের মতানুযায়ী, অবনীন্দ্রনাথের সমস্ত সাহিত্যিক রচনার মতো এগুলিও শিশুপাঠ্যের ভঙ্গীতে লেখা এবং এগুলির রস গ্রহণও পাঠকের বয়সের ওপর নির্ভরশীল নয়।

রাজপুত কাহিনীর মায়াপটের দৃশ্য দেখাতে দেখাতে অবনীন্দ্রনাথ পৌছলেন রোমান্টিক কল্পনার রাজ্যে, পৌছলেন গল্পকার। তার লেখায় রেখা এবং রেখায় লেখা ফুটিয়ে তুললেন তিনি। অবনীন্দ্রনাথ ১৩১৮ সালে গিয়েছিলেন কোনারক—পুরী থেকে। ১৩২২

সালে তিনি প্রকাশ করলেন 'ভূত পত্রীর দেশ'। যাত্রা-স্মৃতি রঙীন হয়ে ফুটে উঠলো। সম্ভব-অসম্ভব, স্বপ্ন জাগরণের বর্তমান অতীতের বাস্তব কল্পনার অদ্ভুত কৌতুক রসের 'ভূত পত্রীর দেশ' তাই লেখকের হাতে অপূর্ব। 'ভূতপত্রীর দেশ' রচনার মূলসূত্র ত্রৈলোক্যনাথের রচনায়। ত্রৈলোক্যনাথ বাংলা ভাষায় ব্যঙ্গ রচনার ধারা প্রবর্তক। ত্রৈলোক্যনাথের স্যাটায়ার-ধর্মী রচনায় মুখোপাধ্যায় মহাশয় 'লে লু ল্লু' বলার সঙ্গে সঙ্গে আমীরের মন্ত্রীকে ভূতে নিয়ে যাওয়া থেকে আরম্ভ করে বিচিত্র ভঙ্গীতে যে পদ্ধতিটি অবলম্বন করেছেন সেই উদ্ভট ও স্যাটায়ার রূপকে লেখক অবনীন্দ্রনাথ উদ্ভট ও অলৌকিক রসে পরিণত করেছেন।

"চলে চলে হুমকী তালে পংখি গালে
মাসীপিসী বন বেরালে
ভূঁত পেরেতে চলছে রাতে হনহনিয়ে ভূঁত পেরেতে।
ছুঁচো ইঁদুর খ্যাকশেয়াল শুকনোপোত গাছের ডাল
সব ভুতুড়ে সব ভুতুড়ে ঘূর্ণি হাওয়া চলছে দূরে।"

গল্পকার অবনীন্দ্রনাথ যেন গল্প নিয়ে খেলা করেছেন এখানে। তার অবাস্তবতায় এবং ভাবকল্পনায় প্রবেশ ঘটেছে, এখানে লেখক অবনীন্দ্রনাথের রূপটি গল্পদাদুর। অবন ঠাকুর হালকা ভাষার মাধ্যমে আনলেন টুকরো কথার জাল। তার শিল্পে মজার মজার ছবির মত সম্ভব অসম্ভবের সত্যনিষ্ঠার বিচিত্র মায়াপট। নৈশযাত্রার সূত্রাবলম্বনে সৃষ্টি হলো অদ্ভুত রসের কাহিনী ভূতপত্রীর দেশ (১৩২২)। কাহিনীর নায়ক লেখক মাসি-পিসি দুজনেরই নিমন্ত্রন পেয়েছেন। যাত্রা করলেন তেপান্তরের মাঠের ওপারে সমুদ্রের ধারে, বালির ধরে, যাবার সময় "মাসি...... এক লণ্ঠন দিয়েছে আলোয় আলোয় যেতে।"

'ভূতপত্রীর দেশ' কাহিনীটি ধীরে ধরে আলোকিক কল্পনায়, অসম্ভব এগিয়ে গেছে বুড়ো মনসা গাছে। 'মাথায় তার হলদে চুল, বড় বড় কাঁটার বড়শী ফেলে বালির ওপর মাছ ধরছিল। মনসাবুড়োর ছিপে মাছ তো পড়ছিল কতো! মনসা গাছ মাছ ধরতে ধরতে চমকে উঠলে। ভূতপত্রীর লাঠির খোঁচা খেয়ে।"

পাল্কীতে চেপে নায়কের সন্দেহ হোল এরা মানুষ নয় ভূত। রায় চণ্ডীতলা একলা ছেড়ে নায়ক সমুদ্র তীরে পৌঁছলেন। সেখানে নায়ক পেলেন কামুন্দে, বামুন্দে, বালুন্দে, হারুন্দে প্রভৃতি বেয়ারাকে। হারুন্দে থেকে লেখক পৌঁছলেন হারুন্-অল্-রশীদএ। তারপর আরব্য উপন্যাসের শেষ ধরে লেখক এগোলেন।—সেখান থেকে লেখক এলেন সিন্দবাদের কাছে। আকবরে, ফের আওরঙ্গজেবে—সেখান থেকে পুরী। এইভাবে লেখক কলকাতায় ফেরত এলেন। এক কথায় 'ভূতপত্রীর দেশ' নানা অদ্ভুত ঘটনা পরম্পরার একখানি অবনীন্দ্রনাথের মালা—যা পরিয়ে দেওয়া হয়েছে পাঠকের গলায়।

'ভূতপত্রীর দেশ' বাংলা সাহিত্যে নির্মল হিউমারের প্রসার করতো এর সূচনা কঙ্কাবতীতে। ত্রৈলোক্যনাথ তাঁর কঙ্কাবতীতে লিখেছেন: (নারায়ণ-বাবুর মতে দেশীয় সাহেবদের উদ্দেশেই ত্রৈলোক্যনাথের সমালোচনা।)

কঙ্কাবতী জিজ্ঞাসা করলেন "ব্যাঙ মহাশয়, গ্রাম কোন্‌দিকে? কোন্ দিক দিয়া যাইলে লোকালয়ে পৌঁছিব?" ব্যাঙ উত্তর করিলেন—"হিট-মিট-ফ্যাট।"

কঙ্কাবতী বলিলেন—"ব্যাঙ মহাশয়। আপনি কি বলিলেন তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না। ভালো করিয়া বলুন। আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি কোন্ দিক দিয়া যাইলে গ্রামে উপস্থিত হইতে পারা যায়?"

ব্যাঙ বলিলেন—"হিশ-ফিশ-ড্যাম।"

কিন্তু অবনীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে ঘটনাটি অন্য রকম। সেখানে সুবুদ্ধি তাঁতির ছেলে কুবুদ্ধি ব্যাঙ মেরেছে। রামসিং দোবে কনেস্টবল এসে তার হাতে দড়ি দিল। ফলে রামসিংয়ের এই হলো:—

ব্যাঙের দৃষ্টিতে তাঁর মুখ পুড়ে গেল,—মুখে আর

কিছু রোচে না। নিম লাগে মিষ্টি, সন্দেশ লাগে তেতো, মুড়কি লাগে ঝাল। সে কেবল ঘুস খেয়ে খেয়ে ধমক্ খেয়ে খেয়ে ব্যাঙের গালাগালি খেয়ে খেয়ে বেড়াতে লাগলো।"

> পরিষ্কার বোঝা যায় দ্বিতীয় উদাহরণটি নির্মল হাস্য-রসের— সেখানে কোন স্যাটায়ার প্রভাবিত করে নি। কেবল ভাষার মারপ্যাচে লেখক দোলায় দুলিয়েছেন আমাদের।—"চার ভূতের চার সুরে চিঁচিঁ পিঁপিঁ মিট্‌মিট্ টিকটিক করে গান গাইতে গাইতে চলেছে,—ঠিক যেন কত দূরে চিল ডাকছে, আর কোলাব্যাঙ কট্‌কট্ করছে।" ত্রৈলোক্যনাথের বিশিষ্ট ওরিয়েন্টাল মনোভঙ্গী—সম্ভব অসম্ভবের কাহিনী প্রভাব ফেলেছে পদ্ধতিগতভাবে।

অবনীন্দ্রনাথ এ রকমই নানা অসম্ভব অবাস্তব ঘটনার দ্বারা সংঘটিত—প্রভাবের অনুবর্তী।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের মতে 'শিল্পী ত্রৈলোক্যনাথের একটি চোখে আলাদীনের প্রদীপের মায়া কজ্জল আর একটি চোখে সমাজ বীক্ষা।' কিন্তু বর্তমান লেখকের মতে অবনীন্দ্রনাথের লেখনীতে আলাউদ্দিনের মায়া কজ্জলই অবনীন্দ্রনাথের দুটী চোখে মাখানো।

ভূতপত্‌রীর দেশ কাহিনীতে ওয়ালটার-ডি-লা-মেয়ার অথবা শ্রীমতি শেলীর ফ্রাঙ্কেনষ্টাইন নেই, আছে লুই ক্যারোলের রসিকতা।—ভূতের সঙ্গে নৈশ ভোজনের মতো এখানেও দেখি পাল্কী বইতে আসছে কয়েকটি মানুষের বদলে কয়েকটি ভূত। নায়কের সাহায্যে লেখক সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর-কলি চার যুগেরই জয়, ভারতের বাইরেও নানা বিচিত্র কাহিনীর বিচিত্রতর প্রকাশে তৎপর হয়েছেন। 'ভূতপত্‌রীর দেশ' এর পরে লেখা হলো 'খাতাঞ্চির খাতা' (১৩২৩)। শিশু মানসিকতার লেখা হলেও এখানে ব্যক্তিজীবন বাল্য স্মৃতি প্রতিফলিত।

কাহিনীটি প্রসিদ্ধ সমালোচক শ্রীসুকুমার সেন মহাশয়ের মতে শিশু মানসিকতার উপন্যাস। প্রতি দিনের ঘরসংসারের তুচ্ছাতিতুচ্ছ, জীবনের গতানুগতিকতার, অনুদারতার, শ্রেণী-চেতনার, কৃপণতা-কঠিনতার কাহিনী 'খাতাঞ্চির খাতা।' উল্লেখযোগ্য হল :

> অমনি মনটা ছ্যাঁৎ করে উঠল,—একটু ভেবে খাতাঞ্চির খরচের খাতায় জের টানলেন,—সোনাতনের হাওলাতি বাবদ তার গত বৎসরের মাহিনা দেওয়া যায় আধ পয়সা; মনের চিরশিশুকে আবার এই খাতাঞ্চির খাতায় লেখকের মানব বিরত করা হয়েছে। খাতাঞ্চির খাতায় তাই সবুজ পাতার কাহিনী এসেছে—এসেছে তার ছবি।

"সকলের মনের একটা কোণে লুকানো দেরাজ"—আছে তাতে তাদের মনের সবুজ খাতা লুকানো;—অনেকে তার সন্ধান পায়—অনেকে পায় না। লেখক তাঁর আবেগের কল্পনায় অনেকটা এগিয়েছেন—"আলোটি ঘরের মধ্যে এসে ঝুম ঝুম করে ঘুঙুর বাজিয়ে খেলাঘরের কোনটিতে গিয়ে বসলো।" এই-ভাবে রবীন্দ্রনাথের মতোন নবীন ঘাসে চোখ ডুবিয়ে বিভূতিভূষণের মতো পাহাড়ের ময়ূর নাচা, ঝর্ণার জল বয়ে যাওয়া, ধানের শিষের শিশির বিন্দুর খবর দিয়েছেন—অবনীন্দ্রনাথ। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা মতো অবনীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বলা চলে" চোখে কল্পনা সব সময়েই মোহ-অঞ্জন মাখিয়ে দিয়ে রেখেছে।"

"আবার এই ধরণের রূপকথার রূপকধর্মিতা রবীন্দ্রনাথের তত্ত্ব নাট্যের কথা মনে পড়ায়। কর্তা (খাতাঞ্চি), গিন্নী, এক মেয়ে (সোনা), দুই জমজ ছেলে (আঙুটি পাঙুটি), ভৃত্য (সোনাতন), তার বিড়াল বৌ, কুকুর (রহিম) ও এক শিশু (পুতু)—পুতুর জগৎ সংসার নিঙড়ানো রসের শিশুচিত্তের স্বপ্ন জাগরণের ভাবকল্পনার প্রতীক।

টানা গদ্যের মতো ছাপা গদ্যে লেখা কাব্য গল্প

আলোর ফুলকি (১৯৪৭); ভারতীতে ১৩২৩ সালে প্রকাশিত হয়। কাব্য গল্পটির আরম্ভ :

দুপুর রাত, নিশুতি রাত,
কেস্টপক্ষের কষ্টিপাথর কালো আকাশের কালো রাত
বর্ষাকালের কাজল মাখা পিছল রাত
নিখুঁত রাত।
কালোর পরে একটি নিখুঁত তারার টিপ
ভয়ঙ্করী নিশীথিনী বিরূপ ঘোর ছায়ার মায়া, থাকুন, তিনি রাখুন।

যন্ত্রাদের গল্পের রূপ, পঞ্চতন্ত্রের মত পাত্রপাত্রী, মোরগ, মুরগি, চড়ুই, টিয়া, পেঁচা মানুষের ভূমিকা নিয়েছে পশুপক্ষীর বেশে। নায়ক কুঁকড়ো এবং নায়িকা সোনালিয়ার কাহিনীতে সৌন্দর্য্য দর্শনের রূপ। বুদ্ধদেব বসু মশায়ের আধুনিক বাংলা কবিতায় কুঁকড়ো উদ্ধৃত হয়েছে প্রথম সংস্করণ থেকেই।

পরিষ্কার বোঝা যায় বাংলা সাহিত্যের একটি অত্যন্ত বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা। এই কাহিনীটি যেন কবি চিত্রকরের নিটোল কাব্য গল্প; রঙে রসে ভাবে তা অতুলনীয়। তাই অবনীন্দ্রনাথ কথা-রূপ শিল্পকার তুলি-কলমের জাদুকর।

এখানে উল্লেখযোগ্য—ত্রৈলোক্যনাথের কঙ্কাবতীর সঙ্গে এখানে বেশ সহজ মিল পাওয়া যায়।

ব্যাঙ মহাশয় "ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বলিলেন,—মোলো মা! এ হতভাগা ছুঁড়ির রকম দেখ? কেবল বলিবে ব্যাঙ! ব্যাঙ! ব্যাঙ! কেন আমার নাম ধরিয়া ডাকিতে মুখে ব্যাথা হয় নাকি? আমার নাম মিষ্টার গমিশ।" (কঙ্কাবতী)

'আলোর ফুলকি'তে অবনীন্দ্রনাথ তেমনি ব্যাঙের সাজ পরিয়া ব্যঙ্গ করেছেন চিন্তাবিদ ইন্টেলেকচুয়াল দের—

ঘাসের মধ্যে থেকে ব্যাঙ আওয়াজ দিলে—"কর্তা ঘরে আছেন? কর্তা"।

সোনালী "ওমা গো ব্যাঙ"। বলে একলাফে একটা গাছের কোটরে গিয়ে লুকালো। দু'দুটো কোলাব্যাঙ এসে উপস্থিত। তার মধ্যে বড়ো ব্যাঙ এসে হাত নেড়ে কুঁকড়োকে বল্লে, বনে চিন্তাশীল যারা, তাদের হয়ে আমরা এসেচি ধন্যবাদ জানাতে: গানের ওস্তাদ আপনাকে ওর নাম কী অনেক গানের আবিষ্কর্তাকে।" (আলোর ফুলকি)

এই ধরণের অনেক উদাহরণ উপস্থিত করা যায়।

সুতরাং এখানে ব্যঙ্গহীন নিছক হিউমার হয়েছে মোটেই বলা চলে না সেদিক থেকে লেখাটির কাব্যের বক্তব্যের এবং প্রকাশভঙ্গীর নূতনত্ব বর্তমান।

> সুইডেনের লেখিকা সেলমা লাগেরলফের একটি বই থেকে লেখক রচনার প্রেরণা পেয়েছিলেন, "বুড়ো আংলা'র (১৩৪১)। Tom Thumb-এর মত এটিও বুড়ো আঙ্গুলের আকার প্রাপ্ত একটি বালকের কাহিনী। ভূগোল অবলম্বনের উত্তর এবং উত্তরপূর্ব অঞ্চলের নাম ধরে কাহিনী এগিয়েছে। আব প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। 'বুড়ো আংলা' নানা ধরণের পশুপক্ষী ও মানবজীবনের নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়কে কেন্দ্র করে এ্যালিস ইন ওয়াণ্ডার ল্যাণ্ড, সুইস ফ্যামিলি রবিনসন প্রভৃতির মত, এমন কি সুকুমার রায়ের 'হ-য-ব-র-ল' ধরণের কাহিনীর মত একটি নোতুন ভাবের নোতুন দিকের কাহিনী বর্ণনা করেছেন টম থাম্বের ধরণটী মাত্র নিয়ে।

অবনীন্দ্রনাথ এর পরে অসুস্থ হয়ে পড়েন। অসুস্থ হয়ে পড়ার দরুণ তিনি স্বাস্থ্যের অনুরোধে স্টীমারে বেড়াতেন। বড়বাজার থেকে বরানগরের কুঠিঘাট বা কালিঘাট পর্যন্ত। এই সময় 'পথে বিপথে' (১৯০৯) বক্তা ও কথোপকথনে বিবর্ণ প্রতিদিনের মাটিতে শুরু হয়েছে লেখকের স্বপ্নাভিসার। বক্তা ও...মধ্যে বক্তারই বিক্ষিপ্ত দ্বিতীয় রূপ। অবশ্য এটিকে যথাযথ গল্পের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা যায় না।

বিভূতিভূষণ যেমন প্রকৃতি-চেতনা থেকে অতীন্দ্রিয়

তার উত্তরণ করেছেন, হালকা ভূতপত্রীর কাহিনী থেকে লেখক ভুতুড়ে ও অলৌকিক, অতীন্দ্রিয় কাহিনীতে প্রবেশ করেছেন "মোহিনী"তে।

এম. আর. জেম্‌সের কাহিনী এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। ভৌতিক কাহিনী হিসেবে মোহিনী উল্লেখযোগ্য।

আবার 'গুরুজী'তে আধুনিক ছোট গল্পের সঙ্গে আরব্য উপন্যাস মিশে গেছে। উপমা উৎপ্রেক্ষা প্রভৃতি অলঙ্কারের চিত্র সমষ্টি এই রচনাগুলির ভাষায় মাধুর্য্য এনেছে। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের লিপিকা স্মরণীয়। এই প্রসঙ্গে অবনীন্দ্রনাথের পরবর্তী জীবনের 'কাটুম কুটুম' পদ্ধতির হালকা হাসির মানসিকতার উৎস পাওয়া যায়। 'আলোর ফুল্‌কি' 'বুড়ো আংলা', খাতাঞ্চির খাতা', 'ভূতপত্‌রীর দেশ' গল্পগুলির লেখার মানসিকতা কাটুমকুটুম পদ্ধতির আদি সূচনা বলা চলে।

> "মাতু" গল্পে একটি নিটোল গীতি কবিতার রূপ। বাস্তব ও কল্পনা, চিত্রে ও চরিত্রে এক হয়ে গেছে। মাতু গল্পের একটি উদাহরণ উল্লেখ করে বলা চলে উপমার মাধুর্য্য অনুপম : "মাতু জাহাজের পাশ দিয়েই আমাদের জাহাজ বেরিয়ে গেলো; দেখলেম মীর সাহেবের জাহাজের তিনটি চোঙা দিয়ে পাখীর বুকের পালকের মত হাল্কা সাদা ধোঁয়া আকাশে উঠেছে।" (মাতু)।—

'অরোরা', 'পর-ঈ-তাউস' কাহিনীগুলির মধ্যে কলমের বেগ গড়িয়ে চলেছে।

অবনীন্দ্রনাথের কাহিনী বর্ণনার দক্ষতা চিরদিনের। যে সময় তিনি বাংলার ব্রত রচনা করেছেন, রাজকাহিনীর জাল বুনছেন, একই সময়ে ভারতীতে তার কোটরা (আশ্বিন ১৩২৬) এবং আলো আঁধারে (কার্তিক ১৩২৬) বাস্তব ও আধুনিক কাহিনী প্রকাশিত হচ্ছে।

শ্রমজীবীর কাহিনী এই "কোটরা"। 'কোটরা' গল্পে 'মাচারু' মাঝি নৌকা 'কোটরা'। কোটরায় নিয়ে তুলো মাচারুর কুড়িয়ে পাওয়া ছেলে 'নোটো'কে।

লেখকের ভাষায় বলি "একেই আরক খেয়েছে, তার ওপর দাঁও মাফিক সওদা শেষ করে আর এই ছেলেটাকে পুলিশের হাত থেকে বাঁচিয়ে মাচারু একেবারে বেপরোয়া।"

অবনীন্দ্রনাথের কাছে অত্যন্ত ছোট গল্পের তীক্ষ্ণ-ব্যঙ্গ-শ্লেষ আশা করা অন্যায়। অবনীন্দ্রনাথ শিল্পী। শিল্পী হিসাবে তাঁর লেখাগুলো অধিকাংশই ছবি আঁকা হয়েছে। তাই 'কোটরা' বা 'আলো আঁধারি' আধুনিক জীবনের পাকা গল্প হয়েছে। না বলে বলা যায় গল্পচিত্র হয়েছে।

১৯৫১ সালে অবনীন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয় ১৯৫৭ সালে 'রংবেরং—এটি কতকগুলি বিচিত্র লেখার সমষ্টি। তার মধ্যে উপকথা অনুযায়ী (কান কাটা রাজার দেশ), আরব্য কাহিনী অবলম্বনে (সিন্ধবাদ বিবরণ পত্র) প্রভৃতি থেকে শুরু করে নানা বিচিত্র বিষয়ে পরিপূর্ণ। সবশুদ্ধ ১৮টি কাহিনীর সমষ্টি।

> 'সিন্ধবাদ বিবরণ পত্র' নাট্য ধর্মী রচনা; উল্লেখযোগ্য :
> আজ মটকাতে পড়ে শকুন
> ঠোঁটে বেছে খেলে উকুন

'সিকস্তি পয়স্তি কথা' কাব্য ও গল্পে বিচিত্রিত রচনা, এখানে খাতাঞ্চি মহাশয়ের উল্লেখ আছে, "জেন্তু সভা বা জন্তু জাতীয় মহাসমিতি" কাহিনীতে নানা বিচিত্র পদ্ধতিতে রূপক ধর্মী রচনা সৃষ্টি হয়েছে।

> বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। সেখানেও জন্তু আছে। তবে কন্তটা পৃথক।

এই ধরণের রচনা রূপক হতে বাধ্য।

এই সময়ের গল্পে অবনীন্দ্রনাথের কবিতার ছন্দোবৈচিত্র্য ও কাব্যধর্মিতা লক্ষনীয়। মূলতঃ অবনীন্দ্রনাথ কবি। কাব্যধর্মি তার মজ্জাগত। সেখানে বিষয় বৈচিত্র্য থাকে। কিন্তু বিষয়ানুগতভাব সর্বদা লক্ষণীয়

নয়। তাই অবনীন্দ্রনাথের হাতে ক্লাসিক পদ্ধতির প্রয়াস খুব বেশী লক্ষণীয় প্রথম দিকে। পরবর্ত্তী জীবনের হালকা ধরণ ধারণের ব্যবহার অবনীন্দ্রনাথের মূল লক্ষ্য।

'তুলি কলম' নিয়ে কাটুম কুটুম পদ্ধতিতে তিনি কাজ করেছেন তাঁর লেখা রেখার মতো ছড়িয়ে পড়েছে। ভাষা-শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ গানের ভাষায় কান তৈরী করিয়েছেন তাই তাঁর লেখায় সেই গান সঙ্গীতের মূর্ছনায় আবির্ভূত।

১৯৩৮-৪২ সালে অবনীন্দ্রনাথ 'কাটুম কুটুম' রচনায় হাত লাগান। পূর্বের ভাব যা হালকা খেলায় প্রকাশ করা যায় নি, তা লেখায় রেখায় আত্মপ্রকাশ করেছিল।

অবনীন্দ্রনাথ যদি শিল্পাচার্য না হয়ে কেবল লেখার জীবনেই নিজেকে উৎসর্গ করতেন—তবে হয়ত হালকা চালের জলকি তালের লেখায় অমর হয়ে থাকতেন তিনি। এক কথায় বলা চলে "অবনীন্দ্রনাথের শব্দের সঙ্গে রূপকে জড়িয়ে নিয়ে বাক্য যদি হোলো উচ্চারিত, ছবি তাঁর ছবি হোলো রূপের রেখায় রঙের সঙ্গে কথাকে জড়িয়ে নিয়ে রূপকথা।"

—তাই কবি অবনীন্দ্রনাথ এ জন্য স্মরণীয়। অবনীন্দ্রনাথ মূলতঃ কবি এবং কবি হিসাবে তার কাব্য-ধর্ম তাই উল্লেখযোগ্যভাবে স্মরণীয়।

অগস্ত্যযাত্রা

কালীচরণ ঘোষ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইংরেজকে অতি মাত্রায় বিব্রত হয়ে পড়তে হয়েছে। ভারতের বিপ্লবীরা সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে চেষ্টা করেছে। তার মধ্যে সর্ব্বপ্রধান ভারত-জার্মান ষড়যন্ত্র যার ফলে জার্মানী থেকে প্রচুর অস্ত্র ও আর্থিক সাহায্য পাবার কথা। এ চেষ্টা সফল হয়নি, কিন্তু সেটা অন্য কথা।

বাঙ্গলায় আক্রমণাত্মক বিপ্লবী কার্য্যকলাপ খুবই বেড়ে যায়। রডার বন্দুক চুরি অতি সুনিপুণ ভাবে সম্পন্ন হয়েছে। কয়েকটা ডাকাতি ও পুলিশ কর্ম্মচারী হত্যা সুচারুরূপে সংঘটিত হয়েছে। বিশেষ করে ১৯১৫ সালে কলকাতার বুকের ওপর কয়েকটা বড় ডাকাতি, যথা, ১৯১৫ ফেব্রুয়ারী ১২ই গার্ডেন রীচ ডাকাতি, ফেব্রুয়ারী ২২-এ বেলিয়াঘাটা ডাকাতি, অবশ্য কিছু পরে ডিসেম্বর ২রা কর্পোরেশন ষ্ট্রিট ডাকাতি সুসম্পন্ন হয়েছে। এতে সর্ব্ব সমেত প্রায় ৬০,০০০ হাজার টাকা বিপ্লবীদের হাতে এসে গিয়েছে।

পুলিশ স্থির করলে এর পিছনে বিপ্লবী-শ্রেষ্ঠ যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও তাঁর অদ্ভুতকর্ম্মা কয়েকটি চেলা রয়েছেন। তাঁকে ও তাঁর সঙ্গী সহচরদের ধরবার জন্য পুলিশরা কলকাতা তোলপাড় করে ফেললে। যখন কোথাও সন্ধান পাওয়া গেল না, তখন পুলিশ মহলে স্থির হয় যে, তিনি কলকাতার বাইরে গেছেন, হয়ত বা মারা গেছেন।

অপ্রত্যাশিত এক ঘটনায় যতীন ও তাঁর সঙ্গীদের সন্ধান মিলে গেল। ১৯১৫ ফেব্রুয়ারী ২৪এ নীরদ হালদার নামে এক ব্যক্তি ৭৭ নং পাথুরিয়াঘাটা ষ্ট্রীট বাড়িতে উপস্থিত। হঠাৎ যতীনকে চিনে ফেলায় সঙ্গে সঙ্গে চিত্তপ্রিয়র রিভলভারের গুলিতে আহত হয়ে নীরদ

পড়ে যায়। মনে হয়েছিল যে তার মৃত্যু ঘটেছে। প্রকৃত পক্ষে মেয়ো হাসপাতালে নীরদ ২৬এ পর্য্যন্ত বেঁচে ছিল এবং খবর দেয় যে সে নিজ চক্ষে যতীনকে দেখেছে, এতে তার কোনও সন্দেহ নেই।

যতীন ও দলবল তখনই সে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়লেন। আজ আর অজানা নেই কয়েকদিনের মধ্যে কলকাতা ছেড়ে বালেশ্বর কপ্তিপদার উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যান। খাস কলকাতা ছাড়ার অব্যবহিত পরের ঘটনা ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় তাঁর "বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি" (পৃঃ ৪২১)-তে লিখেছেন, 'দেশকর্ম্মী মাখন সেনের সাহায্যে তাঁকে বাগনানের হেডমাষ্টার অতুলচন্দ্র সেনের কাছে পাঠানো হয়।...পরে তাঁরা মেদিনীপুর তমলুক সহরে যান।...দাদাকে বালেশ্বর নিয়ে যাবার জন্য হাওড়া ষ্টেশন থেকে ফণী চক্রবর্ত্তী, ভূপতি মজুমদার ও আর একজন তিন খানা সাইকেল ও পাঁচ খানা টিকিট নিয়ে ওঠেন। পাঁশকুড়া ষ্টেশনে দাদা ও নরেন ভট্টাচার্য্য এসে যোগ দেন। ভূপতি মজুমদার বালেশ্বর ষ্টেশন থেকে ফেরেন। বাকিরা বালেশ্বর থাকেন।" (শ্রীনলিনীকান্ত কর বলেন, চিত্তপ্রিয় দাদার সঙ্গেই যান।'

নলিনীকান্তবাবু তাঁর বন্ধু দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরীর পরিচয়ে মনীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তীর সাহায্যে কপ্তিপদায় আশ্রয় ঠিক করেন। তিনি সেখানে আগে থেকেই গোপাল নামে বাস করছিলেন এবং তিনি যে জমি ইজারা নেন সেটা "গোপাল ডিহা" নামে পরিচিত।

পাথুরেঘাটা থেকে বেরিয়ে বাগনান পর্য্যন্ত পৌঁছনোর আগের অবস্থান খানিকটা অস্পষ্ট রয়ে গেছে। "দাদা"র অন্তরঙ্গ অনুচর ও সহকর্মী শ্রীযোগেন্দ্রনাথ দে সরকার (৬১৬ শীলস্ গার্ডেন লেন, কলিকাতা—২) তাঁর অপ্রকাশিত জীবন স্মৃতিতে এর সম্পূর্ণ পরিচয় দিয়েছেন (ইংরেজির তর্জ্জমা): "দাদা, মনোরঞ্জন, চিত্তপ্রিয় ও নরেন্দ্র ভট্টাচার্য্য পাথুরেঘাটা থেকে বেরিয়ে প্রথমে হর্ত্তুকীবাগান ষ্ট্রীটে এক বাড়ীতে যান এবং সেখান থেকেই আমার (যোগেন্দ্রনাথ সরকারের) ইউনির্ভাসিটি কলেজ হোষ্টেল, ৩ নং শম্ভু চ্যাটার্জ্জি ষ্ট্রীট, বাসায় আসেন। (এ নম্বরটি অনেকবার ভুল প্রকাশিত হয়েছে)। বিপিন গাঙ্গুলী দলটিকে নিয়ে উপস্থিত হলেন ২৫ এ ফেব্রুয়ারী রাত্রে।

"দাদা ঘরে ঢুকেই হাস্তে হাস্তে বললেন, 'বিরাট রাজসভায় পঞ্চ পাণ্ডবের প্রবেশ'। আমার ঘরটি মেসের চারতলায় অবস্থিত। মেসে বলে দিলাম, কয়েকটি ছাত্র ও তাদের এক পণ্ডিত এখানে এসেছেন ইউনিভার্সিটীর আসন্ন পরীক্ষা দিতে।

"দাদার" আদেশে আমি মেসের এক বন্ধু, শরৎ গুহকে বললাম, নরেন ঘোষ চৌধুরীকে যেন ডেকে আনে। গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত তাঁদের কি আলোচনা হ'ল আমি জানি না।

"আমি খুব সকালে উঠি। দেখি, দাদা তারও আগে উঠে 'আসনে' বসে জপ করছেন। পরের ঘটনা থেকে বুঝলাম রাত্রে ক'জনের মধ্যে কি বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। চিত্তপ্রিয়, নীরেন ও মনোরঞ্জন এ অঞ্চলে নবাগত। পথঘাট কিছুই তাঁদের জানা নেই। কাঁসারিপাড়ার ভিতর দিয়ে আমি চিত্তকে সঙ্গে করে সকাল বেলা কেদুয়াতে যাই। সেখানে পার্কের উত্তর-পূর্ব্ব কোণে—নরেনকে বসে থাকতে দেখি। তাঁর মুখে চিন্তার কোনও ছাপ নেই, স্নিগ্ধ শান্ত ভাব। দূর থেকে চিত্তকে দেখিয়ে দিলাম নরেনকে। নীরেন ও মনোরঞ্জন সঙ্গেই ছিলেন। আমি মেসে ফিরে আসি। সেদিনটা ফেব্রুয়ারী ২৮ এ।

দু' ঘণ্টা কেটে গেল, চিত্ত আসছে না দেখে দাদা একটু বিচলিত হয়ে আমাকে পাঠালেন তাদের খবর আনতে। মাণিকতলা আর কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটের মোড়ে নীরেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'লে নীরেন বললে 'কাজ হয়ে গেছে, তুমি গিয়ে দেখতে পার'।

"গিয়ে দেখি, পুলিশে পুলিশে যায়গাটা ভরে গেছে, পথচারীরাও এসে ভিড় বাড়াচ্ছে। খুন-করা মানুষ আমি এর আগে কখনও দেখিনি। দৃশ্যটা বীভৎস। গা ছম্ ছম্ করতে লাগলো। আমি মেসে ফিরে এলাম,

কিন্তু চিত্ত তখনও ফেরেনি। আবার গিয়ে গলিঘুঁজির মধ্য দিয়ে চিত্তকে নিয়ে এলাম।

"চিত্ত পথে সব ঘটনা আমায় বললেন। তিনি কর্ণওয়ালিশ আর মাণিকতলা ষ্ট্রীটের মোড়ে গির্জ্জের কাছে দাঁড়িয়ে আছেন। তখন সুরেশ মুখার্জ্জি আর্দালি সঙ্গে করে তাঁর দিকে এগিয়ে আসছেন। সেখান থেকে সামান্য তফাতে নীরেন আর মনোরঞ্জন দাঁড়িয়ে। তিনি (চিত্ত) পিস্তলের ঘোড়া (ট্রিগার) টিপলেন, সেটা নড়লো না। সুরেশ মুখার্জ্জি তখন তাঁকে প্রায় গ্রেপ্তার করে ফেলেছেন আর কি।

"এমন সময় নরেনের রিভলভার ছুটলো সুরেশের পিছন থেকে। অব্যর্থ সন্ধান, গুলি সুরেশের মাথার ভিতর দিয়ে বেরিয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে সুরেশের দেহ ধরাশায়ী হয়ে পড়ে। ততক্ষণে চিত্তর মনে পড়েছে ট্রিগারে সেফ্‌টি (safety) লাগানো আছে। সেটা সরিয়েই ঘোড়া টিপ্‌তে গুলি ছুটে সুরেশের দেহে প্রবেশ করে। নীরেন ও মনোরঞ্জন আলাদা আলাদা গুলি ছোড়েন এবং তার সব কটাই সুরেশের দেহে প্রবিষ্ট হয়।

"এই বার আমার (যোগেনের) বাসা থেকে চলে যাবার পালা। আর এক দিন থেকে দলবল ঐ বাড়ী পরিত্যাগ করে। যাবার সময় দাদা আমাকে একটা আলিঙ্গন দিয়ে বললেন, মানুষ হও।"

এর পরের অবস্থানের যায়গা ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় বিবৃত করেছেন।

কপ্তিপদা (মহলডিহা) পৌছবার পর মার্চ থেকে সেপ্টেম্বরের গোড়া পর্য্যন্ত দাদা, নীরেন আর মনোরঞ্জন থাকতেন আশ্রয়দাতা মনীন্দ্র চক্রবর্ত্তীর বাড়ীর কিছু দূরে এক কুটীরে। এখন থেকে সকল ঘটনা নানা বই ও পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। শেষ সঙ্গতি রক্ষার জন্য সংক্ষেপে ব্যাপারটা উল্লেখ করা হচ্ছে।

খবর পেয়ে কলকাতা থেকে পুলিশ কপ্তিপদায় পৌছায় সেপ্টেম্বর ৮ই। দাদা একটু আগে সংবাদ পেয়ে তালদিহাতে চিত্তপ্রিয় ও জ্যোতিষকে সঙ্গে নিয়ে অজানা পথে বেরিয়ে পড়েন। ৯ই সেপ্টেম্বর চষাখন্দ গ্রামে বুড়াবালঙ নদীতীরে পুলিশের সঙ্গে মুখোমুখি সাক্ষাৎ হবার পর দুপক্ষেই গুলি বিনিময় হয়। চিত্তপ্রিয় ঘটনা-স্থলেই মারা যায়। দাদার পেটে গুলি লাগে। জ্যোতিষও আহত হন। তিনি ও জ্যোতিষ পাল বালেশ্বর হাসপাতালে স্থানান্তরিত হয়েছিলেন। নীরেন ও মনোরঞ্জনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ হেপাজতে রাখা হয়।

পরদিন হাসপাতালে দাদার মহাপ্রয়াণ ঘটে। জ্যোতিষচন্দ্র পাল সেরে ওঠেন। নীরেনকে নিয়ে তিন জনের বিরুদ্ধে মামলা হয়। নীরেন ও মনোরঞ্জনের ফাঁসির হুকুম হয়। জ্যোতিষের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। যথাকালে ফাঁসি সুসম্পন্ন হয়। জ্যোতিষের দণ্ডকাল শেষ হ'য়ে এসেছে এমন সময় গভর্ণমেণ্ট তাঁর পরিবার-বর্গকে সংবাদ দেয়, জেলে তাঁর আকস্মিক মৃত্যু ঘটেছে। ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধের পঞ্চ মহাবীর ইতিহাসের পাতায় চিরকালের স্বাক্ষর রেখে গেছেন। আমরা তাই স্মরণ করে গর্ব্ব অনুভব করি।

বড় ঘরের বড় কথা

(উপন্যাস)

পুষ্পদেবী সরস্বতী

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

এর পরের বোন নীরার কথা আরো মর্ম্মান্তিক। সেকালের কাণ্ড ত? চার চারটে ছেলে তার মারা গেলো। তখন ছেলেপুলেদের মাথাপিছু এক এক জন দাসী ছিল। বড়লোকদের বাড়ী। হেতমপুরের রাজ-বাড়ীর বৌ নীরা। ঐ দাসীদের প্রতাপ ছিল দোর্দ্দণ্ড। তাদের ওপর কথা বলার শক্তি ছিল না বৌদের। কারণ ঝি হয়ত শিশুর বাপ-কাকাকে মানুষ করেছে। যে শাশুড়ীকে যমের মত ভয় কর্ত্ত নীরা—তাঁকেই জামবাটি শুদ্ধ দুধ ছুঁড়ে মেরেছিল রাই ঝি। গয়লা নাকি দুধ পাতলা দিয়েছিল। বেনো বাড়ীর গিন্নি দুধ ভালো করে দেখে নেয়নি এই গিন্নির অপরাধ। অথচ রাইকে কিছু বলার উপায় নেই। রাই ছাপর খাটে ছেলে নিয়ে শোয়। কারণ বছর বছর ছেলে বৌ-এর। একবছরের ছেলে কে নেবে? বাড়ীর প্রথম নাতি, সে তো আর ঝিয়ের পাশে মাদুরে শুতে পারে না কাজেই প্রজাপতি খোদাই করা কর্ত্তার বিয়ের খাটে তুলোর গদীতে ছেলের সঙ্গে শুতো রাই ঝি। কর্ত্তা নিজের খাট নাতিকে দিয়ে তক্তোপোষে শুতে আরম্ভ কল্লে'ন। বলাবাহুল্য বাড়ীর গিন্নির এটা ভালো লাগলো না। নীরার স্বামী জনার্দ্দন বাপের জন্য নতুন পালঙ্ক আনলেও কর্ত্তা তাতে শুলেন না। বললেন, কেন বাপু নাহক টাকা খরচ কর্চ্ছ? এবার তো কাঠের শয্যে চিতায় উঠতে হবে। আগে থেকে এসব অভ্যেস করা ভালো। জনার্দ্দন আর কথা কইতে সাহস করেনি। কিন্তু গিন্নি চিতায় শোয়ার প্রস্তাবটা সহজ মনে মেনে নিতে রাজী হলেন না। ফলে রাই সুয়োরাণী সম্বোধনে সম্বোধিতা হতে আরম্ভ হল। রাই কিন্তু মেজাজটা সুয়োরাণীর মতই করতে আরম্ভ করলো। শেষে ঐ জামবাটি ছুঁড়ে গিন্নিকে মারাটা জনার্দন বাবু সইতে না পেরে রাইকে বাড়ী থেকে চলে যেতে বল্লেন। রাই সামনের বাড়ীতে রোয়াকে বসে বুক চাপড়ে কাঁদতে শুরু কল্ল। এদিকে সেই তীব্র কণ্ঠস্বর শুনে খোকা মাটিতে কেঁদে গড়াগড়ি দিতে লাগলো। জনার্দন বাবু ত তখন ছেলেমানুষ নন, তিনি ত সামলা এঁটে হাইকোর্টে রওনা হলেন। বাড়ীশুদ্ধ লোক আর আলামারী শুদ্ধ খেলনা তখন খোকার কাছে জড়ো হয়েছে। যদি বা কোন খেলনা খাবার পেয়ে তার মুখে ক্ষীণ হাসি দেখা দেয় অমনি শ্রীকৃষ্ণের বাঁশীর আহ্বানের মত রাইএর কণ্ঠস্বর তীব্রতর হয়ে সে হাসিকে কান্নায় পরিণত করে। শ্রাদ্ধ অনেক দূর অবধি গড়ালো। ওমা শ্রাদ্ধ গড়ানোর গল্প বুঝি তোমরা জানো না? এক চাষা পিতৃশ্রাদ্ধ কর্ব্বে—। তাই পণ্ডিতের কাছে বিধান নিয়ে, জিনিষ পত্তর এনে বৌকে বললো দাওয়াটা ভালো করে নিকিয়ে রাখতে। বউ তো নিকিয়ে চুকিয়ে রেখেছে। এদিকে পুরুত মশাই কুশাসনে বসে গঙ্গাজল মুখে দিয়ে চাষাকে বললেন, বলো নমো বিষ্ণু নমো বিষ্ণু—চাষাও বললো, বলো নমো বিষ্ণু নমো বিষ্ণু। পণ্ডিত বললেন, না না বলো শুধু নমো বিষ্ণু নমোবিষ্ণু। চাষা হাত জোড় করে বললো, না না বলো শুধু নমোবিষ্ণু নমো বিষ্ণু। পণ্ডিত গেলেন রেগে, বল্লেন আচ্ছা মুখ্যুর পাল্লায় পড়েছি। চাষা ও সঙ্গে সঙ্গে বললো, আচ্ছা মুখ্যুর পাল্লায় পড়েছি। কথায় কথায় তর্ক উঠলো বেড়ে তারপর যা হবার তাই। মুখ থেকে শেষে হাতাহাতি। দুজনে মারামারি কর্ত্তে কর্ত্তে কীল চড় লাথি। ফলে ধরাশায়ী শেষে গড়াতে গড়াতে পণ্ডিত দাওয়া থেকে উঠোনে পড়ে যেতেই চাষার বৌ

ছুঠে এলো গোলার হাঁড়ি হাতে করে, বললো, ও ঠাকুর মশাই ওঠেন ওঠেন এখানটা নিকিয়ে দিই, আমি ত জানি না হেরাদ্দ এতদূর অবধি গড়াবে? সেই থেকেই এই কথাটার শুরু। রাই কেঁদেই চলেছে, ওরে আমার সোনার খোকারে ওরে আমার বাপরে ওরে আমার যাদুমণিরে। গিন্নির আর সহ্য হল না, গিন্নি বিষ্ণু ঝিকে ডেকে বল্লেন রাইকে সামনের রক থেকে উঠে যেতে বল্। বিধু যেতেই রাই গলার স্বর আরো তীব্র করে বিধুকে শাপ শাপান্ত করলো—। কর্ত্তার তামাক টানা বন্ধ হল। শেষে যত রাগ গিয়ে পড়লো ঠাকুরের ওপর। ঠাকুর ভাতের থালা আনতেই বললেন কে বলেছে ভাত আনতে। এক বছরের একটা শিশু অনাহারে পড়ে রইল আর আমি নাকি এখন পিণ্ডি গিলবো—। এরপর আর চুপ করে গিন্নি থাকতে পারেন না বললেন, ঘাট মানছি আমি তোমার কাছে তুমি ভাতে বোসো। যা বিধু রাইকে ডেকে আনগে বলগে জনার্দনকে তো ওই কোলেপিঠে করে মানুষ করেছে সে যদি একটা কথা রাগের মাথায় বলেই থাকে। ও যেন আসে। রাই চিৎকার করে পাড়ায় জানান দিতে দিতে বাড়ীতে ঢুকলো। জনার্দন বাবু ত অফিস থেকে ফিরে দেখলেন রাই যথাস্থানে অধিষ্ঠিতা। জনার্দনের মা এক বাটি দুধ নিয়ে রাইকে বলছেন, তুমি আপিনের সঙ্গে দুধটা খেয়ে দেখো ত রাই মনে হচ্ছে এ বেলা দুধ ভালই দিয়েছে। জনার্দন কিছু বলতে যেতেই ঘোমটার ভেতর থেকে নীরার কাতর অনুনয়ের দৃষ্টি দেখে থেমে গেলেন। বুঝলেন প্রবল ঝড় বয়ে গেছে সারাদিন সকালের ব্যাপার নিয়ে।

সেই খোকারই মৃত্যু ঘটলো রাই-এর নির্বুদ্ধিতায়। দুতিন দিন খোকার জ্বর দুবেলা ডাক্তার আসছে। নাড়ী দেখেন ওষুধ দেন—কর্ত্তা বলেন বুক পিঠ ভালো করে দেখো ডাক্তার, ডাক্তার তাও দেখেন। কিন্তু তিন দিনের মধ্যে সব শেষ। খোকাকে যখন শেষ যাত্রায় নিয়ে যাবার জন্যে জামা কাপড় বদলান হচ্ছে তখন বোঝা গেল ঘটনাটা। বাঁদিকের উরুতের কাছে লাল হয়ে আছে জায়গাটা। রাইএর টিনের তোরঙ্গের ওপর খোকা নাকি হামাটেনে উঠতে গিয়েছিলো তোরঙ্গটা ছিল খালি উল্টে খোকার উরুতে পড়ে। সেই টিনের আঁচড় সেপটিক হয়ে এই কাণ্ড। তখনকার দিনকাল ছিল আলাদা, রাইও এদের সঙ্গে কপাল চাপড়ে কাঁদতে লাগলো। সবটাই ভাগ্য বলে মেনে নিলেন সবাই। তাছাড়া ইতিমধ্যে কান্নাকাটির ফলে ন'মাসেই নীরা আর একটি ছেলে প্রসব করে রাইএর কোল পূর্ণ করলো। এ তিনমাসের মধ্যেই গেলো—। তখনকার দিনে জমিদার বাড়ীতে কাঁচের তেমন চলন ছিল না। বড় বড় ভারি ভারি রূপোর বাটি ভরে ঝিয়েরা দুধ খাওয়াতো ছেলেকে। সেই দুধ খাওয়াতে গিয়ে বিষম খেয়ে দম আটকে ছেলেটা গেল মরে। সকালে দোলায় ছেলের মৃতদেহ পাওয়া গেলো। সবচেয়ে বেশী কাঁদলো রাই-ই, তার চিৎকারের চোটে বাড়ীর সবাই কাঁদতে ভয় পেতো। এর পরের বার নীরার হল একটি পদ্মফুলের মত মেয়ে। একেও রাই-এর হাতে তুলে দোয়া হল। রাই ছাপর খাটের দখল ছাড়লো না কিন্তু মেয়েটার ভারও নিলো না। আসলে মেয়ে হল অচ্ছেদ্দার জিনিষ। তাই খাটে তুলোর গদিতে শুতো রাই। আর তার ওপর ছেঁড়া অয়েল ক্লথের ওপর ছেঁড়া খবরের কাগজে পড়ে থাকতো মেয়েটা—। আসল ব্যাপার কাঁথা কাচা থেকে মুক্তি পেলো রাই। নীরা একদিন ভয়ে ভয়ে বললো, কই আর তো কাঁথা কাচা মেলা দেখি না। একগাল হেসে রাই উত্তর দিলো—মেয়ে মানুষ এতো আর সোনার চাঁদ ছেলে নয় এখন থেকে অভ্যেস করাচ্ছি। কেমন দরকার হলেই পা নাড়ে আমি তুলে হিসি করিয়ে দিই। এখন থেকে সব অভ্যেস না করালে বরাতে শ্বশুরবাড়ীর লাথি ঝাঁটা শতেক খোয়ার হবে। এরপর আর কিছু বলার সাহস নীরার হয় না। হবি কি হ সেই সময় পাড়ায় পান বসন্ত শুরু হল। রাইএর আর বিধুর লাগানি ভাঙ্গানির ফলে পুরনো ঝি আর কেউ নেই। বাড়িতে পঙ্গপাল ঠিকে ঝি রোজ আমদানি করতে ওদের জুড়ি নেই। আর সত্যি কথা বলতে কি ওই ঠিকে ঝিদের দয়াতেই খুকী বেঁচে আছে। কেউ বা ঘুম পাড়িয়ে দেয় কেউ

বা পার্কে নিয়ে যায়। রাই পারে না। কারণ তার সেই সোনার চাঁদদের জন্যে বুক হু হু করে জ্বলে যায়। কখনো বলে, পরের ছেলের মায়ায় আর জড়াবো না বাপু—। কাজেই ঠিকে ঝিয়েদের ওপরই খুকীর ভার। রান্নাঘরে আরতিঝি বাসন মাজতে এলে নীরার নজরে পড়ে তার দুহাতে ন্যাকড়া জড়ানো—একহাতে হলে ভাবতো কেটে গেছে কিন্তু দুহাতে দেখে জিগেস করলো তোমার হাতে নেকড়া বাঁধা কেনো? আরতি বললো খুকীর বাবার তো মায়ের দয়া হয়েছে এখন ত আর সে আমার স্বামী নেই মা হয়ে গেছে তাই শাঁখা বেঁধে রেখেছি বৌদি। অর্থাৎ বৈধব্যের অভিনয়। নীরা তবু বললো, বাড়ীতে বসন্ত হয়েছে বলনি কেন মা ছুটি দিতেন তাহলে। বাধা দিয়ে আরতি বলে, ছুটির কি দরকার বৌদি? আপিসে খুকীর বাবাকে ছুটি দিয়েছে বলে মেয়েটাকেও আমায় নিতে হয় না (আরতির সেই ছ মাসের খুকীর কথা ভেবে শিউরে ওঠে নীরা) বাপের কাছেই থাকে। আমি আবার ছুটি নিয়ে কী কর্ব্ব? নীরা ভয়ে ভয়ে শাশুড়ীকে গিয়ে এসব কথা বলে। শ্বশুড়ী বলেন ওকে বাড়ী যেতে বল বৌমা ঘরে কচি ছেলে ছোঁয়াচ লাগবে। রাশিকৃত বাসন কলতলায় পড়ে থাকে আরতি চলে যায়। মধু চাকর সে এঁটো বাসন ছোঁবে না। আর রাইএর হাতে ঝিনঝিনে বাত। জানলা দিয়ে চেয়ে দেখে নীরা যদি পুরনো বাসনমাজা ঝি সিন্ধুকে পাওয়া যায়। আজ সিন্ধুর দেখা নেই। যাক সরস্বতীকে দেখা গেলো। পাশের বাড়ীর ঝি। সে বলে সে কি বৌদি বাড়ীতে মায়ের দয়া হয়েছে বলে ঝি ছেড়ে দিলে? মার চোখ আড়াল দেবে কেমন করে? আমার ঘরেই ত মা একেবারে ঢেলে দিয়েছে। নীরা হতাশ হয় তবু হাল ছাড়ে না সেটা বোধ হয় তার অসাধারণ ধৈর্য্যে।

নীরার ছোট্ট ফুলের মত মেয়েটা ঠাকুমার আঁচল ধরে অজস্র প্রশ্ন করছে। অ ঠামা আরতির কি হয়েছে ও কি আর আসবে না? ওর মেয়ে কার কাছে আছে। যা তা হুঁ, হাঁ দিয়ে দিয়ে তাকে ভোলান যায় না। এবার সিন্ধুকে দেখা যায় দীর্ঘাঙ্গী প্রৌঢ়া ঝি পেছনে কুঁজো বুড়ী শাশুড়ী থরথর করে বৌকে চোখে চোখে রেখে যায়। যখন এ বাড়ীতে কাজ করতো অনবরত এসে দেখে যেত। বৌ ঠিক আছে কি না। বলতো আমার ছেলে বাবা বেরং মানুষ তার আশার সন্দ বাতিক তাই আমায় বৌএর পেছন পেছন পাঠায়। হ্যাগা পারি অত তদ্বির করতে? আর ঐ তদারকের ফলেই সিন্ধুর মত কাজের লোককেও কেউ রাখতে পারে না। সিন্ধু কিন্তু আজ সঙ্গে সঙ্গে লোক এনে দেয় গিন্নি বকশিশ বলে চার আনা পয়সাও দেন কিন্তু বকশিশের ফল ফলে না। খানিকবাদে সে ঝি এসে বলে, পুরনো বাড়ী মায়ের দয়া হয়েছে মা তারা ডেকে পাঠিয়েছে রুগীর সেবার জন্য আমার ভরসায় থেকোনি। নীরা হতাশ হয়ে পড়ে। এরপর আসে ঝাঁটপাটের ঝি সরলা, আজ তার সাজের পারিপাট্যে ব্যাতিক্রম দেখা যায়। তার এই পারিপাট্যটি গৃহিণীর পছন্দ ছিল। তাছাড়া নীরার মেয়ে ত তাকে দেখলেই জড়িয়ে ধরে। রাই সত্যি সত্যি রাংএর বাধা হয়েছে আজকাল। তার ফরসা কাপড়খানির জন্যে তার লেসের ব্লাউজের অশালীনতা, কানের পাথরের টপের সঙ্গে নানান রং এর টিপ সহ্য করে যেত গিন্নি। তাছাড়া বলেই বা ফল কি, যে যুগের যা। নিজে থেকেই বলে সরলা, জানো মা আমাদের ঘরেও মা দেখা দিয়েছেন। আর ধোপার বাড়ীর কাপড় পরা চলবে না সিঁদুর পরা পান খাওয়া সব বন্ধ।

ঠাকুর এসে রান্নার জন্যে তাড়া দিয়ে গেছে গৃহিণীর নির্দ্দেশ মত ত্বরিত হস্তে তরকারি কুটছিল নীরা, হঠাৎ কুটনো বন্ধ করে বলে আমার বড্ড মাথা ঘুরছে মা। তাড়াতাড়ি বৌকে বঁটির কাছ থেকে তুলে আনেন গিন্নি। বলেন একটু শুয়ে পড়ে। মুখে হাতে জল দিয়ে।

শরীরটা ভালো যাচ্ছিল না নীরার তার ওপর এই সব অসুখের হতোশে কাবু হয়ে পড়েছে। মাথা ঘোরা চলছেই। শাশুড়ী বৌ, দুজনেরই মনে সন্দেহ সরলার ছেলেমেয়েরই বসন্ত হয়েছে।' নইলে পাড়ার জন্যে লোকে আর অত মানে না? যাই হোক হাত পা ধুইয়ে

একখানা ছেঁড়া কাপড় পরিয়ে তাকে দিয়েই কাজ করানো হল। এলো চিরন্তন কলা পাত। তবু হাঁড়ি কড়া ঢেকচির রাশ। ধোবে কে? সেইকটা ধুয়েই যা প্রলয় গম্ভীর মুখ করে সরলা গেল। তাতে পরদিন সে আসবে কি না তাতে ঘোরতর সন্দেহ।

গৃহিণী যাকে দুচক্ষে দেখছে তাকেই বলছে ঝিএর কথা। সন্ধ্যেবেলাও যখন নীরার মাথা ঘোরা কমল না কর্ত্তা ডাক্তার ডাকলেন। জনার্দ্দনও যেন চিন্তিত হয়ে ঘোরাঘুরি করতে লাগলো—।

গিন্নি সত্যিই বৌ অন্ত প্রাণ খানিকক্ষণ অন্তর বলছেন হ্যাঁমা একটু ভালো বোধ কর্চ্ছ? যখন বাড়ী শুদ্ধ লোক বৌ নিয়ে ব্যতিব্যস্ত তখন এলো দলে দলে পিপিলীকার মত ঝি। এর আগে মোটেই ঝি পাওয়া যাচ্ছিল না হঠাৎ এত ঝিয়ের সাপ্লাই দেখে জনার্দ্দনের সন্দেহ হয়। মাকে বলে কে জানে হয়ত এদের বাড়ীতেও বসন্ত বলে চাকরী গেছে। দু-একজনের গায়ে তখনো চুলকুনির মতো দেখা যায় মহাবিভ্রাটে পড়ে যায় গিন্নী। ওরই মধ্যে থেকে দুজনকে রাখা হল কিন্তু নীরার মেয়ের গা ভরে মা বেরুল। আগে ত যথেষ্ট মাখামাখি হয়েছে। মা শেতলার পুজো তুলে রাখা হল জ্বরটাই বেশী নইলে অন্য কষ্ট বেশী নয় তাছাড়া পানিবসন্ত মারাত্মকও নয় তাই ডাক্তার ডাকা হয় নি। ডাক্তারদের ত এধার না থাক ওধার আছে চামড়ার জুতো পরে সর্ব্বস্ব কর্ব্বে। উপকার কত হবে কে জানে কিন্তু মা শেতলা যে রুষ্ট হবেন এতে সন্দেহ নেই। তিনদিন কাটার পর মেয়ের খাওয়া বন্ধ হল তখন আর কর্ত্তা কারুর কথা শুনলেন না এলেন ব্রাউন সাহেব। তিনি বল্লেন করার কিছু নেই দুটি লাংসই নিমোনিয়ায় ভরে গেছে। পেটের খোল ঠাণ্ডা করার জন্য রাই সর্ব্বদা পান্তা ভাত খোল খাইয়েছে গায়ে ভিজে গামছা জড়িয়ে রেখেছে, গিন্নিও বলেছেন মাগো মায়ের বাছাকে শেতল করে দাও। অত ঠাণ্ডা ঐ শিশুর সইবে কেন? কর্ত্তা কেঁদে ব্রাউন সাহেবের পা জড়িয়ে ধরলেন বললেন বাঁচাও ডাক্তার, ডাক্তারও দুঃখ জানিয়ে বললেন উপায় নেই আগে হলে বাঁচানো যেত। আগেকার কালে সব সময় যে অনাদর উপেক্ষায় মানুষ কষ্ট পেত তা নয়। শিক্ষার অভাবে কুসংস্কারে মানুষ অকারণ যে কত দুঃখ পেত বলে শেষ করা যায় না। রাই কেঁদে কেঁদে বলত কপালে দুঃখু নাইলে এক কাঁড়ি টাকা দিয়ে লোকে মা শেতলার ঘরে সাহেব ডাক্তার আনে? ওরা গরু শোর কী না খায়? ছোট্ট একটী মেয়ে ওদের কাছে কিছুই নয়। আমি ভয়ে মরি তবু দরজার আড়ালে সেঁধিয়ে রইনু, বললে পেত্যর যাবে না দুটো ড্যাবডেবে চোখ দিয়ে যেন শুষে নিলে মেয়েটাকে সে কী দিষ্টি—। ও দিষ্টিতে মানুষ বাঁচে। তাও বলি বড় বাবুকে (অর্থাৎ জনার্দ্দনকে) ধন্যি বাপ তুই, কর্ত্তার নাহয় ভীমরতি হয়েছে তুই ত আটকাবি ডাক্তারকে? তা নয় দিলে এক হ্যাট ম্যাট গ্যাটকে ঘরে ঢুকিয়ে। রাই কিন্তু সত্যি সত্যি মুষড়ে পড়লো—বললো আর ছেলেপুলে নোব না বাপু—এ কি শাস্তি আমার? পেটে একটা কিছু ধরলুম না। আর তিন তিনটে সন্তান শোক—। প্রায়ই দেশে চলে যাবো বললেও নীরা তাকে দেশে যেতে দেয়নি সেই দু টাকা মাইনের ঝিকে ছ টাকার আপিন আর মাসে ১৫ সের দুধ খাইয়ে বাড়ীতেই রেখেছিল শেষ দিন পর্য্যন্ত। রাই জাতে গয়লা ছিল। শেষ পর্য্যন্ত বামুনদের কাঁধে চেপে বামুনের হাতে আগুন নিয়ে সে শেষ যাত্রা করলো। নিজের ছেলেকে পাঠিয়ে তার গয়াতেও পিণ্ড দিলেন, গিন্নি বললেন বড় খোকা অন্ত প্রাণ ছিল তার, কে জানে সেখানে গিয়েও যদি ডেকে নেয়। কোথাও শোকার্ত্ত কান্নার রোল উঠলেই নিজেদের দুঃখ ভুলে সেই রাইএর কথা ভেবে শাশুড়ী বৌএর চোখে জল আসত।

ক্রমশঃ

রবীন্দ্রনাথ ঃ নাম ও জীবন

প্রিয়তোষ ভট্টাচার্য্য

রবীন্দ্রনাথের নাম রহস্য নিয়ে কেউ মাথা ঘামিয়েছেন কি না জানি না, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের নামের সঙ্গে তাঁর অনুস্যূত কাব্য সত্যগুলির যে অর্থপূর্ণ সমন্বয় ঘটেছে তা যেমন কৌতূহলোদ্দীপক তেমনি বিস্ময়কর।

ব্যাকরণের সন্ধিপ্রকরণ অনুযায়ী 'রবীন্দ্রনাথ' শব্দটিকে বিশ্লেষণ করলে আমরা পাই তিনটি শব্দ—রবি, ইন্দ্র এবং নাথ। আপাত দৃষ্টিতে এই শব্দত্রয়ীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কোন মিল খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। কিন্তু একটু অনুধাবন করলে দেখা যাবে, ঐ শব্দ তিনটির পারস্পরিক অবস্থান ও অনন্যোক্ততা রবীন্দ্র জীবন ও কাব্য সত্যগুলির পথ নির্দেশক তিনটি ধ্রুবক।

নামের প্রথমেই অবস্থান করছে 'রবি'। রবি কে? না, সূর্য্য। যিনি প্রতিভার দীপ্তিতে ভাস্বর ও দেদীপ্যমান। প্রতিভার এই মহাব্যোম-উদ্ভাষণ রবীন্দ্র জীবনের এব প্রধান ধ্রুবক। রবীন্দ্র জীবন কিন্তু রবীন্দ্র জীবনী নয়। জীবনী বস্তুটি 'বৃত্তান্ত'-বিষয়ক ব্যাপার। কবি নিজেই তাঁর জীবন বৃত্তান্ত লিখতে গিয়ে বৃত্তান্তটাকে বাদ দিয়েছিলেন। কারণ, বৃত্তান্তর মধ্যে জীবনের যে পর্বটি ধরা পড়ে তা' প্রাত্যহিক পরিচিতি মাত্র, কবির মানস অভিব্যক্তি নয়। অথচ, মানস-অভিব্যক্তির ক্রমিক প্রকাশই কবির প্রকৃত জীবন। এই জীবনকে খুঁজতে গেলে, "বাহির হইতে দেখো না অমন ক'রে—আমায় দেখো না বাহিরে।" জীবনের প্রকৃত হদিশ পেতে হলে ডুব দিতে হবে অন্যত্র- "যে-আমি স্বপনমুরতি গোপনচারী, যে-আমি আমারে বুঝিতে বোঝাতে নারি" সেই 'কবি' কে পাওয়া যাবে তাঁর কাব্যে—সেই তাঁর প্রকৃত জীবন। সেখানে তিনি একটি সাংসারিক ব্যক্তি-বিশেষ নন্, সেখানে তিনি অব্যক্তের ব্যক্ত-স্বরূপ। এই ব্যক্ত-স্বরূপটি রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে এতই ব্যাপক ও বিরাট যে তাঁর প্রতিভার দিঙ্-নির্দেশ করতে যাওয়া আর সূর্য্যের সীমা খুঁজে হিমসিম্ খাওয়া একই কথা।

এক জীবনে রবীন্দ্রনাথ যে বিপুলায়তন সাহিত্য সৃষ্টি ক'রে গেছেন, ভাগ্যিস্ তিনি একালে জন্মেছিলেন তাই রক্ষা, নইলে চণ্ডীদাসের মত তাঁর বহু রবীন্দ্রনাথে পর্য্যবসিত হ'তে একটুও বিলম্ব হ'ত না। প্রায় তিন হাজারের কাছাকাছি সঙ্গীত, দু' হাজারের উপর কবিতা, শ'দুই প্রবন্ধ, শতাধিক গল্প, বিশ-বাইশখানা নাটক, বারো চোদ্দটি উপন্যাস, অগণন সমালোচনা ও বিচিত্র রচনা, অবসর বিনোদনে চিত্রশিক্ষা ও পাঠ্যপুস্তক রচনা—একটা বৃহৎ সৃষ্টিযজ্ঞের ব্যাপার, বিশ্বের কোথাও কোন যুগে যা' এর পূর্বে হয় নি। এই রবীন্দ্র প্রতিভার সামগ্রিক পরিচয় দিতে গিয়ে রবীন্দ্রানুরাগীকে রীতিমত বিভ্রান্ত হতে হয়। কারণ,

> এ যদি হইত শুধু ফুল
> যুগোল সুন্দর ছোটো
> উষালোকে ফোটো ফোটো
> বসন্তের পবনে দোদুল—তা'হলে না হয়

বৃন্ত হ'তে সযতনে তুলে এনে রসিক মহলে উপহার দেওয়া যেতো। কিন্তু এ যে একটা প্রতিভার সৌর ব্যাপার। "কোথা জল, কোথা কূল, দিক হ'য়ে যায় ভুল, অন্তহীন রহস্যনিলয়।" তাই, প্রতিভার এই দেদীপ্যমান জ্যোতি সংক্ষেপে 'রবি'র ধ্রুবকরূপে তাঁর জীবনে আবির্ভূত হ'য়ে নামের পুরোভাগে শোভা পাচ্ছে।

নামের দ্বিতীয় পদটি 'ইন্দ্র'। প্রতিভার পরই রবীন্দ্র জীবনের দ্বিতীয় ধ্রুবকটি হল ঐশ্বর্য্য। ইন্দ্র ঐশ্বর্য্যের দেবতা। রবীন্দ্রনাথের কি পারিবারিক কি

সাহিত্যিক উভয় জীবনেই ঐশ্বর্য্য একটি বাস্তব সত্য। কবির পারিবারিক পরিচয়টি তাঁর জীবনী ও বৃত্তান্তের অন্তর্ভুক্ত। আমাদের আলোচ্য বিষয় তাঁর সাহিত্য জীবন নিয়ে।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য জীবনে ইন্দ্রের ঐশ্বর্য্য কীরূপ ইন্দ্রজাল বিস্তার করেছে তার প্রমাণ আছে রবীন্দ্রনাথের প্রতিটি রচনার ছত্রে ছত্রে আর রবীন্দ্রানুরাগীর প্রতিটি ভাল-লাগার চমকে চমকে। কি ভাষায়, কি ভাবে, কি উপমায়, কি অলঙ্কারে, কি ছন্দে, কি ছন্দভঙ্গে সর্বত্র পরিব্যাপ্ত রয়েছে ইন্দ্রবৎ এক রাজবৎ উন্নতধ্বনি—এক পরিচ্ছন্ন অভিজাতরুচিশ্রী যা, একমাত্র ইন্দ্রের ভাব-মূর্ত্তিতেই পরিলক্ষ্যণীয়। শুধুমাত্র ছন্দ, মিল ও শব্দ চয়নকে অবলম্বন ক'রে যাঁরা কবিতা লেখেন রবীন্দ্রনাথ সে ধরণের কবি নন্। শব্দকে ভাবানুযায়ী অর্থমণ্ডিত ক'রেই তিনি ক্ষান্ত নন্—তদতিরিক্ত এমন একটা কিছু 'বেশী' তিনি অনুস্যূত করে দেন যাতে ভাব বৈভবযুক্ত হয় আর অর্থ হয় সার্থক আর্তির স্ফূর্ত্ত ব্যাঞ্জনায়। এটা ভাষার কারিগরি নয়—এ একরূপ ভাষার ঐশ্বর্য্য অর্থাৎ দিব্যভাব। এই দিব্যভাব সাধারণে সম্ভব নয়। এই ঐশ্বর্য্যের সর্ব্বস্বত্ব কবির নিজেরও বটে, আবার নিজের না-ও বটে। তাঁর নিজের কথাতেই এর কারণ খুঁজে পাওয়া যাবে।

> অন্তর মাঝে বসি অহরহ
> মুখ হ'তে তুমি ভাষা কেড়ে লহ,
> মোর কথা লয়ে তুমি কথা কহ
> মিশায়ে আপন সুরে।
> কী বলিতে চাই সব ভুলে যাই,
> তুমি যা' বলাও আমি বলি তাই,
> সংগীত স্রোতে কূল নাহি পাই
> কোথা ভেসে যাই দূরে।

এই কারণেই, অর্থাৎ, "তুমি যা, বলাও আমি বলি তাই"—এই কারণেই কবির রচনায় এক অনির্বচনীয়ের স্পর্শ ও স্বাদ আছে যা' অন্যত্র দুর্লভ। এইটি তাঁর ইন্দ্রত্ব। একটি উদাহরণ নেওয়া যাক্। মেঘ ও বৃষ্টির ভৌগোলিক তত্ত্বটি আজকাল আর কারও অজানা নেই। মেঘ জমে, বিদ্যুৎ হানে, তারপর, চল নামি'—অর্থাৎ ঢল নামে। এই তত্ত্বটুকুকে কবিতাকারে পরিবেশন করতে কবিদের বিশেষ বেগ পেতে হয় না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের হাতে? তার কায়দাই আলাদা।

> ইন্দ্রের অপ্সরী আসি মেঘে মেঘে হানিয়া কঙ্কণ
> বাষ্পপাত্র চূর্ণ করি লীলানৃত্যে করেছে বর্ষণ
> যৌবন অমৃত-রস—তুমি তাই নিলে ভরি ভরি
> আপনার পত্রপুষ্পপুটে, অনন্তযৌবনা করি
> সাজাইলে বসুন্ধরা।'—এইখানেই রবীন্দ্রনাথের ইন্দ্রত্ব।

হালফ্যাসানের কবিতাতেও রবীন্দ্রনাথ এই ইন্দ্রত্বকে বিসর্জন দেন নাই। উর্বশীর রূপ বর্ণনায় তাঁর ভাষা-শৈলীর সম্রাজ্ঞীরূপ আমরা দেখেছি। আবার, আধুনিক নারীর কমনীয় রূপ বর্ণনাতেও রবীন্দ্রনাথ এক অভিজাত রুচির শ্রী সম্পাদন করেছেন। সেখানে সুর লঘু হলেও গ্রাম উচ্চ। ভাষার ইন্দ্রজাল ইন্দ্রের শ্রী-সৌরভে সমুজ্জ্বল।

> গৌর বরণ তোমার চরণমূলে
> ফল্‌সা বরণ শাড়ীটি ঘেরিবে ভাল;
> বসন প্রান্ত সীমন্তে রেখো তুলে,
> কপোল প্রান্তে সরুপাড় ঘন-কালো।
> একগুচ্ছ চুল বায়ু-উচ্ছ্বাসে কাঁপা
> ললাটের ধারে থাকে যেন অশাসনে
> ডাহিন অলকে একটি দোলন চাঁপা
> দুলিয়া উঠুক গ্রীবাভঙ্গির সনে।

গদ্য রচনার ক্ষেত্রে এই ঐশ্বর্য্য কখনও উদাত্ত, কখনো গম্ভীর, কখনো ভাবব্যাকুল। কিন্তু প্রতি ক্ষেত্রেই ভাষার আভিজাত্য ও উন্নতধ্বনি দেবরাজ ইন্দ্রের দৈবী কান্তিতে সমুদ্ভাসিত। যেমন, 'কেকাধ্বনি'—

"নববর্ষাগমে গিরিপাদমূলে লতা-জটিল প্রাচীন মহারণ্যের মধ্যে যে মত্ততা উপস্থিত হয়, কেকারব তাহারই গান। আষাঢ়ে শ্যামায়মান তমালতালীবনের দ্বিগুণতর ঘনায়িত অন্ধকারে মাতৃস্তন্যপিপাসু ঊর্দ্ধ'বাহু

শতসহস্র শিশুর মতো অগণ্য শাখা-প্রশাখার আন্দোলিত মর্মরমুখর মহোল্লাসের মধ্যে রহিয়া রহিয়া কেকা তারস্বরে যে একটি কাংস্য-ক্রেঙ্কার ধ্বনি উত্থিত করে, তাহাতে প্রবীণ বনস্পতি মণ্ডলীর মধ্যে আরণ্য মহোৎসবের প্রাণ জাগিয়া উঠে।"

ধর্মের সরল আদর্শ বর্ণনা করতে গিয়ে ভাষায় যে ভাব-ব্যাকুল উদাত্ততা রবীন্দ্রনাথ আনয়ন করেছেন তা প্রাণায়াম-ক্রিয়ারই আর এক রূপ।

"হে ভারতবর্ষের চিরারাধ্যতম অন্তর্যামী বিধাতৃ পুরুষ, তুমি আমাদের ভারতবর্ষকে সফল করো।... জগতের মধ্যে অদ্য দারুণ দুর্যোগের দুর্দিন উপস্থিত হইয়াছে, চারিদিকে যুদ্ধভেরী বাজিয়া উঠিয়াছে, বাণিজ্য রথ দুর্বলকে ধূলির সহিত দলন করিয়া ঘর্ঘরশব্দে চারিদিকে ধাবিত হইয়াছে; স্বার্থের ঝঞ্ঝাবায়ু প্রলয়গর্জনে চারিদিকে পাক খাইয়া ফিরিতেছে—হে বিধাতঃ, পৃথিবীর লোক আজ তোমার সিংহাসন শূন্য মনে করিতেছে, ধর্মকে অভ্যাসজনিত সংস্কারমাত্র মনে করিয়া নিশ্চিন্তচিত্তে যথেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হইয়াছে। হে শান্তং শিবমদ্বৈতম্, এই ঝঞ্ঝাবর্তে আমরা ক্ষুব্ধ হইব না, শুষ্ক মৃত পত্ররাশির ন্যায় ইহার দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া ধূলিধ্বজা তুলিয়া দিগ্‌বিদিকে ভ্রাম্যমাণ হইব না, আমরা পৃথিবীব্যাপী প্রলয়তাণ্ডবের মধ্যে একমনে একাগ্রনিষ্ঠায় এই বিপুল বিশ্বাস যেন দৃঢ়রূপে ধারণ করিয়া থাকি যে,

অধর্মেনৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রাণি পশ্যতি
ততঃ সপত্নান্ জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি।"

ছন্দবদ্ধ রচনায় সাহিত্যের সৌন্দর্য্যবৃদ্ধির যে সব আলঙ্কারিক রীতি প্রচলিত, যেমন উপমা, উৎপ্রেক্ষা ইত্যাদি,সেগুলির প্রয়োগ-নৈপুণ্যে রবীন্দ্রনাথ যে প্রাচুর্য্য ও ঔচিত্য দেখিয়েছেন তার জুড়ি মেলা ভার। কালিদাস সেকস্‌পীয়র্ ও শ'—বিশ্বের তিন যুগের এই বিভিন্ন তিন সাহিত্য মহারথীর একত্র সমীকৃত হওয়ার সম্ভাবনা যদি সম্ভব হয় তবে তার নাম রবীন্দ্রনাথ। বৈদগ্ধ্য, ঐশ্বর্য্য ও বুদ্ধির সুমেল বন্ধন ঘটেছে তাঁর মধ্যে।

ছন্দ-ভঙ্গ রচনাতেও কি তাঁর ঐশ্বর্য্য প্রশ্নের অপেক্ষা রাখে? সেখানেও তিনি দেবরাজ ইন্দ্রের মতই অদ্বিতীয়—একরাট।

"অচল অবরোধে আবদ্ধ পৃথিবী, মেঘলোকে
উধাও পৃথিবী,
গিরিশৃঙ্গমালার মহৎ মৌনে ধ্যাননিমগ্না
পৃথিবী,
নীলাম্বুরাশির অতন্দ্রতরঙ্গে কলমন্দ্রমুখরা
পৃথিবী,
অন্নপূর্ণা তুমি সুন্দরী, অন্নরিক্তা তুমি
ভীষণা।"

কী অপূর্ব বাংলাভাষার 'কাদম্বরী' কল-নিনাদ!

এই বারে আসি নামের তৃতীয় পদ 'নাথ' প্রসঙ্গে। নামের প্রথম দুইটি পদে আমরা পেয়েছি 'প্রতিভা' ও 'ঐশ্বর্যের' ধ্রুবক। কিন্তু নামের তৃতীয় পদ 'নাথ'-এ এসে দেখি কবি তাঁর প্রতিভার দ্যুতি ও ঐশ্বর্য্যের ডালি আড়ালে লুকিয়ে রেখে কাঙাল-রূপে বেরিয়ে এসেছেন ভক্তি রসাপ্লুত আত্মনিবেদনের পরম ব্যাকুলতায়।

আমার এ গান ছেড়েছে তার
সকল অলঙ্কার
তোমার কাছে রাখেনি আর
সাজের অহঙ্কার।

তার কারণ বর্ণনাটিও কী মধুর!

অলঙ্কার যে মাঝে প'ড়ে
মিলনেতে আড়াল করে,
তোমার কথা ঢাকে যে তা'র
মুখর ঝঙ্কার॥

এই যে মিলনোৎকণ্ঠা, এক যে পরম প্রেমাস্পদ জীবন নাথের মুখোমুখি হওয়া এই 'ইচ্ছা'টির ধ্রুবক ঐ 'নাথ'। গীতাঞ্জলির কত গানে কতবার যে কবি তাঁর জীবন-নাথের সঙ্গে নিভৃতে কথা কয়েছেন তার এক তালিকা নীচে দেওয়া হল।

ক) প্রেমের দূতকে পাঠাতে নাথ কবে?
সকল দ্বন্দ্ব ঘুচবে আমার তবে।

খ) আবার তুমি জানিনে কোন বেশে
পথের মাঝে দাঁড়াবে, নাথ, হেসে
আমার এ হাত ধরবে কাছে এসে,

লাগবে প্রাণে নূতন ভাবের ঘোর,
তোমায় খোঁজা শেষ হবে না মোর ॥

গ) যা হারিয়ে যায় তা' আগ্‌লে ব'সে
রইব কত আর।
আর পারিনে রাত জাগতে হে নাথ,
ভাবতে অনিবার।

ঘ) প্রভু আজি তোমার দক্ষিণ হাত
রেখোনা ঢাকি।
এসেছি তোমারে, হে নাথ
পরাতে রাখী।

ঙ) তব সিংহাসনের আসন হ'তে
এলে তুমি নেমে,
মোর বিজন ঘরের দ্বারের কাছে
দাঁড়ালে, নাথ, থেমে।

চ) তুমি এবার আমায় লহ হে, নাথ, লহ
এবার তুমি ফিরো না হে—
হৃদয় কেড়ে নিয়ে লহ।

ছ) আপনারে যবে করিয়া কৃপণ
কোণে পড়ে থাকে দীনহীন মন,
দুয়ার খুলিয়া, হে উদার নাথ,
রাজ-সমারোহে এসো।

জ) এ সংসারে তোমার আমার
মাঝখানাতে তাই
কৃপা ক'রে রেখেছ, নাথ,
অনেক ব্যবধান—
দুঃখ সুখের অনেক বেড়া
ধন জন মান।

ঝ) আমারে যদি জাগালে আজি, নাথ,
ফিরোনা তবে ফিরোনা,
করো করুণ আঁখিপাত।

ঞ) ফুলের মতন আপনি ফুটাও গান
হে আমার নাথ, এই তো তোমার দান।

ট) নামটা যেদিন ঘুচাবে নাথ
বাঁচব সে দিন মুক্ত হ'য়ে—
আপন-গড়া স্বপন হ'তে
তোমার মধ্যে জনম লয়ে।

কবির সমগ্র কাব্য-জীবনের ক্রমিক ধারা-বিবর্তনকে পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে এই 'নাথ'-ভাবের উপলব্ধিতেই কবির জীবনসত্য চরমোৎকর্ষ লাভ করেছে। উপলব্ধিতেই অনুভূতিটি যতই তীব্র হয়ে উঠেছে আত্ম নিবেদনের ব্যাকুলতা ততই নিঃশেষ ও গভীর হ'য়ে উঠেছে। সেখানে 'পাওয়া'র আর প্রশ্ন নেই, না-পাওয়াতেও খেদ নেই।

কেবল থাকা, কেবল চেয়ে থাকা,
কেবল আমার মনটি তুলে রাখা,
সকল ব্যথা সকল আকাঙ্ক্ষায়
সকল দিনের কাজের মাঝখানে।

একটা জিনিস লক্ষ্যণীয়। রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভূর্ভূবঃস্বর্লোকে উপমা ও ঐশ্বর্য্যের ছড়াছড়ি থাকা সত্ত্বেও অলঙ্কার ও ঐশ্বর্য্যের বেমালুম পরিবর্জন ঘটেছে যে কাব্যে তাকেই চিহ্নিত করে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য পুরস্কার নোবেল-প্রাইজ দেওয়ায় এতদ্দেশীয় বহুজনের মনে একটা বিভ্রান্তি, বিতর্ক ও নৈরাশ্যের সৃষ্টি সে যুগেও হয়েছিল, এ যুগেও আছে। কেউ কেউ ব্যাপারটাকে একটা রাজনৈতিক চাল ব'লে পাশ কাটাবার চেষ্টাও করেছিলেন। কিন্তু ইউরোপ যে ভুল করেনি, সাহিত্য-বিচারের রসবর্তিকাটি অনেকবারের মত এবারেও নির্ভুল প্রজ্বলিত করেছিল, প্রেয়কে ছেড়ে শ্রেয়ের সম্মান প্রতিষ্ঠা করেছিল, যে কোন সুধিজনই আজ এ সত্যকে স্বীকার করে নিতে দ্বিমত করবেন না। আসলে, শ্রেষ্ঠ সাহিত্য ও শ্রেষ্ঠ সাধনার ফল এক ও অভিন্ন হ'তে বাধ্য। তার একদিকে থাকে অতীন্দ্রিয় অনুভূতি, অন্যদিকে প্রেমামৃত রস আস্বাদন। 'গীতাঞ্জলি' এতদুভয়েরই অলোক-সুন্দর ভাষ্য।

তাহলেই দেখতে পাচ্ছি, নামের সঙ্গে জীবনের এমন বৈশিষ্ট্যগত মিল বিশ্বের কুত্রাপি আর পরিলক্ষিত হয় না। প্রতিভার বিদ্যুৎস্ফুরণে তিনি 'রবি', ভাবৈশ্বর্য্যের অনিন্দ্য সৌন্দর্য্যে তিনি 'ইন্দ্র', আত্ম-নিবেদনের আকুল ব্যাকুলতায় তিনি 'নাথ'—তিনি রবীন্দ্রনাথ।

মুসলমান লেখক লেখিকা

জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী

আগেই বলে নিই একজন বিদুষী লেখিকা একবার কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন 'অসার্থক লেখক-লেখিকারাই পড়েন বেশী'—। আমি যেন কথাটায় একটা তির্য্যক্ ইঙ্গিতের বিদ্যুৎরেখা দেখতে পেলাম......।

কিন্তু পড়েন বেশী, কিছু লেখেনও—এমন নির্বোধ অতি পাঠক-পাঠিকার জগতে অভাব নেই। তাঁরা লেখকদের মৌমাছি সম্প্রদায়। এটাও কম কিছু নয়।

তখন আমার বয়স কত মনে পড়ে না, হয়ত ৮।৯ বছর। আছি প্রবাসে।

সেকালের প্রায় সব পত্রিকাই সেই প্রবাসের বাড়ীতে যেত।

একটি পত্রিকার নাম ছিল "পরিচারিকা," কেশব সেনদের সমাজের মুখপত্র। বেশ মেয়েলী লেখা এবং গল্প বেরুত। কবিতাও। ঐ দু-তিন আনাই হয়ত দাম কাগজটার। অর্থাৎ ২ টাকা বার্ষিক মূল্য।

লেখিকাদের মধ্যে ছিলেন সবই ব্রাহ্ম হিন্দু। মুসলমান নাম দেখিনি। স্নেহলতা সেন, লজ্জাবতী বসু (রাজনারায়ণ বসু দুহিতা) আরো অনেকে (স্বর্ণকুমারী সরলা দেবীরা নয়)।

হঠাৎ একদিন চোখে পড়ল "মতিচুর" নামের একটি বইয়ের সমালোচনা। অনামিকা সমালোচিকা খুশী মনে কিছু কিছু উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তীক্ষ্ণ সরস লেখা। ব্যঙ্গমূলক বোধ হয়। (বইটা হাতে পাইনি বহুকাল। এখন তো সুদুর্লভ।) সমালোচনাটিও সরস।

লেখিকার নাম মিসেস 'আর এফ হোসেন'। "সখাওয়াত মেমোরিয়াল" বিদ্যালয়টীর প্রতিষ্ঠাত্রী। স্বামীর নামে কলিকাতায় স্কুলটা।

সমালোচক নারী বা পুরুষ বলেছেন, নাম 'মতিচুর' কিন্তু (ঝালের নাড়ুও বলা যায়?) খুব ঝাঁঝালো। তীব্র অম্ল মধুর রসের মিশ্র লেখা। বেশ কিছু উদ্ধৃতি-সহ ইসলামী নারী সমাজের ও অন্য নানা বিষয় নিয়ে রচনাগুলি। বলাবাহুল্য ৭০ বছর আগের কথা। পত্রিকাগুলি আর নেই। এবং আর কিছু কথা মনেও নেই। শুধু ভাবটা এবং লেখিকার বিখ্যাত নামটি মনে আছে। এরপর এঁর কথা পেয়েছি কাজী আবদুল ওদুদ সাহেবের লেখায়। পরে সেই প্রবাসের বাড়ীতেই এর পর চোখে পড়ল একদিন, বোধ হয় তখনি, তখনি ১৩০৯।১০ সাল হয়ত—আমারো বয়স দশ,—কাজী ইমদাদুল হক সাহেবের লেখা একটি প্রবন্ধ। সুন্দর রচনা। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীর চরিত্র সম্পর্কে আলোচনা। এটি 'ভারতী' পত্রিকায় বেরিয়েছিল। সরলাদেবী সম্পাদিত ছোট ভারতীতে। ভারতীতে এঁর লেখা আরও বেরিয়েছিল। বই পড়ায় সেকালে বিধিনিষেধ ছিল একটু। যেমন ভারতচন্দ্র, মডেল ভগিনী, বিষবৃক্ষ আদি বই নিষিদ্ধ ছিল বাল্য বয়সে। আমরা অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্র—'বিষবৃক্ষ' ছাড়া, সবই পড়ে নিয়েছিলাম।

লেখক কাজী সাহেবের ক্ষোভময় কথাও বোঝা যায়, বয়স না হোক—আজো ভাবটা মনে আছে তাই। এঁর লেখা আবার পরে পড়ি "আবদুল্লা"। "মোসলেম ভারত" পত্রিকায়। ১৩২৮।২৯। আনয়মিত প্রকাশ শেষ দেখিনি। তার আগে তখন পাটনায় (বাঁকিপুর তখন) আছি, ১৩২০।২১ সাল। একটি ছোট লাইব্রেরী থেকে বই পাই। হাতে এসে পড়ল, মীর মশারফ হোসেনের "বিষাদসিন্ধু"। কারবালার করুণ কাহিনী। ইসলাম ধর্মের আদি পর্বের যুদ্ধ-বিগ্রহ-প্রবঞ্চনা-প্রতারণা ধর্ম ও সমাজ বিপর্যয় নিয়ে রামায়ণ পুরাণ মহাভারতের মত একটি যেন মহাকাব্য। মহরম দেখা একটু গল্প তানা

ছিল, কিন্তু স্পষ্ট নয়। সেই তৃষ্ণার্ত শিশু কোলে কারবালা প্রান্তরে হোসেন বা হাসানের আকুলভাবে পানীয় জলের জন্যে এসে ওপার থেকে নিক্ষিপ্ত তীরে শিশুটির জীবনান্ত.........। নানা ছলনায় তাঁদের হত্যা বিষ প্রয়োগে।"......এক কথায় ইতিহাস ও কাব্য মিশ্র একটি ধর্মের প্রবক্তা ও তার অনুগামীদের অনুরাগীদের জীবনের মর্মান্তিক মহাজীবনী কাব্য। তখন বয়স ২০।২১ হয়ত। (আরো দু-একটি উপন্যাস ঐ সমাজের লেখা তখন পড়েছিলাম, একটির নাম "আনোয়ারা")। অনেক দিন পরে হঠাৎ দেখি বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শনে লেখা একটি সমালোচনা। সেই প্রবন্ধ সমালোচনা সাহিত্যে "বিষাদ সিন্ধু"ও একটি আলোচনা। অর্থাৎ বইটি বেরিয়েছিল ১৮৭২।৭৪ সালে। সাহিত্য গুরু সমালোচনা করেছিলেন মীর সাহেবকে প্রশস্তি জানিয়ে। আমি ঐ কাহিনী ইতিহাস কাব্য আশ্চর্য্য ও মুগ্ধ হয়ে পড়ি প্রায় তার পঞ্চাশ বছর পরে।

তারপর ১৩২৮।২৯ সালে হাতে এসে পড়েছিল "মোসলেম ভারত"। আমি তখন কলকাতায় 'প্রবাসী'। (অর্থাৎ আমাদের মেয়েদের তো আজীবন বাস বা 'বাসা' বদলাতে হয়। আমরণ সবটাই তাঁদের 'প্রবাস জীবন'। একটাও স্থায়ী আবাস নয়।) সেই 'মোসলেম ভারতে' একসঙ্গে অনেক মুসলমানের লেখা রচনা ও মতবাদ চোখে পড়তে লাগল। নজরুলের কবিতা চিঠি গল্প। অন্যদের নানা আলোচনা নানা ভঙ্গী নানা ভাষায়......। এক কথায় অন্য অজানা সমাজের সাহিত্য জগতের একটা বড় জানলা যেন খুলছে সবে!

"মোসলেম ভারত" সাহিত্য সমাজ সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা। আজ থেকে প্রায় ৪০।৪৫ বছরের আগের সাহিত্য পত্র।

নানা জায়গায় থাকি। তার মাঝে 'ভারত স্ত্রী-মহামণ্ডলের (A.I.W.C.) সভ্যও হয়েছিলাম কলকাতায় যখন থেকেছি। একটা সভা হল মনে হয় ১৩৪০।৪১ সালে। ম্যাডাম হালিদা এদিব নামে তুর্কী মহিলা এসেছেন। একটা সভা হ'ল। Y.W.C.Aর হলে বেশ বড় সভা। এবং পর্দানশীন সভা। বহু হিন্দু-মুসলমান মেয়ে সমবেত হয়েছিলেন। বোরকা পরা—ঘোমটা দেওয়া। আবার অমবগুণ্ঠিতা ক্রিশ্চান ব্রাহ্মও অনেকে। তাঁরাই তো আহ্বায়িকা বা পাণ্ড। সভানেত্রী চারুলতা মুখার্জি। মনে হয় প্রিয়ম্বদা দেবী ইন্দিরা দেবীও ছিলেন। খুব ভিড়।

সভায় দুটি তিনটি মুসলমান লেখিকার সঙ্গে মুখ চেনা হল। কম বয়সী একজন, নাম তখন সোফিয়া খাতুন (কামাল পরে) কবি। মোসলেম ভারতে কবিতা লিখতেন। হালকা সুন্দর চেহারা। মিষ্ট কথা বার্তা। একটু আলাপ হল সভা ভেঙ্গে যাওয়ার অবসরে। অন্যজন বেগম সামসুন নাহার। 'সওগাত' পত্রিকার সম্পাদিকা। সামান্য চেনা হল। একবার পত্রিকাটি চোখে দেখেছি। আর দেখাশোনাও হয় নি। দুপক্ষেই প্রবল ব্যবধান পর্দায় তো। তাছাড়া সমাজের। সাম্প্রদায়িক অভ্যাসের দু সম্প্রদায়ের।

ইতিমধ্যে হঠাৎ একসময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে "শ্রী পদ্ম" প্রতীক নিয়ে একটা মহা আন্দোলন জেগে উঠল দেশে। সঙ্গে সঙ্গে বিক্ষোভ দিখা দিল 'আনন্দমঠএ'র বহ্নি উৎসবের যজ্ঞে।

এবং তারপরেই লেখায় দেখা দিলেন লেখক রেজাউল করিম সাহেব। করিম সাহেব আজকে তিনি বর্ষীয়ান। আগেও লিখতেন দেখেছি। কিন্তু সেদিন নিরপেক্ষ উদার সমন্বয়ী দৃষ্টিতে তিনি বঙ্কিম-সাহিত্যে বিচারে বলেন, গ্রন্থের পাত্রপাত্রীর চরিত্র লেখকের ওপর আরোপ করা উচিত নয়......। এবং বইয়ের পাত্র-পাত্রীর যে চরিত্র বিচার করেছিলেন, তা পরে বই আকারে 'বঙ্কিমচন্দ্র' নামে বেরিয়েছিল প্রবন্ধ সংগ্রহ রূপে। পরিশিষ্টে ছিল কাজী আবদুল ওদুদ সাহেবেরও কিছু লেখা। যে সব লেখা মনে পড়িয়ে দেয় আলবীরুণী সাহেবের উদ্ধৃতি অংশগুলি কাজী আবদুল ওদুদের লেখায় দেখা। কবীরের দাদুর দোঁহা। যা' এখনো উত্তর-পশ্চিম ভারতের অমর গাথা কাব্য। বহু দোঁহা যা' হরিদ্বারের গীতা ভবনেও উৎকীর্ণ করে রাখা হয়েছে। আর দেখি সাময়িক পত্রে উদ্বোধনে ও অন্যত্র

প্রবন্ধে পূজা সংখ্যায় রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী সংখ্যায় নানা নিবন্ধে। নাম সব মনে নেই, "যত মত তত পথ" রামকৃষ্ণের দৃষ্টিভঙ্গী বিবেকানন্দের জাতীয় চিন্তায় কত আলোচনায়। পড়ে মনে হয়েছে যেন গঙ্গায় অবগাহন স্নান করলাম! পূজার পরে 'শান্তিজল' পেলাম। এমনি নির্মল স্বচ্ছ নিরপেক্ষ রচনাগুলি। এই করিম সাহেবকে, এই সর্ব-সম্প্রদায়-শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিকে চোখে দেখায় সৌভাগ্য হয় নি আমাদের। তিনি মুর্শিদাবাদ নিবাসী এবং বই আকারে আরো অন্য কোনো রচনা বেরিয়েছে কি না চোখে পড়েনি। এর পরে মনে আসে কাজী আবদুল ওদুদ সাহেবের কথা। কিছুদিন আগে এঁর সম্বন্ধে কিছু লিখেছি কোনো পত্রিকায়। ইনিও শ্রীযুক্ত রেজাউল করিম সাহেবের মত যেমন মনস্বী তেমনি মনীষী। রচিত বই বেশ কিছু আছে। অনেকদিন ধরেই বাংলা সাহিত্যের জগতের একজন বিশিষ্ট লেখক। রবীন্দ্রনাথের বর্ষায় কাব্য নিয়ে 'বিচিত্রা' পত্রিকায় প্রথম এঁর লেখা দেখি। তারপর দেখি, গেটের জীবন-চরিত দুখণ্ডে। হজরৎ মহম্মদ জীবনকথা দু'খণ্ডে (প্রায় শেষ বয়সের রচনা) ঐ সঙ্গে দু'খণ্ড "কোরআন শরীফ"। এছাড়া 'বাংলার জাগরণ,' 'শাশ্বত বঙ্গ' প্রবন্ধ সংগ্রহ।

এঁর শাশ্বত বঙ্গের সমালোচনা পড়ি বিশ্বভারতী পত্রিকায় (অন্নদাশঙ্কর রায়)। তখনি কৌতূহল হয় তাঁর কথা অন্যান্য লেখার কথা জানতে। সুযোগ ঘটে গেল 'পি ই এ' এটির একটি বার্ষিক অধিবেশনে। সেদিনের কথাও অন্যত্র (বসুমতী মাসিক) বলেছি। তারপর 'শাশ্বত বঙ্গ' 'বাংলার জাগরণ,' 'হজরৎ জীবনকথা', 'কোরআন শরীফ', 'গেটে' হাতে পেলাম। লাইব্রেরী থেকে কিনে,এবং পরে লেখকের হাত থেকেও। সবই শাশ্বত অমূল্য রচনাবলী। হজরতের জীবনকথা লেখার কথা গল্প ছলে একদিন আমাকে বলেছেন। যখন কোরআন শরীফের কথাও ভেবেছেন তখন। একদিন কোন একটা (মার্বেল প্যালেসে) সাহিত্য সভায় দেখা হলে জিজ্ঞাসা করলাম। শুনলাম আরম্ভ করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে শরৎ বক্তৃতামালার (বিশ্ববিদ্যালয়ে) খসড়াও একদিন পড়তে দিলেন।

হজরতের অমর জীবনকথায় ভূমিকাতেই রয়েছে বড় বড় অক্ষরে 'ধর্মে বলপ্রয়োগ নাই"। কোরাণের উক্তি। কোরআন শরীফের উক্তিগুলি যেখানে রহস্য-ময় রূপক ভাবে আছে তারও ব্যাখ্যা ও ভাষ্য করে দিয়েছেন স্বধর্মী ভিন্নধর্ম ভাল করে বোঝবার জন্য। আমি হাতের কাছে এক খণ্ড পেয়েছিলাম, তিনি দিয়েছিলেন। আমি মুগ্ধ হয়ে পড়েছিলাম। যা'র "অতীন্দ্রিয় ভাবভেদ', ইসলাম ধর্মী ছাড়া আর কেউ করতে পারবেন না। কাজী আবদুল ওদুদ সাহেবের "শাশ্বত বঙ্গ" মনে পড়িয়ে দেয় সেকালের বঙ্কিমচন্দ্রের বিবিধ প্রবন্ধ রচনা ভঙ্গীকে। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের স্বদেশ সমাজ পারিবারিক প্রবন্ধকে। নিরলঙ্কার ভাষা। সতেজ ও সরস ভঙ্গী।

"শাশ্বত বঙ্গে" শুধু "প্রবন্ধ সমষ্টি নয়। আধুনিক পুরাতন প্রায় সমস্ত সমস্যাই লেখক আলোচনা করেছেন হিন্দু মুসলমান জাগরণ, দ্বন্দ্ব সংঘাত, কারণ, কার্য, প্রায় সব ইতিহাসই'—তাছাড়া সাহিত্য ও সাহিত্যিক প্রসঙ্গগুলিও পড়বার মত।

সৈয়দ মুজতবা আলি সাহেব। আমি তখন দিল্লীতে। ১৯৫২।৫৩ সাল মনে হচ্ছে। তখন আলি সাহেবও দিল্লীতে ছিলেন কর্মসূত্রে।

'রায় পিথোরা' নামে হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ডে তাঁর লেখা বেরুত। 'দেশেবিদেশে" পর এদিকে 'পঞ্চতন্ত্র, 'চাচা কাহিনী' 'ময়ূর কণ্ঠীর' আবির্ভাব হয়েছে সাহিত্য ক্ষেত্রে। আমরা কনট প্লেসের বইয়ের দোকানে গিয়ে পেলাম বইগুলো। যা' তখনি বিক্রী হ'য়ে যাচ্ছে। সরস স্বচ্ছ বাক্যভঙ্গীর গুণে।

একদিন আমরা দু'বোন (৺রুণা সেন) তাঁর কাছে যাবার জন্য টেলিফোনে প্রস্তাব করলাম। তাঁর "বঙ্গ-ভবনএর" বাসগৃহে।

গেলাম। চমৎকার সুন্দর চেহারা। বাঙালী মুসলমান। আমাদের দেশের ছেলেদের মতই দেখতে।

দুটি হিন্দু ঘরের মেয়ে। আমি অত্যন্ত কুনো মানুষ। নিজের কথা বলতে ঠিক পারি না। নিজের লেখা বই ছিল বাড়ীতে। কিন্তু কি এক আত্ম-প্রচার লজ্জায় তা আর নিয়ে যেতে পারি নি। আজ মনে হয় ঠিক কাজ করি নি। (অবশ্য দিয়ে দেখেছি অন্যত্র, কেউ পড়ে না।) আমরা যেতেই আলি সাহেব হুকুম করলেন 'রামসিং চা লেয়াও'। একটু পরেই চা এলো বিস্কুট সহ। এবং 'রামসিং' যখন!—তখন হিন্দু বিধবার সে 'চা' চলবে। তিনি পরোক্ষে বুঝিয়ে দিলেন। আমরা কি কথা বলেছিলাম এবং শুনেছিলাম (লিখে রাখা তো অভ্যাস ছিল না) মনে নেই।

তবে বেশ ঘণ্টা খানেক তাঁর মূল্যবান্ সময় নষ্ট করে শ্রদ্ধা জানিয়ে আনন্দিত মনে বাড়ী ফিরলাম। তার পরেও আর দুদিন গিয়েছি। সে দুদিনে ইন্দ্রাণী রহমান এবং (সেবারকার ভারত সুন্দরী) আরও এলেন দু' একজন। তার মাঝে ছিলেন লেখক শ্রীবিবেকরঞ্জন ভট্টাচার্য। আলি সাহেব গল্পে গুজবে জমে গেলেন। আমরা একটু মাছ রান্না করে নিয়ে গিয়েছিলাম ওই সাহিত্য-শাস্ত্র-বিলাসী, বহুভাষাবিদ্, রন্ধনতত্ত্ববিদ্. সরস মধুর সাহিত্যিকের ভোগের জন্য।

তারপর দিল্লী থেকে অন্যত্র যাই। কলিকাতায় এলে পরে আর তাঁর ঠিকানা পাইনি। কোনো যোগা-যোগও আর করা হয় নি। সেই সময় আলি সাহেবের একটি অপূর্ব উক্তি আমাদের মনে আঁকা হয়ে আছে। তখন এখানে ওখানে হিন্দু-মুসলমান সংঘাত জেগে উঠছে। সাধারণ মানুষ ও নেতারাও বিব্রত। গল্প করতে করতে সৈয়দ আলি সাহেব সহসা বললেন, "আমাদের বাড়ী আসামে। আমি তখন ছোট। আমার পিতার একটি হিন্দু বন্ধুর সঙ্গে তিনি প্রায়ই সন্ধ্যা-বেলা নদী পাহাড়ের ধারে বেড়াতে যেতেন। কখনো আমরাও গিয়েছি। দেখতাম সন্ধ্যে হলেই আমার পিতা গায়ের চাদরখানি পেতে এক জায়গায় বসে সান্ধ্য নামাজ পড়ে নিতেন। আর কাছেই আর এক জায়গায় তাঁর সেই হিন্দু বন্ধু বসে তাঁর সায়ং সন্ধ্যা করে নিতেন...।"

কতদূর বিস্তৃত কত গভীর ব্যঞ্জনাময় কথা কয়টি। কোনো মন্তব্য নয়, আলোচনা নয়, শুধু উক্তিটির উপস্থাপন ভঙ্গীটিই আমাদের তিনজনকেই কত গভীর বেদনাময় আনন্দময় এক জায়গায় গিয়ে দাঁড় করিয়ে দিল। যেখানে দুটি ধর্মী বন্ধু প্রতিবেশী পাশাপাশি আপন আপন ইষ্ট স্মরণ করে নিচ্ছেন। ছোঁয়াছুঁয়ি-ম্লেচ্ছ-কাফের কেউ নেই। এবং আমরা কান দিয়ে শুনে সেই দূর এক অতীতের চিত্রময় এক লোকের দর্শক হয়ে থমকে দাঁড়িয়েছি সেখানে। 'ইষ্ট'? 'ইষ্ট' স্মরণ করছেন তাঁরা দুটি ভিন্নধর্মী ভিন্নজাতি বন্ধু। কার ইষ্ট? দুজনের স্ব স্ব ইষ্ট? কিন্তু যেন বিশ্ব ইষ্টদেবকে স্মরণ করা হচ্ছে। এবং ইষ্ট অর্থ তো 'অখণ্ড কল্যাণ'। সকলের ইষ্ট চিন্তা কামনা।

"এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা"র ভূমিকাতে এই কথাটি পাঠকের সামনে তুলে ধরেছি। এমন কথা তো রোজ কেউ বলে না। কেউ সহজে শুনতেও পায় না। যেন মানুষে মানুষে অন্তরে এত মিল। আর এত অমিলও বাইরে।

সংস্কৃত বড় বিখ্যাত পণ্ডিত মুহম্মদ শহীদুল্লা সাহেব। এই ক' বছর গত হয়েছেন।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভ্য ছিলেন। সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় নিয়মিত কতকাল ধরে প্রাচীন বাংলা সাহিত্য ও নানা বিষয়ে ভাষা সাহিত্য নিয়ে প্রবন্ধ দেখাছ। হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে তাঁর অনুরাগী পাঠক ও ছাত্র শিষ্য অনেক। তাঁর লোকান্তরের পর তাঁদের লেখা চিঠিপত্র প্রবন্ধে তার ইতিহাস ছড়ানো। শুনেছি তিনি সংস্কৃতের খুব ভাল ছাত্র ছিলেন। তাই সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হয়ে বেদ অধ্যয়ন করতে চেয়েছিলেন। তাঁকে সে অনুমতি দেওয়া হয়নি। খুব ক্ষুণ্ণ হয়ে স্যার আশুতোষের কাছে গিয়েছিলেন। গোঁড়ামির বিরুদ্ধে কোনো উপায় হয়নি। স্যার আশুতোষের পরামর্শেই তিনি পুরাণ সাহিত্য শাস্ত্রাদি পড়েন। এতে কৌতুকের দিক হল এই, দেড়শো বছর আগে বিলেতী পণ্ডিতরা (ম্লেচ্ছ) ম্যাকসমুলার সাহেব থেকে কত জন

বেদ উপনিষদ পড়েছেন। অনুবাদ করেছেন। এমন কি আমাদের এই কালেই স্যার জন উড্রফ সাহেব তন্ত্র শাস্ত্র বিশারদ হয়েছিলেন, পড়েছি। তাঁর শিক্ষকও মহা পণ্ডিত তান্ত্রিক, নামটি ঠিক আমার মনে নেই। (যিনি ম্লেচ্ছ শিষ্যকে তন্ত্র পড়িয়েছেন।) এই আনন্দময় পণ্ডিত পুরুষটির দেহান্তের পর তাঁর অনুরাগী ছাত্র বন্ধুদের কথাই এইটুকু আমাদের শোনা ও পাওয়া। তাঁর বিদ্যার বা জ্ঞানের পরিধি ও গভীরতা নির্ণয় গুণীরা করতে পারবেন।

মনসুর উদ্দীন সাহেব। 'হারামণির অন্বেষণ' বলে প্রবাসীতে সেকালে লোকসঙ্গীত গ্রামসঙ্গীত নিয়ে একটা বিষয় প্রতি মাসে বেরুতো। তাতে বেশীর ভাগ গান কবিতা সংগ্রহ ঐ মনসুর উদ্দীন সাহেবই করেছেন।

সেই সংগ্রহ তালিকায় সব প্রথম আমাদের চোখে পড়ে, লালন ফকীরের সেই অপূর্ব বিখ্যাত গানটি।

'আমি একদিনো না দেখলাম তারে।
আমার মনের মাঝে আর্শি নগর তায় এক পড়্শী
বসত করে।"

কত গান তো তিনি প্রতি মাসে সংগ্রহ করে দিয়েছেন। কিন্তু এই গানটি যেন অতুলনীয় ভাবময়। লোকগানের সঞ্চয়ের বিভাগে এই মনসুর উদ্দীন সাহেবের সংগ্রহই বোধ হয় বেশী। শুনেছিলাম, একখানি লোকগীতি-সংগ্রহ বইও তিনি প্রকাশ করেছেন। চোখে পড়ে নি।

কাজী নজরুল ইসলাম। এ কবির পরিচয় চাঁদ সূর্য্যের পরিচয়ের মত আপনিই উজ্জ্বল।

কোন্ কবিতা, কোন্ ভক্তিসঙ্গীত (শ্যাম-শ্যামা) প্রেম-সঙ্গীত শিশু-সঙ্গীত পাঠক মানুষের মন হরণ করে নি আমার তা জানা নেই। বলা শক্ত। তিনি লোকের এত প্রিয় কবি। আর বিখ্যাত বিদ্রোহী কবিতাটি অমর লেখা।

"আমি বিদ্রোহী ভৃগু"—
"আপনারে ছাড়া আর কাহারেও আমি করি
না কুর্ণিশ।"

একটি অমর স্বদেশ সঙ্গীত। 'দুর্গম গিরি'র কোন্ লাইন বাদ দিয়ে কোনটি বল্‌ব।

"হিন্দু না ওই মুসলিম—ওরা ডুবিতেছে কোন্ জন
কাণ্ডারী বল ডুবিতেছে ওরা সন্তান মোর
মার।"
—"ফাঁসীর মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের
জয়গান"—

কাণ্ডারী কি হুঁশিয়ার হয়েছে? হয়েছিল?

নরনারী কবিতাটি। পুরুষ "হল" চালনা করেছে নারী এনেছে সেবা প্রীতি "জল"। কবির কাব্য গান সংগ্রহগুলি ছড়ানো। হাতের কাছে থাকলে এমন কত উদ্ধৃতিযোগ্য গান পাওয়া যেত।

মনে হয় দুর্দৈবের হাতে এই প্রতিভার মত এত বড় পরাজয়, 'জীবিত থেকেও, বুঝি আর দেখতে পাওয়া যায় না। ৺সুকান্ত প্রতিভাকে মনে পড়ে অকালে গত। বাংলা সাহিত্যে উদ্দাম নজরুল প্রতিভা সুপরিণত হবার আগেই প্রতিকূল ভাগ্যের ইঙ্গিতে নীরব স্তব্ধ হয়ে গেছে চিরকালের মত। জীব-আয়ু-অবসর-বিদগ্ধসঙ্গ, বৈদগ্ধ্যের পরিমার্জন-স্বীকৃতি তাঁকে কোন্ পরিণতিতে পৌঁছে দিত তা জানার অবসর দেশবাসী এবং তাঁরও মিলল না।

কাজী আবদুল ওদুদ সাহেব তাঁর শাশ্বত বঙ্গ বইয়ে নজরুল প্রতিভা নিয়ে বেশ একটু আলোচনা করেছেন।

কবি জসীম উদ্দীন, কবি বন্দে আলি মিঞা কাব্য কবিতার জগতে পরিচিত এবং প্রতিষ্ঠিত। গদ্য সাহিত্যও কিছু আছে, কমই। দেখি নি। ("ঠাকুর-বাড়ীর স্মৃতিকথা" জসীম উদ্দিন রচিত।)

এরপরে বিভক্ত দেশে আরো কয়েকজন খ্যাতনামা সাহিত্যিকের লেখার সঞ্চয় দেখতে পাচ্ছি।—

তাঁরা হলেন একজন আবু সয়ীদ আয়ুব সাহেব। রবীন্দ্র সাহিত্য আলোচক নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। পুরস্কৃতও হয়েছেন। ইনি অবাঙালী মুসলমান। কিন্তু যেন বাঙালীর চেয়েও বেশী বাঙালী সাহিত্যিক। সেকালের ৺সখারাম গণেশ দেউস্কর, ৺রামেন্দ্রসুন্দর

ত্রিবেদীর মত বাংলা সাহিত্যের রসে পরিপূর্ণ হয়ে গেছেন।

আজহার উদ্দীন আহমদ সাহেব (মেদিনীপুর)। মোহিতলাল মজুমদারের জীবনকথক। উপেক্ষিত যে কবির জীবনকথা তাঁর নিজের সম্প্রদায় বন্ধুজন আলোচনা করেন নি।

মোজাফফর আহমেদ। কবি কাজী নজরুল ইসলাম সাহেবের একজন বিশিষ্ট জীবনী লেখক (কলিকাতা নিবাসী)।

তারপর দেশ বিভাগের পর কত লেখকের আবির্ভাব হয়েছে 'এপার ওপার' যবনিকার অন্তরালে। 'এপারে' নাম পাওয়া যায়। 'ওপারের' নাম পাওয়া যায় নি বহুকাল।

এপারের সাময়িক পত্রে এখন সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ। আবদুল জব্বার খ্যাত হয়েছেন। আরো ছোট বড় নাম মাঝখানে দেখা যায়। আতাউর রহমান সাহেব এক বিশিষ্ট সাহিত্যিক।

কিন্তু সব শেষে ভাবতে হচ্ছে, ভাবতে বসেছি, কাজী আবদুল ওদুদের আমরা কোরআন শরীফ পেয়েছি। হজরৎ মহম্মদের জীবনকথা পেয়েছি। 'শাশ্বত বঙ্গ' পেয়েছি। ধর্মগ্রন্থ মানব মুকুট পেয়েছি। 'বাংলার জাগরণ' পেয়েছি। পেয়েছি সৈয়দ মুজতবা আলির সরস 'দেশে বিদেশে', 'পঞ্চতন্ত্র' আদি।

কিন্তু ইসলামী সমাজের অন্তঃপুরের চিত্র ইতিহাস, তাঁদের মোগল-পাঠান সমাজের জীবনচিত্র তাদের গৃহ-সমাজের ছোট ছোট চিত্র সুখ-দুঃখের কাহিনী, আঘাত-সংঘাতের কথা-কাহিনী পাওয়া হয় নি। মিসেস আর এস হোসেন, ক্ষুদ্র লেখা ছাড়া-এর। সাহিত্যে কোনো রামমোহন-বিদ্যাসাগর-মধুসূদন-বঙ্কিমচন্দ্র-দীনবন্ধু রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের মত কারুর ওই সাহিত্য ও ধর্ম জগতে আবির্ভাব এখনো হয়নি। ধর্মে কর্মে কাব্যে নাটকে উপন্যাসে গল্পে গানে কাহিনীতে তাঁদের আবির্ভাবের জন্য বাঙালী সাহিত্যসমাজ উৎসুক হয়ে চেয়ে আছে।

কিন্তু একটি প্রশ্ন উঠেছে আমাদের মনে। অতবড় পাণ্ডিত ও বিদ্বান্ ছাত্রকে সংস্কৃত কলেজে 'বেদ' পড়ার অনুমতি দেওয়া হল না কেন? যে সময়ে তিনি বেদ পড়তে চেয়েছিলেন, তার ঢের আগে আচার্য্য ম্যাকস্‌মূলার সাহেব (অর্থাৎ বিজাতীয় ব্যক্তি) বেদ অনুবাদ করেছেন—ভারত সরকারের অনুমোদনে ও ব্যয়ে। ১৮ শতকেই প্রায় শেষও করেছিলেন অনুবাদ-কর্ম। তিনিও ব্রাহ্মণ ঋষি মুনি ছিলেন না। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের অধিকার কি করে পেলেন?

কায়স্থ রমেশ দত্ত মহাশয়—বিবেকানন্দ এবং আরও কেউ কেউ বেদ অনুবাদ ও চর্চা করেছেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় শুনেছি রমেশচন্দ্র দত্তকে তাঁর লাইব্রেরী যথেচ্ছ ব্যবহার করতে বিশেষ স্নেহে অনুমতি দিয়েছিলেন ঋক্ বেদের অনুবাদের জন্য। কিন্তু জনাব মুহম্মদ শহীদুল্লা সাহেব কি জন্য বেদ গবেষণা বা পাঠে অনুমতি পেলেন না, একা আশ্চর্য মনে হয়। কিন্তু আরও স্মরণীয়, মোগল আমলে দারাশুকো (বেদ) উপনিষদের অনুবাদ করিয়েছিলেন।

যে ক'জন বাঙালী মুসলমান পণ্ডিত সাহিত্যিক গবেষক কবি আমাদের মধ্যে আমরা পেয়েছি তাঁদের মধ্যে পরে পরে যাঁদের নাম আমাদের কাছে স্মরণীয় ও অবিস্মরণীয় হয়ে আছে তাঁদের কজন হলেন কবি কায়কোবাদ, মীর মোশারফ হোসেন (বিষাদসিন্ধু), মুহম্মদ শহীদুল্লা সাহেব (হজরতের জীবনীকার), কাজী নজরুল ইসলাম, সৈয়দ মুজতবা আলী মহাশয় প্রমুখ প্রভৃতি, যারা বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট কীর্তিমান মানুষ।

শহীদুল্লা সাহেব এঁদের অন্যতম। তিনি বেদ পড়তে পেলে লাভ তাঁর চেয়ে আমাদের বেশী হত যেমন ম্যাক্‌সমুলার বেদবাণী জানায় হয়েছিল। আশ্চর্য ম্যাক্‌সমুলারের বেদ অনুবাদ পাশ্চাত্ত্যে প্রথম প্রচারিত হয় বিপুলভাবে। এ ক্ষেত্রেও প্রাচ্যে এশিয়াতে বেদের মর্মবাণী ছড়িয়ে পড়তে পেত।

পরীক্ষায় ছাত্রদের আবোল তাবোল

পরিমল গোস্বামী

॥ ২ ॥

আমার এ রচনার গত সংখ্যায় শিরোনাম খুব সঙ্গত হয়নি, এখন মনে হচ্ছে, কারণ আমার পরীক্ষা-গৃহের আবোল তাবোল উদ্ধৃতির শেষে যেসব বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী ছোটদের জন্য জ্ঞানবিজ্ঞানের বই লেখেন তাঁদের হাউলারের নমুনা ব্যাপকভাবে উদ্ধৃত করব, এবং আমি নিশ্চিত বলতে পারি তা দেখলে পাঠককুল স্তম্ভিত হবেন। এবং তার পরেও যদি তাঁদের চিন্তা করার ক্ষমতা অবশিষ্ট থাকে, তা হলে বুঝতে পারবেন আমাদের দেশের শিক্ষার এমন দুরবস্থা কেন। অনেক ছাপা বই আমার সংগ্রহ করা আছে।

কিন্তু আপাতত পরীক্ষা-গৃহেই ফিরে যাওয়া যাক।

রবীন্দ্রনাথের সাগরিকা নামক কবিতাটি ইনটার-মীডিয়েটের পাঠ্য ছিল। কবিতাটি তাঁর ১৯২৭ সনে বালী প্রভৃতি জাভাদ্বীপ ভ্রমণ সময়ে রচিত। এককালে ভারতের সঙ্গে এই দ্বীপাবলীর গভীর সাংস্কৃতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। এখানে হিন্দুদের উপনিবেশ স্থাপিত হয়েছিল। তার সকল চিহ্নই প্রায় এখনও অক্ষত আছে, ধর্মীয় বহু অনুষ্ঠানও এখনও বর্তমান আছে।

রবীন্দ্রনাথ সেই প্রাচীন যুগকে স্মরণ করে সাগরিকা লিখেছিলেন। এই দ্বীপগুলিকে একটি কন্যা কল্পনা করে পূর্বে, প্রেমের পরিচয়, পূর্বের আগমন এবং মিলনের সঙ্গে বর্তমানের ভারতীয় প্রতিনিধির (স্বয়ং কবির ক্ষেত্রে) আগমন তুলনা করেছেন এবং সেইভাবে কন্যাকে সম্বোধন করেছেন। ভারতের সে ঐশ্বর্য ধ্বংস হয়েছে, ভাগ্যরূপ ধনরত্নে বোঝাই জাহাজখানা সমুদ্রে তলিয়ে গেছে, এখন তিনি কবিরূপে হাতে শুধু বীণা নিয়ে এসেছেন। বলা বাহুল্য এটি একটি রূপক। কবি সেই কন্যাকে নতুন করে দেখলেন, প্রাচীনকালে তাঁকে যে সব অলঙ্কার পরিয়েছিলেন সবই তেমনি আছে। যে ফুলে উভয়ে নটরাজের পূজা করেছিলেন সে ফুলও তেমনি আছে। কন্যার বুকে যে চিত্র এঁকেছিলেন (এই চিত্রকে 'পত্রলেখা' বলে) তা আজও আছে, যে মালা পরিয়েছিলেন সেও তেমনি আছে। নৃত্যে সঙ্গীতে সেই ছন্দ আজও অব্যাহত।

…নীরব তব নম্র নতমুখে
আমারি আঁকা পত্রলেখা, আমারি মালা বুকে
দেখিনু চুপে চুপে
আমারি বাঁধা মৃদঙ্গের ছন্দ রূপে রূপে
অঙ্গে তব হিল্লোলিয়া দোলে
ললিত-গীত-কলিত কল্লোলে।
মিনতি মম শুনহে সুন্দরী,
আরেক বার সমুখে এসো প্রদীপখানি ধরি।…
এবার আমি আনি নি ডালি দখিন সমীরণে
সাগর-কূলে তোমার ফুলবনে।
এনেছি শুধু বীণা,
দেখো তো চেয়ে আমারে তুমি চিনিতে পারো
কি না।

বিশেষভাবে এই শেষের অংশটি সংক্ষেপে উদ্ধৃত করছি কেন, তা এখনি বোঝা যাবে। প্রশ্ন ছিল (১৯৬০) —"রবীন্দ্রনাথের সাগরিকা কবিতার গদ্যাংশটুকু লিখিয়া কবিতাটির তাৎপর্য নির্ণয় কর।"

এর উত্তরে কয়েকজন পরীক্ষার্থী যা লিখেছে তার নমুনা এই—

১।…তারপর রবীন্দ্রনাথ এলেন বিংশ শতাব্দীতে।

আসবার সময় যে সব মণিরত্ন আনিয়াছিলেন, জাহাজ ডুবিতে সব নষ্ট হইয়া গেল, শুধু বীণা ছিল। (বীণার প্রতি কবির আকর্ষণ এমনই তীব্র যে সমুদ্রে ভেসেও সেটা হাতছাড়া করেননি।)

২।...কিন্তু হাতের পত্রলেখায় তাহাদের মধ্যে সম্পর্ক একেবারে ছিন্ন হইল না। পত্রের মাধ্যমে ভারত ও বালীর সম্পর্ক পূর্বের মতই রহিয়াছে। ('আমারি আঁকা পত্রলেখা আমারি মালা বুকে' দ্রষ্টব্য। পত্রলেখা শব্দটির বিশেষ অর্থ জানা না থাকাতে ডাকঘরের কথা বানাতে হয়েছে।)

৩। এবারে রাজবেশ নয়। কবির সর্বাঙ্গ সিক্ত এবং বল্কল পরিধান করিয়া দ্বীপবালার কাছে আসিয়া উপস্থিত। (সমুদ্রের তুফানে কবি বিপন্ন, কিন্তু তবু সাঁতার কেটে যখন তীরে উঠলেন, তখন ঐ সঙ্গে পোশাকটি মাথায় জড়িয়ে নিলেন না কেন? তা হলে তো আর গাছের বাকল পরে দ্বীপবালার কাছে আসতে হত না। পোশাক অন্তত বীণার সঙ্গেও তো বেঁধে নিতে পারতেন।)

৪। তারপর সাগরিকার নৃত্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বাজনা বাজাইতে লাগিলেন।

৫।...জাহাজ ডুবিলে কবি সাঁতার কাটিয়া শুধু বীণা লইয়া কন্যার কাছে হাজির হইলেন। (মনে হয় সবাই রবিঠাকুরকে নারদঠাকুর রূপে কল্পনা করে নিয়েছে, তারই ফলে এই ব্যাখ্যা। বীণাটি সর্ব অবস্থায় হাতে আছে।)

এ রকম সব উত্তর লিখতে কল্পনাকে চাবুক মেরে তাকে দিয়ে ক্ষীণ স্মৃতিকে একটা ভদ্রগোছের অর্থে দাঁড় করিয়ে দেবার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু সে স্মৃতি এতই ক্ষীণ যে তা শুধু চাবুকই সহ্য করে, আর কিছুই করতে পারে না। কিন্তু তা না থাকুক, তবু শুধু চেষ্টার দামও কম নয়। অতএব তত্ত্ব আলোচনা বন্ধ রেখে এগিয়ে যাওয়া যাক।

এর পরেই যে উত্তরটি উদ্ধৃত করব, তার জন্য ঐ সাগরিকা কবিতা থেকে আরো কয়েকটি লাইন উদ্ধৃত করতে হল—

মকর-চূড় মুকুটখানি কবরী তব ঘিরে
পরায়ে দিনু শিরে।
জ্বালায়ে বাতি মাতিল সখীদল,
তোমার দেহে রতন সাজ করিল ঝলমল।

এই কথাগুলির স্মৃতি আর এক ছাত্রের কাছ থেকে এই ভাবে পাওয়া গেল—"কবি তাহার মাথায় পরাইয়া দিল মকরচুড় মুকুট, হাতে ধনুক। যখন সাগরিকা সজ্জিত হইল তখন তাহাকে রাজার ন্যায় দেখাইতেছিল।" (সমান্তরাল আর এক কল্পিত চিত্র, এবং মনোহর চিত্র।)

এর পর একটি প্রশ্ন ছিল—"ত্রেতাযুগ অবসানের বহু দিন পরে বুয়রদেশে লঙ্কাকাণ্ডের অপেক্ষাও তুমুল ব্যাপার ঘটিয়া গিয়াছে সত্য, কিন্তু কোন বিজয়ী মহাবীরকে তজ্জন্য লাঙ্গুলের ব্যবহার করিতে হয় নাই।" —এইটির ব্যাখ্যা করতে বলা হয়েছিল। পরীক্ষার্থীদের পড়া বই থেকে প্রশ্ন। এটি রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর মহাকাব্য নামক রচনা থেকে উদ্ধৃত। তাঁর মূল বক্তব্য ছিল, মহাকাব্যের যুগের যে সব কাজকে আমরা বর্বর মনে করি, এবং যা এ যুগে ঘটা অসম্ভব মনে করি, এ যুগে তার চেয়েও অনেকগুণ বেশি বর্বরতার দৃষ্টান্ত দেখা যায়। যেমন বুয়র যুদ্ধে যা ঘটেছে তাতে অবশ্য হনুমানের মতো ল্যাজের আগুনের ব্যবহার করতে হয়নি, কিন্তু তা বর্বরতায় লঙ্কাকাণ্ডকে বহু গুণে ছাড়িয়ে গেছে। রামেন্দ্রসুন্দরের ঐ রচনার একস্থানে আছে "আমরা (এ যুগে) এমন কল্পনায় আনিতে পারি না যে অ্যামেরিকার যুক্তরাজ্যের সভাপতি কোন ইউরোপের রাজসভায় আতিথ্য স্বীকার করিয়া অবশেষে রাজলক্ষ্মীকে ষ্টীমারে তুলিয়া প্রস্থান করিতেছেন...ডিলারী বন্দীকৃত লর্ড মেথুয়েনকে গাড়ীর চাকায় বাঁধিয়া দক্ষিণ আফ্রিকার বন্ধুর উপত্যকায় ঘুরাইয়া লইয়া বেড়াইতেছেন...।"

পরবর্তী উত্তরগুলি বুঝতে সুবিধা হবে বিবেচনায় এতটা উদ্ধৃত করা হল। মহাবীরের ল্যাজ ব্যবহার বিষয়ে উত্তরগুলি এই রকম :

১। পুরাকালে লোকে কি ভীষণ হইতে পারিত তাহা লাঙ্গুল ব্যবহারেই প্রমাণ। এখন যাহারা প্রকৃত

মহাবীর তাঁহারাও পূর্বের মত লাঙ্গুল ব্যবহার করেন না। (মহাবীর যে হনুমান, তা জানা না থাকাতে অর্থবিভ্রাট।)

২।...কিন্তু তাহারা কেহ বলরামের মত যুদ্ধে লাঙ্গুলের ব্যবহার করে নাই। এই যুগে যুদ্ধ যতই কঠিন হউক না কেন, তাহার জন্য কেহ আগেকার মত পাশবিক অত্যাচার করে নাই। কারণ লাঙ্গুলের ব্যবহার পাশবিক অত্যাচারের মতই। (লাঙ্গুলকে লাঙ্গল ভেবে বলরামকে টেনে আনতে হয়েছে, এবং ব্যাখ্যাও পরীক্ষার্থীর নিজস্ব।)

৩।...লাঙ্গুলের সাহায্যে হত্যার মত বীভৎস আর কিছু হইতে পারে না।

৪। পুরাকালের যুদ্ধ অত্যন্ত লজ্জাকর ব্যাপার ছিল। যুদ্ধের পর পরাজিতকে লাঙ্গুল দিয়া প্রহার করার নজির পাওয়া যায়।

৫। কোন মহাবীরের আঙ্গুলের প্রয়োজন হয় নাই।

৬। লেখক মহাভারতের বলরামের লাঙ্গল ব্যবহারের কথা টানিয়াছেন। অতীত কাল সভ্য হইলেও এই সব দিক হইতে অসভ্য। মানুষ আবার মানুষকে লাঙ্গল দিয়া কি ভাবে প্রহার করে?...এ যুগে কেহ ত লাঙ্গলকে তাহার অস্ত্র স্বরূপ ব্যবহার করে না।

৭। পূর্বে আমাদের দেশ এত অসভ্য ছিল যে, কোন লোক পরাজিত হইলে তাহাকে ট্রয়ের মত চাকায় বাঁধিয়া ঘোরান হইত।

৮। একটি দেশকে লেজের আগুনে পুড়াইয়া দেওয়া আমরা কিছুতে সমর্থন করিতে পারি না। তাই মহাবীর হনুমানকে আমরা পশুর মধ্যে গণ্য করিয়াছি।

৯। যুদ্ধ মহাকাব্যে অমার্জনীয় নহে। কিন্তু লাঙ্গুলের ব্যবহার মহাকাব্যের যে-সকল ধর্ম তাহা লঙ্ঘন করিয়াছে। বুয়র দেশের মহাকাব্যে ইহার অপেক্ষা আরও ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু এইভাবে সেথাকার মহাকাব্যে মানহানি ঘটে নাই। ("বুয়র দেশের মহাকাব্যে" লক্ষনীয়।)

১০। বুয়র যুদ্ধ লঙ্কাকাণ্ড অপেক্ষা বহুগুণে বড়। কিন্তু লঙ্কাকাণ্ডে কোন মানুষ লাঙ্গল ব্যবহার করেন নাই। কিন্তু এই যুদ্ধে লাঙ্গলের ব্যবহার দেখিয়া লেখক আশ্চর্যান্বিত হইয়া গিয়াছেন। কারণ তখন সমস্ত রকম অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া যাইত, তবু যুদ্ধের জন্য লাঙ্গলের ব্যবহার ইহা একটা আশ্চর্য ঘটনা।

এই উত্তরগুলি থেকে যাচ্ছে শব্দের অর্থ না জানা, এবং মোটের উপর কথাগুলির তাৎপর্য কিছুমাত্র বুঝতে না পারার ফলে পরীক্ষার্থীদের কল্পনার এই তাণ্ডব নৃত্য। মহাবীর হনুমান, ও মহাবীর যুদ্ধনায়ক, এই দুই অর্থে মূল লেখাটিতে ঐ মহাবীর শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। একজনমাত্র হনুমান বুঝতে পেরেছে, তবু বাকিটা সম্পূর্ণ অনুমান। লাঙ্গুল শব্দটি প্রশ্নপত্রে স্পষ্ট ছাপা থাকা সত্ত্বেও ওটাকে লাঙ্গল রূপে পড়ার কারণ লাঙ্গুল শব্দের সঙ্গে আদৌ পরিচয়ে না থাকা। লাঙ্গুল কথাটা ইনটারমীডিয়েট ছাত্রদের কাছে অজানা—এ বড়ই বিস্ময়কর ব্যাপার। লাঙ্গুলকে লাঙ্গল ভেবে তার সঙ্গে যে বলরামকে যুক্ত করেছে এটি অন্তত প্রশংসাযোগ্য। চাকায় বেঁধে ঘোরানোর ব্যাপারটাতেও কল্পনা উদ্দাম হয়ে উঠেছে। একজন আবার লাঙ্গুলকে আঙ্গুলও ভেবেছে।

এরপর ঐ একই পরীক্ষার্থীদের ইংরেজী থেকে অনুবাদেও যথেষ্ট কল্পনাশক্তির প্রকাশ দেখা যাবে। অনুবাদের জন্য যে দুটি অংশ দেওয়া হয়েছিল তার একটি এই—

> The boy went home and said to his mother that he must go to sea again to fetch some pearls for the king, The mother was quite frightened at the idea, and begged him not to go. But the boy was resolved on going, and nothing could prevent him from carrying out his purpose. He accordingly went alone on board that same vessel which had brought him and his mother, and set sail.

অনুবাদের কয়েকটি নমুনা (সমগ্রের নয়, এর মধ্যেকার

কোন্ কোন্ অংশের তা আবিষ্কার করে নিতে হবে।)

১। কিন্তু বালকটি কথা শুনিয়া কাঁদিতে লাগিল এবং বোর্ডের উপর গিয়া পাত্র বিক্রয় করিল যাহা সে সে এবং তাহার মাতা আনিয়াছিল। (vessel—পাত্র, carrying out crying out—কাঁদিতে লাগিল, brought bought বিক্রয় করিল।)

২। সে পূর্বের ন্যায় তাহাকে এবং তাহার মাকে আনীত গাড়ীতে গেল এবং পাল তুলিয়া দিল।

৩। অবশেষে মাতার দ্বারা আনীত পাত্রটি লইয়া পাল তুলিল।

৪। তখন সে তীরে উপস্থিত হইল এবং কিছু পাত্র সংগ্রহ করিয়া তাহার মাতাকে দিল।

৫। সে ইহার জন্য কাঁদিতে লাগিল। তাহার মাতার জন্য পূর্বে যে পাত্রে করিয়া এই সব আনিয়াছিল সেই পাত্রটি লইয়া সে যাত্রা করিল। (vessel = পাত্র, সোজা বাংলা। একজন গাড়ি অনুমান করেছে।)

৬। একটি বালক বাড়ি যাইয়া তাহার মাতাকে জানাইল যে সে রাজার মঙ্গলের জন্য পুনরায় সমুদ্রে যাইয়া কিছু বিপদের সম্মুখীন হইয়া সংগ্রাম করিবে। (মঙ্গলের জন্য, কোন্ শব্দ থেকে বোঝা গেল না। তবে frightened থেকে 'fight to the end' ধরে নিতে —পারে ধ্বনি প্রায় এক।)

এরপর অন্যান্য প্রশ্নের উত্তর—যা আমার টুকরো টুকরো সংগ্রহ আছে, তা থেকে কিছু কিছু নমুনা দিচ্ছি—।

১। প্রশ্ন : বায়ুঘটিত—একে একটি শব্দে পরিণত কর এবং বাক্য রচনা কর। উত্তর (ক) বায়ুঘটিত, বায়বীয়, যেমন মানুষ বায়বীয় প্রাণী। (খ) বায়বীয় ব্যাপারে তাহার শরীর ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। (গ) জল বায়বীয় পদার্থ। (ঘ) পথের উপযুক্ত, পার্থ। তাহার সঙ্গে কোন পার্থ নাই।

২। অব্যক্ত জীবন নামক জগদানন্দ রায়ের রচনা থেকে প্রশ্ন ছিল—প্রাণী ও উদ্ভিদের মধ্যে অব্যক্ত জীবনের আভাস ইঙ্গিত ও পরিচয় কিভাবে পাওয়া যায়। এই প্রশ্নের উত্তর থেকে যে সব উল্লেখযোগ্য কথা পাওয়া গেছে তা অব্যক্ত জীবন প্রসঙ্গে লেখা। যথা—(ক) ভেক নামক এক প্রকার সামুদ্রিক প্রাণী আছে। (খ) মেরু প্রদেশে ভেক নামক এক প্রকার মৎস্য আছে...। (—জগদানন্দ রায়ের মূল রচনায় আছে- "মেরুপ্রদেশের তুষার রাশির মধ্যে যখন ভেক জমাট বাঁধিয়া থাকে... মেরু প্রদেশের বরফের মধ্যে মৎস্য এমন জমিয়া যায়...।") ভেকের অর্থ বোধগম্য না হওয়াতে দুজন পরীক্ষার্থীর উত্তরে এই বিভ্রাট ঘটেছে। পূর্বের 'লাঙ্গুল' শব্দের মতো 'ভেক' শব্দের সঙ্গেও ইনটারমীডিয়েটের ছাত্রের পরিচয় নেই।

কিন্তু এত উদ্ধৃতি সত্ত্বেও কল্পনার উদ্দাম খেলা কোনোটাতেই খুব বেশি নেই, দু-একটি ভিন্ন। আর শেষের দিকের উদ্ধৃতিতে বেশির ভাগ অজ্ঞতার পরিচয়। জ্ঞানের অভাবের পরিচয়। কল্পনার প্রকৃত পরিচয় পেতে হলে নেমে আসতে হবে প্রবেশিকা পরীক্ষার স্তরে। সেখানে জ্ঞানের অভাবের প্রশ্নই ওঠে না। কোনো কিছুরই অভাব দেখা যাবে না, সাহসেরও না। মনের আনন্দে কলম চালিয়েছে কাউকে গ্রাহ্য না করে। এবং কোনো রচনা বিষয়ে পরীক্ষার্থী-বালকের কল্পনার উপর সম্পূর্ণ ভার থাকলে তা পাঠকদের উপভোগ্য হতে বাধ্য।

আমি এমনি দুএকটি রচনার কিছু কিছু অংশ উপহার দিচ্ছি।—রচনার বিষয় দেশভ্রমণের আনন্দ ও উপকারিতা।

১। গ্রীষ্মের ছুটিতে আমরা তিন বন্ধু মিলিয়া দেশভ্রমণে বাহির হইলাম। বাড়ী হইতে গোগাড়ীতে রওনা হইয়া মটর ষ্ট্যাণ্ডে হাজির হইলাম, এবং বাসে উঠিয়া...পৌঁছিলাম।...তারপর কলিকাতা পৌঁছিলাম। শিয়ালদহ ষ্টেশন হইতে চলিলাম নিউ মার্কেটের দিকে।...তারপর বলিলাম আমরা হাওড়া ব্রিজের দিকে।...সেখানে ভাগীরথীর তীরে বিকেল বেলা বেড়াইয়া কত আনন্দ উপভোগ করিলাম। তারপরে

গেলাম যাদুঘরে। দেখিলাম দারোয়ান আসিয়া এখনও যাদুঘর খোলে নাই। সে অবস্থায় আমরা ঘোড়দৌড়ের মাঠে আসিয়া কিছুক্ষণ আনন্দ উপভোগ করি, তার কিছু ক্ষণ পরে যাদুঘরে আসিয়া তাহা দেখিয়া শেষ করিলাম। এইবার চলিলাম চিড়িয়াখানার দিকে।...এইভাবে কলিকাতার সব জিনিষ দেখিয়া রওনা হইলাম দার্জিলিংএর দিকে। সেখান হইতে আমরা পুনরায় ঘুরিয়া বৈম্বায় (?) বন্দরে উপস্থিত হইলাম। ইংলণ্ডে যাইতে হইলে আবার সেখানকার রাজার হুকুম চাই, কারণ তাহারা বাঙালীকে নিজের দেশে ঢুকিতে দেয় না। সে ব্যবস্থা আমরা আমাদের সরকারকে বলিয়া ধার্য করিয়াছিলাম। আমাদের ক্ষমতাও কম নয়, কারণ আমরা হইতেছি বর্তমান স্বাধীন যুগের স্কুলের ছাত্র।... আমাদের অনেক অভিজ্ঞতা বাড়িল। তারপর আমাদের মধ্যে একজন মনস্থ করিল যে আমরা আফ্রিকার দিকে যাই, কারণ শুনি নাকি আফ্রিকায় খুব জঙ্গল আর হিংস্র প্রকৃতির জন্তু, আর সেখানকার জীবজানোয়ারগুলোও খুব হিংস্র। ইংলণ্ড হইতে দক্ষিণ মুখে আফ্রিকার দিকে অগ্রসর হইলাম। সেখানে উপস্থিত হইয়া আমরা একটি পথপ্রদর্শক সঙ্গে লইয়া সমস্ত দেশটি ঘুরিয়া বেশ ভাল ভাবে দেখিলাম। সেখান হইতে জলযানে আসিয়া মাদ্রাজ বন্দরে উপস্থিত হইলাম।...প্লেনে করিয়া কলিকাতা আসিলাম। (স্থান ও কাল বিষয়ে এমন বেপরোয়া হওয়ার মধ্যে বেশ একটা গর্বও আছে, পড়ে মনে হয়। বিকেলে যাদুঘরে গিয়ে দেখে তখনও খোলেনি, চমৎকার।)

২। আমরা কুমিল্লা হইতে হাঁটা পথে কলিকাতা আসিলাম। কলিকাতায় আসিয়া আমার মামা থিয়েটারের অভিনেতা শৈলেন চৌধুরীর বাড়িতে উঠিলাম।...সেখান হইতে রেলগাড়িতে দার্জিলিং গেলাম ও সমস্ত দেখিয়া আর রেলগাড়িতে ফিরিতে ইচ্ছা হইল না, দার্জিলিং হইতে নৌকায় দেশে ফিরিলাম। (শৈলেন চৌধুরী জীবিত ছিলেন তখন, তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বলেছিলেন, না আমার এমন কোনো ভাগ্নে নেই।

একবার প্রবেশিকা পরীক্ষায় তোমার গ্রামের কোনো ঘটনা লেখ এই রকম একটা প্রশ্ন ছিল। তাতে দেখা গেল একটি বিশেষ কেন্দ্রের সকল পরীক্ষার্থীর গ্রামেই আগুন লেগেছিল, এবং সবাই ঐ অগ্নিকাণ্ডের বিষয়েই লিখেছে। গ্রামে এ রকম আগুন লাগা অস্বাভাবিক নয়, কিন্তু অস্বাভাবিক বোধ হল যখন ঐ উপলক্ষে প্রত্যেকেই একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনার বর্ণনা করল। সে ঘটনাটি এই :-আগুন লাগার চিৎকার শুনে পরীক্ষার্থী সেখানে ছুটে গিয়ে দেখে একটি স্ত্রীলোক উন্মাদের মতো চিৎকার করছে—ব্যাপার কি. না সে আগুন লাগার সঙ্গে সঙ্গে নিজে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে এসেছে, কিন্তু ঘুমন্ত শিশুপুত্রকে আনতে ভুলে গেছে। তখন ঐ ছাত্রটি জ্বলন্ত ঘরে ছুটে গিয়ে তাকে উদ্ধার করে এনে মায়ের অবর্ণনীয় কৃতজ্ঞতার ভাজন হল। কিন্তু যখন দেখা গেল প্রত্যেকটি পরীক্ষার্থী ঐ একই ঘটনা লিখেছে তখন বুঝলাম কোনো রচনার বইতে আগুন লাগার ঐ দৃশ্যটি পড়ে থাকবে। একজন শুধু অতিরিক্ত লিখেছিল আগুন লাগার চিৎকার শুনে কোথায় আগুন লেগেছে দেখতে লণ্ঠন হাতে ছুটে বেরিয়ে গেল। (অগ্নিকাণ্ড কোথায় খুঁজতে লণ্ঠনের সাহায্য!)

যাই হোক, যে পণ্ডিত তাঁর রচনা-শিক্ষার বইতে, মায়ের নিজ সন্তানকে ভুলে নিজের প্রাণরক্ষা বড় হয়ে ওঠার কথা লিখেছেন, তিনি যে ছাত্র সন্তানদের ভাগ্যে অগ্নিসংযোগ করেছেন এ বিষয়ে সন্দেহ ছিল না। যেখানে মা নিজের গা পুড়বে ভয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে হায় হায় করছে, ঘরে প্রবেশ করে সন্তানকে বাঁচানোর চেষ্টা করতে পারছে না, সেখানে স্কুলের ছাত্র অনায়াসে গিয়ে শিশুকে উদ্ধার করে নিয়ে এলো, এমন রচনা নিশ্চয় নির্বোধ মায়েদের শিক্ষার জন্যই লেখা।

রচনা আরো নানা রকম আছে, পরে বলা যাবে তাদের কথা। আপাতত কয়েকটি বাগ্‌ভঙ্গীর সাহায্যে বাক্য রচনার নমুনা দেখা যাক। প্রথম—সোনায়

সোহাগা পৃথক কয়েকটি পরীক্ষার্থীর খাতা থেকে দেওয়া :—

১। সে দেখিতে একেবারে সোনায় সোহাগা।

২। শিশুটি মায়ের সোনায় সোহাগা।

৩। সোনায় সোহাগা ফলিয়াছে।

৪। তুমি ত সোনায় সোহাগা হে, তোমাকে কিছুই বলিবার উপায় নাই।

৫। ধনীর একমাত্র ছেলে সোনায় সোহাগা হইয়া বসিয়া আছে।

৬। সোনায় সোহাগা একটি কথা বলিলেই কাঁদিয়া ফেলে।

৭। গ্রামের কর্তা মারা যাওয়াতে সোনায় সোহাগা হইল।

৮। সারদাবাবু জমিদার কন্যাকে পুত্রবধূরূপে ঘরে আনিতে পারিয়া একেবারে সোনায় সোহাগা।

৯। সে কি আর তোমার বাড়ীতে আসিবে, সে ত সোনায় সোহাগা।

আকাশের চাঁদ

১। পরের সঙ্গে তাল দিয়া চলিলে আকাশের চাঁদ হয়।

২। ছেলে নয় যেন আকাশের চাঁদ, যখন যাহা চায় দিতে হয়।

৩। ব্রাহ্মণ হইয়া আকাশের চাঁদ ধরিতে গেল। (বামন হয়ে চাঁদে হাত শুনে, তার অপপ্রয়োগ করা হয়েছে। বামন খারাপ শোনায়, ওটা ব্রাহ্মণ হয়েছে এবং শুধু চাঁদের বদলে আকাশের চাঁদ হয়েছে। অনেকটা সেই ইদং কর্ম্মং বরাহং-এর মতন।)

অনুবাদ

A quarter past seven - বিভিন্ন অনুবাদ

১। ৭টার এক তৃতীয়াংশ ভাগ চলিয়া গিয়াছে।

২। সাড়ে সাত বাজিয়াছে।

৩। পৌনে আটটা বাজে।

৪। সাতটা বেজে এক সেকেণ্ড হইয়াছে।

৫। সাতটা বেজে ২০ মিনিট হয়েছে।

৬। ৭টা ৪৫ মিনিট হইয়াছে।

৭। সাত মিনিট বাজে।

৮। সাতটা বেজে কয়েক মিনিট হয়েছে।

৯। কাঁটা ৭এর ঘরের বাহিরে গিয়াছিল।

১০। পৌনে ৮টা বাজিয়াছে।

ক্রমশঃ

জেলেদের পান্তাবুড়ি

কচ্ছপ কন্যার কাহিনী

লক্ষ্মী চট্টোপাধ্যায়

বহুদিন আগের গল্প এটি। তখন পৃথিবী সবে অল্প দিন হলো সৃষ্টি হয়েছে। সব দেশে নানা রকম অদ্ভুত ঘটনা ঘটত যেগুলি লোকমুখে যুগের পর যুগ বিভিন্ন কাহিনী রূপে প্রচলিত আছে। এই রকম একটি কাহিনী দক্ষিণ ভারতের কেরেলা প্রদেশে শোনা যায়।

রাজু বলে এক জেলে একটি ছোট গ্রামে বাস করত। এই গ্রামটি কেরেলা প্রদেশে সমুদ্র ধারে। রাজু অতি গরিব। তার একটি নারকোল পাতা ছাওয়া কুঁড়ে ছিল সমুদ্রের বালির চরের উপর। রোজ ভোরে সে নৌকা নিয়ে মাছ ধরতে বেরুত অন্য জেলেদের সঙ্গে। সকলেই অল্প কিছু মাছ জালে পড়লেই গ্রামে ফিরে আসত আর হাটে সেগুলি বিক্রি করে তাদের দিন কোনমতে কাটত। —এভাবে তার জীবনটাই কেটে যাচ্ছিল আর হয়ত এইভাবে সারা জীবন তার শেষ হতো যদি ঘটনাচক্রে একদিন একটি কচ্ছপ তার জালে ধরা না পড়ত।

সেদিন সকালে তার জালে তখন, আর কিছুই ধরা পড়ে নি এই কচ্ছপটা বাদে। রাজু ভাবল, "তাই তো, এখন কি করা যায়? এটা তো মাছের বাজারে বেচা যাবে না।—যারা মাছ কেনে রোজ তারা কচ্ছপ নিয়ে কি করবে? থাক্, এখন এটা বাড়ি নিয়ে যাই। কিছু-দিন ঘরে রাখলে অন্তত পোকা মাকড়গুলি খেয়ে পরিষ্কার করবে।" দিনের শেষে ক্লান্ত জেলে বাড়ি ফিরে এলো, এক হাতে কচ্ছপটা, অন্য হাতে গোটা কতক মাছ নিয়ে। এগুলির মধ্যে বেছে সব চেয়ে ছোট মাছটা নিজে খাবে বলে সে আলাদা করে রাখল, ও বাকিগুলি নিয়ে সে বাজারে গেল।

যেই না জেলে ঘর ছেড়ে বেরিয়েছে অমনি কচ্ছপের শক্ত খোলার ভিতর থেকে একটি পরমা সুন্দরী মেয়ে বেরিয়ে এলো। সে আসলে সমুদ্র রাজ্যের বাসিন্দা। সে তাড়াতাড়ি ছোট মাছটি পরিষ্কার করে নানা রকমের মশলা দিয়ে সেটা রেঁধে ফেল্লো। এরপর খানিকটা সে নিজে খেয়ে ফেল্লো, ও বাকিটা থালায় রেখে আবার সেই শক্ত খোলার ভিতর ঢুকে পড়ল।

কিছুক্ষণ পরে রাজু ফিরে এসে ঘরে ঢুকে থালায় খাবার দেখে খুব আশ্চর্য্য হয়ে গেল—। "এ কি করে হলো? আমার ঘরে এসে কে রাঁধল?" তারপর মাছটা মহানন্দে খেয়ে সে শুয়ে পড়ল। পরদিন সে আবার ভোরে বেরিয়ে সারাদিন জালে যা কিছু পড়েছে সব নিয়ে বাড়ি ফিরল। আগের দিনের মত আবার একটি ছোট মাছ রেখে বাকি মাছগুলি সে বাজারে বেচতে গেল। সঙ্গে সঙ্গে কচ্ছপকন্যা খোলের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে আগের দিনের মত মাছটাছ সব

রান্না করে কিছু খাবার নিজে খেলো আর বাকিটা থালায় রেখে আবার খোলের ভিতর ঢুকে পড়ল।

রাজু বাড়ি ফিরে আবার দেখল যে থালায় নানা রকম মাছ রান্না করে কে যেন রেখে গেছে। মাছটা খেতে খেতে তার মনে খুব কৌতূহল জাগল, সত্যি কে এসে রোজ তার জন্য এভাবে খাবার রান্না করে রেখে যাচ্ছে? তার তো আপন জন বলতে কেউ বিশেষ নেই। পরদিন রাজু নৌকোয় বসে বসে অনেকক্ষণ ভাবল, কি করে এই রহস্যের ভিতরের কথা সঠিক করে, বোঝা যায়। সে স্থির করল যে'সেদিন সন্ধ্যাবেলায় সে লুকিয়ে দেখবে যে কে রোজ তার বাড়ি যাওয়া আসা করছে। বাড়ি ফিরে সে আগের মত ছোট মাছটি রেখে বাকিগুলি নিয়ে বাইরে গেল। কিন্তু তারপর ঘুরে গিয়ে জানলার বাইরে থেকে ঘরের ভিতর উঁকি মারতে লাগল। কি আশ্চর্য্য! সেই কচ্ছপের খোলার ভিতর থেকে একটি পরমা সুন্দরী মেয়ে বেরিয়ে এলো। সেই মেয়েটি ঘর দোর সব পরিষ্কার করল ও পরে খাবার রান্না করল। রাজু হাঁ করে এসব দেখতে লাগল। তারপর সে ঠিক করল যে এই মেয়েটিকে সে বিয়ে করবে, আর তাকে কচ্ছপের খোলার ভিতর যেতে দেবে না। সে দৌড়ে ঘরে গিয়ে বল্লো, "তোমাকে আর খোলার ভিতর যেতে দেব না। তোমাকে আমি বিয়ে করব।"

মেয়েটি তার কাণ্ড দেখে হেসে বল্লো—"আচ্ছা, আচ্ছা, এত তাড়া কিসের? আমি তোমাকে বিয়ে করতে পারি কিন্তু আমার একটি অনুরোধ রাখতে হবে। এই যে কচ্ছপের খোলাটা দেখছ, এটা কিন্তু ফেলে দিও না, তাহ'লে তোমাকে সাংঘাতিক বিপদে পড়তে হবে।"

রাজু কিন্তু এ অনুরোধ রাখতে রাজী হলো না। সে বল্লো, "না, এ হবে না। তুমি যে কোন সময় পালিয়ে যাবে এই খোলাটি বাড়িতে রাখলে। ওটাকে আমি সমুদ্রের জলে ফেলে দেব।" আর ঠিক তাই করল। তারপর রাজু কচ্ছপ কন্যাকে বিয়ে করে ফেল্লো, ও মনের আনন্দে রোজ রোজ ভাল খাবার খেয়ে খেয়ে মোটা হতে লাগল।

এদিকে সে দেশের রাজার বিয়ে করবার সখ হলো। দেশের সেরা সুন্দরী মেয়ের খোঁজে দূতরা চারিদিকে ছোটাছুটি করতে লাগল। কোথাও বা মোটা মেয়ে দেখছে, কোথাও অতি রোগা, কোথাও জিরাফের মত লম্বা, কোথাও বা বামন বেঁটে। কেউ বা মোমের মত ফ্যাকাসে—ফর্সা কেউ কয়লার মত কুচকুচে কালো। কোন মেয়েকেই রাজার পছন্দ হচ্ছে না এমন সময় দূতগুলি একদিন রাজুর গ্রামে এসে উপস্থিত হলো। এদিক ওদিক দেখতে দেখতে তারা সমুদ্রের ধারে এসে পড়ল আর কিছুক্ষণ পরে রাজুর অপরূপ সুন্দরী বউকে দেখতে পেলো। সকলেই এক মুখে, বল্লো এতদিনে রাণী হবার উপযুক্ত একটি মেয়ে দেখতে পেয়েছি।

কিন্তু হায়, খোঁজ নিতে গিয়ে শুনলো যে মেয়েটি এক জেলের বউ। হতাশ হয়ে দূতেরা রাজার কাছে ফিরে যেতে বাধ্য হলো। সেখানে গিয়ে বল্লো, "রাজা মশাই, অনেক তো মেয়ে দেখলাম। একটি বাদে কেউ আপনার রাণী হবার উপযুক্ত নয় আর সে মেয়েটা একটা গাঁওয়ার জেলের বউ।

রাজা বল্লেন, "বটে, মন্ত্রী একটা উপায় ভেবে বার করো, নয়ত আমার বিয়ে হবে না।"

মন্ত্রী বল্লো, "এতে ভাববার কিছু নেই। ওই গাঁওয়ারটাকে এখানে ডেকে আনা হোক। তারপর তাকে একটা অসম্ভব কিছু করতে দেওয়া যাবে আর সে তা না করতে পারলেই তক্ষুণি তার মাথাটা কেটে ফেলা হবে।" সকলে মন্ত্রীর বুদ্ধির প্রশংসা করল ও ও রাজা মশাই পরদিন রাজুকে আনতে লোক পাঠালেন।

রাজু তখন সবে পেট ভরে খেয়ে দুপুরে ঘুমচ্ছিল। রাজার বরকন্দাজ এসে পৌছতে সে ভয়ে ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপতে লাগল। কি দোষ সে করেছে কিছুই তার মনে পড়ল না। কেবল ভাবতে লাগল যে তার মত গরিব জেলেকে রাজার কি প্রয়োজন থাকতে পারে। শেষ পর্য্যন্ত রাজার হুকুম সে অমান্য করতে পারে না বলে বরকন্দাজের সঙ্গে রাজ বাড়ির পথে রওনা হলো।

দরবারে হাজির হতেই রাজা মশাই তাকে ডেকে বল্লেন, "ওহে জেলে, শুনেছি তোমার নাকি নানা রকম আশ্চর্য ক্ষমতা আছে। দেখি এ সব কথা সত্যি না মিথ্যা। তিন দিনের মধ্যে একটা কাজ তোমায় করতে হবে। আমার এই পুরো প্রাসাদটা সোনার পাতে মুড়ে দিতে হবে। এই সোনা তোমাকে জোগাড় করতে হবে আর নয়ত তোমার গর্দান যাবে।"

রাজু প্রায় কেঁদেই ফেল্লো—"হুজুর, কে বলেছে আমার কোন আশ্চর্য্য ক্ষমতা আছে? আমি এত গরিব আমার এক টুকরো সোনাও নেই তো আমি কি করে আপনাকে এত সোনা এনে দেবো?"

রাজা বল্লেন, "সে সব কথা আমি শুনতে চাই না—যা বলছি তা করো নয়ত গর্দান যাবে।"

রাজু কাঁপতে কাঁপতে বাড়ি ফিরে তার বউকে সব কথা বলতে সে বল্লো, "আমার ওই খোলটি ফেলে দিয়েছ বলেই তোমার আজ এই বিপদ। আমি কিছু করতে পরি কি না দেখছি। তুমি কাল সকালে যখন মাছ ধরতে যবে সেই সময় আমার মাকে ডাকবে আর সে এলে তাকে বলবে সমুদ্রের নিচের বাড়ির ভিতর থেকে আমার ছোট মুক্তো বসান বাক্সটা এনে দিতে। সেটা নিয়ে এসো, তারপর দেখি কি করা যায়।"

পরদিন ভোরে উঠে রাজু নৌকা নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। বহুদূর এগিয়ে গিয়ে নৌকো থামিয়ে সে জোর গলায় কচ্ছপকন্যার মাকে ডাকতে লাগল। অল্পক্ষণ পর জলের ভিতর থেকে প্রকাণ্ড একটা কচ্ছপ মাথা উঁচু করে জিজ্ঞেস করল, "কি চাই তোমার? আমায় ডাকছ কেন?"

রাজু বল্লো, "তোমার মেয়ে তার ছোট মুক্তো বসানো বাক্সটা চেয়েছে। সেটা আমাকে এনে দাও, আমি সেটা নিয়ে যাব। কচ্ছপটা আবার ডুব মেরে জলের নিচে চলে গেল ও অল্পক্ষণ পরে একটা ছোট বাক্স তুলে এনে রাজুকে দিলো। বাক্সটা নিয়ে সে বাড়ি ফিরে দেখল যে সেটা সোনায় ভরা। কিন্তু জেলের মনে ভয় বেড়েই চল্লো—ওইটুকু সোনা দিয়ে কি হবে? রাজপ্রাসাদ সোনার পাতে মুড়তে তো প্রচুর সোনা দরকার। কচ্ছপ-কন্যা তাকে আশ্বাস দিয়ে বল্লো—"নিয়েই যাও না এটা। দেখই না কি হয়।"

সকালে রাজু ভয়ে ভয়ে বাক্সটি নিয়ে রাজবাড়ির দিকে রওনা হোলো। সভার লোকেরা বাক্সটা দেখে হেসেই আকুল—ওইটুকু সোনা দিয়ে কি হবে? কাজ শুরু হবার পর সকলেই সুর বদলাল—বাক্সর সোনা শেষই হয় না, যতই তারা বের করে ততই আবার ভরে যায়। সারা প্রাসাদ ভিতর বাইরে সোনার পাতে মোড়া হলো, তখনও বাক্সটা ভর্ত্তিই রয়ে গেল। রাজা আর কি করবেন, বাধ্য হয়ে রাজুকে ছেড়ে দিলেন। পরদিন আবার মন্ত্রীর ডাক পড়ল। রাজা তাকে বল্লেন—"দেখো মন্ত্রী, এ জেলে খুব চালাক। এবার ভাল করে ভেবে চিন্তে ওকে একটা কাজ করতে বলা যাক, যেটা সে কিছুতেই করতে পারবে না।"

মন্ত্রী বেশ কিছুক্ষণ ভেবে বল্লেন, "এবার বেটাকে বলুন আপনার যত সৈন্য আছে সকলকে খাওয়াতে।" রাজা আবার রাজুকে ডেকে এঃ হুকুম করলেন। রাজু পেট বাজিয়ে কাকুতি মিনতি করতে লাগল "হুজুর, আমি নিজে একবেলা খেয়ে থাকি—আপনার অত সৈন্যদের কি করে খাওয়াব?"

রাজা বল্লেন, "কয় ওদের সকলকে কালকে পেট ভরে খাওয়াও, নয়ত তোমার গর্দান যাবে।"

জেলে আবার হতাশ হয়ে বাড়ী ফিরল। কচ্ছপ-কন্যা সব শুনে বল্লো, "তুমি কিছু ভেব না। আমি সব ঠিক করছি। কাল সকালে তুমি নৌকা নিয়ে আবার আমার মাকে ডাক। যখন সে সাড়া দেবে তখন তাকে বলবে আমার ছোট পিতলের হাঁড়িটা তোমাকে দিতে। সেটা নিয়ে এসো তারপর দেখি কি হয়।"

রাজু আবার সকালে নৌকো নিয়ে গিয়ে কচ্ছপ গিন্নীকে ডেকে সেই পিতলের হাঁড়িটা জোগাড় করল। সেটা বাড়ী নিয়ে গিয়ে বল্লো "এটাকে নিয়ে এলাম, কিন্তু এইটুকু হাঁড়িতে কি রান্না হবে?" তার বউ হেসে বল্লো, "এটা নিয়েই যাওনা রাজবাড়িতে; দেখই না কি হয়।"

রাজু পরদিন হাঁড়ি নিয়ে রাজবাড়ি গিয়ে দেখল যে হাজার হাজার সৈন্য বসে গেছে সারি সারি লাইন বেঁধে। তাদের সামনে পাতা গেলাস বসান। রাজুর হাঁড়িটা দেখে সকলে টিট্‌কারী দিতে লাগল। তারপর রাজু কিছুক্ষণ খাবার দেবার পর সকলে অবাক হয়ে সেই হাঁড়িটার দিকে তাকিয়ে রইল। কি আশ্চর্য্য, সেই ছোট হাঁড়িটার থেকে সকলে প্রচুর খাবার খেলো আবার হাঁড়িটা সেই রকমই ভরে রইল।

রাজা রেগে আগুন। আবার রাজুকে ছেড়ে দিতে হলো। এবার মন্ত্রীকে ডেকে বল্লেন, "এবার যদি জেলে বেটা যা বলব তা করতে পারে তাহলে তোমাদের সকলের গর্দান যাবে।" মন্ত্রী পরদিন বহুক্ষণ ভেবে বল্লো—"রাজা মশাই, এবার ওকে বলুন একটা দু'হাত লম্বা লোক আপনার দরবারে নিয়ে আসতে। আর তার যেন চার হাত লম্বা দাড়ি থাকে।"

রাজু এবার হতবাক্ হলো। দু'হাত লম্বা লোকের কি করে চার হাত দাড়ি হয়? বাড়ি গিয়ে বউকে বলতে সে হেসে বল্লো, "অত ভয় কিসের? তুমি আবার কাল আমার মার কাছে গিয়ে আমার ভাইকে সঙ্গে করে নিয়ে আসবে।"

রাজু পরদিন গিয়ে কচ্ছপ-গিন্নীকে ডাক দেওয়াতে আর একটা বড় কচ্ছপ উঠে এলো জলের ভিতর থেকে। সেটা বল্লো, "ওহে, আমি তোমার শ্যালক। আমাকে তোমার সঙ্গে নিয়ে চল।" রাজু হাহুতাশ করতে করতে বাড়ি ফিরল। লোকে কি বলবে? রাজা তাকে একটা বামন বেঁটে নিয়ে যেতে বলেছেন আর ও কিনা একটা মোটা কচ্ছপ নিয়ে যাবে?

বাড়ি গিয়ে এ সব কথা বলাতে তার বউ হেসে বল্লো, "আমার ভাইকে নিয়ে যাও—সে সব ব্যবস্থা করে দেবে। তুমি কেবল হাতে একটা বড় মোটা লাঠি নিয়ে যাবে।" তারপর কচ্ছপটাকে বল্লো, "দেখ ভাই, রাজা বেটা বেজায় জ্বালাচ্ছে। সব বেটাকে শেষ করে এসো।"

ভোর হতে না হতে কচ্ছপটাকে নিয়ে রাজু রাজ-বাড়ির পথে চলেছে। মনে তার কেবল এক ভাবনা, রাজা বলেছেন একটি বামন নিয়ে যেতে আর সে একটা কচ্ছপ নিয়ে যাচ্ছে। দু'জনে আস্তে আস্তে সন্ধ্যাবেলায় সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলো। সভার লোকেরা সকলেই অপেক্ষা করছে, কচ্ছপটা দেখেই রাজা খুব খুশি হয়ে বল্লেন—"মন্ত্রী, এবার জেলেটার গর্দান নেওয়া যাবে।" চারদিকে লোকজন লাফালাফি করতে লাগল এমন সময় কচ্ছপের খোলাটার ভেতর থেকে একটি বিরাট লম্বা পুরুষ বেরিয়ে দাঁড়াল।

রাজুর হাতে একটা যে লাঠি ছিল সেটাকে নিয়ে দমাদম করে সে সকলকে মারতে শুরু করল। তার মারের কাছে কেউ দাঁড়াতে পারল না। ঘূর্ণির মত, ঝড়ের মত তার লাঠির মার রাজ-দরবারে একটা প্রলয়ের সৃষ্টি করল। একটাই বিরাট মানুষ কিন্তু মনে হ'তে লাগল যেন একশ জন মানুষ খুব জোরে লাঠি চালাচ্ছে। কিছুক্ষণ পরে হয় রাজার লোকজন সব সে দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেল নয়ত মার খেয়ে মরল। তারপর দেশের লোকেরা রাজুকে রাজা করল আর তার বউ রাণী হলো। আর তাদের সেই অফুরন্ত বাক্স ও হাঁড়ি নিয়ে তারা সুখে স্বচ্ছন্দে সেই রাজ্যে বাস করতে লাগল।

(২৯২ পৃঃ পরবর্তী অংশ)

হাজার কোটি) কোটি টাকা লাগিবে। যেখানে যেখানে রাস্তা নাই সেই সকল স্থানে রাস্তা নির্মাণ করিতে হইবে। শতকরা সত্তর জন ভারতবাসী এখনও নিরক্ষর। ইহাদিগের শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। চিকিৎসা, স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ব্যবস্থা ও পানীয় জল সরবরাহ প্রভৃতি সকল কার্য্যেই মূলধন প্রয়োজন। ভারতের বৃহত্তম সম্পদ হইল তাহার অসংখ্য নরনারীর শ্রমশক্তি। ঐ সম্পদ অধিকাংশে অব্যবহৃত পড়িয়া রহিয়াছে। শ্রম-শক্তির পূর্ণতর ব্যবহার ব্যবস্থা করিলে সমস্তার সমাধান সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু কে তাহা করিবে? ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ যদি অর্থনীতির মূল কথা হয় তাহা হইলে শ্রমসাধ্য কার্য্যে কে অগ্রসর হইবে?

জাতি, জাতীয়তা, দেশহিত, দেশাত্মবোধ

জাতি ও দেশ শুধু বর্ত্তমান কালে অবস্থিত স্থান বিশেষ অথবা তৎস্থলের অধিবাসী জীবিত ও ক্রিয়াশীল ব্যক্তিগণের আখ্যাই নহে; জাতি বলিতে বহু যুগ ধরিয়া পুরুষানুক্রমিক ভাবে যাহারা জন্মিয়াছিলেন ও ভবিষ্যতে যাঁহারা জন্মাইবেন, সেই সকল মানুষকেই বুঝায়, এবং দেশ বলিতেও সেইভাবে যে স্থলে জাতি বাস করিয়াছিলেন এবং বাস করিবার ন্যায্য অধিকারী সেই সকল স্থানকেই বুঝায়। অর্থাৎ কোনও একটা সময় বিশেষে যে সকল ব্যক্তি জীবিত থাকেন ও যে স্থলে তাঁহারা বাস করেন সেই সকল ব্যক্তিই শুধু নিজেদের সমগ্র জাতি বলিয়া প্রচার করিতে পারেন না; তাঁহাদের পূর্ব্বকালের ও ভবিষ্যতের মানবদিগের প্রতিও একটা দায়িত্ব থাকিয়া যায়। তাঁহারা যদি কোন কারণে স্থানচ্যুত হইয়া থাকেন তাহা হইলে তাঁহাদের যেটুকু স্থান দখলে আছে শুধু সেইটুকুকেই দেশ বলিয়া প্রমাণ করারও অধিকার থাকে না। অর্থাৎ যেখানে জাতি ও দেশের কোন মূল অধিকার, দাবী বা প্রগতির কথা উত্থিত হয় সেখানে শুধুমাত্র বর্ত্তমানের কিছু মানুষের কথায় সেই সকল অধিকার, দাবী ও প্রগতির স্বরূপ নির্দ্ধারিত হইতে পারে না। জাতির ও দেশের পূর্ব্ব কালের ও ভবিষ্যতের সকল আদর্শ, উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, অধিকার ইত্যাদি পূর্ণ রূপে বিচার করিয়া তবেই সে সকল নির্দ্ধারণ কার্য্য সম্পন্ন করা যাইতে পারে। শুধু কয়েকটি জীবিত মানুষের মতামতের উপরে জাতি ও দেশের ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান বিচার, স্থিরীকরণ বা পরিবর্ত্তন করিলে তাহা জাতি ও দেশের উপর একটা অতি প্রকট অন্যায় করা হইবে। সংবিধান সংশোধন বিষয়ে এই সকল কথা সকলের মনে রাখা কর্ত্তব্য।

আমার ইউরোপ ভ্রমণ

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়

(১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত গ্রন্থের মূল ইংরেজী হইতে অনুবাদ : পরিমল গোস্বামী)

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

টাওয়ার অভ লণ্ডন পরিদর্শন করিলাম। ইংল্যাণ্ডের ইতিহাস ইহার সহিত অতি ঘনিষ্ঠভাবে বিজড়িত হইয়া আছে। ১০৭৮ সনে উইলিয়াম দি কংকারার কর্তৃক এটি নির্মিত হয়, পরবর্তী রাজগণ ইহার সঙ্গে অনেক সংযোজন সাধন করিয়াছেন। ইহা তাঁহাদের নিরাপদ আশ্রয় রূপেও স্থান দিয়াছে। বিদ্রোহী ওয়াট টাইলারের বিদ্রোহে যেমন রিচার্ড-২ এখানে আশ্রয় লইয়াছিলেন। টাওয়ারের বিভিন্ন বিভাগ বিভিন্ন নামে পরিচিত—হোয়াইট টাওয়ার, মিড্‌ল টাওয়ার, বাইওয়ার্ড টাওয়ার ইত্যাদি। হোয়াইট টাওয়ারেই রিচার্ড-২ তাঁহার কাজিন হেনরি অভ বলিংব্রোককে তাঁহার সিংহাসন ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। বহু ইতিহাস-প্রসিদ্ধ অস্ত্রশস্ত্র এখানে সংগৃহীত আছে। ইংল্যাণ্ডের ক্রাউন জুয়েল, বিখ্যাত 'কোহিনুর' সহ এখানে রক্ষিত আছে। টাওয়ার আরও বিখ্যাত, কারণ রাজাদেশে বহু ঐতিহাসিক শির এখানে ছেদন করা হইয়াছে, এবং মাঝে মাঝে অনেক ইতিহাসখ্যাত ব্যক্তিকে এখানে কারারুদ্ধ রাখা হইয়াছে। এডওয়ার্ড-৩ কর্তৃক ব্যালিয়ল, ক্রস্, ওয়ালেস এবং ফ্রান্সের রাজা জনকে আটক রাখা হইয়া টাওয়ারের একটি স্থানকে বলা হইল ইহা প্রাচীন শিরচ্ছেদ মঞ্চ। এইখানে কুইন আন বোলীন এবং আরও অনেকের মাথা কাটা হইয়াছে। হেনরি-৮এর সময় ঘাতকেরা বেশি কর্মব্যস্ত ছিল। ১৬৬৬ সনের লণ্ডন শহরে যে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়াছিল তাহার স্মরণে একটি মনুমেণ্ট নির্মিত হইয়াছে, তাহার উপরে উঠিয়াছিলাম। ভিতরের দিকে চক্রাকার সিঁড়ি, ৩৪৫টি ধাপ, মোট উচ্চতা ২০২ ফুট। সেই লণ্ডন ফায়ার—দি গ্রেট লণ্ডন ফায়ার ১৩২০০টি গৃহ এবং ৪৬০টি রাজপথ ধ্বংস করিয়াছিল। অনুরুদ্ধ হইয়া একদিন সেণ্ট পল্‌স ক্যাথীড্রালের প্রার্থনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলাম। ইহার পর জুওলজিক্যাল গার্ডেন দেখিলাম। অন্যান্য যাহা দেখিয়াছি তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যাঙ্ক অভ ইংল্যাণ্ড, ন্যাশন্যাল গ্যালারি, হ্যাম্পটন কোর্ট, এবং এক্সচেঞ্জ। কয়েকটি হাসপাতালও দেখিয়াছি, বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য সেণ্ট বারথলোমিউ হাসপাতাল। কেন্‌সাল গ্রীনের সমাধিক্ষেত্র দেখিলাম। এইখানে আমাদের দেশের বিখ্যাত দ্বারকানাথ ঠাকুরকে সমাহিত করা হইয়াছে। দেখিলাম অ্যাথেনিয়াম ক্লাব, কয়েকটি কো-অপারেটিভ স্টোর, তন্মধ্যে আর্মি অ্যাণ্ড নেভিও ছিল। আরও বহু স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি, অনেক নামও ভুলিয়া গিয়াছি। মাদাম তুসো'র রক্ষিত পূর্ণ আকারের বহু মোমের মূর্তি দেখিবার মত। বহু রাজা, খ্যাত ব্যক্তি, অনেক বিখ্যাত চোর হত্যাকারীর মূর্তি প্রদর্শনী রূপে রাখা হইয়াছে। খুব জীবন্ত মূর্তিগুলি। কয়েকটির চোখ জীবন্ত চোখের মত নড়াচড়া করে। ইহার এক অংশের নাম আতঙ্ক কক্ষ। কুখ্যাত অপরাধী-দের মূর্তি ও তাহাদের দ্বারা সাধিত বহু অত্যাচারের অনেক স্মারক এখানে রক্ষিত আছে। ইহার মধ্যে চার্লস পীস নামক এক প্রসিদ্ধ নরহত্যাকারী ও চোরের মূর্তি আছে। সে তাহার মুখের ভাব এমন ভাবে বদল করিতে পারিত যাহাতে তাহাকে প্রত্যেকবার এক-একটি নূতন লোকের মত দেখাইত। তাহার বন্ধুরাও সে সময় তাহাকে চিনিতে পারিত না। লোকটি ইংল্যাণ্ডে জন্মাইয়া

ভুল করিয়াছে, আমাদের দেশে জন্মিলে তাহাকে দেবতা জ্ঞান করা হইত, এমন পরমাশ্চর্য ক্ষমতার সে অধিকারী ছিল। এই কক্ষে ফরাসী বিদ্রোহ-খ্যাত মারা, রোব-সপিয়েরে ও অন্যান্য অনেকের মূর্তি গড়িয়া রাখা হইয়াছে। যে ছুরির আঘাতে ২১০০০ ব্যাক্তির মাথা কাটা পড়িয়াছিল, (লুই-১৬, মারি আঁতোয়ানেৎ ইহার অন্তর্ভুক্ত)—সেই ছুরিখানি এখানে রাখা হইয়াছে। ইহার পর অ্যালবার্ট হল, ও ক্রিস্টাল প্যালেস দেখিলাম। এটি ইংল্যাণ্ডের একটি বিস্ময়। অবশ্য নামের জন্যই ইহার খ্যাতিটা বেশি। ইহা নির্মাণে দেড় মিলিয়ন পাউণ্ড খরচ হইয়াছিল।

অনেক সাহিত্য বিষয়ক সভায় নিমন্ত্রিত হইয়াছি। 'টাইমস' অফিসেও নিমন্ত্রিত হইয়াছিলাম। ব্রিটিশ মিউজীয়াম সবারই দেখা উচিত। সাউথ কেনসিংটন মিউজীয়াম এবং কিউ-এর বটানিক্যাল গার্ডেনস দেখিবার উপযুক্ত। ব্রিটিশ মিউজীয়াম এক বিরাট সৃষ্টি। প্রথমে সার রবার্ট কটন ব্যক্তিগত ভাবে ইহা প্রতিষ্ঠিত করেন, অনেকগুলি পাণ্ডুলিপি দাখিলপত্র দিয়ে ইহার আরম্ভ, তাহার পর তাঁহার পুত্র সংগ্রহ আরও বৃদ্ধি করেন, এবং পৌত্র ১৭০০ সনে ইহা জাতিকে দান করেন। এই সংগ্রহশালাটি ১৭৩১ সনের অগ্নিকাণ্ডে দগ্ধ হইয়া যায়। এই সময়ে গভর্মেন্ট মিউজীয়ামের জন্য একটি উপযুক্ত গৃহ নির্মাণে মনোযোগী হয়। ১৭৫৩ সনের একটি আইনের বলে ব্রিটিশ মিউজীয়ামের প্রতিষ্ঠা হয়। এই প্রতিষ্ঠানে মানুষের আদি ইতিহাস যেভাবে চিত্রিত হইয়াছে, পৃথিবীর অন্য কোথাও এমন জীবন্ত ভাবে চিত্রিত হয় নাই। এই সংগ্রহশালায় বহু বিচিত্র জিনিস আছে, যাহা অনুশীলন করিতে একটি জীবন কাটিয়া যাইবার কথা। পুরাতত্ত্ব বিভাগটাই আমাদের মত প্রাচীন জাতির পক্ষে অধিক চিত্তাকর্ষক। অ্যাসিরিয়ান ও ঈজিপশিয়ান গ্যালারির কাছে এ জন্য আমার অনেক সময় কাটিল। ২৫০০ বৎসর পূর্বে কিউনিফর্ম হরফে খোদিত টেরাকোটা ট্যাবলেটের দিকে আগ্রহভরা দৃষ্টিতে চাহিয়া ছিলাম। ইহা সেই সময়ের একখানি দলিল। অ্যাসিরিয়ার রাজার কাছে দরিদ্র নাবু-বালাড-সু-ইক্বির আবেদন। তাহার বিরুদ্ধে রাষ্ট্র দ্রোহিতার অভিযোগ সে এই আবেদনে অস্বীকার করিয়াছে। আর একখানি ট্যাবলেটে একটি দাস বিক্রয়ের কাহিনী আছে দাসের নাম আবরাইল শাররাট। ৬৬৮ খ্রীষ্টপূর্ব সনের ট্যাবলেট এটি। আর একটিতে একটি হাসবুহ নাম্নী দাসী বিক্রয়ের কথা আছে। সে এবং তাহার কন্যাকে লুকুর নিকট এক মানা ও আট শেকেলের বিনিময়ে বিক্রয় করা হইয়াছে। সে যুগেও ভাই তাহার ভাইয়ের বিধবা স্ত্রীকে প্রবঞ্চিত করিত—এ যুগে যেমন করে। একটা ট্যাবলেটে আদালতে নালিশ করার বিস্তৃত বিবরণ আছে বুমানিটু তাহার শ্যালকের বিরুদ্ধে নালিশ করিয়াছিল। বাড়ি ভাড়া দেওয়া হইত, বাগান বিক্রয় করা হইত, ব্যাবিলনের নারীদের যৌতুক বিষয়ে চুক্তিপত্র রচিত হইত। ভেষজ, জ্যামিতি, অঙ্কশাস্ত্র এবং অন্যান্য বিজ্ঞান বিষয়ে রচনা রহিয়াছে। মাম্মির সংগ্রহও উল্লেখযোগ্য। একটি দেখিলাম খ্রীষ্টপূর্ব হাজার বৎসর পূর্বের আমেন-রা মন্দিরের দ্বাররক্ষকের কন্যার দেহের মাম্মি। গ্রীস এবং রোমের পুরাতাত্ত্বিক বহু নিদর্শন সংগৃহীত আছে, তবে এশিয়া সংক্রান্ত সংগ্রহ খুব বেশি নাই। ব্রিটিশ মিউ-জীয়ামের লাইব্রেরির তাকগুলি যদি পর পর রাখা যায় তাহা হইলে তাহার দৈর্ঘ্য হইবে ৪০ মাইল। বহু লোক এই মিউজীয়াম বিষয়ে কৌতূহল প্রকাশ করিতেছে, ইহা আমার খুব ভাল লাগিল। জ্ঞান বৃদ্ধি ইহাদের কাছে একটি আনন্দের কাজ, এবং শিক্ষায় যাঁহারা অগ্রসর তাঁহারা জ্ঞানলাভের উপায়কে সর্বসাধারণের সম্মুখে আনিয়া দেওয়াতে বড় তৃপ্তি পাইয়া থাকেন। এখানকার অনেক সম্পদই ব্যক্তিগত দান। আমাদের সদ্গুণের ঝোঁক অন্য। মানুষ ও দেবতা পরস্পরের সম্পর্কে এমন ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার সম্পর্ক যাহাতে মনে হয় এইবার দেবতার উচিত তাঁহাদের রুচির পরিবর্তন সাধন করা। এই আত্মনির্ভরতার যুগে তাঁহাদের কৃপণতা এবং মানুষের উপর চাপ দিয়া কিছু আদায়ের অভ্যাস ছাড়া উচিত। তাঁহাদের দেহ বায়বীয়, সেজন্য তাঁহাদের প্রতি

সমবেদনা প্রকাশ করিতে পারি, কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহাদের দেহ নির্মাণের জন্য আমরা সোনা, রূপা, এমন কি মাটিও ব্যয় করিতে সত্যই পারি না। তাঁহাদেরও উচিত, আহার, বাসস্থান, সাজপোশাক এবং অলঙ্কারের জন্য আমাদের উপর নির্ভর না করা। ইহার জন্য যে পরিমাণ অর্থ তাঁহারা গ্রহণ করেন, তাহা আমাদের দেশে স্কুল, মিউজীয়াম, বিজ্ঞান শিক্ষালয়, এবং অন্ধকারে দিশাহারা মানুষদের মনে জ্ঞানের আলো জ্বালাইবার অন্যান্য উপকরণের জন্য প্রয়োজন। যদি কৃপাপূর্বক তাঁহাদের এই দীন সন্তানদের জাতীয় বাজেট ঢালিয়া সাজিতে অনুমতি দিতেন, তাহা হইলে কৃতজ্ঞতা বশতঃ আমরা সংস্কৃত শ্লোকগুলির অর্থকে ঘুরাইয়া মুচড়াইয়া দুমড়াইয়া এমন একটি বৈজ্ঞানিক স্তরে উন্নীত করিতে পারিতাম, যাহাতে তাহা মিশনারিদের, আস্তিকদের নাস্তিকদের অথবা অজ্ঞতাবাদীদের সকল আক্রমণের বিরুদ্ধে বহু কাল আত্মরক্ষা করিতে পারিত।

ইউরোপের মিউজীয়াম-সমূহ, যেখানে পৃথিবীর নানা স্থান হইতে নৃতাত্ত্বিক নমুনা সংগ্রহ করা হইয়াছে, সেখানে দাঁড়াইলে ভারতবাসীর মনে দুঃখ ও দীনতার ভাব জাগিয়া উঠিবে। সেখানে তাহার নিজের স্থান বর্বরদের সঙ্গে। যাহারা নরখাদক, যাহারা নরবলি দেয়, ধর্মের নামে সর্বাঙ্গে উল্কি পরে, এবং অন্যান্য যে সব প্রথা বর্বর জাতির বিশেষত্ব, ভারতবাসীর স্থান তাহাদেরই সঙ্গে। ইউরোপের জাতি-সমূহ অনেক দিন আগে এই জাতীয় প্রথা ত্যাগ করিয়াছে, তাহারা এখন ইহাকে বিভীষিকার চোখে দেখে। ইহা পরিতাপের বিষয় যে, আমরা যখন ভারতবর্ষে প্রাচীন হিন্দুত্বের পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছি, একশত বৎসর আগেও যাহা ছিল, নরবলি, অঘোর পন্থার নরমাংস ভক্ষণ, বিধবা পোড়ান, এবং এই জাতীয় সব পুণ্যলাভের প্রথা ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করিতেছি, সেই সময়ে ইউরোপীয়গণ এই সব ঐহিক ও পারলৌকিক পুণ্যলাভের পদ্ধতিকে ঘৃণার চক্ষে দেখিবে। আমাদের ধর্মপ্রাণতার এই সব লক্ষণকে যে সব গভীর যুক্তি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করিতে চাই, ইউরোপীয়দের কানে তাহা পৌঁছায় না। অতএ[illegible] আমাদের কর্তব্য হইতেছে আমাদের যাবতীয় দুর্বো[illegible] শাস্ত্রগ্রন্থ লইয়া জনকত ইউরোপীয় পণ্ডিত আমাদের [illegible] উচ্চস্থানে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, সেইখানে দাঁড়াই[illegible] ইউরোপীয়দের উদ্দেশ্য-প্রণোদিত জেদকে ঘৃণার চো[illegible] দেখা এবং দেশপ্রেমিকতার সঙ্গে তাহাদের রেলওয়ে[illegible] টেলিগ্রাফ, তাহাদের বিজ্ঞান এবং তাহাদের যাবতী[illegible] শিক্ষাকে তুচ্ছ করা। আমাদের কি ঐ সব জিনিস হাজা[illegible] হাজার বৎসর পূর্বে ছিল না? সবই তো আমাদে[illegible] হাতের এই গ্রন্থগুলিতে রহিয়াছে? এবং আরও অনে[illegible] জিনিস যাহা ইউরোপ বা অ্যামেরিকায় পুনরাবিষ্কৃ[illegible] পুনরুদ্ভাবিত হইলেই আমাদের বুদ্ধি আমাদিগকে ইহ[illegible] দেখাইয়া দিবে।

আমাদের উপচিয়া পড়া জাতীয় গৌরবের সঙ্গে আর[illegible] একটি গৌরব যোগ করিয়াছি—আমরা সন্তোষজন[illegible] ভাবে এ সত্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি যে প্রাচীন মেক্সিকো[illegible] পুরোহিতদের সঙ্গে আমাদের আত্মীয়তা ছিল—সেই স[illegible] পুরোহিত যাহারা অধিকাংশ তরুণদের বলির অস্ত্রধার[illegible] হত্যা করিত এবং তাহাদের মাংস রান্না করিয়া খাইত[illegible] প্রাচীন ধর্মের এটি একটি সুন্দর অঙ্গ, এবং আমাদে[illegible] স্বদেশবাসী ইহার প্রতি বড়ই অনুরক্ত, এবং গুপ্ত সাধনা[illegible] রূপে ইহা পুনঃ প্রচলিত করিবার জন্য উন্মাদ হইয়াছে[illegible] কিন্তু হায়, আমরা এক দুর্নীতির যুগে বাস করিতেছি[illegible] স্বাধীনতা এ যুগে সহিষ্ণুতার অভাব ঘটিয়াছে। আমাদে[illegible] ধর্মের ইংরেজরা সহ্য করে এ কথা সত্য নহে। তাহার[illegible] কি অঘোরীদের পচা নরমাংস খাওয়া সহ্য করিবে? তাহাদের সকল কাজই পবিত্র কাজ। অঘোরপন্থীগ[illegible] সাধনার গভীরে পৌঁছিয়া সকল ভালমন্দ সুখ দুঃখ সুগন্ধ দুর্গন্ধকে পার হইয়া গিয়াছে। ইংরেজরা কি আমাদে[illegible] দেবীর শুষ্ক তৃষ্ণার্ত জিহ্বা খুঁতহীন বালকের রক্তে ভিজাইতে দিবে? অথবা আমাদের বিধবা ভগিনীদের আত্মাকে দ্রুত স্বর্গে প্রেরণের উদ্দেশ্যে পুড়াইয়া মারিতে দিবে? আমাদের বন্ধু ঠগদের ধর্মকে তাহারা পদদলিত করিয়াছে। এই ঠগেরা ম্যালথাসের নীতিকে কার্যকর

করিবার উদ্দেশ্যেই ত নরহত্যাকে ধর্মের অঙ্গ রূপে গ্রহণ করিয়াছিল। এ দেশ আমাদের মুসলমান বন্ধুদের ভাষায় বলা যায় দার-উল-হর্ব। ইহা এখন হিন্দুদের বাসের অযোগ্য। ইংরেজরা যখন নরবলি বন্ধ করিল, তখন হিন্দুধর্মের বৃক্ষকে পত্রহীন করিল। এবং তাহারই ফলে দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। মধ্য প্রদেশের কৃষক সম্প্রদায়ের ইহাই বিশ্বাস। কারণ ইংরেজ আসিবার পূর্বে এদেশে দুর্ভিক্ষ ছিল না। (দ্রষ্টব্য: সার হেনরি এলিয়টের আট খণ্ডে সমাপ্ত ইতিহাস, বিশেষ করিয়া মুসলমান ঐতিহাসিকের যে অংশ তাহার অন্তর্ভুক্ত।) ইংরেজরা যখন সতীদাহ উচ্ছেদ করিল, তখন হিন্দুধর্মের বৃক্ষকে শাখাহীন করিল। যখন তাহারা কলিকাতায় জলের কল স্থাপন করিল, তখন হিন্দু ধর্মের বৃক্ষকেই ছেদন করিল। আমরা এ সবের বিরুদ্ধে যথাসাধ্য আন্দোলন করিয়াছিলাম। প্রত্যেকটি প্রশ্নকেই আমরা জাতীয় প্রশ্ন করিয়া তুলিয়াছিলাম। আমরা সভা করিয়া প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছি সতীদাহ উচ্ছেদের বিরুদ্ধে, বিদ্যালয় স্থাপনের বিরুদ্ধে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছি, জলকল স্থাপনের বিরুদ্ধে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছি। রামমোহন রায়, মহেন্দ্রলাল সরকার, মালাবারী, এবং বম্বাইতে যাহারা কাপড়ের কল স্থাপন করিয়াছে, এই রকম কয়েকজন দলত্যাগী না থাকিলে, আমাদের নাম চিরপবিত্র থাকিতে পারিত, কারণ সতীদাহ উচ্ছেদ প্রাপ্ত হইলে আমাদের কেহ দোষ দিতে পারিত না, দোষ সম্পূর্ণ ইংরেজের হইত।

কিন্তু বিদ্রূপ থাক। এমন গুরুতর চিন্তার সময় আসিয়াছে। এখন আমাদের বিশ্বের জাতি-সমূহে সত্য স্থান কোথায়। কল্পনা অথবা অলীক স্বপ্ন দেখার দিন আর নাই। কয়েক হাজার বৎসর পূর্বে আমরা কি ছিলাম, তাহার কোনও মূল্য এখন নাই। এমন কি আমরা যদি ধরিয়া লই তখন মহৎ এবং সৎ ছিলাম, তাহা হইলেও তাহার এখন কোনও মূল্য নাই। আমাদের গ্রন্থে উল্লেখিত মহানিম্ব বর্তমানের সিঙ্কোনা অফিসিনালিজ একই বস্তু কি না ইহাতে কিছুই আসিয়া যায় না। কিংবা কুরুক্ষেত্র অন্তকার রাশিয়া, অথবা ঈজিপট এবং মেক্সিকোতে ভারত উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল, ইহা ভাবিয়াও কোনও লাভ নাই। কিন্তু আজ আমরা কি, ইহা চিন্তা করার সার্থকতা আছে। কারণ তাহা দ্বারাই পৃথিবী আজ আমাদের বিচার করিবে আমরা কি ছিলাম তাহা দিয়া নহে। একজন পুরাতত্ত্ব-বিদ্ বা একজন সংস্কৃতের পণ্ডিত আমাদের বিষয়ে কৌতূহলী হইতে পারে, কিন্তু ইউরোপের প্রত্যেকটি পুরুষ বা নারী পুরাতাত্ত্বিক অথবা সংস্কৃতে পণ্ডিত নহে। সত্য কথা বলিতে কি, কয়েক হাজার বৎসর পূর্বে যাযাবর জাতি পঞ্জাবের সমতল ভূমিতে যে গান গাহিত তাহা জানিয়া পৃথিবী স্তম্ভিত হইয়া যায় নাই। দূরের পৃথিবী আমাদের দেশে কন্ধ এবং ব্রাহ্মণে কি তফাৎ তাহা জানে না, একজন জৈন ও একজান মুসলমানে কি তফাৎ তাহা জানে না। অতএব জৈন জীববলির নিন্দা অথবা মুসলমান সতীদাহ প্রথার নিন্দা করিলে তাহাদের কানে তাহা পৌঁছায় না। সবাই মিলিতভাবে বড় কিছু করিলে তাহাদ্বারা আমাদের বিচার হইবে। আমাদের প্রাচীন সভ্যতা এখন অচল হইয়া পড়িয়াছে, এবং সচল থাকিতে পারিত যদি তিন শত বৎসর আগের ইউরোপ আজ বর্তমান থাকিত। এমন কি আমার মতে পঞ্চাশ বৎসর পূর্বেও দুই জাতির দূরত্ব খুব বেশি ছিল না। গত পঞ্চাশ বৎসরে যে সব আবিষ্কার ঘটিয়াছে, আমাদিগকে তাহা একটি বিশেষ ধর্ম ও দর্শনের সীমার মধ্যে আনিয়া দিয়াছে, এবং যাহা সকল যুগের মানুষ তাহাদের বিবেককে তৃপ্ত করিবার জন্য হীনতর জাতি-সমূহের জন্য মাঝে মাঝে রচনা করিয়া থাকে। মানুষ স্বার্থ দ্বারা চালিত হইয়া থাকে, এবং স্বার্থ যিনি বুদ্ধি এবং কার্যকারী ভিত্তির উপর স্থাপন করিতে পারেন, তাঁহাকেই নেতা বলিয়া মানা যাইতে পারে। তিনি বিদ্বান্ হইতে পারেন, ধার্মিক হইতে পারেন, শক্তিশালী হইতে পারেন। কোথাও তুমি অতীতের জন্য করুণা অথবা সম্মান পাইবে না, শুধু আবেগপ্রবণ মানুষ তাহা করিতে পারে। এই আবেগ জন্মগত,

কাহারও শিক্ষা হেতু নহে। পরম নিষ্ঠাবান্ খ্রীষ্টানও তাহার বিবেকের সম্মতিক্রমে কৃষ্ণাঙ্গের উপর প্রবল অত্যাচার করিতে পারে, যদি সে ইহা প্রমান করিতে পারে যে সে হ্যামের বংশধর। প্রবল যুক্তিনিষ্ঠ মানুষও পৃথিবীর সর্বত্র আগুন ও তরবারি লইয়া লুণ্ঠন, হত্যা, অগ্নিসংযোগ প্রভৃতি করিয়া নিজের নীতিধর্মকে খুশি রাখিতে পারে, কারণ সে ইহা করিতেছে প্রকৃতিকে তাহার অগ্রগমনে সাহায্য করিবার জন্য, ধ্বংস পুনর্গঠনের জন্য। এবং প্রবল এবং দেশপ্রেমিক ধর্ম ও ন্যায়পরায়ণতাকে নস্যাৎ করিয়া নিজের লাভ ও গৌরব অর্জনের জন্য বাহির হইতে পারে। ইহাই পৃথিবীর রূপ এবং চিরকাল ইহাই ঘটিয়াছে। অতএব আমাদের উচিত আত্মানুসন্ধান করিয়া আমাদের ত্রুটি কোথায় তাহা বাহির করা, এবং যদি আমরা পৃথিবীর সম্মান লাভ করিতে চাহি তাহা হইলে তাহা সংশোধন করা। তাহা যদি না পারি, তাহা হইলে বর্বরদের সমশ্রেণীভুক্ত হওয়া ভিন্ন উপায় কি?

সাউথ কেনসিংটন মিউজীয়ামে শিল্প-নিদর্শন-সমূহ রক্ষিত হইয়াছে। স্থানটিতে নানা মনুমেণ্ট, বিজয়-তোরণ, স্থাপত্য ডিজাইনের প্লাস্টার কাস্ট ও স্ট্যাচু রহিয়াছে। মূল ট্রাজানের স্তম্ভের প্লাস্টার কাস্ট রহিয়াছে। নানা জাতীয় পাত্র, হাতীর দাঁতের কাজ, ব্রঞ্জ, সোনা, রূপা, কাঠ ও অন্যান্য নানা হস্তশিল্প পৃথিবীর নানা স্থান হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। এই সব সংগ্রহের মধ্যে চারিটি চাইনীজ-ভিলা রহিয়াছে। এগুলি চীন-সম্রাট নেপোলিয়ানের প্রথমা স্ত্রী জোসেফিনকে উপহার স্বরূপ পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু যে জাহাজে আসিতেছিল তাহা পথিমধ্যে একখানা ব্রিটিশ যুদ্ধজাহাজ কর্তৃক আটক হয়। আমিয়ঁার সন্ধির (১৮০২) পরে ব্রিটেন ইহা ফ্রান্সকে ফিরাইয়া দিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু ফ্রান্স উহা লইতে অস্বীকার করে। এই মিউজীয়ামের একটি বিভাগে ভারতীয় ধাতু শিল্পের অনেক নিদর্শন রক্ষিত আছে। কিউতে অবস্থিত বটানিক্যাল গার্ডনস্ অপূর্ব। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সকল দেশের উদ্ভিদ এখানে দেখা যাইবে।

ডিসেম্বর মাস আসিয়া পড়িয়াছে। পথে ঘাটে তুষারপাত আরম্ভ হইয়াছে, দিন হ্রস্ব হইয়াছে। আমারও ইংল্যাণ্ড হইতে বিদায় লইবার সময় আসিয়া পড়িয়াছে। আট মাসের মধ্যে আমি সেখানে যত জিনিস দেখিলাম, তাহা কোনো ভারতীয় তাহার নিজের দেশে বাস করিয়া সমস্ত জীবন ধরিয়াও দেখিতে পারে না। ইংল্যাণ্ডের পরিমণ্ডলে এমন কিছু আছে যাহা দৃষ্টি খুলিয়া দেয় এবং মন প্রসারিত করে। আমরা এখানে যে সব বিশেষ সুবিধা পাইয়াছিলাম, তাহা ছাত্র অথবা টুরিস্টদের পক্ষে পাওয়া সম্ভব নহে। উচ্চ অথবা নিম্ন সকল শ্রেণীর ইংরেজ এবং সম্রাজ্ঞী ভিকটোরিয়া হইতে মিডল্যাণ্ডের কৃষকগণ পর্যন্ত আমাদিগকে আন্তরিক ভাবে খাতির করিয়াছিলেন। প্রীতি ও কৃতজ্ঞতার সহিত তাহা আজীবন স্মরণ করিব।

আমি ১৩ই ডিসেম্বর হল্যাণ্ডের রটারডাম অভিমুখে যাত্রা করিলাম।

ক্রমশঃ

ওলিম্পিকের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় ক্রীড়ামানের পর্য্যালোচনা

রবীন্দ্রনাথ ভট্ট

অসম্ভব রকমের বাধা-বিপত্তির মধ্যেও মহা-সমারোহের সহিত ওলিম্পিক অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘটল। ভারত আজ বিশ্বসভায় তেমন কিছু মনোমুগ্ধকর কলাকৌশল প্রদর্শনে সমর্থ হয় নি। তাই আজ আমাদের আত্ম-সমীক্ষার প্রয়োজন আছে। আজ আমাদের আত্ম-সমালোচনার দিন এসেছে।

বিংশতি ওলিম্পিক অনুষ্ঠানে আরম্ভ হওয়ার কিছুদিন আগে বিশ্বের ওলিম্পিক সংস্থার সভাপতি মিঃ এ্যাভেরী ব্রাণ্ডেজ বলেছিলেন—

"It is surprising that a vast country like India with such a vast population cannot do anything in the Olympic Games. Perhaps there are some mistakes somewhere."

উক্তিটির সত্যতার কথা চিন্তা করতে গেলে আমাদের আর একজন জগৎবরেণ্য মনীষীর উক্তিকে স্মরণ করতে হবে। তিনি হলেন বিশ্ব ওলিম্পিক ক্রীড়ার প্রবর্তক জগদ্বিখ্যাত ক্রীড়ানুরাগী Barron-De-Pierre Cubertin। ক্রীড়া বিষয়ে কোন কিছু মন্তব্য করতে গিয়ে তিনি একবার বলেছিলেন—"That playing of games should from an integral part of education and a way of adult life, if either or both are to achieve full value." কথাটি একটু চিন্তা করলেই আমরা বুঝতে পারব, সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থার সহিত ক্রীড়া শিক্ষাকেও যুক্ত করে যদি আমরা বাল্যকাল থেকেই এই যৌথ সাধনায় মনোযোগ দিই তবেই আমরা ভবিষ্যতে উন্নত ক্রীড়ামানের পরিচয় রাখে সমর্থ হব। আজকাল ক্রীড়া জগতে একটি কথার খুবই প্রচলন হয়েছে—"catch them young।" আমার মনে হয় বাক্যটিতে আরও একটি কথার সংযুক্তির প্রয়োজন আছে। বাক্যটি হওয়া উচিত "catch them young en masse," অর্থাৎ ছোটদের দলবদ্ধভাবে পাকড়াও করো।

এবারকার ওলিম্পিকে জাতিগত সাফল্যের কথা চিন্তা করলে প্রথমেই আমাদের মনে হবে জার্মাণ জাতির সাফল্যের কথা। পদক প্রাপ্তির খতিয়ান বিচার করলে আমরা বুঝতে পারব এই অলিম্পিকে রাশিয়া অথবা আমেরিকা বিশ্বজয় করে নি। বিশ্বজয় করেছে জার্মানীর পূর্ব এবং পশ্চিম ভাগের মিলিত জাতীয় ক্রীড়াদল।

তাদের এই সাফল্যের অন্তর্নিহিত সত্যটির প্রতি যদি আমরা দৃষ্টি নিবদ্ধ করি তবে আমরা দেখতে পাব জার্মান জাতি এই যুদ্ধোত্তর সময়টিতে "catch them young en masse." পদ্ধতি অবলম্বন করেছে।

ভবিষ্যতের যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্রীড়া-মানসিকতা গড়ে তোলার জন্য জার্মান শিক্ষা মন্ত্রক (Education

department), দেশের ক্রীড়া-সংস্থা-সমূহ (clubs) এবং শ্রমিক-সঙ্ঘগুলির (Trade Unions) সহায়তায় শিশু এবং কিশোরদের জন্য দলবদ্ধভাবে 'Spartakiad,' আন্দোলনের প্রবর্তন করেছেন। তাঁদের মতে, স্কুল. ক্রীড়া-সংস্থা এবং শ্রমিক-সঙ্ঘগুলির মিলিত প্রচেষ্টা ব্যতীত পূর্ব জার্মান সরকার কখনই এত অধিক সংখ্যক কিশোর কিশোরীকে এই আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট করতে পারতেন না।

১৯৬৫ সালের প্রথম "Spartakiad" আন্দোলনের পর থেকে এই অনুষ্ঠানে যোগদানকারী প্রতিযোগীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় তিরিশ লক্ষ। ক্রীড়া আন্দোলনের জন্য সংখ্যাটি কখনই উপেক্ষণীয় নয়।

বিষয়টি ভালভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে হলে আমাদের জানতে হবে "Spartakiad" আন্দোলনটি কি? "Spartakiad" হচ্ছে ওলিম্পিক আদর্শের অনুকরণে একটি প্রগতিশীল প্রতিযোগিতামূলক ক্রীড়া আন্দোলন। এই আন্দোলনের শুরু হয় স্কুল এবং স্থানীয় ক্রীড়া-সংস্থাগুলি থেকে। এই স্থানে স্বীকৃতি পেলেই প্রতিযোগীরা জেলা (district) এবং প্রদেশ (county) 'Spartakiads' এ যোগদানের অনুমতি পান। জেলা এবং প্রদেশ "Spartakiad"এর নির্বাচিত কিশোর প্রতিনিধিগণই অতঃপর কেন্দ্রীয় শিশু এবং কিশোর "Spartakiad" প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হওয়ার অধিকার পান।

এই কেন্দ্রীয় "Spartakiad" প্রতিযোগিতা প্রতি দুই বৎসর অন্তর পূর্ব জার্মানীর রাজধানী বার্লিনে অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৭০ সালে এই প্রতিযোগিতায় প্রায় ১১০০০ হাজার বালক-বালিকা প্রায় উনিশটি বিভিন্ন ক্রীড়া বিভাগের প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেছিল। প্রায় এক হাজার জন শিক্ষক এবং উপদেষ্টা প্রতিযোগীদের যথাযথ উপদেশ দেওয়ার জন্য ক্রীড়াস্থলে উপস্থিত ছিলেন। প্রতিযোগিতা পরিচালনার জন্য প্রায় বারশো রেফারী এবং বিচারককে এই স্থানে সদা ব্যস্ত অবস্থায় দেখা গিয়েছিল।

শোনা যায় জার্মানীর এই Spartakiad আন্দোলন থেকেই বাহির হয় ভবিষ্যতের জাতীয় চ্যাম্পিয়ন, ওলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন অথবা বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন। এদের মতে কৃতিত্বধারী ক্রীড়াবিদ্ তৈয়ারী করার জন্য ক্রীড়াবিদ্‌দের সংখ্যাধিক্যের মধ্য থেকেই প্রকৃত গুণ সমন্বিত উপযুক্ত ক্রীড়াবিদ্ অন্বেষণ করা উচিত (In search of good athletes question of quantity comes first and then quality comes automatically)। মনে হয় উন্নত মানের ক্রীড়াবিদ্ অন্বেষণের জন্য 'Spartakiad' অনুষ্ঠানের ন্যায় ক্রীড়ানুষ্ঠানের প্রয়োজন আমাদের দেশেও আছে।

ওলিম্পিক ক্রীড়ায় অসাফল্যের হেতু সম্বন্ধে আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করাটাও বোধ হয় এখানে খুব অযৌক্তিক হবে না। আমরা সাধারণতঃ আন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার জন্য দলগত প্রতিযোগিতা, যথা ফুটবল, হকি, ক্রিকেট প্রভৃতি খেলাগুলির প্রতিই অধিক মনঃসংযোগ করি। আমরা ব্যক্তি-প্রাধান্যের প্রতিযোগিতাগুলির (Individual Contests) প্রতি যেন একটু বেশী রকম উদাসীন।

অবশ্য এ কথা আমাদের স্বীকার করতেই হবে, দলগত প্রতিযোগিতাগুলির উন্নতির জন্য আমাদের আরও উন্নততর প্রচেষ্টার প্রয়োজন। তা হলেও কিন্তু ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য প্রতিযোগিতা যথা কুস্তী, বক্সিং প্রভৃতি ক্রীড়াগুলির প্রতিও আমাদের যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজন আছে।

এ বিষয়ে প্রথমেই মনে হবে আমাদের কুস্তির কথা। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলছি ১৯৪৮ সালের ওলিম্পিক কুস্তিগীর দলের কে. ডি. যাদব খুব ভাল ক্রীড়ামান প্রদর্শন করা সত্ত্বেও অতি অল্পের জন্য পদক প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হন। তাঁকে যে প্রতিদ্বন্দ্বী পরাস্ত করেছিলেন তিনি পদক প্রাপ্তির কৃতিত্ব প্রদর্শনে সমর্থ হয়েছিলেন। শোনা যায় উক্ত প্রতিদ্বন্দ্বীর নিকট পরাজয়ের বিষয় নিয়ে বিচারক ও দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে তখন প্রভূত মতভেদ দেখা গিয়েছিল এবং নেহাৎই বরাতের ফেরে যাদবকে পরাজয় বরণ করতে হয়।

এর পরবর্তী ওলিম্পিক হেলসিঙ্কিতে যাদব কিন্তু স্বীয় প্রতিভাবলে ভারতের পক্ষে সর্বপ্রথম কুস্তিতে একটি পদক সংগ্রহে সমর্থ হয়েছিলেন।

এবারের অলিম্পিকেও আমাদের দুজন কুস্তিগীর প্রেমনাথ ও সুদেশকুমার অসামান্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করেও কিন্তু অতি অল্পের জন্য পদক প্রাপ্তির সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়েছেন।

মনে হয় এই বিভাগটির জন্যও আমাদের যথোপযুক্ত কোচিং, ট্রেনিং এবং উন্নত মানের ক্রীড়াবিদের অনুসন্ধানের প্রয়োজন আছে।

বক্সিং প্রতিযোগিতা সম্বন্ধেও বোধ হয় ঐ একই উক্তি প্রযোজ্য হতে পারে। ১৯৪৮ সালের ওলিম্পিকে প্রথম ভারতীয় মুষ্টিযুদ্ধ দল লণ্ডনে প্রেরিত হয়। ওলিম্পিক সম্পর্কে অনভিজ্ঞ এই প্রতিযোগী দলের কয়েকজন, যথা, বাবুলাল, জনি নাটাল প্রভৃতি মুষ্টিযোদ্ধাগণ পরাজিত হওয়া সত্ত্বেও এই ক্রীড়ায় যথেষ্ট উন্নত মানের পরিচয় দিয়েছিলেন। তাঁরা সেদিন আন্তর্জাতিক ক্রীড়াক্ষেত্রেও ভারতীয় মান সম্বন্ধে জন মানসে খানিকটা রেখাপাত করতেও সমর্থ হয়েছিলেন। সেদিন এই সকল ভারতীয় প্রতিযোগীরা পরাজিত হলেও তাঁদের সেই পরাজয় সম্বন্ধে দর্শকদের মধ্যে তখন প্রবল মতভেদ দেখা গিয়েছিল। এ কথাও সত্যি, ভারত যাঁদের নিকট পরাজিত হয়েছিল তাঁদের মধ্যে অনেকেই উক্ত অলিম্পিকে কৃতিত্ব প্রদর্শনে সমর্থ হয়েছিলেন। এই থেকেই প্রমাণিত হয় ভারতীয় মান খুব নিকৃষ্ট নয়।

এর পরবর্তী অধ্যায়ে পদম বাহাদুর মল এবং আরও কয়েকজন মুষ্টিযোদ্ধার মুষ্টিযুদ্ধ মান যে আন্তর্জাতিক মানের সমতুল্য সে বিষয়ে কোন সন্দেহেরই অবকাশ থাকে না। এবারকার ওলিম্পিকেও মুনি স্বামী ভেনুর সম্বন্ধে ঐ একই উক্তি প্রযুক্ত হতে পারে।

ভারোত্তলন প্রতিযোগিতাতেও ভারতীয় মান খুব একটা নিকৃষ্ট ধরণের নয়। এবারকার ওলিম্পিকের ভারতীয় ভারোত্তলক শ্রীঅনিল মণ্ডলের ক্রীড়ামানও খুব একটা নিম্নস্তরের ছিল বলে মনে হয় না।

এ্যাথলেটিক্‌সের কথা উপস্থিত হলে প্রথমেই আমাদের মনে হবে হেনরী রেবোলোর কথা। Hop, Step and Jump এর তৎকালীন জাতীয় চ্যাম্পিয়ন এই ক্রীড়াবিদের ক্রীড়ামান বিশ্ব-ক্রীড়ামান সমতুল্য ছিল বলেই স্বীকৃত হয়েছিল সেদিন। ১৯৪৮ সালের ওলিম্পিক প্রতিযোগিতায় প্রতিযোগিতাকালীন সময়ে পায়ের পেশী সঙ্কোচন জনিত ক্রীড়াঘাতের জন্যই সম্ভবতঃ তিনি পদক অর্জন থেকে বঞ্চিত হন।

১৯৬০ সালে আমাদের ওলিম্পিক প্রতিনিধি মিলখা সিং রোম ওলিম্পিকের ৪০০ মিটার দৌড়ে ব্যর্থমনোরথ হলেও তিনি উক্ত বিভাগে জগতের শ্রেষ্ঠ দৌড়বীরদের মধ্যে একজন বলে স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন।

উপরোক্ত দৃষ্টান্ত-গুলি যদি উপযুক্ত রূপে পর্য্যালোচনা করা যায় তবে আমরা বুঝতে পারব, উপযুক্ত শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের দ্বারা আমাদের দেশেও বিশ্ব-ক্রীড়ামান পর্য্যায়ের ক্রীড়াবিদ্ পাওয়া সম্ভবপর হতে পারে। প্রকৃত প্রতিভা সম্পন্ন ক্রীড়াবিদের জন্য আমাদের প্রয়োজন বহুর মধ্যে অনুসন্ধান। আর এই জন্যই প্রয়োজন খুব সাধারণের মধ্যে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার বহুল প্রচলন। যুবকগণের মধ্যে ক্রীড়া-মানসিকতা বিস্তারের জন্য আমাদের দেশেও ওলিম্পিক আদর্শের অনুকরণে ক্রীড়া আন্দোলনের প্রয়োজন আছে। এই আন্দোলন শুধুমাত্র নগর-ভিত্তিক ক্রীড়া আন্দোলন হলে চলবে না। এই আন্দোলনকে নগর ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে দিতে হবে সুদূর গ্রাম হতে গ্রামান্তরে। আমাদের এই আন্দোলন শুরু হওয়া উচিত গ্রাম ও ব্লক ভিত্তিক ক্রীড়া অনুষ্ঠানের দ্বারা। এই সকল গ্রাম ও ব্লকের নির্বাচিত কৃতী প্রতিযোগীগণ জেলা ক্রীড়া অনুষ্ঠানে যোগদানের অনুমতি পাবেন। জেলা ক্রীড়া অনুষ্ঠানের কৃতী প্রতিযোগীগণ অতঃপর শহর ক্রীড়ানুষ্ঠানে যোগদানের জন্য অধিকার পাবেন। এই সকল

শহর ক্রীড়ানুষ্ঠানে যাহারা পারদর্শিতা প্রদর্শনে সমর্থ হবেন তাঁরাই কেবল জাতীয় ক্রীড়া-প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণের অধিকার পাবেন। এই উপায়েই বহুর মধ্য থেকে নির্বাচিত জাতীয় চ্যাম্পিয়নদের মধ্যেই হয়ত আমরা আগামী দিনের ওলিম্পিক চ্যাম্পিয়নের সন্ধান পেতে পারি।

শোনা যায় ভারতবর্ষে মোট ৫৬৬৮৭৮টি গ্রাম এবং ২৯৫১টি শহর আছে। অর্থাৎ ভারতে প্রায় ছয় লক্ষ গ্রাম এবং তিন হাজার শহর আছে। উপরোক্ত পদ্ধতিতে এই ক্রীড়া আন্দোলন সংগঠনের দ্বারা আমরা যদি প্রতি গ্রাম পিছু ১০ জন মাত্র উপযুক্ত ক্রীড়াবিদ্‌কে খুঁজে বার করতে পারি তবে এই আন্দোলনে আমরা সর্বসমেত ৬০ লক্ষ (৬ লক্ষ গ্রাম × ১০ জন) প্রতিযোগীকে অংশ গ্রহণ করতে দেখতে পাব। এইরূপে প্রাথমিক পর্য্যায়ের ক্রীড়ানুষ্ঠানগুলির অবসানের পর যদি আমরা শহর পিছু দশ জন মাত্র প্রতিযোগীকে সর্ব-ভারতীয় ক্রীড়ার জন্ম নিবাচন করি তবে জাতীয় প্রতিযোগিতায় জন্ম আমাদের প্রতিযোগীর সংখ্যা হবে প্রায় ত্রিরিশ হাজার (তিন হাজার ১০ জন)।

মনে হয় পূর্ব জার্মাণীর Spartakiad আন্দোলনের ন্তায় ক্রীড়ানুষ্ঠানের দ্বারা যদি আমরা সকল দলগত (Team Contests) এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের প্রতিযোগিতা-গুলির (Individual Contests) প্রতি যথোপযুক্ত দৃষ্টি দান করি তবে আমাদের দেশেও উন্নত ক্রীড়ামানের ক্রীড়াবিদ্ পাওয়া সম্ভব হলেও হতে পারে। এই পদ্ধতি অবলম্বনের দ্বারা ভবিষ্যতে ভারতও হয়ত কোনদিন ওলিম্পিকের কোন বিশেষ প্রতিযোগিতায় একাধিক বিভাগে একাধিক পদক অর্জন করতে সমর্থ হতে পারে।

এই প্রসঙ্গে আমরা যদি নিচের দেওয়া ওলিম্পিক তালিকায় পদকের খতিয়ানটি ভালভাবে লক্ষ্য করি তবে আমরা দেখতে পাব ওলিম্পিকে অংশগ্রহণকারী ১২২টি রাষ্ট্রের মধ্যে মাত্র ৪৬টি রাষ্ট্র পদক অর্জনে সমর্থ হয়েছে। বাকী ৭৬টি রাষ্ট্রের ভাগ্যে একটিও পদক লাভ করা সম্ভব হয় নি। আমরা জানি ওলিম্পিক প্রদত্ত ১১০৯টি পদকের মধ্যে অধিকাংশই জগতের কয়েকটি শ্রেষ্ঠ দেশ যথা জার্মাণী (৬৬+৪০), রাশিয়া (৯৯), আমেরিকা (৯৪) এবং জাপান (২৯) প্রভৃতি রাজ্যই জয় করে নিয়েছে। আফ্রো-এশিয়ার উন্নতিশীল রাষ্ট্রগুলি কিন্তু তেমন সাফল্য লাভ করতে পারেন নি। এই সকল কথা বিচার করলে আমাদের মনে হবে ওলিম্পিকের এই অসাফল্যের জন্ম আমাদের লজ্জিত হবার কোন কারণ নেই। উন্নত মানের ক্রীড়ার জন্ম এখনও আমাদের চেষ্টার প্রয়োজন আছে। এই জন্মই যুব-সাধারণের মধ্যে ক্রীড়া মানসিকতা গড়ে তোলার প্রয়োজন আছে। প্রয়োজন আছে ছাত্রদের মধ্যে খেলাধুলা আকর্ষক করে তোলার।

আমাদের দেশে প্রয়োজন এখন ওলিম্পিক আদর্শের অনুকরণে সারা ভারতবর্ষ ব্যাপী অনুরূপ এক ক্রীড়া আন্দোলন। এই ক্রীড়া আন্দোলন শুধুমাত্র নগর-ভিত্তিক ক্রীড়া আন্দোলন হলে চলবে না; এই আন্দোলন হওয়া উচিত গ্রাম-ভিত্তিক, জেলা-ভিত্তিক এবং নগর-ভিত্তিক সামগ্রিক এক ক্রীড়া আন্দোলন।

মিউনিখ অলিম্পিকের পদক প্রাপ্তির তালিকা দেখিলে দেখা যাইবে যে ৪৭টি পদক প্রাপ্ত দেশের মধ্যে মোট ৫৯১টি পদক ভাগ হইয়াছিল। ইহার মধ্যে ১৪টি দেশ পাইয়াছিল ৫০৪টি পদক। ১১টি দেশ পাইয়াছিল একটি করিয়া পদক। ভারতের স্থান ছিল ইহাদের মধ্যে। ৬টি দেশ ২টি করিয়া, ৪টি দেশ ৩টি করিয়া, ৭টি দেশ ৪টি, ৫টি দেশ ৫টি করিয়া ৩টি দেশ ৮টি করিয়া এবং ১টি দেশ ৯টি পদক পাইয়াছিল। বহুসংখ্যক দেশ একটিও পদক পায় নাই।

মিউনিখ অলিম্পিকে পদক প্রাপ্তির খতিয়ান

দেশ	স্বর্ণ	রৌপ্য	ব্রোঞ্জ	মোট
রাশিয়া	৫০	২৭	২২	৯৯
আমেরিকা	৩৩	৩১	৩০	৯৪
পূর্ব জার্মাণী	২০	২৩	২৩	৬৬
পশ্চিম জার্মাণী	১৩	১১	১৬	৪০
জাপান	১৩	৮	৮	২৯

অষ্ট্রেলিয়া	৮	৭	২	১৭	সুইটজারল্যাণ্ড	০	৩	০	৩
পোল্যাণ্ড	৭	৫	১০	২২	কানাডা	০	২	৩	৫
হাঙ্গেরী	৬	১৩	১৫	৩৫	ইরাণ	০	২	১	৩
বুলগেরিয়া	৬	১০	৫	২১	বেলজিয়াম	০	২	০	২
ইতালী	৪	৩	১০	১৮	গ্রীস	০	২	০	২
সুইডেন	৩	৬	৬	১৬	অষ্ট্রিয়া	০	১	২	৩
ব্রিটেন	৪	৫	৯	১৮	কলাম্বিয়া	৯	১	২	৩
রুমানিয়া	৩	৬	৭	১৬	লেবানন	০	১	০	১
কিউবা	৩	১	৪	৮	মঙ্গোলিয়া	০	১	০	১
ফিনল্যাণ্ড	৩	১	৪	৮	তুর্কি	০	১	০	১
হল্যাণ্ড	৩	১	১	৫	আরজেনটিনা	০	১	০	১
ফ্রান্স	২	৪	৭	১৩	টিউনিসিয়া	০	১	০	১
চেকোশ্লোভাকিয়া	২	৪	২	৮	পাকিস্তান	০	১	০	১
কেনিয়া	২	৩	৪	৯	মেক্সিকো	০	১	০	১
যুগোশ্লাভিয়া	২	১	২	৫	নাইজিরিয়া	০	০	২	২
নরওয়ে	২	১	১	৪	ব্রেজিল	০	০	২	২
দক্ষিণ কোরিয়া	১	১	৩	৫	স্পেন	০	০	২	২
নিউজিল্যাণ্ড	১	১	৩	৫	ইথিওপিয়া	০	০	২	২
উগাণ্ডা	১	১	০	২	জামাইকা	০	০	১	১
ডেনমার্ক	১	০	০	১	ঘানা	০	০	১	১
					ভারত	০	০	১	১

মহামায়া

শ্রীদিলীপকুমার রায়

এ কী মায়া অপরূপ তোমার মায়াবী এ-ভুবনে ;
স্মরণে রাখিলে যাঁরে মুক্তি লভি, তাঁরে ক্ষণে ক্ষণে
যাই ভুলে—মনে আসে কত শত চিন্তা বিশৃঙ্খল
বিপথে যে আনে নিত্য নিভায়ে তোমার সমুজ্জ্বল
স্মৃতির প্রদীপ স্নিগ্ধ, আনন্দের প্রতিবেশী যারা,
দেয় যারা পথের পাথেয় মধুস্পর্শে আত্মহারা
করি' তব জ্যোতির্ময় নির্ঝরণে। জানি যেথা নাই
আশার আশ্রয়, নাই ভরসার জ্যোতি, তবু চাই
তারেই বরিতে, ভুলি' তোমার করুণা চিরন্তনী
যার ক্ষণ রাগে মনে উচ্ছলিয়া ওঠে কলধ্বনি'
নূপুর তোমার বেসুরা বেতালে, অমৃতের স্বাদ
বিস্বাদের কোলাহলে, অন্ধকারে আলোর প্রসাদ
যার ক্ষণরঙ্গ রাস ফুলঝুরি ঝরায়ে বিলীন
হয় পরক্ষণে, যারা প্রতিশ্রুতি ভাঙে প্রতিদিন
নিত্যানন্দ বিলাসের তারা হয় আদৃত অতিথি,
আর যারা ক্লান্তি বহি' আনে, কবে পথভ্রান্ত নিতি
তাদেরি জনতা রোল করে প্রাণ বরণ এ-কোন্
মায়ায় তোমার বন্ধু ?—এই অনর্থক উচ্ছলন
কথা কথা কথার—য্যদের নাই কোনো সার্থকতা
যারা শুধু স্নায়ুর প্রণালীপথে আনে দুঃখ ব্যথা
তারা হয় নিত্য সাথী ?—আর তুমি—কৃপাবরে যার
বিরস জীবনে 'লে অনাবিল সুধার ঝঙ্কার,
যার শ্রীচরণধ্বনি-ভূষিত ত্রিলোক; যার হাসি
তৃণে ফুলে কাননের লতার মর্মরে কলোল্লাস'
ওঠে নিত্য—সেই থাকে অন্তরালে। কেন ?
তুমি শুনি'
হাসো বুঝি, জানো তুমি এ-বিশ্বের মধুর ফাল্গুনী
তোমার বসন্ত রাগ অন্তিমে উঠিবে উৎসারিয়া
যেদিন চাহিবে তারে সঙ্গীত-তৃষিত মর্ত্য হিয়া
বেসুরা কোলাহলের শ্রীহীন ঘর্ঘর পরিহার'
মোহিনী মায়ার তব দুঃখদাহ বেষ্টনী উত্তরি'।
গভীর করিতে তাই সুধাতৃষ্ণা আনো তুমি নাথ
গরলের তাপ, নিরানন্দের অতল অবসাদ,
কৃপণেরে করো লুব্ধ ধন তরে, বুঝি তারি মনে
জাগাতে অতৃপ্তি—এই বৈরাগ্য বিলাস উচ্ছলনে।
আলো ছায়া সুর বেসুরার দ্বন্দ্বপথে অচিন্তিত
ছন্দে হয় ধীরে ধীরে নিবিড় তোমার অনিন্দিত
পরম মিলন সুধা—বাধা অকারণ আনো না তো
কাঁটারে করিতে জয় তুমি গোলাপের মালা গাঁথো।
আজ তাই চাই—যেন প্রতি দুঃখ ব্যথা নিরাশার
মাঝারেও সাধি বন্ধু তোমার দীক্ষার এ-ঝঙ্কার :
"যা কিছুই বোনে জাল সংশয়ের— তোমার কৃপায়
সব পারি যেন দিতে বিদায় লভিতে ঠাঁই পায়
তোমার অন্তিম লগ্নে—মন মুখ এক করি' পারি
গাহিতে যেন তোমার শরণের রাগিণী কাণ্ডারী
রুক্ষা বেদনারো বুকে পারি যেন বরিতে তোমার
ইচ্ছারে মাথায় ধরি— দাও সাড়া এই প্রার্থনায়।

জীবন-সন্ধ্যায়

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

ভগ্নউরু আমি—বন্দী শয্যায়।
আঁধারে কাঁদি শিশু! কোথায় আলো হায়!
ভেঙেছে বাসা ঝড়ে! বিজন প্রান্তরে
শ্রান্ত পথচারী চলেছি সন্ধ্যায়!

আমাকে পাকে পাকে জড়িয়ে ছিল যারা—
শ্যামল বনভূমি, পুষ্প-শশী-তারা!
সোনালি রোদ্দুর! শিশির-বিন্দুর
মুকুরে কোহিনুর ঝলকে! কই তারা?

সবই যে ফুলঝুরি। জলের ভুরভুরি।
কোন্ সে পাগলের গল্প গাঁজাখুরি।
রয়েছে—নেই আর। এই তো সংসার।
আমড়া—আঁটি সার। এরই পিছে ঘুরি?

তৃষিত-রাক্ষসী—মূলে সে দুঃখের।
যা-কিছু মাগিতেছে—ফেনা সে ক্ষণিকের।
সুখ—সে প্রজাপতি। বালক মূঢ়মতি
যেম্নি ধরে তারে—মৃত সে। অতীতের।

দিয়েছি এ যাবৎ ভুলের খেসারত।
পেয়েছি তৃপ্তি কি? পূর্ণ মনোরথ?
কাঁচ তো নয় হীরে। বহেছি তারে শিরে।
মরুর মরীচিকায় মেলে কি সরবৎ?

ছুটেছি আজীবন পিছনে কামনার।
জড়ায়ে গেছি জালে তাই তো ছলনার।
ছলনা আর নয়। তৃষ্ণা হোক্ ক্ষয়।
এখন স্নান নীরে অমৃত—ঝরনার।

বেদবাণী

সুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

"অমৃতোঽহম্"

অমৃতরূপে রয়েছি আমি বিশ্ব ভরে' জলে স্থলে,
অনিল, অনল, আকাশ-পাতাল, অন্তরীক্ষে, ধরণী-
তলে।
অমৃত কানে, অমৃত চোখে, অমৃত পদে, অমৃত করে,
শুনছি আমি, দেখছি আমি, চলছি আমি কর্ম করে'।
দিগ্বিদিকে রয়েছি আমি নানান্ রূপে, নানান্ বেশে।
পুরুষ রূপে, স্ত্রীলোক রূপে রয়েছি আমি সর্ব দেশে।
কুমার আমি, কুমারী আমি, বৃদ্ধ আমি যষ্টি-করে।
পুত্র কন্যা, জনক আমি, জননী আমি সকল ঘরে।
আনন্দময়, ভয়েরও ভয় ভীষণ মধুর, অভাবনীয়।
স্রষ্টা আমি, সৃষ্টি আমি, একই আমি—অদ্বিতীয়।১

———

১। অথর্ববেদ, ছান্দোগ্য-উপনিষদ্ (১। অথর্ব, ১১।৫।১; ছান্দোগ্য, ৭।২৫।১; অথর্ব, ১০।৮ ২৭।-২৮।*

"আর্যের আকৃতি"

সুন্দর এ ধরণীতে চাই আমি সুন্দর জীবন।
শতবর্ষ শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস করিয়া গ্রহণ
বাঁচিব বীরের মত, অনুক্ষণ শত কর্মে রত।
দর্শন শ্রবণশক্তি, বাক্‌শক্তি অক্ষুণ্ণ সতত।
উচ্চ শির দৃঢ় চিত্ত, দীনতার স্পর্শ নাহি মনে,
জিনিব সবারে আমি শ্রদ্ধা প্রীতি স্নেহের বন্ধনে।
অন্তর মাধুর্যরসে ভরা, মধুময় প্রতি আচরণ,
হেরিব মধুর চক্ষে, বাক্যে হবে মধুর ক্ষরণ
অমৃত প্রাণীর মাঝে রয়েছেন অমৃত আকারে
জ্যোতির্ময় দেব যিনি, তাঁরে ছাড়া পূজি আর
কারে?
উচ্চ, নীচ, তুচ্ছ হীন, জ্ঞানী গুণী, অবোধের বুকে,
স্নেহ, দয়া, শ্রদ্ধা, প্রীতি, সেবা রূপে রয়েছেন সুখে,
সেবি তাঁরে শতবর্ষ, শত কর্মে আপনারে ভুলি,
চলে যাব শিরে নিয়ে মধুময় পৃথিবীর ধূলি।২

———

২। যজুর্বেদ, ঋগ্বেদ, অথর্ববেদ, গীতা (২। যজুর্বেদ বাজসনেয়ি-সংহিতা, ৪০।২; ঋগ্বেদ, ৭।৬৬।১৬; অথর্ববেদ, ১৯।৬৭।১; অথর্ব, ১।৩৪।২-৪; বাজসনেয়ি, ৩৬।২৪; অথর্ব, ১১।৫।১; গীতা ইত্যাদি)

১৮।৬১, ঋক্, ১।৯০।৭; বাজসনেয়ি, ১৩।২৮

বাঁকুড়ার হাতী ঘোড়া

ভাগবতদাস বরাট

হাতী ঘোড়ার পূজার প্রচলন অন্য কোন জেলায় বা দেশে আছে কি নেই তা আমার আলোচনার বিষয় নয়। বাঁকুড়া জেলার মত অন্য কোন জেলায় হাতী ঘোড়ার পূজা চালু আছে বা নেই, তাও আমি জানতে চাই না। আমি বলতে চাইছি, হাতী ঘোড়ার পূজা সর্ব্বত্রই বিশেষ করে পল্লী অঞ্চলে খুব বেশী ছড়াছড়ি। বাঁকুড়া জেলায় মরসুমি ফুলের মত এই পূজা হামেশাই দেখা যায়। মাস তিথি বা কালের গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বৎসরের যে কোন মাসে, যে কোন দিনে যত্রতত্র এই পূজা অনুষ্ঠিত হয়। পঞ্জিকার লিপিবদ্ধ না থাকলেও প্রতিবেশী জনগণের মুখে মুখে দিন ক্ষণ মুখস্থ। আর আবহমান কাল ধরে তা চলেও আসছে। দেবতার মহিমায় পূজার অনুষ্ঠান। মানত শোধে কাঁসর ঘণ্টা বেজে ওঠে। বিশ্বাসে ভক্তি জন্মে। বিপদে শরণ নেয়।

হাতী-ঘোড়া জ্যান্ত পশু নয়। মাটির প্রতিমূর্ত্তি। যারা গড়ে তারা মৃৎশিল্পী। জাতিতে কুমার। খুব বড় আবার খুব ছোট আকৃতির হাতী ঘোড়া। যেমন জিনিস তেমনি তার দাম এবং মান। যেগুলো ছোট আকৃতির সেগুলো আগাগোড়া নিরেট। আর যেগুলো বড় তাদের ভিতর ফাঁপা। সেগুলো নাকি ছাঁচে তৈরী।

শোনা যায় বাঁকুড়ায় এক সময় একদুর্দ্ধর্ষ ডাকাত ছিল। সে ডাকাতি করে যা নিয়ে আসত তা ঘরের মধ্যে না রেখে দেবস্থানের ঐ সব ফাঁপা বড় আকৃতির ঘোড়া হাতীর পিছন দিকের ছিদ্র পথে গলিয়ে রাখত। এই ভাবে সোনা দানা ও টাকা পয়সা রাখার কারণ দ্বিবিধ। প্রথম কারণ এই যে যদি সে সন্দেহভাজন হয় তা হলে পুলিশ বিভাগের তদন্তে তার ঘর বাড়ী তছনছ করে খোঁজ তল্লাশ করলেও চোরাই মাল পাওয়া যাবে না। আর দ্বিতীয় কারণ, দেবতার প্রতি ভক্তি। অর্থাৎ যা করলাম তা বাধ্য হয়ে পেটের দায়ে করতে হয়েছে। কাজটা অপরাধজনক হলেও তা তো তোমাকে জানিয়ে করছি এবং তোমার কাছেই গচ্ছিত রাখছি। তোমাকেই সঁপে দিলাম।

উক্ত ডাকাত অবশেষে একদিন ধরা পড়ল। তাকে যখন সিপাইরা ধরে নিয়ে যাচ্ছে তখন তার বুড়ী মা এসে সেই অবস্থায় তার কাছে কেঁদে বলে, বাবা তুই তো ধরা পড়লি, এখন তোর অবর্ত্তমানে আমায় কে খাওয়াবে? মায়ের প্রশ্নের জবাবে ডাকাত বলেছিল,—কাঁদিস না। তোর আবার খাবার দুঃখ। হেথা হোথা অনেক হাতী ঘোড়া আছে ধরে ধরে খাবি। পুত্রের এবংবিধ ইঙ্গিতের অর্থ বুঝে মা নিশ্চুপে চলে গেল। যাক্ ওসব কথা। আলোচনায় আসা যাক্।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, হাতী ঘোড়ার পূজা মানুষ করে কেন? প্রশ্নের জবাবে বলব, মানুষ হাতী ঘোড়ার পূজা করে না। করে দেব-দেবীর পূজা। হাতী ঘোড়াকে কেন্দ্র করে এই পূজা অনুষ্ঠিত হয়। যেমন শিখণ্ডীকে সামনে রেখে একদা অর্জ্জুন যুদ্ধ করেছিল, এও ঠিক সেইরূপ। হাতী ঘোড়া দেব-দেবীর প্রতীক স্বরূপ। যেমন কোন ঝগড়াটে নারী—যার সঙ্গে বাদ বিবাদ তাকে দেখে অন্য নারীকে গালি দেয় এবং যাকে গালাগালি করে সে যেমন বুঝতে পারে গালি বর্ষণ তার উদ্দেশ্যে নয়।

আবার প্রশ্ন হচ্ছে এই ভাবে প্রতীকের পূজা আনার সার্থকতা কি? এবং মানুষ তা করেই বা কেন?—উত্তরে বলব সেটা সাধকের ইচ্ছা। মনের খেয়াল। ইষ্ট দেব-দেবী হয়ত ঠিক ঠিক ভাবে স্মরণে আসছে না। কিম্বা স্মরণে এলেও তাঁর মূর্ত্তি মনের কোনায় দানা বেঁধে

গজিয়ে উঠছে না। অথবা মূর্ত্তি তৈরী করিয়ে পূজক হয়ত সেই মূর্ত্তির অবয়ব দেখে সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। চোখের গঠন তো এইরূপ হবে না। আকৃতি এবং অবয়বেও অনেক পার্থক্য। সাধক মূর্ত্তিখানি সরিয়ে রেখে মূর্ত্তির প্রতীক স্বরূপ ঘোড়া-হাতী স্থাপনা করলেন। সাধক তাঁর ঈপ্সিত দেব-দেবীকে নিজেদের মত ভেবে নিলেন। অর্থাৎ দেবতা আমাদেরই সমগোত্রীয়। আমরা যেমন ঘোড়া ও হাতীর পিঠে চড়ে হেথা হোথা গমনাগমন করি, তেমনি দেব-দেবীরাও। গজ ও ঘোটক দেবতাদের বাহক অথবাবাহন। এই ভেবে মানুষ সেই বাহনের পূজা করতে শুরু করল। সেই সুরু থেকে সারণ। বংশ পরম্পরায় চালু আছে। আজও রয়েছে এবং থাকবেও চিরকাল।

ইষ্ট দেবদেবীকে মানুষ অনেক ক্ষেত্রে গোপন রাখে। কোন দেব-দেবীর যে সে পূজক তা সাধারণকে জানতে দেয় না। সুতরাং মূর্ত্তি গড়ে পূজা করলে জানাজানি হয়ে যাবে। অনেকে বলেন সেইজন্যেই প্রতীক পূজার প্রচলন। অবশ্য এ কথা বলাও অযৌক্তিক হবে না যে মুসলমান আমলে কোন হিন্দু-বিদ্বেষী নবাব বাদশাহ পৌত্তলিক পূজা তাঁর রাজ্যে বন্ধ করে দেওয়ার মানসে হয়ত হুকুম জারি করেছিলেন। তৎকালে রাজাদেশ পালন না করা কঠিন অপরাধ বলে সাব্যস্ত হত। তাই মানুষ তাড়াতাড়ি দেব-দেবীর মূর্ত্তি বিসর্জ্জন দিয়ে এই ভাবে প্রতীক পূজার ব্যবস্থা করে। এ কথা বলতাম না, যদি না দেখতাম পীরের দরগায়ও হাতী ঘোড়ার পূজা চালু। আর কোন নির্দ্দিষ্ট দেব-দেবীর পরিবর্ত্তে যদি দেখতাম হাতী ঘোড়ার পূজা হচ্ছে তা হলেও এত কথা বলতাম না। এত বিষদ ব্যাখ্যারও প্রয়োজন হত না। কিন্তু তা তো নয়। মনসা, ভৈরবী, কালী, এমন কি কোন কোন স্থানে দুর্গাপূজাতেও মূর্ত্তির পূজা না হয়ে হাতী ঘোড়ার পূজা হয়।

কথায় বলে আমাদের অর্থাৎ বিশেষ করে বাঙ্গালী হিন্দুর নাকি তেত্রিশ কোটি দেবতা। এ কথা চিন্তা করে অনেকে হয়ত আশ্চর্য্য হবেন। তা অবাক হওয়ারই কথা। ঈশ্বর তো এক। তিনি আবার বহু হলেন কোন দুঃখে? দুঃখে নয়, ভক্তের ইচ্ছায়। কথায় বলে ভক্তের ভগবান। সাধক যে ভাবে তাঁকে ডেকেছেন,— তিনি সাড়া দিয়েছেন।—তাইতো বিভিন্ন পূজার আয়োজন ও প্রচলন, প্রয়োজনে নয়। ভক্তের কাছে তিনি তো কোন প্রত্যাশী নন। তিনি চান না ভক্ত তাঁকে সাড়ম্বরে সকলকে জানিয়ে শুনিয়ে পূজা করুক। আবার এ কথাও নিশ্চয় যে ভক্তের অভিলাষে ঈশ্বরের বাধা দান নেই। ছোট ছেলের কাছে খেলনা যেমন, প্রকৃত ভক্তের কাছে ঈশ্বরও সেইরূপ। ভক্ত হওয়া কঠিন ব্যাপার। মনে ভক্তি আনা সহজসাধ্য নয়। যাঁর মনে ভক্তির ভাব জাগবে না তিনি ঈশ্বরকে ভয় করবেন। পরম করুণাময় ভগবানের তিনি দেখবেন অন্য রূপ। যেমন শিশুদের কাছে পাঠশালার গুরুমশায়। তাই পূজার প্রয়োজন। মানুষ ভয়ে ঈশ্বরের পূজার প্রয়োজন বোধ করে। আবার এ কথা বলাও অত্যুক্তি হবে না যে আর্য্যদের অনুষ্ঠিত পূজা পদ্ধতি ও দেব-দেবীর সঙ্গে অনার্য্যদের অনুষ্ঠিত পূজায় যোগাযোগ হওয়ায় দেবদেবীর সংখ্যা বেড়ে গেছে। যেমন মনসা, তারা, ভৈরব, চণ্ডী, বারভুঁইয়া, কামাক্ষ্যা, কালভৈরব, শীতলা, প্রভৃতি দেব-দেবীর পূজা অনার্য্যদের অনুষ্ঠিত পূজা।

এখন এই সব জেনে শুনে যদি কারো মনে এই সিদ্ধান্ত বলবৎ হয় যে পূজার বেদীতে দেব দেবীর প্রতিমূর্ত্তির বদলে হাতী ঘোড়ার প্রতীক ব্যবহার অনার্যদের অনুষ্ঠান তা হলে তাঁর মতামতকেও হেসে উড়িয়ে দেওয়া উচিত হবে না। কারণ, বারভুঁইয়া ভৈরব, মনসা, কালভৈরব প্রভৃতি দেবদেবীর পূজা কালে হাতী ঘোড়ারই পূজা হয়। এবং ধর্ম্মঠাকুরের পূজাকালেও হাতী ঘোড়ার পূজা হয়।

পশ্চিমবঙ্গে বিশেষতঃ বাঁকুড়া বর্দ্ধমান ও হুগলী জেলায় ধর্ম্মঠাকুর বিখ্যাত দেবতা। নূতন করে ওঁর পরিচয় দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। রাঢ় দেশে ধর্ম্মঠাকুরের মাহাত্ম্য অবলম্বনে বহু কাব্য রচিত হয়েছে। ধর্ম্ম-ঠাকুরের অসংখ্য নাম। যথা,—ধর্ম্মরাজ, কালুরায়,

বাঁকুড়া রায়, কৌতুক রায়, চাঁদ রায় প্রভৃতি। অনেকের অভিমত বাঁকুড়া জেলায় পাতসায়ের থানার অন্তর্গত বালসী গ্রামে বাঁকুড়া রায় নামে যে ধর্মঠাকুর আজও পূজিত, তাঁর নামানুসারে 'বাঁকুড়া' সহর ও জেলার নাম। সে যাই হোক, কথায় কথায় অন্য কথায় চলে আসছি। যেমন কারো সঙ্গে কথা বলতে বলতে পথ চলতে গিয়ে পথের হদিশ ভুলে গিয়ে অন্যপথে পা পড়ে, এখন অবস্থাও ঠিক সেইরূপ হল আমার। যাক্ এখন যা বলতে চাইছি তাই বলি। যা শোনাতে চাইছি তা শুনুন।

তৎকালে মানুষের যানবাহন বলতে হাতী ঘোড়াকেই বুঝাত। অধুনাকালের যুগে বহু প্রকার যানবাহনই মানুষের করায়ত্ত। কিন্তু তৎকালে তা ছিল না। তখন হাতী ঘোড়া ছাড়া অন্য কোন যানের কথা মানুষ ভাবতেই পারে নি। তাই গজ ঘোটককে দেবতার বাহনরূপে কল্পনা করে দেবতার প্রতীকরূপে পূজার বেদীতে বসিয়েছে। সোজাসুজি দেবতাকে পূজা করতে সাহস নেই। কি জানি পূজা আনায় যদি কোন ত্রুটি বিচ্যুতি ঘটে, দেবতা তাতে হয়ত ক্ষুন্ন হবেন। সুতরাং বাহকের মাধ্যমে পূজা। দেবতার প্রতীক পূজা।

কাল কিন্তু থেমে নেই। বহু যুগ আগের কথা। হাতী ঘোড়াকে যেদিন মানুষ প্রথম পূজার আসনে বসিয়েছিল। সে আজ অনেক বছর আগের কথা। পুরাণো পাঁজির সন তারিখের হিসাব। সেই থেকে পূজা আজও চালু এবং চলবেও চিরকাল। কিন্তু পূজার বেদীতে হাতী ঘোড়া সীমাবদ্ধ না থেকে কালের পরিবর্ত্তনে উঠে এসেছে গৃহস্থের গৃহাঙ্গনে। গৃহের সাজ-সজ্জা হিসাবে বিশেষ করে ঘোড়ার ব্যবহার বেশ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। আগে শুধু মাটির ঘোড়া তৈরী হত এখন কাঠের এবং পিতলের নির্ম্মিত ঘোড়াও তৈরী হচ্ছে। ঘোড়ার চেয়ে হাতী বলবান হলেও চিরকালই সে দৌড়াদৌড়িতে ঘোড়ার কাছে পরাজিত। তাই হাতী পিছিয়ে পড়েছে। পূজার বেদীতেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে। চৌকাঠ ডিঙিয়ে অন্দরে প্রবেশ করতে পারে নি। তাহলেও একবারে স্তব্ধ নয়। মাটির ও পিতলের হাতী তৈরী হচ্ছে এবং তা ঘোড়ার তুলনায় কম হলেও বিক্রী হচ্ছে। অর্ডারি মাল। ঘর সাজাতে গৃহস্থ ঘরে তুলছে। যার যেমন টেস্ট। মনের রুচি ও তৃপ্তির উপর গৃহের সাজসজ্জা।

বাঁকুড়ার 'পাঁচমুড়া' গ্রাম মাটির হাতী ঘোড়া তৈরীর জন্য প্রখ্যাত। মৃৎশিল্পীরা নানা আকারের হাতী ঘোড়া তৈরী করে। তারপর সেগুলো আগুনে পুড়িয়ে শক্ত করে। জল পড়লেও যাতে মাটীর শিল্প না গলে যায়। সেজন্য এই প্রস্তুতি। এই সব মৃৎ-শিল্পীরা জাতিতে "কুমার"। মাটির হাড়ী-কলসী ও অন্যান্য পাত্রাদি নির্ম্মাণ এদের উপজীবিকা। আর সেই সঙ্গে অর্ডারমাফিক হাতী ঘোড়াও তৈরী করে। ছোট বড় মাঝারি আকারের নানা ধরনের হাতী ঘোড়া। শিল্পের চমৎকারিত্বে সুশোভন। ভাস্কর্য্যের নিক্তিতে কেউই কম বেশী নয়। প্রতিটি নিখুঁত। গড়ন-গঠনে আকৃষ্ট না হয়ে খুব কম জনই পিছু হটবে। অবশ্য যদি দর্শনার্থীর শিল্প-মন থাকে। ভাবলে আশ্চর্য্য লাগে যে এই সব শিল্পীরা কোন শিল্পী-প্রতিষ্ঠান বা কোন কলা-কেন্দ্র হতে গড়ন গঠনের রীতি নীতি ও গঠন-ভঙ্গিমা শিখে আসে নি। ওদের রক্তের সঙ্গে মিশে আছে শিল্প সত্ত্বা। বাপ ঠাকুরদার অনুসরণে ও অনু-করণে যা শিখেছে হাতে কলমে, তাতেই ওরা বংশ পরম্পরায় উচ্চ দরের শিল্পী।

পোড়া মাটির হাতী ঘোড়ার বর্ণ হয় লাল। তারপর তার উপর লাল কালো রঙ লাগিয়ে বিক্রীর জন্যে সাজিয়ে রাখে। লাল কালো এই দুই রঙের হাতী ঘোড়া। রঙ খুব পাকা। জল-রোদের পোড় খেয়েও সে রঙে মলিনত্ব আসে না আর এই রঙ তৈরীতেও ওদের নিজস্ব কেরামতি।

এতদিন মাটির হাতী ঘোড়ারই প্রচলন ছিল। কিন্তু এখন কাঠ ও পিতলের তৈরী হচ্ছে। হাতীর চেয়ে ঘোড়াই বেশী তৈরী হচ্ছে। জোর কদমে ঘোড়া

এগিয়ে ছুটে চলেছে! বিদেশেও চালান যাচ্ছে। আমাদের কাছে যত না কদর, বাইরে এর কদর তার চেয়ে অনেক বেশী। আমরা সব সময়ে চোখে দেখছি এবং জন্মাবধি দেখে আসছি। তাই দেখে আহা মরি হয়ে পড়ি না। কিন্তু যারা হঠাৎ দেখে তারাই দাম দেয়। প্রদীপের তলদেশ তো চিরকালই আঁধারে ঢাকা।

কাঠের ঘোড়া যারা তৈরী করে তারা ছুতার মিস্ত্রি। এদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু যারা পিতলের হাতী-ঘোড়া তৈরী করে তারা জাতিতে 'ঢেকো'। এই ঢেকো শিল্পীরা আমাদের দেশের কর্ম্মকারদের কাজ কর্ম্মে সমপর্য্যায়। কিন্তু জাত্যা-ভিমানে কর্ম্মকাররা এদের অস্পৃশ্যজ্ঞানে দূরে রেখেছে। পারিবারিক কোন সম্পর্ক এই দুই জাতির মধ্যে নেই এবং কোন কালে ছিল না।

ঢেকোরা উড়িষ্যার অধিবাসী। এদের ভাষা আলাদা। রীতি-নীতি ও সামাজিক প্রথাও ভিন্নতর। মান্ধাতার আমলে এদের কোন পূর্ব্ব পুরুষ কয়েকজন ছিটকে এ দেশে চলে এসেছিল। সেই থেকে এদেশেই ওদের বসবাস। যেমন পুকুরের মাছ হঠাৎ নদীতে পড়ে নদীকেই আপন আস্তানা ভেবে নেয়, তেমনি ওরাও। নিজের দেশের ভাষাও ভুলে গিয়েছে। এবং ওদের সামাজিক প্রথা ও রীতি-নীতিও পাল্টে ফেলেছে। বারান্তরে এদের সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা করব, কিন্তু এখন এইক্ষেত্রে যেটুকু না বললে নয়; তাই বলছি।

বাঁকুড়ার রামপুর পল্লীর পশ্চিম প্রান্তে ভুনবেদিয়ার কাছাকাছি এই ঢেকো জাতিদের বাস ছিল। কাজ ছিল পিতলের 'পাই' 'কনা ও 'চৌকঠ' তৈরী করা। সে কাজ তেমন চালু ছিল না। আবার এখন 'লিটারের' প্রচলন হওয়ায় পাই-কনার কদর কমেছে। যেন মজা নদী। কোন তরল বা সূক্ষ্ম দ্রব্য পরিমাপের ক্ষেত্রে লিটারের প্রয়োজন। আগে ছিল পাই বা কনা। সুতরাং ওদের কর্ম্মক্ষেত্র আরও সীমিত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকার এর ইনডাষ্ট্রিয়েল ডিপার্টমেন্ট ওদের এখন কাজ দিয়েছেন। পিতলের হাতী ঘোড়া ও অন্যান্য মূর্ত্তি তৈরী করে ওরা এখন জীবিকা অর্জ্জনে সক্ষম হয়েছে। রামপুরের ঢেকো শিল্প প্রতিষ্ঠান মাটি, কাঠ, পিতল ও পাথরের নানাবিধ মূর্ত্তি ও সেই সঙ্গে হাতী ঘোড়া তৈরী করিয়ে নানা দেশ বিদেশে রপ্তানি করছে। শিল্প ও শিল্পীকে বাঁচিয়ে রাখার এই প্রতিষ্ঠান টিকে থাক এবং উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করুক। এবং সেই সঙ্গে শিল্পের কারুকার্য্যও উন্নতির মুখে এগিয়ে চলুক। আমি ক্রেতা নই এবং বিক্রেতাও নই শুধু চেয়ে চেয়ে দেখছি হাতী ঘোড়ার দৌড়। এখন ঘোড়া টগবগিয়ে ছুটে চলেছে। পরে হয়ত হাঁপিয়ে পড়বে। তখন হাতী ওকে লাথি মেরে এগিয়ে পড়বে!

কংগ্রেস স্মৃতি

(চত্বারিংশ অধিবেশন—কানপুর—১৯২৫

শ্রীগিরিজামোহন সান্যাল

(১)

বেলগাঁও কংগ্রেসের অধিবেশন সমাপ্তির অব্যবহিত পরে একটি ঘোষণা দ্বারা মহাত্মাজী জানালেন যে, রায় শঙ্কর জগজীবন তাঁর অনুরোধে চরকা ও খদ্দরের বাণী সম্বন্ধে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ লেখককে এক সহস্র টাকা পারিতোষিক দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

ডাঃ মুঞ্জে এসোসিয়েটেড প্রেসের মারফৎ একটি ঃপ্রকাশ করে বললেন যে, কংগ্রেস অসহযোগ স্থগিত রেখে গান্ধী স্বরাজ্য প্যাক্ট গ্রহণ করার ফলে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে তা বিবেচনার জন্য মধ্য প্রদেশের বিধান সভার স্বরাজ্য দলের সদস্যদের একটি সম্মিলন নাগপুরে ১৯২৫ সালের ১৫ই জানুয়ারী অনুষ্ঠিত হবে।

নির্দিষ্ট তারিখে সদস্যগণ মিলিত হয়ে অধিকাংশের মতানুসারে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করার বিরুদ্ধে মত দিলেন। তাঁরা বললেন যে ভারত গভর্ণমেণ্ট আইন (Government of India Act) স্বরাজ্য পার্টীর মনমত পরিবর্তিত না হলে কোন স্বরাজী মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করতে বা মন্ত্রিত্ব গ্রহণ উচিত মনে করতে পারে না।

মহাত্মাজীর নির্দেশে নাগপুরের হিন্দু-মুসলমানদের বিরোধ মীমাংসার জন্য মৌলানা আবুল কালাম আজাদ এবং পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু ৯ই জানুয়ারী নাগপুরে উপস্থিত হন। পণ্ডিতজী এই সুযোগে মধ্য ভারতের স্বরাজী কাউনসিলারদের মন্ত্রিত্ব গ্রহণ সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

এদিকে জানা গেল, স্যর হিউ ষ্টিফেনসন ৭ই জানুয়ারী বঙ্গীয় প্রাদেশিক কাউনসিলে একটি অর্ডিনান্স বিল উপস্থিত করবেন। এই সংবাদে দেশময় প্রতিবাদ সোচ্চার হয়ে উঠল।

নির্দ্ধারিত দিনে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ অসুস্থ থাকায় তাঁকে একটি ষ্ট্রেচারে করে বিধানসভায় আনা হল। বিধানসভায় ভোটাধিক্যে অর্ডিনান্স অগ্রাহ্য হল। এই জয়ের বার্তা শুনে মহাত্মা গান্ধী "ইয়ং ইণ্ডিয়া"তে ১৫ই জানুয়ারী লিখলেন—লর্ড লিটনের বিরুদ্ধে দেশবন্ধুর সাম্প্রতিক জয় অতি গৌরবময়। বাংলার গভর্ণর অবশ্য এই বিলটি সার্টিফিকেট দ্বারা আইনে পরিণত করলেন এবং স্বয়ং গভর্ণর জেনারেল লর্ড রেডিং তা অনুমোদন করলেন।

এই সময় বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের অধিবেশনের জন্য ফরিদপুরে তোড়জোড় চলতে লাগল। এই সম্মেলনের সভাপতির পদে বীরেন্দ্রনাথ শাসমল নির্ব্বাচিত হয়েছিলেন কিন্তু তিনি পদ গ্রহণ করতে অস্বীকার করায় সভাপতি নির্বাচনের ভার অর্পিত হল বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর উপর।

কনফারেন্সের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি—সুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস জানালেন যে মহাত্মা গান্ধী ফরিদপুর কনফারেন্সে উপস্থিত থাকার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করে একটি তারবার্তা পাঠিয়েছেন, তাতে তাঁকে ফেব্রুয়ারী মাসে এ কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার অনুরোধ আছে।

(২)

২০শে জানুয়ারী দিল্লীতে সর্ব দলীয় একটি কনফারেন্স ডাকা হল। কেন্দ্রীয় বিধান সভার অধিবেশনের জন্য দিল্লীতে উপস্থিত হিন্দু ও মুসলমান নেতাগণ তাঁদের স্ব স্ব ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে স্বরাজ পরিকল্পনায় তাঁদের পক্ষে কি দাবী করা হবে তা আলোচনা করে দেশের রাজনৈতিক ঐক্যের পথ অনেকটা সুগম করে রাখলেন।

নির্দিষ্ট দিনে মহাত্মা গান্ধীর সভাপতিত্বে দিল্লী

সহরের রাইসিনায় অবস্থিত ওয়েষ্টার্ণ হোটেলে সর্ব-দলীয় সম্মিলন আরম্ভ হল। কনফারেন্স বিভিন্ন রাজ-নৈতিক দলের নেতা এবং কেন্দ্রীয় বিধান সভার বহু ভারতীয় সদস্য যোগদান করেছিলেন। যাঁরা যোগদান করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন—পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু, মহম্মদ আলী জিন্না, মৌলানা মহম্মদ আলী, মৌলানা শওকত আলী, স্যর মহম্মদ সফী, ডঃ অ্যানি বেসান্ত, শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু, স্যর পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাস, পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়, সরদার মঙ্গল সিং, ডঃ এস্. কে. দত্ত, এ. রামস্বামী মুদালেয়ার (পরবর্তীকালে স্যর উপাধি ভূষিত), বাবু ভগবান দাস, এস্. শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার, ডঃ সইফুদ্দিন কিচ্লু, স্বামী শ্রদ্ধানন্দ, স্যর আবদুল কায়ুম, সি. ওয়াই. চিন্তামণি, দেওয়ান বাহাদুর রামচন্দ্র রাও, ভরুচা সাহেব, এ- রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার, এস্. সত্যমূর্তি, বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদ, পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু; পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরু. মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, ডাঃ এম্. এ. আনসারী,—রামলিঙ্গম্ চেট্টী, বল্লভভাই প্যাটেল, যমনাদাস দ্বারকাদাস, বিপিনচন্দ্র পাল, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী প্রভৃতি নেতাগণ।

সভা উদ্বোধন করে মহাত্মা গান্ধী বললেন যে রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক ঐক্যের পথ খুঁজে বের করা এবং স্বরাজ্যের একটি পরিকল্পনা তৈরি করার উদ্দেশ্যে এই সম্মিলনী আহুত করা হয়েছে। তারপর তিনি হিন্দু মুসলমান এবং সকল রাজনৈতিক দলের মধ্যে ঐক্য স্থাপনের উপায় অবলম্বন এবং স্বরাজের একটি স্কীম প্রস্তুত করার জন্য একটি সাব কমিটি নিযুক্ত করার কথা বললেন।

চিন্তামণি মশায় (তৎকালীন প্রথিতযশা সাংবাদিক। তিনি কিছুকাল যুক্ত প্রদেশের মন্ত্রীও ছিলেন কিন্তু গভর্ণরের সঙ্গে মত-পার্থক্যের জন্য মন্ত্রীপদে ইস্তফা দেন। বাৎসরিক ৭৭০০০ হাজার টাকার লোভ ত্যাগ করা সহজ কথা নয়। আজ-কালকার মন্ত্রীরা এ থেকে অনেক শিক্ষালাভ করতে পারেন।) বললেন যে সাব কমিটী গঠনের দ্বারা কোন ফল হবে না। তবে তা গঠনে তাঁর আপত্তি নেই।

শ্রীমতী অ্যানি বেসান্ত মন্তব্য করলেন যে বেলগাঁও কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাবের বিরুদ্ধে যেতে পারে এবং যার ফলে সভাপতির পদ থেকে মহাত্মাজীর হওয়ার সম্ভাবনা হতে পারে এমন কোন নূতন প্রস্তাব গ্রহণ করা ধৃষ্টতা হবে।

প্রত্যুত্তরে মহাত্মা গান্ধী বললেন তাঁর প্রস্তাবিত কমিটী, ডঃ বেসান্ত যা আশঙ্কা করছেন ততদূর পর্যন্ত যাবে না। তাঁর প্রস্তাব দ্বারা পরিষ্কার দেখানো হয়েছে কংগ্রেস কোন কিছু দ্বারা বাঁধা নয়, কিন্তু কংগ্রেসের নূতন ভোটাধিকার বা মূলনীতি সম্পর্কে সাব কমিটীর সিদ্ধান্তের তুচ্ছ কারণে পরিবর্তন করা যাবে না। কংগ্রেসীরা তাঁদের কর্তব্য জানেন এবং তাঁদের কর্মসূচী অনুসারে কাজ করে যাবেন। যদি অকংগ্রেসীরা কংগ্রেসে যোগদান করেন এবং কংগ্রেসীদের তাঁদের পথের ভ্রান্তি এবং মূলনীতি পরিবর্তনের সমীচীনতা সম্বন্ধে তাঁদের বিশ্বাস জন্মিয়ে দিতে পারন তা হলে এ বিষয়ে নিষ্পত্তির জন্য কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করা হবে। তিনি মনে করেন না যে এমন কিছু হবে।

জিন্না সাহেব অনতিবিলম্বে একটি প্রতিনিধি মূলক কমিটী নিযুক্ত করে হিন্দু মুসলমানের ঐক্য স্থাপনের কথা বললেন, কারণ, এই ঐক্য ব্যতীত কোন রাজনৈতিক ঐক্য হবে না এবং সংযুক্ত কংগ্রেস ছাড়া কোন স্বরাজ হবে না। লিবারেল ফেডারেশন বা অন্য কোন সংস্থা কি দাবি করে বা না করে তাতে কিছু এসে যাবে না। রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের কোন প্রস্তাব মিডি ও পার্শিয়ানদের আইনের মত ত অপরিবর্তনীয় নয়। এই সভার উদ্দেশ্যই হচ্ছে ঐক্যের উপায় বের করা।

ডালভি মশায়ের অনুরোধে মহাত্মা গান্ধী লিবারেল ফেডারেশনের প্রস্তাব পড়ে শোনালেন। ঐ প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে লিবারেলরা পুনরায় কংগ্রেসে যোগদান করতে পারে যদি (১) বিধান-সম্মত উপায়ে

ডোমিনিয়নের স্থায় স্বায়ত্ত শাসন অর্জন করা কংগ্রেসের উদ্দেশ্য হয় (২) যদি অসহযোগ, অসহযোগ এবং ভোটাধিকার সম্বন্ধে প্রস্তাব স্পষ্টভাবে ত্যাগ করা হয় এবং (৩) বিধানসভাগুলিতে স্বরাজ পার্টিই কংগ্রেসের একমাত্র প্রতিনিধি বলে স্বীকার করা না হয়।

গান্ধীজী জানালেন যে অন্যান্য রাজনৈতিক দলের মতও প্রায় অনুরূপ।

চিন্তামণি মশায় জানালেন যে এই কনফারেন্সে আলোচনা সম্বন্ধে যদি লিবারেল ফেডারেশনের কিছু জানানো প্রয়োজন হয় তা হলে তাঁদের যে প্রতিনিধিরা এখানে উপস্থিত আছেন তাঁরা তা করবেন।

বেলগাঁওয়ের অব্রাহ্মণ সভার সভাপতি এ. রামস্বামী মুদালেয়ার কংগ্রেসের ক্রীড ও ভোটাধিকার অপেক্ষা সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের উপর বেশী জোর দিলেন। তিনি বললেন যে উত্তর ভারতের হিন্দু মুসলমান সমস্যার মত দক্ষিণ ভারতে ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণ সমস্যা প্রবল। যদি এই কনফারেন্সে কোন সুস্পষ্ট প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় তা হলে তিনি সেই প্রস্তাব অব্রাহ্মণ কনফারেন্সের সম্মুখে উপস্থিত করবেন।

ভারতীয় খৃষ্টান এসোসিয়েশনের প্রতিনিধি ডঃ এস্. কে. দত্ত বললেন যে তাঁর ভূমিকা দর্শকের ভূমিকা। তাঁদের কোন পৃথক দাবি নেই। অন্যান্যদের সঙ্গে তাঁদের কি সম্পর্ক থাকবে তাই তিনি জানতে চান।

পণ্ডিত মালবীয় বললেন যে রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য কমিটী গঠনে তাঁর আপত্তি নেই। তিনি গান্ধীজীর সঙ্গে একমত যে দরকার হলে কংগ্রেস তার ক্রীড ও ভোটাধিকারের শর্ত বদলাবে। এই উদ্দেশ্যে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন ডাকা যেতে পারে। তিনি জানালেন যে হিন্দু মহাসভা, কেন্দ্রীয় শিখ লীগ, এবং অব্রাহ্মণ কনফারেন্স এ পর্যন্ত তাদের দাবি সম্বন্ধে কোন আলোচনা করতে পারে নি, তা ছাড়া মুসলমানরাও তাঁদের যথার্থ দাবি কি তা প্রকাশ করেন নি।

জিন্না সাহেব বললেন যে মুসলমানরা কি চান তা জানতে তিনি এখানে আসেন নি। তিনি এসেছেন সকলের সঙ্গে সহকর্মী হিসাবে আসন গ্রহণ করতে। তাঁরা সকলে এক সঙ্গে বসে হিন্দু হিসাবে নয়, মুসলমান হিসাবে নয়, ভারতীয় হিসাবে সকল সমস্যার সমাধান করতে চান।

লালা লাজপত রায় বললেন যে তিনি কমিটী গঠনের বিরুদ্ধে নন কিন্তু যে দল লক্ষ্ণৌ প্যাক্টের সংশোধন চায় তাদের দাবি সামনে রাখতে হবে যাতে ভুল বোঝাবুঝি না হয়।

এন্. সি. কেলকার কমিটী গঠনের প্রস্তাব সমর্থন করলেন।

যমনাদাস মেহেতা বললেন যে স্বরাজের পরিকল্পনা প্রস্তুত করতে দেরী করা বিপজ্জনক।

জয়াকর মশায় প্রস্তাব সমর্থন করে বললেন যে সাম্প্রদায়িক ঐক্য নির্দ্ধারণ কমিটী, তাঁদের রিপোর্ট দাখিল করা মাত্র স্বরাজের প্রশ্ন সম্বন্ধে আলোচনা করা হবে এবং আলোচনায় ভিত্তি স্বরূপ শ্রীমতী বেসান্তের পরিকল্পনা গ্রহণ করা যেতে পারে।

সিঃ রামলিঙ্গ রেড্ডি বললেন যে যখন মুসলমানরা তাঁদের দাবি উত্থাপন করবেন না, তখন তিনি কোন কমিটি নিয়োগের আবশ্যকতা মনে করেন না।

তারপর সভা ২৬শে জানুয়ারী অপরাহ্ন ৪টা পর্য্যন্ত মুলতুবি হল।

২৬শে জানুয়ারী অপরাহ্নে মহাত্মা গান্ধীর সভাপতিত্বে সর্বদলীয় কমিটীর অধিবেশন পুনরায় আরম্ভ হয়।

সভাপতি মশায় বললেন যে তিনি মনে করেন যে যদি এই সম্মিলন খাঁটি ও সম্মানজনকভাবে হিন্দু মুসলমান সমস্যা, ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণ সমস্যা প্রভৃতি সন্তোষজনকভাবে সমাধান করতে পারে তা হলে তা স্বরাজের দিকে দেশকে বিশেষভাবে এগিয়ে দেবে। যদি এই সম্মিলন সকলের পক্ষে গ্রহণীয় এমন কোন স্কীম বা পরিকল্পনা প্রস্তুত করতে পারে তা হলে তাতে স্বরাজের পথে দীর্ঘ পদক্ষেপ করা হবে। যদি প্রধান প্রধান প্রশ্নে

উপস্থিত সদস্যগণ একমত হতে পারেন তা হলে সকল দলকে কংগ্রেসের প্লাটফরমে ঐক্যবদ্ধ করে জাতির নামে সর্বসম্মতিক্রমে দাবি উত্থাপন করার কোনই অসুবিধা হবে না। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট প্রতিনিধিগণ দায়িত্ব সম্পন্ন ব্যক্তি হিসাবে এখানে বন্ধুভাবে মিলিত সুতরাং সকলকে একত্রে পরামর্শ করে কাজ করতে জিন্না সাহেব অনুরোধ করলেন।

তারপর জিন্না সাহেব পণ্ডিত মালবীয়জীর উক্তির উল্লেখ করে বললেন যে পণ্ডিতজী বলেছেন যে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে প্রতিনিধি নির্বাচন ভারতীয় জাতীয়তার পক্ষে দুষ্ট বাধা স্বরূপ কিন্তু যখন হিন্দুরা লক্ষ্ণৌ প্যাক্ট মেনে নিয়েছেন তখন তার পর্য্যন্ত তারা দেবেন কিন্তু মুসলমানরা তার পরিবর্ত্তন চান তা হলে তাঁদের পরিষ্কার করে বলতে হবে তাঁরা কি চান।

জিন্না সাহেব জানালেন যে পূর্ণ স্বায়ত্ত শাসন প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক আবশ্যকীয় পদক্ষেপ স্বরূপ লক্ষ্ণৌ প্যাক্ট গৃহীত হয়েছিল। তিনি লক্ষ্ণৌ প্যাক্টের সহিত যুক্ত ছিলেন সুতরাং তিনি জানেন যে লক্ষ্ণৌ প্যাক্টকে চিরস্থায়ী করার কোন উদ্দেশ্য ছিল না। সংখ্যালঘুদের রক্ষা কবচ স্বরূপ প্রয়োজনীয় ও মৌলিক নীতি হিসাবে তা গ্রহণ করা হয়েছিল। কেন্দ্রীয় বিধানসভায় পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু দায়িত্বপূর্ণ গভর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠার অবিলম্বে পন্থা গ্রহণ করতে বলে সেই নীতিরই পুনরুল্লেখ করেছেন। কিভাবে লক্ষ্ণৌ প্যাক্ট তৈরি হয়েছিল সে সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করে তিনি বললেন যে লালা লাজপত রায়, ডাঃ আনসারী এবং একজন শিখ ভদ্রলোক দ্বারা গঠিত একটি কমিটী ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল প্যাক্ট প্রস্তুত করেছেন এবং সি. আর. দাশ একটি বেঙ্গল প্যাক্ট প্রস্তুত করেছেন যা কাঁকিনাড়া কংগ্রেসে অগ্রাহ্য হয়েছে। সুতরাং এ দ্বারা বোঝা যাচ্ছে যে লক্ষ্ণৌ প্যাক্ট চিরস্থায়ী নয়।

তিনি আরও বললেন যে এই কনফারেন্স স্বরাজ প্রতিষ্ঠার জন্য একটি পরিকল্পনা তৈরি করছে সুতরাং এখন হিন্দু ও মুসলমানের পক্ষে ঐ প্যাক্ট সংশোধন করা প্রয়োজন। হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে কিছু কিছু লোক আছেন যাঁরা পৃথক নির্বাচন চান না কিন্তু উভয় সম্প্রদায়ের অংশের পরস্পরের উপর বিশ্বাস নেই। তা ছাড়া বাংলা ও পাঞ্জাবের মুসলমানরা তাঁদের সংখ্যাধিক্যের দাবি করছে। চাকুরির অংশ সম্বন্ধেও পৃথকভাবে বিবেচনা করা প্রয়োজন।

জিন্না সাহেবের অভিভাষণের পর লালা লাজপত রায় আলোচনায় যোগ দিয়ে বললেন যে তিনি মিষ্টার জিন্নার মত লক্ষ্ণৌ প্যাক্ট প্রণয়নের সংশ্রবে ছিলেন না কিন্তু তিনি মনে করেন যে লক্ষ্ণৌ প্যাক্ট একটি প্রকাণ্ড ভুল। লক্ষ্ণৌ প্যাক্ট কেন গ্রহণ করা হল এবং কেন উক্ত প্যাক্ট সংশোধনের জন্য কংগ্রেস একটি সাব কমিটী নিযুক্ত করে তাঁকে তার অন্যতম সদস্য নিযুক্ত করেন তার ইতিহাস বিবৃত করে বললেন প্যাক্টের কথা চিন্তা করার বহু পূর্বে কংগ্রেসের প্রথম জীবনে মুসলমান নেতারা ভেবেছিলেন যে যদি ভারতে প্রতিনিধি মূলক গভর্ণমেন্ট সৃষ্টি হয় তা হলে তা হিন্দুরাজ হবে সুতরাং সংখ্যালঘু হিসাবে কোন আন্দোলনে হিন্দুদের সঙ্গে যোগদান মুসলমানদের কর্তব্য নয়। স্যর সৈয়দ আমেদ এবং বহু সংখ্যক মুসলমানের এই মত ছিল। কেবল অল্পসংখ্যক মুসলমান কংগ্রেসের সহিত যুক্ত ছিলেন। পরলোকগত দাদাভাই নওরোজীর সভাপতিত্বে ১৯০৬ সালে কংগ্রেসে কলকাতা অধিবেশনে যখন কংগ্রেস প্রথম স্বরাজের দাবি জানাল তখন মুসলমানদের এক অংশ জানালেন যে তাঁরা এই দাবিতে যোগ দেবেন না সুতরাং ব্রিটিশ রাজ এই দাবি মেনে নেবে না। তারপর লক্ষ্ণৌ প্যাক্টের সময় প্রশ্ন উঠল কি করে মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষা করা যায়। ফলে মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা হল।

লালাজী তারপপ জানালেন যে সম্প্রতি কংগ্রেস কেবলমাত্র হিন্দু মুসলমানদের প্রতিনিধি নির্বাচন সম্বন্ধে নয়, শিখদেরও যাঁরা লক্ষ্ণৌ উপস্থিত ছিলেন তাঁদেরও প্রতিনিধি নির্বাচন সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নেবার জন্য একটি কমিটী নিযুক্ত করে। তিনি সেই কমিটীর সদস্য ছিলেন। বহু

আলোচনার পর সাব কমিটী একটি রিপোর্ট প্রস্তুত করে কিন্তু তা প্রকাশিত হওয়ার পূর্বেই সি. আর. দাশ মশায় বেঙ্গল প্যাক্টের শর্তগুলি প্রকাশ করলেন। তার অব্যবহিত পরেই কংগ্রেস কমিটীর রিপোর্ট প্রকাশিত হল। কাঁকিনাড়া কংগ্রেসে বেঙ্গল প্যাক্ট অগ্রাহ্য হয়। কমিটীর রিপোর্ট আরও বিবেচনার জন্য কমিটীর নিকট ফেরত পাঠান হয় কিন্তু বেঙ্গল প্যাক্টের ফলে দেশবাসীর মনভাব যে প্রবল আকার ধারণ করেছে তাতে কমিটী কাজে আর অগ্রসর হওয়া সমীচীন মনে করল না। এই সময় মহাত্মা জেল থেকে মুক্তিলাভ করলেন সুতরাং স্থির হল তিনিই এই সমস্যার ভার গ্রহণ করবেন। ডাঃ আনসারী যে সকল উপাদান সংগ্রহ করেছেন সেগুলি অল-ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটীকে দেওয়া হয়েছে।

লালা লাজপত রায় তাঁর সুস্পষ্ট অভিমত প্রকাশ করে জানালেন যে সাম্প্রদায়িক নির্বাচন জাতীয়তার পরিপন্থী এবং এদ্বারা দেশ ভিন্ন ভিন্ন অংশে বিভক্ত হবে। সাম্প্রদায়িক নির্বাচনের নীতি যদি প্রসারিত করা হয় তা হলে দেশ কতভাবে বিভক্ত হবে তা অনুমান করা যায় না। তিনি সকলের নিকট আবেদন করলেন বিষয়টি বিবেচনা করতে, হিন্দুর স্বার্থে অথবা মুসলমানদের স্বার্থে নয়—একটি ঐক্যবদ্ধ জাতি হিসাবে এবং যারা আমাদের স্বায়ত্তশাসন দিতে অস্বীকার করছে তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে। যদি কোন সমাধান করা হয় যা অগ্রগতির সহায়ক হবে তা তিনি সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করবেন। তিনি সকলকে স্মরণ করিয়ে দিলেন যে কেবল স্বরাজ অর্জন করলেই চলবে না তা রক্ষার ব্যবস্থাও করতে হবে। কোন প্রকার জোড়াতালি দেওয়া চুক্তির ফলে প্রতিনিধির সংখ্যা বাড়ানো পশ্চাতে পদক্ষেপ হবে। তিনি সকলের নিকট আবেদন করলেন রুটি মাংসের ভাগাভাগির চেষ্টা না করে একটি পরিকল্পনা তৈরি করতে যা স্বরাজের স্বার্থের এবং দেশের ঐক্যের সহায়ক হবে।

পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু আলোকচনায় যোগ দিতে উঠে অন্যান্য কথার পর বললেন যে তিনি সাম্প্রদায়িক ভাবে চিন্তা করতে অক্ষম তথাপি তিনি মিষ্টার জিন্না এবং লাল লাজপত রায় উভয়ের সহিতই একমত।

ডঃ অ্যানি বেশান্ত আলোচনায় যোগ দিয়ে বললেন যে তিনি চান দুটি কমিটী গঠন করে যুগপৎ প্যাক্ট সম্বন্ধে এবং স্বরাজ সম্বন্ধে আলোচনা চালাতে থাকুক। হিন্দু মুসলমানের প্রশ্ন যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তিনি মনে করেন স্বরাজের প্রশ্ন তদপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বললেন যে তাঁরা সকলেই ভারতীয়। তাঁরা সহস্র সহস্র বৎসর ভারতে বাস করেছেন। গত ১৫০ বৎসর তাঁরা বিদেশী শাসনাধীনে আছেন, বিদেশী শাসকদের স্বার্থ হচ্ছে তাঁদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে পৃথকভাবে রাখা এবং যে প্যাক্টই করা হোক না কেন বিদেশীরা তাঁদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করে তাঁদের পৃথকভাবে রাখতে চেষ্টা করবে। স্বশাসনের ভার না পাওয়া পর্যন্ত এবং প্রশাসনের সমস্যাগুলির সম্মুখীন না হওয়া পর্যন্ত তাঁদের কলহ মিটবে না। তিনি ভারতের ইতিহাস জানেন। এটা অসহ্য যে স্বয়ংশাসিত দেশগুলির একটি অর্বাচীন শাখা ইংলণ্ড তার মাতৃস্বরূপ ভারতের উপর কর্তৃত্বের দাবি করে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—ভারতীয়েরা কি কলহে লিপ্ত থাকবে যখন ভারতমাতা মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন?

মোলানা শওকত আলী শ্রীমতী বেশান্তের পৃথক কমিটী গঠনের কথার সমর্থন করলেন।

এস্. সত্যমূর্তি পৃথক পৃথক কমিটী নিয়োগের বিরোধিতা করে বললেন যে স্বরাজের পরিকল্পনা এবং হিন্দুমুসলমান প্যাক্ট পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না।

সরদার মঙ্গল সিং বললেন যে শিখরা নির্বাচনে যোগ দিয়ে চান্স নিতে প্রস্তুত আছেন। তাঁরা রুটি মাংসের জন্য লড়াইয়ের নিন্দা করেন। ব্যক্তিগত ভাবে তিনি মনে করেন যে লক্ষ্ণৌ প্যাক্ট একটি ভয়ানক ভুল।

তারপর জিন্না সাহেব শীঘ্র সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার জন্য জোর দিয়ে বললেন যে তাঁর অনুমান হয় যে গভর্ণমেন্ট কেন্দ্রীয় বিধানসভায় রিফর্ম এনকোয়ারী কমিটীর রিপোর্ট আলোচনার জন্য আগামী শুক্রবারে

উপস্থিত করবে। কমিটীতে হিন্দু মুসলমানের অনৈক্য সম্বন্ধে অনেক কাজ করা হয়েছে সুতরাং তিনি গভর্ণমেন্টকে বলতে চান যে হিন্দু মুসলমানের বিরোধ মিটে গিয়েছে এবং তাঁরা দাবি সম্বন্ধে একতাবদ্ধ।

মহাত্মা উত্তর দিলেন যে সাব কমিটীর রিপোর্ট প্রকাশ দ্বারা জিন্না সাহেবের উদ্দেশ্য সফল হবে। সাব কমিটী শীঘ্রই কাজ শেষ করে রিপোর্ট না দেওয়া পর্য্যন্ত প্রতিদিন কাজ করে যাবে।

তারপর তিনি সাবকমিটীর সদস্যদের নিম্নলিখিত নামগুলি পড়ে শোনালেন :—

মহাত্মা গান্ধী, মিষ্টার চিন্তামণি, স্যর শিবস্বামী আয়েঙ্গার, মিঃ জয়াকর, লাল লাজপত রায়, বাবু ভগবান দাস, শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার, বিপিনচন্দ্র পাল, এ রঙ্গস্বামী মুদালেয়ার, সি. আর. রেড্ডি, ডঃ এস্. কে. দত্ত, সরদার মঙ্গল সিং (অথবা বোধ সিং), কেলকার (অথবা অভয়ঙ্কর, কর্ণেল গিড়নী, ডঃ বেশান্ত, সত্যমূর্ত্তি, সরোজিনী নাইডু, লাল হরকিষণ লাল, ডঃ কিচলু, আবদুর রৌফ্, হাকিম আজমল খাঁ, মহম্মদ আলী, মৌলানা আজাদ, ডাঃ আনসারী, আবদুল আজিজ, জাফর আলী, এম্. এ. জিন্না, রাজা আলী, মহম্মদ ইয়াকুব, স্যর মহম্মদ সফী, বরকত আলী, আমেদ আলী খাঁ, শামসুদ্দ জোহা, সরফরাজ হোসেন খাঁ, আবদুল কাউয়ুম, মৌলানা শওকত আলী।

নির্বাচিত সাব কমিটী কিছু পরে আলোচনার বৈঠকে বসলেন। তাদের মধ্য থেকে স্বরাজ পরিকল্পনার জন্য একটি ক্ষুদ্র কমিটি নিযুক্ত হল।

সাব কমিটী এবং তাঁদের নিযুক্ত ক্ষুদ্র কমিটী ২১শে জানুয়ারী থেকে দৈনিক স্ব স্ব কাজে ব্যাপৃত থাকবে স্থির হল।

অপর দিকে ন্যাশনাল কনভেনশন (যার সভাপতি ডঃ তেজ বাহাদুর সাপ্রু এবং সাধারণ সম্পাদিকা ডঃ অ্যানি বেশান্ত) একটি কমনওয়েলথ বিল প্রস্তুত করলেন। বিলটি ব্রিটিশ পার্লামেন্টের বহুসংখ্যক সদস্যের সমর্থন লাভ করেছিল।

(৩)

কোহাটে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে ভীষণ দাঙ্গার ফলে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে যে মনমালিন্য সৃষ্টি হয়েছিল তা মিটমাটের জন্য মহাত্মা গান্ধী, মৌলানা শওকত আলী, জয়রামদাস দৌলতরাম, এবং মহাদেব দেশাই ফেব্রুয়ারী মাসের গোড়ার দিকে রাওয়ালপিণ্ডি গেলেন। সেখানে ৫ই ফেব্রুয়ারী মহাত্মাজীর সঙ্গে কোহাটের নেতৃস্থানীয় মুসলমানরা মিলিত হতে রাজি হয়েছিলেন। এই সাক্ষাৎকারের ফলে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধের মীমাংসা হয়েছিল।

ঐ ৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে দিল্লীতে কেন্দ্রীয় বিধান সভায় বেঙ্গল অর্ডিনান্স বিল পাস করার ব্যাপারে ভারত গভর্ণমেন্টের ভীষণ পরাজয় ঘটল। গভর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক উত্থাপিত বিলটি প্রত্যাখ্যানের জন্য ডোরাস্বামী আয়েঙ্গারের প্রস্তাব বিপুল ভোটাধিক্যে গৃহীত হওয়ায় বিলটি অগ্রাহ্য হল। বেসরকারী সদস্যদের পক্ষ থেকে পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু অতি দক্ষতার সহিত অর্ডিনান্স বিল পাস করানোর জন্য গর্ভমেন্ট পক্ষের সমস্ত যুক্তি খণ্ডন করেন।

ক্রমশঃ

সঞ্চসার

বৃটেনের নিকট ভারতের ৭৮ কোটি টাকা ঋণ গ্রহণ

৯ তারিখ নভেম্বর ১৯৭২ খৃঃ অব্দে ভারত বৃটেনের নিকট দুই দফায় ৪৭৪২৫০০০০, (সাতচল্লিশ কোটি ৪২ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টকো) এবং ৩০,৩৫২০০০০, (ত্রিশ কোটি পঁয়ত্রিশ লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা) ঋণ গ্রহণ করিয়াছেন। দুইটি ঋণই বৃটেনের নিকট হইতে নানান প্রকার দ্রব্য ও কারিগরি কৌশল আমদানি করিবার জন্য ব্যবহৃত হইবে বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। যে সকল কার্য্যের জন্য এই সকল দ্রব্য ও কর্ম্মকৌশলের প্রয়োজন সেগুলি হইল কান্দলার ভারতীয় কৃষকদিগের সমবায়িক সার উৎপাদন কেন্দ্র, দক্ষিণ দেশের পেট্রো-রাসায়নিক সংস্থার টিউটিকোরিনের কারখানা ও মাঙ্গালোরের রাসায়নিক ও সার উৎপাদন কারখানা। ইহা ব্যতীত বৃটেনে ভারতের জন্য তিনটি বিরাট মাল বহনকারী জাহাজ নির্ম্মাণ করা হইবে। দুর্গাপুর ও মধ্য প্রদেশের জন্য তিনটি এ ভি বি বয়লারও আনা হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। এই সকল দ্রব্যাদি আনাইবার ব্যবস্থার জন্য অথবা ইহার অতিরিক্ত অপরাপর আমদানির জন্য যদি আরও টাকা ঋণ করিতে হয় তাহা হইলে সে ব্যবস্থাও করা হইবে বলিয়া ধার্য হইয়াছে। এই সকল ঋণের জন্য ভারতকে কোনও সুদ দিতে হইবে না এবং ধার শোধ কিস্তি করিয়া ২৫ বৎসরে করা হইবে। প্রথম সাত বৎসরে কোনও শোধের কিস্তি দিবার প্রয়োজন হইবে না। ঋণদান ব্যবস্থা বিষয়ক দলিল সাক্ষর করিবার সময় বৃটেনের শ্রীযুক্ত রিচার্ড উড বলেন যে, বৃটেন সকল সময়ই যথাসাধ্য ভারতকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছেন ও বৃটেনের সাহায্যে যদি ভারতের স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভ সহজ ও দ্রুতলভ্য হইয়া উঠে তাহা হইলে সেইরূপ পরিণতি বৃটেনের বিশেষ আনন্দের কারণ হইবে। শ্রীযুক্ত কে আর গণেশ ভারতের তরফ হইতে উত্তরে বলেন যে, বৃটেন যেরূপ বন্ধুভাবে ভারতের সহায়তা করিয়া আসিয়াছেন তাহাতে ভারতের নিকট বৃটেন বিশেষ করিয়া ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। এই বৎসর বৃটেন ভারতকে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক সাহায্য করায় ভারতের বিভিন্ন অর্থ-নৈতিক পরিকল্পনায় বাস্তব রূপায়ণে বিশেষ সাহায্য হইয়াছে।

কাগজ প্রস্তুত করিবার কারখানা

কুড়ি লক্ষ পাউণ্ড অর্থাৎ তিন কোটি ষাট লক্ষ টাকা দিয়া ভারতবর্ষ বৃটেনের ওয়ার্মাল্ড লিমিটেড নামক একটি কাগজ প্রস্তুতের কলকারখানা নির্ম্মাতাদিগের নিকট দুইটী কাগজের কারখানার বায়না করিয়াছে।

এই যন্ত্র নির্ম্মাতাগণ পৃথিবীর মধ্যে কাগজ তৈয়ির কলকব্জা নির্ম্মাণ কার্য্যে সর্ব্বাপেক্ষা স্বনাম ধন্য। ইঁহাদিগের কারখানা ল্যাঙ্কাশায়ারে বেরী নামক স্থানে প্রতিষ্ঠিত। ভারতবর্ষের জন্য যে দুইটি কারখানা নির্ম্মাণ করা হইবে সেগুলি হিন্দুস্থান পেপার করপোরেশন, নাগাল্যাণ্ড সরকারের সহিত সংযুক্তভাবে ক্রয় করিতেছেন। ভারতবর্ষের কাগজ উৎপাদন বৃদ্ধির বিশেষ প্রয়োজন আছে ও সেই কার্য যাহাতে সুসম্পন্ন হয় সেইজন্যই এই দুইটি কাগজের কারখানা স্থাপন ব্যবস্থা হইতেছে। একটি কারখানা হইতে দৈনিক ষাট টন ছাপার ও লিখিবার কাগজ প্রস্তুত হইবে। অপরটি হইতে শুধু দৈনিক চল্লিশ টন করিয়া বাঁধাই-এর কাগজ

উৎপাদন করা হইবে। ভারত সরকার ক্রমশঃ ভারতকে সকল বস্তু নিজ হস্তে প্রস্তুত করিয়া লইতে শিখাইবার চেষ্টা করিতেছেন। ইহা যথাসম্ভব শীঘ্র যাহাতে হয় সেই চেষ্টা চলিতেছে। ভারতবর্ষের যে পরিমাণ কাগজ প্রয়োজন সেই পরিমাণ কাগজ এই দেশে উৎপাদিত হয় না বলিয়া বিদেশ হইতে বহু কাগজ আমদানি করা হইয়া থাকে। ইহাতে বিদেশী মুদ্রা ব্যয় করিতে হয়। সুতরাং অধিক পরিমাণে কাগজ ভারতবর্ষে উৎপন্ন হইলে ভারতের অর্থ-নৈতিক সুবিধা হইবে। বর্ত্তমানে যেভাবে ধার করিয়া ধার শোধ করা হইয়া থাকে, বিদেশী মুদ্রা ব্যয় হ্রাস করিতে পারিলে সেই অবস্থার পরিবর্ত্তন সম্ভব হইতে পারিবে।

কয়টি কয়লা খনি বন্ধ হইয়াছে?

আসানসোল হইতে প্রকাশিত "কোলফিল্ড ট্রিবিউন" পত্রিকাতে বলা হইয়াছে যে শ্রীমোহন কুমারমঙ্গলমের মতে পশ্চিম বাংলায় ১৬টি কয়লা খনি বন্ধ হইয়া ৭৫০০ খনি কর্ম্মী বেকার হইয়াছেন। শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায় বলিয়াছেন যে ৪০টি খনি বন্ধ হইয়া ১০০০০ খনি-কর্ম্মী বেকার হইয়াছেন। কল্যাণ রায় এম পি বলিয়াছেন বন্ধ খনির সংখ্যা ৫৮টি এবং বেকার খনি কর্ম্মীরা হইলেন সংখ্যায় ২০০০০। এই সকল তথ্য পরস্পর-বিরোধী এবং ইহা দ্বারা প্রমাণ হয় যে, যথার্থ পরিস্থিতি কি তাহা কেহই জানেন না। সরকারী গণতিতে দেখা যায় যে অবস্থাটা তত সঙ্গীন নহে। কিন্তু জনসাধারণের হিসাবে অবস্থা আরও শোচনীয় বলিয়াই দেখা যায়। আসল কথা হইল যে, একটি খনিও বন্ধ কেন হয় এবং একজন মালকাটাও বেকার থাকে কেন? পশ্চিমবঙ্গে বেকার সমস্যা প্রবল ও কোনও কাজ কারবার বন্ধ থাকা কিম্বা প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি উৎপাদনে ব্যাঘাত সৃষ্টি যাহাতে না ঘটে তাহাই দেখা সকলের কর্ত্তব্য। কিন্তু সরকারী এবং বেসরকারী ব্যবস্থায় কোনও কিছুই উপযুক্ত রূপে চালিত হয় না। ফলে বাজারে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির অভাব এবং কর্ম্মী মহলে বেকার সমস্যা প্রবল হইয়া উঠে। ইহার প্রধান কারণ হইল, যাহাদের শিরঃ-পীড়া তাহাদের সহিত সংযোগ রক্ষা না করিয়া উচ্চ চিন্তা শীল আদর্শবাদী রাজনীতিবিদ্ এবং সেই একই জাতীয় সমাজ সংস্কারক সমাজনীতিবিদ্‌দিগের বাক্ বিতণ্ডার সাহায্যে দেশের কার্য্য পরিচালনা ও জাতীয় সমস্যাবলীর সমাধান চেষ্টা। ফলে কোন দিকেই কোন উন্নতি হইতে দেখা যায় না। উৎপাদন শক্তির পূর্ণ ব্যবহার ও উৎপাদিত বস্তুর পূর্ণতম ভাগবাট ও সম্ভোগ ব্যবস্থা পাঠ্য পুস্তকের নির্দ্দেশ অনুসারে করিতে যাওয়া গোড়ায় গলদের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সমাজকে আমলা ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রের মুরুব্বিদিগের ক্রীড়নক করিয়া পরিচালনা চেষ্টা কখনও সামাজিক উন্নতি ও প্রগতির পথ খুলিয়া দিতে পারে না। সকল ব্যবস্থাই সমাজের সকল ব্যক্তির সুখ সুবিধার ওজন বুঝিয়া চালাইলে তবেই কার্য্যক্ষেত্রে সফলতা আসিতে পারে। শুধু আদেশ নির্দ্দেশের দ্বারা স্বাস্থ্যবান্ সমাজ ব্যবস্থা কখনও গঠিত হইয়া উঠিতে পারে না।

অ্যাপোলো ১৭-র চন্দ্র অভিযান

বিগত ২০শে অগ্রহায়ণ, ৬ই ডিসেম্বর কেপ কেনেডি, ফ্লোরিডা, হইতে অ্যাপোলো ১৭ নামক যাত্রীবাহী চাউই চড়িয়া তিনজন আমেরিকান মহাকাশ বৈমানিক চন্দ্রে গমন করিয়াছেন। ইঁহারা এইবার চন্দ্রের একটা নূতন অঞ্চলে অবতরণ করিয়াছেন এবং সেই অঞ্চল হইতে বিভিন্ন প্রস্তরাদি পৃথিবীতে লইয়া আসিবেন। হ্যারিসন এইচ, স্মিট এইবার চন্দ্রে অবতরন যান চালনা করিয়াছেন। তিনি উচ্চশিক্ষিত ভূবিদ্যা ক্ষেত্রের বৈজ্ঞানিক। তাঁহার সহিত আছেন এ সেরনান। ইঁনি ইতিপূর্ব্বেও চন্দ্র অভিযানে অংশ গ্রহণ করিয়াছেন। তৃতীয় ব্যক্তি হইলেন রনাল্ড ই এভানস ইঁনি ইতিপূর্ব্বে কোন চন্দ্র অভিযানে গমন করেন নাই। ইঁনি চন্দ্রে অবতরণ করিতেছেন না। মহাকাশ যানটি চালনাই ইঁহার কাজ ও চন্দ্র হইতে অপর দুই ব্যক্তি ফিরিয়া আসা পর্য্যন্ত ইঁনি চন্দ্রের নিকটাকাশে ঘুরিতে থাকিয়া পৃথিবীতে সকলের

প্রত্যাবর্ত্তন ব্যবস্থা করিবেন। পরিকল্পনা অনুযায়ী ভাবে অ্যাপোলো ১৭,২০ তারিখ ডিসেম্বর প্রশান্ত মহাসাগরে অবতরণ করিবে। এইভাবে এই চন্দ্র অভিযান ১১ দিন ১৩ ঘণ্টা ও ৩১ মিনিট ধরিয়া চলিবে ও এই শতাব্দীতে ইহাই আমেরিকার শেষ চন্দ্র অভিযান। ইহার অর্থ ইহা নহে যে মহাকাশ ভ্রমণ এই শতাব্দীতে আর হইবে না। কারণ মঙ্গল গ্রহে যাইবার একটা পরিকল্পনা জাগ্রত ভাবেই এখন বিশ্ববাসীর সম্মুখে রহিয়াছে। ইহা কয়েক বৎসর পরেই সম্ভবত অনুষ্ঠিত হইবে।

এই লইয়া পৃথিবীর মানুষ ৪২ বার মহাকাশে গমন করিল। ইহার মধ্যে ২৭টি অভিযান আমেরিকানগণ চালাইয়াছেন। এই লইয়া আমেরিকান মহাকাশযাত্রীগণ পাঁচবার চন্দ্রে অবতরণ করিলেন।

মূল্যবৃদ্ধির পরিমাণ

১৯৩৯ আগষ্ট মাসে ১০০ শত টাকায় যে সকল বিভিন্ন প্রয়োজনীয় ভোগ্য বস্তু ক্রয় করা যাইত ১৯৭১ খৃঃ অব্দের আগষ্ট মাসে সেই সকল বস্তুর মূল্য হইয়াছিল বোম্বাই এলাকায় ৮০৪ টাকা, আহমেদাবাদে ৭৮৬ টাকা ও নাগপুরে ১০০৭ টাকা। ১৯৭২ খৃঃ অব্দের আগষ্ট মাস পড়িবার কয়েকদিন পূর্ব্বে ঐ সকল বস্তুর মূল্য হইয়াছিল বোম্বাই এলাকায় ৮৫৮ টাকা আহমেদাবাদে ৮২৫ টাকা ও নাগপুরে ১০৬০ টাকা। অর্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে যে সকল ব্যক্তি ত্রিশ টাকা মাসিক উপার্জ্জনের দ্বারা যে সকল দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া জীবন নির্বাহ করিতে সক্ষম হইতেন, ১৯৭১-৭২ খৃঃ অব্দে সেই জীবনযাত্রার মান রক্ষা করিয়া চলিতে তাঁহাদের তাহা অপেক্ষা ৮ হইতে ১০ গুণ অর্থের প্রয়োজন হইত। ২৫০-৩০০ টাকা বেতন পাইলে পূর্ব্বকার ত্রিশ টাকার জীবন যাত্রা মান রক্ষা সম্ভব হইতে পারিত হয়ত কিন্তু এই বিচারের কোন মূল্যায়ন একারণে কার্য্যকর হইতে পারে না যেহেতু জীবন যাত্রা মান ত্রিশ বৎসরাধিক কাল একই থাকিয়া যায় না। যাঁহারা যেভাবে দিন কাটাইতেন সেই যুগে, এখন তাঁহারা তাহা অপেক্ষা উন্নততর মান অবলম্বনে জীবন নির্বাহ করিয়া থাকেন। পায়ে জুতা, গায়ে জামা, হাতে ঘড়ি, পকেটে কলম, ট্র্যানজিস্টার রেডিও, ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা প্রভৃতি নানান কিছু এখন "অতি আবশ্যক" হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহা ব্যতীত অন্যান্য নানা প্রকার "নিশ্চয় চাই" জুটিয়া গিয়াছে; তাহার হিসাবের ফিরিস্তিও দীর্ঘ। এই সকল কারণে শুধু তুলনা-মূলক ভাবে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহের ব্যয়ের কথায় কোনও মূল্য ধার্য্য করা সমাজ বিজ্ঞানের দিক হইতে উচিত নহে। সাধারণ ভাবে বলা যায় যে মানুষের ব্যয়ের তুলনায় আয়ের পরিমাণ ক্রমশঃ কমিয়াই চলিয়াছে ও মানুষের দিন কাটান ক্রমে ক্রমে অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইতেছে।

সাময়িকী

খাদ্যবস্তুর অভাব

যদিও ভারতবর্ষের শাসকগণ বৎসরাধিক কাল হইতেই খাদ্যবস্তু উৎপাদন বিষয়ে এই দেশের স্বয়ং-সম্পূর্ণতার কথা সর্ব্বত্র উচ্চকণ্ঠে প্রচার করিতেছেন, তাহা হইলেও দেখা যাইতেছে যে, খাদ্য-সংকট এখনও দূর হয় নাই। সম্প্রতি ভারত সরকার যে বিদেশে কুড়ি লক্ষ টন গম ক্রয় করিবার কথা স্থির করিয়াছেন তাহাতে উত্তমরূপেই প্রমাণ হইতেছে যে, ভারতের ভাণ্ডারে এখনও খাদ্যবস্তুর অভাব প্রবলভাবেই বর্ত্তমান রহিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গেও দেখা যাইতেছে খাদ্যবস্তুর অভাব প্রকটভাবে দেখা দিয়াছে এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট খাদ্যবস্তু সরবরাহের জন্য দরবার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আরও কোন প্রদেশে কত চাউল অথবা গম কম পড়িয়াছে তাহার হিসাব এখনও আমরা জানিতে পারি নাই, কিন্তু একথা মোটামুটি জানা গিয়াছে যে খাদ্যাভাব সদাজাগ্রতভাবেই বহু স্থলেই বর্ত্তমান থাকিয়া গিয়াছে। "সবুজ বিপ্লব" একটা সুখ-স্বপ্নের কথা মাত্র এবং সেই বিপ্লব অজানার কুয়াশার অন্তরালে উঁকিঝুঁকি দিতে থাকিলেও তাহা শীঘ্রই হাওয়ায় মিলাইয়া গিয়াছে। এখন সেই পুরাতন ব্যাধিই আবার সমাজের দেহে পীড়াদায়ক ভাবে জাগিয়া উঠিতেছে এবং খাদ্যবস্তুর মূল্যবৃদ্ধি, কালো বাজার প্রভৃতি আবার সবল হইয়া উঠিতেছে।

এই যে খাদ্যবস্তু উৎপাদনে অল্পতার কথা ইহার মূলে প্রধানত আছে সেচন ব্যবস্থার অভাব। ভারতবর্ষে এখনও অধিকাংশ কৃষিক্ষেত্রে কৃষিকার্য্য আকাশের মেঘের উপর নির্ভর করে। বৃষ্টি পড়িলে চাষ হয়, না পড়িলে খাদ্যবস্তু উৎপন্ন হইতে পারে না। সেচ ব্যবস্থা পঁচিশ বৎসরেও সম্পূর্ণ হয় নাই এবং কখন হইবে তাহার কোন স্থিরতা নাই। সুতরাং সবুজ বিপ্লব জলাভাবে শুখাইয়া যাইবার সম্ভাবনা সর্ব্বদাই উপস্থিত রহিয়াছে এবং সেই অবস্থার যে উপায়ে উন্নয়ন সম্ভব হইতে পারে সে উপায় এখনও পূর্ণরূপে গঠিত হইতে পারে নাই। সেচন কার্য্য প্রকৃষ্টভাবে সুনিয়ন্ত্রিত হওয়া আবশ্যক। তাহা কখন হইবে কে বলিতে পারে?

বসন্ত রোগ নির্ম্মূল করিবার ব্যবস্থা

বিগত ১৪ই নভেম্বর হইতে ২৮শে নভেম্বর পর্য্যন্ত এক পক্ষকাল এই দেশে সর্ব্বত্র বসন্ত রোগ নির্ম্মূল করিবার ব্যবস্থা করা হইবে বলিয়া প্রচার করা হয়। অর্থাৎ ঐ পক্ষে দেশের সর্ব্বত্র যথাসম্ভব বসন্তের টিকা দিবার ব্যবস্থা করা হইবে; কারণ ঐ রোগ নিবারণের একমাত্র বৈজ্ঞানিকভাবে গ্রাহ্য উপায় হইল টিকা দেওয়া। এই বৎসর বসন্ত রোগ অপর বৎসরের তুলনায় প্রবলতর ভাবে দেখা দিয়াছে এবং আগষ্ট মাস অবধি ২১০০০ হাজার মানুষের ঐ রোগ হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। ইহার এক বৎসর পূর্ব্বে ঐ রোগ উহার এক দশমাংশেরও কম সংখ্যক মানুষকে আক্রমণ করিয়াছিল। রোগাক্রান্ত ব্যক্তির সংখ্যার বৃদ্ধির একটা বড় কারণ হইল টিকা না লওয়া। এই কারণে দেশের সর্ব্বত্র যাহাতে সকল ব্যক্তিই টিকা লইতে পারেন তাহার আয়োজন হইয়াছে ও হইতেছে। আর একটা কথা হইল, বসন্ত রোগ দেখা দিলে সেই খবর নিকটস্থ স্বাস্থ্য বিভাগীয় প্রতিষ্ঠানে পৌঁছান। ইহা অনেক সময়েই করা হয় না এবং তাহার ফলে রোগ ছড়াইয়া পড়িবার সম্ভাবনা বৃদ্ধি

হয়। কোথাও বসন্ত রোগ হইলেই সেই গৃহের অধিবাসীদিগকে যত্রতত্র গমনাগমন করিতে না দিলে রোগ ছড়াইয়া পড়িবার সম্ভাবনা হ্রাস হয়। এই সংক্রমণ নিরোধ ব্যবস্থা অথবা "কোয়ারাণ্টিন" যথাযথভাবে পালিত হওয়া অবশ্য প্রয়োজন। তাহা হইতেছে কি না দেখা স্বাস্থ্য বিভাগের লোকেদের কর্তব্য।

আসামের কথা

"যুগশক্তি" (করিমগঞ্জ) পত্রিকায় প্রকাশ :—

আসামের মুখ্যমন্ত্রী যখন অসমীয়া ছাত্র সমাজের উগ্র মনোভাবের কাছে সম্পূর্ণ নতি স্বীকার করিয়া তাঁহার শেষ প্রেস বিজ্ঞপ্তিটি প্রচার করিয়াছেন ঠিক তারপরই ডিব্রুগড় ও ধুবড়ীতে নূতন করিয়া হাঙ্গামা বাধিল। যথারীতি এই দাঙ্গার প্রকৃত চিত্রও বহির্জগতে উপস্থাপিত হয় নাই, তবে বেসরকারী সূত্রে জানা যায়, ডিব্রুগড়ে একতরফা দাঙ্গা ভয়াবহ রূপ ধারণ করিয়াছিল এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে সীমাহীন দুর্গতির সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। এই হাঙ্গামার পেছনে যাহারা থাকুক না কেন, তাহাদের শায়েস্তা করার সম্পূর্ণ দায়িত্ব সরকারের। কিন্তু এত কাণ্ড ঘটিয়া যাওয়ার পর এখনও সরকারের কোন চৈতন্যোদয় হয় নাই, তাহাদের হাস্যকর ভূমিকা অপরিবর্তিতই আছে।

এদিকে কাছাড়ে আর খুব বেশীদিন আন্দোলন ঠেকাইয়া রাখা যাইবে না। ছাত্র ও যুব সংগ্রাম পরিষদ ১লা ডিসেম্বর হইতে সত্যাগ্রহ ঘোষণা করিয়াছেন। বিগত মাসাধিক কাল কাছাড়বাসী যে অসীম সংযম এবং সহনশীলতা প্রদর্শন করিয়াছেন তাহার মর্য্যাদা দিতে আসাম সরকার অপারগ হইয়াছেন, তবে কেন্দ্রের মনোভাব এই সম্পর্কে যুক্তিসহ এবং নিরপেক্ষ হইবে বলিয়া কাছাড়বাসী বিশ্বাস করেন। কিন্তু আসাম উপত্যকার উত্তেজনা এখনও প্রশমিত হয় নাই, সর্বস্তরে

সংখ্যালঘুদের পর্যাপ্ত ক্ষতি স্বীকার করিতে হইতেছে, সর্বোপরি আসাম সরকারের ভূমিকা এখনো প্ররোচনা-মূলক। সুতরাং কাছাড়ে শান্ত পরিস্থিতির বিস্ফোরণ-মূলক পরিবর্তন ঘটা অস্বাভাবিক নয়। কেন্দ্রের তাহা স্মরণ রাখা প্রয়োজন।

হোজাইতে শতাধিক বাঙ্গালী যুবককে আসাম সরকারের পুলিশ শান্তি রক্ষার নামে গ্রেপ্তার করে। গ্রেপ্তারের পর থানায় পশুর মত মারধোর করে। প্রায় ৫০টি যুবক মারের চোটে জ্ঞান হারায়। অনেক যুবকের হাত মুচড়ে ভেঙ্গে দেওয়া হয়।

পুলিশের মার খাওয়া আহত এই সব যুবক নওগাঁ জেলে আজ মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে। সুব্রত ভদ্র এবং কামাখ্যা সাহা নওগাঁ জেলে প্রাণ দিয়াছে। আরও অন্তত ৬০টি যুবক মৃত্যুশয্যায়, চিকিৎসাহীন।

নওগাঁ জেলার বিভিন্ন স্থান থেকে সাম্প্রতিক ভাষা দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্থ সহস্রাধিক অসহায় নরনারী লামডিং গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন। এরা নিদারুণ কষ্টে দিন কাটাচ্ছেন। রাজ্য সরকার দুদিন চাল এবং দুধ দিয়েছিলেন। এরপর এদের সরকার থেকে নিজ নিজ স্থানেই চলে যেতে বলা হয় কিন্তু আতঙ্কে এঁরা নিজ নিজ স্থানে যেতে অস্বীকার করেন। এরপর থেকে এরা স্থানীয় জনসাধারণের সংগৃহীত চাল-ডালে অর্দ্ধাহারে দিন কাটাচ্ছেন। ইতিমধ্যে কয়েকটি শিশু প্রাণ হারিয়েছে বলেও জানা গেছে।

গত ৫ই নভেম্বর কয়েকদিন উপবাস থাকার পর প্রায় দুশো আশ্রয়প্রার্থী ৪নং আসাম মেল ট্রেনের সম্মুখে বসে পড়ে। চারজন আশ্রয়প্রার্থীকে ঐ সময় পুলিশ গ্রেপ্তার করে।

বেসরকারী সূত্রে পাণ্ডু, মালিগাঁও থেকে কিছু চাল-ডাল, জামা কাপড় এবং সামান্য অর্থ পাওয়া যায়। হোজাই থেকেও কিছু সাহায্য আসে। পাণ্ডুর ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ পরিচালিত মিলন মন্দিরের তরফ থেকেও কিছু কাপড়, জামা, কম্বল ও থালা বাসন বিতরণ করা হয়েছে। প্রয়োজনের তুলনায় এসব সাহায্য খুবই নগণ্য।

দেশ-বিদেশের কথা

সি আই এ কি করে ?

রুশিয় রুনদুল কলিকাতা হইতে যে প্রচার-পত্রিকা প্রকাশ করেন তাহাতে সি আই এ-র কার্য্যকলাপ সংক্রান্ত নিয়ে উদ্ধৃত বর্ণনাবলী বাহির করা হইয়াছে :—

একটি দলিল। দলিলটির ডান দিকে একেবারে উপরে লেখা আছে : গোপনীয়। সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য নয়।

বড় বড় হরফে মাঝখানে লেখা আছে : গোয়েন্দা বিভাগ ও বৈদেশিক কর্মনীতি। দলিলটির নীচে লেখা আছে : বৈদেশিক কর্মনীতি পরিষৎ, ৫৮, ইস্ট, ৬৮তম স্ট্রীট, নিউইয়র্ক ২১। এটি হল মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির সঙ্গে যুক্ত মার্কিন গোয়েন্দাগিরির সমস্যাসমূহের পর্যালোচনার মোড়ক। এই গোপন দলিলটি থেকে কিছু কিছু উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে প্যারিস থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক **জুনে আফ্রিক**-এ। সম্পাদকীয় টিপ্পনিতে বলা হয়েছে যে পত্রিকার "মার্কিন বন্ধুদের" কাছ থেকে জিনিষটি পাওয়া গেছে। পর্যালোচনার বিষয়বস্তুগুলি দেখানোর আগে ফরেন পলিসি কাউন্সিল (এফ পি সি) বা বৈদেশিক কর্মনীতি পরিষৎ সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলা দরকার।

১৯২১ সালে রকাফেলার ও মরগ্যানদের টাকায় বিশিষ্ট বৈদেশিক কর্মনীতি বিশারদদের নিয়ে এই পরিষৎ প্রতিষ্ঠিত হয়। এঁরা মার্কিন পুঁজিপতিদের সেরা বুদ্ধিজীবীদের নামকরা প্রতিনিধি। এঁদের তিন রকম কর্মকাণ্ডে অভিজ্ঞতা আছে অথবা তিন রকম কর্মকাণ্ডের একটির বিকল্পে অপরটি এঁরা গ্রহণ করেছেন। যেমন, প্রশাসনিক, শিক্ষাসংক্রান্ত (আমেরিকায় বৃহত্তম বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে) এবং ব্যবসাবাণিজ্য সংক্রান্ত কাজ। বৈদেশিক কর্মনীতি পরিষদে যাঁদের নাম আমরা দেখতে পাই তাঁরা হলেন : রকাফেলার (ডেভিড রকাফেলার এখন পরিষদের সভাপতি), মরগ্যান, ডিলন, হ্যারিম্যান, হিউয়েস, ষ্টিমসন, ম্যাকক্লয়, লোভেট, ষ্টিভেনসন, বাণ্ডি, কিসিংগার...প্রকৃতপক্ষে বৃহৎ পুঁজিপতিদের সকলেই এবং যাঁরা গত কয়েক দশক ধরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতিকে রূপ দিচ্ছেন এবং কার্যকর করছেন তাঁরা এঁদের মধ্যে আছেন।

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং আন্তর্জাতিক একচেটিয়া পুঁজিপতি সংস্থাগুলি এই পরিষৎকে বছরে দশলক্ষ ডলার যোগায়। পরিষৎ এদের পররাষ্ট্রনীতি সংক্রান্ত গোপন সমীক্ষা সরবরাহ করে। **ফরেন এ্যাফেস**´ নামে একটি প্রভাবশালী সাময়িক পত্র এবং পররাষ্ট্রনীতি সংক্রান্ত গবেষণা-পুস্তিকাদি সহ গ্রন্থসমূহ পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত হয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কিত সংস্থাগুলির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত থাকবেন এবং পররাষ্ট্রনীতি রূপায়িত করবেন এমন সব লোকদের উক্ত পরিষদের নেতাদের মধ্যে থেকেই বেছে নেওয়া হয়। প্রেসিডেন্ট কেনেডির আমলে পরিষৎ সদস্য ডীন রাস্ক এবং অন্যতম সদস্য ম্যাককর্জ বাণ্ডি যথাক্রমে পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং জাতীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত ব্যাপারের বিশেষ উপদেষ্টা নিযুক্ত হন। সাড়ে তিন বছর আগে পরিষৎ সদস্য হেনরি

কিসিংগার জাতীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত ব্যাপারে প্রেসিডেন্টের সহকারী নিযুক্ত হন।

বৈদেশিক কর্মনীতি পরিষৎ সর্বদাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার (সি আই এ) সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ রেখে চলে। বিভিন্ন সময়ে পরিষদের বর্তমান ও প্রাক্তন অনেক সদস্যই মার্কিন গোয়েন্দা বিভাগের বড় বড় পদে বহাল ছিলেন।

এখন বৈদেশিক কর্মনীতি পরিষদের একটি অধিবেশনের পর্যালোচনা আমরা উপস্থাপিত করছি।

সভাপতির আসনে বসে আছেন ডগলাস ডিলন—প্যারিসের প্রাক্তন মার্কিন রাষ্ট্রদূত, ১৯৫৯ - ১৯৬০ সালে সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ১৯৬০।১৯৬১ সালে অর্থমন্ত্রী। বক্তা উইলিয়াম হ্যারিস। ইনি হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং গোয়েন্দাগিরি সম্পর্কে গ্রন্থপঞ্জীর রচয়িতা। আলোচনা পরিচালনা করছেন রিচার্ড বিসেল। ইনি সি আই এ-র পরিকল্পনা দপ্তরের প্রাক্তন সহকারী পরিচালক এবং বর্তমানে ম্যাসাচুসেটস ইনষ্টিটিউট অব টেকনোলজির অর্থনীতির অধ্যাপক।

মার্কিন সরকারের গোয়েন্দাগিরির লক্ষ্য ও পন্থা নিয়েই আলোচনা চলছে। কেউ কাউকে দেখে লজ্জা বোধ করছেন না, কেননা এখানে অচেনা কেউ নেই। কোন রাখঢাক এখানে নেই।

খবর যোগাড় করার তিনটি পন্থারই গুরুত্বের প্রতি বক্তা দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। চিরাচরিত গুপ্তচরবৃত্তি ছাড়া আরও দুটি পন্থা হল: বিমান থেকে গুপ্তচরবৃত্তি এবং বেতার ও ইলেকট্রোনিকের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ। সংবাদপত্রসমূহ থেকে তথ্য সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে একজন বিশেষজ্ঞের মন্তব্য নথিভুক্ত করা হল। আলোচনায় যোগদানকারী একজন অভিযোগ করলেন যে, বর্তমানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার স্তর এত উঁচু যে মার্কিন গুপ্তচরেরা বুঝতে পারেন না যে তাঁরা কিসের সন্ধান করবেন।

দলিলে একটি নতুন প্রবণতার কথা বলা হয়েছে। মার্কিন গোয়েন্দাদের তৃতীয় দুনিয়ার দিকে আরও বেশী মনোযোগ দিতেই হবে। পরিষৎ মনে করেন যে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে খবর যোগাড় করার অধিকতর সুযোগ রয়েছে, কারণ এই সব দেশে উন্নত দেশগুলির চাইতে নিরাপত্তার দিকে কম দৃষ্টি দেওয়া হয়।

> এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকায় মার্কিন গোয়েন্দাদের প্রধান কাজ হল যথাসময়ে "আভ্যন্তরীণ শক্তিগুলির পারস্পরিক সম্পর্কে"র পরিবর্তন সম্পর্কে মার্কিন সরকারকে অবহিত করা। "সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সঙ্গে সদাসর্বদা যোগাযোগ রক্ষা করা" ছাড়া এ রকম সব খবর দেওয়া কঠিন।

বক্তা আরও বললেন যে নিম্নপদস্থ অফিসার এবং সাধারণ সৈনিকদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করার ব্যাপারটি প্রায়ই উপেক্ষা করা হয় বলে তাঁদের অজান্তে একাধিকবার আকস্মিক সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে গেছে। ট্রেড ইউনিয়ন ও অন্যান্য নেতাদের সম্পর্কেও একথা খাটে। ঘটনাসমূহের সঙ্গে জড়িত প্রধান প্রধান লোকদের সম্পর্কে ভালভাবে জানা থাকলে সত্যিকারের পূর্বাভাস দিতে পারা যায়।

পরিষৎ সদস্যরা তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলিতে "অনুপ্রবেশে"র একটি কর্মসূচীর রূপরেখা তুলে ধরলেন। কোন লোককে গুপ্তচরে পরিণত করতেই হবে এমন কোন কথা নেই; কখনও কখনও দেখা যাবে যে, দৃঢ় সম্পর্ক থাকলেই যথেষ্ট। মাঝে মাঝে অর্থ উপহার দিয়ে এই সব লোককে উৎসাহিত করা যেতে পারে। দলিলে বলা হয়েছে যে, কোন কোন দেশে স্থানীয় সি আই এ চক্রের বড়কর্তা রাষ্ট্রপ্রধানের ঘনিষ্ঠ উপদেষ্টা (একটি ক্ষেত্রে এক গেলাসের ইয়ারও বটে)।

পরিষদের যে সব সদস্য বক্তৃতা দিলেন তাঁদের সকলেই কঠোরভাবে গোপনীয়তা রক্ষার উপর জোর দেন। স্পষ্টই বোঝা যায় যে, সি আই এ-র কার্যকলাপ ধরা পড়ে যাওয়ার ব্যাপার সম্প্রতি সংবাদপত্রসমূহে বড় বড় হরফের শিরোনামায় প্রকাশিত হওয়ায় বড়কর্তারা বিরক্ত হয়েছেন।

এই প্রসঙ্গে আলোচনা যিনি পরিচালনা করলেন তিনি সি আই এ-র কার্যকলাপ "আড়াল করা"র ব্যবস্থা উন্নত করা সম্পর্কে তাঁর কয়েকটি অভিমত প্রকাশ করেন। তিনি মনে করেন যে, যে সমস্ত সংস্থায় বেশীর ভাগ কর্মী আমেরিকান নন সেই সব ব্যক্তিগত মালিকানাধীন সংস্থাকে কাজে লাগানোই সুবিধাজনক। ঐসব লোক পেশাদার চরেও পরিণত হতে পারে। তাঁর মতে লাতিন আমেরিকা, এশিয়া ও আফ্রিকায় মার্কিন গোয়েন্দাদের উপর বেশী নজর রাখা হচ্ছে বলে এটা করা দরকার। ঐ সব জায়গায় আমেরিকানদের উপর নজর রাখা সহজ।

"সক্রিয় কার্যকলাপ" সম্পর্কে আলোচনাকালে পরিষৎ সি আই এ-র পররাষ্ট্রনীতি সংক্রান্ত নিম্নলিখিত ৮ দফা তৎপরতার একটি রূপরেখা উপস্থাপিত করেন: (১) রাজনৈতিক বাসনা প্রকাশ ও উপদেশদান; (২) ব্যক্তিগতভাবে আর্থিক সাহায্যদান (অর্থাৎ ঘুষ দেওয়া —লেঃ); (৩) রাজনৈতিক দলগুলিকে অর্থ সাহায্যদান; (৪) ব্যক্তিগত মালিকানাধীন সংস্থা, ট্রেড ইউনিয়ন, ব্যবসারত কোম্পানী, সমবায় সমিতিসমূহকে সাহায্য দান; (৫) গোপন প্রচার; ৬) "ব্যক্তিগত সংস্থাসমূহের" মাধ্যমে বিশেষজ্ঞদের প্রশিক্ষণ; (৭) অর্থ-নৈতিক সহযোগিতা; কোন দেশের সরকারকে গদিচ্যুত করার বা গদিতে বহাল রাখার উদ্দেশ্যে সামরিক ধরনের কার্যকলাপ।

পরিষদের দলিল থেকে উদ্ধৃত অংশগুলি আর ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। এ সব থেকে কয়েকটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব। প্রথমতঃ, মার্কিন গোয়েন্দাবিভাগ এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার দেশগুলি সম্পর্কে অধিকতর আগ্রহান্বিত হয়ে উঠেছে। যে এইসব দেশে মার্কিন গোয়েন্দাচক্রের অন্যতম প্রধান। দ্বিতীয়তঃ এধা বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে কাজ হল রাষ্ট্রের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মাথায় নয়া উপনিবেশবাদী চিন্তাধারা ঢুকিযে দেওয়া। তৃতীয়তঃ, মার্কিন সরকার এখনও উন্নয়নশীল দেশগুলির ব্যাপারে হস্তক্ষেপের— সামরিক হস্তক্ষেপ পর্যন্ত—উপর নির্ভর করছেন।

জুনে আফ্রিক মন্তব্য করেছেন: "রিচার্ড বিসেলের প্রস্তাবিত নাশকতার উপায়সমূহের তালিকাটি মনোযোগ দিয়ে পড়ার জন্য আমরা আফ্রিকান নেতাদের সুপারিশ করছি। এই তালিকায় দৃষ্টান্ত বা নাম নেই, তবে যা দেওয়া হয়েছে তা সহজেই পূরণ করা যায়: শুধু লুমুম্বা, গুয়েভারা, মোসাদ্দেক, আরবেন্স রাই যে "শান্ত আমেরিকান" ও তাদের দালালদের বলি নয় এ কথা সকলেই জানুক। আর যে তা জানবে তার মূল্য' যারা জানে না তাদের দুজনের সমান।"

কমসোমোলাসকাইয়া প্রাভদা,
২৫শে নভেম্বর, ১৯৭২।

মার্কিন বাণিজ্য নীতির পরিবর্তন

মার্কিন দেশ বহুকালাবধি কম্যুনিষ্ট দেশগুলির সহিত বিরুদ্ধাচরণ করিয়া পৃথিবী হইতে কম্যুনিজমের বিলোপ চেষ্টা করিয়া আসিয়াছেন। ফলে মার্কিন দেশেরই ক্ষতি হইয়াছে এবং কম্যুনিষ্ট দেশগুলির কোনও বিশেষ অসুবিধা হয় নাই। "ব্যাকগ্রাউণ্ডার" পত্রিকায় মার্কিন আন্তর্জাতিক বাণিজ্যনীতির বিফলতা সম্বন্ধে একটি রিপোর্টের কথা প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার কিছু অংশ আমরা এইখানে উদ্ধৃত করিতেছি।—

রিপোর্ট প্রণেতারা বলেছেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যখন সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে বাণিজ্যের প্রবল বিরোধী ছিল তখন তার মিত্রবর্গ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত কঠোরভাবে বাণিজ্য সীমিত রাখতে অনিচ্ছুক হয়ে নিঃশব্দে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে বাণিজ্য করে গেছে।

রিপোর্ট প্রণেতারা দেখিয়েছেন যে, এই কারণেই ১৯৬০-১৯৭০ এই দশ বছরে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে পশ্চিম জার্মানীর রপ্তানী ৫৩ কোটি ৬৪ লক্ষ ডলার থেকে বেড়ে ১৪৭ কোটি ৫০ লক্ষ ডলারে দাঁড়ায়। জাপানের রপ্তানী বাড়ে আরও বেশী—৬ কোটি ৫৭ লক্ষ ডলার

থেকে ১০৪ কোটি ৪০ লক্ষ ডলার। আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কি করছে? সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রপ্তানী করে ১৯৬০ সালে ১৯ কোটি ৩০ লক্ষ ডলার মূল্যের পণ্যাদি এবং ১৯৭০ সালে করে ৩৫ কোটি ৩৩ লক্ষ ডলার মূল্যের পণ্য। সুইডেন ফিনল্যাণ্ড অথবা অষ্ট্রিয়া সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে যত ডলারের মাল রপ্তানী করে উল্লিখিত সংখ্যা তার চাইতেও কম। আমদানির ক্ষেত্রেও অনুরূপ চিত্রই চোখে পড়ে।

রিপোর্টে দেখানো হয়েছে যে, পূর্ব ইয়োরোপের সঙ্গে পশ্চিম ইয়োরোপের ছয়টি দেশ (কমন মারকেটভূক্ত) ১৯৭১ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চাইতে দশগুণ বেশী মূল্যের বাণিজ্য করেছে এবং পূর্ব ইয়োরোপের সঙ্গে পশ্চিম ইয়োরোপের অবাধ বাণিজ্য এলাকাভূক্ত দেশ-গুলির বাণিজ্যও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চাইতে ছয়গুণ বেশী। এই পার্থক্যের কারণ হল প্রথমতঃ, পূর্ব ইয়োরোপের সঙ্গে বাণিজ্যের ব্যাপারে মার্কিন সরকারের বিশেষ বিধিনিষেধ এবং দ্বিতীয়তঃ, কয়েকটি পণ্যের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা করতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অক্ষমতা।

রিপোর্ট রচয়িতারা দুঃখ করে বলেছেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আরোপিত বিধিনিষেধের অপরিবর্তনীয় কর্মনীতির যদি কোন ফল পাওয়া যেত তা হলেও না হয় এর পক্ষে কিছু বলা যেত। কিন্তু ফল তো কিছুই হয় নি, বরং সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি প্রমাণ করেছে যে, তারা দ্রুত বেগে তাদের অর্থনীতির বিকাশ ঘটাতে সমর্থ। এই সব দেশের সঙ্গে বাণিজ্য করার ব্যাপারে বিধিনিষেধ আরোপ করে তাদের প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিবিদ্যা ও উৎপাদনক্ষমতার বিকাশ ঘটাতে উৎসাহিত করা হয়েছে এবং এর ফলে তারাই শক্তিমান্ হয়ে উঠেছে।

অতএব সিদ্ধান্ত হল এই: কয়েকটি পণ্য বিক্রয় (সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে) সংক্রান্ত বিধিনিষেধের আবশ্যকতা সম্পর্কে আমরা সন্দেহ পোষণ করি..... আমরা সুপারিশ করছি যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উচিত বিশেষ কয়েক প্রকার সাজসরঞ্জাম তৈরীর জন্য প্রয়োজনীয় মালমশলা ও প্রযুক্তিবিদ্যা ছাড়া কমিউনিষ্ট দেশগুলিতে রপ্তানী সংক্রান্ত সমস্ত বিধিনিষেধ অপসারিত করা।

রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, ১৯৬৫ সালেই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্কে বিধিনিষেধের কর্মনীতি ব্যর্থ হচ্ছে দেখে অর্থ-নৈতিক উন্নয়ন কমিটি পূর্ব-পশ্চিম বাণিজ্য সম্পর্কে একটি রিপোর্ট পেশ করেছিলেন। এই রিপোর্টে বাণিজ্য সংক্রান্ত কর্মনীতি পরিবর্তনের জন্য কয়েকটি সরকারী কমিটি গঠিত হয় এবং ১৯৬৯ সালে প্রশ্নটি নিয়ে কংগ্রেসে বিস্তারিত আলোচনা হয়। কংগ্রেসে মার্কিন বিধিনিষেধ শিথিল করার ঔচিত্যের উপর জোর দেওয়া হয়। ঠাণ্ডা যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর এই প্রথম পূর্ব ইয়োরোপে ব্যাপকতর বাণিজ্যের জন্য কংগ্রেসে দাবি ওঠে।

কুষ্ঠ ও ধবল

৭০ বৎসরের চিকিৎসাকেন্দ্রে হাওড়া কুষ্ঠ-কুটীর হইতে নব আবিষ্কৃত ঔষধ দ্বারা দুঃসাধ্য কুষ্ঠ ও ধবল রোগীও অল্প দিনে সম্পূর্ণ রোগমুক্ত হইতেছেন। উহা ছাড়া একজিমা, সোরাইসিস, দুষ্টক্ষতাদিসহ কঠিন কঠিন চর্ম্ম-রোগও এখানকার সুনিপুণ চিকিৎসায় আরোগ্য হয়। বিনামূল্যে ব্যবস্থা ও চিকিৎসা-পুস্তকের জন্য লিখুন।

পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্ম্মা কবিরাজ, পি,বি, নং ৭, হাওড়া

শাখা :—৩৬নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা-৯

দি বেঙ্গল আর্ট প্রিণ্টার

৭, ইণ্ডিয়ান মিরার ষ্ট্রীট,

কলিকাতা-১৩

ব্যবসা ব্যবসাই

কয়েকটি বিধিনিষেধ লোপ করা হয়েছে (যেমন, ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে প্রেসিডেন্ট মার্কিন প্রতিষ্ঠানগুলির বিদেশী শাখাগুলি কর্তৃক সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে পণ্য রপ্তানী সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করেন) রিপোর্টে এ কথা উল্লেখ করেও রিপোর্ট প্রণেতারা অসন্তোষ প্রকাশ করে বলেছেন যে, এখনও বহু বিধিনিষেধ বলবৎ রয়েছে। ব্যবসায়ীরূপে তাঁরা পরিষ্কারভাবেই উপলব্ধি করেন যে, ব্যবসা ব্যবসাই এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যদি সত্যি সত্যিই সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে বাণিজ্যের প্রসার ঘটাতে চায় তা হলে এই ব্যাপারে ব্যবসায়ীসুলভ মনোভাব দেখাতে হবে।

রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, এর জন্য সর্বোপরি প্রয়োজন হল বাণিজ্যের জন্য স্বাভাবিক অর্থের যোগান সুনিশ্চয় করা। সুপারিশ করা হচ্ছে যে, পশ্চিম ইয়োরোপের অন্যান্য শিল্পপ্রধান দেশগুলির ক্ষেত্রে ঋণ-সংক্রান্ত যে কর্মনীতি অনুসৃত হয় কমিউনিষ্ট দেশগুলির ক্ষেত্রেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সেই কর্মনীতিই অনুসরণ করুক।

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির রপ্তানীর উপর যে বৈষম্য-মূলক মার্কিন শুল্ক ধার্য করা হয় তারও বিলোপ-সাধন করা দরকার। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যদি ঐ সব দেশে রপ্তানী বাড়াতে চায় তা হলে ঐ সব দেশ থেকে তাকে আমদানিও করতে হবে। তা না হলে বাণিজ্য হবে কি করে? অতএব সিদ্ধান্ত হল এই যে, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশকে সর্বাধিক আনুকূল্যপ্রাপ্ত দেশ বলে বিবেচনা করা হোক।

(গত ১৫ই নভেম্বর নিউ ইয়র্কে জাতীয় বৈদেশিক বাণিজ্য পরিষদের এক সম্মেলন হয়। এতে যোগদান করেন দুই সহস্রাধিক মার্কিন ব্যবসায়ী। মার্কিন-সোভিয়েত বাণিজ্য সম্প্রসারণের আহ্বান জানিয়ে সম্মেলনে গৃহীত এক প্রস্তাবে সোভিয়েত ইউনিয়নকে সর্বাধিক আনুকূল্য প্রাপ্ত দেশ রূপে মেনে নেওয়ার জন্য আবেদন জানানো হয়।')

সবশেষে রিপোর্টে বলা হয় যে যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দীর্ঘস্থায়ী ভিত্তিতে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের সঙ্গে ব্যাপক বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে তোলার কাজ শুরু করার সিদ্ধান্ত করে তা হলে পশ্চিম ইয়োরোপের দেশগুলি ও জাপানের দৃষ্টান্ত অনুসরণের সময় হয়ে গেছে। এইসব দেশ নির্ভয়ে শিল্প প্রকল্প নির্মাণে সহযোগিতা করতে রাজী হয়েছে। নক্সা তৈরী হয়ে গেলে সরবরাহকারী দেশগুলি ধারে সাজসরঞ্জাম দেয় এবং দেনা শোধ বাবদ চালু-হয়ে-যাওয়া শিল্পসংস্থার উৎপাদিত পণ্য সরবরাহকারী দেশগুলি নেয়। রিপোর্ট প্রণেতারা সুপারিশ করেছেন যে মার্কিন সরকারও যেন মার্কিন কোম্পানীগুলিকে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে অনুরূপ চুক্তি করতে বাধা না দেন।

পরিমল গোস্বামী রচিত সর্বাধুনিক গ্রন্থ

প ত্র স্মৃ তি

লেখক কর্তৃক গৃহীত ৩৬ খানি ফোটোগ্রাফ, মূল্যবান্ মুদ্রণ, ৭৮ জন পত্র লেখক ও লেখিকার ৩৫০ খানি পত্র ও পত্রাংশ—আর তাদের ঘিরে লেখকের বিচিত্র স্মৃতি। বাংলা সাহিত্যে সম্পূর্ণ অভিনব। মূল্য বাইশ টাকা।

যাঁদের পত্র ঘিরে লেখকের স্মৃতি রচিত হয়েছে

অজিতকৃষ্ণ বসু—অঞ্জনা ভৌমিক—অতুলচন্দ্র বসু—অতুলানন্দ চক্রবর্তী—অমল হোম—অমিতা রায়—অমিয়া চৌধুরাণী—অশোক মৈত্র—আবদুল আজীজ আমান—আশু দে—ইন্দিরা দেবীচৌধুরাণী—কালিদাস নাগ—কালিদাস রায়—কিরণকুমার রায়—গীতশ্রী বন্দনা সেনগুপ্ত—গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য—গোপাল ঘোষ—গোপাল হালদার—চন্দ্রশেখর বেঙ্কট রামন্—জয়ন্তনাথ রায়—জয়ন্তী সেন—জাহান আরা বেগম—জীবনময় রায়—জ্যোতির্ময় ঘোষ—তপতী বিশ্বাস—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়—দিগিন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য—দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী—নলিনীকান্ত সরকার—নিখিলচন্দ্র দাস—নিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী—নীরদচন্দ্র চৌধুরী—নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়—পুলিন বিহারী সেন—পি. সি. সরকার—প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়—প্রমথ চৌধুরী—প্রমথনাথ বিশী—প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়—প্রেমেন্দ্র মিত্র—বনফুল—বনবিহারী মুখোপাধ্যায়—বারীন্দ্রকুমার ঘোষ—বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়—বিনয়কুমার সরকার—বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়—বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়—বিমলাকান্ত রায়চৌধুরী—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—মণীন্দ্রচন্দ্র সমাদ্দার—মণীষ ঘটক—মায়া বসু—মার্গারেট চ্যাটার্জী—মৈত্রেয়ী দেবী—রাজশেখর বসু—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—লীলা বন্দ্যোপাধ্যায়—লীলা মজুমদার—লীলা সিং—শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়—শশিশেখর বসু—শিবরাম চক্রবর্তী—শিশিরকুমার ভাদুড়ি—শীতলাকান্ত শীল—শোভা সেন—সতীনাথ ভাদুড়ী—সবিতা সেনগুপ্ত—সুধাকান্ত রায়চৌধুরী—সুধীরকুমার চৌধুরী—সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী—সৈয়দ মুজতবা আলী—হারীতকৃষ্ণ দেব—হেমলতা ঠাকুর।

পরিবেশক : রূপা অ্যাণ্ড কোং কলিকাতা-১২

পরিমল গোস্বামী রচিত

আধুনিক ব্যঙ্গ পরিচয়

মূল্য ছয় টাকা

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী বলেন—

বাংলা ভাষায় ব্যঙ্গ সাহিত্য সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ।

●

প্রেসিডেন্সি কলেজের বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক

শ্রীভবতোষ দত্ত বলেন—

আধুনিক ব্যঙ্গ পরিচয়ের ভূমিকাতে ব্যঙ্গের লক্ষণ যে রকম সুনির্দিষ্ট এবং পরিষ্কার করে বলা হয়েছে এমন আর কোন বইতে হয়েছে বলে জানি না।

পরিবেশক : নবগ্রন্থনা, ৮, কৈলাস বসু স্ট্রীট কলিকাতা-৬

শহীদ যতীন দাস ও ভারতে বিপ্লব আন্দোলন॥ সন্তোষকুমার অধিকারী॥ জে এন্ ঘোষ এ্যাণ্ড সন্‌স্॥ কলিকাতা-১২ শহীদ যতীন দাস স্মৃতি সমিতি পক্ষে শ্রীমতী কমলা দাস কর্তৃক প্রকাশিত॥ দাম চার টাকা॥

এই মূল্যবান্ জীবনী গ্রন্থটির ভূমিকায় প্রখ্যাত বিপ্লবী শ্রীনলিনীকিশোর গুহ যতীন দাসকে বলেছেন বাংলার দধীচি। গ্রন্থটি সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য: যতীনের ও সমসাময়িক কালের ইতিহাস অঙ্কনে সন্তোষকুমার অধিকারী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তথ্য বিচার করে অগ্রসর হয়েছেন। শ্রুতকথার উপর নির্ভর করেন নি। তিনি এই গ্রন্থে ঐতিহাসিকের নির্মম দৃষ্টি দিয়েই প্রত্যেকটি ঘটনাকে দেখেছেন।

এ হেন গ্রন্থরচনায় আবেগ প্রাধান্য পাওয়া স্বাভাবিক। জীবন-মৃত্যুকে যে বীর পায়ের ভৃত্য করে ভাবনাহীন চিত্তে আত্মোৎসর্গ করতে পারে, যার মহান্ ত্যাগে জনজীবন আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে, তার জীবনকথা বলবার সময় আবেগ ত আসারই কথা। কিন্তু ঐতিহাসিকের একটা গুরুদায়িত্ব আছে। সেই দায়িত্ব পালনে শ্রীসন্তোষকুমার অধিকারী উত্তীর্ণ হয়েছেন, এ-গ্রন্থের এইটেই সবচেয়ে বড় পরিচয়।

যতীন দাস বেছে নিয়েছিলেন বিপ্লবের পথ। রাসবিহারী বসু, বাঘা যতীন, শচীন সান্যাল প্রভৃতি বীর্যবান্ বিপ্লবীর মন্ত্রশিষ্য তিনি। গান্ধীবাদের সঙ্গে তাঁদের তীব্র মতপার্থক্য। হিংসার পথ, না অহিংসার পথ, এ নিয়ে তখন প্রচণ্ড বাদানুবাদ; এবং অনুসৃত কোন্ পথে রাজনৈতিক সিদ্ধি কখন যে কতখানি এগিয়ে ছিল বা পিছিয়ে ছিল এই নিয়ে তখনও যেমন তর্ক ছিল ভবিষ্যতেও তেমনি থাকবে। এবং ইতিহাস তার মূল্যায়ন করবে। তবে, এই দুই দলের মধ্যে বিপ্লবীদের যে-কোন মুহূর্তে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার সম্ভাবনাকে হাতের মুঠোয় রেখে বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়ার যে অসীম ত্যাগমাহাত্ম্য তার তুলনা হয় না। সেইখানেই তাঁরা মহান্। হিংসাত্মক পন্থার সমর্থনযোগ্য কোনযুক্তিই রবীন্দ্রনাথ খুঁজে পাননি, এমন কি দেশ-জননীর শৃঙ্খল মুক্তির মহতোদ্দেশ্য সাধনের রাজনৈতিক পন্থা হিসাবেও নয়। অথচ, যতীন দাসের মৃত্যু সংবাদ যখন শান্তিনিকেতনে এলো, তাঁর সকল পাঠের খেই গেল হারিয়ে এবং তাঁর অন্তরের তীব্র বেদনার রক্তপদ্ম নিবেদিত হলো ভৈরব-চরণে।

'হে ভৈরব। শক্তি দাও, ভক্তপানে চাহ।

গ্রন্থটি সতেরোটি অধ্যায়ে বিস্তৃত। ভারতের সশস্ত্র বিপ্লবের সংক্ষিপ্ত পটভূমি, যতীনের বংশ-পরিচয়, তাঁর কৈশোর ও যৌবনের কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনা, রাজনীতিক্ষেত্রে প্রবেশ, শচীন সান্যালের সর্বভারতীয় সংস্থা হিন্দুস্থান রিপাবলিকান এ্যাসোসিয়েশন গঠন, (পরে এই দলের নাম করণ হয় হিন্দুস্থান সোসালিষ্ট রিপাবলিকান্ আর্মি)—এরপর অগ্নিগর্ভ বীরযুবকদের আনাগোনা। সূর্য সেন, রাজেন লাহিড়ী, অনন্তহরি মিত্র, চারু বিকাশ, রামপ্রসাদ বিসমিল, ভগৎ সিং, বটুকেশ্বর দত্ত, শুকদেব,

শিবরাম রাজগুরু, এমনি কতো নাম, যাদের সঙ্গে যুক্ত যতীন দাস। হিন্দুস্থান রিপাবলিকান এ্যাসোসিয়েশনের ঐতিহাসিক ভূমিকার প্রথম নথি হিসাবেও সন্তোষকুমার অধিকারীর এই গ্রন্থটিকে চিহ্নিত করা যায়। যতীন আর শচীন সান্যাল, গুরুশিষ্যের অবদান এখানে সুন্দরভাবে বিধৃত।

সমসাময়িক সংবাদপত্র থেকে উদ্ধৃতি, বিভিন্ন অভিমত, তৎকালীন Legislative Assembly, Assembly Debates on the Hunger Strike Bill, ব্যবস্থাপক সভায় যতীনের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন নেতার আলোড়ন সৃষ্টি, লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার রায়, যতীন দাস সম্পর্কে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য উক্তি, এই সব তথ্য—গ্রন্থে সংক্ষেপে অথচ সুষ্ঠুভাবে সন্নিবিষ্ট হয়েছে।

কয়েকটি ফোটো গ্রন্থের গুরুত্ব বৃদ্ধি করেছে। যতীন দাসের একটিমাত্র ফোটোর সঙ্গেই আমরা পরিচিত। লক্ষ্য করার বিষয়, রোগা-রোগা ঐ মুখখানিতে রাজশক্তির প্রতি তীক্ষ্ণ তাচ্ছিল্য ফুটে উঠেছে। সুন্দর প্রচ্ছদশিল্পটি শ্যামল সেনের।

এই গ্রন্থের আলোচনাক্রমে অহিংসপন্থী গান্ধীজীর কথা এসেছে এবং লর্ড আরুইনের সঙ্গে তাঁর আপোষ আলোচনার শর্তগুলির মধ্যে কোথাও লাহোর মামলার কোন উল্লেখ বা ভগবৎ সিং-এর ফাঁসি মকুব করার কোন কথা না থাকায় গ্রন্থকারের মতন আমরাও দুঃখ পাই। যতীন দাস গান্ধীবাদী ছিলেন না; কিন্তু সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের মর্যাদা সুপ্রতিষ্ঠিত করার সংকল্পে আমৃত্যু অনশন করে দুরন্ত বিপ্লব ঘটাবার চরিত্রশক্তিও তাঁর আছে।

চ্যাণ্ডের বিশ্বরূপ দর্শন :—গোপেশচন্দ্র চক্রবর্তী, প্রকাশক শ্রীরুচি চক্রবর্তী, ২৫বি, ধর্মতলা ষ্ট্রীট কলিকাতা দাম ২.৫০।

গোপেশচন্দ্র বিখ্যাত চিত্রশিল্পী। তাঁর বহু চিত্র বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সমাদর লাভ করিয়াছে। তাঁহাকে চিত্রশিল্পী বলিয়াই এতকাল জানিয়া আসিয়াছি। কিন্তু বর্তমান গ্রন্থে তিনি দেখাইয়া দিলেন তিনি একজ প্রতিভাবান্ কবি। তিনি বলিয়াছেন ইহা ছড়া, যদি ছড়া বলিয়াই স্বীকার করিতে হয় তবে ইহা অসাধারণ ছড়া। প্রতিভা যে নব নব উন্মেষশালিনী, সে পরিচয় তিনি রাখিয়া গেলেন।

এই কাব্যগ্রন্থে তিনি অনেক বিষয় লইয়াই আলোচনা করিয়াছেন। তিনি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের ধর্মনীতিহীন শিক্ষাকে এবং ধর্মের নামে ভণ্ডামিকে তীব্র কশাঘাত করিয়াছেন। যেমন,

"চিরদিন জনগণে
রেখে অন্ধকারে
শাসন শোষণ বল,
চলিতে কি পারে?"

নানা প্রসঙ্গে এই বিশৃঙ্খল জাতিকে কশাঘাত করিতেও তিনি ছাড়েন নাই—

"বিশৃঙ্খল জাতি আজ
সব স্বেচ্ছাচারী
ছোট বড় ছেলে বুড়ো
পুরুষ কি নারী।
যে যাহার ইচ্ছা মতো
সকলেই চলে
কে কাহাকে বাধা দেবে
সমান সকলে।"

ত্রিপুরাশঙ্কর সেন তাঁর ভূমিকাতে বলিয়াছেন, "অর্থলোভ ও ধর্মভ্রষ্টতাই আমাদের দেশের নানা দুর্নীতির মূল। লেখক খাদ্যে ভেজাল, ঔষধে ভেজাল প্রভৃতির ওপর কশাঘাত করে অবশেষে বলেছেন—

হেন দুষ্কর্ম নাহি
আছে এ জগতে
অর্থলোভে মানুষ যা
না পারে করিতে।"

এমন অপূর্ব ভাটায়ার পড়িতে সকলকে অনুরোধ করি।

চিত্রশিল্পী তথা কবিকে আমরা অভিনন্দন জানাই।

বস্ত্র শিল্পের বিভিন্ন উদাহরণ
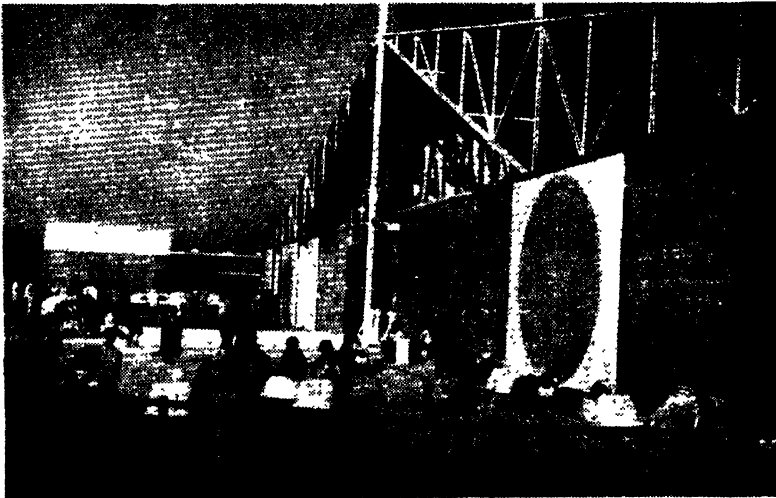
ব্যাটারী চালিত গাড়ী—
জাপানী প্রদর্শন কেন্দ্র
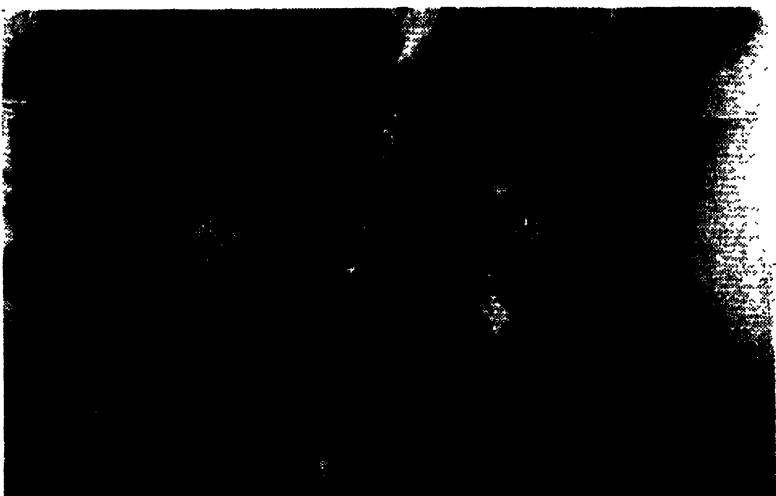
সুন্দরবনের সম্রাট—বঙ্গদেশের
প্রদর্শন কেন্দ্র

সকল চিত্রই পি, সি, মুখার্জি
দ্বারা গৃহীত ঃ

:: রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ::

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৭২তম ভাগ
দ্বিতীয় খণ্ড

মাঘ, ১৩৭৯

৪র্থ সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

রাজপথ ব্যবহার নীতি

রাজপথ নির্ম্মাণ করিবার উদ্দেশ্য কি তাহা লইয়া কোনও তর্কের আবশ্যক হয় না। যুগ যুগ ধরিয়া মানুষ যেখানেই নিজেদের বাসস্থান, কেল্লা দুর্গ, হাট, বাজার, মন্দির, কারখানা, পাঠশালা, হাসপাতাল প্রভৃতি স্থাপন করিয়াছে সেখানেই যাতায়াতের সুবিধার জন্য রাস্তাও তৈয়ার করিয়াছে। মানুষ যেখানেই পদব্রজে বা যান বাহন যোগে যাইবার প্রয়োজন দেখে সেখানেই তাহার যাইবার পথের আবশ্যকতা উপস্থিত হয়। এই কারণে গ্রাম সহর অথবা বৃহৎ বৃহৎ নগরের সর্ব্বত্র রাজপথ নির্ম্মাণ করা হয় ও সেই সকল রাজপথ উপযুক্ত ভাবে সুগঠিত রাখিবার ব্যবস্থাও করা হয়।

কলিকাতা একটি মহানগরী। ইহা অতি পুরাতন কালের সহর নহে সুতরাং ইহার রাস্তাঘাট ও আজকালকার প্রয়োজন বুঝিয়াই নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল। কিন্তু তাহা হইলেও এই সহরের রাস্তা নির্ম্মাণ, মেরামত প্রভৃতির ব্যয় যাহাদের প্রদত্ত অর্থে করা হইয়া থাকে রাস্তাঘাট হইতে তাহাদের ততটা লাভ হয় না যতটা হয় অন্যায়ভাবে রাস্তা ব্যবহারকারীদিগের। যথা, রাজপথে দোকান সাজাইয়া বসিয়া যাওয়া কিম্বা বিছানা পাতিয়া শুইয়া থাকা অথবা উনান জ্বালাইয়া রন্ধন করা কলিকাতার সর্ব্বত্রই সকল সময়ে দেখা যায়। যাহারা এইরূপ করে তাহারা সহরের কোনও প্রতিষ্ঠানের সাহায্যের জন্য কখনও একটা পয়সাও দেয় বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু তাহাদের জন্য সাধারণ নগরবাসী ও পথযাত্রীদের বিশেষ অসুবিধা সকল সময়েই হইয়া থাকে। যদি কেহ তাহাদিগকে উঠাইতে যায় তাহা হইলে সম্ভবতঃ দুই-চার পয়সা হাত বদল হইলেই সেই চেষ্টার অবসান ঘটে। যাঁহারা রাজপথে মাল বোঝাই ইত্যাদি করিবার জন্য পাহাড় প্রমাণ দ্রব্যাদি স্তূপাকার করিয়া রাখিয়া মানুষের পথ চলাচল বন্ধ করেন তাঁহারাও ঐ একই উপায়ে রাজপথের অপব্যবহার করিয়া পার পাইয়া যান।

আর একটা অতি অন্যায় ও কুরীতি বর্ত্তমানে আরম্ভ করা হইয়াছে; তাহা হইল মোটর গাড়ী রাজপথে কোথাও পথপার্শ্বে দাঁড় করাইলে কলিকাতা কর্পোরেশন কর্ত্তৃক নিযুক্ত কনট্রাক্টরের কর্মচারী আসিয়া গাড়ী দাঁড় করাইবার মাশুল আদায় করার ব্যবস্থা। একথা সর্ব্বজনবিদিত যে মোটর গাড়ী চালাইতে হইলে একটা

বাৎসরিক শুল্ক দিবার ব্যবস্থা আছে। ইহার নাম "রোড ট্যাক্স" অথবা রাজপথ ব্যবহার মাশুল। এই মাশুল দিলে রাজপথ ব্যবহারের অধিকার লাভ করা হয়। কিন্তু এই ট্যাক্স দিবার সময় একথা বলা হয় না যে রাজ-পথে গাড়ী চালিতে পারিবে, কিন্তু পথপার্শ্বে দাঁড়াইতে পারিবে না অথবা দাঁড়াইলে কলিকাতা কর্পোরেশন ইচ্ছামত অতিরিক্ত পয়সা আদায় করিতে পারিবেন। আমরা যতটা জানি, কলিকাতা কর্পোরেশন গাড়ীর রোড ট্যাক্স হইতে কিছু টাকা গভর্ণমেন্টের নিকট পাইয়া থাকেন, মোটর গাড়ীর রাস্তা ব্যবহারের কারণে। সুতরাং রাস্তায় গাড়ী দাঁড় করাইলে অতিরিক্ত পয়সা আদায় করার ব্যবস্থা আইন অন্যায়। রাস্তা ব্যবহারের আইন-সঙ্গত অর্থ যদি এই হয় যে গাড়ী সকল সময়ই চলিতে থাকিবে, দাঁড়াইবে না, দাঁড়াইলেই রোড ট্যাক্স আর কার্য্যকর থাকিবে না; তাহা হইলে সেই প্রকার অর্থ ন্যায়শাস্ত্র অনুগত বলিয়া বিচার্য্য হইতে পারে না, এবং যাঁহারা গাড়ী চালাইবার জন্য রোড ট্যাক্স দিয়া থাকেন তাঁহাদিগের পক্ষে উচিত হইবে হাই কোর্ট বা সুপ্রীম কোর্টে এই বিষয় উত্থাপিত করিয়া সুবিচার প্রার্থনা করা।

এই সম্পর্কে আর একটা কথা বলা যাইতে পারে। তাহা হইল গাড়ী দাঁড় করাইবার জায়গায় অভাব। বহু স্থলেই কর্পোরেশনের অতিরিক্ত মাশুল আদায়ের মানুষ-গুলি পয়সা আদায় করিবার জন্য গাড়ীর মালিকদিগের উপর জোর জুলুম করে কিন্তু গাড়ীগুলির কোনও দাঁড় করাইবার জায়গা অনেক ক্ষেত্রেই থাকে না। জায়গা দখল করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে বহু সংখ্যক খালি রিকশা, ঠেলা গাড়ী অথবা ব্ল্যাক মার্কেটের চাউল বিক্রেতা-দিগের চাউলের বস্তা। কলিকাতা হগ সাহেবের বাজার এই রূপ জোর জুলুম ও অসভ্যতা করিয়া পয়সা আদায়ের একটি কেন্দ্র। এইখানে কর্পোরেশন অনেকগুলি মাশুল আদায়কারী অভদ্র মানুষকে অতিরিক্ত মাশুল আদায়ের জন্য থাকিতে দিয়া থাকেন ও এই সকল ব্যক্তি একত্র হইয়া যদি কেহ গাড়ী রাখিবার জায়গা নাই বলিয়া অতিরিক্ত পয়সা দিতে আপত্তি করেন তাঁহাদের ঘিরিয়া ধরিয়া জোর করিয়া পয়সা আদায় করে। এই রূপ জোর জুলুম ও অসভ্যতা যদি আইনের দোহাই দিয়া করিতে দেওয়া হয় তাহা হইলে ইহার ফলে বিষম প্রতিক্রিয়ার আবির্ভাব হইবে নিঃসন্দেহ। এই স্থলে যে খালি রিকশা ও চাউল বিক্রেতাদিগের ভিড় হয় তাহা পুলিশ থাকিলেও হইয়া থাকে এবং পুলিশ ইহাদে[illegible] কোনও ভাবে সরিয়া যাইতে বাধ্য করে না। এই রূপ কেন হয় তাহা পুলিশই বলিতে পারে। কিন্তু তাহাদের ডাকিলেও তাহারা মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যায় বলিয়া শুনা যায়। জনসাধারণকে যদি জুলুম হইতে বাঁচিতে হইলে নিজেদের শক্তির উপর নির্ভর করিতে হয় তাহা হইলে সেইরূপ পরিস্থিতিতে শান্তিরক্ষা সকল সময় সুসম্পন্ন হইতে পারে না। মোট কথা হইতেছে এই যে যদি গাড়ীর ট্যাক্স দিয়াও লোকে গাড়ী রাস্তার ধারে দাঁড় করাইতে না পারে অতিরিক্ত পয়সা না দিলে—তাহা হইলে সে বিষয়ে আদালত অথবা সরকারী উচ্চ-পদস্থ কর্মচারীদিগের কিছু করা আবশ্যক।

বিদেশে কোন কোন সহরে (যথা লণ্ডনে) গাড়ী দাঁড় করাইবার জন্য বিশেষ স্থান আছে যেখানে পয়সা দিয়া গাড়ী রাখার ব্যবস্থা হয়, কিন্তু সেই জায়গাগুলি পৌর প্রতিষ্ঠানের এলাকার রাজপথের অংশ নহে। সেই সকল "পার্কিং লট" ব্যক্তিগত মালিকানার জমিতে থাকে ও পয়সা আদায় করা হয় ব্যক্তিগত অধিকারে। কলিকাতা সহরেও অনেক পেট্রোলের বিক্রয় স্থানে পয়সা দিয়া গাড়ী রাখিবার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু সাধারণের ব্যবহারের রাস্তায় "রোড ট্যাক্স" দেওয়া সত্ত্বেও অতিরিক্ত পয়সা দিয়া গাড়ী রাখার নিয়ম অতি অন্যায় কথা। ইহার প্রতিকার অতি অবশ্য করা প্রয়োজন।

বাঙ্গালীকে কেহ কেন ভালবাসে না?

মানুষ যাহার অপকার করে, যাহার ধনসম্পত্তি অন্যায় ভাবে আত্মসাৎ করে ও যাহার খরচে নিজের সুবিধা করিয়া লয়, তাহাকে কখনও সত্য কথা বলিয়া

নিজ অপেক্ষা উচ্চ স্থানে বসাইতে প্রস্তুত থাকে না। বরঞ্চ যাহার ক্ষতি করিয়াছে তাহাকে যদি হীন প্রমাণ করিতে পারে তাহাতেই আনন্দ অনুভব করে; কেননা ক্ষতি করার যদি কোনও ঔচিত্য সৃষ্টি করা সম্ভব হয় তাহা হইতে পারে শুধু যদি দেখান যায় যে অপকৃত ব্যক্তি নির্দোষ নহে এবং তাহার অপকার করা এক প্রকারে দোষীকে শাস্তি দেওয়ার মতই ন্যায় ধর্ম্ম অন্তর্গত কার্য্য। বাঙ্গালীর অর্থ, বাঙ্গালীর ব্যবসায়, বাঙ্গালীর দেশ যদি অবাঙ্গালীরা নিজেদের কবলিত করিয়া সুবিধা করিয়া লইতে পারে তাহা হইলে তখন তাহাদের দুষ্কর্ম্মের সাফাই হিসাবে বাঙ্গালীর নিন্দা করাই বিধেয় হইয়া দাঁড়ায়। এবং বৃটিশ আমল হইতেই ভারতের ইতিহাস চর্চ্চা করিলে দেখা যাইবে যে বৃটিশগণ বাঙ্গালীর স্বাধীনতা অর্জ্জন প্রচেষ্টার জন্য বাঙ্গালীর দুর্নাম প্রচার ও বাঙ্গালীর ক্ষতি যাহাতে নানাভাবে হইতে পারে সেই চেষ্টা ক্রমাগতই করিয়া আসিয়াছে। ইহা ব্যতীত বাংলার অঙ্গচ্ছেদ করিয়া বৃটিশ শাসকগণ বিহার আসাম ও উড়িষ্যায় বাংলার নানা অংশ সংযুক্ত করিয়া বাঙ্গালীকে কমজোর করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিল। সেই সকল ছিন্ন অংশ এখনও বঙ্গ দেশে পুনঃ সংযুক্ত করা হয় নাই ও বাঙ্গালী-বিরুদ্ধতার ইহাও একটা বড় কারণ। যাহার জমি কাড়িয়া লইয়া কোন মানুষ নিজ স্বার্থসিদ্ধি করে, তাহাকে প্রীতির দৃষ্টিতে দেখিবার ইচ্ছা জমি গ্রহণকারীর প্রাণে কদাপি জাগ্রত হয় না। বাঙ্গালীর নিন্দা করিবার ও বাঙ্গালীকে শত্রু প্রমাণ করিবার ইহাও একটা কারণ।

ইহা ব্যতীত যখন স্বাধীনতা আহরণ করা হইল তখনও বঙ্গ দেশের অঙ্গচ্ছেদ করিয়া তাহা করিতে হইল। পাঞ্জাব ও বঙ্গ দেশ নিজ নিজ এলাকার বৃহৎ অংশ পাকিস্থানকে দিবার পরেই বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীগণ ভারতকে স্বাধীনতা দিতে রাজী হইল। পাঞ্জাবের মানুষ সবল ও কর্ম্মপটু। তাহারা যাহা ক্ষতি হইল তাহা নিজ চেষ্টায় অনেকটা ঠিক করিয়া লইল। ভারতীয় পাঞ্জাব হইতে সকল মুসলমানদিগকে বিতাড়িত করিয়া দেশ ভাগের ক্ষতি পাঞ্জাবের মানুষ অনেকটা ঠিক করিয়া লইল। শান্তিপ্রিয় বাঙ্গালীর ভারতীয় বাসভূমিতে লক্ষ লক্ষ মুসলমান স্বচ্ছন্দে থাকিয়া গেল এবং অসংখ্য হিন্দু পাকিস্থানের বাঙ্গালা অঞ্চল হইতে বিতাড়িত হইয়া পশ্চিম বঙ্গে আসিয়া প্রবেশ করিল। ফলে বাঙ্গালীর অবস্থা আরই খারাপ হইল। কিছু কিছু উদ্বাস্তু বাঙ্গালী ভারতে অন্যান্য অঞ্চলেও যাইতে বাধ্য হইল ও তাহাতেও ও ভারতের নানা স্থানে বাঙ্গালী-বিদ্বেষ বৃদ্ধি হইল। অর্থাৎ বাঙ্গালীকে ভাল না বাসিবার কারণ আরও প্রবল হইল। বাঙ্গালীর মহা অপকার করিয়া যে স্বাধীনতা অর্জ্জন করা হইল ও তাহার জন্য যে ভারত বাঙ্গালীর প্রায় কোনই ক্ষতিপূরণ করিল না, সে কথাটা চাপা পড়িয়া গেল। বাঙ্গালীরা যে ভারতীয় জনসাধারণের মত প্রিয়পাত্র নহেন তাহার আর একটা কারণ বাঙ্গালী-দিগের উচ্চ শিক্ষায় আগ্রহ ও বাবুয়ানী। বহুকাল হইতেই বাঙ্গালীরা পাশ করিবার জন্য উৎসুক এবং কিছু একটা পাশ না করিলে বাঙ্গালীর মনে শান্তি হয় না। বাঙ্গালী বাবুরা যে হাতে কাজ করেন না এবং শুধু লেখা পড়া লইয়াই থাকেন ইহা ভারতের অশিক্ষিত মুটে মজুরদিগের ঘরে ঘরে একটা চির আলোচ্য বিষয় ছিল। এখন অন্যান্য জাতির ভারতীয়েরাও পাশ করিবার জন্য উৎসাহী; কিন্তু বাঙ্গালীরা যে কিছু ভিন্ন ধরণের মানুষ ও তাহারা যে অপর জাতির লোকেদের অশিক্ষিত শ্রমিক শ্রেণীর লোক বলিয়া মনে করে, এ কথাটা কেহ ভুলে নাই। পরিষ্কার কাপড় পরিয়া কুরসিতে বসিয়া কলম চালাইয়া অর্থোপার্জ্জন করিবে, ইহাই বহু বাঙ্গালীর জীবনাদর্শ। না খাইয়া মরিলেও হাতে কড়া পড়াইয়া তেল কালি মাখিয়া উপার্জ্জন করিতে যাইবে না এই বাবুয়ানীর মূল মন্ত্রও অনেক বাঙ্গালী কিছুতেই ভুলিতে পারেন না। যাহারা খাটিয়া খায় তাহারা কিছু নিম্ন স্তরের মানুষ ইহাও এক শ্রেণীর বাঙ্গালীর মনে গাঁথা থাকে। এখন এই সকল কথা পরিবর্ত্তিত আকার গ্রহণ করিয়া থাকিলেও পূর্ব্বে যে এইরূপ অবস্থাই ছিল তাহা কেহ ভুলে নাই এবং সেই কারণে বাঙ্গালীকেও নিজের নিকটের বন্ধু বলিয়া অনেকেই এখনও মনে করে না।

বাৎসরিক শুল্ক দিবার ব্যবস্থা আছে। ইহার নাম "রোড ট্যাক্স" অথবা রাজপথ ব্যবহার মাশুল। এই মাশুল দিলে রাজপথ ব্যবহারের অধিকার লাভ করা হয়। কিন্তু এই ট্যাক্স দিবার সময় একথা বলা হয় না যে রাজপথে গাড়ী চালিতে পারিবে, কিন্তু পথপার্শ্বে দাঁড়াইতে পারিবে না অথবা দাঁড়াইলে কলিকাতা কর্পোরেশন ইচ্ছামত অতিরিক্ত পয়সা আদায় করিতে পারিবেন। আমরা যতটা জানি, কলিকাতা কর্পোরেশন গাড়ীর রোড ট্যাক্স হইতে কিছু টাকা গভর্ণমেন্টের নিকট পাইয়া থাকেন, মোটর গাড়ীর রাস্তা ব্যবহারের কারণে। সুতরাং রাস্তায় গাড়ী দাঁড় করাইলে অতিরিক্ত পয়সা আদায় করার ব্যবস্থা আরই অন্যায়। রাস্তা ব্যবহারের আইনসঙ্গত অর্থ যদি এই হয় যে গাড়ী সকল সময়ই চলিতে থাকিবে, দাঁড়াইবে না, দাঁড়াইলেই রোড ট্যাক্স আর কার্য্যকর থাকিবে না; তাহা হইলে সেই প্রকার অর্থ ন্যায়শাস্ত্র অনুগত বলিয়া বিচার্য্য হইতে পারে না, এবং যাঁহারা গাড়ী চালাইবার জন্য রোড ট্যাক্স দিয়া থাকেন তাঁহাদিগের পক্ষে উচিত হইবে হাই কোর্ট বা সুপ্রীম কোর্টে এই বিষয় উত্থাপিত করিয়া সুবিচার প্রার্থনা করা।

এই সম্পর্কে আর একটা কথা বলা যাইতে পারে। তাহা হইল গাড়ী দাঁড় করাইবার জায়গায় অভাব। বহু স্থলেই কর্পোরেশনের অতিরিক্ত মাশুল আদায়ের মানুষগুলি পয়সা আদায় করিবার জন্য গাড়ীর মালিকদিগের উপর জোর জুলুম করে কিন্তু গাড়ীগুলির কোনও দাঁড় করাইবার জায়গা অনেক ক্ষেত্রেই থাকে না। জায়গা দখল করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে বহু সংখ্যক খালি রিকশা, ঠেলা গাড়ী অথবা ব্ল্যাক মার্কেটের চাউল বিক্রেতাদিগের চাউলের বস্তা। কলিকাতা হগ সাহেবের বাজার এই রূপ জোর জুলুম ও অসভ্যতা করিয়া পয়সা আদায়ের একটি কেন্দ্র। এইখানে কর্পোরেশন অনেকগুলি মাশুল আদায়কারী অভদ্র মানুষকে অতিরিক্ত মাশুল আদায়ের জন্য থাকিতে দিয়া থাকেন ও এই সকল ব্যক্তি একত্র হইয়া যদি কেহ গাড়ী রাখিবার জায়গা নাই বলিয়া অতিরিক্ত পয়সা দিতে আপত্তি করেন তাঁহাদের ঘিরিয়া ধরিয়া জোর করিয়া পয়সা আদায় করে। এই রূপ জোর জুলুম ও অসভ্যতা যদি আইনের দোহাই দিয়া করিতে দেওয়া হয় তাহা হইলে ইহার ফলে বিষময় প্রতিক্রিয়ার আবির্ভাব হইবে নিঃসন্দেহ। এই স্থলে যে খালি রিকশা ও চাউল বিক্রেতাদিগের ভিড় হয় তাহা পুলিশ থাকিলেও হইয়া থাকে এবং পুলিশ ইহাদের কোনও ভাবে সরিয়া যাইতে বাধ্য করে না। এই রূপ কেন হয় তাহা পুলিশই বলিতে পারে। কিন্তু তাহাদের ডাকিলেও তাহারা মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যায় বলিয়া শুনা যায়। জনসাধারণকে যদি জুলুম হইতে বাঁচিতে হইলে নিজেদের শক্তির উপর নির্ভর করিতে হয় তাহা হইলে সেইরূপ পরিস্থিতিতে শান্তিরক্ষা সকল সময় সুসম্পন্ন হইতে পারে না। মোট কথা হইতেছে এই যে যদি গাড়ীর ট্যাক্স দিয়াও লোকে গাড়ী রাস্তার ধারে দাঁড় করাইতে না পারে অতিরিক্ত পয়সা না দিলে— তাহা হইলে সে বিষয়ে আদালত অথবা সরকারী উচ্চপদস্থ কর্মচারীদিগের কিছু করা আবশ্যক।

বিদেশে কোন কোন সহরে (যথা লণ্ডনে) গাড়ী দাঁড় করাইবার জন্য বিশেষ স্থান আছে যেখানে পয়সা দিয়া গাড়ী রাখার ব্যবস্থা হয়, কিন্তু সেই জায়গাগুলি পৌর প্রতিষ্ঠানের এলাকার রাজপথের অংশ নহে। সেই সকল "পার্কিং লট" ব্যক্তিগত মালিকানার জমিতে থাকে ও পয়সা আদায় করা হয় ব্যক্তিগত অধিকারে। কলিকাতা সহরেও অনেক পেট্রোলের বিক্রয় স্থানে পয়সা দিয়া গাড়ী রাখিবার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু সাধারণের ব্যবহারের রাস্তায় "রোড ট্যাক্স" দেওয়া সত্ত্বেও অতিরিক্ত পয়সা দিয়া গাড়ী রাখার নিয়ম অতি অন্যায় কথা। ইহার প্রতিকার অতি অবশ্য করা প্রয়োজন।

বাঙ্গালীকে কেহ কেন ভালবাসে না?

মানুষ যাহার অপকার করে, যাহার ধনসম্পত্তি অন্যায় ভাবে আত্মসাৎ করে ও যাহার খরচে নিজের সুবিধা করিয়া লয়, তাহাকে কখনও সত্য কথা বলিয়া

নিজ অপেক্ষা উচ্চ স্থানে বসাইতে প্রস্তুত থাকে না। বরঞ্চ যাহার ক্ষতি করিয়াছে তাহাকে যদি হীন প্রমাণ করিতে পারে তাহাতেই আনন্দ অনুভব করে; কেননা ক্ষতি করার যদি কোনও ঔচিত্য সৃষ্টি করা সম্ভব হয় তাহা হইতে পারে শুধু যদি দেখান যায় যে অপকৃত ব্যক্তি নির্দোষ নহে এবং তাহার অপকার করা এক প্রকারে দোষীকে শাস্তি দেওয়ার মতই ন্যায় ধর্ম অন্তর্গত কার্য্য। বাঙ্গালীর অর্থ, বাঙ্গালীর ব্যবসায়, বাঙ্গালীর দেশ যদি অবাঙ্গালীরা নিজেদের কবলিত করিয়া সুবিধা করিয়া লইতে পারে তাহা হইলে তখন তাহাদের দুষ্কর্মের সাফাই হিসাবে বাঙ্গালীর নিন্দা করাই বিধেয় হইয়া দাঁড়ায়। এবং বৃটিশ আমল হইতেই ভারতের ইতিহাস চর্চ্চা করিলে দেখা যাইবে যে বৃটিশগণ বাঙ্গালীর স্বাধীনতা অর্জ্জন প্রচেষ্টার জন্য বাঙ্গালীর দুর্নাম প্রচার ও বাঙ্গালীর ক্ষতি যাহাতে নানাভাবে হইতে পারে সেই চেষ্টা ক্রমাগতই করিয়া আসিয়াছে। ইহা ব্যতীত বাংলার অঙ্গচ্ছেদ করিয়া বৃটিশ শাসকগণ বিহার আসাম ও উড়িষ্যায় বাংলার নানা অংশ সংযুক্ত করিয়া বাঙ্গালীকে কমজোর করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিল। সেই সকল ছিন্ন অংশ এখনও বঙ্গ দেশে পুনঃ সংযুক্ত করা হয় নাই ও বাঙ্গালী-বিরুদ্ধতার ইহাও একটা বড় কারণ। যাহার জমি কাড়িয়া লইয়া কোন মানুষ নিজ স্বার্থসিদ্ধি করে, তাহাকে প্রীতির দৃষ্টিতে দেখিবার ইচ্ছা জমি গ্রহণকারীর প্রাণে কদাপি জাগ্রত হয় না। বাঙ্গালীর নিন্দা করিবার ও বাঙ্গালীকে শত্রু প্রমাণ করিবার ইহাও একটা কারণ।

ইহা ব্যতীত যখন স্বাধীনতা আহরণ করা হইল তখনও বঙ্গ দেশের অঙ্গচ্ছেদ করিয়া তাহা করিতে হইল। পাঞ্জাব ও বঙ্গ দেশ নিজ নিজ এলাকার বৃহৎ অংশ পাকিস্থানকে দিবার পরেই বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীগণ ভারতকে স্বাধীনতা দিতে রাজী হইল। পাঞ্জাবের মানুষ সবল ও কর্ম্মপটু। তাহারা যাহা ক্ষতি হইল তাহা নিজ চেষ্টায় অনেকটা ঠিক করিয়া লইল। ভারতীয় পাঞ্জাব হইতে সকল মুসলমানদিগকে বিতাড়িত করিয়া দেশ ভাগের ক্ষতি পাঞ্জাবের মানুষ অনেকটা ঠিক করিয়া লইল। শান্তিপ্রিয় বাঙ্গালীর ভারতীয় বাসভূমিতে লক্ষ লক্ষ মুসলমান স্বচ্ছন্দে থাকিয়া গেল এবং অসংখ্য হিন্দু পাকিস্থানের বাঙ্গালা অঞ্চল হইতে বিতাড়িত হইয়া পশ্চিম বঙ্গে আসিয়া প্রবেশ করিল। ফলে বাঙ্গালীর অবস্থা আরই খারাপ হইল। কিছু কিছু উদ্বাস্তু বাঙ্গালী ভারতে অন্যান্য অঞ্চলেও যাইতে বাধ্য হইল ও তাহাতেও ও ভারতের নানা স্থানে বাঙ্গালী-বিদ্বেষ বৃদ্ধি হইল। অর্থাৎ বাঙ্গালীকে ভাল না বাসিবার কারণ আরও প্রবল হইল। বাঙ্গালীর মহা অপকার করিয়া যে স্বাধীনতা অর্জ্জন করা হইল ও তাহার জন্য যে ভারত বাঙ্গালীর প্রায় কোনই ক্ষতিপুরণ করিল না, সে কথাটা চাপা পড়িয়া গেল। বাঙ্গালীরা যে ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে প্রিয়পাত্র নহেন তাহার আর একটা কারণ বাঙ্গালী-দিগের উচ্চ শিক্ষায় আগ্রহ ও বাবুয়ানী। বহুকাল হইতেই বাঙ্গালীরা পাশ করিবার জন্য উৎসুক এবং কিছু একটা পাশ না করিলে বাঙ্গালীর মনে শান্তি হয় না। বাঙ্গালী বাবুরা যে হাতে কাজ করেন না এবং শুধু লেখা পড়া লইয়াই থাকেন ইহা ভারতের অশিক্ষিত মুটে মজুরদিগের ঘরে ঘরে একটা চির আলোচ্য বিষয় ছিল। এখন অন্যান্য জাতির ভারতীয়েরাও পাশ করিবার জন্য উৎসাহী; কিন্তু বাঙ্গালীরা যে কিছু ভিন্ন ধরণের মানুষ ও তাহারা যে অপর জাতির লোকেদের অশিক্ষিত শ্রমিক শ্রেণীর লোক বলিয়া মনে করে, এ কথাটা কেহ ভুলে নাই। পরিষ্কার কাপড় পরিয়া কুর্সিতে বসিয়া কলম চালাইয়া অর্থোপার্জ্জন করিবে, ইহাই বহু বাঙ্গালীর জীবনাদর্শ। না খাইয়া মরিলেও হাতে কড়া পড়াইয়া তেল কালি মাখিয়া উপার্জ্জন করিতে যাইবে না এই বাবুয়ানীর মূল মন্ত্রও অনেক বাঙ্গালী কিছুতেই ভুলিতে পারেন না। যাহারা খাটিয়া খায় তাহারা কিছু নিম্ন স্তরের মানুষ ইহাও এক শ্রেণীর বাঙ্গালীর মনে গাঁথা থাকে। এখন এই সকল কথা পরিবর্ত্তিত আকার গ্রহণ করিয়া থাকিলেও পূর্ব্বে যে এইরূপ অবস্থাই ছিল তাহা কেহ ভুলে নাই এবং সেই কারণে বাঙ্গালীকেও নিজের নিকটের বন্ধু বলিয়া অনেকেই এখনও মনে করে না।

ইহা ব্যতীত বাঙ্গালীকে বৃটিশের চক্ষে দেখিবার অভ্যাসটাও অন্য ভারতীয়গণ ছাড়ে নাই। বাঙ্গালীকে একান্ত নিজের বলিয়া স্বীকার করিলে অনেক জমি জমা ব্যবসায় বাঙ্গালীকে ফিরাইয়া দিতে হইতে পারে। শত্রু, বা অন্তত বন্ধু নয়, এ কথাটাও ভাবিলে অবস্থাটা অনেকদূর অবাধ একই প্রকার থাকিয়া যাইতে পারে। সুতরাং সুবিধাবাদী ভারতবাসী জনসাধারণ বাঙ্গালী-দিগকে পর বলিয়া ভাবাই শ্রেয় মনে করিয়াছেন।

কিন্তু তাহা হইলেও বাঙ্গালীর যাহা পাওনা তাহা ত বাঙ্গালীকে দিতেই হইবে। বাঙ্গালী যদি ভাল-বাসা লাভের যোগ্য না হয় তাহা হইলেও কি তাহার ধন সম্পদ কাড়িয়া লওয়া চলিবে? তাহার পত্নী, ভগ্নী ও কন্যাকে কি অপমান করা ন্যায্য বলিয়া স্বীকৃত হইবে? তাহার গৃহে আগুন লাগাইয়া, তাহার দোকান পাট জ্বালাইয়া দিয়া তাহাকে দেশত্যাগ করিতে বাধ্য করা সঙ্গত বিবেচিত হইবে? আমরা মনে করি না যে কাহাকেও কাহারো পছন্দ না হইলেই তাহাকে প্রাণে মারিবার অথবা দেশ হইতে বিতাড়িত করিবার অধিকারের উদ্ভব হয়। দেশের শাসকগণ সকল দেশ-বাসীর সকল ন্যায্য অধিকার রক্ষা করিতে বাধ্য। যদি কেহ জনপ্রিয় না হয়, তাহার অধিকার সংরক্ষণও শাসক-দিগের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য। শুধু বাঙ্গালীদের কেহ ভাল বাসে না বলিলেই শাসন কার্য্যের দায়িত্ব পালন সম্পূর্ণ হইয়া যায় না। ভাল না বাসিলেও যখন রাজস্ব, খাজনা ও মাশুল দিতে হয় তখন অধিকারের ক্ষেত্রের সকল পাওনাও পুরাপুরি পুরাইয়া দেওয়া আবশ্যক। ভারতবর্ষে বহু মানুষ আছে যাহারা ভালবাসার উপযুক্ত পাত্র নহে। তাহাদের কিন্তু জীবনধারণের, জীবিকা অর্জ্জনের ও সম্মানিত ভাবে স্বদেশে বসবাস করিবার অধিকার এই কারণে নষ্ট হইয়া যায় না।

সাগর দ্বীপে কপিল মুনির মন্দির

গঙ্গা সাগরে অর্থাৎ তত্রস্থ সাগর দ্বীপে প্রতি বৎসর মকর সংক্রান্তি দিবসে লক্ষ লক্ষ তীর্থযাত্রী স্নান করিয়া পুণ্য অর্জ্জন করিতে গিয়া থাকেন। এই যাত্রীগণ যে অর্থ ঐ দ্বীপের কপিল মুনির মন্দিরে প্রণামী দিয়া থাকেন তাহার পরিমাণ হয় বহু লক্ষ টাকা। ঐ অর্থ কিন্তু কপিল মুনির মন্দিরের সংস্কার প্রভৃতির জন্য ব্যয় করা হয় না। উহা পশ্চিমা পাণ্ডাদিগের প্রাপ্য বলিয়া উত্তর প্রদেশের কোনও ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠানে জমা হয়। কপিল মুনির মন্দির যেন তেন অবস্থায় পড়িয়া থাকে। এখন শুনা যাইতেছে পশ্চিম বঙ্গ সরকার ঐ টাকা যাহাতে যথাযথ ভাবে ব্যবহৃত হয় ও যাত্রীরা যাহাতে সাগর দ্বীপে যাইয়া তেমন কষ্ট উপভোগ না করেন, সেইরূপ ব্যবস্থা করিবার চেষ্টা করিতেছেন। অর্থাৎ ঐ স্থলে একটা নূতন মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া ও সেই মন্দিরের সহিত যাত্রীদিগের পানের জল, রন্ধন প্রভৃতির সুব্যবস্থা করিয়া জনসাধারণের মঙ্গল চেষ্টা করা হইবে। ইহার জন্য প্রথমে হয়ত ধর্ম্ম-নিরপেক্ষ সরকারের কিছু অর্থ ব্যয় হইবে কিন্তু পরে তাহা নূতন মন্দিরের প্রণামী সংগ্রহের দ্বারা মিটান যাইবে বলিয়া মনে হয়। বর্ত্তমানেও বাৎসরিক গঙ্গা সাগর মেলার জন্য পশ্চিম বঙ্গ সরকার বহু অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন ও তাহাতে শুধু খরচই হয়, আয়ের কথা থাকেই না। এখন যদি ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠানগুলিকে সর্ব্বত্র জাতীয় করিয়া লওয়া হয় তাহা হইলে বলা যাইতে পারে যে সরকারের তহবিলে টাকা ভাল করিয়াই আসিবে। ভারতবর্ষের ধর্ম্মমন্দিরগুলির ব্যবসা হিসাবে একটা বিশেষ অর্থকর আমদানির দিক আছে। কোন কোন মন্দিরের আমদানি কোটিতে গুনিতে হয়। এই হিসাবে ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠানগুলিকে জাতীয় করিয়া লইলে তাহাতে লাভই হইবে বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। এই ভাবে জাতীয় করণের আর একটা ভাল দিক আছে। ফাটা কারখানা বা অজানা ব্যবসায় দখল করিয়া তাহাতে কোটি কোটি টাকা লাগাইয়া জাতীয় লোকসানের পরিমাণ বৃদ্ধি ভারত সরকার প্রায়ই করিয়া থাকেন। অবশ্য এই সকল কার্য্য করিবার পূর্ব্বে এই কথাই চিন্তা করা হয় যে জাতীয় কারবার বৃদ্ধি হইলে ক্রমশঃ লাভ হইবার পথই প্রশস্ত হইতে প্রশস্ততর হইবে; কিন্তু কার্য্যত

দেখা যায় যে বহু ক্ষেত্রেই লাভ না হইয়া লোকসানই হইতেছে এবং সে লোকসানের ধারা চির প্রবাহিতই থাকিয়া যাইতেছে। এই কারণে সরকারী আর্থিক প্রচেষ্টা যাহা হয় তাহা যদি কারখানা বা ব্যবসায় ছাড়িয়া মন্দির পরিচালনায় নিযুক্ত হয় তাহা হইলে তাহাতে হয়ত লাভের সম্ভাবনাই বৃদ্ধি হইতে পারে। লাভ না হইলেও মন্দির চালাইয়া লোকসান হইবার সম্ভাবনা ততটা প্রবলভাবে বর্ত্তমান থাকে না বলিয়া ধর্ম্ম-নিরপেক্ষতার আদর্শবিরুদ্ধ হইলেও বিষয়টা চিন্তা করিবার উপযুক্ত।

রুশিয়ানদিগের মিশরে প্রত্যাগমন

কিছুকাল পূর্ব্বে মিশর হইতে সহস্র সহস্র রুশ দেশীয় সামরিক যন্ত্রকৌশলীদিগকে রুশিয়ায় ফেরত পাঠান হইয়াছিল। ইহার কারণ ছিল এই যে প্রথমতঃ রুশিয়ানগণ মিশরের লোকদিগকে নিজেদের কৌশল শিখাইয়া দিয়াছে বলিয়া ধারণা হয় ও দ্বিতীয়ত আমেরিকা অপপ্রচার আরম্ভ করে যে রুশিয় যন্ত্রবিদ্‌গণ সাক্ষাৎ ভাবে অস্ত্রাদি পরিচালনাতেও মিশরীদিগকে সাহায্য করিতেছে। যাহাই হউক, রুশিয়ান অস্ত্র ও তৎসম্পর্কিত যন্ত্রকৌশলীগণ নিজ দেশে ফিরিয়া যাইবার পরে দেখা যাইল যে মিশরীগণ রুশদেশ হইতে পাওয়া অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করিতে কিছুমাত্রই সক্ষমতা প্রদর্শন করিতেছে না। মিশরের অবস্থা ইহার ফলে এমনই হইল যে ঐ সময় যদি ইসরায়েল পুনর্ব্বার মিশর আক্রমণ করিত তাহা হইলে মিশর সে আক্রমণ প্রত্যাহত করিতে কিছুমাত্রই পারিত না। সৌভাগ্যের বিষয় সেইরূপ কোনও পরিণতি ঐ সময় লক্ষিত হয় নাই।

পরে বহু বিবেচনা আলোচনা ইত্যাদি করিয়া স্থির হয় যে রুশিয়ান যন্ত্রবিদ্‌গণকে ফিরাইয়া আনাই বিধেয়। তাহা না হইলে মিশরের সামরিক অবস্থা অত্যন্তই দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে। এই কারণে এখন প্রায় ১০০০ হাজার রুশ দেশীয় নরনারী সপরিবারে মিশরে ফিরিয়া আসিতেছেন ও ইঁহারা অতঃপর মিশরের সমরকৌশলীদিগকে শিক্ষা দিয়া রুশিয়ান অস্ত্র ব্যবহারে সুদক্ষ করিয়া তুলিবেন বলিয়া মিশরের রাষ্ট্রনেতাগণ আশা করিতেছেন। অর্থাৎ বিষয়টা বিশ্বশান্তি স্থাপন অনুকূল নহে। ইহার ফলে নিকট এশিয়ায় যুদ্ধ সম্ভাবনা বৃদ্ধি হইবে বলিয়াই অনুমান করা সঙ্গত।

ভারত সরকার সকল সময়েই বিশ্বশান্তি ও আন্তর্জাতিক মৈত্রী স্থাপনার্থে প্রাণপন চেষ্টা করিয়া থাকেন। যখনই কোন জাতির ব্যক্তিগণ এমন কিছু করেন যাহাতে আন্তর্জাতিক শান্তি ভঙ্গ হইবার সম্ভাবনা থাকে, ভারত সরকার তখনই সেই বিষয়ের আলোচনাতে আত্মনিয়োগ করিয়া থাকেন। এ ক্ষেত্রে সোভিয়েট যুক্ত রাষ্ট্রের সহিত ভারত সরকার কি প্রকার চিঠিপত্র লেখালেখি করেন তাহা দেখিবার জন্য আমরা উৎসুক রহিলাম। মনে হয় না যে ভারতের পত্রাদিতে রুশের কার্য্যের কোন সমালোচনা থাকিবে, কারণ, ভারত সরকার রুশ সম্বন্ধে একান্তভাবে ভক্তি ভালবাসার দৃষ্টি রক্ষা করিয়াই চলিয়া থাকেন এবং আরব দেশগুলি সময়ে সময়ে কর্দ্দমের কাদা নিক্ষেপ করিয়া ভারতকে আক্রমণ করিলেও ভারত কখনও তাহাদিগকে প্রেম দিতে কসুর করেন না।

অর্থ সঞ্চয়ের নিরাপত্তার উপায়

পুরাকালে জনসাধারণ অর্থ সঞ্চয় করিত প্রধানতই মত ঘর বাড়ী জমি জমা ক্রয় করিয়া। অথবা কেহ কেহ সোনা রূপার মুদ্রা বা অলঙ্কারাদি মাটির নিচে পুঁতিয়া রাখিয়া সঞ্চয় কার্য্য সাধিত করিত। এই সকল উপায়ে যাহা সঞ্চিত থাকিত তাহার সংজ্ঞে কোন প্রকার মূল্য হ্রান হইত না। অর্থাৎ গৃহ, জমি বা সোনা-রূপার মূল্য কখনই পূর্ব্বের তুলনায় এক চতুর্থাংশ বা দশ ভাগের এক ভাগ হইয়া যাইত না। চোর ডাকাত অথবা বিদেশী সৈন্যদল আসিলেও তাহারা গৃহ বা লুকান ধন সম্পদ লুণ্ঠনে সক্ষম হইত না। এই পুরাতন রীতি দীর্ঘকালাবধি অনুসৃত হইয়া আসিয়াছিল; ও এখনও কোথাও কোথাও জনসাধারণ ঐ ভাবেই সঞ্চিত অর্থ সংরক্ষণ করিয়া থাকেন। বর্ত্তমান কালে সকল দেশেই সরকারী ভাবে

সঞ্চিত অর্থ ঋণ করিয়া গ্রহণ করা হয় ও বহু ব্যাঙ্কও মেয়াদী নিয়মে অর্থ গ্রহণ করে ও সুদ সমেত ফেরত দিবার ব্যবস্থা রাখে। কিন্তু এই সকল রীতি প্রবর্তিত হইয়া থাকিলেও একটা কারণে ইহার ব্যবহার জনসাধারণের পক্ষে ক্ষতিকর হইতে দেখা গিয়াছে। ইহা হইল জাতীয় ভাবে ব্যবহৃত মুদ্রার ক্রয়শক্তি হ্রাসের জন্য অর্থ সঞ্চয় করিলেও ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনার কথা। প্রথম বিশ্ব মহাযুদ্ধের পরে বহু দেশের অর্থ মুদ্রাস্ফীতির ফলে ক্রয়শক্তি হারাইয়া ক্রমশঃ পূর্ব্বের তুলনায় একেবারেই মূল্যহীন হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। জার্ম্মানীর মার্ক মুদ্রাস্ফীতির ফলে ক্রয়শক্তিতে দশ লক্ষ ভাগের এক ভাগে গিয়া পৌঁছায় ও ফলে এক পেয়ালা চায়ের মূল্য হয় পঞ্চাশ লক্ষ মার্ক। ট্রাম বাস ভাড়াও লক্ষ লক্ষ মার্কে দিতে হইত। ঐ সময় পৃথিবীর শত শত কোটি মানুষের সকল নগদ সঞ্চয়ের (কাগজের নোটের) টাকা অল্পবিস্তর মূল্যহীন হইয়া যায়। সোনা রূপার মুদ্রার মূল্য বৃদ্ধি হয় বহুগুণ ও সেইগুলির মুদ্রা হিসাবে ব্যবহার বন্ধ হইয়া যায়। যাহাদের সঞ্চয় সোনা রূপা বা অপর বস্তুতে রক্ষিত ছিল তাহারা কাগজের নোটজাত অর্থ মূল্যহীন হইয়া যাইলেও ঘরবাড়ী, আসবাব, বাসন কোসন, বিছানা, বস্ত্র অথবা চিত্র কারুশিল্প, পুস্তক, ঘড়ি, অস্ত্র শস্ত্র, ক্যামেরা, অনুবীক্ষণ, দূরবীক্ষণ গ্রামোফোন, পালিত ঘোড়া গরু ভেড়া মুরগী, মোটর গাড়ী, নৌকা, যন্ত্র কলকব্জা ইত্যাদিতে যাহা ছিল তাহাতেই কিছুটা সম্পদ রক্ষা করিতে পারিয়াছিল। কিন্তু ঐ সময় হইতেই মানুষ সরকারী ছাপাখানা অথবা ট্যাঁকশাল হইতে যে মুদ্রা বাহির হইত তাহার উপর বিশ্বাস হারাইতে আরম্ভ করিল। প্রথম বিশ্ব মহাযুদ্ধের পরে একদফা মুদ্রার ক্রয়শক্তি নষ্ট হইয়া প্রচলিত টাকা জমান আর ততটা জনপ্রিয় রহিল না; এবং দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধের পরে সেই ক্রয়শক্তি ক্রমে ক্রমে প্রায় পাঁচ অথবা দশ ভাগের একভাগ হইয়া দাড়াইল। অর্থাৎ ১৯০৯ খৃঃ অব্দে যে ব্যক্তির নিকট এক লক্ষ টাকা সঞ্চিত ছিল, সেই এক লক্ষ টাকা ১৯৫৯ খৃঃ অব্দে ক্রয়শক্তির হিসাবে দশ হাজার টাকার সমতুল্য হইয়া দাঁড়াইল। এই অবস্থায় মানুষ স্বভাবতই ছাপান নোট, ব্যাঙ্কের জমান টাকা অথবা পেনশন, প্রভিডেন্ট ফাণ্ড প্রভৃতির ক্ষয়শীলতার প্রতি অধিক নজর দিতে আরম্ভ করিল। সকলেই জমিজমা ঘরবাড়ী ও সোনাদানার প্রতি অধিক বিশ্বাসের সহিত তাকাইতে সুরু করিলেন। কিন্তু ভারত সরকার কৃত্রিম উপায়ে সকল মূল্যবান বস্তুর দাম বাড়াইয়াও যখন মানুষের স্বর্ণপ্রীতি হ্রাস করাইতে সক্ষম হইলেন না, তখন স্বর্ণ ক্রয় বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ জারি করিয়া স্বর্ণের বাজার অচল করিবার চেষ্টা করিলেন। ফলে লক্ষ লক্ষ স্বর্ণকার বেকার হইল, কাজ কারবার বন্ধ হইয়া জাতীয় অর্থনীতিতে ঘুণ ধরিবার মত অবস্থা হইল এবং পরে বাধ্য হইয়া ঐ নিয়ন্ত্রণ ক্রমে ক্রমে হাল্কা হইতে আরোও হাল্কা করিয়া প্রায় উঠাইয়া দেওয়া হইল। হীরা জহরত মূল্য বৃদ্ধির ফলে উর্দ্ধ হইতে ক্রমশঃ আরও উর্দ্ধে উঠিয়া মহা মূল্যবান্ বলিয়া পরিগণিত হইল।

এখন ভারত সরকারের দৃষ্টি পড়িয়াছে ঘরবাড়ী জমিজমার উপরে। মানুষ যাহাতে বাধ্য হইয়া শুধু তাঁহাদের ছাপান টাকা, যাহার মূল্য কখন কি দাঁড়াইবে তাহার কোনই স্থিরতা নাই, সেই টাকাতেই সকল সঞ্চয় রক্ষা করিতে বাধ্য হয়; সেই জন্য ঘরবাড়ী ও জমির কতটা কোন্ ব্যক্তি রাখিতে পারিবে তাহার সীমা নির্দ্দেশ চেষ্টায় মনোনিবেশ করিতেছেন। ইহা দ্বারা মানুষকে বাধ্য করা হইবে ঐ অস্থায়ী মূল্যের ছাপান টাকা সঞ্চয় করিতে। সরকার রাজস্বের তুলনায় ব্যয় অধিক হইলেই নোট ছাপাইয়া ঋণদান সহজ করিয়া ঋণের টাকা ব্যয় করিয়া বাজার গরম কারবার ব্যবস্থা করিতে পারিবেন ও ফলে যাহাদের সঞ্চিত টাকা থাকিবে তাহারা ক্রমে ক্রমে দেখিবে যে সঞ্চিত অর্থ দিয়া আর পূর্ব্বের তুলনায় তেমন কিছু ক্রয় করা সম্ভব হইতেছে না। এমন কি একটা যুদ্ধ লাগিয়া যাইলে জমান অর্থ মূল্যহীনতায় দিকে আরও প্রবল গতিতে গড়াইয়া যাইবে। এই যে টাকার মূল্যহানি তাহার মূলে আছে মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধি ও সরকারী ঋণগ্রহণ রীতি। এই ঋণ

গ্রহণ করার ফলে যে সরকারী ব্যয় বৃদ্ধি হয় সেই ব্যয়ের টাকা শেষ অবধি বাজারের ভোগ্য বস্তু সকল ক্রয়ে লাগিয়া থাকে ও ভোগ্য বস্তুর পরিমাণের তুলনায় অর্থ সরবরাহ অধিক হইয়া বাজারে সকল বস্তুর মূল্য বাড়িয়া চলে। অর্থাৎ যে বস্তু অর্থ সঞ্চয়কারীর ভোগে লাগিত তাহার অনেকাংশ সরকারের নিকট যাহারা টাকা পাইল তাহাদের ভোগে লাগিয়া যাইতে আরম্ভ করে। সঞ্চয়কারীরা যাহা পাইল না তাহা পাইল সরকারের পাওনাদারগণ—অর্থাৎ তাহা সরকারের কার্য্যেই লাগিয়া যাইল। এইভাবে অর্থের মূল্য বা ক্রয়শক্তি হ্রাস এক প্রকার গোপন ভাবে জন সাধারণের সম্পদ শোষণকার্য্য বলা যাইতে পারে। মানুষ সঞ্চয় করে ভোগ সীমিত করিয়া। সেই ভোগ সে সঞ্চিত অর্থ ব্যয় করিয়া পরে করিতে পারিবে--অথবা তাহার উত্তরাধিকারীগণ করিবে এইরূপ আশাই সঞ্চয়ের কারণ। কিন্তু সরকার যদি নোট ছাপাইয়া ও ছাপান নোট ঋণ হিসাবে বাহির করিয়া লইয়া সঞ্চয়কারীর ভোগে ভাগ বসাইয়া তাহাকে সঞ্চিত অর্থের অন্তত কিছুটা ভোগ করিতে না দেন, তাহা হইলে সেই সরকারী ভাবে জোর করিয়া ভোগ সম্বরণ করান ন্যায়সঙ্গত কার্য্য নহে ও সেই অন্যায়ের দায়িত্ব সরকারের।

মানুষের যে-সকল স্বাধীনতা থাকা উচিত তাহার মধ্যে কে কি ভোগ করিবে অথবা ভোগ না করিয়া ভোগে যাহা খরচ হইত সেই অর্থ কি ভাবে সঞ্চিত রাখিবে; তাহা নিজ ইচ্ছানুসারে করিবার স্বাধীনতা একটা বিশেষ ভাবে সংরক্ষনীয় অধিকার। কোনও শাসন পদ্ধতিতেই এই স্বাধীনতা খর্ব করিবার অধিকার শাসকদিগের হস্তে তুলিয়া দেওয়া উচিত নহে। শাসকগণ যদি প্রকাশ্য উপায়ে যে রাজস্ব তাঁহাদের জন্য নির্দিষ্ট করা হয় তাহার অধিক ব্যয় করেন ও সেই ব্যয়ের জন্য যথেচ্ছ ঋণ করিয়া বাজারের মুদ্রার পরিমান বৃদ্ধি করেন ও ফলে যদি মুদ্রার ক্রয়শক্তি হ্রাস হইয়া জনসাধারণের সঞ্চিত অর্থ অপেক্ষাকৃত ভাবে মূল্যহীন হইয়া দাঁড়ায় তাহা হইলে সঞ্চয়কারীদিগের যে ক্ষতি হয় তাহার জন্য সরকারই দায়ী এবং সেই ক্রয়শক্তি হানি হইয়া যে ভোগ সঞ্চয়কারীগণ বাধ্যতামূলক ভাবে না করিতে পান তাহা এক প্রকার গুপ্ত-রাজস্ব আদায় পন্থা। ইহাকে ন্যায়সঙ্গত উপায়ে রাজস্ব আদায় বলা চলে না।

আর একটা কথাও এই সূত্রে বলা যায়। তাহা হইল সরকারের যথেচ্ছ কাজ-কারবার জাতীয় করিয়া লওয়া। জনসাধারণ নানা প্রকার কাজ-কারবারে মূল ধন সরবরাহ করিয়া কিছু কিছু লাভ পাইয়া থাকেন। ইহা অর্থনীতির একটা প্রচলিত অঙ্গ। এখন যদি সরকার আসিয়া ঐ সকল কাজ-কারবার নিজ করায়ত্ত করিয়া লইয়া ঐসকল কাজ-কারবারে লোকসান ঘটাইতে আরম্ভ করেন তাহা হইলে সেই লোকসানের জন্য দায়ী কে? জনসাধারণ যদি দশ টাকার শেয়ার পাচ টাকা হইয়া যাইতে দেখেন; অর্থাৎ তাঁহাদের সঞ্চয় যদি হঠাৎ অদ্ধেক হইয়া যায়—সরকারী অর্থনীতির ধাক্কায়—তাহা হইলে সরকারের প্রতি সাধারণের আস্থা কি করিয়া রক্ষা করা সম্ভব হইতে পারিবে তাহাও বিচার্য্য।

আবার ফরক্কা

ফরক্কা কিছুতেই যেন পরিকল্পনা অনুযায়ীভাবে কার্যকররূপ ধারণ করিয়া "নির্ম্মাণ হইতেছে" অবস্থা হইতে "নির্ম্মান শেষ হইয়াছে" অবস্থায় আসিতে সক্ষম হইতেছে না। প্রথমত: এক মাদ্রাজী মন্ত্রী ফরক্কা বাঁধের কি উদ্দেশ্য তাহাই ভুলিয়া সেই স্থলে রাস্তা ও রেলের সেতু নির্ম্মাণ শেষ করাইয়া "উন্মোচন" অনুষ্ঠান করিয়া জানিয়াকে দেখাইলেন যে ফরক্কা পরিকল্পনা সক্ষমতার সহিত বাস্তবে পরিণত হইয়াছে। পরে আর এক মাদ্রাজী মন্ত্রী নানান অজুহাতে পরিকল্পনার আসল উদ্দেশ্য যাহা, অর্থাৎ ভাগীরথীর জল বৃদ্ধি করিয়া কলিকাতা বন্দর রক্ষার ব্যবস্থা; তাহা কিছুতেই সম্পূর্ণ না করিতে পারার কারণের ইস্তাহার প্রকাশ করিয়া নিজ কর্ত্তব্য শেষ করিতে থাকিলেন। কিন্তু ফরক্কা আর কিছুতেই "নির্ম্মাণ শেষে" পৌছাইতে পারিতেছে না। এখন দেখা যাইতেছে যে ফরক্কায় গঙ্গার পাড়ে ধস পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে।

পাড় ধসিয়া বহু ঘরবাড়ী নাকি জলগর্ভে চলিয়া যাইতেছে। সংবাদপত্রে প্রকাশ যে ঐ পাড়ে গঠন কার্য্য করিতে ফরক্কার এক-কালীন প্রধান কর্ম্মচারী ডাঃ চক্রবর্ত্তী মন্ত্রী শ্রীকে,এল, রাওকে সাবধান করিয়াছিলেন। কে, এল, রাও সে কথা শুনেন নাই এবং ডাঃ চক্রবর্ত্তীও ঐ কার্য্য ত্যাগ করেন। কে, এল, রাও ইচ্ছাকৃত ভাবে এইরূপ করিয়া ফরক্কা পরিকল্পনা বানচাল করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, অথবা অজ্ঞানতা প্রযুক্ত আত্মম্ভরিতার বশে ভুলই করিয়াছিলেন তাহার বিচার আমরা করিতে পারি না। তবে ফরক্কাতে আর একটা বাধার সৃষ্টি হইয়া কলিকাতা বন্দরের জলস্রোত বৃদ্ধি এখনও হইল না। ইহাতে উক্ত মন্ত্রী প্রবরের মন্ত্রিত্ব হইতে নিক্রমণ ঘটিবে কি না, তাহাও আলোচনার বিষয়। জন-কল্যাণের কারণে ইঁহাকে সরাইয়া দেওয়াই আবশ্যক।

ঠিকাদার নিয়োগে কার্য্য ব্যবস্থা

বড় বড় কারখানা, চা বাগান অথবা ঐ জাতীয় কৃষি কেন্দ্রিক কারবার প্রভৃতিতে অনেক সময়ই ঠিকাদার নিযুক্ত করিয়া অনেক প্রকারের কার্য্য করান হইয়াথাকে। যে সকল কার্য্য নিয়মিত উৎপাদন অথবা যন্ত্রাদি ঠিক ভাবে রাখিবার ব্যবস্থার কার্য্য তাহাতে ঠিকাদারী শ্রমিক নিয়োগ প্রয়োজন না হইবারই কথা, কিন্তু বহুস্থলে সেইরূপ কার্য্যেও ঠিকাদার আনয়ন করা হইয়া থাকে। যে সকল কার্য্য কখনও হয় কখনও বা হয় না অথবা যে কার্য্যের পরিমাণ কখনও অনেক হয় কখনও বা অত্যল্প হইয়া যায়, সেই সকল কার্য্যেই ঠিকাদারী শ্রমিক নিয়োগ প্রয়োজন হয়। ঠিকাদারি কর্য্যের নানা প্রকার গলদ থাকায় ঐ রূপ কার্য্য ব্যবস্থা শ্রমিকদিগের অথবা জনমঙ্গল কার্য্যে বিশেষজ্ঞদিগের মতে উপযুক্ত কর্ম্মপন্থা নহে। ঠিকাদার নিজের লাভ ও সুবিধার জন্য বহু ক্ষেত্রেই শ্রমিকের ন্যায্য প্রাপ্য না দিয়া তাহাদিগকে প্রবঞ্চনা করিয়া থাকে। নিয়োগকর্ত্তাদিগকেও প্রবঞ্চনা করিতে অনেক ঠিকাদারেরই বাধে না। শ্রমিক সরবরাহ কার্য্যে যে সংখ্যক শ্রমিক দেওয়া হয় তাহা অপেক্ষা অধিক লিখাইয়া অথবা সময় বাড়াইয়া লিখিয়া অতিরিক্ত পারিশ্রমিক আদায় করা ইত্যাদি নানা প্রকার ঠকাইবার কার্য্য ঠিকাদারগণ বহু ক্ষেত্রে করিয়া থাকে। এই সকল প্রবঞ্চনা কার্য্যে সাহায্য লাভ করিবার জন্য ঠিকাদারগণ উৎকোচ দিয়া থাকেন বলিয়াও শুনা যায়। ইহা ব্যতীত যে জাতীয় শ্রমিক যে রূপ কর্ম্মে নিযুক্ত না করিবার কথা, ঠিকাদারগণ অনেক স্থলেই সেই রূপ অযোগ্য ব্যক্তিকে দিয়া কাজ করাইয়া থাকে। অল্পবয়স্ক বালকবালিকা অথবা রুগ্ন ব্যক্তিকে দিয়া কাজ করান ঠিকাদার মহলে সর্ব্বদাই চলিয়া থাকে। কিন্তু এই সকল কারণেই ঠিকাদার নিয়োগ ব্যয়ের দিক দিয়া লাভজনক হইতে দেখা যায় এবং বহু কারখানার কর্ম্মচারীই ঠিকাদার নিয়োগ করিতে সর্ব্বদাই ইচ্ছুক থাকেন। বর্ত্তমান যুগে ঠিকাদার নিয়োগ না করাই আদর্শনীতি হইলেও এই রীতি প্রচলিত থাকিয়া যাইতেছে। ম্যানেজারগণ এই রীতির বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিয়া আসিতেছেন বহুকাল হইল, কিন্তু ঠিকাদার নিয়োগ বন্ধ হইতেছে না কিছুতেই। অনেকে বলিয়া থাকেন যে দুর্নীতিপরায়ণ কর্ম্মচারীগণ ঠিকাদার নিয়োগ লাভজনক মনে করেন বলিয়াই এই রীতি প্রচলিত থাকিয়া যাইতেছে। নতুবা ঠিকাদারি শুধু শ্রমিকদিগের প্রতি অবিচারের ব্যবস্থাই নহে; ইহার ফলে শ্রমিকদিগের মঙ্গলকর যত আইন করা হইয়াছে তাহার অনেকগুলিই যথাযথ ভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব হয় না। ভারত সরকার ঠিকাদারির সমর্থন করেন না। কিন্তু অবস্থা বিপর্য্যয় ঘটিলে সরকারী পরিচালকগণ ঠিকাদারের শ্রমিক দিগকে বেতন বৃদ্ধি করিয়াও কর্ম্মে নিযুক্ত রাখিতে কসুর করেন না। সম্প্রতি একটি কারখানায় ঠিকাদারী শ্রমিকগণ হরতাল করিয়া নিজেদের বেতনাদি শতকরা চল্লিশ টাকারও অধিক বাড়াইয়া কর্ম্মে মোতায়েন রহিয়া গিয়াছে। এই প্রকার ঘটনাবলী দ্বারা ইহাই প্রমাণ হয় যে সরকারী আদর্শবাদ প্রবল ভাবে প্রচারিত হইলেও তাহা কাচৎ কদাচিৎ কার্য্যক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইতে দেখা যায়। ইহার কারণ যে ঐ রীতি প্রচলিত থাকিলে উচ্চ নীচ, প্রকাশ্যে গোপনে, নানান স্তরের ব্যক্তিদিগের উহার দ্বারা লাভের পথ খুলিয়া যায়।

উনিশ শ বাহাত্তরের বিশেষত্ব

উনিশ শ বাহাত্তরের ঘটনাবলী আলোচনা করিলে দেখা যায় যে ঐ বৎসরটি বহু কারণে দেশের ও দুনিয়ার ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। কি কারণে থাকিবে তাহার তালিকা প্রস্তুত করিলে দেখা যাইবে নানান দিক দিয়াই ঐ বৎসরের নানান ঘটনার বৈশিষ্ট্য স্বীকার করিতে হইবে এবং অনেক ক্ষেত্রেই যাহা এখন মহা গুরুত্ব পূর্ণ বলিয়া বিচার করা হইবে তাহা দুই-পাঁচ বৎসর পরে আর কেহ হয়ত মনেও রাখিবে না। আবার কোন কোন ঘটনা এখনকার দৃষ্টিতে বিশেষ সম্ভাবনা-পূর্ণ মনে না হইলেও হয়ত ভবিষ্যতের পরিণতিতে ইতিহাসের পাতায় অতি বড় অক্ষরেই লিখিত থাকিবে। যদি হঠাৎ কেহ জিজ্ঞাসা করে উনিশ শ বাহাত্তরে কি ঘটিয়াছিল তাহা হইলে এদেশের মানুষ স্বভাবতই বলিবে শেখ মুজিবুর রেহমান স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া বাংলা দেশকে পৃথিবীর মানচিত্রে উজ্জ্বল বর্ণে অঙ্কিত করিয়া দেখাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন; অনাবৃষ্টিতে দেশের বহু অংশ জ্বলিয়া তৃণপত্রহীন অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছিল এবং আসামে আসামী গুণ্ডারা বাঙ্গালী সংখ্যালঘু নাগরিকদিগের উপর অমানুষিক অত্যাচার করাতে একটু দুঃসহনীয় অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল। আমেরিকানগণ বলিবেন ঐ বৎসর তাঁহারা আর একবার চন্দ্রে অভিযান পাঠাইয়া সক্ষমতার সহিত নিজেদের চন্দ্র গমন পরিকল্পনা সম্পূর্ণ করিয়াছেন; নিকসন পুনর্ব্বার রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচিত হইয়া চার বৎসরের জন্য আমেরিকার হর্তাকর্তা বিধাতা রূপে শ্বেত প্রাসাদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন এবং নিকসনের আদেশে উত্তর ভিয়েতনামের উপর আবার প্রবল ভাবে আমেরিকান বিমানবাহিনী বোমা বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। চীন বলিবে জাপানের সহিত তাহার মিতালি স্থাপিত হইয়া ঐ দুই দেশের ইতিহাসের একটা নতুন অধ্যায় লেখা আরম্ভ হইল। ইয়োরোপের মানুষ বলিবে মিউনিখের ওলিম্পিক ক্রীড়ার ইহুদি খেলোয়াড়-দিগকে নির্মম ভাবে হত্যা করিয়া আরব গুপ্তঘাতকগণ বর্ব্বরতার চূড়ান্ত করিয়াছে এবং ইংরেজদিগের কথায় মনে হইবে বৃটেনের ইয়োরোপীয় সাধারণের নিজস্ব ক্রয় বিক্রয় ব্যবস্থায় সংযুক্ত হওয়াই পৃথিবীর অর্থনীতি ক্ষেত্রে একটা অতিবৃহৎ ঐতিহাসিক ঘটনা।

পৃথিবীর ইতিহাস ও সকল জাতির পারস্পরিক সম্বন্ধ নির্ণয় বিচার করিলে বলিতেই হয় যে নিকসনের নির্ব্বাচনে জয়লাভ বিশ্বের আন্তর্জাতিক সম্বন্ধ বিচারে এমন একটা বিষাক্ত আবহাওয়া আনিয়াছে যাহার চরম পরিণতি কি হইবে তাহা বলা সহজ নহে। নিকসন নির্ব্বাচনে জয় লাভের পূর্ব্বে যে ভাবে বিশ্বমৈত্রী স্থাপন চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করিতেছিলেন, দ্বিতীয়বার রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচিত হইবার পরে আর তাঁহার সে দৃষ্টিভঙ্গী তিনি রক্ষা করিতে পারিলেন না।

কোথায় গেল চীন ও রুশের সহিত প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপন চেষ্টা, আর কোথায়ই বা গেল তাঁহার মানবতা বোধের নব জাগরণের দ্রুত উন্মেষ। তিনি হঠাৎ বিশ্ব মানবীয় নীতিবাদ ভুলিয়া পৃথিবীর নর নারী শিশুর নিধন যজ্ঞের হোতা রূপে একটা ভয়াবহ রূপ পরিগ্রহণ করিয়া জগৎবাসীর নিকট প্রলয়ের মহাদূত বলিয়া

পরিচিতি লাভ করিলেন। নর নারী শিশু নির্ব্বিশেষে সকল নাগরিককে হত্যা করার ব্যবস্থা ঠিক যুদ্ধ নহে; কারণ যুদ্ধের একটা আন্তর্জাতিক বৈরিতাজাত কারণ থাকে। নিকসনের উত্তর ভিয়েৎনাম আক্রমণ ও তত্রস্থ সকল মানুষকে প্রাণে মারিবার ব্যবস্থা উত্তর ভিয়েৎনামের সহিত আমেরিকার কোন সাক্ষাৎ শত্রুতা না থাকা সত্ত্বেও দুর্দ্দম আবেগে চালান হইতেছে। উত্তর ভিয়েৎনাম হয়ত দক্ষিণ ভিয়েৎনামকে আক্রমণ করিবে; এবং সেই সম্ভাবনা আগে হইতেই নিবারণ করিবার জন্য উত্তর ভিয়েৎনামের জনসাধারণকে লক্ষ লক্ষ মণ বিস্ফোরক ফেলিয়া মারা হইতেছে। যুদ্ধের আশঙ্কা থাকিলেই যদি যাহারা যুদ্ধ "হয়ত" করিতে পারে তাহাদের স্ত্রী-পুত্র-দিগকে বোমার আঘাতে ছিন্নভিন্নদেহ করিয়া বিনাশ করা ন্যায় ধর্ম্ম অনুগত বলিয়া ধরা যায়, তাহা হইলে সেই নীতি অনুসরণে যে কোন মানুষ অপর যে কোন মানুষকে হত্যা করিয়া বলিতে পারে যে নিহত ব্যক্তি বাঁচিয়া থাকলে হত্যাকারীকে হয়ত মারিয়া ফেলিতেও পারিত, সেইজন্য তাহাকে আগে হইতে মারিয়া ফেলাই আত্মরক্ষার শ্রেষ্ঠ পন্থা বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। প্রেসিডেণ্ট নিকসনের নীতিজ্ঞানের সহিত আরব গেরিলাদিগের নীতিবোধের অনেক সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। আরব-দিগের মতে ইহুদিদিগকে যে দেশেই পাওয়া যায় সেই দেশেই আক্রমণ করা বিধেয়, কারণ জার্ম্মানীতে ইহুদি-গণ ততটা সাবধানে আত্মরক্ষার্থে প্রস্তুত থাকিবে না ও তাহাদিগকে হত্যা করা সহজ হইবে। ইসরায়েলে ঐ কার্য্য করা অতটা সহজ হইবে না সুতরাং অপর দেশে গিয়া ইহুদি হত্যাই সরল ও সহজ পন্থা।

নিকসন ভাবিলেন উত্তর ভিয়েৎনামের সৈন্যগণ কোথায় আছে তাহা খুঁজিয়া বাহির করা কঠিন। তাহাদিগের পরিবারের নর নারী শিশুগণ হানয় বা তন্নিকটস্থ শহরগুলিতে আছে এবং তাহাদের সহজেই হত্যা করা যায়। সুতরাং তাহাদের মারাই সমীচীন। ইহাতে উত্তর ভিয়েৎনামের সৈন্যবাহিনীর কিছু না হইলেও উত্তর ভিয়েৎনামীদিগের একটা কঠিন শাস্তি হইবে। পাপের শাস্তি সম্ভব না হইলেও যদি পাপ করিবার পূর্ব্বেই হবু-পাপীর পরিবারের লোকেদের শাস্তি দেওয়া যায় তাহা হইলেই বা ক্ষতি কি হয়?

আসামী ভাষাভাষী মানুষদিগের ইচ্ছা যে আসামে অন্য ভাষা কেহ বলিবে না। সকলেই আসামী ভাষা বলিবে এবং স্কুল-কলেজেও শুধু ঐ ভাষাই চলিবে। আসামীরা স্থির করিল তাহাদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির শ্রেষ্ঠ উপায়, যাহারা অন্য ভাষা বলিতে পারে তাহাদের মারিয়া শেষ করা অথবা আসাম হইতে বিতাড়িত করা। বাঙ্গালীকে তাড়াইবার কথাটা এই উপায়ে আসামকে নিছক আসামী প্রদেশ বলিয়া গড়িয়া তুলিবার চেষ্টারই অঙ্গ। কিন্তু এই পন্থা চালাইয়া উল্টা ফল হইবে। কারণ মানুষ মারিয়া ভাষার প্রতিষ্ঠা হইতে পারে না। বরঞ্চ দেখা যাইবে উহার ফলে কিছুই হইতেছে না। সম্ভবত আসাম প্রদেশই উঠিয়া যাইবে।

ঐ বৎসরে দেশবাসী আর একটা মহা দুর্দৈবের ভাগী হইয়াছিল। বৎসর ভোর অনাবৃষ্টি এমনই ঘোরতর রকমের হইল যে তাহার ফলে সবুজ বিপ্লব ত নিজের স্বরূপ রক্ষা করিতে পারিলই না, উপরন্তু খাদ্যের অভাব প্রকট হইয়া সকলের মনে রাষ্ট্রীয় কথা মাত্রেই একটা অবিশ্বাসের ছায়াপাত করিল। সকল মানবের মধ্যে ঐক্য ও একজাতীয়তা বোধ জাগ্রত করা, দারিদ্র্য দূর করিয়া ভারতের জনসাধারণকে উচ্চতর জীবন যাত্রার মান প্রতিষ্ঠা করিতে সাহায্য করা, পাকিস্থানের সহিত মৈত্রী স্থাপন অথবা চীনের সহিত আন্তর্জাতিক সম্বন্ধের নবজন্ম ইত্যাদি কোনও কথাতেই আর কেহ বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না। বিশ্বাসের সরস জীবনীশক্তি যেন অবিশ্বাসের খর তাপে শুখাইয়া শেষ হইয়া গিয়াছে। উনিশ শ বাহাত্তরে যে সমাজতন্ত্র বা সোসিয়ালিজম ভারতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছিল তাহা খাদ্যাভাবে, উপার্জ্জন-হীনতায় এবং শাসকদিগের বর্ব্বরতা দমন কার্য্যে অক্ষমতা ও নিস্পৃহ-তায় আর একটা অর্থহীন কথায় মাত্র পরিণত হইতে চলিল, সমাজকে নূতন রূপ কেহ আর ধারণ করাইতে পারিল না।

বৃটেন ছিল পৃথিবীর ব্যবসার কেন্দ্র। লমবার্ড ষ্ট্রীট ছিল দুনিয়ার টাকা লেন দেনের বাজার। উনিশ শ বাহাত্তরে বৃটেন পৃথিবীর অর্থ কোথা হইতে আসিবে বা কোথায় যাইবে সে কার্য্য আর করিতে না পারিয়া ইয়োরোপীয় অর্থনীতির সীমাবদ্ধ অঙ্গনে দোকান খুলিয়া বসিবার আয়োজন করিতে তৎপর হইল। ইয়োরোপীয় বাজারে পাঁচজনের একজন হইয়া বসিলে অন্ততঃ রোজ-কার বাজার খরচ জুটিয়া যাইবে, বৃহত্তর ব্যাপারে জড়িত থাকার গৌরব না থাকিলেও। পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকে পরিবর্ত্তন ঘটিলে নূতন অবস্থায় সকল কিছুর সহিত মানাইয়া চলিতে পারিলে বাঁচিয়া থাকা যায়। এই জ্ঞান যে সহজ ভাবে আয়ত্ত করিতে পারে সে বাঁচিয়া যায়। যে পারে না, শুধু অতীত গৌরবের স্বপ্নে বিভোর থাকিয়া ক্রমবর্দ্ধনশীল অভাবের তাড়নায় বিকল অবস্থায় নিমজ্জমান হইতে আরম্ভ করে তাহার ভবিষ্যৎ ঘনঘটাচ্ছন্ন প্রতীয়মান হয়।

মিউনিখে শতাধিক জাতির খেলোয়াড়গণ একত্র হইয়া ক্রীড়াক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হইয়াছিল। ভারতীয় খেলোয়াড়ও ছিলেন বহুসংখ্যক ও বহু জাতীয় খেলার আসরে নিজ ক্ষমতা প্রদর্শণ করিবার জন্য। কিন্তু তাঁহারা কোনও কেরামতি দেখাইতে পারেন নাই। শুধু হকি খেলায় জয়স্তম্ভের পাশ ঘেঁষিয়া যাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ভারতের ক্রীড়া ক্ষেত্রে এই অপারগতা উনিশ শ বাহাত্তর খৃঃ অব্দে আবার প্রকট ভাবে ব্যক্ত হওয়াতে সকলে দেশের সুনাম রক্ষার্থে তর্কবিতর্ক আরম্ভ করিলেন। গভর্ণমেণ্ট কেন আরও অর্থ ব্যয় করিয়া খেলোয়াড়দিগের শিক্ষাদিবার ব্যবস্থা করেন না, বিদেশ হইতে আরও অধিক সংখ্যক ক্রীড়াক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞদিগকে এদেশে আনাইবার আয়োজন কেন করেন না ইত্যাদি ইত্যাদি।

আসল কথা হইল দেশের সকল জনবহুল অঞ্চলে খেলার মাঠ, কসরতের আখড়া, খেলার নানান ক্ষেত্রের খেলোয়াড়দিগকে একত্র করিয়া দল বা ক্লাব গঠন এবং প্রতিযোগিতার বন্দোবস্ত করা। সরকার সেই সকল উদ্দেশ্যে টাকা দিবার চেষ্টা করিলেই রাষ্ট্রীয় দলের মোড়লরা আসিয়া সেই টাকা অন্যায় ভাবে লইয়া রাষ্ট্রীয় দলের কার্য্যে লাগাইবার চেষ্টা করেন বলিয়া শুনা যায়। ফলে ক্রীড়া ক্ষেত্রে সে অর্থ না পৌছিয়া তাহা সরকারী বহু অন্য দানের অর্থের মতই অপচয় হইয়া থাকে এবং ক্রীড়ার উন্নতি হওয়া সম্ভব হয় না। পূর্ব্বে রাজা মহারাজা ও ধনীব্যক্তিরা ক্রীড়াবিদ্-দিগকে অর্থ দিয়া সাহায্য করিতেন। এখন রাজা মহারাজারা নিঃসম্বল ও ধনীরা ট্যাক্স দিয়া দেউলিয়া। সুতরাং একমাত্র সরকারী সাহায্যই ক্রীড়াবিদ্দিগের সাহায্যে আসিতে পারে। কিন্তু রাষ্ট্রীয় দলের পাণ্ডারা তাহা হইতে দেন না।

উনিশশ বাহাত্তরে সরকারী বহু অর্থ-নৈতিক প্রচেষ্টা লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইয়া ভুল জায়গায় গিয়া লাগাতে অর্থনীতি ক্ষেত্রে কোনও উন্নতি ঘটিতে দেখা যায় নাই। সহস্র সহস্র কোটি টাকা সরকারী কর্ম্ম ক্ষমতার ধাক্কায় যে দেশে অধিকাংশ স্থলে শুধু লোকসান সৃষ্টি করিয়াছে, সেখানে যে পরের সম্পত্তি নিজ হস্তগত করিয়া সরকার বাহাদুর লাভ দেখাইতে পারিবেন এরূপ আশা করা বৃথা। সুতরাং সমাজবাদ প্রতিষ্ঠার মহান্ আদর্শ প্রচারিত হওয়া সত্ত্বেও সরকারী হস্তে সমাজবাদের বলি ব্যবস্থা ব্যবসাদারীর নীতি ও পদ্ধতি রক্ষা করিয়া চালিত হইতে পারে নাই। উনিশ শ বাহাত্তর সরকারী কর্ম্মশক্তির দিক হইতে ফলপ্রসূ বলিয়া গণ্য হইবে না। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে সহজেই কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের "বাক্যবীর হ'য়ে রইলাম" ব্যঙ্গ কবিতার কথা মনে পড়িয়া যায়। কথার বন্যায় অকর্ম্মা মানুষ নিজ অক্ষমতা চিরকালই ঢাকা দিবার চেষ্টা করিয়া আসিয়াছে। রাষ্ট্রীয়দলের মানুষ এবং আমলা ও মন্ত্রীগণও কথা দিয়া কাজের অভাব লোকচক্ষের বাহিরে রাখিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। সুতরাং বাক্যই শুধু অকাতরে বাড়িয়া চলে ও তাহার আড়ালে ক্ষীণকায় কর্ম্ম কোথায়

গা ঢাকা দিয়া থাকে অথবা না থাকায় দারিদ্র্য অদৃশ্য করিয়া রাখে তাহার হিসাব রাখা অসম্ভব।

কত কথাই কথিত হইয়াছে ও কত কাজই করা হয় নাই তাহার সুদীর্ঘ তালিকা কে করিতে পারিবে? অহিংসা, গ্রামের অর্থনীতিকে কেন্দ্র করিয়া দেশ সংস্কার ও গঠন, কারখানাবাদের বিভিন্ন পরিকল্পনা, নানা ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণতা সাধন, শিক্ষা, চিকিৎসা, জলসেচন ও পানীয় জল সরবরাহের প্রতিশ্রুতি, সাড়ে আট কোটি গৃহ নির্মাণ, লক্ষ লক্ষ বেকারদিগকে কর্ম্মে নিযুক্ত করা প্রভৃতি অগণ্য ও সর্ব্বব্যাপ্ত বাক্যজালের সূত্রে রাষ্ট্রীয় ঊর্ণনাভগণ দেশের জনসাধারণ রূপ মক্ষিকাগুলিকে শোষণ করিয়া নিজ নিজ পুষ্টির ব্যবস্থা করিয়া থাকেন এই পরিস্থিতিতে দেশের উন্নতি হওয়া একান্তই কঠিন। কথার উপর নির্ভর করা যায় না সকলেই জানেন কিন্তু কথা শুনিতে সকলেই আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন ও কথার জন্য মানুষকে সম্ভ্রম প্রদর্শনে কৃপণতা দেখাননা বলিয়াই দেশের নিষ্কর্ম্মা বাক্যবীরদিগের কথাস্রোতে অদ্যাবধি ভাটা পড়িতেছে না।

ঊনিশ শ বাহাত্তরেও কথা প্রবল বন্যায় শ্রোতাদিগকে ভাসাইয়া লইয়া গিয়া সকল নিরাশার পরপারে পৌঁছাইয়া দিয়াছে। মানুষ আশা ও প্রতিশ্রুতি শ্রবণের আবেগেই বাঁচিয়া থাকিতে শিখিয়াছে। বাস্তবে বিশ্বাসই সোসিয়ালিজম ও কম্যুনিজমের মূলমন্ত্র হইলেও মানুষ নূতন ছাঁচে জীবন গঠন করিবার জন্য শুধু অবাস্তব কল্পনার উপরেই নির্ভর করিতে শিখিয়াছে। এই ব্যাধির কোনও উপশম হইতেছে বলিয়া মনে হইতেছে না। যে বৎসর গত হইল তাহাতে পৃথিবীর অথবা ভারতের জন সাধারণের কোন প্রগতি ও ক্ষেত্রে উন্নতির অগ্রগমন সম্ভব হয় নাই।

পরীক্ষায় ছাত্রদের আবোল তাবোল

পরিমল গোস্বামী

রচনার আরো নমুনা দিচ্ছি—আরো সুন্দর। বিষয় ভ্রমণের আনন্দ ও উপকারিতা।

"...কলিকাতা আসিয়া দেখি কত রিকশা, কত ট্রাম, কত মোটর আর কত কি। আমি শুধু তাকাইয়া তাকাইয়া দেখিতাম। আমার সঙ্গীরা আমাকে ফেলিয়া চলিয়া যাইত, আমি আবার ছুটিয়া গিয়া তাহাদের সাথ নিতাম। আর কলিকাতা থাকতে আমার বেশ ভাল লাগিল। ওখানে দুই বৎসর ছিলাম। দুই বৎসর থাকাতে আমি লজ্জা ভয় প্রভৃতি সমস্ত হারাইয়াছি। আগে কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দিতে পারিতাম না, এখন আর তা নাই। এখন কত অফিসারের সঙ্গে কথা বলি। আবার কোন গেয়ো ছেলে কলিকাতা আসলে তাহাকে লইয়া সমস্ত টাউন ফিরাইয়া আনি।...কলিকাতা হইতে একবার শিকারে গেলাম সুন্দরবন। আমরা ছয় জন ছিলাম। একটা বেশ বোড়ালো (?) ও পানির (?) ধার ঘেঁষিয়া মঞ্চ তৈয়ার করিয়া রাত্রে বসিয়া আছি। রাত তখন ৭টা হইবে, এমন সময় একটা সিংহী (সুন্দরবনে সিংহী?) একটা মেষ শাবককে তাড়া করিয়া আসিতেছিল এবং আমাদের সামনে তাহাদের ধরিল। ইত্যবসরে সমস্ত বন কাপাইতে কাপাইতে মেষগুলি সিংহীটির পশ্চাৎ অনুসরণ করিয়া আসিতেছিল। মেষগুলি আসিয়া পৌছিলে সিংহী ও মেষের মধ্যে লড়াই বাধিয়া গেল। সে কি লড়াই। ওদিকে দেখি একটা সিংহ একটা মেষের পিঠে চাপিয়া আছে। অন্য দিকে দেখি একটা মেষ একটা সিংহকে মাটির সঙ্গে চাপিয়া ধরিয়া আছে। শেষে মেষেদেরই জয় হইল। আমরাও গোটা দুই তিন বাঘ শিকার করিয়া বাড়ী ফিরিলাম।

মোষই যে মেষ হয়েছে সন্দেহ নেই, কারণ মেষের এমন ক্ষমতা থাকতে পারে না। দ্বিজেন্দ্রলালের "মানুষ আমরা নাহ তো মেষ" গানই তা হলে বৃথা হয়। কিন্তু সুন্দরবনে সিংহ-দম্পতিকে দেখা এবং কয়েকটি বাঘ মারা খুবই আনন্দদায়ক সন্দেহ নেই। তবে বাংলাদেশে থেকে সিংহরা যে পোষা মোষের কাছে হেরে যায় এ খবরও মূল্যবান। নইলে সুন্দরবনে বুনো মোষের পাল অন্য লোকদের চোখে পড়ে না কেন? অতএব সন্দেহ হয় কোনো থাটাল থেকে ওরা বেরিয়ে এসেছিল সিংহের সঙ্গে লড়াই করে কোনো একটা পুরস্কার জেতার লোভে। কিন্তু এর বর্ণনাটাই হল আসল, তথ্য যাহা হোক। পরীক্ষার্থীরা প্রকৃত শিশু-সাহিত্যিক—শিশু এবং সাহিত্যিক। অবশ্য অনেক বয়স্ক লেখককেও কল্পনায় এ রকম বেপরোয়া হতে দেখেছি এবং তাঁরা সংখ্যায় কম নন। বেপরোয়া কথাটা বিশেষ অর্থে। রূপকথাতেও অসম্ভব সব কল্পনা থাকে, কিন্তু সে-সব গল্পের ঘটনা লজিক ঠিক রেখে চলে। এ কালের লেখকেরা লজিকের ধার ধারেন না, কল্পনায় ক্ষেত্র তাঁরা খুঁজে পেয়েছেন শিশুদের জন্য পাঠ্যপুস্তক লেখার মধ্যে। বলেছি, সে কথা পরে বলব দৃষ্টান্তসহ।

এবারে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে কয়েকজন পরীক্ষার্থীর মত প্রকাশ করছি।

১। রবীন্দ্রনাথের বই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য চোখের বালি, গোরা, ডাকটিকিট, সোনার মনীষী ইত্যাদি।

২। তাঁর লেখা নৌকাডুবি, চাঁদের বালি প্রভৃতি নাটক।

৩। রবীন্দ্রনাথ ইউরোপ গিয়া ইংরাজি শেখেন এব

ফিরিয়া আসিয়া ইউরোপ পত্রিকা নামক এক পত্রিকা বের করেন। (য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র নামটির স্মৃতি থেকে লেখা মনে হয়।)

৪। রবীন্দ্রনাথ বাল্যকালে পিত্রালয়ে পাড়তেন।

৫। রবীন্দ্রনাথ মেধাবী ছাত্র ছিলেন, তিনি বলিয়াছিলেন I does not know how to forget.

৬। রবীন্দ্রনাথ বি-এ পাস করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যানসেলর হন। তিনি কিছুকাল আদালতেও কাজ করিয়াছিলেন। (সিনথেটিক রবীন্দ্রনাথ।)

৭। রবীন্দ্রনাথ স্কুল থেকে পালিয়ে এসে মাঠে মাঠে রাখালদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াতেন। (সম্ভবত 'এবার ফিরাও মোরে'র ক্ষীণ স্মৃতি থেকে লেখা।)

৮। রবীন্দ্রনাথ নিজের দোষের জন্য বাল্যকালে ঘরে বন্দী থাকিতেন। (ঘরে বন্দী থাকতেন, অতএব নিশ্চয় দোষের জন্য। অদৃষ্টের দোষ লিখলে ঠিক হত।)

৯। ইংরেজরা তাঁহাকে লর্ড উপাধিতে ভূষিত করিলেন।

১০। ইংরেজ কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ রবীন্দ্রনাথের কবিতার ভূয়সী প্রশংসা করিতেন। (রবীন্দ্রনাথের জন্মের ২১ বছর আগে ওয়ার্ডসওয়ার্থের মৃত্যু হওয়া সত্ত্বেও। সম্ভবত ইয়েটস্ এ ক্ষেত্রে ওয়ার্ডওয়ার্থ হয়েছেন।)

১১। তিনি রাশিয়ার চিঠি নৌকাডুবি প্রভৃতি নাটক লেখেন।

১২। কলকাতার অক্সফোর্ড বিদ্যালয় তাঁহাকে ডি-লেট উপাধি দেন।

১৩। তিনি ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে নবেল লিখিয়া পৃথিবীর মধ্যে অক্ষয় যশ অর্জন করিলেন। তিনি বহু ভাষাবিৎ ছিলেন। সকল ভাষাতেই গীত লিখিয়াছেন।

১৪। ছেলেবেলা হইতেই তিনি ভাবুক ছিলেন এবং প্রত্যেকটি কাজ ভাবিয়া তবে করিতেন।

১৫। তিনি একধারে লেখক ও অন্যধারে কবি ছিলেন।

১৬। তিনি জোড়াসাঁকোতে ভর্তি হইয়াছিলেন। সেখান হইতে অনেক বিদ্যা লইয়া ফেরেন। তিনি একজন হেনরির কাছে থাকিতেন। (লণ্ডন জোড়াসাঁকোয় পরিণত।)

১৭। রবীন্দ্রনাথ শৈশব হইতেই বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার ফল প্রভৃতি গান লিখিতেন। তারপর হাইস্কুলে ভর্তি হইলেন। তখন তাঁহার গানের দিকে ঝোঁক পড়িল। এই সময় পড়া ত্যাগ করিয়া তিনি রাশিয়ার চিঠি, বাংলার মুখ প্রভৃতি কবিতা লেখেন। তারপর পিতা দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে বিলাত যান।

১৮। তিনি ১৩৪৮ ২২শে শ্রাবণ ইহলোক গমন করেন।

১৯। রবীন্দ্রনাথ হুগলী জেলার অন্তর্গত জোড়াসাঁকোয় জন্মগ্রহণ করেন। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে নভেল প্রাইজ লাভ করেন। তিনি স্বদেশ ব্যাঞ্জন ছিলেন।

এরপর বিবিধ বাক্য গঠনের দৃষ্টান্ত :

পাকা ধানে মই

১। যাও যাও আর পাকা ধানে মই দিতে হবে না, আমিই যখন সব করলাম তখন বাকিটাও পারব।

২। আগে কাজ শেষ কর তারপর তোমার পাকা ধানে মই হিসাব করে দেব। (দালালি অর্থে ব্যবহৃত।)

গায়ের ঝাল

১। আমার কথায় তাহার গায়ে ঝাল লাগিল।

২। তোমাকে দেখিয়া আমার গায়ে ঝাল হইতেছে।

তেলে বেগুনে

১। তাহার ভাইয়ের আগমন সংবাদে তেলে বেগুনে উত্তর দিল।

২। সে তাহার কথায় তেলে বেগুন হইয়া উঠিল।

৩। স্বামী নিন্দায় স্ত্রী তেলে পুড়িয়া বেগুন হইল।

বাগজাল

১। তাহাকে বাগজালে পাইয়া তাহার উপর সে প্রতিশোধ লইল। (বাগে পাওয়ার সঙ্গে গণ্ডগোল।)

২। সীতার বাগজালে লক্ষ্মণের চিত্তপুত্তলি দগ্ধ হইতে লাগিল।

৩। হরিশ একেবারে বাগজাল ছেলে, প্রত্যেক বিষয়ে বাগজাল।

৪। তুমি আজকাল এত বাগজাল হইয়া পড়িয়াছ যে তোমার কথার কোন মূল্য থাকে না।

৫। আমি সভায় গিয়া কথা বলিতে পারি নাই, কারণ আমার গলা বাগজালে রুদ্ধ হইয়াছিল।

দিলদরিয়া ও দক্ষযজ্ঞ

১। এই বিশাল দিলদরিয়া মাঝে একমাত্র ভগবান সহায়।

২। মাঝিরা নৌকা দিলদরিয়ায় লইয়া গেল।

৩। দিলদরিয়ার মাঝে একটি সর্প ভাসিতেছে।

৪। রামবাবুর স্থায় দক্ষযজ্ঞ ব্যক্তি এ গ্রামে বিরল।

৫। তোমার এ মতলব শেষে দক্ষযজ্ঞ হয়ে দাঁড়াবে, কোনদিন কাজে লাগবে না।

চিনির বলদ

১। বসে বসে খেয়ে তুমি চিনির বলদ হয়ে পড়লে।

২। এমন শরীর যে একটু ঠাণ্ডা লাগলেই সর্দি হয়—একেবারে চিনির বলদ।

শিরে সংক্রান্তি

১। তোমার মাথায় যে এখন শিরে সংক্রান্তি।

২। তাহাকে শিরে সংক্রান্তিতে পাইয়াছে।

৩। একেবারে শিরে সংক্রান্তি করে এলে, খাবার যে ফুরিয়ে গেল।

৪। ছেলেটি এমন দুষ্টু যে শিরে সংক্রান্তি না করিয়া ছাড়িবে না।

বিবিধ শব্দের সাহায্যে বাক্য গঠন

১। তুমি একটি মিটমিটে শয়তান, অর্থাৎ শাঁখের করাত।

২। তোমার মত তীর্থের কাক আর জগতে একটিও নাই।

৩। তুমি যে আজকাল একেবারে পুকুর চুরির মত বেড়াইতে আরম্ভ করিয়াছ।

৪। হরিশবাবুর পুত্র কূপমণ্ডুকের মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

৫। তাহাকে তুমি এই রকম কঠিন কাজের ভার দিয়াছে. জান না সে শাঁখের করাত?

৬। পয়লা পরীক্ষা আরম্ভ হওয়ায় ছেলেদের এবং বোর্ডের কর্মচারীদের শাঁখের করাত হইয়াছে।

৬। ছেলেটি ২৪ ঘণ্টা আমার সঙ্গে শাঁখের করাতের মত ঘুরছে।

৭। ঘরখানি যেন একটি কপমণ্ডপ।

আরো রবীন্দ্রনাথ

১। রবীন্দ্রনাথের প্রথম পুস্তকের নাম অভিসার।

২। তিনি একটি শান্তিনিকেতন করেন।

৩। জগতের শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক প্রাণপণ চেষ্টা করায় আর বাঁচিয়া উঠিলেন না।

৪। রবীন্দ্রনাথ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র।

৫। তিনি সোনার তৌরী লিখিয়াছিলেন।

৬। বোলপুরে স্ত্রী পুরুষ উভয় লিঙ্গের ছাত্রছাত্রী অবাধে পড়াশুনা করে।

৭। রবীন্দ্রনাথ নরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র ছিলেন।

৮। তিনি দাশরথি রায়ের পথের পাচালি সুর করিয়া পড়িতেন।

৯। জালালাবাদের হত্যাকাণ্ডের পর উপাধি ফিরাইয়া দিয়াছিলেন।

১০। ক্রমে তাঁহার প্রতিভা বর্দ্ধিতাকার ধারণ করিল। ইংরাজরা তাঁহাকে লর্ড উপাধিতে ভূষিত করিল।

১১। যখন ইংরেজ ভারতকে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে ভাগ করিয়া শক্তিহীন করিতে চাহিল সে সময় একদা এক দাড়িওয়ালা বৃদ্ধকে রাস্তায় সবার হাতে রাখি বেঁধে দিতে দেখা গেল। দেশবাসী• অবাক। ইনিই রবীন্দ্রনাথ। ১২। রবীন্দ্রনাথ ভারতবাসীকে

সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার বিরুদ্ধে সচেতন করার জন্য লিখলেন ভারততীর্থ আর দুর্ভাগা দেশ।

১৩। এই যে বিরাট কবি তাঁহার মত লোকের সমালোচনা করা আমার মত হীন লোকের কর্তব্য নয়। কিন্তু তথাপি আমার একই প্রশ্নপত্রে নথিবদ্ধতা আছে বলিয়া সামান্য কিছু বলিতেছি। তিনি সত্যই জগৎ কবি ছিলেন। তিনি কার কবি নন? ছোটবড় যুবক কিশোর সবার কবি। সর্বপ্রকার লোকের সম্বন্ধে তিনি কবিতা লিখিয়াছেন, লেখেন নাই শুধু দরিদ্রের জন্য। তিনি অর্থশালীর ন্যায় জীবন যাপন করিয়াছেন, তাই দরিদ্রের জন্য লেখা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। (ইনকাম্ গ্রুপ ভাগ করে কবিতার পাঠক ঠিক করা ও সেই ভাবে কবিতা লেখার এই ইঙ্গিতটি মন্দ নয়। ৫০০ টাকার নিচের আর বিশিষ্ট ব্যক্তি ও ভিখারীদের জন্য তিনি কিছুই যে লেখেন নি, এটা অবশ্যই পরিতাপের বিষয়। আধুনিক কবিরাও এ বিষয়ে সচেতন হলে বোধ হয় ভাল হয়।)

১৪। রবীন্দ্রনাথ সর্বপ্রথম নাইট উপাধিতে ভূষিত হন। তারপর আমেরিকায় যান। তথা হইতে ফিরিবার সময় যথেষ্ট সম্মান লইয়া আসেন। তখন তাঁহাকে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি "ডি লিট অব লিটারেচার" এই উপাধিতে ভূষিত করেন। তারপর ডি লিট এই উপাধি পান।

১৫। তাঁহার নিজের লাইব্রেরি বা গ্রন্থাগার ছিল। তিনি দিনে তিনশত চারিশত পাতার বই শেষ করিতেন। কত যে কাব্য রচনা করিয়াছিলেন।

১৬। তিনি তাঁহার দাদার পুস্তকের দোকান হইতে বই পড়িতেন।

১৭। আমরা দৈনন্দিন যে সমস্ত প্রবন্ধ বা কবিতা পড়িতেছি তাহা সবই রবীন্দ্রনাথের রচিত।

১৮। যখন ভারতবর্ষের কতক লোক নিজেদের উচ্চ শ্রেণী বলিয়া জাহির করিত, তখন রবীন্দ্রনাথ তাঁহার অমর কবিতার দ্বারা ইহার পরিণতি সকলকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন।—দেখিতে পাও না তুমি মৃত্যু দূত দাঁড়ায়ে আছে দ্বারে। ইত্যাদি।

১৯। রবীন্দ্রনাথ সার্থকনাম্নী কবি ছিলেন। তিনি একাধারে কবি নাট্যকার প্রবন্ধলেখক ও গায়ক ছিলেন। শেক্সপীয়ার, ভারভি, মাগ, টেনিসোনী প্রভৃতি মহিষীরা এক একটি বিষয়েই দক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন। (সম্ভবত বলবার ইচ্ছা ছিল—প্রভৃতি মনীষীদের প্রত্যেকের বিষয়েই...কিন্তু মনীষীদের নাম ও বানান সব মনে না থাকাতে কিছু অসুবিধা ঘটেছে।)

২০। রবীন্দ্রনাথ প্রথম জীবনে বলিয়াছিলেন "কেন জন্ম হল মম মোর।"

২১। তিনি গীতাঞ্জলি ইংরেজিতে রচনা করিয়া রাইচাঁদ প্রেমচাঁদ উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন।

২২। ১২৮০ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষ গীতাঞ্জলির জন্য তাঁহাকে নোবেল পুরস্কার দেন।

২৩। তিনি লোকন্তরার গুণে দেশকালের বহু উর্দ্ধে উঠিয়া গিয়াছেন।

২৪। রবীন্দ্রনাথ ছেলেবেলা থেকে খেলাধূলায় খুব ভাল ছিলেন।

২৫। একে একে সব ইংরাজি বয় (বই) অধ্যয়ন করিলেন। তাহাতে তাঁহার ইংরাজিতে প্রচুর জ্ঞান হইল। এবং তিনি শান্তিনিকেতনে কিছুদিন থাকিয়া নানা রূপ পদ্য লিখিতে অভ্যাস করিলেন। এবং ইংরাজিতে নবেল লিখিতে শুরু করিলেন। তখন তাঁহার বয়স মাত্র ২২ বৎসর। এই অল্প বয়সে তিনি নবেল লিখিয়া বসিলেন। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে তিনি নবেল লিখিয়া পৃথিবীর মধ্যে অক্ষর যশ অর্জন করিলেন। এবং বহু ভাষা দ্বারা তিনি অভিনব সাহিত্য লিখিতে লাগিলেন। তিনি বহু ভাষাবিদ ছিলেন। বহু ভাষা দ্বারা গান ও গীতকবিতা লিখিয়া অক্ষয় হইয়াছেন।

২৬। দাক্ষিণাত্যের জালিওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের পর তিনি...ইত্যাদি।

এরপর বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গে নানা মত

১। বিদ্যাসাগরকে কলিকাতায় প্রথমে মেশিনারী

স্কুলে ভর্তি করিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

২। তিনি তেলের অভাবে রাস্তায় পোষ্টারের তলায় দাঁড়াইয়া পড়িতেন।

৩। বিদ্যাসাগর কলিকাতা যাইবার পথে বাটনা বাটা পাথরের উপর ইংরেজী অক্ষরগুলি শিখিয়া ফেলিয়াছিলেন।

৪। বিদ্যাসাগর বিধাতা বিবাহের ব্যবস্থা করিলেন।

৫। তাঁহার পরনে পাঞ্জাবী ও পায়ে চুটি জুতা।

৬। বিদ্যাসাগর অত্যন্ত পরশ্রীকাতর ছিলেন।

৭। বিদ্যাসাগর ব্যারিষ্টারি পাস করেন ও শেষে ওকালতি আরম্ভ করেন।

৮। বিদ্যাসাগরের পিতার নাম দ্বারকানাথ ঠাকুর।

বিবেকানন্দ মহশীন সুভাষচন্দ্র

১। বিবেকানন্দের ক্ষুরধার ছিল অসীম।

২। নরেন্দ্র দত্ত বি-এ পাস করিয়া বিলাতে গেলেন। সেখান হইতে ব্যারিষ্টারি পরীক্ষায় পাস করিয়া ফিরিয়া আসিয়া পরমহংস দেবের শিষ্য হইলেন। তখন নাম হইল বিবেকানন্দ।

৩। ঈশ্বর সম্বন্ধে বিবেকানন্দের মনে কৌতুক ক্রমশঃ বাড়িয়া যায়। কি করিবেন, উপযুক্ত লোক না পাওয়ায় তিনি কাহাকেও গুরু বলিয়া স্বীকার করেন না।

৪। বি-এ অধ্যয়নকালে তিনি দাক্ষিণাত্যের একজন সাধু শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের নিকট সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করিলেন।

এবং এই সঙ্গে (১) মহসীন মাধবী ছাত্র ছিলেন। (২) সুভাষচন্দ্র পড়িবার জন্য আমেরিকায় গেলেন। সেখানে শিক্ষকের নিকট বাঙালীর নিন্দা শুনিয়া তিনি তাঁহাকে প্রহার করেন। (৩) কংগ্রেস হইতে বাহির হইয়া তিনি ফরওয়ার্ড বক্স স্থাপন করেন।

এরপর কয়েকটি ব্যাকরণ বিচিত্রা উপহার দিচ্ছি। এর মধ্যে সব চেয়ে আনন্দদায়ক "আছ" ধাতুর রূপ। প্রশ্ন ছিল আছ ধাতুর সাধু ভাষায় ও চলিত ভাষায় প্রথম পুরুষ একবচনে ব্যবহার।

১।	চলিত	সাধু	
	অছতেছে	আছিতেছে	
	এইছে	আসিতেছে	
	আছত	আছিত	
	আছিয়াছিল	আছাছিল	
২।	আছিতম্	আছিতঃ	
	আছ	আছিতঃ	
		আছিম্	
৩।	আছ	আছিলে	আছিলাম
	,,	আছিতাম	আসিলাম
	,,	আছিরণ	আসিয়াছিলাম
	,,	আছিতম্	আছিত
	,,	আছিতঃ	আছিম্
	,,	আছিব	আছিস
	,,	আছিতম্	আছিতেম।

বাংলাভাষার পরীক্ষায় এ রকম উত্তর সম্পূর্ণ মৌলিক এবং তুলনাহীন। অতঃপর ভঙ্গুর, জীর্ণাভিত্তি, মুখর ও কবুল এই শব্দগুলি দ্বারা বাক্য রচনা—

১। অন্যের বিপদ দেখিয়া মুখ ভঙ্গুর করা উচিত নহে।

২। দেশের লোক খাদ্যের অভাবে জীর্ণাভিত্তি অবলম্বন করিতে বাধ্য হইতেছে।

৩। বাঘা যতীন আমাদের বাংলা দেশে অতিশয় মুখর ব্যক্তি ছিলেন।

৪। আমি কবুলের জন্য সুন্দরবন যাইতেছি।

ডুমুরের ফুল, পোয়াবারো—বাক্যগঠন :—

১। লোকটি চোখে ডুমুরের ফুল দেখিল।

২। রামবাবু বিপদে পড়িয়া চোখে ডুমুরের ফুল দেখিলেন।

৩। হরিবাবু লোকটিকে পোয়াবারো দিয়া বিদায় দিল।

অন্যান্য :

১। সর্বদা বকধার্মিকের মত চলিবে। (অর্থাৎ সাধু ভাবে।)

২। কাণ্ডজ্ঞানশূন্য লোকটার শিরে সংক্রান্তি দেখা দিল।

পুনরায় রবীন্দ্রনাথ

১। রবীন্দ্রনাথের পিতা সতেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠাতা।

২। রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তখন বিলাতে অবস্থান করিতেছিলেন।

৩। রবীন্দ্রনাথ বাল্যকালে কিছুদিন ব্রহ্মচারীর বেশে ঘোরেন।

৪। রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে কিছু ছাত্র লইয়া সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করেন।

৫। রবীন্দ্রনাথের যেমন সুন্দর চেহারা তেমনি রং, দেখিলে ভক্তি চলিয়া আসে। তাহা জীবিত অবস্থায় নহে, ছবি দেখিয়া।

৬। তিনি এমন কতকগুলি অনুবাদ করিয়াছেন যাহা পড়িলে মনে হয় তিনি যেন একজন মহামানবের উপরে। সত্যিকার মানুষ তিনি ছিলেন না, তিনি ছিলেন ভগবান।

৭। রবীন্দ্রনাথের পিতামহ মহর্ষি দ্বারকানাথ ঠাকুর।

পোষ্টমাষ্টার গল্পের স্মৃতি

১। বুদ্ধিমান মানুষ ভালবাসিতে জানে কিন্তু শেষ পর্যন্ত সমস্ত নাড়িভুঁড়ি ছিঁড়িয়া ছুটিয়া পলায়ন করে। (মূলে আছে: হায় বুদ্ধিহীন মানব হৃদয়। ভ্রান্তি কিছুতেই ঘোচে না...প্রবল প্রমাণকেও অবিশ্বাস করিয়া মিথ্যা আশাকে দুই বাহুপাশে বাঁধিয়া বুকের ভিতরে প্রাণপণে জড়াইয়া ধরা যায়, অবশেষে একদিন সমস্ত নাড়ি কাটিয়া হৃদয়ের রক্ত শুষিয়া সে পলায়ন করে...।" বুদ্ধিহীন বুদ্ধিমান হয়েছে, সমস্ত নাড়ি কাটিয়া—সমস্ত নাড়িভুঁড়ি ছিঁড়িয়াতে রূপান্তরিত হয়েছে।)

২। দূরে কয়েকখানি নিশাকর বাউলের বাড়ী। সেই নিশাকর বাউলদের সংকীর্তন শোনা যাইত। (মূলে নেশাখোর বাউলের দলের কথা আছে। তারাই নিশাকর হয়েছে।)

৩। সন্ধ্যা আগমনের সঙ্গে সঙ্গে নিশাখোর (এখানে খোর ঠিক হলেও নিশা বজায় আছে) উন্মত্ত বাউলের দলের ঝিল্লিরব ভাসিয়া আসিত। মূলে আছে: ঝোপে ঝোপে ঝিল্লি ডাকিত...। বাউলদের ঝিল্লিরব কথাটি স্মৃতিশক্তির বিশ্বাসঘাতকতা।)

৪। পোষ্টমাষ্টারের মনে হইল কা তব কান্তা কস্তে পিতা। মূলে আছে—"পৃথিবীতে কে কার।"—কিন্তু তা লিখলে এমন অভিনব মোহমুদ্গরটি পোস্টামাষ্টারের মুখে বসানোর কৃতিত্বটি অপ্রকাশিত থেকে যেত সন্দেহ নেই। ক্রমশঃ

এশিয়া '৭২

পরিমলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

দুনিয়ায় যেসব ঘটনা এবং জিনিষের নামই মানুষকে আকর্ষণ করে, 'মেলা' সেই সব প্রধানদের অন্যতম। সুতরাং 'এশিয়া ৭২' মেলা যে লক্ষ লক্ষ মানুষকে কাছে টানবে তাতে আর আশ্চর্য হবার কি আছে। প্রধানতঃ বাণিজ্য মেলা হলেও কেউ যেন না ভাবেন যে সেখানে কেবল কঠিন কঠোর কারবারীর সমাবেশ হচ্ছে। সেখানে যাচ্ছে নারী পুরুষ সব বয়সের, সব শ্রেণীর মানুষ। দেখেছি দৃষ্টি হীনকে মণ্ডপের মধ্য দিয়ে ঘুরতে পরিদর্শকের সঙ্গে।

এবারে এই মেলার উদ্যোক্তা 'এশিয়া এবং মধ্য প্রাচ্য অর্থ-নৈতিক কমিশন' (ECAFE)। এই মেলা বসে প্রতি তিন বৎসর অন্তর। এই পর্যায়ের প্রথম মেলা বসেছিল ব্যাঙ্ককে (১৯৬৬), দ্বিতীয় তেহেরানে (১৯৬৯), এবং তৃতীয় এই ভারতের নতুন দিল্লীতে মথুরা রোডের পাশে প্রগতি ময়দানে। খুলেছে ৩ নভেম্বর ১৯৭২, চলেছে ৪৪ দিন ধরে ১৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত। এই ময়দানেই অতীতে আরও দিশী এবং আন্তর্জাতিক মেলা হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এই 'এশিয়া' ৭২' মেলা আয়তনে এবং আয়োজনে সত্যই অদ্বিতীয়।

১২০ একর জমির উপর বিস্তৃত, ৪০,০০০ হাজার মানুষের এক বছরের ওপরের পরিশ্রমে নির্মিত এই মেলা প্রাঙ্গন এক বিশেষ মর্যাদা লাভ করেছে। কেননা এই ১৯৭২ হচ্ছে আমাদের স্বাধীনতার রজত জয়ন্তী উৎসব। এই পাঁচিশ বছরে আমরা সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যে কতটা এগিয়ে যেতে পেরেছি বা পারিনি তার যেমন মূল্য নিরূপণ প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন কি মূল্য আমরা দিয়েছি স্বাধীনতা অর্জন করতে। যেহেতু শিল্প-প্রগতি ভিন্ন সমাজতন্ত্র লাভ সম্ভব নয়, সেহেতু বিভিন্ন মণ্ডপ সাহায্য করবে আমাদের অগ্রগতির ধারা নির্ণয় করতে। স্বাধীনতা অর্জনের কিছু আভাস দেখতে পাওয়া যাবে 'নেহেরু' মণ্ডপে যেখানে আমাদের পরাধীনতার স্বরূপ, স্বাধীনতার সংগ্রাম রূপায়িত হয়েছে প্রধানতঃ জবাহর লাল নেহেরুর জীবনালেখ্যর মাধ্যমে। এ ছাড়া আছে ভারত '৭২ (India '72) মঞ্চ যেখানে ভারতের ইতিহাস ও সংস্কৃতি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা হয়েছে এক বিশেষ আলো-ধ্বনির মাধ্যমে। এরই একটা প্রকোষ্ঠে সাজানো হয়েছে বিভিন্ন যাদুঘর থেকে আনা দুষ্প্রাপ্য সব দর্শনীয় যার মাধ্যমে ভারতের অতীত ও বর্তমানকে এক সূত্রে গ্রথিত বলে মনে করতে ভুল হবে না।

ভারতের গ্রাম বিচিত্রার মধ্য দিয়ে যেতে যেতে পল্লী জীবনের একটা আভাস পাওয়া যাবে। মাঝে মাঝে সেখানে পরিবেশিত হচ্ছে ভারতীয় লোকসঙ্গীত ও নৃত্য।

স্ব স্ব সংস্কৃতি ফুটিয়ে তুলতে বিদেশীরাও কম যান না। তারা এনেছে নিজ নিজ দেশের সব বাছাই করা সঙ্গিত ও নৃত্যবিদদের। তারা তাদের জাতীয় দিবসও পালন করছে এই মেলা প্রাঙ্গণে। লোক সঙ্গীত ও নৃত্য ত আছেই। এ বিষয়ে দক্ষিণ কোরিয়ার লোক নৃত্য খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

স্থাপত্যের বৈচিত্র্যে, রং বেরংএর সাজে সজ্জিত এই মেলায় যোগ দিয়েছে ভারত বাদে আরও ৪৭টা দেশ। নাম এশিয়া'৭২ হলেও এই যোগদানকারী দেশগুলির মধ্যে বেশীর ভাগই এশিয়ার বহির্ভূত। তাদের মধ্যে ইউরোপ থেকে এসেছে ১৬টী দেশ, আফ্রিকা থেকে আটটী, এবং দক্ষিণ আমেরিকা থেকে তিনটী। এছাড়াও আছে বিদেশী কুড়িটী প্রতিষ্ঠান। যারা আসেনি তাদের মধ্যে প্রধান আমেরিকা, বৃটেন, চীন ও পাকিস্তান—যদিও দুয়ার খোলা ছিল সবার তরেই।

ভারতের রূপ ফুটে উঠেছে ১৯টী রাজ্য, বিভিন্ন সরকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, পল্লী ভারত বিচিত্রা, প্রতিরক্ষা সহ বিভিন্ন মন্ত্রালয়, নেহেরু মণ্ডপ, মুক্তাঙ্গন নাট্যমঞ্চ,এবং আরও অনেক ছোট খাট রূপকের মাধ্যমে। ষ্টেটসম্যান ও হিন্দুস্থান টাইমস পত্রিকার ষ্টলও দেখতে পাওয়া গেছে। সব রং ও রেখায় ফুটে উঠেছে সমন্বয়ের বিচিত্র রূপ।

একদিন ছিল যখন সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি আপন সাম্রাজ্য বিস্তার করে ব্যবসা বাণিজ্য প্রসার করত নিজ দেশকে সমৃদ্ধিশালী করে তুলতে, আজ দিকে দিকে স্বাধীনতার সূর্য উদিত। কিন্তু স্বাধীন হলেই দেশ রাতারাতি সমৃদ্ধিশালী হয়ে ওঠে না। তার জন্য চাই অনেক কিছুর মধ্যে অর্থ, কাঁচা মাল, যন্ত্র, উদ্যোগ, এবং প্রযুক্তি বিদ্যায় পারদর্শী মানুষ। তাই আমাদের মত সমস্ত উন্নতিকামী দেশই আবার ঐ সব উন্নত (সাম্রাজ্য বাদী) দেশ থেকে হাত পেতে নিচ্ছি সহায়তা, এটা রাজনৈতিক পরাধীনতার চাইতেও বেশী মারাত্মক। কেননা এ পথে ওরা দিব্য প্রসার করছে ওদের ব্যবসা বাণিজ্য আর আমরা মার খাচ্ছি শুধু সুদ পরিশোধ করতেই নয়, আন্তর্জাতিক সমাজে আমরা অধমর্ণের পর্যায়ে চিহ্নিত। চীন এবং পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আমাদের আত্মরক্ষার লড়াইএর সময় পরনির্ভরতার করুণ চিত্র বার বার ফুটে উঠেছে। সে অবস্থা থেকে যে আমাদের মুক্তি পেতেই হবে তা ভুললে চলবে না। সে দৃষ্টিকোণ থেকে এই মেলার আয়োজন কতটা ফলপ্রসূ হ'বে তা নির্ভর করছে মেলায় যোগদানকারী দেশ ও প্রতিষ্ঠানগুলির যৌথ প্রয়াসের উপর। সকলেই স্ব স্ব পথে প্রযুক্তি বিদ্যা ও শিল্পে এগিয়ে চলেছে। মেলা প্রাঙ্গণে তারই রূপ রেখা মূল্যায়ন করে চাহিদানুগ প্রচেষ্টার পথ স্থির করতে হবে। 'দিব আর নিব' এই হওয়া উচিত মূল সূত্র। তা না করতে পারলে শুধু যে আমরা উন্নত দেশগুলির সঙ্গে অসম প্রতিযোগিতায় মার খেয়েই মরব তা' নয়, ঋণের বোঝায় চিরদিনই অসীম দরিয়ায় হাবুডুবু খাব। এ পথ নির্দেশ ও নির্ণয়ই হচ্ছে এই মেলার মূল সুর—"এশিয়ার শান্তি ও প্রগতি আর্থিক সংযোগিতার মাধ্যমে।" না করতে পারলে কোটী কোটী টাকা ব্যয়ে নির্মিত এই মেলা চিহ্নিত হয়ে থাকবে এক বিরাট প্রহসন রূপে।

১২০ একর বিস্তৃত এই মেলার দেহ সৌষ্ঠব গড়ে তুলতে স্থপতিরা নবদিগন্ত উন্মোচন করার চেষ্টা করেছেন বলে প্রকাশ। এই আয়তনের মধ্যে ৪০ একর জায়গা জুড়ে গড়া হয়েছে কতকগুলি স্থায়ী আবাস। তার মধ্যে ১০১ ফুট উঁচু 'হল অব নেশনশ' আবাস বৈশিষ্ট্যের দাবী করছে কারিগরি এবং স্থাপত্যের কুশলতায়। এত বড় 'স্পেস ফ্রেম' নাকি পৃথিবীর আর কোথাও নেই। দেয়াল বা থাম হীন এই বাড়ি তৈরি হয়েছে সিমেন্ট কংক্রীটে জমানো ১৬ফুট সমবাহু ত্রিভুজের সাহায্যে। পরিকল্পনা করতে পরিগণকের (Computor) সাহায্য নিতে হয়েছে, সমাধান করতে হয়েছে ৩৫০টি গাণিতিক সমীকরণ। ভিত থেকে ২২ফুট উঁচুতে ইংরেজী L আকারের আছে একটী মিজানিন (Mezzanine)। সব নিয়ে এর আয়তন ১, ২০,০০০ বর্গ ফুট।

স্থায়ীদের মধ্যে আর আছে 'হল অব ইণ্ডাষ্ট্রিজ', মুক্তাঙ্গন নাট্যমঞ্চ হাজার আড়াই লোক সমাবেশের মত, ৪৫০টী আসনযুক্ত সিনেমা থিয়েটার, ৯ হাজার বর্গফুট আয়তন যুক্ত বস্ত্র শিল্পের মণ্ডপ যাকে এই মেলার পণ্যের মূল সুর বলা হচ্ছে, নেহেরু মণ্ডপ, ভারত '৭২ মণ্ডপ এবং পল্লীভারত বিচিত্রা।

বাকী ৮০ একর জায়গা জুড়ে যে অস্থায়ী আস্তানা গড়ে উঠেছে তা সাধারণত বৈচিত্র্যময় ও রুচিসম্মত। ব্যয় সঙ্কোচ করেও কিভাবে অস্থায়ী স্থাপত্য সুন্দর ও মজবুত হতে পারে, তারই পরীক্ষা নিরীক্ষা হয়েছে এই মণ্ডপগুলি তৈরীর সময়। তরুণ ইন্‌জিনিয়াররাও নাকি বেশী সংখ্যার কাজে এসেছে এ ব্যাপারে। এটা খুবই আশা এবং আনন্দের কথা।

বিদেশীদের মধ্যে সোভিয়েত রাশিয়ার মণ্ডপই সর্ববৃহৎ। ঢুকতেই দেখতে পাবেন ওদের চন্দ্রযান লুনোখাদ—১ (Lunokhad-1) এর একটি পূর্ণাবয়ব

নমুনা। চাঁদের দেশ থেকে লুনার-১৬ (Lunar-16) যেসব পাথর কুচি কুড়িয়ে এনেছে, তার নমুনাও আছে দ্রষ্টব্যের মধ্যে। মণ্ডপের ভেতরে রূপায়িত হয়েছে ওদের প্রগতির মান স্তম্ভ (Milestone of Progress)।

জাপানীদের মণ্ডপও কম যায় না। ওদের মূল সুর 'আর্থিক সহযোগিতার মাধ্যমে প্রগতি' (Progress Through Economic Cooperation)। পূর্ব গোলার্ধে ওরা উন্নত দেশগুলির শীর্ষেই। দেখবার অনেক কিছুর মধ্যে আছে পাঁচ হাজার গুণ বিবর্ধন শক্তি সম্পন্ন অনুবীক্ষণ যন্ত্র। আর আছে পৃথিবীর সব চাইতে দ্রুতগতি ট্রেনের একটি ছোটখাট নমুনা, এবং অনেকগুলি ব্যাটারী চালিত খুদে গাড়ি। এগুলি সত্যই আকর্ষক, এবং ছোট বয়সের ছেলেমেয়েরা এতে চড়ে বেশ মজা লুটছে। খবর অনুসারে জাপানী সরকার এসব ভারত সরকারকে উপহার হিসেবে দেওয়ার প্রস্তাব করেছে।

অষ্ট্রেলিয়ার বিকাশ ফুটে উঠেছে এক বিরাট বাঁকা পটের উপরে গভীর ছবির সাহায্যে। অপর বৈশিষ্ট্যের মধ্যে আছে ৪ মিটার চওড়া পদ্মের মত ফোয়ারা। সত্যই সুন্দর।

জার্মানীর প্রযুক্তি বিদ্যায় পারদর্শিতার কথা সবাই জানেন। এবং তারই আকর্ষণেও মণ্ডপে ভীষণ ভিড়! দর্শকরা যে হতাশ হচ্ছেন না তা বলাই বাহুল্য।

হাঙ্গেরী মণ্ডপের মূল সুর—'মিলিত লক্ষ্যের পথে প্রসারিত হস্ত।" মণ্ডপের প্রবেশ পথেই একটি নাতি-দীর্ঘ ছায়াছবির আয়োজন। বিষয় বস্তু শ্রীযুক্তা গান্ধীর হাঙ্গেরী পরিদর্শন, ছোট ছেলেমেয়েদের আঁকা ছবির একটা প্রদর্শনীও মণ্ডপের আর একটি বৈশিষ্ট্য।

উঁচু লম্বা ডিম্বাকৃতি দক্ষিণ কোরিয়ার মণ্ডপ খুব জনপ্রিয়। বিনাশুল্কে ঘন ঘন লোকনৃত্যের আয়োজন মনোজ্ঞ। শিল্পীবৃন্দ ওদের দেশের বাছাই করা সব।

সর্বকনিষ্ঠ বাংলাদেশ অনেক প্রশংসা কুড়িয়েছে ওখানকার বস্ত্র' শিল্প এবং পাটজাত দ্রব্যের বিন্যাস দ্বারা। আরও দ্রষ্টব্য তিনটি মোটর গাড়ী যা' ওদের দেশে গড়া—যদিও যন্ত্রাংশ এসেছে বিদেশ থেকে। সম্প্রতি একটা গাড়ি ওরা উপহার দিয়েছে শ্রীযুক্তা গান্ধীকে।

একটা সময় ছিল যখন বিদেশীরাই আমাদের কাছে বেশী চটকদার হয়ে উঠত। এবারকার মেলায় কিন্তু আমাদের দেশীয় প্রগতি দেখে আপনি খুসীই হবেন।

ন্যাশানেল ডেভেলপমেন্ট করপোরেশন লিঃ এর মণ্ডপে ঢুকতে গেলেই প্রথম দ্রষ্টব্য বিরাট এক বাঁকা দেয়াল পর্দায় চলমান রঙিন ছবি ও ধ্বনি। বিষয়বস্তু সৌরমণ্ডল উৎপত্তির একটা আভাস। ভেতরে বিস্তৃত রয়েছে কত কত ধাতু এবং আমাদের জাতীয় জীবনে এদের প্রয়োজনীয়তা।

ক্ষুদ্রশিল্প জাত দ্রব্যের মণ্ডপে ঢুকলে আপনি অবাক হয়ে দেখবেন এরা কি না করতে পারে। বুঝতে পারবেন দেশের উন্নতির জন্য ভারী শিল্পের সঙ্গে এদের কোনই বিরোধ নেই। বরং বর্তমান ক্রম-বর্দ্ধমান বেকার সমস্যা সমাধান করে এবং চাহিদানুগ ভোগ্য পণ্য তৈরী করে দ্রব্য মূল্যের ভারসাম্য রক্ষা করতে এদের শক্তি কত। অবশ্য সবই নির্ভর করে এ বিষয়ে আমরা সুপরিকল্পনার পথে চলব কি না।

কয়লা পর্ষদ এবং কয়লা নিয়ন্ত্রণ সংস্থা নানান রকম নমুনা এবং চিত্রের সাহায্যে তুলে ধরেছে চোখের সামনে সেই কালো কয়লার কাহিনী। কত ভাবে দেশকে মানুষকে সাহায্য করছে, প্রগতির পথে এগিয়ে দিচ্ছে। দেখতে দেখতে এক সময় আপনি চমকে যাবেন রাজধানী এক্সপ্রেসের এক নমুনা দেখে। বিস্ময় কাটলে চমকে শুনতে পাবেন যে আসানসোলের কাছে এই লাইনের মাত্র ১১ মিঃ (৬০ ফুট) নীচে এক বিরাট ফাঁক সৃষ্টি হয়েছিল চোরাই কয়লা খোদার ফলে। পরিণাম? উপরের মাটি সমেত ধ্বসে পড়তে পারত ঐ ট্রেন। ভাগ্যিস, সময়মত ব্যাপারটা ধরা পড়ায় বিপদ এড়ানো গেছে। মানুষের লোভ সব কিছু ছাড়িয়ে যায়।

ভারতের বস্ত্র (Textiles of India) মণ্ডপে ঢুকতে আপনাকে সাদর অভ্যর্থনা জানাবে রাজসাজে সজ্জিত এক বিরাট হাতির নমুনা। এই শিল্প দুনিয়ার বড়দের

মধ্যে তৃতীয় স্থান অধিকারী এবং ভারতীয় রপ্তানী বাণিজ্যে এর স্থান শীর্ষস্থানীয়দের অন্যতম। এই শিল্পের উৎপত্তি, প্রগতি হাল আমলের ফ্যাশান, এবং ভবিষ্যতের সংকেত দেখতে পাবেন মডেল এবং বড় বড় চার্টের সাহায্যে। দেখতে পাবেন গান্ধীজি ও নেহেরুকে সুতো কাটায় ভঙ্গিতে।

সুরক্ষা ভিন্ন প্রগতি সম্ভব নয়। তার জন্য প্রয়োজন আত্মশক্তির বিকাশ, নিজের পায়ে দাঁড়াতে না পারলে বাইরের জগতে মাথা নীচু করে থাকতে হয়। শক্তিমানের খেয়াল খুসীতে নিজের মান অপমানের পালা বিসর্জন দিতে হয়। গত পঁচিশ বছরে এমনি বেদনাদায়ক পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হয়েছে বেশ কয়েকবার। তাই প্রতিরক্ষা মণ্ডপে আমাদের কঠোর পরিশ্রমে অর্জিত প্রগতি আশার আলো সঞ্চার করে। বিদেশীদের হাত থেকে ছিনিয়ে আনা কয়েকটি আয়ুধ আপনাকে যুদ্ধজয়ের গৌরব অনুভব করিয়ে দেবে নিশ্চয়।

বিভিন্ন রাজ্যগুলি তাদের মণ্ডপ সাজিয়েছে আপন আপন রুচি ও বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তুলতে। এই ব্যঞ্জনার মধ্যে একটা জিনিষ প্রত্যক্ষ ভাবে বিচার্য। যদি বিকাশের পথ কোন সুস্থ পরিকল্পনা মাফিক না চলে তবে তা' হবে একে অপরকে ল্যাং মারার প্রতিযোগিতা। এটা শুধু কোন রাজ্য বা প্রতিষ্ঠানের অকল্যাণ ডেকে আনবে না, সমগ্রভাবে ভারতের অগ্রগতির পথরোধ করে দাঁড়াবে এক উঁচু দেয়াল।

এবারে মণ্ডপগুলিতে পরিসংখ্যানের ভূতের বোঝা তেমন নেই। অনেকেই টেলিভিশনের সাহায্যে ছোট ছোট বাক্য বিন্যাসে নিজ নিজ বক্তব্য রাখতে চেয়েছেন।

গোড়াতেই বলেছি মেলার প্রাঙ্গণ আয়তনে এবং আয়োজনে বিরাট। সুতরাং তার পূর্ণ বিবরণ দিতে গেলে প্রয়োজন হবে একটি প্রমাণ সাইজের—মোটা বই। উপরের উক্তি শুধু মেলার উদ্দেশ্য এবং প্রয়াসের সংকেত দেওয়ার জন্য। তার রেশ টানতে গিয়ে মনে হয় শ্রীযুক্তা গান্ধীর এই মেলা উদ্বোধনী ভাষণের কিছু অংশ বিশেষ উল্লেখ করলে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। "সকল জাতিকেই এগিয়ে আসতে হবে সহযোগিতার পথে। যে এগিয়ে আছে তাকে হাত বাড়িয়ে দিতে হবে পেছনের সারিতে, ধনীকে ধরতে হ'বে গরীবের হাত, বড়কে ছোটর, ইউরোপ আমেরিকা বাসীকে এশিয়া, আফ্রিকা, এবং অষ্ট্রেলিয়ার। কেননা, এই পৃথিবীটা হচ্ছে আমাদের একমাত্র আবাসস্থল। তাকে আমরা লুটের রাজ্য বলে মেনে না নিয়ে যদি শান্তি ও সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যেতে চাই, তবে সহযোগিতা ভিন্ন উপায় নেই"।

হিসাব

(গল্প)

স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য

শেষ পর্যন্ত ছন্দা ধরা পড়ল। তার ফাঁসী হল। একশ একটা নরহত্যার আসামী যে ছন্দাকে পুলিশ কখনও ধরতে পারে নি, সেই দুর্ধর্ষ ডাকাত ধরা পড়ল অতি সহজে। কতবার ঘোষণা হয়েছে, যে কেহ জীবিত বা মৃত অবস্থায় ছন্দাকে ধরে আনতে পারবে একহাজার টাকা পুরস্কার পাবে। একহাজার টা-কা-। একালে একহাজার নয়। ১৯২২ সালের একহাজার। তাতে বিশ বিঘে জমি পাওয়া যেত চব্বিশ পরগণায়, খুলনায়, বরিশালে, নোয়াখালিতে; আর একশত বিঘা পাওয়া যেত চট্টগ্রাম আর পার্বত্য চট্টগ্রামে। এত ভাল একটা পুরস্কারের লোভে ইংরেজ আমলে পাকা গোয়েন্দারা অনুসন্ধানে মেতেছে। কিন্তু ছন্দাকে কেউ ধরতে পারে নি। তবে কি ছন্দা লুকিয়ে ছিল—দেশত্যাগী হয়ে ছিল, —না ফকির সেজে বেড়াচ্ছিল? না! এ সব কিছুই করে নি। নিজের কাজে সে মন রেখেছে। কোথায় অর্থ আছে—তার সন্ধানে ঘুরেছে,—পাটের ব্যাপারী, ধানের ব্যাপারী যে পথ দিয়ে যাবে, ছন্দা তাদের সন্ধান পেলে আর রক্ষা পাবে না।

ছন্দা যদি একহাজার লোকের মাঝে লুকিয়ে থাকে তবু তাকে চিনতে পারা যায়। বাংলা দেশের মানুষ তার বুকের সমান মাত্র উঁচু। তার রঙ ভীষণ কালো। চোখ দুটি গর্তে। সাপের চোখের মত চিক চিক করত। যেদিকে তাকাত—সেদিকের মানুষই তাকে ভয় পেত। বয়স ত্রিশ কি পঁয়ত্রিশ হবে—পঁচিশের যুবকের মত চঞ্চল তার পদক্ষেপে, ক্ষিপ্র তার গতি। পরণে ধুতি-শার্ট—শার্টের পকেটে থাকত তার দুমুখো ছোরা। সে ছোরাতেই তার একশ জন শিকার প্রাণ দিয়েছে।

ছন্দা ওরা দুই ভাই। তার বড় ভাই বন্দে আলী মিয়া একজন ধর্মভীরু সৎচাষী গৃহস্থ। তাদের বাপ মারা গেলে বন্দেআলী আর তার ছোট ভাই ছন্দেআলী ওরফে ছন্দালী বা ছন্দা আট বিঘে করে জমি পেয়েছে। বন্দে আলী কঠিন পরিশ্রমে জমি চাষ করে পাটের টাকায় প্রতি বছরে এক বিঘে করে জমি কিনেছে। আর ছন্দা তার নিজের জমি বিক্রি করে তাড়ি খেয়েছে, আর শহরে যত্রতত্র রাত কাটিয়েছে। জমি বাড়ী সব বিক্রি করে শেষে একেবারে নিঃসম্বল হয়ে গ্রামের বিত্তবান্ সজ্জন গৃহস্থ বাঞ্ছারাম রায়ের কাছে কিছু টাকা ঋণের জন্যে গিয়ে উপস্থিত হল। বাঞ্ছারাম বাবু, সংক্ষেপে গ্রামের লোকের ভাষায় রাম বাবু, চতুর ব্যক্তি। লোকের জমিজমা, গয়নাপত্র বাঁধা রেখে তিনি টাকা ধার দেন। পাকা বাড়ী, অনেক ধানের ক্ষেত, পাটের ক্ষেত আছে তাঁর। তিন স্ত্রী, দশ ছেলে, —বিরাট সংসার। তিনি গ্রামের বাড়ীতে থাকেন অল্প দিন—শহরেও তাঁর বাড়ী আছে বাজারে। তার অর্ধেকটা দোকানীদের কাছে ভাড়া খাটে। পেছনটায় থাকে তাঁর রাক্ষিতা। সেই সুন্দরী যুবতীর নাম নয়নতারা। ঘরের তিন স্ত্রীর চেয়ে নয়নতারার প্রতি আকর্ষণ তাঁর বেশী। নয়নের বয়স অল্প,—রূপের অহংকার বেশী বলে রামবাবু তার উপরও কড়া নজর রাখেন। রামবাবুর সঙ্গে শহরের বেশীর ভাগ উকীলের —পুলিশ সাহেবের, সার্কল অফিসারের চেনা।—বড় উকীল লোচন তালুকদার তাঁর নিজস্ব উকীল। গ্রামের লোকেরাও তাঁর উপদেশে লোচন বাবুর কাছেই মামলা মোকদ্দমার জন্যে যায়।

রামবাবু জিজ্ঞাসা করলেন—মিয়া, তোমার কত টাকা চাই?

ছন্দা না ভেবেই উত্তর করল—দু'শ তা এখন দরকার?

জমিজমা তো সব শেষ করেছ,—টাকা শোধ করবে কি করে?

"আপনার জমিতে কাজ করে শোধ দিব।

জমিতে যদি কাজ করবে, তবে নিজের জমি হারাবে কেন? সে তুমি পারবে না বাপু।

ছন্দা চুপ করে ভাবতে লাগল।

গলা নীচু করে রামবাবু ছন্দার কানের কাছে বলতে লাগলেন—এমন সুন্দর একটা জোয়ান ছেলে—গায়ে হাতীর জোর। টাকা রোজগার করতে পারছো না। চল্ দেখি আমার সাথে শহরে, আজকেই তোকে বুদ্ধি বাৎলে দিচ্ছি—কি করে টাকা আমদানী করতে পারা যায়।

রামবাবু ছন্দাকে নিয়ে শহরে গেলেন। ঠিক সঙ্গে নিয়ে নয়। ছন্দা আগে শহরে পৌঁছে গিয়ে রেল-পুলের নিচে উপদেশ মত অপেক্ষা করতে লাগল। পুলের নিচে যখন রামবাবু পৌঁছেছেন, তখন ছন্দা দস্তুর মত চঞ্চল হয়ে উঠেছে। রামবাবু তাকে দর্শন দিয়ে, পরে কানে মন্ত্র দিয়ে তাঁর বাসার পথে চলে গেলেন। তার ঘণ্টা তিন পরে সন্ধ্যার আঁধার নামতে না নামতেই দুইজন লোক পুলের তলা দিয়ে দেখা দিল। ছন্দা দুজনের সামনে গিয়ে দাঁড়াল, ছোরা বার করল, ঝকঝকে ছোরা। কাঁপতে কাঁপতে দুজনেই পালাতে চাইল ছুটে। ছন্দা তাদের ধাওয়া করে ধরে ফেলল। তারপর কিছু বলার আগেই ছোরা বসিয়ে দিল একজনকে। অন্যজন ভয়ে যা ছিল—একটা টাকার থলে,—পাঁচশ টাকা হবে নিশ্চয়ই, ছন্দার হাতে তুলে দিয়ে জীবন ভিক্ষে চাইল। ছন্দা আশীর্বাদের ভঙ্গি করে টাকাটা তুলে নিল। কিন্তু তাকে রেহাই দিল না। আর এক জনের হত্যাকাণ্ড সে লক্ষ্য করেছে কিনা।

সেই রাত্রেই ছন্দা রামবাবুর বাসায় গিয়ে দেখা করল তাঁর সঙ্গে। বুঝিয়ে দিল সবটা টাকা। রামবাবু খুশী হয়ে তাকে অর্দ্ধেকটা টাকা দিয়ে দিলেন। সবটা টাকাই তোর। তবে এই আদ্ধেকটা আমি রেখে দিচ্ছি, যদি মামলা মোকদ্দমায় পড়ে যাস, তা থেকে খরচ করতে হবে তো? আমি তখন কোথায় টাকা পাব?

ছন্দা এতেই খুশী। আরও খুশী হলো সে রামবাবুর রক্ষিতা নয়নতারার রূপ দেখে। সে বুঝতে পারল কেন রামবাবু ঘরে তিন বউকে ফেলে শহরে এই বাড়ীতে এসে পড়ে থাকেন।

ছন্দা তস্কর, ছন্দা ডাকাত, তার রক্ষক রামবাবু। কি ভয়ানক নির্মম এই ভদ্রবেশী বাবুটি তা কল্পনা করা সম্ভব নয়। ছন্দাকে হাতে পেয়ে সে আরও বেশী হিংস্র হয়ে উঠল,—আরও বেশী তৎপর হয়ে উঠল জমি কেনায়, বাড়ী তৈরি করায়—উকীল, মোক্তার, পুলিশ, সরকারী কর্ম্মচারীদের আদর আপ্যায়নে। নয়নতারা ভাবল তার ভাগ্যেই রামবাবুর এত ঐশ্বর্য বৃদ্ধি হচ্ছে।

কিন্তু ছন্দারও এক নয়নতারা ছিল। তার নাম ময়না। সে-ই লক্ষ্য করল—রামবাবুর বাড়বাড়ন্ত, আর ছন্দার দুর্দশা—একশটা খুন করেছে সে। টাকা পয়সা গয়না জহরৎ তুলে ধরেছে রামবাবুর হাতে। সে ছন্নছাড়া হয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। একটা দিন নিশ্চিন্ত হয়ে সে তার ঘরে ঘুমোতে পারে না। ময়না বিনিদ্র বসে কাটায় আর ভাবে, ছন্দাকে কবে পুলিশ ধরে নিয়ে যায়,—বা অন্য কোন ডাকাত কখন মেরে ফেলে। আর তারই টাকায় রামবাবুর বড় বাড়ী হচ্ছে—নয়নতারার গয়না হচ্ছে। ময়না তাকে বুদ্ধি দিল। তোমার হিসাবের টাকা বুঝে নাও,—আমরা এদেশ থেকে চলে যাব টাকা নিয়ে—বস্‌রা চলে যাব। ধান ক্ষেত কিনব, গরু কিনব, পুকুর কাটব, ঘর বানাব, এই ভয়ংকর ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে সুখে শান্তিতে ঘর করব। আমাদের ছেলেপুলে হবে।

ছন্দা রাত্রে রামবাবুর শহরের বাড়ীতে এক দিন তাঁকে ধরল—বাবু, আপনাকে এক লাখ টাকা দিয়েছি আজ পর্যন্ত। অন্ততঃ হাজার পঞ্চাশ আমাকে দিন,—আমি এদেশ ছেড়ে চলে যাব।'

রামবাবুর ভ্রূকুঞ্চিত করে বললেন—বুঝেছি, তোমাকে

কেউ দুষ্ট বুদ্ধি দিয়েছে। ওসব বুদ্ধি নিও না—যদি ভাল চাও। খেতে পেতে না,—সব ব্যবস্থা করে দিয়েছি। পুলিশ ধরে নিয়ে যেত,—এমন বন্দোবস্ত করে রেখেছি,—তোমাকে কেউ স্পর্শ করবে না।

আর এ ব্যবস্থার দরকার নেই। আমার টাকা দেবেন কি না বলুন।

তোমার কোনো টাকা পাওনা নেই,—গিয়ে ভাল করে হিসাব করে দেখো,—এ পর্যন্ত তোমার জন্যে আমার কত খরচ করতে হয়েছে?

সব হিসাব করেই চেয়েছি। দেবেন কি না বলুন।

রামবাবু ব্যঙ্গ হেসে বললেন—চোখ লাল করো না চন্দা। মনে রেখো তোমার মরণকাঠি জীয়নকাঠি আমার হাতে। আমি ইচ্ছে করলে এক্ষুণি তোমাকে পুলিশের হাতে দিতে পারি,—জানো তুমি ধরা পড়লে ফাঁসি হবে তোমার!

চন্দা জানিয়ে গেল,—হ্যাঁ, জানি ফাঁসি একবারই হবে। কশো খুন করেছি,—আরও একটা করলে দুবার ফাঁসি হবে না।'

এর পর চন্দাকে বহুদিন দেখা গেল না। রামবাবু ভয়ে ভয়ে সাবধানে চলাচল করতে লাগলেন। পাহারা বসালেন নেপালী দারোয়ান বাসার দরজায়। কিন্তু হঠাৎ এক দুপুরে বাজারে তিনি ঘুরছেন ভিড়ের মাঝে নিঃশঙ্ক চিত্তে। কিন্তু কোথা থেকে একটা বাঁক নিয়ে এগিয়ে এল একটা চাষী, সে গ্রাম থেকে এসেছে শহরের বাজারে মোট নিয়ে। একপাশে তার বস্তা দুটো রেখে বাঁকটা হাতে করে দাঁড়াল। রামবাবু তাকে লক্ষ্য করেন নি। লোকটার পাশ দিয়ে আসা মাত্র বাঁকের একটা তীক্ষ্ণ প্রান্ত ঢুকিয়ে দিল রামবাবুর পেটে। বাজারে শত শত লোকের মাঝখানে পড়ে গেলেন রামবাবু। লোকেরা চীৎকার করে পালাল—'চন্দা ডাকাত!'

যতক্ষণ রামবাবুর মৃত্যু না হলো—ততক্ষণ চন্দা বাঁক চেপে ধরে দাঁড়িয়ে ছিল। তারপর যে পালাল তার আর কেউ পাত্তাই পেল না। অনেকে ভাবল চন্দা দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেছে। কিন্তু যেতে পারেনি এক-মাত্র ময়নার আকর্ষণ ছিল বলে। বড় দারোগা সব জানতেন—তিনি পুলিশদের বললেন,—ময়নার বাড়ীর ওপর নজর রাখ, দেখো সে যেন পালাতে না পারে। তোমাদের কাউকে ঘুরে বেড়াতে হবে না। ময়নার ঘরেই চন্দাকে তোমরা ধরতে পাবে।

তারপর চন্দা নানা গাঁয়ে দুবছর ঘুরে বেড়িয়েছে। গ্রামের লোকেরা ভয়ে তার খবর কাউকে বলেনি। কেউ খবর করতে আসতও না। সবাই পুলিশের অকর্মণ্যতার জন্য ধিক্কার দিতে লাগল; কিন্তু পুলিশ তা শুনেও শুনল না। তারা দারোগাবাবুর কথা মত নজর রাখল ময়নার ঘরের উপর। দুবছর নির্বাধ ঘুরে ফিরে সাহস বেড়ে যেতেই চন্দা একদিন ময়নার ঘরে হাজির হল। ময়না তাকে দেখেই চমকে উঠল। লুকিয়ে রাখল তাকে খাটের নিচে। দারোগার জাল পাতা ছিল, ছয়জন বন্দুকধারী তাকে ধরে ফেলল,—কোমরে শিকল বেঁধে, তাকে জেল হাজতে নিয়ে গেল। তারপরেকার ঘটনা খুবই সংক্ষিপ্ত, চন্দার ফাঁসি হল। চন্দার উকীল বলেছিল,—তুই প্রাণ ভিক্ষে কর্। চন্দা করল না—বলল, যার জন্যে প্রাণ বাঁচাতে চেয়েছিলুম,—সে-ই আমাকে ধরিয়ে দিলে।

পঞ্চাশ বছর আগে চন্দার এই সব দুঃসাহসিক ডাকাতির কাহিনী শুনে মায়ের কোলের দুষ্টু ছেলেরা ভয়ে ঘুমিয়ে পড়ত।

কিন্তু চন্দা মরেনি। চন্দা ডাকাতের ফাঁসির পঞ্চাশ বছর পরে তাকে আবার দেখলুম।

গাঁয়ের মেয়ে চন্দা। তাকে যখন প্রথম গাঁয়ে দেখি, সেই চেহারা আজও মনে পড়ে। গায়ে একটা নোংরা ফ্রক্। তাও ছেঁড়া। নাক দিয়ে সর্দি পড়ছে কষ বেয়ে। বিশ্রী দৃশ্য। তার বছর দশেক পরে তাকে আবার দেখলুম কলকাতার শহরতলিতে। তখন কি তাকে চেনা যায়? কি তার নাক, কি মুখ, কি রং, কি ঢঙ। সব মিলিয়ে তাকে যেন পরী বলে মনে হচ্ছিল। সে এখন কলেজে পড়ে। পেট-পিঠ-নাভি খোলা বেশ ধরে। তার মামা

মামী তার রূপগুণের তারিফে পঞ্চমুখ। তাঁরা দু জনেই একটা ভাল পাত্র খুঁজছেন। আমার দেখে মনে হয়েছিল—হ্যাঁ, এখন ভাল পাত্র যোগাড় করা মোটেই কঠিন হবে না।

তার বছর পাঁচেক পরে, আবার ছন্দার সঙ্গে দেখা সেই একই জায়গায়। ছন্দার মামা মামী তাকে অভ্যর্থনা করার জন্যে রাস্তায় ছুটে গেলেন। তার গাড়ীর আওয়াজ পেয়েই। মামাত ভাইবোনগুলিও ছুটে গিয়ে গাড়ীটাকে ঘিরে ফেলল। গাড়ী থেকে দুজন সুবেশ সুবেশিনী তরুণ তরুণী নেবে এল। বুঝতে পারা যাচ্ছিল ছন্দার সৌভাগ্য কত বৃদ্ধি পেয়েছে। তার লাবণ্যচ্ছটা যে ছিটকে পড়ছে তার মুখ থেকে চোখ থেকে শাড়ী থেকে মিনি-কাট ব্লাউজ থেকে। তার সঙ্গের তরুণটি যে তার বর তা বুঝতে কোন কষ্ট হচ্ছিল না। সুন্দর সুপুরুষ চেহারা,—স্বাস্থ্য কঠিন, দৃঢ়। চোখের দৃষ্টিতেও কাঠিন্য আছে। ছন্দার মামার কাছে শুনলুম ছেলেটি বড়, বিজনেস করে। ছন্দার বিয়ে হ'ল ক'বছর হয়েছে,—চার বছর হবে। এরই মধ্যে দুখানা বাড়ী, তিনখানা গাড়ী কিনে ফেলেছে। নাম হৃদয় ব্যানার্জি। আলাপ করে খুশী হলুম, বড় অমায়িক ব্যবহার তার। জিজ্ঞেস করলুম, কিসের বিজনেস করেন? বলল সে আর বলবেন না, ব্যবসার ভারী খারাপ অবস্থা, সারা দিন খেটে,—হাজারটা টাকা উপায় করতে পারি নে। বুঝলুম,—বড় ব্যবসায়ী হৃদয়বাবু। আরও বড় হবার আকাঙ্ক্ষা তার আছে। ছন্দার ব্যবহার বড় মিষ্টি। এত ঐশ্বর্য্য হয়েছে বলে এতটুকু তার অহংকার নেই। আমাকে দুজনেই তাদের বাড়ীতে যাবার জন্যে নিমন্ত্রণ করেছিল।

অর্থকষ্টে ভুগি। তাই জানতে ইচ্ছে হয়, কিসের ব্যবসায়ে ছন্দার বরের এত সমৃদ্ধি। তা সঠিক জানা আর হয়ে উঠে না। কিন্তু জানতে পারলুম কিছুদিন পরে—যেদিন শুনলুম, ছন্দা আর এক ডাকাত। ডাকাত দলের নেত্রী। তাঁর স্বামী হৃদয় ব্যানার্জিই সেই নাম করা ওয়াগন ব্রেকার ব্যানার্জিবাবু। তার সঙ্গে বিয়ে হবার পর ছন্দাই সেই ওয়াগন-ভাঙ্গা দলের নেতৃত্ব নিয়েছে। ডাকাতিতেও হাত পাকিয়েছে। কিন্তু বাদ সাধল তার দলের একজনের নেতৃত্বের সাধ।—সে হচ্ছে তাদের গাড়ীর ড্রাইভার, মিঠু সিং। সে দলের সকলের খবর রাখে। পুরো খবর রাখে ছন্দার,—হৃদয়ের—তাদের আয়ব্যয়ের। সে-ই একদিন তার দল নিয়ে রাতের গভীরে তাদের ঘরে ঢুকল, হিসেব চাইল। ছন্দার ব্যবহার সব সময়েই মধুর। কিন্তু কেন জানিনে, সে সেই দিন হিসাবের কথা শুনে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠল। মিঠু সিংহের হাতে রিভলভার ছিল। গুলি ছুঁড়ল। হৃদয়ের বালিসের নীচে রিভলভার থাকে। তা আনতে যাবার আগেই তাকেও গুলি করল মিঠু সিং। দুজনেই ধরাশায়ী হল।

মিঠুর দল মূল্যবান্ যা বাড়ীতে পেয়েছে, সেসব নিয়ে, গাড়ী তিনটে নিয়ে পালিয়ে গেল। কোথায় গেল তারা জানতেও পারল না কেউ। পরের দিন পত্রিকায় বেরুল,—জোড়া খুন আর ডাকাতির খবর—ভয়ংকর রোমহর্ষক খবর। ডাকাতদলের কেউ ধরা পড়ল না। কেউ ধরা পড়ল না। কেউ জানল না ছন্দা ডাকাত ছিল, হিসাব দিতে পারল না, বা দিতে চাইল না বলেই সে এমন ভাবে মারা গেল।

নূতন ডাকাত-সর্দার মিঠু সিংকেও এরকম হিসাব দিতে হবে। পাপের ধনের হিসাব কোথাও না কোথাও, কোনোদিন-না-কোনোদিন সবাইকেই দিতে হবে।

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ও অর্থনীতি

সংগ্রামসিংহ তালুকদার

আধুনিক জগতে তিন প্রকার অর্থনীতি প্রচলিত। কৃষি-ভিত্তিক; শিল্প-ভিত্তিক ও কৃষি ও শিল্প-ভিত্তিক। যে সকল দেশ কৃষি-ভিত্তিক তারা অনেকেই শিল্প প্রতিষ্ঠার দ্বারা সম্পূর্ণ কৃষি-ভিত্তিক অর্থনীতির ভিতরে না থেকে কৃষি-শিল্প-ভিত্তিক পর্যায়ে আসতে চেষ্টা করছে। এর প্রকৃত কারণ আধুনিক কালে আধুনিকতার উপকরণ সংগ্রহের আকাঙ্ক্ষা প্রায় সকল দেশের জনগণের মধ্যে সংক্রামক আকারে দেখা দিয়েছে। আধুনিক বৈজ্ঞানিক পর্য্যায়ে উন্নত দেশগুলির সঙ্গে মিত্রতা ও অবাধ যাতায়াতের ফলে শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসারতার মাধ্যমে দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয়তার বৃদ্ধি সমভাবেই জাতীয় জীবনে স্থান পেয়েছে। সুতরাং এর গতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধির দিকেই যাবে।

কিন্তু যে সকল বড় বড় দেশ বৃহৎ ও ব্যাপকভাবে কৃষি-ভিত্তিক অর্থনীতির দ্বারা পরিচালিত তারা শিল্প প্রতিষ্ঠা করলেও নিজ নিজ আভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়ে উচ্চমান ও সম-মানের শিল্পসম্ভার প্রস্তুত ক'রে অত্যুন্নত দেশগুলির সঙ্গে মূল্য প্রতিযোগিতায় হেরে যায়। আমাদের ভারত আধুনিক জগতে এই পর্য্যায়ে পড়ে। ভারতের মত আরও অনেক দেশ আছে। যেহেতু এই প্রবন্ধের বিষয়বস্তু আমাদের দেশের "মূল্যবৃদ্ধি ও অর্থনীতি" সেইজন্যে আমি আমাদের দেশের বিষয়ই পর্য্যালোচনা করব।

আমাদের দেশ মূলতঃ কৃষি-ভিত্তিক বা কৃষি-প্রধান বলা চলে। তার কারণ শতাব্দির পর শতাব্দি ধরে কৃষিই আমাদের আপামর-জন-সাধারণের প্রধান উপজীবিকা। তার প্রধান কারণ আমাদের দেশের বেশীর ভাগ সুজলা সুফলা ও অতি অল্প আয়াসে এ দেশে শস্য জন্মায়; জন-সাধারণের প্রায় ৮০ ভাগ কৃষিজীবি। তাদের চিরাচরিত অতি সাধারণ ও আড়ম্বরহীন পরিবারগত জীবনধারণের পদ্ধতি অতি অল্প আয়াস লব্ধ শস্যাদির দ্বারা পরিতৃপ্ত। দ্বিতীয় মহা-সমরের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এইরূপ অবস্থা ছিল বলা চলে।

কিন্তু দ্বিতীয় যুদ্ধের সময় ও যুদ্ধোত্তর কালে যুদ্ধের প্রয়োজনে যেসব শিল্পজাত দ্রব্য স্থায়ী কারখানায় প্রস্তুত করা হ'ত বা সেইসময় ছোট বড় নিত্য নূতন কারখানার পত্তন ক'রে প্রস্তুত করানো হত, তাদের মূল্য এত উচ্চ দেওয়া হত যে দেশে ব্যাপকভাবে বহু ব্যক্তির বা শিল্প-মালিকদের হাতে আশাতীত অর্থ এসে পড়ে। যার ফলে এক একটি কারখানা যুদ্ধের ৪।৫ বৎসরের মধ্যেই আশাতিরিক্ত মুনাফার অধিকারী হ'য়ে পড়ে। কেবল যে-শিল্প মালিকরাই অতিরিক্ত অর্থ পেয়েছে তা না, ঠিকাদার, শ্রমিক, দোকানদার, মুদি, মুদ্দফরাস কেউ বাদ যায় নাই। এই অর্থ আর কিছু নয়। অযাচিত চলতি কাগজের টাকা (currency notes) যা বিদেশী সরকার তাদের এখানকার টাঁক-শালে ছাপিয়ে যদৃচ্ছা ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। যার ফলে টাকার মূল্যমান কমে গিয়ে দেশে জনসাধারণের মধ্যে অবাধ টাকার প্রচলন ও যার অবশ্যম্ভাবী ফল, দুর্নীতি, অসাধুতা, অন্যায়, লোভ, ইত্যাদির দ্বারা সমাজ-জীবন কলুষিত হ'য়েছে।

একটি জাতির জীবনে ২৫।৩০ বৎসর কিছুই নয়। কিন্তু একবার দুর্নীতিগ্রস্ত হলে তার প্রক্ষালন বহু সময় ও কষ্টসাধ্য। আওরংজেব প্রায় ৬০ বৎসর রাজত্ব করে গেছে ও তার রাজত্বের সময়কার ঘটনা প্রবাহ ও সেই সময়কার জাতীয় জীবনের কলুষ এখনও সময় সময় আমরা দেখতে পাই।

দ্বিতীয় যুদ্ধের বিষময় ফল আজ পর্য্যন্ত আমরা ভোগ করছি। তার উপর যুদ্ধের প্রয়োজনে বিদেশী সরকার যে সকল সরকারী দপ্তর খুলেছিলেন বা যুদ্ধের প্রয়োজনে যে সকল কর ধার্য্য করা হয়েছিল সেগুলো প্রায় বেশীর ভাগই জনসাধারণের উপর চেপে বসে আছে। উপরন্তু ভারত সরকারের ভ্রান্তনীতির ফলে (যেমন indirect Tax, control of Food Grains and essential Commodities, উচ্চ হারে কর ধার্য্য Public utility জিনিষের অতিরিক্ত দাম বাড়ানো ইত্যাদি) একদিকে যেমন এক শ্রেণী অতিরিক্ত দরিদ্র হয়ে পড়ছে অন্যদিকে তেমনি অবৈধ অর্থের পর্য্যাপ্ত প্রচলনে দেশের অভ্যন্তরে ভয়ঙ্কর মুদ্রাস্ফীতি আরম্ভ হয়েছে। এর প্রধান ও মুখ্য কারণ হ'চ্ছে সকল প্রকার কৃষিজাত খাদ্য পণ্য ও শিল্পজাত নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উপর অযৌক্তিক বিধি-নিষেধ, অবৈধ নিয়ন্ত্রণ ও অসম বন্টন।

ব্যক্তিগত জাতি-গত ও সমাজগত জীবনে প্রকৃতিগত কতগুলি বিধি অবশ্য পালনীয়। দেহে কোনও অঙ্গে অযথা রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া রোধ করা হ'লে যেমন সারা দেহ অশক্ত ও অবশ হয়ে মৃত্যু আসন্ন হয় তেমনি পরিমিত উৎপাদন থাকা সত্বেও যদি উৎপন্ন পণ্যের অবাধ চলাচলে বাধা সৃষ্টি করা হয়—তবে ধীরে ধীরে অসম বন্টনের জন্য দেশে আভ্যন্তরীণ অর্থ-নীতির বিপর্য্যয় অবধারিত হ'য়ে পড়ে।

আমাদের দেশ প্রায় দু'শত বৎসর ইংরাজ শাসনে ছিল। এই শাসনকালে শাসন দণ্ডের ঘূর্ণয়মান প্রতাপের দ্বারা রাজস্বের অপরিমিত লভ্যাংশ পাবার আশায় যেমন তারা জনসাধারণের স্বার্থ একদিকে উপেক্ষা করেছে, অন্যদিকে কিছু কিছু সত্য কথাও নিজেরা না বলে পারে নাই। যদিও সেও নিজেদের স্বার্থেই। তাদের রাজত্বের শেষ পর্য্যায় ধান ও চাউলের বিষয় যে সমীক্ষা যুক্ত বাংলার উপর করে গেছেন সেগুলো যেমন তাৎপর্য্যপূর্ণ তেমনি তথ্য-ভিত্তিক। (Ref: Report of the Bengal Paddy and Rice Enquiry Committee Vol. I & II Government of Bengal, Department of Agriculture an Industries—Published by Bengal Governmer Press, Alipore. 1940)

প্রথমতঃ কমিটি বাংলা দেশের প্রতিটি জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটকে নির্দ্দেশ দিল যে তোমরা তোমাদের জেলা ভিত্তিক সমীক্ষা চালিয়ে আমাদের জানাও যে, যে ভাবে এতদিন ধান ও চাউলের উৎপাদন তথ্য চালিয়ে যাওয় হচ্ছে সেটা কি সন্তোষজনক?

প্রায় সকলেই একমত হয়ে জানালেন—

"The defects in the Present method of estimating the average outturn of paddy in each district are many" PP-15 Vol II.

The Royal Commission on Agriculture made some Caustic remarks on the method of estimating crops in Bengal describing them as—

"Admittedly mere guesses and not infrequently demonstrably absurd guesses"—PP-14 Vol-II

আর এক জায়গায় বলা হ'য়েছে—

It is also most improbable that any individual can estimate what will be the yield of paddy from examination of growing crop over wide areas. There is a most interesting discussion of the Possibility, of estimating the yield of other crops in this way, in a Paper by F. Yates on the "Application of Sampling Technique to crop Extraction and Forecasting" of which Professor Mahalanobis was good enough to show me a copy a couple of years ago. This gives Particulars of Experiments in England which Showed that persons who might be expected to succeed, failed to recognise the samples approximating to the mean of a number of Samples and failed also when confronted with fields under a crop known to them to give anything like correct estimates or consequently incorrect estimates of the crop. These were men who not only were highly

qualified but were giving their full attention to the task of making their estimate. In Bengal the officers on whom we rely are not often highly qualified as judges of crops and they base their views upon casual impressions gained during their tours" pp 15-16 vol II.

এঁরা নিজেরাই স্বীকার করেছেন যে—Survey of India Land Record-ই মহা গোলমেলে।

"Unfortunately we discovered much to our disappointment that no comprehensive and reliable statistics of the distribution of cultivated land under paddy similar to those relating to the holdings of landed property in some other European countries, existed in this province."

"We are constrained to note that the data on the very important subject still remain pitifully inadequate." pp-2 . Vol-I.

Price Fixation and Control বিষয়ে Report পরিষ্কার বলছে-

"We now come to the problems of administration and control. It is a common place economy that given the conditions of demand, the price for a commodity can be manipulated only if its supply can be appropriately controlled. In this case of a monopoly product the supply is naturally controlled ; in the case of other commodities price can be influenced only by the artificial control of supplies. This implies control over domestic production as well over imports from outside. In the present context it is the latter problem that seem to us to present well-nigh insuperable administrative difficulties. If the prescribed minimum price or the "Table of minima", as the case may be is fixed—as presumably, it must be at a level higher than the market price for paddy that prevailed immediately before the minimum law came into force, there will be tendency for paddy and Rice from the neighbouring provinces to flow into Bengal inorder to take advantage of higher Price Parities obtaining here. Immediate effect of this would be to force the market price below the legal price etc etc. Inorder, however to complete our argument, we shall mearly mention—"*Seriatim*"—

(1) The policy will involve an obligation on the part of Government to buy all the surplus paddy that cannot be markted at the fixed minimum Prices.
(2) It will involve the storage or warehousing of this surplus produce.
(3) This in turn will involve the maintenance of godowns or warehouses, and a trained staff for the work in connection with them
(4) The entire surplus produce will have to the with-held from the market as long as the Price position does not improve.
(5) Adequate funds should be provided for the above items.

Prime facie, a scheme of minimum price or prices for a *staple crop* which is the principal article of diet of millions of people in this country cannot by itself, represent a comprehensive policy ; logically as well as in fact, it involves a sectional view of the problem pp 63-64 Vol I.

"In an annexure to this chapter we include a short historical and analytical note on Japanese Food Control System"—

জাপানের এই "Food Control System" যাকে বলা হয় "Jo-hei-so" System which literally means "Permanent levelling granary system". It consisted in the stabilization of corn prices by Government equipped with granaries at principal marketing points when the Government purchased corn at higher price for the protection of Farmers when it was lower and sold at lower price for the benefit of common people when it was higher, than the average price."

এটা অনেকটা দ্বিতীয় যুদ্ধের পূর্বে অর্থাৎ যখন জাপানে "Jo-hei-so" system হয় তখন আমেরিকার

Agriculture Secretary Mr. H. A. Wallace" Ever-green-granary" এর মত।

এখানে বলা হয়েছে "To the students of economic history of India, the "Jo-hei-so" system has a strange family resemblance to the system of Food regulation in ancient India with which the author of "*Artha Sastra*" has made us familiar." pp-65 vol I.

প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে যে সমীক্ষা তারা করে গেছেন সেগুলো এখনও আমাদের খাদ্য-নীতিতে সমভাবে প্রযোজ্য।

আমাদের দেশের অর্থনীতি কৃষি-ভিত্তিক হওয়ায় খাদ্য শস্যের ফলনের উপর অর্থনীতির তারতম্য হয়। ধান, গম, বাজরা ও অন্যান্য রবি শস্য যে বছর ভাল হয় সে বছর জনসাধারণ স্বচ্ছল হয়। যে বছর ফলনের বিপর্য্যয় হয় সে বছর লোক অভাবগ্রস্ত হয়। ভারতবর্ষ বহু রাজ্যে বিভক্ত। এক রাজ্যের সঙ্গে অন্য রাজ্যের লৌকিক আচার আচরণের কিছু কিছু বিভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও খাদ্যের দিক থেকে প্রায় সকল লোকই ভাত, ডাল, রুটি ইত্যাদি বিভিন্ন রুচিসম্মতভাবে গ্রহণ করে থাকে। এই সব খাদ্য শস্যের উৎপাদন নিরক্ষর জনসাধারণ বা যাকে আমরা চাষী বলি তারাই করে থাকে। যে প্রকার অমানুষিক শ্রম স্বীকার করে তারা শস্য উৎপাদন করে তার মূল্য হিসাবে যা তারা পায় সেটা অকিঞ্চিৎকর বলেই মনে হয়। তবুও তারা উৎপাদন করে। কারণ এক—কৃষি তাদের বংশ পরম্পরাগত বৃত্তি—দুই, সংসার নির্ব্বাহ। চাষীদের একটি বিশেষ মনস্তত্ত্ব আছে—সেটা তাদের প্রতিবারের চাষের পূর্ব্বে উচ্চ ফলনের আশা। তার জন্য তারা অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে আবাদে হাত লাগায়।

আমাদের জনসাধারণের যা কিছু ঐশ্বর্য্য ও সরকারের ব্যয়ভারের প্রায় নব্বুই ভাগ ওই কৃষির উপর নির্ভরশীল। শিল্পও আমাদের ইদানিং কিছু কিছু গড়ে উঠছে সত্য। কিন্তু তার ভিতরেও অনেক শিল্প কৃষিজাত দ্রব্যের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল যেমন বস্ত্র (তুলার উপর) পাটশিল্প (পাটের উপর) চিনি (আখের উপর) চা (চা পাতার উপর) ইত্যাদি। লৌহ, ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্য, যন্ত্রাংশ ও আর যে সকল শিল্প স্বাধীনতার পরে গড়ে উঠেছে তার দ্বারা আমাদের জাতীয় অর্থ-নীতির বিশেষ কিছু সাহায্য এখনও হয় না। Foreign Exchange উপার্জ্জনের জন্য adverse balance করে export করতে হচ্ছে।

স্বাধীনতার পর সরকার প্রথমেই একটি মস্ত ভুল করে বসলেন। কৃষির সর্ব্বাত্মক উন্নতি বিধান না করে পাঁচ শালা পরিকল্পনায় শিল্প সম্প্রসারণের উপর জোর দিলেন। যে কৃষির উপর আভ্যন্তরীণ অর্থনীতি বহুলাংশে নির্ভরশীল সেটা যেমন একদিকে উপেক্ষিত হল; অন্যদিকে সেই উৎপাদিত দ্রব্য মূল্যের বিনিময়ে বৃহৎ শিল্প সকলের যন্ত্রপাতি ক্রয়ের ফলে আভ্যন্তরীণ অর্থনীতির বিপর্য্যয় দেখা দিল। এর প্রমাণ যে Sterling balance-বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ১৯৪৭ খৃঃ রেখে গেল দশ বৎসরের মধ্যে তা প্রায় নিঃশেষিত হল। অথচ যে আশা নিয়ে সরকার বৃহৎ শিল্পের পরিকল্পনা করলেন সে আশা মরিচিকাবৎ হল। না হল শিল্পের প্রসার অর্থাৎ শিল্পের দ্বারা অর্থের অভাবপূরণ, না হল কৃষির উন্নতি। এইরূপ যখন অবস্থা তখন সরকার আমেরিকার শরণাপন্ন হলেন। ১৯৫৭ খৃঃ International Rice and Paddy Enquiry Commission এল। যদিও নাম হল International আসলে কিন্তু এটা একটি American sponsored body—সরকার Mr. Adler নামে একজন American Rice Expert কে খুব উচ্চ বেতন দিয়ে নিযুক্ত করলেন। তাঁরা আমাদের দেশ ঘুরে ঘুরে সব দেখে রায় দিলেন যে আমাদের দেশ deficit Country সুতরাং Control, Rationing, movement restrictions ইত্যাদি যদি না করা হয় তবে ভবিষ্যতে অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হবে। আর তাঁরা আমাদের সাহায্য হিসাবে খাদ্য শস্য সরবরাহ করবেন at deferred payments হোলেও তাহা PL 83 চেপে বসলো আমাদের ঘাড়ে ও যত পচা গম ইত্যাদি কোটি কোটি টাকায় পাচার হল আমাদের দেশে। আমরা

নেহাৎ বোকা তাই এই অহেতুক ব্যয়ভার আমরা বহন করলাম এতদিন।

সরকার ভয় পেয়ে খাদ্য শস্যের উপর কড়া বিধি-নিষেধ আরোপ করলেন ও দর বেঁধে দিলেন। কিন্তু সরকার তাঁর Control rate বেঁধে রাখতে পারলেন না। বৎসরের পর বৎসর এই rate বাড়তে লাগল। কারণ Controlled ও Rationing এর আওতার মধ্যে জনসাধারণের জন্য Government distributed চাল ও গমের পরিমাণ অনেক কম ও নিকৃষ্ট হওয়ায় তাঁরা নিজেদের অভিরুচি অনুযায়ী বেশী দাম দিয়ে চোরা পথে কিনতে আরম্ভ করলেন। Rationing এর বাইরে দাম কম হওয়ায় ও Rationing এর গণ্ডিতে দাম অত্যন্ত বেশী হওয়ায় অবাধ চোরা কারবার গ'ড়ে উঠল। সরকার নানা পদ্ধতির law regulation করতে থাকলেন। কিন্তু যাদের উপর রক্ষার ভার দেওয়া হল তারাই ভক্ষক হয়ে অবাধ অবৈধ পয়সা রোজগারের ব্যবস্থা সমাজের ভিতরে চালু করে দিলেন। সকলেই চোর হয়ে গেল—যে কিনছে সে, যে বিক্রি করছে সেও, যে ধরছে সেও। চারিদিকে ধীরে ধীরে এমন vicious circle গড়ে উঠল যে, যে সরকারই গদিতে বসলেন তাঁদেরই এ অবস্থার কোনও পরিবর্ত্তন করা সম্ভব হল না।

১৯৫২ খৃঃ ধানের দাম ছিল মনপ্রতি ৭৲ টাকা। ১৯৭২ খৃঃ দাম প্রায় ৪৭ টাকা। ১৯৪৭ থেকে ১৯৫৭ খৃঃ পর্য্যন্ত ধানগুলো প্রায় এক ফসলী ও কিছু কিছু দোফসলী ছিল। এখন অনেক জমি তিন ফসলী হয়েছে ও সরকার বহু জমি আবাদের আওতায় এনেছেন। ১৯৫৭খৃঃ এর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আমাদের দেশ থেকে চাউল exported হয়েছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে International Rice and Paddy Enquiry Commission এর Report এর পর থেকে Rice Export চিরতরে বন্ধ হয়ে গেছে।

অসম বন্টনের ফলে ও অবৈধ নিয়ন্ত্রণের অবশ্যম্ভাবী পরিণতির ফলে ধান, চাল, গম, বাজরা ইত্যাদির দাম উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় অন্যান্য সকল প্রকার নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের দামও উত্তরোত্তর বৃদ্ধির দিকে চলেছে। এই বৃদ্ধি বন্ধ করা সরকারের পক্ষে অসম্ভব যদি না খাদ্য শস্যের উপর সকল প্রকার বিধি নিষেধ উঠিয়ে দেওয়া হয়। অবাধ বাণিজ্য (Free Trading) ও one zonal system এর প্রচলন অবশ্য প্রয়োজন। সকল প্রকার Control, Rationing ও সরকারের নিজের কেনবার প্রথা যদি বিলোপ না করা হয় এই অবস্থার কোনই উন্নতি হবে না। Free Trading is an enemy of hoarding and Profiteering. পূর্ব্বে যখন one zonal system ও অবাধ বাণিজ্য ছিল তখন Hoarding হত না—কারণ ধান চাল গম ইত্যাদি ঋতু-ফসল ও Perishable goods ও ধার রাখতে হলে বিরাট জায়গার প্রয়োজন। পরবর্ত্তি ফসল উঠবার পূর্ব্বে বিক্রি করতেই হবে। না করলে সমূহ লোকসান।

চোরা কারবারী ও মুনাফা শিকারীর দোহাই দিয়ে সকল সময় রাজত্ব চলে না। এরা চিরকাল ছিল ও থাকবেই। পয়সা রোজগারের অবাধ সুযোগ পেলে সমাজে এমন কেউ নাই উচ্চ, নীচ যে সে সেই সুযোগ হারাবে। কিন্তু যদি, সরকারের ভ্রান্ত নীতির ফলে এরা সক্রিয় হয় সেখানে সরকারই সম্পূর্ণ দায়ী। যদি বলি ১৯৫২ খৃঃ থেকে ১৯৭২ খৃঃ পর্য্যন্ত সরকারের হাতে যে সকল Public utility দ্রব্য আছে তাদের দাম ১০০ শতাংশ বেড়ে গেছে তার উপযুক্ত জবাব সরকার দিতে পারবেন কি?

১৯৬৬ খৃঃ পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র সেনের অত্যন্ত ভ্রান্ত ও অপরিণামদর্শী নীতির ফলে এই রাজ্যব্যাপী খাদ্য শস্যের ব্যবসায়ের উপর একটি বজ্রাঘাত এসে পড়ে। পশ্চিম বাংলায় প্রায় এক হাজারের উপরে বড় ধান কল ছিল। তা ছাড়া অসংখ্য ছোট ছোট Husking Mill ছিল প্রতি জেলায় জেলায়। বড় Huller Mill গুলো প্রায় ৭০/৮০ বৎসর ধরে ধীরে ধীরে বংশ পরম্পরাগত ব্যবসায় দাঁড়িয়েছিল। এত বৎসরের মধ্যে কখনও ধানের অপ্রতুলতার জন্য এই সব ধান কল

বন্ধ হয় নাই। বাংলায় ধানের অভাব হলে কেরলা থেকে ধান এনে এরা কল চালিয়েছে ও লাভ করেছে। অগ্রহায়ণ থেকে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্য্যন্ত এক একটি ধান কলে প্রতিদিন প্রায় ১০০-১৫০ জন লোক কাজ করত। এদের যন্ত্রাংশ সরবরাহ করত প্রায় ১৫।২০ রকম ancillary Industries যারা হাওড়া ও পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে ছোট খাট কারখানা করে ১০।১২ জন থেকে আরম্ভ করে ৪০।৫০ জন কারিকর নিয়ে কাজ করত। সে সব আজ একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে। চালকল গুলি তাদের মেশিনপত্র সব বিক্রি করে দিয়েছে ও দিচ্ছে। হাজার হাজার লোক বেকার হ'য়েছে ও লক্ষ লক্ষ টাকা নষ্ট হ'য়েছে ও পৃথিবীর মধ্যে Unique Spontineous Industry একেবারে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে একটি লোকের অবিমৃষ্যকারীতার জন্য।

এর পর এল Subhramonium Scheme. Modernisation of Rice Mills by Co-operative Organisation Scheme টি কিন্তু আসলে খুব খারাপ ছিল না। এর আসল প্রতিপাদ্য ছিল যে—যেহেতু Huller system Millএ চাউলের yield ৬০ থেকে ৬৪ শতাংশের বেশী পাওয়া যায় না, broken বেশী হয় ও খুব মিহি bran অপচয় হয় সেই হেতু Sheller system Mill বসালে ৬৭-৬৯ শতাংশ চাল পাওয়া যাবে broken কম হবে ও bran যা পাওয়া যাবে তার দ্বারা edible oil হবে ও residue পশুর খাদ্যে ব্যবহৃত হবে। কিন্তু এই Scheme এর কার্য্যকারিতার সময় এমন কতগুলো ত্রুটি এসে পড়ল যাতে অতিকষ্টে টিকে থাকা চাল কল গুলির উপর দ্বিতীয় বার বজ্রাঘাত হল। (এ বিষয় পরে বিশদ্ আলোচনা করবার ইচ্ছা রইল)

আমার বক্তব্য হচ্ছে ভারতের অর্থনীতি কৃষিভিত্তিক ও এক রাজ্যের সঙ্গে অন্য রাজ্যের এক অদ্ভুত পূর্ণ অর্থনৈতিক বন্ধন বিদ্যমান যার দ্বারা এক রাজ্যের বিপর্য্যয়ে অন্য রাজ্যের অর্থনীতির বিপর্য্যয় হ'তে বাধ্য। এ সত্য আমরা বহু বৎসর থেকে দেখে আসছি। সুতরাং বাংলা দেশের এই যে বিপর্য্যয় সেটা ভারতের অর্থনীতির উপরে নিশ্চয়ই আঘাত হেনেছে। এই ভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে। আসাম, পশ্চিম বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, উত্তর-প্রদেশ ইত্যাদি সব প্রদেশে এমন একটি প্রাদেশিক মনোভাব গড়ে উঠেছে যে তাতে অর্থনীতি অত্যন্ত জটিল আকার ধারণ করেছে। খাদ্য শস্য প্রায় সব প্রদেশেই হয়। পূর্বে নিয়ম ছিল এক প্রদেশে অজন্মা হ'লে অন্য প্রদেশ থেকে সাহায্য করা। এখন মনে হচ্ছে প্রদেশরা এই মহানুভবতা হারিয়েছেন। এঁরা প্রদেশ-ভিত্তিক অর্থনীতির উপরে জোড় দিয়ে তাঁদের উৎপন্ন দ্রব্য তাদের গণ্ডির বাহিরে প্রবেশ নিষেধ করছেন। যার ফলে অর্থনীতির গণ্ডি অত্যন্ত সঙ্কুচিত হ'চ্ছে। এ দিকে ভারত সরকার সর্বদেশ-ভিত্তিক অর্থনীতির উপর নির্ভর করে প্রদেশগুলি থেকে উপযুক্ত সাহায্য না পাওয়ায় দ্বিধাগ্রস্ত নীতি গ্রহণ করতে বাধ্য হচ্ছেন। এবং অর্থনীতিতে এক প্রকার জড়তা পরিলক্ষিত হচ্ছে।

এখনও যদি ভারত সরকার সকল প্রকার খাদ্য পণ্য ও কৃষিজাত দ্রব্যের নিয়ন্ত্রণ নীতির সুষ্ঠু ও উদার পরিকল্পনার ভার নিজ হস্তে গ্রহণ না করেন তবে অদূর ভবিষ্যতে ভারতীয় অর্থনীতির চরম বিপর্য্যয়ের আশঙ্কা আছে। অর্থাৎ প্রদেশগুলির উৎপাদিত সকল দ্রব্যের সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণ সারা ভারত ভিত্তিক করতে হবে। এবং সেটা ভারত সরকার করবেন সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ নীতি অনুসরণ করে।

অনেকের ধারণা যেহেতু আমাদের জনসংখ্যা অপরিমিত বৃদ্ধি পেয়েছে ও Per-Capita System এ দেখা যাচ্ছে যে যা সারা দেশে উৎপন্ন হয় সেটা যথেষ্ট নয় সেই হেতু Control, Rationing ও Restrictions এর প্রয়োজন।

অবিভক্ত ভারতে ১৯৪৬ খৃঃ জনসংখ্যা ছিল প্রায় ৪৬ কোটি। এখন বিভক্ত ভারতে জনসংখ্যা প্রায় ৬৪ কোটি। প্রায় ৫০ শতাংশ বেড়েছে। তখন ছিল এক ফসলী এখন তিন ফসলী জমি। বাংলা Partition এ পাঞ্জাব Partitionএ বাংলা হারিয়েছে তিনটি Surplus

districts বরিশাল, নোয়াখালি ও ময়মনসিংহ; বাকী সব Surplus districts পশ্চিম বাংলার ভাগে পড়েছে। পাঞ্জাব কিছুই হারায় নাই বলতে গেলে। তখন চাউলের দাম ছিল মনপ্রতি ৭৮ টাকা আর এখন কিলো প্রতি ২-৫০-৩৲। সুতরাং জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে এর কোনই সম্পর্ক নাই। Per-Capita System সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক কারণ বিভিন্ন প্রদেশের জনসাধারণ বিভিন্ন রকম মিশ্র খাদ্যে অভ্যস্ত। সুতরাং mixed-eating—Per-Capita Systemকে সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক প্রতিপন্ন করছে।

যখন দেখা যাচ্ছে আমাদের দেশের অর্থনীতি কৃষিজাত পণ্যের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল তখন এই কৃষিজাত পণ্যকে এক Zonal Systemএ এনে সারা দেশে অবাধ চলাচল ও স্বাধীন কেনা বেচায় (Private Sector) ব্যবস্থা করলে এখনও দেশব্যাপী ভীষণ অর্থনৈতিক বিপর্যায় ও মুদ্রাস্ফীতি থেকে দেশকে রক্ষা করা চলে। যে নীতি গত ২৫ বৎসরে কোনও ফল প্রসব করল না, বরঞ্চ অবস্থা আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে সে নীতি ২।০ বৎসরের জন্য পরিবর্তন করলে যদি দেশকে বাঁচানো যায় তবে কেন সেটা করা যাবে না?

শ্রীঅরবিন্দ ঃ জন্ম শতবর্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলী

ভাগবতদাস বরাট

দিবা রাত্রির আবর্ত্তনে মাস ও বৎসর গত হয়। ঘুর্ণাবর্ত্তে ফিরে আসে মাস, তিথি, তারিখ। ক্ষণ,—ক্ষণস্থায়ী। পৃথিবীর জনমানবও ক্ষণজন্মা। পদ্মপত্রে নীরের মতই অবস্থান। তবু তাঁর স্বল্পক্ষণ অবস্থানে যদি কেউ স্বীয় প্রতিভায় বিকশিত হয়ে উঠেন, বা আপন মহিমায় সম্মানীয় হন, তা হলে সেই মানব ক্ষিতি মধ্যে মহামানব হয়ে উঠেন। চিরদিন তিনি সবার মনে বিরাজ করেন। সারা বিশ্বেই তিনি চির স্মরণীয়। তাঁর ক্ষণস্থায়ী জন্মক্ষণও সে ক্ষেত্রে চিরস্থায়ী। দেশপ্রেমিক শ্রীঅরবিন্দও সেইরূপ একজন ক্ষিতিখ্যাত মহাপুরুষ। এই বৎসর তাঁর জন্ম শতবর্ষ পূর্ত্তির কাল। অর্থাৎ প্রায় শতবর্ষ পূর্ব্বে ঠিক এইক্ষণেই তিনি পার্থিব আবেষ্টনীর সংস্পর্শে আসেন। প্রস্ফুটিত কুসুম-কোরকের মত পৃথিবীর জল আলো চাক্ষুষ করেন। উদ্ভিদ-শিশুর মতই স্পর্শ করেন পৃথিবীর মাটি ও বাতাস। মহাপুরুষের মহাআবির্ভাবের ক্ষণটিও তাই খ্যাতক্ষণ। দিকে দিকে স্মরণ সভায় উদ্‌যাপন। প্রয়োজনে ও প্রয়োচনায় শ্রদ্ধাঞ্জলী প্রদান। মনের স্বতস্ফূর্ত্ত আবেগে তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে অর্ঘ্যদান। বিস্মরণে বিলুপ্ত হওয়ার কথা নয়।

শ্রীঅরবিন্দের জীবনের সর্ব্বকালই অনুসরণীয়। তাঁর জীবনের আগাগোড়াই আদর্শ স্থানীয়। এবং তা চরিত্র গঠনের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা সুতরাং তাঁর জীবনী আলোচনার প্রয়োজন আছে। এবং তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধার্ঘ্য প্রদান আপামর সর্ব্ব শ্রেণীর জনঃ মানবের বাঞ্ছনীয়।

আমরা সাংসারিক সাধারণ মানুষ। বহির্মুখী মন। কিন্তু বহিরাগত মানুষজনকে আমরা ভালবাসতে পারি কি? আপন স্বার্থ নিয়েই মশগুল। নিঃস্বার্থভাবে

স্মৃতির শেষ পাতায়

দিলীপকুমার রায়

[ভূমিকা : জীবন সন্ধ্যায় মনে হ'ল—দুজনের কথা আরো একটু লিখলে ভালো হয়—পুনরুক্তি হয় হোক—যদিও পুনরুক্তি বেশি নেই। এ-দুজনের মধ্যে সাধু সুন্দর সিং-এর কথা প্রায় সবই প্রথমোক্তি। সুভাষ সম্বন্ধে অনেক কিছু বলেছি আমার তিনটি বইয়ে : স্মৃতিচারণ দ্বিতীয় পর্বে, ভাবি এক হয় আর—এ কুক্কুমের চরিত্রেও NETAJI THE MAN ইংরাজী স্মৃতিকথায়। তবু মনে হ'ল—বিশেষ ক'রে আজকের দিনে তার মহানুভবতার আর একটু পরিচয় দেওয়া বাঞ্ছনীয় আমাদের জাতীয় আত্মমর্যাদাকে উদ্দীপ্ত করতে—মনে রাখতে যে এমন একজন মহাপ্রাণ কর্মযোগী আমাদের মধ্যে জন্মেছিল—অনেকেই যার মহত্ত্ব মেপে না পেয়ে তার প্রতি অবিচার করেছিলেন। আমার এ- তর্পণে তার দীপ্ত প্রভাব ও গভীর দৃষ্টিভঙ্গি সম্বন্ধে এমন অনেক কথা বলেছি যা আগে বলার মতন ক'রে বলা হয় নি। আরো কিছু বলার আছে—যদিও শেষ ঘন্টা বাজার আগে বলা হ'য়ে উঠবে কিনা বলতে পারি না।

ইতি ৮।৩।৭১ দি, কু, রা॥]

এক

জীবনীর দুটি রূপ আছে : এক, অপরের লেখা জীবনচরিত; দুই, আত্মজীবনী। দুয়ের দৃষ্টিভঙ্গি উল্টো। অপরের লেখা জীবনী বাইরে থেকে দেখে অন্তর্লীন সত্যকে প্রকাশ করতে চায়; আত্মজীবনী আন্তর দৃষ্টিতে যা দেখে বাইরে তার ছক কাটে। প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির যেমন স্বকীয় সুবিধা আছে তেমনি আছে অসুবিধা। বাইরে থেকে দেখি—বর্ণনীয় মানুষটির আচরণ—অর্থাৎ যা চোখে পড়ে। কিন্তু অনেক সময়েই শুধু বহির্দৃষ্ট ঘটনা লোককে দিয়ে মাপা বা ওজন করা যায় না অদৃশ্য অন্তর্লোকের নিহিত সত্য। পক্ষান্তরে, আমার অন্তরের দৃষ্টি আমার কাছে প্রত্যক্ষ হ'লেও তার ভাবরস ঠিক কি ভাবে আমার আচরণে ঝিকিয়ে উঠেছিল তার হদিশ দেওয়াও কম কঠিন নয়। তবু সুলিখিত আত্মজীবনীরই আদর বেশি সব দেশেই, কেননা গভীরের খবর তার মধ্যে দিয়ে যেভাবে ফুটে ওঠে (অবশ্য) লেখক আন্তরিক ও সত্যনিষ্ঠ ব্যাখ্যাতা হ'লে। যেভাবে ফুটে উঠতে পারে না অপরের লেখা জীবনচরিতে। আমি নিজেকে আন্তরিক ও সত্যনিষ্ঠ জিজ্ঞাসু ব'লে মনে করি, তাই আশা করি আমার স্মৃতিচারণ সত্য জিজ্ঞাসুদের কাছে অনাদৃত হবে না। এইটুকু গৌরচন্দ্রিকা গেয়েই পালা গানে নামি। কী ভাবে ফুটিয়ে তুলব আমার জীবনসাধনাকে তার কোনো স্পষ্ট ছক কাটিনি, কাটা হয়ত সম্ভবও নয়। কারণ; লেখার ঝোঁক প্রতিপদেই ঢুঁ মারে নানা অচিন অলি-গলিতে—কেন ও কী ভাবে—আগে থাকতে তার কোনো দিশা মেলে না। তাই লেখনীকে অনুমতি দেওয়াই ভালো তার মর্জিকে মেনে চলতে। দেখা যাক কোথাকার জল কোথায় দাঁড়ায়। কোনো চিত্রী যখন রেখা কাটেন তখন এ ও তা আঁচড়ে কোন্ ছবি কীভাবে ফুটে উঠবে আগে থাকতে জানতে পারেন না—আঁচড় কাটতে কাটতে এক একটা গোটা ছবি ফুটে ওঠে, কোনোটা স্পষ্ট কোনোটা বা আবছা। তবে চিত্রী যদি সত্যিকার শিল্পী হন তবে সাধারণতঃ তাঁর হাতে নানা আবছা ছবিরও ব্যঞ্জনা যুগপৎ চোখ ও মনকে খুশী করে। আমার "স্মৃতিচারণ" দুটি খণ্ডে নানা ছবি অনেককে আনন্দ দিয়েছে এবার তার শেষ পর্বেও আশা করি সে সমান আনন্দ দেবে। সাহেবি ভাষায় একে বলে অপ্‌টিমিস্‌ম্। ভুবনে বহু ঘা খেয়ে, নানা স্বপ্ন-

ভঙ্গের পর আজও আমি অপ্‌টিমিস্ট্‌ আছি, না থাকলে অন্তরে এ-শেষ অধ্যায় সমাপ্ত করবার প্রেরণা পেতাম না। কারা জীবনে—বিশেষ ক'রে হাল আমলে মানুষের দুঃখ কষ্ট দ্বন্দ্ব দোলা দেখ দেখ করতে করতে এতই ফুলে উঠেছে যে, শুধু সে-দুর্দশার ছবি আঁকার বিশেষ কোনো সার্থকতা আছে বলে মনে হয় না। এক চিন্তাশীল ইংরাজ লেখকের একটি উক্তি পড়েছিলাম সুদূর যৌবনে—উক্তিটি আজও আমার মনে গাঁথা আছে: "শুধু বাস্তবকে ফলিয়ে তুলে শিল্প কৃতকৃত্য হয় না, বাস্তব জীবন যে গভীর সত্যকে ঢেকে রাখে তাকে ফোটাতে না পারলে শিল্প সাধনা পণ্ডশ্রম।" দেশের মাঝে যখন শোচনীয় উপাদান দেখি তখন তাকে আঁকতে যাওয়া—অর্থাৎ বাস্তববাদ, realism—অপচেষ্টা নয়, কিন্তু সে-উপাদানকেই সন্দেশা ব'লে ঘোষণা করলে ভুল হবে কেন না প্রকৃতির বিবর্তনে খাতিয়ে মানুষ অন্ধকার থেকে আলোক লোকের দিকেই উধাও হয়েছে, জীবন থেকে মৃত্যুলোকের দিকে নয়। যতই কেন না শোচনীয় মনোবৃত্তিদের নিয়ে হাহাকার করি, যুগে যুগে মানুষ নানা ওঠাপড়া হাসিকান্না ধূপছায়ার মধ্যে দিয়ে উর্ধ্বাভিসারকে বরণ করেই বরেণ্য হ'য়ে উঠেছে—নরখাদক বর্বরতার গুহা থেকে উত্তীর্ণ হয়েছে লক্ষ দীপ-মালিকা শিল্পকাব্যবিজ্ঞান প্রেমলোকের আশ্চর্য রাজ-ধানীতে—চন্দ্রাভিযানের মত অসম্ভবকেও সম্ভব ক'রে এ-মহাসত্যটিকে আমরা আজকের দিনে প্রায়ই ভুলে যাই চোখের সামনে যে-সব বিভীষিকা ঘটছে তার উৎপাতে। তাই স্মরণ করা ভালো যে, জীবনের একটি চিরন্তন সত্য এই যে,

ঝড় তুফানে নিভলে আলো অকূল পাথারে
হিরন্ময়ী ধরবে তারার প্রদীপ আঁধারে।
ডাক শুনে যে অপার বাঁশির
দেয় সাড়া—সে অবিনাশীর
পাবেই অভয়—বাঁধবে তাকে কোন সে মায়া রে?

* * * *

দৈব দুর্বিপাকে, উৎকণ্ঠায় ভরে যে মানুষ ব্যক্তিগত ভাবে অভয় পায় এ একটি ঐতিহাসিক সত্য। থেকে থেকে এক একটি জাতিও পেয়েছে এ অভয় যার ফলে ইতিহাসের মূল ধারাটিও মোড় ফিরেছে। মনে পড়ে—এ-যুগে এ-অভয় দিয়েছিলেন মহাবীর চার্চিল যখন বৎসরাধিক কাল (১৯৪০-১৯৪১) ইংলণ্ড একাই দাঁড়িয়ে-ছিল দুর্ধর্ষ জগজ্জয়ী নাজিদের বিরুদ্ধে। স্পষ্ট মনে আছে সে-সময়ে আমাদের পণ্ডিচেরীর আশ্রমে দুটি দল গ'ড়ে উঠেছিল: একটি দলের যে কী আনন্দ ইংলণ্ড ডুবল ডুবল ডুবল ব'লে। অন্য দলটির পুরোধা তথা দিশারি ছিলেন স্বয়ং শ্রীঅরবিন্দ। তিনি আমাদের নিষেধ করেছিলেন এ-আত্মঘাতী উল্লাসকে বরণ করতে—বলেছিলেন: মিত্রশক্তি যদি হিটলারের দানবিক নাজি চমূর কাছে হার মানে তাহ'লে মানুষের আত্মিক প্রগতির পথে এমন সব বাধা দুস্তর আসবে যার ফলে তার নৈতিক সংস্কৃতি বা অধ্যাত্মবিকাশের আলো জ্বেলে রাখা প্রায় অসাধ্য হয়ে উঠবে। তাই সঙ্গে সঙ্গে বহু লোকের নিন্দা সত্ত্বেও তিনি ঘোষণা করেছিলেন অকুতোভয়েই যে, তাঁর সমস্ত যোগশক্তি নিয়ে তিনি মিত্রশক্তির স্বপক্ষেই দাঁড়াবেন। এ সম্বন্ধে আমাকে তিনি যে-দুটি দীর্ঘ পত্র লিখেছেন তাঁর পত্রাবলীতে ছাপা হয়েছে, তাই উদ্ধৃত করলাম না। প্রবীর চার্চিলের প্রাণকে বাজি রেখে হিটলারের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোকে তিনি সর্বান্তঃকরণ আশীর্বাদ করেছিলেন আরো এই জন্যে যে, চার্চিলের চ্যালেঞ্জের কল্যাণেই বিশ্বযুদ্ধের মোড় ফিরেছিল। সাবিত্রীতে শ্রীঅরবিন্দ লিখলেন: One mighty deed can change the course of things.

আমার নিজের জীবনে অন্তরের প্রতীক কথা অভীপ্সার দিশারি হ'য়ে এসেছিলেন তিনটি মহাজন: শ্রীরামকৃষ্ণদেব, স্বামীজি ও শ্রীঅরবিন্দ।

শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে পাঠ নিয়েছিলাম: "যে আন্তরিক আত্মসমর্পণে মা-কে ভাবে সে পরেই পাবে তাঁর শরণ। একটি গান ওঁর ছিল অতি প্রিয় প্রায়ই গাইতেন ভাব-মুখে: "ডাক দেখি মন ডাকার ম'ত কেমন শ্যামা থাকতে পারে?"

২। স্বামীজীর "বীরবাণী"-র আহ্বানে আমার বালক মন সাড়া দিয়েছিল :

"জাগো বীর, ঘুচায়ে স্বপন, শিয়রে শমন ভয়
কি তোমাকে সাজে?......
পূজা তাঁর সংগ্রাম অপার, সদা পরাজয়, তাহা
না ডরাক তোমা।
চূর্ণ হোক স্বার্থসাধমান, হৃদয় শ্মশান, নাচুক
তাহাতে শ্যামা।"

৩। শ্রীঅরবিন্দ গেয়েছিলেন প্রত্যাসন্ন দিব্য-জীবনের সামগান :

I know that thy creation cannot fail...
I know there shall inform the inconscient cells,
At one with Nature and at height with Heaven,
A Spirit, vast as the containing sky
And swept with ecstasy from invisible fount,
A god come down and greater by the fall.

জানি আমি—সৃষ্টিতব পারে না মানিতে
হার শেষে...

জানি আমি এ-দেহের অচেতন অণু পরমাণু
হ'য়ে থাকিস তুঙ্গ, প্রকৃতির মর্মে অনুস্যূত,
উঠিবে জাগিয়া এক আলোক সম্বিতে—বিশ্বম্বর
অম্বরের ম'ত যে বিশাল—অলক্ষিত গঙ্গোত্রীর
আনন্দের তরঙ্গে বিপ্লুত যেথা দেবতা স্বয়ং
অবতীর্ণ হ'য়ে হবে দেবতার চেয়েও মহান্।

পণ্ডিচেরিতে আমি তাঁর জ্যোতির্ময় কান্তি দেখি সর্বপ্রথম ১৯২৪ সালে। তাঁর সঙ্গে দুদিন কথালাপও হয়েছিল—যার অনুলিপি লিখে রেখেছিলাম—পরে ছাপা হয় আমার "তীর্থঙ্কর" ও "Among the Great"-এ।

কিন্তু সে-অনুলিপি আজ পড়তে গিয়ে দেখি—যে-অভয় তিনি দিয়েছিলেন তার সিকির সিকি অনুরণনও আমার রিপোর্টে পেজে ওঠে নি। কী করে উঠবে? তাঁর মুখে যে-আশ্বাসের ঝঙ্কার শুনেছিলাম সে-ঝঙ্কারের পিছনে ছিল শুধু তাঁর দীপ্ত মুখ, অভী প্রাণ ও ধ্রুব প্রতীতিই তো নয়—ছিল তাঁর আশ্চর্য্য ব্যক্তিরূপ। লেখায় এ-অমেয় আত্মিক বিকাশের কতটুকু বর্ণনা হয়? তবু কিছুটা হ'তে পারে ভেবেই অনুলিপি লিখেছিলাম—আরো "শ্রীম"-র উপদেশ মনে রেখে: "মহাজনদের স্মরণীয় বরণীয় যা কিছু বাণী শুনবে লিখে রাখবে বাবা, কেমন?" এ-উপদেশটির কথা আমি অন্যত্র লিখেছি একাধিকবার। আজও মনে করতে আনন্দ হয় যে, আমাকে "শ্রীম" এ-অনুলিপিকারের পতাকা-বহনের যোগ্য মনে করেছিলেন। কিন্তু কেন করেছিলেন? আমি তখন মাত্র তেরো চোদ্দ বৎসরের বালক—স্কুলে পড়ি, ভগবান্ আছেন কিনা এ নিয়ে অজ্ঞ হ'য়েও বিজ্ঞ ভঙ্গিমায় সাব্যস্ত করি যে, তিনি যখন অবাঞ্ছনীয় সব কিছুকেই বাতিল ক'রে মানুষকে সব-পেয়েছির-দেশে বসিয়ে দিয়ে নিত্যানন্দ পরিবেষণ করতে নারাজ দেখাই যাচ্ছে—তখন তাঁকে অন্ততঃ "দয়াল"উপাধি দেওয়া চলে না। এ-সস্তা অভিযোগ যে ছেলেমানুষি একথা ছেলে-মানুষে কেমন ক'রে জানবে? ক্রমশঃ একটু একটু করে বুঝতে শিখি—"রামকৃষ্ণকথামৃত" পড়েই বলব—যে, ভগবানের কাজ কিছুই বুদ্ধির "কম্প্যুটার" দিতে আঁকড়ে পাওয়া যায় না। শ্রীরামকৃষ্ণদেব প্রায়ই তার্কিকদের টুকতেন: "একসেরী ঘটিতে কি চার সের দুধ ধরে গা? তাঁর লীলা কে বুঝবে? তাই আমি আদবে বুঝতে চেষ্টা করি না, শুধু মাকে বলি: 'আমাকে তোমার পায়ে শ্রদ্ধা ভক্তি বিশ্বাস দাও।' প্রার্থনা করি: 'মা আমার বিচার বুদ্ধিতে বজ্রাঘাত দাও।" এক কথায়, খুঁজতে হবে তর্কযুক্তির মশাল জেলে নয়—শরণার্থী হ'য়ে, চোখের জলে—এমন কি দুষ্কর তপস্যার অভিমানেও মানুষ লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। বহু ঘা খেয়ে শেষে পণ্ডিচেরি গিয়ে শ্রীঅরবিন্দের নির্দেশে একটু একটু ক'রে চোখ ফুটেছিল, তাই দেখতে পেয়েছিলাম (আমারই একটি প্রিয় গান:):

যে চায় তোমার আপন সাধনে ধরিতে চপল
... সাথী,

মুঠি মাঝে জল সম তুমি দাও ফাঁকি তারে
দিন রাতি।
যে চায় বিরহে তোমার চরণে
পূর্ণ শরণ—সে-ই কানে শোনে
তোমার অপার সুরঝঙ্কার প্রেমশিহরণ ভরা।
অকিঞ্চনেরি বল্লভ তুমি, তারে শুধু দাও ধরা।

দুই

অকিঞ্চনমন্ত্র দীক্ষাই যে ভগবৎপ্রাপ্তির একমাত্র পথ এ-সত্যটি হয়ত আমি বিশ্বাস করতে পারতাম না যদি না—

১) রামকৃষ্ণকথামৃত আমার শিশু বুকের তারে বেজে উঠত ;
২) "শ্রীম" ও স্বামী ব্রহ্মানন্দের আশীর্বাদে আমার নবজন্ম হ'ত—তর্ক ছেড়ে জিজ্ঞাসার কোঠায় উত্তীর্ণ হ'য়ে।

নবজন্ম বৈকি—একশোবার। নৈলে কি আমার সংশয়ী মনও এমন আচম্‌কা দুলে উঠত তাঁদের কথায়, চাহনিতে, স্নেহস্পর্শে—আমার বুকের বীণায় বেজে উঠত রামপ্রসাদের একটি অপূর্ব উপলব্ধি : "না জেনে নাম—শুনে কানে, মন গিয়ে তায় লিপ্ত হ'ল।"

এ-দুই মহাপুরুষের কথা আমি অন্যত্র বলেছি একাধিক বার। কিন্তু এঁদের কণ্ঠে আমার আকুল অন্তর কী অভয় বাণী শুনেছিল তার কি কোনো সত্যি খবর আমি রাখি, যখন আদৌ জানি না—সাধুর কৃপাশিস কী ভাবে তারণ করে? শুধু এইটুকু বলতে পারি যে তাঁরা একান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবেই আমার কাছে এসেছিলেন ঠাকুরের প্রেমদূত হ'য়ে। "শ্রীম" আমাকে উস্কে দিয়েছিলেন সাধুদের মহাবাণীর অনুলিপি রাখতে। স্বামী ব্রহ্মানন্দ আমাকে বলেছিলেন—ঠাকুরের কৃপা আমাকে ঘিরে আছে এ তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন তাঁর সমাধিতে।

তারপরে শ্রীমা সারদামণির দর্শন পাই—তিনি আশীর্বাদও করেছিলেন। সে-ও কি অভয় নয়? অতঃপর পড়ি স্বামী বিবেকানন্দের ঘোষণা (ভর্তৃহরির বৈরাগ্যশতকের) যে "বৈরাগ্যম্ এবাভয়ম্"—সংসারে বৈরাগ্য ছাড়া কিছুই আমাদের অভয় দিতে পারে'না।

বৈরাগ্য বলতে অনেক কথাই মনে জাগে। বৈরাগ্যের ভাবানুসঙ্গে নানা ছন্দে মন দুলে উঠত। আমি ছিলাম সুখী বালক, কৃতী ছাত্র ও জনপ্রিয় গায়ক কৈশোর থেকেই। জীবনে আসক্তি ছিল আমার প্রবল। যা কিছু দর্শনীয় দেখে মন দুলে উঠত, শ্রবণীয় শুনে প্রাণ উচিয়ে উঠত, অভাবনীয় চাক্ষুষ ক'রে অন্তর চম্‌কে উঠত—যথা, পিতৃদেব ও তাঁর নানা মনীষী বন্ধুর দীপ্ত ব্যক্তিরূপ, নানা গায়ক গায়িকার গান, সর্বোপরি মহাজনদের আশিস-স্পর্শ। মুখ্যতঃ, কবি, শিল্পী, গায়ক-গায়িকা, ও মহাত্মাদের চুম্বক শক্তি—এই তিনটির আকর্ষণ আমার মন প্রাণকে নিয়ে যেন ছিনিমিনি খেলত। তাই আমি স্বভাবে বৈরাগী ছিলাম না—মানতেই হবে। জীবনের বহুমুখী বিকাশের প্রতি কীর্তিসৌধ তথা আলোক স্তম্ভই আমার মনকে দোলা দিত—উত্তর জীবনে আমি যাদের ছবি এঁকেছি আমার স্মৃতিচারণে তথা উপন্যাসে ও রমন্যাসে। কিন্তু তবু বলব—জীবন যেমন আমাকে টানত তেমনি প্রতিহতও করত। এক দিকে ঝোঁকা, অন্য দিকে ফেরা। এ ও তা চাই—কিন্তু পেয়ে দেখি মন ভরে না, আসে বৈরাগ্য, জাগে প্রশ্ন—এমন কিছু কি আছে জগতে যাতে মন ভরে প্রাণ গান গেয়ে ওঠে অন্তরে নিটোল শান্তি বিছিয়ে যায়? নানা মহানুভব মানুষের সান্নিধ্যে প্রথমে উজ্জ্বলিত হ'য়ে উঠি, কিন্তু তার পরেই কে যেন বলত আমার অন্তর গহনে :

এ-ই কি সত্যি পরম চাওয়া, পরম পাওয়ার দান?
ধন্য কি হয় জীবন পেলে সুখ ভোগ সম্মান?

আমি জীবনাসক্ত, অথচ এই-ই তো বৈরাগ্যের বাজী সুর—"হেথা নয় হেথা নয় আর কোনো খানে।" শ্রীঅরবিন্দের মুখে পরে শুনি—তিনি কখন কালেও বৈরাগ্য মন্ত্রী ছিলেন না, গীতার অনাসক্তি কথাটিই ওর প্রিয়। আমাকে একবার লিখেছিলেন যে, বৈরাগ্যও প্রাপ্তির একটি পথ একথা মার নেই, কিন্তু হলে হবে কি,

বৈরাগ্যের অভিসার হয় কাঁটাবনের মধ্যে দিয়ে, নয় মরুপথে। "এ বড় দুঃখের পথ, কৃচ্ছ্র সাধনের পথ" লিখেছিলেন তিনি, "তাই আমি চাই না তুমি এ-পথের পথিক হও। রবিকরোজ্জ্বল পথেই (sunlit path) চলো না কেন—এ-যুগে বৈরাগ্যের বাণী তেমন জোর পায় না ইত্যাদি।" এ-চিঠিগুলি পরে ছাপা হ'য়ে প্রকাশিত হয়েছে তাই এ-সম্বন্ধে বেশি ব্যাখ্যা করার দরকার দেখি না। শুধু এই কথাটি বলতেই বৈরাগ্যের অবতারণা যে, বৈরাগ্যই আমাকে পেয়ে বসত, বৈরাগ্যকে আমি স্বেচ্ছায় বরণ করি নি। স্বভাবে আমি প্রসন্ন মানুষ, স্বধর্মে রসবাদী তথা সহজপন্থী—তাই বরাবরই দর্শনীয় শ্রবণীয় বরণীয় সব কিছুতেই মনে প্রাণে সাড়া দিয়ে এসেছি—যাদের মধ্যে একটি প্রধান আনন্দনিলয়—বন্ধুপ্রীতি। যেখানে যেতাম বন্ধু জুটত। বাজে বন্ধুও জুটত বৈকি, কিন্তু সর্বত্রই আমাকে ধন্য ক'রে রেখে গেছেন আমার নানা স্মরণীয় ও বরণীয় বন্ধুবান্ধবী। তাই থেকে থেকে "হোমসিক" হ'লেও বিদেশকে আমার কখনো অনাত্মীয় মনে হয় নি, মনে হয়েছে রঙিন—ধূসরে রঙিন। কত জাতের মানুষ আসত কাছে, তাদের সাড়ায় মন উঠত দুলে, আমার সাড়ার প্রতিদানে তারাও কাছে এসে আমাকে দিত বরণমালা। এ কথার কথা নয়। একবার মনে আছে ভূমধ্যসাগরে জাহাজে পিয়ানো বাজিয়ে গাইছিলাম :

"এ কী অগণন জলবালা পাথারে
খেলে হোলি হীরক ফাগে..."

(এ গানটি পরে গাই এক চ্যারিটি কন্সার্টে রাজবন্দীদের সাহায্যার্থে—য়ুনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে—যেখানে সুভাষ পৌরোহিত্য করেছিল, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশও ছিলেন। গান শেষ হ'তে দেখি এক খাস গোরা আমার পিছনে দাঁড়িয়ে। সে একগাল হেসে বলল : "ব্রাভো ফ্রেণ্ড!" ব'লেই করপীড়ন—সে কী স্নেহে! তার সঙ্গে ভাব হ'য়ে গেল একটি মাত্র শুভদৃষ্টিতে গানের কদমতলায়। রবীন্দ্রনাথেরও এ-অভিজ্ঞতা হয়েছিল। একদা তিনি বলেছিলেন আমাকে : "গানের টানে যত সহজে পর আপন হয় এমন আর কিছুতে নয়।" শুধু তাই নয়, আর একটি কথাও তিনি বলেছিলেন তাঁর অপরূপ ভঙ্গিতে : যার সঙ্গে তোমার কোথাও কোনো মিলই নেই—দেখতে পাবে সেও গানের টানে কাছে এসে তোমাকে মিতালির রাখী পরাতে পারে অকুণ্ঠে।" কবিতা বা চিত্রশিল্পে এ-অঘটন কখনই ঘটে না বলি না, কিন্তু গানে যে-ভাবে পদে পদে প্রীতির সাড়ার নাগরদোলায় মেলে সে-ভাবে অন্য কোনো শিল্পে মেলে না—কবি এই কথাটিই বলতে চেয়েছিলেন। অভিজ্ঞতাটি অপ্রতিবাদ্য মনে হবেই হবে তাদের কাছে যারা গানের মালা গেঁথে অপরিচিতকে কাছে টেনে এনেছে—দেশ ভাষা সংস্কার সব ডিঙিয়ে।
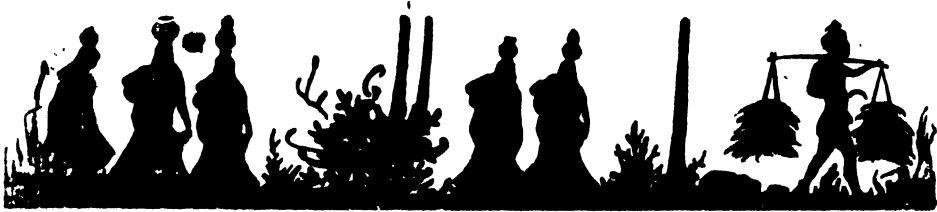
জন্মভূমি

(গল্প)

নন্দলাল পাল

সাতগাঁও ষ্টেশন থেকে সোজা উত্তর দিকে প্রায় এক মাইল—পাথর ছড়ানো চওড়া রাস্তা। লরী-বাস যাতায়াত করতে পারে। তবে এ রাস্তায় বাস চলে না। কেবল অদূরের চা বাগান থেকে চা-বাক্স ভর্তি লরী মাঝে মাঝে ষ্টেশনে আসে এবং মাল খালাস করে আবার চলে যায়। এ রাস্তাটা যেখানে পি ডব্লু ডি-র পাকা রাস্তার সঙ্গে মিশেছে, সেখানে তিনটা কদম গাছ এখনো ঠিক তেমনি ত্রিভুজ রচনা করে আছে। বাইশ বছরে তার কোন পরিবর্তন হয় নি। কেবল একটা গাছ ঝড়ে একটু হেলে পড়েছে। তবে পরিবর্তন হয়েছে পি ডব্লু ডি-র রাস্তাটার। এখন ওটা ঝকঝকে পাথর বাঁধানো। আগে এমনটা ছিল না।

আবছা মনে পড়ে রাখালের। তখন সে খুবই ছোট। বাবার হাত ধরে একবার শ্রীমঙ্গল গিয়েছিল। বর্ষাকাল বৃষ্টি হয়েছে কিছুক্ষণ আগে। রাস্তা গলে একাকার। সেটা ১৯৪২ সাল। রাখালের বয়স তখন আট কি নয়। তার মনে আছে, কোন কোন জায়গায় তার পা হাঁটু পর্যন্ত কাদায় দেবে গিয়েছিল। তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে। সে বছর থেকেই এ রাস্তাটা চওড়ায় অনেক বেড়ে গিয়েছিল। সব কটা পুল ভেঙ্গে বড় করা হয়েছিল। রাস্তার ওপর প্রচুর পাথর ছড়ানো হয়েছিল। সবই যুদ্ধের প্রয়োজনে। তারপর থেকে রাস্তাটা আর বর্ষাকালে গলত না। রাস্তাটা আখাউড়া থেকে শুরু হয়ে রেল লাইনের পাশে পাশে একেবারে সিলেট পর্যন্ত চলে গিয়েছে।

কদম গাছের তলায় এসে থমকে দাঁড়ায় রাখাল। কোনদিকে সে যাবে। দু'টো পথ ধরেই যাওয়া যায়। একটা ত সারা বছরের রাস্তা। কদম গাছ থেকে পশ্চিম দিকে ফার্লং খানেক গেলেই সোজা উত্তর দিকে লোকেলবোর্ডের সড়ক এবং সে সড়ক ধরে মাইল চারেক গেলেই তার বাড়ী।

আর দ্বিতীয় রাস্তাটা? ওটা সড়ক নয়। কদম তলা থেকে পি ডব্লু ডি-র রাস্তা ছেড়ে উত্তর-পশ্চিম দিকে পায়ে হাঁটা রাস্তা। শীতকালে যখন মাঠের ধান কাটা শেষ হয়ে যায়, তখন হাইল হাওরের ঐ কোনাটা কোনাকুনি পার হয়ে গেলে আবার সেই লোকেল বোর্ডের রাস্তা। বৈশাখ মাস পর্যন্ত এই পায়ে হাঁটা রাস্তাটা চালু থাকে।

রাখাল পাকা রাস্তাটা ধরেই পশ্চিমদিকে চলতে থাকে। লোকেল বোর্ডের রাস্তাটা যেখান থেকে শুরু হয়েছে, তার পশ্চিম দিকে বিশাল পাকা বাড়ী ও দীঘি দেখে আশ্চর্য হয় রাখাল। এমনটা ত আগে ছিল না। বাড়ী একটা ছিল বটে, তবে তা কাঁচা কয়েকখানা ঘর এবং সে বাড়ীর যে মালিক তার নাম শুনে গায়ে কাঁটা দিত লোকের। সন্ধ্যার পর বেশ কয়েকজন লোক এক সঙ্গে না হলে বাচ্চু মিঞার বাড়ীর পাশ দিয়ে কেউ যাতায়াত করত না।

মনে কিছু শঙ্কা নিয়েই দ্রুত পায়ে জায়গাটা পার হয়ে গেল রাখাল। কিন্তু না, তেমন কিছু ঘটল না। একেবারে নীল দীঘির পাড়ে এসে থামল সে।

নীল দীঘি বিশাল। কবে কে এই দীঘি কাটিয়ে ছিলেন, কেউ তা সঠিক জানে না। লোকের মুখে মুখে নানা কিংবদন্তী ঘুরে। নীলদীঘির পাড় খুব উঁচু। একদিকের পাড় ভেঙ্গে তা আলসিয়া নদীর সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। সবচেয়ে বেশী প্রচলিত যে কিংবদন্তী তা হল এই ভাঙ্গা পাড় ও আলসিয়া নদীকে ঘিরে। প্রায় তিন শ বছর আগে রাজা খেতাবধারী এক জমিদার এ

দীঘি কাটিয়েছিলেন। দীঘির মধ্যে নাকি প্রচুর দৈব সম্পত্তি—কলস ভর্তি মোহর ও সিন্দুক ভর্তি টাকা ছিল। প্রয়োজনের সময় রাজা নাকি দীঘির ঘাটে পূজো দিতেন এবং সে রাত্রে এক কলস করে মোহর রাজার দেবমন্দিরে চলে আসত। জমিদারদের শেষ বংশধর নরোত্তম চৌধুরী যেমন ছিলেন অত্যাচারী তেমনি ছিলেন দুশ্চরিত্র ও লম্পট। একবার এক অবাধ্য বাঈজীকে খুন করে নীল দীঘির জলে বস্তাবন্দী করে ফেলে দিয়েছিলেন। সেদিন রাত্রেই নাকি সে সব ধনদৌলত দীঘির পাড় ভেঙে আলসিয়া নদী দিয়ে হাইল হাওরের চণ্ডীবিলে চলে গিয়েছিল। পরদিনই নরোত্তম চৌধুরী রক্ত বমি করে মারা যান। নরোত্তম চৌধুরী নিঃসন্তান ছিলেন। সুতরাং তাঁর মৃত্যুতে জমিদার বংশের বিলুপ্তি ঘটে। নীলদীঘির জলে কোন দিন শ্যাওলা জমত না। তিনশ বছরের দিঘি, কিন্তু তার নীল জল সব সময় টল টল করত এবং এর থেকেই দীঘির নাম হয়েছিল নীল দীঘি।

গোপেন্দ্র গঞ্জের বিরাট সাইন বোর্ড'টা চোখে পড়ে। কাঠের ক্রেম আর টিনের বোর্ড'টা শুধু পড়ে আছে। লেখাটা এখন আর বুঝাই যায় না। সাইন বোর্ডের পাশেই একটা দোকান ছিল। চা-বিস্কুট থেকে শুরু করে তেল মশলা পর্যন্ত সব জিনিষ পাওয়া যেত ওই দোকানে। কিন্তু এখন আর সে দোকান নেই। এদিক ওদিক তাকায় রাখাল, কিন্তু কাউকে চোখে পড়ে না।

আলসিয়া নদী বাঁক ঘুরে গোপেন্দ্রগঞ্জের পাশ দিয়ে পূর্বদিকে গিয়েছে। নদীর উপরে পাকা পুল। নদী পার হয়ে উত্তর দিকে চলতে থাকে রাখাল। ডানদিকে হাইল হাওর, বাম দিকে সাতগাঁও পাহাড়ের পাদদেশে চা বাগান। মাঝে মাছে লোকালয়।

জয়ন্তী নদীর তীরে এসে খুশী হয় রাখাল। আগে নদীর ওপর বাঁশের সাঁকো ছিল—এখন পাকা পুল। নদী পার হলেই তার গ্রাম। জননী জন্মভূমি।

জয়ন্তী নদীর পাড়েই মুসল পাড়া। ওই পাড়ার ছেলে গফুর আলী তার সঙ্গে পাঠশালায় পড়ত। রাখাল জানে না এখন গফুর কী করে। কয়েক পা এগিয়ে যেতেই ডানদিকে সরকারী হাসপাতাল এবং বাঁ দিকে পোষ্ট অফিস। কিন্তু সবই কেমন যেন শ্রীহীন। হাসপাতালের কম্পাউণ্ডে বেড়া নেই। গরু-ছাগল অবাধে চরে বেড়াচ্ছে। সংস্কারের অভাবে হাসপাতাল ভবনের দেওয়ালে এখানে ওখানে সিমেন্ট উঠে গেছে। পোষ্ট অফিসের অবস্থাও একই রূপ। পোষ্ট অফিসের পাশে কুণ্ডুদের প্রকাণ্ড বাড়ী ছিল। সে বাড়ীর চিহ্ন নেই। কেবল পাকা দেবমন্দিরটি পড়ে আছে।

কৈশোরে যে চোখ দিয়ে রাখাল জননী জন্মভূমির আশ্চর্য রূপ অবলোকন করেছিল, আজ বাইশ বছর পরে সে রূপের কিছুই যেন সে খুঁজে পায় না। তবে কি প্রৌঢ়ত্বের কিনারে এসে চোখ দু'টোই তার পাল্টে গেছে, অথবা চোখ পাল্টায়নি, পাল্টিয়েছে পরিবেশ।

হরিহর তলার সেই স্থবির অশ্বত্থ গাছটি এখনও আছে। প্রতিবছর পৌষ সংক্রান্তিতে এই হরিহর তলায় মেলা বসত। বাবার হাত ধরে ঘুরে ঘুরে মেলা দেখত রাখাল, খেলার পুতুল আর তালপাতার ভেঁপু কিনত। সারাদিন লোক কীর্তন করত হরিহর তলায়। কয়েক সপ্তাহ আগেই গ্রামের লোক কাজে লেগে যেত। হরিহর গাছের চারদিকে অনেকদূর পর্যন্ত ঘাস ও গুল্ম কেটে পরিষ্কার করত। গাছের গোড়ায় প্রকাণ্ড পাকা বেদী ছিল। সে বেদীকে ঘষে মুছে পরিষ্কার করা হত। বেদীর সামনে ত্রিপল টাঙিয়ে কীর্তনের আসর বসত। কীর্তনিয়া দলের প্রধান ছিল সারদা রায়। সারদা রায়ের ছোট একটা মিষ্টির দোকান ছিল। তার ছেলে-মেয়ে-বৌ কেউ ছিল না। সারদা রায় তার দোকান থেকে ছোট ছোট লিলি বিস্কুট আনায় চল্লিশ খানা করে কিনে খেত রাখাল। সারদা রায় গান লিখত, ছড়া লিখত। কোথাও কীর্তন গানের বই নিয়ে উপস্থিত হত। তারপর সুর ধরে 'অক্রুরের রথ' পালার গান ধরত—

'ভোরে উঠে কেঁদে কেঁদে

রাধা বিনোদিনী,
সখিগণ কাছে ক'ন
স্বপ্নের কাহিনী।'

হরিহর তলায় কীর্তন এবং মেলা চলত এক সপ্তাহ ধরে। এই সাতদিনে হরিনামের বন্যা ছড়িয়ে পড়ত চারদিকে। উৎসব শেষে কেমন যেন নিথরতা নেমে আসত গ্রামগুলিতে। আবার এক বছর পরের এ দিনটির জন্য তারা অধীর আগ্রহে দিন গুনত।

হরিহর গাছের নীচে দাঁড়িয়ে এইটা ব্যথা অনুভব করে রাখাল। মনটা তার টন টন করে ওঠে। নিবিড় ঝোপ জঙ্গলের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে হরিহর গাছ। মনে হয়, দীর্ঘদিন মেলা বা কীর্তনের আসর বসেনি।

হরিহর তলা থেকে লোকেল বোর্ডের রাস্তাটা পশ্চিমদিকে বাঁক ঘুরেছে এবং তার গা থেকে একটা পায়ে হাঁটা রাস্তা আম বাগানের ভেতর দিয়ে অনেক দূর চলে গেছে। আমগাছের ডাল ও পাতা পায়ে হাঁটা রাস্তাটার ওপরে একটা ছাদ তৈরী করেছে। গরমের দিনে সে রাস্তাটায় চলতে ভারী আরাম। রাস্তাটা পায়ে হাঁটা হলেও এর গুরুত্ব অনেক। এ রাস্তা দিয়েই গোটা ভীমশী গ্রামের লোক জীবন গঞ্জের হাটে আসে এবং এ রাস্তা দিয়েই আবার লোকেল বোর্ডের সড়কে যাওয়া যায়। শীতকালে যখন আমগাছে মুকুল ধরে তখন তার গন্ধে এ দিকের বাতাস ভারী হয়ে ওঠে। আবার বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে আম পাকলে পাখিদের কিচিরমিচিরে কানে তালা লাগে। আমের লোভে অদূরের সাতগাঁও পাহাড় থেকে হনুমানও দু'একটা এসে জুটে। ঝিঁ ঝিঁ পোকা সুর ধরে।

ফাল্গুন মাস। রাখাল আম্রবীথির ভেতর দিয়ে অগ্রসর হয়। এখানকার এঁটেল মাটি, তার সোঁদা গন্ধ, আমবাগানের জমাট বাঁধা ছায়া, ঝিঁ ঝিঁ পোকার শব্দ, আম্রমুকুলের মন-কেমন করা সৌরভ তাকে সাদর আহ্বান জানায়। এমনি কত ফাল্গুনের দুপুরে রাখাল কচি আমের জন্য কখনও একা একা, কখনও সঙ্গীদের নিয়ে ঘুরে বেরিয়েছে আমবাগানে, কৈশোরের রঙীন স্বপ্নে ভরা সে দিনগুলো কোথায় যেন হারিয়ে গেল। হাত বাড়ালে তাদের ধরা যায় না। কিন্তু কোনও ছুটির দিনে উদাস দুপুরে জানালায় বসে আকাশের দিকে তাকালে দূরে আকাশের গায়ে যেন অস্পষ্ট তুলির টানে আঁকা সে সব ছবি এখনও দেখতে পায় রাখাল।

রাখাল ভাবতে চেষ্টা করে এই ত সেই রাস্তা যে রাস্তা দিয়ে তার পূর্বপুরুষের শোভাযাত্রা চলে গিয়েছে। তার মা-ঠাকুরমা একদিন এই রাস্তা দিয়েই ঘোমটা মাথায় পাল্কী চড়ে শ্বশুরবাড়ীর অন্দরে প্রবেশ করেছিলেন। তারপর এই রাস্তা বেয়েই একদিন আম্র বাগানের কোণে শেষ আশ্রয় নিয়েছিলেন। আবার এই পথ দিয়েই একদিন রাত্রির শেষ প্রহরে রাখালেরা পূর্বপুরুষের ভিটেমাটি ছেড়ে রহিম চাচার পরামর্শে অজানার উদ্দেশে পা বাড়িয়েছিল।

১৯৫০ সাল। সেদিন শনিবার। সন্ধ্যার পর রহিমচাচা এসে বৈঠকখানা ঘরে বাবার সঙ্গে একান্তে ফিস ফিস করে কী যেন আলাপ করেছিলেন। রহিম চাচা চলে যাওয়ার পর গম্ভীর মুখে বাবা বলেছিলেন, 'তোমরা তৈরী হও। দেশের অবস্থা ভাল নয়। হবিগঞ্জে দাঙ্গা হয়েছে। আমাদের এদিকেও হতে পারে। রহিম ভাই তাই বলে গেলেন।'

এই পথ দিয়ে চলতে চলতেই রাখাল আমবাগানের এক কোণের একটি স্মৃতি মন্দিরের দিকে চেয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছিল,—'তুমি রইলে মা সীমান্তের এপারে আর আমরা ওপারে চললাম।' শেষ রাত্রির হিমেল হাওয়ায় আমগাছগুলিও যেন রাখালের সঙ্গে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছিল।

আমবাগানের কোণায় এসে দাঁড়ায় রাখাল। পাশাপাশি দুটো স্মৃতি মন্দির। মা অনেক আগেই স্থান নিয়েছিলেন, অনেক পরে সীমান্তের ওপারে রাখালদের রেখে বাবা আবার চলে গিয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'তোমরা এখানে থাক। যার জন্য সারা জীবন এত রাজনৈতিক নির্যাতন ভোগ করলাম, সেই জন্মভূমিতে আমি ফিরে যাব।' বাবা তাঁর জন্মভূমিতেই এখানে আশ্রয় নিয়েছেন।

স্মৃতি মন্দিরের সিঁড়িতে বসে পড়ে রাখাল। চোখের জলে বাইশ বছর আগের জীবনকে যেন ঝাপসা দেখতে পায়।

আম বাগানের ওপারে কখন সূর্য অস্ত গিয়েছে টের পায়নি রাখাল। একটা ঠাণ্ডা হাতের স্পর্শ পিঠে অনুভব করে চমকে ওঠে সে। আবক্ষ লম্বিত শুভ্র শ্মশ্রু মুখে কে এক বৃদ্ধ তার দিকে তাকিয়ে আছেন। তুলোর মত শাদা ভ্রূর নীচে দু'টো ঘোলাটে চোখ যেন জ্বলছে। বৃদ্ধ বলেন, 'কে? রাখাল?'

ভাল করে তাকিয়ে রাখাল বলে, 'হ্যাঁ, রহিম চাচা।'

রহিম চাচা বলেন, 'তোমরা চলে যাওয়ার পর দেশের অনেক পরিবর্তন হ'ল, রাখাল। অনেক ঘটনার ভেতর দিয়ে আজ বাংলা দেশ স্বাধীন হয়েছে। আমি যে তোমার বাবার দেওয়া বোঝা আর বইতে পারছি না। মাঝে মাঝে ভয় হত যদি কোন দিন মরে যাই, তবে বেহেস্তে তোমার বাবার কাছে কী জবাবদিহি করব। হা খোদা, তুমি আমার কথা শুনেছ।'

রহিম চাচা বলে চলেন। 'তোমার বাবা মারা যাওয়ার পর সংস্কারের অভাবে ঘর বাড়ী সব নষ্ট হয়ে গেছে। তবে তোমাদের সব স্থাবর সম্পত্তি আমার হেপাজতে আছে।'

নির্বাক বিস্ময়ে অশীতিপর বৃদ্ধের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে রাখাল।

বাড়ীটার চিহ্ন মাত্রও নেই। অথচ এখানেই পঁচিশ বিঘা জমি নিয়ে প্রকাণ্ড বাড়ীটা ছিল। ঘর ছিল অনেকগুলি—কিছু কাঁচা, তবে বেশীর ভাগই পাকা। বাড়ীতে অন্দরমহল ছিল, বাইরে বৈঠকখানা ছিল। বৈঠকখানার পরেই ছিল চণ্ডীমণ্ডপ। দোল-দুর্গোৎসবে চণ্ডীমণ্ডপ মুখরিত হয়ে উঠত। অদূরে শান বাঁধানো পুকুর ছিল। আজ আর কোন কিছুই নেই। শুধু—পুকুরটাই আছে। তার ঘাট ভেঙে ভেঙে প্রায় চণ্ডীমণ্ডপের কিনারা পর্যন্ত এসে গেছে। কে বা কারা কড়ি-বরগা, ইঁট-পাথর, টিন সব খুলে নিয়েছে। কেবল অনেকগুলো ভিটে অযত্নে ও অনাদরে ঘাস ও গুল্মে ভরে আছে।

রাখাল খুব সন্তর্পণে কী যেন খুঁজে বেড়ায়, কী যেন সে হারিয়েছে। একটা জায়গায় এসে বসে পড়ে রাখাল। চুপ করে থাকে অনেকক্ষণ। হ্যাঁ, সে চিনতে পেরেছে। এরই আকর্ষণে দীর্ঘ বাইশ বছর পরে প্রথম সুযোগেই ছুটে এসেছে সে। রাখাল কেমন যেন আচ্ছন্ন ও মোহগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এক নবজাত শিশুর ক্রন্দন ধ্বনি যেন সে শুনতে পায়। এই ক্রন্দন ধ্বনি আটত্রিশ বছর আগে এমনি এক ফাল্গুনের দুপুরে তার পিতৃপিতামহ থেকে এখানেই এক প্রকোষ্ঠে তার মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল।

কান পেতে বসে থাকে রাখাল।

নায়েগ্রা জলপ্রপাত

গৌরমোহন দাস দে

লণ্ডন থেকে আমেরিকার পিটস্‌বার্গে সহরে পৌঁছেই কয়েকদিন বিশ্রাম নেবার পর আমরা সস্ত্রীক মেয়ে-জামাইএর সঙ্গে নায়েগ্রা জলপ্রপাত দেখতে বেরিয়ে পড়ি। কাছাকাছি দ্রষ্টব্য স্থান গুলো না দেখলে গোটা আমেরিকা দেখতে দেরী তো হবেই আর তাছাড়া ভয় ও আছে যে আমাদের প্রচণ্ড শীতের মুখে পড়তে হবে। নীলরতন মেডিকেল কলেজের সার্জ্জেন ডাঃ ধ্রুব সেনের ছোট ভাই ডাঃ অমিয় সেন কানাডার টোরান্টো সহরে সপরিবারে বাস করেন। আমার মেয়ে জামাই এর সঙ্গে তাঁদের খুব ভাব তাঁর স্ত্রীকে ফোন করে জানালাম যে আমরা তাঁদের বাড়ীতে দিন দুই থাকবো। প্রাতরাশ সেরে সঙ্গে কিছু খাদ্যদ্রব্য ও পানীয় নিয়ে দুর্গানাম স্মরণ করে আমরা নায়েগ্রার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ি। নায়েগ্রা আমাদের বাড়ী থেকে প্রায় আড়াইশো মাইল দূর হবে। রাস্তাগুলো প্রশস্ত ও সব সময় মনে হয় যেন গতকাল তৈরী হয়েছে। এগুলি দেখে আমাদের খুবই অবাক লাগে। নায়েগ্রা থেকে ডাঃ সেনের বাড়ী পৌঁছাতে আরও একশ মাইল গাড়ী চালাতে হবে। তাই নায়েগ্রা দেখে তাঁর বাড়ী পৌঁছাতে আমাদের ডিনারের নির্দ্দিষ্ট সময় উৎরে যাবে। সেজন্যে আমরা ওখানে আর ডিনার খাবো না বলে জানিয়ে দিয়েছিলাম। আমার প্রফেসর জামাই-ই গাড়ীর চালক। আমরা পিটস্‌বার্গ ছাড়িয়ে ৭৯ নম্বর হাইওয়ে না ধরে ভুল করে ৭৬ নম্বর হাইওয়ে ধরেছিলাম বলে আমরা ৫০ মাইল রাস্তা বৃথাই ছুটলাম। একটি হাইওয়ের ওপর ভুল করে উঠে আবার গাড়ীকে পেছনে ঘোরাতে হলে আমাদের এইসব রাস্তার মত ঘোরানো যায় না। কারণ প্রত্যেক হাইওয়েগুলি ওয়ান ওয়ে, পেছনে ফিরতে হলে এক্সিজিটের (Exit) মধ্যে ঢুকতে হবে। কোন কোন একজিট (বাহিরে যাইবার পথ) চার মাইলে, কোন কোন একজিট ১৬ মাইলে। কোন কোন একজিট ৩২ মাইলে অবস্থিত।

আমরা আবার ৭৯ নম্বর হাইওয়ে ধরে এগিয়ে চল্লাম। তখন জুলাই মাস, রাস্তার দুধারের বনানীর সবুজ বৃক্ষরাজি, ও দূরে পর্ব্বতমালার বিচিত্র সৌন্দর্য্যের দৃশ্য আর প্রভাতের শীতল বাতাসে আমাদের মন আনন্দে ভরপুর হয়ে উঠলো। কিছুটা এগিয়ে যাবার পরই দেখতে পেলাম আমেরিকার সুদূর প্রসারিত সবুজ ভুট্টাক্ষেতগুলি দূর আকাশের কোলে গিয়ে মিশেছে। এই ভুট্টার তৈরী খাবার এদের প্রিয় খাদ্য। এই ভুট্টা থেকে অনেক প্রকারের খাবার তৈরী হয়ে থাকে। এগুলি পার হয়ে আমরা য়াপ্পালাচিয়ান পর্ব্বতমালার কাছে এসে পড়লাম। এই পর্ব্বতমালাটীর খুবই দৈর্ঘ্য। অন্টারিও হ্রদের দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে আলাবামার বারমিংহামের কাছাকাছি পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। এর মধ্যে দিয়ে বেশ কয়েকটা টানেল তৈরী হয়েছে। এটী পার হতে হলে এইসব টানেলের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। এইসব টানেল গুলিও ওয়ানওয়ে। আমেরিকার সব যানবাহনাদি রাস্তার ডানদিক দিয়ে যায় আর অন্য যানবাহনাদিকে অতিক্রম করতে হলে বাঁদিক দিয়ে অতিক্রম করতে হয়। শুধু ইংরাজদের দেশ ও তার কলোনিগুলো ব্যতীত সারা পৃথিবী এই নিয়ম-কানুন মেনে চলে। মাঝে মাঝে রাস্তার ডানদিকে রেষ্ট রুম এরা ল্যাভেটরীকে রেষ্টরুম বলে আর বিশ্রাম ও জলযোগ করবার জন্যে সার সার বেঞ্চিপাতা আছে। বিশ্রাম না করে আমরা কয়েকঘন্টার মধ্যে ইরি হ্রদের কাছে পৌঁছে গেলাম। এখান থেকে আবার ৯০ নম্বর হাইওয়ে ধরে নিউইয়র্ক স্টেটের বাফেলো সহরে এসে আমাদের পৌছুতে হবে। এই শহরের ধারেই রয়েছে

নায়েগ্রা নদীটি যার থেকে পৃথিবী বিখ্যাত নায়েগ্রা জলপ্রপাত হয়েছে। নিউইয়র্ক ষ্টেটের মধ্যে ইরি হ্রদের কিছুটা অংশ ও কানাডার অনটারিও হ্রদের কিছুটা অংশ রয়েছে। ইরি ও অনটারিও হ্রদের বেশীর ভাগ জলভ জমি কানাডার ভাগ্যে জুটেছে।

ইরি হ্রদের ধার দিয়ে আমাদের গাড়ীটী তীর বেগে ছুটেছে। পূর্বেই বলেছি গাড়ীর চালক আমার জামাতা। এ চলন্ত অবস্থায় গাড়ীর স্পিডোমিটারে ৯০ মাইলের নীচে কাঁটাটি নামতে আমার চোখে পড়েনি। দূরে ইরির গাঢ় নীল জল আকাশের সঙ্গে একেবারে মিশে গেছে। হ্রদের তটে রয়েছে হাজার হাজার নতুন ও পুরাতন ছোট বড় বাড়ীগুলো আর রয়েছে অনেকগুলি ছোট ছোট নতুন ও পুরাতন সহর। এই দৃশ্যটি মনের মধ্যে একটা স্মৃতির ছাপ রেখে গেল।

এই সেই বিখ্যাত ইরি হ্রদ। যার থেকে নায়েগ্রা নদীটি বেরিয়ে সহরের মধ্যে দিয়ে এঁকে বেঁকে জগতের শ্রেষ্ঠ জলপ্রপাত হয়ে, পৃথিবী বিখ্যাত হয়েছে। আমেরিকা আর কানাডার মধ্যে যতগুলো হ্রদ আছে ইরি তাদের মধ্যে চতুর্থ বৃহৎ হ্রদ। কানাডা ও আমেরিকার দুদেশের গর্বের হ্রদ এই ইরি। এর আয়তন ৯৯৪০ বর্গমাইল, ৫০৯৪ বর্গমাইল কানাডার ভাগে আর ৪৮৪৬ বর্গমাইল আমেরিকার ভাগে পড়েছে। এই হ্রদটী অন্যান্য হ্রদের মতনই বরফ গলে তৈরী হয়েছে। ইরির আর এক নাম্‌ ও হ্রদ। লক্ষ লক্ষ বছর আগে নিউইয়র্ক ষ্টেটের য়াপ্পালাচিয়ানের অংশ এ্যাড্রিয়লড্যাকস্‌ পর্ব্বতের শীর্ষদেশ থেকে একটি বরফের প্রকাণ্ড পাহাড় ধ্বসে উত্তরে পূর্ব্বেকার সেন্টলরেন্স ভ্যালিতে (এখনকার নাম নিউইয়র্ক ষ্টেট) গিয়ে পড়ে সেখানে লাণ্ডি হ্রদটী তৈরী করে। তারপর সেই বরফের পাহাড়টী এই হ্রদটীর উত্তর-পূর্ব্ব দিকে সরে এসে সেই জমিটিকে ঢালু করে দেয়। এই জমিটি ঢালু হবার জন্যে হ্রদের জল নীচের দিকে নামতে থাকে ও নায়েগ্রা নদীর সৃষ্টি হয়। যে বৃহৎ জলরাশি নায়েগ্রা নদে ভরে নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে সেই জলরাশি আবার পূরণ হয়ে যাচ্ছে ইরির উত্তর-পশ্চিমের লেক সুপিরিয়র, লেক মিশিগান ও লেক হুরোণের জলে। ডেট্রয়েট নদীটি এই সব হ্রদগুলির সঙ্গে ইরির সংযোগ সাধন করেছে। ইরি সমুদ্র থেকে ৫৭২ ফুট উঁচু, এর গভীরতা হচ্ছে ২১০ ফুট। আর অন্যান্য হ্রদের মধ্যে ইরিই একমাত্র হ্রদ যার উচ্চতা সবচেয়ে বেশী। এটী ২৫০ মাইল লম্বা ও ৫০ মাইল চওড়া। এর ওপর ছোট বড় জাহাজগুলো এর চার পাশের ষ্টেট থেকে লোহা, কয়লা ও অন্যান্য জিনিষ পত্তর বোঝাই করে অন্যান্য পাশের ষ্টেট্‌গুলোকে দেওয়া নেওয়া করে থাকে; আর বিদেশে মালপত্তর নিয়ে যেতে হলে জাহাজগুলো সেন্ট-লরেন্স সীওয়ে দিয়ে সমুদ্রযাত্রা করে থাকে। এই সীওয়েটি ১৯৫৯ সালে তৈরী হয়েছে। এর মধ্যে দিয়ে সমুদ্রে যেতে হলে কানাডার অনটারিওর মধ্যে অবস্থিত ওয়েল্যাণ্ড ক্যানালটী অতিক্রম করে যেতে হয়। এই ক্যানালটী অনটারিও হ্রদের ওয়েলার ও ইরির কোলবার্ণ বন্দরের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। ১৮৩৯ সালে নায়েগ্রা জলপ্রপাতের পাশে এটীকে তৈরী করা হয়। সেই সময় এটী এত প্রশস্ত ও গভীর ছিল না। ১৮৪৫ ও ১৮৮৭ সালে এটীকে আরও প্রশস্ত ও উন্নত করা হয়েছিল। আবার ১৯১৩ সাল থেকে আরম্ভ করে ১৯৩৩ সাল পর্য্যন্ত কয়েক লক্ষ ডলার খরচ করে আরও প্রশস্ত ও গভীর করা হয়। এখন এই ক্যানালটী লম্বায় ২৭ মাইল ও চওড়ায় ৩১০ ফুট, আর এর গভীরতা কমবেশী ৩০ ফুট। এর আটটি লক্‌ রয়েছে যাতে করে জাহাজগুলিকে প্রচুর জল আটকে ওপরে তুলতে পারে। এটী সেন্টলরেন্স সীওয়ের একটী অংশ। তবে অনেক সময় এর জল বরফে পরিণত হলে জাহাজ চলাচল করতে পারে না।

আমরা লেক ইরির পাশ দিয়ে নিউইয়র্ক ষ্টেটের বাফেলো সহরে এসে উপস্থিত হলাম। এটী বেশ বড় শহর, লোক সংখ্যায় এটী নিউইয়র্ক ষ্টেটের দ্বিতীয় শহর বলে গন্য করা হয়। এখান থেকেই নায়েগ্রা নদীটি আত্মপ্রকাশ করেছে, আর এখান থেকেই নায়েগ্রা জলপ্রপাতটী ২০ মাইল দূরে অবস্থিত। কিন্তু নায়েগ্রা ড্যামের কাছ দিয়ে ঘুরে গিয়ে জলপ্রপাতের কাছে যেতে

প্রায় ৩৫ মাইল দূরত্ব পড়ে। বাফেলো সহরের আয়তন ৪০ বর্গমাইল। এই সহরের কেন্দ্রস্থলে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ম্যাককিনলের স্মৃতিস্তম্ভ রয়েছে। তিনি এই সহরে ১৯০১ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর আততায়ীর হস্তে নিহত হন। এখানকার হাসপাতালে কয়েক মাস পূর্বে মানুষের ওপর প্রথম এটমিক ইনটারণাল পেসমেকার যন্ত্রটী বসানো হয়েছে ও তাতে সুফল পাওয়া গেছে। এই যন্ত্রটী হার্ট ব্লক অসুখে লাগানো হয়ে থাকে। এই যন্ত্রটীর পরমায়ু ২০ বছর। আর ব্যাটারী সংযুক্ত যন্ত্রটী যেটী পূর্বে চালু ছিল তার পরমায়ু ছিল মাত্র দু বছর থেকে তিন বছর।

বাফেলো সহরের নায়েগ্রা নদীর ওপর একটী দ্বীপ আছে এটির নাম গ্রাণ্ড দ্বীপ। এই দ্বীপের মধ্যে অনেক গুলি ষ্টেট উদ্যান রয়েছে, সেখানে জনসাধারণ পিকনিক করতে যান। বাফেলো সহরে অনেকগুলি বিদ্যালয় ও একটি বড় বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। এখানে ফ্রেঞ্চ furtrappers ও মিশনারীরা প্রথম পদার্পণ করেন। ১৬৭৯ সালে লা সাল্লী La Salli) তাঁর গ্রিফ্‌কোন (Griffon) জাহাজটী নায়েগ্রা নদীর ধারে তৈরী করেন ও নদীর মুখে কনটাই দুর্গ স্থাপন করেন। দুর্গটী অগ্নিতে ধ্বংস হয়ে যায় আর জাহাজটী ইরির জলে জলমগ্ন হয়ে যায়। ১৮৬৭ সালে মারকুইস ডি ডিয়োনভিলি নদীর মুখে নায়গ্রা দুর্গটী তৈরী করেন। এটী দেড়শত বছর ধরে বিখ্যাত ছিল। ১৮১৩ সালের যুদ্ধে বৃটিশ সৈন্যেরা বাফেলো জায়গাটীকে একেবারে ধ্বংশ করে ফেলে। এটি তখন সহর ছিল না তখন এটি একটি গ্রাম ছিল। ১৮৩২ সালে এটিকে সহরের মর্যাদা দেওয়া হয়। এই সহরের ওধারে কানাডার অনটারিও ষ্টেট। এই দুটি দেশের মধ্যে দিয়ে নায়েগ্রা নদীটি—প্রবাহিত হচ্ছে। দুটি দেশকে একটি সেতু দ্বারা সংযুক্ত করা হয়েছে। এই সেতুটির নামকরণ করা হয়েছে ইন্টারন্যাশান পিস ব্রীজ। এটি তৈরী হয় ১৯২৭ সালে। এক শতাব্দী ধরে কানাডা ও আমেরিকার জনসাধারণ যে শান্তিতে বাস করছেন তার জন্যেই এই শান্তি সেতুটি তৈরী হয়েছে।

নায়েগ্রা নদীটি কানাডার অনটারিও ষ্টেটের ইরি দুর্গ আর নিউইয়র্কষ্টেটের গ্রাণ্ডদ্বীপটির চারদিক প্রদক্ষিণ করে নায়গ্রা জল প্রপাতের ওপর দিয়ে অনটারিও হ্রদে গিয়ে মিশেছে। এটি লম্বায় ৩৪½ মাইল আর এর গভীরতা ১৭০ ফুট। জলপ্রপাতের উচ্চতার সঙ্গে এর গভীরতা প্রায় সমান।

নদীটি ইরি হ্রদ থেকে বের হয়ে ৩২৬ ফুট নীচে ঢালের দিকে নেমেছে। নৌকা বা ছোট ছোট জাহাজে করে এই নদীটির ওপর ২০ মাইল পর্য্যন্ত যাওয়া যায়। আমরা শান্তি সেতুটি পার হয়ে কানাডার ভিসা নিলাম। কানাডা কমনওয়েলথের মধ্যে বলে ভিসার কোন খরচ দিতে হয় না। তবে পাশপোর্টে কানাডার নাম থাকা চাই। কানাডা ও আমেরিকাবাসীদের দু দেশের মধ্যে যাতায়াতের কোন ভিসা লাগে না। আমরা ভিসা নেবার পর নদীটির ধার দিয়ে দিয়ে এগিয়ে চল্লাম। এদিককার নদীটি খুবই শান্ত ও খুবই প্রশস্ত। এইখানেই নদীর ওপর ড্যাম তৈরী করা হয়েছে। দেখে মনে হয় যেন এটি একটি বড় হ্রদ। এর ওপর অনেক জাহাজ ও নৌকা ভাসতে দেখলাম। মোটর বোট ও মোটর লঞ্চও রয়েছে। ছোট ছোট নৌকা করে অনেক লোক মাছ ধরছে। নদীটির পাশ দিয়ে চওড়া রাস্তা চলে গেছে। রাস্তাটীর বাঁদিকে ছোট ছোট বাংলো বাড়ী, হোটেল, সবই রয়েছে। লোকজন অনেক দূর থেকে শরীর সারাবার জন্যেও এখানে এসেছে দেখলাম। রাস্তার দুধারের বৃক্ষরাশিগুলি ছায়া ও শীতলতার সৃষ্টি করেছে। আর ঐ বৃক্ষরাজির আশে পাশে নানা রকমের অজস্র ফুল ফুটে রয়েছে। এ দিকটা খুবই নিস্তব্ধ। আমরা বেশ কয়েক মাইল যাবার পর দেখলাম নদীটির গতিটি খুব বেড়ে গেছে। সে এখন পূর্বের মত শান্ত নয়—সে এখন প্রচণ্ড দুরন্ত। দূর থেকে একটা গম্ভীর গর্জ্জন আমাদের কানে এসে পৌছলো। এই শব্দটি যে নায়েগ্রা জলপ্রপাতের শব্দ তা বেশ বোঝা গেল। এখন নদীটিকে দেখলে আর মনে হয় না যে এই সেই শান্ত নিরীহ নদীটি যার পাশ দিয়ে আমরা এতক্ষণ ঘুরতে ঘুরতে এলাম। এর মধ্যে

মধ্যে এখানে কতগুলো 'র‍্যাপিড' :দেখলাম আর ছোট বড় অনেক ঢেউ। জলগুলো যেন সব নিজেদের মধ্যে মারামারি লাগিয়ে দিয়েছে। এই স্থান থেকে জলপ্রপাতটি অর্দ্ধমাইল দূরে অবস্থিত। যেতে যেতে কিছুটা দূর থেকে আমাদের চোখে পড়ে হাজার হাজার লোকের জটলা আর নানা রকম রঙের হাজার হাজার গাড়ীর সমাবেশ। মনে হয় যেন এখানে একটি বড় প্রদর্শনীর মেলা বসেছে কয়েক মাইল জুড়ে। কাছে এসে দেখলাম যে সত্যই নায়েগ্রা জলপ্রপাত নিজেই একটি প্রদর্শনী। লোকে দেখেই চলেছে, দেখেই চলেছে তারা আর অন্যদিকে চোখ ফেরাচ্ছে না। তাই এখানে আবাল বৃদ্ধ বনিতা যুবক-যুবতী শিশুদের ভীড়ে ভীড়। আমাদের কতদিনের আশার এই স্বপ্নময়ী জলপ্রপাত আজ প্রত্যক্ষ করলাম। আমরাও চোখ ফেরাতে পারছি না। চোখ ভরে তার লীলা আমরা পান করছি। প্রপাতের ধার নব ঘেরা, তার পাশেই আমরা দাঁড়িয়ে দেখছি। একেবারে আমাদের পাশ দিয়ে তার জলরাশি প্রলয়ের তাণ্ডব লীলার মত ভীষণ গর্জ্জন করতে করতে নীচে গিয়ে নামছে। জলরাশিতে সূর্য্যকিরণ প্রতিভাত হচ্ছে অসংখ্য রঙের সংমিশ্রণ হয়ে জলরাশিকে নানা রঙে মণ্ডিত করেছে। কোথায় সাদা, কোথায় গাঢ় আকাশের নীল রঙ, কোথাও লালের আভা কোথাও বেগুনি রঙের ছটা। এই জলরাশির এই রঙের লীলা দেখে আমাদের মনকে উদ্বেলিত করতে থাকে। তার কিছুটা দূরে শূন্যে রয়েছে সাতরঙা রামধনুটা জলরাশির একপাশ থেকে উঠে অন্য পাশে একটি সেতুর গায়ে গিয়ে মিশেছে যুগ যুগ ধরে এই রামধনু এখানেই বিরাজ করছে। আর সেতুটির নামকরণ হয়েছে রামধনু সেতু। জল প্রপাতের স্রোতটি নীচে নামবার সময় ভেতরের দিকে বেঁকে ঢুকে যাচ্ছে। আমার স্ত্রী এক দৃষ্টিতে ঈশ্বরের সৃষ্টি দেখে চলেছেন। কতবার ডাকলাম কানেও শোনেন না। আমিও তাঁর সঙ্গে আবার দেখতে থাকি। ঐ স্রোতটি যেখানে নীচে গিয়ে পড়ছে সেখানে যাবার বন্দোবস্ত আছে। প্রত্যেককে এক ডলার পঁচাত্তর সেন্ট প্রবেশ করার জন্যে খরচ করতে হয়। এখানে একটি অফিস রয়েছে এটির নামকরণ করা হয়েছে 'সিনিক বিউটি'। টিকিট কেনা হলে মেয়ে জামাই নীচে নিয়ে যাবার জন্যে আমাদের ডাকাডাকি করতে আরম্ভ করলে আমি সজাগ হয়ে উঠি, আমার স্ত্রীর কিন্তু সে দিকে একেবারে হুঁস নেই। আমি তাঁকে সজাগ করে ডেকে নিয়ে ওদের পেছন পেছন যাই।

আমরা প্রবেশ পত্র দেখিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নীচের একটি ঘরের মধ্যে ঢুকলাম। এখানে পুরুষদের ও স্ত্রী লোকদের পৃথক পৃথক ঘরের ব্যবস্থা আছে। সেখানে গিয়ে আমাদের মাপ অনুযায়ী কালো রঙের গ্যামবুট ও ওয়াটারপ্রুফ পরলাম। আর মাথায় দিলাম কালো রঙের রাবারের টুপি। শুধু আমাদের চোখ মুখটা বেরিয়ে রইলো। সাজগোজ করে লম্বা চাতালে গিয়ে দেখলাম লিফট দিয়ে নিচে নামবার জন্যে সকলেই লম্বা লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এই লাইনে স্বামী স্ত্রী, যুবক বৃন্দ তার যুবতী বান্ধবীকে নিয়ে এক সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে চোখ দিয়ে দেখলাম কেউ তার স্ত্রী বা বান্ধবীকে জড়িয়ে রয়েছে, কেউ সকলের সামনেই ঘন ঘন মুখচুম্বন করে ভালবাসা জানাচ্ছে। আর তাদের স্ত্রী বা বান্ধবীরাও ছাড়বার পাত্র নয় দেখলাম তারাও তাদের প্রতিদান দিচ্ছে। এদের কাছে গোপন কিছু নেই বলেই আমাদের ভাল লাগে। এরকম দৃশ্য ইউরোপের প্রায়ই দেশেই দেখে এসেছি কিন্তু মস্কোতে এ দৃশ্য আমরা দেখতে পাই নি।

আমার স্ত্রী ও কন্যা যে কোথায় জনারন্যে মিশে গেছে তাই তাদের দেখতে পেলাম না। আমাদের সময় হতে আমরা লিফটে করে অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে বেশ কয়েক তলা নীচে নেমে গেলাম। নীচে নেমে এগিয়ে চলি। ডান দিকে একটি সুড়ঙ্গ চলে গেছে আর সামনে সিঁড়ি দিয়ে নামতেই মাঠের মত একটা খোলা জায়গা পেলাম। সেখান থেকে দেখলাম প্রায় দুশো গজ দূরে ওপরকার স্রোতের জলরাশি ভয়ঙ্কর শব্দ করে

(এরপর ৪৭৪ পৃষ্ঠায়)

বড় ঘরের বড় কথা

(উপন্যাস)

পুষ্পদেবী সরস্বতী

এরপর সাত আট বছর বাদে নীরার আবার সন্তান সম্ভাবনা দেখা দিল। এ ছেলে আঁতুড়েই গেল জনডিসে। তখন অবিশ্যি পেঁচোয় পাওয়া বলত আমি আধুনিক নামটাই দিলুম। হারুবাবুর মতে মেরীর সন্তান শোক ছিল বটে কিন্তু সে সন্তানের মুখও দেখলো না। সে দেখলো সেই নীরা চার চারটে সন্তান পেটে ধরেও রেখে যেতে পারলো না কারুকে। হারুবাবুর ছোট যে ভগ্নী ছিল তার মৃগীর রোগ ছিল, একটু পাগলাটে ধরণের। যাকে তোমরা বলো এ্যাবনর্মাল কিন্তু দুষ্টু বুদ্ধিতে মাথা ছিল ভরপুর। পাগলই হোক আর ছাগলই হোক বিয়ে না দিয়ে উপায় নেই, মেয়ের গড়ন পেটন ভালো রং শাঁখের মত ধবধবে মাথায় কালো একরাশ চুল। মেয়ে একটু তোতলা নাম ছিল তার জলজ বালা। আর এমনি গেরো যে ঐ বর্গীয় জটাই তার মুখে যেত আটকে। তাই কনে দেখতে এলে সে যে বন্ধুর নাম মনে আসত বলে দিতো। কখনো আভা কখনো বিভা যা তার আটকায় না। তখনকার দিনে কথা বার্ত্তা বর কনেয় হত না—। হত কর্ত্তায় কর্ত্তায়। কনে দেখতে এসে তার গায়ের রং চুলের বাড় আর ছোট কপাল আর ছোট ছোট পা দেখলেই তাঁরা সন্তুষ্ট হতেন। প্রশ্ন দুটি ছিল মালক্ষ্মী তোমার নাম কি? দ্বিতীয় হচ্ছে কি পড়ো? প্রথম প্রশ্নের উত্তর সাধারণ মেয়ের পক্ষে সহজ ছিল। দ্বিতীয় উত্তরটা সাধারণতঃ শেখানো ছিল কেউবা শিশুশিক্ষা কেউবা কথামালা বলতো। এই বিষয়ে একটি কথা মনে পড়লো—এক মস্ত কলিয়ারী প্রপ্রাইটারের স্ত্রী ছেলের জন্যে কনে দেখতে এসেছেন কালিঘাটে—। তখন কালিঘাট দক্ষিণেশ্বর বা অতি আধুনিক হলে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের ভেতর মেয়ে দেখার চলন ছিল। যতক্ষণ সম্পর্ক ঠিক না হত কেউ কারুর বাড়ী যেতেন না। এখন মাকালীর মন্দিরের ভেতর গিন্নি জিগেস করেছেন কি বই পড়ো মা, মেয়ে বলেছে পেরথম ভাগ বলেই ঝরঝর করে কেঁদে ফেলেছে। গিন্নি ত অপ্রস্তত বলেন তাতে কি হয়েছে কাঁদছো কেন? গিন্নির কথায় সাহস পেয়ে মেয়েটি বললো কাকা বলে দিয়েছিলো শিশুশিক্ষা বলতে কিন্তু মাকালীর থানে কি করে মিথ্যে কথা বলবো—গিন্নি বললেন নেকা-পড়া মাথায় থাক মা তুমিই আমার বৌ হবে। আমি মাষ্টারণী রেখে নেকাপড়া শিখিয়ে নেবো। এই যে ধর্মজ্ঞান এইটেই হল সতি কারের জিনিষ। বলাবাহুল্য বিয়ে হয়ে গেল। শুধু মেয়েটির সততার জন্যেই।

এখানে বিপদ হল যে মেয়েটির নাম আভা সে সামনেই বসেছিল। কুটুম্বরা চলে যেতেই সে বললো হ্যারে জলি আমার নাম কেন বল্লি? জলি অনায়াসে বললো কি করবো জ জ জলজ বালা বল্লে যে মা বকবে। বেচারীর বড় বোনের নাম অম্বুজ মেজ পঙ্কজ সেজ নীরোজ অবিশ্যি পরে বালা ছিল শেষের নাম জলজ ছাড়া কি হবে। তাই বেচারার এই দুর্গতি—। কিন্তু দুর্গতির তখনও বাকি ছিল, পাত্রপক্ষ বললো কন্যাকর্ত্তাকে এ কি মশাই কনে বদল কল্লেন নাকি? ঘটনাটা কন্যা কর্ত্তা জানতেন তাই রক্ষা। সামলে নিয়ে বল্লেন না মশাই মেয়েদের কাণ্ড জানেন ত? ওটা ডাক নাম। তখন নিজেদের অনেক অপকর্মই মেয়েদের দোষ বলে পুরুষরা নিজেদের পৌরুষত্ব বজায় রাখতেন। পাত্র পক্ষ টাকার গাদার ওপর বসে থাকতো সত্যি কিন্তু একেবারে সুকুমার রায়চৌধুরীর পাত্র—গঙ্গারামকে পাত্র পেলে

জানতে চাও সে কেমন ছেলে—পাত্রটি শুধু সে আকাট মুখ্যু তাইই নয় গাঁজা গুলি ভাং হেন নেশা নেই যা করে না—। হারুবাবুর মনে হল একে যেন বিধাতা নিজেনে গড়েছিলেন হারুবাবুর মনের মত করেই।

এখনকার ছেলেমেয়েরা বলবে তখনকার বাপ মারা ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের দিয়ে দিয়ে পুতুল খেলার সাধ মিটাতো। তা হয়ত মেটাতো। বিপদও যে ঘটত না তাও নয়। যেমন ধর না কেন বাসর ঘর আর ছাদনা তলা, এ তো কিশোর বরদের আতঙ্ক ছিল। প্রথমে কলা তলায় চান করতে যখন পিঁড়িতে দাঁড় করাত তখন সে পিঁড়ির তলায় সুপুরি দিতে প্রায়ই মেয়েদের ভুল হত না। ঐ যে খোঁড়া ধনঞ্জয় খুড়োকে তোমরা দাওয়ায় বসে তামাক খেতে দেখো উনি তো বিয়ে করতে গিয়েই খোঁড়া হয়েছিলেন। তখন ত এত এক্‌সরে প্লাষ্টার এ সবের চলন ছিল না—তাছাড়া বিয়ে করতে গিয়ে ঠকে পড়েছে একথা বলাও ত কম লজ্জাকর নয়। কাজেই ব্যথাটা হাসিমুখে সহ্য করতেই চেষ্টা করেছিল বেচারী। এমন কি শ্বশুরবাড়ীতে ঐ টেনে টেনে হাঁটা নিয়ে খোঁড়া বর না কিরে বাপ? এসব ত শুনে শুনে সয়ে গেছে। শেষে বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে বলে তারা জোর পা টানা-টানি করেও যখন সারলো না তখন পাটি পাকাপাকি ভাবে জখম হয়ে গেছে—। তবে এর চেয়ে বড় ঘটনাও ঘটতো। আমাদের ড্রইং মাষ্টার মশাই সুখেনবাবু গল্প করেছিলেন যে তাঁদের দেশে জামাইকে ঠাট্টা করে কম্বল দিয়ে এমন জাপটে ধরা হয়েছিল যে কম্বলের মধ্যেই দম আটকে মারা যায় বর। আবার ন্যাতার টুকরো ব্যাসন দিয়ে ভেজে পোরের ভাজা বলে খেতে দেোয়া দই বলে নতুন ভিজনো চুন ডিবের ভেতর আরশোলা এ সব না দিলে বড়রাও দুঃখিত হত বলতো এ কী বিয়ে বাবা যেন নিরিমিষ্যি নিরামিষ্যি ঠেকছে? বিয়ের রাত্তিরে শালীদের কানমলায় অষ্টমঙ্গলা অবধি কানটি বেশ টাটিয়ে থাকতো। আমার সেজ ঠাকুরদা তো অষ্টমঙ্গলায় আবার শালী কানে হাত দিতেই ওরে বাবারে বলে দে ছুট্‌। বর কনের বাড়ীর ব্যবধান এ-পাড়া ওপাড়া। বাড়ী এসে নিজের পিসীমাকে দেখে সতের বছরের বর ভ্যাঁ করে কেঁদেই ফেললো। বললো এখনও কানের ব্যথারি জ্বালায় রাতে ঘুমুতে পারি না পিসীমা, ও কানে আর হাত ছোঁয়ান যায়? দরকার নেই আমার শ্বশুরবাড়ীতে নমস্কার। দোর্দণ্ড প্রতাপ-শালিনী পিসীমা কিন্তু রাগ করেন না বলেন ওসব ত সইতেই হবে বাবা নইলে বলবে ভারি মন্দ মেয়ে-মানুষের ভয়ে পালিয়ে এলো।

চিরদিন ভাইবৌকে খাটো করার জন্যে যে পিসীমা ভাইপোর যা কিছু দোষ ঘাট সমর্থন করেন তিনিই আজ ভাইপোর দিকে ভোট দিলেন না। খানিক বাদেই খড়মের খট খট শব্দে অন্তঃপুর সচকিত হয়ে উঠলো। কর্ত্তা হুকার ছাড়েন ক্যাবলা নাকি পালিয়ে এসেছে। ওদের বাড়ীর গোমস্তা এসে বললো। পিসীমা মিউ মিউ কণ্ঠস্বরে কি যে উত্তর দিলেন বোঝা গেল না। কিন্তু পিসীমার অমন খনেখনে গলা হঠাৎ খাদে নামতে বামুন ঠাকরুণ অবধি অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন। বর বেচারা ভিজে বেরালের মত গোমস্তার পেছনে পেছনে শ্বশুর বাড়ী যেতে পথ পায় না। কিন্তু ক্যাবলার কর্ণ-বেদনার এইখানেই সমাপ্তি ঘটলো না কনে এমন দিকে শুলো যে সেই কানের ব্যথা নিয়ে বর বেচারাকে সেই দিকেই কান চেপে শুতে হল। কনে কদিনের ঘোমটা ও শাসন থেকে মুক্তি পেয়ে আনন্দে দিশেহারা। হঠাৎ বললো হ্যাগা তোমার মুখ অমন সিঁটকে সিঁটকে উঠছে কেন? আমাদের বাড়ী বুঝি ভাল লাগছে না। বর বেচারা কিই বা বলে কারণ সারাদিনই বধূকে ঐ কর্ণ মর্দ্দন কারিণীর কণ্ঠলগ্না দেখেছে—ঘটনাটা যতই হৃদয় বিদারক হোক না বিচারে তার হার নির্দ্ধারিত নিশ্চিন্ত। কাজেই বললে মুখ আবার শিটকালো কে? প্রাণে ভয়, এ ঘটনা সেই নির্দয় মহিলার কর্ণগোচর হলে হয়ত কানটা রেখেই বাড়ী ফিরতে হবে।

পাত্র অতুল্যর শুধু নেশার টাকাটা সময় মত পেলেই হল। যা ইচ্ছে সই করতে বললেই করে দেবে সে। তাতে যে মামাশ্বশুর কত টাকা পাচ্ছে আর সে কত

পাচ্ছে, অত হিসেব করার তার সময় নেই। হারুবাবু লোকটি সাংঘাতিক। বাপ সব সম্পত্তি দানপত্র করে গিয়েছিলেন স্ত্রীর নামে সেই দানপত্র রদ করান তিনি। কাজটি সহজ নয়। তিনি তার একবেয়াইএর কাছে গিয়ে কেঁদে পড়লেন আমার মা দুহাতে জলের মত খরচ কচ্ছে´ টাকা—আমার নাবালক ছোট ভাই দুটো চারু আর নাড়ু পথে বসলো। সে বেয়ায়ের আবার মনের ছবি অন্য রকম। সোজা সহজ পথের পথিক তিনি। গরীব অর্থে অর্থসম্পত্তিতে দরিদ্র ভটচায্যি বাড়ীর ছেলে তিনি। বাপ মস্ত পণ্ডিত ছিলেন। এক ধনী অপুত্রক ছিলেন। তাঁর পুত্র কামনায় যজ্ঞ করার ফলে তাঁর পুত্র হলে তিনি শিবমন্দির চতুষ্পাঠীসহ একখানি বাড়ী ভটচায্যি মশাইকে দেন। ভটচায্যি মশাই সঙ্গে সঙ্গে বহু দরিদ্র ছাত্রকে আশ্রয় দিলেন। কাজেই পাকা ঘর বাড়ী হলেও দারিদ্র ঘুচলো না। হঠাৎ হৃদ্‌রোগে তাঁকে আক্রমণ কল্লো। একদিন কোবরেজ মশাই এলেন পষ্ট মুখের ওপর বলে দিলেন তাঁর অন্তিম দিনের আর বেশী দেরী নেই। শুনে নির্ভীক ব্রাহ্মণ কিছু মাত্র বিচলিত হলেন না। হলেন তাঁর সহধর্মিণী সহসা সকলকে অবাক করে তিনি ছোট আড়াই বছরের ছেলেকে বল্লেন রাম কর্তাকে একবার টোল থেকে ডেকে আন ত? ভটচায্যি মশাই অন্তঃপুরে আসলে তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে তিনি শুলেন বল্লেন আমার বুকটা যেন কেমন কচ্ছে´। কোবরেজ আবার এলেন কিন্তু আসার আগেই সব শেষ। এর বছর খানেক বাদে ভটচায্যি মশাই গেলেন। সংসারের ছবি বদলে গেলো। বড় মেজ দুই ছেলে শুধু দরিদ্র ছাত্রের পালকেই বিদায় করলো না। সেই শিশু ভাইকেও বিলিয়ে দিলো নিঃসন্তান বাঁড়ুজ্জে গিন্নির কাছে। বাঁড়ুজ্জে গিন্নিরা চার জা—। যখন সেই শিশুর আসল বসন্ত হল তখন তাকে বাড়ীতে রাখতে কেউ রাজি হল না। নদীর ধারে বটতলায় শিশুকে কাঁদতে কাঁদতে বাঁড়ুজ্জে গিন্নি শুইয়ে এলেন। কথায় বলে রাখে হরি মারে কে? এখানেও তাই হল মেয়েরা যখন নদীতে জল আনতে যেত তারা কেউবা মাথা ধুইয়ে দিতো কেউবা ডাব নিয়ে যেত কেউবা বাতাসা ভিজনো জল। অর্দ্ধ অচৈতন্য শিশু তাই খেয়ে বেঁচে উঠলো। বাঁড়ুয্যে গিন্নি রাত্রে স্বামীকে বলে রাতে নাকি সারারাত বিনিদ্র রজনী শিশুর মাথার কাছে বসে থাকতো। সেই ছেলে বেঁচেই শুধু উঠলো না প্রত্যেকবার ক্লাশে পড়ে পড়ে শেষে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় যখন প্রথম দশ জনের মধ্যে হলেন, ভাইদের টনক নড়লো তারা এসে বাঁড়ুয্যে গিন্নিকে বললো আপনার ছেলে মানুষ করার সাধ ত মিটলো জ্যাঠাইমা এবার ওকে আমারা বাড়ী নিয়ে যাই চিরকালই কি পরের বাড়ী পড়ে থাকবে? সজল চোখে বাঁড়ুয্যে গিন্নি রামকে বিদায় দিলেন। তিনিই হলেন শেষে হাকিম এবং হারুবাবুর বেয়াই। রাম হাকিম হতেই বড় দুভাই বললো দেখো কি কষ্টের মধ্যে তোমায় আমরা মানুষ করেছি। বাড়ী যে তুলবে ভাই তাতে যেন তিন জনের নাম থাকে। আর আজীবন আমরা একশো টাকা করে দুশো টাকা পাবো—এই ·র্ত্ত পাকা দলিল করে লিখিয়ে নিয়েছিলেন। অতি বিনীত ভদ্ররুচিসম্পন্ন মানুষ ছিলেন রামবাবু। সবচেয়ে বেশী ছিল তাঁর কর্ত্তব্যবোধ—। কে কি করলো এ হিসেব তিনি জীবনে কষেন নি। নিজে যেন কারোর প্রতি কর্ত্তব্য করতে ভুল না করেন এ দিকে ছিলো তাঁর সজাগ দৃষ্টি। এই সহজ সরল দেবতুল্য মানুষটিকে হারুবাবু কাজে লাগালেন। বল্লেন কি আর বলবো বলুন বেয়াই মশাই আমি বেঁচে থাকতে ভাই দুটো পথে বসবে? রামবাবু অভিভূত হলেন তাঁর ভ্রাতৃস্নেহ দেখে। তখন হান্টিংটন সাহেব ছিলেন ম্যাজিষ্ট্রেট আর অ্যাডিসনাল ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন রামবাবু। তাঁকে দিয়ে অন্যায় খরচের অপবাদে দানপত্র রদ কল্লে´ন হারুবাবু তার আগেই বাক্স ভর্ত্তি কোম্পানীর কাগজ জাল সই করে নিজের নামে করিয়ে নিয়েছিলেন। মা তবু রেহো বলতে অজ্ঞান। হারু খেতে বসে যেদিন ভাতের পাতে মিষ্টি খেতেন না চার আনা পয়সা মার কাছে আদায় করে তবে উঠতেন। শেষে মার হাড়ির হাল করে ছেড়েছিলেন হারুবাবু।

তখন বাধ্য হয়ে জামাইদের সঙ্গে বুদ্ধি নিয়ে তিনি মামলা করলেন হারুবাবুর সঙ্গে। সেকালে এ রকম ঘটনা সত্যি সত্যি দেখা যেত না। তবে হারুবাবু মামলা করলে কি হবে নিজের প্রকাণ্ড সংসারটি মার ঘাড়ে চাপিয়ে রাখলেন নিজেও চেপে থাকলেন। পরে যখন ওয়ারেন্ট বেরুল হারুবাবুর নামে তখনও দিনে কোথায় থাকতেন কে জানে? দুবেলা ঠিক এসে খেয়ে যেতেন। মাও ফুলকো লুচিগুলি বেছে বেছে রাখতেন হারুবাবুর জন্যে বলতেন ফুলকো লুচি ছাড়া খেতে পারে না হতভাগা। ছেলে কিন্তু অন্য কথা বলতো বলতো নিজের হাতে রেঁধে খাইয়ে খাইয়ে মাথাটি খেয়ে রেখেছে আমার। অন্য রান্না মুখে রোচে না। সারা জীবন ধরে মা হয়ে শত্রুতা করে গেল। সত্যি কথা বলতে গেলে মা নামে ঘেন্না হয়ে গেল আমার। অমন রান্না খাওয়ার চেয়ে না খেয়ে থাকা ভালো—। শুধু ঐ আবাগীর বেটির জন্যেই খাওয়া নইলে উপোস করে কেঁদে কেটে অনর্থ কর্ত্তে। সাতবার ঢাকন তুলে খোঁজ নিয়ে যায় কি খেলুম কি না খেলুম। হারুবাবুর মা বোধ হয় নষ্টচন্দ্র দেখেছিলেন তাই অপ-কলঙ্ক তাঁর গায়ের ভূষণ হয়েছিল। তিনি রাজার মেয়ে ছিলেন কিন্তু মনে প্রাণে ছিলেন তপস্বিনী। তাঁকে সধবা বেলাও হাতে দুগাছা মাটা বালা আর এক আঙ্গুল চওড়া লালপাড় ধুতি ছাড়া কখনো কেউ পরতে দেখেনি। কিম্বদন্তী হারুবাবুর স্ত্রীকে তিনি বরণের সময় সব গয়না নিজের গা থেকে খুলে পরিয়ে তিনি বধূবরণ করেন মাথার মুকুট হীরার নলরী হীরার চিক হীরার চুড়ী বালা আর তাঁর অঙ্গে ওঠেনি। বিধবা হবার পর সকলের আগে কাটলেন চুল আর ত্যাগ করলেন। একটি কম্বল পেতে শুতেন একটি কম্বল গায়ে দিতেন। অমন নিরলস কর্মী দেখা যায় না। শেষ রাত্রে উঠতেন উনুনে আগুন দিয়ে তাঁর রান্না করা নিত্য কর্ম ছিল। পুজো জপ তপ করতে কেউ কখনো দেখে নি। শিশুদের জন্য বার্লি থেকে আরম্ভ করে বড়দের মুখরোচক ক্ষীর অবধি সবেতেই তাঁর হাত দ্রুত গতিতে চলত। কিন্তু তাঁর হাতের তৈরী বার্লি যে খেয়েছে সে কখনো সে বার্লির আস্বাদ ভুলতে পারে নি। ক্ষীরেতে এতটুকু খিঁচ থাকতো না। বার-চোদ্দ সের দুধ প্রত্যহ তিনি ক্ষীর করতেন। তাঁর রান্না ছিল ভারী মজার—। সর্ষে, ধনে, জীরে, বা কোন ফোড়ন কেউ তাঁকে কখনো ব্যবহার করতে দেখে নি। শুধু হলুদ বাটা দিয়ে তিনি সুক্ত থেকে অম্বল অবধি রাঁধতেন। ফোড়নের মধ্যে সম্বল ছিল শুকনো লঙ্কা। এখনো মনে আছে মনোহর পুকুরের সেই লম্বা দালানে আমরা জন তিরিশেক লোক খেতে বসেছি। বাহাত্তর বছর বয়স্কা বৃদ্ধা একেকখানি ফুলকো লুচি ভেজে পরিবেশন করছেন। বিরাম নেই বিশ্রাম নেই। বেলে আর্‌রিশি দিতেন হারুবাবুর স্ত্রী। এই সময়ের একটা মজার ঘটনা মনে পড়ে—হারুবাবুর এক কাকা ওই রান্নার লোভে প্রায়ই আসতেন খেতে। বারণ্ডায় পিঁড়ে পেতে দেওয়া হতো—লুচি বেগুন ভাজা শুকো তরকারী মাছের অম্বল ক্ষীর পরিপাটি করে খেতেন। ভোজনের মাত্রা বেশ একটু অধিকই হতো। খেতে বসে প্রচুর প্রশংসা বাণী বহির্গত হতো তাঁর মুখ থেকে বলতেন—"রান্না তো নয় অমৃত তা নাহ'লে বালি ওতোরপাড়া থেকে এতটা পথ ছুটে আসি মুখের স্বাদ বদলে গেলো এমন নইলে রাজকন্যে এ রান্না যে খাবে ধন্যি ধন্যি করবে"—তারপর আঁচিয়ে উঠে বলতেন এই-খানে একটা মাদুর পেতে দাও তো মা একটু গড়িয়ে নিই। খাওয়াটা যেন একটু ভারী হয়ে গেছে। মাদুর বালিশ দেওয়ার পর শুয়ে বলতেন একটা গামছা ভিজিয়ে দাও। তারপর সেটি পেটের ওপর ঢাকা দিয়ে দিতেন গালাগাল বলতেন—"নরকে যাক নরকে যাক শতখোয়ারী আবাগীর বেটী ঠাণ্ডা পেটটার ভেতরে যেন কুরুক্ষেত্র বাধিয়ে দিলে গো" এই অভিশাপ বাণী প্রথমে বিড় বিড় করে আরম্ভ হয়ে শেষে উচ্চ কণ্ঠে উঠতো। এ ঘটনার জন্য বাড়ীর সবাই প্রস্তুত থাকতো। যার উদ্দেশে এই কটুবাক্য প্রয়োগ করা হল তিনি কিন্তু অবিচল, রাজকন্যা এবং আবাগীর বেটী এই দুটি কথায় তার মুখের একটি রেখারও পরিবর্ত্তন হত না। হারুবাবুর

মা যে দিন মারা যান সেদিনও হারুবাবু কাগজপত্তর গুছিয়ে মার সঙ্গে মামলা করবার জন্ত কোর্টে যাচ্ছিলেন। হারুবাবুর স্ত্রী পেছু ডাকলেন "আর বোধ হয় তোমার মার সঙ্গে মামলা করতে হলো না গো মার বোধ হয় কলেরা হয়েছে"। এই কলেরাতেই মারা গেলেন তিনি। হারুবাবুর বাবাও কলেরাতেই মারা গিয়েছিলেন। তখনো রিটায়ার করেন নি তিনি। শ্রীরামপুরে জজ ছিলেন। তখন স্যালাইন ইনজেকশন বেরোয় নি। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় মৃত্যু হয় তাঁর। সে জন্য চিরদিন হারুবাবুর মা দুঃখ করতেন—স্যালাইন বেরুলেই ঠিক বাবুকে বাঁচানো যেতো। তারও কলেরা হলো আটদিন ধরে অবিশ্রান্ত স্যালাইন দেওয়া হলো কিন্তু তাঁকে বাঁচানো গেল না। মৃত্যুর সময় দুটি মাত্র কথা বলেছিলেন "তোমরা হবিষ্যি করো না অসুখ করবে" আর বাবুর জুতো জোড়া আমার সঙ্গে দিও। তাঁর পুজোর জিনিষ বলতে ওইটিই সম্বল ছিল। এবার হারুবাবুর সংসার আরম্ভ হল। বাড়ী শুদ্ধ লোক চোখের জলে নাকের জলে হাবুডুবু। যখন মাংস তাঁর খেতে ইচ্ছে হবে বাড়ীতে মাংস আসবে না তাতে অনেক খরচ। নিজে একবার মাংস কিনে নিয়ে আসবেন দোকান থেকে। ছোট ছোট ছেলেপুলে সকলের সামনে নিজে সেই মাংসটুকু দিয়ে ভাত খাবেন। বাড়ীতে আম আসবে না আমের সময়। হারুবাবুর খাটের তলায় দেখো সার সার আম সাজানো থাকছে। উবু হয়ে বসে টিপে টিপে টিপে যে আমটি পেকেছে দেখছেন আর কেটে খাচ্ছেন। হারুবাবুর সবই অদ্ভুত। হয়ত কোন বিধবা বোনের ছেলে পুলে নেই শশুর-বাড়ীর থেকে তার সম্পত্তি পাঁচশ টাকা এলে তাকে টাকা দেবেন না। দেবেন একখানি লম্বা ফর্দ, যদিও নেহাৎই বোন টাকা টাকা করে বলবেন দেখ্ তোর আখেরের জন্তেই রেখে দিলুম। অপুত্রক বিধবার আবার আখের যে কী তা বোঝা যায় না। যেই রক্ষক সেই ভক্ষক—অনেকগুলি নাতি নাতনী একবার তাদের আট জনকে আটটি পেনসিল কিনে দিয়েছিলেন এমন মজাদার পেনসিল লিখতে গেলেই শিষ্ টি মট করে ভেঙে যায়। আরেক বার এনে দিয়েছিলেন আটটি জলছবি একটি ছবিও উঠলো না। তৃতীয়টি সবচেয়েও বেদনাদায়ক লজেনস নামে যে কোবরেজের পাঁচনের বড়ি এনে দিয়েছিলেন তার স্বাদ আজও নাতি নাতনীর মুখে লেগে আছে। এরপর নাতি নাতনীরা আর কখনও কিছু চায় নি। সকালে উঠে একবাটী সর্ষের তেল সারা গায়ে মাখতেন। তারপর এক চৌবাচ্চা জলে একমুঠো পটাশ পারমাঙ্গানেট ছড়িয়ে সেই জলে চান করতেন। এই গোলাপী জল তৈরীটী নাতি নাতনীরা সকৌতুকে দেখতো। আটটা বাজলে রান্নাঘরের রকে একটি কাঁঠাল কাঠের পিঁড়িতে বসতেন। এক সের দুধেতে একমুঠো ভাত দিয়ে তাঁর হতো ব্রেকফাষ্ট বল বা চা পর্ব্বই বল। তারপর নথিপত্র বগলে করে কাছারি যেতেন। না তিনি কোন কাজ করতেন না। কারুর না কারুর নামে মামলা করতেই তাঁকে রোজ যেতে হতো প্রথমে তো মামাদের ম্যানেজার হয়েছিলেন। তাদের সব পথে বসিয়ে বেনামীতে সব ডেকে নিলেন। তার পর হলেন শ্বশুরের ম্যানেজার। ম্যানেজার হলেও তিনি সবই পেতেন কারণ একমাত্র মেয়েকেই বিয়ে করেছিলেন। তবুও শ্বশুরকে তাঁর রাজপ্রাসাদ থেকে খোলার ঘরে বসিয়ে সবটুকু আত্মসাৎ করলেন। যখন মারা যান কলকাতায় ষাট খানা বাড়ী। মহা ভাবনায় পড়ল হারুবাবু কি করে বাড়ীগুলো সঙ্গে করে নিয়ে যাবে। অথচ কত কষ্টে উপার্জ্জন করা ধন প্রাণ ধরে কাউকে দেয়াও যায় না। তখন একটা দানের ব্যবস্থা হলো। গভর্ণমেন্টকে ট্রাষ্ট করে দিলেন সম্পত্তি। প্রতি মাসের গোড়ায় বিধবারা এসে এক টাকা করে দান নিয়ে যাবে। একমাত্র ছেলেকে একখানি টিনের ঘর দিয়ে গেলেন। তাও দানপত্র নয় জীবনসর্ত্ত। একমাত্র পৌত্রেরও তাতে কোন অধিকার থাকবে না। কুলোকে বলে হঠাৎ হারুবাবু কানা খোঁড়া বৃদ্ধ কারুকে দান না করে সব বিধবাকে দিলেন এই কারণে যে বহু বিধবাকে তিনি পথে বসিয়েছেন। ক্রমশঃ

শ্রীরঙ্গমের দেবদাসী

শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

প্রায় সাত শ' বছর আগেকার কাহিনী।

ভারতের সুদূর দক্ষিণ প্রান্তে এক নিভৃত পুণ্যভূমি। তামিল প্রদেশের উপান্তে নদীমাতৃক স্নিগ্ধ শ্যামল অঞ্চল। দ্বীপতীর্থ শ্রীরঙ্গম্‌। পুণ্যতোয়া স্রোতস্বিনী কাবেরীর বিযুক্ত শাখায় সৃষ্টি হয়েছে এই দ্বীপ। দক্ষিণী বৈষ্ণবদের এক পরম পবিত্র তীর্থ শ্রীরঙ্গম্‌। স্বচ্ছসলিলা কাবেরীর সেই উত্তর তীরে শ্রীরঙ্গনাথ মন্দির। স্থাপত্য-কারুর নিরুপম নিদর্শন এক বিশাল দেবায়তন।......

দাক্ষিণাত্যের প্রান্তভাগে, পশ্চিম থেকে পূর্ব ভূপৃষ্ঠকে পাবন ধারায় নিষিক্ত করে কাবেরী প্রবহমানা। কুর্গের ব্রহ্মগিরি নামে পর্বত থেকে আবির্ভূতা হয়ে বঙ্গোপসাগরে তার সঙ্গম।

এটি নদীধারার যাত্রাপথে তিনটি দ্বীপে শ্রীরঙ্গনাথের তিন মন্দির। তিন বৈষ্ণব তীর্থস্থল। প্রথম দ্বীপ পশ্চিমে, মহীশূরে শ্রীরঙ্গপত্তনম্‌—পশ্চিম রঙ্গ বা আদি রঙ্গ। দ্বিতীয় শ্রীরঙ্গনাথও মহীশূরে—শিবসমুদ্রমে। তিনি মধ্য রঙ্গ। তৃতীয়, ত্রিশিরাপুরীর (ত্রিচিরপল্লী) অন্ত্য রঙ্গ।......

ব্রহ্মাণ্ড যখন মহাপ্রলয়ে প্লাবিত ছিল, ভগবান বিষ্ণু তখন অপার সলিলে অনন্ত শয়নে অবস্থান করেছিলেন। তারই স্মারক কাবেরী প্রবাহিনীর এই তিনটি দ্বীপ। গোলোক-পতি বিষ্ণু এখানে অনন্ত শয়নে শায়িত থেকে পূজা গ্রহণ করেন নিত্যদিন।

দক্ষিণ ভারতীয় বৈষ্ণবদের কাছে তৃতীয় রঙ্গ বা অন্ত্য রঙ্গ দেবতাই শ্রীরঙ্গম্‌ রূপে পূজিত হন। ত্রিশিরাপুরীর শ্রীরঙ্গনাথ তাঁদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ তীর্থ। অপরূপ শোভার আগার তাঁর অভ্রভেদী মন্দির। তাঁরই নাম-গৌরবে দ্বীপ-নগরী শ্রীরঙ্গম নামে সুপরিচিত হয়েছে। বিরাটকায় দেবালয় গর্ভগৃহে দীর্ঘদেহী বিষ্ণুর বিগ্রহ। অনন্ত শয়নে নারায়ণ।

শুধু বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের কেন, তাবৎ হিন্দুর ভক্তজনের অন্যতম পুণ্যতীর্থ শ্রীরঙ্গনাথ স্বামী মন্দির। সেজন্যে বহু দূর ব্যাপী শ্রীরঙ্গমের প্রসিদ্ধি। প্রতিদিন কত উপাসক আসে দেবতাকে পূজা নিবেদন করতে। রাজকুল থেকে সাধারণ প্রজাবৃন্দের ভক্তির কত উপচার। দীর্ঘকাল ধরে অগণিত পূজার্থীরা নিবেদিত অর্ঘে শ্রীরঙ্গনাথ স্বামীর ভাণ্ডার পূর্ণ করেছে। রৌপ্য, কাঞ্চন ও নানা রত্ন সঞ্চিত হয়েছে দেব বিগ্রহের উদ্দেশে। উত্তর ভারতের ও দাক্ষিণাত্যের বহু খ্যাতনামা মন্দিরে যেমন, শ্রীরঙ্গনাথেরও তেমনি বিপুল ঐশ্বর্যসম্ভার। সত্যকার স্বর্ণ প্রসূ দক্ষিণ ভূমির এক অতি সম্পন্ন দেবগৃহ শ্রীরঙ্গনাথ স্বামীর।

পূজারী ও উপাসকরা বিশিষ্ট তিথিতে মন্দির অঙ্গন মুখরিত করে। পূজামণ্ডপে, গর্ভগৃহে ভক্তজন অর্ঘ উপচার নিবেদন করে যায় নিষ্ঠাভরে। আর প্রতিদিন উপাসনা অর্চনায় উৎসবে অনুষ্ঠানে বিগ্রহের নিয়ত সেবা। মঙ্গলশঙ্খ ও ঘণ্টাধ্বনিতে বায়ুমণ্ডল পরিপূর্ণ হয়ে যায়। নিশীথ পাররাত্রিকে প্রদীপমালায় শ্রীরঙ্গপুরী ঐশ্বর্যময়ীর রূপ ধারণ করে। প্রভাতে সন্ধ্যায় নিত্য পূজা বিধি। উপাসনার অঙ্গস্বরূপ পরিবেশিত হয় ভজন সঙ্গীত। সেই সঙ্গে নৃত্যানুষ্ঠানে দেবারতি। নৃত্যের ছন্দে পূজা ও আরতি। দেবতার উদ্দেশে দেবদাসীর নৃত্যাকারে আত্মনিবেদন।

প্রত্যহ প্রভাতে ও সন্ধ্যায় দেবদাসী মন্দিরে আসে। শোনায় ভক্তিগীতি। সম্পূর্ণ অঙ্গে নৃত্য প্রদর্শন করে। শ্রীরঙ্গনাথের প্রধানা দেবদাসী, নৃত্য ও গীতে রীতি-মত পারদর্শিনী। নাম তার রঙ্গনায়কী। শ্রীরঙ্গনাথ স্বামীর দাসী রঙ্গনায়কী।

তিন শ্রেণীর দেবদাসীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ ধারার অন্তর্গতা সে। রাজদাসী নয়—যে মন্দিরে ধ্বজস্তম্ভের সামনে

শুধু রাজা ও অভিজাতবর্গের সমাবেশে তাদের মনোরঞ্জনে নিয়োজিত করে আপন নৃত্যকলা। স্বদাসী নয়—যে শুধু সাধারণের মনস্তুষ্টির জন্যে নৃত্য অনুষ্ঠান করে। দেবদাসী রঙ্গনায়কী। তার নৃত্যগীতের অঞ্জলি শুধু শ্রীরঙ্গনাথ দেবের উদ্দেশে নিবেদিত।

ভজনে পূজনে নৃত্যে আরাত্রিকে দেবালয়ের শান্ত দিন যাত্রা চলে যায়। বয়ে যায় রঙ্গনায়কীরও প্রসন্ন জীবনধারা। মন্দিরে তার কলাবিদ্যার প্রাত্যহিক উপচার। শাস্ত্রীয় নৃত্যগীত অভিনয় বিদ্যায় পদ্ধতিগত শিক্ষায় সে গঠিত।

শ্যামাঙ্গিনী হয়েও রঙ্গনায়কী বিচিত্র রূপমতী। আয়ত আঁখি, সুঠাম দেহসৌষ্ঠব ও বিকচ লাবণ্যে সৌন্দর্যময়ী। নৃত্য ছন্দে যখন হিল্লোলিত হয় তার তনুলতা, সত্যই তখন এক দৃশ্য সঙ্গীত মনে হয় দর্শকদের।

কিন্তু রঙ্গিনী রূপে পরিচিতা নয় দেবদাসী। বরং তাকে রঙ্গরূপিণী দেখবার আশা মুগ্ধ নাগরিকরা জলাঞ্জলি দিয়েছে। তারা জেনেছে, রঙ্গনায়কী শুধু শ্রীরঙ্গনাথেরই রঙ্গনায়িকা। তার প্রতিদিনের জীবনচর্যা থেকে এই সত্য প্রতিভাত হয়েছে। যে ভক্তির অর্ঘ পূজার্থীরা প্রতিদিন নিবেদন করে দেবতাকে, তারই আর এক রূপময় প্রকাশ দেবদাসীর নৃত্য গীত অভিনয়ের ডালি।

মন্দিরে তার কলানুষ্ঠান ভক্তদের উপাসনার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী মিলে আছে। তীর্থযাত্রীরা দেবপূজার সঙ্গে দেখে যায় রঙ্গনায়কীর নৃত্যারতি। দেবতার অর্চনায় তার প্রাণের শ্রেষ্ঠ সেবা। দেবদাসী আপনাকে ধন্যা বোধ করে।.....

দেবায়তনের এই ছন্দিত জীবন কিন্তু আর চলল না রঙ্গনায়কীর। সুশান্ত সুষমতার মাঝখানে অকস্মাৎ তাল-ভঙ্গ ঘটে গেল। নিদারুণ ছন্দ-পতন হয়ে ঘনিয়ে এল অভাবিত বিপর্যয়। শুধু রঙ্গনায়কীর জীবনে নয়—শ্রীরঙ্গস্বামীর স্থানে, এমন কি সমগ্র দাক্ষিণাত্যের ধর্ম-সংস্কৃতিতেই।

চতুর্দশ শতকের প্রথম ভাগের কথা। দক্ষিণ ভারতের প্রথম দুঃস্বপ্নের দিন। যে বর্বরতার অভিশাপ একদিন শ্মশানে পরিণত করেছিল উত্তর ভারতকে, এবার তা দাক্ষিণাপথেও হানা দিলে। বিন্ধ্য পর্বতমালা, পবিত্র-নীরা নর্মদা পার হয়ে দক্ষিণের সোনার অঞ্চলেও ধূমায়িত হল সেই বিষবাষ্প। বিদেশী বিধর্মীর পৈশাচিক তাণ্ডব এবার এখানেও ঘটতে লাগল।

সেই নির্বিচার হত্যাকাণ্ড, সেই সমূহ ধ্বংস, সেই লুণ্ঠন, সেই নারী-লাঞ্ছনা, সেই অগ্নিদাহ। অপরূপ স্থাপত্য-কারুকর্মের মন্দির বিধ্বস্ত ও কলঙ্কিত করা। অপূর্ব ভাস্কর্যের নিদর্শন দেব-দেবীমূর্তি চূর্ণ ও অপমানিত করা। ধনরত্ন লুণ্ঠন। তরবারির আস্ফালনে ধর্মান্তর করণ।

সমগ্র উত্তর ভারতে তখন এমনি পরিবেশ রচিত। সুলতান আলাউদ্দিন খল্জীর আমল। কি রীতির রাজ্যশাসন ছিল দিল্লীর সুলতান আলাউদ্দিনের তা সমকালীন বিশ্বনাথ কবিরাজের রচনাতেই সুপ্রকাশ :

> আলাউদ্দিন নৃপতৌ ন সন্ধি র্ন চ বিগ্রহঃ।
> সন্ধৌ সর্বস্ব হরণম্ বিগ্রহে প্রাণ নিগ্রহঃ॥

আলাউদ্দিনের সঙ্গে সন্ধি হলেও সর্বস্বান্ত এবং যুদ্ধ করলে সর্বনাশ। তার সঙ্গে সংগ্রাম বা মিত্রতা দুয়েরই এক পরিণাম।

সুলতান আলাউদ্দিনের শাসন কাজের এই বাস্তব চিত্র। শুধু আলাউদ্দিনের কেন, আগেকার সুলতানী আমলেও একই প্রকৃতি, মাত্রায় কিছু তারতম্য মাত্র। তবে আলাউদ্দিনের নৃশংসতা আগের অনেক কীর্তিকেই ম্লান করে দিয়েছে। যেমন, দিল্লী সিংহাসনের প্রথম দখলদার কুতবুদ্দিন আইবক, তারপর শামসুদ্দিন ইল্‌তুৎমিশ প্রভৃতির সুলতানী।

কুতবুদ্দিনকে দিল্লী সিংহাসনের ভার দিয়ে যায় মহম্মদ ঘোরী। সোনার ভারত লুণ্ঠনের জন্যে হানা দিতে দিতে ঘোরী রাজত্বের সুযোগ পেয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করবার ইচ্ছা ছিল না তার। তাই প্রধান অনুচর কুতবুদ্দিনকে শাসন কাজের দায়িত্ব দিয়ে স্বদেশে চলে যাবার সাধ করেছিল। কিন্তু প্রাণ নিয়ে আর ঘোরীকে ফিরতে হয়নি তার পাঠান

মুলুকে। প্রায়শ্চিত্ত করতে ভারতের মাটিই নিতে হয়েছিল। ভারতবর্ষে ধনরত্ন সম্ভারে সঙ্গে নারী লুণ্ঠন, অপর ধর্মীয়দের হত্যা, মন্দির ধ্বংস ইত্যাদির প্রেরণা মহম্মদ ঘোরী পেয়েছিল সুলতান মাহমুদের আদর্শে। ঘোরীর আগের শতকেই গজনীর সুলতান মাহমুদ তার বর্বর বাহিনী নিয়ে এইসব সুখের সন্ধানে এদেশে হানা দিত। ভারত ইতিহাসের সেই সব অভিশপ্ত দিবস বছরের পর বছর। তাদের যাতায়াতের পথে পথে সোনার ভারতের বুকে শ্মশান চিহ্ন এঁকে রেখে যেত। উষর মরু প্রদেশের অর্ধসভ্য বাহিনী। রুক্ষ পার্বত্য অঞ্চলের সর্ববিধ অভাবের পরিবেশে জীবন কাটে তাদের। সংস্কৃতিবিহীন আদিম প্রকৃতি, যুদ্ধ ও লুণ্ঠনই জীবিকা। অপহরণের প্রবৃত্তিতে দুর্বার। যুদ্ধচর্চা ও জীবনচর্যা তাদের একাত্ম। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নিজেদের জ্ঞান বুদ্ধি মতের তথাকথিত ধর্মবোধ ও তার উন্মাদনা। আগ্রাসী তারা ক্ষুধা লালসার তাড়নায়, দস্যুবৃত্তির দুর্দম প্রবৃত্তিতে প্রতিবেশী মহাদেশে তারা ঝাঁপিয়ে পড়ে। ভারতভূমি রত্নপ্রসূ। যেমন অফুরন্ত তার ঐশ্বর্যসম্ভার, তেমনি শিল্পসংস্কৃতির সৌন্দর্যসৃষ্টিতে অনন্য। কিন্তু শান্তিপ্রিয়, বৈদেশিক শত্রুর সম্পর্কে অসতর্ক। তাদের জীবনযাত্রায় যুদ্ধ-চর্চার স্থান অতি গৌণ স্থান। নরহত্যা, রক্তপাত ও পর-পীড়নে নিতান্ত অনীহা। বর্বর দস্যু-বাহিনীর পরম কাম্যভূমি ভারতবর্ষ।

সেই একই ধারায় নৃশংস হত্যাকারী লুণ্ঠনকারীর দল এই পুণ্যভূমিতে নরক সৃষ্টি করেছে। যুগের পর যুগ। যুদ্ধজীবী দস্যু সেজেছে সুলতানের পোশাকে। দিল্লীর সিংহাসন দখল করে নিয়েছে। আর্যাবর্তের পর ক্রমে অধিকার বিস্তারিত করেছে সমগ্র উত্তরাপথে, পূর্বে গৌড় পর্যন্ত। সেই বিবেকবিহীন লুণ্ঠন, হত্যাকাণ্ড ও ধ্বংস, অগ্নিদাহের সামনে স্তম্ভিত হয়ে যায় শান্ত, সমাহিত, ধর্ম-সভ্যতা-সংস্কৃতির লীলাভূমি জ্ঞানবৃদ্ধ ভারতবর্ষ।...

এই কলঙ্কিত অধ্যায় সুলতান জালালুদ্দিন খলজী পর্যন্ত বিন্ধ্য পর্বতমালার উত্তরভাগেই লিখিত হতে থাকে। স্বর্ণখনি দাক্ষিণাত্যে প্রথম লুণ্ঠনের স্বাদ পায় আলাউদ্দিন খল্‌জী। ইসলামের তরবারি সেই প্রথম বিন্ধ্য ও নর্মদার বাধা অতিক্রম করে।

দাক্ষিণ ভূমি যে রত্নগর্ভা এই বার্তা প্রথম জীবনেই আলাউদ্দিনের কানে যায়। সুলতানী লাভেরও আগে। দিল্লীর তখতে তখন জলালুদ্দিন খল্‌জী—আলাউদ্দিনের একাধারে জ্যেষ্ঠতাত ও শ্বশুর। তারই অধীনে কারা-মাণিকপুরের (এলাহাবাদ অঞ্চল) শাসনকর্তা সেসময় জামাতা-ভ্রাতুষ্পুত্র।

তারও আগে থেকে সুলতানীর সিংহাসনে আলাউদ্দিনের লুব্ধ দৃষ্টি পড়েছিল। সে লোভ চরিতার্থ করবার পরিকল্পনাও ছিল মনে মনে। উপায়—ষড়যন্ত্র। কিন্তু তা সফল করবার জন্যে প্রধান প্রয়োজন—অর্থ। দাক্ষিণাত্যে লুণ্ঠন অভিযানের আয়োজন তার সেই উদ্দেশ্যেই।

দাক্ষিণের সেই প্রথম দস্যুবৃত্তিতে আলাউদ্দিন সসৈন্যে বিস্তর ধনসম্পদ লুণ্ঠন করে। মহা ঐশ্বর্যশালী দেবগিরির রাজকোষাগার করায়ত্ত হল তার। সুলতান শ্বশুরের কাছে এই লুণ্ঠিত সামগ্রীর পূর্ণ বিবরণও আলাউদ্দিন দাখিল করলে না। জালালুদ্দিন তখন অশীতিপর বৃদ্ধ এবং পুত্রহীন। তারই অনুগ্রহে জামাতা-ভ্রাতুষ্পুত্র আঞ্চলিক শাসনকর্তার পদ লাভ করেছিল। সুলতানের বিশেষ স্নেহ ও বিশ্বাসের পাত্রও আলাউদ্দিন, সুলতানীর উত্তরাধিকারও তার ওপর বর্তাবার ইচ্ছা জালালুদ্দিনের ছিল।

কিন্তু আলাউদ্দিনের আলাদা হিসাব। কারণ, তার চরিত্র আলাদা রকমের। তুর্কি-পাঠান-মোগল অধ্যুষিত সেই অন্ধকার মধ্যযুগের সুলতান বাদশাদের মধ্যেও বিবেকবিহীন বিশ্বাসঘাতকতা নৃশংসতা ও লাম্পট্যে আলাউদ্দিন একজন শীর্ষস্থানীয়।

জামাতা-ভ্রাতুষ্পুত্রকে সংবর্ধনা জানাবার শুভ-মুহূর্তেই আলাউদ্দিনের ষড়যন্ত্রে বার্ধক্যপীড়িত হতভাগ্য সুলতান নিহত হল। অকস্মাৎ আলাউদ্দিনের জল্লাদেরা অস্ত্র হাতে ছুটে আসতেই জালালুদ্দিন মর্মভেদী আর্তনাদ

করে উঠেছিল—"ওরে আলাউদ্দিন, এ তুই কি করলি।"

কিন্তু আলাউদ্দিনের বিবেক কিংবা মর্ম স্পর্শ করেনি সেই আতঙ্কিত বৃদ্ধের আর্তস্বর। অনুশোচনার কোন সংস্কারও তার নেই। তার হুকুমে জালালুদ্দিনের শুভ্র-কেশ ছিন্ন মুণ্ড বর্শায় বিদ্ধ করে অনুচররা শোভাযাত্রা করতে লাগল কারাতে। তারপর আলাউদ্দিন সসৈন্যে দিল্লী যাত্রা করলে। রাজধানীতে পৌঁছে আমীর ওমরাহদের বিবেক উচিত মূল্যে ক্রয় করে উপবিষ্ট হল সিংহাসনে। প্রসাদলোভী ভাড়াটিয়া কাব্যরচয়িতা আমীর খুসরো—জালালুদ্দিনের অন্নে পুষ্ট ও আলাউদ্দিনের প্রতি বিদ্বিষ্ট যে ছিল এ যাবৎ—এখন তাকেই কুর্ণিস করে স্বরচিত অভিনন্দন বয়েৎ শুনিয়ে দিলে।

সুলতানী অধিকারের পর আলাউদ্দিনের প্রথম বিরাট কীর্তি গুজরাট আক্রমণ। সেখানে তার সেনা-পতিদের রীতিমত জয়লাভ এবং সাফল্য। লাভালাভের খতিয়ানে আলাউদ্দিন উল্লসিত হল—থম্বারাং ও নহরওয়ালাহ্ লুণ্ঠিত। নহরওয়ালার রাজা কর্ণ পর্যুদস্ত। তাঁর রাণী, অনিন্দ্যসুন্দরী কমলা দেবী লুণ্ঠিতা হয়ে আলাউদ্দিনের হারেমে প্রেরিতা। প্রচুর ধনরত্ন হস্তগত। ক্রীতদাস মালিক কাফুরকে উপার লাভ।

সেই মালিক কাফুর কিছুদিনের মধ্যেই দুর্ধর্ষ যোদ্ধা রূপে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে আলাউদ্দিনের প্রিয়পাত্র হল। ক্রমে প্রধান সেনাপতিও। আলাউদ্দিনের নানা লুণ্ঠন অভিযানের অতি সফল নায়ক। শেষ পর্যন্ত চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী কাফুর আলাউদ্দিনের অন্তিমকালে তাকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করে। আলাউদ্দিনের সেই প্রায়শ্চিত্তের পরে সুলতানী দপ্তলের মালিক কাফুরকেও নিহত হতে হয় শেষ পর্যন্ত। কিন্তু সে সব অনেক পরের কথা। শ্রীরঙ্গনাথ মন্দির প্রসঙ্গেরও পরবর্তীকালের ঘটনা।

আলাউদ্দিন-মালিক কাফুর পর্বের সেই উপসংহারের অনেক আগেকার কাহিনী শ্রীরঙ্গমের। দেবদাসী রঙ্গনায়কীর নাটকীয় জীবনের কথা।

তখন আলাউদ্দিনের আমলের শেষ দিক। বর্ষীয়ান সুলতানের সব গুরুত্বপূর্ণ লুণ্ঠন, সংগ্রাম, মন্দির-বিগ্রহ চূর্ণ ইত্যাদি ধর্মকর্মর ভারপ্রাপ্ত প্রধান সেনাপতি মালিক ইজ্জুদ্দিন নাইব কাফুর। সে যাত্রা তার দ্বিতীয় বার দাক্ষিণাত্যে দস্যুবৃত্তির কাল।

দক্ষিণের ধনরত্ন হস্তগত করবার জন্যে কাফুর প্রথমে বরঙ্গলে অভিযান করেছিল। তা হল ১৩০৯ সালের শেষ ভাগের কথা। অতি সফল আক্রমণ। বিপুল পরিমাণ স্বর্ণ রত্নাদি লুণ্ঠন করে এনে কাফুর দিল্লীর কোষাগার পূর্ণ করলে। দেবালয় দেবমূর্তি চূর্ণ করবার দায়িত্ব পালিত হল ভাল ভাবেই।

এই কৃতিত্বের পুরস্কার স্বরূপ এক বছর পরেই পুনবার কাফুর দাক্ষিণাত্য লুণ্ঠনের ভার পেলে। এবার আক্রমণের পালা আরো দক্ষিণে। লক্ষ্য ছিল কুমারিকা পর্য্যন্ত। কিন্তু দক্ষিণের শেষ প্রান্তে পৌঁছতে পারেনি। তার অনেক আগেই ফিরে আসতে হয়েছিল।

যাই হোক, ১৩১০ সালের ২০ নভেম্বর বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে এই দাক্ষিণাত্য যাত্রা করেছিল মালিক কাফুর।

যাত্রাপথে যথারীতি আক্রমণ, লুণ্ঠন, হত্যাকাণ্ড, মন্দিরাদি ধ্বংস প্রভৃতি কর্মতৎপরতা চলে। অগ্রসর হতে থাকে সুলতানী সেনাদল। ধর্মভূমি দাক্ষিণাত্যের তীর্থস্থলে, জনপদে, গ্রামে গ্রামে কলঙ্কের রেখা অঙ্কিত হয়ে চলে। বিভীষিকার সঞ্চার হয় চতুর্দিকে। কিন্তু এই দুর্ধর্ষ দস্যুদলকে বাধা দেবার ব্যবস্থা দেখা গেল না কোথাও। এ যাত্রায় বিখ্যাত চিদম্বরম্ মন্দির বিধ্বস্ত হল। অন্যান্য দেবস্থানের মতন্ এখানেও তারা লুণ্ঠন করলে সঞ্চিত ধনরত্ন। মন্দির রক্ষার আয়োজন কোন রাজাই করেনি। নিরস্ত্র নিরীহ পূজারীদের পক্ষেও অসম্ভব হল প্রতিরোধ।

এবার সুলতানী বাহিনীর সঙ্গে আলাউদ্দিনের দরবারী কবি-লেখক আমীর খুসরোও যোগ দিয়েছিল। চিদম্বরম্ মন্দির ধ্বংসে উল্লসিত আমীর খুসরোর রচনায় প্রকাশ পায় তার উচ্ছ্বসিত বর্ণনা—'যেখানে আগে রত্ন

ঝলমল করত সেখানে ঝলক দিয়ে উঠল তরবারি...আর ব্রাহ্মণ ও মূর্তি-পূজকদের মুণ্ডগুলি স্কন্ধ থেকে নৃত্য করতে করতে তাদের পদতলে লুটিয়ে পড়তে লগাল।'

মন্দির আক্রমণ তাদের শুধু জেহাদের জন্য নয়। দেবতার উদ্দেশে নিবেদিত, দীর্ঘকাল ধরে সঞ্চিত আছে স্বর্ণ-মণি-মাণিক্যের উপচার। দেবস্থান থেকে সে সম্পদ্ লুণ্ঠনও দস্যুদের এক প্রধান উদ্দেশ্য থাকে। তাই যে-কোন স্থান আক্রমণ করতে গেলে সেখানকার মন্দিরকে রাখে তাদের কর্মসূচীতে। দেবায়তন বিধ্বস্ত ও তার ধনরত্ন লুণ্ঠনের পর মূর্তিগুলি যথাসাধ্য ভগ্ন বা চূর্ণ করে। তারপর এমন স্থানে তাদের নিক্ষেপ করে, যেখানে পদদলিত করা যায়। যে মন্দির যত পবিত্র বলে প্রসিদ্ধ সেখানে তাদের আক্রোশ তত বেশি।

এমনিভাবে মন্দির-বিগ্রহ চূর্ণ করতে করতে মালিক কাফুর আরো দক্ষিণে অগ্রসর হয়। এই মূর্তিমান্ অভিশাপ ক্রমে দেখা দেয় শ্রীরঙ্গমের নিকটে।

দূর থেকেই শ্রীরঙ্গনাথের বিশাল দেবালয় মালিক কাফুরের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। স্থানীয় লোকদের মুখে তারা শোনে—এই মন্দির অতি পবিত্র তীর্থ। সকলের অতিশয় ভক্তি আছে শ্রীরঙ্গ দেবতার প্রতি। আর এখানে কোন রক্ষীদলও নেই।

উল্লসিত হয়ে উঠল মালিক কাফুর। এক নতুন শিকার পাওয়া গেছে!

তার সেনাধ্যক্ষ মুনাবর খাঁ। তখনই তাকে তলব করলে। হুকুম দিলে, 'এই মন্দিরটাকে ভেঙে মাটিতে পাত করে দিতে হবে। সোনা-দানা সব খুঁটিয়ে বার করে নেবে। কিছুই যেন বেহাত না হয়। জায়গাটা খুবই ছোট। বাধা বিশেষ কিছু আসবে না। তোমার ওপর এই পবিত্র কাজের ভার রইল। সামান্য ক'জন সেনা রাখলেই চলে যাবে তোমার। আমি মাদুরার দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। তুমি আজ থেকেই এখানে থেকে যাও। মনে হয় দু'-একদিনের মধ্যেই তুমি কাজ কতে করবে। তারপর আমার কাছে আসবে পরের শিবিরে। আর ভুলো না, কিছু কাফেরকে অন্ততঃ যেন পবিত্র ধর্মে টেনে আনতে পারো।'

এমন লোভনীয় দায়িত্ব পেয়ে মুনাবর খাঁ ধন্য বোধ করলে। সোৎসাহে বলে উঠল, 'আপনি নিশ্চিন্ত থাকবেন, হুজুর। আমার জান দিয়ে আপনার হুকুম তামিল করব। এ-মন্দিরের চিহ্ন রাখব না আমি। লুঠের মাল সব আপনার কাছে নিয়ে হাজির হব।'

নিজের যোগ্যতা দেখাবার একটা বড় সুযোগ পেয়ে অধীর হয়ে উঠল মুনাবর খাঁ। উপযুক্ত স্থান দেখে শিবির স্থাপন করলে। মন্দির আক্রমণ। তার আয়োজন এবার। অনুচরদের নিয়ে তার পরামর্শ আরম্ভ হয়ে গেল।...

অচিরেই শ্রীরঙ্গ নগরে ছড়িয়ে পড়ল এই দুঃসংবাদ সুলতানের এক সেনাপতি তীর্থস্থানে উপস্থিত হয়েছে। দেবস্থান ধ্বংসের ভার পেয়েছে সে। নিকটেই তার শিবির।

মন্দিরের সকলেই আতঙ্কে বিহ্বল হল। কিন্তু প্রতিরোধের কোন ব্যবস্থা করতে পারলে না কেউ। পরিত্রাণের কোন পথই দেখতে পেলে না। শুধু ভাবনায় আকুল হল—কেমন করে রক্ষা পাবে পবিত্র মন্দির। দুর্বৃত্তদের হাত থেকে কিভাবে ধর্ম রক্ষা হবে?

শ্রীরঙ্গম্‌বাসীদের সঙ্গে রঙ্গনায়কীও কাতর হল দুশ্চিন্তায়।

সেদিন নৃত্যারতির সময় কিছুতেই নিজেকে নিবিষ্ট করতে পারলে না। কেবলই অন্যমনস্ক হ'তে লাগল অমঙ্গলের আশঙ্কায়। বার বার ছন্দপতন ঘটল। ভজন গীতি নিজের কাছেই নিষ্প্রাণ বোধ হল তার। কিন্তু সেসব ত্রুটি লক্ষ্য করবার মনের অবস্থাও কারো ছিল না।

আরতির পর পূজা অনুষ্ঠান সবই শেষ হল রাত্রির জন্যে। রঙ্গনায়কী কিন্তু তখনই গৃহে চলে গেল না। মন্দিরের নাটমণ্ডপে বসে রইল একাকী। সমস্ত দেহ অবসন্ন। হতাশায় বিষণ্ণ মন। দীপাধারে উজ্জ্বল শিখার সামনেও তার মনে হল যেন অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে।

বিষ্ণু বিগ্রহের পায়ের কাছে এসে দাঁড়াল দেবদাসী। অনন্ত শয়নে শায়িত দেবতার প্রতিমূর্তি। চিন্তা করতে

লাগল—এই মন্দির, এই বিগ্রহ যদি ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে আমাদের ভবিষ্যৎ কি? এ-প্রশ্নের কোন উত্তরই জানা নেই তার। ব্যাকুল অন্তরে প্রার্থনা জানাতে লাগল—পরিত্রাণের পথ কোথায়? কে পথ দেখাবে? কে পূর্ণ করবে প্রার্থনা।...

রঙ্গনায়কী মনের মধ্যে এক নতুন প্রেরণা লাভ করলে। মুক্তির উপায় আমাদেরই দেখতে হবে। দেবতার ইচ্ছা ত পূরণ হয় আমাদেরই কাজের মধ্যে দিয়ে। মন্দির রক্ষার দায়িত্বও আমাদের।

আর এক দিক থেকেও ভাবতে লাগল দেবদাসী। এই বিধর্মীরা শুধু দেবস্থান কলুষিত, বিধ্বস্ত করেই ক্ষান্ত হবে না। মন্দিরের যাবতীয় ধনরত্ন আত্মসাৎ করেও তৃপ্ত থাকবে না। তাদের লালসা-বহ্নিতে কি দগ্ধ করতে চাইবে না হতভাগিনী দেবদাসীদের?

নারীধর্মের সেই চূড়ান্ত অবমাননা থেকে উদ্ধারের একমাত্র পন্থা—মৃত্যু। জীবন থাকতে এই দুর্বৃত্তদের লাঞ্ছনা থেকে পরিত্রাণ হবে না। নিস্তার লাভের একমাত্র উপায়—আপন হাতেই আপনার জীবননাশ। গত্যন্তর নেই। হয় আত্মহত্যা, নচেৎ সর্বস্ব বিসর্জন দিয়ে আত্মবিক্রয়—নিগৃহীতা হয়ে কোন্ হারেমে ক্রীতদাসীর জীবন যাপন করতে হবে, কে জানে! মৃত্যুর অধিক সেই আমৃত্যু গ্লানির জীবন!

রঙ্গনায়কী চিন্তা করতে লাগল—এ-প্রাণ যদি জলাঞ্জলি দিতেই হয়, তার কি অন্য কোন সার্থকতা সম্ভব নয়? মন্দির কি তাতে রক্ষা হতে পারে না? এই তুচ্ছ জীবন দিয়ে কি সেই মহৎ লক্ষ্য সাধন করা যায় না?

নিবিড় আঁধারের মধ্যে যেন আশার ঝলক দেখতে পেলে দেবদাসী। অকস্মাৎ মনের মধ্যে এক আশ্চর্য শক্তি অনুভব করলে। এক উপায়ে সম্ভব

দেব-বিগ্রহকে প্রণতি জানিয়ে নটী মন্দির ত্যাগ করলে। মনের মধ্যে তখন সেই চিন্তা। আর কাল-বিলম্ব নয়। কার্যসিদ্ধির এক পন্থা মনের মধ্যে উদয় হয়েছে। অতি বিপজ্জনক—কিন্তু অসম্ভব নয়। এ বিপদ্ শিরোধার্য করতেই হবে। আজ রাত্রি থেকেই সে উপায়ের সূচনা করা প্রয়োজন। এখনই সময়।

আপন কক্ষে ফিরে এসে নটী দর্পণের সামনে দাঁড়াল। আপন প্রতিবিম্ব একবার লক্ষ্য করে পুনরায় আরম্ভ করলে প্রসাধন। সযত্নে নিপুণ হাতে নিজেকে সুশোভনা করতে লাগল। কবরীবন্ধনে, ভ্রূ-অঙ্কনে, ওষ্ঠ ও মুখপ্রলেপে, কণ্ঠ-বক্ষ-বাহুবল্লরীর আভরণে, চিক্কণ বসনে, কঞ্চুলিকায় অঞ্চলে, পদ-অলঙ্কারে পর্যন্ত রঞ্জিতা ভূষিতা হল রঙ্গনায়কী। তারপর নূপুর-শিঞ্জিত পদে গৃহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হল।

তার গন্তব্যস্থল—সুলতানী শিবির।

মন্দির চত্বর পার হয়ে একাকিনী পথ চলতে লাগল নটী। রাত্রি প্রথম প্রহর তখনো শেষ হয় নি। তাই পথ তেমন জনবিরল নয়।

কিছুক্ষণ চলবার পর স্বল্প হয়ে এল বসতি-অঞ্চল। এবার সামনে তিনটি পথের সংযোগস্থল দেখা গেল। বামদিকের এক বিপণিতে জিজ্ঞাসা করে নটী জানতে পারলে—শিবির অদূরেই। এখান থেকেই দক্ষিণে খানিক দূরে একটি উন্মুক্ত স্থান। সেখানেই সুলতানের সেনাধ্যক্ষ শিবির ফেলেছে।

নির্দেশ অনুসারে শিবিরের কাছে উপস্থিত হল রঙ্গনায়কী। তার প্রবেশ পথে এক অত্যুজ্জ্বল মশাল। আর একদিকে সশস্ত্র প্রহরী। শিবিরের মধ্যে যাবার পথে রেশমী আবরণ মশালের আলোয় ঝল্‌মল্ করছে।

নটীকে দেখেই সান্ত্রী বলে উঠল, 'কোন্ হ্যায়?'

'আমি খাঁ সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে চাই। গোপন সংবাদ জানাবার আছে।'

প্রহরী বিষম আপত্তি জানালে, 'এখন কারো সঙ্গেই হুজুর মুলাকাৎ করবেন না। শিবিরের অন্দরে কেউ যাবে না—তাঁর কড়া হুকুম। তিনি এখন আরাম করছেন।'

নটী এবার বললে, 'আমি যদি গান শোনাতে চাই তাঁকে? যদি নাচ দেখাতে যাই ভেতরে? তাহলেও কি সেনাপতির আপত্তি হবে?'

এবার এ জেনানাকে ভাল করে দেখলে সান্ত্রী। আশ্চর্য হয়ে কি যেন ভাবলে ক্ষণেকের জন্যে। তার মনে হল, এমন মেহ্‌মানকে হুজুরের আপত্তি হয়ত হবে না। কিন্তু তবু হুকুম-বিরুদ্ধ কাজ করবার সাহস হল না তার। বললে, 'জী, হাঁ। অন্দরে যাবার হুকুম এখন নেই।'

রঙ্গনায়কী তার রকম দেখে হাসতে হাসতে বললে, 'কিন্তু আমি যে হুজুরের কাছে অনেক বখ্‌শিস্‌ আশা করে এসেছি। গান না শুনিয়ে ফিরে যাব না। ভেতরে যেতে যদি না দাও, তাহলে এখান থেকেই গান শোনাই। হুজুরের কানে যাবে নিশ্চয়। আর তোমারও শোনা হবে।'

প্রহরী কি জবাব দেবে ঠিক করতে পারলে না। যেন বেওকুফ বনে গেল বেচারা। এমন আওরৎ যেমন কখনো দেখেনি, তেমনি এমন অদ্ভুত অবস্থাতেও পড়েনি কখনো। যেচে গান শোনাতে এসেছে! অবাক্‌ হয়ে সে চেয়ে রইল নটীর বহুমূল্য অলঙ্কারের দিকে।

রঙ্গনায়কীর সুধাকণ্ঠ এবার সঙ্গীতে তরঙ্গিত হয়ে উঠল। সেই নির্জন নিশীথে সেখানকার আকাশ-বাতাস পূর্ণ হয়ে গেল তার স্বরলহরীতে।

শিবিরের মধ্যে তখন মুনাবর খাঁ সত্যই আরাম করতে বসেছিল। বেশ মৌজেই ছিল মালিক কাফুরের সহ-সেনাপতি। সামনে পান-পাত্র। কাল কিভাবে মন্দির আক্রমণ করতে যাবে মনে সে চিন্তাও আছে। সেই পরিশ্রমের আগের রাত্রিতে স্ফূর্তি করে নিচ্ছে কিছুক্ষণের জন্যে। আর মাঝে মাঝে ভাবছে, কাল মন্দির থেকে কিরকম সোনা-দানা হাতে আসবে। হ্যাঁ, কালই যাওয়া দরকার। শোনা গেল, বহুলোক এখানে পূজো দিতে আসে। মন্দির ভেঙে সেইসব কতখানি মিলতে পারে আন্দাজ করছিল এমন সময় তার কানে ভেসে এল—জেননার গলায় গান। বাইরের দিকে, খুবই কাছে। এ কি ব্যাপার?

হাতের পাত্র রেখে দিয়ে মুনাবর উঠে দাঁড়াল। এগিয়ে এসে বাইরেকার পর্দা সরাতেই তাঁর রঙীন চোখে আর পলক পড়ল না। এ কি স্বপ্ন? নাকি সত্যই বেহেস্তের কোন্‌ হুরী নেমে এসেছে আসমান থেকে? চোখ বুজে মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে আর-একবার ভাল করে চেয়ে দেখলে। না, অবিশ্বাসের কিছু নেই। গায়ের রঙ একটু কালো হলেও হুরির মতন শরীর আর সাজ-সজ্জা। রূপ, যৌবন, অলঙ্কার, গান সব নিয়ে সে ঝলমল্‌ করছে চোখের সামনে। আর কি গানের গলা, যেন বুলবুলি।

মুনাবর খাঁ তার দিকে আরো এগিয়ে আসতেই নটী গান বন্ধ করলে। হাসিমুখে নতি জানালে মাথা হেঁট করে।

মনের বৈকল্যে কিংবা দ্রব্যগুণে খাঁর কণ্ঠস্বর ঈষৎ জড়িত শোনাল। বললে, 'ও কাফের সুন্দরী, গলাটিও ত বুলবুলের মতন। কিন্তু এ কি বুদ্ধি তোমার? এই চমৎকার গান তুমি সেপাইটাকে শোনাচ্ছ? আমার কাছে তাঁবুর ভেতরে এস, শোনাও তোমার চীজ্‌। নাচতে জানো ত নাচ দেখাও। দেখো কি ইনাম্‌ মেলে!'

এমনি সুযোগের আশাতেই রঙ্গনায়কী এত প্রস্তুত হয়ে এসেছে। আবার সেলাম করে জানালে, 'হুজুর, আমি সেই আশায় এতদূর এসেছি অনেক কষ্ট করে। নাচও দেখাব। আপনার ভাল লাগলেই আমি ধন্য। আপনি সুলতানের সেনাপতি। আপনার অনুগ্রহ পেয়েছি, এই আমার ভাগ্য।'

মুনাবর কৃতার্থ হয়ে বললে, 'বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবে কেন, অন্দরে এস বুলবুলি।'

নটী তখনই আদেশ পালন করলে। শিবিরের মধ্যে এসে তার দিকে চেয়ে খাঁ সাহেব বললে, 'তুমি ত মুসলমানী নও।'

'না, হুজুর। তবে ইসলামের প্রতি আমার বড় শ্রদ্ধা। আমার মুসলমান হবার ইচ্ছাও আছে। কিন্তু এতদিন তা পূরণ করবার কোন সুযোগ পাইনি। আমার কয়েকজন সঙ্গিনীরও এই মনোভাব। আপনি যদি দয়া করে ব্যবস্থা করে দেন...'

মুনাবর উৎফুল্ল হয়ে বলে উঠল, 'নিশ্চয় করে দেব। এ ত আমার পবিত্র কর্তব্য। তোমার সঙ্গিনীদের বলে দিও, এ-ভার আমার।'

মধুর কণ্ঠে অন্তরঙ্গ সুরে রঙ্গনায়কী বললে, 'হুজুর, এখন থেকে আমি আপনারই। তবে আমার একটি প্রার্থনা আছে আপনার কাছে। আপনি অনুগ্রহ করে যদি পূরণ করেন তাহলে ধন্য হব।'

'বল তুমি কি চাও?'

'আগামীকাল আমার জন্মদিন। সেই উপলক্ষ্যে আমার সঙ্গিনীরা এক উৎসবের আয়োজন করেছে। শুধু ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের জন্যে নৃত্য-গীতের একটি অনুষ্ঠান। মন্দিরের কাছে একটি শিখর-সৌধ আছে। তারই সর্বোচ্চ তলে উৎসব হবে। সেখানে আপনার নিমন্ত্রণ রইল। আপনি অনুগ্রহ করে যদি আসেন, আমার জন্মদিনের অনুষ্ঠান সার্থক হয়। সেখানে আমার সকল সঙ্গিনীদের সঙ্গে আপনি পরিচিত হবেন এবং দেখবেন তারাও সকলে আমার মতন আপনাদের সত্য ধর্ম অবলম্বন করতে কত আগ্রহী। তাছাড়া, আমার সঙ্গিনীরা সকলেই নৃত্যগীতে পটীয়সী। আপনি এ-বিষয়ে যেমন বিচক্ষণ, আমার মনে হয় তাদের নাচ-গান নিশ্চয় আপনার প্রীতি-কর হবে। তারপর অনুষ্ঠানের শেষে আমি থাকব আপনার জন্যে...শুধু আমি ও আপনি...'

ওষ্ঠপ্রান্তে মধুর হাস্যরেখা ফুটিয়ে, একটি কটাক্ষ হানলে নটী।

মুনাব্বরের মাথার মধ্যে যেন গোলমাল ঘটে গেল। কাল যে মন্দির আক্রমণ করবার কথা ভেবেছিল তা আর মনেও রইল না এখন। এ প্রস্তাবে সে তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে গেল।

রঙ্গনায়কী নতি জানিয়ে বললে, 'আজ বিদায় দিন। কাল সন্ধ্যায় আপনার সঙ্গে এখানেই সাক্ষাৎ হবে।'

তাকে তখনি বিদায় দেবার ইচ্ছা মুনাব্বরের আদৌ ছিল না। কিন্তু পরদিনের অনেক রঙীন আশার আশ্বাসে নিজেকে সংবরণ করলে কোনক্রমে।...

পরদিন সকালে দেবদাসী যথারীতি মন্দিরের অনুষ্ঠান সম্পন্ন করলে। তারপর মিলিত হল সঙ্গিনীদের সঙ্গে। সদা হাস্যমুখী পদ্মা, ললিতা, ধম্মল, বৃন্দা। রঙ্গনায়কীর মতন দেবদাসী তারা। অতি অন্তরঙ্গ বান্ধবীও।

সেদিন রঙ্গনায়কীর জন্মদিনও নয়, কোন উৎসবের কথাও ছিল না। মুনাব্বরের বৃত্তান্ত সবই সখীদের জানিয়ে এই প্রথম নৃত্যগীতের ব্যবস্থা করতে বললে সে। সেই সন্ধ্যাতেই।

আরো কিছু কথাবার্তার পর তারা শিখর-সৌধে উপস্থিত হল। সৌধের চত্বরে দাঁড়িয়ে আলোচনা করলে নিজেদের মধ্যে। একপাশের দেওয়ালের ধারে একটি বিরাটাকার কূপ। সেখানে পরিদর্শনের পর তাদের উপরিতলে দেখা গেল। এদিকের প্রাচীরের কাছে এসেও দাঁড়াল কিছুক্ষণ।

রঙ্গনায়কী শেষে বললে, 'পূর্বাহ্নেই এ-ব্যবস্থা হয়ে যাবে ত? তারপর উৎসব স্থানের সজ্জা। সন্ধ্যাতেই অনুষ্ঠান আরম্ভ করতে হবে।'

পদ্মারা সকলেই তাকে আশ্বাস দিলে, আয়োজনের কোন ত্রুটি হবে না।

'এখন আমি যাই', রঙ্গনায়কী বললে, 'অপরাহ্ণেই আমি আসব।'

প্রিয় সখীদের মুখের হাসি আগেই অন্তর্ধান করে-ছিল। এমন কি পদ্মারও। রঙ্গনায়কীর বিদায় নেবার কথায় তাদের আঁখি সজল হয়ে উঠল। ললিতা অশ্রু রোধ করতে অঞ্চল ঢাকা দিলে মুখ ফিরিয়ে।

রঙ্গনায়কী গভীর মমতায় তাঁর কাঁধে হাত রাখলে। আর সকলেরই উদ্দেশে বললে, 'আমি পাষাণে বুক বেঁধেছি। তোরা আমার এই শুভ কাজে চোখের জল ফেলবি?'

দেবদাসীরা নিরুত্তরে আলিঙ্গন করলে প্রিয় সখীকে। সেই স্পর্শের মধ্যে দিয়েই তাদের হৃদয়ের সমস্ত আবেগ উজাড় করে দিলে।...

ওদিকে শ্রীরঙ্গনাথ মন্দির আক্রমণের কাজ একদিনের জন্যে স্থগিত রাখলে মুনাব্বর। সে শুনেছিল, মন্দিরের মধ্যে মূর্তিটাও অতি প্রকাণ্ড। সবশুদ্ধ ভাঙতে আরম্ভ করলে আজ হয়ত শেষ করা যাবে না। কারণ, দলে

সৈন্য বেশী নেই, সবই গেছে মালিক কাফুরের সঙ্গে। একদিনেই চুকিয়ে ফেলতে হবে, না হলে সোনাদানা বেহাত হতে পারে।

সেদিন সকালে অনুচরদের বললে, 'কালই মন্দির-টাকে জাহান্নামে পাঠানো যাবে।' স্বগতোক্তি করলে, 'আজকের দিনটা ফুর্তি করে নিই। তা ছাড়া, ক'টা কাফেরকেও কল্‌মা পড়াবার ব্যবস্থা হবে—সেদিকেও একটা লাভ।'

সন্ধ্যার আগেই মুনাবর খাঁ শিখর-সৌধে হাজির হল। খুব বাহারের সাজ-সজ্জা করেছে। কোমরবন্ধে তলোয়ার ঝোলানো। তলোয়ারটা নেবার কোন প্রয়োজন বোধ করেনি, শুধু অভ্যাস বশেই পোশাকের সঙ্গে ছিল। সুর্মা আঁকা চক্ষু ঈষৎ রক্তিমাভ। সঙ্গে দুজন ইয়ার।

রঙ্গনায়কী তাদের সাদর অভ্যর্থনা করলে। আরামে উপবেশন করতে দিলে সুসজ্জিত উপাধানে। বিচিত্র স্তবকের তাম্বুল বিড়ায় সামনে রাখলে। মুনাবর দন্ত বিকশিত করে চাইতে লাগল নটীর দিকে। মনোমোহিনী রূপে সে আজ সেজেছে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আরম্ভ হল অনুষ্ঠান। বৃন্দা একটি গীতি শুনিয়ে উদ্‌বোধন করলে। তারপর পদ্মা, ধম্মল ও ললিতা নৃত্য দেখালে একসঙ্গে।

সবশেষে রঙ্গনায়কীর পালা। তার এবারের নৃত্য একেবারেই অন্য প্রকৃতির হল। দেবদাসী বৃন্দারা রঙ্গ-নায়কীর এই নৃত্য দেখে আশ্চর্য হয়ে যেত যদি না জানত তার আজকের মতিগতি।

সে নিজেও কোনদিন এমন নৃত্য মন্দিরে প্রদর্শন করেনি। কারণ দেবতা তার নৃত্যের উপলক্ষ্য নয় এখন। তার একমাত্র উদ্দেশ্য—মুনাবর খাঁর মনোরঞ্জন। লাস্যের ভঙ্গিমা প্রকট করে নটী নৃত্য করতে লাগল।

আবিল দৃষ্টিতে চেয়ে রইল সুলতানের সেনাপতি। রঙ্গনায়কীর দেহছন্দের হিল্লোল যেন সম্মোহের জাল।

অকস্মাৎ নৃত্যের মধ্যেই মুনাবর দাঁড়িয়ে সেই আন্দোলিত দেহলতা আলিঙ্গন করতে গেল। নটীও সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে ছিল এমনি পরিস্থিতির জন্যে। মনে মনে ইষ্টনাম স্মরণ করে নিলে। খাঁ স্পর্শ করামাত্র নিজেকে তারই ওপরে সবেগে নিক্ষেপ করলে রঙ্গ-নায়কী। আপনার সমস্ত শক্তি ও ওজন নিয়ে মুনাবরের ওপর ঝাঁপ দিয়ে পড়ল। তার ভারে ধরাশায়ী হল অপ্রস্তুত সেনাপতি, কিন্তু পতনের পরও মনে হয়েছিল —নর্তকী ত তারই আলিঙ্গনবদ্ধা। কিন্তু তার উৎফুল্ল ভাব কয়েক মুহূর্তেই মিলিয়ে গেল। বাহু-বন্ধনের মধ্যে সেই পতনের বেগেই রঙ্গনায়কী তাকে নিয়ে চলল প্রাচীরের দিকে, একটি বিশেষ স্থানে। সেখানে দেওয়ালটি উন্মুক্ত করা ছিল।

মুনাবর অনুভব করলে, নটীদেহে যেন অসীম শক্তি। এ-যেন শ্বাসরোধকর আলিঙ্গন। তারই প্রচণ্ডতায় অনিচ্ছাসত্ত্বেও সে আবর্তিত হয়ে চলেছে। দেওয়ালের সামনে আসতেই নিজেকে সভয়ে মুক্ত করতে চাইল সেনাপতি। কিন্তু বৃথা চেষ্টা। প্রাচীরের মধ্য দিয়ে পরস্পর আবদ্ধ হয়েই তারা সেই বিরাট কূপের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হল।

ওপর থেকে পতনের মধ্যেই আর্তনাদ করে উঠল মুনাবর—'ছেড়ে দে, বেইমানী—রাক্ষসী—'

'আমি দেবদাসী, দেব—' রঙ্গনায়কীর কণ্ঠধ্বনি অতলে নিমজ্জমান হল। দুজনেরই সলিল-সমাধি ঘটল কূপের গহ্বরে। রঙ্গনায়কীর সে মরণ-আলিঙ্গন তাদের মৃত্যুর আগে শিথিল হল না।—

ঘটনার আকস্মিকতা ও পরিণতি দেখে মুনাবরের দুই অনুচরই পলায়ন করলে প্রাণভয়ে। শুধু সৌধ থেকে নয়, শ্রীরঙ্গ নগর থেকেও। মুনাবরের শিবির থেকে অন্য অনুচররাও তাদের সঙ্গী হয়ে গেল।—

বৃন্দা, পদ্মা প্রভৃতির মুখে নগরবাসীরা শুনলে রঙ্গ-নায়কীর আত্মোৎসর্গের বৃত্তান্ত। যুগপৎ বিস্ময়, বিষাদ, হর্ষ ও গৌরবে সকলের অন্তর ভরে উঠল। এমনিভাবে জীবন বিসর্জন দিয়ে নিঃসহায় নারী রক্ষা করে গেল শ্রীরঙ্গনাথ স্বামীর মন্দির।

তীর্থ মাহাত্ম্যের সঙ্গে দেবদাসীর অপূর্ব আত্ম-ত্যাগের কাহিনী ও সেখানে অমর হয়ে রইল।

কংগ্রেস স্মৃতি

(চত্বারিংশ অধিবেশন—কানপুর—১৯২৫

শ্রীগিরিজামোহন সান্যাল

(৪)

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটী ফরিদপুর কনফারেন্সের সভাপতিত্ব পদের জন্য দেশবন্ধু দাশকে মনোনীত করল এবং কনফারেন্সের দিন স্থির করল ৮ই মার্চ। দেশবন্ধু দাশের কিছুদিন স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটেছিল। স্বাস্থ্যোন্নতির উদ্দেশ্যে তিনি এক মাসের জন্য ২৭শে জানুয়ারী তাঁর ভাই প্রফুল্লরঞ্জন দাশ (পাটনা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব জজ এবং বিখ্যাত আইনজীবী, মিঃ পি. আর. দাশ) মশায়ের নিকট পাটনায় যান। তিনি পাটনা থেকে তারবার্তায় অভ্যর্থনা সমিতিকে জানালেন যে তাঁর পক্ষে ৮ই মার্চ সভাপতিত্ব করা সম্ভব হবে না। সুতরাং বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতির কর্য্যকরী সমিতি সভা আহ্বান করে কনফারেন্সের দিন স্থির করল ১০ই মার্চ অথবা রমজানের পর এপ্রিলের শেষের দিকে কোন একদিন। এ সম্বন্ধে অভ্যর্থনা সমিতির মতামত জানার জন্য কমিটির অধিবেশন স্থগিত রাখা হল। অভ্যর্থনা সমিতির মতানুসারে অধিবেশনের তারিখ ২৫শে মার্চ ধার্য্য হল। ইতিমধ্যে মহাত্মা গান্ধী জানালেন যে তিনি কনফারেন্সে উপস্থিত হতে পারেন যদি অধিবেশন ২০শে এপ্রিল আরম্ভ হয়। মহাত্মাজীর সুবিধার জন্য বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর উপর ভার দেওয়া হল দিন স্থির করতে। তদনুসারে উক্ত কমিটী ওরা মে দিন স্থির করল।

ইতিমধ্যে ২৩শে মার্চ বঙ্গীয় বিধান পরিষদে মন্ত্রীদের নামঞ্জুর করার ফলে নবাব নবাব আলী চৌধুরী এবং রাজা মন্মথনাথ রায় চৌধুরী মন্ত্রীদ্বয় পদত্যাগ করতে বাধ্য হলেন।

যথা নির্দিষ্ট ওরা মে তারিখে ফরিদপুরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনীর অধিবেশন আরম্ভ হল। মহাত্মা গান্ধী দক্ষিণ ভারত পরিভ্রমণ শেষ করে পূর্ববঙ্গে ঢাকা চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ করছিলেন। তিনি সেখান থেকে কনফারেন্সে যোগ দিতে ফরিদপুর এলেন।

দেশবন্ধু দাশের সভাপতির অভিভাষণ অতি সুন্দর ও সুযুক্তিপূর্ণ হয়েছিল কিন্তু তার সুর কিছুটা নরম ছিল। তিনি হিংসার নিন্দা করে বলেছিলেন যে এটা immoral এবং inexpedient। এতে উগ্রপন্থীরা সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। বিষয় নির্বাচনী সভায় তাঁকে লাঞ্ছিত হতে হয়েছিল। আমি ভাবতেই পারতাম না যে কেউ দেশবন্ধুর মুখের উপর দুর্বাক্য বলতে পারে। আমি সেই সভায় উপস্থিত ছিলাম। অত্যন্ত বেদনার সহিত লক্ষ্য করেছিলাম যে আমার বিশেষ পরিচিত একজন বিপ্লবী দেশবন্ধুকে বলল, "আপনি আমাদের নিজ কাজে ব্যবহার করে এখন ভুক্তাবশেষ কমলা লেবুর ছিবড়ার মত ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছেন।" দেশবন্ধু যখন পাটনা থেকে ফেরেন তখনও তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হন নি। এই ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় অসুস্থ হয়ে পড়লেন এবং পুনরায় জ্বর দেখা দিল। তার ফলে তিনি পরবর্তী দিনের অধিবেশনে উপস্থিত হতে পারলেন না। তাঁর অনুপস্থিতিতে পরবর্তী দিনের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করলেন ললিত মোহন দাস।

কলকাতায় ফিরে এসে দেশবন্ধু বিশপ লিফ্রয় রোডের এক বাসায় ছিলেন। তারপর সেখান থেকে স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য তিনি দার্জিলিং যান। দার্জিলিং রওনা হওয়ার পূর্বে আমি তাঁকে একটি ব্যক্তিগত বিষয় সম্বন্ধে

বলেছিলাম। তিনি আশ্বাস দিয়েছিলেন দার্জিলিং থেকে ফিরে এসে সে সম্বন্ধে ব্যবস্থা করবেন। তখন কে জানত যে তাঁর সঙ্গে আমার সেই শেষ দেখা হবে।

(৫)

পূর্বোল্লিখিত সর্বদল কর্তৃক নিয়োজিত কমিটী-কার্য্য ফলপ্রসূ হয় নি।

এপ্রিল মাসে পুনরায় ঐক্যবদ্ধ কংগ্রেসের আশা দেখা দিল। শ্রীমতী সরোজিনী এ বিষয়ে অগ্রণী হয়ে এপ্রিল মাসের গোড়ায় দিকে সকল দলের নেতাদের মত সংগ্রহ করতে লাগলেন। বিটল ভাই প্যাটেল মত প্রকাশ করলেন যে স্বরাজ্য পার্টি তাদের দল তুলে দিতে প্রস্তুত আছে যদি অন্যান্য দলও কংগ্রেসের প্রাধান্য স্থাপনের জন্য তাদের প্রতিষ্ঠানগুলি তুলে দিতে সম্মত হয়। এ বিষয়ে হিন্দু মহাসভা এবং মুসলিম লীগের সঙ্গে আলোচনা হচ্ছে। শ্রীনিবাস শাস্ত্রীর বোম্বাইতে উপস্থিতির সময় জিন্না সাহেব, পণ্ডিত মদন মোহন মালবীয়, ডঃ অ্যানি বেসান্ত, শ্রীনিবাস শাস্ত্রী এবং অন্যান্য নেতাদের একটি বৈঠক ডাকার কথা ছিল কিন্তু অসুস্থতার জন্য শ্রীমতী নাইডু হায়দারাবাদ চলে যাওয়ায় তা সম্প্রতি মুলতুবি রাখা হয়েছে।

(৬)

পূর্বে বলা হয়েছে যে দেশবন্ধু স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য দার্জিলিং যান। সেখানে তাঁর স্বাস্থ্যের উন্নতি হওয়া দূরে থাক ক্রমশঃ অবনতির দিকে যাচ্ছিল। হঠাৎ সমস্ত দেশ বজ্রাহত হয়ে জানল যে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ১৮ই জুন রাত্রে দার্জিলিং-এ পরলোক গমন করেছেন এবং তাঁর মরদেহ ট্রেনে ১৮ই জুন প্রাতঃকালে শিয়ালদহ ষ্টেশনে আনার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেখান থেকে শোভাযাত্রা সহকারে তাঁর দেহ কেওড়াতলা শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হবে। সংবাদ পেয়ে সমস্ত দেশবাসী মুহ্যমান হয়ে গেল। মহাত্মা গান্ধী তখন কলিকাতায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি সকল ভার গ্রহণ করলেন।

১৮ই জুন ভোর থেকে শিয়ালদহ ষ্টেশনে লোক সমাগম হতে লাগল। হিন্দু মুসলমান পার্শী খৃষ্টান প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের পুরুষ ও স্ত্রী, বৃদ্ধ ও যুবক সকলের গতি শিয়ালদহের দিকে। ইতিমধ্যে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠিত হলো লোকের ভীড় নিয়ন্ত্রণের ভার গ্রহণ করে। যখন ট্রেণ থেকে তাঁর মৃতদেহ পুষ্প শোভিত খাটে ষ্টেশনের বাইরে নিয়ে আসা হল তখন লোকের ভীড় ঠেকানো অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল। এরূপ বিরাট জন সমাবেশ এর পূর্বে কখনও দেখি নি। খাট বহন করার জন্য দুদিকে যে চারটি দণ্ড সংযোগ করা হয়েছিল তা কাঁধে নিয়ে শব বহন করার জন্য লোকের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে গেল। আমি বহু চেষ্টায় এক সময় একটি দণ্ডে কাঁধ দিয়েছিলাম। কিছু দূর যেতেই আমি স্থানচ্যুত হলাম।

মহাত্মা গান্ধীও ভীড়ের হাত থেকে রক্ষা পান নি। পরে একটি মোটর গাড়ীতে কেওড়াতলায় উপস্থিত হয়েছিলেন। শোকযাত্রা পৌঁছুবার বহু পূর্বে তিনি সেখানে পৌঁছে সেখানকার কর্তৃত্বভার গ্রহণ করেন। জুন মাসের প্রচণ্ড রৌদ্র উপেক্ষা করে হাজার হাজার লোক পায়ে হেঁটে কেওড়াতলা গিয়েছিল। তাদের কষ্ট লাঘবের জন্য করপোরেশন থেকে হোস পাইপের সাহায্যে যাত্রীদের উপর জলবর্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। রাস্তার দুধারের গৃহের ছাদ এবং বারান্দা থেকে জল ছিটানো হচ্ছিল। সঙ্গে সঙ্গে মৃতদেহের উপর পুষ্পবৃষ্টিও হচ্ছিল। এরূপ দৃশ্য পূর্বে বা পরে কখনও দেখিনি। বহুকষ্টে শ্মশানে উপস্থিত হয়ে দেশবন্ধুর চিতারোহণ দেখেছিলাম।

মহাত্মা গান্ধী দেশবন্ধুর গৃহে উপস্থিত থেকে সেখানকার সমস্ত ব্যবস্থার ভার নিজ হস্তে নিয়েছিলেন। সমবেদনা প্রকাশের জন্য শ্রীমতী বাসন্তী দেবীর সহিত দর্শনার্থীদের নিয়ন্ত্রণেরও ভার গ্রহণ করে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন। এই সময়ে একদিন প্রাতঃকালে বিপিনচন্দ্র পাল মশায় আমার আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে স্থিত বাসায় এলেন। তিনি মহাত্মাকে সহ্য করতে পারতেন না। কথা প্রসঙ্গে শ্রীমতী বাসন্তী দেবীর সহিত সাক্ষাতের

নিয়ন্ত্রণের কথা উঠলে তিনি উত্তেজিত হয়ে বললেন যে একজন গুজরাতী বাংলা দেশে মাতব্বরি করবে। এমন কি, বাসন্তী দেবীর সঙ্গে কে সাক্ষাৎ করবে না করবে তা সেই গুজরাতী ঠিক করে দেবে এ অসহ্য—কোনমতেই সহ্য করা যায় না। এই বলে তিনি ক্রোধান্বিত হয়ে টেবিলের উপর প্রচণ্ড জোরে ঘুঁসি মারলেন, ফলে তাঁকে যে চা দেওয়া হয়েছিল তার খানিকটা পেয়ালা থেকে ছলকে পড়ে গেল।

এই শোকের সময়েও, ২রা জুলাই, মুসলমানদের দ্বারা একটি গোহত্যার গুজবের ফলে খিদিরপুর কিং জর্জ ডকে হিন্দু মুসলমানদের একটি ভীষণ দাঙ্গা বেধে যায়। ফলে কিছু লোক হতাহত হয়। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে এ রকম ভীষণ দাঙ্গা হয় নি। মহাত্মাজীর হস্তক্ষেপের ফলে দাঙ্গা হাঙ্গামা বেশী দূর প্রসার লাভ করতে পারে নি।

দেশবন্ধুর মৃত্যুতে সর্বত্র শোক সভা হতে লাগল। গড়ের মাঠে মহাত্মাজীর নেতৃত্বে যে সভা আহূত হয় তাতে লক্ষাধিক লোক দেশবন্ধুর স্মৃতির প্রতি অর্ঘ দিতে উপস্থিত হয়েছিল। সভায় মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত প্রভৃতি নেতাগণ দেশবন্ধুর নানাবিধ গুণাবলীর উল্লেখ করে অভিভাষণ দেন।

দেশবন্ধুর গৃহপ্রাঙ্গণের পূর্ব্বদিকে শামিয়ানার নীচে একটি সভা আহ্বান করা হল। এই সভায় মহাত্মা গান্ধী দেশবন্ধুর স্মৃতিরক্ষার জন্য অর্থ সংগ্রহের আবেদন করেন। অন্যান্য কথার পর তিনি বাংলার যুবকদের চরিত্র সম্বন্ধে সংযত হতে উপদেশ দেন। কারণ স্বরূপ তিনি জানান যে একজন বাংলার প্রসিদ্ধা নেত্রী তাঁর কন্যায় বিয়ের জন্য ব্যস্ত হওয়ায় তিনি তাঁকে বিয়ে দেওয়ার জন্য উদ্বিগ্ন না হয়ে তাঁর কন্যাকে দেশের কাজে নিযুক্ত করতে বলেন। উত্তরে মহিলাটি অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে জবাব দেন, বাংলার তরুণদের লালসাময় দৃষ্টি থেকে রক্ষা করার জন্য তাঁর মেয়ের বিয়ের প্রয়োজন। এই উক্তি পরে বহরমপুরের একটি জনসভাতেও করেন। কোনখানেই এই উক্তির প্রতিবাদ ওঠে নি।

(৭)

দেশবন্ধুর তিরোভাবের পর বাংলা দেশের নেতা-নির্ব্বাচনের সমস্যা দেখা দিল।

কলিকাতা করপোরেশনের মেয়র, বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি এবং বাংলার স্বরাজ্য দলের নেতানির্ব্বাচনের জন্য বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর একটি জরুরী সভা দেশবন্ধুর বাস-ভবনে ৯ই জুলাই অপরাহ্ন ৪॥টার সময় আহ্বান করা হল। সভার অধিবেশন একটি রুদ্ধদ্বার কক্ষে আরম্ভ হল। উক্ত কংগ্রেস কমিটীর সদস্য হিসাবে আমিও সেই সভায় উপস্থিত ছিলাম। এই সভায়ও নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন মহাত্মা গান্ধী।

বীরেন্দ্রনাথ শাসমল করপোরেশনের একজিকিউটিভ অফিসারের পদের ব্যাপারে অপমানিত বোধ করে কলকাতা ত্যাগ করে গিয়েছিলেন। তিনি তখন মন্তব্য প্রকাশ করেছিলেন যে কলকাতায় বাড়ী ও গাড়ী না থাকলে এখানে নেতা হওয়া যায় না। তিনি প্রতিজ্ঞা করেন যে অর্থ উপার্জন এবং কলকাতায় বাড়ী নির্মাণ না করা পর্য্যন্ত তিনি কলকাতার রাজনীতিতে ফিরে আসবেন না। সে প্রতিজ্ঞা তিনি রেখেছিলেন। সুতরাং নেতা নির্ব্বাচনে তাঁর প্রশ্ন উঠল না।

মহাত্মা গান্ধী বাংলার কোন্ নেতাকে ত্রিমুকুটে শোভিত করা যায়, অর্থাৎ কলকাতা করপোরেশনের মেয়রের আসন, বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর সভাপতির পদ এবং বঙ্গীয় স্বরাজ্য দলের সর্ব্বাধিনায়কের পদ কার উপর ন্যস্ত করা যায় সে সম্বন্ধে তাঁর মত প্রকাশ করলেন। তিনি এই প্রসঙ্গে তিনজন সম্ভাব্য নেতার নাম করলেন—সুভাষচন্দ্র বসু, নির্মলচন্দ্র চন্দ্র এবং যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত। তারপর তিনি সুভাষচন্দ্র সম্বন্ধে বললেন সুভাষ অল্পবয়স্ক—সুতরাং তাঁকে নির্ব্বাচন করা সমীচীন হবে না। নির্মলচন্দ্র সম্বন্ধে বললেন নির্মলবাবু অতিশয় অলস। তাঁর পক্ষে এই গুরুভার বহন করা সম্ভব নয়।

বাকি রইলেন একমাত্র যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত। কিন্তু

তাঁর বিরুদ্ধে তিনটি অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে, যথা, তিনি মদ্যপান করেন, আইন ব্যবসা পুনরায় আরম্ভ করেছেন এবং ইউরোপীয়ানদের ক্লাবে মেলামেশা করেন।

প্রথম অভিযোগ সম্বন্ধে মহাত্মাজী মন্তব্য করলেন যে যতীন্দ্রমোহন মদ খান বটে কিন্তু তিনি মাতাল নন। যদি মদ্যপানের অপরাধে তাঁর কোন পদে মনোনীত হতে বাধা হয় তা হলে অনেক নেতাকেই কংগ্রেসের বিশিষ্ট পদ থেকে বের করে দিতে হয়। তিনি বললেন বহু নো-চেঞ্জার ও স্বরাজী নেতা এই নেশায় আসক্ত। পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু তাঁর সামনেই মদ্যপান করেন।

দ্বিতীয় অভিযোগ সম্বন্ধে মহাত্মাজী বললেন যে যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের বর্তমান আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করে আইন ব্যবসা পরিত্যাগ করতে বলতে তাঁর (মহাত্মাজীর) মন সরে না।

তৃতীয় অভিযোগ সম্বন্ধে মহাত্মাজী বললেন যে ইউরোপীয় ক্লাবে ইউরোপীয়ানদের সহিত মেলামেশায় তিনি কোন দোষ দেখতে পান না।

তারপর মহাত্মা গান্ধীর ইচ্ছানুসারে যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তকে উল্লিখিত তিন পদে নির্ব্বাচনের প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতি ক্রমে গৃহীত হল।

উপরোক্ত নির্বাচন সম্পন্ন হওয়ার অব্যবহিত পরেই মহাত্মা গান্ধী দেশবন্ধুর স্মৃতি রক্ষার জন্য অর্থ সংগ্রহ করতে মফঃস্বলে ভ্রমণ সাব্যস্ত করলেন। প্রথমেই তিনি সিরাজগঞ্জ গেলেন। স্থির হল যে সিরাজগঞ্জ ভ্রমণের পর তিনি অর্থ সংগ্রহের জন্য রাজসাহী জেলায় যাবেন এবং সেই সময়ে আমি তাঁর সঙ্গী হব।

ব্যবস্থা মত আমি ১০ই জুলাই সন্ধ্যার সময় ঈশ্বরদি ষ্টেশনে প্লাটফরমে সিরাজগঞ্জের ট্রেণের জন্য অপেক্ষা করলাম। রাত্রি ৮টার সময় সিরাজগঞ্জ থেকে কলিকাতা গামী ট্রেণ ঈশ্বরদি প্ল্যাটফরমে দাঁড়াল। সেই ট্রেণে মহাত্মা গান্ধী এবং তাঁর সঙ্গীদের জন্য একটি প্রথম শ্রেণীর, একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর, একটি মধ্যম শ্রেণীর এবং একটি তৃতীয় শ্রেণীর কামরা যুক্ত একটি বগী জুড়ে দেওয়া হয়েছিল। ষ্টেশনে ট্রেণ পৌঁছতেই আমি ঐ বগীতে উঠে মহাত্মাজীকে অভ্যর্থনা জানালাম। তাঁর বগীটি ট্রেণ থেকে বিচ্যুত করে একটি সাইডিং-এ রেখে দেওয়া হল। বন্দোবস্ত ছিল যে অধিক রাত্রে কলিকাতা থেকে দার্জিলিং মেল এলে তার সঙ্গে বগীটি জুড়ে দেওয়া হবে এবং সান্তাহার ষ্টেশনে সেটি দার্জিলিং মেল থেকে কেটে সাইডিং-এ রাখা হবে, কারণ, রাজসাহী জেলার প্রথম গন্তব্য স্থান ছিল নওগাঁ।

ঈশ্বরদি ষ্টেশনে বগীতে উঠে দেখি যে মহাত্মাজী তৃতীয় শ্রেণীর কামরার বেঞ্চের উপর শয্যা বিছিয়ে তার উপর বসে আছেন। তাঁর সঙ্গীদের মধ্যে ছিলেন খাদি প্রতিষ্ঠানের সুপ্রসিদ্ধ সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত। তিনি মধ্যম শ্রেণীর কামরায় ছিলেন। রাত্রি হওয়ায় সকলকে শয্যা গ্রহণ করতে বলা হল। আমি দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় এক বেঞ্চে শয়ন করলাম এবং অনতিবিলম্বে ঘুমিয়ে পড়লাম। তারপর কখন বগীটি দার্জিলিং মেলের সঙ্গে যুক্ত করা হল এবং কখনই বা ট্রেণ থেকে বিচ্যুত করে সান্তাহার ষ্টেশনের খানিকটা উত্তর দিকে পশ্চিমদিকের সাইডিং-এ রাখা হল, সুপ্তাবস্থায় কিছুই বুঝতে পারি নি। খুব ভোরে ঘুম ভাঙ্গতে দেখলাম যে বগীর সামনে রাস্তায় কাতারে কাতারে লোক গান্ধীজীকে সন্দর্শন ও সম্বর্দ্ধনার জন্য দাঁড়িয়ে আছে। মহাত্মাজীর কামরায় গিয়ে দেখলাম যে তিনি ঘুম থেকে উঠে মুখ হাত ধুয়ে একটি লেবুর রস ও নুন মিশ্রিত গরম জল পান করছেন। সমবেত জনতার মধ্যে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোক ছিল। পোশাক পরিচ্ছদ দেখে তাদের পৃথক করে চেনার উপায় ছিল না। আমি সেই দিকে মহাত্মাজীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে জিজ্ঞাসা করলাম যে এই জনতার মধ্যে তিনি হিন্দু মুসলমানদের পৃথক করে চিনতে পারছেন কি না। তিনি মৃদু হাস্য করে অসামর্থ্য জ্ঞাপন করলেন।

নওগাঁ মহকুমায় প্রধান দুই জমিদার ছিলেন দুবলহাটি ও বলিহারের রাজবংশ। তাঁদের মধ্যে দীর্ঘকাল প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব ছিল। মহাত্মাজীর অভ্যর্থনায়

ব্যাপারেও এই ভাব প্রকাশ পেল। মহাত্মাজীকে অভ্যর্থনা করার জন্য উভয় পক্ষই সমান আগ্রহ প্রকাশ করতে লাগল। ফলে স্থির হল যে মহাত্মাজীর বাসস্থান হবে নওগাঁর যমুনাতীরস্থ দুবলহাটীর কাছারি বাড়ী। বলিহারের কুমার বিমলেন্দু রায় স্বয়ং মোটর নিয়ে সান্তাহার ষ্টেশনে উপস্থিত হলেন এবং মহাত্মাজীর অভ্যর্থনার পর তিনি স্বয়ং মোটর চালিয়ে তিন মাইল দূরবর্তী নওগাঁ সহরে দুবলহাটীর কাছারি বাড়ীতে তাঁকে নিয়ে গেলেন। গাড়ীতে সতীশবাবু ও আমি সহযাত্রী ছিলাম।

দুবলহাটীর কাছারি বাড়ীতে পৌছে বিশ্রামান্তে মহাত্মাজী একটি প্রশস্ত হলে ফরাসের উপর আসন গ্রহণ করলেন। দলে দলে লোক তাঁর দর্শনপ্রার্থী হতে লাগল। আশ্চর্য মহাত্মাজীর প্রভাব। তিনি সেখানে বসেই স্মৃতি ভাণ্ডারের জন্য বহু অর্থ সংগ্রহ করলেন। তাঁর প্রভাবেই একটি নমুনা এই যে সেখানকার নামজাদা উকিল উপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মশায়ের দান ধ্যান করার বিশেষ সুখ্যাতি ছিল না, তিনি মহাত্মাকে দর্শন করতে এসে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে পাঁচ শত টাকা ভাণ্ডারে দান করলেন।

অপরাহ্নে নওগাঁ শহরের একটি উন্মুক্ত মাঠে একটি বিরাট জনসভার আয়োজন করা হয়েছিল। হিন্দু মুসলমান, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সেই সভায় সমবেত হয়েছিল। শহর এবং আশেপাশের গ্রামের লোক মহাত্মার দর্শন লাভের জন্য দলে দলে সভায় যোগ দিয়েছিল। দেশবন্ধুর স্মৃতি তহবিলের জন্য আবেদন জানালে অভূতপূর্ব সাড়া পড়ে গিয়েছিল। এই সভাস্থলে বহু অর্থ ও অলঙ্কার সংগৃহীত হয়।

সন্ধ্যার সময় স্থানীয় থিয়েটার হলে মহিলাদের জন্য একটি পৃথক সভার আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে কোন পুরুষের প্রবেশের অধিকার ছিল না, কেবল স্থানীয় লোক বলে মহাত্মার সঙ্গে আমার থাকার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। আমি মহাত্মাকে সঙ্গে করে বাইরে থেকে ষ্টেজে যাওয়ার সিঁড়ি দিয়ে উঠতে আরম্ভ করলাম, তখন দেখি সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত মশায়ও আমাদের পশ্চাতে সিঁড়িতে উঠতে উদ্যত হয়েছেন। তখন কর্মরত সেচ্ছাসেবকগণ তাঁকে অতি ভদ্রভাবে ষ্টেজে যেতে নিষেধ করলেন। তিনি বললেন যে মহাত্মাজীর হিন্দী ভাষণ অনুবাদ করার জন্য তাঁকে যেতেই হবে। তাঁকে জানানো হল, জনৈকা স্থানীয় মহিলা মীরাটে শিক্ষায়িত্রীর কাজ করেন, তিনি খুব ভাল হিন্দী জানেন, সৌভাগ্যক্রমে তিনি এখানে উপস্থিত আছেন, তাঁর উপরই মহাত্মাজীর হিন্দীর অনুবাদ বাংলায় শোনানোর ভার দেওয়া হয়েছে। সতীশবাবুকে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করা সত্ত্বেও তিনি তা অগ্রাহ্য করে সিঁড়ির দিকে অগ্রসর হয়ে সিঁড়িতে পা রাখতেই আমার সহপাঠী ও বন্ধু নওগাঁর উকিল প্রাণেশচন্দ্র বাগচী সতীশবাবুর গলার চাদরের দুই প্রান্ত ধরে সিঁড়ি থেকে নামিয়ে দিল। সতীশবাবুর জিদের ফলেই এই দুঃখ ও অসৌজন্যজনক ঘটনা ঘটেছিল। এই ঘটনার ফলে রাজসাহী শহরের মহিলা সভায় তিনি প্রবেশের চেষ্টা করেন নি। অভিভাষণের পর মহাত্মাজীর আবেদনে এই মহিলা সভাতেও প্রচুর অর্থ ও অলঙ্কার সংগৃহীত হয়েছিল।

সভা ভঙ্গের পর মহাত্মাকে তাঁর বাসভবনে পৌছে দিয়ে আমি আমার স্বভবনে বিশ্রাম করতে গেলাম।

পরদিন প্রাতঃকালে বেলা ৮টার সময় প্যারীমোহন পাবলিক লাইব্রেরীতে বিশিষ্ট নাগরিক ও কংগ্রেস কর্মীদের সভায় মহাত্মাজী একটি ভাষণ দেন। সেখানেও তিনি অন্যান্য কথার পর বাংলার যুবকদের চরিত্র সম্বন্ধে সংযত হতে উপদেশ দেন এবং এই উক্তির সানুকূলে দেশবন্ধুর গৃহে এবং বহরমপুরে যা বলেছিলেন তার পুনরুক্তি করেন। কারণ স্বরূপ বলেছিলেন যে বাংলার একজন প্রসিদ্ধ নেত্রী তাঁর কন্যার বিয়ের জন্য উদ্বিগ্নতা প্রকাশ করায় মহাত্মা তাঁকে উপদেশ দিয়েছিলেন যে বিয়ের জন্য ব্যস্ত না হয়ে কন্যাকে কংগ্রেসের গঠনমূলক কাজে নিযুক্ত করতে। তদুত্তরে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে মহিলাটি আক্ষেপ করে বলেছিলেন যে বাংলার যুবকদের লালসা-

মর দৃষ্টি থেকে তাকে অবিবাহিত রাখতে পারি না।১ মহাত্মার এই উক্তিতে কলকাতায় এবং বহরমপুরে কোন প্রতিবাদ ওঠে নি। কিন্তু নওগাঁতে মহাত্মাজীকে প্রতিবাদের সম্মুখীন হতে হল। স্থানীয় উকিল সুরেন্দ্রনাথ মিত্র মশায় প্রতিবাদ করে বললেন যে, 'মহাত্মাজী, আমাদের যুবকদের এরকম অপবাদ কেউ দিতে পারেন না। এই উক্তি অশোভন।' প্রতিবাদের পর মহাত্মাজী খেই হারিয়ে ফেললেন. আমি তখন পাশে দাঁড়িয়েছিলাম। তিনি আমার দিকে তাকিয়ে ইংরেজীতে বললেন যে, তুমি তাঁকে চেন এবং তাঁর নামও বললেন। এখানে নামোল্লেখ থেকে বিরত রইলাম।

সেই দিনই দ্বিপ্রহরের দিকে আমরা রাজসাহী রওনা হলাম। ফেরবার সময় নওগাঁ মহকুমায় এস্. ডি. ও. স্থানীয় কে. ডি. হাই স্কুলের ভুতপূর্ব ছাত্র মহম্মদ ফারুক মোটর চালিয়ে মহাত্মাজীকে সান্তাহার ষ্টেশনে পৌছে দিলেন। সেখান থেকে ট্রেণে আমরা নাটোর গেলাম। নাটোর ষ্টেশনে রাজসাহী নিয়ে যাওয়ার জন্য মোটর গাড়ীর বন্দোবস্ত ছিল। মহাত্মা সহ বিকালে আমরা রাজসাহী পৌছলাম। মহাত্মাজীর অবস্থানের জন্য পুঠিয়ার মহারাণী হেমন্তকুমারী দেবীর পদ্মাতীরস্থ বাসভবনে ব্যবস্থা করা হয়েছিল। রাজসাহী জেলা কংগ্রেস কমিটীর অত্যুৎসাহী কর্তৃপক্ষ মহাত্মাজীর ব্যবহারের জন্য একটি খদ্দরের মশারি তৈরী করিয়েছিলেন। রাজসাহীতে মশার উৎপাত খুব প্রবল। মশারি ছাড়া মশার কবল থেকে উদ্ধারের কোন উপায় ছিল না কিন্তু খদ্দরের মশারির নীচে নিদ্রার ব্যবস্থা কি রকম কষ্টজনক শ্বাস রোধের ব্যাপার হবে তা বোধ হয় তাঁরা অনুধাবন করতে পারেন নি।

যাই হোক, মহাত্মাজীর থাকার ব্যবস্থা করে দিয়ে আমি আমার বোনের বাড়ীতে রাত কাটালাম।

পরদিন খুব ভোরে কয়েকজন কৌতুহলাক্রান্ত যুবক মহাত্মাজী খদ্দরের মশারির নীচে কি ভাবে রাত কাটালেন তা দেখতে মহারাণী হেমন্তকুমারীর গৃহে গিয়ে দেখেন প্রাসাদের দক্ষিণ দিকে উন্মুক্ত বারান্দায় বিলাতী নেটের মশারি খাটিয়ে মহাত্মাজী ঘুমুচ্ছেন। দক্ষিণ দিকে বিশাল পদ্মা বয়ে চলেছে।

প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে আমি মহারাণী হেমন্তকুমারী দেবীর প্রাসাদে পৌছে দেখলাম মহাত্মাজী একটি বৃহৎ কামরায় ফরাশের উপর হেলান দিয়ে বসে আছেন। তখনই কয়েকজন দর্শনপ্রার্থী উপস্থিত হয়েছেন দেখলাম। ক্রমে ভিড় বাড়তে লাগল। সমবেত ভদ্রলোকদের মধ্যে দীঘাপাতিয়ার কুমার হেমেন্দ্রকুমার রায়ও ছিলেন! আমিও তাঁদের মধ্যে গিয়ে বসলাম। আমার পাশেই বসেছিল রাজসাহীর নব্য উকিল শিশিরকুমার ঘোষ। শিশির আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, দাদা, মহাত্মাজীকে খদ্দরের মশারির কথা জিজ্ঞাসা করি না কেন? আমি বললাম, করে দেখতে পার। তখন শিশির মহাত্মাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে তিনি খদ্দরের মশারি ব্যবহার না করে বিলাতী মশারি ব্যবহার করেছেন, এটা কি কংগ্রেসের প্রস্তাবের বিরুদ্ধাচারণ নয়? মহাত্মাজী উত্তর দিলেন যে খদ্দরের মশারি ব্যবহার করলে তাঁর পক্ষে ঘুমানো অসম্ভব হত। নেটের মশারির ব্যবহার কংগ্রেসের প্রস্তাবের পরিপন্থী নয়, কারণ, কংগ্রেসের প্রস্তাব কেবল পরিধেয় বস্ত্র সম্বন্ধে প্রযোজ্য।

দেশবন্ধুর স্মৃতি রক্ষার জন্য মহাত্মাজীর তখনকার পরিকল্পনা ছিল, দেশবন্ধুর গৃহে নার্স ট্রেনিং-এর জন্য স্কুল স্থাপন করা। তিনি সে সম্বন্ধে আলোচনা করতে লাগলেন। আলোচনার সময় কুমার হেমেন্দ্রকুমার মন্তব্য করলেন যে নার্সরা তাদের চরিত্র ঠিক রাখতে পারেন না, এই কারণে কোন ভদ্রলোক তাঁর মেয়েকে সেখানে পাঠাবেন না। মহাত্মা বললেন যে এই কারণেই তিনি চান যে কুমারের মত সম্রান্ত ঘরের মেয়েরা ঐ শিক্ষায়তনে ভর্ত্তি হোক। কুমার প্রত্যুত্তরে বললেন যে তাঁর মেয়ে ঐ স্কুলে গেলে তারও এই পরিণতিই হবে। মহাত্মা আর কিছু বললেন না।

---

1 I canot keep my daughter unmarried because of the lustful eyes of the youth of Bengal.

সেই দিনই অপরাহ্নে মহারাণী হেমন্তকুমারী দেবীর ভবনের দক্ষিণ দিকে পদ্মার ধারে অবস্থিত পাঁচ আনির মাঠে (হেমন্তকুমারী দেবী পুঁঠিয়া রাজবংশের পাঁচ আনার মালিক, এই কারণে তাঁকে পাঁচ আনির জমিদার বলা হত এবং তাঁর বাসার সম্মুখস্থ মাঠ পাঁচ আনির মাঠ রূপে পরিচিত ছিল) রাজসাহী জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ হারাণ চক্রবর্তীর সভাপতিত্বে একটি বিপুল সভার অধিবেশন হয়। সেই সভায় মহাত্মাজী দেশবন্ধু স্মৃতি রক্ষার জন্য অর্থের আবেদন করেন এবং প্রচুর অর্থ ও অলঙ্কার সংগৃহীত হয়।

সন্ধ্যার পর কাশিমপুরের জমিদারের রাজশাহী ভবনে মহিলাদের জন্য পৃথক সভা আহ্বান করা হয়। সেখানে আমি উপস্থিত ছিলাম না। মহিলারা অকাতরে অর্থ ও অলঙ্কার দান করেন।

পরদিন প্রাতঃকালে মহাত্মাজী রাজশাহীর বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি পরিদর্শন করেন। উক্ত সমিতির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মশায় সমিতিতে রক্ষিত ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলি ঘুরে ঘুরে দেখান। মাহিসন্তোষের ভগ্ন মসজিদ হতে প্রাপ্ত একটি কষ্টিপাথরের ভগ্নাবশেষ দেখালেন। সেটি একটি হিন্দু দেবমূর্তি। মূর্তির অপর দিকে খুঁজে ফরাসী অক্ষরে ইসলামের বাণী লিখা ছিল। মূর্তিটি মসজিদের দেওয়ালের প্রোথিত ছিল। ফরাসীতে লিখিত ভাগটি বাইরে থেকে দেখা যেত। এইটি দেখিয়ে অক্ষয়বাবু মহাত্মাকে বললেন যে এই সমস্যার সমাধানের ভার আপনার হাতে। মহাত্মাজী পরিদর্শকের খাতায় মন্তব্য লিখে তারপর রাজসাহী পাবলিক লাইব্রেরি পরিদর্শন করলেন। এই উভয় স্থান পরিদর্শনের সময় উপস্থিত ছিলেন সস্ত্রীক জেলার জজ সাহেব কে. সি. নাগ (পরবর্তীকালে হাই কোর্টের জজ হন।)

সেই দিনই অপরাহ্নে রাজসাহী থেকে মোটর গাড়ী করে মহাত্মাজী নাটোরে আসেন। সেখানে কোন সভা সমিতির আয়োজন করা হয় নি। তার সময়ও ছিল না। মহাত্মাজী কেবল নাটোর বার লাইব্রেরীতে উপস্থিত হয়ে উকিল ও মোক্তারদের সঙ্গে আলোচনা করেন এবং তাঁদের নিকট দেশবন্ধুর স্মৃতি রক্ষার তহবিলের জন্য অর্থ সংগ্রহের জন্য অনুরোধ করেন।

(৯)

দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি পর্য্যালোচনার জন্য অল-ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির ওয়ার্কিং কমিটির একটি অধিবেশন ১৬ই জুলাই কলকাতায় আহ্বান করা হয়।

ঐ ১৬ই জুলাই তারিখেই অল-ইণ্ডিয়া স্বরাজ্য পার্টির কার্য্যকরী সভায় পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু স্বরাজ্য দলের নেতা নির্বাচিত হলেন।

ওয়ার্কিং কমিটির সভা ১৬ই জুলাই আরম্ভ হলে প্রথমেই দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা হল।

তারপর ভোটাধিকারের জন্য সুতা কাটার শর্ত সংশোধনের জন্য আলোচনা আরম্ভ হল। যাঁরা এই আলোচনায় যোগদান করেছিলেন তাঁদের মধ্যে কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু, এন্ সি কেলকার, শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু, আনে ভারুচা এবং সোয়েব কুরেশীর নাম উল্লেখযোগ্য।

আলোচনার পর ঠিক হল যে এই প্রশ্নের মীমাংসার জন্য অল-ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির সভা আহ্বান করা হবে।

১৭ই জুলাই স্বরাজ্য পার্টির কাউন্সিলের সদস্যরা সুধীরচন্দ্র রায়ের বাড়ীতে মিলিত হয়ে—কংগ্রেসের ভোটাধিকারের জন্য সুতাকাটার শর্ত বাতিল করার জন্য আলোচনা হল। অধিকাংশ সদস্য প্যাক্ট প্রতি-পালনের পক্ষে মত দিলেন এবং বললেন যে অন্ততঃ পুরো এক বৎসর প্যাক্ট মেনে চলা এবং সেই কারণে আগামী কংগ্রেসের অধিবেশন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা প্রয়োজন। অনেক সদস্য, তাঁদের মধ্যে মহারাষ্ট্রের সদস্য সংখ্যাই বেশী, অবিলম্বে কংগ্রেসের ফ্র্যানচাইজের জন্য সুতা কাটার শর্ত লোপ করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করলেন।

কংগ্রেসের সভাপতি মহাত্মা গান্ধী উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি ঘোষণা করলেন যে যদি তাঁরা ভোটাধিকারের উক্ত শর্ত বিলোপ করতে চান তা হলে তিনি তৎক্ষণাৎ তা মেনে নেবেন এবং এই জন্য অবিলম্বে অল-ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটীর সভা আহ্বান করবেন কিন্তু তাঁর পক্ষে একটা পথই উন্মুক্ত থাকবে তা হলো, অল্-ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটীর সভাপতির পদ ত্যাগ করে পৃথক ভাবে চরকা ও খদ্দর প্রচারের জন্য কাজ করা। তিনি জানালেন যে তিনি প্যাক্ট বাতিল করতে এবং কংগ্রেস ম্যানডেটের (নির্দেশের) দায় থেকে স্বরাজীদের সম্পূর্ণ মুক্ত করে দিতে রাজি আছেন। প্যাক্টে—স্বরাজীদের পক্ষে ভোটাধিকারের জন্য সুতা কাটার শর্ত এক বৎসরের জন্য প্রতিপালন করা বাধ্যতামূলক—ছিল এই কারণে অনেকে তা পুরো এক বৎসর পালন করতে চান কিন্তু অধিকাংশ সদস্য এর বিলুপ্তি চান তা হলে তাঁদের মতের প্রতি শ্রদ্ধা দেখিয়ে প্যাক্ট বাতিল করতে হবে।

উপসংহারে তিনি বললেন যে যদি কংগ্রেস ভোটাধিকারের জন্য সুতা কাটার শর্ত বাতিল করে তা হলে তিনি দেশবন্ধু দাশ যেমন কংগ্রেসের ভিতর থেকেও স্বরাজ পার্টী সৃষ্টি করে তার জন্য কাজ করেছিলেন তদস্বরূপ তিনিও কংগ্রেসের ভিতর থেকে সুতাকাটার জন্য একটি পৃথক সংস্থা গঠনে করে কাজ করে যাবেন।

এষম্বন্ধে অনেকে জল্পনা কল্পনা করলেন কিন্তু দেখা গেল যে প্রায় সকল সদস্যই ভোটাধিকারের জন্য সুতা কাটায় শর্ত বিলোপ করার বিরুদ্ধে। কাটা সুতার পরিমাণ নির্দ্ধারণের জন্য মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু এবং এন্. সি. কেলকারকে নিয়ে একটি কমিটী নিযুক্ত করা হল এবং কমিটীকে আর একজন সদস্য গ্রহণ করার ক্ষমতা দেওয়া হল। পরিশেষে স্থির হল যে সুতাকাটার শর্ত সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনার জন্য সেপ্টেম্বর মাসের শেষে অথবা অক্টোবর মাসের প্রথমে অল-ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটীর সভা আহ্বান করা হবে।

সভার কার্য শেষ হলে মহাত্মাজী পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর নিকট একটি নোট পাঠিয়ে জানালেন যে যেহেতু কংগ্রেসের স্বরাজীরা সংখ্যা-গরিষ্ঠ এবং যেহেতু পণ্ডিতজী স্বরাজ্য দলের সভাপতি অতএব তাঁর পক্ষে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর সভাপতির পদ গ্রহণ করা উচিত। তিনি আর এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতি থাকতে ইচ্ছুক নন।

এই নোটের ফলে স্বরাজীদের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা দিল কারণ অধিকাংশ সদস্যই মহাত্মাজীর উপদেশের সুযোগ হারাতে চান না। যাই হোক, শেষ পর্য্যন্ত স্থির হল যে অন্ততঃ এক বৎসর শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত মহাত্মাজীই অল-ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি থাকবেন। অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটীর পরবর্তী অধিবেশনে যদি ভোটাধিকারের জন্য সুতাকাটার শর্ত পরিত্যক্ত হয় তা হলে তিনি সভাপতির পদ ত্যাগ করবেন এবং সুতাকাটার জন্য একটি পৃথক প্রতিষ্ঠান গঠন করবেন।

(১০)

এদিকে কানপুর কংগ্রেসের জন্য তোড়জোড় চলতে লাগল।

অন্ধ্র প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটী কংগ্রেসের সভাপতি পদের জন্য তাদের নেতা কোণ্ডা ভেঙ্কটাপ্পার নাম সুপারিশ করল।

মারাঠী মধ্যভারত কংগ্রেস কমিটী, অরবিন্দ ঘোষ, লালা লাজপত রায়, নৃসিংহ চিন্তামণ কেলকারের নাম সুপারিশ করল।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটী ১৯শে জুলাই কংগ্রেস সভাপতির পদের জন্য শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু এবং কেলকারের নাম সুপারিশ করল।

২২ই জুলাই কেরল কংগ্রেস কমিটী অরবিন্দ ঘোষ, শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার এবং শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর নাম সভাপতি পদের জন্য সুপারিশ করেন।

২৬শে জুলাই সভাপতির পদের জন্য গুজরাট প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটী একমাত্র শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর নাম প্রস্তাব করে।

বিহার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটী ৩০শে জুলাই সভাপতি পদের জন্য মজহর-উল্ হক, ব্রজকিশোর প্রসাদ এবং সরোজিনী নাইডুর নাম প্রস্তাব করে।

শ্রীঅরবিন্দ কানপুর কংগ্রেসের অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদককে এক পত্র লিখে অনুরোধ করলেন যেন তিনি বিভিন্ন প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীকে তাদের সুপারিশ থেকে তাঁর (শ্রীঅরবিন্দের) নাম প্রত্যাহার করতে লেখেন। শ্রীঅরবিন্দ দুঃখের সহিত জানালেন যে তাঁর পক্ষে সমস্ত বৎসর কংগ্রেসের সভাপতিত্বের দায়িত্ব পালন করা সম্ভব হবে না।

কানপুর কংগ্রেসের অভ্যর্থনা সমিতি ১লা অক্টোবর চূড়ান্ত ভাবে কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচন করে। প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিগুলির ১০টি কমিটির সুপারিশ শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর জন্য হয়েছিল সুতরাং পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুর প্রস্তাবে শ্রীমতী নাইডু নির্বাচিত হন।

(১১)

দেশবন্ধুর তিরোধানের জন্য শোক সামলাতে না সামলাতে বাংলাদেশের উপর তথা ভারতের উপর আর একটি শোকের ছায়া পড়ল। ৬ই আগষ্ট দ্বিপ্রহরে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর মণিরামপুরের (বারাকপুর) নিজ বাসভবনে অন্তিম নিশ্বাস ত্যাগ করলেন।

৬ই আগষ্ট হাইকোর্টের বার এসোসিয়েশনে ফোনে খবর এল যে সুরেন্দ্রনাথের অন্তিম সময় উপস্থিত। সংবাদ পাওয়ামাত্র স্যর প্রভাসচন্দ্র মিত্র বারাকপুর যাওয়া স্থির করলেন। ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী ও আমি তাঁর সঙ্গী হলাম। প্রভাসবাবুর মোটরকারে আমরা যখন সুরেন্দ্রনাথের ভবনে উপস্থিত হলাম তখন সব শেষ। বাড়ীর কোন শোকের চিহ্ন লক্ষ্য করলাম না। দোতলায় তাঁর দেহ শয্যায় শয়নাবস্থায় রয়েছে। মনে হল যেন তিনি নিদ্রিত অবস্থায় রয়েছেন। তাঁর দেহে কোন প্রকার বৈলক্ষণ্য দেখা গেল না।

প্রশস্ত বারান্দার দক্ষিণ দিকে চারুচন্দ্র ঘোষ (পরবর্তীকালে স্যর উপাধি প্রাপ্ত এবং কলকাতা হাইকোর্টের জজ), সুরেন্দ্রনাথের অন্যতম জামাতা যোগেশচন্দ্র চৌধুরী প্রভৃতি কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সমবেত হয়েছেন। কোথাও কোন শোকের চিহ্ন নেই কেবল সুরেন্দ্রনাথের শয়নকক্ষের পাশের এক ঘরে তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা ব্যায়ামবীর জিতেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় আকুল হয়ে বালকের ন্যায় হাউ হাউ করে কাঁদছেন।

অপরাহ্নে সুরেন্দ্রনাথের মরদেহ তাঁর গৃহের পশ্চিমে ভাগীরথীর পূর্বতীরে অল্প লোকের সমাবেশে ভস্মীভূত হল। পরে তাঁর চিতার উপর একটি মর্মর মূর্তি স্থাপিত হয়েছে।

সুরেন্দ্রনাথের পরলোক গমনের সংবাদ দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। কলকাতায় এবং বাংলা ও ভারতের বিভিন্ন স্থানে শোকসভা আহুত করে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ প্রদান করা হল।

(১২)

পূর্ব ব্যবস্থা মত অক্টোবর মাসের গোড়ার দিকে পাটনা শহরে অল-ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটীর অধিবেশন মহাত্মা গান্ধীর সভাপতিত্বে আরম্ভ হল।

পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু একটী সুদীর্ঘ প্রস্তাব উপস্থিত করলেন।

এই প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে কংগ্রেস সংবিধানের ৭নং ধারা এমনভাবে পরিবর্তন করা হোক যাতে ২০০০ গজ সমভাবে হাতে কাটা সুতা অগ্রিম জমা দিলে প্রত্যেকে কংগ্রেসের সদস্য হতে পারবে এবং উক্ত পরিমাণ সুতা সর্বভারতীয় কাটুনী সংঘের (অল-ইণ্ডিয়া স্পিনার্স এসোসিয়েশন) নিকট অথবা তার মনোনীত কোন সংস্থায় জমা দিয়ে উক্ত এসোসিয়েশনের সেক্রেটারীর নিকট হতে প্রাপ্ত সার্টিফিকেটের বলে সকলে কংগ্রেসের সদস্য হতে পারবে।

প্রস্তাবে আরও বলা হয়েছে যে মহাত্মা গান্ধী ও স্বরাজপার্টীর পক্ষে পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের মধ্যে চুক্তির ফলে বিধান সভা সম্বন্ধে

যে বাধাগুলির সৃষ্টি হয়েছিল তা বাতিল করা হোক এবং এখন থেকে কংগ্রেস প্রধানতঃ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ করুক।

অল-ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটী আরও প্রস্তাব করছে যে কংগ্রেস এখন থেকে সেই সকল রাজনৈতিক কাজ করবে যা দেশের স্বার্থের জন্য প্রয়োজন। এবং সেই উদ্দেশ্যে খদ্দরের কাজের জন্য বিশেষ অর্থ রক্ষিত রাখা হবে তা ছাড়া সমুদয় সংগঠন এবং তহবিল কংগ্রেসের কাজে ব্যবহৃত হোক।

এতে আরও বলা হয়েছে যে স্বরাজ্য পার্টি'র নীতি অনুসারে বিধানসভার কাজগুলি পরিচালিত হবে। অবশ্য সময়ে সময়ে কংগ্রেস এই নীতি পরিবর্তন করতে পারবে।

প্রস্তাব দ্বারা একটি পৃথক সুতা কাটার প্রতিষ্ঠান অল-ইণ্ডিয়া স্পিনার্স এসোসিয়েশন বা সর্ব ভারতীয় কাটুনী সংঘ গঠন করা হল।

আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন মহাত্মা গান্ধী, মৌলানা মহম্মদ আলী এবং শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু।

প্রস্তাবটি সমর্থিত হয়ে গৃহীত হল।

অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি মহাত্মা গান্ধী বিহারের বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করেন।

নভেম্বর মাসের শেষের দিকে জয়াকর, কেলকার, প্রভৃতি স্বরাজ্য দলের নেতা পারস্পরিক সহায়তায় একটি নূতন দল সৃষ্টি করে তার নাম দেন রেস্‌পন্‌সিভ কো-অপারেশিষ্ট দল।

এই রকম পটভূমিকায় কানপুর কংগ্রেসের অধিবেশন আরম্ভ হ'ল।

ক্রমশঃ

মুজিবরের মুক্তি ও পরবর্তী ঘটনা

রমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ইতিহাসে একটি প্রশ্নের উত্তর কোনদিনই পাওয়া যাইবে না, মুজিবরের জীবন রক্ষা করিল কে ?

দাবীদারের সংখ্যা খুব বেশি নয়, তবু সঠিকভাবে বলা কঠিন এ-বিষয়ে কৃতিত্ব কাহার।

কেহ হয়ত বলিবে ইন্দিরা গান্ধী, কারো মতে ইয়াহিয়া, কেহ ভুট্টোর পক্ষে রায় দিবে, আবার কেহ বলিবে নিক্সন। আর প্রত্যয়দীপ্ত অগণিত জনগণের মতে এ-প্রশ্নের উত্তর একটা প্রতি-প্রশ্নে জিজ্ঞাসিত হইবে—মুজিবরকে মারে কে ?

মুজিবরকে বাঁচাইবার সবচেয়ে বেশি চেষ্টা যে ইন্দিরা গান্ধী করিয়াছেন তাহা সন্দেহাতীত। দিকে দিকে তাঁর দূত প্রেরিত হইয়াছে, ভারত পৃথিবীর সকল রাষ্ট্রের সহিত যোগাযোগ সংরক্ষণ করিয়া চলিয়াছে—তবু বেশ সঠিকভাবেই বলা যায় শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর চেষ্টা এ-বিষয়ে কিছুমাত্র কার্য্যকর হয় নাই।

পাকিস্থানের বর্তমান প্রেসিডেন্ট ভুট্টো মুজিবরের জীবন রক্ষা করিতে পারেন এমন একটা ধারণা মাথায় আসা অসঙ্গত নয়। কারণ যে পদে তিনি অধিষ্ঠিত তার পক্ষে মুজিবরকে বাঁচানো কিছুমাত্র অসম্ভব নয়।

আমার মনে হয় যেদিন ঢাকা শহরে (২৫শে মার্চ ১৯৭১) পাকিস্থানী সৈন্যদের তাণ্ডবলীলা আরম্ভ হইল সেদিন যদি ইয়াহিয়ার পরিবর্তে ভুট্টো প্রেসিডেন্ট থাকিত তবে ভুট্টো সেইদিনই মুজিবরকে মারিয়া ফেলিত সগৌরবে সদম্ভে ও সর্বলোচনের সমক্ষে। যেমনটি তিনি করিয়াছিলেন ভারতীয় ফক্কার প্লেনের ধ্বংস-লীলায়। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে ভুট্টো এই সময় প্রেসিডেন্ট নন; মুজিবরকে হত্যা করিবার উপদেশ তিনি দিতে পারেন কিন্তু মুজিবরকে মারিয়া ফেলিবার অধিকার তখন তাঁর ছিল না। সে-বিষয়ে অধিকারী ছিল একমাত্র ইয়াহিয়া। এবং পরবর্তী ঘটনায় প্রকাশ, ইয়াহিয়া মুজিবরকে বন্দী করিয়া করাচীতে পাঠাইয়া দিয়াছিল। অর্থাৎ উত্তেজনার মুহূর্তে মুজিবরকে হাতের মুঠিতে পাইয়াও যে তার অনিষ্ট সাধন করে নাই সে ব্যক্তি ভুট্টো নয়, সেই ব্যক্তি ইয়াহিয়া।

মুজিবরকে করাচী পাঠাইবার উদ্দেশ্য হইল, প্রয়োজনে তাকে কাজে লাগানো। করাচীতে তাকে হত্যা করিবার প্রশ্নই উঠে না, বরং তাকে বাঁচাইয়া রাখিবার প্রশ্নই পাকিস্থানের পক্ষে সমীচীন।

মুজিবরকে বাঁচাইয়া রাখিবার প্রশ্ন আরও জোরালো হইল ভারতীয় সৈন্যের বাংলাদেশ দখলে ও পাকিস্থানী সৈন্যদের পরবর্তী আত্মসমর্পণে। এই সময়েও মুজিবরকে মারিয়া ফেলিবার প্রশ্ন উগ্র নয়, বরং তাকে বাঁচাইয়া রাখিবার চেষ্টাই পাকিস্থানের একমাত্র চিন্তনীয়।

এই সময়ের কিছু পরে ইয়াহিয়া বিতাড়িত ও ভুট্টো তৎস্থলাভিষিক্ত।

এই সময়ে মুজিবর একান্তভাবে ভুট্টোর অধীন। ইচ্ছা করিলে এই সময় ভুট্টো মুজিবরকে অনায়াসে মারিয়া ফেলিতে পারিত। কিন্তু মনে হয় ভারত কর্তৃক বাংলাদেশ অধিকারের পর হইতে ভুট্টো আর এক ভুট্টো হইল। অর্থাৎ বালক ভুট্টো সাবালক হইল। পাকিস্থানের বৈদেশিক মন্ত্রিত্বের কালেও ভুট্টো বালকই ছিল। তা না হইলে ভারতের বৈদেশিক মন্ত্রীকে অকথ্য ভাষায় গালাগালি করিতে পারিত না, ভারতীয় ফক্কার প্লেন নিয়া একটা হাস্যকর বোকামি ও ছেলে-মানুষি করিতে পারিত না। তার প্রকৃত বোধোদয় হইল যখন U. N. O.তে ceasefire প্রস্তাব সোভিয়েট প্রতিনিধি কর্তৃক বাতিল হয়। সোভিয়েট প্রতিনিধির

উক্তির ভাষা লক্ষণীয়—The time for ceasefire is not yet come। অর্থাৎ ভারত ceasefire করিবে নিশ্চয় কিন্তু সেই সময় এখনও অনাগত। উক্তির প্রতিটি শব্দ লক্ষণীয়। বাংলাদেশ তখনও ভারতের অধিকারে আসে নাই এবং পাকিস্থানী সৈন্য তখনও আত্মসমর্পণ করে নাই। ইহাই উক্তিটির পিছনে আছে।

U.N.O.-র প্রস্তাব যখন সোভিয়েটের বিরোধিতায় অগ্রাহ্য হইল তখন ভুট্টো পাকিস্থানের প্রতিনিধি হিসাবে সংসদে উপস্থিত এবং অনেকের মতে বালকের মত কাঁদিয়া-কাটিয়া প্রস্তাবপত্র যখন সে ছিঁড়িয়া-ছুঁড়িয়া সভাকক্ষ ত্যাগ করিল তখন হইতে ভুট্টো হইল সাবালক; এবং সে পরিষ্কার বুঝিতে পারিল, পাকিস্থান যখন বিদেশী রাষ্ট্রের উস্কানিতে ভারত-বিদ্বেষী উন্মাদনায় নিজেদের অশেষ ক্ষতি সাধন করিয়া চলিয়াছে এবং একান্তভাবে পরনির্ভরতাকেই প্রাণপণে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে, তখন ভারতবর্ষ বিব্রত ও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াও নীরবে গোপনে শক্তিবৃদ্ধি করিয়া চলিয়াছে, যার ফল হইল পাক-ভারত তৃতীয় যুদ্ধে ভারতের বিজয় ও পাকিস্থানের শোচনীয় পরাজয়।

এই ব্যাপারেই ভুট্টো পাইল শিমলা চুক্তি গ্রহণ বিষয়ক সদ্‌বুদ্ধি। এই আঘাত না পাইলে ভুট্টো আজীবন বালকই থাকিয়া যাইত।

ধীরে ধীরে ভুট্টোর হাতে সর্বময় কর্তৃত্ব আসিয়া পড়িল পাকিস্থানের প্রেসিডেন্ট হওয়াতে। ভুট্টোর আশাতীত খুশী হইবার কথা কিন্তু সে পুরো খুশী হইতে পারিল না; কারণ বাংলাদেশবর্জিত পাকিস্থান তার কাম্য ছিল না। আর প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশই বৃহত্তর পাকিস্থান, জনসংখ্যায় ও ব্যবসায়জাত সম্পদে। বাংলাদেশ এখন দুর্বল ও অসহায় বটে, কিন্তু এই দুর্বলতা ও আর্থিক অসম্পন্নতা চিরস্থায়ী নয়। অচিরে বাংলাদেশ একটি সমৃদ্ধ, উন্নত ও বিশিষ্ট দেশ হিসাবে বিশ্বে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবে।

সম্ভাব্য সেই উন্নত ও সমৃদ্ধ রূপ ভুট্টোকে ঈর্ষান্বিত করিয়া চিন্তিত করিয়াও তুলিল। বাংলাদেশের অগ্রগতিতে বাধা সৃষ্টি করিতে হইলে মুজিবরকে মারিয়া ফেলা দরকার; আবার সে ভাবিল, মুজিবরকে বাঁচাইয়া রাখিলেই তার অভীষ্ট পূর্ণ হইবে। কারণ বাংলাদেশ মুসলমান রাষ্ট্র, যদিও ভারতবর্ষের প্রভাবে পড়িয়া secular হিসাবে গৃহীত ও প্রচারিত। মুসলমানদের মানসিকতা ভুট্টোর অজানা নয়। মুজিবর বেশীদিন ধর্ম-নিরপেক্ষ থাকিতে পারিবে না; জনগণের চাপে অনতিবিলম্বে বাংলাদেশ স্বার্থান্ধ হইয়া ভারতকে রাতদিন তিতিবিরক্ত করিয়া চলিবে এবং ফলে ভারত-বাংলাদেশ-মৈত্রী বহুলাংশে বিযুক্ত হইবে এবং পৃথিবীর সকল মুসলমান রাষ্ট্রের মত দলাদলিতে সমর্পিতপ্রাণ বাংলাদেশ লোকক্ষয় ও শক্তিক্ষয় করিয়া পরিশেষে দুর্বল, চির-অবনতই থাকিবে।

এই চিন্তাও ভুট্টোকে প্রীত করিতে পারিল না। কারণ দুর্বল বাংলাদেশ ভারতের সম্পূর্ণ আয়ত্তে আসিয়া পড়িবার আশঙ্কা। বিশেষ করিয়া মুজিবরহীন বাংলাদেশ। তখন?

পাকিস্থানের দুই মিত্র তখন পাকিস্থানে ছুটিয়া গেল। একজন বলিল—বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিও না; ইউ এন্ ও-তে সে পথ আমি রুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিব। অন্যজন বলিল—আমার চালে একটা বড় ভুল হইয়া গিয়াছে, 7th Fleet আনিয়াছিলাম, কাজে লাগাই নাই ইলেক্শনের ভয়ে। আমার নির্বাচন পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর। নির্বাচিত হইলে ভুল আমি সংশোধন করিতে বদ্ধপরিকর। মুজিবরকে ছাড়িয়া দাও। সে দেশে ফিরিয়া যাউক; তার বিষদাঁত ভাঙ্গিবার ব্যবস্থা করিব। আমার agentরা বাংলাদেশে গোলমাল শুরু করিবে। ভারত বাংলাদেশকে শক্তিশালী ally যেন না করিয়া তুলিতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখিব। সর্বোপরি ভিয়েটনামের যুদ্ধ তুলিয়া আনিব ভারতবর্ষ ও বাংলাদেশে।

দুই জায়গায় যুদ্ধ চলিলে আমার দেশে গোলমাল হইবার সম্ভাবনা; তাই আমি ভিয়েটনাম যুদ্ধ মিটাইয়া ফেলিতে কৃতসংকল্প।

কথাটা ভুট্টো বিশ্বাস করিল, আবার অবিশ্বাসও করিল। সম্ভব মনে করিল, আবার অসম্ভবও মনে করিল। তবে যেটুকু সে বিশ্বাস করিল তাহা হইল ভারতবর্ষ ও বাংলাদেশের ক্ষতির সম্ভাবনা। প্রস্তাবানুযায়ী কাজ হইলে পাকিস্থানের চাইতে ভারতবর্ষ ও বাংলাদেশের ক্ষতি হইবে বহুগুণ বেশী; সে হিসাবে প্রস্তাব আকাঙ্ক্ষিত। ভিয়েটনামে যেভাবে বোমাবর্ষণ হইতেছে তদনুরূপ ব্যাপার সংঘটিত হইলে ভারতবর্ষের অর্থনীতি ও জীবনযাত্রা বিষয়ক যে ক্ষতি হইবে তাহা দুই দেশের অগ্রগতির পক্ষে হইবে মারাত্মক। এইসব চিন্তাই মুজিবরের মুক্তির পশ্চাতে ছিল অনুমান করি। এবং ভারতের বিরুদ্ধে নিক্সনের কঠিন মনোভাবের দৈনন্দিন প্রকাশে ভুট্টো আশাহীন হইয়াও আশ্বস্ত হইতে থাকে। মুজিবরের মুক্তিদানের প্রাক্কালে ভুট্টো একটু নাটকীয় ব্যাপার করিয়াছিল বলিয়া প্রকাশ। মুজিবরের জন্য কবর নাকি খোঁড়াও হইয়াছিল কিন্তু তাকে কবরস্থ না করিয়া লণ্ডনস্থ করা হইল। এবং এই ব্যাপারে মুজিবরের মনে যে একটু কৃতজ্ঞতা সঞ্চারিত হয় তা মুক্ত মুজিবরের উক্তিতে প্রকাশ; উহাই ভুট্টোর একমাত্র পাওনা। উপরন্তু ভুট্টো নাকি কোরান স্পর্শ করাইয়া মুজিবরের নিকট হইতে কতকগুলি মৌখিক প্রতিশ্রুতি আদায়ও করিয়া লইয়াছিল যাহার উল্লেখ করিয়া ভুট্টো পরে ইঙ্গিতে বলিয়াছে—He (Mujibar) has gone back upon his word.

এই অনুমান যদি সত্য হয় তবে বুঝিতে হইবে মুক্তি মুজিবরের চেষ্টাতেই হইয়াছে। স্থূলবুদ্ধি ভুট্টো সূক্ষ্মবুদ্ধি মুজিবরের কাছে হারিয়া গিয়াছে।

পাকিস্থানে মুজিবর সাধারণ কয়েদী হিসাবেই কারারুদ্ধ ছিলেন। যে পোশাক পরিয়া তিনি লণ্ডনে উপস্থিত হ'ন, তাহা কীটদষ্ট ও জীর্ণ ছিল বলিয়া প্রকাশ; ইহাতে ইহাই অনুমিত হয় যে নেহাৎ চাপে পড়িয়া ও দুরাশায় প্রলুব্ধ হইয়াই ভুট্টো মুজিবরকে মুক্তি দিয়াছে। মুসলমান ভুট্টোর ক্ষীণ হইলেও আশা ছিল যে মুসলমান মুজিব শেষ পর্য্যন্ত হিন্দু-ভারতের সহযোগী হইয়া মুসলমান পাকিস্থানের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবে না।

ভুট্টোর নিকট হইতে মুজিবর বিশিষ্ট কয়েদীর সম্মান পান নাই; সর্ব্বোপরি নিঃসঙ্গ ও স্বাচ্ছন্দ্যহীন সেলে সুদীর্ঘ নয়মাস কারাবাসে তাঁর প্রতি পাকিস্থানের ব্যবহার-কাঠিন্যই সূচিত করে।

উপরে যে চিন্তা ব্যক্ত তাহা বিশ্লেষণাত্মক অনুমান মাত্র এবং তাহা মুজিবের মুক্তির পরবর্তী ও শিমলা চুক্তির সহিত সংশ্লিষ্ট ঘটনা হিসাবেই গ্রহীতব্য। তবে একটা প্রশ্ন ভুট্টো শিমলা চুক্তি করিল কেন? ভুট্টো শিমলা চুক্তি করিয়াছে অবস্থার চাপে পড়িয়া; জনগণ যুদ্ধবন্দীদের মুক্তি দাবী করিয়া অনেক জ্বালাতন করিতেছিল এবং বেশীরভাগ লোক চীন ও আমেরিকার কথায় আর বিভ্রান্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত হইতে প্রস্তুত নয়। সেই কারণেই সিমলা চুক্তির উদ্ভব। আমাদের অনুমান যে ভিত্তিহীন নয় তাহা এই চুক্তির পরে ভুট্টোর দেশে প্রত্যাবর্ত্তন জনগণের অভিনন্দনে প্রমাণিত। সিমলা চুক্তি যে পূর্ণ স্বীকৃতি পাইতেছে না তার পিছনেও আছে আশানুরূপ ঘটনাবলীর সংঘটন। ভাসানির সহিত মুজিবরের সংঘর্ষ বাড়িয়াই চলিয়াছে। রায়ট হইতেছে এবং হিন্দুর প্রতি ব্যবহার কঠিন হইতে কর্কশ হইতেছে অর্থাৎ পাকিস্থানী পূর্ব্ববঙ্গ ও secular বাংলাদেশের ব্যবহারে বিশেষ তফাৎ থাকিতেছে না। মানা ক্যাম্প হইতে বাংলাদেশে বসবাসেচ্ছু দু'হাজার প্রাক্তন রেফিউজি ভারতবর্ষে বিতাড়িত হইয়াছে। এইসব ঘটনা ভুট্টোকে আশান্বিত করিয়াছে এবং এরই ফলে শিমলা-চুক্তি ব্যাপারে পাকিস্থান গড়িমসি করিয়া কালহরণ করিয়াছে, নিক্সনের পুনরায় নির্ব্বাচনের সম্ভাবনার কথা ভাবিয়া।

আমার ইউরোপ ভ্রমণ

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়

(১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত গ্রন্থের মূল ইংরেজী হইতে অনুবাদ : পরিমল গোস্বামী)

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

সপ্তম অধ্যায়

ইউরোপে

ইউরোপ মহাদেশে আমার ভ্রমণ দ্রুতগতির ভ্রমণ। অতএব যে সব স্থানে গিয়াছিলাম সেগুলি সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু বর্ণনা করিতে পারিব না। ইউরোপ হইতে যে সব টুরিষ্ট ভারতে আসে, আমি সেরূপ গুণ-সম্পন্ন ভ্রমণকারী নহি। বম্বাই হইতে ছুটিয়া কলিকাতা আসা, সেখানে একদিন থাকা, অন্যস্থানে আর একদিন থাকা, রেলওয়ে হোটেলে, অথবা কলেকটরের বাংলোয়, তরাই অঞ্চলে একটি বাঘ শিকার যাত্রা—এই সব মিলিয়া তাহার দৃষ্টির সম্মুখে এই উপকথার দেশের সকল রহস্য মেলিয়া ধরে। সে আমাদের দেশের সমস্ত কাহিনী জানিয়া ফেলে—আমাদের দেশ কেমন করিয়া গঠিত হইল, প্রাণী আবির্ভাবের পূর্ব যুগে কেমন ছিল, এদেশের জমি কেমন, উদ্ভিদ কি জাতীয়, এদেশের পর্বত, অরণ্য, সমুদ্র, নদী, দেশের সরীসৃপ প্রাণী, মাছ, পাখী, স্তন্যপায়ী জীব, মেরুদণ্ডহীন প্রাণীকুল, এদেশের বাতাস যাহাতে জীবাণু উড়িয়া বেড়ায়, এবং আরও অনেক বিষয় তাহারা জানিয়া ফেলে। এবং তুমি যদি তোমাদের ধর্ম, আচরণ, রীতিনীতি, কুসংস্কার, জীবনযাত্রা, খাদ্য পানীয়, তোমাদের চিন্তাধারা ইত্যাদি বিষয়ে নির্ভরযোগ্য তথ্য জানিতে চাহ, তাহা হইলে সে স্বদেশে ফিরিয়া গিয়াই যে বই প্রকাশ করিবে তাহা পড়িও। আমি বলিয়াছি আমি সেরূপ জিনিয়াস নহি। অতএব আমার আলোচনা সংক্ষিপ্ত হইবে।

১৮৮৩ সনের ১৪ই ডিসেম্বর প্রাতঃকালে মস্ নদীর উপর দিয়া 'প্রিন্সেস অভ ওয়েলস' নামক স্টীমারে রটারডাম অভিমুখে চলিতেছি। নদীর দুই পাশে সবুজ সমতল জমি। সমুদ্র হইতে এ জমি হল্যাণ্ডবাসী-দের বুদ্ধি-কৌশলে কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে। কৌশলী রাষ্ট্রনৈতিকের ন্যায় ইহারা বাতাসকে জলের অনিষ্টকর শক্তি নষ্ট করিবার কাজে লাগাইয়াছে। দেশটি উইণ্ড-মিলে ভরা। (উহারা সমুদ্র হইতে নিচু ভূমির দেশ হইতে অধিকাংশ জল পাম্প করিয়া বাঁধের বাইরে চালান করিতেছে।) দেখিলাম সকালের মৃদু হাওয়াতে উইণ্ডমিলগুলির প্রকাণ্ড পাখাগুলি ঘুরিতেছে; এই হাওয়া চালিত কলের সাহায্যে উহারা শস্য চূর্ণ করা, কাঠ চেরার কাজ প্রভৃতি করে। আমি বুঝিতে পারি না, ভারতে এই জাতীয় হাওয়া কল ব্যবহৃত হয় না কেন। ইহা অতি প্রাচীন কালের জিনিস, অতএব হিন্দুদের দৃষ্টি এড়াইয়া যাইবার কথা নহে। অবশ্যই হাওয়া কল চালাইতে আমাদের দেশে কোনও অলঙ্ঘ্য বাধা আছে।

অন্তত পক্ষে প্রাচীন কালে ছিল। আমাদের দেশের হাওয়ার গতি বারবার বদল হয়, এই জন্যই কি? কখনও হাওয়া নিস্তব্ধ, কখনও বিধ্বংসী প্রভঞ্জন, কিন্তু বর্তমানের যন্ত্রবিজ্ঞানে জ্ঞান সকল রকম বেগের বাতাসকে সমতায় আনিতে পারিবে না কেন? আমি কানপুরে একটি অ্যামেরিকান উইণ্ডমিল বসান হইয়াছে দেখিয়াছি, কিন্তু ইহার ফল কি হইয়াছে জানি না। কয়েক বৎসর পূর্বে আর একটি ছোট হাওয়া কল দেখিয়াছি বুলান্দশহরের মেলায়। যে কারিগর ইহা প্রস্তুত করিয়াছিল সে সেজন্য মহা গর্বিত। আমরা সকাল ৯-৩০এ রটারডামে পৌঁছিলাম। এটি হল্যাণ্ডের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ শহর। অনেকগুলি প্রণালি শহরকে কাটিয়া দিয়াছে, এগুলি রাজপথের কাজ করে। নদীর ধারের ছায়াবৃত বীথি বুমপিয়েজ নামে অভিহিত, কাঠ পুঁতিয়া পুঁতিয়া তাহার ভিত্তির উপর নির্মিত। এখানকার মাটি অত্যন্ত নরম, দৃঢ় ভিত্তি স্থাপন সম্ভব নহে। কাজেই ইহার ভিতর বহু কাঠ প্রোথিত করিয়া তাহার উপর অট্টালিকা নির্মাণ করা হয়। সমস্ত অ্যামস্টারডাম নগরটিই এইভাবে নির্মিত হইয়াছে। ইটালির ভেনিসও তাই। রটারডামে একটি জুওলজিক্যাল গার্ডেন ও একটি বটানিক্যাল গার্ডেন আছে। এক্সপেরিমেণ্টাল ফিলসফির জন্য একটি সমিতি আছে।

এখান হইতে আমি হারলেম শহরে আসিলাম। হল্যাণ্ডের এটি অন্যতম বড় শহর। এখানে আমার বন্ধু ভ্যান এডেনের অতিথি হইলাম। ইনি কলোনিয়াল মিউজীয়ামের ডাইরেকটর। এখানকার মিউজীয়াম দেখিলাম। ডাচ ইষ্ট ইণ্ডিজ হইতে সরকারের পক্ষ হইতে ইনি বহু মূল্যবান্ জিনিস সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন। ওলন্দাজেরা তাহাদের অধিকারভুক্ত পূর্বদেশের সকল ভূখণ্ডই "ইণ্ডিয়া" নামে অভিহিত করিয়া থাকে। জাভা, সুমাত্রা, বোরনিও, ফিলিপিন দ্বীপপুঞ্জ—তাহাদের কাছে ইণ্ডিয়া। ডাচ কলোনিয়াল মিউজীয়ামে আমি সাপের চামড়ায় প্রস্তুত নানা জিনিস দেখিলাম। ফরাসীরা এই চামড়া বাক্সের আচ্ছাদনরূপে ব্যবহার করে। চাহিদা বেশি, কিন্তু যোগান বেশি নহে। সুতরাং সাপ মারিয়া যাহারা সরকারী পুরস্কার লাভ করে তাহাদের এদিকে একটি ইঙ্গিত দিলাম। জাভা ও সুমাত্রার পাখীদের পালক হইতে নানারূপ অলঙ্করণের দ্রব্য প্রস্তুত হয়। উজ্জ্বল পালক সকলকেই আকর্ষণ করে—বাঞ্ছিত অবাঞ্ছিত সবাইকে। মহিলাদের টুপির অলঙ্কার রূপে ইউরোপে প্রচুর পালক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। দক্ষিণ ইউরোপে ইহার ব্যবসা খুব জোর চলে। আনারসের পাতার আঁশ হইতে ফিলিপিনের লোকেরা সুন্দর কাপড় প্রস্তুত করে। আমরা টাউন হল দেখিলাম, সেখানে একটি চিত্রশালা আছে। "সীজ অভ হারলেম" বা হারলেম অবরোধ নামক চিত্রখানির জন্য হারলেমের অধিবাসীগণ গর্বিত। আক্রমণকারী স্পেনীয়দের বিরুদ্ধে ঐ সময়ে স্ত্রীপুরুষ মিলিতভাবে লড়াই করিয়াছিল। এল.কস্টার ইউরোপে টাইপ-প্রিন্টিং প্রবর্তন করেন ওলন্দাজেরা এরূপ দাবি করিয়া থাকে। তাঁহার জন্যও হারলেমবাসীগণ গর্বিত, কারণ তিনি ছিলেন হারলেমবাসী। তিনি যে গৃহে বাস করিতেন, তাহার সম্মুখে তাঁহার একটি মূর্তি স্থাপিত হইয়াছে, তিনি যেখানে ব্লক-মুদ্রণের পরিকল্পনা করিয়াছিলন সেখানেও একটি স্মারক স্থাপিত করা হইয়াছে। লিনিউস তাঁহার "সিসটেমা" (শ্রেণীবিভাগ রীতি) হারলেমে বসিয়া লিখিয়াছিলেন। এখানে একটি বৈজ্ঞানিক মিউজীয়াম ও উদ্ভিদতত্ত্ব বিষয়ে একটি গ্রন্থাগার আছে। এই শেষোক্ত স্থানে আমি একটি মহিলাকে উদ্ভিদ বিষয়ে চিত্রাঙ্কন করিতে দেখিলাম। তিনি নিজে উদ্ভিদ বিজ্ঞানী। ইউরোপে বিজ্ঞান বিষয়ক জ্ঞান পুরুষদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নাই। হারলেমের পাশে পূর্বে একটি হ্রদ ছিল। ইহা হইতে জল নিষ্কাশিত করিয়া ৭০০০০ একর জমি চাষের জন্য উদ্ধার করা হইয়াছে। প্রচুর হায়াসিন্থ ও টিউলিপ ফুল এবং অন্যান্য "বাল্ব" বা কন্দ হারলেমের চারিদিকে উৎপন্ন হয়। এগুলি বিদেশে রপ্তানি করা হয়। ইউরোপে টিউলিপের জন্য এক জাতীয় মেনিয়া বা উন্মাদনা জাগিয়াছিল ২৫০ বৎসর পূর্বে।

সেই সময় ইহার একটি কপি বা মূল ৬০,০০০ টাকায় বিক্রয় হইয়াছে।

সন্ধ্যাবেলা হারলেমের কয়েকজন বৈজ্ঞানিক ভারত হইতে আগত এই ব্রাহ্মণকে দেখিতে আসিলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন সংস্কৃতে পণ্ডিত ছিলেন। আলাপ শেষ পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণ্য ধর্ম বিষয়ে আবদ্ধ হইল। আমি বলিলাম সত্য ব্রাহ্মণের কোনও বিশেষ দেশ নাই, কোনও বিশেষ মতবাদ নাই। ব্রাহ্মণ সকল দেশের। তাহার শিক্ষা বিশ্বজনীন ন্যায়ধর্ম বহুকাল পূর্বে সে আবিষ্কার করিয়াছে, সমগ্রের সে একটি অংশ মাত্র। কিন্তু সে যাহা প্রচার করিয়াছিল পৃথিবী তাহা গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত ছিল না। অতএব অকাল-বৃদ্ধির ভারে নুইয়া পড়িল। হাজার বৎসর ব্যাপী রক্ষা করিতে করিতে এমন স্তরে নামিয়া আসিল যাহাতে আলোক-ভীরুদের তাহা সহন-যোগ্য হয়। কিন্তু জ্ঞানের অগ্রগতির ফলে অবশ্যই একটা উদারতা আসিবে, যাহা অন্তত কিছুদিনের জন্য পৃথিবীর সর্বত্র বিজ্ঞান-চেতনা-সম্পন্ন মানুষের ধর্মীয় আকাঙ্ক্ষাকে তৃপ্ত করিতে পারিবে। সংস্কৃতে পণ্ডিতদের আমি বিশেষ করিয়া সাংখ্য, যোগ, বৈশেষিক পদ্ধতি এবং উত্তর মীমাংসা সযত্নে পড়িতে বলিয়াছি। কিন্তু সবার উপরে ভগবদ্‌গীতা। আমি বলিয়াছি, আমার মতে ইউরোপের পণ্ডিতগণ প্রাচীন ভারত সম্পর্কে একটা পরিষ্কার ধারণা গঠনের পথে দুইটি বাধা পাইয়াছেন। প্রথম বাধা, তাঁহাদের বিশ্বাস, পৃথিবী ছয় হাজার বৎসর হইল সৃষ্ট হইয়াছে; দ্বিতীয় বাধা, বাইবেলে কথিত দেশ-গুলির প্রতি তাঁহাদের স্বাভাবিক ঝোঁক। তাঁহারা বরং বলিবেন আমরা মনু পাইয়াছি ঈজিপ্ট হইতে, বলিবেন না ঈজিপ্ট মেনেস পাইয়াছে আমাদের নিকট হইতে। আমরা অ্যালজেব্রা আরব দেশ হইতে পাইয়াছি এ কথা তাঁহারা সহজে বিশ্বাস করিবেন, কারণ আরবরা লিখিত-ভাবে কোথাও উল্লেখ করে নাই যে উহা তাহারা ভারত হইতে পাইয়াছে। গত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে আমরাই তাঁহাদের তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব গঠন করিতে সাহায্য করিয়াছি, ইহা যে যথাযথ স্বীকার পাইয়াছে, আমি এরূপ কোথাও দেখি নাই। তাঁহারা এড্ডা ও ডের নিবেলুংগেন লিডকে আমাদের পুরাণ ও সংস্কৃত মহাকাব্য হইতে অধিক প্রশংসা করিবেন। আমার বন্ধুগণ বলিয়াছিলেন ইউরোপে আমাদের দেশ হইতে প্রচারক পাঠাইয়া ইউরোপকে আমাদের ধর্মে দীক্ষিত করা উচিত। আমি বলিয়াছিলাম, "আগে নিজেদের ঘর সামলাই। আমাদের দেশ এখন একটি যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে, আধ্যাত্মিক ও ঐহিক বিষয়ে যুদ্ধ। তবে ইউরোপের ন্যায় তাহা জমি দখলের যুদ্ধ নহে। আমাদের সমস্ত ঐহিক ব্যাপার আধ্যাত্মিকতা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে, যাহার ফলে কিভাবে বাড়ি প্রস্তুত করিতে হইবে, কি খাইতে হইবে, কি হইবে না, কোন্ ঔষধ খাইতে হইবে, কোন্‌টি হইবে না, কোন্ পানীয় গ্রহণ করিতে হইবে' কোন্‌টা হইবে না, এই কাপড় পরিবে, এইটি পরিবে না, এই তারিখে যাত্রা শুভ, এই তারিখে নহে, মৃত্যু এই স্থানে শ্রেয়: ইত্যাদি মানিয়া চলিতে হয়। কিন্তু ঐহিক দাবি এই বন্ধন হইতে আমাদিগকে মুক্ত করিতে চাহে। কিন্তু আধ্যাত্মিকতা ঐতিহ্যের এবং অলৌকিক শাস্ত্রের সম্মান বহন করিতেছে, আর ঐহিক প্রয়োজনের পিছনে আছে ভীরু সাধারণ বুদ্ধি এবং চির-সঙ্কোচ এবং চির-সন্দেহ-যুক্ত বিজ্ঞান। তথাপি ভবিষ্যতে কি ঘটিবে বলা যাইতে পারে।" আমার বন্ধু যখন আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি দেশে ফিরিয়া গেলে পৃথক থাকিব কি না, কারণ, বন্ধু বলিলেন, "তোমার চিন্তাধারা ইউরোপীয়-দের ন্যায়,—প্রাচ্য জাতীয় নহে।" আমি বলিলাম, "প্রাচ্যদিগেকে হাল্কা ভাবে দেখিবেন না। সূর্য পূর্ব দিকে উদয় হয়, ইহা আত্মিক অর্থেও সত্য। আরও পূর্ব দেশবাসী কনফিউসিয়াসকে তাঁহার শিষ্য যখন জিজ্ঞাসা করিলেন মানবের কর্তব্য কি, এক কথায় বলিয়া দিন, তাহার উত্তরে তিনি বলিলেন, "অন্যেরা তোমার প্রতি যাহা করিলে তোমার নিকট অপ্রীতিকর বোধ হয়, তুমি অন্যের প্রতি সেরূপ করিও না।" পাঁচশত ত্রিশ

বৎসর পরে আর এক বিখ্যাত প্রাচী বাসী পূর্বের বিপরীত প্রান্ত হইতে ঐ একই কথা বলিয়াছিলেন। এই দুইয়ের মধ্য দেশে, অর্থাৎ ভারতে, কনফিউসিয়াস ও খ্রীষ্টজন্মের বহু বৎসর পূর্বে আমাদের ঋষিগণ শুধু এই প্রকার উক্তিই করেন নাই, তাঁহারা আরও বলিয়াছেন, শুধু মানুষের প্রতি নহে, মৃত্যু-যন্ত্রণা-বোধ-সম্পন্ন প্রাণী মাত্রেরই প্রতি সম ব্যবহার করিবে। বহু-পদ-বিশিষ্ট কেন্নো দেখিয়াছেন? আমাদের দেশকে ইহার সহিত তুলনা করুন এবং মনে করুন আমি তাহার একখানি পা। দেহ হইতে পৃথক হইলে আমার মৃত্যু, কিন্তু যুক্ত থাকিলে আমি তাহার অগ্রগমনে সাহায্য করি। অনেক পা পূর্বে পৃথক হইয়া গিয়াছে; কিন্তু তাহারা এঞ্জিন হইতে বিচ্ছিন্ন চাকার ন্যায়, তাহার অগ্রগমনে আর সাহায্য করিতেছে না।

পরদিন মিস্টার ভ্যান এডেন আমাকে অ্যামস্টারডামে লইয়া আসিলেন। আমরা প্রথমে গেলাম ডক্টর হ্বেস্টেরমান-এর নিকট। তাঁর বয়স ৮০ বৎসর। পৃথিবীর একজন সেরা প্রকৃতি-বিজ্ঞানী। তিনি আমাকে আন্তরিকতার সঙ্গে অভ্যর্থনা করিলেন, এবং ব্রিটিশ ভারতের কি পরিমাণ উন্নতি হইতেছে সে বিষয়ে নানা প্রশ্ন করিলেন। স্থানীয় পশুশালার তিনি প্রেসিডেন্ট, সেখানে অন্যান্য অনেক পশুর মধ্যে কয়েকটি সিংহ ও শাবকসহ সিংহী দেখিলাম। ইহার পর মিস্টার স্যুইস্‌ট্রার নিকট আসিলাম, ইনি কে. জুওলজিক্যাল গার্ডেন্‌স্ নাটুরা আর্টিস মাজিস্ট্রার তত্ত্বাবধায়ক। ইঁহার পৃথিবীর বহু জাতীয় প্রজাপতির ও পোকার একটি সংগ্রহ আছে। অ্যাকোয়ারিয়ামের তত্ত্বাবধায়ক মিস্টার জি. ইয়ানসের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। অ্যামস্টারডামের এই অ্যাকোয়ারিয়ামেটি ইউরোপের মধ্যে একটি সেরা অ্যাকোয়ারিয়াম। ইহার মধ্যে দুই সারিতে লবণাক্ত জল ও সাদা জল—দুই স্থানের মাছই আছে। চার বৎসর পূর্বে মিস্টার ইয়ানসে সমুদ্র হইতে প্রয়োজনীয় জল পাইয়াছিলেন। অবিরাম স্রোত বহাইয়া ইহা রক্ষিত হইতেছে। এক দিকে এই জল পরিস্রুত হইয়া পাম্পের সাহায্যে উপরে উঠিতেছে। এখানকার সর্বাপেক্ষা মূল্যবান্ সংগ্রহশালা—এখানকার রিক্‌স মিউজীয়াম। এখানে বিখ্যাত শিল্পীদের অনেক চিত্র রহিয়াছে। রেমব্রান্টের বিখ্যাত চিত্র "নাইট ওয়াচ," "ল' কনক্রের দে মারশাঁ দ' দ্রা," "ওফেলিন দ' আমুস-তারদাম" ইত্যাদি। উত্তর সাগরের খাল ও উত্তর হল্যাণ্ডের খাল জারমান সমুদ্রের সঙ্গে অ্যামস্টারডামকে যুক্ত করিয়াছে। শহরটিও অনেকগুলি খালের দ্বারা বিভক্ত। হল্যাণ্ডের খাল ১১০ ফুট প্রশস্ত ও উত্তর সাগরের খাল ২০০ হইতে ৩৫০ ফুট প্রশস্ত। শহরটি প্রকারান্তরে ৯৫টি দ্বীপের দ্বারা গঠিত, এগুলি পরস্পর ৩০০টি সেতু দ্বারা যুক্ত। জমি নরম, তাই এখানেও বহু কাঠ পুঁতিয়া তাহার উপর নগর নির্মিত হইয়াছে। এগুলিকে পাইল বলা হয়। রাজপ্রাসাদ ১৪০০০ পাইলের উপর নির্মিত। ভিত্তি দৃঢ় হইলেও অট্টালিকা অধিক ভারী হইলে তাহার চাপে উহা নিচে নামিয়া যাইতে পারে। বৃহৎ শস্য গোলাটি ১৮২২ সনে ৩৫০০ টন শস্য সমেত এইভাবে নষ্ট হইয়াছিল। অ্যামস্টারডাম হীরক-কাটা শিল্পের জন্য খ্যাত। এই কাজে ১০০০০ কর্মী নিযুক্ত আছে, অধিকাংশই জু। কোস্টাসের প্রতিষ্ঠানটি সর্ববৃহৎ, এখানে হীরক-কাটার চাকাগুলি মিনিটে ২০০০ বার ঘুরিতেছে। এক গুনিতে যত সময় লাগে তাহার মধ্যে চাকা ৩০ বার ঘোরে।

হল্যাণ্ডের শিক্ষিতদের অনেকেই ইংরেজী ফরাসী ও জার্মান বলিয়া থাকে। বাণিজ্যের ভাষা ইংরেজী, কূটনীতির ভাষা ফরাসী এবং জার্মান শক্তিশালী প্রতিবেশীর ভাষা রূপে শেখা হয়। একজন কূটনীতিক আমাকে বলিলেন, "ফরাসী ভাষায় নিখুঁতভাবে ভাব প্রকাশ করা যায়।" আমি বলিলাম, "ইহাতেই ত অসুবিধাবোধ করা উচিত।" তিনি আমার দিকে বিস্মিতভাবে চাহিয়া রহিলেন। আমি এ কথা বলিয়াছিলাম, কারণ রাজনীতিকেরা স্পষ্ট অর্থবোধক ভাষাই ত সর্বাপেক্ষা বেশি এড়াইয়া চলিতে চাহেন। সোজাসুজি হ্যাঁ বা না বলা পরিত্যাজ্য। কিন্তু উহা

ঘুরাইয়া কৌশলপূর্ণ ভাষায় বলিলে প্রশংসার্হ হয়। কোনও কোনও ব্যক্তির এরূপ কৌশলপূর্ণ ভাষায় বলা সহজে আসে, কাহারও বা ইহা শিখিয়া লইতে হয়। ইউরোপের লোকেরা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চলে। অপরাধীকে হত্যা করা সেখানে একটি আর্ট, তেমনি সত্যকেও উহারা কৌশলে হত্যা করে। একমাত্র দলীয় সাংবাদিকতায় সত্যকে অবিজ্ঞানোচিত পদ্ধতিতে হত্যা করা চলে। অস্ত্র যত ভোঁতা হয়, তত অর্থলাভ ঘটে। আমি যে কৌশলের কথা বলিতেছি বর্বরদের তাহা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। অর্ধ বর্বর সমাজে ইহা আরম্ভ মাত্র, অত্যন্ত স্থূল, স্পষ্ট এবং তুচ্ছ ব্যাপারে উল্লাস। সভ্য সমাজে ইহা পাকা শিল্প।

অ্যামস্টারডাম হইতে প্যারিসে আসিলাম। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পরী-সুন্দরী এই-প্যারি'-সুন্দরীকে তাহার নিকুঞ্জরূপে গড়িয়া তুলিয়াছে। ইহার সমস্ত সুন্দর, ইহার সুগঠিত পার্কগুলি, ইহার ঝকঝকে পরিষ্কার পথ, সম সৌন্দর্যে গঠিত প্রাসাদগুলি পথের দুইধারে শোভা পাইতেছে। যে অলক্ষ্য সৌন্দর্য-দেবতা এই শহর গড়িয়াছেন, তাঁহাকে অনুরোধ জানাই, তিনি দয়া করিয়া আমাদের কলিকাতা শহরের উপর যে ঘৃণ্য প্রেত তাহার প্রভাব বিস্তার করিয়াছে তাহাকে তাড়াইয়া দিন, কারণ সে আমাদের শহরের দুই পার্শ্বের দুটি রেলওয়ে স্টেশনের মধ্যবর্তী যোগাযোগের ছোট পথটিও সুন্দর করিয়া গড়িতে দিতেছে না।

প্যারিসে পৌঁছাইবার পর আমি গ্র্যাণ্ড হোটেলে গিয়া উঠিলাম। প্রাচ্য দেশে রাজকীয় জাঁক শুধু রাজকীয় ব্যক্তিদের জন্যই নির্দিষ্ট। পাশ্চাত্য দেশে সেরূপ নহে, সেখানে দরিদ্রতম ব্যক্তিও একদিনের জন্যও অন্ততঃ রাজার হালে থাকিতে পারে, তাহাকে শুধু প্যারিসের গ্র্যাণ্ড হোটেলে আসিতে হইবে। এসব দেশে লোকে হোটেলে থাকাই বেশি পছন্দ করে, তাহার কারণ সভ্যতা যৌথ প্রচেষ্টায় অধিক সুবিধা পাইবার ব্যবস্থা করিয়াছে। আমার স্বদেশবাসী অনেক সময় বুঝিতে পারেন না, প্রত্যেক ইংরেজ পরিবারের নিজস্ব গৃহ নাই কেন। তাঁহাদের ধারণা দারিদ্র্যই ইহার কারণ। যথেষ্ট টাকার অভাব, ইহা মিথ্যা নহে, কিন্তু দারিদ্র্য বলিতে আমরা যাহা বুঝি ইহাদের তাহা নহে। শুধু টাকা খরচ করিয়া একখানা বাড়ি করিলেই সেখানে যথেষ্ট মনে করা হয় না, আনুষঙ্গিক অনেক বেশি খরচ করিতে হয়। আর একটা কারণ সকলের পক্ষে জমি সুলভ নহে, যাহাদের অধিকারে জমি তাহারা সহজে ইহা অন্যকে ছাড়িতে চাহে না। তদ্ভিন্ন যেমন-তেমন করিয়া একখানা চালাঘর জাতীয় ঘর তুলিয়া সেইখানেই বংশ বংশ ধরিয়া বাস করা উহাদের রীতি নহে। বাড়ি করিলে তাহা যত্নপূর্বক রক্ষা করা কি জিনিস তাহা আমরা জানি না, উহারা জানে। তাহার খরচ ও সেজন্য পরিশ্রম কম নহে। এবং আমাদের দেশের ন্যায় ওদেশে পরিবার অনুপস্থিত থাকিলে কোনও বিধবা আত্মীয়া বাড়ির তত্ত্বাবধান করিবে এমন আত্মীয়া পাওয়া যায় না। তাই উহারা বাসস্থানের জন্য মাটির গভীরে মূল প্রবেশ করায় না। উহারা নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়ায়। লণ্ডনে গ্রীষ্ম কাটাইল, হেমন্তকালে স্কটল্যাণ্ডে, কিংবা ফ্রান্সে বা জার্মানীতে,এবং শীতকালে ইউরোপে। সেজন্য নির্দিষ্ট আয়ের ব্যক্তির পক্ষে বাড়ি করা বিড়ম্বনা। আসামে ও বর্মাতে যেমন অনেক বাড়িতে তাঁত আছে, সেরূপ তাঁত রাখিয়া আমরা যেমন নিজের কাপড় নিজে প্রস্তুত করিয়া লই না, প্রয়োজন মত কিনিয়া লই, ইংরেজরাও তেমনি ব্যবসায়ী বাড়ির মালিকের বাড়ি প্রয়োজন মত ভাড়া করিয়া লয়। প্রকৃতপক্ষে ভারতে কোনও ব্যক্তির যদি একটি প্রাসাদ থাকে এবং মাসিক ২০০০ টাকা আয় থাকে, তাহা হইলে গ্র্যাণ্ড হোটেলে ৫০০ টাকায় যে সব সুবিধা ও আরাম পাওয়া যায় তাহা সে তাহার নিজের বাড়িতে পাইবে না।

আমার সঙ্গে মঁসিয়ো আরদু এবং অধ্যাপক বেলোর জন্য পরিচয় পত্র ছিল। ইঁহারা দুইজনেই লব্ধপ্রতিষ্ঠ বিজ্ঞানী। আমার সঙ্গে আরও জীববিজ্ঞানের মিউজীয়ামের ডাইরেকটর মঁসিয়ো ক্রেমির পরিচয় করাইয়া দেওয়া হইল। ইনি বিশ্ববিখ্যাত রাসায়নিক।

ইনি ইংরেজী বলিতে পারেন না। আমাদের মধ্যে দোভাষীর কাজ করিলেন জীববিজ্ঞানের অধ্যাপক ও পরিচালক মঁসিয়ো মাক্সিম কয়নু। ইনি জাতীয় কৃষি সমিতিরও সভ্য। ডক্টর ক্রেমি আমাকে প্রীতির সঙ্গে অভ্যর্থনা করিলেন। তাঁহার তন্তু বিষয়ে খুব অনুরাগ আছে—বিশেষ ভাবে 'রিয়া' (Bœhmeria, nivea, H. and A.) সম্পর্কে। ভারতবর্ষে আমরা এই রিয়া (চায়না গ্র্যাস, অসমীয় রিহা) দ্বারা কি করিতেছি তাহা তাঁহাকে বলিলাম। আমাদের উহা হইতে তন্তু ছাড়াইবার উপযুক্ত যন্ত্র নির্মাণ করিতে পারি নাই। অনেক চেষ্টা করা হইয়াছে গভর্মেণ্ট হইতে পুরস্কার ঘোষণা করা হইয়াছে, তথাপি কোনও ফল হয় নাই।

তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি যন্ত্র লইয়া পরীক্ষার সময় উপস্থিত ছিলাম কি না। আমি বলিলাম দুইটি যন্ত্র দেখিয়াছি, এবং একটির পরীক্ষার সময় ভারত গভর্মেণ্ট কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া আমি বিচারক রূপে উপস্থিত ছিলাম। ডক্টর ক্রেমি তাঁহার সংগৃহীত রিয়া তন্তু আমাকে দেখাইলেন। আলজিয়ার্স হইতে কাঁচা বাকল তাহা হইতে প্রস্তুত বয়নের উপযুক্ত তন্তু দেখাইলেন। পরিষ্কার তন্তু, এবং এইরূপই ইহা হওয়া উচিত। সিল্কের ন্যায় দেখিতে উজ্জ্বল, অসাধারণ দৃঢ় এবং দীর্ঘ। প্রস্তুতের সময় ইহাকে অনেকগুলি রাসায়নিক প্রক্রিয়ার অঙ্গীভূত করা হইয়াছিল। ডক্টর ক্রেমি নিজেই এই প্রক্রিয়া আবিষ্কার করিয়াছেন। প্রস্তুতে কি পরিমাণ খরচ পড়ে তাহা সন্তোষজনক ভাবে জানিতে পারিলাম না, অবশেষে আমি তাঁহাকে প্রকারান্তরে বলিলাম যে রিয়া হইতে কত ভাল ভাবে তন্তু উৎপাদন করা যাইতে পারে ইহা যদি দেখাইবার জন্যই হয়, ব্যাপক ভাবে ব্যবহারের উপযুক্ত করিয়া তোলা সম্ভব না হয়। তাহা হইলে তাঁহার এত কষ্ট স্বীকার করিবার কারণ নাই, কারণ রিয়ার তন্তু কত ভাল হইতে পারে তাহা বহু পূর্বেই প্রমাণিত হইয়াছে। ডক্টর ক্রেমি স্মিতহাস্য করিয়া বলিলেন, তাঁহার পদ্ধতি শুধু যে ব্যবসার উদ্দেশ্যে সফল হইয়াছে তাহাই নহে, ইহা ইতিমধ্যেই লিল-এর কারখানায় বয়নের জন্য ব্যবহৃত হইতেছে। তিনি আমাকে আরও জানাইলেন, ইহার এত চাহিদা যে আলজিয়ার্স হইতে তাহা মিটান সম্ভব হইতেছে না। এবং ইহার শুষ্ক বল্কলের জন্য ফ্রান্সের বাজার উন্মুক্ত আছে, যে-কেহ উহা এখানে বিক্রয় করিতে পারেন। ভারত হইতে কিছু নমুনা পাঠাইলে তাহা তিনি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে রাজি আছেন। তবে ন্যূনপক্ষে ছয় টন বাকল পাঠাইতে হইবে। আমি তাঁহাকে আরও জানাইলাম, অন্য এক জাতীয় গাছ আছে, রিয়ার সঙ্গে তুলনীয়—'আর্টিকোস' শ্রেণীর (Maoutia Puya, Wedd) বাংলার তরাই অঞ্চলে ও আসামে প্রচুর জন্মিয়া থাকে। মিউজীয়ামের সহকারী জীববিজ্ঞানী মঁসিয়ো জুল পোয়ার্সঁ এবং অধ্যাপক ব্যুরো আমাকে রাসায়নিক গবেষণাগারটি দেখাইলেন। সেখানে ছাত্র-ছাত্রীরা নানা পরীক্ষা চালাইতেছে। তাহার পর মাইক্রোস্কোপ স্কুল দেখিলাম, সেখানেও তরুণ-তরুণীরা পর্যবেক্ষণের কাজ চালাইতেছে। প্যারিসের আরও কয়েকটি বিজ্ঞান শিক্ষালয় পরিদর্শন করিয়াছি, তাহার বর্ণনা দিবার প্রয়োজন নাই।

প্যারিসে ইডেন থিয়েটার ও নিউ অপেরা দেখিলাম। দুটিই বিরাট প্রেক্ষাগৃহ, নির্মাণে বিরাট অঙ্ক ব্যয়িত হইয়াছে। নিউ অপেরা নির্মাণে দুই কোটি টাকার উপরে খরচ হইয়াছে, শুনিলাম। আমি অভিনয় বুঝি নাই, কিন্তু নৃত্য উপভোগ করিয়াছি, দৃশ্যপট ভাল লাগিয়াছে। ইডেন থিয়েটারে বহু মেয়ে এক সঙ্গে নাচে লণ্ডনের আলহামব্রাতে যেমন। ইহাদের পোশাক দুঃসাহসিক, সোনা ও নকল রত্নখচিত—আলোয় চোখ ঝলসাইয়া দেয়। নাচিবার সময় বিভিন্ন বর্ণের আলো তাহাদের উপর নিক্ষিপ্ত হয়, তখন রূপকথার জগৎ যেন বাস্তব রূপ ধরিয়া সম্মুখে উপস্থিত হয়। বড়দিনে কলিকাতার প্যান্টোমাইমও ভাল কিন্তু তাহাতে এত অর্থব্যয় সম্ভব নহে। দুই দৃশ্যের মধ্যবর্তী সময়ে আমি একটু ঘুরিয়া বেড়াইলাম, যাঁহাদের সাহিত হেখা হইল

তাঁহারা আমাকে শ্যাম্পেন পানে অনুরোধ জানাইলেন। আমার পাগড়িকে ধন্যবাদ। কিন্তু আমি ইউরোপের কোনও ভাষা জানি না। তাঁহারা একের পর এক নানা ভাষা চেষ্টা করিলেন, আমি দুঃখের সঙ্গে ঘাড় নাড়িতে লাগিলাম এবং যে ভাষায় উত্তর দিলাম তাহা পৃথিবীর অন্য কোনও জাতি ব্যবহার করে না। তাঁহারা নিজেদের মধ্যে যে সব হাস্য পরিহাস চালাইলেন, তাহা আমি উপভোগ করিতে পারি নাই, কারণ তাহা আমার কাছে গ্রীক। বুলভার-এ বেড়াইতে গেলাম। কিন্তু তথাকার গাছগুলি তখন প্রায় সবই পত্রশূন্য। তথাপি দুই পাশের চমৎকার ফুট-পাথ- এবং সুন্দর সুন্দর দোকান ও কাফে মিলিয়া এটি পৃথিবীর একটি সেরা বীথিকা। শাঁজ এলিজেতেও গিয়াছিলাম। সদা স্ফূর্তিযুক্ত বহু লোকের ভিড়। প্রত্যেকে চমৎকার পোশাকে সজ্জিত। আমি কৃষ্ণাঙ্গদের জমকাল পোশাকের বিরোধী নহি, কিন্তু অন্য দেশ হইতে আমদানি করা বস্ত্রাদিতে রুচিভ্রম ঘটিয়াছে, স্বদেশী রুচির কোনও সমতা তাহাতে রক্ষিত হয় নাই। ইউরোপের জনসাধারণ জীবনকে উপভোগ করে, ন্যূনতম উপভোগ্যও তাহারা বেশি পরিমাণ উপভোগ করিতে জানে। আমাদের যাবতীয় দর্শনশাস্ত্র সত্ত্বেও, ইউরোপীয়গণ তাহাদের ভাবনাচিন্তাকে ভাবনাচিন্তার হাতে অনায়াসে ছাড়িয়া দিতে পারে। অনেকগুলি প্যানোরামা চিত্রও দেখিলাম। এই বিস্তীর্ণ চিত্রের একটিতে ছিল যুদ্ধক্ষেত্র, এমন বাস্তব ভঙ্গিতে চিত্রিত যে অদ্যাবধি ইহার মধ্যকার একটি রক্তাক্ত মৃত সেনাকে ভুলিতে পারি নাই।

ত্রিয়ঁফ দ' ল' এতোয়াল, নেপোলিয়নের বিজয় উপলক্ষে নির্মিত স্মৃতিতোরণ দেখিলাম। নানা দেশ বিজয়ের পরে নেপোলিয়ন যে ১২০০টি কামান হস্তগত করিয়াছিলেন, সেগুলি গলাইয়া যে কলোন্ ভাঁদোম নির্মাণ করিয়াছিলেন সেটিও দেখিলাম। ১৮৭১ সনে কমিউনিষ্টগণ বেদী হইতে স্তম্ভটিকে নামাইয়া ফেলিয়াছিল, পরে তাহা পুঃসংস্থাপিত হইয়াছে। নেপোলিয়নের দেহ বর্তমানে 'ওতেল দে অঁ্যাভালিদ্'-এ সমাহিত রহিয়াছে। এটি অক্ষম সেনাদের আবাসস্থল। মিউজীয়ামগুলির মধ্যে আমি ত্রোকাদেরো মিউজীয়ামটি দেখিয়াছি। এইখানে নানা মূর্তি ও অনেক নৃতাত্ত্বিক নমুনা রাখা আছে। আর দেখিয়াছি লুভ্‌র্ মিউজীয়াম। ইহার বহু বিভাগ ফরাসী ভাস্কর্য, চিত্রশিল্প; ইটালিয়ান, ফ্লেমিশ ও ফ্রেঞ্চ পদ্ধতির পেইন্টিং; গ্রীক, রোম্যান, ও ঈজিপশিয়ান প্রাচীন নিদর্শন সমূহ :—ভাস, মূর্তি, এবং জাহাজের মডেল। ভীনাস অভ্ মিলো এইখানে রক্ষিত আছে। পিকচার গ্যালারিটি লুভ্‌র্ মিউজীয়ামের সর্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক চিত্রশালা। 'ইম্যাকিউলেট কনসেপশন' এবং ভিখারী বালক বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। আমি বিখ্যাত 'নোত্‌র্ দাম' পরিদর্শন করিলাম। দ্বাদশ শতাব্দীতে এই ক্যাথীড্রালটি নির্মিত হইয়াছিল। ইহার প্রধান প্রবেশপথ তিনটি, এই প্রবেশপথগুলিতে নিউ টেস্টামেন্ট হইতে গৃহীত বিষয়বস্তু খোদিত আছে। প্রকাণ্ড একটি ঘণ্টা আছে। উহার নাম ল' বুর্দঁ, ওজন ৩২২ হানড্রেডওয়েট। ভিতরে ঐকতান সঙ্গীতগৃহটি বহুচিত্রশোভিত। গ্যালারিটি ১৭৭টি ভারী ভারী স্তম্ভে আলম্বিত। ইহার অর্গ্যানটিতে ৫০০০ পাইপ আছে। মেঝে মারবল পাথরের। মূর্তি-গুলির মধ্যে অশ্বারোহী শার্লমেন ও তৎসহ দণ্ডায়মান রোলাঁ ও অলিভার। নোত্‌র্ দামের নিকট পালে দ' জুস্‌টিস্ এবং লা সঁ্যাত শাপেল দেখা যাইবে। প্যারিসে যাহারা আসেন তাঁহারা বিখ্যাত শবাগারটি দেখিয়া থাকেন। পথে ঘাটে যে সব মৃতদেহ পাওয়া যায় তাহা সনাক্ত করণের জন্য এখানে রাখা হয়। পচন আরম্ভ হইলে ফোটোগ্রাফ তুলিয়া সেইগুলি টাঙাইয়া রাখা হয়। পাঁচ বৎসরের একটি ছেলের ফোটোগ্রাফও সেখানে দেখিলাম। কয়েকদিন পূর্বে তাহার দেহটি পথে পাওয়া গিয়াছিল, কিন্তু দাবিদার কেহই নাই। রাজপ্রাসাদ দেখিলাম। প্যানথিয়ন পূর্বে গীর্জা ছিল, বর্তমানে বিখ্যাত ব্যক্তিদের সমাধি স্থান। ভিক্টর হিউগোর দেহ এইখানে রহিয়াছে।

আমার গাইডকে জিজ্ঞাসা করিলাম "তোমাদের বর্তমান গভর্মেণ্ট কিরূপ মনে কর?" সে এদিক ওদিক চাহিয়া চাপা গলায় বলিল,"বর্তমান গভর্মেণ্ট সুবিধাবাদী গভর্মেণ্ট, আমি পছন্দ করি না।" সে যাহা বলিল, তাহা ভয়ে ভয়ে বলিল কেন, বুঝিলাম না। কারণ 'স্বাধীনতা, সমতা, ও ভ্রাতৃত্ব" যাহাদের নীতি সেখানে বাক্-স্বাধীনতাকে ভয় পাইবার কি আছে? ব্রিটিশ গভর্মেণ্টের অধীন আমাদের যেটুকু স্বাধীনতা আছে, ইহাদের নিজেদের গভর্মেণ্টের কাছে তাহা নাই। আমরা মধ্য যুগে বাস করিলেও তাহার ভয়াবহতা হইতে মুক্ত আছি।

প্যারিস হইতে কোলোয়ন যাইবার সময় তুষার-পাত হইতেছিল। কোলোয়নে পৌছিয়া দেখিলাম শহরটি তুষারে ঢাকিয়া গিয়াছে। বহির্দৃশ্য সবই শুভ্রতায় মণ্ডিত, মাঠ ঘাট গাছপালা ঘরবাড়ি, এমন কি কাকও শাদা হইয়া উঠিয়াছে। ওতেল দ' অলাদ-এ গিয়া উঠিলাম। হোটেলটি রাইন নদীর ধারে। শ্রীরামপুরের ধারে হুগলি নদী যতটা প্রশস্ত, রাইনও এখানে ততটা। গভীরতাও এক রকম। জল ঘোলাটে। বহু স্টীমার এ পথে যাতায়াত করে। কিন্তু কোলোয়ন অতীতে যাহা ছিল তাহার সহিত বর্তমান শহরটির তুলনা হয় না। তখন এটি 'মুক্ত' শহর ছিল। নদীর তীরে ছোট ছোট হাতে ঠেলা গাড়ি দেখিলাম, এগুলির মালিক এগুলিকে কুকুরের সহায়তায় টানিতেছে। চলিবার কালে কুকুরগুলি ক্রমাগত ডাকিতেছে। আবহাওয়া অত্যন্ত প্রতিকূল থাকাতে কোলোয়নে বেশি কিছু দেখা হইল না। মাত্র ক্যাথীড্রাল ও চার্চ দেখিলাম। সেণ্ট উরসুলা চার্চটি সুন্দর। ১২৪৮ সনে ভিত্তি স্থাপিত হয়, সম্পূর্ণ কাজ শেষ হইয়াছে ১৮৮০ সনে। লাল প্রস্তর ব্যবহৃত হইয়াছে নির্মাণে। বিরাট আকার, ক্রস্‌বিদ্ধ হইবার পরবর্তী অবস্থার একটি খ্রীষ্ট মূর্তি রহিয়াছে। ইহা পাথরে নির্মিত, জীবন্ত মনে হয়। যীশুর জন্মের পরে যে তিন-জন জ্ঞানী ব্যক্তি পূর্বদেশ হইতে তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন তাঁহাদের সমাধি এখানে রহিয়াছে। যতদূর স্মরণ হয়, আমাকে কয়েকটি মাথার খুলি দেখান হইয়াছিল, বলা হইয়াছিল সেগুলি 'মাজি' বা জ্ঞানী ব্যক্তিদের। একটি বৃহৎ টোপাজ (পোখরাজ)-এর দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। এই পাথরটি ডেভিল বা শয়তান 'সপ্তপদ' হইতে নিক্ষেপ করিয়াছিল। একাদশ শতাব্দীতে 'হান্' (হুন) নামক যাযাবর বর্বরদের হাতে ১১০০০ কুমারী বা ভার্জিন নিহত হইয়াছিল, গীর্জার প্রাচীরে তাহাদের চিহ্নাদি রাখা হইয়াছে। কোলোয়নে 'ওডিকোলোন' তৈয়ার হয়।

এখান হইতে বার্লিন রওনা হইবার সময়েও তুষার-পাত হইতেছিল। ১৮৮৬, ৩১শে ডিসেম্বরে আমি বার্লিনে পৌছিলাম। এই সময়টি অতিরিক্ত ঠাণ্ডার সময়, কিন্তু পথে আমি খুব অসুবিধা বোধ করি নাই। জার্মানির রেল কামরাগুলি বিশেষ ভাল। কামরা গরম রাখিবার ব্যবস্থা আছে, তাহাতে বেশ আরাম-দায়ক উষ্ণতা রক্ষিত হয়। তাপ-জনন ব্যবস্থার সঙ্গে কামরার দেয়ালে একটি ডায়াল সংযুক্ত আছে, তাহার হাতল ঘুরাইয়া কামরা বেশি গরম বা কম গরম করা যাইতে পারে। বার্লিনে সেণ্ট্রাল হোটেলে উঠিলাম। এই হোটেলে ৫০০টি শয়নকক্ষ আছে। প্রথম শ্রেণীর অন্যান্য হোটেলের ন্যায় এটিতেও বিদ্যুতের আলোর ব্যবস্থা আছে। পেইণ্ট করা গ্লাস এবং দেয়ালচিত্রে কক্ষগুলি অলঙ্কৃত। নানা রূপক চিত্রে শোভিত করাতে ইউরোপের সর্বত্রই একটি অনুরাগ দেখা যায়। হোটেলের সঙ্গে যুক্ত একটি বড় হল ঘর আছে, তাহার ছাত কাচের। ইহা একজাতীয় গৃহমধ্যস্থ উদ্যান। এখানে গিয়া হোটেল-বাসীরা বসিয়া কফি পান করে। এই উদ্যানের সঙ্গে যুক্ত থিয়েটার রুমে যন্ত্রসঙ্গীতের ব্যবস্থা আছে। এজন্য হোটেলবাসীদের অতিরিক্ত কিছুই দিতে হয় না। একটি ত্রুটি—এখানে গাইডের সংখ্যা একটু বেশি, তাহারা একটু অত্যাচারী বলিয়া বোধ হইল। আমার ঐখানে বাস কালে তখন রাত্রিদিন তুষারপাত হইতেছিল। কিন্তু পাইপের সাহায্যে হোটেলে ৭০ ডিগ্রী ফারেনহাইট মাত্রার তাপ সর্বদা রক্ষিত হইত। সাধারণ বাড়িতে এ

জন্য স্টোভ ব্যবহার করা হয়। ইউরোপে ইংল্যাণ্ডের মত খোলা অগ্ন্যাধার নাই, এখানে সেইরূপ পাইতে ইচ্ছা হইতেছিল। আমি হোটেলবাসী হইলেও কার্যতঃ আমি ছিলাম জার্মান সাম্রাজ্যের প্রিভি কাউনসিলর অধ্যাপক রেয়োলোর অতিথি। ইনি একজন সংস্কৃতে পণ্ডিত ব্যক্তি। ভারতের সর্ববিষয়ে তাঁহার কৌতূহল। সম্প্রতি তিনি প্রাচীনকালের শতরঞ্জ বা দাবা খেলা ও ও তাস খেলার মধ্যে একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আবিষ্কার করিয়াছেন। আমার বার্লিন থাকা কালে তিনি একটি সোনার ফলকের আকরভূমি আবিষ্কারে ব্যস্ত ছিলেন। এই ফলকটি হাঙ্গারিতে মাটির নিচে হইতে পাওয়া গিয়াছে। তিনি অনুমান করিয়াছেন এটি আগের যুগের হাতীর মাথায় ব্যবহৃত একটি অলঙ্কার। আমার মনে হয় তাঁহার ধারণা ঠিক। হানুরা তখন সেনাদলে হাতী ব্যবহার করিত এরূপ অনুমান করা অযৌক্তিক নহে। আমাদের সঙ্গে হানুদের সম্পর্ক ছিল। তাহাদের আদি ভূমি তিব্বত হউক বা না হউক, আমাদের প্রতিবেশী, হিমালয়ের মালভূমির অধিবাসীদিগকে, আমরা হুনিয়া বলিয়া থাকি। পূব দিকে চীনাদের দ্বারা পরাজিত হইয়া তাহারা পশ্চিম দিকে ইউরোপ বিধ্বস্ত করিতে যাত্রা করিয়াছিল। অস্ট্রো-হাঙ্গারির মাগিয়ারগণ তাহাদের বংশধর। আমি অধ্যাপক রেয়োলোকে, আমরা কি ভাবে হানুদের সঙ্গে সম্পর্কিত তাহা বলিলাম, এবং কি ভাবে ভারতের রাজহস্তীদের ললাট দেশ অলঙ্কৃত করিবার জন্য ঐরূপ অলঙ্কার ব্যবহৃত হইত তাহাও বিবৃত করিলাম। অধ্যাপকের সঙ্গে বার্লিনের নানা দর্শনীয় জিনিস দেখিতে বাহির হইলাম। একটি মিউজীয়ামে কতকগুলি উৎকৃষ্ট মৃৎপাত্র দেখিলাম। ইহার প্রস্তুত-পদ্ধতি লোকে ভুলিয়া গিয়াছিল, কিন্তু এক বৃদ্ধ তাহার বাল্যকালে পদ্ধতিটি দেখিয়া মনে রাখিয়াছিল, এবং তাহার নিকট হইতে শিক্ষালাভ করিয়া আধুনিক কালে পুনরায় ইহা প্রস্তুত হইতেছে। আরও বহু চিত্তাকর্ষক জিনিস দেখা হইল, এবং একটি অপেরা অভিনয়ও দেখিলাম।

ক্রমশঃ

জীবন জিজ্ঞাসা

শ্রীস্বদেশ ভূষণ ভূঞা

"ভূমিকা"

ফটোগ্রাফি আবিষ্কারের পূর্ব্বে চিত্রকর মানুষের অবিকল চিত্র অঙ্কন করতো। ফটোগ্রাফি আবিষ্কারের পর চিত্রকর দেখলো ফটোগ্রাফির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সে মানুষ গাছপালা পশু প্রকৃতির অবিকল প্রতিকৃতি আঁকতে পারবে না। তাই সে অন্য পথ ধরলো। মানুষের বহিরঙ্গের অঙ্কন না করে সে তার অন্তরঙ্গের চিত্র আঁকতে লাগলো। মানুষের অন্তরঙ্গের চিত্র আঁকার জন্যে নানা রকম symbol এর সাহায্য নিল। সে symbol বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে হয়। আধুনিক চিত্র তাই ক্রমশঃ দুর্ব্বোধ্য হয়ে উঠলো। অত্যন্ত বুদ্ধি সহযোগে না দেখলে আজকের ছবি বোঝা যায় না।

এই intellectualism শুধু চিত্রে নয়, এল কবিতায়, সাহিত্যে, চলচ্চিত্রে। সর্বত্র একটা intellectualism-এর ধারা সুরু হতে আরম্ভ করলো।

এই intellectualism মানুষকে আর একটা বোধ দিল। মানুষ বুঝলো জীবন ধারা সব সময় ছন্দময় নয়। ছন্দপতনও ঘটে। তাই এল গদ্য কবিতা।

এই intellectualism জন্ম দিল বিজ্ঞানের mathematics এর। সেই mathematics অসীম সংখ্যার গণ্ডী পেরিয়ে পৌঁছলো অসীম তত্ত্বে—Theory of Infinityতে। অসীম তত্ত্বানুসারে ১-১=০। কিন্তু Infinity বা অসীম থেকে অসীম বাদ দিলে থাকে অসীম। শূন্যকে শূন্য দিয়ে ভাগ দিলে ভাগফল ১,২,৩, সব সংখ্যাই হয়। তাহলে সেই ভাগফলগুলোও সব সমান। অর্থাৎ ১-২-৩...তার অর্থ এই যে পূর্ব্বের জানা যোগ, বিয়োগ, গুণ ভাগের ধারণা অসীম তত্ত্বে কোন কাজে লাগে না। যুক্তি বা Intellect, relativity, theory of causation কার্য কারণ সম্পর্ক সসীম জগতে সত্য অসীম জগতে নয়। বিজ্ঞান উঠে গেল দর্শনের পর্য্যায়ে। বার্ট্রাণ্ড রাসেল, আইনষ্টাইন ইত্যাদি মনীষী অঙ্কবিদও বটে আবার দার্শনিকও।

এঁরা আবিষ্কার করলেন নিউট্রন, প্রোটন তত্ত্ব। অনুকে ভেঙ্গে পরমাণুতে দেখালেন কিভাবে নিউট্রন প্রোটনকে কেন্দ্র করে অবিরত ঘুরে বেড়াচ্ছে। প্রতিটী কণা যাকে স্থাণু, স্থির মনে হয় আপাতঃ দৃষ্টিতে, সেটী কিন্তু স্থির বা স্থানু নয়। তারা অস্থির, তারা চঞ্চল। অর্থাৎ আমরা চোখে যা দেখি প্রকৃত বস্তু তা নয়। তাকে বুঝতে হলে বুদ্ধির বা Intellect এর প্রয়োগ করতে হয়।

এইভাবে Intellectualism বিজ্ঞান দর্শন শিল্প সাহিত্যকে একবিন্দুতে মিলিয়ে দিল।

কিন্তু তবু প্রশ্ন থেকে যায় এই যে নিউট্রন প্রোটনকে কেন্দ্র করে অবিরত ঘুরছে এটা কি করে ঘটছে? বিজ্ঞান দিয়ে বুঝছি, যন্ত্র দিয়ে দেখছি এই অবারিত ঘূর্ণন। কিন্তু কেন? এই ঘূর্ণনের source বা উৎস কি? কোথায়? মানুষ আজও তার সন্ধান পায় নি—এই তার জীবন জিজ্ঞাসা।

বিপাশার স্রোতের মত
পাথরে পাথরে
মাথা ঠুকে ঠুকে, ক্ষত বিক্ষত হ'য়ে হ'য়ে
জিজ্ঞেস করেছি
জীবনের অর্থ কি ?
পাইনি উত্তর।

শিলা খণ্ডে খণ্ডে
চেয়েছি জীবনের উত্তর।
পৃথিবীর আদিম সন্তান,
আমার জন্মলগ্নের বহুকাল আগে
এসেছ তোমরা পৃথিবীতে
দেখেছ অনেক মানুষের অনেক ভাঙ্গাগড়া।
বলে দাও, বলে দাও জীবনের উত্তর ,
নির্বাক্ নিস্পন্দ হ'য়ে আছ কেন নিরুত্তর।
পাইনি উত্তর।

পাইন পপলার ও দেওদার সারি সারি।
সুউচ্চ সগর্বে মাথা তুলে আছে
পৃথিবীর আদিম শৌর্য্যের মত।
উন্মত্ত উদ্ভ্রান্ত পাগলের মত
বন হ'তে বনান্তরে ছুটে ছুটে
খুঁজেছি উত্তর
তবু তারা দিল না উত্তর।

অফুরন্ত বিপাশার স্রোতে স্রোতে,
কান পেতে চেয়েছি উত্তর।
পাহাড়ের গা বেয়ে অনাদি অনন্ত কাল হ'তে
খাঁজ কেটে কেটে এ নদী বয়ে গেছে
কিন্তু তবু দিল না উত্তর।

শুধু হাহা করে হেসে হেসে
বলে গেল মূর্খ
তুই চাস জীবনের উত্তর।

পিছু পিছু ছুটে গেছি, শিলাখণ্ড ভেঙ্গে ভেঙ্গে
হাত পা গেছে কেটে, ফিন্‌কি দিয়ে ছুটেছে রক্ত
তবু পাইনি উত্তর।

শুধু ক্রন্দনরোল এসেছে ভেসে
বিপাশার স্বচ্ছ অসমতল বুক থেকে।
ক্রন্দসী কানীন কন্যা
কেন কাঁদ সর্বক্ষণ।
আদিম পর্বতমালা
রহস্যঘন ছায়া ঘেরা বনানী অঞ্চল
জান তুমি জীবন উত্তর ?
মিলিল না উত্তর।

বিপাশার কূল ধরে
সর্পিল পিচ্ছিল পথে এঁকে বেঁকে
উঠে গেছি বরফ-ঢাকা পাহাড়ের চূড়ায়
তবু দেখা পাইনি উত্তর।
তুষারের কন্যারা
আমার সমস্ত সত্তার চারিদিক
ঘিরে করে নৃত্য।
গাছে গাছে ছড়িয়ে পড়ে
আমার অন্তঃসত্তাকে
হাত ছানি দিয়ে ডেকেছে বারবার।
কিন্তু তবু প্রশ্নের দেয়নি উত্তর।
আমার জ্বালা, আমার যন্ত্রণাকে
শতগুণ বাড়িয়ে দিয়ে
গাছে গাছে বসে তারা
হি-হি ক'রে হেসেছে।
আমি মূর্খের মত ফ্যালফ্যাল
করে তাকিয়ে দেখেছি।
আর বার বার ভেবেছি
জীবন সত্যের সন্ধান যদি না দেবে
হে সুন্দরী, তবে এইখানে তোমার
তুষার অঞ্চলের অন্তঃস্থলে
আমার যন্ত্রণা দাও ঢেকে চিরকালের মত
তুষার কন্যাকুমারীর মুখের দিকে
তাকিয়ে করুণ প্রার্থনা করেছি
বলে দাও বলে দাও এ জীবনের উত্তর।
পাইনি উত্তর।

হে হিমালয়, শত শত বর্ষ ধরে
শত শত ঋষি, মহাঋষি
তপস্যা করেছে তোমার গুহায় গুহায়
জীবন সত্যের সন্ধানে।
তাই আমি ছুটে গেছি
মণিকরণের উষ্ণ-প্রস্রবণে। বশিষ্ঠের আশ্রমে।
সেখানে দেখেছি
পাহাড়ের কানায় কানায় সৌন্দর্য্যের পসরা
পূর্ণ হয়ে আছে।
কিন্তু আমি ত তা খুঁজতে যাইনি।
আমি গেছি জীবন সত্যের সন্ধানে।
যে সত্যানুসন্ধান আমার
সমস্ত সত্তাকে উত্তাল পাতাল
করে আমাকে অস্থির করে তুলেছে,
আমাকে কোথাও এক মুহূর্ত্তও
স্থির হতে দিচ্ছে না,
আমাকে অস্থির উদ্ভ্রান্ত বিবশ
করে দিয়েছে,
তার উত্তর কেউ দিল না—
না দিল বনানী, না দিল প্রস্রবিণী,
না দিল প্রস্তর,
না দিল তুষার।
একদিন মাঝ রাতে
পূর্ণিমার চাঁদ বরফ-ঢাকা
পাহাড়টার চুড়োয় যখন স্থির হয়ে
বিপাশার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল—
যেদিন বিপাশার বুক থেকে কে যেন
মায়াবিনী কুহকিনী কন্যা
আমার পাশে এসে বসে
হাতে হাত রেখে বললো কানে কানে—
"জীবনই জীবনের উত্তর। অন্য কিছু
নয়।"

আমার সমস্ত সত্তা প্রতিবাদে
যন্ত্রণায় কাতরিয়ে উঠলো।

চিৎকার করে বললাম—
এ যে কথার শুধু মার প্যাঁচ
এত আমার জিজ্ঞাসার
না অর্থ, না উত্তর।
অন্ধ আক্রোশে গেলাম তাকে ধরতে
দেখি কেউ নেই পাশে—
শুধু বিপাশার অকারণ অবারণ ক্রন্দন
আমার সমস্ত সত্তাকে
একটা বিরাট অজগর সাপের মত
জড়িয়ে ধরে
আমার যন্ত্রণাকে আরো বাড়িয়ে দিল।
শতগুণ—শতবার!
তবু তার পাইনি উত্তর।
চিৎকার করে ডাকলাম
আমার জীবন জিজ্ঞাসা,
তুমি আমারই মত
হারিয়েছ পথ
জীবনের খুঁজিতে উত্তর।
কেহ তার দিল না উত্তর।
কে যেন বলে গেছে
কে যেন কোন কবি—
জীবন শুধু প্রলাপের শূন্যধ্বনি।
যদি তাই হয় তবে
সাকী—এসো পাশে বসে
নিয়ে এসে জীবন মদিরা।
যখন পাইনের বনে
ঘন মেঘ করে আসবে
তখন তোমার অঞ্চল
দিয়ে ঢেকে দিয়ো আমায়
শীতল উত্তাপে।
আবার যখন বরফ ঢাকা
পাহাড়ের চুড়ায় জ্যোৎস্না এসে
পড়বে রাশি রাশি—
তখন আমার অধরে এঁকে

দিও একটী চুম্বনের রেখা।
তোমার কোলে যে
শিশু আসবে বর্ষ পরে
তার জন্ম বার্ষিকী পালন করো।
আমি কিন্তু পালন করবো
তার মৃত্যুবার্ষিকী—
কেন জান?—যে শিশু
এক বছর বাড়ে, সে ত মৃত্যুর দিকে
এক বছর এগিয়েও যায়।
সখি, বল ত, কুক্কুট আর
ডিমের কোনটা কারণ আর
কোনটা কার্য্য।
যখন খণ্ডিত আংশিক
দৃষ্টি দিয়ে বিচার কর
তখন পাও কার্য্য কারণের
এক সম্পর্ক।
কিন্তু যখন নিরবধিকালের
জীবন প্রবাহে
তাকে বিচার কর—
তখন কার্য্য কারণ সম্পর্ককে
দাও জলাঞ্জলি।
সখি, জীবন মরণ আমাকে
অষ্টে পৃষ্ঠে বেঁধে করছে কোলাকুলি।
আমি বেঁচে আছি এই তোমাকে ছুঁচ্ছি
আবার আমি নেইও—
মরণের অতলান্ত গহ্বরে শুয়ে আছি।
সখি, কাছে এসো, হাত ধর
মরণই জীবনের উত্তর।
আমার জীবন সত্তার
সমস্ত শক্তি দিয়ে ডাক দিলাম
জীবন—জীবন—জীবন।
পাইন দেবদারু পপলারের শ্রেণীতে শ্রেণীতে
পর্ব্বতের কন্দরে কন্দরে
প্রতিধ্বনির প্রত্যুত্তর পেলাম—
মরণ—মরণ—মরণ।
আমার সমগ্র সত্তা খান খান
হয়ে ভেঙ্গে গেল।
মৃত্যুর যন্ত্রণা নিয়ে বললাম—
না, না, না, এত স্ববিরোধ
আমার প্রশ্নের উত্তর নয়।
জীবন মৃত্যু, মৃত্যু জীবন
সব একাকার
এই কি আমার উত্তর।
সখি, আসল কথা কি জান?
তোমার খণ্ডিত আংশিক
বুদ্ধির পরিমাপে জীবনের
যে সংজ্ঞা তুমি দিয়েছ
তার সঙ্গে তুলনা করে
মৃত্যুকে মনে হয় বিপরীত
মৃত্যুকে মনে হয় বিপরীত
কিন্তু, সখি, তোমার সংজ্ঞাই
যে ভুলের পসরা।
মূর্খ পণ্ডিত, অন্ধ দার্শনিক
ভুলের পসরা নিয়ে যে কারবার করে
তারা ত জানে না আমার উত্তর।
তোমার আমার পণ্ডিতের দার্শনিকের
সব সংজ্ঞার ঊর্ধ্বে যে
সংজ্ঞাহীনতা বিরাজমান
তোমার কোলে ছুটে এসেছিলাম তাই।
কিন্তু, বিপাশা, আমার জীবন জিজ্ঞাসায়
দিলে না উত্তর।
বিপাশা, আকণ্ঠ পিপাসা আর
দগ্ধ, ভগ্ন হৃদয়ের আর্ত্তি নিয়ে
ফিরে গেলাম তোমার
উপলখণ্ড লাঞ্ছিত বক্ষ হতে।
আমার অশ্রুবিন্দু রইল তোমার অঙ্কে।
আমার হৃদয়ের এক বিন্দু রক্ত দিয়ে
এঁকে দিলাম একটী টিপ

তোমার সীমন্তে সীমন্তিনী।
আর হয়ত কখনও তোমার সঙ্গে
হ'বে না দেখা—
কারণ আমাকে যে যেতে হবে
অনেক অনেক দূর
ঘুরে ঘুরে বেড়াতে হবে ছন্নছাড়ার মত
অনেক অনেক বছর—
কেননা আমি ত পাই নি
আমার প্রশ্নের উত্তর।
আমার চলন্তিকার আশে পাশে
আমি দেখেছি সিমলা মুসৌরী,
সুন্দরী বারবনিতার মত
সাজে সজ্জায় সজ্জিত হয়ে আছে
পণ্য সম্ভারে সমৃদ্ধ হয়ে।
আলালের ঘরের দুলালেরা আসে
এখানে সারা বছরের আলস্যের শ্রান্তি
বিনোদনের জন্য
আর অপার্জ্জিত অর্থ অপব্যয়ের তাড়নায়।
আমি নেমে গেছি পাহাড়ী বস্তিতে।
দেখেছি ভারবাহী পশুর মত
মুব্জ কুব্জ মানুষগুলো বইছে ভার।
জীবন জিজ্ঞাসা ত দূরের কথা
তারা যে বেঁচে আছে এই কথাই ত
তারা জানে না।
কূর্মাবতারের মত এ পার্ব্বত্য সভ্যতার
সব ভার তাদেরই পিঠে চেপে আছে।
এরা যদি একদিন সোজা হয়ে দাঁড়ায়
তবে পাহাড়ী ধ্বসের মত, এ সভ্যতাও পড়বে
ধ্বসে।
আমাদের এ সভ্যতার কারবার
বার বার দিয়েছে আমার অন্তরাত্মাকে
ধিক্কার।
আমার জীবন জিজ্ঞাসা উলিয়ে গুলিয়ে হয়ে
গেছে একাকার।
আমি গেছি প্রয়াগ-সঙ্গম পুণ্য বারাণসীধাম
দেখিছি ধর্ম্মের অত্যাচার।
আমি গেছি হরিদ্বার।

ধর্ম্মের দেখেছি ব্যাভিচার
দেখেছি ধর্ম্মের কঙ্কাল অস্থিচর্ম্মসার
শুয়ে আছে গঙ্গার শীর্ণ শুষ্ক বক্ষে।
আমি প্রশ্ন করেছি বার বার—
জীবন জিজ্ঞাসার পাই ন উত্তর।
লাল টিব্বা থেকে মুগ্ধ হয়ে
দেখেছি হিমাল গিরি শ্রেণী—
যমুনেত্রী গঙ্গোত্রী, কেদারবদরী, নন্দদেবী।
প্রথম প্রভাতের অরুণোদয়ে
আমার সমস্ত সত্তাকে
মেলে দিয়ে জিজ্ঞেস
করেছি আমার উত্তর।
পাইন পপলারের বনের হুহুধ্বনির
মধ্যে আমি কান পেতে রয়েছি;
কিন্তু তবু মৌন মূক মুখে
তুষারমৌলি গিরিরাজ শ্রেণী
শুধু চেয়ে দেখেছে—আমাকে দেয় নি কোন
উত্তর।
আবার সূর্য্যাস্তের সোনা মেশান বিষণ্ণ
রক্তিমাভা
যখন 'তুষার শ্রেণীর বুক থেকে গিয়েও যাচ্ছে
না,
তখনও আমার অন্তরসত্তাকে তার পদপ্রান্তে
ফেলে আকুতি জানিয়েছি—
তবু পাইনি উত্তর।
আমার প্রশ্ন আমার
মধ্যে গুমরে গুমরে
উত্তাল পাতাল করে
আমাকে পথে ঠেলে দিয়েছে।
আমার প্রশ্ন নিয়ে
আমি যন্ত্রণায় কেঁদে মরছি
কিন্তু তবু, তবু পেলাম না
উত্তর।
বিপাশা, বিপাশা, তবু একদিন ছিল
যেদিন তুমি ছিলে আমার পাশে।
আজ আমি একা,
আমার সঙ্গীহীন সাথীহারা
শ্রান্ত ক্লান্ত প্রাণহীন নিঃসাড় দেহটাকে
টেনে হিঁচড়ে বয়ে নিয়ে চলেছি
কোথায়? কে জানে?
জীবন সত্যের সন্ধানে।

(৪৫২ পৃষ্ঠার পরবর্তী অংশ)

নীচে এসে পড়ছে। অবিশ্রান্ত গর্জ্জনে আমাদের কানে তালা লেগে যাচ্ছে। অনেকগুলো ফটোতে তাদের খেলা ধরে রাখলাম। জল ছিটকে এসে আমাদের শরীরগুলো সব ভিজিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। তারপর ওপরে উঠে সুড়ঙ্গ দিয়ে একেবারে জলপ্রপাতের কাছে চলে এলাম। সেখানে কতগুলি ছোট ছোট জানালা রয়েছে। সেই জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে জলপ্রপাত দেখতে গিয়ে তার জলরাশি আমাদের চোখ মুখ সমস্ত ভিজিয়ে দিয়ে গেল। এর খানিকটা জল নিয়ে মুখে দিলাম। তারপর কিছুক্ষণ সেখানে থেকে আমরা ওপরে উঠে এলাম। কিছুক্ষণ পরেই আমার স্ত্রী ও কন্যা ওপরে উঠে এলেন। স্ত্রীর মুখে চোখে কি হাসি। দেখলে মনে হয় না যে ইনি স্বামীর কাছে কখনও হাসতে জানেন না। তিনি হাসি মুখে বল্লেন যে তিনি গঙ্গা স্নান করে এলেন আর তার সঙ্গে এর জলও পান করেছেন।

ঈশ্বরের এই অভূতপূর্ব্ব অপূর্ব্ব সৃষ্টি চিরদিন চিরকাল যুগ যুগ ধরে এমনি ভাবেই বয়ে চলেছে, যুগ যুগান্ত ধরে এমনি ভাবেই বয়ে চলবে। একি কোনদিনই থামবে না? সারা ইউরোপ এশিয়া ঘুরে কত আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য জিনিষ দেখে এলাম তবুও বলতে হয় এটির সঙ্গে আর কারোও তুলনা হয় না, এ তুলনাহীন। শীতের নায়েগ্রা জলপ্রপাত আরও সুন্দর হয় শুনলাম। শীতকালে এই প্রবল স্রোত কয়েক জায়গায় জমে বরফ হয়ে যায় তখন মনে হয় স্রোতের মধ্যে কে বা কারা রৌপ্যের দড়ি দিয়ে হাজার হাজার ছোট বড় স্রোতকে বেঁধে রেখেছে। কেউ কেউ আবার বলেন যে জলরাশিগুলি বরফে জমে বটগাছের বড় বড় শেকড়ের মত সব জায়গায় ছেয়ে থাকে আর সূর্য্যের কিরণে সব জায়গাগুলো টল মল করতে থাকে। আবার কেউ কেউ বলেন যে রাতে মানুষের সৃষ্ট রঙবেরঙ-এর বিজলী বাতির আলোতে এর চেহারা একেবারে পাল্টে যায়। আমার তো মনে হয় যে দিনের আলোর নায়েগ্রা জলপ্রপাত আর পূর্ণিমা চাঁদের আলোতে উদ্ভাসিত নায়েগ্রা জলপ্রপাতের তুলনা হয় না। নায়েগ্রা জলপ্রপাতের আধমাইলটাক আগে নায়েগ্রা নদীটির মধ্যে দুটি ছোট ছোট দ্বীপ আছে একটির নাম লুনা আর অপরটির নাম গোট (goat)। এই দুটি দ্বীপ নায়েগ্রা জলপ্রপাতটিকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করেছে। প্রথমটি কানাডায় এর নাম হর্স্‌সু ফল্‌স্ দ্বিতীয়টির নাম লুনা ও তৃতীয়টির নাম আমেরিকান ফলস। শেষোক্ত দুইটি ইউনাইটেড স্টেটস্ অফ আমেরিকার মধ্যে অবস্থিত।

আমরা এতক্ষণ ধরে তন্ময় হয় যে জলপ্রপাতটি দেখছিলাম এটির নাম হর্স্‌সু ফলস (Horseshoe falls)। এটি একটি অশ্বখুরের আকৃতি নিয়েছে। আর এর জলের স্রোতটি ভেতর দিকে বেঁকে নীচে নামছে (inward curved)। এটি ২৫০০ ফুট চওড়া ও এর জল ১৬ ফুট নীচে গিয়ে পড়ছে। তারপর আমরা কানাডার টোরান্টো সহরে ডাঃ সেনের বাড়ীতে দু-রাত্রি থেকে আমরা সেখান কার দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখে ফেরবার পথে আমেরিকান ও লুনা ফলস দেখে বাড়ী ফিরি। ওঁদের ব্যবহার ও আতিথেয়তা আমাদের চিরদিন মনে থাকবে।

আমরা কানাডার সীমা পার হয়ে আমেরিকায় এসে ঢুকে আমেরিকান ফলস দেখলাম। যদিও কানাডার হর্স সু ফলসের মত এত বড় নয় তবুও এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বড় মনোমুগ্ধকর। এই ফলসটি ১০৭০ ফুট চওড়া আর তার জল ১৬৭ ফুট নীচে গিয়ে পড়ছে।

লুনা ফলসটি যেটির আর এক নাম ব্রাইডাল ভেল (Bridal veil) খুবই ছোট। নায়েগ্রা নদীর জলের ছয় পারসেন্ট জল আমেরিকান ফলসের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়ে থাকে, কিছুটা লুনার মধ্যে দিয়ে যায় আর বেশীর ভাগ জল হর্স্‌সু ফলসের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়। এর জন্যেই এর জল গাঢ় নীল দেখায়। নদীর ওপর ড্যাম তৈরী হবার পূর্ব্বে দুটি ফলস থেকে জলের পরিমান ছিল ২০৮০০ কিউ সেক (Cusec)। ১৯৫১ সালে কানাডা ও আমেরিকা গভর্ণমেন্টের সঙ্গে একটি চুক্তি সাক্ষরিত হয়েছে। এই সমস্ত জল থেকে গ্রীষ্মকালে ও দিনের

বেলায় এক লক্ষ কিউ এফ এস জল আর সন্ধ্যাবেলায় ও শীত কালে এর অর্দ্ধেক জল ৫০,০০০ কিউ এফ এস জল ইলেকট্রিসিটি তৈরীর জন্যে নেওয়া হয়। তবে প্রয়োজনে অতিরিক্ত জল নেওয়া হয়ে থাকে।

এই নায়েগ্রা জলপ্রপাতটি দেখতে প্রথমে এসেছিলেন ফ্রেঞ্চ explorers ও মিশনারীরা। ১৬৭৮ সালে ফাদার লুইস হেনিপিন ক্যাভেলিয়ার এদিকে লা সাল্লির (Lasalle) সঙ্গে এসে নায়েগ্রা জলপ্রপাতটি দেখেন। তিনি এর দৃশ্য দেখে এতই মুগ্ধ হ'ন যে বাড়ী ফিরে গিয়ে ১৬৮৬ সালে এই বিষয়ে একটি পুস্তক প্রকাশ করেন। পুস্তকটার নাম দিয়েছিলেন Description dela Louisiane। এই জায়গাটিতে তাদের নিজেদের কলোনী বসাবার জন্যে ১৮১২, ১৮৩৭ ও ১৮৩৮ সালে অনেক রক্তপাত হয়ে গেছে।

এই নায়েগ্রা জলপ্রপাতের ওপর অনেক দুঃসাহসিক কাজ হয়ে গেছে। দড়ির ওপর দিয়ে জলপ্রপাতের এদিক থেকে অন্য দিকে প্রথম পার হয়েছিলেন Charles Bloudin (Jean Francois Gravelet)। শুধু তাই নয় তিনি আবার ১৮৫৯ সালে একটি লোককে কাঁধের ওপর বসিয়ে এই জলপ্রপাতটি দড়ির ওপর দিয়ে পার হয়ে জনসাধারণকে অবাক করে দিয়েছিলেন। একটি বড় ব্যারেলের মধ্যে নিজেকে ঢুকিয়ে ১৯০১ সালে প্রথম যিনি জলপ্রপাতের ওপর থেকে নীচে গড়িয়ে পড়েন তিনি একজন মহিলা—তাঁর নাম Mrs. Annie Edson Taylor। অনেকে তাঁর কার্য্য দেখে হতভম্ব হয়ে পড়েন। কিন্তু এই ঘটনার পরেও অনেকে লোহার কাঠের ও রাবারের ব্যারেলের মধ্যে ঢুকে তাঁর মত নীচে গড়িয়ে পড়েছিলেন। এর মধ্যে অনেকে আর তাঁদের জীবন নিয়ে ফিরে আসতে পারেন নি। এখন আইন করে এই দুঃসাহসিকতার কাজটি দুই দেশের সরকার বন্ধ করে দিয়েছেন।

জলপ্রপাতের পর নদীটি দুই মাইল পর্য্যন্ত বেশ শান্ত। এই নদীর ওপর টুরিষ্টদের ঘোরাবার জন্যে ১৯৫৫—১৯৫৬ সালে তৈরী দুটী ছোট ছোট জাহাজ ভাসমান আছে। এদের নাম প্রথম ও দ্বিতীয় মেড অফ দ্য মিস্ট (Maid of the Mist) এই রকম দুটো জাহাজ পূবে এখানে ছিল। ১৯৫৫ সালের ২২শে এপ্রিল দুটো জাহাজই অগ্নিতে ভস্মীভূত হয়। এই জাহাজে চড়ে বেড়াতে হলে নিউইয়র্ক ষ্টেটের তৈরী ২৮২ ফুট উঁচু Scenic Towerটীর নীচে থেকে লিফটে করে ঐ জাহাজে চড়তে হয়। আর যারা কানাডার মধ্যে দিয়ে জাহাজে চড়তে চায় তাদের জন্যে Incline railway আছে। তাতে করে নামা ও ওঠা যায়। বড়দের জন্যে ১ ডলার ৭৫ সেণ্ট ও ছোটদের ১ ডলার ২৫ সেণ্ট প্রবেশ পত্র লাগে। পাঁচ বছরের নীচের ছেলেমেয়েদের কোন পয়সা লাগে না। নদীটীর দুই মাইল দূরে রয়েছে ঘুর্ণি জল (whirl pool)। এখানে নদীর জল প্রচণ্ডবেগে ঘুরতে আরম্ভ করেছে আর এখানে নদীর স্রোত ঘণ্টায় ২৭ মাইল বেগে ছুটোছুটী করতে করতে চলেছে। এই ঘুর্ণি জলের স্রোতটী কানাডার জমির গায়ে আছাড়ি পাছাড়ি করতে করতে এগিয়ে যাচ্ছে। এর দৃশ্য দেখতে হলে spanish cableএ করে সেখানে যেতে হয়। এই ঘুর্ণি জলস্থানের পরেই নদীটি একেবারেই শান্ত। বৈজ্ঞানিকেরা মনে করেন যে নায়েগ্রা নদীটির স্রোতটী জমি কাটে কেটে Gorge এর মধ্যে দিয়ে নিউইয়র্ক ষ্টেটের লিউইষ্টন (Lewiston) সহরে গিয়ে পড়েছে তার জন্যে এর সময় লেগেছে ৫০ থেকে ৭৫ হাজার বছর। এর দূরত্ব মাত্র ৭ মাইল।

এই হর্স স্যু ফলসের পাশের বড় মাঠে রয়েছে Skylon ও Haritage মিনার (Tower) এই দুটী টাওয়ারের ওপর থেকে নায়েগ্রা শহর ও নায়েগ্রা জলপ্রপাত খুব ভালোভাবে দেখা যায়। Skylon Towerটী সবচেয়ে বড়—এর ওপরে ইলেকট্রিক কেবল কারে উঠতে হয়। জমি থেকে টাওয়ারটীর উচ্চতা ৫২০ ফুট, এর ওজন ৬০ মিলিয়ন পাউণ্ড, এর পরিধি—তলার ৭২ ফুট ৬ ইঞ্চি, যেখানে সরু হয়ে ওপরে উঠেছে পরিধি ৩৩ ফুট ও যেখান থেকে সমস্ত শহরটী দেখা যায় তার পরিধি ১০৭ ফুট। এর ওপরে ২০০ লোকের জন্য খাবার ঘর, ৩০০ জন লোক খাবার জন্যে ক্যাফেটেরিয়া রয়েছে, এই টাওয়ারটির আশে পাশে অনেক হোটেল আর তার আশে পাশে রয়েছে সবুজ দূর্বা আর ফুলে ভরা মাঠ। আর তার ওপরে নানা রঙের পোষাকে সজ্জিত হাজার হাজার জনসাধারণ ও শিশুর দল সেই স্থানটিকে আরও সুন্দর করে তুলেছে। তবে মানবের সৃষ্টি ঈশ্বরের সৃষ্টির কাছে কিছুই নয়। আজ জীবন আমাদের সার্থক হলো।

স্বাধীনতা

জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী

তুমি বুঝি ভেবেছিলে পরাধীনতায় দুস্তর প্রান্তর
একবার হয়ে গেলে পার দেখা যাবে
উদয় আলোর রেখা দূর চক্রবাল-মূলে
উদ্ভাসিয়া দিক্‌দিগন্তর।
দুর্দ্দিনের ঢেউগুলি সব
মিলাবে সিন্ধুতে, শান্ত হবে দুঃখ কলরব।
সাগরের ঢেউ ছেঁচে সব তার মুক্তা মাণিক
সকলেই পাবে বুঝি খানিক খানিক।
আর কূলে কূলে আছে তার অনেক প্রান্তর,
সেইখানে গড়ে নেবে জীবনের সাধভরা ছোট
কুঁড়ে ঘর।
আহা! চিক্‌মিকে সোনা রং ক[illegible]
[illegible] যগ।
দেখেছিলে দূরে হলুদ সোনায় ভরা সোনার আকর।
মাঝে তার ভয়াল প্রান্তর আর অকূল
সাগর,—
সীমা নাই যার।
অসংখ্য যাত্রীর দল নিয়ে হয়েছিলে পার।
মরিল অনেক তারা আহা! বেঁচেছিল
কিছু।
ক্লান্ত পায়ে এলো পিছু পিছু।
হলুদ সোনার খনি ভুলায়েছে পথ বালির সোনার
কোলে।
স্বাধীনতা তৃষাতুর কত তারা ডুবে গেল দলে দলে।

বাকি জন ভেবেছিল বুঝি এইবার
ওই মরুভূমি আর উত্তাল সাগর—হিমাদ্রি শিখর
হয়ে গেছি পার।
শেষ হয়ে গেছে কাজ এবারে বিশ্রাম
পরম আরাম।
কোথা হতে কে কহিল ডাকি'
পদতলে তার রুক্ষমরু আর মহা
পারাবার।—
"আমি স্বাধীনতা!
আমার তো নাই শেষ কথা
অলস বিলাস সুখ আরাম বিরাম
নাহি জানি তাহাদের নাম।
মোর পথে পথ শুধু
কখনো বা মরুভূমি কখনো বা সাগর উত্তাল।
মহাকালে চিরকাল আঁকা পথে মোর ঘর।
যে পথেতে ধাবমান যুগযুগান্তর।"
একটা সে নদী।
দুই পারে তার জেগে রয় স্বাধীনতা আর অধীনতা,
যে নদীতে ভেঙে ভেঙে ঢেউ জেগে ওঠে চর।
যে নদীতে ডুবে যায় শতবর্ষ সীমা আহা আয়ুর
বছর
যে পথ সমুখে জাগে দিগন্ত বিলীন চিরকালের
প্রান্তর।
যার বুকে আশা—পায়ে চলা। স্বাধীনতা বর।

মিছিল

হোস্‌নে আরা (বাংলাদেশ)

আব্বু মিয়া রিকশা চালায়, কাল্লু মিয়া গাড়োয়ান্,
শ্যাম ব্যাপারী পাটের কলে দারোয়ান।
গঙ্গা আর মেঘনা যেন একসাথে যায় মিশে।
ডঙ্কানাদে বলছে হেঁকে একসাথেতে সবে,
ভিন্ন মোরা কিসে ?

গলির মোড়ে আব্বু মিয়ার রিকশা যখন চলে
কাল্লু মিয়া পথ ছেড়ে দেয় পরম কুতূহলে।
শ্যাম ব্যাপারীর বউটি যখন হ'ল মরার মত,
ছুটাছুটি কাল্লু মিয়া করলে তখন কত,
সেই কথাটা ইতিহাসে কেউ তো লেখে নাই!
বস্তির সব বাসিন্দারা দুঃখসুখের রাতে
থাকে একই সাথে।
হাসে, কাঁদে সবাই একই সাথে।
আব্বু মিয়া রিকশা চালায়, কাল্লু মিয়া গাড়োয়ান,
শ্যাম ব্যাপারী পাটের কলের দারোয়ান।
শীর্ণকায়া সুলতানা আর কৃষ্ণকায়া কালীর বউ,
কলতলাতে জমায় আসর কণ্ঠে ঢেলে কথার মউ।
একের শোকে অন্যে কাঁদে, এদের সুখে হাসছে ওরা,
মনের মাঝে নেই ভেদাভেদ,
নয় তারা কেউ বর্ণচোরা।
পানির তরে ঝগড়া করা ভুলেছে সব অনেক আগে,
কেউ কাহারে দেয় না গালি ভুলেও কভু মিথ্যা
রাগে।
তারার মায়ের ব্যারাম হ'লে কালীর মা হয় কেঁদে
সারা
রাত কাটে তার নিদ্রাহারা।

আপন হাতের পৈঁচি বেচি বাজার হ'তে দাওয়াই
আনে
দিনে-রাতে সেবার পরশ ছোঁয়ায় তারা প্রাণের
টানে।
শীর্ণকায়া সুলতানা আর কৃষ্ণকায়া কালীর বউ
কলতলাতে জমায় আসর কণ্ঠে ঢেলে কথার মউ।

আব্বু মিয়া, শ্যাম ব্যাপারী, কালীর বউ আর
সুলতানা
ভিন্ন জাতি হলেও এদের ব্যথা-বেদন ভিন্ন না।
পুঁজিওয়ালা বাবু মিয়া আব্বু মিয়ার ব্যামোর দিনে
দেয় না কভু পথ্য কিনে।
কালীর বউ-এর পুত্রশোকে দেশের ধনী রাজেন
সাহা
একটুকুও কয় না 'আহা'।
বস্তিবাসী মানুষ যারা
তাদের মধ্যে নেইকো বিভেদ
মানুষ তারা এক মিছিলের, তাহার লাগি নাই
কোন খেদ।
আব্বু মিয়া, শ্যাম ব্যাপারী, কালীর বউ আর
সুলতানা
ভিন্ন জাতি হলেও এদের ব্যথা-বেদন ভিন্ন না।

নূতন দিনের উঠছে সূর্য্য, নূতন আলোয় ভরবে
ধরা,
নূতন পথে মিছিল করে যাত্রা শুরু করবে ওরা।
ওদের হাতের জয়-পতাকা নূতন আশা দিচ্ছে আনি,
অনাগতের হাতছানি। •

কুলায়

শ্রীআশুতোষ সান্যাল

শহরের কোলে ছোটো গ্রামখানি,
সেথা কোনোমতে বেঁধেছি বাসা ;
শুধু ধানক্ষেত, মাঝে সরু পথ—
তাই দিয়ে করি যাওয়া-আসা।
দুই হাঁটু ভ'রে মেখে কাদা-পাঁক
আষাঢ়-শ্রাবণে চলি নির্বাক্ ;
পৌষে ও মাঘে জনহীন মাঠে
হাড়-কাঁপা জাড় সর্বনাশা।
নারিকেল-তাল-খর্জুর তরু,—
তারি মাঝে মোর কুটিরখানি,
ভাগ্যবানের নহে সে সৌধ—
কাঙালের কুঁড়ে—জানি তা' জানি।
নাগরীর মতো বাহুপাশলীন
নগরী আমায় রাখে সারাদিন ;—
ক্ষুদ্র এ গৃহ মায়ের মতন
সাঁঝে লয় মোরে বক্ষে টানি'।
আমার ভবন নিমতরু-ঢাকা
সমুখের ঐ আঙিনা ঘিরে,
নীড়ে-ফেরা পাখিসম রোজ হেথা
দিবসের শেষে আসি হে ফিরে।
কান পেতে শুনি ঝিল্লীর সুর,—
না— না বুঝি কার নূপুর মধুর ;
দেখি প্রাণ ভ'রে দিগন্তশায়ী
শ্যামল কোমল বনশ্রীরে।
অর্থ-বিত্ত—মরু-মরীচিকা—
যাই নাকো বৃথা অন্বেষণে,
যদি মোর কিছু থাকে সম্পদ্—
রয়েছে ছড়ায়ে ফুলের বনে!
আছে দারিদ্র্য, আছে টানাটানি,
তবু যা পেয়েছি তাই ভালো মানি ;—
একদা রাতের শিউলির মতো
যাই যেন ঝ'রে এ-নির্জনে।

সুরেশ্বর

(আলাউদ্দিন খাঁর উদ্দেশে শ্রদ্ধার্ঘ্য)

ডাঃ নন্দলাল পাল

আকাশের গায়ে মেঘের বনানী,
পৃথিবীটা কিন্তু ধূলিতে একাকার ;
সুরের সূর্য্য অস্তাচলের রথে
সন্ধ্যার বুকে দিবসের হাহাকার।

আকাশ-মাটির দীর্ঘ ব্যবধান
এ-যেন কোন অদৃশ্যে বহা নদী
এপারে প্রান্তর—ওপারে উচ্চ গিরি,
সাঁকো তার মাঝে সুরের ধ্রুপদী যদি

মন্দির হল শূন্য আজিকে, ছিন্ন বীণার তার,
রাগ-রাগিণী ব্যথায় বিধুর সব।
জীবনের সাঁকো যদি(ও) ভেসে যায় স্রোতে,
সুরের কাছে মৃত্যুর পরাভব।

আমি ত জানি না নতুন ঠিকানা
সুরের তারা যেথায় জ্বলে,
বিদ্যুৎ যেথা বহ্ধা হৃদয়
সুরের কুসুম যেথায় ফলে।

ভাদ্র-আকাশে গর্জিয়া উঠিল বাজ,
সুরেশ্বর, তব সুরসভা হতে এলো কি আহ্বান
আজ!

———

অপরিচিত মনীষী ঃ শ্রীঅক্ষয় কুমার দত্তগুপ্ত

অকিঞ্চনকুমার দত্তগুপ্ত

একদিন যিনি সংস্কৃত এবং বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের খ্যাতনামা অধ্যাপক (Professor) ছিলেন, ঢাকা কলেজে ক্লাসে পড়াইবার সময় অপরাপর কলেজ হইতে বহু ছাত্র যাঁহার পড়ান বা lecture শুনিতে আসিত, আজ তিনি অতি বৃদ্ধ ও পঙ্গু ;—বর্তমান নবীন সাহিত্যিকদের কাছে তিনি সম্পূর্ণ অপরিচিত। এই অপরিচিত মনীষী শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্ত গুপ্তের জীবন-কথা তাই আজ সংক্ষেপে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি।

পণ্ডিত প্রবর মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ এবং ডাঃ রাধাগোবিন্দ বসাক - এই দুই মহাদার্শনিক আজ সর্বজনবিদিত। ডাঃ রাধাগোবিন্দ বসাকের এক চিঠির উত্তরে গোপীনাথজী লিখিয়াছিলেন (২৯.৮.৭১.), "ভাই রাধাগোবিন্দ দাদা, আপনার পত্রখানা পাইয়া কত যে আনন্দ হইয়াছে বলিতে পারি না। কত পূর্বস্মৃতি জাগিয়া উঠিতেছে বলিতে পারি না।... আপনার ঢাকা কলেজের জীবন আমার মনে পড়ে। আমি জুবিলী স্কুল হইতে ১৯০৫ এ এনট্রান্স পাশ করিয়া জয়পুর চলিয়া যাই। আপনি বোধহয় আমা হইতে দুই-তিন বৎসরের বড়। ছাত্র জীবনে ঢাকাতে অবস্থান কালে আপনাকে ও আপনার পূর্ববর্তী শ্রী-অক্ষয়কুমার দত্ত গুপ্তকে নিজের পাঠ্য জীবনের আদর্শ বলিয়া মনে করিতাম।" (শ্রীযুক্ত হরলাল ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের "গোপীনাথ কবিরাজের জীবন দর্শন" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। "সাহিত্য ও সংস্কৃতি" ত্রৈমাসিক পত্রিকার মাঘ—চৈত্র ১৩৭৮ সংখ্যায় প্রকাশিত)

শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্ত গুপ্ত গোপীনাথজীকে বাল্যকাল হইতে ছোট ভাইয়ের মত স্নেহ করেন। পরবর্তীকালে গোপীনাথজী অক্ষয়বাবুর গুরুভাই হওয়ায় এই দুই জনের পরিবারের মধ্যে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা হয়।

পূর্ববঙ্গের (অধুনা বাংলাদেশের) ঢাকা জেলার অন্তর্গত ধামরাই একটি অতি নাম-করা গ্রাম। প্রাচীনকাল হইতেই এই গ্রাম বস্ত্রশিল্প (মশ্‌লিন) ও বাসনের জন্য বিখ্যাত। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যও ইহার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সবচেয়ে বড় আকর্ষণীয় বস্তু হইতেছে এই গ্রামের জাগ্রত ঠাকুর মাধব। মাধবের মূর্তি এত চমৎকার যে তাহা কখনও বিস্মৃত হইবার নয়। আষাঢ় মাসে ঠাকুর মাধবের রথ-যাত্রা উপলক্ষ্যে একদিন সমস্ত পূর্ববঙ্গ হইতে বহুলোক দর্শনার্থে এই গ্রামে আসিয়া সমবেত হইত। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্ত গুপ্ত এই গ্রামে ১২৮৮ সালের ৮ই আষাঢ় (ইং ১৮৮১ খৃ) জন্মগ্রহণ করেন। ঋষি গোপীনাথজীও এই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। অক্ষয়বাবু ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় বৃত্তি পাইয়া ঢাকার জুবিলি স্কুলে ভর্তি হন। এই স্কুল হইতে তিনি ১৯০০ সালে মাসিক ১৫ ্টাকা বৃত্তি পাইয়া এন্ট্রান্স্ পরীক্ষা পাশ করেন। তৎপর তিনি ১৯০২ সালে ঢাকা কলেজ হইতে এফ্-এ পরীক্ষা পাশ করিয়া ১৫ ্টাকা বৃত্তি লাভ করেন। ১৯০৪ সালে কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে তিনি কৃতিত্বের সহিত বি-এ পাশ করেন এবং ১৯০৬ সালে সংস্কৃত শাস্ত্রে এম্-এ পাশ করেন। এম্-এ পড়িবার সময় তাঁহার এক অতি মেধাবী ছোট ভাই, প্রফুল্লকুমার, অকালে কলেরা রোগে মৃত্যু মুখে পতিত হন। ধামরাই গ্রামের অনেকের কাছে শুনিয়াছি যে তিনি নাকি অক্ষয়বাবুর চেয়েও মেধাবী ছাত্র ছিলেন। তিনিও বৃত্তি পাইয়া এন্ট্রান্স্ পরীক্ষা পাশ করেন এবং ঢাকার জগন্নাথ কলেজে এফ্-এ পড়িতে থাকেন। পরীক্ষার মাত্র একমাস পূর্বে অল্প কয়েকদিনের জন্য তিনি ঢাকা হইতে তাঁর দেশের বাড়ীতে যান। সেই সময় ধামরাই গ্রামে কলেরা দেখা দেয় এবং তিনি উহাতে আক্রান্ত হইয়া অকালে দেহত্যাগ করেন।

শুনিতে পাই, তৎকালীন জগন্নাথ কলেজের প্রিন্সি-পাল যখন প্রফুল্লকুমারের এই মৃত্যু খবর পান তখন তিনি অশ্রুবর্ষণ না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। তিনি তৎক্ষণাৎ কলেজ বন্ধ করিয়া দেন, কিছুদিন আগেও গোপীনাথজীর মুখে শুনিয়াছি, "সে brilliant ছেলে ছিল।" গোপীনাথজীর মুখে এই কথা শুনিয়া সেদিন আমার কান্তকবি রজনী সেনের একটি করুণ গান মনে পড়ে—"ফুটিতে পারিত গো, ফুটিল না সে।" অক্ষয়বাবু এই ভ্রাতৃবিয়োগের শোক সহজে ভুলিতে পারেন নাই।

অক্ষয়বাবুর কনিষ্ঠ ভাই শ্রীযুক্ত অমূল্যকুমার দত্ত গুপ্ত মহাশয়ও একজন scholar. তিনি দীর্ঘকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের Law College এর lecturer ছিলেন। বঙ্গ বিভাগের পর হইতে তিনি কাশীতে আছেন। তিনিও সম্প্রতি blood pressure এ ভুগিয়া শক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছেন।

চাকুরি-জীবনে সংস্কৃত ও বঙ্গভাষার অধ্যাপকরূপে অক্ষয়বাবু বহুদিন ঢাকা কলেজের অধ্যাপক (Professor) ছিলেন। প্রথমেই বলিয়াছি, ঢাকার অন্যান্য কলেজের ছাত্রেরা তাঁহার lecture শুনিতে ঢাকা কলেজে আসিত। প্রাচীন ছাত্রদের মুখে সেদিনও শুনিয়াছি যে অক্ষয়বাবু কালিদাসের "অভিজ্ঞান শকুন্তলম্" এমন সুন্দর ভাবে ব্যাখ্যা করিয়া পড়াইতেন যে যে-ছাত্র একবার তাহা শুনিয়াছে সে-ই মুগ্ধ হইয়াছে। এজন্য অপর সংস্কৃত প্রফেসারগণ অক্ষয়বাবুকে ঈর্ষ্যার চক্ষে দেখিতেন, বি-এ ক্লাসে বাংলা সাহিত্যেও তিনি এইরূপ পড়াইতেন। বঙ্কিম-সাহিত্যের ব্যাখ্যা ছিল তাঁহার অতি সুন্দর। এই সময়েই (১৩২১ সালে) ছাত্রদের অনুরোধে তাঁহার "বঙ্কিমচন্দ্র" পুস্তক প্রকাশিত হয়। পুস্তকটি বঙ্কিমের জীবনী ও তাঁহার অধিকাংশ গ্রন্থেরই সমালোচনা, ইহাতে লেখকের মৌলিক গবেষণা আছে বলিয়া শিক্ষক এবং ছাত্রসমাজে এখনও পুস্তকটি খুব আদৃত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই বই আর ছাপা নাই বলিয়া বাজারে এখন পাওয়া যায় না। শুনিতেছি শীঘ্রই বইটির পুনর্মুদ্রণ হইবে। ১৯২০ সনে অক্ষয়বাবু ঢাকা কলেজের শিক্ষকতা ছাড়িয়া দিয়া কলিকাতায় বেঙ্গল লাইব্রেরীর লাইব্রেরিয়ানের পদ গ্রহণ করেন। একবার বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের উদ্যোগে বঙ্কিমের জন্মস্থান কাঁটাল পাড়ায় এক অধিবেশন হয়। অক্ষয়বাবু এই অধিবেশনের সভাপতি হন। সভাপতির ভাষণ ছিল চমৎকার। এই ভাষণের জন্য তিনি সুনাম অর্জ্জন করেন। শিশু-সাহিত্যেও তাঁহার নাম ছিল যথেষ্ট। ছোট বালক, বালিকাদের জন্য তিনি কয়েকটি পাঠ্য পুস্তক প্রণয়ন করেন। Class III-র উপযোগী "কোমল কথা" ও "কোমল প্রসঙ্গ" পাঠ্যপুস্তক দুইটি এই স্থানে বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য। "কোমল কথা"-র সমস্ত বিষয় ও অধিকাংশ কবিতা স্বরচিত। এই পুস্তকটি উত্তর কলিকাতার টাউন স্কুলে বহুদিন পর্য্যন্ত Class III-র পাঠ্যপুস্তক ছিল। ইহা ছাড়া Class IV হইতে Class VIII পর্য্যন্ত পাঠ্য পুস্তকও রচনা করেন। বালক বালিকাদের "শিশু-সাথী" পত্রিকায় তিনি অনেক লেখা দিয়াছেন। একটি কবিতা "ধ্রুবের হরি-সন্ধান" আজও আমার মনে পড়ে। নিম্নে, যতদূর স্মরণ হয়, কবিতাটি উদ্ধৃত করিলাম—

"কোথায় তুমি দীনদুখীদের
কমলনয়ন সখা
আমার মত অবোধ শিশু
পায় কি তোমার দেখা,
কানে যেন শুনি কেমন
মন-ভুলানো সুর
ওগো আমার দীনের ঠাকুর
আছ কতদূর।
বাতাসে কার অঙ্গ পরশ
লাগে আমার গায়
ক্ষণে ক্ষণে রূপের ছটায়
জগত ভেসে যায়।
তোমার কথা শুনে প্রভু
ছুটে এলাম বনে
বালক বলে লুকোচুরি

খেলছ আমার সনে।
আমার মা যে দুঃখী অতি
মোর কি খেলা সাজে
এসো ঠাকুর বিলম্ব যে
বড়ই প্রাণে বাজে॥"

রাইটার্স বিল্ডিংস্-এ বেঙ্গল লাইব্রেরিয়ান্-পদে সুনাম ও দক্ষতার সহিত কার্য্য করার দরুণ ১৯২৫ সালে অক্ষয়বাবু 'রায়সাহেব' উপাধি পান। ইহার বহুকাল আগে তিনি "কবিরত্ন" উপাধি লাভ করেন। ১৯৩৯ সালে তিনি চাকুরি হইতে অবসর গ্রহণ করেন। এই সময় হইতে তিনি নিয়মিতভাবে আনন্দবাজার পত্রিকা, প্রবাসী, ভারতবর্ষ প্রভৃতি দৈনিক ও মাসিক পত্রিকায় নানা বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিতে থাকেন।

"যোগিরাজাধিরাজ শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংস" নামক পুস্তক-রচনা অক্ষয়বাবুর শ্রেষ্ঠ কীর্তি। ইহা তাঁহার মহান্ গুরুদেবের জীবনী এবং গুরুজীর নিকট হইতে প্রশ্ন উত্তরে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাসহ ধর্মালোচনা পুস্তক। ইহা বঙ্গসাহিত্যের সম্পদ বলিয়া মনে করি। অক্ষয়বাবু এই পুস্তকের ভূমিকায় লিখিতেছেন—

"এই পুস্তকে অতি আধুনিক কালের একজন অতি অসাধারণ মহাপুরুষের পুণ্য লীলা-কথা সুধী ও ধর্মানুরাগী পাঠকবর্গের গোচর করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। আমাদের দেশে মহাপুরুষগণের মধ্যে জ্ঞানী, ভক্ত ও যোগী এই প্রকার শ্রেণী বিভাগ করিবার রীতি প্রচলিত আছে। ঐ রীতি অনুসারে শ্রীশ্রী বিশুদ্ধানন্দ পরমহংস ছিলেন একজন যোগী।......যেহেতু যোগীর লভ্য উচ্চ, উচ্চতর, উচ্চতম ভূমিসকল এই যোগিরাজাধিরাজের আয়ত্ত হইয়াছিল, সেইজন্য তাঁহাকে কেবল একজন শ্রেষ্ঠ যোগী নহে, শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ও শ্রেষ্ঠ ভক্তও বলা যাইতে পারে।......এই মহাপুরুষ দেহের পরিচয়ে বাঙ্গালী হইলেও সারা বঙ্গদেশে তাঁহার নাম সুবিদিত নয়।...যদিও অধ্যাপক, বিচারক, ডাক্তার, বৈজ্ঞানিক, উকিল, এটর্ণি, এঞ্জিনিয়ার প্রভৃতি বহু সুশিক্ষিত ও পদমর্য্যাদাসম্পন্ন বাঙ্গালী ব্যক্তি তাঁহার শিষ্য ছিলেন তথাপি তাঁহার অবাঙ্গালী শিষ্যের সংখ্যাও নিতান্ত অল্প নহে। কিন্তু তিনি নিজের প্রচার ইচ্ছা করিতেন না এবং যে সকল উপায়ে সাধারণত সাধু-মহাত্মাদিগের প্রচার হয়, তাহাতে সবিশেষ আস্থা সম্পন্ন ছিলেন না বলিয়া এত বিশিষ্ট বিশিষ্ট শিষ্য সত্ত্বেও তাঁহার খ্যাতি তেমনভাবে সাধারণের মধ্যে প্রসারিত হয় নাই। অথচ এইরূপ একজন অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষের আবির্ভাব যে কেবল তাঁহার ক'য়েক শত বা কয়েক সহস্র শিষ্যের প্রয়োজনেই হইয়াছিল, ইহাও বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না। অন্ততঃ তাঁহার জীবনকথার আলোচনায় সাধারণের প্রয়োজন আছে ও তাহাতে সকলের মহৎ উপকারই হইবার সম্ভাবনা, এইরূপ বিশ্বাস হইতে আমি এই পুস্তক রচনা ও প্রকাশের জন্য শ্রম ও ব্যয়বাহুল্য স্বীকার করিয়াছি। এই কার্য্যের জন্য আবশ্যক প্রেরণা নিশ্চয় আমি তাঁহার চরণ হইতেই প্রাপ্ত হইয়াছি এবং সেই জন্যই বার্দ্ধক্য, উপযুক্ত শক্তির অভাব ও অল্প বিষয়ামতি সত্ত্বেও তদনুসারে কার্য্য করিতে পশ্চাৎপদ হই নাই।"

ঢাকা কলেজের অধ্যাপক থাকা কালীন অক্ষয়বাবু ১৯১৮ সাল হইতে কয়েকবার উত্তর ভারতের তীর্থ ও ইতিহাসপ্রসিদ্ধ স্থানগুলি দর্শন করিতে যান। প্রতি বারেই তিনি কাশীতে তাঁহার চিরপরিচিত ভ্রাতৃস্থানীয়, ক্রমে পরম প্রীতিভাজন সুহৃৎ শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজের বাসায় অতিথি হন। এই সময় হইতে তিনি শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজের গুরুদেব শ্রীশ্রী বিশুদ্ধানন্দ পরমহংসদেবের সহিত পরিচিত হন এবং তাঁহার যোগবিভূতি ও সূর্য্য বিজ্ঞানের কথা জানিতে পারেন। গোপীনাথজী অক্ষয়বাবুকে বলিয়াছিলেন, "সূর্য্যের সাতটা রশ্মির কথাই সকলে জানে। কিন্তু সূর্য্যবিজ্ঞান মতে সূর্য্যালোক ভাগ করিয়া তিনশত ষাটটি রশ্মি পাওয়া যায়; তাহাতে জগতের সকল বস্তুর উপাদানই আছে। উহা বিশ্লেষণ করিয়া ঠিক ঠিক রশ্মিগুলি বাছিয়া যেমন যেমন দরকার সেইভাবে সে-গুলিকে মিশাইতে পারিলে যে কোন দ্রব্যই প্রস্তুত করা

যায়। গুরুদেব তাহাই কয়েন। এটা বৈজ্ঞানিক সৃষ্টি, ইহাতে অলৌকিক কিছু নাই। ...যাহাকে যোগবিভূতি বলে তাহা স্বতন্ত্র ব্যাপার। সেটা যোগীর ইচ্ছাশক্তির খেলা। ইচ্ছাশক্তিতে কোনও উপাদানসংগ্রহের প্রয়োজন নাই—যোগীর ইচ্ছাতেই সব হয়। যোগ আর বিজ্ঞান এক নয়; যদিও গুরুদেব বলেন, যোগ ছাড়া বিজ্ঞান নাই, বিজ্ঞান ছাড়া যোগ নাই।" কাজেই এই মহান্ যোগীর অসাধারণ শক্তিগুলি প্রচ্ছন্ন থাকিবার নয়, যদিও তিনি যতদূর সম্ভব প্রচ্ছন্ন থাকিবার চেষ্টা করিতেন। শ্রীঅরবিন্দের ভাষায় বিভূতি সমূহ ছিল তাঁহার "normal way of seeing and acting." সুতরাং সেগুলি শিষ্যদের দৃষ্টি সর্বদাই আকর্ষণ করিত। অক্ষয়বাবুও তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। যাহা হউক, ১৩৩১ সালে আশ্বিন মাসে নবমী পূজার দিন এই মহান্ শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে অক্ষয়বাবু দীক্ষাপ্রাপ্ত হইলেন।

অক্ষয়বাবু তাঁহার "যোগিরাজাধিরাজ শ্রীশ্রী বিশুদ্ধানন্দ" পুস্তকের মুখবন্ধে লিখিয়াছেন, "আমি এক-রূপ পরিণত বয়সেই এই আদর্শ গুরুর চরণাশ্রয় পাইয়াছিলাম। তাহার পর তিনি কিঞ্চিদূন সাত বৎসরকাল মাত্র স্থূলদেহে ছিলেন। এই অল্পকাল মধ্যে আমি তাহার লীলার যে অংশ প্রত্যক্ষ করিয়াছি বা বিশ্বাসযোগ্য (কেন না আমি স্বভাবতঃ অতি সন্দিগ্ধচিত্ত) গুরুভ্রাতাদিগের মুখে শ্রবণ করিয়াছি, তাহা প্রায় সবই আমার ডায়েরীতে যথাকালে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। সেই ডায়েরীই এই পুস্তকসঙ্কলনে আমার প্রধান অবলম্বন।......কিন্তু শ্রীশ্রী গুরুদেবের সমুখ হইতে প্রাপ্ত বিবরণ ভিন্ন অন্যের কাছে লব্ধ কোনও বিষয়ই আমি তাহার সত্যতা যথেষ্ট নিঃসংশয় না হইয়া গ্রহণ করি নাই।...সাধারণতঃ শিষ্যের লিখিত গুরুর জীবনীতে পাঠকগণ যেরূপ ভক্তি ও ভাবের প্রাচুর্য্য আশা করিতে পারেন, ইহাতে তাহার অভাবই লক্ষিত হইবে। কেন না, ভাব ও ভক্তি সম্পদে এ পুস্তকের লেখক নিতান্তই দরিদ্র। অবশ্য "বাজার চলন" ভক্তি ও একটু শস্তা রকমের ভাবোচ্ছ্বাস ইহাতে আমদানী করা খুব দুঃসাধ্য ছিল বলিয়া মনে করি না, কিন্তু যে দেবতার চরণে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া এই গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়াছি, লৌকিক জীবনে তিনি ছিলেন অতি কঠোর পরীক্ষক মেকী ও ভেজাল ছিল তাঁহার কাছে নিতান্তই অচল। আমার পরম দেবতাকে আমি কোন্ সাহসে কৃত্রিম ভক্তি ও ভাবের উচ্ছ্বাস দিয়া ফাঁকি দিতে চেষ্টা করিব? তাহাতে সুপরীক্ষক পাঠকই কি পরিতৃপ্ত হইবেন?... কাজেই পুস্তকে সব কথা সরল ও সুস্পষ্টভাবে বলিয়া যাইবার প্রয়াস পাইয়াছি।"

"যোগিরাজাধিরাজ বিশুদ্ধানন্দ পরমহংস পুস্তকে প্রথমেই আমরা অক্ষয়বাবুর রচিত সংস্কৃতে 'শ্রীগুরুস্তোত্র' দেখিতে পাই। ইহা ছাড়া শ্রীগুরুদেব যতদিন দেহে ছিলেন, প্রতিবারেই তাঁহার জন্মোৎসবে (২৯শে ফাল্গুন) অক্ষয়বাবু শ্রীগুরুদেবের ছবি সহ স্বরচিত গান মুদ্রিত করিয়া গুরুভাইদের উপহার দিতেন। এইরূপ একটি গানের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম -

"ঠাঁই দিলে যদি পায়,
এই কর প্রভু, আর যেন কভু
দূরে মন নাহি ধায়।
নাহি জানি পর, না চিনি আপন,
সুখভ্রমে দুখে করি আবাহন,
মরীচিকা হেরি বারি মনে করি
ছুটি কুরঙ্গের প্রায়।"

যাঁহারা বাংলা ভাষা জানেন না এরূপ গুরুভাইদের জন্য ইহার ইংরাজী অনুবাদও তিনি করিয়া দিলেন।

"Since it has pleased Thee to give me refuge
At Thy feet
Do this O Lord, that my mind may no more
Stray away from them.
I Know not who is mine own and who is not
And invite woe mistaking it for weal.
I run after a mirage like a thirsty deer,
Thinking it to be water."

ইহা হইতে আমরা অক্ষয়বাবুর অপূর্ব গুরুভক্তি দেখিতে পাই।

দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে পঞ্চমুণ্ডী আসন দেখিয়াছি

অন্যান্য সিদ্ধস্থানেও পঞ্চমুণ্ডী আসন আছে। কিন্তু নবমুণ্ডী আসন কোথাও দেখি নাই। বর্তমান বারানসী ষ্টেশনের অনতিদূরে মালদহিয়ায় "বিশুদ্ধ-কানন" নামে শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংসদেবের প্রতিষ্ঠিত আশ্রম আছে এই আশ্রমের পশ্চিম-দক্ষিণ কোণে একটু স্বতন্ত্র জায়গায় নবমুণ্ডী আসন স্থাপিত হইয়াছে। যোগিরাজাধিরাজ শিষ্যদের কল্যাণের জন্য এই সিদ্ধাসন স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার অবর্তমানে শিষ্যেরা এই স্থানে বসিয়া সদ্ভাবে জপ করিলে আধি-ব্যাধি হইতে মুক্তি পাইতে পারিবে—এইজন্যই তিনি নবমুণ্ডী আসন স্থাপন করিয়াছিলেন। পঞ্চমুণ্ডী আসন হইতে নবমুণ্ডী আসনের শক্তি মনে হয় খুব বেশী। যাহাহউক অক্ষয়বাবু এই স্থানে জপ করিতে খুব ভালবাসিতেন। যতদিন দেহে শক্তি ছিল ততদিন পর্য্যন্ত তিনি পূজার সময় কাশী গিয়াছেন। কাশীর বিশ্বনাথ ও অন্নপূর্ণা প্রতিবার দর্শন করিলেও তিনি "বিশুদ্ধ কানন" আশ্রমকেই প্রকৃত কাশী বলিয়া মনে করেন। এই আশ্রম হইতে প্রকাশিত "বিশুদ্ধ-বাণী" পত্রিকায় অক্ষয়বাবু একবার "আশ্রম গৌরব" নামক কবিতা লেখেন। তাহার প্রথম চার লাইন্ উদ্ধৃত করিতেছি—পাঠকবর্গ উক্ত মতই দেখিতে পাইবেন; যথা—

"বিশুদ্ধ কানন সহ সিদ্ধাসন
নবমুণ্ডী যার নাম,
এই আমি জানি এই শুধু চিনি
এই মোর কাশীধাম॥"

আজ ৯১ বৎসরে পদার্পণ করিয়া অক্ষয়বাবু অতি বৃদ্ধ ও পঙ্গু হইয়া পড়িয়াছেন। বৎসর দুই আগে পায়ে আঘাত পাইয়াছিলেন। সেজন্য এখন চলিতে পারেন না, শয্যাশায়ী হইয়া আছেন। কানে খুবই এখন কম শোনেন, চোখের দৃষ্টিও পূর্বের মত নাই। দেড় বৎসর আগে তাঁহার পত্নীবিয়োগ হয়। সন্তানেরা এতদিন বৃদ্ধ পিতামাতা জীবিত থাকায় বট গাছের আশ্রয়েই ছিলেন বলিয়া মনে করিতেন। আজ মাতৃহারা হইয়া পিতাকেই সেজন্য সবচেয়ে বেশি তাহারা আঁকড়াইয়া ধরিয়াছেন। একান্নবর্তী পরিবার। স্নেহময় পিতা শয্যাশায়ী হইয়াও সব সময়ে পুত্র-কন্যাদের কাছে ডাকিয়া সাংসারিক খবর লইয়া থাকেন। আত্মীয়স্বজন বাড়ীতে আসিলে অত্যন্ত আনন্দিত হন। তাঁহার তৃতীয় পুত্র ডাক্তার; তিনি পিতার স্বাস্থ্য নিয়মিত পরীক্ষা করেন।

শয়ন ঘরে শয্যার সম্মুখস্থ দেওয়ালে অক্ষয়বাবুর গুরুদেবের একখানি বড় ফটোগ্রাফ ঝুলান রহিয়াছে। সকাল সন্ধ্যায় এখনও শয্যায় শয়ান অবস্থাতেই নিয়মিত সন্ধ্যা-আহ্নিক করিয়া থাকেন। অন্যান্য সময়ে কখন খবরের কাগজ কখন বা বই পড়েন। কিন্তু প্রতিটি সন্ধ্যায় তাঁহাকে দেখা যায়, হয় তিনি নাম জপ করিতেছেন কিম্বা জপ শেষ করিয়া তাঁহার গুরুদেবের প্রতিকৃতির নিচে তিনি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া আছেন। "সন্ধ্যা হয়ে এল ঐ, আর কত বসে রই"—যেন এইভাবে নিজ অবস্থার কথা তিনি তাঁহার করুণাময় শ্রীগুরুদেবকে নিবেদন করিয়া যাইতেছেন।

কার্তিকেয়

সুখময় সরকার

শিবের পুত্র ব্যতীত কেউ তাকে বধ করতে পারবে না—ব্রহ্মার এই বরে বলদৃপ্ত তারকাসুর স্বর্গরাজ্য অধিকার করে বসেছে; দেবতারা উদ্‌বাস্তু হয়ে ভ্রমণ করছেন পথে পথে। তারকাসুর ভাবছে—সে কার্যতঃ অমর, কারণ শিবের পুত্র হবার কোন সম্ভাবনা নেই। সম্প্রতি তিনি দক্ষযজ্ঞে সতীকে হারিয়ে কঠোর তপস্যায় মগ্ন। কিন্তু দেবতাদের দুর্গতি যখন চরম পর্যায়ে এসে উপস্থিত হল, তখন ইন্দ্রের নেতৃত্বে তাঁরা ক্ষীরোদ সাগরে এসে মধুসূদনের স্তব করতে লাগলেন। যোগ-নিদ্রা থেকে ব্যুত্থিত বিষ্ণু নির্দেশ দিলেন, "সতী গিরিরাজ দুহিতা রূপে জন্মগ্রহণ করেছেন; তাঁর সঙ্গে শিবের মিলন ঘটাতেই হবে। শিব-পার্বতীর মিলনে জন্মগ্রহণ করবেন কুমার কার্ত্তিকেয় এবং তিনিই তারকাসুরকে নিধন করে দেবলোকে শান্তি প্রতিষ্ঠা করবেন।"

এদিকে পার্বতী শিবকে পুনরায় পতি রূপে লাভ করার জন্য তপস্যা করছিলেন; কিন্তু শিব নির্বিকার। একদিন কৈলাসে ধ্যানমগ্ন শিবের চরণে অর্ঘ্য নিবেদন করছেন পার্বতী—এমন সময় দেবতাদের নির্দেশক্রমে মদনদেব শিবকে লক্ষ্য করে নিক্ষেপ করলেন সম্মোহন শর। ক্রুদ্ধ ধূর্জটীর ললাটাগ্নিতে ভস্মীভূত হলেন কামদেব। তপস্যায় বিঘ্ন সৃষ্টিতে মহাদেব প্রস্থান করলেন উন্নততর গৌরীশৃঙ্গে। পার্বতী নিকটবর্তী, গিরিচূড়ায় অবস্থান করে, বৃক্ষপত্র পর্যন্ত ভোজন না করে —'অপর্ণা' হয়ে—বৎসরের পর বৎসর পঞ্চাগ্নি তপস্যা দ্বারা 'পঞ্চতপা' হয়ে, অবশেষে শিবের ধ্যান ভাঙলেন। শিব-পার্বতীর মিলন হ'ল। জন্ম হ'ল কুমারের। শুভ কৃত্তিকা নক্ষত্রে জাত এই কুমারের নামকরণ হ'ল 'কার্ত্তিকেয়'। অচিরে যৌবন প্রাপ্ত কুমার দেব সেনাপতি হয়ে তারকাসুরকে নিধন করলেন।

মৎস্য পুরাণের এই কাহিনী অবলম্বনে মহাকবি কালিদাস রচনা করেছেন অমরকাব্য 'কুমার-সম্ভবম্'। কুমার সম্ভবের এই বৃত্তান্ত দেড় হাজার বছর ধরে এত জনপ্রিয় হয়ে রয়েছে যে, কার্ত্তিকেয়র জন্মকথা সম্বন্ধে অন্যান্য পুরাণের বৃত্তান্ত লোকে প্রায় বিস্মৃত হয়েছে।

স্কন্দ-পুরাণ, অগ্নি-পুরাণ ইত্যাদির উপাখ্যান থেকে জানা যায়, শিব-পার্বতীর মিলনের পরেও বহুকাল পর্যন্ত তাঁদের কোনও সন্তান হয় নি। তখন দেবতারা অগ্নিকে শিবের নিকট দূতরূপে প্রেরণ করে প্রার্থনা করলেন, যেন শিব দেবকার্য-সাধনার্থে একটি পুত্র উৎপাদন করেন। অগ্নিদেব একটি কপোতের রূপ ধারণ করে চঞ্চু দ্বারা শিবের এককণা 'বীজ' সংগ্রহ করে দেবতাদের নিকট প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। বীজটি এত গুরুভার বোধ হতে লাগল যে, অগ্নিদেব সেটি আর বহন করতে না পেরে পথিমধ্যে গঙ্গার জলে নিক্ষেপ করলেন। সেই 'বীজ' থেকে গঙ্গাতীরে এক অপূর্ব শিশুর উদ্ভব হ'ল; তিনি চন্দ্রের মতো সুন্দর, সূর্যের মতো উজ্জ্বল। এই শিশুর নাম স্কন্দ। কৃত্তিকা নাম্নী ছয় কন্যা তাঁকে স্তন্যদান করে পুষ্ট করে তুললেন; এই কারণে তাঁর ছয়টি মুখের উদ্ভব হ'ল কার্ত্তিকের। ময়ূর হ'ল বাহন। কার্ত্তিকেয় বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে দেবগণের সৈনাপত্য লাভ করলেন এবং যথাকালে তারকাসুরকে নিধন করলেন।

আবার মহাভারত (বনপর্ব, ২২১ অঃ) কার্তিকেয়ের জন্ম সম্বন্ধে বলছেন অন্য কথা। রুদ্রদেব অসুর বিনাশের ব্রত ত্যাগ করে এখন ধ্যানী শিবে পরিণত হয়েছেন। অথচ অসুরদের উৎপাতে দেবলোক বিপর্যস্ত। দেব লোককে অসুরমুক্ত করতে পারেন এমন একজন মহাবীর সেনাপতি আবশ্যক। ইন্দ্রও স্বর্গচ্যুত হ'য়ে হৃত রাজ্য ফিরে পাওয়ার উপায় আবিষ্কারের জন্য অরণ্যে তপস্যা করছেন। এমন অবস্থায় একদিন এক নারীর আর্তস্বর শুনতে পেয়ে ইন্দ্র সেখানে ছুটে গিয়ে দেখলেন কেশী নামে এক অসুর অপরূপ রূপসী একটি বালিকাকে ধর্ষণ করতে উদ্যত। ইন্দ্র কেশীকে বিতাড়িত করলেন। বালিকা বলল, তার নাম 'দেবসেনা'। ইন্দ্রের নিকট সে একটি সুযোগ্য পতি প্রার্থনা করল। ইন্দ্র ভাবলেন: যার নাম 'দেবসেনা' তার উপযুক্ত পতি হতে পারেন দেবসেনাপতি। কিন্তু দেবলোক যে এখন সেনাপতি বিহীন। এই চিন্তা করতে করতে তিনি গেলেন ব্রহ্মার কাছে—বললেন সমস্ত বৃত্তান্ত। ব্রহ্মা স্থির করলেন, অগ্নি এবং গঙ্গাই সেই ভাবী বীরের জনক-জননী হতে পারেন, যিনি হবেন দেব-সেনাপতি এবং দেবসেনা-পতি। ব্রহ্মার নির্দেশে সপ্তর্ষিগণের দ্বারা অনুষ্ঠিত হ'ল এক যজ্ঞ। অগ্নিদেব যজ্ঞকুণ্ড থেকে নির্গত হয়ে ঋষি পত্নীগণের প্রেমে পড়লেন। কিন্তু সেই সাধ্বী রমণীরা নির্বিকার। সুতরাং অগ্নি বনে গিয়ে তাঁদের ভুলতে চেষ্টা করলেন। সেখানে দক্ষ কন্যা স্বাহা অগ্নিদেবের প্রণয়াসক্ত হলেন। তখনও ঋষিপত্নীদের ভুলতে পারেন নি অগ্নি; তাই স্বাহাকে তিনি প্রত্যাখ্যান করলেন। দেবকন্যা স্বাহা অগ্নির মনের কথা জানতে পেরে এক ঋষিপত্নীর রূপ ধারণ পূর্বক অগ্নির নিকট প্রেম নিবেদন করলেন। অগ্নি তখন বিনা দ্বিধায় মিলিত হলেন স্বাহার সঙ্গে। স্বাহা আরও পাঁচবার পাঁচজন ঋষিপত্নীর রূপ ধারণ করে অগ্নির নিকট এলেন এবং অগ্নির সঙ্গে সঙ্গত হলেন। মোট ছয়বার মিলনের ফলে অগ্নির ছয়টি বীজ স্বাহা গ্রহণ করলেন এবং সেই ছয়টি বীজ গঙ্গাজলে পূর্ণ একটি স্বর্ণময় আধারে সযত্নে রক্ষা করলেন। ঋষিগণ বেদমন্ত্র উচ্চারণ করলে পর ঐ ছয়টি বীজ থেকে এক অদ্ভুতশিশুর জন্ম হল, যার ছয় মস্তক, দ্বাদশ চক্ষু, দ্বাদশ বাহু, দ্বাদশ চরণ ইনিই কার্ত্তিকেয়। এঁর বাহন হ'ল তাম্রচূড়। বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে ইনি দেব সেনাকে বিবাহ করে 'দেবসেনা-পতি' হলেন, আবার 'দেব-সেনাপতি' হয়ে স্বর্গলোক থেকে অসুরদের বিতাড়িত করলেন।

কার্ত্তিকের ষড়ানন, এ প্রসিদ্ধি ব্যাপক হলেও বাংলা দেশে ষড়ানন কার্ত্তিকেয়—প্রতিমা দেখা যায় না। দাক্ষিণাত্যে পেরুরের মন্দিরে সহস্রাধিক বৎসরের পুরাতন একটি অপরূপ কার্ত্তিকেয় মূর্তি আছে। এই মূর্তি ষড়ানন ও দ্বাদশবাহু, কিন্তু দ্বিপদ এবং ময়ূর বাহন। দ্বাদশ ভুজে ধনুর্বাণ, শক্তি, তোমর, শেল-শূলাদি নাশ প্রহরণ। দেব সেনাপতির উপযুক্ত মূর্তি। বাংলাদেশের 'বাবু' কার্ত্তিক নয়।

যাই হোক, কার্ত্তিকেয়ের জন্মবৃত্তান্ত এবং তাঁর হাতে তারকাসুরের নিধন ব্যাপারটা বুঝাতে চেষ্টা করা যাক। মহাভারতে এবং পুরাণে কার্ত্তিকেয়ের জন্ম-বৃত্তান্তে কিছু কিছু প্রভেদ আছে। ভিন্ন ভিন্ন কালে বিভিন্ন প্রদেশে রচিত হয়েছে এই সব উপাখ্যান; সুতরাং তাদের মধ্যে অবিকল ঐক্য থাকতে পারে না। তা ছাড়া, এতো ভূলোকের ইতিহাস নয়, দেবলোকের উপাখ্যান। সে দেব-লোক কোন কল্পিত স্থান নয়; আমাদের প্রতিদিনের প্রত্যক্ষীভূত অগণিত তারকা-খচিত নভোমণ্ডল বা দ্যুলোক। কৃত্তিকা, গঙ্গা, অগ্নি, স্বাহা, তারকাসুর—সমস্তই সেই দ্যুলোকের চিত্রাকে স্পষ্ট করে তোলে। কার্ত্তিকেয়ের জন্ম হয়েছিল দ্যুলোকে তিনি তারকাসুরকে বধ করেছিলেন দ্যুলোকে। দ্যুলোকের কোথায় আছেন কার্ত্তিকেয়? কোন্ গঙ্গার জলে অগ্নিবীজ বর্ধিত হয়ে ষড়ানন কার্ত্তিকেয়ের জন্ম? কোথায় বা তারকাসুর?

কার্ত্তিক মাসের শেষাশেষি মধ্য রাত্রে মধ্য আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করুন। দেখতে পাবেন, উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ-মেরু পর্যন্ত প্রসারিত দুগ্ধ শুভ্র সুরগঙ্গা বা

ছায়া পথের (milky way) কূলে ছয় তারকা বিশিষ্ট কৃত্তিকা নক্ষত্র মণ্ডল (Pleadus) ঝিকমিক করছে। এই ছয় তারকা বিশিষ্ট কৃত্তিকাতেই ষড়ানন কার্ত্তিকেয় মূর্তি কল্পিত হয়েছিল। আর ছায়াপথ বা স্বর্গের নদীই সেই গঙ্গা, যার জলে অগ্নিবীজ বর্ধিত হয়ে কার্ত্তিকেয়ের জন্ম হয়েছে। পুরাণে কৃত্তিকা নাম্নী ছয় রাজকন্যার কুমারের ধাত্রীরূপে স্তন্যদানের কথা বর্ণিত আছে। কৃত্তিকা নক্ষত্রমণ্ডলের ছয় তারকা থেকেই এই কল্পনার উদ্ভব। কৃত্তিকার একটু পূর্ব দিকে রয়েছে রক্তবর্ণ রোহিণী নক্ষত্র। সুপ্রাচীন কাল থেকে নানা প্রসঙ্গে ঋষি-কবিগণ রোহিণী নক্ষত্রের অপরূপ সৌন্দর্যের কথা বলে এসেছেন। সম্ভবতঃ এই রোহিণীতেই কার্ত্তিকেয় পত্নী দেবসেনার কল্পনা হয়েছিল। আর একটু পূর্বদিকে দেখুন, তিন তারা বিশিষ্ট মৃগশিরা নক্ষত্র। এই নক্ষত্র সমগ্র মৃগ নক্ষত্রের শির বা মস্তক। সমগ্র মৃগ নক্ষত্রের এক নাম কালপুরুষ (Orion)। প্রকাণ্ড একটা অসুরের মতো এর আকৃতি। তেরটি উজ্জ্বল তারা দিয়ে গঠিত এর দেহ। তারকাময় এই অসুরই এককালে তারকাসুর কল্পিত হয়েছিল। কৃত্তিকা নক্ষত্ররূপী কার্ত্তিকেয় এই তারকাসুরকেই বধ করেছিলেন। আর, কার্ত্তিকেয়ের বাহন তাম্রচূড় (কুক্কুট) বা ময়ূর কোথায়? বেদে ও পুরাণে বহুস্থানে সপ্তর্ষি নক্ষত্র মণ্ডলের বিবিধ বিচিত্র রূপ কল্পিত হয়েছে যেমন—ঋক্ষ (ভল্লুক—তুলনীয় লাটিন Ursa Maior, ইংরেজী Great Bear), লাঙ্গল, নৌকা, তাম্রচূড় (কুক্কুট), ময়ূর ইত্যাদি। কার্ত্তিকেয় শেষে এইভাবে আকাশ পর্যবেক্ষণ করলে স্পষ্ট দেখা যাবে, উত্তর আকাশে সপ্তর্ষি-মণ্ডল এমনভাবে অবস্থান করছে যে, তার তারাগুলি রেখাদ্বারা যোগ করলে একটি অতিকায় কুক্কুট বা ময়ূরের আকৃতি পাওয়া যায়। যখনকার কথা হচ্ছে, তখন কৃত্তিকা নক্ষত্র এবং সপ্তর্ষি সমসূত্রে অবস্থান করলে একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটতো, তাই কার্ত্তিকেয়ের বাহন কল্পিত হয়েছে সপ্তর্ষি-রূপী ময়ূর বা কুক্কুট। পরে সে-ঘটনার উল্লেখ করছি। কার্ত্তিকেয়ের কুক্কুট বাহন, এই ভাবনা (Conception) কিন্তু বহুকাল পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। মার্কণ্ডেয়-চণ্ডীতে দেবী যখন কৌমারী (কুমার অর্থাৎ কার্ত্তিকেয়ের শক্তি)-রূপে আবির্ভূতা হচ্ছেন তখন এই মন্ত্রে তাঁর স্তুতি করা হয়েছে :

ময়ূর-কুক্কুট-বৃতে মহাশক্তি ধরে হন যে।
কৌমারী-রূপ সংস্থানে নারায়ণী নমোহস্তুতে॥

ময়ূর বা কুক্কুট যার বাহন, যিনি মহাশক্তি নামক অস্ত্র ধারণ করেন, সেই অপাপবিদ্ধা কৌমারী রূপধারিনী নারায়ণীকে নমস্কার।

প্রশ্ন হতে পারে, তারকাসুর যদি তারকাময় অসুর কালপুরুষ, তবে তার নিধন ব্যাপারটা কি? কৃত্তিকা নক্ষত্র রূপী কার্ত্তিকেয় তাকে কেনই বা বধ করলেন? পুরাণ কথাকে যাঁরা অন্ধভক্তিবশতঃ আক্ষরিক ইতিহাস মনে করেন তাঁরা আমাদের ব্যাখ্যা কী ভাবে গ্রহণ করবেন জানি না। আবার পুরাণের মর্মমূলে প্রবেশ না করে কেউ কেউ এই সহজ উপাখ্যানকে গাঁজাখুরি গল্প বলে উড়িয়ে দেন। আসলে ওটা অজ্ঞতার নামান্তর মাত্র। জ্ঞানীর দৃষ্টি অতিবিশ্বাস বা অবিশ্বাসের ধূম্র-জালে আচ্ছন্ন হয় না। আমরা জ্ঞানদৃষ্টিতে ব্যাপারটা দেখতে চেষ্টা করব; তবেই তা সত্য বা 'ঋতম্'-রূপে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে।

বৈদিক সাহিত্য যাঁরা চর্চা করেছেন তাঁরা জানেন, যজুর্বেদের কালে মৃগনক্ষত্রে শারদ-বিষুব (Autumnal Equinox) হ'লে রুদ্রযজ্ঞ এবং নববর্ষ হ'ত। কিন্তু অয়ন বা বিষুবের কাল চিরদিন একস্থানে থাকে না, পিছিয়ে পিছিয়ে আসে। যজুর্বেদের কালে (খ্রী-পূ ৫০০০ অব্দ এবং তদূর্ধ্ব) মৃগনক্ষত্রে শারদ বিষুব হ'ত, কিন্তু সহস্র বৎসর পরে ঋষি লক্ষ্য করলেন শারদবিষুব হচ্ছে কৃত্তিকা নক্ষত্রে। মহাকালের বিধানে এখন মৃগনক্ষত্রের পরাজয় এবং কৃত্তিকার জয় ঘোষণা করতে হবে। এই প্রাকৃতিক ব্যাপারকে রূপকের আকারে বর্ণনা করেছেন মহাভারত এবং পুরাণকার মৃগনক্ষত্র রূপী তারকাসুর কৃত্তিকারূপী কার্ত্তিকেয়ের হাতে নিহত হ'ল। অর্থাৎ মৃগনক্ষত্রে

শারদবিষুব তথা নববর্ষ-গণনা প্রবর্ত্তিত হ'ল। সেকালে নববর্ষ-দিনে যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বলিত হ'ত। অগ্নিবীজ থেকে কার্ত্তিকেয়ের জন্ম—এইরূপকের সাহায্যে পুরাণকার সেই তথ্যটুকুই পরিবেশন করতে চেয়েছেন। আর সপ্তর্ষি মণ্ডল এবং কৃত্তিকা সমসূত্রে অবস্থান করলে শারদবিষুব হ'ত, এই তথ্যটি বিধৃত হয়েছে কার্ত্তিকেয়ের ময়ূর বা কুক্কুট বাহনের কল্পনায়।

এ সব কত কালের কথা, মোটামুটি হিসেব করা যায়। কালিদাস গুপ্ত যুগে (খ্রীঃ ৪র্থ-৫ম শতক) জীবিত ছিলেন সুতরাং কুমারসম্ভবের কাহিনী দেড় হাজার বছরের পুরাতন। কালিদাস তাঁর কাহিনীর উপকরণ সংগ্রহ করেছিলেন মৎস্যপুরাণ থেকে; এই পুরাণের রচনাকাল আনুমানিক ১ম-২য় খ্রীষ্ট শতক। আর খ্রী-পূ পঞ্চদশ শতকে কৃত্তিকা নক্ষত্রে শারদবিষুব হ'ত, এই তথ্য বিধৃত আছে মহাভারতে। অন্য ভাবেও সময়টা জানা যায়। বর্তমানে ৭।৮ আশ্বিন শারদবিষুব হয়; যখনকার কথা হচ্ছে তখন হ'ত কার্ত্তিকের শেষে (যে-স্মৃতি ধরে এখন কার্তিক পূজা হয়। অতএব বিষুব-দিনের আরম্ভ কাল ১·৭৫ মাস পিছিয়ে এসেছে। বিষুবদিন একমাস পিছিয়ে আসে ২১৬০ বৎসরে। অতএব ২১৬০,১.৭৫ = ৩৭৮০ বৎসর পূর্বের কথা। স্থূল গণনায় খ্রী-পূ অষ্টাদশ শতক। বেদব্যাস খ্রী-পূ পঞ্চদশ শতকে জীবিত ছিলেন, এর অনেক প্রমাণ আছে। অতএব খ্রী-পূ অষ্টাদশ শতকের নৈসর্গিক ঘটনা লিপিবদ্ধ করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল না। আমাদের পূজাপার্বণে এবং পৌরাণিক উপাখ্যানে কত কালের কত কথা লুকিয়ে আছে, এবং পুরাণকারগণ কী অপরূপ কৌশলে আমাদের সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রেখেছেন, তা অনুধাবন করলে বিস্ময়ের অবধি থাকে না।

পরিমল গোস্বামী রচিত সর্বাধুনিক গ্রন্থ

প ত্র স্মৃ তি

লেখক কর্তৃক গৃহীত ৩৬ খানি ফোটোগ্রাফ, মূল্যবান্ মুদ্রণ, ৭৮ জন পত্র লেখক ও লেখিকার ৩৫০ খানি পত্র ও পত্রাংশ—আর তাদের ঘিরে লেখকের বিচিত্র স্মৃতি। বাংলা সাহিত্যে সম্পূর্ণ অভিনব। মূল্য বাইশ টাকা।

যাঁদের পত্র ঘিরে লেখকের স্মৃতি রচিত হয়েছে

অজিতকৃষ্ণ বসু—অঞ্জনা ভৌমিক—অতুলচন্দ্র বসু—অতুলানন্দ চক্রবর্তী—অমল হোম—অমিতা রায়—অমিয়া চৌধুরাণী—অশোক মৈত্র—আবদুল আজীজ আমান—আশু দে—ইন্দিরা দেবীচৌধুরাণী—কালিদাস নাগ—কালিদাস রায়—কিরণকুমার রায়—গীতশ্রী বন্দনা সেনগুপ্ত—গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য—গোপাল ঘোষ—গোপাল হালদার—চন্দ্রশেখর বেঙ্কট রামন্—জয়ন্তনাথ রায়—জয়ন্তী সেন—জাহান আরা বেগম—জীবনময় রায়—জ্যোতির্ময় ঘোষ—তপতী বিশ্বাস—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়—দিগিন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য—দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী—নলিনীকান্ত সরকার—নিখিলচন্দ্র দাস—নিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী—নীরদচন্দ্র চৌধুরী—নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়—পুলিনবিহারী সেন—পি. সি. সরকার—প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়—প্রমথ চৌধুরী—প্রমথনাথ বিশী—প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়—প্রেমেন্দ্র মিত্র—বনফুল—বনবিহারী মুখোপাধ্যায়—বারীন্দ্রকুমার ঘোষ—বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়—বিনয়কুমার সরকার—বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়—বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়—বিমলাকান্ত রায়চৌধুরী—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—মণীন্দ্রচন্দ্র সমাদ্দার—মণীষ ঘটক—মায়া বসু—মার্গারেট চ্যাটার্জী—মৈত্রেয়ী দেবী—রাজশেখর বসু—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—লীলা বন্দ্যোপাধ্যায়—লীলা মজুমদার—লীলা সিং—শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়—শশিশেখর বসু—শিবরাম চক্রবর্তী—শিশিরকুমার ভাদুড়ী—শীতলাকান্ত শীল—শোভা সেন—সতীনাথ ভাদুড়ী—সবিতা সেনগুপ্ত—সুধাকান্ত রায়চৌধুরী—সুধীরকুমার চৌধুরী—সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী—সৈয়দ মুজতবা আলী—হারীতকৃষ্ণ দেব—হেমলতা ঠাকুর।

পরিবেশক : রূপা অ্যাণ্ড কোং কলিকাতা-১২

পরিমল গোস্বামী রচিত

আধুনিক ব্যঙ্গ পরিচয়

মূল্য ছয় টাকা

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী বলেন—

বাংলা ভাষায় ব্যঙ্গ সাহিত্য সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ।

●

প্রেসিডেন্সি কলেজের বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক

শ্রীভবতোষ দত্ত বলেন—

আধুনিক ব্যঙ্গ পরিচয়ের ভূমিকাতে ব্যঙ্গের লক্ষণ যে রকম সুনির্দিষ্ট এবং পরিষ্কার করে বলা হয়েছে এমন আর কোন বইতে হয়েছে বলে জানি না।

পরিবেশক : নবগ্রন্থনা, ৮, কৈলাস বসু ষ্ট্রীট কলিকাতা-৬

বিহারীলাল : একটি আলোচনা

অরিন্দম দাশগুপ্ত

স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ-ই তাঁকে 'ভোরের পাখী' বলে আখ্যায়িত করলেন। আমরা, একশত বৎসর পেছিয়ে এসে লক্ষ্য করলুম সত্যি তিনি বাংলা সাহিত্যের কাব্য জগতে 'ভোরের পাখী।' এতদিন অব্দি যে কাব্য-জগতের সঙ্গে আমরা সীমাবদ্ধ ছিলুম, তাতে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে—রোমান্টিসিজমের বাহিরে গীতি-আলেখ্য বা গীতধর্মী লেখা। তাতে ছন্দ মাধুর্য্য থাকলেও কাব্যগুণরস সম্পন্ন হয়ে ওঠেনি, অন্যরূপে, তিনি অর্থাৎ বিহারীলাল কাব্য-জগতের মাঝে রোমান্টি-সিজমের সংস্পর্শে কাব্যের অন্য রূপ দিলেন। বাংলা কাব্য সাহিত্য রাতারাতি অন্য রূপ নিতে আরম্ভ করলো।

এবার বিহারীলালের সম্পর্কে ব্যাপকে যাওয়া যাক্। বাংলাদেশে (ভারতবর্ষে যখন ইংরেজ শাসন পুষ্ট অর্থাৎ বাঙ্গালী মুন্সীয়ানা সম্পূর্ণরূপে পর্য্যবসিত সেই সময়, অর্থাৎ ১৮৩৫ সালের ২১শে মে তিনি মধ্যবিত্ত এক যজমানের ঘরে জন্ম নিলেন। পিতা দীননাথের একমাত্র পুত্র, স্বভাবতই আদরের তারচেয়েও বড় কথা, মাত্র চার বছর বয়সে মাতৃহীন। মায়ের স্নেহবাৎসল্য ভুলে গেলেন কিশোর বিহারীলাল—চতুর্দিকের এক অপরূপ মায়া-জগতের টানে। উনিশ বৎসরের কিশোর বিহারীলাল—বিবাহে আবদ্ধ হবার আগে কিশোরী অভয়া দেবীর সঙ্গে প্রেমে পড়ে গেলেন। অর্থাৎ কিশোর কবি ছিলো মনে প্রাণে রোমান্টিক। রোমান্টিকতার রূপ আরো ব্যাপক হয়ে উঠলো, প্রেমিকা (পরে স্ত্রী) অভয়া দেবীর সংস্পর্শে। মাত্র তেইশ বছর বয়সে (সে সময়ে কলেজের ছাত্র মাত্র বিহারীলাল) অর্থাৎ ১৮৫৮ সালে তার প্রথম বই স্বপ্ন দর্শন রচিত হয়। স্বপ্ন দর্শন সম্পর্কে অন্য কোন অভিমতকে এস্থলে ব্যবহার করা যাবে না। কারণ তখন তিনি সামান্য কলেজের ছাত্র মাত্র। এর চেয়েও বড় এক পরিচয় রোমান্টিক কবি বিহারীলালের আছে। তিনি মনে প্রাণে প্রকৃতি-প্রেমিক। তাই, স্বভাবতঃ, তাঁর কাব্যের রূপ অন্যরূপ নিতে আরম্ভ করেছে বটে, ঠিক এত সময়, হয়তো বা নিয়তির নিষ্ঠুর বিধান মতে, রোমান্টিক কবির স্ত্রী অভয়া দেবীর, সন্তান প্রসব কালে বিয়োগ ঘটে। বিহারীলালের কাব্য • জগতে আরেকটি সুর বেজে উঠলো, তা হলো বিয়োগ-ব্যথার সুর। বিয়োগের যে চমৎকার রূপ থাকে, কিশোর কবিকে যা সজোরে আঘাত দিতে পারে, কবিতায় যা রূপ নিতে পারে, বিহারীলালই সম্ভবত একমাত্র কবি, তাঁর কাব্যে প্রথম স্থান পেল। কাব্য-জগতের সুর রাতারাতি বদলে গেল বিহারীলালের স্পর্শে।

এই ঘটনার চার বৎসর পরে, অর্থাৎ আঠারোশ' বাষট্টিতে এসে তাঁর দ্বিতীয় কাব্য গ্রন্থ প্রকাশিত হলো। তিনি নাম দিলেন সঙ্গীত-শতক। সঙ্গীত শতক লিখে ঠাকুর বংশের সংস্পর্শে এলেন। এই ঠাকুর বংশের নাম তখনও এত খ্যাতির রূপে ছিলো না; কিন্তু সঙ্গীত-জগতে অনন্য ও অসাধারণ দিক ছিলো এই বংশের। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও তাঁর পিতা এবং অন্যান্য সকলে সত্যিই একজন উঁচুদরের সঙ্গীতজ্ঞ। রতন রতনে চেনে। বিহারীলালকে চিনতে বিন্দুমাত্র ভুল করলেন না দেবেন্দ্রনাথ। যাদু কাঠির স্পর্শের মতন বিহারীলালের ঠাঁই হলো, ঠাকুরবাড়ীতে। এই ঠাঁইয়ের যে কত মূল্য তার প্রমাণ পরবর্তী কালে আমরা পাই রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য থেকে। কেবলমাত্র চার হাজারের—অধিক গান লিখে যিনি বাংলা সাহিত্যের অন্য দিক খুলে দিয়ে গেলেন। এই কিশোর রবীন্দ্রনাথ, তখন, বিহারী

লালের সংস্পর্শে এসে ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের মনে কাব্য-জগতের অন্য রূপ তুলে ধরে ছিলেন। সংগীত শতক (১৮৬০) বাংলা সাহিত্যের দিগন্তপ্রসারী কাব্য গ্রন্থ।

এরপরে দীর্ঘ দিন বিহারীলাল চুপ চাপ। আমরা টুকি-টাকি খুঁজে পেলুম বঙ্গ সুন্দরী, নিসর্গ সন্দর্শন ইত্যাদির খসড়া থেকে; কিন্তু ব্যাপকভাবে, বিহারী-লালের কোন রূপই পেলুম না। কেন পেলুম না? সে সম্পর্কে কোন অভিমত আমার জানা নেই। কেবল মনে হয়, তিনি (বিহারীলাল) সে সময় কাব্য-জগত থেকে বহু উর্দ্ধে উঠে গেছেন। সঙ্গীত শতক লেখবার মতন স্পৃহা আর তাঁর নেই; প্রেম-প্রীতি-প্রণয়-বিয়োগের-সুরের জন্য তার মন-প্রাণ উদগ্রীব তাই দীর্ঘ দিন কেবলমাত্র খসড়া লিখে কাটালেন এবং বোধ করি তা মঙ্গলের জন্য। কারণ, ১৮৭০ সালে এসে পেলুম: বঙ্গসুন্দরী। নিসর্গ সন্দর্শন। বন্ধু বিয়োগ প্রেম কাহিনী। অর্থাৎ আট বছর বাদে. বিহারীলালের হাতে চারটি কাব্য-গ্রন্থ রূপ নিলো—বাংলা সাহিত্যের কাব্য-জগত আরো বিস্তৃত হলো। এরপরে, আরো নয় বছর বাদে বিহারী লাল (১৮৭৯) লিখলেন সারদা মঙ্গল। এবং সমসাময়িক কিংবা কিছুপরে লিখলেন সাধের আসন। উনষাট বছর বয়সে তাঁর বিয়োগ ঘটলো।

এই সামান্য তথ্য পঞ্জীর উপরে ভিত্তি করে বিহারী লালের কাব্য-জগতের এক অসামান্য রূপ আমরা দেখতে পাই। তেইশ বছরের যে যুবক স্বপ্ন সন্দর্শন লিখে কাব্য-জগতে আসন করে নিলেন, ৪৪ বছর বয়েসে গিয়ে অন্তিম কাব্যের রূপ দিলেন; সারদা মঙ্গল লিখে বাংলা সাহিত্যের অন্য মোড় তিনি খুলে দিলেন। এই এত অল্প সময়ে, অল্প বললুম এই কারণে মাত্র ৮টি কাব্য-গ্রন্থের রচয়িতা বিহারীলাল জীবনে বহু ঘটনার সংস্পর্শে এসেছিলেন, সবচেয়ে বড় পরিচয় তিনি রোমান্টিক। তিনি সত্যিকারের প্রেমিক। প্রেমের মূল্য তিনি জানতেন। বিয়োগের যন্ত্রণাও তিনি অনুভব করেছেন এই বছর ভেতরে ঢুকে গিয়ে বিহারীলাল একের অধিক কাব্যের সাধনা করে গেলেন।

বিহারীলাল সম্পর্কে আরো বহু জানার আছে আমি কেবলমাত্র তাঁর জীবন পঞ্জীর স্কেচ করে দিলুম। আশা রাখি, ভবিষ্যতে তাঁর সম্পর্কে আরো ব্যাপক আলোচনা করা যাবে।

ছেলেদের পাততাড়ি

ইতিহাসের কথা

ভারতবর্ষের ইতিহাস পড়লে দেখা যায় যে মাঝে মাঝে কয়েকশ বছর পরে পরে এই দেশের লোকেদের রাজার শাসন আর অন্য নানা রকম শাসনের কথা নিয়ে তোলপাড় করার অভ্যাস আছে। ইতিহাস যখন ঠিক করে জানা ছিল না আর সে সব যুগে কি হয়েছিল সে কথা গল্পে উপাখ্যানে পুরানেই শুধু পাওয়া যায় সেই সময়েও রঘুর দিগ্‌ বিজয় রামের লঙ্কা বিজয় কিম্বা মহাভারতের কুরুপাণ্ডব যুদ্ধ ইত্যাদির কাহিনীর মধ্যেও ঐ জাতীয় তোলপাড়ের বর্ণনাই দেখতে পাওয়া যায়। ইতিহাস যখন পরিস্কার ভাবে লেখা হয়েছে তখনও প্রথম দিকের সব গোলযোগের মধ্যে রাজায় রাজায় যুদ্ধের কথার চেয়ে ধর্ম্মের অদল বদলের কথাই বেশী থাকতে দেখা যায়। জৈন কিম্বা বৌদ্ধ ধর্ম্ম যখন ভারতবর্ষের মানুষদের মধ্যে প্রচার করা হ'ল, তখন অনেক সময় নিজেদের পুরান ধর্ম্ম বদলিয়ে ঐ সব নূতন ধর্ম্ম মেনে নিলেন, তা হলেও কেউ তাঁদের যুদ্ধ করে বা গায়ের জোরে ধর্ম্ম বদলাতে বাধ্য করলেন বলে কখনই প্রায় দেখা যায় নি। ধর্ম্ম নিয়ে কোনও ঝগড়াই হয়নি এমন কথাও জোর করে বলা যায় না। বিম্বিসার বৌদ্ধ ধর্ম্মের সপক্ষে ছিলেন কিন্তু অজাতশত্রু ছিলেন তার বিরুদ্ধে। এর কারণ ছিল এই যে গৌতম বুদ্ধের খুড়তুত ভাই দেবদত্ত বুদ্ধের ধর্ম্ম সম্বন্ধে উল্টামত প্রচার করতেন, আর অজাতশত্রু ছিলেন দেবদত্তর বন্ধু আর সাহায্যকারী। কিন্তু এই ধরণের উল্টামত থাকা সত্ত্বেও বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রচার খুব বাধা পায় নি! নন্দ রাজাদের সময় মনে হয় যে বৌদ্ধ ধর্ম্ম ভারতের সব জায়গাতেই ছড়িয়ে পড়েছিল। গ্রীক রাজা ও দিগবিজয়ী মহাবীর আলেকজাণ্ডার যখন সুদূর ম্যাসিডোনিয়া থেকে ভারতের পাঞ্জাব অঞ্চল আক্রমণ করেন তখন তিনি বেশীদূর ভারতবর্ষের ভিতরে সৈন্যদল নিয়ে ঢুকবার চেষ্টা করেন নি। এর কারণ ছিল এই যে তাঁর গুপ্তচরেরা তাঁকে খবর দেয় যে ভারতের ভিতরে মহাপদ্ম নন্দ নামে এক সম্রাটের সাম্রাজ্য আছে যার সৈন্যদলে ২০০০০ ঘোড়সওয়ার, ২০০০০০ পদাতিক, ২০০০ রথী আর ৩০০০ হাতী আছে। কোন কোন সংবাদদাতা বলেন যে ঘোড়সওয়ারের সংখ্যা ৮০০০০। রথীর ৮০০০ আর হাতীর ৬০০০। অল্প সংখ্যক (পুরুরাজের হাতী ছিল ২০০) হাতীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে গ্রীক্ সৈন্যদের সে সম্বন্ধে ভয় হয়ে ছিল। তারা ৩০০০ হাজার ৬০০০ হাজার যুদ্ধ হস্তীর সঙ্গে লড়াই করতে হ'বে শুনে নিজেদের মধ্যে ভারতের ভিতরে না যাবার কথাই আত্মসম্মান রক্ষার অতি উত্তম পন্থা ব'লে বলাবলি করতে থাকে। আলেকজাণ্ডার যে পুরুরাজের সঙ্গে যুদ্ধ করবার পরে সিন্ধু নদে নৌকা জোগাড় ক'রে সমুদ্রপথে ব্যাবিলন চলে গেলেন তার মূলে ছিল তাঁর সৈন্যদের ভারতের লড়িয়ে হাতীর সঙ্গে যুদ্ধের অনিচ্ছা। এই হাতীগুলি দাঁতে লম্বা লম্বা তলোয়ার বেঁধে আর অনেক সময় তার সঙ্গে জ্বলন্ত মশাল বেঁধেও শত্রু সৈন্যদের তাড়িয়ে নিয়ে যেত। কয়েক হাজার হাতী যদি এই ভাবে দৌড়ে আসে তাহলে তার সামনে দাঁড়িয়ে লড়াই করা প্রায় অসম্ভব বল্লেও চলে। আলেকজাণ্ডারের কয়েক শ বছর পরেও সম্রাট স্কন্দগুপ্ত হূনদের ভারতবর্ষ থেকে তাড়িয়ে ছিলেন ঐ ভাবেই কয়েক হাজার হাতী দিয়ে তাদের আক্রমণ করে।

পারল না। ভারতের মানুষও ইংরেজের দিকে আর আগেকার মত শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে তাকাতে পারল না। দুই জাতের মধ্যে মিলিতভাবে একত্র বসবাসের সম্ভাবনা চিরকালের মত দূর হয়ে গেল। ইংরেজ গায়ের জোরে ভারতকে নিজেদের অধীন রাখবার চেষ্টা করতে লাগল। ভারতও তাদের যে কোন উপায়ে পারা যায় বিতাড়িত করবার উপায় খুঁজতে লাগল।

এই রকম অবস্থায় আমাদের দেশের জাতীয় কংগ্রেস স্থাপনা হ'ল। ভারতের রাষ্ট্রীয় অবস্থান যাতে ইংরেজের পায়ের তলায় না থেকে তাদের সমকক্ষের মতই হতে পারে জাতীয় কংগ্রেস শুধু সেই চেষ্টাই চালাতে লাগল। ৫০।৬০ বৎসর ধরে সেই চেষ্টাই চলতে লাগল। কখন শুধু তর্ক বিতর্ক কখন বিপ্লবের তলোয়ারের ঝনঝনানি। কখনও বা রক্তের ঢেউ বয়ে যাওয়া। সব রকমের বিবাদ কলহ চলতে থাকল। এর মধ্যে মুসলমানদের একটা দল গঠিত হল আর তাদের চেষ্টায় যেদিন ইংরেজ ভারতবর্ষকে ছেড়ে চলে গেল সেদিন ভারতবর্ষকে দুইভাগ করে দুই দেশ সৃষ্টি করা হ'ল। সেই অবস্থাই এখনও চলছে।

সাময়িকী

ভুট্টোকে ভুলিলে চলিবে না

ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় পরিস্থিতি বিচার করিতে হইলে ভাগকাল হইতেই পাকিস্থানের কথা সর্বাগ্রে খুঁটিয়া খুঁটিয়া দেখিয়া তবেই ভারতে কি হইবে অথবা হইবে না তাহার আলোচনা সম্ভব হইত। কারণ ভারত আন্তর্জাতিক অথবা অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে যাহা কিছুই করিবার চেষ্টা করিত তাহা করা যাইবে কি না তাহা নির্ভর করিত পাকিস্থান কি করিতেছে বহুলাংশে তাহারই উপর। আমাদের বাহির দেশ হইতে অর্থ সাহায্য লাভ, আমাদের বাজেটে সামরিক ব্যয়ের বোঝার ওজনের বাড়তি ঘাটতি, আমাদের অন্য দেশের সহিত মিতালি অথবা বন্ধুত্বের অভাব, সকল কথাই নির্ভর করিত পাকিস্থান হঠাৎ একটা যুদ্ধ লাগাইয়া বসিবে কি না, অথবা ভারতের বিরুদ্ধে প্রবলভাবে মিথ্যা অপপ্রচারের একটা নূতন প্লাবন আরম্ভ করিবে কি না তাহার উপর। ভারত যতই শান্তির পথে প্রতিষ্ঠিত থাকিবার চেষ্টা করুক না কেন, সীমান্তের ওপারে যদি শত্রুতার উন্মাদনায় বিভ্রান্তবুদ্ধি কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান হীন একরূপ একটি জাতি শাণিত অস্ত্র ধরিয়া শুধু কখন ভারতের উপর গিয়া ছুটিয়া পড়া সহজ হইবে এই চিন্তাতে মগ্ন থাকে, তাহা হইলে সেইরূপ অবস্থাতে ভারতের পক্ষে সেইরূপ শত্রুর উপস্থিতি অগ্রাহ্য করিয়া নিজের প্রগতির কার্য্যে সহজভাবে মনোনিবেশ করা কখনও সম্ভব হইতে পারিত না। এবং পারেও নাই। উপরন্তু আর একটা কথা এই বিষয়টাকে আরও জটিল করিয়া তুলিয়াছিল। ইহা হইল ভারতের অহিতাকাঙ্ক্ষী অন্য কয়েকটি বিদেশী রাষ্ট্রের কিছুটা প্রকাশ্যে ও কিছুটা গোপনে ভারত বিরুদ্ধতাতে আত্মনিয়োগ করিবার প্রচেষ্টা। এই সকল ভারতবিরুদ্ধতার মূলে কোন ঐতিহ্য ভিত্তিক কারণ না থাকায় বিরুদ্ধতাটা প্রকটভাবেই অহেতুকী রূপ ধারণ করিয়া রাষ্ট্রক্ষেত্রে উপস্থিত ছিল। যাহা অকারণে ঘটে

তাহার সম্বন্ধে কিছু বুঝিয়া স্থির করা কঠিন। এই জন্যই চৈনিক বা আরবী ভারতবিরুদ্ধতা সহজে বোধগম্য হওয়া সম্ভব হইত না। বৃটেন, আমেরিকা অথবা ঐ দলের অন্যদেশীয় রাষ্ট্র মহলেও ভারত বিরুদ্ধতা পাকিস্থানের খামখেয়ালির ফলে হঠাৎ অকারণে দেখা দিত। পাকিস্থান ছিল বৃটেনের মানস পুত্র। সুতরাং পাকিস্থানকে যেমন করিয়াই হউক চাঙ্গা করিয়া বাঁচাইয়া রাখা বৃটেনের একটা মহাকর্ত্তব্য কার্য্য বলিয়াই বৃটিশ কূটনীতিবিদগণ মনে করিতেন। পাকিস্থান যে কাশ্মীরের কিছুটা অংশ দখল করিয়া রাখিয়াছে এবং তাহা হইতে যে চীনকে কতকটা ভূভাগ খয়রাতি করিয়া দান করিয়াছে, ইহা বৃটেন-আমেরিকা দলের সাহায্য ব্যতীত কখনও সম্ভব হইত না। পাকিস্থানকে ভারত অনায়াসেই কাশ্মীর ত্যাগ করিয়া নিজ এলাকায় পালাইতে বাধ্য করিয়া দিতে পারিত, যদিনা সম্মিলিত জাতিসংঘের সাহায্যে আমেরিকা ও বৃটেন এরূপ মিথ্যার বন্যা বহাইত যাহাতে মনে হইতে পারিত যে কাশ্মীরের ঝগড়া একটা আন্তর্জাতিক রাজ্য সীমানার কলহের সমতুল্য। এখন তথাকথিত "আজাদ কাশ্মীর" হইয়া দাঁড়াইয়াছে পাকিস্থান অধিকৃত কাশ্মীর-অঞ্চল এবং বিশ্ব রাষ্ট্রসভায় পাকিস্থানের কাশ্মীরের এই অঞ্চল দখল করা আর সামরিভাবে বিনা অধিকারে জবর দখল করা বলিয়া পরিগণিত হইতেছে না। পাকিস্থান ও ভারতের মধ্যে যেন একটা চিরস্থায়ী প্রকাশ্য ঘোষণা বর্জ্জিত যুদ্ধই হইয়া চলিয়াছে। সে যুদ্ধ যথেচ্ছা হয় অথবা হয় না, তাহার আরম্ভ ও অবসান উক্ত দুই রাষ্ট্রের ইচ্ছামতই হয় এবং সম্মিলিত বিশ্বরাষ্ট্রসংঘ ইহা লইয়া যেন কিছুই করিতে সক্ষম নহেন, এইরূপ একটা অক্ষমতার অভিনয় আজ পঁচিশ বৎসর বৃটেন-আমেরিকা চালাইয়া আসিতেছেন।

বাংলাদেশ লইয়া যে ভারত—পাকিস্থান যুদ্ধ লাগিয়াছিল তাহাতেও চেষ্টা ছিল যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করিয়া যাহাতে সম্মিলিত বিশ্বরাষ্ট্রসংঘ পাকিস্থানকে বাংলাদেশ হইতে বিতাড়িত না হইবার ব্যবস্থা করিতে পারেন; কিন্তু পাকিস্থানের দুর্ভাগ্যবশতঃ ঐরূপ ব্যবস্থা হইবার পূর্বেই পাকিস্থান সমরবাহিনী আত্মসমর্পণ করিয়া বাংলাদেশ ভারতীয় সৈন্যদের হস্তে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইল। যদিও আমেরিকার সপ্তম নৌবাহিনী ভারত মহাসাগরে বিচরণ আরম্ভ করিয়াছিল ও ঢাকায় যুদ্ধ জাহাজ পাঠাইয়া অসহায় পাকিস্থানীদিগকে নিজদেশে প্রত্যাবর্ত্তনক্ষম করিতে সাহায্য করিবার কথাও তুলিয়াছিল; তবুও যুদ্ধের গতিবেগ অতিক্রত হইয়া যাওয়ায় সেই সকল পাকিস্থান সহায়ক কার্য্যকলাপ যথাকালে হইয়া উঠিতে পারিল না। সুতরাং বাংলা দেশ হইতে পাকিস্থানের বিদায় ব্যবস্থা কেহ প্রতিরোধ করিতে পারিল না।

কিন্তু এখনও পাকিস্থানের ভারতের গায়ের কাঁটা হইয়া থাকা শেষ হয় নাই। আমেরিকা, চীন ও অন্যান্য বহু অজানা ও অর্দ্ধজ্ঞাত জাতি এখনও পাকিস্থানকে ভারতের সহিত শত্রুতা চালাইতে সাহায্য করিয়া চলিয়াছেন। পাকিস্থানেও দুইটি দল গঠিত হইয়া পড়িতেছে। একদল চায় শান্তি ও ভারতের সহিত সখ্য। অপর দল চাহিতেছে পুরাতন পথেই চলিতে থাকা। প্রথম দলে যাহারা আছেন তাঁহাদের মধ্যে আছেন প্রাচীন উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের পাঠান বংশোদ্ভব অনেক ব্যক্তি এবং কিছু কিছু বালুচিস্থান ও সিন্ধুদেশবাসী মানুষ। পাঞ্জাব অঞ্চলের পাকিস্থানী যাহারা তাহারা প্রায় সকলেই ভারতবিদ্বেষী ও তাহাদের মধ্যেই চীন ও আমেরিকার অর্থপুষ্ট ভারত-বিরুদ্ধতা প্ররোচক, যুদ্ধোন্মাদনা প্রচারক, ধর্মান্ধ ব্যক্তির সংখ্যা অধিক। শ্রীভূট্টো যখন শান্তির কথা বলেন তখন এই সকল পাঞ্জাব অঞ্চলের ইসলামরক্ষক দেশ-মাতার কুসন্তানগণ ভূট্টোকে বহিষ্কার অথবা প্রাণে মারা প্রয়োজন এরূপ অপপ্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। ভুট্টো ভারতের সহিত সখ্য স্থাপন করিয়া পাকিস্থানকে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বাবলম্বী রাষ্ট্রে পরিণত করিবার আয়োজনের দিকে যাইবার চেষ্টা করেন, পাঞ্জাবী পাকিস্থানীগণ তখন ভুট্টোর সমর্থক :পাঠান বা বালুচি-

দিগকে পাকিস্থান ধ্বংসকারী ইসলামবিরোধী মহাপাপী বলিয়া রাষ্ট্র করিতে আরম্ভ করেন; ও ইহার ফলে লোক প্রশংসা পিপাসু ভুট্টো আবার কখন কখন উল্টা সুর গাহিতে আরম্ভ করেন। ইহার মধ্যে আবার আমেরিকা ও চীন বিনামূল্যে অস্ত্র সরবরাহ করিয়া পাঞ্জাবী সেনানায়কদিগের প্রচারের শক্তিবৃদ্ধি করিয়া থাকেন ও ইহাতে ভারত-পাকিস্থান মৈত্রী স্থাপন কার্য্যে আরও বাধা পড়িয়া যায়।

কাশ্মীর লইয়া গণ স্বাধীনতার দাবি পেশ করিয়া পাকিস্থান যে জগত সভায় মানবীয় অধিকারের মহা-পুরোহিতরূপে উপস্থিত হইতেন; বাংলাদেশের ব্যাপক গণহত্যা ও মানবীয় অধিকার নাশের পরে পাকিস্থানের সেই ভূমিকায় বিশ্ব রাষ্ট্রমঞ্চে অবতরণ আর ততটা সহজ থাকে নাই। কাশ্মীরের কথা ভুলিয়া পাকিস্থান সম্প্রতি আর তেমন প্রচার চেষ্টা করে না। ভুট্টো সাহেব বর্ত্তমানে দ্বিবিধ উপায়ে পাকিস্থান ও তাঁহার নিজের শক্তি বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। প্রথম হইল পাকিস্থানে নানাভাবে একনায়কত্বের সাধারণতন্ত্র বিরুদ্ধতার অবসান চেষ্টা করা ও জনসাধারণের রাষ্ট্রীয় অধিকার বৃদ্ধি করিয়া ক্রমে ক্রমে পাকিস্থানকে একটি প্রচলিত রীতি নীতি অনুগত সাধারণতন্ত্র অবলম্বী রাষ্ট্র হিসাবে গঠিত করিয়া তোলা। ইহা করিতে গিয়া যদি শ্রীভুট্টো নিজেই বহিষ্কৃত হইয়া যান সেই সম্ভাবনা আছে কিনা তাহা সকল সময় দেখিয়া দেখিয়া অগ্রগমন করাই সমীচীন বলিয়া শ্রীভুট্টোর রাষ্ট্র সংস্কারের গতিবেগ কোন সময়েই প্রবল হইতে পারে না। দ্বিতীয় পন্থা বক্তৃতা দিয়া নিজের প্রতিষ্ঠা দৃঢ় করা। শ্রীভুট্টোর বক্তৃতা দিবার ক্ষমতা সংজনস্বীকৃত ও তিনি পাঞ্জাব এলাকার বাহিরে নানা স্থানে দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়া নিজের মতামত প্রচার ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। ইহা সত্ত্বেও হয়ত শ্রীভুট্টো পদচ্যুত হইয়া যাইতে পারেন; কিন্তু তাহা হইবে কি না, অথবা তিনি চীন-আমেরিকার সাহায্যে আর একবার যুদ্ধ করিবেন কি না এ সকল কথার উত্তর দেওয়া সহজ নহে। কারণ বিশ্বের রাষ্ট্রীয় পরিস্থিতি ঠিক কোন দিকে যাইবে ও তাহার ফলে পশ্চিম ইয়োরোপীয় জাতি গোষ্ঠী, আমেরিকা, চীন, রুশিয়া ও আরব-ইসরায়েল সম্বন্ধ কোন দিকে যাইবে তাহার উপর পাকিস্থানকে তাহার সহায়কগণ কি নির্দ্দেশ দিবে তাহা নির্ভর করে। আরব-ইসরায়েল সম্বন্ধ, রুশ-চীনের রাজ্য সীমানার কলহ, আমেরিকার ভিয়েৎনাম ধর্ষণ চেষ্টা ও চীনের আভ্যন্তরীণ অবস্থা; এই সকল কথা উপেক্ষা করিয়া ভারত-পাকিস্থান বিরোধ বৃদ্ধি চেষ্টা বৃহৎ বৃহৎ শক্তিমান জাতিরা করিবেনা। সুতরাং বর্ত্তমানকালে অন্ততঃ কিছুদিন পাকিস্থান বিশ্ব রাষ্ট্র রঙ্গমঞ্চে কোনও বিশেষ ভূমিকায় অবতরণ করিতে পারিবেনা বলিয়াই মনে হয়।

আর একটা কথাও কাশ্মীর ক্ষেত্রে ক্রমশঃ প্রকট হইয়া উঠিতেছে। তাহা হইল পাকিস্থানের সহিত কোনও যোগাযোগ ঘনিষ্ঠতর করিবার অনিচ্ছা। অধিকাংশ কাশ্মীরী পূর্ব্ব হইতেই পাকিস্থানের সহিত ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধির বিরোধী ছিলেন; এখন তাহা আরও ব্যাপক হইয়া উঠিয়াছে। যে সকল ব্যক্তি, যাহারা সংখ্যায় অতি অল্পই আছেন, ভারতের সহিত কাশ্মীরের রাষ্ট্রীয় সংযোগ রক্ষা করিতে চাহেন না, তাঁহারাও পাকিস্থানের সহিত কোনও নূতন সম্বন্ধ গঠন করিতে ইচ্ছুক নহেন। এই অবস্থায় কাশ্মীরে পাকিস্থানী ভারত-বিরুদ্ধতার প্রচার বর্ত্তমানে ক্রমশঃ আরও কঠিন ও প্রায় অসম্ভব হইয়া উঠিতেছে।

দুইটি বিধ্বস্ত সহরের ভগ্নাবশেষ

অনেকেই মনে করেন যে ভিয়েৎনামের যুদ্ধ চলিতেছে শুধু আমেরিকান বিমান বাহিনীর ও উত্তর ভিয়েৎনামের সমর বাহিনীর মধ্যে এবং আক্রমণ ক্ষেত্র হইল উত্তর ভিয়েৎনামের হ্যানয় ও হাইফঙ্গ সহর দুইটি, যেগুলির উপর আমেরিকার বিমান অনবরত বোমা বর্ষণ করিয়া চলিয়াছে এবং সেই কার্যে নিযুক্ত কিছু বিমানও মধ্যে মধ্যে উত্তর ভিয়েৎনামীগণ গোলাগুলি মারিয়া ধ্বংস করিয়া দিতেছেন। কিন্তু এই মহাযুদ্ধ দক্ষিণ ভিয়েৎনামেও চলিতেছে এবং দক্ষিণ ভিয়েৎনামের দুইটি সহরও ঐ যুদ্ধের ফলে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু দক্ষিণ ভিয়েৎনামী সৈন্যগণ সহর দুইটি ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাই নাই; তাহারা অসীম বিক্রমে উত্তর ভিয়েৎনামীদিগকে সহরে প্রবেশ করিতে না দিয়া বাহিরে থাকিতেই বাধ্য করিয়া রাখিয়াছে। আমেরিকার "টাইম" পত্রিকার দুইজন সংবাদদাতা কিছুকাল পূর্ব্বে ঐ দুইটি সহর দেখিবার জন্য গমন করেন ও তাঁহারা যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহা টাইমে প্রকাশিত হয়।

কোয়াংট্রি ও অ্যান লক সহর দুইটির প্রথমটিতে পূর্ব্বে ১৫০০০ লোকের বাস ছিল। এখন সেখানে প্রায় ৪০০০ দক্ষিণ ভিয়েৎনামী সৈন্য আছে। অপর লোকের সংখ্যা মুষ্টিমেয়। সহরে প্রবেশ করিলে সর্ব্বত্র দেখা যায় শুধু ট্যাঙ্ক প্রভৃতি সামরিক যান ও অপরাপর অস্ত্রশস্ত্রের ভগ্নস্তূপ। মরিচা পড়িয়া রক্তবর্ণ হইয়া রহিয়াছে। কোয়াংট্রিতে বহুকাল ধরিয়া উত্তর ভিয়েৎনামীগণ ২০০০-৩০০০ বৃহৎ বৃহৎ গোলা ও রকেট নিক্ষেপ করিয়া সহরের কোনও স্থলেই কিছু আর অভগ্ন থাকিতে দেয় নাই। কিন্তু দক্ষিণ ভিয়েৎনামের সৈন্যবাহিনী ইহার প্রত্যুত্তরে আক্রমণ চালাইয়া চলিয়াছে এবং নিজেদের ঘাঁটি ছাড়িয়া এক হাতও হটিয়া যায় নাই। দক্ষিণ ভিয়েৎনাম বাহিনীর হতাহতের সংখ্যা সপ্তাহে ২০০ শতের অধিক হইয়াছে। তাহারা ইহার বহুগুণ উত্তর ভিয়েৎনামী সৈন্য বিনাশ করিয়াছে বলিয়া দাবি করিয়া থাকে। এত সৈন্য মারা যাওয়ার কারণ প্রধানত কম্যুনিষ্টদিগের প্রাণের মায়া ত্যাগ করিয়া দক্ষিণ ভিয়েৎনামীদিগের উপর অবিরাম আক্রমণ চালাইবার ফলে গত ডিসেম্বর মাসে সপ্তাহে প্রায় ২০০ হাজার করিয়া উত্তর ভিয়েৎনামী সৈন্য নিহত হয়। উত্তর ভিয়েৎনাম হইতে সামরিক মাল মশলা ও সৈন্যদিগের খাদ্যাদি আনয়ন একটা প্রায় অসম্ভব কার্য্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিছুকাল পূর্ব্বে কয়েকজন উত্তর ভিয়েৎনামী যুদ্ধবন্দী বলে যে তাহারা চারদিন কিছু খায় নাই। শান্তি স্থাপনের কথা চলিতে থাকিলেও কোয়াংট্রিতে দক্ষিণ ভিয়েৎনামী সৈন্যগণ যুদ্ধ পরিচালনায় কিছু মাত্র ঢিলা দেয় নাই।

নয় মাস পূর্ব্বে যখন দক্ষিণ ভিয়েৎনামীদিগকে উত্তর ভিয়েৎনামী কম্যুনিষ্টগণ অ্যান লকে আক্রমণ করিতে আরম্ভ করে তখন রাষ্ট্রপতি থুগেনভ্যানথিও আদেশ দেন যে ঐ সহরটিকে কোন মতেই ছাড়া হইবে না এবং উহা নিজেদের দখলে রাখিতেই হইবে। বস্তুতঃ সেইরূপই করা হয়। অ্যান লকের পতন আজ অবধি হয় নাই। রবার ব্যবসায়ের এই কেন্দ্রটিতে বাণিজ্য চলিত খুবই সতেজে। জন সংখ্যা ছিল এই সহরের প্রায় ২০০০০। বর্ত্তমানে এই সহরে অসামরিক অধিবাসী ২৫০ জনের অধিক হইবে না। এই সহরের দুই একটি ব্যতীত কোন গৃহই আর দাঁড়াইয়া নাই। যে দুই চারিটি আছে সেগুলিও অর্দ্ধভগ্ন। গির্জ্জা হাসপাতাল ও বালিকাদিগের স্কুল নিশ্চিহ্ন। সর্ব্বত্র অসংখ্য কবর দেখা যায় ও জনশ্রুতি যে কোন কোনটিতে কয়েক শত করিয়া নরনারীশিশুর কবর দেওয়া হইয়াছে। এক

সময় দিনে ১০০০ গোলা ও রকেট অ্যান লকের উপর বর্ষিত হইত। ঐ সংখ্যা পরে ৮০০০এ পৌছায়। তিন মাসে দক্ষিণ ভিয়েৎনামের সৈন্য সংখ্যার অ্যানলকে শতকরা সত্তর জন হতাহত হয়। কিন্তু অ্যানলক দখল কম্যুনিষ্ট বাহিনী করিতে সক্ষম হয় নাই। অ্যানলকের যুদ্ধ চলিতেছে এবং মনে হইতেছে চলিতেই থাকিবে। জল সরবরাহ নাই, বিদ্যুৎ সরবরাহও নাইই; কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্থায়ীভাবে নির্ম্মিত দোকান ঘরে কিছু কিছু কেনা বেচা চলিতেছে। যে সকল মানুষ অ্যানলক ত্যাগ করিয়া বাহিরে চলিয়া গিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই ফিরিয়া আসিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। শান্তি স্থাপিত হইলেই বহুলোক ফিরিয়া আসিবেন বলিয়াই মনে হয়।

বুলগেরিয়াতে বিজ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতির প্রসার

যে সকল ক্ষুদ্রাকার রাষ্ট্রে কলকারখানা স্থাপন করিয়া আর্থিক উন্নতি চেষ্টা হইয়া থাকে তাহার মধ্যে বুলগেরিয়ার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বুলগেরিয়ার কারখানাবাদে উন্নতি বহুলাংশে ঐ দেশের বৈজ্ঞানিকদিগের উপর নির্ভর করিয়া সাধিত হইয়াছে। বুলগেরিয়া রাষ্ট্র কর্তৃক প্রকাশিত 'নিউস ফ্রম বুলগেরিয়া' পত্রিকাতে এই বিষয়ে যাহা ছাপা হইয়াছে তাহা হইতে আমরা কিছু কিছু উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

বুলগেরিয়ার কাজ কারবার বিশেষ ভাবে বিজ্ঞানের উপর নির্ভরশীল এবং এই ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিকদিগের সহায়তা সদা সর্বদাই পাওয়া এবং ব্যবহার করা হইয়া থাকে। কারখানার উৎপাদন কার্য্যে একাদশ প্রকার ব্যবসায়ে বর্ত্তমানে বিজ্ঞানের বিশেষ ব্যবহার করা হয়। এই সকল কার্য্য পূর্ব্বে নিজ নিজ পথে চালিত হইত এবং সহজ সরল উপায়েই সকল কার্য্যের ব্যবস্থা করা হইত। সতের বৎসর পূর্ব্বে বুলগেরিয়াতে একটি বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয় যাহার কার্য্য হয় মুরগীর ব্যবসায় ও অন্যান্য মাংস বিক্রয় কার্য্য বৈজ্ঞানিক ভাবে সুনিয়ন্ত্রিত করিয়া যান্ত্রিক বিধির অবাধ গতিতে পরিচালনা সাধন করা। মুরগী ও অপরাপর মাংস ব্যবসায়ে ব্যবহৃত পশু পক্ষীর সুপ্রজনন, বর্দ্ধন ইত্যাদির ব্যবস্থা, কারবার চালনার উন্নতম আদর্শে প্রতিষ্ঠিত করিবার পদ্ধতি নির্ণয়নও এই প্রতিষ্ঠানের কার্য্য বলিয়া গণ্য হইত।

এই কার্য্য সূত্রে যে সকল সমস্যা উপস্থিত হয় তাহার সমাধান লইয়াই বর্ত্তমানে ও আগামী পাঁচ বৎসর কাল এই প্রতিষ্ঠানের বৈজ্ঞানিক গণ নিযুক্ত থাকিবেন। এখন অবধি প্রতিষ্ঠানটিতে যে সকল কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়াছে তাহার মধ্যে উল্লেখ করা যাইতে পারে যেগুলি তাহা হইল যান্ত্রিক উপায়ে পশুচর্ম্ম ছাড়ান ও শুখাইবার ব্যবস্থা; দেশের আর্থিক ও ভৌগোলিক অবস্থা বুঝিয়া নানা প্রকার খাদ্যবস্তু উৎপাদন করিবার আয়োজন; মাংস উৎপাদন যাহারা খাইবে তাহাদের শরীরের অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিবার পদ্ধতি নির্দ্ধারণ। নানা প্রকার রোগ থাকিলে কোন রোগের জন্য কিরূপ মাংস উপযুক্ত খাদ্য তাহা নির্ণয় করা। এই সকল কার্য্য বুলগেরিয়ার আকাডেমি অফ সায়েন্স এর খাদ্যগুণ বিচার প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় করা হইয়া থাকে। এখন যে কার্য্য বিশেষ ভাবে করা হইতেছে তাহা হইল শরীরের মেদভার লাঘব করার জন্য কিরূপ মাংস ভক্ষণ উপযুক্ত তাহা স্থির করা। শিশুদিগের খাদ্য লইয়াও ইঁহারা বহু কার্য্য করিতেছেন। মাংস বিদেশে চালান করিবার জন্য জীবাণুনাশক প্রক্রিয়ার ব্যবস্থা করা সম্বন্ধেও এই প্রতিষ্ঠান বহুকাল অনুশীলন পরিচালনা করিয়া আসিয়াছে। তেল মিলের সহিত সহযোগিতায় এই প্রতিষ্ঠান রাসায়নিক ঈস্ট উৎপাদন কার্য্যে বিশেষ সক্ষমতা প্রদর্শন করিয়াছে ও পৃথিবীর বহু দেশে এই কার্য্য লইয়া ব্যবহারিক চর্চা আরম্ভ হইয়াছে।

এই প্রতিষ্ঠান সুবৃহৎ আকারের পশুপালন কেন্দ্র গঠনের কয়েকটি নক্সা প্রস্তুত করিয়াছে। ৪০,০০০ হইতে ১০০০০০ শূকর, ৪০ লক্ষ হইতে ১ কোটি মুরগী, ৩ হইতে ৬ লক্ষ পরিণত বয়স্ক মোরগা মুরগী ও ১০,০০০ হইতে ২০০০০ গো বৎস লইয়া এই সকল কেন্দ্রে কার্য্য হইবে। মিশরের আরব রিপাবলিকের জন্যও মুরগী পালন

কেন্দ্রের নক্সা এইখান হইতেই প্রস্তুত করা হইয়াছে। এই প্রতিষ্ঠানে মাত্র ১৫০ জন বৈজ্ঞানিক ও অপর কর্ম্মী কাজ করেন। ইহার মধ্যে ৫০ জন অনুশীলনে, তিনজন শিক্ষাদানে ও ২০ জন উচ্চ মানের অনুশীলন কার্য্যে নিযুক্ত আছেন।

গরীব বলিতে কি বুঝায়

বৃটেনের কোন কোন পত্রিকায় খাদ্য দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি ও তাহার সহিত দারিদ্র্য দূর করিবার ব্যবস্থার অভাব লইয়া আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে। কারণ এই যে বৃটেনে দারিদ্র্য পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক দেখা যাইতেছে এবং ইহার প্রশমন একান্তভাবে আবশ্যক। বৃটেনে যাহাদের উপার্জ্জন উচ্চমানের অর্থাৎ যাহারা অধ্যক্ষপদে প্রতিষ্ঠিত তাহাদের তুলনায় যাহারা কোনও প্রকার কর্ম্মকৌশলহীন সাধারণ মজুর তাহাদিগের উপার্জ্জন কুড়ি ভাগের একভাগ অর্থাৎ শতকরা পাঁচ টাকা মাত্র। অর্থাৎ যদি "ম্যানেজার" জাতীয় কর্ম্মচারীগণ মাসিক পাঁচ হাজার টাকা বেতন পান তাহা হইলে সাধারণ মজুরদিগের বেতন বৃটেনে হইবে ২৫০ টাকা। ভারতবর্ষে কারখানা অথবা ব্যবসায়ী দফতরের কর্ম্মীদিগের বেতন বিচার করিলে অবস্থাটা অনেকাংশে বৃটেনেরই মতন দেখা যাইবে। কিন্তু পার্থক্যটা এই যে বৃটেনে প্রায় সকল কর্ম্মশক্তি-শালী ব্যক্তিই কর্ম্মে নিযুক্ত থাকেন এবং ভারতবর্ষে সেই স্থলে এক দশমাংশ ব্যক্তিও উপার্জ্জনক্ষম নহেন। অর্থাৎ ভারতের কর্ম্মীদিগের মধ্যে শতকরা ৭০।৮০ জন ব্যক্তিই বেকার, অর্দ্ধ বেকার ও অতি অল্প বেতনে গ্রামে বা যত্রতত্র যেন তেন প্রকারে কার্য্যে নিযুক্ত। এই সকল ব্যক্তির বাৎসরিক রোজগার যদি মাসিক হিসাবে দেখান যায় তাহা হইলে দেখা যায় যে ইহাদিগের উপার্জ্জন মাসিক ২০ টাকা হইতে পঞ্চাশ টাকা মাত্র। সুতরাং কারখানা ও ব্যবসায়ী কারবারের বেতনের তুলনা করিয়া ভারতবর্ষের দারিদ্র্যের গভীরতা নির্দ্ধারণ সম্ভব হয় না। ভারতবর্ষে প্রায় এক ক্রোরের অধিক ভিখারী আছে। ততধিক আছে তাহারা যাহারা ধর্ম্ম কর্ম্ম বা সন্ন্যাস অবলম্বনে দিন কাটায়। আমাদের গরীব যাহারা তাহাদের দারিদ্র্য সহজ সরল দারিদ্র্য নহে। দারিদ্র্য অপেক্ষা তাহার উপসর্গই অধিক জটিলতা ও সমস্যাসঙ্কুল।

৺প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ

ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ বসু ৺প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের যৌবন কালের বন্ধু। ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিকাল ইন্‌স্টিটিউটের সহিতও ডা সত্যেন্দ্রনাথ বসুর ঘনিষ্ট যোগ ছিল। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে ৺প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের একটি স্মৃতিসভা হয় ও তাহাতে অনেকে বক্তৃতা ও লিখিত স্মৃতি কথা পাঠ করেন। ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ বসু ঐ সভাতে পাঠ করিবার জন্য একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। উহা পরে তত্ত্বকৌমুদী পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। আমরা ঐ প্রবন্ধের অধিকাংশই এইখানে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

বয়সের বেশী তফাৎ নয়—প্রশান্ত মাত্র ৬।৭ মাসের বড় তবে আলাপ হয়েছিল যখন আমরা শিক্ষার এ্যাপ্রেন্টিসী শেষ করে কাজ শুরু করেছি—যা জীবনের প্রধান কাম্য বলে বেছে নেওয়া হল। স্বদেশীয়ানার ভরা জোয়ার। আমাদের বছরে যারা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভালমার্ক পেল কৃতীছাত্র বলে—প্রায় সকলেই ছুটে গেল—আচার্য জগদীশ বোস কিংবা আচার্য রায়ের লেবরেটারীতে। আমরা স্যর আশুতোষকে ধরে বিজ্ঞান কলেজে স্নাতকোত্তর ক্লাশের আয়োজনে রাজী করালাম—যদিও তখন প্রথম মহাযুদ্ধে বিদেশ থেকে যন্ত্রপাতির আমদানী প্রায় অসম্ভব। খুঁজে বের করলাম আমরা কোথায় দামী যন্ত্রপাতি নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে আছে। স্যর আশুতোষ আমাদের মুখ চেয়ে সে সব সংগ্রহ করে দিলেন। প্রভূত উৎসাহে যুবকেরা নতুন কাজে পা বাড়াল।

প্রশান্তর একটু সুবিধা ছিল। যুদ্ধের মধ্যেই কেমব্রিজ থেকে জয়টীকা পরে ফিরে এসেছে। গণিত এবং ফিজিক্‌সে (physics) সে দেশেই অনুসন্ধানে আত্মনিয়োগ করবে কিছুদিন—এই ভেবে দেশে এসেছিল। প্রেসিডেন্সীতে তখন উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব। বিদেশী কেহ আসছে না, সরকার তাকে

বসিয়ে দিলেন প্রোফেসর করে। এইখানেই নতুন অনেক কাজ প্রশান্তকে ব্যস্ত রাখলে। নতুন বিজ্ঞানের রীতি পড়ে প্রশান্ত মুগ্ধ। পরিসংখ্যান রীতি এদেশের অনেক সমস্যার ও বহু আলোচিত প্রশ্নের উপর আলোকপাত করতে পারে কি না ভাবতে বসলো। বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে সে লেগে গেল। হিন্দু সমাজে ব্রাহ্মণ-শূদ্রের স্তর বিভাগ ও মনুর বর্ণ-সঙ্কারের ভীতি থাকা সত্বেও, উচ্চস্তরের বাঙ্গালী মোটামুটি পরিসংখ্যান-সূত্র মতে প্রায় একই জনস্তর থেকে আসছে মনে হলো তার। পরিসংখ্যানের নির্নীত মতে একই গোষ্ঠী ধরতে হবে এদের আদি পুরুষ। এরজন্য অনেক মাপজোপ হলো—মাথার নানা বিশেষত্ব—হাত পায়ের দৈর্ঘ্য আরও কত কি।

এদিকে প্রেসিডেন্সী কলেজে ফিজিক্‌স্ পড়ান চলছে—আবার প্রথামত কিছু দিন বাদে আলিপুরের হাওয়া-ঘরের প্রধান হয়ে কাজ করতে হলো। নতুন পরিসংখ্যান রীতি নিবিড়ভাবে অধ্যয়ন ও প্রয়োগ করা শিখতে মহলানবিশের কাছে অনেক কৃতী ছাত্র গেল—সে সময় যাঁরা একত্র হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে অনেকে সুনাম ও সুখ্যাতি অর্জন করে পরিসংখ্যান শাস্ত্রের পুরোভাগে রয়েছেন। ভারতীয়দের এই কৃতিত্বের জন্য প্রশান্তর প্রশস্তি গাইতে হয়। বিদেশী সরকারকে সে বুঝালে এর সারবত্তা। দেশের অর্থ-নৈতিক উন্নতি করতে গেলে আগে বুঝতে হবে বর্তমানে আমরা কি ভাবে দুর্দশা বা তিমিরে আচ্ছন্ন আছি—তার জন্য দেশব্যাপী ঘুরে তথ্য সংগ্রহের আয়োজন চালালে। এবং বিশেষ ধরণের ব্যবস্থা অবলম্বন করলে কি হয় তার মোটামুটি ফল—এই সব ব্যাপারে পরিসংখ্যান রীতিই প্রধান—এটি সে সরকারকে বুঝিয়ে নতুন বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা করলে।

আরম্ভ হয়েছিল ব্রিটিশ যুগে—সুহ্‌রাওয়ার্দীর আমলে পরে নানা অদল বদল হ'ল—জওহরলাল এসে আশীর্বাদ করলেন—এই প্রয়াসকে। মহলানবিশের অক্লান্ত পরিশ্রমে আম্রপালীর চারিদিকে একটি প্রকাণ্ড শিক্ষা ও অনুসন্ধানক্ষেত্র গড়ে উঠলো বটগাছের মত সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ল—তার থেকে নানা প্রদেশে নানা সংস্থা। আজ সারাভারতে I. S. I. র শাখা-প্রশাখা বিরাজ করছে। কেন্দ্রীয় সরকারের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা রূপায়িত করতে মহলানবিশের পরিকল্পনা অনুযায়ী যোজনা মন্দিরে যে বিশেষজ্ঞরা বসে আছেন তারই আশ্রয় ও পরামর্শ নিতে হচ্ছে।

আমি ও সাহা প্রথমে শুধু ফিজিক্স পড়াই। যুদ্ধ শেষ হয়েছে এরই মধ্যে প্ল্যাঙ্ক—আইনষ্টাইন—বর(Bohr)—যাঁদের নাম এখন প্রাতঃস্মরণীয় বলে ঘরে ঘরে উচ্চারিত হচ্ছে—তাঁদের নতুন প্রচার আপেক্ষিকতাবাদ বা সমষ্টিকণাবাদের সবশেষ কথা—যা যুদ্ধের মধ্যে লেখা হয়েছিল—তারই খবর আসতে শুরু হয়েছে—মাত্র কয়েক বৎসর। ডাঃ দেবেন বোস তখন অন্তরীণ থেকে মুক্তি পেয়ে জার্মানি থেকে ফিরে এসে ৯২ অপার সারকুলার রোডে কাজ শুরু করেছেন। আমি তাঁর কাছে জার্মান শিখছি আইনষ্টাইনের নতুন নিবন্ধ আলোকের মহাকর্ষক্ষেত্রে বক্রগতি নিয়ে যা লেখা ছিল তার তর্জমা করছি। ডাঃ সাহা নিজেই জার্মান ভাষা আয়ত্ত করেছিলেন তিনি সে সময় আপেক্ষিকতাবাদের গণিতে যে শুদ্ধরূপ দেওয়া হল মিন্‌কাউস্কির সে সব লেখা তর্জমা করলেন। প্রশান্ত চন্দ্র ঐ বিষয়ে শিক্ষকতা করতেন—তিনিও একটি জানগর্ভ ভূমিকা লিখলেন। আমাদের যৌথ প্রয়াসে রিলেটিভিটির উপর এক সেট নিবন্ধ এক সঙ্গে করে পুস্তিকাকারে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশ করলেন। বেশ কিছুদিন চলেছিল দেশবিদেশে। এখন বোধহয় তা অপ্রাপ্য।

সাহা গেলেন এলাহাবাদে আমি ঢাকায়। প্রশান্ত বহুদিন প্রোফেসরী করে পরিপূর্ণ বয়সে অবসর গ্রহণ করলেন সরকারী কাজ থেকে—পরে বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে স্ট্যাটিটিক্‌স্ পড়াবার সুবন্দোবস্ত করে গেলেন। তারপর প্রায় বিশ বৎসর একনিষ্ঠভাবে সেবা করেছেন দেশমাতৃকার। তাঁর স্থির বিশ্বাস ছিল পরিসংখ্যানের পরিমাপেই আমরা সব সমস্যার বাস্তব রূপের প্রণিধান করতে পারবো ও সেই সঙ্গেই ভাবতে পারবো দেশের করণীয় কি। দেশ বিদেশে তাঁর প্রতিভার স্বীকৃতি

মিলেছে। পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই গিয়েছেন—এবং বিশ্বসংস্থা থেকে তাঁর প্রজ্ঞার স্বীকৃতি মিলেছে। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত প্রশান্তর ধ্যান ছিল পরিসংখ্যান।

নার্সিং হোমে যাবার আগে আমি দেখা করতে গিয়েছি—নানা গোলমাল উঠেছে আই. এস. আই-র পরিচালনার ব্যাপারে—তবু সে সব কথা শেষ করে আমাকে দেখাতে চাইলেন—নতুন এক পদ্ধতিতে কী ভাবে অগ্রসর হলে সহজে আর্থিক অবস্থার তুলনা করা যায়—ভাল কি মন্দ বোঝা যায় কত সহজে। তখনও তিনি নিঃসন্দেহ নন রোগশয্যায় শুয়ে চেয়েছেন কর্মীদের সহযোগিতা। পরে শুনেছি যা তিনি ভেবেছিলেন, তারই কথানুসারে যে ফলশ্রুতি পেয়েছেন তার সহকারীরা—তা শীঘ্রই প্রকাশ হবে।

বিজ্ঞানের কথাই বেশী করে বলেছি। তবে প্রশান্ত যে বহুদিন গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের নিবিড় সাহচর্য করেছিলেন তাতো সকলেই জানে। তাঁর সঙ্গে দেশ-বিদেশে গিয়েছেন। আইনষ্টাইনের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সময় গুরুদেবের পাশে প্রশান্ত। বিশ্বভারতীর গোড়া-পত্তনে বহু বৎসর সেখানে কর্মসচিব—পরে রবীন্দ্রনাথের আমলে সরে এসেছিলেন—তবে চিরকাল দেশের কল্যাণকর সব কাজেই প্রশান্তর সহানুভূতি। প্রতিভার সামনে সে সব সময় উচ্ছ্বাসে প্রশংসা করেছে। আচার্য ব্রজেন্দ্র শীলের সে একজন মহাভক্ত ছিল।

সমবয়সী কর্মীদের অনেকে তার সাহায্য কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করবে। সাহাকে যে অর্থানুকুল্য করেছিলেন, তাতে তার বিদেশযাত্রা সম্ভব হয়েছিল। রাজচন্দ্র বোস বা ৺সমর রায় তার হাতে গড়া মানুষ—আরও কত উদাহরণ সকলের মনে পড়বে।

জীবনের সায়াহ্নে প্রশান্তকে ভারতের বাহিরে কাটাতে হত অনেক মাস—তবে ভারতে বিজ্ঞানের প্রগতি ছিল তার স্থির লক্ষ্য। ভারতীয় বিজ্ঞান-কংগ্রেসের সভাপতি হয়েছেন—সেই সংস্থার অর্থসচিব হয়েছিলেন বহুকাল।

সরস্বতীর আরাধনা করা যায়—তবে প্রতিভার প্রকাশে নতুন রাস্তা তৈয়ারী করে দেশের বহুলোকের ধর্মপ্রচেষ্টার পথ করতে পারে—এইরূপ সৌভাগ্য কয়জনের ঘটে জীবনে? আমাদের বয়সী বিজ্ঞানীদের কথা ভাবতে গেলে ৺সাহা ও ৺মহলানবিশের মহান অবদানের কথা উঠে ও ভাবলে সম্ভ্রমে মাথা নত হয়। আজ বাঙালী বা ভারতীয় পরিসংখ্যানে দেশ বিদেশে খ্যাতি লাভ করেছে—আজ আই-এস-আইর আসন বিশ্বের দরবারে প্রধান স্তরে। এশিয়ার মধ্যে কলকাতার আম্রপালির নাম সর্ববিদিত। যে মহাপুরুষ অসম্ভবকে এইভাবে সম্ভব করেছেন তাঁর প্রতি শ্রদ্ধায় আমরা মাথা নত করছি।

কুষ্ঠ ও ধবল

৭০ বৎসরের চিকিৎসাকেন্দ্রে হাওড়া কুষ্ঠ-কুটীর হইতে নব আবিষ্কৃত ঔষধ দ্বারা দুঃসাধ্য কুষ্ঠ ও ধবল রোগীও অল্প দিনে সম্পূর্ণ রোগমুক্ত হইতেছেন। উহা ছাড়া একজিমা, সোরাইসিস, দুষ্টক্ষতাদিসহ কঠিন কঠিন চর্ম্ম-রোগও এখানকার সুনিপুণ চিকিৎসায় আরোগ্য হয়। বিনামূল্যে ব্যবস্থা ও চিকিৎসা-পুস্তকের জন্য লিখুন।

পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্ম্মা কবিরাজ, পি, বি, নং ৭, হাওড়া

শাখা :—৩৬নং হারিসন রোড, কলিকাতা-৯

দি বেঙ্গল আর্ট প্রিণ্টার

৭, ইণ্ডিয়ান মিরার ষ্ট্রীট,

কলিকাতা-১৩

দেশ-বিদেশের কথা

ভারত বিভাগ আর কত হইবে ?

ভারত স্বাধীন হইবার জন্য দুই ভাগে বিভক্ত হয়। পাকিস্থান ও ভারত। ভারতের হইল অনেকগুলি প্রদেশ কিন্তু সবগুলিই ভারতের অন্তর্ভুক্ত। তারপরে আরম্ভ হইল প্রদেশ বিভাগ। একটি প্রদেশকে কাটিয়া দুই তিন খণ্ড করা হইল এবং খণ্ডিত অংশগুলি শীঘ্রই নিজ শক্তিতে নিজের পায়ের উপর দাঁড়াইতে সক্ষম হইল। কিন্তু এই খণ্ডন কার্য্য চলিতেই থাকিল। ইহার প্রধান কারণ দলাদলি ও রেসারেসী; কিন্তু যাহারা এই দলাদলি ও রেসারেসীতে সামনে অগ্রসর হইয়া কাজ করিয়াছে, তাহারা ক্রমে ক্রমে নূতন নূতন উপপ্রদেশ সৃজনার্থে দল গঠন করিয়াছেন। ভারত সরকার এই ক্ষেত্রে কোনও প্রকার কঠোর নীতি অবলম্বনে সক্ষম হয়েন নাই। যুগবাণী পত্রিকাতে প্রকাশ :

ভারত সরকার নিজের দুর্বলচিত্ততা আসাম, কাশ্মীর ও অন্ধ্রের বিষয়ে এমন স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছেন যে সরকার তাঁর দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম কিনা এই প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। কাশ্মীরের ভারতভুক্তি চূড়ান্ত এই কথা বারবার বলার পর সরকার আবার শেখ আবদুল্লার সঙ্গে ঠিক ঐ বিষয়েই আলোচনা সুরু করেছেন। নয়া দিল্লীতে ভারত সরকারের পক্ষ থেকে শ্রী জি পার্থসারথি ও শেখ আবদুল্লার পক্ষ থেকে মিরজা আফজল বেগ দীর্ঘ আলোচনা চালাচ্ছেন শেখের বক্তব্য, তিনি কাশ্মীরের ভারতভুক্তি মানতে পারেন যদি ১৮৫৩ সালের আগে যেমন ছিল তেমনি কাশ্মীরের নিজস্ব সংবিধান, নিজস্ব সুপ্রীম কোর্ট ও নিজস্ব প্রধানমন্ত্রী থাকতে দেওয়া হয়। ভারত সরকার কাশ্মীর নিয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে বারবার সুরু করেছেন, রাষ্ট্রসঙ্ঘে অসংখ্যবার আলোচনা হয়েছেন, হাজার হাজার কোটি টাকা ও হাজার হাজার ভারতীয় সৈন্যের জীবন ব্যয় করেছেন—এখন ১২ বছর জলখাটা শেখের সঙ্গে আবার ঐ কাশ্মীরের ভারতভুক্তি নিয়েই আলোচনায় বসেছেন। ভারত সরকার কি সত্যই দেশের অখণ্ডতা ও জাতীয় সংহতিতে বিশ্বাস করেন ? তাহলে সেই মৌল প্রশ্নেই আবার শেখ ও তাঁর দূতের সঙ্গে আলোচনায় বসেছেন কেন ?

অন্ধ্রের পরিস্থিতি যেখানে পৌঁছেছে তাতে অন্ধ্র ও তেলেঙ্গানা দুটি পৃথক রাজ্যে বর্তমান অন্ধ্রকে ভাগ করে দেওয়া ছাড়া উপায় নেই। কিন্তু ভারত সরকার প্রাণপণ তাকে বাধা দিচ্ছেন ও অনড় জিদ ধরে বসে আছেন। ইতিপূর্বে তামিলনাড়ু ভেঙে অন্ধ্র একটি স্বতন্ত্র রাজ্য সৃষ্টি হয়েছিল, বৃহত্তর বোম্বাই ভেঙে হয়েছে মহারাষ্ট্র ও গুজরাট রাজ্য, পাঞ্জাব ও হরিয়ানাকে আলাদা করা হয়েছে, আসাম ভেঙে কতগুলি রাজ্য হয়েছে—তাহলে অন্ধ্র ভেঙে অন্ধ্র ও তেলেঙ্গানা দুটি আলাদা রাজ্য হলেই কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে। ভারত সরকারের আসল শঙ্কা অন্যত্র। ইতিপূর্বে ভাষার ভিত্তিতে রাজ্যগুলি গড়া হয়েছিল, এখন একই ভাষাভাষীরাই অন্ধ্রের বিভাগ দাবী করছে। একবার সেই বিভাগ মেনে নিলে উত্তরপ্রদেশ তিনটি পৃথক রাজ্যে ভাগ হয়ে যাবে, মহারাষ্ট্র ভাগ হবে বিদর্ভ ও মহারাষ্ট্র এই দুটি আলাদা রাজ্যে এবং বিহার থেকে মিথিলা বেরিয়ে আসার দাবী জানাবে। শ্রীমতী গান্ধী, শ্রী চব্যন ও বিহারের নেতারা এই সম্ভাবনার সম্মুখীন হতে চান না। উত্তর-প্রদেশ, মহারাষ্ট্র ও বিহার ভাগ হয়ে গেলে সারা ভারতে পশ্চিমবঙ্গ প্রধান রাজনৈতিক শক্তির অধিকারী রাজ্যে পরিণত হবে, বাঙালী ভারতে আবার তার প্রাক্তন গৌরব ও প্রাধান্য ফিরে পাবে এ কি বর্তমান কেন্দ্রীয় নেতারা বরদাস্ত করতে পারেন ?

আজ থেকে প্রায় ৭৫ বছর আগে, ১৮৯৮ সালে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন : "আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি ভাষা সম্বন্ধে ভারতবর্ষে যদি প্রাকৃতিক নির্বাচনের স্বাধীন হস্ত থাকে তবে বাংলা ভাষার পরাভবের আশঙ্কা নাই। বাঙালিভাষীর জনসংখ্যা ভারতবর্ষের অপরভাষীর তুলনায় অধিক।" (ভাষাবিচ্ছেদ)

ভারতে বাঙালীর এই প্রাধান্য খর্ব করার উদ্দেশ্যে সেকালে ইংরেজ সরকার অনেক ফন্দী করেছিল।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন: "ভেদনীতি ইংরেজের রাজকৌশল। সেই নীতি অবলম্বন করিয়া তাঁহারা আমাদের ভাষার ব্যবধানকে পূর্বাপেক্ষা স্থায়ী ও দৃঢ় করিবার চেষ্টায় আছেন। তাঁহারা বাংলাকে আসাম ও উড়িষ্যা হইতে যথাসম্ভব নির্বাসিত করিয়া স্থানীয় ভাষাগুলিকে কৃত্রিম উত্তেজনায় পারিস্ফুট করিয়া তুলিতে প্রবৃত্ত।" রবীন্দ্রনাথ আরও বলেছিলেন: "চাকরি পাওয়া সম্বন্ধে রাজপুরুষেরা বাঙালীর বিরুদ্ধে যে গণ্ডি টানিয়া দিয়াছেন এবং সেই সূত্রে বেহারি প্রভৃতি বঙ্গ-সাথীদের সহিত বাঙালির যে একটি ঈর্ষার সম্বন্ধ দাঁড় করাইয়াছেন তাহা আমরা অশুভেরই কারণ মনে করি।"

৭৫ বছর আগে ইংরেজ সরকার যা করেছিলেন বর্তমানে আমাদের স্বদেশীয় ভারত সরকার একই নীতি অবলম্বন করেছেন। আসামে অসামিয়াদের ভাষার নামে বাঙালীদের বিরুদ্ধে এমন প্রবলভাবে দাঁড় করানো হয়েছে যে যুক্তি তর্কের ভাষা অসমিয়ারা শুনতে আর প্রস্তুত নয়, তারা বাঙালীর রক্তে হস্তরঞ্জিত করেই উল্লাস বোধ করে।

ভারত সরকার আসামের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীশরৎচন্দ্র সিংহ ও কাছাড়ের কংগ্রেস নেতাদের দিল্লীতে ডেকে আসামের ভাষা সমস্যার যে মীমাংসা করতে চেয়েছেন তাতে ভারত সরকারের দুর্বলচিত্ততা, কিংবা, দুষ্ট মনোভাবের প্রকাশ পেয়েছে। আসামের বাঙালীদের মাতৃভাষায় শিক্ষালাভের কোনো অধিকার থাকবেনা কাছাড়ের কংগ্রেস নেতাদের দিয়ে এই কথা মানানোর চেষ্টা হয়েছে। তাহলে আমরা যদি বলি যে পশ্চিমবঙ্গে বাঙালী ছাড়া আর কারও মাতৃভাষায় শিক্ষালাভের অধিকার থাকবেনা, ভারত সরকার কি সেকথা মেনে নেবেন? আসামে বাঙালী মাইনরিটি নয়। জোর করে বাঙালীকে সংখ্যালঘু বলে প্রমাণ করা হচ্ছে। ১৯৭২ সালের সেন্সাস আসামে এখনো প্রকাশিত হয়নি কেন? অসমিয়ারাই আসামে মাইনরিটি হয়ে গিয়েছে বলে?

পশ্চিমবঙ্গে কুষ্ঠরোগের প্রাদুর্ভাব

পশ্চিম বঙ্গে কুষ্ঠরোগের প্রাদুর্ভাব বহুকাল হইতেই লক্ষিত হইয়া আসিতেছে। ১৯৩১ খৃঃ অব্দে যে গণনা করা হয় তাহাতে দেখা যায় যে ঐ সময় পশ্চিম বঙ্গে ২১ ৫৪ জন গলিত কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত ছিল। ইহার মধ্যে আসানসোল অঞ্চলের তিনটি জেলাতে ছিল বর্দ্ধমানে ২১৭৩, বীরভূমে ১১৯২ ও বাঁকুড়ায় ৩৪৯০ জন। বর্তমানে বিশেষজ্ঞদিগের মতে পশ্চিমবঙ্গে প্রায় তিন লক্ষ কুষ্ঠরোগী আছে। আসানসোলে মাইনস বোর্ড অফ হেল্থ এর অধীনে একটি কুষ্ঠ কুটির, ৭টি পৃথকভাবে রাখিয়া চিকিৎসা করিবার কেন্দ্র ও ১৫টি রোগী বাহির হইতে গিয়া চিকিৎসা করাইবার স্থান আছে। এই অঞ্চলে প্রায় আট লক্ষ মানুষের বাস এবং কুষ্ঠরোগীও আছে অনেক। সুতরাং সেই পরিস্থিতিতে চিকিৎসা ব্যবস্থা যথাযোগ্য আছে বলিয়া মনে হয় না। এই ব্যবস্থা ব্যতীত সরকারী চিকিৎসা কেন্দ্র খোলা হইয়াছে আরও ১৭টি জায়গায়। পূর্ব রেলওয়ের আসানসোলের হাসপাতালেও কুষ্ঠরোগের চিকিৎসা ব্যবস্থা আছে।

১৯১২ খৃঃ অব্দে প্রায় ১০০০০ কুষ্ঠ রোগী আসানসোল অঞ্চলে ধরা পড়ে। অর্থাৎ ইহার উপরে আরও কুষ্ঠরোগী ছিল যাহাদের বিষয় চিকিৎসা কেন্দ্র-গুলিতে কোনও খবর পৌছায় নাই। অনেকে অনুমান করেন যে এই অঞ্চলে প্রায় ২৪০০০ কুষ্ঠরোগী আছে ও ইহাদিগের মধ্যে ৩০০০ জন সংক্রামক অবস্থায় সাধারণের সহিত মেলামেশা করিয়া বসবাস করিতেছে। চিকিৎসার যে যে ব্যবস্থা আছে তাহাতে দৈনিক ১০০ জন রোগীরও চিকিৎসা সম্ভব হয় না। ৭ জন পাশ করা ডাক্তার ও ১৭ জন সাহায্যকারী নিযুক্ত আছেন। তাঁহারা ইহা অপেক্ষা অধিক কাজ করিতে পারেন না। মনে হয় যে রোগীদিগের মধ্যে শতকরা ৫০।৬০ জনের অধিক ব্যক্তির কোন চিকিৎসা হয় না। সকল রোগীর চিকিৎসা করিতে হইলে এখন যে ব্যবস্থা আছে তাহা অন্ততঃ দ্বিগুণ করিতে হইবে। ইহা ব্যতীত রোগ জানা

যাইলেই রোগীর অপর ব্যক্তিদিগের সহিত একত্র বাস ও মেলামেশা বন্ধ করিতে হইবে। কুষ্ঠ রোগ রোগীর সহিত একত্রবাস করিলেই সংক্রামিত হইতে পারে। পৃথক বাস করিলে রোগ সহজে অপরের হয় না।

১৯৭২এ যাঁহারা পরোলোক গিয়াছেন

আমাদের দেশে ১৯৭২ খৃঃ অব্দে যে সকল স্বনামধন্য ব্যক্তি স্বর্গধামে গমন করিয়াছেন তাঁহাদিগের মধ্যে চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারীর নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখ করা যায়। ডাঃ আনসারিও ঐ বৎসরে দেহ রক্ষা করিয়াছেন।

যে সকল বিদেশী ব্যক্তি ঐ বৎসরে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে আমেরিকার ভূতপূর্ব রাষ্ট্রপতি ট্রুমান প্রসিদ্ধ লোক। তিনি পৃথিবীতে প্রথম এটম বোমা ব্যবহার করাইয়াছিলেন; যাহার ফলে হিরোসিমা ও নাগাসাকিতে লক্ষ লক্ষ জাপানী নরনারী-শিশু হতাহত হইয়াছিলেন। মানবজাতির বিরুদ্ধে এত জঘন্য একটা অপরাধ ইতিপূর্বে কেহ কখন করে নাই। ক্যানাডার প্রধান মন্ত্রী লেষ্টার পিয়ারসনও এই বৎসরে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। বিখ্যাত লোকেদের মৃত্যুর কথা যদি বাদ দিয়া অপর ব্যক্তিদিগের কথাতে যাওয়া যায় তাহা হইলে প্রথমেই বলিতে হয় মিউনিখের হত্যাকাণ্ডের কথা। এই স্থলে আরব গুপ্তঘাতকগণ যেভাবে ইহুদি খেলোয়াড়দিগকে হত্যা করে, ইতিহাসে সচরাচর সেইরূপভাবে বিনাদোষে অজানা অচেনা মানুষকে হত্যা করার কাহিনী প্রায় শোনা যায় না। ইহা ব্যতীত চিঠি-বোমা পাঠাইয়া নরহত্যার কথাও উল্লেখযোগ্য। ১৯৭২ এ ভারতবর্ষে ঠিক মত বৃষ্টি পাত না হওয়ায় বহুলোক বহুসময়ে অনাহারে অর্দ্ধাহারে থাকিতে বাধ্য হইয়াছে। সাক্ষাৎভাবে ইহার ফলে কে কোথায় প্রাণ হারাইয়াছে তাহা বলা যায় না; কিন্তু ইহার ফলে বহুলোকের যে জীবনীশক্তি হ্রাস হইয়াছে ও তাহারা সহজেই নানান প্রকার ব্যাধি আক্রান্ত হইয়া প্রাণ হারাইয়াছে একথা অনায়াসেই বলা যাইতে পারে। ১৯৭২ খৃঃ অব্দ পৃথিবীর মানুষের পক্ষে মহা উপকারী বৎসর ছিল না। মানুষের উপকার অপেক্ষা অপকারই ঐ বৎসরে অধিক হইয়াছে।

বিজয়ী বাংলাদেশ নেতা

শেখ মুজিবুর রেহমান

: : রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত : :

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৭২তম ভাগ দ্বিতীয় খণ্ড | ফাল্গুন, ১৩৭৯ | ৫ম সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

সুইডেনের অর্থনীতিবিদের মার্কিন বিরুদ্ধ সমালোচনা

দিল্লীর হারভার্ড ক্লাবে একটি বিরাট জনসভায় সুইডেনের প্রসিদ্ধ অর্থনীতিবিদ্ অধ্যাপক গুন্নার মারদাল (Gunnar Myrdal) বলেন যে আমেরিকার জনসাধারণ যদি নিজেদের চক্ষে নিজেদের মনুষ্যত্ব অক্ষুণ্ণ দেখিয়া জীবন কাটাইতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলে তাঁহাদের আত্মশুদ্ধির প্রয়োজন হইবে। কারণ তাঁহারা ভিয়েৎনামে যে দুর্নীতিপূর্ণ, নির্দ্দয়, সকল বিধান বিরুদ্ধ অপরাধ প্রবণতা প্রদর্শন করিয়াছেন তাহাতে কোন জাতিই নিজেদের প্রতি নিজেদের আত্মসমর্থন বোধ রক্ষা করিয়া চলিতে পারে না। ইহা দ্বারা প্রমাণ হয় যে আমেরিকাকে পৃথিবীতে বাস করিতে হইলে তাঁহাদের যখন যাহা ইচ্ছা হইবে তখনই তাহা পাইতে হইবে এই মনোভাব ত্যাগ করিতে হইবে এবং পরাজয় হইলে তাহা মানিয়া লইতে কোন দ্বিধা বা মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া উল্টা প্রচার চেষ্টা ছাড়িতে হইবে। আমেরিকানদিগের রাষ্ট্র গঠনের মূল মন্ত্র হইল সাম্য, স্বাধীনতা ও ন্যায়ানুবর্ত্তিতা। এইরূপ পরিস্থিতিতে যদি এক ব্যক্তির অর্থাৎ রাষ্ট্রপতির হস্তে সীমাহীন ক্ষমতা ন্যস্ত করিয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে রাষ্ট্রের অবস্থা কি দাঁড়ায় তাহা ভাবিয়া দেখা প্রয়োজন। আমেরিকার জনসাধারণ ভিয়েৎনামের যুদ্ধ সম্বন্ধে বিপরীত মত পোষণ করিলেও রাষ্ট্রপতির আদেশে সেই যুদ্ধ কেহই এত কাল থামাইতে পারেন নাই। আমেরিকার শাসকগণ ভারতের অথবা সুইডেনের আমেরিকা-বিরুদ্ধ সমালোচনা বিরক্তির চক্ষে দেখিয়াছেন কিন্তু সুইডেনের জনসাধারণ তাঁহাদের প্রধানমন্ত্রীর সেই সমালোচনা সত্য বলিয়াই ধার্য্য করিয়াছেন। শ্রীমতী গান্ধী পরে তাঁহার সমালোচনা কিছুটা মোলায়েম করিয়া দিয়াছেন বলিয়া দেখা গিয়াছে।

সুইডেনের জনসাধারণ রাষ্ট্রপতি নিকসনের সকল

কার্য্যই সন্দেহের চক্ষে দেখিয়া থাকেন। ভিয়েৎনামের যুদ্ধ শেষ হওয়াটাতে শুধু এই কথাই প্রমাণ হয় যে ভিয়েৎনামের যুদ্ধে আমেরিকার পরাজয় হইয়াছে। যুদ্ধ শেষের কোনও সম্মানজনক নিষ্পত্তি হইল বলিয়া ধরা যাইতে পারে না। সুইডেনে আমেরিকা কোন রাজদূত পাঠাইতেছেন না বলিয়া সুইডেনের জনসাধারণ আমেরিকাকে অশ্রদ্ধার চক্ষেই দেখিতেছেন এবং একথাও বলিলে পৃথিবীর জনগণ আশ্চর্য্যই হইবেন যে আমেরিকার সুইডেন সম্বন্ধে মনোভাব যাহাই হউক না কেন বর্তমানে পূর্বের তুলনায় সুইডেন হইতে আমেরিকাতে বহু মাল রপ্তানী হইতেছে। এই ব্যবসাবৃদ্ধি ব্যবসাদারদিগের পারস্পরিক সম্বন্ধের ঘনিষ্ঠতা হইতেই হওয়া সম্ভব হইয়াছে। ইহার জন্য কোনও রাষ্ট্রপ্রতিনিধির উপস্থিতি আবশ্যক হয় নাই।

আমেরিকার রাষ্ট্রপতিকে শান্তির নোবেল প্রাইজ দেওয়ার কথাও কোন কোন আমেরিকান উত্থাপিত করিয়াছেন। ইহা শুধু তাঁহাদের নির্বুদ্ধিতাই প্রমাণ করে। আমেরিকান জনসাধারণ বর্ত্তমানে জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন চেষ্টা করিতেছেন ও ইহাতে তাঁহাদের প্রশংসাই করিতে হয়। তাঁহারা নিজেদের শাসক গোষ্ঠীর নিকটে আত্মসমর্পণ করিয়া বসিয়া নাই দেখিলে জগৎবাসীর মনে তাঁহাদিগের সম্বন্ধে আশারই সঞ্চার হইবে। ভারতের রপ্তানী বাণিজ্য কি কারণে যথাযথভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে না, এই কথার আলোচনা করিয়া অধ্যাপক মারদাল বলেন যে ভারতীয় উৎপাদন কার্য্য বিশ্বের উন্নত দেশ-গুলির চাহিদা অনুসারে ঠিক ভাবে চালিত হইতেছে না। ভারতের যে বিদেশী বিশেষজ্ঞ আনাইয়া নিজেদের কাজ কারবার পরিচালনা করিবার ব্যবস্থা চেষ্টা তাহাও অনেকক্ষেত্রে ক্ষতির কারণ হইয়াছে। কারণ বিদেশী বিশেষজ্ঞগণ অনেক সময়ই ব্যাপক অনুসন্ধিৎসার আশ্রয় গ্রহণে প্রস্তুত থাকেন না। ভারতের মানুষ চেষ্টা করিয়া নিজেদের কাজ নিজেরা করিতে শিক্ষা করিলে তাঁহাদের লাভ হইবে।

কম্যুনিষ্ট কংগ্রেস মিতালি

একথা সর্বজন স্বীকৃত যে কংগ্রেসের মতবাদ গান্ধীবাদের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। কংগ্রেস কার্য্যক্ষেত্রে কারখানাগত অর্থনীতি অনুসরণ করিলেও আদর্শক্ষেত্রে জাতির সকল মানুষের স্বাধীনভাবে নিজ নিজ বাসভূমিতে জীবিকা অর্জ্জন করিবার অধিকারকেই বড় করিয়া দেখিয়াছেন। ব্যক্তিগত স্বাধীনতা কংগ্রেসের নিকট চিরকালই একটা উচ্চস্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যুদ্ধ করিতে, প্রয়োজন হইলে, কংগ্রেস পিছপাও হয় নাই; কিন্তু যুদ্ধ করাতে কংগ্রেস কখনও হৃদয়মন দিয়া বিশ্বাস করে নাই; অহিংসা নীতিও কংগ্রেসের আদর্শ। কংগ্রেস আধ্যাত্মিকতায় বিশ্বাসী ও নাস্তিকতার বিরোধী, একথাও ভারতবাসী জনগণ সকলেই জানেন। এইরূপ অবস্থায় কংগ্রেস-কম্যুনিষ্টদল হঠাৎ যদি গভীর সখ্যের অভিনয় করেন তাহা হইলে তাহা যে শুধু অভিনয় ও মূলতঃ সুবিধাবাদজাত একটা মহা মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত সে কথা কাহাকেও হাতে ধরিয়া প্রমাণ দিয়া বুঝাইবার প্রয়োজন না হওয়াই স্বাভাবিক। আমাদের যে স্বাধীনতা সংগ্রাম, যাহা ১৯৪৭ খৃঃষ্টাব্দে প্রায় একশত বৎসর চালিত থাকিয়া এক প্রকারে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়; সেই স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার উৎস ব্যক্তিগত স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার ভিতর দিয়াই উৎসারিত হইয়াছিল। ব্যক্তি কাহারও অধীনে থাকিয়া মুখ বন্ধ করিয়া অন্যের হুকুমে চলিতে হইলে সে অবস্থা অসহ্য মনে করে এবং প্রাণপণ চেষ্টা করে যাহাতে সেই পরদাসত্বের যথাশীঘ্র সম্ভব অবসান হয়। যে অন্তরের অনুভূতি ও আগ্রহ মানুষকে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামে অনুপ্রাণিত করে সে আবেগ সকল মানুষেরই ব্যক্তিগত অনুভূতির বা উপলব্ধির কথা। অর্থাৎ ব্যক্তিই নিজের মুক্তি ও স্বাধীনতা কামনা করিয়া পরের অধীনতা শৃঙ্খল ভাঙ্গিবার চেষ্টা প্রথমে করে ও তাহা সাধিত হইলে সেই দাসত্ব মোচনজাত আনন্দ উপভোগ করিয়াই বৃহত্তর ক্ষেত্রের মুক্তি ও স্বাধীনতার কথা একক বা সমবেতভাবে কল্পনা করিতে সক্ষম হয়। নিজের জীবনযাত্রা নিজের ইচ্ছা অনুগতভাবে নির্ব্বাহ করিবার অধিকার হইতেই ক্রমে ক্রমে জাতীয় জীবনে স্বায়ত্তশাসনের আকাঙ্ক্ষার উদ্ভব হয়। এই কারণে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার আদর্শের

উপর সাধারণতন্ত্র আশ্রিত স্বাধীন রাষ্ট্র শাসন পন্থা গঠিত হয় তাহার সহিত ব্যক্তিস্বাধীনতা খর্ব্বকর কম্যুনিজমের সমন্বয় সাধন একটা অসম্ভবকে সম্ভব করিবার কষ্টকল্পিত উদ্ভাবনা মাত্র। যাহা নিজের চেষ্টায় নিজের আগ্রহে লওয়া হয় তাহার সহিত বাধ্যতামূলক ভাবে পরদাক্ষিণ্য-জাত দানের একটা জাতিগত পার্থক্য আছে। একথা কাহাকেও বুঝাইয়া দেওয়ার আবশ্যকতা থাকে না। তেমনই অপরের শাসন শারীরিক ও মানসিকভাবে যতই উপভোগ্য ও পুষ্টিকর হউক না কেন তাহা কখনও স্বায়ত্তশাসনের সহিত একপঙ্‌ক্তিতে উপবিষ্ট হইতে পারে না। কম্যুনিজম হইল নির্দ্দেশ ও নিয়ন্ত্রণের দাসত্ব, সে নির্দ্দেশ ও নিয়ন্ত্রণ যতই উৎকৃষ্ট হউক না কেন। নির্দ্দেশ ও নিয়ন্ত্রণের স্বভাব হইল ক্রমশঃ প্রাণহীন ও আড়ষ্টভাব গ্রহণ করা। এই কারণে কোন বিশেষ সময়ে কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য কঠিন নিয়ন্ত্রণের দ্বারা চালিত হওয়া লাভজনক হইলেও জীবন-যাত্রার চিরাচরিত পন্থা হিসাবে তাহার অনুসরণ কখনই মঙ্গলকর হয় না। মানুষের মঙ্গল সাধন করিতে হইলে মানুষের প্রবৃত্তি হৃদয় মন সর্ব্বদাই শ্রেষ্ঠ পথ প্রদর্শক বলিয়া স্বীকৃত হইবে। যান্ত্রিক পরিবর্ত্তন জ্ঞাপক "মিটার" ঘড়ি দেখিয়া মঙ্গলের অনুসরণে দিগ্‌দর্শন কখন সম্ভব হইতে পারে না। অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। ব্যক্তি স্বাধীনতার মুক্ত আকাশের হাওয়ায় যাহারা বিচরণ করিতে সক্ষম তাহারা কখনও কম্যুনিজমের শৃঙ্খল ধারণ করিতে প্রস্তুত হইতে পারে না, সে শৃঙ্খল যতই অপরূপ স্বর্ণ নির্মিত হউক না কেন।

চাকুরী পাইবার অধিকার

কোন চাকুরী খালি হইলে তাহাতে নিযুক্ত হইবার অধিকার স্থানীয় ব্যক্তিদিগের অন্য সকল উমেদারের তুলনায় অধিক বহিয়া থাকে কি না এই কথার বিচার করিতে হইলে অধিকার অনধিকার সম্বন্ধে যাহা বলা হয় তাহার বিশ্লেষণ করা আবশ্যক হয়। চাকুরী পাওয়া না পাওয়া অর্থ-নৈতিক বিলিব্যবস্থার কথা। যে কোনও স্থানে যে সকল অর্থ-নৈতিক অবস্থা উপস্থিত থাকিতে দেখা যায় চাকুরী পাওয়ার সুবিধাও সেই সকলের অন্তর্গত। অর্থাৎ যেমন জমি খালি থাকিলে জমি ক্রয়ের অথবা খাজনা বা ভাড়া দিয়া লইবার অধিকার একটা অর্থ-নৈতিক অধিকার। চাকুরী পাইবার অধিকারও সেই জাতীয়ই অধিকার। অপর যে সকল অর্থ-নৈতিক অধিকার স্থানীয়ভাবে উপস্থিত থাকিতে দেখা যায় তাহার মধ্যে বলা যায় ব্যবসা ফাঁদিবার, দোকান খুলিবার, কৃষকের কার্য্য করিবার, শিক্ষকতা, ওকালতি করিবার ইত্যাদি ইত্যাদি বহু প্রকারের কার্য্য থাকে। যদি চাকুরী করিবার অধিকার স্থানীয় ব্যক্তি-দিগের জন্য সর্ব্বাগ্রে বিশেষ করিয়া সংরক্ষিত করিয়া রাখা হয় এবং তাহাদিগকেই অপরের তুলনায়, অধিক দাবী আছে বলিয়া সর্ব্বপূর্বে বাছিয়া লইবার রীতি প্রচলিত করা হয়; তাহা হইলে ঐ নীতি ও রীতি অনুসরণ শুধু চাকুরীতেই শেষ হইতে পারে না। ব্যবসা বাণিজ্য ইত্যাদি সকল অর্থ-নৈতিক ক্ষেত্রেই স্থানীয় ব্যক্তিদিগের অধিকার বিশেষ করিয়া সুরক্ষিত করিবার ব্যবস্থাও তৎসঙ্গেই করিতে হয়। যদি দেখা যায়, যে-কোনও স্থানে, অর্থাৎ প্রদেশে, ব্যবসা বাণিজ্য, দোকানপাট প্রভৃতি অপর প্রদেশের ধনিকগণ অবাধে ভোগ দখল করিতেছে এবং যখন ইচ্ছা অফিস দফতর কারখানা হইতে স্থানীয় লোকদিগকে সরাইয়া দিয়া নিজ দেশের অথবা কর্ম্মকেন্দ্রের বাহিরের লোকদিগকে আনিয়া স্থানীয়দিগের জায়গায় কর্ম্মে মোতায়েন করিতেছে, তাহা হইলে এই স্থানীয় লোকের বিশেষ অধিকার স্বীকৃতির নিয়ম অনুসরণ করিয়া ঐ সকল অন্য প্রদেশবাসী কারবারীদিগের সকল অর্থ-নৈতিক প্রচেষ্টাতেই স্থানীয়তার অধিকার পূর্ত্তির ও বাধ্যতামূলকভাবে প্রয়োগ করা আবশ্যক হয়। শুধু খুচরা দুই-চারিটি চাকুরীতে স্থানীয় লোকদের রাখা হওয়া দরকার বলিয়া ক্ষান্ত থাকিলেই চলিবে না।

পশ্চিমবঙ্গে অবাঙ্গালীদিগের চাকুরী হইয়া থাকে অসংখ্য এবং উপার্জ্জনের অপরাপর পথও উন্মুক্ত থাকে

অবাধে। কর্মক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে মজুরী করিয়াও থাকে লক্ষ লক্ষ অবাঙ্গালী। ইহার মূলে আছে অবাঙ্গালীদিগের একজোট হইয়া সকল ব্যবসা বাণিজ্য নিজেদের করায়ত্ত করিয়া লইবার চেষ্টা এবং অবাঙ্গালী মুটিয়া মজুরদিগের অল্প বেতনে শ্রম বিক্রয় করিবার আগ্রহ। তাহারা বাঙ্গালীদিগের তুলনায় অধিক কর্ম কৌশলী নহে, কিন্তু বাঙ্গালী অপেক্ষা অধিক পরিশ্রমী। এই কারণে নিয়োগ কর্ত্তাগণ তাহাদিগকে সাধারণ অল্প কৌশলের কর্ম্মে নিয়োগ করিতে সহজেই প্রস্তুত হইয়া থাকেন। ইহার মধ্যে একথাও থাকে যে নিয়োগ কর্ত্তাগণ অনেক স্থলেই অবাঙ্গালী হওয়াতে তাহাদের মধ্যে বাঙ্গালী নিয়োগেচ্ছা প্রবলভাবে উপস্থিত থাকিতে দেখা যায় না। যাহারা বাঙ্গালী না হইলেও পশ্চিমবঙ্গে কাজ করিয়া অথবা কারবার চালাইয়া উপার্জ্জন করিয়া জীবন নির্ব্বাহ করে তাহাদের মধ্যে সরকারী চাকুরী করেন অল্প লোকেই। যাঁহারা মজুরি করেন অথবা বেসরকারী দফতরে চাকুরী করেন তাঁহারাই সংখ্যায় অধিক। এই পরিস্থিতিতে অর্থনীতি ক্ষেত্রে ব্যাপক সংস্কার ব্যবস্থা না করিলে বাঙ্গালীর বেকারত্ব দূর হইতে পারে না। ভারতের সংবিধানে সকল ভারতীয়ের কর্ম্মের অধিকার সর্বভারত বিস্তৃত। কার্যতঃ কিন্তু প্রাদেশিকতা সর্ব্বত্রই উৎকটভাবে সমুপস্থিত। পশ্চিমবঙ্গে এই উৎকট ভাব লক্ষিত হয় না। ইহার মূলে আছে অবাঙ্গালীদিগের প্রতি কংগ্রেসের সহানুভূতি এবং সাধারণ বাঙ্গালীর মধ্যে অবাঙ্গালী বিরোধের অভাব। অন্য প্রদেশেও সাধারণ কর্ম্মীগণ বাঙ্গালী বিরোধে তৎপর নহে। যাহারা বাঙ্গালীদিগের বিরুদ্ধতা করে তাহারা অধিকাংশই ছাত্র অথবা ছাত্র জাতীয় শিক্ষিত ব্যক্তি যাহারা ভিতরে ভিতরে রাষ্ট্রীয়দলগুলির সহিত সংযুক্ত আছে। তাহারা কোন দল বিশেষের দ্বারা নিযুক্ত অথবা বিদেশী সহায়তায় পুষ্ট একথার উত্তর দেওয়া সহজ নহে। দল যদি গঠিত হয়, প্রাদেশিকতাকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্দেশ্যে, তাহা হইলে সে সকল দল সর্ব্বভারতীয় নহে। সেগুলি প্রদেশের লোকেদের নিজেদের সুবিধার জন্য গঠিত। সকল প্রদেশেই এই প্রকারের দল গঠিত হইতেছে ও কোথাও কোথাও এই সকল দলভুক্ত ব্যক্তিগণ অন্য প্রদেশের লোকের উপর জোরজুলুম করিয়া থাকে। আসামে ও উড়িষ্যায় বাঙ্গালী বিরুদ্ধতা কিম্বা মহারাষ্ট্রে দক্ষিণ ভারতীয়দিগের উপর স্বদেশে ফিরিয়া যাইবার জন্য চাপ দেওয়া এই জাতীয় উৎপীড়ন নীতি অনুসরণের উদাহরণ। আরও বহু প্রদেশে নানাভাবে প্রাদেশিক বা আঞ্চলিক অধিকার দাবি করিয়া আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে।

একথা সর্ব্বজন স্বীকৃত যে স্থানীয় লোকদের অর্থনৈতিক অধিকার দাবি করার মধ্যে অন্যায় কিছু নাই। যে যেখানে জন্মিয়াছে ও বাস করে সে যদি সেই স্থলেই কাজ কারবার করিয়া জীবন নির্ব্বাহ করিতে পারে তাহা হইলে নানাপ্রকার সামাজিক, পারিবারিক ও অন্য সুবিধা সহজেই হইতে পারে। অযথা দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়া কাহাকেও দূরদেশে বা দূরস্থিত কর্ম্মক্ষেত্রে যাইতে হয় না। জীবননির্ব্বাহের খরচও অল্প হয় এবং নানা বিষয়ে আত্মীয় স্বজনের সহায়তা লাভ সহজ হয়। কারখানা প্রভৃতিতেও কর্ম্মীদিগের নিবাস ব্যবস্থার খরচ কম হয় এবং স্ত্রী জাতীয় কর্ম্মীদিগের কর্মে নিযুক্ত থাকার সময় সন্তানাদির রক্ষণাবেক্ষণও সহজে ও অল্প ব্যয়ে সাধিত হয়। যে কোন স্থলেই মানুষ বাস করে না কেন, তাহার উপার্জ্জন ব্যবস্থা ও জীবনযাত্রার আনুষঙ্গিক নানা আয়োজনের বিষয়ে একটা স্বয়ংসম্পূর্ণতা সকল সময়েই লাভজনক হয়। দূর হইতে কর্ম্মী, উৎপাদনের উপকরণ, ভোগের বস্তু ইত্যাদি আনাইতে হইলে তাহার জন্য একটা আঞ্চলিক বা জাতীয় অপব্যয়ের সম্ভাবনার সৃষ্টি হয়। অপব্যয় হয়ও এবং তাহা নিবারণ করিতে হইলে স্থানীয় লোকেদের যত্রতত্র গমনাগমন না করিয়া নিজ বাসস্থানে কর্ম্মের সুবিধা পাওয়ার আয়োজন করিতে হয়। এক কথায় অর্থনীতির দিক হইতে উৎপাদন কারক ব্যক্তি ও বস্তুর নিয়োগ ও ব্যবহার সর্ব্বাপেক্ষা লাভজনকভাবে করিতে হইলে যে অঞ্চলে

কাজ হইবে সেইস্থানের কর্ম্মী ও উৎপাদনের উপকরণ অধিকতম ব্যবহার করিবার চেষ্টাই শ্রেষ্ঠপন্থা। দূর হইতে কর্ম্মী বা উপাদান আনাইবার ব্যবস্থা লোকসানের কারণ হইয়া দাঁড়ায়।

অর্থনীতির কথা বাদ দিয়া যদি শুধু মানুষের ইচ্ছা অনিচ্ছা, সুখ সুবিধা ও মানসিক শান্তির কথা আলোচনা করা যায় তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, মানুষ হাতের কাছে কাজ পাইলে দূরে যাইতে কখনই চাহে না। যেখানে বন্ধু বান্ধব, আত্মীয় স্বজন সেইখানেই যদি কেহ থাকিয়া উপার্জ্জনও করিতে পারে তাহা হইলে তাহার অন্যত্র গমন করিবার ইচ্ছা কখনও জাগ্রত হইতে পারে না। যেখানে পারিপার্শ্বিক পূর্ণ পরিচিত সেখানেই থাকিতে পারিলে মানুষ সুখে শান্তিতে কর্ম্মে আত্মনিয়োগ করিতে সক্ষম হয়। ইহাতে নানাপ্রকার লাভও হওয়া সম্ভব হয় যাহা দূর দেশে অজানা পরিবেশে হওয়া সম্ভব হয় না। স্থানীয় কর্ম্মী যদি পাওয়া যায় তাহা হইলে অন্য স্থানের কর্ম্মী লইয়া আসিয়া কাজ করান অর্থ-নৈতিক আদর্শ বিরুদ্ধ ও অবাঞ্ছনীয়।

ভারতের দরিদ্র কাহারা

উৎপাদনে পূর্ণ উদ্যমে আত্মনিয়োগের সুবিধা ও সুযোগের অভাবই দেশের মানুষের দারিদ্র্যের প্রধান কারণ। ইহার অর্থ এই নহে যে যেখানেই দরিদ্র মানুষ আছে সেখানেই সেই সকল মানুষের কর্ম্মে নিযুক্ত হইবার সুযোগ সুবিধা নাই। অনেক ক্ষেত্রে কর্ম্মে পূর্ণরূপে নিযুক্ত থাকিয়া এবং যথেষ্ট উৎপাদন করিয়াও মানুষ ধনিকের শোষণনীতির আক্রমণে দরিদ্র থাকিয়া যাইতেছে। কিন্তু যদি ব্যাপকভাবে অনুসন্ধান করা যায় তাহা হইলে দেখা যাইবে যে ভারতবর্ষের শতকরা ৫০ জন মানুষের যে নিদারুণ দারিদ্র্য নিষ্পিষ্ট অবস্থা তাহার মূলে আছে বেকারী, অর্দ্ধ বেকারী ও সাময়িক বেকারী। ভারতবর্ষের প্রায় ত্রিশ কোটি মানুষের ভরণপোষণ যাহাদের কর্ম্ম ক্ষমতার ব্যবহারে হয় সেই সকল কর্ম্মীগণ উপযুক্ত ভাবে কর্ম্মে নিযুক্ত নহে। তাহারা হয় নিষ্কর্ম্মা নয়ত তাহারা বৎসরে অধিকসময় জীবিকাহীন থাকে। ইহারা সমাজের অর্থ-নৈতিক সকল সুখ সুবিধা সুযোগ হইতে বঞ্চিত এবং ইহাদের সেই অবস্থার জন্য কে বা কাহারা দায়ী তাহা বলা কঠিন। ইহারা নিঃসম্বল নিরাশ্রয় ও অবলম্বনহীন। সমাজ ইহাদের অবহেলা করিয়া দূরে ঠেলিয়া রাখিয়াছে এবং ইহারা কিভাবে কেমন করিয়া জীবিত থাকে তাহা কেহ বলিতে পারে না, অনুসন্ধানের চক্ষে চাহিয়াও দেখে না। ইহারা কোন বিশেষ জাতীয় মানুষ নহে; ইহাদিগের মধ্যে উচ্চ নীচ সকল জাতীয় মানুষই আছে। ইহারা সকল প্রদেশেই আছে। ইহাদিগের মধ্য হইতে অর্থ-নৈতিক উন্নতির সোপান বাহিয়া অনেকে অধিক উপার্জ্জন ক্ষমতা অর্জ্জন করিয়া চরম দারিদ্র্যের কবল হইতে বাহির হইয়া যায়। তেমনি আবার অনেক ব্যক্তি দুর্দ্দশার আক্রমণে হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া অপেক্ষাকৃত উন্নত অবস্থা হইতে ইহাদের মধ্যে নিদারুণ দারিদ্র্যের আবর্ত্তে আসিয়া পড়ে। ইহারা যদি কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়া উৎপাদন কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া ধনিকের শোষণের ফলে চরম দারিদ্র্যে নিমজ্জিত হইত, তাহা হইলে ধনিকদের উপর চাপ দিয়া ইহাদের অবস্থার উন্নতি সাধন সম্ভব হইত। কিন্তু ইহারা সেইভাবে নিজেদের শ্রম শক্তির পূর্ণ ব্যবহার করিবার সুযোগ পায় না। শোষণ যে কোথাও নাই ইহাদের অর্থ-নৈতিক জীবনে এমন কথা বলা যায় না। কিন্তু সে শোষণ না থাকিলেও ইহাদিগের কর্ম্মশক্তির যেটুকু ব্যবহার হয় তাহাতে ইহাদের জীবনযাত্রা কদাচ সুগম হইতে পারিত না।

যাঁহারা ক্রমাগত "মনোপলি" ও ধনিক গোষ্ঠীর দ্বারা শোষিত হওয়ার দুঃস্বপ্ন দেখেন ও ভাবেন যে ৭৫টি ধনবান্ গোষ্ঠীকে অচল করিয়া দিলেই ভারতবর্ষ হইতে দারিদ্র্য উঠিয়া যাইবে তাঁহারা ভুলিয়া যান যে ভারতবর্ষের অতি অল্প সংখ্যক উপার্জ্জকই ঐ সকল ধনবান্‌দিগের সহিত কোনভাবে জড়িত আছেন। যাহারা কৃষি কার্য্য করেন তাঁহারা যদি গরীব হ'ন তাহা হইলে তাঁহাদের কে শোষণ করিতেছে?

জমিদার ত নাই ; আড়তদারও প্রবল শক্তিমান আর নাই। খাজনা যদি যথেচ্ছা আদায় করা যাইতেছে বা ফসলের মূল্য উচিৎ মূল্য হইতেছে না ; তাহা হইলে তাহার জন্ম দায়ী গভর্ণমেন্ট। গভর্ণমেন্ট ত "সোসিয়ালিষ্ট প্যাটার্ণ"-এর। তাহা হইলে কৃষি ক্ষেত্রে দারিদ্র্য আসে কেমন করিয়া ? "সোসিয়ালিজম" যদি দারিদ্র্য সৃষ্টি করে তাহা হইলে ত গরীবী হটাইতে হইলে প্রথমে "সোসিয়ালিজম" হটাইতে হইবে।

ত্রিশ কোটি লোকের অবস্থা অত্যন্তই অভাব নিষ্পিষ্ট। আরো কুড়ি কোটি মানুষ আছেন যাঁহাদের জীবনযাত্রা জগতের মানব জীবন নির্ব্বাহমানের হিসাবে অনুন্নত। অর্থাৎ ভারতের প্রায় ৫০ কোটি মানুষ যেভাবে দিন কাটাইলে মানব সভ্যতার পূর্ণ উপলব্ধি সাধিত হইতে পারে সেভাবে দিন কাটাইতে সক্ষম নহেন। যদি তাঁহাদের সকলের জীবনযাত্রা যথাযথ হইত তাহা হইলে তাঁহাদের ব্যবহারের জন্ম যে সকল বস্তু বা অবাস্তব সেবার প্রয়োজন হইত তাহা সরবরাহ করিতে ভারতের সকল কর্ম্মীর শ্রম শক্তি পূর্ণ ও উপযুক্তরূপে সেই সকল বস্তু ও সেবা উৎপাদনে নিযুক্ত হইতে পারিত এবং সেই কারণে তাহারা যাহা উপার্জ্জন করিতে পারিতেন তাহাতে তাঁহাদের নিজেদের জীবনযাত্রাও উন্নততর হইত। শোষণের জন্ম যে দারিদ্র্য তাহা, উৎপাদন কার্য্যে নিযুক্ত হওয়ার সুযোগ না থাকা হইতে যে দারিদ্র্য সৃজিত হইয়া থাকে তাহার তুলনায় ততটা ব্যাপক অথবা গভীর নহে। অর্থাৎ ভারতের সমাজ ও রাষ্ট্র নেতাগণ যদি সত্যই দারিদ্র্য দূর করিতে বদ্ধপরিকর হইয়া থাকেন তাহা হইলে তাঁহাদিগকে সর্ব্বাগ্রে সকল কর্ম্মীকে উপযুক্ত কর্ম্মসংস্থান করিয়া দিতে হইবে। ইহাতে সকলের উপার্জ্জন বৃদ্ধি হইবে ও সকলে সেই উপার্জ্জন লব্ধ অর্থে যে সকল ভোগ্য বস্তু ও সেবা ক্রয় করিবেন সেই সকল বাস্তব ও অবাস্তব ভোগ্য সরবরাহে সকলের কর্ম্মশক্তি পূর্ণ নিযুক্ত হইতে পারিবে।

"মনোপলি" ও বৃহৎ ধনিক গোষ্ঠীর পরিবর্ত্তে যদি সরকারী মূলধন অথবা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উৎপাদন ব্যবস্থাকারী ব্যক্তিদিগের দ্বারা দেশের কাজ কারবার চালিত হয় তাহাতে মহা ধনবান্‌দিগের সংখ্যা হ্রাস হইবে ও মাঝারি শ্রেণীর ধনবানের সংখ্যা বৃদ্ধি হইবে। দারিদ্র্য ইহা দ্বারা দূর হইলেও বিশেষ কিছু হইবে না। দারিদ্র্য দূর করিতে হইলে সকল মানুষের শ্রমশক্তির পূর্ণতর ব্যবহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

একটি সাধারণতন্ত্রের বিনাশ

১৯৭৩ খৃঃ অব্দের জানুয়ারী শেষের দিকে ফিলিপাইনস্‌এর রাষ্ট্রপতি ফার্ডিনাণ্ড মার্কোস্ নিজ রাষ্ট্রের উপর একাধিপত্য রীতি প্রয়োগ করিয়াছেন। তাঁহার আদেশে ফিলিপাইনসে সাধারণতন্ত্র বিনষ্ট হইয়া তৎস্থলে এক ব্যক্তির স্বৈরাচারের উপর নির্ভরশীল শাসন-পদ্ধতি অনুসৃত হইতে আরম্ভ হইল। প্রায় ২৫ বৎসর কাল ফিলিপাইনসে যে সাধারণতন্ত্র চালিত ছিল তাহার অবসান হইয়া এখন মার্কোস্ চূড়ান্ত একনায়কত্বের অধিকারী হইলেন এবং এই অধিকার তাঁহার যতদিন ইচ্ছা ততদিনই তিনি সম্ভোগ করিতে পারিবেন। তিনি বলিয়াছেন যে সময় বড় খারাপ ও বিপদসঙ্কুল এবং এইরূপ অবস্থায় সাধারণতন্ত্রের ঢিলাঢালা রীতিনীতির ঐতিহ্য অনুসরণ করিয়া চলিলে হঠাৎ কোন আকস্মিক অবস্থা বিপর্য্যয় ঘটিলে কেহই রাষ্ট্রকে রক্ষা করিতে সক্ষম হইবে না।

বিগত সেপ্টেম্বর মাসে মার্কোস্ ফিলিপাইনসে সামরিক আইন বলবৎ করেন এবং সেই সময় হইতেই তিনি ক্রমশঃ শাসন-পদ্ধতির নানাপ্রকার পরিবর্ত্তন সাধন করিয়া নিজ শক্তি বৃদ্ধি করিয়া আসিয়াছেন। বর্ত্তমানে ঐ দেশের উচ্চতম আদালত বিচার করিতেছিলেন যে তাঁহার সকল পরিবর্ত্তনাদি আইনতঃ গ্রাহ্য হইবে কি না। কিন্তু বিচার শেষ হইবার পূর্ব্বেই মার্কোস্ নিজের নির্দ্দেশের দ্বারা সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া দাঁড়াইলেন। তিনি এখন উচ্চতম আদালতের বিচারকদিগকে ইচ্ছামত নিয়োগ অথবা বরখাস্ত করিতে পারিবেন এবং সেই কারণে ঐ আদালতের পক্ষে তাঁহাকে কোনভাবে দমন করা সম্ভব হইবে না। তিনি যাহা খুসী তাহাই স্থির করিতে পারিবেন। নূতন যে

শাসনতন্ত্র হইল তাহাতে তিনি পরোয়ানা জারি করিয়াই শাসনকার্য্য চালাইতে পারিবেন এবং রাষ্ট্রীয় বিধানসভা প্রভৃতির নির্বাচনাদি যতদিন ইচ্ছা রহিত করিয়া রাখিতে পারিবেন।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র এইসকল ঘটনা সম্বন্ধে কি মনে করেন তাহা এখনও যথাযথভাবে জানা যায় নাই। ফিলিপাইন্‌সে আমেরিকার বহু মূলধন লাগান আছে। সামরিক মাল-মশলার সমাবেশও আছে প্রচুর। কিন্তু মার্কোস্‌-এর একাধিপত্য আমেরিকার বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হইবে বলিয়া কেহ মনে করেন না। তিনি শুধু শাসন-ক্ষেত্রে কাহারও কোন বিরুদ্ধতা সহ্য করিতে চাহেন না। কোনও আইনের বন্ধন যেন তাঁহার ইচ্ছার গতিতে কোন বাধার সৃষ্টি না করে ইহাই তাঁহার বাসনা। রাষ্ট্র-পতি মার্কোস্‌ এখন হইতে ফিলিপাইন্‌সের জনসাধারণের কর্তাকর্তা-বিধাতা হইয়া সকলের অদৃষ্ট নিজ ইচ্ছামত ভাঙ্গিতে গড়িতে সক্ষম হইবেন। তিনিই আইন প্রণয়ন করিবেন, তিনিই তাহা প্রয়োগ করিবেন। তিনিই হইবেন রাজকার্য্যক্ষেত্রের একমাত্র অধীশ্বর।

মূল্যবৃদ্ধি ও মুদ্রাস্ফীতি

ইংরেজী সাপ্তাহিক "স্বরাজ্য" পত্রিকায় প্রকাশিত মূল্যবৃদ্ধির হিসাব হইতে দেখা যায় যে ১৯৫৩ খৃঃ অঃ হইতে ১৯৭১ খৃঃ অঃ পর্যন্ত ভারতে মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে বাৎসরিক শতকরা ১০·১ হারে। এই মূল্যবৃদ্ধি বহু দেশেই হইয়াছে কিন্তু সেই সকল দেশের বাৎসরিক মূল্য বৃদ্ধির হার দেখা যায় হইয়াছে ৩·৪% ইউ. কে.-তে, ২% ইউ. এস্‌. এ.-তে, ২·৬% ফ্রান্সে, ১·৩% জাপানে ও ·৯% পশ্চিম জার্ম্মানীতে। ১৯৬০-৬১ খৃঃ অঃতে যদি মূল্যের পরিমাণ ১০০ ধরা যায় তাহা হইলে ১৯৫৮-৬৯ খৃঃ অঃতে ভারতে তাহা বাড়িয়া হইয়াছিল ১৬৫·১, ১৯৬৯-৭০-এ ১৭৫·৭, ১৯৭০-৭১ এ ১৮০·৬ ও ১৯৭১-৭২এ ১৯২·৪। মাসিক মূল্য বৃদ্ধির হিসাব করিলে দেখা যায় এপ্রিল ১৯৭২ হইতে সেপ্টেম্বর ১৯৭২ অবধি উপরের হিসাবের অনুপাতে মূল্য বাড়িয়া হইয়াছিল ১৯২·৮, ১৯৪·২, ১৯৮·৮, ২০৫·৮, ২০৬·৯ ও ২০৭·৬; অর্থাৎ ছয়মাসে ১৫% মূল্যবৃদ্ধি।

এই প্রকারে মূল্য বৃদ্ধি কখনও হইতে পারে না যদি না দেশীয় অর্থ-নৈতিক অবস্থার মধ্যে মুদ্রাস্ফীতি ক্রিয়া-শীল হয়। এবং মুদ্রাস্ফীতিও হইতে পারে না যদি না সরকার বাহাদুর আয় অপেক্ষা ব্যয় অধিক করিয়া সেই টাকার অভাব মিটাইবার জন্য কৃত্রিম উপায়ে ঋণের টাকা সৃষ্টি করিয়া তাহা বাজারে ছাড়িতে আরম্ভ করেন। ঋণের টাকা যদি সঞ্চয়ের টাকা হয় তাহা হইলে সেই টাকা ধার করিয়া বাজারে ছাড়িলে ততটা মূল্য বৃদ্ধির কারণ হয় না যেমন হয় মুদ্রাস্ফীতিলব্ধ অর্থ বাজারে আসিলে। কারণ সঞ্চয় বলিতে বুঝায় ভোগ না করিয়া সেই ভোগ ক্ষমতা ভবিষ্যতের জন্য সংরক্ষিত রাখা এবং সেই সঞ্চয়ের টাকা যদি অপরকে ধার দেওয়া হয় তাহা হইলে যাহা উপার্জ্জনকারী ব্যবহার করেননাই শুধু তাহাই মাত্র ঋণ গ্রাহক ব্যবহার করিবে। ইহাতে ক্রয় চেষ্টার তুলনায় বিক্রয় সামগ্রীর অভাব বর্দ্ধিতভাবে দেখা দেয় না ও মূল্য বৃদ্ধিও হয় না। কিন্তু যদি ঋণের টাকার পিছনে সঞ্চয় না থাকে; কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্ট মুদ্রাস্ফীতি-জাত অর্থ ঋণ হিসাবে সরকারী তহবিলে জমা হয় ও তাহা সরকারী ব্যয়ের পথে ক্রেতাদিগের হস্তে গিয়া পড়ে, তাহা হইলে ভোগ-সামগ্রী বৃদ্ধি হয় না কিন্তু ক্রেতাদিগের ক্রয় চেষ্টাই প্রবলতর হয় এবং তাহার ফলে মূল্যবৃদ্ধি ঘটে। ইংরেজীতে ইহাকেই ইন্‌ফ্লেশন্‌ বা মুদ্রাস্ফীতি বলে ও ইহার অর্থ বাজারে বিক্রয় সামগ্রীর মোট পরিমাণের তুলনায় ক্রয়ের টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি। এইরূপ ক্রয়ের টাকা বাড়িলে মূল্য বৃদ্ধি হইবেই এবং ইহার প্রতিকার হইতে পারে শুধু ক্রয় করিবার বস্তু ও অবাস্তব সেবার পরিমাণ বৃদ্ধির দ্বারা অথবা বাজারে ব্যবহৃত মুদ্রার মোট পরিমাণ ক্রমশঃ হ্রাস করিয়া। টাকা যেমন ঋণ গ্রহণের উপায়ে বাজারে অধিক করিয়া ছাড়া যায়, তেমনি ঋণ শোধ করিয়া দিয়া এবং ব্যয় লাঘব করিয়া বাজার হইতে টানিয়া লওয়াও যায়। ভারত সরকারের অভ্যাস হইয়া দাঁড়াইয়াছে আয় অপেক্ষা ব্যয় অধিক করা এবং টাকার অভাব হইলেই ব্যাঙ্ক অথবা অপরাপর বৃহৎ অর্থ-নৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির

সাহায্যে ঋণের টাকা সৃষ্টি করিয়া সেই টাকা বাজারে ছাড়িবার কারণ উপস্থিত করা। ফল মুদ্রাস্ফীতি ও মূল্য বৃদ্ধি। অতিরিক্ত মুদ্রাস্ফীতির প্রতিকারে মুদ্রা সঙ্কোচ সাধন সম্ভব হইলেও সহজ নহে। তাহা হইতে অধিক অনায়াসসাধ্য হইল বিক্রয়-সামগ্রীর উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া বাজারের নূতন টাকার উপযুক্ত ব্যবহার ব্যবস্থা করা। ইহাতে মূল্য বৃদ্ধি বাধা পায় এবং সাধারণের মধ্যে মজুরী ও বেতন বৃদ্ধির আন্দোলনও হাল্কা হয়। সরকারী চেষ্টা অবশ্য এখন পর্য্যন্ত মুদ্রা সঙ্কোচ অথবা বিক্রয় সামগ্রী বৃদ্ধি এই দুইয়ের কোনটিতেই কার্য্যকর রূপ গ্রহণ করে নাই। অনেক কাজ-কারবার জাতীয় করা হইয়াছে কিন্তু তাহার ফলে মূল্য বৃদ্ধি ব্যাহত হয় নাই। কারণ জাতীয়ভাবে চালিত হইয়া কোনও কাজ-কারবারেই উৎপাদন বৃদ্ধি হইতেছে বলিয়া মনে হয় না এবং উৎপাদন খরচও বাড়িয়াই চলিতেছে। জাতীয়করণ মূল্য বৃদ্ধির আর একটা প্রবল কারণই হইয়া দাঁড়াইতেছে। আমলাতন্ত্র ইহার কুফল হইতে দেশকে রক্ষা করিতে অসমর্থ।

শান্তির আশা সুদূরে

ভিয়েৎনামে যুদ্ধ বিরতি হইয়াছে; কিন্তু কম্যুনিষ্ট ও কম্যুনিষ্ট বিরুদ্ধদলের সৈন্য ও অস্ত্রের সমাবেশ ক্রমবর্দ্ধনশীল। কোথাও কোথাও গোলাগুলি বর্ষণও হইতেছে না যে এমন নহে। অর্থাৎ যুদ্ধ ব্যাপকভাবে না হইলেও পরস্পর বিরোধী দলগুলির মধ্যে শত্রুতা প্রবলভাবে বর্ত্তমান এবং যুদ্ধ হইবার সকল ব্যবস্থাই পূর্ণরূপে রহিয়াছে। শুধু বন্দুক চালাইবার আদেশ পাইলেই হয়। ভিয়েৎনামের আশপাশের দেশগুলিতে কম্যুনিষ্ট ও তৎবিরুদ্ধ দলগুলির মধ্যে যুদ্ধ চলিতেছে এবং তাহার বিস্তার শুধু সময় ও সুযোগের কথা। এশিয়ার অপর প্রান্তে সিরিয়া লেবানন, জর্ডন, মিশর প্রভৃতি দেশে ইসরায়েলের সহিত শত্রুতা বিন্দুমাত্র হ্রাসের দিকে যায় নাই। চিঠির ভিতর বোমা পাঠান, লোক ধরিয়া লইয়া গিয়া আটকাইয়া রাখিয়া অদল বদলের দরভাও করা, হঠাৎ হঠাৎ বৈমানিক আক্রমণ বা তোপ চালানো, এই সকল হিংসাত্মক কার্য্য সর্বদাই চলিতেছে। মনে হয়, যে কোনও সময়ে যুদ্ধ হইতে আরম্ভ করিতে পারে। ইরাক প্রভৃতি দেশে বিপ্লবের বহ্নি বহুকাল হইতেই ছাই ঢাকা থাকে, মাঝে মাঝে হাওয়া চলিয়া তাহাতে অগ্নি স্ফুলিঙ্গ জাগিয়া উঠে, আবার তাহা স্তিমিত রূপ পরিগ্রহণ করে। এখন কিছুকাল হইতে ঐ অঞ্চলে বিস্ফোরণ আশঙ্কা প্রবলতর হইয়াছে এবং মনে হয় ঐ দেশে বাহির হইতে অস্ত্রশস্ত্রাদি আমদানী ব্যবস্থা বিশেষ ক্রিয়াশীল হইয়াছে। পাকিস্থানে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রণালী বিবর্ত্তন চেষ্টা প্রবল হইয়া উঠিতেছে। সিন্ধু, বালুচিস্থান ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে পাঞ্জাবী সংখ্যাগরিষ্ঠদিগের হুকুমত বিরুদ্ধতা বাড়িয়াই চলিতেছে। কোথাও ভাষার দাবী, কোথাও বা নিজ জাতির কর্ম্মচারী নিয়োগের কথা। কিন্তু মূলে রহিয়াছে ঐ আঞ্চলিক স্বাধীনতা প্রাপ্তি চেষ্টা। ইহা ঠিক কতদূর গড়াইবে তাহা সঠিক বলা যায় না, তবে ইহার মধ্যে যে বিদ্রোহ ও বিপ্লবের সম্ভাবনা প্রাণবান্ ভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে এ কথা সকলেই স্বীকার করেন। পাকিস্থানের জনগণ কায়েদে আজম জিন্নার মতে এক জাতি ও এক ভাষাভাষী হইলেও বাস্তবে দেখা গিয়াছে যে, তাহাদের মধ্যে কোনও জাতি, কৃষ্টি, ভাষা বা আচার ব্যবহারগত মিল নাই। রাষ্ট্রীয় মতবাদও বৈচিত্র্যে ও পার্থক্যে নানান ধরণের বহমান। এইরূপ অবস্থায় সামরিক শক্তি প্রয়োগে মিলন সাধন কদাচ সম্ভব হইতে পারে না। ইহা পূর্ণরূপে প্রমাণ হইয়া গিয়াছে বাংলাদেশে। কিন্তু পাকিস্থানের সমর কুশলী, নখদন্ত ব্যবহারে বিশ্বাসী সেনাপতিদিগের এই সকল পরিণতি হইতে কোনও শিক্ষা হয় নাই। তাঁহারা এখনও মুসলমান রাষ্ট্রে মৈত্রী সৃজন করিবার শ্রেষ্ঠ উপায় হিসাবে তরোয়াল অবলম্বনেই বিশ্বাসী রহিয়া গিয়াছেন। পাকিস্থানে যে শান্তিপূর্ণভাবে রাষ্ট্রশাসন কার্য্য চলিতে থাকিবে এবং তাহাতে জাতি বা ভাষাক্ষেত্রে সংখ্যা লঘিষ্ঠ ব্যক্তিগণ কোনও আপত্তি করিবে না, এইরূপ আশা করা সমীচীন হইবে না। এই কথাই ধরিয়া লওয়া

(এরপর ৬২৭ পাতায়)

রাজা রামমোহন ঃ
এদেশে বুদ্ধিবাদের প্রথম পুরোহিত

অলকরঞ্জন বসুচৌধুরী

রামমোহনের নামের আগে রাজা অভিধা যুক্ত করা সমীচীন কি না, কেউ কেউ এ প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁদের বক্তব্য, দিল্লীর মুঘল বাদশাহ রামমোহনকে 'রাজা' খেতাব দিয়ে বিলেতে পাঠিয়েছিলেন ইংল্যাণ্ডের রাজ-দরবারে নিজের মাসোহারার জন্য তদ্বির করতে। যাঁর নিজের রাজত্বই ছিল বৃটিশের অনুকম্পার ওপর নির্ভরশীল, তাঁর দেওয়া উপাধির কতটুকু সার্থকতা থাকতে পারে! একথা ঠিক, মুঘল বাদশাহের প্রদত্ত ঐ জাতীয় উপাধিতে যে জমিদার-শ্রেণীকে চিহ্নিত করা হতো, আজ রামমোহন সেই পরিচয়ের অনেক উর্দ্ধে; কিন্তু একথা আরও বেশী ঠিক, যে আমরা আজ বিংশ শতাব্দীর মানুষেরা যখন শ্রদ্ধায় রাজা রামমোহন নামটা উচ্চারণ করি তখন নিশ্চয়ই ঐ যুগন্ধর পুরুষের জমিদারী বা খেতাবের কথা স্মরণ করি না। স্মরণ করি 'রাজা' বলতে যা কিছু মহিমা, যা কিছু স্বাতন্ত্র্য, যা কিছু নেতৃত্ব বোঝায় তাকেই। যে কারণে 'রাজা' উপাধি ব্যবহারিক অর্থের চেয়ে ভাবার্থেই বেশী সত্যি হয়েছে আজ রামমোহনের ক্ষেত্রে, তা' অক্ষয়কুমার দত্ত সুন্দরভাবে স্বল্প কথায় বলেছেন: "তোমার উপাধি রাজা! কোনো জড়ময় ভূমিখণ্ড তোমার রাজ্য নহে, তুমি একটি সুবিস্তার মনোরাজ্য অধিকার করিয়া রহিয়াছ।"

অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতীয় মনন-জগতে রামমোহন সত্যিই রাজা ছিলেন—রাজার মতই একক এবং অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তিনিই সবার আগে এদেশের বদ্ধ চিন্তার পঙ্কিল স্রোতে বুদ্ধিবাদের গতি-প্রাবল্য আনতে চেয়েছিলেন। রামমোহনের জীবনের সর্বপ্রযত্নের মূলকথা ছিল মুক্তি—তাই বুদ্ধির মুক্তিবিধানের আন্দোলন ছিল তাঁর সারা জীবনের ব্রত। এই জড়-বুদ্ধির দেশে অভূতপূর্ব এক সংস্কারমুক্ত দৃষ্টি তাঁর জীবনের প্রতিটি কর্মপ্রচেষ্টায় আমরা স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করি—তৎকালীন তথ্যাবলীর দুষ্প্রাপ্যতা সত্ত্বেও।

রামমোহনের সংগ্রামী জীবন শুরুই হয় ধর্মসংস্কার আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। আমরা সবাই জানি, ষোল বছর বয়সে রামমোহন প্রচলিত হিন্দুধর্মের কুসংস্কার ইত্যাদির বিরুদ্ধে গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, যার জন্য তাঁকে ঘরছাড়া হতে হয়। ঐ অল্প বয়সেই আমরা রামমোহন চরিত্রের দু'টি জিনিষ দেখতে পাই—যুক্তিবাদের প্রতি তীব্র ঝোঁক ও আদর্শের ক্ষেত্রে আপোষহীনতা। ঐ বই লেখার আগে থেকেই রামমোহনের প্রচলিত হিন্দুধর্ম ও লোকাচার সম্পর্কে বিক্ষুব্ধ মানসিকতা গড়ে উঠেছে, এবং এজন্য অনেকটা দায়ী ইসলাম ও আরবী সভ্যতার যুক্তিবাদী চিন্তাধারা। রামমোহন ন' দশ বছর বয়সে যখন পাটনা গেছেন তখনই তিনি আরবী, ফারসী, কোরাণ ও ইসলাম শাস্ত্রাদি পড়ে ফেলেছেন, ইউক্লিড ও অ্যারিস্টটলের আরবী অনুবাদও পড়েছেন। কথিত

আছে, এ সময় তাঁর ওপর ঐ সব ভাবধারার বুদ্ধিবাদী দিকগুলো, বিশেষতঃ 'মুতাজিলা' ও 'সুফী' দর্শন বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। যে বুদ্ধিবাদ কিশোর রামমোহন-কে ইসলামী শাস্ত্র পাঠে আকৃষ্ট করেছিল, তার প্রেরণায় তিনি শুধু প্রচলিত হিন্দুধর্মকেই নয়, খৃষ্টধর্মকেও পঙ্কিলতা-মুক্ত করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। রামমোহনের নিপুণ বাস্তববুদ্ধির পরিচয় এখানেই, যে তিনি ইসলামের যুক্তিবাদে প্রীত হয়েই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে বসেন নি, বরং নিজ ধর্মের আঙিনায় সেই যুক্তিবাদ আমদানি করতে চেয়েছিলেন; আবার নিজে হিন্দু বলে খৃষ্টানদের কুসংস্কারে পীড়িত হয়েই ক্ষান্ত হন নি, তার মূলোৎ-পাটনেও ব্রতী হয়েছিলেন—এটা রামমোহনের বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ববোধের অপূর্ব দৃষ্টান্ত। এরকম বিপ্লবী মনীষা আধুনিক যুগেই দুর্লভ, আর দু'শো বছর আগেকার বাতিকগ্রস্ত ও শৃঙ্খলিত বুদ্ধির একদল মানুষের মধ্যে কেউ যদি ধর্মবিচারে যুক্তির কথা বলে, বিশেষতঃ সে আবার যদি ষোল বছরের কিশোর হয়, তবে তাকে যে 'বিধর্মী নাস্তিক' অপবাদ মাথায় করে' সমাজচ্যুত হতে হবে, তা আর বিচিত্র কি? প্রবর্তকরা যুগে যুগে এই বেদনা বহন করে এসেছেন।

ষোল বছর বয়সে রামমোহন যে পাণ্ডুলিপিটি রচনা করেছিলেন, তা' ছিল মূলতঃ পৌত্তলিকতার সমা-লোচনা। রামমোহন যে একেশ্বরবাদের সমর্থক হয়ে উঠেছেন, মূর্তিপূজা-বিরোধিতা থেকেই সে কথা বুঝতে পারা যায়। ১৮০৩ খৃঃ অব্দে পিতৃবিয়োগের কিছু পরে রামমোহন যখন মুর্শিদাবাদে, তখন তিনি আরবী ভূমিকা সহ ফারসীতে তাঁর গ্রন্থ "তুহ্ফৎ-উল-মুয়াহ্‌হিদিন্" (অর্থ—"একেশ্বরবাদীদের প্রতি উপহার") প্রকাশ করেন। এর ভূমিকায় রামমোহন প্রথমেই উল্লেখ করেছেন একটি পরমসত্তার অস্তিত্ব বিষয়ে মানবগোষ্ঠীর মধ্যে চিন্তার ঐক্যের কথা। আর এটা তাঁর স্বকল্পিত কোনো তত্ত্ব নয়, বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতাসঞ্জাত উপলব্ধি। তিনি লিখেছেন, "আমি পৃথিবীর দুর্গমতম প্রান্ত পর্যন্ত, যেমন সমভূমিতে, তেমনই পার্বত্য অঞ্চলে পরিভ্রমণ করেছি এবং দেখেছি সেখানকার অধিবাসীরা সকলেই একটি সত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করে এবং তারা সেই সত্তার ওপর বিশেষ কোনো গুণ আরোপ করার ও ধর্মীয় বিধান এবং 'হারাম' (অবৈধ) ও 'হালাল' (বৈধ) এর তত্ত্ব সমন্বিত বিশেষ কোনো ধর্মমত অবলম্বন করার বিরোধী। এসবের ক্রমিক পর্যবেক্ষণের পর আমার সিদ্ধান্ত:—সাধারণতঃ একটি অস্তিত্বের প্রতি বিশ্বাস মানব চরিত্রের একটি স্বাভাবিক প্রবণতা এবং প্রতিটি ব্যক্তির ক্ষেত্রেও সমভাবে সত্যি। আর মানবগোষ্ঠীর বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনো বিশেষ দেবতা বা দেবতাসমূহের প্রতি, কোনো বিশেষ ধর্মমতের প্রতি এবং কিছু অদ্ভুত পূজা-পদ্ধতির প্রতি যে ঝোঁক দেখা যায়, তা, হচ্ছে প্রশিক্ষণ ও অভ্যাসের ফলে উদ্ভূত মানব-স্বভাবের কিছু আরোপিত ধর্ম।" মানব-চরিত্রের এই স্বভাবী ধর্ম ও আরোপিত ধর্মের মধ্যে ভেদ বিধান করবার শক্তি আসতে পারে না যদি বুদ্ধির মুক্তি না ঘটে। সেজন্য রামমোহনের এই মূল্যবান্ রচনায় আমরা একদিকে যেমন সঙ্কীর্ণতাবর্জিত এক উদার বিশ্বধর্মের বাণী শুনতে পাই, (পরবর্তীকালে ব্রাহ্মসভার প্রতিষ্ঠায় যার আরও স্পষ্ট প্রকাশ দেখা যাবে), তেমনই অন্যদিকে পাই ধর্মমতের ক্ষেত্রে বুদ্ধিবাদের প্রয়োগের সূচনা ঘটাবার দুর্লভ দুঃসাহস এবং তুলনামূলকভাবে বিভিন্ন ধর্মমতের বিচার করার আহ্বান, যে ব্যাপারে রামমোহন আজও বিশ্ববাসীর পথিকৃৎ হবার দাবী রাখেন। বুদ্ধিবাদীদের প্রশংসা করে রামমোহন বলছেন, সেই সব লোক কতই না সুখী, যারা অভ্যাস ও সংসর্গগত গুণাবলী এবং মানব-গোষ্ঠীর বা ব্যক্তির চরিত্রগত অন্ত-র্নিহিত গুণাবলীর তফাৎ বুঝতে পারে এবং অপক্ষপাতী ও সজাগভাবে বিভিন্ন ধর্মের বিভিন্ন মতবাদের, এমন কি যে মতবাদ সবাই মেনে নিয়েছে তারও সত্যমিথ্যা যাচাই করতে সচেষ্ট হয়। এবং রামমোহনের মতে, সব ধর্মের বিচারই যদি বুদ্ধিবাদের আলোকে করা যায়, তবে পরিশেষে সেই একেশ্বরবাদ মেনে নিতে হবেই। এবং বিচারকর্তা সেক্ষেত্রে মুক্ত হতে পারবেন

"অপ্রয়োজনীয় ধর্মীয় বাধানিষেধ থেকে, যা কখনও কখনও কুসংস্কারের উৎস স্বরূপ হয়ে একজনের বিরুদ্ধে আর একজনের শারীরিক ও মানসিক বিরোধের কারণ ঘটায়, এবং সেই একক সত্তার প্রতি আকৃষ্ট হবেন, যিনি এই সামঞ্জস্যপূর্ণ বিশ্বরচনার মূলস্বরূপ, এবং তার ফলে সমাজের মঙ্গলে মনোযোগ দিতে পারবেন।" এখানে রামমোহনের বুদ্ধিবাদী দর্শনের সারবত্তার আর একটি প্রমাণ আমরা দেখতে পাচ্ছি—তিনি একেশ্বরবাদকে সামাজিক কল্যাণের লক্ষ্য নিয়েই প্রচার করছেন।

মনে রাখতে হবে, রামমোহন যখন এদেশে ধর্ম-আন্দোলন গড়ে তুলছেন তখনও বিদ্যাসাগরের একক বাস্তববাদ বা ডিরোজিও ও তাঁর শিষ্য নব্যবঙ্গীয়দের সমষ্টিগত বুদ্ধিবাদ ও যুক্তিবাদ এদেশের ইতিহাসে অনাগত। কাজেই সে যুগে রামমোহনের সমস্ত প্রয়াসের বিস্ময়কর বুদ্ধিবাদী ভঙ্গিমা একথার সংশয়াতীত পরিচয় দেয় যে, রাজা রামমোহনই আধুনিক ভারতে বুদ্ধিবাদের প্রথম পুরোহিত। যে যুগে জ্যান্ত মেয়েদের পুড়িয়ে মারা হতো ধর্মীয় বিধানের নামে, শিশুদের জীবন্ত ভাসিয়ে দেওয়া হতো, জলে, সে যুগে এই বৈপ্লবিক প্রতিভার মানুষটি সোজাসুজি অলৌকিক ঘটনা ও অতিপ্রাকৃত শক্তিকে অস্বীকার করে বসলেন। দুঃসাহসী এখানেই ক্ষান্ত হলেন না, অন্ধবিশ্বাস-অপনোদনে বৈজ্ঞানিক যুক্তির অবতারণা করলেন এবং বললেন সর্বশক্তিমান্ ঈশ্বরেরও শক্তি নেই বিশ্ববিধানকে লঙ্ঘন করার। রামমোহন "তুহ্‌ফৎ-উল-মুয়াহিদিন্"এ লিখেছেন, এটা তো একটা স্বীকৃত ব্যাপার যে, বিশ্ব-স্রষ্টার কোনো ক্ষমতা নেই অসম্ভব বস্তু সৃষ্টি করবার, যথা—ভগবানের অংশীদার, বা ভগবানের অনস্তিত্ব, বা দু'টি পরস্পর-বিরোধী ব্যাপার ইত্যাদি।

রামমোহনের প্রগতিশীল যুক্তিবাদ অন্ধবিশ্বাস ও অজ্ঞতাকেই অলৌকিক ঘটনায় বিশ্বাসের কারণরূপে নির্দেশ করেছিল এবং তার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছিল। রামমোহনের মতে সাধারণ লোক কার্য-কারণ সম্পর্ক নির্ণয় করতে পারে না এবং নিজের বুদ্ধি বা অভিজ্ঞতার বাইরে কোনো ঘটনা ঘটতে দেখলেই তার ব্যাখ্যা দেবার জন্য অতিপ্রাকৃত শক্তিকে টেনে নিয়ে আসে। অজ্ঞ ও অশিক্ষিত ব্যক্তিদের নির্বুদ্ধিতার সুযোগ নিয়ে যেসব চতুর ভণ্ড ব্যক্তি অলৌকিকতার সাহায্যে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করে রামমোহন তাদের সম্পর্কে পুরোমাত্রায় সচেতন ছিলেন এবং তাঁর বলিষ্ঠ ব্যবহারিক বুদ্ধিতে বুঝেছিলেন, এদের সম্পর্কে জনতাকে সাবধান না করে দিলে প্রতারিত ও বুদ্ধিভ্রষ্ট হবার সম্ভাবনা কখনও দূর হবে না। এমন কি রামমোহন অবতারের ঈশ্বরের প্রতিনিধিত্ব করার অধিকার স্বীকার করেন নি। পূর্বোক্ত গ্রন্থে তিনি লিখেছেন, "অবতারের আবির্ভাব এবং ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ তত্ত্ব অন্যান্য প্রাকৃতিক ঘটনার মতোই ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক-রহিত বহিরঙ্গ ব্যাপার, অর্থাৎ কোনো একজন উদ্ভাবকের উদ্ভাবনের ওপরই নির্ভরশীল।"

সর্বপ্রকার কুসংস্কারের মূলোৎপাটনের জন্য রামমোহন "বিচক্ষণ মানুষদের বৈজ্ঞানিক যুক্তি প্রয়োগের" আহ্বান জানিয়েছেন। এই আহ্বান আজকের যুগের মানুষের প্রতিও প্রযোজ্য হতে পারে একই ভাবে। কারণ, দুর্ভাগ্যবশতঃ আজ রামমোহনের ঐ আহ্বানের দেড়শো বছর পরে এই চন্দ্রযাত্রার যুগেও আমাদের দেশের লোকের বৈজ্ঞানিক মানসভঙ্গী গড়ে ওঠেনি। সঠিক কার্যকারণ জ্ঞান না থাকায় এবং ভ্রান্তবিশ্বাস ও ধর্মীয় আচারের প্রভাবে ভুল কার্যকারণ সম্পর্ক নির্ণয় প্রসঙ্গে রামমোহন লিখেছেন যে, বিভিন্ন ধর্মের অন্ধবিশ্বাস অনুযায়ী সাধারণ মানুষ মোক্ষলাভের উদ্দেশ্যে নদীতে স্নান করে, বৃক্ষকে পূজা করে, বা সাধুসন্ন্যাসীর কাছ থেকে নিজেদের কৃতপাপের প্রায়শ্চিত্ত ক্রয় করে ও তার ফলেই সারাজীবনের পাপ থেকে মুক্তি পায় বলে মনে করে; অথচ যারা এসব বিশ্বাস করে না, তাদের ওপর এসব কাজের কোনো প্রভাব পড়ে না। এরপরই রামমোহন বলেছেন সবচেয়ে দরকারী কথা, যে কথা আমরা, আজও যারা হাঁচি-টিকটিকি, পূর্ণিমা অমাবস্যা

নিয়ে অহোরাত্র নানা জটিলতা সৃষ্টি করি, তারা সবাই জানি অথচ পালন করি না—"এইসব কাল্পনিক বস্তুর কোনো বাস্তব কার্যকারিতা যদি সত্যিই থাকতো, তবে নিশ্চয়ই তা কোনো বিশেষ একটা জাতের বিশ্বাস ও অভ্যাসের মধ্যে আবদ্ধ না থেকে বিভিন্ন বিশ্বাস সম্পন্ন সকল জাতের ক্ষেত্রেই সমান প্রযোজ্য হতো।" তারপরই তিনি তীক্ষ্ণ যুক্তিবাদী প্রজ্ঞায় প্রশ্ন করেছেন, "আপনারা কি দেখেননি, কেউ যদি মিষ্টদ্রব্য বিশ্বাসেও বিষ ভক্ষণ করে থাকে, বিষের ফল ফলবেই—খাদকের মৃত্যু ঘটবেই ?"

রামমোহনের প্রথম পরিণত রচনা এই "তুহ্‌ফৎ-উল্‌ মুয়াহিদিন্‌"এ দেখতে পাচ্ছি কিশোর রামমোহনেরই আরও দৃঢ়প্রতিষ্ঠ প্রতিধ্বনি—পূর্ববিশ্বাস বদলায়নি, বরং আরও দৃঢ়মূল হয়েছে, শুধু তাই নয়, উনবিংশ শতাব্দীর গোড়াতেই ভারতের ইতিহাসে ঐ গ্রন্থ নিয়ে এসেছে এক নূতন প্রতিশ্রুতি, অন্ধবিশ্বাস, দুর্নীতি ও আত্মভ্রষ্টতার উচ্চকণ্ঠ প্রতিবাদ, সঙ্গে সঙ্গে বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত এক উদার বুদ্ধিবাদী বিশ্বধর্মের নূতন ধারণা।

রামমোহন এরপর চুপ করে বসে থাকেননি। ডিগবি সাহেবের কাছে কাজ করবার সময় যেমন নিত্য অবহিত হয়েছেন য়ুরোপের নব নব আন্দোলনের কথা, তেমনই তান্ত্রিক, জৈন ও ইসলাম ধর্মের লোকজনের সঙ্গে মেলামেশা ও গ্রন্থপাঠ করেছেন। কিন্তু সবকিছু তিনি বিচার করেছেন বুদ্ধিবাদের আলোকে। রামমোহনের বাস্তববুদ্ধি শাস্ত্রের প্রামাণ্যতা একেবারে উড়িয়ে দেয়নি, কিন্তু চোখ বুজে সব কিছু মেনে নিতেও তিনি পারেন নি। কেনোপনিষদের ইংরেজী সংস্করণের ভূমিকায় রামমোহন লিখছেন: "সত্য নির্ণয়ের তিনটি উপাদান—শাস্ত্র, যুক্তি এবং ভগবদ্‌ কৃপা।" এই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েই রামমোহন অসংখ্য দুর্দ্ধর্ষ গোঁড়া হিন্দু পণ্ডিতের সঙ্গে তর্কযুদ্ধ করেছেন, বেদান্ত ও উপনিষদের বাংলা ও ইংরেজী অনুবাদ প্রচার করেছেন, সতীদাহের বিরুদ্ধে লড়বার জন্য সারাদেশ ঘুরে বেড়িয়ে নিজের জীবনও বিপন্ন করেছেন। তিনি মহর্ষি বশিষ্ঠের একটি কথা প্রায়ই উদ্ধৃত করতেন—"যদি একটা শিশুও যুক্তিসঙ্গত কিছু বলে, তবে তা' গ্রহণীয়, আর যদি ব্রহ্মা স্বয়ং অযৌক্তিক কিছু বলেন, তা' হলেও সেটা খড়কুটোর মতই বর্জনীয়।" কিন্তু শাস্ত্রবচন দেখালেই মেনে নেবে, দেশের সমাজপতিদের ও সাধারণ মানুষের বুদ্ধি তেমন কিছু সরল ছিল না। ১৮১৫ সাল নাগাদ রামমোহন কলকাতায় এসেছেন ও বেদান্তের গ্রন্থপ্রকাশ শুরু করেছেন, "আত্মীয়সভা"ও স্থাপিত হয়েছে যার মাধ্যমে কুলীন প্রথা, মেয়ে বিক্রী, জাতিভেদ প্রথা ইত্যাদির বিরুদ্ধে এবং মেয়েদের পিতার ও স্বামীর সম্পত্তিতে অধিকারের স্বপক্ষে আন্দোলনও শুরু হয়েছে, এমন কি খৃষ্টধর্মের নানা অনাচারেও রামমোহনের দৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে। ফলে রামমোহনের নিন্দুক এবং শত্রুরাও ক্রমশঃ বাতাস ভারী করে তুলেছে, এবং আজকে শুনলে কৌতুক বোধ হবে, বৃটিশ গোঁড়া পত্রিকা "জন্‌ বুল" আর হিন্দু রক্ষণশীলদের মুখপত্র "সমাচার চন্দ্রিকা" হাতে হাত মিলিয়ে আক্রমণ চালিয়েছিল রামমোহনের বিরুদ্ধে। রামমোহন এসময় বলেছিলেন, "কদাচ আমি হিন্দুধর্মকে আক্রমণ করিনি, আমি শুধু আক্রমণ করেছি ধর্মান্ধতা ও কুসংস্কারকে।"

ভবিষ্যতে রামমোহনকে খৃষ্টান গোঁড়ামির বিরুদ্ধেও দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হতে হয়েছিল। ১৮২১ সালে শ্রীরামপুরে মিশনারীদের হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে নিন্দা ও বিদ্বেষমূলক প্রচারের জবাব দিতে রামমোহন বাংলায় 'ব্রাহ্মণসেবধি' ও ইংরেজীতে 'Brahminical Magazine' পত্রিকা প্রকাশ করেন, যাতে বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদের স্বপক্ষে তিনি যুক্তিবিন্যাস করেন।

খৃষ্টধর্মের ত্রিত্ববাদের (Trinity) বিপক্ষে তিনি খৃষ্টান পাদরিদের সঙ্গে ঘোর তর্কে প্রবৃত্ত হন। পাদরিদের মধ্যে অবশ্য তাঁর সমর্থকও ছিলেন। 'এশিয়াটিক জার্ণালে' জনৈক পাদরির ত্রিত্ববাদের সমর্থনে উপস্থাপিত

'গাণিতিক যুক্তিসমূহ' তিনি যেভাবে খণ্ডন করেছিলেন, তার বুদ্ধিবাদী ভঙ্গিমাটি আজকের পাঠকের কাছে আকর্ষক মনে হতে পারে। ঐ ত্রিত্ববাদীর 'গাণিতিক' বক্তব্যের মূলকথা ছিল—যেমন তিনটি সরলরেখা একটি ত্রিভুজ গঠন করে, তেমনই তিনটি ব্যক্তিরূপ নিয়েই ঐশ্বরিক সত্তা গঠিত (Father, Son, Holy Ghost)। এর জবাবে রামমোহন প্রথমে ব্যঙ্গ করে বলেছেন, "এটা খুবই আশ্চর্য, যে নিউটনের মতো গাণিতিক সত্যসন্ধানী প্রতিভাও ত্রিত্ববাদের এই গাণিতিক সত্যটি আবিষ্কার করতে পারেননি।" তারপর রামমোহন যে যুক্তি দেখিয়েছেন, তার সংক্ষিপ্তসার হচ্ছে—প্রথমতঃ, ঈশ্বরত্ব এবং ত্রিভুজের মধ্যে সাদৃশ্য বিধান করলে তা' ঈশ্বরের অস্তিত্বই অস্বীকার করে, কারণ জ্যামিতির সংজ্ঞা অনুযায়ী কোনো রেখার বাস্তব অস্তিত্ব নেই, তা' কাল্পনিক, তাই ত্রিভুজেরও কোনো বাস্তব অস্তিত্ব নেই। দ্বিতীয়তঃ, এতে ঈশ্বরের ত্রিরূপের মধ্যে ঐক্যবিধানের যে চেষ্টা করা হয়, তা'ও টেকে না, কারণ ত্রিভুজের বাহু তিনটিকে পৃথক অস্তিত্বরূপে ধরা হয়। তৃতীয়তঃ, এতে Father, Son এবং Holy Ghost এদের যে কোনোটির সমগ্র সত্তা ঈশ্বরের প্রতিভূ হবার অধিকার অস্বীকৃত হয়, কারণ ত্রিভুজের যে কোনো একটি বাহুকে ত্রিভুজ বলা যায় না। চতুর্থতঃ, ত্রিভুজ দিয়ে যদি ত্রিত্ববাদ প্রমাণ করা যায়, তবে চতুর্ভুজ দিয়েও একশ্রেণীর হিন্দুর "চতুর্ব্যূহাত্মক" তত্ত্ব প্রমাণ করা যায়। পঞ্চমতঃ, এই ধরণের যুক্তিতে অধিকাংশ হিন্দুর বহু ঈশ্বরবাদও সমর্থন করা যায় একটি বহুভুজের সাহায্যে।

এরপর রামমোহন সংগ্রাম চালান খৃষ্টীয় ধর্মশাস্ত্রের (New Testament) নানা অলৌকিক ঘটনা, আচার ও গল্প থেকে খৃষ্টের জ্ঞানপ্রদ মৌল উপদেশাবলী পৃথক করবার জন্য। এই উদ্দেশ্যে তিনি একটি সংকলন গ্রন্থও প্রকাশ করেন—The Precepts of Jesus, the Guide to Peace and Happiness. এই সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বলতে গিয়ে রামমোহন বলেছিলেন যে, খৃষ্টের শিক্ষাপ্রদ উপদেশগুলো সমগ্র মানবজাতির কল্যাণকারী, কিন্তু ঐসব অলৌকিক গল্প ও সারহীন উপকথা, কারও কোনো কাজে তো আসেই না, বরঞ্চ খৃষ্টের মূল উপদেশগুলি গ্রহণ করার পথে ওগুলো বাধাস্বরূপ। রামমোহনের এই প্রচেষ্টায় গোঁড়া পাদরি-সমাজে ভীষণ ঝড় বয়ে গেল। রামমোহনকে, ও তাঁর প্রতি বিদ্বেষবশতঃ বেদকেও আক্রমণ করার জন্য পাদ-রিদের ভেতর অখৃষ্টানোচিত, এমনকি অভদ্রোচিত প্রযত্ন দেখা গেল। রামমোহনকে বলা হলো "Heathen" "the injurer of truth" আর বেদ হলো "Father of lies'। কিন্তু রামমোহনও ভীমরুলের চাকে ঢিল মেরেই চিরকাল অভ্যস্ত, কোনোদিনই তিনি ঢিলটি ছুঁড়ে পালিয়ে যাননি। তাই আশ্চর্য মহিমান্বিত শালীনতায় তিনি বারবার প্রতিবাদীদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন ধর্মীয় সহিষ্ণুতার বিরাট আদর্শের কথা। রামমোহনের এই উদার শ্লীলতামণ্ডিত আচরণ তাঁর বুদ্ধিবাদকে আরও মহনীয় করেছে। যুক্তিবাদের প্রতি তাঁর আনুগত্য এতই আন্তরিক ছিল, যে প্রতিপক্ষের কথায়ও যৌক্তিকতা কিছু থাকলে তিনি মেনে নিতেন। একবার ত্রিত্ববাদ নিয়ে বিতর্ককালে মিশনারীরা মূল বাইবেল না পড়েই খৃষ্টতত্ত্ব আলোচনায় রামমোহনের অধিকার চ্যালেঞ্জ করেন। রামমোহন তৎক্ষণাৎ মেনে নেন এবং দু'বছর কোনো আলোচনায় প্রবৃত্ত না হয়ে ল্যাটিন, গ্রীক ও হিব্রু শিখে ফেলেন এবং মূল বাইবেল পাঠ করেন। দু'বছরের ব্যবধানে প্রকাশিত 'Brahminical Magazine"এর চতুর্থ সংখ্যায় আবার বিতর্কে প্রবৃত্ত হবার কালে তিনি নিজেই একথা লিখেছেন।

রামমোহনের সব আন্দোলনে এই প্রথম বুদ্ধিবাদের দ্যুতি দেখা যায়। সহমরণ বিষয়ক তাঁর পুস্তিকা শুধু বাংলা গদ্যের নূতন শক্তিরই যে পরিচয় তাই নয়, যুক্তিবাদী চিন্তারও এক অপূর্ব নিদর্শন। তিনি নারী-সমাজের বিরুদ্ধে তৎকাল-প্রচারিত প্রতিটি কুৎসার খণ্ডন করে দেখিয়েছেন, বরঞ্চ যুক্তিগ্রাহ্য বিচারে পুরুষের ওপরও বহু দোষ এসে পড়ে।

রামমোহনের বুদ্ধিবাদী মুক্তচিন্তার আন্দোলনের মূল্য তৎকালীন ভারত বুঝতে পারেনি, এতে দুঃখের থাকলেও আশ্চর্যের কিছু নেই; কিন্তু বহু বিদেশী মনীষী এর মূল্য দিয়েছেন। বেদান্ত ও খৃষ্টতত্ত্ব সম্পর্কে তাঁর আন্দোলনের বহু-সমর্থক ছিলেন বৃটেনে, আমেরিকায়, ফ্রান্সে; রামমোহনের সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগও ছিল, এমন কি আমেরিকার বিভিন্ন স্থানে "Roy School of Thought"ও গড়ে উঠেছিল। বৃটেনে আমেরিকার সত্যসন্ধানে ও কুসংস্কার অপনোদনে তাঁর আরও সহযোগী আছে দেখে বিশ্বমানব রামমোহন পরম সন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন (লণ্ডনের ডঃ টি. রীজকে লেখা রাজার চিঠি, ৪।৬।০:৮০৪), তবে কুয়াশাচ্ছন্ন বোধবুদ্ধির এই বিশাল ভারতবর্ষে বাঙালী রামমোহন কিন্তু একক নিঃসঙ্গ ছিলেন। এই অতি-মানব একাই সেদিন জাগ্রত মানুষিক বুদ্ধি নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন ঠিক রাজার মতোই। নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের অনবদ্য ভাষায়: "রামমোহন মহর্ষি কি ব্রহ্মর্ষি, তা জানি না, তবে রামমোহন যা তা তাঁর নামের সঙ্গে স্বাভাবিক ভাবেই জুড়ে গিয়েছে, রামমোহন হলেন রাজা।...... দিল্লির শেষ হতভাগ্য বাদশাহ নয়, স্বয়ং ভারতভাগ্য-বিধাতা তাঁকে রাজতিলক দিয়েই এই ভীত, অর্দ্ধমৃত মানবকদের মধ্যে পাঠিয়েছিলেন। রাজার মতোই ছিল তাঁর ঐশ্বর্য ও শক্তির বৈচিত্র্য।"

কবি-ছান্দসিক যতীন্দ্রপ্রসাদ

ব্যোমকেশ মজুমদার

রবীন্দ্র-যুগের কবি-সমাজের এক শক্তিশালী অথচ স্বল্পালোচিত কবির সম্বন্ধে আজ এখানে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনায় প্রবৃত্ত হচ্ছি। কোনও উপযুক্ত গবেষক যদি এর দ্বারা বিন্দুমাত্রও অনুপ্রাণিত হয়ে উক্ত কবির বৈশিষ্ট্য বিষয়ে বিশদ আলোচনায় প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন, তবেই আমার মতো অক্ষমের লেখনী ধারণ সার্থক বলে বিবেচিত হবে।

সত্যেন্দ্রনাথ-মোহিতলাল-নজরুল-কুমুদরঞ্জন—যতীন্দ্রনাথ পর্যায়েই আর এক উজ্জ্বল ও বিশিষ্ট নাম—শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য। উক্ত কবি-পঞ্চকের সকলের সম্বন্ধেই কিছু-না-কিছু আলোচনা ও মূল্যায়ন হয়েছে—ব্যতিক্রম শুধু একমাত্র এই যতীন্দ্রপ্রসাদ। যতীন্দ্রপ্রসাদ সহ অন্যান্য সকল কবিই একই কবিমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত হয়েও মৌলিক কবি-কীর্তির জন্য প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট—যদিও প্রাণ-রস আহরণের আত্মিক যোগ সকলেরই রয়েছে প্রণাধিকান্ত ওই রবীন্দ্রনাথেরই সঙ্গে। ভাবে, ভাষায়, আঙ্গিকে ও চিত্রকল্পে রবীন্দ্রনাথকে প্রত্যক্ষ অনুসরণ করেন নি কেউই,—আত্মীকরণের জারকরসের কুশলী শিল্পী তাই এঁরা প্রত্যেকেই।

উল্লিখিত কবিমণ্ডলীর মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথকে বলা হয়ে থাকে—'ছন্দের যাদুকর'। বস্তুতঃ, বিভিন্ন ছন্দ নিয়ে এত সার্থক পরীক্ষা-নিরীক্ষা তাঁর পূর্বে আর কেউ করেন নি। সংস্কৃত, এমন কি সংস্কৃতেতর ভাষা থেকেও কতকগুলি নতুন ছন্দ তিনি বাংলা ভাষায় আমদানি করেন। অকালমৃত্যু না ঘটলে যে এ বিষয়ে তিনি আরও নব নব চমকের সৃষ্টি করতেন তাতেও কোনও সন্দেহ নেই।

আলোচ্য যতীন্দ্রপ্রসাদ ছন্দের ক্ষেত্রে এই সত্যেন্দ্র

নাথেরই যথার্থ উত্তরসূরি। কালকবলিত হয়ে সত্যেন্দ্র নাথকে যেখানে বাধ্য হয়ে থামতে হয়েছে, যতীন্দ্র প্রসাদের জয়যাত্রা সেখান থেকেই শুরু। সৌভাগ্যক্রমে যতীন্দ্রপ্রসাদ দীর্ঘজীবী। বয়সে নব্বইয়ের কোঠায় পৌঁছেও আজও তিনি কর্মক্ষম এবং নিয়ত সৃষ্টিশীল। সারা জীবন অজস্র লিখেছেন এবং প্রবাসী, ভারতবর্ষ, বঙ্গবাণী, প্রবর্তক ইত্যাদি থেকে আরম্ভ করে খ্যাত অখ্যাত এমন পত্রিকা দেশে খুব কমই আছে বা ছিল যাতে কখনও-না-কখনও তাঁর কোনও রচনা প্রকাশিত হয় নি। রচনার মান ও উৎকর্ষেই শুধু শ্রেষ্ঠ তিনি নন। যে কোনও কাগজকে চাওয়া মাত্র বিনা দ্বিধায় কবিতা দিতে এমন দিলদরিয়া কবিও আর ক'জন মেলে জানি না। যতীন্দ্রপ্রসাদের কবিতা কতকটা হয়তো অযত্নে ও অবহেলায়ই ছড়িয়ে আছে সর্বত্র—কৌতূহলী পাঠক মাত্রেরই পক্ষে সুলভও তিনি তাই।

অজস্র সৃষ্টির অনুপাতে যতীন্দ্রপ্রসাদের পুস্তকের সংখ্যা খুবই কম—পাঁচখানা মাত্র। পুস্তকাকারে অবিধৃত অথচ সাময়িক পত্রে প্রকাশিত কবিতার পরিমাণ বহু। আর অমুদ্রিতও বড় কম নেই। তাঁর প্রথম পুস্তক "মর্মগাথা" ২৪ বৎসর বয়সে ১৩২১ সালে মুদ্রিত হয়। তারপর যথাক্রমে হাসির হল্লা (১৩৩০), ছায়াপথ (১৩৩২) রামধনু (১৩৩৩) ও নভোরেণু" (১৩৩৪)। শেষোক্ত পুস্তকের পর সুদীর্ঘকাল আর কোনও বই প্রকাশিত হয় নি। অবশেষে সেদিন, মাত্র ১৩৭০ সালে, কবির ৭২ বৎসর বয়সে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় তাঁর "শ্রেষ্ঠ কবিতা" বের হয়।

যতীন্দ্রপ্রসাদ "প্রবর্তক" পত্রিকায় চৈত্র, ১৩৫৮ থেকে আরম্ভ করে পরবর্তী কয়েকটি সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে "সংস্কৃত ছন্দের বাংলা রূপ" শিরোনামে স্বরচিত কবিতার নিদর্শন সহ যে বিস্তৃত আলোচনা করেন, কৌতূহলী ছন্দ-জিজ্ঞাসুদের পক্ষে তা যথেষ্ট তথ্যবহুল। ঐ প্রবন্ধে আলোচিত ছন্দের সংখ্যা মোট ৫০টি। যথা:—

১। অনুকূলা ছন্দ	২। কুসুমবিচিত্রা
৩। গজমতি ছন্দ	৪। চণ্ডীছন্দ
৫। চণ্ড বৃষ্টি প্রপাত ছন্দ	৬। জলোদ্ধত গতি
৭। ত্বরিত গতি	৮। তনুমধ্যা
৯। তামরস	১০। তূণক
১১। তোটক	১২। দীপকমালা
১৩। দ্রুতপদ	১৪। দুর্মিল
১৫। দোধক	১৬। পঙ্‌ক্তি
১৭। পঞ্চচামর	১৮। প্রমাণিকা
১৯। পুষ্পিতাগ্রা	২০। অনুষ্টুপ
২১। বংশস্থবিল	২২। বিদ্যুন্মালা
২৩। বিদ্যুল্লেখা	২৪। ভ্রমরবিলসিত
২৫। ভুজঙ্গ প্রয়াত	২৬। মন্দাকিনী
২৭। মত্তা	২৮। মধুমতী
২৯। মন্দাক্রান্তা	৩০। মালী
৩১। মালিনী	৩২। মণিমালা
৩৩। মাণবক	৩৪। লোম্মবিস্ফূর্জিতা
৩৫। মৃগী	৩৬। রুচিরা
৩৭। হীরক	৩৮। শার্দূল বিক্রীড়িত
৩৯। শশিবদনা	৪০। শশিকলা
৪১। শিখরিণী	৪২। স্রগ্ধরা
৪৩। সমাপিকা	৪৪। স্রক্
৪৫। সতী	৪৬। সুমুখী
৪৭। স্ত্রী	৪৮। প্রিয়া
৪৯। ইন্দ্রবজ্রা	৫০। উপেন্দ্রবজ্রা

এ ছাড়া নিজস্ব পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতালব্ধ সম্পূর্ণ মৌলিক ছন্দও তাঁর আছে। নিদাঘ মধ্যাহ্নের নিস্তব্ধ প্রহরের বিরহী ঘুঘুর মন-কেমন-করা উদাস গম্ভীর ডাককে ছন্দে অনুকরণ করে 'ঘুঘু-ডাকা ছন্দ' নাম দিয়ে তাতে কবিতা লিখে ছন্দ সরস্বতীর চরণ-মঞ্জীরে ধ্বনিত করেছেন।

যতীন্দ্রপ্রসাদ অসামান্য ছন্দ-কুশলীই শুধু নন, নানা রসের ও রীতির কবিতা রচনায়ও তিনি সিদ্ধহস্ত।

রঙ্গ, ব্যঙ্গ প্যারডি, কাহিনী-কাব্য ও প্রশস্তি, শোক গাথা ও সনেট, দেশপ্রেমমূলক ও রাজনীতি-সচেতন বহুতর বিভিন্ন কবিতায় তাঁর বলিষ্ঠ স্বাক্ষর উজ্জ্বল হয়ে আছে। বহু পংক্তির সুদীর্ঘ কবিতা যেমন লিখেছেন, দু'চার লাইনের ঘন পিনদ্ধ ভাবসমৃদ্ধ কবিতা-কণিকা রচনায়ও তেমনি তিনি সকল স্বচ্ছন্দ।

যতীন্দ্রপ্রসাদের ছন্দ-কুশলতা সম্পর্কে প্রখ্যাত ছন্দো বিজ্ঞানী অধ্যাপক শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয় কর্তৃক কবিকে লিখিত দীর্ঘ দু'খানা পত্রের অংশবিশেষ উদ্ধৃত করলে আমার বক্তব্য স্পষ্টতর হবে বলে আশা করি।—

১। আপনার বইগুলির অধিকাংশই আমি পড়িয়া ফেলিয়াছি। আপনার বইগুলির বহু কবিতার সঙ্গেই মাসিক পত্রিকার পৃষ্ঠায় আমার পরিচয় ছিল। আর, ছন্দোবৈচিত্র্যের জন্য আপনার বহু কবিতাই আমার সংগৃহীত আছে। আমার ছন্দের পুস্তকে আপনার অনেক কবিতা হইতেই দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিতে হইবে। ছন্দের দিক ছাড়িয়া দিয়া, শুধু রসের দিক হইতেও আপনার অনেক কবিতাই আমাকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করিয়াছে। আপনার রঙ্গ ও ব্যঙ্গ কবিতাগুলির যে বাংলা সাহিত্যে একটি বিশেষ মূল্য আছে সে কথা সকলেই স্বীকার করিবে।

আপনার পত্র পাইলে এবং আপনার সঙ্গে ছন্দ আলোচনার সুযোগ পাইল সুখী হইব।

(তালপুকুর, কুমিল্লা থেকে ১৫।৬।৩২ তাং লিখিত চিঠি।)

২। স্বরমাত্রিক ছন্দের উদ্ভাবয়িতা আপনার ভাষায় বঙ্গের "পিঙ্গল" সত্যেন্দ্রনাথ। তারপর নজরুল ইসলাম, গোলাম মোস্তাফা, কালিদাস রায়, নরেন্দ্র দেব প্রভৃতিও কিছু কিছু লিখেছেন এ ছন্দে। কিন্তু তাঁদের রচনায় স্বরমাত্রিক ছন্দের দৃষ্টান্ত খুব কম। আমার মনে হয় স্বরমাত্রিক ছন্দের সত্যেন্দ্রনাথের পরেই আপনার স্থান। এ ছন্দের বহু কবিতা রচনা করে আপনি বাংলার ছন্দ-ভাণ্ডারের সম্পদবৃদ্ধি করেছেন। আমার ছন্দের গ্রন্থে এবং স্বরমাত্রিক ছন্দের গ্রন্থে এবং স্বরমাত্রিক ছন্দের প্রবন্ধে আমি যথাযোগ্যভাবে এ কথার উল্লেখ করব। আপনি এই পত্রখানিতে আপনার সংস্কৃত ও আরবি থেকে অনুবাদিত এবং মৌলিক স্বরমাত্রিক ছন্দগুলির তালিকা দেওয়াতে আমি খুবই উপকৃত হয়েছি।

* * *

স্বরমাত্রিক ছন্দের দৃষ্টান্তের জন্য সত্যেন্দ্রনাথ ও আপনার রচনার আশ্রয় নিতে হবে বিশেষ করে। এ বিষয়ে আপনার অনুমতি পেলে অনুগৃহীত হব।

(লালকুঠি, পোঃ-তেলিনীপাড়া, হুগলী থেকে ২৫. ৪. ৩২ তাং লিখিত চিঠি)।

যতীন্দ্রপ্রসাদ ১৮৯০ সালের ২১শে মে রাজসাহী (অধুনা বাংলাদেশের অন্তর্গত) জেলার বলিহার গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম ৺রোহিণীপ্রসাদ ভট্টাচার্য। পিতৃব্য রজনীপ্রসাদকে তাঁর শৈশবে ময়মনসিংহ জেলার গৌরীপুরের বিরাট ও সুপ্রসিদ্ধ জমিদার ৺রাজেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী মহাশয়কে দত্তক পুত্র স্বরূপ দান করা হয়। রজনীপ্রসাদের নাম পরিবর্তিত হয়ে এবং হলো ব্রজেন্দ্রকিশোর। স্বদেশী যুগের বিখ্যাত দানবীর সঙ্গীতজ্ঞ, মার্গসঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষক ও বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্যরূপে (M. L. C.) ব্রজেন্দ্রকিশোরের পরিচয় একদা নিখিল বঙ্গে ব্যাপ্ত ছিল।

রোহিণীপ্রসাদ যৌবনকালেই জন্মভূমি বালিহার ত্যাগ করতঃ অনুজের জমিদারী গৌরীপুর এস্টেটের দায়িত্বশীল কর্মচারীপদে নিযুক্ত হয়ে গৌরীপুরেরই স্থায়ী অধিবাসীরূপে পরিণত হন; এবং ব্রজেন্দ্রকিশোরের আনুকূল্যে ও আর্থিক সহায়তায় প্রাসাদ-সংলগ্ন তাঁর নিজস্ব ভদ্রাসনও গড়ে ওঠে। যতীন্দ্রপ্রসাদ জন্মসূত্রে রাজসাহীর সন্তান হলেও ময়মনসিংহ তাই তাঁর ধাত্রী মাতা। ময়মনসিংহেরই স্তনরসে তাঁর দেহ যেমন পরিপুষ্ট, তারি বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক পরিবেশে তেমনি তাঁর ভাবজীবনেরও চরম বিকাশ। দ্বিতীয় জন্মভূমি এই ময়মনসিংহের প্রতি কবির তাই পক্ষপাত ও কৃতজ্ঞতার

অন্ত নেই। নানা কবিতায় মুক্তকণ্ঠে তার প্রশস্তিও তিনি গেয়েছেন।

যতীন্দ্রপ্রসাদ শৈশবে কিছুকাল কাশীবাস করেছিলেন। এবং স্কুলে ভর্তি হয়ে পড়াশুনাও করেন। তার ফলে হিন্দীভাষা উত্তমরূপে তাঁর অধিগত। উর্দু ও মোটামুটি জানেন। বাংলায় ফিরে এলে পরে ময়মনসিংহ সহরের কোনও স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন। অতঃপর কলকাতায় সুকিয়া স্ট্রীটস্থ গৌরীপুরের বাসা বাড়ীতে অবস্থান করে মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশন থেকে আই এ পরীক্ষা দিয়ে ব্যর্থকাম হওয়ায় পাঠ্যজীবনের সমাপ্তি ঘটে। কৃষ্ণ নাগ, শিশির ভাদুড়ী, যতীন্দ্রকিশোর চৌধুরী প্রভৃতি স্বনামধন্য ব্যক্তিগণ তখন সেখানে শিক্ষক ছিলেন।

এই সময় পিতা রোহিণীপ্রসাদের কলেরা রোগে অকাল মৃত্যু হওয়ায় পিতৃব্য ব্রজেন্দ্র কিশোরের আদেশ ক্রমে সে যতীন্দ্রপ্রসাদ গৌরীপুর এস্টেটে পিতার শূন্য স্থান অধিকার করে কর্মরত হন। সদর নায়েব, ইন্‌স্পেকটর ইত্যাদি বিভিন্ন দায়িত্বপূর্ণ পদে বিশেষ যোগ্যতা ও সুনামের সঙ্গে ১৩০৫ সনের ২০শে অগ্রহায়ণ থেকে ১৩৬০ সনের ২৮শে আষাঢ় পর্যন্ত সুদীর্ঘকাল কাজ করে অবসর গ্রহণ করেন।

গৌরীপুর, তৎসন্নিহিত কালীপুর, রামগোপালপুর, গোলোকপুর, ভবানীপুর প্রভৃতি বড় বড় জমিদার অধ্যুষিত অঞ্চলের মধ্যমণি স্বরূপ সহরের সমস্ত সুযোগ সুবিধা সম্পন্ন অতি উন্নত ধরণের গ্রাম। নগরতুল্য আদর্শ পল্লীতে পিতৃব্য ব্রজেন্দ্রকিশোরের স্নেহছায়ায় পঞ্চাশ বৎসরের অধিককাল উদ্বেগহীন স্বচ্ছন্দ জীবন যাপন যতীন্দ্রপ্রসাদের ভাবরাজ্যে ও ব্যক্তিচরিত্রে নানাভাবে গভীর রেখাপাত করেছে। তিনি সরল, সহৃদয় ও নিরহঙ্কার। কান্ত রূপের সঙ্গে এই সব দুর্লভ গুণ একত্রিত হয়ে যৌবনে তাঁকে ঘরে-বাইরে সমান আকর্ষক করে তোলে। বাংলার সারস্বত সমাজে যেমন ছিল তাঁর অসামান্য সমাদর ও প্রতিষ্ঠা, গৌরীপুর এস্টেটের দীন-দরিদ্র অসহায় প্রজাকুলের সঙ্গে তেমনি ছিল অপরিসীম স্নেহ ও প্রীতির সম্পর্ক। তাদের সুখ-দুঃখের সঙ্গে একাত্মভাবে মিশে গিয়ে কবিতার অনেক উপাদান তিনি সংগ্রহ করেন। তা ছাড়া ময়মনসিংহ জজ আদালতের বিশেষ জুরী এবং জুরীগণের মুখপাত্র হিসাবে দীর্ঘকাল কাজ করার ফলে মানব-চরিত্রের গূঢ় ও জটিল বিষয়গুলি সম্পর্কেও তিনি অবহিত হওয়ার সুযোগ পান, এবং কতকগুলি কাহিনী কবিতায় তাদের রূপ দিতেও চেষ্টা করেন। বস্তুত, যতীন্দ্রপ্রসাদ সারা জীবন নিজের চোখে যা দেখেছেন, নিজের কানে যা শুনেছেন এবং নিজের প্রাণে যা উপলব্ধি করেছেন—কিছুই তার বিফলে যেতে দেন নি। সব উপাদানকেই অক্ষরের জালে বন্দী করে করে কবিতার ছন্দে লীলায়িত করেছেন। গৌরীপুর এস্টেটের চাকরী তাই যতীন্দ্রপ্রসাদের জীবনে বিধাতার আশীর্বাদ স্বরূপ হয়েছিল বলা যায়।

অন্ততঃ একটি বিষয়ে যতীন্দ্রপ্রসাদ ভারতীয় কবি-সমাজের অগ্রণী পথিকৃৎ স্বরূপ। ১৯২৪ সালের ২১শে জানুয়ারী বলশেভিক নেতা মহামতি লেনিনের মৃত্যু হয়। কিন্তু, তদানীন্তন বৃটিশ শাসিত ভারতের সংবাদ-পত্রগুলিতে সেই সংবাদ যথোচিত মর্যাদা সহকারে প্রকাশিত তো হয়ই নি, এমন কি অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় Statesmanএর মতো প্রভুভক্ত বশংবদ কাগজ এ কথা লিখতেও পশ্চাৎপদ হলো না—The notorious Bolshevik leader Lenin has dead. অমৃতবাজার পত্রিকায় রয়টারের প্রদত্ত অতি সংক্ষিপ্ত সংবাদ ছাপা হলো—Lenin is dead প্রায় সংস্কৃত ব্যাকরণের সূত্রাকারে প্রকাশিত ওই সমস্ত সংবাদপত্রের খবর তাই কারও কারও চোখে যদিই বা পড়ে থাকে, অনেকের দৃষ্টিই এড়িয়েও গেল। কলকাতা থেকে বহুদূরে ময়মনসিংহের গৌরীপুরে অবস্থানরত যতীন্দ্রপ্রসাদের কানে এ সংবাদ পৌছলো প্রায় দু'মাস পরে। তিনি তৎক্ষণাৎ রাত জেগে "লেনিন" নামে এক দীর্ঘ কবিতা লিখে তখনকার বিখ্যাত মাসিকপত্র বঙ্গবাণীতে প্রকাশ করেন। কবিতাটির রচনাকাল—২ চৈত্র, ১৩৩০ সাল।

দুর্গত মানবসমাজের মুক্তি সন্ধানী, শ্রমিক ও কৃষক দরদী মহামানব লেনিনের যথার্থ মূল্যায়ন সেদিন বার্ষিক বারো লক্ষ টাকা আয়ের বিশাল জমিদারীর এক পদস্থ কবি-কর্মচারী করতে পেরে তাঁর প্রশস্তি-মুখর হয়ে উঠেছিলেন—এটা তখনকার পরিপ্রেক্ষিতে এক অভাবনীয় ঘটনা। এই ঘটনা যে যতীন্দ্রপ্রসাদের সংস্কারমুক্ত প্রাগ্রসর চিন্তাধারারই দ্যোতক তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

একমাত্র যতীন্দ্রপ্রসাদ ছাড়া ভারতীয় আর কোনও কবিই লেনিন সম্পর্কে সেদিন কিছু লিখতে সাহসী হন নি। তাই বলছিলাম, অন্ততঃ এই বিশেষ ক্ষেত্রটিতে তিনি ঐতিহাসিক স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হয়েছেন, এবং লেনিন-অনুরাগীদের দ্বারা তার জন্য তিনি চিরবন্দনীয় হয়ে থাকবেন। কবির এই ঐতিহাসিক ভূমিকা উপযুক্ত মর্যাদা সহকারে "পরিচয়" পত্রিকায় লেনিন শতবার্ষিক সংখ্যায় আলোচিত হয়েছে। কৌতূহলী পাঠক-পাঠিকা তা পড়ে দেখতে পারেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, উপরি উক্ত "লেনিন" কবিতার জন্য কবিকে রাজরোষেও পড়তে হয়েছিল,এবং একমাত্র তদানীন্তন স্থানীয় পুলিশ অফিসার পূর্ণচন্দ্র ঘোষালের আন্তরিক প্রচেষ্টাই সেদিন তাঁকে নিশ্চিত শ্রীঘরবাস থেকে রক্ষা করে।

যতীন্দ্রপ্রসাদের জীবনের আরও একটি গৌরবময় কাহিনীর উল্লেখ না করলে এ প্রসঙ্গ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

১৯২৬ খৃষ্টাব্দে বীরভূম সাহিত্য সম্মিলনের আমন্ত্রিত সাহিত্যিক-শিবিরে একদিন রাত্রিকালে ময়মনসিংহের "সৌরভ"-সম্পাদক কেদারনাথ মজুমদার এসে যতীন্দ্র-প্রসাদকে জানালেন যে, একজন নবযুবক কবির সঙ্গে দেখা করার উদ্দেশ্যে বাইরে অপেক্ষা করছেন। কবি তদুত্তরে যুবকটিকে ভেতরে নিয়ে আসতে বললেন। একটি শীর্ণ ও কৃষ্ণকায় যুবক ভেতরে প্রবেশ করে পাদ স্পর্শ করে প্রণাম করায় কবি তাঁকে নিজের বিছানারই এক পাশে বসতে দিলেন। যুবকটি তখন তাঁর নব প্রকাশিত একখানা কবিতার বই যতীন্দ্রপ্রসাদের হাতে উপহার দিয়ে ওই পুস্তক সম্বন্ধে কবির মতামত প্রার্থনা করলেন। কবি বললেন যে, ছোট ওই বইখানা রাত্রেই তিনি পড়ে রাখবেনএবং পরদিনই যেন যুবকটি তাঁর মতামত জানতে আসেন। যুবকটি পরদিন আবার এলে কবি প্রথমেই তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি তাঁর বই সম্বন্ধে সত্য কথা শুনতে চান, না, মন-রাখা মামুলী কথায়ই তিনি সন্তুষ্ট হবেন। যুবকটি উত্তরে জানালেন যে, সত্য কথা শুনবার আকাঙ্ক্ষা নিয়েই তিনি যতীন্দ্র-প্রসাদের মতো বিশেষজ্ঞ কবির কাছে এসেছেন, অতএব সত্য কথাই তিনি শুনবেন। যতীন্দ্রপ্রসাদ নিশ্চিন্ত হয়ে বললেন, রবীন্দ্রনাথের মতো অসামান্য শক্তিশালী প্রচণ্ড কবি-ভাস্কর যখন তখনও বাংলা কাব্য-সাহিত্যের মধ্যগগনে দীপ্তিমান, তখন তাঁর প্রভাব-মণ্ডপের মধ্যে থেকে গতানুগতিক পন্থায় কবিতা লিখে অন্য আর কারও পক্ষেই কবি হিসাবে খ্যাতি অর্জন করা খুবই দুঃসাধ্য। তাই তার চেয়ে তিনি যদি গল্প লিখতে চেষ্টা করেন তবে কালে হয়তো নাম করা সম্ভব হতে পারে। কারণ, তাঁর কয়েকটি কাহিনীমূলক কবিতায় তিনি ভালো গল্পের উপাদান দেখতে পেয়েছেন। যুবকটি কবির এই পরামর্শে ও আশ্বাসে সন্তুষ্ট হয়ে ও সম্মতি জানিয়ে বিদায় গ্রহণ করলেন।

১৯২৬ সালের সেই অখ্যাত তরুণ কবি পরবর্তী কালের অপ্রতিদ্বন্দ্বী কথাশিল্পী তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। যতীন্দ্রপ্রসাদকে উপহার দেওয়া সেদিনকার সেই কবিতার বইখানা হলো—"ত্রিপত্র"।

তারাশঙ্কর স্মৃতিচারণমূলক কয়েকখানা গ্রন্থ প্রণয়ন করে গেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, যে ঘটনা তাঁর সাহিত্য জীবনের দিক পরিবর্তনে প্রেরণা সঞ্চার করে তাঁকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করেছিল, সে সম্পর্কে বিন্দুমাত্র উল্লেখ কোথাও করেছেন বলে জানা যায় না।

তাওয়ালের নির্বাসিত সন্তান স্বভাব-কবি গোবিন্দ

চন্দ্র দাসের সঙ্গে ছিল যতীন্দ্রপ্রসাদের নিবিড় শ্রদ্ধা ও প্রেমের সম্পর্ক। গোবিন্দচন্দ্র ১৯২৫ সালের ১৮শে শ্রাবণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে গৌরীপুরে যান এবং যতীন্দ্রপ্রসাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ৫।৬ দিন তাঁর আতিথ্য গ্রহণ করেন। এর কিছুকাল পরে ওই সালেরই অগ্রহায়ণ মাসে ঢাকা সহরের নারিন্দা পল্লীতে চরম দারিদ্র্য ও লাঞ্ছনার মধ্যে নিতান্ত অসহায় অবস্থায় বাংলার এই স্বভাব-কবি পরলোকগমন করেন। নানা কারণে ঢাকা সাহিত্যিক সমাজ তাঁর প্রতি বীতশ্রদ্ধ ছিলেন বলে উপযুক্ত মর্যাদা সহকারে শবযাত্রা অনুষ্ঠিত হয় নি। ময়মনসিংহের সন্তান তৎকালে ঢাকা-প্রবাসী প্রখ্যাত পল্লী-গবেষক পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্যের লিখিত চিঠিতে এই সংবাদ অবগত হয়ে শোকাকুল যতীন্দ্রপ্রসাদ তৎক্ষণাৎ লোকান্তরিত কবির সম্বন্ধে এক দীর্ঘ কবিতা রচনা করেন। রবীন্দ্রনাথের "সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত" ও নজরুল ইসলামের "চিত্তনামা"-র মতোই বাংলা কাব্য-সাহিত্যে তা একটি শ্রেষ্ঠ স্মৃতিতর্পণরূপে পরিগণিত হওয়ার যোগ্য।

অভিজ্ঞ পাঠক-পাঠিকা মাত্রেই জানেন, পূর্ববঙ্গের আঞ্চলিক ও ঘরোয়া শব্দ ব্যবহারে গোবিন্দচন্দ্র দাসের জুড়ি ছিল না। তাঁর কবিতায় ব্যবহৃত "লগে লগে" এবং "রগে রগে" কথাগুলির অর্থ কি সে সম্বন্ধে একদা হেদুয়া ভ্রমণরত খাঁটি পশ্চিমবঙ্গবাসী কবি সত্যেন্দ্রনাথ যতীন্দ্রপ্রসাদকে প্রশ্ন করেন। যতীন্দ্রপ্রসাদ তদুত্তরে বলেন যে, 'লগে লগে' মানে সঙ্গে সঙ্গে। আর 'রগে রগে' মানে শিরায় শিরায়। সত্যেন্দ্রনাথ অত্যন্ত তারিফ করে বললেন, এইরূপ সুন্দর সুন্দর আঞ্চলিক শব্দের সুষ্ঠু ব্যবহার যদি সকল সাহিত্যিকই করেন, তবে বাংলা ভাষার সম্পদ ও প্রকাশ-ক্ষমতা আরও বহুগুণ বৃদ্ধি পেতে পারে। প্রণয়াস্পদ কবি-সুহৃদের ওই অমূল্য মন্তব্যের যথার্থ সদ্ব্যবহার যতীন্দ্রপ্রসাদ তাঁর সুদীর্ঘ সাহিত্যজীবনে সর্বদাই করে এসেছেন। তাঁর কবিতায় জটিল ও দুর্বোধ্য শব্দ তো নেই-ই, এমন কি আভিধানিক শব্দের প্রয়োগও কম। আটপৌরে জীবনের ঘরোয়া পরিবেশ থেকেই নিত্যব্যবহার্য চলতি শব্দ বাছাই করে নিয়ে তিনি সেগুলি তাঁর প্রতিটি কবিতায় প্রয়োগ করেছেন। যার ফলে প্রবোধচন্দ্রের উল্লিখিত স্বরমাত্রিক ছন্দে যতীন্দ্রপ্রসাদের অমন অপূর্ব কুশলতা।

যতীন্দ্রপ্রসাদ বলেন, সুহৃৎ সত্যেন্দ্রনাথেরই মতো গুরু রবীন্দ্রনাথের কাছেও অন্ততঃ একটি বিষয়ে তিনি চিরঋণী। যতীন্দ্রপ্রসাদ একদা গুরুদেবের কাছে দুঃখ প্রকাশ করে বলেন যে, রবীন্দ্রনাথের সর্বাতিশায়ী প্রতিভার আওতায় থেকে তাঁদের মতো ক্ষুদ্রতর কবির পক্ষে নূতন আর কোনও কিছু সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। তদুত্তরে কবিগুরু বলেন, প্রত্যেকেরই নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী আছে। কাজেই সকলকেই যে রবীন্দ্রনাথের চোখে দেখতে হবে তার কোনও কথা নেই। প্রত্যেকেরই উচিত নিজের নিজের চোখে বিশ্বজগৎ দেখা এবং সেই মতো লেখা। তাহলেই তাদের সৃষ্টির স্বাতন্ত্র্য রক্ষা পেতে পারে।

রবীন্দ্রনাথের এই উপদেশ স্মরণ রাখার ফলে যতীন্দ্রপ্রসাদের কবিতা কারও অনুকরণ যেমন হয়নি, নূতন নূতন বিষয়বস্তুরও অভাব তেমনি এই বিরাশী বছর পর্যন্তও তাঁর ঘটেনি।

রবীন্দ্রনাথ যতীন্দ্রপ্রসাদকে স্নেহই যে কেবল করতেন তা নয়। প্রয়োজনে যতীন্দ্রপ্রসাদের সাহায্যও তিনি বহুবার গ্রহণ করেছিলেন। বস্তুতঃ, ব্রজেন্দ্রকিশোরের সঙ্গে কখনও যোগাযোগ করতে হলে যতীন্দ্রপ্রসাদই ছিলেন তার একমাত্র মাধ্যম। সকলেই জানেন, কালিম্পঙ্ শৈলাবাসে কবিগুরু "গৌরীপুর ভবন"-এ অবস্থান করতেন। এবং তাঁর শেষ জীবনের কতকগুলি বিখ্যাত কবিতা সেখানেই রচিত। ওই "গৌরীপুর ভবন"-এর মালিক ছিলেন ময়মনসিংহ-গৌরীপুরের জমিদার স্বনামধন্য সেই ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী। বাড়ীটি ব্যবহারের অনুমতি নিতে রবীন্দ্রনাথ প্রতিবার স্নেহাস্পদ যতীন্দ্রপ্রসাদকেই স্মরণ করতেন।

১৩৩৪ সালে পূর্ববঙ্গ সফররত রবীন্দ্রনাথ ময়মনসিংহ

যান, এবং মহারাজা শশিকান্ত আচার্য চৌধুরীর সুরম্য বাগানবাড়ী Alexandar Castle-এ অবস্থান করেন। রবীন্দ্রনাথের জরুরী তার পেয়ে যতীন্দ্রপ্রসাদ গৌরীপুর থেকে ময়মনসিংহে এসে দেখেন, কবি খুবই চিন্তান্বিত ও বিমর্ষ। ব্রহ্মপুত্র নদের পরপারে সুদূর গারো পাহাড়ের শ্যাম মেঘচ্ছায়ার প্রতি দৃষ্টি প্রসারিত করে একটি পেয়ালা থেকে চামচ দিয়ে তুলে তুলে কি যেন আহার করছেন। যতীন্দ্রপ্রসাদকে দেখেই চোখে-মুখের অভ্যস্ত অপূর্ব ভঙ্গি সহকারে বলে উঠলেন—যতীন, আমার সব স্বপ্ন ভেঙে গেলো! শান্তিনিকেতনকে বুঝি আর বাঁচাতে পারলুম না। যতীন্দ্রপ্রসাদের প্রশ্নের উত্তরে কবিগুরু বললেন যে, আর্থিক সংকটই এর একমাত্র কারণ। ময়মনসিংহ জেলায় তো বড় বড় অনেক জমিদার আছেন। যতীন্দ্রপ্রসাদ যদি কবির হয়ে একটু চেষ্টা করেন, তা হলে তাঁদের কাছ থেকে হয়তো আর্থিক আনুকূল্য তিনি কিছুটা লাভ করতে পারেন। এই কথা শুনে কবি-পুত্র রথীন্দ্রনাথকে সঙ্গে নিয়ে যতীন্দ্রপ্রসাদ তৎক্ষণাৎ গৌরীপুরে চলে যান, এবং গৌরীপুর এষ্টেট্ থেকে তো বটেই, সন্নিহিত অন্যান্য আরও কয়েকটি জমিদার বাড়ী থেকেও বেশ কয়েক হাজার টাকা চাঁদা তুলে রবীন্দ্রনাথের হাতে সমর্পণ করেন।

একথা বোধ হয় এতক্ষণে স্পষ্ট হয়েছে যে, উল্লিখিত কারণ পরম্পরায়, রবীন্দ্রনাথ যতীন্দ্রপ্রসাদকে ভালোও বাসতেন যেমন, তাঁর উপর নির্ভরও করতেন ঠিক তেমনি। কিন্তু, অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, রবীন্দ্রনাথের কোনও জীবনীতে এ সব তথ্যের বিন্দুমাত্র উল্লেখও কোথাও দেখা যায় না। তার ফলে প্রতিষ্ঠাবান্ লেখকদের কারও কারও মধ্যেও অন্যান্য ভুলের সঙ্গে এমন ভ্রান্ত ধারণাও বদ্ধমূল রয়ে গেছে যে, রবীন্দ্র-স্মৃতি-পূত কালিম্পঙের সেই বিখ্যাত "গৌরীপুর ভবন"টি ময়মনসিংহ-গৌরীপুরের নয়—রাজ্যান্তরের আর এক গৌরীপুরের!

প্রখ্যাত সঙ্গীতবিদ শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী তাঁর "সুরের সুরধুনী" গ্রন্থে তাঁর বাল্যকালে যতীন্দ্র-প্রসাদ-সমভিব্যাহারে রবীন্দ্র-সন্দর্শনে যাত্রার এবং তাঁকে প্রথম দেখার যে মনোরম বর্ণনা দিয়েছেন, তাতে যতীন্দ্রপ্রসাদের ভূমিকাটি কৌতূহলী পাঠক-পাঠিকাকে পড়ে দেখতে অনুরোধ করি।

মতামতের বৈচিত্র্য

পাপ পুণ্য, ধর্ম্ম অধর্ম্ম, ন্যায় অন্যায়, সমাজ-সহায়ক সমাজ-বিরুদ্ধ, মানবতার আদর্শ সম্বন্ধে আনুকূল্য বা বৈপরীত্য ইত্যাদি কথার কোন স্থিরনিশ্চয় মূল্য নির্ণয় করা সহজ কার্য্য নহে। ইহার কারণ এই যে প্রায় সকল কর্ম্ম, পারম্পর্য্যিক সম্বন্ধ ও কার্য্যের ফলাফলের একাধিক অর্থ বা রূপ থাকিতে পারে ও সেই কারণে যাহা এক-ভাবে পুণ্য, ধর্ম্ম, ন্যায় সমাজ-সহায়ক ও মানবতার অনুকূল বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহাই আবার অন্য ভাবে বিচারিত হইয়া পাপ, অধর্ম্ম, অন্যায়, সমাজ বিরুদ্ধ ও মানবতার প্রতিকূল বলিয়া নিরূপিত হয়। মানুষকে আঘাত করা পাপ, কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি কোন নারী-হন্তা অথবা সমাজ-উৎপীড়ক অপরাধীকে আঘাত করিয়া পাপকার্য্য হইতে তাহাকে বিরত করিতে বাধ্য করে তাহা হইলে সেই ক্ষেত্রে আঘাত করা পাপ বলিয়া ধার্য্য হইবে না। যে সকল কালাপাহাড় নিজ ধর্ম্মের প্রচারার্থে অপরের ধর্ম্মকেন্দ্র ও মন্দিরাদির ধ্বংস সাধনে আত্মনিয়োগ করে তাহাদিগের ক্রিয়া একাধারেই ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম বলিয়া ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীর মানুষে বিচার করিয়া থাকে। নিজ জাতি বা সমাজের লাভ অথবা উন্নতি হইবে বলিয়া বহু শক্তিশালী যোদ্ধা অপর জাতি বা সমাজের জনগণের উপর নিদারুণ অত্যাচার করিয়াছেন বলিয়া ইতিহাসে বহু উদাহরণ পাওয়া যায়। বর্ব্বর জাতিদিগের দ্বারা রোমের উপর আক্রমণ, শক হুন তাতার লুণ্ঠনকারীদিগের ভারত অভিযান, নেপোলিয়ন অথবা হিটলারের বিশ্ব বিজয় চেষ্টা, চীনের তিব্বত বিজয় অথবা আমেরিকার ভিয়েৎনাম বিধ্বস্ত-করণ মানবতার মাপকাঠিতে মাপিলে আদর্শ-বিরুদ্ধ বলিয়া দেখা যাইবে যদিও যাহারা সেই মহা অন্যায় করিয়াছেন তাহাদের নিজের সমাজ বা জাতির সুবিধার দিক দিয়া দেখিলে অধিক ব্যক্তির দ্বারাই অন্যায়টা আর অন্যায় বলিয়া স্বীকৃত হইবে না।

অর্থাৎ যাহাকে নৈতিক মূল্য বিচার বা নির্দ্ধারণ বলা হয় তাহা মনুষ্য সমাজে কদাপি একভাবে করা হইতে দেখা যায় না। কেহ যাহাকে পাপ বলে অপরে সেই কার্য্যকেই পুণ্য বলে। যাহা এক ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর নিকট ধর্ম্ম বলিয়া ধার্য্য হয় তাহাই অপর ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর নিকট অধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। সমাজের উন্নতি বা প্রগতি অথবা মানবতার আদর্শ লইয়া আলোচনা করিলেও নানা মত ব্যক্ত হইতে দেখা যায়। কোন্ ভাবে চলিলে সমাজের উন্নতি হয়, অথবা উন্নতির পরিবর্ত্তে অবনতিই হয়, সে বিষয়েও সমাজের সকল মানুষকে কখনও এক মত পোষণ করিতে দেখা যায় না। বিশ্বমানবতার দিক দিয়াও বর্ণবিদ্বেষ, সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর দ্বারা সামরিক শক্তি ব্যবহারে সংখ্যাগুরুদিগের শাসনভার গ্রহণ, নানা দেশ ও জাতির প্রগতির পথে বাধা সৃষ্টি নিবারণ চেষ্টা ইত্যাদি বহু বিষয়ে যে কোনো মত যে কোনো দিক হইতে প্রকাশিত হয়। তাহার বিপরীত মতও প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই অপর কোন দিক হইতে সমান শক্তিতেই ব্যক্ত করা হইতে দেখা যায়। বিষয়ও আছে অসংখ্য। জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ, আন্তর্জাতিক সম্বন্ধ নির্দ্ধারণ ক্ষেত্রে নানা প্রকার বিধি ব্যবস্থা প্রয়োগ নিয়োগের আয়োজন—রুশ দেশ হইতে ইহুদিদিগকে ইসরায়েলে ইচ্ছামত যাইতে দেওয়া হইবে কি না, ইউগাণ্ডা হইতে বিতাড়িত এশিয়াবাসী-দিগের বৃটিশ নাগরিকতা থাকিলে ইংলণ্ডে গিয়া বাস করিবার অধিকার তাহারা পাইবে কি না, বাংলা দেশের রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠা সর্ব্ব দেশে স্বীকৃত ও গ্রাহ্য হইবে কি না ইত্যাদি কত কথাই উত্থিত হইয়াছে ও বিভিন্ন মতের আলোক বিচ্ছুরণের ফলে নব নব রূপে প্রতিভাত হইয়া নানা গোষ্ঠীকে নানাভাবে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। প্রত্যেকটি মতেরই স্বপক্ষে বিপক্ষে প্রমাণ দেখাইবার লোক আছে এবং তাহারা নিজেদের কার্য্য যথারীতি চালাইতে পূর্ণ

রূপেই সক্ষম বলিয়া দেখা গিয়া থাকে। কোন কথাই তাহা হইলে সহজে গ্রাহ্য অথবা পরিত্যক্ত হইতে পারে না। এবং আজ যাহা মানিয়া লওয়া হইতেছে কালও যে তাহারা সমান ভাবেই স্বীকৃত থাকিয়া যাইবে এমন কথাও কেহ অভ্রান্ত নিশ্চয়তার সহিত বলিতে পারে না।

কেহ বলে আমেরিকার ভিয়েৎনামের দ্বন্দ্বে অংশ গ্রহণ করার কোনই প্রয়োজন ছিল না। তাহা যে গায়ে পড়িয়া অন্য দেশের একান্ত নিজস্ব সমস্যার সমাধানে আমেরিকার ইচ্ছা অনিচ্ছা প্রকাশের অন্যায় চেষ্টা মাত্র একথা সর্ব্বজন স্বীকৃত। অন্য লোকে বলে চীন ও রুশ ভিয়েৎনামে অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করিয়া যদি যুদ্ধ বাড়াইতে পারে তাহা হইলে আমেরিকাই বা কেন সেই যুদ্ধের বিপরীত পক্ষকে সাহায্য করিবে না? কিন্তু চীন ও রুশ প্রথমতঃ সৈন্য পাঠাইয়া যুদ্ধ করে নাই অথবা বিমান পাঠাইয়া দক্ষিণ ভিয়েৎনামে বোমা বর্ষণও করেনাই। ইহা ব্যতীত রুশ বা চীন কোনও অন্যায় কার্য্য করিলে আমেরিকারও অন্যায় করিবার অধিকার জন্মায় এরূপ কথারও কোন মূল্য হয় না। আর একটা কথা হইল এই যে রুশ বা চীন উত্তর ভিয়েৎনামের সৈন্যদের অস্ত্র সরবরাহ করিলে তাহার প্রত্যুত্তরে আমেরিকানগণ উত্তর ভিয়েৎনামের নরনারী বালিকা শিশুদিগকে নির্ম্মম ভাবে বোমা মারিয়া হত্যা করিতে পারে এই সিদ্ধান্ত কখনও ন্যায়ধর্ম-সঙ্গত বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে না।

পাকিস্থান যাহা করিয়াছে তাহার কোন তুলনা বর্ব্বরতার ইতিহাসে সহজে পাওয়া যায় না। লক্ষ লক্ষ নরনারী শিশুকে বারে বারে সাম্প্রদায়িক কলহের নামে হত্যা করিয়া ভারত বিভাগ অবশ্যসাধ্য করিয়া তুলিয়া পাকিস্থানের সৃষ্টি হয়। সেই সময় একটা ধর্ম্মান্ধতার অজুহাত ছিল ও তাহা দেখাইয়া অনেক পাপই জন-মনে ক্ষালন করা হইল বলিয়া দর্শিত হইয়াছিল। কিন্তু পরে পাকিস্থান নিজ রাষ্ট্রের সমধর্মী মুসলমান নাগরিকদিগের উপর যে অত্যাচার উৎপীড়ন ও হত্যাকাণ্ডের সূচনা করে তাহার বিচার করিলে ধর্ম্মান্ধতার অজুহাতও আর দেখান সম্ভব থাকিল না। ইহা ব্যতীত আর একটা কথাও সকলের মনে রাখা আবশ্যক। তাহা হইল এই যে, পাকিস্থান গঠনের সময় মুসলমানদিগের নিজেদের শাসন-ব্যবস্থা নিজেরাই করিবার অধিকার যাহাতে প্রাপ্ত হইতে পারে সেই জন্যই দেশ ভাগ করিয়া একটি পৃথক মুসলমান-প্রধান রাষ্ট্র গঠন করা হইয়াছিল। কিন্তু কার্য্যতঃ পাকিস্থানবাসী মুসলমানগণ কোনওদিনই নিজেদের শাসন ভার নিজেদের হস্তে রাখিতে সমর্থ হ'ন নাই। প্রায় সকল সময়ই পাকিস্থানের শাসন কার্য চালিত হইয়াছে একটা ক্ষুদ্র সামরিক গোষ্ঠীর একাধিপত্যের উপর নির্ভর করিয়া। মুসলমান জনসাধারণ পাকিস্থানে কোনদিনই স্বায়ত্ত শাসনের আস্বাদ লাভ করিতে সক্ষম হ'ন নাই। কাশ্মীর লইয়া পাকিস্থানের যে জগৎবাসীর নিকট অভিযোগ তাহা লইয়া আলোচনা করিলেও দেখা যায় যে, কাশ্মীরের যে অংশ পাকিস্থান দখল করিয়া রাখিয়াছে সেখানেও শাসন-ব্যবস্থা জনসাধারণের ইচ্ছা অনুসারে হয় না। রাওলপিণ্ডির সামরিক মালিকদিগের স্বেচ্ছাচারিতার উপরেই আজাদ কাশ্মীরের শাসন কার্য্য পূর্ণরূপে নির্ভর করে।

এই সকল বিষয় সম্বন্ধে জনমত বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে ন্যায় অন্যায়, ধর্ম অধর্ম প্রভৃতি বিচার ক্ষেত্রে নানান গোষ্ঠীর মত নানান প্রকার। যাহাদের লাভ ও সুবিধা যে অবস্থায় যে ভাবে বিচার করিলে সহজে ও পূর্ণরূপে হইতে পারে তাহাদের বিচার সেই ভাবেই রূপ গ্রহণ করিয়া থাকে। ফলে প্রায় সকল কথাতেই একটা বিপরীত মতবাদ সর্ব্বদাই ব্যক্ত হওয়ার সম্ভাবনা উপস্থিত হয়। ইহার সত্যতা ব্যক্তিগত, দলগত অথবা জাতিগত, সকল প্রকার তর্কে বিতর্কে ও বিচারেই লক্ষিত হয়। প্রায় সকল মতেরই দুই পক্ষ থাকে ও উল্টা প্রমাণ দেখাইবার চেষ্টাতে সর্ব্বদাই কষ্ট-কল্পনা প্রবল বন্যায় প্রবাহিত হইতে দেখা যায়।

আমেরিকা যখন ভিয়েৎনামের দ্বন্দ্বে অংশ গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিলেন তখন আমেরিকা কম্যুনিজমের প্রসার দমন করিবার জন্যই সেই কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন

বলিয়া নিজেদের কার্য্য বিশ্ব মানবের কল্যাণকর প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিলেন। কম্যুনিজম যে সকল দেশে আছে সে সকল দেশের সকল মানুষ কি দক্ষিণ আফ্রিকা, রোডিশিয়া অথবা আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সকল মানুষ অপেক্ষা অল্প মাত্রায় সাম্য মৈত্রী ও স্বাধীনতা উপভোগে সক্ষম হ'ন? অর্থাৎ আমেরিকার শাসকগণ মানবীয় অধিকার রক্ষার জন্য যদি নিজেদের বিশেষ কোনও দায়িত্ব আছে বলিয়া অনুভব করেন তাহা হইলে তাঁহারা ভিয়েৎনামে যুদ্ধ না করিয়া স্বদেশে, দক্ষিণ আফ্রিকায় রোডিশিয়ায় ও অন্যান্য বহু দেশেই যে যুদ্ধ চালাইতে পারিতেন। চীন যখন তিব্বত দখল করিল তখন আমেরিকার বিবেক কি কারণে জাগ্রত হইয়া আমেরিকাকে তিব্বতবাসীর রক্ষার কার্য্যে অবতীর্ণ হইতে উদ্বুদ্ধ করে নাই? রুশিয়া যখন চেকোস্লো-ভাকিয়াকে সামরিক শক্তি প্রয়োগে ওয়ারস প্যাক্ট অনুসরণ করিতে বাধ্য করে তখনই বা আমেরিকার মানব-স্বাধীনতার আদর্শ রক্ষার প্রেরণা ঘুমন্ত ছিল কেন? উত্তর ভিয়েৎনাম যদি দক্ষিণ ভিয়েৎনামকে কম্যুনিজম মানিতে বাধ্য করিলে সে কার্য্য জগৎপ্রগতি বিরুদ্ধ বলিয়া ধার্য্য করা হয়, তাহা হইলে পৃথিবীর সকল দেশের ইহুদিগণ একত্র হইয়া যদি আরবের বক্ষে একটা কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্ট নূতন রাষ্ট্র গঠন করিতে নিযুক্ত হয় ও সে কার্য্যে প্রধান সহায়ক যদি আমেরিকা হয়, তাহা হইলে ভিয়েৎনামের তুলনায় ইসরায়েলের পরিস্থিতি কি কারণে অধিক মানব-হিতকর বলিয়া বিচারিত হইতে পারে সে প্রশ্নের আমেরিকা কি উত্তর দিতে পারেন? পাকিস্থান যখন বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ নরনারীর উপর অমানুষিক অত্যাচার ও নির্মম উৎপীড়ন করিতেছিল তখন আমেরিকা পাকিস্থানকে সেই কার্য্যের জন্য অস্ত্র সরবরাহ করিতেছিল। ভারত বাংলাদেশের মানুষকে সাহায্য করিতে অবতীর্ণ হইলে পরে আমেরিকা নিজের সপ্তম নৌবহর ভারত সাগরে পাঠাইয়া ভারতকে ভীতি প্রদর্শন চেষ্টা করে। ইহা কি কোন মানবতার আদর্শ রক্ষার জন্য করা হইয়াছিল? পাকিস্থান রাষ্ট্রীয় অধিকার ব্যবহার ক্ষেত্রে বহুকাল হইতেই মানবতার অধিকার অস্বীকার করিয়া চলিয়া আসিতেছে ও আমেরিকা পাকিস্থানকে অস্ত্রশস্ত্র ও অর্থ দিয়া এই অন্যায়কার্য্যের সমর্থন করিতেছে। আমেরিকার আদর্শবাদ সুবিধামত উল্টা পথে চলিতে কখনই কোন অক্ষমতা দেখায় নাই। সুতরাং আমাদের এই মীমাংসাই মানিয়া লইতে হইতেছে যে, মতামতের ন্যায়-অন্যায় সত্যাসত্যের কথা অপেক্ষা মত-প্রবর্ত্তকের নিজের লাভ সুবিধা ও পূর্ব্ব-অনুসৃত কুটনীতিগত পন্থারই মূল্য ও ওজন অধিক।

নিজেদের দেশের রাজনীতি আলোচনা করিলেও দেখা যায় যে, যাঁহারা দলে ভারি তাঁহাদের মতামতকে ধ্রুব সত্য বলিয়া মানিয়া লওয়াই একটা বাধ্যতামূলক রীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই ক্ষেত্রে যে কথা বিচার করিয়া এক স্থলে একপ্রকার ব্যবস্থা করা হয়, অপর স্থলে দলপতিদিগের সুবিধা ও দাবিদাওয়া মানিয়া লইয়া তাহার বিপরীত ব্যবস্থা করিতে কাহারও কোন সংকোচ হইতে দেখা যায় না। যথা প্রদেশের সীমানা লইয়া জাতিগত বা ভাষাভিত্তিক দাবি মানিয়া লওয়া বা না লওয়া নেতাদিগের ইচ্ছামত হইয়া থাকে। মানভূম ও সিংভূম বঙ্গদেশের অন্তর্গত করিলে বিহার প্রদেশের অসুবিধা হয় ও বিহারের নেতাদিগের গুরুত্ব কংগ্রেস দলের আসরে বিশেষ ভাবে স্বীকার করাই একটা রীতি হইয়া দাড়াইয়াছে। সুতরাং কংগ্রেসের বাঙ্গালী যাঁহারা তাঁহারা নিজ দেশের মূল্যবান্ অঞ্চল সমূহ বিহারকে দান করিয়া দিতে লজ্জা অনুভব না করিয়া বরঞ্চ বিহারের নেতাদিগের কথায় সায় দিয়াই চলিয়া থাকেন। ইহার ফলে বঙ্গদেশ হইতে বহু অঞ্চল, যথা ঝরিয়া ধানবাদের কয়লা-খনির অঞ্চল অথবা জামশেদপুরের লৌহ-কারখানার অঞ্চল আজ বিহারের অন্তর্গত হইয়া রহিয়াছে। এখানে মতবাদ রাজনীতির পেষণে আড়ষ্ট ও প্রাণহীন।

ক্রীড়া জগতের সমস্যাবলী

রবীন্দ্রনাথ ভট্ট

খেলাধুলা শিক্ষার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ রূপে পরিগণিত হওয়া উচিত। এই প্রসঙ্গে আধুনিক ওলিম্পিকের প্রতিষ্ঠাতা স্বনামধন্য Baron de-Pierre Cubertin বলেছেন "That playing of Games should form an integral part of Education and a way of adult life, if either or both are to achieve full value."

বিদ্যাশিক্ষা এবং ক্রীড়া প্রশিক্ষণ—এই দুইটির উপর সমান গুরুত্ব দিলেই তবে আমরা একটা সুস্থ, সবল স্বাভাবিক মানব গোষ্ঠী গঠন করতে সমর্থ হই।

ক্রীড়া কৌশলকে সামগ্রিক শিক্ষার একটি অঙ্গ হিসাবে ধরলে শিক্ষা সমস্যার (educational problem) মতন ক্রীড়া ক্ষেত্রের সমস্যাবলী সম্বন্ধেও আমাদের সবিশেষ জানা প্রয়োজন।

প্রখ্যাত শল্য চিকিৎসাবিদ্ এবং প্রাক্তন ওলিম্পিক ক্রীড়াবিদ্ Sir Arthur Poarrit এ বিষয়ে যে মতামত পোষণ করেন সেই বিষয়েই আমরা এখানে কিছু আলোচনা করব।

ক্রীড়া জগতের সমস্যাবলীর কথা চিন্তার সময় প্রথমেই আমাদের ক্রীড়াঘাত জনিত শারীরিক অবস্থা সম্বন্ধে একটু চিন্তা করতে হবে।

ক্রীড়াজনিত আঘাতের জন্য বহু প্রতিযোগীই স্কুল অথবা ক্রীড়া জীবনের প্রারম্ভ থেকেই স্বীয় ভবিষ্যতের জন্য চিন্তান্বিত হয়ে পড়েন। অনেক সময় শরীরতত্ত্ব বিষয়ক অনভিজ্ঞতার জন্যই হয়ত এই সকল দুর্ঘটনা সংঘটিত হতে পারে।

ক্রীড়াঘাত জনিত সমস্যার বহু বিষয় সম্বন্ধেই এখনও আমাদের অনুসন্ধানের প্রয়োজন আছে।

বর্তমানে ক্রীড়াক্ষেত্র হইতে উদ্ভূত বিভিন্ন সমস্যার কথা—চিকিৎসা জনিত, শিক্ষা জনিত, ক্রীড়া জনিত ও অর্থ-নৈতিক সমস্যাবলীর প্রতি বর্তমানে বিশ্বের জন-সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়েছে। এ বিষয়ে প্রতীচ্য ইটালীয়ান চিকিৎসকদের সহযোগিতায় একটি আধুনিক আন্তর্জাতিক সংস্থা (Federation International Medico Sportive) স্থাপিত হয়েছে। পৃথিবীর বহু দেশ এই সংস্থাটির সদস্য হয়েছে এবং বিশ্বের বহু দেশেই এ বিষয়ে যথেষ্ট উৎসাহ এবং তৎপরতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

ক্রীড়াঘাত জনিত অবস্থা সম্বন্ধীয় বিষয়টির বিশালত্বের কথা চিন্তা করেই এই প্রবন্ধে বিষয়টির আলোচনা স্থগিত রাখা হলো। এখন ক্রীড়া জগতের অন্যান্য সমস্যাবলীর বিষয় নিয়েই কিছু আলোচনা করব।

ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় আমরা Coaching, Training এবং Physical Fitness নামক কথা তিনটি প্রায়ই শুনতে পাই। সুতরাং এবিষয়ে আমাদের কিছু জানা প্রয়োজন।

সাধারণ শারীরিক সক্ষমতা বা General Physical Fitness নির্দ্ধারণের জন্য কোন ক্রীড়ায়ই পুনঃ পুনঃ নিয়মিত ডাক্তারী পরীক্ষার বিশেষ প্রয়োজন। এ বিষয়ে বয়স্ক ব্যক্তি অপেক্ষা কিশোরদের উপরই মনো-যোগ দেওয়া বিশেষ ক'রে আবশ্যক। যদিও অনেকে মনে করেন কিশোরদের হৃদ্‌পিণ্ড বয়ঃপ্রাপ্তদের অপেক্ষা বেশী কর্মক্ষম, যেহেতু কিশোরদের মধ্যে হৃদ্‌পিণ্ডের দুর্বলতা জনিত উপসর্গের ঘটনা অপেক্ষাকৃত কম। বিষয়টি উত্তমরূপে পর্য্যালোচনা করলে আমরা বুঝতে পারি যে এর একমাত্র কারণ একজন কিশোর ক্লান্তির কাতরতা সহ্য করতে পারে না। অতিরিক্ত পরিশ্রমে ক্লান্তি আসা মাত্রই সে আপনা হতেই তার প্রচেষ্টা থেকে ক্ষান্ত হয়। এ বিষয়ে কিন্তু একজন শ্রমক্লান্ত যুবক

অতিরিক্ত পরিশ্রান্তি সত্বেও আপনার অভীষ্ট-সিদ্ধির জন্য তার কার্য্যটি চালিয়ে যায়। এই জন্যই যুবকটির হৃদ্‌পিণ্ডে অতিরিক্ত শ্রম জনিত ক্ষতির সম্ভাবনা অধিক হয়।

সাময়িক শারীরিক অসুস্থতা, যথা সর্দি, হাম, ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রভৃতির পর ক্রীড়া সমূহের মাত্রাধিক্যে হৃদ্‌পিণ্ডের দুর্বল হওয়ার সম্ভাবনাই অধিক হয়। সুতরাং এ বিষয়েও আমাদের বিশেষ সচেতন হওয়া প্রয়োজন।

বর্তমান পর্য্যায়ে ক্রীড়া জগতের শারীরিক যোগ্যতা ও অবসাদ (Physical Fitness এবং Staleness) কথা দুটি সম্বন্ধে আমাদের ধারণা খুবই অস্পষ্ট। উক্ত দুটি বিষয়ই মানুষের মানসিক শক্তি ও শারীরিক সক্ষমতার উপর সমান ভাবে নির্ভর করে। কিন্তু বিষয় দুটির পৃথকীকরণ একটু কষ্টকর। যতক্ষণ পর্য্যন্ত না শারীরিক সক্ষমতার (Physical Fitness) কোন একটি সঠিক মান নির্দিষ্ট হচ্ছে ততক্ষণ পর্য্যন্ত শারীরিক অবসাদ বা অবসন্নতা এড়িয়ে গিয়ে শারীরিক যোগ্যতা অর্জন করার কোন নির্দিষ্ট পদ্ধতি অবলম্বন করা যাবে না।

আমরা জানি শিশুরা স্বভাবতঃ কর্মক্ষম (Fit)। সারাদিনই কোনও না কোন ক্রীড়ায় তারা নিজেদের নিবদ্ধ রাখে। তবুও তারা অবসন্ন হয় না। একজন ৬০ বৎসর বয়স্ক Golf খেলোয়াড় সম্পর্কেও ঐ একই উক্তি প্রযুক্ত হতে পারে। বৃদ্ধটির কর্মক্ষমতা সম্বন্ধে আমাদের কোনই সন্দেহ থাকতে পারে না। এখানে কিন্তু বৃদ্ধটি সম্পর্কে আমাদের ধারণা হবে যে শারীরিক শক্তির তুলনায় তার মানসিক শক্তিরই প্রাবল্য অধিক।

সামর্থ্য বা ক্ষমতা প্রশিক্ষণ দ্বারা বর্দ্ধিত করা যায় সত্য। কিন্তু এর জন্য যে একনিষ্ঠ শ্রম ও সাধনার প্রয়োজন তাহা হয়ত ব্যক্তি বিশেষের নিকট অত্যধিক তাহা হয়ত ব্যক্তি সে ক্লান্তি বিদীর্ণ হয়ে অবসন্ন (stale) হয়ে পড়ে।

প্রতিযোগিতা বিহীন যে কোন একঘেয়ে একক প্রশিক্ষণের পৌনঃপুনিকতাই মানুষের মধ্যে শারীরিক ও মানসিক অবসাদ এনে দেয়। সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধরণের শারীরিক শ্রম যদি উপযুক্ত সঙ্গীর সাহচর্য্যে যথাযথ ভাবে পালন করা যায় তবেই হয়ত শক্তি ক্ষয়ের মাত্রাধিক্য সত্বেও আমরা শারীরিক অথবা মানসিক অবসাদ থেকে অব্যাহতি পেতে পারি।

এই চিন্তাধারা যদি ঠিক পথে চালনা করা যায় তবেই হয়ত বিভিন্ন পদ্ধতির নিয়ন্ত্রিত পরীক্ষার দ্বারা ইহা প্রমাণিত হতে পারে, ইহা ভুল অথবা নির্ভুল। এই সকল পরীক্ষার মাধ্যমেই ভবিষ্যতে হয়ত সক্ষমতা (fitness) সম্বন্ধে একটি সঠিক মান নির্ণয় করাও সম্ভব হতে পারে।

অনুশীলন বা Training

শ্রমসাধ্য ক্রীড়ার উপযোগী করে শরীর গঠনের জন্য আমরা অনুশীলন (Training) করি। শ্রমসাধ্য প্রচেষ্টায় রক্ত সঞ্চালন পদ্ধতি, শ্বাস ক্রিয়া পদ্ধতি এবং পেশী সমূহের কর্মক্ষমতার মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করে উপযুক্ত শরীর গঠনের জন্যই প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হয়। আমরা জানি স্বাভাবিক কর্ম কালীন অবস্থায় শরীরের মাত্র অর্দ্ধেক রক্তসংবাহনকারী নালিকা তাদের যথাযথ কার্য্যে লিপ্ত থাকে। বাকী অর্দ্ধেক নিষ্ক্রিয় ভাবে শরীরের মধ্যে অবস্থান করে। প্রশিক্ষণ কালে ঐ সকল স্বল্প ব্যবহৃত শিরা উপশিরা উন্মুক্ত হয়ে পেশী সমূহকে উপযুক্ত পরিমাণ শরীরের রক্ত ক্ষয় পূরণ ও পুষ্টিসাধনে সহায়তা করে। ইহাও দেখা গিয়েছে উপযুক্ত পরিমাণ পুষ্টি-সাধনের ফলে উক্ত পেশী সমূহের তন্তু রাজিরও (Muscle fibres) আকার ও শক্তি বৃদ্ধি ঘটে।

আধুনিক গবেষণায় ইহাও প্রমাণিত হয়েছে যে প্রশিক্ষণে পেশী সমূহের স্থিতি স্থাপনকারী তন্তু অপেক্ষা গতি সঞ্চারকারী তন্তু রাজিরই সংখ্যা বৃদ্ধি অধিক হয়।

প্রশিক্ষণে শারীরিক শক্তির মাত্রা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। আমরা জানি, একজন সাধারণ মানুষের বিশ্রাম থাকা কালীন অবস্থায় যে পরিমাণ শক্তি (Energy) ক্ষয় হয় তাহাকে Basal Metabolic Rate বলা হয়। ১০০

গজ দৌড়ে এই হার শতগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। প্রশিক্ষণের মাধ্যমেই এই রূপান্তর সম্ভবপর হয়।

প্রশিক্ষণ বিষয়ক প্রশ্নটাই হল বর্তমান যুগের প্রধান জিজ্ঞাস্য। ক্রীড়া প্রশিক্ষণে অতিরিক্ত পরিশ্রম জনিত শ্রান্তির উৎপত্তি অতীতের তুলনায় বর্তমানে অনেক কম। বিষয়টি নিয়ে এ যাবৎ অনেক গবেষণাও হয়েছে। মধ্যবর্তী ও দূর পাল্লার দৌড়ে একথাও নিশ্চিত রূপে প্রমাণিত হয়েছে যে প্রশিক্ষণ দ্বারা মানুষের সহনশীলতা প্রচুর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। কিন্তু এ বিষয়ে আমাদের মনে রাখা উচিত যে ইহা কিন্তু শারীরিক অবসন্নতা প্রতিরোধে কোনরকম সাহায্য করে না।

শরীরকে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উপযুক্ত করে তৈয়ারী করার প্রচেষ্টাকে প্রশিক্ষণ বলা হয়। এই প্রশিক্ষণের জন্যই প্রয়োজন কর্ম করিবার প্রেরণা (Energy), জীবনী শক্তি (Vitality) এবং সহ্যশক্তি (Endurance)। আর ইহাদের জন্যই প্রয়োজন হয় প্রবল ইচ্ছা ও মানসিক শক্তির। এই মানসিক শক্তিকে পরিপূর্ণতার রূপ দিতে গেলে আমাদের একটি উদ্দেশ্য মূলক নির্দিষ্ট পথে অগ্রসর হতে হবে। আমাদের এমন পথে অগ্রসর হতে হবে যাহাতে আনন্দ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধিতেও সহায়তা করে।

প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এই মানসিকতা গঠনের জন্য আমাদের প্রয়োজন উপযুক্ত সাহচর্য্য (companion) এবং সময়োপযোগী প্রতিযোগিতা। ইহাদের প্রয়োজন কোন ব্যক্তি বিশেষের বিরুদ্ধে প্রয়োগের জন্য নয়। ইহাদের প্রয়োজন নির্দিষ্ট বিভাগে ক্রীড়াবিদের উৎফুল্লতার সহিত ক্রমোৎকর্ষের সিদ্ধির জন্য।

বর্তমান যুগে circuit training একটি জনপ্রিয় প্রশিক্ষণ পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে ক্রম পর্য্যায়ের শারীরিক ব্যায়াম অনুশীলন পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। এই পদ্ধতিতে ভার লইয়া প্রশিক্ষণে শরীর বেশ সরস সতেজ এবং নমনীয় হয়। এই পদ্ধতিতে যে কোন ব্যক্তিই আপনাকে যে কোন ক্রীড়ার উপযোগী করে তুলতে পারেন।

প্রশিক্ষণের অনেকটাই সাধারণ বুদ্ধি বা Common-sense এর উপর নির্ভর করে। ক্রীড়াবিদদের নিদ্রা, বিশ্রাম, খাদ্য, ধূমপান ও পানাসক্তির বিষয় সমূহ এই পর্য্যায়ে পড়ে। ব্যক্তি বিশেষের উপর এই সকল কিছুর প্রতিক্রিয়া ক্রীড়াবিদের নিজস্ব ব্যাপার। আমাদের জানা প্রয়োজন, একজনের ঔষধ অন্যের নিকট বিষরূপে প্রতিপন্ন হতে পারে।

এই সকল বিষয় যথাযথ চিন্তা করলে বোঝা যায় ক্রীড়া জগতে প্রশিক্ষণ বিষয়ে এখনও গবেষণার ক্ষেত্র প্রসারিত হয়ে আছে।

প্রশিক্ষণ জগতের আর একটি চিন্তার বিষয় হলো—প্রশিক্ষণে শিক্ষকের স্থান এবং প্রয়োজনীয়তা।

শারীরিক এবং মানসিক সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য প্রত্যেক ক্রীড়াবিদেরই প্রয়োজনীয় উপদেশ আবশ্যক। প্রত্যেক ক্রীড়াবিদেরই দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটি বিষয়ের আলোচনার জন্য একজন সঙ্গীর প্রয়োজন। আত্ম-নির্ভরতার জন্যও তার আলোচনার সঙ্গীর প্রয়োজন। ক্রীড়া জগতের বাহিরের ব্যবহারিক জীবনের জন্যও তার সঙ্গীর প্রয়োজন। সম্ভাব্য এই সকল প্রয়োজনের জন্য ক্রীড়াবিদের উপযুক্ত শিক্ষকের প্রয়োজন। এই শিক্ষক খেলোয়াড়ের অভাব অভিযোগ প্রভৃতি সকল সমস্যা সমাধানে তাকে সাহায্য করতে পারবেন।

শরীর তত্ত্ব বিষয়ক সমস্যা (Physiological Problem)

বর্তমান কালের কয়েকটি অত্যাশ্চর্য্য এবং ঐতিহাসিক ম্যারাথন দৌড়ের কৃতিত্ব পূর্ণ জয়লাভ এবং আনুষঙ্গিক সর্দিগর্মি জনিত অসুস্থতার প্রতি অনেকেরই এখন দৃষ্টি আকর্ষিত হয়েছে।

শারীরিক উত্তাপ পারিপার্শ্বিক কয়েকটি কারণ, যথা রৌদ্রতাপ, বাতাসের আর্দ্রতা, পোষাক পরিচ্ছদ প্রভৃতির উপর নির্ভরশীল হলেও উহা সর্বতোভাবে মস্তিষ্কের কয়েকটি বিশেষ কেন্দ্রের (Brain cenlre) উপরে নির্ভর করে। রৌদ্র তাপ, বায়ুর আর্দ্রতা প্রভৃতি সর্দিগর্মির

কারণ হলেও মস্তিষ্কের তাপ নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রে (Heat Regulating Centre) অপরিমিত রক্ত সঞ্চালনও সর্দিগর্মির একটি কারণ হতে পারে।

ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অতিরিক্ত শক্তি উৎপাদনের (Energy) জন্য মাত্রাতিরিক্ত পরিশ্রমে শরীরে এক প্রকার দূষিত পদার্থ উৎপন্ন হয়। এই দূষিত পদার্থই মস্তিষ্কের তাপ নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রে অল্প পরিমাণ রক্ত সঞ্চালনের একটি কারণ হয়ে উহাকে নিষ্ক্রিয় করে দেয়। ইহাও সর্দিগর্মির একটি কারণ হতে পারে।

বিপরীত পরিস্থিতিতে অতিরিক্ত ঠাণ্ডায় শরীরে কর্মশক্তি উৎপাদন (Energy) কম হওয়াও শরীরের পক্ষে ক্ষতিকারক হতে পারে। এই জন্যই ক্রীড়া মহলে প্রতিযোগিতার পূর্বে শরীর গরম করার প্রথাটি খুবই জনপ্রিয় যদিও কয়েক পুরুষ পূর্ব পর্য্যন্তও অতি অল্প মানুষই এই প্রথা অবলম্বন করতেন। এই চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সাঁতারুরা প্রতিযোগিতার পূর্বে শরীর গরম করার জন্য পূর্বাহ্নেই ঈষদুষ্ণ গরম জলে স্নান করে নেন। শোণিতের তাপমাত্রার তারতম্য অনুসারে পেশী সমূহের শক্তির পার্থক্য বিষয়ে এখনও অনুসন্ধানের প্রয়োজন আছে।

নিরুদক (Dehydration)

দূর পাল্লার দৌড়ে নিরুদক (Dehydration) একটি জৈব রাসায়নিক (Biochemical) সমস্যা। যে সকল অবস্থায় অধিক স্বেদ নিঃসরণ (Perspira ion) এবং দ্রুত শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া অব্যাহত থাকে সেই সকল অবস্থায় শরীরের রক্ত এবং কোষ সমূহের ভিতর জলীয় অংশে রাসায়নিক পরিবর্তন সংঘটিত হয়। ইহার জন্য প্রধানতঃ শরীরের লবণের ভাগ কমিয়া যায়। ফলে শরীরে বিভিন্ন প্রকার উপজাত (By product) দ্রব্যের সৃষ্টি হয়। এই সকল উপজাত দ্রব্যের অধিকাংশই শরীরের মূল কর্মধারার উপর প্রভাব বিস্তার করে কর্মশক্তি উৎপাদনে (Energy) এবং পেশী সমূহের কার্য্যাবলীতে (Muscle activity) ব্যাঘাত ঘটায়। এই সমস্যা সমাধানের জন্য ম্যারাথন দৌড়ে লবণ জল পান করান একটি সাধারণ প্রথায় পরিণত হয়েছে।

বায়ু হতে অক্সিজেন গ্রহণের পরিমাণের উপরও শরীরের কর্মশক্তি উৎপাদনের ক্ষমতা নির্ভর করে। ফুসফুসের ভিতর গ্যাসীয় পদার্থের আদান-প্রদান (পরোক্ষভাবে রক্তমধ্যাস্থিত গ্যাসীয় পদার্থের) অধিক পরিশ্রমে জটিলরূপ পরিগ্রহণ করে এবং ব্যক্তিভেদেও ইহার পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। প্রশিক্ষণ দ্বারা ফুসফুসের কর্ম্মক্ষমতা বাড়িয়ে কর্ম্মশক্তি উৎপাদন (Energy) বৃদ্ধি করা কিছুটা সম্ভব হতে পারে।

প্রাণী জীবন বিষয়ক এই প্রশ্নের উপর ইতিপূর্বে বহু গবেষণা হয়েছে। বায়ু পরিবর্তনের পরিমাণ ও হারের উপর একজন ক্রীড়াবিদ্ অল্প পাল্লার দৌড়বিদ্ হবেন না দূর পাল্লার দৌড়বিদ্ হবেন, তাহা নির্ভর করে।

পেশী তন্ত্র (Muscular System) বিষয়ক প্রশ্ন

পেশী তন্তুর বিভিন্ন প্রকার ভেদের বিষয় আমাদের বহুদিন পূর্ব থেকেই জানা আছে। বর্তমান গবেষণায় এই সকল বিভিন্ন তন্তুরাজিকে তাহাদের আকার প্রকৃতি অনুসারে পুনরায় বিশেষভাবে ভাগ করা হয়েছে। এই সকল বিভিন্ন বিশেষ তন্তু (Special fibres) এবং নমনীয় তন্তুর সংখ্যার তারতম্যেও ক্রীড়াবিদ্‌কে স্বল্প পাল্লার দৌড়ে কৃতিত্ব প্রদর্শন করবেন, কে দূর পাল্লার দৌড়ে পারদর্শী হবেন আর কেই বা উচ্চলম্ফে উন্নত ক্রীড়ামান প্রদর্শন করবেন তাহাও নির্দ্ধারণ করা সম্ভবপর হয়।

ক্রীড়া জগতে মেয়েদের স্থান

মেয়েদের মধ্যে খেলাধূলায় অবিশ্বাস্য রকমের উন্নতি সাধিত হয়েছে। আজ থেকে প্রায় পাঁচ দশক পূর্বে ওলিম্পিকে মেয়েদের জন্য প্রথম অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়। তখন মনে হয়েছিল নাম রক্ষার জন্যই মেয়েরা হয়ত ইহাতে যোগদান করতেন। কিন্তু বর্তমানে ওলিম্পিকে রেকর্ড ভাঙ্গার পাল্লাতেও মেয়েরা পুরুষদের অপেক্ষা অনেক এগিয়ে আছেন।

মেয়েদের প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণের জন্য অতীতে এ বিষয়ে শরীর তত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব এবং নৈতিকতা প্রভৃতি বহু

প্রশ্নেরই অবতারণা হয়েছে। এমন একদিন ছিল যে-দিন মেয়েদের ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় যোগদান নীতি-হীনতা অশিষ্টতার নিদর্শন বলে পরিগণিত হয়েছে। মানুষের এই পূর্বতন ধারণা বর্তমানে অচল বলে প্রমাণিত হয়েছে। এখনও কিন্তু অনেকে—"স্ত্রী জাতি দুর্বল" এই অজুহাতে তাদের প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণের বিরোধিতা করেন। এই যুক্তিও বর্তমান পর্য্যায়ে অচল বলে প্রমাণিত হয়েছে।

স্ত্রী জাতির আকারগত পার্থক্য থেকে ইহা অবশ্যই প্রমাণিত হয়েছে যে স্ত্রী জাতি পুরুষ অপেক্ষা দুর্বল। আকার প্রকৃতি অনুসারে কোন স্ত্রীলোকই একজন পুরুষের সমকক্ষ হতে পারে না যদি না সে একজন পুরুষ ভাবাপন্ন (Amazon) স্ত্রীলোক হয়।

ডিম্বকোষদ্বয় তাহাদের দীর্ঘকালব্যাপী ক্রম-পর্য্যায়ের কার্য্যাবলীর দ্বারা মেয়েদের শরীরের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে।

স্ত্রী জাতির মাসিক স্রাব অবশ্যই কিছু সমস্যার সৃষ্টি করে। ব্যক্তিভেদে শরীরের উপর ইহার প্রভাবের তারতম্য ঘটতে পারে। রজঃস্রাব সম্বন্ধে মানসিক ভীতিই স্ত্রী জাতির কৃতিত্বের পথে একটি অন্তরায়। এ বিষয়ে সুচিন্তিত অভিমত এই যে রজঃস্রাব মেয়েদের সাধারণ স্বাস্থ্যের উপর অতি অল্পই প্রভাব বিস্তার করে। রজঃস্রাবের পূর্বে কিন্তু সাময়িকভাবে শরীরের ভিতর সংরক্ষিত তরল পদার্থ হয়ত বা অস্বাচ্ছন্দ্য অথবা অসুবিধার কারণ হতে পারে।

ইহাও প্রমাণিত হয়েছে যে মেয়েদের সন্তান সম্ভাবনার প্রাথমিক পর্য্যায়টিও ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় কৃতিত্ব প্রদর্শনের কোনই অন্তরায় হয় না। ক্রীড়া প্রতিযোগিতাও ভাবী শিশু কিংবা মাতার উপর কোন অশুভ প্রভাব বিস্তার করে না।

ঔষধ ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ঔষধের প্রয়োগ একটি জটিল সমস্যা আনিয়াছে। এ বিষয়ে স্বভাবতই মনে কয়েকটি প্রশ্ন আসে—ঔষধ কি? ইহার দ্বারা কি উন্নত ক্রীড়ামান প্রদর্শন করা সম্ভব? যদি সম্ভব হয় তবে কতখানি উন্নতি এবং কতক্ষণ পর্য্যন্ত ইহা সম্ভব? উত্তেজক ঔষধ এ্যালকোহল এবং গ্লুকোজ (Glucose) কি ঔষধের পর্য্যায়ে পড়ে? ক্রীড়াবিদের উপর Beuzidrine এবং Cortisonএর প্রভাব কি? ক্রীড়াবিদের মানসিক প্রশান্তির ঔষধের (Tranquiliser) কি প্রয়োজন আছে? শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের উপর আঞ্চলিক চৈতন্যহারক (Local Anaesthesia) ঔষধ কি ক্ষতিকারক? এই সকল ঔষধ কি প্রতিযোগিতায় অনুমোদন করা যেতে পারে?

ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ঔষধ প্রয়োগের সম্মতি দেওয়া হলেও স্বভাবতই মনের ভেতর এই সকল প্রশ্ন সদাই জাগ্রত হয়।

এই সকল প্রশ্নের যথাযথ উত্তর আজও পর্য্যন্ত পাওয়া সম্ভব হয়নি। বর্তমান অলিম্পিক সংস্থা ক্রীড়া প্রতি-যোগিতায় মাদক দ্রব্য ব্যবহারের বিষয় বিশেষ করে লক্ষ্য অবলম্বন করেছেন এবং বিষয়টির জন্য একটি অনুসন্ধান সমিতিও (Investigation Committee) নিযুক্ত হয়েছে।

শারীরিক গঠন-প্রকৃতির প্রকার নির্দ্ধারণ (Somatotypes)

এই অর্থে মনুষ্য জাতিকে শারীরিক গঠনের নির্দ্ধারিত মান অনুযায়ী কয়েকটি বিভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ইহার উদ্দেশ্য হলো কয়েকটি মৌলিক বিষয়ের পারস্পরিক সম্বন্ধ নির্দ্ধারণ এবং বিশেষ ক্রীড়ায় বিশেষ জাতীয় ব্যক্তির সাফল্যের বিষয় ভবিষ্যদ্বাণী স্থিরীকরণ।

বর্তমানে বিষয়টির আরও উন্নতি হয়েছে। এ বিষয়ে বহু প্রয়োজনীয় তত্ত্বও স্বীকৃতি পেয়েছে। বর্তমানে অসংখ্য পরিমাপ (Measurement) যথা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির দৈর্ঘ্য, হৃদ্‌পিণ্ড ও ফুসফুসের ক্ষমতা (Heart and Lung Capacity) প্রতিক্রিয়ার সময়ের হিসাব পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলার ক্ষমতা, মাংস পেশী পরিবর্দ্ধনের মাত্রা প্রভৃতি সম্বন্ধে

বহু স্বীকৃত তত্ত্ব সত্য বলে পরিগণিত হওয়ার ফলে মনুষ্য জাতিকে কয়েকটি মৌলিক বিভাগে ভাগ করা হয়েছে। ভবিষ্যতে হয়ত বা এই জ্ঞানের আলোকে উপযুক্ত বিভাগে উপযুক্ত প্রতিযোগী নির্দ্ধারণ করা সম্ভব হবে।

মনস্তত্ত্ব বিষয়ক সমস্যা (Psychological Problem)

শারীরিক পরিশ্রম ব্যতীতও ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় আত্মসংযম ও ইহার নৈতিক মূল্যের উপলব্ধির প্রয়োজন আছে। ইহা একজন বাহ্যমুখী চিন্তাধারা অনুযায়ী মানুষকেও আত্ম-অনুসন্ধানের পথ বেছে নিতে বাধ্য করে।

একজন প্রতিযোগীর শারীরিক অনুশীলন অথবা কৃতিত্ব যত নিখুঁতই হোক না কেন, প্রতিযোগিতার জন্য দেশ, জাতি বা ক্লাবের প্রতিনিধিত্ব করার দায়িত্বের মানসিক চাঞ্চল্য প্রতিটি প্রতিযোগীর মনের উপর প্রবল প্রতিক্রিয়া আনে।

এ বিষয় এখনও অনেক অনুসন্ধানের প্রয়োজন আছে। মনস্তত্ত্ব বিজ্ঞান যতই নির্ভুলতার পথে অগ্রসর হবে ক্রীড়া প্রতিযোগিতামূলক সমস্যাও ততই একটা সঠিক সমাধানের দিকে অগ্রসর হবে।

বিবিধ বিষয়ক সমস্যা

উপরোক্ত সমস্যাগুলির অবতারণা করে Sir Arthar Porrit পুনরায় বলেছেন,"যদি উক্ত বিষয়গুলি আমাদের মানসিক ক্ষুধার তৃপ্তি সাধন না করতে পারে তাহলে আসুন আমরা আমাদের আবার প্রশ্ন করি পেটে খিল লাগার অর্থ কি? যদিও এর তথ্যের উপর ভিত্তি করে অনেক তত্ত্ব তৈরী হয়েছে কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কোনটাই সঠিকভাবে প্রমাণিত হয়নি। খেলাধূলায় পেশী সমূহে খিল লাগারই বা অর্থ কি? বোধহয় ইহা অন্যান্য পেশী সঙ্কোচন থেকে একটু ভিন্ন প্রকার।

"খাদ্য নির্বাচনের বিষয় আমাদের কর্ত্তব্য কি? যদি সাধারণ জ্ঞান ও ব্যক্তিগত পছন্দর উপর আমরা নির্ভর করি তাহলেও কিন্তু কোনও কোনও খাদ্য পরিমাণ বা গুণানুসারে কোন নির্দিষ্ট সময়ে কোন বিশেষ উদ্দেশ্যর জন্য উপযুক্ত নাও হতে পারে।

"বিদেশ পরিক্রমায় বিমান বা সমুদ্র ভ্রমণ প্রতি-যোগীদের উপর কতদূর প্রভাব বিস্তার করে এবং তাদের প্রতিক্রিয়াই বা কি হয়? এই সকল প্রতিক্রিয়া জনিত অবস্থার জন্য চিকিৎসা কি সম্ভব?

"এই রকম বহু প্রশ্নই আজও পর্য্যন্ত অনিশ্চয়তার মধ্যে দোদুল্যমান রয়েছে।

"অদূর ভবিষ্যতে হয়ত এই সকল প্রশ্নের যথাযথ উত্তর পাওয়া যাবে। এ বিষয়ে কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে বিজ্ঞান আমাদের যাহাই দিক না কেন তবুও এখানে আমরা জীবন্ত মানুষকে নিয়ে কাজ করছি, কোন স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রকে নিয়ে নয়। ঔষধ যদি অপকারের পরিবর্তে উপকার করতে সমর্থ হয় তাহলে ক্রীড়া জগতেও ক্রীড়াবিদ্‌দের হিতার্থে ইহার প্রয়োগের আধিক্যও হয়ত দেখা যাবে।"

স্মৃতির শেষ পাতায়

শ্রীদিলীপকুমার রায়

তিন

গান ও সাহিত্য এই দুটি পাখায় আমায় মন সানন্দে সঞ্চরণ করত কল্পনার আকাশে। স্মৃতিচারণে লিখেছি কী ভাবে পিতৃদেবের কাছে এই দুটি আনন্দে দীক্ষা পেয়েছিলাম আমার শৈশবে ও কৈশোরে। তাঁর গল্পসভায় আসতেন সে-যুগের বাংলার শ্রেষ্ঠ মনীষীরা—কবি, নাট্যকার, ঔপন্যাসিক, ওস্তাদ গুণী। কিন্তু সব প্রথম তাঁর নানা গানের সুরই আমার প্রাণের তারে ঝংকার তুলে আমাকে করেছিল সুদূর বিবাগী। তিনি যে শুধু নাট্যকার বা হাস্যরসিক ছিলেন না, ছিলেন গানের পাখী এ-সত্য আমার কাছে ছেলেবেলায়ই প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। নিত্য নতুন সুর রচনা করতেন তিনি—কখনো হার্মোনিয়ম বাজিয়ে, কখনো বারান্দায় পায়চারি করতে করতে গুন গুন করে। তাঁর দেহান্তের কয়েক মাস আগে তিনি বাঁধেন তাঁর প্রখ্যাত পন্ত স্তোত্র —"পতিতোদ্ধারিণি গঙ্গে।" বেশ মনে আছে বারান্দায় পায়চারি করতে করতে তাঁর এ-গানটির সুর দেওয়া। অনেক সময়ে সুর তাঁর আগে আসত, কথা সাজাতেন সেই সুরের কাঠামোয়। অনেক সময় কথা আগে হাজির দিত, সুর পরে। উদাসী বাউল গান ছিল তাঁর অতি প্রিয়। "আমা আমা বলে ডাকি," ও "মহাসিন্ধুর ওপার থেকে" গান দুটি আমার বড় ভালো লাগত।

প্রথমটি নিছক বৈরাগ্যের গান—তাঁর "তারাবাই" নাটকে এক উদাসী রঙ্গমঞ্চে এসে গেয়ে যেত। গানটি সাদামাটা ভৈরবী, কিন্তু বন্দেগে বৈশিষ্ট্য ছিল। আমার "দ্বিজেন্দ্রগীতি"-তে এ-গানটির স্বরলিপি দিয়েছি। এ-গানটির মিল পাড়াগেঁয়েই বলব—শুধু শেষে মুক্তদলে মিলের আমেজ। গানটি উদ্ধৃত করি:

আমার আমার ব'লে ডাকি, আমার এ ও আমার তা।
তোমার নিয়ে তুমি থাকো, নিয়ো না কো আমার যা।
আমার বাড়ি আমার ভিটে
আমার যা তা বড়ই মিঠে
আমায় নিয়ে কাড়াকাড়ি, আমায় নিয়ে ভাবনা।
আমার ছেলে আমার মেয়ে, আমার বাবা, আমার মা।
আমার পতি আমার পত্নী—সঙ্গে তো কেউ যাবে না।
আমার যত্নের দেহ ভবে
তা-ও রেখে যেতে হবে
আমার বলে কারে ভাবি—চোখ বুঁজলে কেউ কারো না।

পাড়াগেঁয়ে বাউলে মিলের জৌলুষে ঘাটতি হ'লে সুর করত ক্ষতিপূরণ, যথা একটি বিখ্যাত সেকেলে বাউল:

দেখেছি রূপসাগরে মনের মানুষ কাঁচাসোনা
ধরি ধরি মনে করি—ধরতে গিয়ে আর পেলাম না।
পথিক কয়: ভেবো না রে, ডুবে যাও রূপসাগরে
ডুবিলে পাবে তারে আর ভেবো না।
এবার ধরতে পেলে মনের মানুষ ছেড়ে যেতে আর দিও না।

বাউল রামপ্রসাদী ভাটিয়ালি বর্গীয় লোকসঙ্গীতে সে-যুগে মানুষের কান আপত্তি করত না কারণ এসব গান একে উদাস সুরের আনন্দে আমাদের মনকে বাস্তব জগতের দুঃখদৈন্য-আশাভঙ্গ-স্বপ্নভঙ্গের ঊর্দ্ধে নিয়ে যেত, মনের মধ্যেই "মনের মানুষ"কে খুঁজতে উস্কে দিয়ে। খৃষ্টদেব বলেছিলেন: "স্বর্গরাজ্য তোমারি মধ্যে প্রচ্ছন্ন হয়ে বিরাজ করছে—তাকে পেলে আর ভাবনা থাকবে না।" রবীন্দ্রনাথ তাঁর "মানুষের ধর্ম্ম" নিবন্ধে বাউলের এই বাদী সুরটির কথাই বলেছেন বড় সুন্দর ভঙ্গিতে: "বৃহদারণ্যকে একটি আশ্চর্য বাণী

আছে—'অথঃ যোঽন্যাং দেবতাম্ উপাস্তে অন্যোঽসৌ অন্যোঽহম্ অস্মীতি ন স বেদ যথা পশুরেবং স দেবানাম্।' যে-মানুষ অন্য দেবতাকে উপাসনা করে 'সেই দেবতা অন্য আর আমি অন্য' এমন কথা ভাবে, সে তো দেবতাদের পশুর মতোই।...সেই কথাই আপন ভাষায় বলছে নিরক্ষর অশাস্ত্রজ্ঞ বাউল। সে আপন দেবতাকে জানে আপনার মধ্যেই, তাকেই বলে মনের মানুষ। বলে, 'মনের মাঝে মনের মানুষ করো অন্বেষণ"।

গ্রাম্য নানা বাউলে এ-উদাস সুরটি ভেসে আসত না-পাওয়ার মধ্যেই পাওয়ার আভাস দিয়ে। পিতৃদেবের আসরে সুগায়ক শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু একটি চমৎকার বাউলে পরিবেশন করতেন এই অতৃপ্তির তৃপ্তি:

মন মাঝি তোর বৈঠা নে রে, আমি আর বাইতে
পারলাম না।
ওরে, সারা জনম বাইলাম বৈঠা রে, তবু তোর মনের
নাগাল পালাম না॥

আমি আমার "উদাসী দ্বিজেন্দ্রলাল"-এ লিখেছি যে, পিতৃদেব তাঁর শেষ জীবনে প্রায় পুরোপুরি উদাসী হয়ে গিয়েছিলেন। তাই তিনি বাউল গান এত ভালোবাসতেন ও রসিয়ে তুলতেন শ্রোতাদের মন তাঁর নানা উদাসী বাউল গানে। এর মধ্যে জনপ্রিয় হয়েছিল তাঁর দুটি নির্ভেজল বাউল:

একবার গালভরা মা ডাকে
মা ব'লে ডাক মা ব'লে ডাক মা ব'লে ডাক মাকে।

অন্যটিও বাউলের বৈশিষ্ট্যে চমকপ্রদ, উদাসী সৌরভে মর্ম্মস্পর্শী:

জীবনটা তো দেখা গেল শুধুই কেবল কোলাহল।
এখন যদি সাহস থাকে মরাটাকে দেখবি চল্।
পড়ে আছে অসীম পাথার, সবাই তাতে দিচ্ছে
সাঁতার,
অজ এলে অবশ হয়ে সবাই যাবি রসাতল।
সিন্ধু 'পরে গর্জে ঢেউ, সে দণ্ডমাত্র নয়ক স্থির,
নিচে পড়ে আছে অগাধ স্তব্ধ শান্ত সিন্ধুনীর।
এতদিন তো ঢেউয়ে ভেসে দিলি সাঁতার উপর দেশে
ডুব দিয়ে আজ দেখব—নিচে কতখানি গভীর জল।

এ-গানটি ছন্দে মিলে নিখুঁৎ, অথচ গ্রাম্য বাউলের ব্যঞ্জনায় নিটোল। শুনি, ছেলেবেলায় মনে যেসব ছাপ পড়ে আর মোছে না কোনোদিনও। তাই হয়ত বাউলের উদাস সুরে আমি পূর্ণ দীক্ষা পেয়েছিলাম সব প্রথম পিতৃদেবের নানা বাউল গানে, পরে তাঁর নানা কীর্তন ও কীর্তনাঙ্গ গানে, যথা (চন্দ্রগুপ্তে ছায়ার অপরূপ গান):

আর কেন মিছে আশা মিছে ভালোবাসা মিছে
কেন তার ভাবনা।
সে যে সাগরের মণি আকাশের চাঁদ—
আমি তো তাহারে পাব না...
আমি জানি না তো হায় ধূলায় গড়ায় তপ্ত
অশ্রুবারি গো?
না না, তবু সেই দুখ বাঁচিয়া থাকুক
আমরণ মম স্মরণে:
আমি লভেছি যদি এ-বিরস জীবন—
লভিব সরস মরণে।

এ-গানটি শুনতে না শুনতে আমার কান ও মন যেন পাখা মেলে উড়ে চলে যেত সে কোন্ অচিনপুরে যেখানে মরাও সরস হয়। মানুষ জীবনে যা পায় না তার ক্ষতিপূরণের আশা রাখে মরণের পরে। খৃষ্টদেব বার বার বলতেন: "এখানে যে দীন হ'তে শিখবে পরে সে হবে ঐশ্বর্যশালী।"[১] এ-মধুর আশ্বাসে বুক বেঁধে কত বরেণ্য মানুষই না দারিদ্র্যব্রত বরণ করেছেন যুগে যুগে। উদাসী মনোভাবের তো এইই রীতি—অপ্রাপ্তিকেও সে বরণ করে প্রাপ্তলোকের ছাড়পত্র পেতে নৈলে "কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ" এ-বৈরাগ্যবাণী কি আবহমানকাল মহাজনদের উদ্দীপ্ত করে তুলতে

১। "And whosoever shall exalt himself shall be abased; and he that shall humble himself shall be exalted......(St. Matthew)

পারত ত্যাগের মধ্যে দিয়ে ধন্যজন্মা হবার স্বপ্নে? যাঁরা বলেন ধর্ম মনের আফিং তাঁরা আদৌ জানেন না ধর্ম যথার্থ ধার্মিককে কী দেয়—কী ভাবে শক্তির সেবার আত্মোৎসর্গের দীক্ষা দিয়ে রিক্ত জীবনকে সমৃদ্ধ করে তোলে। যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে স্তোকবাক্যে ভোলাতে চান নি যখন তিনি বলেছিলেন :

অফলো যদি ধর্মঃ স্যাৎ চরিতো ধর্মচারিভিঃ
অপ্রতিষ্ঠে তমস্যেতদ্ জগন্মজ্জেদ্ অনিন্দিতে।

অর্থাৎ, ধার্মিকের আচরিত ধর্ম যদি নিষ্ফল হ'ত তাহলে এ-জগৎ বহুদিন আগেই গভীর অন্ধকারে ডুবে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত।

সে-সময়ে ধরতে পারি নি অবশ্য, কিন্তু পিতৃদেবের দেহান্তের পর যখন একটু একটু করে তলিয়ে ভাবতে শিখি তখন দেখতে পাই—আর সব মহানুভব প্রতিভাধরদের মতন তাঁরও চরিত্রে নানা স্ববিরোধী ঝোঁক ও ভাব পাশাপাশি আসর জমাত। তাই তিনি মনে তার্কিক হয়েও ছিলেন প্রাণে বিশ্বাসী, দেহে বলিষ্ঠ হ'য়েও ছিলেন অন্তরে কোমল, সংশয়ী হ'য়েও শ্রদ্ধাবান্, শরণার্থী হ'য়েও স্বাবলম্বী, রসিক হ'য়েও ভাবুক, আনন্দী হ'য়েও দুঃখবাদী।

তাঁর চরিত্রের এ-সব প্রবণতারই ছোঁয়াচ আমার শিশুমনে লেগেছিল, কৈশোরে যার পরিণতি হয় তার্কিক হওয়া সত্ত্বেও মহাজনদের কাছে নত হ'তে চাওয়ায়, ক্রোধন হওয়া সত্ত্বেও অসংযমের পরে অনুতপ্ত হ'য়ে ক্ষমার্থী হবার অভীপ্সায়। তাই প্রথম যৌবনেই আমি টের পেয়েছিলাম—যেকথা পরে একটি গানে ফলিয়ে তুলেছিলাম :

ধরিব ধরিব যে বলে সে-ই তো পায় না।
জানিব জানিব বলিলেই জানা যায় না।

অর্থাৎ দাবি করলেই মণি মেলে না, তার জন্যে চাই মণিমন্ত্রের সাধনা—প্রণতি ও নিষ্ঠা যার ভিৎ। শরৎচন্দ্রের সঙ্গে যেদিন আমার শেষ দেখা হয় কলকাতায় —বোধহয় ১৯৩৮ সালে—তিনি একটি কথা আমাকে বলেছিলেন যা আমার মনে দাগ কেটেছিল। বলেছিলেন : "মন্টু, আমি ধর্মকর্ম যোগযাগ বুঝি না, কিন্তু এটুকু মানি যে সত্যি প্রণাম করতে না শিখলে কোনো মহৎ লাভই হয় না।" বস্তুতঃ শ্রদ্ধা আর প্রণামই হ'ল আধ্যাত্ম পথের প্রথম দুটি ধাপ—শ্রদ্ধা শাস্ত্রবাক্যে আর প্রণাম মহাজনের পায়। শ্রীঅরবিন্দের কাছে পরে একথার সমর্থন পাই, যৌবনের সীমা পেরিয়ে। তিনি লিখেছিলেন : "আমি জানিবার মতন কিছুই জানি না এই উপলব্ধিই হ'ল যথার্থ জ্ঞানের বনেদ।" গর্ব আমাদের বল দেয় না, উত্তরোত্তর দুর্বলই করে, যার সমাপ্তি আত্মঘাতে।

উপমা সম্রাট্ শ্রীরামকৃষ্ণও বলতেন : "উঁচু জমিতে ফসল ফলে না। উর্বর হয় নিচু জমিই।" উত্তর জীবনে ঘা খেয়ে এই সত্যটি আমি উপলব্ধি করেছিলাম—আমার একটি প্রিয় গানে অঙ্গীকার করে :

নয়নের নীরে তাই গাই : "করো মোরে দীনতম।
তনুমন মোর হোক আজ তব চরণের ধূলিসম।
প্রতিভা শকতি গরব বিভব
করো পদানত, প্রণতি নীরব,
হে ঘন শ্যামল! অহেতু বরষা হ'য়ে এসো তাপহরা।
দুর্লভ তুমি জানি, তাই গাই : করুণায় দাও ধরা।"

চার

আমার কৈশোরে আমি অবশ্য জানতাম না মানুষ উদাসী হয় কোন্ নিভৃত তাগিদে, কেন অপ্রাপ্তির দুর্ভাবনা প্রাপ্তির রক্তিম আশাকে ধূসর ক'রে দেয় থেকে থেকে। যতদূর মনে পড়ে তা এই যে, নানা আশা-ভঙ্গের বেদনা থেকেই আমার চেতনা ঊর্ধ্বগামী হয়েছিল। একটি দৃষ্টান্ত দিই।

মা যেদিন মারা যান মৃতবৎসা হয়ে, সেদিন গভীর রাতে হঠাৎ উঠে দেখি সবাই কাঁদছে—দিদিমা মাসিমারা ও দুই মামা। শুনেছিলাম ছোট ভাই বা বোন জন্ম নেবে। মা প্রায়ই বলতেন আদর ক'রে : "কিন্তু তাকে ভালোবাসিস।"

আমার মন মুষড়ে পড়ত। ভালোবাসব? কাকে? যে আসবে সে তো মা-র ভালোবাসায় ভাগ বসাবে—

যেমন আমার ছোট বোন মায়া বসিয়েছিল যথাবিধি। ঈর্ষা—জেলাসি—মনের একটি আদিম বৃত্তি।

তাই যখন শুনলাম—মা মরা-শিশুর জন্ম দিয়েছেন তখন মন খুশী হয়েছিল বৈকি। কিন্তু ওরা সবাই কাঁদে কেন—এ এক সমস্যা! আমি সূতিকা ঘরের দিকে যেতে চাইতেই দিদিমা বাধা দিয়ে বললেন: "তোর মা এখন ঘুমিয়ে। তুইও এখন ঘুমো, ধন!" বলে আমাকে ঘুম পাড়ান।

কিন্তু পরদিন উঠে যখন মা-কে কোথাও দেখতে পেলাম না (পিতৃদেব সে-সময়ে মফঃস্বলে) তখন একে ওকে তাকে জিজ্ঞাসা করি, কিন্তু কেউই উত্তর দেয় না। এর আগে কাউকে চোখের সামনে মরতে দেখিনি, তবে এটুকু বুঝতাম যে যারা চলে যায় তারা আর ফেরে না, আর এই অফেরার নামই মৃত্যু। (একথার মর্ম পরে ষোলো বৎসর বয়সে বুঝতে পারি পিতৃদেবের মৃত্যুর পরে তাঁরই একটি গানে:

জগত যা নিয়ে যায় একবার ফিরায়ে দেয় না
আর তায়।
নিয়ে যায় সব ভেঙেচুরে —
শুধু স্মৃতিটুকু তার রেখে যায়।)

ক্রমশঃ যখন বুঝবার কিনারায় এলাম যে মা আর ফিরবেন না, তখন মনে গভীর বিষাদ ছেয়ে গেল। তাঁর অপরূপ সুন্দর মুখ আর দেখব না, শুনব না তাঁর আদর ভরা ডাক. নিজে হাতে আর তিনি খাইয়ে দিতে আসবেন না কোলে বসিয়ে!—বুঝলাম, এই-ই মৃত্যুর নিষ্ঠুর রূপ। আমার বোন মায়া তখনও একথা বোঝে নি। কারণ তার বয়স তখন চার, আমার ছয়। আর আমি আশৈশব এঁচড়েপাকা ছেলে নাম কিনেছিলাম —যদিও পিতৃদেব আমাকে সুভদ্র সাহেবি উপাধি দিয়েছিলেন precocious,—তাই আমি টের পেয়েছিলাম—ছয় বৎসর বয়সেই—যে, চাইলেই হাতে চাঁদ আসে না। হয়ত মাতৃবিয়োগ না হ'লে এ-চেতনা জাগত না ছ-সাত বৎসর বয়সে। পরে ঠেকে শিখে জেনেছিলাম—বেদনার আওতায় শিশুর বোধ ও ধারণাশক্তির বিকাশ হয় দ্রুত বেটে। আমার ক্ষেত্রেও সেই হ'ল। অমন স্নেহময়ী শ্রীমতিনী মাকে হারিয়ে আমি শৈশবেই উধাও হলাম উদাসী হবার দিকে—যার ফলে আমার দুর্নাম রটেছিল অকালপক্ক বা এঁচড়ে-পাকা।

এর পরে দেখলাম পিতৃদেবেরও পরিবর্তন। মা থাকতে তিনি হাসির গান গাইতেনই বেশি—আমিও সেসব গানে সোল্লাসে দোয়ার দিতে দিতে তাঁর বহু হাসির গানই শিখে নিয়েছিলাম। কিন্তু স্ত্রীবিয়োগের পর তিনি ঝুঁকলেন নানা উদাস মধুর গান বাঁধতে—সুরু হ'ল নাটক লেখা। তারপর শুধু আমার নিজের মা হারানোর বেদনার মধ্যে দিয়ে নয়, আমার বরেণ্য ও প্রিয় পিতার আমার বেদনার শরিক হবার মধ্যে দিয়েও আমার বোধশক্তির দ্রুত বিকাশ হয়—যেজন্যে পিতৃদেব প্রায়ই বলতেন তাঁর বন্ধুবান্ধবকে যে, তাঁর প্রিয় পুত্রের মনের বয়স দেহের বয়সের চেয়ে অনেক বেশি। আমার মনের মধ্যে উদাসী সুর কায়েম হওয়ার একটি প্রধান কারণ নিশ্চয়ই—প্রথম, শৈশবে মাতৃহারা হবার দুঃখ, পরে কৈশোরে পিতৃহারা হবার গভীর বেদনা।

পাঁচ

আমার চিত্তাকাশে উদাসী ভাব থেকে থেকে হাল্কা মেঘের মত সব উৎসাহের আলো ঢেকে ফেললেও আমার মন ছিল শুধু অকালপক্ক নয়, অতি জীবন্ত—তাই টাল সামলে নিয়েছিলাম পিতৃমাতৃহারা হওয়ার গভীর ব্যথা সত্ত্বেও। আমার পিতৃবন্ধুদের মধ্যে কেউ কেউ আমার নাম দিয়েছিলেন—Live Wire: তর্কাতর্কি, হাসিঠাট্টা, গানবাজনা, বিশেষ করে বহুপাঠিতায় আমি হয়ে উঠেছিলাম অনন্য। কেবল স্কুলপাঠ্য বইয়ে আমার মন বসত না। আমি বেশি পড়তাম মহাভারত, রামায়ণ, নানা পুরাণ সংহিতা—এমন কি রমেশ দত্তর ঋগ্বেদও কিনে পড়েছিলাম—যদিও বুঝতে না পেরে ছেড়ে দিয়েছিলাম—যেকথা ইতিপূর্বে লিখেছি।

আমার বিকাশের কাহিনীর এর পরের পর্বগুলি আমার নানা বইয়েই লিখেছি, বিশেষ করে "উদাসী

দ্বিজেন্দ্রলাল", "স্মৃতিচারণ প্রথম খণ্ড" ও "মহানুভব দ্বিজেন্দ্রলাল" এই তিনটি গ্রন্থে। তাই এবার সুরু করি পিতৃদেবের মৃত্যুর পরের পর্ব্ব—আমার মাতামহের স্নেহনিলয়ে থিয়েটার রোডে। (চেষ্টা করব যথাসাধ্য পুনরুক্তি এড়িয়ে চলতে।)

সেখানেও আমি অত্যধিক আদরে আদরে মোড় নিচ্ছিলাম স্বেচ্ছাবিহারের দিকেই—এমন সময়ে দেখা হ'ল কয়েকটি যোগীর সঙ্গে। তাদের মধ্যে একজনের কথা আমি লিখেছি আমার "স্মৃতিচারণ দ্বিতীয় খণ্ডে।" তাঁর নাম—কুমারনাথ, মহাতান্ত্রিক, সিদ্ধপুরুষ।

সিদ্ধপুরুষ অবশ্য এর আগেও আমি দেখেছিলাম—শ্রীম, স্বামী সারদানন্দ ও ব্রহ্মানন্দকে। কিন্তু তাঁদের দীপ্যমান ব্যক্তিরূপে মুগ্ধ হ'লেও তাঁদের কাউকেই এত কাছে তো পাইনি। কুমারনাথ তাঁর একটি কথায় আমার কিশোর হৃদয়ে কায়েম হয়েছিলেন যখন তিনি স্নিগ্ধ হেসে বলেছিলেন আমাকে "কুলপি? খাব বৈ কি বাবা। আমি সব খাই পরমানন্দে।"

আনন্দময় পুরুষ বৈ কি। কিন্তু এ-সহজিয়া অবস্থা লাভ করতে তিনি রাণাঘাটের কাছে এক শ্মশানে বহু বৎসর তান্ত্রিক সাধনা করেছিলেন—শুনেছিলাম আমার মেসোমহাশয় শ্রীগিরিশ শর্ম্মার কাছে। আমার মন তাঁর এই কথায় যেন গান গেয়ে উঠল: "এই-ই তো চাই—স্বাধীন বেপরোয়া। আচার, ছুঁৎমার্গ, অতি সাবধানতা এসব কে চায়? মানুষ চায় স্বাধীন হ'তে।" বহুবৎসর পরে শ্রীঅরবিন্দের সাবিত্রীতে পড়েছিলাম—সাবিত্রী পুরুষোত্তমের কাছে দাবি করছেন:

I am a deputy of the aspiring world
My spirit's liberty I ask for all.

উর্ধ্ব অভীপ্সার দীপ্ত প্রতিনিধি রূপে চাই আমি
আমার অন্তরাত্মার দিব্য মুক্তি সকলের তরে।

এরই তো নাম জীবন্মুক্তি—মনের প্রাণের খাঁচা ভেঙে আনন্দের আকাশে পাখা মেলে গা ভাসিয়ে চলা।

কিন্তু তখন আমার কোনো ধারণাই ছিল না একনিষ্ঠ সাধনার—যার প্রসাদে মেলে এই জীবন্মুক্তির পরম বর। তাই চেয়েছিলাম কুমারনাথের উপদেশ। তিনি কী উপদেশ দিয়েছিলেন মনে নেই, কেবল এইটুকু ছাড়া যে আমার লক্ষণ ভালো কেবল প্রতীক্ষা করতে শিখতে হবে। উপনিষদের ভাষায় "ন ত্বরমানেন লভ্যঃ"—হাঁকুপাকু করলেই বস্তুলাভ হয় না—সাধনা বিনা সিদ্ধিলাভ অসম্ভব।

কিন্তু সাধনা করব কীভাবে? নির্দেশ দেবেন কিনি? গুরুবরণ করতে একদিকে যেমন আমার গভীর আগ্রহ ছিল, তেমনি অন্যদিকে ছিল দারুণ ভয়। কে জানে গুরু কীভাবে সব স্বেচ্ছাবিহারের পথ আগলে দাঁড়াবেন? কাজ নেই বাবা! পড়াশুনোয় মন বসেছিল, দুদিন বাদে বিলেত যাব, তারপর যথাকালে লক্ষ্যহীন জনপথ ছেড়ে জীবন্মুক্তির রাজপথের খোঁজ করা যাবে।

এই সময়ে আমার কয়েকটি স্নেহময় তথা বুদ্ধিমান্ বন্ধুর দেখা মেলে যাদের মধ্যে তিনজন ছিলেন প্রথম থাকের অন্তরঙ্গ। সুভাষ, সত্যেন্দ্রনাথ বসু ও নীরেন্দ্রনাথ রায়। ধূর্জটির সঙ্গে বন্ধুত্ব হয় বিলেত থেকে ফেরার পরে।

বন্ধুরা আমার জীবনে বিশেষভাবে সক্রিয় হয়েছে চিরদিনই, তবে এ-বয়সে—মানে প্রথম যৌবনেই—তাদের প্রীতিবীজে ফসল ফলেছে সবচেয়ে বেশি। তাদের স্নেহ, দৃষ্টিভঙ্গি, বিদ্যা বুদ্ধি, দরদ, এককথায় তাদের ব্যক্তিরূপের প্রবল প্রভাব আমাকে, শুধু আলো নয়, শক্তিও দিয়েছে দেখবার ভাববার, সত্যসন্ধানের। কেবল উদাসী বৈরাগ্য বাদ। কারণ সুভাষ যদিও উচ্চকোটির সাধকের শুদ্ধি ও স্বপ্ন নিয়ে জন্মেছিল কিন্তু তার একমাত্র লক্ষ্য ছিল দেশসেবা, একমাত্র স্বপ্ন—দেশের স্বাধীনতা। সত্যেন আমাকে দিয়েছিল সংস্কৃতির দীক্ষা — তার প্রভাবে পড়েই আমি ফরাসী ভাষা শিক্ষার দিকে ঝুঁকে দেখতে পাই যে, বিদেশী ভাষা শিক্ষার ফলে শুধু সাহিত্যে রস পাওয়ার ক্ষমতা বাড়ে তাই নয়, দৃষ্টির প্রসার হয়, চিন্তা গভীর হয়, ভাবুকতার 'ফুল ফোটে। নীরেনের কাছে শিখি—বন্ধুর বিকাশে ঔৎসুক্য কী ভাবে নিজের বিকাশকে সমৃদ্ধ করে। কিন্তু এদের কথা আমি অন্যত্র ফলিয়েই লিখেছি। তাই ফিরে হারানো খেই ধরি।

ক্রমশঃ

আমার ইউরোপ ভ্রমণ

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়

(১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত গ্রন্থের মূল ইংরেজী হইতে অনুবাদ : পরিমল গোস্বামী)

নৃতত্ত্ব বিষয়ক মিউজীয়াম দেখিলাম সব শেষে। ডকটর বাসটিয়ান ইহার প্রেসিডেন্ট। কয়েক বৎসর পূর্বে তিনি কলিকাতা আসিয়াছিলেন, এবং আমার বিশ্বাস কলিকাতার অনেকেই তাঁহাকে চিনিবেন। তাঁহার মিউজীয়ামের জন্য পৃথিবীর সর্বত্র তিনি সহস্র অভিযানে ঘুরিয়াছেন। তিনি তাঁহার সংগ্রহের প্রায় সবই আমাকে দেখাইলেন। প্রাচীন মেক্সিকোর একটি খোদাই করা পাথর তিনি আমাকে দেখাইলেন। এটি নরবলির দৃশ্য। এক উচ্চ পরিবারের কর্তব্যপরায়ণ সন্তান তাহার পূর্বপুরুষদের পূজিত আত্মার নিকট নিহত ব্যক্তির মুণ্ডটি অর্ঘ্যরূপে সমর্পণ করিতেছে। আর এই সুন্দর উপচারটির জন্য অন্য এক দাবিদার পিছন হইতে হাত বাড়াইয়াছে। সে পাতালরাজ, রক্তের গন্ধ পাইয়া সে তাহার পাতালবাস হইতে উঠিয়া আসিয়াছে। পিতৃপুরুষ পূজারী, মুণ্ডটি তাহার পিতৃপুরুষের তৃপ্ত্যর্থে আনিয়াছে, অতএব তাহা পাতালরাজ, অর্থাৎ যিনি যমরাজ, তাঁহাকে সহজে দেওয়া চলে না। ইহা লইয়া তর্ক আরম্ভ হইয়াছে দুই জনের মধ্যে, কিন্তু তাহার পরিণামে কি হইয়াছে তাহা আমি জানি না, কারণ তাহা ঐ পাথরে চিত্রিত হয় নাই। মিউজীয়ামটি নূতন কিন্তু তবু আমি যতগুলি সেরা মিউজীয়াম দেখিয়াছি, এটি তাহার অন্যতম। সর্বত্র নব জার্মানির জাতীয় জাগরণের চিহ্ন প্রত্যক্ষ।

আবহাওয়া এমন দুর্যোগপূর্ণ যে তাহার মধ্যে বাহির হইয়া সকল স্থান দেখা সম্ভব ছিল না। সমস্ত দিন-রাত্রি ধরিয়া তুষারপাত হইয়াছে, সমস্ত পথ গভীর তুষারে ঢাকা পড়িয়াছে, চাকার গাড়ি অচল, পথে স্লেজ ব্যবহৃত হইতেছে, রেলগাড়ি চলিতেছে না, এবং আমি তুষার-বদ্ধ হইয়া পড়িয়া আছি। সৌভাগ্যবশতঃ আমি সম্রাট উইলিয়াম-১-এর সঙ্গে পরিচিত হইয়াছিলাম। আমার বন্ধু আমাকে প্রিন্স বিসমার্কের কাছে লইয়া যাইতেন, কিন্তু তিনি তখন বার্লিনে ছিলেন না। প্রায়ই আমি ঘরের বাহির হইলে পথ হারাইয়া ফেলি, বার্লিনেও তাহা হইয়াছিল। একদিন অপরাহ্ণে আমি বড়দিন উপলক্ষে স্প্রে নদীর তীরে স্থাপিত স্টল দেখিতে গিয়াছিলাম। যখন সন্ধ্যা আসন্ন তখন খেয়াল হইল, ফিরিতে হইবে। কিন্তু পথ হারাইলাম। পুরা এক ঘণ্টা ধরিয়া নানা পথে একটি স্লেজের আশায় ঘুরিলাম, কিন্তু পাওয়া গেল না। পুলিসের লোককে, পথিককে জিজ্ঞাসা করি, কিন্তু তাহারা আমার কথা বোঝে না। তখন অন্ধকার গভীর হইয়াছে, আমার উদ্বেগ বাড়িয়া যাইতেছে। অবশেষে একটি বালিকার দেখা পাইলাম। তাহার একটি চক্ষু অন্ধ। তাহার কাছে শুধু "সেন্ট্রাল হোটেল" এই নামটি উচ্চারণ করিলাম। সে আমার গন্তব্য বুঝিতে পারিয়া তাহাকে অনুসরণ করিতে ইঙ্গিত করিল। পরে জানিতে পারিলাম, সে তাহার পথ হইতে দুই মাইল অতিরিক্ত হাঁটিয়া আমাকে নিরাপদে হোটেলে পৌঁছাইয়া দিয়াছে।

এক সন্ধ্যায় এক বন্ধু আমাকে তাঁহার বাড়িতে নিমন্ত্রণ করিলেন। নিমন্ত্রিতদের মধ্যে একজন ছিলেন দার্শনিক। তিনি জার্মান দার্শনিক চিন্তাধারা সম্পর্কে এবং ইউরোপে বর্তমানে দর্শনে যে অগ্রগতি ঘটিয়াছে সে

সম্পর্কে অনেক কিছু বলিলেন। এবং আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন. আমরা ভারতীয়গণ এ বিষয়ে কি মত পোষণ করি। আমি বলিলাম, "এ বিষয়ে আলোচনা করিবার যোগ্যতা আমার নাই, তবে এইটুকু বলিতে পারি, আপনারা যে সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন, তাহা হইতে ভারতীয়গণ নূতন কিছু পাইবেন বলিয়া মনে হয় না। অবশ্য তাঁহারা আপনাদের যুক্তির সূক্ষ্মতাকে প্রশংসা করিতে পারেন। কিন্তু ভারতীয় ঋষিগণ সহস্র সহস্র বৎসর পূর্বে যে সত্য উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং প্রচার করিয়াছিলেন, বর্তমান ইউরোপীয় মানস সে সত্যের ধারণা করিতে পারিবে না। ঋষিগণের উপলব্ধ সত্যের নিকট কাণ্ট, জাকোবি, ফিখ্টে শেলিং, হেগেল প্রভৃতি ইউরোপীয় দার্শনিকদিগকে মনে হইবে তাঁহারা একই চক্রপথে ক্রমাগত পাক খাইতেছেন। আরও অনেক বলিবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু নিজেকে সংযত করিলাম। কারণ হঠাৎ উপলব্ধি করিলাম, ইঁহারা মনে করিবেন আমি গভীর জ্ঞানী এবং এ বিষয়ে তাঁহাদের সহিত আলোচনা করিবার অমি সম্পূর্ণ উপযুক্ত। আমার জন্ম লগ্নে কোনও দুষ্টগ্রহের প্রভাব আছে যাহাতে সহজেই লোকে আমাকে ভুল বোঝে।

আমি যে বিষয়ে অজ্ঞ সে বিষয়ে আমার জ্ঞান আছে মনে করিলে অবশ্য কম ক্ষতি হয়। কাহার কাছে প্রতিবাদ করিব? কি ভাবে প্রতিবাদ করিব? এবং করিয়া কি লাভ হইবে? ইহা অপেক্ষা বায়ুর পশ্চাদ্ধাবন করিয়া পাতার ভিতর যে মর্মর ধ্বনি জাগায় তাহা থামাইতে বলা বরং সহজ। কারণ মানুষ যখন একটি বিশেষ ধারণা মনে গাঁথিয়া লয়, তখন তাহা তাহার মন হইতে দূর করা বড়ই কঠিন। ঠিক সেই নিগ্রো সর্দারের মত। তাহাকে খ্রীষ্টান ধর্ম সম্পর্কে বহু কথা এবং খ্রীষ্টের পুনর্জীবন ইত্যাদি সব বলা হইলে তবু শেষকালে সে বলিত, "কবর খুঁড়িয়া না তুলিলে মৃত ব্যক্তি কখনও কি বাহিরে আসিতে পারে?" লজ্জার সঙ্গে স্বীকার করিতেছি, আমি যাহা জানি বলিয়া মনে করা হয়, সে বিষয়ে আমাকে অধিকাংশ সময়েই ভাসা ভাসা জ্ঞান অর্জন করিতে হইয়াছে। তাহাতে প্রথমেই আমাকে পণ্ডিত বলিয়া যে ধারণা জন্মে তাহা আরও গভীর এবং আরও খারাপ। কিন্তু ইহা সকল সময়ের জন্য চলিতে পারে না, অথচ বিজ্ঞান, দর্শন এবং রাজনীতি জানি এই মিথ্যা পরিচয়ই জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বহন করিতে হইবে।

রেলওয়ে লাইন হইতে তুষার অপসারণের পরেই গাড়ি চলা আরম্ভ হইল, আমিও বার্লিন ত্যাগ করিয়া ভিয়েনা অভিমুখে যাত্রা করিলাম। ড্রেসডেন পর্যন্ত বেশ আরামেই কাটিল। আমার সঙ্গে একজন মিলিটারি অফিসার ছিলেন,তিনি ইংরেজীতে কথা বলিতে সক্ষম। ফ্রাংকো-প্রুশিয়ান যুদ্ধে তিনি অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার রেজিমেন্ট প্যারিস অবরোধে সহায়তা করিয়াছিল। তিনি যুদ্ধের অনেক ঘটনা খুবই উৎসাহের সঙ্গে বলিলেন, শুনিয়া মনে হইল পুনরায় এ রকম একটি যুদ্ধ বাধিলে তিনি খুশী হন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "যুদ্ধের ভয়াবহতা কি কখনও আপনার মনকে আঘাত দেয় নাই?" তিনি বলিলেন, এক-একটি যুদ্ধের পরে তাঁহার স্নায়ু কিছু ক্লান্ত হইয়াছে। অতঃপর তিনি ভীষণ উৎসাহের সহিত যুদ্ধ, অবরোধ, এবং পিতৃভূমির গৌরবরক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা আরম্ভ করিলেন। আমি বলিলাম, "এ সব ছোটখাটো ঈর্ষাবিদ্বেষ অথবা পিতৃভূমির গৌরব বিষয়ে আপনার ধারণা আমার কাছে বড় নহে, আমি দেখি এ কাজে লক্ষ লক্ষ সক্ষম মানুষ আবদ্ধ থাকে, সেজন্য তাহারা মানুষের উন্নতির কাজে লাগিতে পারে না, এই ক্ষতিটাই আমার কাছে বড় মনে হয়। বহু খাল এখনও কাটা হয় নাই, বহু জলাভূমি হইতে এখনও জল নিষ্কাশন বাকি আছে, বহু জঙ্গল সাফ করিতে হইবে। আরও পথ চাই, আরও রেলওয়ের বিস্তার চাই, সমুদ্রে আরও লাইট-হাউস প্রয়োজন, বহু নদীর তলার মাটি কাটিতে হইবে, অনেক পর্বত কাটিয়া পথ সুরঙ্গ প্রস্তুত করিতে হইবে। এক সময় ছিল, যখন মানুষ জাতির সুবিন্যাসের জন্য যুদ্ধের প্রয়োজন ছিল, সে উদ্দেশ্য এখন আর নাই।

এখন লোকসংখ্যার চাপ কমাইবার জন্য ভিন্ন দেশে বহু লোককে পাঠাইয়া দেওয়া চলে, তাহারা পৃথিবীর দূরতম অঞ্চলে গিয়া উদ্বৃত্ত জমি অধিকার করিতে পারে। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে জীবনযাত্রা চালাইলে কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পাইবে, জাতিতে জাতিতে মিলন ঘটিবে, পরস্পরের মধ্যে স্বাধীনভাবে চলাফেরার পথ সুগম করিলে বাণিজ্য এবং শিক্ষাবিস্তারের দ্বারা জাতীয় জীবনের প্রবাহ-হীনতা সহজে রোধ করা সম্ভব হইবে। ইউরোপের এই সব যুদ্ধের উপযোগী প্রস্তুতি ও মনোভাব দেখিয়া আমার মনে হয়, মানুষের যতদূর উন্নতি সম্ভব, তাহা দ্বারা দেবতার মস্তক ও হাত লাভ করিতে হইবে ইহাই তাহাদের উদ্দেশ্য, কিন্তু ভিতরের মনটা তাহাদের বানরের রহিয়া গিয়াছে।"—শেষ মন্তব্যটি হাসিতে হাসিতে করিলাম। ভদ্রলোকও তেমনি হাসিয়াই বলিলেন, "আপনার সঙ্গে এই বিষয় লইয়া তর্ক করিয়া লাভ নাই। আমি বইতে পড়িয়াছি, আপনারা ব্রাহ্মণেরা পশুহত্যাতেও আপত্তি করেন। আমরা তেমন নিরোধ নাই। আমরা গোরু ভেড়া হত্যা করি তাহার মাংস খাইবার জন্য, শিকারের উপলক্ষে পশুহত্যা করি ক্রীড়ার আমোদের জন্য, আমরা দয়াপরবশ হইয়াও পশুহত্যা করি, খোঁড়া ও বৃদ্ধ অশ্ব হত্যা করি দীর্ঘ যন্ত্রণা ভোগ হইতে তাহাকে মুক্তি দিবার জন্য।" আমি বলিলাম, "মার্জনা করিবেন, আমি যদি মনে করি উঁহাদের হত্যা করেন খরচ বাঁচাইবার জন্য? যদি ইহা দয়াধর্ম হয়, তাহা হইলে ত হটেনটটেরা বেশি দয়ালু, কারণ তাহারা তাহাদের বৃদ্ধ এবং অকর্মণ্য আত্মীয়বর্গকে মরুভূমিতে রাখিয়া আসে, সেখানে তাহারা ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় সহজে প্রাণত্যাগ করে।" আমরা আরও অনেক বিষয়ে আলাপ করিলাম, এবং অল্পকালের মধ্যেই আমরা পরস্পর বন্ধু হইয়া পড়িলাম। তিনি ড্রেসডেনে নামিয়া গেলেন, আমি একা চলিতে লাগিলাম। অবশেষে নিজের মনে তত্ত্বচিন্তায় নিযুক্ত হইলাম। আমি নিচের পৃথিবীর দিকে চাহিয়া দেখি, সব যেন ক্ষণস্থায়ী মরীচিকা। চলমান বামনের দল উন্মাদের মত পরস্পরকে ধাক্কা মারিতে মারিতে ছুটিয়া চলিয়াছে। ইহারই সুবিস্তীর্ণ চিত্র মনের চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল। আমাদের গুরুগণ আমাদিগকে এই সব তুচ্ছতার ঊর্ধ্বে থাকিতে বলিয়াছেন, শান্ত সমাহিত থাকিতে বলিয়াছেন, যেখানে কোনও মেঘ তাহার ছায়াপাত করে না, যেখানে ঝড়ের গর্জন কানে আসে না, নিস্পৃহ মনে নিচের এই উন্মাদের লড়াই অবলোকন করিতে বলিয়াছেন।

কিন্তু মহাশয়, পৃথিবীতে যে ক্ষুধা আছে, বেদনাবোধ আছে, তাহা ব্যক্তিগত ভাবে আমি দমন করিতে পারি, কিন্তু উহাদের ক্ষুধা তৃষ্ণা ব্যথাবেদনা আমি কেমন করিয়া দমন করিব? অন্যের প্রতি এই দুঃখময় সমবেদনা, এবং আমার নিজের মধ্যে যে আত্মাভিমান আছে তাহা আমাকে আমার এই কল্পলোকের উচ্চতা হইতে নিচে নিক্ষেপ করিল, এবং স্মরণ করাইয়া দিল আমিও ত উহাদেরই মত বামন, আমিও ত উহাদেরই একজন। হায়, যাহারা এই হতভাগ্য বামনদিগকে তাহাদের মত বিরাট বানাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছে, যদি তাহাদের জুতার ফিতা খুলিবার উপযুক্ত হইতাম!

কিছুক্ষণ পরেই টেটশেন নামক একটি স্থানে আসিয়া পৌঁছিলাম। এটি অস্ট্রিয়া সীমান্তে অবস্থিত। এইখানে আমি রেলের লোকদের কাছে জানিতে চাহিলাম ভিয়েনা যাইতে হইলে এখানে আমাকে গাড়ি বদল করিতে হইবে কি না। কারণ টিকিটের উপর লেখা ছিল—বার্লিন হইতে ড্রেসডেন, ড্রেসডেন হইতে বোডেনবাখ, বোডেনবাখ হইতে ভিয়েনা। কিন্তু আমি যাহা জিজ্ঞাসা করিলাম, হয় তাহা তাহারা বোঝে নাই, অথবা তাহারা যাহা বলিল তাহা আমি বুঝি নাই। তাহারা যাহা বলিল তাহাতে আমি বুঝিলাম আমি এই ট্রেনেই যাইতে পারিব। অতএব আমি বিছানায় আরাম করিয়া ঘুমাইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম, কারণ সেটি রাত্রিকাল।

মধ্যরাত্রি পার হইয়া গেল, বড়দিনে রাত্রি শেষ হইবে, ট্রেনখানি ইনটারন্যাশন্যাল এক্সপ্রেসের পূর্ণ গতিতে

ছুটিয়া চলিয়াছে, এমন সময় কন্‌ডাকটর আসিয়া আমাকে আমার গভীর নিদ্রা হইতে জাগাইয়া দিল। সে আমার টিকিট পরীক্ষা করিতে আসিয়াছে। সেই ঠাণ্ডায় ঘুমন্ত চোখে টিকিট বাহির করিয়া তাহার হাতে দিলাম। ভাবিলাম মুহূর্তে তাহার পরীক্ষা শেষ হইবে। কিন্তু তাহার কোনও তাড়া ছিল না। সে বহুক্ষণ ধরিয়া টিকিটটি দেখিল, ভাবিলাম প্রত্যেকটি অক্ষর বানান করিয়া পড়িতেছে এবং মুখস্থ করিতেছে। আলো ছিল মৃদু, তাই সে উঠিয়া প্রখর আলোর দিকে গেল, ইহাই তখন আমার মনে হইল। এতক্ষণে আমি সম্পূর্ণ জাগিয়া উঠিয়াছি, এবং একটি সন্দেহ যেন মনে ক্রমে জাগিয়া উঠিতেছে। তবে কি আমাকে সে কোনও রক্তপিপাসু সমাজতন্ত্রী অথবা ডাইনামাইট ফাটান নিহিলিস্ট ভাবিয়াছে? আয়নায় মুখের প্রতিবিম্ব পড়িল, দেখিয়া ভাবিলাম নিশ্চয় সে আমাকে খারটুমের মেহদির মর্যাদা বিশিষ্ট কোনও লোক বলিয়া মনে না করিয়া পারিবে না। অতএব আমি দাড়ি ঠিক করিয়া লইয়া চোখে মুখে হিংস্রতা ফুটাইয়া কন্‌ডাকটরের অপেক্ষায় বসিয়া রহিলাম। সে একাই ফিরিয়া আসিল, সঙ্গে সৈন্য-সামন্ত কিছু আনে নাই, যদিও আনা উচিত ছিল। কিন্তু আমি হতাশ হইয়া দেখিলাম, সে নানা অঙ্গভঙ্গি করিয়া আমাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিল যে আমি ভুল গাড়িতে চড়িয়াছি, অতএব আমাকে অতিরিক্ত মাশুল দিতে হইবে। এবং সে অনেকগুলি টাকা। আমি অনেক কথাই বলিলাম, কিন্তু সে নাছোড়, টাকা দিতে হইবে। আরও অনেক কিছু বলিবার পর আমি তাহাকে অতিরিক্ত মাশুল দিব না বলিলাম। অর্থাৎ ইঙ্গিতে বুঝাইয়া দিলাম কথাটি। সে চলিয়া গেল, ভাবিলাম, চিরতরে। কিন্তু আমার ধারণা ভুল। এটি এক্সপ্রেস ট্রেন, পরবর্তী ষ্টেশনে থামিবার কথা নহে, কিন্তু সে সেই ষ্টেশনে থামাইয়া আমাকে নামিতে বাধ্য করিল, এবং আমার বিছানাপত্র ছুঁড়িয়া নিচে ফেলিয়া দিল, ট্রেনও তাহার ইঙ্গিত পাইয়া স্টেশন ছাড়িয়া গেল। আমি একা সেই বোহেমিয়ার পাহাড় অঞ্চলে পড়িয়া রহিলাম। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, রাত্রি ঘোর অন্ধকার, শুধু চারিদিকের তুষারের প্রতিফলন একটু আধটু যাহা চিকচিক করিতেছে। ষ্টেশন ঘর পর্যন্ত গেলাম, এবং একটি লোককে সেখানে দেখিয়া তাহার হাত ধরিয়া আমার লগেজটি রেল লাইনের উপর হইতে আনিতে বলিলাম। লোকটি এমন ভাবে চমকাইয়া উঠিল, যেন ভূত দেখিয়াছে ভয় হইল লোকটি ভয়ে পলাইয়া না যায়। তাহার অবস্থা দেখিয়া আমি ভীষণ ভাবে হাসিয়া উঠিলাম। সেও সাহস পাইয়া একটু হাসিল, কিন্তু সন্দেহ তখনও তাহার মন হইতে দূর হয় নাই। আমি তাহাকে ঠেলিয়া লগেজের কাছে লইয়া চলিলাম, এবং দুইজনে মিলিয়া সেটিকে একটি নিরাপদ স্থানে আনিয়া তুলিলাম। অতঃপর তাহার কাছে "ভিয়েন" (Wien) কথাটি অনেক বার উচ্চারণ করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম যে আমি ভিয়েনায় যাইব। তাহাকে আমার টিকিট দেখাইলাম এবং 'বোডেনবাখ' নামটির উপর অঙ্গুলি রাখিয়া তাহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম আমার মুশকিলটা কি। যেন একটুখানি বুঝিল, তাহার মুখ দেখিয়া সেইরূপ বোধ হইল। কিন্তু সহানুভূতি দেখান দূরের কথা, সেও আমার নিকট টেটশেন হইতে তাহার ষ্টেশন পর্যন্ত ভাড়া দাবি করিল। আমি এতক্ষণে যথেষ্ট বিজ্ঞ হইয়াছি, অতএব ভাড়া দিতে আর অস্বীকার করিলাম না। খারটুমের মেহদির পদে উঠিবার বাসনা আর নাই। আমার কাছে যে কয়েকটি মার্ক মুদ্রা ছিল, তাহা সমস্তই টেবিলের উপর রাখিলাম। সে মাথা নাড়িল। অর্থাৎ আরও চাই। আমার কাছে কাগজের নোট যাহা ছিল তাহাও উহার সঙ্গে যোগ করিলাম। তথাপি সে মাথা নাড়িতে লাগিল। আমি একটি স্বর্ণ মুদ্রা দিয়া বলিলাম ভাঙানি দাও। ভাঙানি নাই? তাহা হইলে আর আমি কি করিতে পারি? তুমি যাহা পার কর। এই বলিয়া আমি চেয়ারে হতাশ ভাবে বসিয়া পড়িলাম। লোকটি একখানা কাগজে কি লিখিয়া পোর্টারের হাতে দিল এবং কি সব বলিল।

পোর্টার লগেজ তুলিয়া লইয়া আমাকে টাকাগুলি ওখান হইতে কুড়াইয়া লইয়া তাহাকে অনুসরণ করিতে

বলিল। কিছুক্ষণ ভালই চলিলাম, কিন্তু তুষার ক্রমে গভীর বোধ হইতে লাগিল, কয়েক ফুট গভীর। শুধু সরু গলিতে তত গভীর নহে। কিন্তু বেশি লোক চলিয়া তাহাকে কাঁচের মত শক্ত করিয়া তুলিয়াছে, এবং তেমনিই পিছল। আমি যে কোথায় চলিতেছি তাহা বুঝিতে পারিলাম না। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা একটি পাহাড়ে উঠিতে আরম্ভ করিলাম। আমাদের পথ ইহারই পাশ দিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া গিয়াছে। আমাদের দক্ষিণদিকে পাহাড় খাড়া হইয়া উঠিয়াছে। বাম পাশে অন্ধকারে যতদূর বোধ হইল পাহাড়ের পাশ খাড়া নিচে নামিয়া গিয়াছে, সবটাই তুষারে ঢাকা। ভাবিলাম, এখন এখান হইতে পা ফসকাইলে নরম তুষারের ভিতর সুরঙ্গ কাটিয়া নিচে গিয়া পড়িতে হইবে। লোকটি আমার আগে চলিতেছে, আমিও যতদূর পারি তাহার প্রায় পায়ে পায়ে চলিতেছি। ভয় ছিল আবার কোনও দুষ্টবুদ্ধি তাহার মাথায় ভর না করে। এই ভাবে অনেক দূর যাইবার পর নিচে নামিয়া আমরা একটি বড় নদীর ধারে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। একটি কাঠের সেতু ছিল নদীর উপর, সেটি পার হইলাম। এইখানে লোকটি আমার নিকট হইতে যে কয়েকটি রৌপ্য মুদ্রা ছিল তাহা লইয়া চলিয়া গেল, সম্ভবত নদী পারের 'টোল' দিতে। অল্পক্ষণের মধ্যেই সে ফিরিয়া আসিল এবং আমরা আবার চলিতে লাগিলাম। পথে একদল স্ত্রীপুরুষকে দেখিলাম, তাহারা সম্ভবত বড়দিনের উৎসব শেষ করিয়া বাড়ি ফিরিতেছিল। রাত্রি প্রায় ৩টার সময় আমরা একটি ছোট শহরে আসিয়া পৌঁছিলাম। শহরটি আধাজাগ্রত, হাসির শব্দ, গানের শব্দ এবং উৎসবের আরও নানারকম শব্দ কানে আসিল। একটি বড় বাড়ির কাছে আসিয়া আমার সঙ্গের লোকটি আমার নিকট হইতে স্বর্ণমুদ্রাটি লইয়া ভিতরে তাহা ভাঙাইতে চলিয়া গেল, বলিয়া গেল পথে আমি যেন অপেক্ষা করি। আমি তখন অতিশয় ক্লান্ত, এবং নিদ্রাকাতর হইয়া পড়িয়াছি, আমার পা দুইখানি অসাড় হইয়া গিয়াছে, সুতরাং আমি আধ খোলা দরজায় হেলান দিয়া চোখ বুঁজিলাম। এই ভাবে অল্পক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিবার পর হঠাৎ একটি লোক আমার সঙ্গে ধাক্কা খাইয়া পড়িয়া গেল, অবশ্য আমরা দুইজনেই এক সঙ্গে পড়িয়া গেলাম। প্রথমে ইহা দুরভিসন্ধিমূলক বলিয়া সন্দেহ হইয়াছিল, কিন্তু লোকটি লটান মাটিতে পড়িয়া নাক ডাকাইতে লাগিল। অনেক চেষ্টা করিয়া নিজে খাড়া হইলাম এবং লোকটিকে তুলিবার চেষ্টা করিলাম, ঠাণ্ডায় মারা যাইতে পারে এমন ভয় ছিল। বহু কষ্টে তাহাকে টানিয়া বসাইয়া দিলাম এবং টানিতে টানিতে দেয়ালের কাছে আনিয়া তাহার সঙ্গে উহার পিঠ ঠেকাইয়া দিলাম। এতক্ষণে সে তাহার জ্ঞান কিছু ফিরিয়া পাইয়া কেন যেন আমার উপর ভীষণ খাপ্পা হইয়া উঠিল এবং চিৎকার করিয়া কি বলিতে লাগিল। ইতিমধ্যে রেলওয়ে পোর্টার ফিরিয়া আসিতে আমি তাহাকে ফিরিয়া গিয়া ভিতরের লোকদের কাছে ইহার অবস্থার কথা জানাইতে বলিলাম। অতঃপর আমরা আরও কিছুদূর চলিবার পর একটি হোটেলে গিয়া পৌঁছিলাম। এইখানে সে আমাকে ষ্টেশন মাষ্টারের দেওয়া বাড়তি মাশুলের রসিদখানি দেখাইল। তাহাকে তাহা দিলাম, এবং তাহার নিজের পাওনাও গ্রহণ করিয়া ইঙ্গিতে আমাকে বুঝাইল যে, যেটুকু রাত্রি অবশিষ্ট আছে, সেটুকু আমাকে এই হোটেলেই ঘুমাইয়া কাটাইতে হইবে। তাহার পর সে একখণ্ড কাগজে "আউস্‌সিগ" শব্দটি এবং তাহার পরে "৯-১৮" লেখাতে বুঝিতে পারিলাম, এই শহরটির নাম আউস্‌সিগ এবং বোডেন-বাখ-ভিয়েনা লাইন এই শহরের পাশ দিয়া গিয়াছে এবং আমাকে ৯-১৮তে ট্রেন ধরিতে হইবে। আমার অনুমান সত্য। ঠিক সময়ে ট্রেন ধরিয়া ভিয়েনা অভিমুখে যাত্রা করিলাম।

আউস্‌সিগ হইতে ভিয়েনা দীর্ঘ পথ। ট্রেনটি তীরবেগে ছুটিয়া চলিয়াছে তুষার-ঢাকা দেশের উপর দিয়া। যেন বিরাট এক তুষার-সমুদ্র, মাঝে মাঝে বড় পাহাড় মাথা তুলিয়া আছে, ছোট ছোট পাহাড় অসংখ্য, গভীর খাদ মাঝে মাঝে দেখিতেছি, ঘন পাইন বন,

এবং শহর ও গ্রামগুলি এই পটে ছবির মত দেখাইতেছে। প্রাচীন ভাঙা কাস্‌ল্‌ উচ্চ পাহাড়ে মাঝে মাঝে দেখা যাইতেছে। বসন্ত কাল না আসা পর্যন্ত এ তুষার জমি হইতে নড়িবে না। কেবল মনে হইতেছিল, ব্রিটেনে, ফ্ল্যাণ্ডার্সে অথবা ফ্রান্সে জমি যেমন বেড়া-গাছে সুন্দর ভাবে ঘেরা দেখিয়াছি, এখানেও যদি সে রকম থাকিত তাহা হইলে চোখদুটি কিছু বিশ্রাম পাইত। কণ্টকিত পত্র হলি, হর্নবীম, বীচ, দীর্ঘশাখাযুক্ত এলডার অথবা শোভনদৃশ্য সুইট ব্রায়ার, ব্ল্যাক-থর্ণ, হোয়াইট-থর্ণ, ইউ, অথবা প্রিভেট, এই সব গাছের নিরেট ঘন দুর্ভেদ্য বেষ্টনী রচনা যাহা ইংল্যাণ্ডের ক্ষেতে দেখিয়াছি, এখানে তাহা নাই, তাই এ দৃশ্য বৈচিত্র্যহীন বোধ হইল। ছাঁটকাটহীন উদ্দাম বৃদ্ধির প্রশ্রয় প্রাপ্ত Euphorbias, Jatrophas এবং Zizyphus প্রভৃতি দেখায় অভ্যস্ত আমার স্বদেশবাসী আমার বেড়াঘেরার সৌন্দর্য লইয়া কবিত্ব করিতে দেখিয়া হাসিবেন, কিন্তু যত্ন রুচি ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, জীবনের ক্ষুদ্রতম ব্যাপারেও কি পরিমাণ সৌন্দর্য যোগ করিতে পারে, সে বিষয়ে তাঁহাদের ধারণা নাই বলিলেই চলে। গাড়ির কামরায় আমার সহযাত্রী ছিলেন একজন অস্ট্রিয়ান সামরিক অফিসার।—লেফটেনান্ট এ. বুয়েরগের অভ পেটেস'গেসে'। সমস্তদিন প্রতি আধ ঘণ্টা অন্তর আমাকে তিনি একটি করিয়া সিগার দিতেছিলেন এবং কপালে হাত দিয়া দুঃখ করিতেছিলেন, তিনি ইংরেজী জানেন না, জানিলে আমার সহিত আলাপ করিতে পারিতেন। পৃথিবীটা এতই স্বার্থপর যে সে কখনও ভাল হইতে পারে কি না, এ বিষয়ে আমার মনে প্রায়ই সন্দেহ জাগে। সম্ভবতঃ পৃথিবীটা যেমন হওয়া উচিত তেমনি দেখিবার উগ্র আগ্রহ হইতেই এরূপ সন্দেহ জাগে। ভুল হয়, ইহার যদি একটি উজ্জ্বল দিক থাকে, তেমনি ইহার একটি অন্ধকার দিকও থাকিতে পারে। কিন্তু সে যাহাই হউক আমার এই সহযাত্রীর ন্যায় লোককে দেখিলে মনে হয় পৃথিবীটা বাস করিবার পক্ষে খারাপ নহে। অপরাহ্নে আমরা প্রাগ অতিক্রম করিয়া গেলাম, এবং ভিনা অতিক্রম করিবার সময় সন্ধ্যা নামিয়া আসিল। ইহার পরেই সাম্রাজ্যিক শহর ভিয়েনার সীমানার মধ্যে আসিয়া পড়িলাম। আমি গিয়া উঠিলাম হোটেল মেট্রোপোলে। এইখানে অ্যামেরিকান ও ইংরেজ টুরিস্টগণ আসিয়া উঠেন। কিন্তু আমি এ শহরে প্রকৃত পক্ষে এম. এ. দ স্কালার অতিথি হইলাম। প্রথাগত ভাবে তিনি ও তাঁহার স্ত্রী আমাকে সাদর অভ্যর্থনা জানাইলেন, এবং আমাকে ভিয়েনা দেখাইবার ভার লইলেন। অনেক বিষয়েই শহরটি প্যারিসের মত, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সর্বত্র, প্রাসাদোপম অট্টালিকাসমূহ, সব স্থানেই হাসিখুশি মুখ। ডানিউব নদী দেখিতে গেলাম, শহর হইতে প্রায় দুই মাইল দূরে অবস্থিত। সম্রাটের প্রাসাদও দেখিলাম। এটি নিজেই একটি মিউজীয়াম। একটি বিরাট গ্রন্থশালা আছে, বহু চিত্রের সংগ্রহ এবং নৃতত্ত্ব বিষয়ক অনেক বস্তু, এবং খনিজ তত্ত্ব' জীবতত্ত্ব, পুরাতত্ত্ব বিষয়ক অনেক সংগ্রহ আছে। মূল্যবান্ পাথর ও মুদ্রা ও অনেক রহিয়াছে। ক্রমশঃ

এই প্রবন্ধের মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত কিস্তিতে ৪১৮ পৃষ্ঠায় ১০-সংখ্যক উদাহরণটিতে ২১ বছর স্থলে ১১ বছর পড়তে হবে।

বড় ঘরের বড় কথা

(উপন্যাস)

পুষ্পদেবী সরস্বতী

হারুবাবুর স্ত্রীর মুখে শোনা যায় একবার হারুবাবুর ছেলের খুব অসুখ বাঁচার আশা নেই। হারুবাবু মাঝে মাঝে স্ত্রীর কান্নাকাটিতে বিরক্ত হয়ে কখনো বা দুফোটা চায়না কখনো বা নাক্সভমিকা একবাটি জলে ঢেলে দেন। বলেন দুঘণ্টা অন্তর খাইও। হারুবাবুর মা বিচলিত হলেন একমাত্তর নাতি। হারুবাবুকে ডেকে বল্লেন হ্যাঁরে কত ভুগবে ছেলেটা? বৌমার চোখের জল শুখোয় না তুই বরঞ্চ বিপিন ডাক্তারকে একবার ডেকে ছেলেকে দেখা

তখনকার দিনে বিপিন কুমার নামকরা ডাক্তার ছিলো। ফী ছিল ষোল টাকা। এধারে হারুবাবু কর্ল্লে কি জানো। দু টাকা ফী-এর এক ডাক্তারকে বিপিন কুমার সাজিয়ে নিয়ে এলো।

ধর্মের কল বাতাসে নড়ে—পাড়ার এক গিন্নির ছেলে তার মার অসুখে বিপিন কুমারকে নিয়ে এসেছিল। সেই মা খোকার অসুখ শুনে দেখতে এসেছেন। বিপিন কুমার এসেছেন শুনে এগিয়ে গেলেন সগৌরবে। শুধু পরিচিতই নন প্রাণদাতা চিকিৎসক। গিয়ে পৌছিয়ে এলেন। এ কি এ তো বিপিন কুমার নয়। বললেন হারুবাবুর মাকে হারুবাবুর মা তো স্তম্ভিত। ছেলেকে তিনি চিনতেন কিন্তু এতটা চিনতেন না।

ঠিক অনুরূপ কাণ্ড হল হারুবাবুর ছোটমেয়ের বিয়েতে। বড় বোন অগাধ টাকার অধিকারী হয়ে বাড়ীতে বসে আছে। স্বামী অল্প বয়েস থেকে মদ খেতে আরম্ভ করে শেষে লিভার পচে মারা গেছে—তার মৃত্যু কাহিনীও শ্রবণ সুখকর নয় ভয়াবহ। বড় ভাই হাত ধরে ছোট ভাইকে মদ খেতে শেখালো। নাবালক ভাই মদের ঘোরে থাকলে সুবিধে। সহজেই বিষয় সম্পত্তি বেহাত করা যায়। আজকের দিনে এসব ঘরে ঘরে হচ্ছে। তখনকার দিনে হত না। এমন ত দেখা যেত বিষয় সম্পত্তি নিয়ে মামলা হচ্ছে জ্যাঠার সঙ্গে—। হয়ত নাবালকরা এসেছে মামার বাড়ী থেকে ঐ জ্যাঠার বাড়ীতেই তার খাবার ব্যবস্থা হত। বিধবা ভায়ের বৌ নায়েবকে দিয়ে জানাতেন ছেলেরা কি খাবে। জ্যাঠামশাই দাঁড়িয়ে তদারক করতেন অতুল্য আধসের দুধের ক্ষীর পেলো কি না আর অমূল্যটা চির-কেলে পেটরোগা সে সিঙ্গি আর কাঁচকলার ঝোল খাচ্ছে কি না। তার থেকে তিল মাত্র এধার ওধার হলে স্ত্রীর সঙ্গে কুরুক্ষেত্তর বাধাতেন।

এ বিষয় কিছু বলতে গেলে বলতেন মামলা চলছে সম্পত্তি নিয়ে সরকার ঠিক করে দেবেন কোনটা কার? ভাবলে ভাইপোরা পর হয়ে যাবে? একেই বলে স্ত্রী বুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী।

হারুবাবুর বড় মেয়ে শুধু নামেই প্রতিমা ছিল না রূপে গুণে দেবী প্রতিমার মত ছিলেন তিনি। সেই যৌবনে যোগিনী রূপ দেখলে পাষাণও বুঝি ফেটে যেত।

এই নিঃসন্তান বিধবা সকলের বড়মা ছিলেন। বাড়ীর সব ছেলেমেয়েদের ত বটেই দীন দুঃখী দরিদ্র সবাই এসে সদর দরজায় হাঁক দিতো—বড়মা কোথায় গো? হারুবাবু প্রাণপণে আটকালেও বড়মাকে সামলাতে পার্ত্তেন না। তিনি ছোট বোনের বিয়েতে সেকালের যুগে দশ হাজার টাকা খরচ কর্ব্বেন বললেন। বাপকে বললেন দোহাই তোমার আর শুধু বড় লোক খুঁজো না। শিক্ষিত ছেলে নইলে সুধার বিয়ে দিতে দোব না। তখন একটি রাজা উপাধি ধারী ধনী ও

গ্রাজুয়েট পাত্র পাওয়া গেল' বড়মা বললো যেমন করে হোক ঐ ছেলের সঙ্গে সুধার বিয়ে দিতে হবে। হারুবাবু বল্লেন আচ্ছা দে দশ হাজার টাকা চেষ্টা দেখি। এ তো সহজ ব্যাপার নয় কত দিকে টোপ ফেলতে হবে কত টাকা ছড়াতে হবে। সেই টাকা নিয়ে হারুবাবু দীর্ঘকাল গা ঢাকা দিলেন ফিরলেন সেই পাত্রর বিয়ে হয়ে যাবার পর। বড়মা প্রাণপণ চেষ্টা করেও ছোট বোনের মনোমত বিয়ে দিতে পারলেন না। শেষে অনেক বলা কওয়ার পর হারুবাবু তিনহাজার উগরোলেন তার ওপর আর কিছু টাকা দিয়ে বড়মা ছোট বোনের বিয়ে দিলেন। বড়মার পক্ষে আবার দশহাজার টাকা দিতে আপত্তি ছিল না। কিন্তু সব টাকাই ত হারুবাবুর করতলগত। বড়মার ছবি আকবো এমন লেখনীর জোর আমার নেই। তিনি সকলের মঙ্গল করার জন্যই যেন জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। জোর করে মানুষকে দিয়ে তার যাতে ভালো হয় করাতেন। যার ভাল হচ্ছে সেই-ই হয়ত বিরক্ত হত কিন্তু বড়মা তাতে থামতেন না। যতক্ষণে শেষ পর্য্যন্ত তা না করতে পারতেন বড়মার শান্তি হত না। বড়মার অভিধানে অনেকগুলি কথা ছিল না ছিল না আপন পর ছিল না হিংসা দ্বেষ ছিল না শতকষ্ট পেলেও তার প্রতি আক্রোশ বা প্রতিশোধের বাসনা।

আজ ঘরে ঘরে দেখি ননদ ভাজের কত রেষারেষি। বড়মা কিন্তু নিজে হাতে ভাজকে সাজাতেন যেমন করে মানুষ ঠাকুর সাজায় তেমনি করে। পাতা কেটে চুল বেঁধে নিজে হাতে করে স্নো পাউডার মাখিয়ে সাজাতেন ভাজকে। তারপর ভালো সাড়ী পরিয়ে নিজের গয়নাগুলি হীরের চিক হীরের সাতনরী পরিয়ে মুগ্ধ নেত্রে মুখখানি দেখতেন।

কোনদিন বিকেলে ভাজ কি কাপড় পরবে তাও বড় মা ঠিক করে দেবে। তাঁতিনী আসলে সেও ডাকতো। বড়মা কোথায় গো? বড়মা বেছে ভালো কাপড়গুলি কিনতেন। তারপর তা বিতরণ হত—গাঢ় উজ্জ্বল রং-গুলি দুভাগে ভাগ হত কিছু ভাজ কিছু এক বোনঝি বড়-মার মতে তারা ছিল ফরসা। কিছু চাঁপা ফুল গেরুয়া জাতীয় রং-এর সাড়ী পেত নিজের সব চেয়ে আদরের ছোট বোন সুধা। বড়মার মতে তার রং তত ফরসা ছিল না। বড়মার রং-এর অনেক শ্রেণী ছিল। ফুট গৌরবর্ণ, গৌরবর্ণ, নামে গৌরবর্ণ, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, শ্যামবর্ণ, কালো—।

বড়মার মত ত্যাগী মানুষ আমি দেখিনি অনায়াসে মস্ত বড় গাড়ী রেখে দাসী পরিবৃতা হয়ে তিনি আরামে থাকতে পারতেন। কিন্তু মনে প্রাণে তিনি ত্যাগী ছিলেন। সকালে একথাল টাকা নিয়ে বড়মা কালিঘাটে যেতেন কালিবাড়ী গিয়েও সেখানে রোজ দর্শন হয়ে উঠতো না কাঙ্গালীর দল ঘিরে ফেলতো তাঁকে কার কাপড় চাই কার কম্বল চাই কার ছাতা চাই কার ছেলের ওষুধ চাই সকলকে ভাগ বাটোয়ারা করে টাকা দিয়ে বড়মা বাড়ী ফিরতেন গঙ্গাস্নান করে পদব্রজে। কারণ শেষ কপর্দ্দকও ত দান হয়ে গেছে। তাছাড়া যদি থাকেই তাহলেই বা থাকবে কি করে? পুতুলের দোকানদার ডাকছে অ বড়মা নতুন পুতুল এসেছে চিনে মাটির নয় পোর্সিলিনের শিব অন্নপূর্ণা—। বড়মা পুতুল দেখেই মুগ্ধ। কিনলেন কিন্তু পুতুলটি বাড়ী এসে পৌছুবার আগেই হয়ত পথে কোন ছোট মেয়ে পুতুলটি দেখে বায়না করলো মা আমার অমনি ঠাকুর চাই—। মেয়েটির মা হয়ত দাম শুনে বললেন বাবা অত দাম? মেয়েটি কাঁদার উপক্রম করার আগেই বড়মা পুতুলটি তার হাতে দিয়ে হন হন করে এগিয়ে চললেন। বাড়ী গিয়ে আজ খাবার ফুরসুৎ নেই। জামায়ের অসুখ তারা এমন অবুঝ কিছুতে কোবরেজী করাবে না। তাঁর নিজের সন্তান ছিল না এ হল বোনঝি জামাই—।

বোনঝিটি তাঁর বড় আদরের তাঁরা তিন বোন—মেজবোনটির ভাগ্যক্রমে ভালো বিয়ে হয়েছে ভগ্নীপতি হাকিম। তাঁর একমাত্র মেয়ে কাজেই দাও ওর হাতে আকাশের চাঁদ পেড়ে। ছোট বেলা থেকে চাইবার আগে যাবতীয় রাজৈশ্বর্য্য তাকে জুগিয়ে এসেছে। —সেবার বোন যখন বাপের বাড়ী আসে বড়মা

বলেছিল কি সুন্দর বোম্বাই বেঁকী চুড়ী উঠেছে তরু দে না দেবীকে গড়িয়ে। বোন কানে নেয়নি কথা বলেছিল ও মেয়েকে খাইয়ে মাখিয়ে সুখ নেই দিদি বাপের আদরে ওর বড় বড় কথা—আমাদের দেশের লোক খেতে পায় না আমাদের বিলাসিতা করা উচিত নয়—বলবো কি দিদি আমার ছেলেরা অমন নয় কিন্তু ওই মেয়ের মেজাজ দেখে কে? বাপ দিনে ক পয়সার বেশী বাপু খাবে না মহাত্মা গান্ধী বলে দিয়েছেন মেয়েও ঠিক তাই হয়েছে। বড়মা অত শক্ত বুঝতে রাজী নন নতুন বোম্বাই বেঁকী উঠেছে অথচ দেবী পরবে না এও কি হয় নাকি? ভগ্নীপতি কলকাতায় এলে আবার আর্জ্জি পেশ করলেন। অ শ্রীকুমার তরুকে বললুম তোমাদের একমাত্তর মেয়ে সখ সাধ নেই দেবীকে বোম্বাই বেঁকি চুড়ী গড়িয়ে দে। সে বলে দেবী নাকি চুড়ী পরবে না। ব্যস্তসমস্ত শ্রীকুমারবাবু তখন বন্যার সাহায্য ফাণ্ড নিয়ে ব্যস্ত বললেন দিন না দিদি টাকাটা এই ফাণ্ডে দেবীর ত চুড়ী রয়েছে এরা খেতে পাচ্ছে না—। বড়মা আরেক দফা খরচের দায়ে পড়েন অথচ কেউ খেতে পাচ্ছে না শুনে কিছু না দেওয়াও সম্ভব নয়। বন্যার জন্য বড়মা তৎক্ষণাৎ পাচশো টাকা মঞ্জুর করলেন। কিন্তু হাহাকার করলেন হারুবাবু বল্লেন করলি কি পাগলী—নাহক দমকা খরচা। সরকার ওদের জন্যে টাকা দিচ্ছে আমরা ক্ষুদ্র প্রাণী—। বড়মা থামবার মেয়ে নন বড়মা বললো শ্রীকুমার বল্লে যে তাদের বড় কষ্ট আমি ত তাদের কথা বলিনি বলেছিলুম ওরং মেয়েকে বোম্বাই বেঁকী চুড়ী গড়িয়ে দিতে—এবার হারুবাবু রেগে ওঠেন বোম্বাই বেঁকী চুড়ী তাঁকে গত রাত্রেই যথেষ্ট বিব্রত করেছে। বাগান বাড়ীতে নতুন আমদানী ননীবালাও চেয়েছে বোম্বাই বেঁকী চুড়ী—কাজেই জ্বালাটা দ্বিগুণ হয়ে উঠলো। বললেন "হাকিম বাপ তার একমাত্তর মেয়ে তার মেয়ে কী পরবে কী না পরবে তা নিয়ে তোর মাথা ঘামানো কেন? তাছাড়া সেও তো চাইছে না।" এবার বড়মা মোক্ষম অস্ত্র ছাড়লেন কেন বাবা আমার কাছির বাগান বিক্রীর টাকাটা তো মজুদই রয়েছে দিয়ে দাও না ওতে বন্যার টাকাও হবে দেবীর চুড়ীও হবে—। হারুবাবু তখন পালাবার পথ পান না—বলেন তোর সঙ্গে আর বকবক করতে পারি না বাপু আমার আজ মামলার দিন বললুম। বড়মা চেঁচিয়ে বলেন টাকাটা কিন্তু পাঠিয়ে দিও। কি করে বড়মা? শেষে অমূল্য স্যাকরার তলব পড়লো—। যখন ছোট ছোট বোম্বাই বেঁকী এসে বড়মার হাতে পৌছল বড়মা মানসনেত্রে যেন দেবীর নতুন চুড়ী পরা হাত দুটি দেখতে পেলেন। যখন বন্যার ব্যাপার নিয়ে বাপ ও মেয়ে ঘরে ঘরে চাঁদা চেয়ে বেড়াচ্ছেন তখন রেজিষ্ট্রি ডাকে বোম্বাই বেঁকী চুড়ী এসে পৌছুলো। দেবী বললো দিন বাবা চুড়ীটা বন্যা ফাণ্ডে। কিন্তু সঙ্গে বড়মার কাতর আবেদন "তোদের ত প্রাণে সখ নেই তরু অমন সুন্দর মেয়েটাকে সাজাতেও তোদের ইচ্ছে হয় না—এই চুড়ী পরিয়ে দেবীর একটা ছবি তুলিয়ে পাঠাস।"

চিঠিটা পড়ে শ্রীকুমারবাবু কি যেন ভাবলেন মেয়ের সাদচ্ছায় বাধা দিয়ে বললেন থাক দিদি যখন বলেছেন চুড়ীটা তুমি বরং পরো। চোখ কুচকে দেবী চুড়ীটা নিলো বটে তবে বড়মাকে মস্ত বড় আদর্শের লেকচার ঝেড়ে চিঠি দিতে ছাড়লো না। ছি বড়মা কত শিশু কত অনাথা খেতে পাচ্ছে না এই দিনে তুমি আমায় নতুন চুড়ী পাঠিয়ে সাজতে বলেছ? আমি কি তোমার খেলার পুতুল আমার কি হৃদয় বলে কিছু নেই ইত্যাদি। বড়মা সে চিঠির উত্তরও দিলেন না বললেন "পাগলের বেটি পাগল পরবে বৈকি পরবে। আমায় না দেখিয়ে পারবে না।" সত্যিই পারার উপায় ছিল না। চুড়ী পরাবার আশায় বড়মা দেবীকে খুসী করার ফন্দী বের করলো একবার দেবী বলেছিল জানো বড় মা মীরাদির মত যদি আমার অর্গান থাকতো তাহলে তোমায় কি রকম "দেশ দেশ নন্দিত করি" গানটা গেয়ে শুনিয়ে দিতুম। বড়মার রাতের ঘুমটুকু গেল। সকাল বেলা গেলেন খুড়তুতো ভাই নালুর কাছে। সে গান বাজনায় ওস্তাদ। তাকে গিয়ে ধরলেন হ্যাঁরে নালু তুই যে সেদিন কি ফোল্ডিং অর্গানের কথা বলছিলি

ডোয়ার্কিনের একটা কিনে পাঠিয়ে দিতে পারিস দেবীকে? জানিস কত সাধ করে মেয়েটাকে চুড়ী গড়িয়ে দিলুম তা মেয়েটা পরলো না অবধি। দেখি পাগলীকে বাজনা দিয়ে খুসী করতে পারি কি না?

তক্ষুণি অর্গান কিনে পাঠানর ব্যবস্থা হয়ে গেল। দেবী ত অবাক সকাল বেলা হেইও হেইও করে প্রকাণ্ড অর্গানের বাক্সটা এসে হাজির হতে। এবার কিন্তু দেবীর দেশের দুর্দ্দিন বলে কোন আপত্তি দেখা গেল না "জন গণ মন অধিনায়ক" আর "দেশ দেশ নন্দিত করি" গানের চোটে বাড়ীর সকলকে পাগল করে তুললো। কিন্তু ভুলে গেল বড়মাকে একটা চিঠি লিখেও আনন্দটা জানাতে—কারণ বড়মার কাছে পাওয়াটা তার কাছে জল হাওয়ার মতই সহজ প্রাপ্য। সেই জামাই আবার চিররুগ্ন বড়মার ভাবনার শেষ নেই। যতই বলেন যতই বোঝান তারা ছাই কিছুতেই কোবরেজ দেখাবে না। প্রতিদিন ছোটেন সেই বেয়ানের বাড়ী দেখেন দেবীর ছল ছল মুখ। জামায়ের ম্লান বিমর্ষ মুখখানি। হার্ট নাকি ডায়লেশন হয়েছে তার সঙ্গে এ্যালবুমেন কিডনী কাজ কর্চ্ছে না।

বেয়াই বেয়ান নির্ব্বিকার জামাই ধুকতে ধুকতে দেড়শো টাকার চাকরী কর্ত্তে যায় দেবীর খোয়ারের শেষ নেই। মাঝে মাঝে শ্রীকুমারবাবু বিদেশ থেকে আসেন তখনকার সব চেয়ে বড় ডাক্তার এনে জামাইকে দেখান ওষুধ পথ্য কিনে দিয়ে যান। বেয়াই বেয়ান চোখ বুঁজে থাকেন। ভাবটা যেন যদি ছেলে মারা যায় শ্রীকুমারবাবুর মেয়েরই মাছ ভাত বন্ধ হবে ওদের কাঁচকলা। সেই ডাক্তার দেখানও সহজ নয়। দেবীর শ্বশুরবাড়ীতে ডাক্তার আনা চলবে না কোন আত্মীয়র বাড়ীতে মেয়ে জামাইকে নেমন্তন্ন করে ডাক্তার দেখাতে হবে। বেয়ান নাকি চিরকালই অমনি নিজের সাজগোজ সিনেমা থিয়েটার নিয়েই আছেন। ছেলে যে কবে হয়েছে তা নাকি তাঁর মনেই নেই। এজমালি বাড়ীতে থেকে বড়জা আর তাঁদের মেয়েদের নিয়ে ছেলের ছোট বেলাটা মানুষ করিয়ে নিয়েছেন তার পরই আধুনিকাদের মত পৃথক হয়েছেন। স্বামী দোকান থেকে মাংস আর মোগলাই পরটা কিনে আনেন দুজনে খান ছেলের কথা মনে থাকে না অবহেলিত শিশু এগার বছর বয়েস অবধি নাকি দুধ খেয়েই বেড়েছে। বাড়ীতে গরু ছিল গয়লা দুধ দুয়ে বালতি করে রেখে যেত ক্ষিদে পেলে তাইই ছিল তার আহার। বাড়ীময় খড়ি দিয়ে ছবি এঁকে এঁকে সে বেড়াতো। বড়মা তাঁর বুক ভরা স্নেহের সমুদ্র নিয়ে এই পাষাণী মায়ের সামনে এসে বসেন। মনে মনে ভাবেন কত আদরের দেবী তাকে দেয়া হয়েছে এই হৃদয়হীনার কাছে। পানদোক্তায় গাল ঠেসে গিন্নি তরকারি কুটছেন। তাঁর সামনে ভিক্ষার্থীর মত বড়মা বসেন কোথায় শুনে এসেছেন পড়ার বই লিখে কে নাকি মেলা টাকা করেছে। বড়মা সেই কথা আজ বেয়ানকে বলবেনই। বেয়ানের চোখে কিন্তু এস বোস-র ভাবও নেই একান্ত উপেক্ষার ভাব নিয়ে তরকারির দিকে মনোনিবেশ করে রইলেন। বড়মা নিজেই বল্লেন দেখুন বেয়ান এই যাদব মিত্তির অঙ্কের বই লিখে টাকার পাহাড়ের ওপর বসে রয়েছে। যাবদ্ চন্দ্র দিবাকর তাঁর নাম রইল পৃথিবীতে আপনি বেয়াইকে বলুন একখানা অঙ্কের বই লিখতে বই ত আমাদের সুবোধই লিখতে পারে ও-ও-ত প্রফেসার শুধু বেয়াই মশায়ের নাম দিলেই তার কাটতি হবে। বেয়ান বিরক্ত হয়ে বলেন তাঁর যা ইচ্ছে হবে তিনি কর্বেন। বড়মা তবু ছাড়ার পাত্র নন। এই কথা নাহক একশো বার দেবীকে বলেছেন দেবী শ্বশুর শাশুড়ীকে বলতে রাজী হয় না। আর সুবোধ নামেও সুবোধ কাজেও সুবোধ বড়মার সামনেও নীরব। বাবা মার সামনেও নীরব। বড়মা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবেন হায় রে সেই দেবীকে এ কোথায় দিলুম। বিয়ের সম্বন্ধ বড়মাই করেছেন কাজেই মনে মনে নিজেকেই দোষী করেন। লোক পরম্পরায় শোনেন মেয়েটা পেটে খেতে পায় না অবধি। আজ তরকারি কোটা দেখে তা আরো বুঝলেন। চার চাকা বেগুন ভাজা। আর চারটি নটেশাক আর কুমড়োর ফালি কুচুনো। বড়মা ভাবেন

বেটেরে মানুষই ত ছজন তাহলে কি এ বেগুন ভাজার টুকরোও দেবীর ভাগ্যে জুটবে না। বেয়ান উঠে গা ধুতে গেল। এবার বড়মা যান দেবীর ঘরে।

দেবীর শিশু কন্যা ছুটি বড়মার পাশে এসে দাঁড়ায়। বড়মা বস্ত্রাস্তরাল থেকে নানা নয়ন লোভনীয় খেলনা বার করেন গঙ্গাস্নানের ফেরার ফল। রঙ্গীন প্রজাপতি ক্লীপ দমদোয়া চামাগুড় পুতুল পেয়ে মেয়ে ছুটির মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে বড়মা হতশ্রী দেবীর দিকে চেয়ে দেখেন সেই আনন্দোজ্জ্বল হাস্য প্রতিমার এ কি চেহারা? মুখে নিষ্প্রভ কাঠিন্য হঠাৎ এই বাস্তবের কঠিন পরিচয়ে সে যেন থমকে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু বড়মার ত দাঁড়ালে চলবে না তিনি বলেই চলেন দেখো সুবোধ তোমাদের এত করে বলছি একবার গণনাথ সেনকে দেখাও কবিরাজ ত নয় ধন্বন্তরি। ও ঠিক সুবোধকে সারিয়ে দেবে। কত কঠিন কঠিন রোগ সারতে দেখলুম ত কেন তোরা নিরাশ হচ্ছিস।

তখন সদ্য নলিনীসেন জবাব দিয়েছেন সে কথা বড়মাকে বলতে দেবীর ইচ্ছে হয় না।

তাছাড়া ঐ বড় কবিরাজের ফীই বা কে দেবে? বারে বারে বাপের কাছে হাত পাততে বিবাহিতা মেয়ের কুণ্ঠা আসে কিন্তু উপায় কি? বাপের বাড়ীতে দেখেছে মায়ের যে সম্মানের আসন শ্বশুর শাশুড়ীর কাছে আছে এখানে তার কিছুই সে পায়নি। ভেবে পায় না তার কি অপরাধ। এবার বড়মা প্রসঙ্গান্তরে যান বলেন দেখ মেয়ের বিয়ে দে। কিশোরী মেয়ের দিকে চেয়ে হাসে দেবী। বলে ওইটুকু মেয়ে কে নেবে বড় মা? বড়মা মহোৎসাহে এক বিরাট জমীদার বাড়ীর নাম করেন এবার দেবী না হেসে পারে না। বলে সত্যি সত্যি বড়মা তুমি পাগল। ঐ অত বড়লোকেরা আমার মেয়ে নেবে কেন? বড়মা বলেন দেখ সবই মেয়েদের ভাগ্য যদি ভাগ্যে থাকে এই মেয়েই তাদের ঘরে যাবে। পাত্তরের দিদিমা আমার ও তোর পাড়ার সম্পর্কে পিসীমা হন। আমিই বরং তোকে নিয়ে যাবো। দেবী ম্লানমুখে মাথা নাড়ে বলে কেন মা বড়মা শুধু শুধু কষ্ট কর্ব্বে ওখানে কখনো হয়। বড়মা কিন্তু কিছুতেই শোনে না। দেবীর বলতে ইচ্ছে হয় না ধুমধাম করে মেয়ের বিয়ে দেবার টাকা কই? বড়মা ভাবতেও পার্ব্বে না যে নাতনীর বিয়েতে ঠাকুরদা ঠাকুমা এক পয়সাও বের কর্ব্বেনা। কিন্তু আবার সেই বাবার কাছে চাওয়া কিংবা বড়মার কাছে চাওয়া ভাবতেই দেবীর কষ্ট হয়। চিরকাল যে শিশু নিয়েই সকলকে ধন্য করেছে আজ তার অবস্থা ভিখারিণীর অধম। সুবোধ ওই দেড়শো টাকার ১০০ বাপকে দেয় কুড়ি টাকা মার হাত খরচ দশ টাকা বোনকে বাকি কুড়ি টাকা সম্বল তাতে ট্রামবাস·দুধ জলখাবার। এ সব কি বড়মাকে বলবার? টাকার কথা সুবোধকে বললে সুবোধ টিউশনি নিতে চায় ঐ শরীরে টিউশনি কি সইবে। কঠিন অধ্যবসায়ে দেবী সংসার চালায়। তাছাড়া এই বেয়াই বেয়ানকে খুসী কর্ত্তে বড়মা করেনি কি? সেবার যখন বেয়ান শরীর সারাতে পশ্চিমে গেল। দুমাস ধরে বেয়াই ও জামাইকে বড়মা প্রতিদিন খাইয়েছেন। বড়মা বেঁচে থাকতে জামাই রেঁধে খাবে এও কখন হয় নাকি? মাস দুই ধরে চর্ব্ব চোষ্য খেয়েও বেয়াই কিন্তু বিন্দুমাত্র নরম হলেন না। শুধু বড়মা বেয়াই বাড়ী এসে বেয়ানরা যে রোজ লুচি খান এই গল্প শুনে গেলেন। পাড়ার গিন্নিরা নাম দিয়েছেন লুচি খাওয়া গিন্নি।

বড়মা বাড়ী ফিরলেন জামাইকে বল্লেন তুমি দেখাও ত কবিরাজ অসুখ কেমন না সারে দেখি। মনে স্থির করলেন মহামৃত্যুঞ্জয় যজ্ঞ করাতে হবে দেখি একবার ভটচায্যি মশাইকে ডেকে পাঠাই।

বড়মার মনে যত অপরিমিত স্নেহ টাকাটা সে পরিমাণে অপরিমিত নয়। বিশেষ করে যে টাকা ঠাকুরবাবুর করতলগত। সংসার স্বার্থপর—যখন বড়মা যার জন্য করেন সে ছাড়া সকলেই বিরক্ত হয় অকারণ এ পয়সার অপব্যয় কেন? কিন্তু এই কেন বড়মাকে বুঝবে কে?

হঠাৎ বড়মা শুনলেন বাড়গাঁয় খুব সস্তায় জমী বিক্রি হচ্ছে। রাতারাতি বড়লোক হবার এমন সুযোগ বড়

হয় না। বড়মা সকলকার দোরে দোরে ঘুরলেন। ওরে তোরা যা পারিস কিনে রাখ্‌ বেচতে কতক্ষণ? কিন্তু কিনবে কে বলো দায় ত বড়মারই? বড়মা যাকে যতটুকু পারলেন জমী কিনে দিলেন। যাকে কিনে দিলেন সেও বিরক্ত কোথায় কোন গণ্ডগ্রামে জমী দেখে কে?

পারতপক্ষে সবাই বড়মাকে এড়িয়ে যায় পথে দেখা হলে আর নিস্তার নেই—হ্যাঁরে মেয়ের বিয়ে দিচ্ছিস না কেন? বালুরঘাটে যে পাত্তরের কথা বলেছিলুম দেখেছিলি? হাবুটা কি এখনও হাপানিতে কষ্ট পাচ্ছে? তাকে না হয় একটু চেঞ্জে পাঠিয়ে দে। তোর মামা শ্বশুরের ত ঝাঁঝায় বাড়ী আছে। টান জায়গা গেলে নিশ্চয় ভালো থাকবে। পথচারী ভদ্রলোক বিপদে পড়েন। বহুদিন মামাশ্বশুরদের সঙ্গে শ্বশুরবাড়ীর বিচ্ছেদ আজ সেখানে নিজের ভায়ের জন্য বলা চলে না কিন্তু বড়মা নাছোড়বান্দা হয়ত বাগবাজারে নিজেই চলে যাবেন। বিব্রত হয়ে "ওকে জসিডি পাঠাবার ব্যবস্থা কর্ব্বো ভাবছিলুম আমার একবন্ধু থাকে" বলে তিনি পাশ কাটান। বড়মা আবার ডাকেন হ্যাঁরে নতুন গোলাপ খাস আম উঠেছে খেয়েছিস এবার ভদ্রলোক হেসে উত্তর দেন "খাওয়ালেই খাই" বড়মা স্নেহভরে বলেন কই আর যাস্‌ যে খাওয়াবো? কোন টালিগঞ্জের নবাব বাগানের গোলাপ খাস বলাব তবে খাঁটি জিনিষ পাবি।

সংসার মেকীর জায়গা বড়মার বুকের খাঁটি স্নেহও সেখানে পাগলের প্রলাপ বলে পরিচিত হয়।

বাড়ীতে ডাক্তার এসেছে নেভিব্লু রংএর সার্জ্জের কোট পরে। বড়মা ডাক্তারকেই জিগেস করে বসলেন হ্যাঁ বাবা তোমার কোটটা কোথায় কিনেছ কত দাম কি নাম সঙ্গে সঙ্গে তরুকে চিঠি গেল ওরে সুবোধকে এবার নীল রংএর রেজার কোট কিনে দিতে হবে পোবড়ায় আর অ.য় বড় খোকার জন্যেও একটা জিনিস।

ক্রমশঃ

তোকে মেলে মেলে ইয়া-ইয়া খাঁ কলব!

(রঙ্গচিত্র)

শৈলবালা ঘোষজায়া

আড়াই বছরের ক্ষুদে প্রপৌত্রী ঠাকুরাণীর কাচ-কণ্ঠের গর্জন শুনে প্রপিতামহী চমকে উঠলেন!

কাকে কচ্ছে?...তোকে মেলে মেলে ইয়াইয়া খাঁ কলব!

ব্যাপার কি? আবার শোনা গেল, সেই সগর্জন শাসন বাক্য!

অনুসন্ধানে জানা গেল, ব্যাপার দুঃসহ!

রান্না ঘরে রুটি বেলতে বেলতে মা উঠে গেছেন। অতএব তিনি নির্দ্বিধায় চাকি বেলুন দখল করে রুটি বেলতে বসেছেন। ময়দার ডেলা চটকে চাকি বেলুনে পেস্ট করে শিল্পকর্ম সম্পাদন করেছেন। বিশ বছর বয়সের পাচক যজ্ঞেশ্বর শিল্পের মহিমা বোঝে নি। চাকিটা সরিয়ে নিয়েছে। কাজেই বেলনা তুলে প্রহারোদ্যত হয়ে প্রপৌত্রী ঠাকুরাণী গর্জন জুড়েছেন "তোকে মেলে মেলে ইয়া-ইয়া খাঁ কলব!"

যজ্ঞেশ্বর রান্নাঘরের এদিক ওদিকে সরে তার নাগালের বাইরে পালাচ্ছে। হাসছে। ইনি তত রাগছেন। তত আক্রমণ করতে ছুটছেন।

চণ্ডী-উপাসক দাদু, আদর করে নাম রেখেছেন বিষ্ণুমায়া। উনি সেটা কাচ কণ্ঠে উচ্চারণ করেন "বিষ্ণু মায়া।" দাদুর দাদা নাম রেখেছেন "দেববর্ণা"। পিসীমায়েরা নাম রেখেছেন "মুন মুন"। কারণ ১৯৬৯ সালের ২১শে জুলাই চাঁদে মানুষ নেমেছে যেদিন, সেই রাত্রে উনি পৃথিবীতে এসেছেন। আরও গণ্ডা কতক ভাল মন্দ নাম আছে।

দাপট খুব। দাদু থেকে আরম্ভ করে বাড়ীর বাচ্চা চাকরটা পর্যন্ত সবাই তাঁর কাছে ধমক খায়। কিন্তু আশ্চর্য, তারা খেতে বসলে, দাঁড়িয়ে থেকে খাওয়ায়। সস্নেহে প্রশ্ন করে "পেৎ ভলেছে ত?" পেৎ মানে পেট।

সবাইকে খাওয়াতে খুব ভালবাসে বিষ্ণুমায়া।

তার নিজস্ব সম্পত্তি—"নোনো"। নোনো তাঁর প্রপিতামহী। নোনোর রাতের খাবার মিষ্টটুকু রোজ ক্ষুদে হাতে বয়ে আনে।

বিষ্ণুমায়ার স্কন্ধে মাঝে মাঝে মহিষাসুরমর্দিনী আবির্ভূতা হন। পাশের বাড়ীর ছয় বছরের সর্বাণী এসে যদি প্রপিতামহীর কাছে বসে, একটু গল্প করে, তবে অসহ্য! দূর থেকে তাকে ইসারা করে ডাকে। আড়ালে নিয়ে গিয়ে তাকে শাসিয়ে সতর্ক করে, "তুই যদি নোনোর সঙ্গে আর কথা বলবি, তবে তোকে খামচে দেব। কামড়ে দেব। এমন মাল্ মাল্‌ব যে কাঁদতে কাঁদতে পালাবি!"

সর্বাণী হাসতে হাসতে এসে নোনোর কাছে গোপনে রিপোর্ট দিয়ে পালায়।

প্রপিতামহী দাদুর নতুন-কাকীমা। দাদু নতুন মা বলে ডাকেন। দাদুর ছেলেমেয়েরাও তাই বলে। উনি কাচ বেলা থেকে প্রপিতামহীর ঘাড়ে চড়া মুরুব্বি হয়েছেন। এক বছর বয়স থেকে শর্টহ্যাণ্ডে নাম দিয়েছেন "নো-নো।"

"নো-নো"কে অত্যন্ত ভালবাসে। পাশাপাশি বাড়ীর ছেলেমেয়েরা এসে পাছে কেউ তার নোনোকে আত্মসাৎ করে সেই ভয়ে সর্বদা সতর্ক থাকে। কেউ বেশীক্ষণ নোনোর কাছে থাকলে তাকে স্পষ্ট বলে, "যা, এবাল বালী যা।"

অর্থাৎ "যা, এবার বাড়ী যা।"

অনেক খোঁজ খবর নেওয়া হোল্।

আজকের দুর্ঘটনার হেতুটা বোঝা গেল।

১৯৭১ সালের বাংলাদেশের যুদ্ধ সম্প্রতি শেষ হয়েছে। ক'দিন আগে পাক-সেনাপতি কিছু-কম লাখ খানেক সৈন্য-সামন্ত ও পাহাড় প্রমাণ অস্ত্রশস্ত্র সহ আত্ম-সমর্পণ করেছেন।

রেডিওতে খবর প্রচার হবা মাত্র আসানসোলের স্থানীয় ছেলেরা মহোল্লাসে বাড়ীর সামনে তেমাথার মোড়ে মাইক বসিয়ে রাত আড়াইটা পর্যন্ত গান-বাজনা করেছে। পরদিন বৈকালে ইয়াহিয়া খাঁ ও জনাব ভুট্টোর মূর্তি গড়ে মিলিটারী পোশাক পরিয়ে, বিরাট শোভাযাত্রা সহ ব্যাণ্ড বাজিয়ে পথে পথে ঘুরিয়ে মহাসম্মানে অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া করেছে।

বৈকালে ঘুম থেকে উঠে, বিষ্ণুমায়া তন্ময় হয়ে সে শোভাযাত্রা দেখেছে। অতএব ইয়াহিয়া খাঁকে সে চিনে নিয়েছে।

পরদিন প্রাতঃকালে এক ফুলঝাঁটা, দু হাতে উঁচু করে ধরে তুড়ুক তুড়ুক করে নাচতে নাচতে প্রপিতামহীর ঘরে আবির্ভূত হলেন।

প্রপিতামহী চমকিত। কি ব্যাপার?

ঝাঁটা দেখিয়ে প্রপৌত্রী ঠাকুরাণী গম্ভীর মুখে বললেন "এতা, ইয়াইয়া খাঁ।"

প্রপিতামহী সানুনয়ে বললেন "ছি, বলতে নেই। ভগবানের জীব।"

প্রপৌত্রী দমবার পাত্রী নয়। দু হাতে ঝাঁটা উঁচিয়ে ঘর ময় নেচে বেড়াতে লাগলেন। মুখে নানা শব্দের অনর্গল আবৃত্তি। যেন তাঁর "ছড়া ছবির" বই পড়ছেন।

বাড়ীর মধ্যে প্রাণতুল্য প্রিয়পাত্র—দাদু। তারপর পর্যায় ক্রমে পিতামহী "আম্‌মা",—পিসীমায়েরা, নোনো, আর ঝি-চাকররা এবং মেথরাণী ও তার বাচ্চা ছেলেটি।

সকালে দাদুর স্কন্ধে উঠে পাড়া পর্যটন, নিত্যকর্ম। তারপর নোনোর কাছে গিয়ে পঞ্জিকা খুলে ঠাকুর দেবতা দর্শন। ছবিতে কার্তিক ঠাকুর ময়ূরের গায়ে ঠেস দিয়ে বসে আছেন। অতএব ইনিও কার্তিক ঠাকুরের মত "নোনো"র গায়ে ঠেস দিয়ে বসে থাকতে ভালবাসেন।

একদিন রান্নাঘরে প্রপৌত্রী ঠাকুরাণী বসে নোনোর খাওয়া দেখছিলেন। আম্‌মাও সেখানে ছিলেন। কথায় কথায় নোনো বললেন, "কার্তিক ঠাকুরের মত মুনতু আমার গায়ে ঠেস দিয়ে বসে থাকতে ভালবাসে। আমি মুনতুর ময়ূর। মুনতু আমার কার্তিক ঠাকুর।"

প্রপিতামহী আদর করে ওকে মুনতু বলতেন। তাঁর মন্তব্য শুনে যজ্ঞেশ্বর মাঝখান থেকে রসিকতার সুরে বললে "ময়ূর নয়। নোনো—অসুর।"

দেবদেবীদের এবং তাঁদের বাহন ও শত্রুগুলির পরিচয় মুনতু উত্তম রূপে চিনেছে। মা দুর্গার অসুর তার অপরিচিত নয়। সেই অসুরকে নোনো বলা!

বিনা বাক্যে মুনতু লাফিয়ে উঠল। জানালা থেকে রান্নাঘরের পাখাটা টেনে নিয়ে এক লাফে যজ্ঞেশ্বরের পিছনে হাজির।

কেউ কিছু বোঝার আগেই যজ্ঞেশ্বরের মাথায় সশব্দে পাখার বাঁটের এক ঘা।

বেচারা যজ্ঞেশ্বর মেঝেয় বসে হেঁট হয়ে ভাত বাড়ছিল। চমকে উঠে হাঁ হাঁ করে পাখাটা কেড়ে নিলে। নিরস্ত্র মুনতুর মনে পড়ল তার নোখ আছে। দাঁত আছে।

হাঁ করে যজ্ঞেশ্বরের পিঠের উপর ঝুঁকে পড়ল। উদ্দেশ্য, কামড় দেওয়া।

আম্‌মা, নোনো বাধা দেওয়ার জন্য চেঁচিয়ে উঠলেন। বালক ভৃত্য জগদীশ ছুটে এসে ছোঁ-মেরে মহিষমর্দিনীকে শূন্যে তুলে নিয়ে দে-ছুট।

মুনতু রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে সগর্জনে বললে "নোনোকে ওচুল বল্‌বি না।"—"অসুর বলবি না।"

জগদীশ পর মুহূর্তে রাস্তায়। মোটর, বাস, ট্রাক, লরীর ছুটোছুটির ভিড়ে মুনতুর রাগ জল হয়ে গেল।

মস্ত গুণ। যতই রাগ হোক, যতই জেদ ধরুক, চট করে ভুলে যায়।

অনেক কষ্টে জোজো সে যাত্রা ক্ষমালাভ করলে।

দিন কতক পরের কথা।

যজ্ঞেশ্বর ছুটি নিয়ে বাড়ী গিয়েছিল। দশদিন পরে ফিরেছে। রাত তখন ন'টা। মুনতুর ঘুমের সময়

হয়েছে। মা ঘুম পাড়াবার জন্য ডাকাডাকি করছেন। কিন্তু উহুঁ। এখন যাবে কি? দশদিন জোজোকে দেখে নি। খুব মন কেমন করেছে। অতএব তার কোলে চেপে গলা জড়িয়ে ধরে প্রশ্নের পর প্রশ্ন চালাচ্ছে, "তুই কি খেয়ে এলি? তোর মা কি রেঁধেছিল?..." ইত্যাদি।

জোজো বিব্রত। এত বড় পাকা গিন্নীকে সে কি করে থামাবে? ভুলিয়ে ভালিয়ে নিজের ঘরে নিয়ে গেল।

যজ্ঞেশ্বরের সংগ্রহশালায় অনেক সিনেমার ছবি আছে। অনেক ফটো আছে। সেগুলা দেখতে দেখতে মুনতু মুগ্ধ মোহিত। সাগ্রহে প্রস্তাব করলে, "জোজো, তোর কাছে দড়ির খাটিয়ায় আমি আজ ঘুমুব।"

দশদিনের পর জোজো বাড়ী থেকে এসেছে। মুনতুর বাৎসল্য-স্নেহটা খুব প্রবল হয়ে উঠেছে।

অবশ্য দাদুর কাছে, নোনোর কাছে শুয়ে ঘুমোবার ইচ্ছা প্রায়ই হয়। মা ধরে বেঁধে দোতলায় নিয়ে যান। সেজন্য প্রায়ই এক ঝলক কাঁদতে হয়।

আজ ও কাদতে হোল।

জোজো ভাত খেতে গেল। অদর্শনের শোকে কান্নার ঝোঁকটা খুব বেড়ে উঠল। শুধু মা নয়, আম্মা নয়, স্বয়ং দাদু এসে বুকে করে ভোলাবার জন্য কত চেষ্টা করলেন, কিছুতে থামল না। সাইকেল রিকশায় চাড়িয়ে সেই রাত্রে পথে পথে তাকে নিয়ে দাদু ঘুরলেন। তবু কান্না থামে না। দাদু হিমসিম খেয়ে গেলেন।

অপরিসীম শোকাবেগ!

বেড়িয়ে এসেও আবার কান্না। "জোজোর ঘরে দড়ির খাটিয়ায় ঘুমুব।" এক বায়না চলল।

মা ক্রুদ্ধ হয়ে শাসালেন, "যাও, জোজোর ঘরে দড়ির খাটিয়ায় পড়ে ঘুমোও গে। আমি আর কোনদিন তোমাকে কাছে নিয়ে ঘুমোব না।"

তবু বিষ্ণুমায়ার মায়াজাল ছিন্ন হোল না।

বাড়ী শুদ্ধ লোক ব্যস্ত বিব্রত।

প্রপিতামহী ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। কান্নার শব্দ শুনে তাঁর ঘুম ভাঙল। উঠে এলেন। ব্যাপার দেখে শুনে হতভম্ব।

এক পাশে বসে বিষ্ণুমায়ার কাণ্ড দেখতে লাগলেন।

দাদু নাস্তানাবুদ হয়ে নাতনীকে সামলাতে সামলাতে বললেন "তুমি ঘুমোও গে নতুন মা। রাত জেগো না।"

দাদু ডাক্তার মানুষ। ব্লাড প্রেশারের রোগী নতুন মাকে সাবধানে আগলে রাখেন।

নতুন মা কাতর কণ্ঠে বললেন, "যাচ্ছি বাবা। কিন্তু আমার মুনুকে এত রাগিয়ে দিলে কে? এত রাগ ভাল নয়। কাঁদতে কাঁদতে বমি করে ফেলবে যে! কান্না থামুক আগে।"

আম্মা—অর্থাৎ মুনুর পিতামহী বললেন, "ও ঝোঁক ধরেচে জোজোর ঘরে গিয়ে, দড়ির খাটিয়ায় শুয়ে ঘুমুবে।"

নিরীহ ভাবে নতুন মা বললেন, "বেশ ত। যাক না। কিন্তু হয়ত খাটিয়ায় ছারপোকা আছে। সারা রাত কুট কুট করে কামড়াবে। মুনু ঘুমুতে পারবে না। তা ছাড়া খাটিয়ায় 'মাকা' থাকে ত। তারা সুড়সুড় করে মুনুর মুখে চোখে ঘুরে বেড়াবে। তখন?"

"মাকা"—অর্থাৎ মাকড়সা। মুনুর পরম প্রিয় দুই সম্ভঃ গ্র্যাজুয়েট পিসীমা সব বিষয়ে অকুতোভয়। কিন্তু দেয়ালে একটা "মাকা" দেখলে তিন লাফে ঘর ছেড়ে পালান। চাকররা এসে "মাকা"টা মারলে তবে সুস্থ হন।

অতএব? কিছু না বুঝেই মুনু "মাকা"কে ভীষণ খাতির করে। হকচকিয়ে গেল। ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে সকলের মুখের দিকে তাকাতে লাগল।

অধিকতর করুণ কণ্ঠে নতুন মা বললেন "হাঁরে মুনুয়া, তুই সেদিন 'মেলে মেলে' জোজোকে 'ইয়াহিয়া খাঁ' করতে চেয়েছিলি, নয়? সেই জোজোর দড়ির খাটিয়ার জন্যে আজ তোর এত শোক।"

চকিতে মুনতুর কান্না স্তব্ধ। আশ্চর্য হয়ে নোনোর দিকে চেয়ে রইল। মনে পড়ল ইয়াহিয়া খাঁর প্রতি-

মূর্তি গড়ে কেমন করে বাঁশের ডগে বসিয়ে সাজিয়ে গুজিয়ে, ব্যাণ্ড বাজিয়ে ছেলেরা শোভাযাত্রা করে কবর দিতে নিয়ে গেছল, সেই অপরূপ বর্ণাঢ্য দৃশ্য।

মনে পড়ল, পরদিন সকালে সেই অনুকরণে মুনতু নিজে এক ফুল-ঝাঁটা উঁচু করে ধরে নাচতে নাচতে নোনোর ঘরে গিয়ে সস্মিত মুখে পরিচয় দিয়েছিল, "এত্তা ইয়াইয়া খাঁ।"

চাকি কেড়ে নেওয়ার জন্য তাই ত দুর্দান্ত জোজোকে মেরে ধরে ইয়াহিয়া খাঁ বানাবার সদিচ্ছা—মনে জেগেছিল। সিনেমাভক্ত জোজোর ঘরের সিনেমার ছবিগুলো যতই সুন্দর লোভনীয় হোক, দড়ির খাটিয়াটা নিশ্চয় আহামরি গোছের আরামদায়ক পদার্থ নয়। সেটার জন্য কান্নাকাটি করে এই রাত্রে দাদুকে নাস্তানাবুদ করা সুবিবেচনা নয়।

মুনতু কান্না ভুলে গেল। ভাবনায় পড়ল।

জোজোকে কদিন দেখতে না পেয়ে খুবই মন কেমন করেছিল। সে কথা ঠিক। কিন্তু জোজোও সব সময় সুবিধার মানুষ নয়। চাকি যে কেড়ে নেয়। সে ইয়াহিয়া খাঁর মতই দুর্দান্ত।

ফোঁপানি বন্ধ হোল। হাত পা ছোঁড়া বন্ধ হোল। কান্না তৎক্ষণে সম্পূর্ণতম রূপে বন্ধ।

জোজো খেয়ে এসে আবার মুনতুকে কোলে নিল।

কিন্তু মুনতুর আর সেজেগুজে কাঁদতে বসার উৎসাহ নেই। দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মুখে নোনোর দিকে একটু চেয়ে থেকে বললে "ঘরে যান।"

রাত্রের দিকে নোনো ঘর থেকে বেরিয়ে এলে, দাদু ব্যস্ত হন। বাত, ব্লাড প্রেশার বার্ধক্যগ্রস্ত অপটু বৃদ্ধা পাছে কোথাও পড়ে যান, পাছে হাত পা ভাঙেন, সেজন্য সবাই সন্ত্রস্ত থাকেন। মুনতুও তাই শিখেছে। রাত্রে তাকে বেরুতে দেখলেই ব্যস্ত হয়ে বলে "ঘরে যান।" অর্থাৎ ঘরে যান।

বোঝা গেল এবার মুনতু ওরফে বিষ্ণুমায়া ওরফে দেববর্ণা, ওরফে মুন্ মুন্ ঠাকুরুণ, শান্তসু হয়েছেন।

মা এসে তাকে দোতলায় নিয়ে গেলেন। দাদু নিজের বিছানায় গেলেন। নোনো ও অপর সবাই যে যার ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লেন।

জিদটা বেশ শক্তিশালী বটে! এই জিদটা মুনতু যদি সুবিবেচনার সঙ্গে পরবর্তী জীবনে কোনও ভাল কাজে লাগায়, কিংবা লেখাপড়া শেখার ঝোঁকে নিয়োজিত করে, তবে ওর মোহড়া নেয় কে?

এই সব "জিদেল্" শিশুকে অভিভাবকরা ধৈর্যশীল হয়ে সদৃষ্টান্ত দেখিয়ে যদি সৎপথে চালনা করেন, তবে, এরা জীবনে অনেক—অনেক বড় হবে।

অন্যথা?

হে, মা মহিষাসুর-মর্দিনী। তুমি বিষ্ণুমায়াদের স্কন্ধে আরূঢ় হয়ে, জগতের অনিষ্টকারী গণ্ডা গণ্ডা ইয়াহিয়া খাঁদের দমন কর। পৃথিবীতে শান্তি স্থাপিত হোক।

পরদিন সকালে দেখা গেল, বিষ্ণুমায়া এক মাসিক পত্রিকা খুলে মাননীয়া প্রধান মন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সুন্দর মূর্তিটি দেখছেন। সাদরে ছবির মুখে হাত বুলিয়ে সকৌতুকে সাধের সুরে বলছেন—

"এই মেয়েতা, এই মেয়েতা
আমাদেল বালী যাবি?
এক পয়সাল ছোলা দেব
বচে বচে তাবি?"
অর্থাৎ বসে বসে খাবি?

পরীক্ষা ঘরের আবোল তাবোল

পরিমল গোস্বামী

॥ ৪ ॥

এবারে কিছু অনুবাদের বৈচিত্র্য দেখানো যাক। একটা ইংরেজী অংশ ছিল (১৯৪৯) এই রকম—

God did not create us to eat drink and be merry, but to earn our bread by the sweat of our brow. There should be no dearth of work in our country; when we have 30 crores of living machines, why should we depend on the dead ones...

যে অনুচ্ছেদটি দেওয়া হয়েছিল এটি তার প্রথম অংশ। আমি এইটুকুই মাত্র উদ্ধৃত করছি কারণ এই কথাগুলিই পরীক্ষার্থীদের কাছে দুর্বোধ্য ঠেকেছে বেশি। বিভিন্ন নমুনা ;

১। কিন্তু তিনি সুন্দর ক্ষেত্র দ্বারা খাদ্য উৎপন্ন করিতে নিযুক্ত করিয়াছেন। আমাদের দেশে নিশ্চয় কোন খারাপ কাজ নাই। যখন আমাদের ৩০ হাজার জগতে বাঁচিবার আছে তখন কেন আমরা একজনের মৃত্যুর উপরে নির্ভর করিব ?

২। যখন আমাদের জীবন ধারণের ৩০টি উপায় আছে সেখানে আমাদের দেশে কাজের ভয় নাই। কেন আমরা মৃত ব্যক্তির উপর নির্ভর করিব ?

৩। ঈশ্বর আমাদিগকে খাদ্য পানীয় শক্তি বুদ্ধি বিশ্রাম শান্তি এই সমস্ত জিনিস আমাদের দিয়াছেন। আমাদের দেশে কাজের জোগাড় করিয়া দিয়াছেন। যখন আমরা ৩০ ক্রোরেসে মেসীন চালনা করি একমাত্র মৃত্যু নিকটবর্তী হয় কেন ?

৪। আমরা আমাদের অন্ন সুমিষ্ট দ্বারা সংগ্রহ করিব। আমাদের চাকরির অভাব নাই আমাদের যখন ৩০ কোটি টাকার কলকব্জা রহিয়াছে তখন একজনকে কেন মরিতে দিব ?

৫। আমাদের দেশে যখন ৩০ লাখ কলকারখানা স্থাপিত হইয়াছে তখন কেন আমরা বেকার হইয়া মরণের পথে যাইব ?

৬। আমাদের দেশের কার্য্যের মধ্যে কোন প্রিয় অংশ না থাকিলেও যেখানে ৩০ কোটি সজীব মানুষ রহিয়াছে...।

৭। আমাদের ৩০ ক্রোশ জীবন্ত ইঞ্জিন রহিয়াছে।

৮। ঈশ্বর আমাদের ক্রন্দনস্তে জীবিকা অর্জন করিতে বলিয়াছেন।

৯। ঈশ্বর আমাদের জন্য খাদ্য সৃষ্টি করে নাই, শুধু পানীয় জল এবং ভুট্টা দেয়। কিন্তু আমাদের জন্মের জন্য রুটির দ্বারা sweat হইতে brow হয়। আমাদের দেশে কার্যের জন্য dearth করা উচিত নহে।

১০। যখন আমাদের বয়স ৩০ বৎসরের উপরে উঠিবে, তখন আমাকে ভাবিতে হইবে মরণ নিকটবর্তী।

১১। যখন আমরা ৩০ কোটি টাকার মালিক হইব তখন অন্যের টাকার উপর কেন নির্ভর করিব ?

১২। ভগবান আমাদিগকে জলপান ও বিবাহ করিবার জন্য সৃষ্টি করে নাই। আমরা যখন ৩০ ক্রোশ তফাতে মেশিনে বাস করিতাম তখন আমরা মৃত্যুর উপর নির্ভর করিতাম না।

১৩। আমাদের দেশে কোন মাদী ঘোড়ার কাজ নাই। (There should be no dearth of work থেকে এ অনুবাদ কি করে সম্ভব হল বোঝা যায় না।)

১৪। ভগবান আমাদিগকে দিব্য চক্ষু দিয়াছেন (sweat of our brow এর বাংলা দিব্য চক্ষু।) যখন আমাদের ৩০ ক্রোশের মধ্যে জীবিকা উপার্জনের কল আছে।

১৫। আমরা শতকরা ৩০ জন লোক মেশিনের কাজ করিয়া বাঁচিয়া আছি।

নানা ছাত্রছাত্রীর এই সব অনুবাদ থেকে বোঝা যায় sweat শব্দটিকে অনেকে sweet মনে করে কেউ লিখেছে 'সুন্দর', কেউ লিখেছে 'সুমিষ্ট' কেউ বা 'প্রিয়'। আবার ঐ ইংরেজী sweatকে swift মনে করে লিখেছে 'দ্রুত'। একজন merryকে marry মনে করে লিখেছে 'বিবাহ'। crores কে কেউ ভেবেছে 'ক্রোশ' কেউ 'লাখ', কেউ লিখেছে 'বৎসর' আবার একজন লিখেছে কোরেশ, একজন লিখেছে 'হাজার', একজন লিখেছে 'উপায়'। এ ছাড়াও নানা রকমের আছে, সব দেওয়া সম্ভব হল না। অন্য অনুবাদের নমুনা দেখা যাক। দ্বিতীয় অনুবাদটি ছিল এই—

A well-educated gentleman may not know many languages—may not be able to speak any but his own—may have read very few books. But whatever language he knows, he knows precisely ; whatever word he pronounces, he pronounces rightly. An uneducated person may know, by memory, many languages, and talk them all, and yet truly know not a word of any—not a word even of his own. The turn of expression of a single sentence will at once mark a scholar. A false accent or a mistaken syllable is enough to mark a man as inferior for ever.

বিভিন্ন অনুবাদের নমুনা—(অংশ বিশেষের)

১। একজন উচ্চশিক্ষিত ভদ্রলোক বেশী কথাও বলতে পারে না, নিজের সম্বন্ধে কিছু খোঁজও রাখে না। একজন অশিক্ষিত লোক কথাও বলতে জানে না, ভদ্র ব্যবহারও জানে না, সত্য কথাও বলে না।

২। তাহারা একজন বড় শিক্ষয়িত্রী অপেক্ষা একটি সাধারণ বাক্যকে ঘুরাইয়া বলিতে পারিত।

৩। বাদ পড়া অথবা ভুল হওয়া এমন একটি শব্দ সংশোধন করা উচিত যাহা মানুষকে চিরকালের জন্য কষ্ট দেয় কিন্তু কি ভাষা তিনি জানিতে পারেন সে জানে প্রয়নছুয়েহন সে জানে প্রোনাউন ঠিক। একজন শিক্ষিত ব্যক্তি জানিলেও জানিতে পারেন শ্রীতের (স্মৃতির ?) দ্বারা অনেক ভাষা।

৪। একটা ভাল শিক্ষিত ভদ্রলোক অনেক বই পড়ে অনেক কিছু ভাষা অর্জন করেছেন, কিন্তু নিজে একটি বাক্য তৈয়ারি করে বলতে পারে না। শুধু উচ্চারণের শক্তিটুকু তার আছে। একটা অশিক্ষিত লোক উচ্চারণ করিতে না জানিলেও নিজের মস্তিষ্ক দ্বারা তৈয়ারি করিয়া বলিতে পারে—যদি তাহারা একটা বাক্যের অংশ বাদ দেয় তাহা হইলে তাহাদের মারাত্মক ভুল এবং মর্যাদার হানি হয় না।

৫। যদি সে একটা সোজা বাক্যের পরিবর্তন করিতে পারে তবে তখনই সে একটা বৃত্তি নম্বর পাইবে। (scholar scholarship এবং mark-এর বাংলা নম্বর !)

৬। কোন বাক্য বদলাইবার সময় তৎক্ষণাৎ পণ্ডিতের দরকার হয়।

৭। যখন তাহার একটি অংশের অভিজ্ঞতা হইতে তৎক্ষণাৎ সে নম্বর পাইয়া বৃত্তি পাইবে।

৮। অজ্ঞ ব্যক্তিরা চিরকাল ভুল করিয়া থাকে এবং চিরকাল তাহারা মানুষের পদতলে পড়িয়া থাকে।

অন্য আর দু-একটি অনুবাদের দৃষ্টান্ত এক-একটি অংশরূপে দেওয়া হচ্ছে। যথা—

The general outlook on life and temperament seems to be very much akin.

১। জীবনের বাহিরের দৃশ্য এবং প্রকৃতির দৃশ্য দেখিতে অতি চমৎকার।

২। তাহার ক্ষণস্থায়ী জীবনের উপর সাধারণ বহির্দৃষ্টি অতি চমৎকার দেখায়।

৩। সাধারণ জ্ঞানে আমি সকল জিনিস বুঝতে পারি।

৪। সেনাপতির আচার ব্যবহারে মনে হয় তিনি খুবই আনন্দিত ছিলেন।

৫। সেনাপতি আমাদের জীবনের প্রতি লক্ষ্য রাখেন এবং উত্তাপ অত্যন্ত অসহ্য বলিয়া বোধ হয়।

৬। সৈন্যাধ্যক্ষরা তাহাদের জীবন উপেক্ষা করে এবং তাহাদের আচরণ পরিচিত বলিয়া মনে হয়।

অনেকেই general অর্থে সেনাপতি সেনাধ্যক্ষ বুঝেছেএবং general knowledge কথাটি জানা থাকাতে সাধারণ জ্ঞান বুঝেছে। কিন্তু outlook ও temperament বহির্দৃশ্য ও উত্তাপ মনে করা স্বাভাবিক, কারণ temperature কথাটা জানে। কিন্তু এ রকম অনুবাদে ছাত্রদের সে খুব দোষ আছে মনে হয় না। বাংলা দ্বিতীয় পত্রের প্রশ্নে ইংরেজী থেকে অনুবাদ করতে বলা হয় বাংলা থেকে ইংরেজী বেশি জানে কি না তা পরীক্ষার জন্য অবশ্যই নয়। কিন্তু যে সব ইংরেজী বাক্যের নমুনা দেওয়া গেল তা একজন প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীর পক্ষে অবশ্যই কঠিন বোধ হবে, কারণ এই মানের ইংরেজী তাকে শেখানো হয়েছে কি না সন্দেহ।

The general ontlook on life and temperament seems to be very much akin—

এই বাক্যের যে অর্থ, বি-এ পরীক্ষার্থীর পক্ষে হয় তো বোঝা অপেক্ষাকৃত সহজ হতে পারে, কিন্তু আমার নিজের ধারণা এই স্ট্যাণ্ডার্ডের চিন্তাই তাদেরও অধিকাংশের পক্ষে সম্ভব নয়। এবং যদিও খুব অল্প সংখ্যক স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার্থীর পক্ষে এর প্রকৃত অর্থ লেখা সম্ভব হয়েছে. তাদের ব্যতিক্রম বলে ধরা যেতে পারে। বাংলায় কেমন অনুবাদ করতে পারে তা পরীক্ষার জন্য উঁচু মানের জটিল ইংরেজী বাক্য দেওয়া সমীচীন মনে হয় না। পূর্বের অনুবাদটি আরো বেশি কঠিন।

অবশ্য শিক্ষার মান বর্তমানে এত নিচে নেমে গেছে যে অনেক পরীক্ষার্থী সহজ ইংরেজী বাক্যেরও অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না এমন দৃষ্টান্ত আছে। আমি একটি অনুচ্ছেদ এখানে তুলে দিচ্ছি—এবং এর সঙ্গে অনুবাদও।

My time in Persia is coming to an end. I have not been here for long, yet I do not feel like a stranger. It is surprising that though I do not know your language, somehow I have come very close to you, and can easily communicate with you and feel the warmth of your friendship.

এর অর্থ মোটামুটি একজন স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার্থীর বোঝা উচিত। কিন্তু একটি নমুনা দেখলে হতাশ হতে হবে—

পার্সিয়াতে আমার শেষ সময় হইয়াছে, আমি এখানে বেশী দিন থাকিতেছি না। এই সমস্ত আমি মোটেই পছন্দ করি না। তোমার অকৃত্রিম ভালবাসা কিরূপ তাহা আমি জানি না। আমি আমার অমূল্য সময় নষ্ট করিতেছি।

অন্য আর একটি অনুবাদ থেকে একটি বাক্য তুলে দিচ্ছি—

It seems that a young lady has arrived in a state of excitement, who insists on seeing me.

উল্লেখযোগ্য এই যে, state কে কেহ রাষ্ট্র, কেহ দরবার, কেহ রেল স্টেশন মনে করেছে। অনেকে ঠিকই বুঝেছে। নমুনা—

১। একজন যুবতী উত্তেজিত হইয়া রাষ্ট্রে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন।

২। একটি ভদ্রমহিলা এসেছেন রাষ্ট্রকে উত্তেজিত করতে।

৩। যুবতী উত্তেজনার বশে আমাকে দেখিতেছে।

৪। একটি সুন্দরী বালিকা একটি নগরে (state এখানে নগর রয়েছে) উত্তেজিত অবস্থায় ঢুকিয়াছেন।

৫। আমার মনে হয় অল্পবয়স্কা একজন মহিলা প্রচুর আবেগ লইয়া আসিয়াছেন।

৬। আমার মনে হয় যে, একটি যুবতী রাষ্ট্রে নামিয়াছিলেন, যিনি আমাকে দেখিয়া চিনিতে পারিয়াছিলেন।

৭। মনে হইল এক ভদ্রমহিলা উত্তেজিত অবস্থায় রাষ্ট্র অতিক্রম করিয়াছে।

৮। মনে হচ্ছে একটি যুবতী রাষ্ট্রদ্বারা আক্রান্ত।

৪। আমার ভাইবোনেরা আমাকে বলিল যোগ্যতা অনুসারে আমি তোমাকে চারিগুণ দিয়াছিলাম।

৫। আমার ভাই ও ভগিনীরা আমাকে বলিয়াছিল চারবারের জন্য তাহাকে দিবে, ইহাই ইহার যথেষ্ট দাম।

৬। ...বলিল যদি ইহার যথার্থ মূল্য হইত তাহা হইলে তাহারা চারগুণ সহ্য করিত।

৭। সেটি চারবার করিয়া দেখিয়া দ্রব্যটি ভাল নয় বলিয়া আমাকে এমন বিদ্রূপ করিল যে আমি কাঁদিয়া ফেলিলাম।

৮। যদি তাহাদিগকে চারবার দেই, তাহারা আমাকে ইহার মূল্য দিবে।

৯। আমি চারঘন্টার জন্য গিয়াছিলাম। ইহা বহু সময় হইয়াছিল।

১০। ...বলিতে লাগিলেন আস্ত পাগল, কেন যে আমি পাগলামি করিতেছি, এবং আমার পাগলামি দেখিয়া হাসিতে লাগিল।

১১। আমার বোকামির জন্য তাহারা হাসিত এবং আমি শৃগালের মত চীৎকার করিয়া উঠিতাম। (vexation=vixen=শৃগাল)।

১১। আমার ভাই এবং বোন আমাকে বাঁশীর জন্য মূল্য দিতে রাজি ছিল। তাহারা হাসিলে আমি গর্ব অনুভব করিতাম।

এরপর

অন্য অনুবাদের নমুনা দেবার আগে কিছু ব্যাকরণ ও বাক্য গঠনের বৌচত্রে প্রবেশ করা যাক। এর সঙ্গে কিছু প্রবন্ধ গল্প পরিচয়ও আছে।

১। যাহা সহজে ভাঙে এক কথায় কি—এবং সেই কথা দিয়ে বাক্য রচনা: উত্তর—ভঙ্গুর। যথা, অন্যের বিপদ দেখিয়া মুখ ভঙ্গুর করা উচিত নয়।

২। রোগে তাহার শরীর ভঙ্গুর পরিণত হইয়াছে।

৩। দেশের লোক খাদ্যের অভাবে জীর্ণভাত অবলম্বন বাধ্য হইতেছে।

৪। বাঘা যতীন আমাদের বাংলাদেশে মুখর ব্যক্তি ছিলেন।

৫। বর্গের প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণকে অল্পপ্রাণ বর্ণ বলে, যথা—আমাকে মারিও না।

৬। নিধান—যে খেতে একটিও ধান নাই।

৭। ঠোঁটকাটা—সতীশবাবুর ছেলে সকলের সাক্ষাতে ঠোঁট কাটিয়া কথা বলে।

৮। যাহার পত্নীবিয়োগ হইয়াছে—বিধবা।

৯। যাহার পত্নীবিয়োগ হইয়াছে—স্ত্রৈণ।

১০। পোয়াবারো ভেবে আর কি হবে, যেমন করে হোক দেনা শোধ কর।

১১। অন্নপূর্ণা বিন্দুর আসন্ন ফিট হইতে বাঁচাইবার জন্য যে ঔষধ বাহির করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার সতীত্বের পরিচয় পাওয়া যায়।

১২। নন্দকুমারের মৃত্যুতে কলিকাতায় মহা আনন্দ পড়িয়া গেল।

১৩। (দেনাপাওনা) শ্বশুরবাড়ীতে নিরুকে বাকি টাকার জন্য দিন দিন টোটকা মারিতেই থাকে।

১৪। (জীবিত ও মৃত) কাদম্বিনীর এখন মানুষ বলিয়া দাবী নাই। সে এখন পেত্নী।...সে বাটিদ্বারা করাঘাত করিল।

১৪। কাদম্বিনী ভাবিল আমি এখন শয়তান হইয়া গিয়াছি।

১৬। শাশুড়ীর কাছে নিরুপমা শরশয্যা হইয়া পড়িলেন।

(মূল দেনা-পাওনা গল্পে আছে: নিরুপমার পক্ষে তাহার শ্বশুরবাড়ি শরশয্যা হইয়া উঠিল। কিন্তু লেখার সময় যেটুকু মনে পড়েছে তাই লিখেছে।)

১৭। যে নিরুপমা খাওয়া দাওয়া এবং শরশয্যার সময়েও একমুঠো অন্ন পাইত না...। (শরশয্যা মানে শয্যাগ্রহণ।)

১৮। নিরুপমা দরজার দোর খুলিয়া শুইত।

১৯। নিরুপমার স্বামী ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদে অভিযুক্ত হইলেন।

২০। রামসুন্দর বুকের ভিতর হইতে তিনখানি পঞ্জর বাহির করিলেন।

(মূলে আছে, পঞ্জরের তিনখানি অস্থির মতো সেই তিনখান নোট...)

২১। সেই তিনখানি নোটকে বুকের পাঁজরের ভিতর লইয়া রামসুন্দর বেহাই বাড়ীতে চলিলেন।

একপদে পরিণত করার আরো দৃষ্টান্ত

১। যে আপনাকে পণ্ডিত মনে করে—দাম্ভিক।

২। " " "—মূর্খ।

৩। যাহাতে মজা আছে—সুস্বাদু।

৪। যাহা পূর্বে কখনও শোনা যায় নাই—বীতস্পৃহ।

৫। " " " অবিমৃষ্য।

৬। যাহা সহজে ভাঙে—ভ্রূভঙ্গ।

৭। যে অগ্রে জন্মিয়াছে—অজাত।

৮। " "—অনুজ।

৯। জীবিত থাকিয়া মৃত—অজ্ঞান।

১০। " " "—নির্জীব।

১১। " " "—কাদম্বিনী।

অনুবাদ

He was a late riser as a rule—

১। সে ছিল একজন শাসনকর্তার মতন। (rule—ruler—শাসনকর্তা।)

২। সে একজন আইনজ্ঞ ছিল। (rule—ruler—lawyer—ধ্বনির কিছু সাদৃশ্য থেকে।)

৩। সে যথাসময়ে শয্যাত্যাগ করিত।

I do the same to you—আমি তোমাকে লজ্জা দিয়াছিলাম। (same—shame—লজ্জা!—অনেকে essকে sh উচ্চারণ করে, তাইতে same shame হয়েছে!)

ক্রমশঃ

মানকুমারী বসুর কাব্যকুসুমাঞ্জলি

শৈলেনকুমার দত্ত

বাংলা সাহিত্যে যেকজন মহিলা কবি কাব্য রচনায় প্রয়াসী হয়েছেন মানকুমারী বসু (১৮৬৩—১৯৩৩) নিঃসন্দেহে তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি তাঁর সুদীর্ঘ জীবনে মাত্র পাঁচখানি কাব্যগ্রন্থ রচনা করলেও রচনার উৎকর্ষ এবং কাব্যমূল বিষয়ে তাঁর রচনা শ্রেষ্ঠত্বের দাবী রাখে। তাঁর অন্যান্য রচনা বাদ দিলে কাব্যগ্রন্থগুলি হল—কাব্য কুসুমাঞ্জলি (১৮৯৩) কনকাঞ্জলি (১৮৯৬) বীরকুমার বধ (১৯০৪) বিভূতি (১৯২৪) এবং সোনার সাথী (১৯২৭)। কিন্তু কাব্য কুসুমাঞ্জলি তাঁর প্রথম এবং শ্রেষ্ঠ কাব্য। এই একখানি কাব্য গ্রন্থই তাঁকে অমর করে রাখার পক্ষে যথেষ্ট।

কাব্যকুসুমাঞ্জলি সব মোট উনসত্তরটি কবিতা নিয়ে ১৩০০ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থটি সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র এ গ্রন্থ পাঠ করে বলেছিলেন 'কবিতাগুলি সরল, সুমধুর ও সুপাঠ্য।' গ্রন্থটি পাঠ করে নবীনচন্দ্র সেন কবিকে লিখেছিলেন—আপনার সুললিত কবিতার অক্ষরে অক্ষরে আপনার সরল রমণী-হৃদয়ের কবিতামৃত প্রবাহিত, অক্ষরে অক্ষরে কল্পনার উচ্ছ্বাস, অক্ষরে অক্ষরে ভাবুকতার তরঙ্গ।

আলোচ্য কাব্যে গ্রথিত কবিতাগুলিকে মোটামুটি পাঁচটি ভাবে ভাগ করা যায়। ভগবদ্‌প্রেম, প্রকৃতিপ্রেম, দেশপ্রেম, ব্যক্তিজীবন এবং সমাজ বিষয়ক। বাংলা দেশের অপর দুই প্রখ্যাতা মহিলাকবির ন্যায় মানকুমারীকেও বৈধব্য জ্বালা সহ্য করতে হয়। নিঃসঙ্গ নিস্তরঙ্গ জীবনের সেই ধূসর মলিনতা তাঁর কাব্যেও যেন একটা ম্লান ছায়া বিস্তার করেছিল। সমাজের এই নির্মমতার বিরুদ্ধে তাঁর সবটুকু ঘৃণা, ক্ষোভ যেন উপচে পড়েছিল।

মনীষী রাজনারায়ণ বসু তাঁর এই কাব্যগ্রন্থ পাঠ করে গ্রন্থের শ্রেষ্ঠ নটি কবিতার কথা উল্লেখ করেছেন। রাজনারায়ণের বিচার এবং গুণানুসারে শ্রেষ্ঠ নটি কবিতা হল—ঈশ্বর, মা, শিবপূজা, ভাঙিও না ভুল, ভ্রমর, নীরবে, আসিব কি ফিরে?' একা এবং প্রিয়-বালা।

কাব্যকুসুমাঞ্জলির কবিতাগুলিকে মোটামুটি এইভাবে শ্রেণী বিভাগ করা যায়। ভগবদ্‌প্রেম পর্যায়ের কবিতা-গুলির মধ্যে—ঈশ্বর, শিবপূজা, ভাঙিও না ভুল, তুমি ত আমার, নরবলি ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। প্রকৃতি প্রেম পর্যায়ে পড়ে—অন্ধকার নিশি, উষা সমাগমে, প্রভাতি-চাতক প্রভৃতি। দেশপ্রেমমূলক কবিতা হল আমাদের দেশ ও সাধক। সমাজ বিষয়ক কবিতা পর্যায়ে কুলীন কুমারী, সহমরণ, পতিতোদ্ধারিণী, মহাযাত্রা, ভ্রমর, শোকোচ্ছ্বাস, শোকাতুরা মা, ভ্রাতৃদ্বিতীয়া, উচ্ছ্বাস, অভাগিনী, ঘটকালি প্রভৃতি উল্লেখনীয়। ব্যক্তিজীবন নিয়ে রচিত কবিতা হল আমার দেবতা, ভুল ভাঙা, সাধ, আমার শৈশব, পূর্বস্মৃতি, শুকতারা, পথিক, সাতক্ষীরায় অন্তিম প্রার্থনা, বসন্ত-সুহৃদ প্রভৃতি।

কবির জীবনে যত দুর্দশাই হোক, বিধাতার কাছে তাঁর

কোন নালিশ ছিল না। বিশ্বপিতার করুণা এবং অস্তিত্ব তিনি সর্বত্রই দেখতে পেয়েছেন। তাঁর উক্তিতেও সে স্বীকৃতি সুস্পষ্ট—

জগদীশ!

এ ভব-ভবন-মাঝে

যে দিকে যখন চাই,

তোমার করুণারাশি

কেবল দেখিতে পাই। (ঈশ্বর)

জীবনের নানা ঘাত প্রতিঘাত এবং বিপর্যয়ে কবি হয়তো বিশ্বপিতাকে সব সময় স্মরণ করতে পারেন নি। কিন্তু তাঁর আর্তি কল আজীবন ঐ চরণ মূলেই আশ্রয় লাভ। তাই তিনি প্রার্থনা জানিয়েছেন—

প্রভো! ভাঙিও না ভুল।

যে ক'দিন বেঁচে রব,

তোমারে আমারি ক'ব,

অন্তিমে খুঁজিয়া লব ও চরণমূল,

ভুলে যদি থাকি প্রভো! ভাঙিও না ভুল!

(ভাঙিও না ভুল)

মানকুমারী বসুর ভাষা এবং বর্ণনা এমন সাবলীল যে, সেখানে তাঁর অকপট অন্তরের শুচি শুভ্র মনোভাবই প্রতিবিম্বিত হয়েছে। চর্মচক্ষুর মর্মচক্ষুর একটা স্বাভাবিক বোঝাপড়া ছিল। তাই তাঁর বর্ণনা এত সরল। শিবপূজা কবিতার কবিকে তাই স্বাভাবিকভাবে বলতে শুনি—

দেখেছি বৈকুণ্ঠ ধামে,

নারায়ণ লক্ষ্মী বামে,

দেখেছি কমলাসনে উজল অনল,

গণিয়া একটি দু'টি

দেখেছি তেত্রিশ কোটি

দেখেছি গন্ধর্ব নাগ—স্বর্গ রসাতল,

এমন আপন ভোলা,

এমন পরাণ খোলা

এমন রজত গিরি—শ্বেত শতদল,

পবিত্র শঙ্কর কোথা দেখিনি কেবল।

তাঁর প্রকৃতিপ্রেমের কবিতাগুলি এদিক থেকে আরও রমণীয়। প্রকৃতির আকাশ-বাতাস নদ-নদী-প্রান্তর ফুল-ফল-পাখি সব কিছুই কবিকে মোহিত করেছে। তিনি অকপটে স্বীকারও করেছেন—

প্রকৃতি গো!

বিচিত্র তোমার লীলা সকলি সুন্দর

পলকে দেখাও কত যুগ-যুগান্তর।

(অন্ধকার নিশি)

তাই প্রকৃতির নানা বস্তুতে তিনি প্রভূত আনন্দ উপভোগ করেছেন। প্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন রূপে তিনি মোহিত হয়েছেন। বর্ষার আগমনে তিনি বলেছেন—

রাতদিন ঝম্-ঝম্

রাতদিন টুপ্-টুপ্

দেখেছি অনেকতর

দেখিনি তো এতরূপ।

(বর্ষা-সুন্দরী)

প্রকৃতির কোন তাৎক্ষণিক চিত্রও তাঁর চোখকে ফাঁকি দিতে পারে নি। প্রকৃতির পূজারী কবি সে সব দৃশ্যও সুন্দরতর করে চিত্রিত করেছেন তাঁর-কাব্যে। এমনি একটি চিত্র—

মধুর কাকলী মুখে

খেলিছ মনের সুখে

হেরি ও মাধুরী মরি নয়ন জুড়ায়।

(প্রভাতি-চাতক)

এই সব খণ্ড খণ্ড চিত্রগুলি তিনি কি অনায়াসভাবে চিত্রিত করতে পারতেন, স্থিতধী পাঠক মাত্রেই সেটি উপলব্ধি করতে পারবেন। তাঁর বর্ণনা যেমন নিখুঁত, ভাষা তেমনি মধুর। এমনি একটি মনোরম বিবরণ—

দেখেছি ফুটিতে ফুল কানন উজলি,

উষার আলোক মাখি,

মধুর গাহিত পাখী,
ছড়াইত শিশু-রবি কনক-অঞ্জলি;
দেখেছি সায়াহ্ন-কালে,
ভাঙা ভাঙা মেঘজালে
চাঁদের চাঁদনি নব উঠিতে উথলি,
দেখেছি মেঘের পাশে ছুটিতে বিজলী।

(অন্ধকার নিশি)

কবির এই স্বাভাবিক ভঙ্গিমাই তাঁর দেশপ্রেমমূলক কবিতা কটিতেও প্রস্ফুটিত। তাঁর উদার আহ্বান জানিয়েছেন কি অপরিসীম সারল্যে—

আমি চাই বিশ্বেদের উদার পরাণ
অভেদ খ্রীষ্টান হিন্দু,
দ্বেষ নাই এক বিন্দু
নিরখে জগতে ভরা এক ভগবান। (সাধক)

কবি-মনে তাই মানুষের অবিচারের আচরণ আঘাত দিয়েছে। 'আমাদের দেশ' কবিতায় তিনি নিঃসংকোচে একটি অপ্রিয়সত্য প্রকাশ করেছেন—

আমাদের দেশ ভাই! পার কি চিনিতে!
"সব ছোট আমি বড়,
আমারেই পূজা কর"—
এই কথা সেইখানে পাইবে শুনিতে;
দেখিবে সেখানে ভাই!
কাঙালেরে দয়া নাই,
"আমার" বলিয়া পরে পারে না ডাকিতে!

কাব্য কুসুমাঞ্জলি পাঠ করে রাজনারায়ণ বসু যে পত্র (৭ কার্তিক, ব্রহ্মশক ৬৪) লেখেন তার বক্তব্যটুকু এ প্রসঙ্গে খুবই মূল্যবান—"কবি যেমন হাস্য উদ্রেক করিতে পটু, তদপেক্ষা করুণ রসের উদ্রেক করিতে অধিক পটু। দেবতার প্রতি ভক্তিভাব, পিতামাতার স্নেহ, প্রেমাস্পদ ও প্রেমাস্পদার আন্তরিক প্রেমভাব, দরিদ্রের দুঃখজন্য বিষম আক্ষেপ, বালিকা বিধবার চিরবৈধব্য ও কৌলীন্যপ্রথা প্রচারের জন্য শোক প্রকাশ করিতে কবি যেমন সক্ষম, এমন অতি অল্পকবি বাংলা ভাষায় পাওয়া যায় বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না।"

মানকুমারীর কাব্যে করুণ রসের এত প্রাধান্য—এর মূলে আছে তাঁর জীবনের ঘাত প্রতিঘাত। মাত্র উনিশ বছর বয়সে বিধবা হয়ে তিনি আজীবন যে দুঃখকষ্ট সহ্য করেছেন তার প্রভাব প্রতিটি কবিতার ছত্রে ছত্রে—

পোড়া কপালের ভোগ ভুগিলাম ঢের
মানব জীবন ছাই বড় বিষাদের!

নিজের জীবন দিয়ে তিনি যে কষ্টের মধ্যে কাব্য সাধনা করেছেন, তার মধ্যেও তাঁর সে সংশয় কাটেনি। অন্যত্র বলেছেন—

আমি যদি সোনা ধরি
ছাই হয় ভয়ে মরি।
কপাল এমনি পোড়া দীন অভাগার!

(কনকাঞ্জলি)

বাঙালি বিধবার মর্মান্তিক জীবন এবং কৌলিন্যপ্রথা তাই তাঁর চোখে অন্যরূপে দেখা দিয়েছে। তিনি বলতে দ্বিধা করেন নি—

শাস্ত্রের দোহাই দিয়া বালিকা চিবায়।

বাঙালি মহিলার জীবনের সব সুখ স্বাচ্ছন্দ্য স্বামীকে কেন্দ্র করে থাকে। স্বামীর মৃত্যুতে সব সুখ শেষ হয়। তাই এই ক্ষণস্থায়ী জীবনকে কবি সুখের বলে মনে করতে পারেন নি। তাঁর ভাষায়—

মানব জীবন ছাই বড় বিষাদের—
দুটো কথা না কহিতে,
দুটি বার না চাহিতে
আপনি পোহায়ে যায় যামিনী সাধের
মানবজীবন ছাই বড় বিষাদের! (সাধ)

তাই নারী হিসেবে তাঁর প্রথমেই নজর গেছে সিঁথির সিঁদুরের দিকে। কেন না 'সিঁথিতে সিন্দুর নাই, ছাই সব সুখে।' কিন্তু সমাজ এই সব বিধবা, বিশেষ করে বাল বিধবাদের ওপর কি নিষ্ঠুরতাই না দেখিয়েছে!

কবি সে সব নির্মমতায় প্রাণে আঘাত পেয়েছেন। তাই সমাজকে কোথাও আক্রমণ করেছেন কোথাও ব্যঙ্গ করেছেন, কোথাও বা নীরবে অশ্রু বিসর্জন করেছেন। বাংলাদেশের অপরিণত কিশোরীদের নিয়ে যে জীবনের জুয়াখেলা, তাদের বৈধব্য-জীবনের অজুহাতে যে কঠোর শাস্তিদান; তা নিয়ে তিনি বিস্ময়ে বলেছেন—

খেতে খেতে যায় ছুটি
হেসে হয় কুটি কুটি
তার তরে একাদশী কি বলিস্ ছাই।

অথবা অন্যত্র—

সাঁঝের বাতাস ওই ধীরে বয়ে যায়
কেরে তুই এলো চুল।
কচি মেয়ে বেলফুল,
তোর মা বাঁধেনি খোঁপা অমন মাথায়?
(অভাগিনী)

নারী জীবনের এই দিকটি তিনি কিছুতেই ভুলতে পারেননি। 'প্রেমের জগতে নাথ! সকলি সুন্দর!' স্বীকার করেও তাই তাঁকে বার বার ক্রন্দন করতে দেখা যায়।

এই ক্রন্দন একদিকে যেমন তাঁর কোমল অন্তরের কথা, অন্য দিকে তেমনি তাঁর নিজস্ব জীবনের হাহাকার। তাঁর নিঃসঙ্গ একাকীত্ব তাই তাঁকে রেহাই দেয়নি। তাঁকে বার বার স্মরণ করতে হয়েছে—

একা আমি চিরদিন একা
সে কেন দু'দিন দিল দেখা?
আঁধারে ছিলাম ভাল
কেন বা জ্বলিল আলো?
আঁধার বাড়ায় যথা বিজলীর রেখা!
(একা)

'কুলীন কুমারী'র ছবি আঁকতে গিয়েও তাই তিনি নিজের ছবি এঁকেছেন—

অই শুকানো মুকুল!
বিধাতা ঘুমের ঘোরে
পাঠিয়ে দিয়েছে ওরে
কপালে লিখিতে "সুখ" হয়েছিল ভুল।
ওর বুকে শুধু জ্বালা
শুধুই আগুন ঢালা
মরমে মরমে মরা, বিষাদে আকুল।

এই দুঃখ থেকেই তাঁর দুঃখবাদের জন্ম। তাঁর সুদীর্ঘ জীবনও তাই তাঁর কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছে—

ভাগ্যবান তাড়াতাড়ি মরে,
অভাগারে যমে ভয় করে।
(ভিখারিণী মেয়ে)

হয়তো একারণেই তিনি চিরসতী সাবিত্রীর জন্যে মহাকালের কাছে প্রার্থনা জানিয়েছেন—

এখানে এস না নিঠুর শমন।
সাবিত্রীর নাম দিও না ঘুচে,
ভবের লালসা প্রাণের ভরসা
সিঁথির সিন্দুর নিও না মুছে।
(সাবিত্রী)

হিন্দু বিধবার এই অপরিসীম দুঃখজ্বালার মধ্যেও তাঁর কিন্তু সনাতন শুচিতার দিকে আগ্রহ কম ছিল না। তাই বঙ্কিমচন্দ্রের 'ভ্রমর' চরিত্রের কার্যকলাপ দেখে সমস্ত নারীসমাজের প্রতিনিধি হয়ে তিনি বিস্ময়ে ফেটে পড়েছেন—

হায় অভাগী ভ্রমর!
তবু কি তাহার আশে
আবার থাকিবি বসে,
জ্বালায়ে জ্বলন্ত চিতা বুকের উপর?
সয়ে কি এ বিষবাণ
রবে তোর দেহে প্রাণ;
এত কি অসাড় হবে রমণী অন্তর?
নারীকুলে হেন কালি দিস্‌নে ভ্রমর।
(ভ্রমর)

আত্মজীবনীতে কবি গোবিন্দদাস, গিরিজাপ্রসন্ন রায় চৌধুরী এবং বঙ্কিমচন্দ্রকে গুরু বলে স্বীকার

করেছেন। পিতৃব্য মধুসূদনও তাঁকে উৎসাহিত করেছেন। তাই তাঁর কাব্যে স্বভাবকবি গোবিন্দ দাসের স্বাভাবিকতা, বঙ্কিমচন্দ্রের বলিষ্ঠতা এবং মধুসূদনের মাধুর্য—এই তিনটি গুণের সংমিশ্রণ দেখা যায়। 'পলে পলে যে মমতা জীবনী জাগায়' সেই মমতায় সঞ্জীবিত তাঁর কবি হৃদয়; তাই তাঁর ভাব এত প্রাণস্পর্শী, ব্যঞ্জনা এত হৃদয়বিদারী।

কাব্য কুসুমাঞ্জলি'র মত কাব্য রচনা করেও কবি মানকুমারী বসু আজ বিস্মৃত। তিনি সুদীর্ঘ জীবনে খ্যাতি পেয়েছিলেন, পেয়েছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগত্তারিনী ও ভুবনমোহিনী সুবর্ণ পদক; কিন্তু বাংলা কাব্যে স্থায়ী আসন লাভ করতে পারেননি। কাব্য কুসুমাঞ্জলি পাঠ করে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছিলেন—"কবিতাপ্রিয় ব্যক্তি মাত্রেই যিনি ইহা পাঠ করিবেন, তিনিই, গ্রন্থকর্ত্রীর আশ্চর্য ক্ষমতা এবং প্রভাব অনুভব করিতে পারিবেন, এবং তাঁহার প্রতিভার ছটায় মোহিত এবং পুলকিত না হইয়া থাকিতে পারিবেন না।" কিন্তু অপ্রিয় সত্য গোপন করে লাভ নেই—কবিতাপ্রিয় ব্যক্তিদের মধ্যে অনেকে হয়তো এ কাব্য পাঠে পুলকিত হয়েছেন ঠিকই, হয়তো অনেকে প্রভাবও অনুভব করতে পেরেছেন; কিন্তু সেই পর্যন্তই। সমৃদ্ধ থাকলেও কাব্যকুসুমাঞ্জলি বাংলা কাব্যের সম্পদ বলে বিবেচিত হয়নি কখনও। এটা কবি এবং কবিতাপ্রিয় আমাদের সকলের পক্ষেই দুঃখজনক।

কুষ্ঠ ও ধবল

৭০ বৎসরের চিকিৎসাকেন্দ্রে হাওড়া কুষ্ঠ-কুটীর হইতে নব আবিষ্কৃত ঔষধ দ্বারা দুঃসাধ্য কুষ্ঠ ও ধবল রোগীও অল্প দিনে সম্পূর্ণ রোগমুক্ত হইতেছেন। উহা ছাড়া একজিমা, সোরাইসিস, দুষ্টক্ষতাদিসহ কঠিন কঠিন চর্ম্ম-রোগও এখানকার সুনিপুণ চিকিৎসায় আরোগ্য হয়। বিনামূল্যে ব্যবস্থা ও চিকিৎসা-পুস্তকের জন্য লিখুন।

পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্ম্মা কবিরাজ, পি, বি, নং ৭, হাওড়া

শাখা:—৩৬নং হারিসন রোড, কলিকাতা-৯

দি বেঙ্গল আর্ট প্রিণ্টার

৭, ইণ্ডিয়ান মিরার ষ্ট্রীট,

কলিকাতা-১৩

কবর ও শ্মশান

মতিলাল ধর

"জয় বাংলার জয়, জয় বাংলার জয়"। ভারতের পূর্ব সীমান্তে বাংলার বুকে দিকে দিকে এই জয়ধ্বনি—সেই গান 'বিশ্ব কবির সোনার বাংলা জীবনানন্দের রূপসী বাংলা' ইত্যাদি।

লরীর শব্দ, গাড়ীর শব্দ ও বাংলার জয়ধ্বনি শুনে শিবিরবাসী ছেলে মেয়েরা বড় রাস্তায় ভিড় জমায়। আমিনা এসাও গিয়ে তাদের মধ্যে অংশ গ্রহণ করে। ফিরে এসে মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে এসা বলে,—"মা আমরা দেশে যাব না? কবে যাব?"

—"কোথায় গিয়ে উঠব? আমাদের কে আছে, কে দেখবে?" আয়েসা দীর্ঘ নিশ্বাস ছেড়ে একথা বলে।

বাংলা আজ শাপমুক্ত, ঘরছাড়া দেশছাড়া বাঙ্গালী হিন্দু মুসলমান আজ আনন্দে আত্মহারা। পতি-পুত্র-হারা নারী, শোকাতুরা জনকজননী আজ তাদের শত্রুর শোণিতে তর্পণ করে চোখের জল মুছতে মুছতে জন্মভূমিতে ফিরে যাচ্ছে। কে কবে যাবে, কার কবে ডাক পড়বে সেই তারিখটি জানাবার জন্য শরণার্থীরা তাদের অফিসের দুয়ারে ভিড় জমায়। নদে, যশোরের বহু শরণার্থী সরকারী ব্যবস্থার প্রতীক্ষায় না থেকে পায়ে হেঁটেই ছুটে চলেছে মাটির মায়ের ডাকে। সেখানে গিয়ে ওরা কি দেখবে? ধ্বংসস্তূপ, না শ্মশান···? না কবর?...না সেই কারবালার মহামরু? একথা কেউ যেন ভাবতেই চায় না। এ প্রশ্ন তাদের মনেই ওঠে না। দলে দলে আকুল আগ্রহে লরীতে উঠছে আবার কেউ বা বাঁধের আবদ্ধ জলরাশির মত বাঁধ কাটার দিনের প্রতীক্ষায় বসে রয়েছে।

আয়েসাও মাঝে মাঝে বড় রাস্তায় গিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওদের ঘরে ফেরার দৃশ্য দেখে। ঘরে ফিরে আবার সে একথাও ভাবে,—"আমরা কতকাল এখানে এভাবে পড়ে থাকতে পারব? সরকারী সাহায্য বন্ধ হয়ে গেলে কি হবে?" বড় মেয়ে আমিনা বলে, "সে কথা আল্লাই জানেন। অত ভাবা-ভাবি কেন? আমিই বা লেখাপড়া শিখছি কেন?"

আয়েসার মনেও আশার এ ক্ষীণ রশ্মিটি যে আলো দেয় না এমত নয়। এখন তাঁর আরেকটা ভাবনা ছোট ভাই কাশেম বেঁচে আছে কি না।

স্বামীহারা আয়েসা এতদিন এপার বাংলায় এক তাঁবুতে বসে দিনের আশায় দিন কাটাত। এখনই তো যত চিন্তা ভাবনা।

আয়েসা তার শেষ সম্বল দু'টি মেয়ে আমিনা ও এসাকে নিয়ে বনগাঁ-সীমান্তের অনতিদূরে একটি গ্রামে এক হিন্দু পরিবারের আশ্রয়ে একাত্ম হয়ে বসবাস করে তাদের বাগানের একাংশে একটি তাঁবুর ঘরে।

বাড়ীর কর্ত্রী অনুরাধা। প্রৌঢ়া বিধবা। পাড়ায় অনুদি বলেই সুপরিচিতা। সেও আয়েসার সমদুঃখী। অনুরাধাও ভারত ভঙ্গের কয়েক বৎসর পরে বাস্তুহারা হয়ে একদিন স্বামীর শেষ অস্থি ও চিতাভস্ম বুকে করে দু'টি ছেলে নিয়ে এপার বাংলায় পাড়ি দিয়েছিল।

অনুরাধার দেশ ছেড়ে আসার সামান্য ইতিহাস এখানেই শেষ নয়। বহু কষ্ট ক্লেশ সহ্য করে এখানে এই নিভৃত পল্লীতে ঘর বেঁধেছে। স্বামীর আদর্শে বিশ্বাসী হয়ে তাঁর স্মৃতিরক্ষার জন্য একটি নার্সারী স্কুল খুলে বসেছে। বড় ছেলেটি সদ্য ডাক্তারী পাশ করে সরকারী চাকুরী করে। আয়েসা তারই এক অস্থায়ী প্রতিবেশী, না, একথা ঠিক নয়, তার চেয়েও বেশী কিছু।

হঠাৎ সেদিন—রাত্রে অতি অপ্রত্যাশিত ভাবে

আয়েসার ভাই কাশেম আলী তাঁবুর একধারে দরজার কাছে এসে হাঁক দেয়—"ঘরে কে আছেন?" রাত তখন সাত কি আটটার বেশী নয়, তখন আয়েসা মেয়েদের নিয়ে কেবল খেতে বসেছে। অতি পরিচিত কণ্ঠস্বর তার মনের দুয়ারে আঘাত করে। সে ভাতের থালা ঠেলে রেখে ছুটে এসে দেখে, দুয়ারে দাঁড়িয়ে আর কেউ নয় তার ভাই কাশেম আলী। "দিদি দিদি" বলে চিৎকার করে আয়েসার পায়ের কাছে এসে ধপ করে বসে পড়ে।

—"কাশেম,—কাশেম" বলে আয়েসা তাকে জড়িয়ে ধরে কান্নায় ফেটে পড়ে। ঘর হতে মেয়েরা ছুটে আসে। তাদের চোখ দিয়েও টশ্ টশ্ করে জল পড়ে। কেউ কাকেও কিছু বলতে যেন সাহস পায় না।

আয়েসা ভাই-এর মুখখানা তার কাপড়ের আঁচল দিয়ে মুছিয়ে দেয়। মেয়েদের বলে, "তোদের মামুকে একটু হাওয়া দে।" কাশেম কম্পিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে, —"দিদি, দুলাভাই?"

আয়েসা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে তার হাত ধরে তাঁবুর অনতিদূরে স্বামীর কবরের কাছে গিয়ে বলে "ওই—ওই দেখ, সে তাঁর হিন্দু ভাইর শ্মশান মন্দিরের পাশে কবরে ঘুমোচ্ছে।"

কাশেম সেখানে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ ধরে মাথা নত করে অশ্রুপাত করে ঊর্ধ্বে তাকিয়ে বলে "খোদা,... খোদা, তোর মনে এই ছিল? আমার সব কেড়ে নিলি।"

—"কাশেম তোর বউ—ছেলে মেয়ে?"..."আকুল আগ্রহে জিজ্ঞাসা করে আয়েসা।

—"ছেলেটাকে খান সেনারা গুলি করে মেরে ফেলেছে। বউটাকে আর মেয়েটাকে যখন ঐ শয়তান-গুলো টেনে নিয়ে যাচ্ছিল, তখন ঐ সামান্য বালক ক্রুদ্ধ বাঘের মত ওদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারপর এক-টাকে কাটারি দিয়ে ঘায়েল করে, নিজের জান দিয়ে মান বাঁচাবার চেষ্টা করে। সে শহীদ হয়েছে,...দিদি, শহীদ হয়েছে, আমি ছুটে এলাম। আমার রাইফেলের গুলি ফুরিয়ে এলো। আমি পারলুম না। স্বামী হয়ে রক্ষা করতে পারলুম না আমার স্ত্রীকে। পিতা হয়ে রক্ষা করতে পারলুম না মেয়েটুটাকে।

—"কাশেম,...চল,...ঘরে চল। সবই খোদার মর্জি।" আয়েসা তার হাত ধরে ঘরের দিকে চলে। চোখ মুছতে মুছতে কাশেম বলে,—"ওদের কাছে কেউ রেহাই পায় না। বার তের বছরের মেয়েও নয়, আর তার মাও নয়। জানি না ওরা বেঁচে আছে কিনা। দেশে গিয়ে একবার খুঁজে দেখতে হবে তো..."

—"তা তো হবেই, তুই বেঁচে আছিস, আমি স্বপ্নেও তা ভাবতে পারি নি।"

—"হ্যাঁ, কেমন করে বেঁচে রইলাম তা আমিও এখন ভাবতে পারি না। তবে এপার বাংলায় ছুটে এসে ভাবলাম,—সবই যখন গেল, তখন কাপুরুষের মত বেঁচে থেকে লাভ কি। নাম লেখালাম মুক্তি ফৌজে। ট্রেনিং নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লাম মরণ সংগ্রামে। খোদা মুখ তুলে চাইলেন। আমরা জয়ী হলাম। এখন আমিও একটা বাহিনীর নায়ক।"

—"এবার তোর জামাটামা খোল্। কিছু খেয়ে নে...হাঁড়িতে ভাত আছে তো আমিনা?" আমিনা ঘাড় নেড়ে জবাব দেয়—"হ্যাঁ হ'য়ে যাবে।"

কাশেম তার মিলিটারি পোশাক-পরিচ্ছদ খুলতে খুলতে দুঃখের কথা আবার আরম্ভ করে। "যুদ্ধ জয়ের পর এপারে এসে তোদের খুঁজে বের করবার জন্যে ক্যাম্পে ক্যাম্পে ঘুরতে লাগলাম। দৈবক্রমে গতকাল মিলিটারি ক্যাম্পে হাসপাতালের এক তরুণ ডাক্তারের সঙ্গে আলাপ হ'লো। কথা প্রসঙ্গে তোদের কথা বললাম। তিনি অবাক্ হয়ে আমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বললেন,—আপনার বোন? ভাগ্নীরা?...তাঁরা তো আমার বাড়ীতেই আছেন। ভালই আছেন।"

সে তরুণ ডাক্তারটি কে আয়েসার তা আর বুঝতে বিলম্ব হলো না। সে যে তার অম্বুদির ছেলে একথা

সে গৌরব ক'রে ভাইর কাছে একাধিক বার বলে আনন্দ উপভোগ করে এই দুঃখের মধ্যেও।

সেই রাত্রে দু'ভাইবোন অনেক সুখদুঃখের কথা বলে। কেমন করে কোন্ অবস্থায় অনুদির বাড়ীতে তাদের আশ্রয় লাভ হ'লো একথা কাশেম শুনেছে বটে, কিন্তু দিদির মুখে সবটুকু না শুনলে কি তৃপ্তি আসে মনে? খান সেনাদের অত্যাচারে আয়েসার স্বামী জন্মভূমি হরিদাসপুরে তিষ্ঠিতে না পেরে বাড়ীঘর ফেলে একদিন শেষরাত্রে পালিয়ে আসে এপার বাংলার দিকে। আয়েসাকে তার স্বামীর হাত থেকে ছিনিয়ে নেবার জন্য খানসেনাগুলো ক্ষিপ্ত কুকুরের মত পশ্চাৎ ধাবন করে। আয়েসারা ভারতের মাটিতে পা দিলে ওরা ক্ষিপ্ত হয়ে গুলি ছোঁড়ে। আয়েসার স্বামী মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে ভারতের সীমান্তরক্ষী সৈন্যদের কামান গর্জে ওঠে। আয়েসার স্বামী কামালকে ভারতীয় সৈন্যরা প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্রে নিয়ে আসে। আহত কামাল দু'দিন জীবিত ছিল। তারপর মৃত্যুর সময় তরুণ ডাক্তারবাবুর হাতে ওদের সঁপে দিয়ে মহা পথে চলে যায়। সেই দিন ডাক্তার তার পিতার শ্মশান মন্দিরের পাশেই তাকে সমাধিস্থ করে। ওদের আশ্রয় দেয় তার নিজ বাড়ীতেই। শ্মশানের পাশে কবর দেওয়ারও একটা কারণ আছে। অনুদির স্বামীর মৃত্যুরও একটা ইতিহাস আছে। এবং উভয়ের মৃত্যুতে একটা সাদৃশ্য আছে। আয়েসার মুখে তার জামাইবাবুর এই মর্মান্তিক কাহিনী শোনার পর, তার হিন্দু জামাইবাবুর মৃত্যুকাহিনীটাও জানবার কৌতূহল খুবই স্বাভাবিক, সুতরাং আয়েসা তাঁর করুণ কাহিনীও তাকে বলতে লাগল। "ভারত ভাগের পর হিন্দুরা বাপ-দাদার ভিটে মাটি ছেড়ে দলে দলে ভারতের পশ্চিমবঙ্গে চলে আসে। পাড়ার স্কুলের হেড মাস্টার শ্যামসুন্দরবাবুকে অনেকেই আসতে দিতে চাইল না। তিনি থেকেই গেলেন। কিন্তু শয়তানরা তাঁকে তাড়াবার ব্যবস্থা করে। দূরদর্শী শ্যামসুন্দর ঘোষ যশোরের ওপারেই এক মুসলমান জোতদারের সঙ্গে কিছু জমিজমা বিনিময় ক'রে একখানা ঘর করে, তাঁর বিধবা বোন ও ছেলেদুটোকে সেখানেই রেখে দেন। স্বামীস্ত্রী ওখানে কোন রকমে বাপদাদার ভিটাতেই মাথা গুঁজে থাকেন। অনুদির রূপে মুগ্ধ হয়ে শ্যামসুন্দর ঘোষের এক মুসলমান বন্ধু একদিন রাত্রে তাঁকে খুন করে। তারপর কাজ হাসিল করবার চেষ্টা করে। দিদির চিৎকারে পাড়ার লোকজন তাকে উদ্ধার ক'রে এপার বাংলায় পাঠাবার ব্যবস্থা করে দেয়। দিদি স্বামীর সৎকার করে তার চিতাভস্ম ও শেষ অস্থি বুকে করে এখানে এনে এক শ্মশান মন্দির তৈরী করেন। প্রতি সাঁঝের বেলা আমরা দু বোন ভাই এখানে প্রদীপ জ্বালি। এই খুনের পিছনে অনেক ষড়যন্ত্র ছিল তা এত অল্প সময়ে বলে শেষ করা যায় না। পরে শুনবি।"
কাশেম দীর্ঘ নিশ্বাস ছেড়ে শুধু বলে, "সে পাপের মাটি আজ আমরা রক্ত দিয়ে ধুয়ে দিয়েছি। খোদার রাজ্যে অবিচার নেই। পাপের প্রায়শ্চিত্ত যুগে যুগে এমন ভাবেই হয়।"

কাশেমের দুচোখ দিয়ে টশ্ টশ্ করে জল পড়ছে।

—আয়েসা হাই তুলে বলে, "এখন ঘুমো ভাই। রাত অনেক হয়েছে। কিন্তু সত্য বলতে কি, এদের ছেড়ে যেতেও মন চায় না। তবে এভাবে চিরকাল থাকাও কি সম্ভব?"

—"কি গো মা? তুমি কি বলছ?" আমিনা উত্তেজিত কণ্ঠে বলে। "চিরকালই থাকা সম্ভব। ডাক্তার ভাই ছোট ভাই, আমাদের মায়ের রক্তের বোনের মতই দেখেন। ওদের সঙ্গে আমাদের প্রভেদটা যে কি আমরা তো তা বুঝতেই পারলুম না। না, ও মাটিতে আর পা' দেব না, শয়তানের মুলুকে আর আমরা তো যাব না। যেতে হয় তুমি যেও।" দিদির সুরে সুর মিলিয়ে এসাও তাই বলে।

কাশেম দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বলে—"ও মুলুক আর শয়তানের মুলুক নয়, ওটা এখন বাঙ্গালীর বাংলা। শয়তানদের চিরতরে বিদায় করে দিয়েছি। আর ওদের চরগুলো এখন স্বাধীন বাংলার কারাগারে বিচারের দিন গুনছে। তোদের পিতৃপিতামহের কবরে, ভিটামাটিতে

কে বাতি জ্বালাবে? গোসা করবি কার সঙ্গে...? মন ঠিক কর্, তোরা প্রস্তুত হ। আগামী শুক্রবার বেলা দশটায় আমাদের গাড়ী তোদের এখানে আসবে। তোরাই যদি ঘরে না ফিরবি তবে আমারই বা কিসের সংসার?" এসা আমিনা এবার চুপ করে রইল। মামুর দুঃখের কথা শুনে তাদের মুখে বাক্য সরে না।

—"তোদের বাড়ীতে এখন আর কিছু নাই। আছে কতগুলো পোড়া কাঠ। আর ভস্মের স্তূপ। সেখানে একটা আস্তানা করে তোদের রেখে দিয়ে বেরিয়ে পড়ব তোর মামী আর মেয়েদুটোর খোঁজে। যদি ওদের খুঁজে না-ই পাই, তবে আমার কিসের সংসার? ওঃ, খোদা।..."

কাশেম ফোঁপায়ে ফোঁপায়ে কাঁদতে লাগল। আয়েসা তাকে বলে, "পাবি ভাই, পাবি, আমার মন বলছে। নিশ্চয়ই পাবি, খোদার রহমে ওরা বেঁচেই আছে।"

পরদিন ভোরেই দিদিদের সেলাম করে কাশেমআলী কর্মস্থলে চলে যায়।

আয়েসা যথাসময়ে কাশেমের প্রস্তাব অনুরাধাকে জানায়। অনুরাধাও তাদের দেশে গিয়ে শ্বশুরের ভিটায় ঘর বাঁধতে পারামর্শ দেয়। কিন্তু আমিনা আর পূব মুখী হতে চায় না।

তাদের বিদায় দিনটি যেন দ্রুতগতিতে এসে তাকে গ্রাস করে ফেলতে চায়। কোন কাজে তার মন বসে না। মায়ের পাঁচ ডাকে কচিৎ একবার সাড়া মেলে। এসা আমিনার চেয়ে অনেক ছোট। সে এখন দেশে যাবার জন্য মেতে উঠেছে। মাকে সে সাধ্যমত সাহায্য করে। মাকে প্রশ্ন করে—"মা, দিদি অমন করে মুখ ভার করে থাকে কেন? ও তো কিছুই করে না। মামু তো আজ এসে পড়ল বলে।"

—"তুই কি বুঝবি? আমিনা তোর মত পাগল নয়। মাসীর জন্য, ছোট ভাইর জন্য ওর মন পোড়ে না? মাসীর যে ও ডান হাত। ভাইরা ওকে কত ভালবাসে। কত যত্ন ক'রে লেখা পড়া শেখাল। তা কি ও ভোলতে পারে?"

"তাই তো। মায়কে বলো, আমরা যাব না। তুমি চলে যাও তোমার ভাইয়ের সঙ্গে। আমরা থাকব আমাদের ভাইর সঙ্গে।"

আয়েসা ওর সরল সুন্দর মুখখানির দিকে চেয়ে কি যেন ভাবছে।

এসা আবার বলে, মৃদুস্বরে বলে—"মা, একটা কথা বলব?"

—"কি বলবি বল্—"

—"দিদি না...বলব? ভাইয়ার কোলে মাথা রেখে কাল সন্ধ্যায় কবরের কাছে বসে কাঁদছিল। আমাকে দেখে না...চোখ মুছতে মুছতে উঠে এসে আমাকে বলছে, যা এখান থেকে। মাসীকেও দেখি সেদিন থেকে প্রায়ই চোখ মুছতে মুছতে কাজ করে।"

দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে আয়েসা বলে, "তুই তার কিছু বুঝবি?" আয়েসার এসব খবর অজানা ছিল না। আয়েসার চাল-চলন দেখে মনে হয় সে যেন দোটানায় পড়ে গেছে। তার চোখে জল নাই বটে, মুখে হাসিও নাই।

আজ বিদায়ের দিন। সমাধি মন্দির-দুটি একটি বিশাল বকুল গাছের সুগন্ধি সুশীতল ছায়ায়, গভীর মায়ায় আবদ্ধস্থিত। বকুল তার ফুল, তার ছায়াদানে কারও প্রতি পক্ষপাতিত্ব করে না। শ্মশান ও কবর দু'টিকেই সে প্রতিদিন ফুল দিয়ে ঢেকে দেয়। ভাইয়া ওরফে আশিস্। অনুরাধার ছোট ছেলে ও এসা এখানে এসে প্রতিদিন সন্ধা ও সকাল বেলা গান গাইতে গাইতে মালা গেঁথে কবর ও শ্মশান সাজায়ে দেয়। আজ এসা ও তার ভাইয়া যৌথভাবে শেষবারের মত মালা গেঁথে তাদের পিতৃদেবের সমাধিতে শেষ অর্ঘ্য দেয়।

লরীর শব্দ ও হর্ণ শুনে ওরা আঁতকে ওঠে। কিছু ক্ষণের মধ্যেই আয়েসা ও আমিনা, কাশেম চোখ মুছতে মুছতে বকুল তলায় এসে নিঃশব্দে মাথা নত করে বুঝি বা তাদের অশরীরী প্রিয়জনের কাছে তাদের স্বদেশ যাত্রার অনুমোদন প্রার্থনা করে।

আয়েসা সূর্য্যের দিকে তাকায়ে বলে, "ভাই, নামা-

জের ওক্ত হয়েছে। জোহুরের নামাজটা এখানেই পড়ে নেই।" তাড়াতাড়ি উজু করে নামাজ শেষ করে তারা আল্লার কাছে এবাদদ জানায় নতশিরে।

তারপর ওরা ধীরে ধীরে বকুলতলা হতে নিষ্ক্রান্ত হ'য়ে সদর রাস্তায় একটা গাছতলায় এসে দাঁড়ায়। অনুরাধার হাত ধরে আয়েসা বলে,—"দিদি, দিদি তোমার ভাইর কবরে প্রদীপ জ্বালাবার ভার তোমার উপর দিয়ে আমি আমার শ্বশুরের ভিটায় প্রদীপ দিতে চললাম। কবরের প্রদীপ যেন নিভে যায় না কোনদিন। ওকে ফেলে ওর কবর ফেলে, চলে যেতে আমার যে মন চায় না।"

"শোন আয়েসা, কবর আর শ্মশানে তফাৎ কি? যে শ্মশানের মর্যাদা দিতে জানে, সে কবরের মর্যাদা দিতেও জানে। শ্মশানই বা কি আর কবরই বা কি? শ্মশানে শব ভস্ম হয়ে মাটির কোলে আশ্রয় নেয়। কবরেও শব মাটির উত্তাপে ভস্ম হয়ে শেষ পর্যন্ত মাটির কোলেই মিশে যায়। মহাপ্রাণ মহাশূন্যে চলে যায়, তারপর কি হয় অতো খবর রাখি না। তোর জামাইবাবুর মুখে আমরা একথা শুনেছি, শ্মশান আর কবর ও দুটি তো জীবনের পরিণামের পবিত্র প্রতীকমাত্র। আমি আমার স্বামীর শ্মশান বুকে করে বয়ে নিয়ে এসেছি, তুইও তোর স্বামীর কবর বুকে করে বয়ে নিয়ে যা।"

"দিদি তোর কথা বুঝেছি, তবু...তবু...তবু কিন্তু" —"কিন্তু নাই। থাকুক ওখানে কবর ও শ্মশান দু'টি ভাইর মত গলাগলি বেঁধে, আমরা দু'টি বোন দু'টি বাংলার মত স্নেহ মমতা ভালবাসার ডোরে আবদ্ধ হয়ে থাকব।" কাশেম একটু দূরে দাঁড়ায়ে এই অপূর্ব দৃশ্য দেখে একেবারে অভিভূত হয়ে পড়ে।

লরীর হর্ণের শব্দে তার যেন চেতনা ফিরে এল। সে কম্পিত জড়িত কণ্ঠে ডাক দিয়ে বলে—"দিদি, দেরী হয়ে যাচ্ছে।" অনুরাধা ও আয়েসা ধীরে ধীরে হাত ধরাধরি ক'রে গাড়ীর ধারে এসে থমকে দাঁড়ায়, কাশেম দিদিদের পায়ের ধূলো নিতে যায়, অনুদি তাকে বাধা দিয়ে জড়িয়ে ধরে বলে,—"ওরে বিদায় নয়...তোরা আসবি—যাবি, আমরাও যাব—আসব।" দিদির মুখে আর বাক্য সরে না, সে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। কাশেম, আয়েসা, আমিনা, এসা ধীরে ধীরে গাড়ীতে ওঠে। এক প্রৌঢ় ও এক কিশোরের মুখে বিরহ বিষাদের কালিমা ঢেলে দিয়ে গাড়ী স্বাধীন বাংলার দিকে চলছে সোল্লাসে সগর্বে। আরোহীদের মুহুর্মুহু জয়ধ্বনি ক্রমে ক্রমে মিলিয়ে গেল। আকাশে বাতাসে ঊর্ধ্বে ইথর তরঙ্গে।

সোনার ঘোড়া

লক্ষ্মী চট্টোপাধ্যায়

এক রাজার একটি মাত্র সন্তান ছিল। সেই রাজপুত্র একদিন রাজসভায় এসে বল্লো, "আমাকে একটি জাহাজ দিতে আজ্ঞা হোক—আমি দেশ ভ্রমণে যেতে চাই।"

রাজা রাণীর সঙ্গে পরামর্শ করে বল্লেন, "ঠিক আছে, রাজকুমার। তোমার জন্য একটি জাহাজ প্রস্তুত করা হচ্ছে। তুমি দেশ ভ্রমণের সব ব্যবস্থা করো।"

যথাসময়ে পিতা মাতার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রাজপুত্র পৃথিবী ভ্রমণে রওনা হলেন। নানা দেশের নানা আচার ব্যবহার দেখলেন ও সেগুলি কিছু কিছু শিখলেন। অনেক দুর্যোগের ভিতর তাঁর জাহাজ পড়ল কিন্তু প্রত্যেকবার নাবিকরা তাল সামলে জাহাজ আবার শান্ত, নিরাপদ সমুদ্রে ফিরিয়ে আনলো।

ইতিমধ্যে রাজার রাজধানী এক প্রচণ্ড ভূমিকম্পে ধ্বংস হয়ে গেল। বড় বড় বাড়িগুলি সব উল্টে পড়ে চুরমার হলো ও চারিদিকে জমিতে বিরাট ফাটল দেখা দিল। মুহূর্ত্তের মধ্যে এই ফাটলের ভিতর সব কিছু ঢুকে গেল, জীবজন্তু, মানুষজন, রাজা রাণী সবই এই প্রলয়ে শেষ হয়ে গেল। সব শেষে একটা বিরাট ঢেউ এসে সবকিছু জলের নিচে ভাসিয়ে দিল। সেই রাজ্যের আর কোন কিছুই রইল না।

রাজপুত্র সেই সময় দেশের কাছাকাছি এক রাজার দেশে এসে পৌঁছলেন। অল্পদিন পর একটি দূত এসে তাঁকে এই সর্ব্বনেশে খবর দিল। বেচারা রাজপুত্র এই সাংঘাতিক খবর পেয়ে পাগলের মত নিজের দেশে ফিরে যাবার চেষ্টা করল। জাহাজ তার তীর বেগে দেশের দিকে রওনা হলো কিন্তু হায়, নাবিকরা সে দেশ খুঁজেই পেলো না। চারিদিক কেবল জলে জলময়, এর ভিতর কিছুই দেখা গেল না। তারপর রাজপুত্র নাবিকদের জলে নামতে হুকুম দিল। তারাও কোথাও কিছু দেখতে পেল না।

রাজপুত্র এবার নিজেই জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে একটা লম্বা বাঁশ নিয়ে জলে চুবিয়ে চুবিয়ে দেখবার চেষ্টা করল। প্রায় হতাশ হয়ে জাহাজে ফিরে আসছে এমন সময় কে যেন জলের নিচে থেকে বলে উঠল, "রাজপুত্র, রাজপুত্র, একটা বড় জাল ফেলো আর আমাকে সাবধানে উপরে টেনে তোলো।" নাবিকরা জাহাজ থেকে জাল ফেলামাত্র খুব জোরে তাতে টান পড়ল। খুব সাবধানে সেটা টেনে তুলতেই তারা দেখল যে তাতে একটা সোনার ঘোড়া ধরা পড়েছে। কি আশ্চর্য্য সে ঘোড়া! চকচকে সোনায় তৈরী; নিশ্বাস নেবার সময় যেন আগুন বেরুচ্ছে।

ঘোড়া রাজপুত্রকে বল্লো, "রাজপুত্র, তোমার বাপ মা আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন যাতে তোমাকে নিরাপদে তোমার নূতন রাজ্যে আমি পৌঁছে দিতে পারি। চলো, এবার জাহাজ ছেড়ে চলো। আমাদের বহুদূর যেতে হবে।"

রাজপুত্র তখুনি ঘোড়ার পিঠে লাফিয়ে উঠল ও তীর বেগে ঘোড়া ছুটতে সুরু করল। পাহাড় পর্বত সব পার হয়ে ঘোড়াটা একটি বিরাট আমবাগানে এসে পৌছল। হঠাৎ রাজপুত্রর পায়ে একটি সোনার পালক উড়ে এসে পড়ল। সেটাকে যত্ন করে সে পাগ্‌ড়িতে গুঁজে রাখল। কিছুদুর গিয়ে তারা একটা বড় বটগাছের তলায় জল খেয়ে বিশ্রাম করতে বসেছে এমন সময় রাজপুত্র দেখলো যে গাছের একটি ডালে একটি সুন্দর সোনার হার ঝুলছে। হার নামিয়ে সেটা সযত্নে গলায় পরল রাজপুত্র।

এভাবে অনেক দূর যাবার পর অবশেষে তারা একটি সুন্দর সহরে এসে পৌছল। চমৎকার বাড়িগুলি, চারিদিকে পরিষ্কার রাস্তা, বড় বাগানের মাঝখানে রাজার সুন্দর প্রাসাদ। ঘোড়া এরই সামনে গিয়ে থামল ও রাজপুত্রকে বল্লো, "এবার নামো। ওই সোনার পালকটি নাও, যে ওটা প্রথমে কিনতে চাইবে তাকেই তুমি ওটা বেচে দেবে, নাহলে তুমি খুব বিপদে পড়বে।"

রাজপুত্র পালকটি হাতে নিয়ে রাজবাড়িতে ঢুকল। প্রথমেই দরজার কাছে তার মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা হলো। মন্ত্রী মশাই পালক দেখে বল্লেন, "ওহে, আমাকে ওই সোনার পালকটা যদি বিক্রি কর তো আমি তোমাকে পাঁচ হাজার মোহর দি।"

রাজপুত্র মাথা নেড়ে বল্লো, "না, এ পালক আমি রাজাকে বিক্রি করব বলে ঠিক করেছি।"

মন্ত্রীর এ উত্তর শুনে ভীষণ রাগ হলো। সে বল্লো, "তুমি অতি বড় আহাম্মুক—আমি এত দাম দিতে চাইলাম আর তুমি এটা আমায় বিক্রি করলে না? বেশ, তবে রাজার কাছেই চলো, দেখো কি হয়।" গট্‌ গট্‌ করে হেঁটে মন্ত্রী রাজপুত্রকে রাজার কাছে নিয়ে গেল।

রাজা মশাইয়ের পালকটা দেখে খুবই পছন্দ হলো। তিনি মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন, "হ্যাঁ হে মন্ত্রী, এই পালকের কত দাম হবে বল ত—লোকটাকে কি দেবো?"

মন্ত্রী মুখ বেঁকিয়ে বল্লেন, "এ তো একটা সামান্য পালক, এর আর কি দাম হবে? ওকে পাঁচটা মোহর দিলেই যথেষ্ট।"

রাজা তখনি তাই দিয়ে পালকটা কিনে নিলেন। রাজপুত্র বিমর্ষ মুখে ঘোড়ার কাছে ফিরে আসাতে সে বল্লো, "তোমাকে কি বলেছিলাম মনে আছে? প্রথম লোকটাকেই ওটা বিক্রি করা উচিত ছিল। বেশ হয়েছে যেমন আমার কথা শোনোনি।"

দু'চার দিন পরেই আবার রাজপুত্রের পয়সার অভাব হলো। এবার সে সোনার হারটি বিক্রি করতে নিয়ে গেল। ঘোড়া আবার তাকে সাবধান করে দিয়ে বল্লো, "রাজপুত্র, মনে করে প্রথমেই যে হারটা কিনতে চাইবে তাকে দিয়ে দিও।" রাজপুত্রর মনে কি খেয়াল হলো, সে আবার হার নিয়ে রাজবাড়ির দিকেই রওনা হলো। আবার দরজায় তার মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা হলো। হার দেখে লোভে মন্ত্রীর চোখ জ্বল জ্বল করে উঠল। "এটা আমাকে বিক্রি করো, আমি দশ হাজার মোহর দেবো।"

কিন্তু বোকা রাজপুত্র আবার মাথা নেড়ে বল্লো, "এটা রাজা ছাড়া আর কাউকে বিক্রি করব না।"

মন্ত্রী ক্ষেপে চিৎকার করে বল্লো, "নির্বোধ, বেয়াকুফ কোথাকার! বেশ চলো, আবার রাজার কাছেই চলো। একবারে তোমার দেখছি কোন শিক্ষা হয়নি।"

আবার তারা রাজার সামনে এসে দাঁড়াল এবার রাজা মন্ত্রীকে হারের দাম কি হওয়া উচিত জিজ্ঞাসা করাতে সে বল্লো, "এটার আর কি দাম হবে—ওকে দশটি মোহর দিয়ে দিন।"

রাজামশাই দশটি মোহর দিয়ে সোনার হারটি কিনে নিলেন। অতি ম্লান মুখে রাজপুত্রকে ফিরতে দেখে ঘোড়াটা বল্লো, "তোমাকে বার বার বলা সত্ত্বেও তুমি আবার আমার কথা অমান্য করেছ। এবার আবার কি বিপদে পড় তা কে জানে?"

সন্ধ্যে হতে না হতেই তারা রাজবাড়ি থেকে ডাক পেল। বরকন্দাজ এসে রাজপুত্রকে বেঁধে নিয়ে গেল। সেখানে যেতেই রাজা বল্লেন, "ওহে, তোমার এই সোনার পালক আর হার তো খুব সুন্দর। কিন্তু সত্যিই অপরূপ শুনেছি সেই পাহাড়ের দেশের সোনার পাখি যার গায়ের পালক এটি। এবার তোমার সেই পাখিটাকে ধরে আনতে হবে, না হলে তোমার গর্দান যাবে।"

রাজপুত্র কোনদিন সেই সোনার পাখির কথা শোনেনি—সে ভেবাচাকা খেয়ে দৌড়ে ঘোড়ার কাছে গিয়ে এসব কথা বল্লো। তার মনে খুব ভয়—"হায়, হায়, এবার কি হবে?"

ঘোড়া বল্লো, "হা হুতাশ করে কি হবে? দেখা যাক কি হয়। এখন চলো তাড়াতাড়ি। আমার পিঠে চড়ে বসো তারপর আমরা সে দেশে যাই।" রাজপুত্র বসা মাত্র ঘোড়া উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চল্লো। শেষে এক পাহাড়ে দেশে গিয়ে সে থামল। তারপর চারদিক ভালো করে দেখে বল্লো, "এই হচ্ছে সোনার পাখির দেশ। এখানে এক ডাইনী বাস করে, তার সঙ্গে খুব সাবধানে কথা বলো নয়তো বিপদে পড়বে।"

ঘোড়ার কথা শেষ হতে না হতে তারা দূরে ডাইনীকে দেখতে পেলো। কি বিশ্রী চেহারা তার; চোখ দুটো আগুনের ভাঁটা, চুলগুলি জট পাকান, গা ভরা উকুন আর ঘা, আর তার উপর লম্বা লম্বা হলুদ দাঁতগুলি ঝুলে বেরিয়ে আছে। রাজপুত্র ভয়ে ঘোড়ার মুখ উল্টে পালাবার চেষ্টা করল কিন্তু ঘোড়াটা নড়লো না। ডাইনির গায়ের গন্ধে তাদের অন্নপ্রাশনের ভাত উঠে আসে আর কি। কিন্তু উপায় নেই কাজেই রাজপুত্র মাথা ঠাণ্ডা করে ডাইনীকে জড়িয়ে ধরে বল্লো "আই মা, কতদিন তোমাকে দেখিনি?"

ডাইনী আহ্লাদে আটখানা—সে বল্লো, "তাই তো নাতি, তাই তো। ভাগ্যিস আমাকে মনে করিয়ে দিলে এ'কথা না'হলে তোমাকে খেয়ে ফেলছিলাম আর একটু হলে। তা নাতি, তোমার এ দিকে কি প্রয়োজন হলো?"

রাজপুত্র বল্লো, "আই মা, আমি এখানে সোনার পাখির খোঁজে এসেছি। তাকে আমায় রাজার কাছে নিয়ে যেতে হবে।"

ডাইনী মাথা নেড়ে বললো, "এ তো খুব কঠিন কাজ। তোমার দ্বারা হবে বলে মনে হয় না। আচ্ছা, যখন এসেছ, চেষ্টা করতে দোষ নেই। ওই যে পুকুরটা দেখছ ওখানে, রোজ দুপুরে সোনার পাখিটা জল খেতে আসে। ওই পুকুরের জলটুকু সবই সে চুমুক দিয়ে শেষ করে, তারপর আবার সারাদিন ধরে আস্তে আস্তে ওই পাহাড়ের বরফগলা জল নেমে এসে পুকুর ভরে যায়। এই মাত্র পাখি জল খেয়ে গেছে, এখন পুকুরটা শুকনো। তুমি এই যাদুকরা ফুলটা ওখানে ফেলে দিয়ে এসো। তারপর আজকে ওখানে পুকুর পাড়ে গাছতলায় চুপচাপ খেয়ে দেয়ে শুয়ে থাকো। কাল সকালে উঠে দেখবে ওই পুকুর জলে ভরে গেছে। পাখিটা এসে সেই জল খেলেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাবে, তখন তুমি তাকে ধরতে পারবে।" ডাইনীকে বহু ধন্যবাদ জানিয়ে রাজপুত্র পুকুরের দিকে চললো। সেখানে পৌঁছে ফুলটা ফেলে দিয়ে রাজপুত্র গাছের আড়ালে বসে খেয়ে দেয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

পরদিন ভোরে উঠে দেখলো যে, পুকুরটা জলে ভরে গেছে আর একটা অদ্ভুত গন্ধ বেরুচ্ছে সেই জল থেকে। দূরের একটা ছোট পুকুরের জল খেয়ে রাজপুত্র চুপচাপ বসে সেখানে সোনার পাখির অপেক্ষা করতে লাগল। কিছুক্ষণ পর সমস্ত পাহাড় পর্বত গাছপালা আলো করে সোনার পাখি উড়ে এসে পুকুরের জলে নামল। জল খেতে খেতে মাঝে মাঝে সুন্দর গান গেয়ে পাখি সকলকে মোহিত করে দিলো। রাজপুত্র তন্ময় হয়ে এই অপরূপ দৃশ্য দেখতে লাগল। অল্পক্ষণ পর পাখি সব জলটুকু খেয়ে ফেললো ও ডাইনীর যাদুতে সেইখানেই বেঁহুস হয়ে পড়ে রইল। রাজপুত্র শীঘ্র নেমে গিয়ে পাখিটাকে তুলে নিয়ে আবার সেই রাজার রাজ্যে ফিরে গেল।

রাজা পাখি দেখে মোহিত। তিনি বললেন—"মন্ত্রী, এখন এই লোকটিকে কি দেওয়া উচিত?"

মন্ত্রী বললো, "বলেন, কি মহারাজ, ওকে আবার কি দেবেন? ও প্রাণে বেঁচেছে সেই যথেষ্ট—আর ওকে কিছু দিতে হবে না।"

রাজামশাই পাখিটাকে খাঁচায় ভরে রাজপুত্রকে দরজার থেকে হাঁকিয়ে দিলেন। সে মনের দুঃখে আবার ঘোড়ার কাছে ফিরে গেল। সে তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললো, "রাজপুত্র, আরও অনেক কাজ বাকি—এখন থেকে মন খারাপ করলে চলবে কি করে? দেখই না কি হয়।"

এদিকে রাজা একটি অপূর্ব সুন্দর প্রাসাদ তৈরী করালেন। সোনা রূপার পাতে থামগুলি সব মোড়া। একটি শ্বেত পাথরের তাকের উপর একটা রূপোর গাছ বসান হলো; তারি একটি মুক্তো বসান গাছের উপরে সোনার পাখিকে সোনার হার গলায় দিয়ে বেঁধে রাখা হলো। কিন্তু পাখি আর গান গায় না, কেবল মাথা নিচু করে চুপচাপ এক কোনায় বসে থাকে। রাজার ভীষণ ভাবনা হলো—মন্ত্রীকে ডেকে বললেন, "মন্ত্রী, পাখিটার হলো কি?"

চতুর মন্ত্রী বললো, "আজ্ঞে মহারাজ পাখির উপযুক্ত সাথী চাই তবে তো সে গান গাইবে। আপনার রাণী এলে সব ঠিক হয়ে যাবে।"

রাজা বললেন, "এমন রাজকন্যা কোথায় পাব?"

মন্ত্রী বললেন, "কেন, ওই সোনার পাখির দেশের রাজকন্যাকে আনলেই হবে। সে-ই পাখির যোগ্য সাথী হবে।"

রাজা খুব খুসি হয়ে আবার রাজপুত্রকে ডেকে পাঠালেন। তাকে বললেন, "দেখো, তোমাকে আবার ওই সোনার পাখির দেশে ফিরে যেতে হবে। সে দেশের রাজকন্যাকে নিয়ে এসো সে আমার রাণী হবে।"

রাজপুত্র ঘোড়ার কাছে ফিরে গিয়ে রাজার হুকুমের কথা জানাল। তারপর বললো, "এবার ঠিক আমার গদান যাবে। এমন রাজকন্যা কোথায় পাব?"

ঘোড়া বললো, "উঠে পড় আমার পিঠে। আমি তোমাকে ওই রাজকন্যার কাছে নিয়ে যাব। তবে প্রথমে আমাদের সেই ডাইনীর সঙ্গে দেখা করতে হবে।" আবার ঘোড়াটা তীর বেগে ছুটে গেল সেই সোনার পাখির দেশে। সেই বাগানে নামতেই তারা ডাইনী বুড়িকে দেখতে পেলো। দৌড়ে গিয়ে রাজপুত্র তাকে বললো, "আইমা, দেখো তোমার নাতি আবার তোমাকে দেখতে এসেছে।"

ডাইনী বললো "তা বেশ, তা বেশ। একটু বাদুড়ের আচার খাবে? তা এবার নাতি তোমাকে এখানে কেন রাজা পাঠিয়েছে?"

রাজপুত্রর বাদুড়ের আচার দেখেই মাথা ঘুরতে শুরু করল। সে বললো, "আইমা, আমার এখনও স্নান হয়নি। দাও একটু আচার, পরে খাব। আর আমি এসেছি এই দেশের রাজকন্যাকে নিয়ে যেতে। মহারাজ তাকে রাণী করেবেন ঠিক করছেন।"

ডাইনী ঢক্ ঢক্ করে মাথা নেড়ে বললো, "এ কোন মানুষের দ্বারা সম্ভব নয়। যাক, তুমি যখন আমার নাতি তখন তোমাকে আমি সাহায্য করতে পারি। কিন্তু খুব সাবধানে যাবে। ওই পাহাড়ের ওদিকে একটি খুব লম্বা গম্বুজ দেওয়া বাড়ি দেখছ? ওর মধ্যে সোনার রাজকন্যা আছে। তোমাকে এই দুটি জিনিস দিচ্ছি—একটি লোহার সিঁড়ি অন্যটি একটি ছোট সোনার বাঁশি। রাত্রি হলে এ দুটি নিয়ে ওই বাড়ির দিকে রওনা হবে। তারপর ওই সিঁড়ি বেয়ে একেবারে উপরের ঘরে উঠে যাবে। ওখানে রাজকন্যা ঘুমায়। বাঁশিটি বাজালেই সেই বাঁশির সুরের টানে তোমার সঙ্গে সঙ্গে সিঁড় বেয়ে রাজকন্যা নেমে আসবে নিচে। তারপর তাকে নিয়ে ঘোড়ার পিঠে চেপে দেশে ফিরে যেও। খবরদার তার সঙ্গে কথা বলতে যেও না—সেও খুব সাংঘাতিক যাদুমন্ত্র জানে।"

ডাইনীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রাজপুত্র বাঁশ ও লোহার সিঁড়িটা নিয়ে ঘোড়ার পিঠে আবার চড়ে বসল। কিছুদূর গিয়েই সেই গম্বুজওয়ালা বাড়িটা তারা দেখতে পেলো। সেখানে পৌছবামাত্র সিঁড়িটা ঠিকমত রেখে তারা রাত্রির জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

চারিদিক নিস্তব্ধ, ঝিঁঝিঁপোকার ডাক ছাড়া কোন আওয়াজ শোনা যায় না। ঠাণ্ডায় রাজপুত্র হি হি করে কাঁপতে লাগল।

ঘোর রাত্রে সিঁড়ি বেয়ে রাজপুত্র উঠতে লাগল। সিঁড়িটার যেন শেষ নেই, যত উপরে যাচ্ছে রাজপুত্র সেটাও যেন বেড়ে চলেছে। শেষে সে রাজকন্যার ঘরে গিয়ে পৌঁছল। জানলা দিয়ে রাজপুত্র দেখতে পেল যে, একটি অতি সুন্দর রাজকন্যা সোনার খাটে ঘুমিয়ে আছে। রাজপুত্র ধীরে ধীরে বাঁশিটি বাজাতে সুরু করল। কি আশ্চর্য্য, রাজকন্যা সেই ঘুমন্ত অবস্থায় উঠে বসল, তারপর বাঁশির আওয়াজ যেদিকে শুনতে পাচ্ছে, সেই দিকে হেঁটে যেতে লাগল। ধীরে ধীরে সে রাজপুত্রর সঙ্গে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামল ও সেই ঘুমন্ত অবস্থায় তাকে ঘোড়ায় তুলে নিয়ে রাজপুত্র তীব্র বেগে দেশে ফিরে এলো। সেই অবস্থায় তাকে রাজবাড়ির সেই নূতন প্রাসাদে নিয়ে গিয়ে রাজপুত্রর বাঁশির সুর থামল। চারিদিকে রাজা, মন্ত্রী, সভার সভাগণ হাঁ করে এই ব্যাপার দেখতে লাগল।

বাঁশির আওয়াজ থামতেই রাজকন্যার ঘুম ভেঙ্গে গেল। সে অবাক্ হয়ে ঘুরে ঘুরে চারিদিকে তাকাতে লাগল। কিছুক্ষণ পর সোনার পাখিটি দেখে হঠাৎ রেগে চিৎকার করে উঠল, "কে আমার ভাইকে এভাবে শেকল দিয়ে বেঁধে রেখেছে?"

পাখি উত্তর দিল—"ওই যে রাজা আর মন্ত্রী দেখছ —এরাই যত গোলমাল করেছে।" বলামাত্র রাজকন্যা রাজাকে মন্ত্র পড়ে একটা নেকড়ে বাঘ করে দিল আর মন্ত্রী মশাই একটি নাদুস্ নুদুস শুয়োর হয়ে গেল। নেকড়েটা শুয়োরকে তেড়ে গিয়ে চেঁচাতে লাগল, "তুমি আমাকে সোনার পাখি ও রাজকন্যার লোভ না দেখালে আজ আমার এ অবস্থা হতো না। তোমাকে আমি মেরে ফেলব।"

শুয়োর পালাতে পালাতে উত্তর দিল. "কেন, তুমি তো রাজা ছিলে, নিজের বুদ্ধিতে না চলে সব সময় আমার উপদেশ কেন চাইতে? দোষ তো তোমার।" এভাবে দুটো জন্তু ঝগড়া করতে করতে সভা থেকে দৌড়ে বেরিয়ে গেল।

ইতিমধ্যে রাজকন্যা রাজপুত্রকে দেখে তার গলায় মালা দিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে সোনার পাখিটা তার ডানা পাখনা ছেড়ে নিজ রূপ ধারণ করল। এরপর সে ঘোড়ার পিঠে উঠে বললো, "তোমরা দু'জন এদেশে রাজত্ব করো—আমি আমার দেশে চলে যাচ্ছি।"

ঘোড়াও রাজপুত্রর কাছে বিদায় নিয়ে বললো, "এবার আমার কাজ শেষ হয়েছে—তোমাকে সিংহাসনে বসিয়েছি। আমিও এবার চললাম।" এই বলে ওরা দু'জনে সকলের কাছে বিদায় নিয়ে সেখান থেকে চলে গেল। রাজপুত্র তখন রাজা হয়ে তার রানীকে নিয়ে সুখে সে দেশে বাস করতে লাগল।

রবীন্দ্র উপন্যাসে আধুনিকতা ও শিল্পিত স্বভাব

কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত

রবীন্দ্র সাহিত্যকে ক্ল্যাসিকাল পর্যায়ে রেখে যাঁরা আনন্দ পান তাঁদের বিবেচনাশক্তি অংশত অচল নিঃসন্দেহে। বিশ্লেষণ ছাড়া যে গ্রহণ তা হৃদয়গ্রাহী হয়না কোনমতেই। রবীন্দ্র উপন্যাসের আলোচনায় রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি সমীক্ষাই করেছেন বহু লেখক কিন্তু রবীন্দ্র উপন্যাসের আধুনিকতার দিকটি তেমন আলোচিত হয়নি। শিল্পীয় সত্তাটির আলোচনা বহু হয়েছে কিন্তু শিল্পিত স্বভাবটিকে আবিষ্কার করার চেষ্টা কম। আধুনিকতার সংজ্ঞা যদি বর্তমানকে প্রশ্রয় দেওয়ার মধ্যেই প্রকটিত হয় তবে তা বিড়ম্বনা মাত্র। আধুনিকতা বিবর্তনবাদী, পুরোনো খোলস ছেড়ে নতুনের দিকেই তার জয়যাত্রা। রবীন্দ্র-কথাসাহিত্য আলোচনায় যে প্রশ্নটি বারবার মনকে আলোড়িত করে সেটি তাঁর স্বভাবজাত 'বৈপ্লবিক শক্তি'র অভাব। তাঁর প্রিয় ছিল নিয়মনিষ্ঠা ও বিনয়। তরুণ রবীন্দ্রনাথ রাতারাতি কোনও বদল ঘটাতে চাননি। বাংলা কথা-সাহিত্যকে বঙ্কিমের হাত থেকে যে অবস্থায় পেয়েছিলেন; ঠিক সেখান থেকেই যাত্রা করেছেন তিনি। পরিণত বয়সে তিনি বহু অদল বদল করেছেন ভাষার ও আঙ্গিকের, এমন কি বক্তব্যেরও। পদ্যে তিনি প্রথম থেকেই বিশিষ্ট কিন্তু গদ্যে তাঁর ধীরগামিতা। পূর্বাপরতা লঙ্ঘন না করে হঠাৎ কিছু করতে গেলে প্রজন্মের সম্ভাবনা কম। এর দৃষ্টান্ত বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে মাইকেল মধুসূদন। রবীন্দ্রনাথ আচমকা কিছু করতে চাননি, ধীরে ধীরে বাস্তবতার তীরে নেমে এসেছেন। বৌঠাকুরাণীর হাট আর চার অধ্যায়ে কত তফাৎ। বৌঠাকুরাণীর হাটে সুরমার মৃত্যু প্রতাপাদিত্যের পরিবর্তন আনেনি কিন্তু চার অধ্যায়ে এলার কাতর আহ্বানে সাড়া না দিলেও অতীনের পোশাকী সার্বজনীনতার মুখোশ ছিঁড়ে দিয়েছে এলার ব্যক্তিস্বাধীনতার চুম্বন।

শ্রীবুদ্ধদেব বসুর মতে রবীন্দ্রনাথের পূর্ব উপন্যাসে একটা অস্বাস্থ্যকর অবস্থা চোখে পড়ে, যেন লেখকের বুদ্ধি ও প্রবৃত্তি ভিন্নগামী। 'যখন হৃদয় চায় কথা বলতে—মগজের কারখানায় চলছে প্লটের চতুরালি।' নৌকাডুবি ও বৌঠাকুরাণীর হাটে ঘটনাগত সংঘাতই প্রবল অথচ আশ্চর্যের বিষয় এই যে চোখের বালির মতো মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসের পাঁচ বছর পরে লেখা নৌকাডুবি। এই প্লটের দাবী মেনে নেওয়ায় রবীন্দ্র উপন্যাস প্রথমদিকে কিছুটা মন্থর ও প্রাণহীন হয়ে পড়েছে। বঙ্কিমের ঘটনাগত আলোড়ন থেকে তখনও মুক্ত নন। এখানে রবীন্দ্রনাথের চরিত্রগুলোর সঙ্গে ঔপন্যাসিক আত্মীয়তা নেই, ফলে চরিত্রগুলো নিজ নিজ আদর্শের শিকার হয়ে বসেছে (সুরমা, হেমনলিনী, রমেশ)।

প্লটের দাবী মিটিয়ে ও কবির অন্তর্মুখী মনটি বজায় রেখে রবীন্দ্রনাথ গোরায় সম্ভবতঃ সম্পূর্ণভাবে আত্মপ্রকাশ করেছেন। এর পরে চতুরঙ্গ, ঘরে বাইরে, শেষের কবিতা, যোগাযোগ ও চার অধ্যায়ে রবীন্দ্র-মানসিকতার বিভিন্ন দিকগুলো ফুটে উঠেছে। বক্তব্যের দিক থেকে স্বীকার করতে গেলে গোরাই রবীন্দ্রনাথের আধুনিক উপন্যাস কিন্তু পরিবেশ রচনা ও বাচনভঙ্গীর দিক থেকে চোখের বালি।

চোখের বালির সমালোচনায় নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন—"চোখের বালির স্বাতন্ত্র্য বিষয়বস্তুতে নয়, রীতিতে।" প্রকৃতপক্ষে চোখের বালির সমস্যা বিষবৃক্ষের কুন্দনন্দিনীর সমস্যা। যদিও মায়ের ঈর্ষাকে রবীন্দ্রনাথ প্রধান সংকট বলে দাবী করেছেন কিন্তু তা প্রকৃতপক্ষে গৌণ। নগেন্দ্রের বিশুদ্ধিকরণের জন্যে প্রলোভনজাত দুঃখের প্রয়োজন ছিল। চোখের বালির অনুতপ্ত মহেন্দ্রকে সান্ত্বনা দিয়ে অন্নপূর্ণাও তাই বলেছেন

—"নিজেকে ভালো বলিয়া তোর অহংকার ছিল, ... পাপের ঝড়ে তোর সেই গর্বটুকু ভাঙিয়া গিয়াছে, আর কোনও অনিষ্ট করে নাই।" মহেন্দ্রের এই আত্মশুদ্ধিই কি চোখের বালির একমাত্র উদ্দেশ্য? তা নয়, চোখের বালির মূল্য উদ্দেশ্য প্রেমকে চিনতে পারার প্রচেষ্টা। বিনোদিনী কোনও দিনও মহেন্দ্রকে ভালবাসেনি। মহেন্দ্র আশার সুমধুর দাম্পত্যজীবনে ফাটল ধরানোই ছিল তার উদ্দেশ্য। যৌনতা বোধের নর্ম পীড়ন তাকে পরকীয়া প্রেমে বাধ্য করেছে। রবীন্দ্রনাথ নারী-চরিত্রের এই স্বাভাবিকতা সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। চোখের বালির এই আধুনিকতা বা শিল্পিত রূপটি অসাধারণ। বিনোদিনী বৈধব্যের অবরুদ্ধ কামনা নিয়ে মহেন্দ্র আশার বিবাহিত জীবনের দিকে চেয়ে আছে।' এখানে কামই মুখ্য, তাই রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন'—আশার এই বিছানা, এই খাট তো একদিন তাহার জন্যই অপেক্ষা করিয়াছিল।" রবীন্দ্রনাথকে যারা ভাববিলাসী বা অতীন্দ্রিয় প্রেমের পূজারী বলে ব্যঙ্গ করেন তাঁরা এই সামান্য একটি ছত্রের বাস্তবতার শিল্পশোভন রূপটি নিশ্চয়ই খেয়াল করেননি।

চোখের বালি সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে আধুনিকতার জন্ম দিতে চায়নি। বিহারীকে তাই বিনোদিনী জীবনসঙ্গী বলে মেনে নেয়নি। সহজ জৈবিক মিলনের তুচ্ছতায় সে তার প্রেমকে মলিন করতে চায়নি। আত্মোপলব্ধির উত্তাপে তার ভুল ভেঙেছে। বিধবা-বিবাহের সমস্যা মেটানও রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্য ছিল না; আসলে প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থাকে তিনি সামাজিক বেড়ার মধ্যে স্বীকার করে নেননি। তিনি স্থাপন করেছেন মানব হৃদয়ের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম গোপনাভিসার। বঙ্কিমের মতো তাই নায়িকাকে পাপীয়সী বলে গালাগাল দেননি কিংবা হঠাৎ মৃত্যু ঘটাননি, শরৎচন্দ্রের মতো মধ্যবিত্ত সংস্কারের কাছে আত্মসমর্পণ করেননি। কিরণময়ী পাগল হয়ে গিয়েছে চরিত্রহীন উপন্যাসে, কিন্তু বিনোদিনীর হৃদয় পরিপূর্ণ প্রেমে। নিজের অস্তিত্বকে অস্বীকার করেনি বিনোদিনী, তেমনি অস্বীকার করেনি তার গোপন অনুরাগকে। রবীন্দ্রনাথ এদিকে একান্তভাবেই আধুনিক। তিনি মানবমনের অতলতলে ডুব দিয়েছিলেন, যা পরবর্তীকালে মাণিক বন্দোপাধ্যায়ের উপন্যাসে প্রস্ফুটিত। রবীন্দ্রনাথের নিজের কথায়—"মানুষের লক্ষ লক্ষ সম্পর্কসূত্র আছে যার দ্বারা প্রতিনিয়ত আমরা শিকড়ের মতো বিচিত্র রস আকর্ষণ করছি।"

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বাংলা উপন্যাসের কালান্তর গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথকে দ্বান্দ্বিকসমগ্রতার প্রথম ঔপন্যাসিক বলেছেন। তাঁর এই দাবী অযৌক্তিক নয় মোটেই। রবীন্দ্র-উপন্যাসের চরিত্র বঙ্কিমের মতো ঘটনায় ঘোড়ায় চেপে উপন্যাসে আবির্ভূত হয় না। উপন্যাসে জীবনের যে প্রচণ্ড টান তা জীবনধারণের প্রণালীতেই নিহিত। মহেন্দ্রের জীবনের সংকট সে নিজে, তার অতিলালিত চরিত্র। ঘটনাও তেমনই রবীন্দ্র উপন্যাসে কিছু ঘটে যাওয়া নয়, ব্যক্তিত্বের সংঘর্ষ। সুচরিতা ও গোরা, এলা ও অন্তু, বিমলা, নিখিলেশ ও সন্দীপ, অমিত ও লাবণ্য সমস্তই ব্যক্তিত্বের সংঘর্ষ। মজাটা হলো সকলেই অগ্রসর ও শিক্ষিত শ্রেণীর মানব মানবী। নায়ক নায়িকার ব্যক্তি সমস্যাই রবীন্দ্র উপন্যাসের সমস্যা। "রবীন্দ্রনাথের নাগরিকতা তাই অদ্ভুত। সৌন্দর্য ও রুচিবোধ, মানসিক সাহস এবং মানুষের সত্তার বন্ধনহীনতাকে অঙ্গীকার এ নাগরিকতার একদিকে, আর নিয়ত অগ্রসরতা ও সভ্যতা সম্বন্ধে সদাজাগ্রত চেতনা এর আর একদিকে। পুরোনো গ্রামীণ জট এবং আধুনিক ভারতবর্ষের বামুন চেহারার অপূর্ণ নাগরিক-জট এই দুই-এর বিরুদ্ধেই রবীন্দ্রনাথের প্রাগ্রসর নায়ক-নায়িকাদের আমরা সদাই দেখি যন্ত্রণা-মথিত।" নিখিলেশ (ঘরে বাইরে) কাপুরুষ নয়, উদার প্রকৃতির। তাই সে স্ত্রী বিমলাকে নিজের সম্পত্তি বলে মানে না। তাই সে বলে—"এখানে আমাকে দিয়ে তোমার চোখ কান মুখ সমস্ত মুড়ে রাখা হয়েছে—তুমি যে কাকে চাও তাও জান না, কাকে পেয়েছ তাও

জান না।" নিখিলেশের এই উদাসতাই বিমলাকে প্রশ্রয় দিয়েছে সন্দীপের বাসনার আগুনে ঝাঁপ দিতে। কিন্তু পরে বিমলা নিখিলেশকে চিনতে পেরেছে। লাবণ্য ও অমিতের প্রেমোচ্ছ্বাসের সংস্পর্শে এসে উপলব্ধি করেছে শোভনলালের মূক ভালবাসার মূল্য। কুমু (যোগাযোগ) নিজের আত্মসম্মান সংস্কারের জন্যে স্বামী মধুসূদনের পায়ে বিসর্জন দেয়নি। কুমু ফিরে এসেছে তখনই যখন সে সন্তানসম্ভবা। এই খণ্ডায়নের যন্ত্রণা রবীন্দ্র উপন্যাসের পূর্ণতা লাভের সোপান।

ধর্ম ও সমাজ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ধারণা বঙ্কিমচন্দ্র থেকে অনেক আধুনিক ও শরৎচন্দ্র থেকে অনেক সুন্দর। বঙ্কিমচন্দ্র ধর্মকে শ্রদ্ধা করেছেন কিন্তু তাকে জাতি-নিরপেক্ষ হিসাবে মেনে নিতে পারেননি। তাই সত্যানন্দ (আনন্দমঠ) কালী প্রতিমার পূজারী। যদিও দেশমাতৃকার রূপ বর্ণনায় সেই মৃন্ময়ী প্রতিমা চিন্ময়ী হয়ে উঠেছে, বঙ্কিমচন্দ্র দেশাত্মবোধকে ধর্মের সঙ্গে মালার মতো গেঁথেছেন। রবীন্দ্রনাথ ধর্মের সঙ্গে কোনও কিছুরই রফা করতে চাননি। আবার শরৎচন্দ্রের মতো তিনি ব্যক্তিগত বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেননি। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে ধর্ম হল কল্যাণবোধ যা একান্তভাবেই আধুনিক। বৌঠাকুরাণীর হাটে রবীন্দ্রনাথ দেশাত্মবোধ ও ধর্মচেতনার একটি শোচনীয় ও মর্মান্তিক বিরোধের ছবি এঁকেছেন। গোরাতে ও রাজর্ষিতে এই বিদ্রোহ ব্যঞ্জনাময় হ'য়ে উঠেছে। গোরা নিজেকে চিনতে পেরেছে মানব-কল্যাণের বিস্তৃত প্রেক্ষাপটে—"আজ আমি সত্যিকারের সেবার অধিকারী হয়েছি, সত্যকার কর্মক্ষেত্র আমার সামনে এসে পড়েছে —সে আমার মনের ভিতরকার ক্ষেত্র নয়—সে এই বাইরের পঞ্চবিংশতি কোটি লোকের যথার্থ কল্যাণ-ক্ষেত্র।"

বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের সমাজ-ব্যবস্থাকে যথাসম্ভব বাঁচিয়ে তাকে যুগোপযোগী ব্যাখ্যার সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন তার কারণ বঙ্কিম মনে করতেন যে লোকে সমাজ মেনে চলবে। শরৎচন্দ্রে সমাজের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ আছে; কিন্তু ট্র্যাডিশন্ বা গতানু-গতিকতার শিকার হয়েছে সবকটি চরিত্র—একমাত্র অভয়া ছাড়া। রবীন্দ্রনাথ মানুষকে দেখতে চেয়েছেন ব্যক্তিস্বাধীনতার অবাধ মুক্তির ক্ষেত্রে। সেখানে সে একান্তভাবেই একক ও স্বাধীন। এই ব্যক্তি-স্বাধীনতার বা স্বাতন্ত্র্যের চরম পরিণতি শেষের কবিতায় অমিতে। সে আমাদের ভিড়ের মধ্যে বাস করেও সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ। এই বিচ্ছিন্নতাবোধ বর্তমান সাহিত্যের প্রাণ। এদিক থেকে রবীন্দ্রনাথ আধুনিকতার দাবী করতে পারেন।

ব্যক্তি-স্বাধীনতার অশুভ পরিণাম ঘরে বাইরের সন্দীপ, যে দেশপ্রেমের নামে নিজের ব্যক্তিগত প্রবৃত্তিকে সার্থক করতে প্রয়াসী। অযথা বাগ্‌বিস্তার ও উত্তেজনায় সে নিখিলেশের বিশ্বস্ত সংসার থেকে বিমলাকে বাইরে এনেছে। দেশপ্রেমের ছুঁতোয় সে অধিকার করতে চেয়েছে বিমলাকে। চার অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথ উগ্র দেশপ্রেমের হাড়িকাঠে বলি দিয়েছেন সুকুমার বৃত্তিগুলোকে। এই বলিদানের উদ্দেশ্য অন্য ব্যক্তিস্বাধীনতাকে উজ্জ্বল করে দেখান। ইন্দ্রনাথের গুপ্ত সমিতিতে যৌবনের আবেগে জড়িয়ে পড়েছে এলা, এলার সূত্র ধরেই এসেছে তার প্রণয়ী অতীন। দুজন কেউই বিপ্লবকে জীবনে গ্রহণ করেনি, বুদ্ধিদীপ্ত সংলাপ ও গরম কথাবার্তায় তাদের দেশপ্রেমের পরিচয়। নিজের ব্যক্তি-পুরুষকে অস্বীকার করাই পাপ। তাই অতীনের হাহাকার—"স্বভাবকে হত্যা করেছি, সব হত্যার চেয়ে পাপ। কোন অহিতকেই সমূলে মারতে পারিনি, সমূলে মেরেছি কেবল নিজেকে।"

রবীন্দ্র উপন্যাসের স্ত্রীচরিত্রের একটি আলাদা মূল্য আছে। রবীন্দ্রনাথের মতে স্ত্রী পুরুষ উভয়ে মিলে সমাজ গড়ে, কাজেই একটি সত্তাকে পঙ্গু করে অন্যটি অপূর্ণ। গোরার বিচ্ছিন্নতার পূর্ণতা তাই সুচরিতার অখণ্ড সৌন্দর্যে। গোরার এই আত্মসমর্পণ যেমন ভাববাহী, যোগাযোগের বণিকপ্রবর মধুসূদনের কুমুর আভিজাত্যের কাছে আত্মসমর্পণ তেমনি বিশিষ্ট। মধুসূদন শ্যামার স্থূল সম্পর্কে কুমু কোনওদিনই কিছু বলেনি, ফলে মধুসূদন আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছে।

নারী-চরিত্রের গভীরতার দিক পেয়েছি বিনোদিনীতে, মালঞ্চের অসুস্থা নীরজার মধ্যে, ঘরে বাইরের বিমলার মধ্যে কিংবা গোরার আনন্দময়ীর মধ্যে। রবীন্দ্র উপন্যাসে স্ত্রীচরিত্র রূপায়ণে যে স্বাভাবিকতা লক্ষ্য করা যায় তাও প্রথাগত নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের নায়িকারা সকলেই সুদর্শনা (প্রফুল্ল, আয়েষা, তিলোত্তমা, কুন্দ, রোহিণী, শৈবলিনী)। কিন্তু রবীন্দ্র উপন্যাসের নায়িকাদের রূপ বেশীর ভাগই সাধারণ গোছের। এলা কিংবা কুমু দুজনেরই সাধারণ বাঙালী মেয়ের চেহারা। কুমুর রূপ বর্ণনায় রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্য আবিষ্কারের চেষ্টাই প্রবল—"কিছুক্ষণ পরে কুমু শোবার ঘরে এসে প্রবেশ করল। মধুসূদন তাঁর মুখের দিকে চাইল। সাদাসিধে একখানি লাল শাড়ী পরা। শাড়ীর প্রান্তটি মাথার উপরে টানা। এই নির্জন ঘরের অল্প আলোয় কী অপূর্ব আবির্ভাব।" এই শিল্পিত রূপ শরৎ সাহিত্যে নেই বললেই চলে—শরৎ সাহিত্যে যে সুন্দরী সে সুন্দরী, যে সাধারণ সে সাধারণ। পার্বতীর সঙ্গে তো সাবিত্রীর তুলনা চলে না কিংবা অচলার সঙ্গে কিরণময়ীর?

চরিত্রের পর পরিবেশের কথায় প্রথমেই বলতে হয় পল্লী-প্রকৃতির বিচিত্র সৌন্দর্য রবীন্দ্রনাথের রোম্যান্টিক মনকে মুগ্ধ করেছে। গ্রামবাংলার সৌন্দর্য ছড়িয়ে রয়েছে বিশেষতঃ গল্পগুচ্ছের গল্পগুলোতে। তাই বুদ্ধদেব বসু বলেছেন—"তাঁর সমগ্র কথাসাহিত্যে গোরাতেই তিনি কলকাতাকে স্বীকার করে নিয়েছেন—নগরের দ্বন্দ্বময় আবহাওয়াকে এখানে আমরা অনুভব করি।" হিন্দু ব্রাহ্ম বিদ্বেষ ও ইঙ্গভারতীয় সংঘর্ষ তাই গোরার পটভূমি হয়েছে। চোখের বালি ও যোগাযোগের অনেকটা অংশ কলকাতাতে ঘটলেও সেখানে নগরের ছবি আমরা পাই না। এজন্যে রবীন্দ্রনাথকে দায়ী করে লাভ নেই কারণ রবীন্দ্র উপন্যাসের নায়ক নায়িকারা অবাঞ্ছিত নাগরিকতাকে মূল্য দেয় না। তাই সুচরিতার ধাঁচে গড়া লাবণ্য ও কুমু ও গোরার উদারতা নিখিলেশ, অতীনের মধ্যেও আছে, ব্যতিক্রম এলা ও ললিতা। এলা চার অধ্যায়ে এক ভয়ংকর মুহূর্তে প্রেম ও দেহকে অর্পণ করতে চেয়েছে প্রেমাস্পদকে, আর ললিতা অনাত্মীয় যুবকের সঙ্গে স্টিমার ভ্রমণে বেরিয়েছে।

প্রেমের নামে রবীন্দ্রনাথ এ দুটি মুহূর্ত ছাড়া যৌনতাকে মোটেই প্রশ্রয় দেননি। ঘরে বাইরেতে বিমলা সন্দীপের কোনও ঘনিষ্ঠ মুহূর্ত নেই, শেষের কবিতায় অমিত ও লাবণ্য প্রেমের বন্ধনহীনতার আদর্শের জোয়ারে ভাসমান, এমনকি চতুরঙ্গে দামিনী শচীশের প্রেমকে বুকে নিয়ে শ্রীবিলাসের ঘরে দীপ জ্বেলেছে। কেন এমন হল? অমিত কেন লাবণ্যকে পেল না? সন্দীপ কেন জোর করল না বিমলার ওপর? শচীশের সে দাবী ছিল না কি দামিনীর ওপর? আসলে রবীন্দ্রনাথ প্রেমের আধুনিকতা বলতে ভাবতন্ময়তা বোঝাননি, তিনি প্রেমকে দেহধূলির মালিন্যে মলিন হতে দিতে চাননি। তাই তাঁর মতে—"তোমারে যা দিয়েছিনু সে তোমারি দান।" অর্থাৎ ব্যক্তিত্বের সংঘর্ষে যে অনুরাগের জন্ম তাতে পাপ নেই, তা শুভ্র শতদল, কিন্তু তাকে সমাজের দড়ি দিয়ে কষে বাঁধা মানেই হৃদয়ের অনুভূতিটিকে অমর্যাদা করা। বিনোদিনী শুনিয়েছে সেই বাণী বিহারীকে—"ভুল করিয়ো না—আমাকে বিবাহ করিলে তুমি সুখী হইবে না, তোমার গৌরব যাইবে—আমিও সমস্ত গৌরব হারাইব।" প্রেমের ভিত্তি বিশ্বাসে তাই বন্ধন সেখানে নৈকট্যের প্রশ্ন তোলে না। প্রেমের এই মাধুর্য সত্যিই অদ্ভুত ও অপরিচিত।

উপন্যাসের রচনা-রীতির দিক থেকে রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই প্রথাগত রচনার বৈপরীত্য সৃষ্টিকারী প্রতিভা। চোখের বালির বুদ্ধিদীপ্ত বাচনভঙ্গিমা চার অধ্যায়ে, শেষের কবিতায় প্রাণবন্ত। ঘরে বাইরে থেকে তিনি চলতি ভাষাকে বরণ করে নিলেন গদ্যে, সঙ্গে সঙ্গে বাংলা গদ্যে আনলেন 'তীক্ষ্ণতা নমনীয়তা ও লাস্য।' উপন্যাসেরও দিক বদল হল। উনিশশতকী প্লটের মোহ চলে গেল। উপন্যাস হয়ে উঠল বক্তব্যপ্রধান, ভাবনির্ভর, সেই সঙ্গে চলল কথা-শিল্পের কারুকাজ। চার অধ্যায়ে এলা অতীনের কথোপকথন কিংবা শেষের কবিতায়

লাবণ্য ও অমিতের কথোপকথন সাধারণের উপযোগী নয়। এই বুদ্ধিদীপ্ত সংলাপ কবি মনের প্রেরণায় হোক কিংবা চরিত্রের প্রয়োজনেই হোক, বাংলা কথাসাহিত্যে একটি অনবদ্য দান। উপন্যাসের সংহতির দিক থেকে আকর্ষক বটে।

রবীন্দ্র উপন্যাসের শিল্পিত স্বভাবের বিরুদ্ধে বুদ্ধদেব বসু তাঁর রবীন্দ্রনাথ: কথা সাহিত্যে তিনটি প্রশ্ন এনেছেন। প্রথমত: একমাত্র গোরা ছাড়া রবীন্দ্রনাথের কবিসত্তার সঙ্গে ঔপন্যাসিক সত্তার সামঞ্জস্য রক্ষা হয়নি, দ্বিতীয়ত: কবিত্ব যখন দানা হয়ে এসেছে তখন নৌকাডুবির কৃত্রিমতা; তৃতীয়ত: তা যখন প্রশ্রয় পেল তখন ঘরে বাইরের আতিশয্য ও শেষের কবিতার বিষয়বস্তুতে যথার্থতার অভাব।

এই তিনটি অভিযোগ পুরোপুরিভাবে সত্য নয়। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বাংলা উপন্যাসের কালান্তর গ্রন্থে এই তিনটি প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। প্রথমতঃ, রবীন্দ্রনাথ কবি আর কথাশিল্পীর সমন্বয় ঘটাতে পারেননি একথা ভুল। ব্যক্তির জীবনের ঘাত প্রতিঘাতে যে অস্তিত্বের যন্ত্রণা সেটাকে সমাজ-সভ্যতার প্রেক্ষাপট ছাড়া ব্যক্ত করা যায় না। রবীন্দ্রনাথ সেই মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী যন্ত্রণাই উপন্যাসে ধরতে চেয়েছেন। ঘরে বাইরের আতিশয্য কিংবা শেষের কবিতার সৌন্দর্য তার আঙ্গিকে ও কথাসংস্থায়। নৌকাডুবির কৃত্রিমতা স্বীকার্য কারণ তখনও রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমের ঘটনাগত আলোড়নের মোহকে বর্জন করতে পারেননি।

তবে প্রধান উপন্যাসগুলোর সমাপ্তির দুর্বলতার জন্যে একমাত্র গোরা ছাড়া রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট আদর্শকে দায়ী করতে পারি। দামিনীর মৃত্যু, মধুসূদনের আত্মসমর্পণ ও বিনোদিনীর ফিরে যাওয়ার বেদনা গোরা সুচরিতার সুন্দর মিলনে আনন্দময় হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসের বিষয়কে নিরীক্ষাশালায় প্রেরণ করতে উৎসাহী ছিলেন। এ মানসিকতা ঔপন্যাসিকের আধুনিকতা ও শিল্পিত স্বভাবেরই পরিচায়ক। কবির মন অন্তর্মুখী আর ঔপন্যাসিক বহির্মুখী, ঔপন্যাসিক মিশুক ও কবি লাজুক প্রকৃতির। রবীন্দ্রনাথের শিল্পিত-স্বভাবটিকে দুটি উদাহরণেই স্পষ্ট করা যায়। যেমন বিমলার মায়ের স্মৃতি কয়েকটি কথায় সুন্দর করে এঁকেছেন রবীন্দ্রনাথের শিল্পী মন—"ভক্তির আপন সৌন্দর্যে সমস্তই কেমন সুন্দর হয়ে ওঠে সে আমি ছেলেবেলায় দেখেছি। মা যখন বাবার জন্যে বিশেষ করে ফলের খোসা ছাড়িয়ে সাদা পাথরের রেকাবিতে জলখাবার গুছিয়ে দিতেন, বাবার জন্যে পানগুলি বিশেষ করে কেওড়া জলের ছিটে দেওয়া কাপড়ের টুকরোয় আলাদা করে জড়িয়ে রাখতেন, তিনি খেতে বসলে তালপাতার পাখা নিয়ে আস্তে আস্তে মাছি তাড়িয়ে দিতেন, তাঁর সেই লক্ষ্মীহাতের আদর, তাঁর হৃদয়ের সেই সুধারসের ধারা কোন অপরূপ রূপের সমুদ্রে গিয়ে ঝাঁপ দিয়ে পড়ত, সে যে আমার সেই ছেলেবেলাতেও মনের মধ্যে বুঝতুম।"

নগ্নতার চরম প্রকাশেও রবীন্দ্রনাথ শিল্পিত স্বভাবটিকে হারাননি। চার অধ্যায়ে শেষদৃশ্যে এলা অন্তুকে বলেছে—"একটুও ভেবো না অন্তু। আমি যে সম্পূর্ণই তোমার—মরণেও তোমার। নাও আমাকে। নোংরা হাত লাগতে দিও না আমার গায়ে, আমার এ দেহ তোমার।" যাঁরা এলার এই সংলাপে আবেগ খুঁজতে যাবেন শুধু, তাঁরা নিশ্চয়ই ভুল করবেন। বাস্তবতার এমন চরম পর্যায় রবীন্দ্র উপন্যাসে আর সম্ভবত: দ্বিতীয়টি নেই। শেষ উপন্যাসটিতেও রবীন্দ্র প্রতিভা অটুট ও অফুরন্ত সৌন্দর্য্য নির্ঝর।

—ঃ গ্রন্থপঞ্জী ঃ—

১। রবীন্দ্র রচনাবলী।
২। কথাকোবিদ রবীন্দ্রনাথ—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়।
৩। রবীন্দ্রনাথ: কথাসাহিত্য—বুদ্ধদেব বসু।
৪। বাংলা উপন্যাসের কালান্তর—সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়।
৫। কথা সাহিত্য ও রবীন্দ্রনাথ—বিশ্বপতি চৌধুরী।
৬। রবীন্দ্র সাহিত্যে নারী—লীলা বিশ্বাস।
৭। রবীন্দ্র উপন্যাস পরিক্রমা—অর্চনা মজুমদার।

ব্যবধান

অর্ধেন্দু চক্রবর্তী

চা খেয়ে পয়সা দিতে এগোচ্ছিলাম ক্যাশ রিসিভারের দিকে।

থামতে হ'লো যে পয়সা নিচ্ছে তার দিকে চেয়ে। বহুদিন আগের একটি বিশেষ চেনা মুখের আদল আসছে, অথচ কোথায় যেন খানিকটা গরমিল রয়েছে। কিছুতেই মিলিয়ে উঠতে পারছি না। চশমার কাঁচটাও এই তো সেদিন বদল করেছি। তবুও...। সংযত করি নিজেকে। এমন ভুল অনেকেরই হয়। পরিচয় করতে গিয়ে অপমান হওয়াও খুব অস্বাভাবিক নয়।

খুব স্বাভাবিক হ'য়ে পয়সা দিতে এগোলাম।

—কি, হঠাৎ চোখ পড়ায় ভাবছিলি চেনা মনে হয় অথচ চিনতে পারছিস না। সত্যি— তোর মেমরি খুব ধূসর হ'য়ে পড়েছে দীপক। তোকে আর দশ বছর আগের সেই ফার্ষ্ট বয় বলে মনে হয় না।

চমকে উঠি নিজের নামটাও ওর মুখে উচ্চারিত হ'তে শুনে। খুব লজ্জিত আর বিব্রত মনে হয় নিজেকে।

—ভাখ তো ভালো করে চেয়ে চেনা যায় কি না। আর তোকেই বা দোষ দিয়ে লাভ কি দীপু। আমি নির্মল সরকার, তোদের সেই নিমু।

—নিমু তুই? মানে...আমিও খানিকটা ওইরকমই আঁচ করেছিলাম। যাক্ মনে কিছু করিস না।

আমার আত্মখণ্ডনমূলক কথাগুলো নিমুর কানে গেল কিনা জানি না। কেননা নিমু তখন হেঁকে চলেছে, "ওরে পল্টু, পাঁচ নম্বর টেবিলে দুটো অমলেট, একটা লক্কাছাড়া। এক নম্বর কেবিনে দু'কাপ চা, একটায় চিনি কম।"

নির্মলের খোঁচায় আমার কপালে ঘাম বেরিয়েছে। সামনের পথের চলমান গাড়িগুলোকে ঝাপসা দেখছি। সেখানে নির্মলের মুখটা কাঁপছে। ক্রমে আমার চোখটা যেন পরিষ্কার হয়ে আসে। স্কুলে বেশ কয়েক বছর এক সঙ্গে পড়েছি আমরা। আমি ছিলাম খুব লাজুক। বসতাম পেছনের বেঞ্চে। নির্মল অবশ্য মোটেই মুখচোরা ছিল না। বিপরীতস্বভাব সত্বেও আমাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হয়েছিল। দশবছর আগে স্কুলের গণ্ডি পেরুনোর পর কেউ কারও তো খবর রাখিনি।

বেশ সচ্ছল পরিবারের ছেলে নির্মল। দামী পোশাক পরতো। সুপুরুষ দেখতে। স্কুল-জীবন থেকেই লুকিয়ে চুরিয়ে বিড়ি সিগারেট খেয়ে দাঁতের ফাঁকে কালো দাগ ফেলেছিল। চোখে ছিল কালো ফ্রেমের চশমা। এখন দেখছি না সেটা। হয়তো তাই ওকে প্রথমে চিনতে পারিনি।

—বোস্। গল্প করা যাক। হাতের ওই বস্তুটি যেখানে ছিল আপাততঃ সেখানেই রেখে দে।

সম্বিত ফিরে পাই নির্মলের কথায়। পয়সাটা আমার হাতেই রয়েছে।

বলতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু...

—কোন কিন্তু নয়। সেদিনের নির্মল সরকার এখনো মরেনি রে। বন্ধু-বান্ধবের দু'কাপ চা খাওয়াবার ক্ষমতা এখনো শেষ হয়নি।

শেষের কথাগুলো বলার সময় নির্মলের মুখটা গম্ভীর হয়। গলার স্বরটাও অন্য রকম শোনায়। পকেটে হাত গলিয়ে পয়সাটা রেখে বসে পড়ি পাশের চেয়ারে। একটা সিগারেট বাড়িয়ে নির্মল বলে, 'ধরেছিস্? না কি এখনো নিরামিষই আছিস্?'

— মাঝে মাঝে চলে।

সিগারেট ধরাই। ভাবছি ওর দোকানটার কথা। মোটরে যেতে আসতে বি. টি. রোডের ধারে 'সরকার

রেষ্টরেন্ট', চোখে পড়েছে বহুদিন। কিন্তু এখানে আমার জন্যে বিস্ময় লুকিয়ে রয়েছে ভাবতে পারিনি। খুব সাজানো গোছানো নয় দোকানটা। তবু চারপাশের ছোট বড় গুটিকয়েক কারখানার জন্যে মন্দ চলে না মনে হয়।

—তারপর কেমন আছিস বল্? নির্মল জিগ্যেস করে।

—চলছে কোন রকমে।

—হ্যাঁ, কোন রকম ছাড়া আবার কি? সত্যি, গত ছ'বছরে কে যে আমরা বেঁচে আছি আর কে মরে গেছি এটাই বলা শক্ত। ভেবে ছাখ্ দেখি এমনি হট্টগোলের বাজারে আমরা কি আরও বেশি আত্মকেন্দ্রিক হ'য়ে পড়িনি?

কথা বলতে বলতে খদ্দেরের কাছ থেকে পয়সা নেয় নির্মল।

তারপর বলে, আচ্ছা, আমায় বলতে পারিস গত ছ'বছরে যে অগুনতি মানুষের প্রাণ গেল তার বিনিময়ে আমরা কি পেলাম?

প্রশ্নটা করে নির্মল একবার সন্দিগ্ধ চোখে চারপাশটা দেখে নেয়।

আবার বলে, আমি জানি না তুই কোন বিশেষ মতকে সমর্থন করিস কি না। আমি অবশ্য সব মতবাদের ওপরই আস্থা হারিয়ে ফেলেছি। তাই—

একটু হেসে আমি বলি, ভয় নেই। তুই নির্বিবাদে বলতে পারিস।

—বিমানকে তোর মনে আছে? সেই যে ভালো ক্যারিক্ করতো আর ছবি আঁকতো?

—হুঁ...কেন?

—বিমান মারা গেছে।

—সে কি...? কি করে?

—তোর এই প্রশ্নের উত্তরটা আমি কি করে দিই তবে এইটুকু শুনেছি হাতে একটা কিছু বার্স্ট্ করেছিল। আর...মরার মাত্র কয়েকদিন আগে নাকি পার্টিরই একটা মেয়েকে বিয়ে করেছিল।

মাথাটা ঝিম্ ঝিম্ করে আমার। অন্যমনস্ক হয়ে পড়ি। বিমানকে কেন্দ্র করে ফেলে আসা স্কুল-জীবনের টুক্‌রো টুক্‌রো ঘটনা চোখের সামনে ভাসতে থাকে। বিমানের সেই হাসিমুখটা হেমন্তের ওই নীল আকাশে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। নীল আকাশটাকেই কেমন মিথ্যে মনে হয়।

—জানি দীপক, বিমান মরেছে এ তুই বিশ্বাস করতে পারছিস্ না। আমিও প্রথমে পারিনি। কিন্তু...ওই বিভীষিকার সময়টায় কেউ তো কারও বিশ্বাসের ধার ধেরে মরেনি বা বাঁচেনি।

একটা নিঃশ্বাস ফেলি নির্মলের কথায়।

নির্মলও একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলে, যাক্, ওসব ভেবে আমাদের কি লাভ। তা...কাজকর্ম কিছু জুটিয়েছিস্?

—হুঁ...। আচ্ছন্নের মতন উত্তর দিই আমি। মাষ্টারি করছি একটা।

—ভালো। যা হোক একটা করছিস। চাকরির যা বাজার।

কি যেন ভাবে নির্মল। আর সেই বিট্‌কেল ভাবে সিগারেটে গোটাকয়েক ক'ষে টান দেয়।

হঠাৎ নির্মল জিগ্যেস করে, আমায় তো কিছু জিগ্যেস করছিস্ না? ভাবছিস্ না হঠাৎ চায়ের দোকানে বসতে গেলাম কেন? দোকানটাই বা কার?

সামান্য একটু হাসির রেখা টেনে নির্মল আমার দিকে চেয়ে থাকে।

তারপর বলে, আরে নিজের দোকান বলেই তো অমন লাটসায়েবী কায়দায় হাঁক-ডাক করছি। বাবার পয়সা না হয় উড়িয়ে শেষ করতে পারি। কিন্তু ফ্যামিলি-ট্র্যাডিশন্ মেজাজটা তো আর নষ্ট করা যায় না।

খানিক কি ভাবলো নির্মল।

আবার বলে, কলেজের দোর পেরুতে পারিনি। বাবা মারা যাবার পর দাদারা যে যার আলাদা হ'য়ে গেল। এক চট্‌কায় জীবনের ভোল্‌ গেল পালটে। নার্ভাস হইনি, বুঝলি। সেদিন বুঝলাম স্কুলের পরীক্ষায় নগেনবাবু বারবার কেন স্বাবলম্বন রচনা লিখতে দিতেন। লেগে গেলাম পাউরুটি বিক্রি করতে। তারপর এইটুকু যা হয়েছে। রত্নাকে মনে আছে তোর? ওর বিয়ে দিয়েছি। ছেলেটি ব্যাংকে ক্লার্ক্‌। এখন মাকে নিয়ে আমার কোনরকমে চলে যাচ্ছে।

স্মৃতির জালে জড়িয়ে পড়ে আবার দশ বছর আগের সেই স্কুলের ছেলেটি হয়ে যাই। নির্ম্মলদের বাড়ী গেলেই ওর বোন রত্না ক্যারম নিয়ে বসতো। আমাকে ওর জুটি করতো। আমি ক্যারাম খেলতে পারতাম না। রত্না ভালো খেলতো। বেশির ভাগ খেলায় একার জোরে জিতে যেতো।

মাঝে মাঝে বলতো, দীপুদার হাত দিন দিন খুব শার্প্‌ হচ্ছে।

খেলার পর চলতো খাওয়া। চা বিস্কুট চানাচুর টোষ্ট ইত্যাদি।

একদিন রত্না খারাপ খেলায় আমি একটু খোঁচা দিয়ে বলেছিলাম, কেমন, হলো তো? অতি চালাকের গলায় দড়ি।

আমার খোঁচাটুকু ওর খুব লেগেছিল।

ক্ষুব্ধ হয়ে বলেছিল, তোমার ওই মাষ্টারী মাষ্টারী ভাব ছাড়ো দীপুদা। নইলে কেউ তোমাকে বিয়ে করবে না।

কিশোরী রত্নার ওই অসংলগ্ন মন্তব্য নিয়ে আমি ভাবিনি কোনদিন। এমন কি এই পাঁচ বছরের মাষ্টারী জীবনেও। আজ কেন জানি না রত্নার ওই অসংলগ্ন কথাটাই বারবার মনে পড়ছে। তবে কি রত্না আমাকে...? না, তাই বা সম্ভব কি করে? আমিই কি ওকে...? না—নিজের কাছে কোনদিন প্রশ্ন করিনি।

আমার চমক ভাঙ্গে নির্ম্মলের কথায়।

নির্ম্মল বলে, ভেতরে চল্‌। রত্না এখানেই রয়েছে। মা কাশী বেড়াতে গেছে কিনা।

নির্ম্মল ডাকতেই রত্না এসে দাঁড়ায়।

আমার শরীরের মধ্যে একটা বিদ্যুৎ খেলে যায়।

—ওমা, দীপুদা যে? বোসো। আমাকে চিনতে বোধ হয় কষ্ট হচ্ছে? অনেকদিন পর কিনা। তুমি কিন্তু একরকমই রয়েছো। শুধু ধুতি-পাঞ্জাবি আর পুরোপুরি মাষ্টার।

দীপু তো মাষ্টারীই করছে রে। নির্ম্মল বলে।

—সে আমাকে বলতে হবে না। আমি আগেই জানতাম। পোশাকেই ধরা পড়ে গেছে।

—তোরা গল্প কর। আমি আমার কাজ সামলাই।

নির্ম্মল চলে গেল।

আমি এবার ভালো করে তাকাই রত্নার দিকে।

চোখদুটো রত্না নামিয়ে নিয়েছে। একপ্রকার অস্বস্তি আমাকে বিব্রত করে তোলে। রত্নার দিকে ঠিক যেন স্বাভাবিক ভাবে তাকাতে পারছি না। রত্নারও কি তাই? কেন এই অস্বস্তি আমাদের দুজনকেই এমনি আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলছে।

—বোসো। দাঁড়িয়ে রইলে কেন?

—হুঁ...বসছি।

বসে পড়ি। জানি না আমার বসে পড়াটা ওর কাছে বেখাপ্পা মনে হয় কি না।

—তুমি কিন্তু আগের চাইতে অনেক গম্ভীর হয়ে গেছো। মাষ্টারী করলেই মানুষ যেন কেমন হয়ে যায়।

—আমার ছাত্ররা কিন্তু আমাকে গম্ভীর বলে না

—ওমা—তাই বুঝি?

রত্নার মধ্যে উচ্ছলতার ঝলক দেখা দিয়েই মিলিয়ে যায়। আমি সেই পুরনো রত্নাকে ওর মধ্যে খুঁজে বেড়াই। বুঝতে পারি না সেদিনের চপলা মেয়েটা আজকের এই রত্নার মধ্যে রয়েছে কি না। আজকে রত্না আরও সুন্দর হয়েছে কি না যাচাই করতে পারি না তবে ওর রংটা আরও চকচকে হয়েছে। শরীরটা আর নিটোল পরিণত। কোথাও ঘাটতি নেই। বিয়ের পর সব মেয়েরই এমন হয়।

—বিয়ে করেছো দীপুদা ?

রত্নার কথাটা যেন অনেক দূর থেকে ভেসে আসে।

—না...মানে কাকে করবো ?

আমার কথাটা নিজের কাছেই বড় বেখাপ্পা মনে হয়। মনে হয় যেন চাতুরি করতে যেয়ে রত্নার কাছে ধরা পড়ে গেছি। রত্নার কাছে মুখটা আড়াল করতে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাই। বাইরের ওই একফালি আকাশে নিজের মুখের প্রতিবিম্ব খুঁজে বেড়াই।

—কেন ? রত্না ছাড়া কি ?...

চমকে উঠি রত্নার কথায়। আমার মুখে কোন কথা যোগায় না। সব কেমন তালগোল পাকিয়ে যায়। রত্না মাথা নিচু করে বসে রয়েছে। আমি ওর আনত চোখদুটো দেখতে পাচ্ছি।

একটা ঢোক গিলে আমি বলি, এক গ্লাস জল দেবে রত্না ?

রত্না জল এনে আমার দিকে বাড়িয়ে দেয়। হাত বাড়িয়ে জল নিতে রত্নার চোখদুটো আমাকে একটা কশাঘাত করে। ওর চোখের কোণে দুফোটা জল চিক্ চিক্ করছে। ওই দুফোটা জল যেন ধীরে ধীরে সমুদ্রের আকার ধারণ করছে। আমি সেই সমুদ্রে হাবুডুবু খাচ্ছি। তৃষ্ণায় আমার বুকের ছাতি যেন ফেটে যাচ্ছে।

—কই, জল চাইলে যে ?

খপ্ করে রত্নার হাত থেকে গ্লাসটা নিয়ে ঢক্ ঢক্ করে জলটুকু গলায় ঢেলে দিই। শরীরের অসহ্য জ্বালা মেটাবার পক্ষে ওই জলটুকু যেন কিছুই নয়। বরং আমাকে যেন আরও অসংখ্য সূচের মাঝে ঠেলে দেয়। সূচগুলো আমার দেহটাকে ক্ষত-বিক্ষত করছে। কিসের এক তৃষ্ণায় যেন সমস্ত মাংসপেশী শুকিয়ে আসছে।

কংগ্রেস স্মৃতি

(চত্বারিংশ অধিবেশন—কানপুর—১৯২৫)

শ্রীগিরিজামোহন সান্যাল

॥ ১৩ ॥

বেলগাঁও কংগ্রেসের অধিবেশনের সমাপ্তির অব্যবহিত পরে অল-ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটী পরবর্তী কংগ্রেসের অধিবেশনের জন্য যুক্তপ্রদেশের আমন্ত্রণ করে। তদনুসারে যুক্তপ্রদেশের প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটী কংগ্রেসের অধিবেশনের স্থান কানপুর স্থির করে এবং একটি অস্থায়ী (প্রভিশনাল) অভ্যর্থনা সমিতি গঠন করে কাজ শুরু করে দেয়।

প্রথম দিকে কংগ্রেসের অধিবেশনের উপযুক্ত স্থান সংগ্রহ করতে অভ্যর্থনা সমিতির বিশেষ বেগ পেতে হয়েছিল, অবশেষে সহরের উন্নতি ও প্রসারকল্পে নব নির্মীয়মাণ অঞ্চলের জমি ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাষ্টের নিকট হতে সংগ্রহ হল। এতে কমিটীকে বেশ মোটা অঙ্কের টাকা খেসারত দিতে হয়েছিল।

এবার প্রতিনিধিদের বাসের জন্য তাম্বু খাটানো হয়েছিল এবং বিশিষ্ট প্রতিনিধিদের জন্য ২০টি বাংলো ভাড়া করা হয়েছিল।

হিন্দুস্থান সেবাদলের সর্বাধিনায়ক ডঃ হর্দিকর অভ্যর্থনা সমিতিকে বিশেষ ভাবে সাহায্য করেছিলেন।

এবারও বাংলার প্রতিনিধিগণ দলবদ্ধ হয়ে কানপুর কংগ্রেসে যোগ দিতে যান নি। তাঁরা পৃথক পৃথক ভাবে কানপুর রওনা হয়েছিলেন।

রাজসাহীর সুরেন্দ্রমোহন মৈত্র মশায় (ইনি পরে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর সদস্য হয়েছিলেন) কংগ্রেস শিবিরে না গিয়ে রাজসাহীর মোক্তার যোগেন্দ্রনাথ বাগচীর পুত্র শ্রীমান নরেন্দ্রনাথ বাগচীর কানপুরের বাসায় আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। নরেন্দ্রনাথ তখন লাল-ইমলি উলেন ফ্যাক্টরীর একজন অফিসার নিযুক্ত হয়ে কানপুরে বাস করছিল।

২৩শে ডিসেম্বর প্রাতঃকালে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের ব্যবস্থা হয়েছিল। নির্বাচিত সভানেত্রী মহোদয়া তখনও কানপুর পৌঁছান নি সুতরাং পতাকা উত্তোলনের ভার অর্পিত হল লালা লাজপত রায়ের উপর। ডঃ হর্দিকর লালাজীকে পতাকা উত্তোলনের জন্য আহ্বান করলেন। লালাজী একটি সংক্ষিপ্ত অভিভাষণ দিয়ে সমবেত জনতার হর্ষধ্বনি ও বন্দে মাতরম্ ধ্বনির মধ্যে পতাকা উত্তোলন করলেন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নেতাদের মধ্যে পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, ডাঃ আনসারী, রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার প্রভৃতি মুষ্টিমেয় কয়েক জন।

সেই দিন সন্ধ্যার সময় নির্বাচিতা সভানেত্রী মহোদয়া মহাত্মা গান্ধী, শেঠ যমনালাল বাজাজ এবং বোম্বাই ও গুজরাতের বহু প্রতিনিধির সঙ্গে ট্রেণে কানপুর ষ্টেশনে পৌঁছুলেন। সভানেত্রীকে অভ্যর্থনা করার জন্য অভ্যর্থনা সমিতির সদস্যগণ ও গণ্যমান্য নেতাগণ প্ল্যাটফরমে উপস্থিত ছিলেন। অভ্যর্থনা সমিতির সদস্যদের ছাড়া যে সকল নেতা ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু, মৌলানা শওকত আলী, যতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত, রফি আহমদ কিদোয়াই, ডাঃ আনসারী, স্বামী গোবিন্দানন্দ, এ রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার' অভয়ঙ্কর, লালা হংসরাজ, সি. এস্. রঙ্গ আইয়ার প্রভৃতি।

ট্রেণ পৌঁছুতেই "বন্দেমাতরম্", মহাত্মা গান্ধীজী কি জয়, সরোজিনী দেবী কি জয় ধ্বনিতে প্ল্যাটফরম মুখরিত হয়ে উঠল।

তারপর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ডাঃ মুরারীলাল সভানেত্রীকে অভ্যর্থনা করে তাঁকে পুষ্প মাল্যে শোভিতা করলেন।

ষ্টেশনের গেটে পুষ্প শোভিত একটি মোটর গাড়ী সভানেত্রীর জন্য অপেক্ষা করছিল। ডাঃ মুরারীলাল এবং পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু সভানেত্রীকে সঙ্গে করে মোটর গাড়ীতে বসালেন। অন্যান্য গাড়ীতে মহাত্মা গান্ধী ও অন্যান্য নেতারা স্থান গ্রহণ করলেন। তারপর বিরাট একটি শোভাযাত্রা সহকারে সভানেত্রীকে কংগ্রেস নগরের দিকে নিয়ে যাওয়ায় ব্যবস্থা করা হল কিন্তু মহাত্মার দর্শনের জন্য জনতার এমন প্রবল চাপ সৃষ্টি হল যে শোভাযাত্রা আরম্ভ করা গেল না। অগত্যা বাধ্য হয়ে মহাত্মা গান্ধী শোভাযাত্রা ত্যাগ করে ভিন্ন পথে কংগ্রেস শিবিরে পৌছুলেন।

মহাত্মার স্থান ত্যাগ করার পর ভিড় কতকটা শান্ত হলে অশ্বারূঢ় পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর শোভাযাত্রা চলতে শুরু করল কিন্তু কিছুদূর অগ্রসরের পর অন্ধকার হয়ে পাওয়ায় শোভাযাত্রার গতি দ্রুত করা হল। সন্ধ্যা ৭ টার পর সভানেত্রী তাঁর জন্য নির্দিষ্ট ভবনে পৌছুলেন।

পরদিন ২৪শে ডিসেম্বর অপরাহ্নে অল্-ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটীর একটি সংক্ষিপ্ত অধিবেশন হল। সভায় কাজ কিছুদূর অগ্রসর হতেই কেন্দ্রীয় বিধান সভার স্পীকার বিঠল ভাই প্যাটেল কালো রঙের খদ্দরের পোশাকে সজ্জিত হয়ে এবং কাল টুপি পরে প্যাণ্ডেলে প্রবেশ করলেন। মহাত্মাজী রহস্যের ছলে জিজ্ঞাসা করলেন, "উনি কি স্পীকার।" পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু বললেন যে হাঁ, তিনিই। প্যাটেল মশাই তখন একটি কোণের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন দেখে মহাত্মাজী বললেন "সর্বপ্রকার অন্তর্কাপুনি ত্যাগ করে স্পীকার মশাই সোজা প্ল্যাটফরমে চলে আসুন। অন্ততঃ আমার সঙ্গে সংগ্রামের কোন বিপদ নেই।" এই উক্তিতে সকলে হেসে উঠল। প্যাটেল মশায় হাসতে হাসতে উত্তর দিলেন যে তিনি বসবার জন্য গ্যালারী লক্ষ্য করছিলেন। এতে আবার হাস্য রোল উঠল। প্যাটেল মশায় তারপর ডায়াসে এসে আসন গ্রহণ করলেন।

তারপর অল-ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটী কয়েকটি মামুলি প্রস্তাবগুগ্রহণ করল। তারপর মহাত্মা গান্ধী সভাপতির আসন ত্যাগ করে শ্রীমতী নাইডুকে সেই আসন গ্রহণ করতে আমন্ত্রণ করলেন। হর্ষধ্বনির মধ্যে তিনি সভাপতির আসন গ্রহণ করলেন।

এই আনুষ্ঠানিক পর শেষ হলে অল-ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটি বিষয় নির্বাচনী সমিতিতে পরিবর্তিত হল।

খদ্দরের ব্যবহার এবং ভোটাধিকারের জন্য হাতে সুতা কাটার শর্ত সম্বন্ধে খুব তর্ক বিতর্ক হল।

এন্. সি. কেলকার একটি সংশোধন প্রস্তাব দ্বারা ভোটাধিকারের জন্য সুতাকাটার সর্তের পরিবর্তে বাৎসরিক ফি চার আনা মাত্র ধার্য্য এবং খদ্দর পরিধান না করার জন্য যে সকল অযোগ্যতা (ডিস-কোয়ালিফিকেশন) আরোপ করা হয়েছে সেগুলি বাতিল করতে বললেন।

এই সংশোধনী প্রস্তাব সমর্থন করলেন এম্. আর. জয়াকর, ডাঃ মুঞ্জে প্রভৃতি মধ্যপ্রদেশ ও মহারাষ্ট্রের নেতারা।

প্রস্তাবের বিরোধিতা করলেন মৌলানা শওকত আলী, এস্-শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার এবং স্বরাজ্য পার্টির ও নো চেঞ্জারদের অনেকে।

ভোটে সংশোধনী প্রস্তাব অগ্রাহ্য হল।

স্বামী গোবিন্দানন্দ একটি সংশোধনী প্রস্তাব দ্বারা কেবলমাত্র কংগ্রেসের নির্বাচিত সদস্যের জন্য খদ্দরের ব্যবহার বাধ্যতামূলক করতে চাইলেন।

আর একটি সংশোধনী প্রস্তাব দ্বারা মাদ্রাজের আবদুল হালিম খাঁ কংগ্রেস সদস্যদের জন্য সর্বদা খদ্দর পরিধান বাধ্যতামূলক করতে চাইলেন।

উভয় প্রস্তাবই ভোটে অগ্রাহ্য হল।

মহাত্মা গান্ধী পাটনায় গৃহীত প্রস্তাবটি গ্রহণ করতে বললেন। তিনি জানালেন ঐ প্রস্তাবটি আপোষের ফল, তিনি জোর দিয়ে বললেন যে স্বরাজ ডাউনিং ষ্ট্রীট থেকে আসবে না—তা আসবে তাঁদের নিজেদের চেষ্টার ফলে। যদি ভারতবর্ষ বিদেশী বস্ত্র বয়কট করতে চায় তা হলে তাকে মিলের চিন্তা ত্যাগ করতে হবে এবং সরল ও সহজ উপায়ে বস্ত্র প্রস্তুত করার জন্য চরকা গ্রহণ করতে হবে। কারণ ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করলেই সমুদয় মিল বন্ধ করে দিতে পারে কিন্তু চরকা বন্ধ করা তার পক্ষে সম্ভব হবে না।

২৫শে ডিসেম্বর অল-ইণ্ডিয়া স্বরাজ্য পার্টির সভার অধিবেশন হল। সেখানে জয়াকর, মুঞ্জে, কেলকার প্রভৃতি রেসপন্‌সিভ কো-অপারেশনিষ্টের দল সমস্ত ক্ষমতাশালী পদগুলি দখল ও তার দায়িত্বের ভার গ্রহণের জন্য একটি প্রস্তাব আনলেন। কিন্তু প্রস্তাবটি পাশ হল না।

উক্ত ২৫শে ডিসেম্বর তারিখেই অপরাহ্নে বিষয় নির্বাচনী সমিতির অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়গণের ডেপুটেশনের অন্যান্য সদস্যগণ ও ডঃ আবদুর রহমন উপস্থিত ছিলেন।

মহাত্মা গান্ধী তাঁদের সভায় পরিচয় করিয়ে দিয়ে তাঁদের অভ্যর্থনার জন্য একটি প্রস্তাব উপস্থিত করলেন।

বানারসী দাস চতুর্বেদী প্রস্তাবটি সমর্থন করতে উঠে অন্যান্য কথার পর বললেন যে বহির্ভারতের প্রবাসী ভারতবাসীর দুঃখ দুর্দশার জন্য চরম অবহেলার জন্য কংগ্রেসই দায়ী।

তারপর প্রস্তাব গৃহীত হল।

উপরোক্ত প্রস্তাব পাশ হওয়ার পর পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু স্বরাজ পার্টির কাউন্সিলে গৃহীত প্রস্তাবটি পেশ করলেন।

শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার প্রস্তাব সমর্থন করলেন। লালা লাজপত প্রস্তাবটি মোটামুটি সমর্থন করে কয়েকটি পরিবর্তনের কথা বললেন।

সি. এস্. রঙ্গ আইয়ার, টি প্রকাশম, এম্, আর, জয়াকর, মৌলানা মহম্মদ আলী, যতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত, ডাঃ মুঞ্জে, অভয়ঙ্কর প্রভৃতি সদস্যগণ এই প্রস্তাব সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

উক্ত প্রস্তাবের পর সেদিনকার মত সভার কার্য শেষ হল। আগামী কাল ২৬শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত সভা মুলতুবি রইল।

কংগ্রেসে অধিবেশনের প্রাক্কালে আজমীরের প্রতিনিধিদের জন্য একটি উদ্বেগজনক পরিস্থিতি উপস্থিত হল। নির্ব্বাচনের ত্রুটির ফলে তাঁরা প্রতিনিধির অধিকার থেকে বঞ্চিত হলেন। এর ফলে গুরুতর সঙ্কটের সম্মুখীন হতে হল। মৌলানা হসরত মোহানী তাঁদের পক্ষে সভানেত্রী শ্রীমতী নাইডুর সঙ্গে ২৪শে ডিসেম্বর রাত্রে দেখা করেন এবং আলোচনার ফলে শ্রীমতী নাইডু মোহানী সাহেবকে আশ্বাস দেন তিনি আজমীরের প্রতিনিধিদের কংগ্রেস অধিবেশনে যোগদানের অধিকার দেবেন। এই আশ্বাসের ফলে তাঁরা নিশ্চিন্ত হন কিন্তু যখন তাঁরা পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুকে ডেলিগেটের কার্ডের জন্য পত্র লেখেন তখন তিনি আজমীরের কংগ্রেস নেতা অর্জ্জুনলাল শেঠীকে জানান যে তিনি তাঁদের অনুরোধ রক্ষা করতে অক্ষম। এই সংবাদ পেয়ে মোহানী সাহেব পুনরায় শ্রীমতী নাইডুর সঙ্গে দেখা করেন তখন তিনি বলেন যে আজমীরের লোকদের তিনি বিনামূল্যে দর্শক হিসাবে কংগ্রেস প্যাণ্ডেলে প্রবেশের অধিকার দেবেন কিন্তু তাঁরা প্রতিনিধি-স্বরূপ কংগ্রেসে যোগ দিতে পারবেন না। এই সিদ্ধান্তের ফলে একটি অবাঞ্ছিত অবস্থার সৃষ্টি হল। তাঁরা একটি সভা ডেকে সাব্যস্ত করলেন যে দর্শকরূপে তাঁরা কংগ্রেসে যোগদান করবেন না।

। ১৪ ।

২৬শে ডিসেম্বর বেলা ২-৩ মিনিটের সময় কংগ্রেসের প্রথম দিনের অধিবেশনের সময় নির্দিষ্ট হয়েছিল। সহরের উপকণ্ঠে ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাস্টের নির্ম্মীয়মাণ সহরের

কিয়দংশে কংগ্রেসের অন্য অস্থায়ী তাম্বু ও খদ্দরের সহর তিলক নগর নির্মিত হয়েছিল।

কংগ্রেস অধিবেশনের জন্য সুবৃহৎ প্যাণ্ডেল প্রস্তুত করা হয়েছিল। তা ভারতবর্ষের নায়কগণের চিত্র শোভিত এবং স্থানে স্থানে পুষ্প স্তবকে সজ্জিত করা হয়েছিল।

নির্দিষ্ট সময়ের বহুপূর্বেই সুরেন্দ্রবাবু ও আমি একটি ট্যাক্সি করে তিলক নগরে উপস্থিত হলাম। প্যাণ্ডেলে প্রবেশ করে দেখলাম যে সুবৃহৎ প্যাণ্ডেল লোকে পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছে। প্যাণ্ডেলের অভ্যন্তরে ২৫ হাজার লোকের স্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছিল তা সম্পূর্ণ পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট পৃথক বসবার জায়গায় সহস্রাধিক মহিলা আসন গ্রহণ করেছিলেন।

আমাদের প্যাণ্ডেলে পৌঁছাবার অব্যবহিত পরে বেলা ১টা ৩০ মিনিটের সময় আজমীর মাড়োয়ার প্রতিনিধিগণ বিষয় নির্বাচনী কর্তৃক তাঁদের নির্বাচন বাতিল করার সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য করে প্রায় ৬০ জন প্রতিনিধি জোর পূর্ব্বক কংগ্রেস প্যাণ্ডেলে প্রবেশের জন্য চেষ্টা করতে লাগল। বহু স্বেচ্ছাসেবককে এই অনধিকার প্রবেশে বাধা দেওয়ার আহ্বান করা হল এবং প্যাণ্ডেলের গেট বন্ধ করে দেওয়া হল এবং লাঠি হাতে স্বেচ্ছাসেবকগণ তাঁদের ঘিরে রাখল। তাঁদের নেতা অর্জ্জনলাল শেঠী প্রতিনিধিদের প্রবেশ-পথ আটক করে মাটিতে শুয়ে পড়লেন। ইতিমধ্যে আরও প্রতিনিধি ও দর্শকগণ প্যাণ্ডেলে প্রবেশের জন্য সেখানে উপস্থিত হন। পেছনের ভিড়ের চাপে তাঁদের গতিরোধ করতে অপারগ হয়ে কয়েকজন প্রতিনিধি তাঁর দেহের উপর দিয়ে গেটের দিকে চলে গেলেন। ফলে তিনি (অর্জ্জনলাল শেঠী মশায়) তাঁদের পদতলে পিষ্ট হয়ে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পরে সংজ্ঞালাভ করার পর আজমীরের অন্যান্য প্রতিনিধিদের সঙ্গে তাঁকে বাইরে আটকে রাখা হল।

অন্য একটি সংবাদে প্রকাশ যে সভানেত্রী মহোদয়ার নির্দ্দেশে কংগ্রেসে প্রতিনিধিরূপে যোগদান করতে বাধা পাওয়ায় তাঁরা অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ ও ক্রোধান্বিত হন এবং কংগ্রেসের অধিবেশন আরম্ভ হওয়ার বহু পূর্ব্বেই আজমীরের তথাকথিত প্রতিনিধিদের মধ্যে প্রায় ২০ জন প্যাণ্ডেলের ভিতর জোর করে প্রবেশ করে আসন গ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের স্থানচ্যুত করতে ব্যর্থ হওয়ায় স্বেচ্ছাসেবকদের ক্যাপ্টেন বিপদসূচক বিউগল বাজান। ফলে যষ্টি হস্তে স্বেচ্ছাসেবকগণ নানাদিক থেকে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় এবং জোর করে তাঁদের প্যাণ্ডেল থেকে বের করে দেবার চেষ্টা করে। আজমীরের লোকেরা বাধা দিলে তাঁদের উপর যষ্টি প্রহার এবং মুষ্টাঘাত করা হয়। আক্রান্ত আজমীরের লোকরাও নীরব ছিলেন না। এতে প্যাণ্ডেলের ভিতর বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। তখন পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু ঘটনা স্থলে আবির্ভূত হয়ে প্রত্যেক গেটে এবং প্যাণ্ডেলের চতুর্দিকে স্বেচ্ছাসেবকগণকে মোতায়েন করলেন।

গোলমাল শান্ত হলে যথারীতি শোভাযাত্রা সহকারে নির্ব্বাচিতা সভানেত্রী মহোদয়া মুহুর্মুহু জয়ধ্বনির মধ্যে প্যাণ্ডেলে প্রবেশ করলেন। শোভাযাত্রার পুরোভাগে ডঃ হর্দিকরের সেবাদল "বন্দে মাতরম্" গাইতে গাইতে অগ্রসর হচ্ছিল। তার পশ্চাতে ছিলেন সভানেত্রী ও তাঁকে অনুসরণ করছিলেন মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, মৌলানা মহম্মদ আলী, মৌলানা শওকত আলী, ডাঃ এম্ এ. আনসারী, এন্. বি. কেলকার, ডাঃ মুরারীলাল, এস্. শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার, গঙ্গাধর রাও দেশপাণ্ডে, এস্. সত্যমূর্ত্তি এবং গিরধারী লাল।

শোভাযাত্রা প্যাণ্ডেলে প্রবেশ করা মাত্র সমবেত জনতা দণ্ডায়মান হয়ে বিপুল জয়ধ্বনি সহকারে সভানেত্রীকে অভ্যর্থনা জানাল। সভানেত্রীকে নিয়ে নেতৃবর্গ ডায়াসে উঠে আসন গ্রহণ করলেন।

যাঁরা ইতিমধ্যে ডায়াসে আসন গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন লালা লাজপত রায়, মাননীয় বিঠলভাই প্যাটেল, বল্লভভাই প্যাটেল, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী, লালা ঈশ্বর সারণ, মহম্মদ সফী,

দীপনারায়ণ সিং, উর্ম্মিলা দেবী, পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু, ডাঃ মুঞ্জে, ডঃ কৈলাসনাথ কাটজু, সি. ভি. এস্. নরসিংহ রাজু, খান্ বাহাদুর সরফরাজ হোসেন খান্, সি. রঙ্গ আইয়ার, তুলসীচরণ গোস্বামী, শরৎচন্দ্র বসু, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, এ. রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার, টি. প্রকাশম্, অভয়ঙ্কর, ডঃ মামুদ, ডঃ আবদুর রহমন্, ডঃ রাদারফোর্ড, রেভারেণ্ড হোমস্, মিস্ শ্লেড, মিস্টার ও মিসেস হাক্সলী।

নির্দিষ্ট সময়ে সভার কার্য্য আরম্ভ হল। প্রথমতঃ সমবেত কণ্ঠে কয়েকজন বালক "বন্দে মাতরম্" সঙ্গীত গাইল। তারপর শ্যামলাল গুপ্ত ও বিষ্ণু দিগম্বর মশায়রা পর পর কয়েকটি জাতীয় সঙ্গীত হিন্দীতে গেয়ে শোনালেন।

সঙ্গীতান্তে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ডঃ মুরারী-লাল তাঁর ভাষণ পড়তে মঞ্চে উঠলেন। লিখিত অভিভাষণ পাঠ করার পূর্বে তিনি মৌখিক ভাষণে বললেন যে যাঁরা সুদূর অঞ্চল থেকে কংগ্রেসে যোগদান করতে এসেছেন তাঁদের অভ্যর্থনার এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থায় বহু ত্রুটি হয়েছে। এজন্য তিনি সকলের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলেন।

তারপর তিনি বললেন যে দেশের পরিস্থিতি সম্বন্ধে মাত্র একটি কথাই বলতে চান তা হল এই যে, অসহযোগ আন্দোলনের মৃত্যু হয় নি—তার শিকড় দেশের মাটিতে দৃঢ়ভাবে প্রোথিত হয়েছে। সময় উপস্থিত হলেই তা মহা মহীরুহ রূপে দেখা দেবে এবং তার ফলে দেখা যাবে যে অসহযোগই একমাত্র পথ যা দেশের মুক্তি এনে দেবে।

মৌখিক ভাষণের পর তিনি তাঁর হিন্দীতে মুদ্রিত ভাষণ পড়ে শোনালেন।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণের পর দক্ষিণ আফ্রিকা প্রবাসী ভারতীয়দের নেতা ডঃ আবদুর রহমন তাঁদের পক্ষ থেকে সভানেত্রীকে তাঁর (সভা-নেত্রীর) নিজেরই একটি ফটো উপহার দিয়ে বললেন যে এই উপহার একটি শর্তে দিচ্ছেন! তাঁরা পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জীবিত মানব মহাত্মা গান্ধীকে ভারতকে উপহার দিয়েছেন—তিনি দক্ষিণ আফ্রিকারই ভারত-প্রবাসী। সভানেত্রী মহোদয়াও তাঁদের। তাঁর শর্ত হচ্ছে এই যে তাঁদের উভয়কে অথবা অন্ততঃ একজনকে দক্ষিণ আফ্রিকায় তাঁদের নেতৃত্ব করার জন্য ভারতকে দিতে হবে।

এই উক্তিতে সকলে হর্ষ প্রকাশ করল।

ডঃ রহমন আসন গ্রহণ করার পর সভানেত্রীর নির্দ্দেশে সাধারণ সম্পাদক গিরধারীলাল, ডঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীমতী বাসন্তী দেবী, সি. বিজয়রাঘব আচারিয়া, ডঃ অ্যানি বেসান্ত, ব্যোমকেশ চক্রবর্তী, শঙ্করাচার্য্য, রেজা আলী, শ্রীমতীসরলা দেবী, সি. রাজাগোপালাচারী এস্. সত্যমূর্তি, সোয়েব কুরেশী, রেলাভ, গোপবন্ধু দাস, আনে, এম্. এ. জিন্না, শাকলাতওয়ালা, লর্ড সিংহ প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিকট থেকে এবং নাইরোবি কংগ্রেস, প্রিটোরিয়া ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান্ এ্যাসোসিয়েশন্, জোহানস-বার্গ ও ট্রান্স্‌ভালের ভারতীয় এ্যাসোসিয়েশন্ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান থেকে কংগ্রেসের শুভেচ্ছাসূচক যে-সকল বাণী এসেছে তা পড়ে শোনালেন।

তারপর সভানেত্রী মহোদয়া তাঁর ভাষণ দেওয়ার জন্য বক্তৃতা মঞ্চের দিকে অগ্রসর হতেই চতুর্দ্দিক থেকে "বন্দে মাতরম্" "আল্লা-হো-আকবর" "সরোজিনী নাইডু কি জয়" ধ্বনি দ্বারা অভ্যর্থিতা হলেন।

তাঁর মুদ্রিত ইংরেজী অভিভাষণ প্রতিনিধিদের মধ্যে বিতরিত হয়েছিল। তিনি আর তা পড়ে শোনালেন না। তিনি উর্দুতে মৌখিক ভাষণ দিলেন।

অন্যান্য কথার পর তিনি বললেন যে তাঁরা এখানে একটি ট্র্যাজেডির ছায়ায় মিলিত হয়েছেন। দেশের শত শত যুবক কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়ে অকথ্য অত্যাচার ও নির্য্যাতন সহ্য করে কালাতিপাত করছে। তাদের একমাত্র অপরাধ যে তারা দেশকে ভালবাসে। দেশের আইনে এর কোন প্রতিকার নেই।

তারপর তিনি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের পরলোক গমনের উল্লেখ করে আবেগভরে বললেন যে গত বৎসর তাঁর নেতা মহাত্মা গান্ধী যখন কংগ্রেসের সভাপতির

কাজ চালাচ্ছিলেন তখন তাঁর পাশে একজন ছিলেন যিনি তাঁর (মহাত্মার) আশা, আকাঙ্ক্ষা ও সংগ্রামের অংশীদার। আজ আর তিনি আমাদের পাশে নেই। তিনি দরিদ্রের বন্ধুরূপে পরিচিত ছিলেন। তাঁকে সম্বোধন করা হত দেশবন্ধু দাশ বলে।

পরলোকের অজানা রাজ্যে এই রাজার প্রবেশের অনতিকাল পরে আর একজন দেশপ্রেমিকের জীবন-লীলার অবসান হল। মহান্ কংগ্রেস যাঁরা সৃষ্টি করেছিলেন তিনি ছিলেন তাঁদের অন্যতম। আমরা এটা উপলব্ধি না করে পারি না যে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের যৌবনের স্বপ্ন চিত্তরঞ্জন দাশের মধ্যে সফলতা লাভ করেছিল।

তারপর তিনি বললেন যে এই সেদিন মাত্র আমরা বলেছিলাম—দেখ, স্বাধীনতা আমাদের করতলগত হয়েছে। সেদিন এই কথাই আমরা বলেছিলাম যে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে সমুদ্র পার হয়ে একজন যাদুকর এসেছেন এবং দেশের একপ্রান্ত থেকে আর একপ্রান্ত পর্য্যন্ত অগ্নি প্রজ্বলিত করেছেন যার নাম ছিল অসহযোগ। বৃদ্ধরা স্বপ্ন দেখতে লাগলেন। যুবকেরা স্বপ্ন দেখতে লাগলেন এবং নারীগণ নির্বাপিত দীপ পুনরায় প্রজ্বলিত হয়ে তা দ্বারা তাদের আত্মা উদ্ভাসিত হতে দেখলেন। সহস্র সহস্র লোক কারাবরণ করল। সহস্র সহস্র লোক দারিদ্র্যের শপথ নিল। বহু ধনী দরিদ্র হয়ে গেল কিন্তু আজ আর তারা সেই স্বপ্নের গুরুভার বহন করতে পারছে না।

তারপর তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয় প্রবাসীরা ধ্বংসের মুখে পতিত হয়ে অবলুপ্তির আশঙ্কায় যেভাবে দিন কাটাচ্ছে তার সকরুণ অবস্থা বিশদভাবে বর্ণনা করলেন। দুঃখের দিনে তারা এখানে দূত পাঠিয়েছে কিন্তু সভানেত্রী মহোদয়া অত্যন্ত বেদনার সহিত মন্তব্য করলেন কংগ্রেসের একটি অত্যাচারেরও প্রতিকারের ক্ষমতা নেই।

তারপর তিনি জাতীয় সৈন্যবাহিনী গঠনের আবশ্যকতা সম্বন্ধে আলোচনা করে বললেন যে সৈন্যবাহিনী গঠন জাতির পক্ষে অত্যাবশ্যক।

হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সংঘর্ষ সম্বন্ধে তিনি বললেন যে যখন আজ হিন্দুর হস্ত মুসলমান ভ্রাতাদের বিরুদ্ধে এবং মুসলমানের হস্ত হিন্দু সহকর্মীদের বিরুদ্ধে উদ্যত হয়েছে, যখন তারা সকলে নিজেদের হাতেই স্বাধীনতা এবং ঐক্যবদ্ধ ভারতের সকল স্বপ্নই চূর্ণ করে ধূলায় পরিণত করেছে তখন তিনি স্বরাজের কথা কি করে বলতে সাহস করেন। তিনি অভিমত প্রকাশ করলেন যে যতক্ষণ পর্য্যন্ত দুষ্ট ক্ষত যা জাতীয় জীবনের প্রাণশক্তি নষ্ট করছে, সেই ভয়ঙ্কর ব্যাধির প্রতিকারের ব্যবস্থা না করা হয় ততদিন পর্য্যন্ত ভারতের জনগণের স্বরাজের কোন আশা নেই।

হিন্দু ও মুসলমানদের সংখ্যা-গরিষ্ঠতা, সংখ্যা-লঘুতার কথা, রক্ষা কবচ ও প্রতিরক্ষার কথা, নিরপেক্ষতা এবং সংঘর্ষের কথা বলা ত্যাগ করতে হবে। তাঁদের সকলকে বলতে হবে, ভারত আমাদেরই। জন্মভূমিই হচ্ছে একতার বন্ধন এবং যদিও ইসলাম আরবের মরুভূমির সংস্কৃতি হতে এবং হিন্দুত্ব বৈদিক যুগের আরণ্যক সংস্কৃতি হতে উদ্ভব হয়েছে তথাপি তারা অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। মরুভূমি ও অরণ্য একটি সাংস্কৃতিক স্বর্গে মিলিত হোক যার নাম হচ্ছে ভারতীয় নেশনের জন্য ভারতের স্বাধীনতা।

তারপর দেশের দারিদ্র্যের কথা উল্লেখ করে তিনি বললেন যে তাদের অগ্রগতি, সাফল্য ও স্বাধীনতা তখনই সার্থক হবে যখন গ্রামাঞ্চলে প্রতি গৃহে অন্নের, নগ্ন নারীদের লজ্জা নিবারণের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ বস্ত্রের এবং শস্যপূর্ণ দেশে দুগ্ধাভাবে যে সকল শিশু অকালে জীবনলীলা সাঙ্গ করে সেই সকল তৃষিত শিশুদের ওষ্ঠ সিক্ত করার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ দুগ্ধের ব্যবস্থা করতে না পারা যাবে।

দেশের সংবিধানের কথা উত্থাপন করে তিনি বললেন যে তাঁদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতানুসারে যে কোন সংবিধান প্রস্তুত করা হোক না কেন, অর্থাৎ সংবিধান অনুসারে পূর্ণ স্বাধীনতা হবে অথবা দেশবন্ধু দাশের মতানুসারে প্রাথমিক অবস্থায় অন্যান্য স্বাধীন দেশগুলির

সহিত পারস্পরিক সহযোগিতায় সেই স্বাধীনতা হবে অথবা সাময়িক প্রয়োজনের জন্য কংগ্রেসের ভূতপূর্ব সভানেত্রী ডঃ অ্যানি বেশান্তের উদ্ভাবিত পথে ঐ স্বাধীনতা হবে অথবা কেন্দ্রীয় সভায় নির্বাচিত সদস্যদের দাবি অনুসারে সেই স্বাধীনতা অর্জিত হবে,—যেভাবেই স্বাধীনতা অর্জন করা যাক না কেন তিনি সকলকে স্মরণ রাখতে বললেন যে ভারতবর্ষের এক-তৃতীয়াংশ ভারতীয় রাজন্যবর্গের অধীনে। কংগ্রেসের কর্তব্য হবে দেশীয় রাজ্যগুলিতে হস্তক্ষেপ না করে বন্ধুত্বের নীতি অবলম্বন করা যাতে তারা ব্রিটিশ ভারতের মহান্ আদর্শের সঙ্গে সমান লাইনে আসতে পারে। রাজন্যবর্গ যেন মুহূর্তের জন্যও মনে না করেন যে কংগ্রেস গুপ্ত বা প্রকাশ্য কোন কৌশলে তাঁদের ধ্বংস করতে চায়।

তিনি সকলকে স্মরণ রাখতে বললেন যে কংগ্রেসের কাজ হচ্ছে স্বরাজ অর্জন করা কিন্তু কংগ্রেস আজ দ্বিধা-বিভক্ত। যুক্ত থেকেও এর দুটি শাখা হয়েছে। একটি শাখার দলপতি হলেন মহাত্মা গান্ধী। তাঁরা সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে নিজেদের পরিবর্তন করতে অস্বীকার করে বলেন যে তাঁরা স্বরাজ্য চান একমাত্র মহাত্মা গান্ধীর মাধ্যমে।

অপর দলটি কংগ্রেসের অভ্যন্তরে একমাত্র রাজনৈতিক দল। তার নাম স্বরাজ্য দল। সেই স্বরাজ্য দলই প্রকৃতপক্ষে আমলাতন্ত্রের স্বেরাচারের বিরুদ্ধে প্রকৃত লড়াই করছে। দেশবন্ধু দাশের মৃত্যুর পর এই দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছেন এমন এক ব্যক্তি যিনি মনুষ্যকুলে শ্রেষ্ঠ, যিনি অগাধ ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করে দারিদ্র্য বরণ করেছেন, তাঁর নাম পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু। তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করলেন যে মাত্র একটি দলের পক্ষে শক্তিশালী আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই করা সম্ভব নয়, এই কারণে তিনি লিবারেল, ইন্‌ডিপেন্‌ডেন্ট এবং অন্যান্য দলকে পুনরায় কংগ্রেসে যোগ দিয়ে আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রাম চালানোর জন্য আবেদন করলেন।

উপসংহারে তিনি বললেন যে "আমি চরম, আত্মাহুতির জন্য ভীত নই। আমি সামান্য নারী মাত্র কিন্তু আমি আপনাদের সম্মানের ধ্বজা বহন করছি। আমি দেখব এবং ভারতের নারীগণ দেখবেন যে আপনারা পুরুষেরা যেন আর জাতির অর্জিত ঐতিহ্যের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা না করে। ভারতের নারী তার পুরুষদের আহ্বান করে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করতে বলছে যে আত্মাহুতি ছাড়া মনুষ্যত্ব কি, মৃত্যু ছাড়া জীবন কি—যে মৃত্যুর ফলে আমাদের সন্তান-সন্ততিগণ তাদের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত স্বাধীনতায় পুনর্জীবন লাভ করবে যেমন তারা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে পতিত হয়ে থেকেছে, সেইভাবে এখনও তারা পতিত অবস্থায় থাকে তাহলে তারা ঘরে ফিরে যাক এবং আমাকে, সামান্য একজন নারীকে বলতে দিক, 'মা, ওঠ। আমরা তোমাকে বন্ধ্যা দশা থেকে মুক্ত করেছি, দাসত্বের বিভীষিকা থেকে জেগে ওঠ।" নারীদের কি বলতে হবে যে দেশের পুত্রগণ অবিশ্বাসী ছিল, তার কন্যাগণ তাঁকে মুক্তি দান করেছে?

অভিভাষণ সমাপ্তির পর 'বন্দে মাতরম্' উচ্চারণ করে তিনি আসন গ্রহণ করলেন।

তারপর সভানেত্রী মহোদয়া স্বয়ং নিম্নলিখিত শোক প্রস্তাব উপস্থাপিত করলেন—

কংগ্রেস দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, স্যর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ শ্রীরামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর, এস্. কৃষ্ণস্বামী শর্মা, শ্রী ভি. এস্. আইয়ার এবং অন্যান্য দেশপ্রেমিক, যাঁরা অগ্রগতির জন্য স্ব স্ব ক্ষেত্রে কাজ করেছেন তাঁদের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করছে এবং তাঁদের শোক-সন্তপ্ত পরিবারগুলির প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করছে।

সকলে দণ্ডায়মান হয়ে প্রস্তাব পাশ করল।

ক্রমশঃ

কলকাতার তরুণের অন্তরে নতুন ভবিষ্যতের আশা

(ইউ এস আই এস কর্তৃক প্রচারিত)

কলকাতার অধিবাসী ছাব্বিশ বছরের যুবক অভিজিৎ মজুমদার হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু তিনি আবার তাঁর আশা, আত্মবিশ্বাস আর আনন্দ ফিরে পেয়েছেন। রোগ যন্ত্রণার অবসানের জন্য অভিজিতের হৃৎপিণ্ডে অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হয়েছিল। আমেরিকার বিখ্যাত হৃদরোগ-বিশেষজ্ঞ শল্য-চিকিৎসক ডঃ মাইকেল ডিবেকির নেতৃত্বে একদল চিকিৎসক প্রায় আট মাস আগে হিউস্টনের টেকসাস মেডিক্যাল সেন্টারের মেথডিস্ট হাসপাতালে অভিজিতের হৃৎপিণ্ডে অস্ত্রোপচার করেছিলেন। এর ফলেই এই যুবকের যন্ত্রণার কারণ দূর হয়ে গিয়েছিল।

মেথডিস্ট হাসপাতালে পরীক্ষা করে দেখা গেল অভিজিতের বুকের মহাধমনীর রক্তচলাচল অত্যন্ত বিপর্যস্ত। চিকিৎসকেরা দেখলেন এই মহাধমনীর ভাল্ভটি বদলে দেওয়া দরকার। সম্পূর্ণভাবে বাদ দেওয়ার নিজস্ব কৌশল প্রয়োগে ডঃ ডিবেকি তাঁর নিজস্ব বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পন্থায় এই অস্ত্রোপচার শেষ করলেন। দোষদুষ্ট মহাধমনী ভাল্ভটি সরিয়ে ফেলা হল আর তার বদলে 'কাবন বল' লাগিয়ে দেওয়া হল। এই কাবন বলটি ডঃ ডিবেকির নির্দেশেই তৈরি।

সাড়ে তিন ঘন্টা ধরে অস্ত্রোপচার চলেছিল। কলকাতার অভিজিৎ তা সহ্য করতে পেরেছিলেন আর অস্ত্রোপচারের পরেও চিকিৎসায় কোন জটিলতা দেখা যায়নি।

অভিজিৎ দীর্ঘকাল ধরে যন্ত্রণা ভোগ করেছিলেন। ছেলেবেলায় তাঁর স্বাস্থ্য ছিল চমৎকার। ১১ বছর বয়সে বাতের দরুণ তাঁর জ্বর হয়। এই থেকেই তাঁর যন্ত্রণার শুরু। স্থানীয় চিকিৎসকেরা তাঁর ব্যাধি সারিয়ে দিলেন বটে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক করে দিলেন যে এই জ্বরের ফলে পরে অভিজিতের হৃৎপিণ্ড দুর্বল হওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা রয়েছে। অভিজিতের জীবনে এই আশঙ্কা সত্য হয়ে উঠল আর দুর্ভোগও তিনি ভুগলেন।

জ্বরের পরে অভিজিৎ প্রথম জানতে পেরেছিলেন যে তিনি ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ছেন। সামান্য নড়াচড়া করলেই তিনি দুর্বল হয়ে পড়তেন। তাঁর শ্বাসকষ্টও দেখা গেল আর পা ফুলে গেল।

অভিজিৎ বলেছেন, "ধীরে ধীরে আমি হীনমন্য হয়ে পড়তে লাগলাম। শারীরিক দুর্বলতা সম্বন্ধে খুব সচেতন ছিলাম বলেই আমার সমবয়সী ছেলেদের সঙ্গ থেকে দূরে থাকতে আরম্ভ করলাম।"

বছর কেটে যেতে লাগল। কোন উপায়ে লেখাপড়া শেষ করে অভিজিৎ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক হলেন। যখনই তাঁর বুকের ব্যথা, শ্বাসকষ্ট বা পা ফোলা বেশী হত তখনই তিনি স্থানীয় চিকিৎসকদের নির্দেশে যন্ত্রণানাশক বড়ি খেতেন।

কিন্তু এরকম ত আর বেশী দিন চলতে পারে না। ১৯৭১ সালে তাঁর যন্ত্রণা আবার বাড়ল। সে সময় কলকাতার নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তাঁকে ভর্তি হতে বাধ্য হতে হল। সম্পূর্ণ পরীক্ষার পর সেখানকার চিকিৎসকেরা অভিমত দিলেন অভিজিতের মহাধমনীর ভাল্ভটি ঠিকমত কাজ করছে না।

ছেলেবেলার বাতজ্বরই অভিজিতের এই অবস্থার কারণ। কলকাতার হাসপাতালে কিন্তু তাঁর হৃৎপিণ্ডের দুষ্ট মহাধমনীর ভাল্ভটি পাল্টাবার ব্যবস্থা ছিল না। তখনকার অবস্থা সম্পর্কে তিনি বলেন, "আমি জীবনের

আশা প্রায় ছেড়েই দিয়েছিলাম। মৃত্যুর দিন গুনতে গুনতে আমি ব্যর্থ জীবন কাটাচ্ছিলাম।"

ঠিক এই সময় কলকাতার এক খবরের কাগজে ডঃ ডিবেকি কর্তৃক মাদ্রাজের এক অধিবাসীর হৃৎপিণ্ডে অস্ত্রোপচারের সংক্ষিপ্ত কাহিনী তিনি পড়েছিলেন। অস্ত্রোপচারের সাফল্য ও রোগীর সেরে যাওয়ার কথাও কাহিনীটিতে ছিল। অভিজিতের কাছে এ সংবাদই আশার আলো হয়ে দেখা দিয়েছিল।

এর কয়েকদিন পরে অভিজিৎ মার্কিন তথ্য কেন্দ্রে একটি চলচ্চিত্র দেখতে গিয়েছিলেন। মেক্সিকোর একটি ছেলের হৃৎপিণ্ডে ডঃ ডিবেকির অস্ত্রোপচারই ছিল চলচ্চিত্রের বিষয়বস্তু। এই চলচ্চিত্র দেখে কলকাতার এই যুবকের বিশ্বাস হল যে ডঃ ডিবেকিই তাঁর রোগ সারিয়ে দিতে পারেন।

তাই, ১৯৭১ সালের ১০ই সেপ্টেম্বর অভিজিৎ চিকিৎসার পরামর্শ চেয়ে মার্কিন শল্য-চিকিৎসককে চিঠি লিখলেন। অভিজিৎ উৎসাহ ভরে এই প্রসঙ্গে বলেন "যে সাড়া আমি পেলাম তা স্বপ্নেও আশা করিনি।" ডঃ ডিবেকি জানালেন ১৯৭১ সালের ২৪শে অক্টোবর তাঁকে মেথডিস্ট হাসপাতালে ভর্তি করে নেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে, হাসপাতালে থাকা ও চিকিৎসার জন্য কোন খরচই লাগবে না।

দুর্ভাগ্যক্রমে অভিজিৎ এ সুযোগ নিতে পারেনি। ডঃ ডিবেকি আবার প্রস্তাব দিলেন, কলকাতার এই যুবক যেন ১৯৭২ সালের ২রা মে মেথডিস্ট হাসপাতালে উপস্থিত হয়। ভারত সরকারের বেসামরিক বিমান দপ্তর কলকাতা থেকে নিউ ইয়র্ক যাতায়াতের ব্যবস্থায় এবার তাঁকে সাহায্য করল। ফলে অভিজিৎ এবার সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারলেন।

তারপর সব কাজ ঘড়ির কাঁটার মত ঘটে গেল। ১৯৭২ সালের ৫ই মে ডঃ ডিবেকি অভিজিতের বুকে অস্ত্রোপচার করলেন আর ৩০শে মে নিরাময় হয়ে অভিজিৎ হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেন।

অভিজিৎ পরে বলেছেন, "ডঃ ডিবেকি ও অন্যান্য সকলকে কি ভাবে যে ধন্যবাদ দেব তা সত্যই আমি জানি না। নিজেকে সব চেয়ে ভাগ্যবান্ বলে আমার মনে হয়।"

অভিজিৎ মজুমদার কিছুকাল আগেই চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেনসি পড়তে শুরু করেছিলেন। এই অস্ত্রোপচারের কল্যাণে এখন তাঁর আশা হয়েছে, পাশ শেষ করে তিনি একজন চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট হতে পারবেন। •

দ্বন্দ্ব মধুর

সুশীতল দত্ত

কিশোরগঞ্জের শচীনদা আমার পিসীমার ভাসুরের শ্যালীর ছেলে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা ছাত্র, সুপুরুষ এবং অন্যগুণের মধ্যেও ছিল খেলা-ধূলা আর গান-বাজনায় সমান পারদর্শিতা। আর এর জন্যই তাঁর নামটাও ছড়িয়ে পড়েছিল সারা কিশোরগঞ্জে। বংশ ও অর্থসম্পদে তখনকার দিনে মেঘনার পূব পাড়ে তাঁদের মত আর কেউ ছিলনা বল্লেই চলে। অনেকদিন আগের কথা, আমি একেন শচীনদার বাড়ীতে ঘটনাচক্রে বেড়াতে গিয়েছিলাম। বলাবাহুল্য তখন থেকেই শচীনদার সঙ্গে আমার অন্তরঙ্গতা এবং এই অন্তরঙ্গতা এমন এক পর্যায়ে এসে পৌঁছায় যখন থেকে শচীনদা আমার ধ্যান-জ্ঞান-আদর্শের একমাত্র নায়ক হয়ে দাঁড়ান, এক কথায় আমার যৌবনের "হিরো"।

এদিকে রংপুরে বরদা উকিল যিনি প্রয়োগবিদ্যায় সেরা পণ্ডিত হিসাবে সারা ভারতে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তিনি তখনকার সমাজে একজন সম্মানিত ও পূজিত ব্যক্তি। তাঁর বইয়ের রয়েলটি থেকে যে আয় হতো অনেকের মতে তা জগৎ শেঠের বা কাশীমবাজারের মহারাজার আয়ের মতো নাহলেও ডাঃ ডাব্লিউ, সি, রায়ের পাগলের মহৌষধি বিক্রি করে যে আয় হ'তো সেই আয়ের চাইতেও অনেক বেশী। দু'টী নাতনী ছিল তাঁর কমলা আর ইতি। কমলা বিদূষিনী নাহলেও রূপসী তো বটেই আর এই কমলা যখন কলায়-কলায় পূর্ণিমার চাঁদের মত হতে চললো তখন তার রূপ দেখে দাদুর মাথায় ভাবনা এলো বেশী, কি করে নাতনীকে তাড়াতাড়ি পাত্রস্থ করা যায়। আর তখনই তাঁর সুদক্ষ শিকারীর মতো চোখ গিয়ে পড়লো আমাদের এই শচীনদার উপর। কাকরমনি চাউল খেতে খেতে বিরক্ত মানুষের মন যেমন নিঃকাঁকর বাসমতি চাউলের ভাত পেলে খুব খুশী হয়ে উঠে তেমনি কমলার দাদু বরদা উকিলও খুব খুশী হয়ে উঠলেন। অবশ্য শচীনদার বাবাও যে এ' প্রস্তাবে বিবাদী হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন তা নয় কারণ তুরুপের তাস ছিল বরদা-উকিলের হাতে, তাই সব কিছুকেই তাঁর মেনে নিতে হলো। খুব ঘটা করে পয়সা খরচ করে রোশনাই-বাজী-বাজনায় নাতনী রূপসী কমলার কিশোরগঞ্জের খেলোয়াড়, সঙ্গীতজ্ঞ, কৃতিছাত্র আমার এই হিরো শচীনদার সঙ্গে একদিন বিয়ে হয়ে গেলো। বলাবাহুল্য সেই সুবাদেই কমলার বোন বিদুষী "ইতি"র সঙ্গে আমার মনোজগতের শুভদর্শন ক্রমে নিবিড় হয়ে এলো। কাজে অকাজে আমি ইতিদের বাড়ীতে যেতে লাগলাম। সাধও যে মনে জাগেনি তা নয়। এই ধনিক দুলালীর সংস্পর্শে আসলে হয়তো বা ভাগ্যচক্রের একটা পরিবর্তনও ঘটে যেতে পারে। কিন্তু ভগবান হয়তো অলক্ষ্যেই হেসেছিলেন আমার কথায়। কারণ তাই বেশীদূর এগোনোর আগেই এমন একটি ঘটনা ঘটলো যাকে আমি কেন, কোন মানুষই অভিনন্দন জানাতে বা স্বাগত জানাতে পারেনা। এমনি একদিন আমি ইতিদের বাড়ীর ড্রইংরুম থেকে ইতির শয়নকক্ষের দিকে যেতে যেতে অন্তরাল থেকে কথোপকথন শুনতে

পেলাম, ইতি বলছে—"এই দেখ রমলা, মেয়েদের কখনো ভাবে ভরা ফানুস হলে চলেনা, এটা মোটেই আমার পছন্দ নয়।"

—"কেন"? রমলা প্রশ্ন করলো।

—"কারণ দেখ, ফানুস আকাশে ওঠে অনেকদূর -অনেকের দৃষ্টিও আকর্ষণ করে ঠিক, কিন্তু পরিণতিটা কি? মানুষের পায়ের পেষণের নিচেই তো তার স্থান। কি রইলো তার ঐতিহ্য, কি রইলো তার উপসংহার?

—অর্থাৎ! ঠিক বুঝলাম না তোর দার্শনিকতত্ব।

—এত সহজ কথা বুঝলি না?

—কি করে বুঝবো বলো—এত হেঁয়ালী করলে।

—শোন তবে, তোর প্রশ্নের জবাব—আমার ঐ নটবর বাবু লোকটাকে খুব ভাল লাগে।

—না লাগাটাই অন্যায়, এতবড় রুচিশীল, বিদ্বান।

—হ্যাঁ, ঠিক তাই—

—তবে শঙ্খ বাজাই কি বল।

—ধীরে বন্ধু ধীরে—এখনও বক্তব্য শেষ হয়নি—

—বক্তব্যের কি আছে, মোদ্দাকথা ভাল লাগে মানেই ভালবাসা অতএব—

—আহা কি যুক্তিখানাই তোর! লাল শাড়ী ভাল লাগে, পুরুষের গোপ ভাল লাগে, মানে তুমি ভালবাসো তবে তাকেই বিয়ে কর। তাহলে ছাগলও সেক্ষেত্রে উপযুক্ত ভাল পাত্র তাই না কি?

—আমি কি তাই mean করেছি।

—নয়তো কি? নইলে ভাল লাগলেই ভালবাসাটা হয়তো বা স্বাভাবিক কিন্তু তার জন্য দুজনের উপযুক্ত ভাল দেখে বাসা খোঁজার কোন অর্থ নেই। নটবরবাবুকে ভাল লাগে তাঁর রুচিশীলতায়, তাঁর বিনয়ে কিন্তু ভাল মোটেই লাগে না তাঁর আদ্যিকালের নামে, সাদাসিধে ভাবে, তাঁর সরল বোকামীতে। মোটকথা জীবনকে ভোগ করতে যে অর্থের প্রয়োজন সেই বর্ণে-গন্ধে-স্পর্শে জীবনকে ভোগ করবার মত অর্থ তাঁর কই? তিনি সরস্বতীর সাধক। লক্ষ্মী চিরকালই তাঁর প্রতি বিমুখ তো থাকবেই।

ইতির এই বাঁকা কথায় (যা আমি অন্তরাল থেকে শুনেছিলাম) ইতির মতো সমস্ত কলেজে-পড়া মেয়েদের উপর আমার একটা বিজাতীয় ঘৃণার উদ্রেক হলো আর তার পরিণতিতে ইতিদের বাড়ীতেও যাওয়া-আসার ইতি ঘটলো।

এরপর বহুদিন কেটে গেছে বহু নদীর বহু জল সাগরে গিয়ে মিশেছে। এদেশ ওদেশ করে বহু দেশ-বিদেশ বেড়িয়ে এই আমিও এসে উপস্থিত হয়েছি কলকাতার শ্যামবাজারের একটা আস্তানায় নিঃসঙ্গ জীবন-যাপনের আশায়। মোদ্দাকথা "নারীর ললিত লোভনলীলায়" আমার আর তেমন কোন আকর্ষণ জাগেনি। আমি আমার সৃষ্ট জগৎ নিয়ে আমার পরিধির মধ্যে নিজেকে কেন্দ্র করে বসে আছি। মূল কথা আমার অর্জিত সম্পদে কোন দাম্ভিকা বিদুষী সম্পদশালিনী হয়ে আমারই বুকের উপর বসে সুখে স্বচ্ছন্দে, বর্ণ আভিজাত্যে অহঙ্কারে নিজেকে প্রকাশ করুন আর আমাকে বোকা পাঁঠা বলে প্রচার করুন আমারই পারিপার্শ্বিকে সে সুযোগ আর আমি জগতের কোন মেয়েকে দিতে চাই না। আর এটাও চাই না যে আমার এই তিলোত্তমা মহিয়সী সুচতুরা শিক্ষিতা উন্নাসিকা এই স্ত্রীর পদতলে বসে "ত্বয়া হৃষিকেশ হৃদিস্থিতেন, যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি" অথবা "যদিদং হৃদয়ং মম তদিদং হৃদয়ং তব" অথবা "ত্বং স্বাহা ত্বং স্বধাঃ ত্বং হি বসঠ্কার স্বরাত্মিকা" বলে বড়লোকের বাড়ীর একান্ত পোষ্য কুকুরের মত পড়ে থাকি আর প্রার্থনা জানাই—।

"ছাড়ালে না ছাড়ে কি করিব তারে
মোর পুরাতন ভৃত্য"

কিন্তু ইতি আমাকে ছেড়ে গিয়ে আমাকে বাঁচিয়েছে সে জন্য তার কাছে হয়তো আমি কৃতজ্ঞ, নইলে কল্পনা করুন খুব সহজ বিধানে যদি আমাদের অর্থাৎ ইতির আমি পানি পীড়ন করতাম তবে কি সত্যিই আমার অন্তরাত্মা আমার পৌরুষত্ব এমনি করে পীড়িত হতো না। যাক সেজন্য অলক্ষ্য বিধাতাকে অসীম ধন্যবাদ।

* * * *

অনেক দিন পরে একদিন চিত্রা সিনেমায় "স্বয়ংসিদ্ধা" বইখানা দেখার জন্য গিয়েছি। বইখানার বিষয়-বস্তু আমাকে খুবই আকর্ষণ করেছিল—বিশেষকরে নায়িকার চরিত্র। নিজে বিদুষী হয়েও সে গুণকে গোপন করে একজন নিরক্ষর স্বামীর সুযোগ্যা সহধর্ম্মিনী হিসেবে গোপনে তার স্বামীকে ধীরে ধীরে শিক্ষিত গুবিদ্বান করে তুললো এবং সেই পরিবারকে অপূর্ব্ব শ্রীতে মণ্ডিত করে তুললো। শিক্ষিতা মেয়ে বলতে এই রকম মেয়ের কথায় প্রাণ-মন ভরে উঠে। ছবি শেষ হয়ে গেল—চিন্তার রেশ নিয়ে বাইরে এসে দাঁড়িয়ে বারমাই সিগার টানতে লাগলাম ট্রামের অপেক্ষায়।

—হঠাৎ চোখ পড়লো বন্ধুপত্নী কমলার উপর—পাশেই নিরাভরণা কুমারী সাজে সজ্জিতা অতি আধুনিকা "ইতি"। আমার দিকে তাকিয়েই তাঁরা মুচ্‌কি মুচ্‌কি হেসে কি যেন বলছিল। শচীনদার ডাকে সামনে এগিয়ে গেলাম এবং জানতে পারলাম তারা বর্ত্তমানে কলকাতাতেই আছেন। দু'চারটা কথার বিনিময়ের পর শচীনদা আমাকে তাঁর বাসার ঠিকানা দিয়ে শ্রীপঞ্চমীর দিন তাঁর বাড়ীতে নিমন্ত্রণ জানিয়ে অপেক্ষমান গাড়ীতে গিয়ে উঠলেন। ইতিও নমস্কার বিনিময় করে ঐ একই কথার প্রতিধ্বনি তুলে তারই পথ অনুসরণ করলো- তার সঙ্গে অনুসরণ করলো কমলা বৌদিও। ইতি গাড়ী থেকে হাত নাড়িয়ে বলে 'নিশ্চয় করে আসা চাই কিন্তু নইলে—' কথা শেষ হতে পারলো না গাড়ী Speed দিয়ে বেরিয়ে গেলো। গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস কণ্ঠ ভেদ করে এলো। চিত্রাপিতের মত দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলাম-ব্যাপারখানা কি? এত আন্তরিকভাবে ইতিতো কোনদিন আমাকে আমন্ত্রণ জানাইনি, কিন্তু একি দেখলাম—ইতি কি আজও বিয়ে করেনি? সিঁথিতে সিঁদুর নেই, হাতে শাঁখা নেই, তবে কি এতদিন পর্যন্ত বিয়ে করেনি? কিন্তু কেন? তবে কি আমি তাঁর সম্বন্ধে ভুল বুঝেছিলাম? বুকের ভিতরটা টন্ টন্ করে উঠলো স্বভাবতই। ইতির মতো শিক্ষিতা মেয়ের প্রতি আর আমার কোন অভিযোগ রইলো না হঠাৎ রিক্সাওয়ালার সরস ভাষার সম্বোধনে সম্বিত ফিরে এলো। ট্রাম এসেই গিয়েছিলো তাতে উঠে পড়লাম, এবং তাড়াতাড়ি খেয়ে-দেয়ে আরেকবার ডাঃ ফ্রয়েডের মনোস্তত্বের বইখানা উলটে-পালটে দেখবার খুবই যেন প্রয়োজন বোধ করলাম। কিন্তু কার্য্যকালে নিজেকে আবিষ্কার করলাম বইখানি হাতে অপঠিত আর আমি ইতির কথাই ভাবছি। এরপর কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম মনে নেই।

নির্দিষ্ট দিনে সকালে স্নান সেরে সাজ-পোষাক করে চৌরঙ্গীগামী ট্রামে চেপে বসলাম। গন্তব্যস্থান কমলা-বৌদির বাড়ী কিন্তু মনের সমস্তটা জুড়েই ইতি তখন মহারাণীর আসনে। হঠাৎ পাশের এক বন্ধুর ডাকে তাকালাম সে বলছে "কিরে এত জামাই-সাজ করে কোথায় চলেছিস্? হঠাৎ নিজেকে আবিষ্কার করলাম, সত্যিই তো আজকের সাজ যেন বড় বেশী হয়ে গেছে, লজ্জায় কান লাল হয়ে গেল। উত্তর দিলাম—"এই এক বন্ধুর বাড়ীতে"। ট্রাম এসে থামলো ইডেন হস্‌পিট্যাল রোডের মোড়ে আমি ট্রাম থেকে নেমে শিবঠাকুরকে প্রণাম করে প্রেমচাঁদ বড়াল ষ্ট্রীটের ভিতর দিয়ে সেই বিখ্যাত বরদা উকিলের বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়ালাম। বুকের ভেতরটা তখন কাঁপছে অজানা আনন্দে এবং রহস্যে। বেশী কষ্ট করতে হলো না, সামনেই একজন বয় আমার পথপ্রদর্শক হয়ে মোজাক সিঁড়ি বেয়ে দোতালায় পশ্চিমের সিঁড়িটা পার হয়ে ডানহাতে-দক্ষিণে দিকের যে ঘরটায় নিয়ে গেল সেটা হলো শচীনদার শোবার-ঘর, শচীনদা শুয়ে রয়েছেন। আমাকে দেখেই শচীনদা তাঁর দুই মেয়েকে (যারা এতক্ষণ বাসন্তী রংয়ের কাপড় পড়ে সেজে-গুজে দাঁড়িয়ে ছিল অঞ্জলী দিতে যাবার জন্য) বললেন—"যা তোদের মাকে বল গিয়ে নটু-কাকু এসেছে, দুকাপ কফি পাঠিয়ে দিতে।"

কফি খেতে খেতে অনেক কথা-বার্তা হলো সমাজ,

সংসার, রাজনীতি কিছুই বাদ গেল না হঠাৎ কি মনে হতেই শচীনদা বলে উঠলেন, "দাঁড়া-দাঁড়া বড় অন্যায় হয়ে গেছেরে। ভাগ্যিস ইতি এসে পড়েনি, নইলে আমার কান দুটোই হয়তো আজ যেত। সত্যিই শ্যালী ভাগ্যি আমার, মানুষের শ্যালী যদি হয় ইতির মতো এমনি—"কথা শেষ না করতেই ইতির প্রবেশ,, এবং তর্জ্জনী উত্তোলন—"ভাল হবে না বলছি শচীনদা।" শচীনদা বললেন—"কি বিপদরে বাবা। কারও নাম করা যাবেনা এ বাড়ীতে ?" ইতি ততক্ষণে অদৃশ্য হয়ে গেছে। আমার বুকের ভেতর তখন চলছে তাঁতের মাকু ঠুকাঠুকি আর বিদ্যুৎ শিহরণ। বললাম—"কি ব্যাপার শচীনদা ; শচীনদা-উত্তর না দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে আমার হাত-ধরে টেনে তুললেন"—চল একজন নতুন লোকের সঙ্গে আলাপ করিয়ে নিয়ে আসি।" কৌতূহলের সঙ্গে আমি শচীনদাকে অনুসরণ করলাম। একটা লবী পার হয়ে ড্রইং-রুমের ভিতর দিয়ে আরেকটি ব্যালকনি পার হয়ে পূর্ব দিকের একটা সুসজ্জিত কক্ষে এসে উপস্থিত হলাম। খাটে-শায়িত একজন আমার বয়সী ভদ্রলোক, হাতে একখানা-বই। শচীনদা বললেন— "এঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেই; নাম শ্রীঅরুণেশ্বর রায়, কাজ করেন রিজার্ভ ব্যাঙ্কে সাহিত্যে-টাহিত্য করেন, কবিতাও বেশ লেখেন, আমার বিশেষ বন্ধু।" শচীনদার মুখে কিন্তু দুষ্টুমি ভরা হাসী—দৃষ্টি তাঁর পাশের দরজার দিকে। আমি বললাম"—আমি নটবর রায়, পেশায় শিক্ষক। বিশেষ কোন গুণ নেই তবে সর্ব্বগুণকেই আমি শ্রদ্ধা করি। এই দেখছেন না আমার মত নিগুর্ণী শচীনদার মত গুণীর কত ভক্ত! পরিচয় নমস্কার-বিনিময়ের পর অরুণবাবু সামনের সোফাটা য় বসতে বলেন। আমি চিন্তা করতে লাগলাম—এঁর সাথে এত ঘটা করে পরিচয়ের কি প্রয়োজন ? এমন সময় হঠাৎ পাশের দরজার পর্দ্দার অন্তরাল থেকে বীণানিন্দিত কণ্ঠ ভেসে এলো ইতির। আমার ভিতরটা তখন কেঁপে কেঁপে উঠছে, জিভ শুকিয়ে কাঠ। ঘামও দেখা দিয়েছে কপালে। এমন সময় দু'টী খাবারের প্লেট হাতে ঘরে ঢুকলো ইতি সেই অধুনা কুমারী বেশ। প্লেট দুটোকে টেবিলের উপর রেখে বয়কে দু' গ্লাস জল আনতে নির্দ্দেশ দিয়ে বললো —"কি নটবর বাবু, ওঁর সাথে পরিচয় হয়েছে ? উনি আমার স্বামী মিঃ অরুণেশ্বর রায়। "আমার যেন হঠাৎ আকাশ থেকে পতন ঘটলো—চোখে সর্ষে ফুল দেখতে লাগলাম। ইতির তবে বিয়ে হয়েছে! সে কুমারী নয়! আমি তবে ভুল বুঝেছি। বুঝলাম প্রগতির জোয়ারে শিক্ষিতা অতি অধুনিকার পুরাতন সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে হয়তো সংস্কার কুসংস্কারই শুধু খুঁজে পেয়েছে তাই শাঁখা সিন্দুর লোহা আজ প্রায় বর্জ্জিত হতে চলেছে।

"—কি হলো, ভাবছেন কি অত! খেয়ে নিন গুগুলো"—ইতির কণ্ঠস্বরে বর্ত্তমান এবং নিজেকে ফিরে পেলাম, বললাম—"না এই খাচ্ছি, কিন্তু এততো খাবোনা, একটি সন্দেশ উঠিয়ে নিচ্ছি, প্লেটটা নিয়ে যেতে বলুন—।"

—"না না তা হবেনা সবটাই খেতে হবে, আপনি আসবেন বলেই নিজের হাতে তৈরী করেছি সকাল থেকে। কই শচীনদা আপনি তো হাতই দিলেন না ? আপনার কোন গানের কলি মনে পড়লো বুঝি আবার ?"

—"ঠিক ধরেছিস ইতি, ঠিক,, তাই, কত অজানারে জানাইলে তুমি কতরূপে দিলে দরশন—। আবার শচীনদা"—কিল উঠালো ইতি।

—না, না, এই দেখনা এই মানুষ তার একই অঙ্গে কতই না রূপ, কখনো এই শিশু, কখনো কিশোর, কখনও তরুণ যুবক, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ, আবার দেখ হাসি কান্না, রাগ, দুঃখ, শোক, অভিমান তারপর—"

—"আবার, আবার শচীনদা—। তারপর নটবরবাবু আপনার কথা বলুন শুনি" ইতি বললো।

অরুণেশ্বর একটু নড়ে-চড়ে উঠে বললেন।

চমকের পর চমক খাচ্ছিলাম এবার খেলাম বিষম। জল খেয়ে বললাম—শুনবো বলেই তো এসেছি। নিজের জন্য চিরদিনই আমি অপ্রস্তুত—ইতি কথাটাকে

কেড়ে নিয়ে বলে উঠলো—"মনে হয় জীবনে অনেক কামনার বস্তুই এই অপ্রস্তুতির জন্য হয়তো হারিয়েছেন।"

—তা হয়তো হারিয়েছি (কথাটা বলতে গিয়ে জিভে কামড় খেলাম)। কথাটা কি জানেন ইতি দেবী, পৃথিবীতে এমন অনেক বস্তু আছে যা নাগালের বাইরে তা পেলাম না বলে দুঃখ থাকলেও অভিযোগ নেই। চেষ্টা করে বলতে পারা যায় কোনটা নাগালের মধ্যে কোনটা বাইরে। প্রচেষ্টার হয়তো বা একান্ত অভাব ছিল এসব হারানোর পিছনে। আর তা হয়তো ছিল কারণ যা স্পষ্ট করে সত্য বলে জানতে পারলাম তাকে অস্বীকার করি কি দিয়ে বলুন—।

—"এটা আপনার অভিমানের কথা। ভীরুতার কথা। বীরভোগ্যা বসুন্ধরা কথাটা মানেন তো—"

—তা ঠিক কিন্তু ধরুন পরের বাগানে যে পাকা আমটা নাগালের বাইরে ঝুলছে তার প্রতি আমার আকর্ষণ হয়তো থাকতে পারে, বীরদর্পে তাকে ডাকাতি করে আনবার মধ্যে জয়ের আনন্দও হয়তো আছে কিন্তু পরিণামটাকে অস্বীকার করতে পারেন কি?

—পরিণামের চিন্তা থাকলে লোভ দিতে নেই।

—লোভটা মানুষের স্বভাবজাত, নইলে সে সন্ন্যাসী হয়ে যেতো—

—সেটাতো আবার ক্লীবতা, জীবনকে এঁরা ভয় করে, সংগ্রামকে এঁরা ভয় করে—তাই Grapes are Sour বলে দূরে সরে যায়।

আবার বিষম খেলাম। শেষ ঢোক জল খেয়ে সামনের দিকে Plate টা সরিয়ে দিতে লক্ষ্য পড়লো শচীনদা আর অরুনেশ্বর তাঁদের নিজেদের অফিসের গল্পে খুব মেতে উঠেছেন—ইতি দৃষ্টিটাকে উদাস করে Serious ভঙ্গিতে প্রশ্ন করলো "আচ্ছা নটবরবাবু, বলতে পারেন মানুষ কি চায়?

—যদি বলি দম্ভ, অর্থ, প্রতিপত্তি—

—হোল না—

—যদি বলি প্রেম, প্রণয়, ভালবাসা।

—হোল না সেটাও আপেক্ষিক।

—তবে মানুষের জানা নেই সে কি চায়—

—না, তাও হলো না -

—তবে—?

—শান্তি। অথচ কি মজা দেখুন, মানুষ শান্তি পেতে যেয়ে যা চায় বা পায় তা শান্তি নয় শান্তি, বলতে পারেন শান্তির পথ কোনটা?

—নিজেকে ভাল করে জানা আর সেই জানাকে ছড়িয়ে দেওয়া দশের মধ্যে।

—ওতো স্বামিজী মার্কা কথা হলো। যাক্ এসব কথা বাদ দিন। আপনার কথা শুনি, আচ্ছা আপনি বিয়ে করেছেন কোথায় তা তো শোনা হলো না। বউ কেমন হলো—

—আজ্ঞে বিয়ে করার সময় ঠিক আজও হয়ে ওঠেনি।

—সময় হয়ে ওঠেনি—না কারুর প্রতি অভিমানে—

—না।

—তবে?

—ঘৃণায়।

—ঘৃণার কারণ?

—প্রকৃত শিক্ষিতা হয়েও যারা অর্থের মাপ কাঠিতে মনুষ্যত্ব, গুণ এবং জীবনকে মাপবার চেষ্টা করে তাঁদের—

"থাক্ থাক্, নটবরবাবু—(ইতির চোখে জল জমছিল) —তারই তো শান্তির পর্ব চলেছে"—নিজেকে সংযত করতে না পেরে চোখে আঁচল চেপে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল ইতি। আমি আবার চমক খেলাম। ঘর সুদ্ধ সবাই স্তব্ধ হয়ে তার গতিপথের দিকে তাকিয়ে রইলো। স্তব্ধতা ভঙ্গ করলেন অরুণেশ্বর—"Stupid, Sentimental."

কোথা দিয়ে ব্যাপারটা যে কিভাবে ঘটে গেল বুঝবার আগেই অপ্রস্তুত হয়ে পড়লাম, লজ্জায় ঘামতে লাগলাম। শচীনদা ব্যস্ত হয়ে বলে উঠলেন—"অরুণ, তুমি বরং এখন বিশ্রাম করো? উত্তেজিত হয়ো না,

সংসার, রাজনীতি কিছুই বাদ গেল না হঠাৎ কি মনে হতেই শচীনদা বলে উঠলেন, "দাঁড়া-দাঁড়া বড় অন্যায় হয়ে গেছেরে। ভাগ্যিস ইতি এসে পড়েনি, নইলে আমার কান দুটোই হয়তো আজ যেত। সত্যিই শ্যালী ভাগ্য আমার, মানুষের শ্যালী যদি হয় ইতির মতো এমনি—"কথা শেষ না করতেই ইতির প্রবেশ,, এবং তর্জনী উত্তোলন—"ভাল হবে না বলছি শচীনদা।" শচীনদা বললেন—"কি বিপদরে বাবা। কারও নাম করা যাবেনা এ বাড়ীতে ?" ইতি ততক্ষণে অদৃশ্য হয়ে গেছে। আমার বুকের ভেতর তখন চলছে তাঁতের মাকু ঠুকাঠুকি আর বিদ্যুৎ শিহরণ। বললাম—"কি ব্যাপার শচীনদা ; শচীনদা-উত্তর না দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে আমার হাত-ধরে টেনে তুললেন"—চল একজন নতুন লোকের সঙ্গে আলাপ করিয়ে নিয়ে আসি।" কোতূহলের সঙ্গে আমি শচীনদাকে অনুসরণ করলাম। একটা লবী পার হয়ে ড্রইং-রুমের ভিতর দিয়ে আরেকটি ব্যালকনি পার হয়ে পূব দিকের একটা সুসজ্জিত কক্ষে এসে উপস্থিত হলাম। খাটে-শায়িত একজন আমার বয়সী ভদ্রলোক, হাতে একখানা-বই। শচীনদা বললেন— "এঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেই; নাম শ্রীঅরুণেশ্বর রায়, কাজ করেন রিজার্ভ ব্যাঙ্কে সাহিত্যে-টাহিত্য করেন, কবিতাও বেশ লেখেন, আমার বিশেষ বন্ধু।" শচীনদার মুখে কিন্তু দুষ্টুমি ভরা হাসী—দৃষ্টি তাঁর পাশের দরজার দিকে। আমি বললাম"—আমি নটবর রায়, পেশায় শিক্ষক। বিশেষ কোন গুণ নেই তবে সর্বগুণকেই আমি শ্রদ্ধা করি। এই দেখছেন না আমার মত নিগুণী শচীনদার মত গুণীর কত ভক্ত। পরিচয় নমস্কার-বিনিময়ের পর অরুণবাবু সামনের সোফাটায় বসতে বলেন। আমি চিন্তা করতে লাগলাম—এঁর সাথে এত ঘটা করে পরিচয়ের কি প্রয়োজন ? এমন সময় হঠাৎ পাশের দরজার পর্দার অন্তরাল থেকে বীণানিন্দিত কণ্ঠ ভেসে এলো ইতির। আমার ভিতরটা তখন কেঁপে কেঁপে উঠছে, জিভ শুকিয়ে কাঠ। ঘামও দেখা দিয়েছে কপালে। এমন সময় দু'টী খাবারের প্লেট হাতে ঘরে ঢুকলো ইতি সেই অধুনা কুমারী বেশ। প্লেট দুটোকে টেবিলের উপর রেখে বয়কে দু' গ্লাস জল আনতে নির্দেশ দিয়ে বললো —"কি নটবর বাবু, ওঁর সাথে পরিচয় হয়েছে ? উনি আমার স্বামী মিঃ অরুণেশ্বর রায়। "আমার যেন হঠাৎ আকাশ থেকে পতন ঘটলো—চোখে সর্ষে ফুল দেখতে লাগলাম। ইতির তবে বিয়ে হয়েছে! সে কুমারী নয়! আমি তবে ভুল বুঝেছি। বুঝলাম প্রগতির জোয়ারে শিক্ষিতা অতি অধুনিকার পুরাতন সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে হয়তো সংস্কার কুসংস্কারই শুধু খুঁজে পেয়েছে তাই শাঁখা সিন্দুর লোহা আজ প্রায় বর্জ্জিত হতে চলেছে।

"—কি হলো, ভাবছেন কি অত! খেয়ে নিন গুগুলো"—ইতির কণ্ঠস্বরে বর্ত্তমান এবং, নিজেকে ফিরে পেলাম, বললাম—"না এই খাচ্ছি, কিন্তু এততো খাবোনা, একটি সন্দেশ উঠিয়ে নিচ্ছি, প্লেটটা নিয়ে যেতে বলুন—।"

—"না না তা হবেনা সবটাই খেতে হবে, আপনি আসবেন বলেই নিজের হাতে তৈরী করেছি সকাল থেকে। কই শচীনদা আপনি তো হাতই দিলেন না ? আপনার কোন গানের কলি মনে পড়লো বুঝি আবার ?"

—"ঠিক ধরেছিস ইতি, ঠিক,, তাই, কত অজানারে জানাইলে তুমি কতরূপে দিলে দরশন—। আবার শচীনদা"—কিল উঠালো ইতি।

—না, না, এই দেখনা এই মানুষ তার একই অঙ্গে কতই না রূপ, কখনো এই শিশু, কখনো কিশোর, কখনও তরুণ যুবক, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ, আবার দেখ হাসি কান্না, রাগ, দুঃখ, শোক, অভিমান তারপর—"

—"আবার, আবার শচীনদা—। তারপর নটবরবাবু আপনার কথা বলুন শুনি" ইতি বললো।

অরুণেশ্বর একটু নড়ে-চড়ে উঠে বসলেন।

চমকের পর চমক খাচ্ছিলাম এবার খেলাম বিষম। জল খেয়ে বললাম—শুনবো বলেই তো এসেছি। নিজের জন্য চিরদিনই আমি অপ্রস্তুত—ইতি কথাটাকে

কেড়ে নিয়ে বলে উঠলো—"মনে হয় জীবনে অনেক কামনার বস্তুই এই অপ্রস্তুতির জন্য হয়তো হারিয়েছেন।"

—তা হয়তো হারিয়েছি (কথাটা বলতে গিয়ে জিভে কামড় খেলাম)। কথাটা কি জানেন ইতি দেবী, পৃথিবীতে এমন অনেক বস্তু আছে যা নাগালের বাইরে তা পেলাম না বলে দুঃখ থাকলেও অভিযোগ নেই। চেষ্টা করে বলতে পারা যায় কোনটা নাগালের মধ্যে কোনটা বাইরে। প্রচেষ্টার হয়তো বা একান্ত অভাব ছিল এসব হারানোর পিছনে। আর তা হয়তো ছিল কারণ যা স্পষ্ট করে সত্য বলে জানতে পারলাম তাকে অস্বীকার করি কি দিয়ে বলুন—।

—"এটা আপনার অভিমানের কথা। ভীরুতার কথা। বীরভোগ্যা বসুন্ধরা কথাটা মানেন তো—"

—তা ঠিক কিন্তু ধরুন পরের বাগানে যে পাকা আমটা নাগালের বাইরে ঝুলছে তার প্রতি আমার আকর্ষণ হয়তো থাকতে পারে, বীরদর্পে তাকে ডাকাতি করে আনবার মধ্যে জয়ের আনন্দও হয়তো আছে কিন্তু পরিণামটাকে অস্বীকার করতে পারেন কি?

—পরিণামের চিন্তা থাকলে লোভ দিতে নেই।

—লোভটা মানুষের স্বভাবজাত, নইলে সে সন্ন্যাসী হয়ে যেতো—

—সেটাতো আবার ক্লীবতা, জীবনকে এঁরা ভয় করে, সংগ্রামকে এঁরা ভয় করে—তাই Grapes are Sour বলে দূরে সরে যায়।

আবার বিষম খেলাম। শেষ ঢোক জল খেয়ে সামনের দিকে Plate টা সরিয়ে দিতে লক্ষ্য পড়লো শচীনদা আর অরুনেশ্বর তাঁদের নিজেদের অফিসের গল্পে খুব মেতে উঠেছেন—ইতি দৃষ্টিটাকে উদাস করে Serious ভঙ্গিতে প্রশ্ন করলো "আচ্ছা নটবরবাবু, বলতে পারেন মানুষ কি চায়?

—যদি বলি দম্ভ, অর্থ, প্রতিপত্তি—

—হোল না—

—যদি বলি প্রেম, প্রণয়, ভালবাসা।

—হোল না সেটাও আপেক্ষিক।

—তবে মানুষের জানা নেই সে কি চায়—

—না, তাও হলো না -

—তবে—?

—শান্তি। অথচ কি মজা দেখুন, মানুষ শান্তি পেতে যেয়ে যা চায় বা পায় তা শান্তি নয় শান্তি, বলতে পারেন শান্তির পথ কোনটা?

—নিজেকে ভাল করে জানা আর সেই জানাকে ছড়িয়ে দেওয়া দশের মধ্যে।

—ওতো স্বামিজী মার্কা কথা হলো। যাক্ এসব কথা বাদ দিন। আপনার কথা শুনি, আচ্ছা আপনি বিয়ে করেছেন কোথায় তা তো শোনা হলো না। বউ কেমন হলো—

—আজ্ঞে বিয়ে করার সময় ঠিক আজও হয়ে ওঠেনি।

—সময় হয়ে ওঠেনি—না কারুর প্রতি অভিমানে—

—না।

—তবে?

—ঘৃণায়।

—ঘৃণার কারণ?

—প্রকৃত শিক্ষিতা হয়েও যারা অর্থের মাপ কাঠিতে মনুষ্যত্ব, গুণ এবং জীবনকে মাপবার চেষ্টা করে তাঁদের—

"থাক্ থাক্, নটবরবাবু—(ইতির চোখে জল জমছিল) —তারই তো শান্তির পথ্য চলেছে"—নিজেকে সংযত করতে না পেরে চোখে আঁচল চেপে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল ইতি। আমি আবার চমক খেলাম। ঘর সুদ্ধ সবাই স্তব্ধ হয়ে তার গতিপথের দিকে তাকিয়ে রইলো। স্তব্ধতা ভঙ্গ করলেন অরুণেশ্বর—"Stupid, Sentimental."

কোথা দিয়ে ব্যাপারটা যে কিভাবে ঘটে গেল বুঝবার আগেই অপ্রস্তুত হয়ে পড়লাম, লজ্জায় ঘামতে লাগলাম। শচীনদা ব্যস্ত হয়ে বলে উঠলেন—"অরুণ, তুমি বরং এখন বিশ্রাম করো? উত্তেজিত হয়ো না,

এখন চলি পরে আবার আসবো"। নমস্কার বিনিময় করে ঘর থেকে বেরিয়ে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। কিন্তু ইতিকে পূর্ণ স্বরূপে নতুন করে জানতে পারায় দুঃখের বদলে আনন্দই হলো বেশী। অনেক আরাম লাগলো বুকটায়।

ফিরে এসে বসলাম শচীনদার ঘরে। আমাকে বসতে বলে শচীনদা অন্য ঘরে চলে গেলেন। আমি ভাবতে লাগলাম ইতির কথা—রহস্যময়ী নারী কি জানি বুঝেও যেন বুঝে উঠতে পারি না। তবে এইটুকু বুঝতে পেরে স্থির সিদ্ধান্তে এসেছি যে, ইতির সচেতনমন সেই-দিন ছিল চমক লাগানো রঙীন কল্পন। নিয়ে ভরা, তাই সেদিন অর্থকেই দেখেছিল জীবনের মাপকাঠি, বৈভবকে বুঝেছিল বাঁচবার পাথেয়। সেদিন সে নিজেও বুঝতে পারেনি তার অবচেতন মনের উপরে ভবিষ্যতের জন্য রেখে একটা যাচ্ছে ভারী দাগ আমারই সম্বন্ধে, যখন নিজে এই কথাটা স্থূল মনে উপলব্ধি করতে পারলো তখন সে নিজেই তার নাগালের বাইরে চলে গেছে। পথ সংশোধনের। কারণ আমিও চলে গেছি অনেক দূরে—নেইঅজানার—বুকে—আর তাঁর বিয়েও হয়ে গেছে। সে তার নিজের মনোজগতে যে স্বর্গ রচনা করেছিল ঠিক সেইমতো বাস্তবকে রূপায়িত করতে করতে হয়তো এগিয়েও চলেছিল কিন্তু যতই সে এগিয়েছে ততই সে তার কল্পনা স্বর্গ আর বাস্তবের গাহস্থ্য স্বর্গের মধ্যে বিরাট করে ফাঁক আবিষ্কার করতে করতে অবশেষে হয়তো দেখতে পেয়েছে তার গোটা জীবনটাই একটা বিরাট ফাঁকির মধ্যে আশ্রয় নিয়েছে। এতকাল সে নিজেকেই নিজে ফাঁকি দিয়ে এসেছে। অর্থ, সম্মান, প্রতিপত্তি, বৈভব, High society, ডাকসাইটে রাশভারী অফিসার স্বামী, বাড়ী গাড়ী সবই হয়তো পেয়েছে, কিন্তু পায়নি কোন অঙ্ক মেলানোর সূত্র। তাই দাম্পত্য জীবনখানা হয়ে উঠেছে তার কাছে হয়তো ক্লেদকর, বিষময়। অবশ্য একটা জিনিষ আমি লক্ষ্য করেছি ইতির ঘরে বসে, সেটা হলো ইতি আর তাঁর স্বামী, উভয়ের মধ্যে উভয় খুব আন্তরিক নয়। আর ইতির শান্তির পথ খোঁজার কথাটা তার প্রমাণ।

"শুনুন, আপনি কিন্তু রাত্রিরে একেবারে খেয়ে-দেয়ে এখান থেকে যাবেন"—হঠাৎ ইতির কণ্ঠস্বরে চমকে চাইলাম, পাশের দরজায় সে দাঁড়িয়ে খুব স্বাভাবিকভাবে, এমন যেন এর আগে কিছুই ঘটেনি। আমি ইতঃস্তত করছি দেখে বলল—"কোন Lame excuse কিন্তু শুনছি না।

—বেশ খাবো, কিন্তু একটা শর্ত

—শর্ত! বেশ বলুন আপনার শর্ত

—আপনাকে আমার কয়েকটি প্রশ্নের জবাব দিতে হবে।

অবশ্য যদি বাধা না থাকে।

—বাধা? না-না বাধা কোথায়? বাধা কিসের?

—একান্ত ব্যক্তিগত বলে। অনধিকার চর্চা করছি বলে। আমি আপনার একান্ত শুভাকাঙ্খী, সুসমাধানই আমার কাম্য।

—কিসের সমাধান! সমাধান তো হয়েই আছে সব। —ওকে কি আর সমাধান বলে? দেখুন, বেতালগীতে ছন্দপতন ঘটে, বাড়ে গ্লানি—ক্লেদাক্ত হয়ে পড়ে স্বচ্ছল জীবনখানি. পরিণতি ভয়াবহ।

কোন ভয়ই আজ আর আমার নেই নটবরবাবু। বিশেষ প্রগতিশীলা শিক্ষিতা নারী বলেই কি তার কাছ থেকে মানুষ এইসব আশা করবে আজ।

—মানুষ! মনুষ্যত্ব কোথায়—?

—কেন বিবেকে—

—ওটা তো একান্ত আপেক্ষিক অথবা Synthetic বলতে পারেন—

—ঠিক মানতে পারলে হয়তো খুশী হতাম ইতি দেবী।

—একটা কথার জবাব দেবেন নটবরবাবু'

—বলুন—

—বিয়েটাই কি জীবনের, সমাধান এবং সব?

—হয়তো নয়। তবে বেঁচে থাকলে, বাঁচতে গেলে জৈবিক মনের ক্ষুধাকে তো আর অস্বীকার করা যায় না। অবশ্য দেহটা তার প্রকাশ ক্ষেত্র।

—তাই যদি হবে তবে বিয়ের প্রয়োজন কি নটবরবাবু? নারী পুরুষের সহাবস্থানই তো যথেষ্ট।

—কি বলছেন ইতি দেবী! বিবাহ কতবড় পবিত্র—কতবড় শর্ত্তের কথা। বিশেষরূপে বহন করা বা বাহন হবার শর্ত্ত। কতবড় mutual surrender.

—আর সেই শর্ত্ত যখন পদে পদে পদদলিত হয়?

—আমি শর্ত্ত বলতে contract বুঝাইনি, বুঝিয়েছি অঙ্গীকার।

—Of course! আপনি না বুঝলেও আমি হলপ করে বলতে পারি Marriage is the social contract of lives and matrimonial union or tie is the only channel of communication between the two opposite sexes just to satisfy their neolythic sexual hunger by nature from the point of socialistic pattern and so called civilized view.

—কি বলছেন, ইতি দেবী? বিবাহ বন্ধন যে সার্থক হয়ে ওঠে উভয়ের ত্যাগ, প্রতিশ্রুতি ও বিশ্বাস রক্ষার উপর—তাইতো পবিত্র।

—আমিও তো সেই কথাটা বলছি নটবরবাবু—ত্যাগটা কি শুধু একপক্ষের কাছ থেকেই আসবে চিরকাল—

—না-তা কেন?

—আর প্রতিশ্রুতি যেখানে পদে পদে ভঙ্গ হয়, কলুষিত হয়-সেখানে। সেখানে কি নটবরবাবু?

—mutual understandingটা clear রাখার চেষ্টা

—তার মানেই তো সেই contract. সে contract যখন fail করে?

—আহা! হা, বিবাহকে Business বলে ধরছেন কেন ইতি দেবী?

—ধরবো না কেন বলুন—যেখানে ত্যাগ নেই, পবিত্রতা নেই, বিশ্বাস-সহযোগিতা কিছুই নেই, সেখানে বিয়ে জিনিষটা নিছক Businessই। আর এই Business contract fail করলে হয় Breach of contract তখন Contract makers সব সম্পর্কই তো ছিন্ন করে, নয় কি?

—তা করে, কিন্তু মন ভালবাসা বলে কি কোন বস্তু নেই সংসারে?

—থাকবে না কেন, নিশ্চয়ই আছে। তা না হলে পৃথিবী টিকে আছে কি করে? কিন্তু veni-vidi—viciর Policy যেখানে কঠিন সত্য সেখানে Romeo Juliet অথবা Othelo পর্ব্ব গড়ে উঠে না নটবরবাবু। Hellen of Troy, Cleopetra, Anna karenina'র চরিত্রই গড়ে ওঠে যুগে যুগে এবং সেটাই একমাত্র সমাধান আর সত্য। বিবাহ বন্ধন নিয়ে স্বর্গ থেকে খসে আসিনি আমরা মর্ত্তেই গড়েছি আমারা এটা আমাদের কতগুলো স্বার্থ এবং সুবিধার জন্য। সেটা ভেঙ্গে চুরে ধ্বংস হয়ে গেলে ক্ষতি কি? সেখানে নারী পুরুষের জীবন তাল-মান ছন্দ-লয়-গতিতে-কর্ম্মে সর্ব্বদাই বিপরীতমুখী?

—এটাই কি আপনার পরম সত্য মানে final realisation?

—জানিনা—তবে এটা আমার সিদ্ধান্ত—

স্বয়ংসিদ্ধার নায়িকার মত কি কোন চেষ্টাই চলে না আপনার তরফ থেকে ইতিদেবী?

—চলতো—যদি দেখতাম বা বুঝতাম অপরপক্ষ থেকে কোন সহানুভূতি, কোন সাহচর্য্য ত্যাগ, আন্তরিকতা আমার প্রতি ভেসে এসেছে। বলতে পারেন, কোন সহধর্ম্মিণী তাঁর স্বামীকে Outing, Picnic, বলের আসর, Night Clubএর সুরা সাথী বা পরস্ত্রীর আশ্রয়ে দেখতে ভালবাসে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত?

—আপনাকেই মোড় ঘোরাতে হবে নিজেরই কল্যাণে।

—কল্যাণ— It is a vague term and it is far away from us. বহু চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছি and lastly I am exhausted. I am totally lost নটবরবাবু,

Specially for this type of precarious and untidy life.

—এরপর ?

—এরপর! জানিনা। আপনই বলুন, আপনার কাছেই জবাব চাই। আপনই না বলেছিলেন আমার শুভাকাঙ্খী—(ইতির চোখে জল ভরে উঠলো) আজ জবাব দিতে না পারেন আর একদিন দেবেন কিন্তু উত্তর আপনার কাছেই চাই, না পেলে বুঝবো আপনই কাপুরুষ! জ্ঞান বিদ্যার জগতে আপনি একটি গ্রন্থকীট, কূপমণ্ডুক নয় সাংঘাতিক ভণ্ড।

উত্তরের অপেক্ষা না করে ত্রস্ত গতিতে ইতি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আর তার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘরে ঢুকলেন কমলা বৌদি। হাতে সরস্বতী পূজার প্রসাদ ও একগ্লাস জল, টেবিলের উপর ওগুলো রেখে বল্লেন—"কি বলছিল ইতি ?"

আমি সোজাসুজি এর উত্তর না দিয়ে প্রশ্ন করলাম—"এদের বিয়ের Match maker কে বৌদি ?"

—"স্বয়ংবরা।" রহস্যময় হাসি কমলা বৌদির মুখে "এটা ঐ সবেরই স্বাভাবিক পরিণতি আর কি—"

—স্বয়ংবরা হলেই যে এরকম পরিণতি হবে সেটা খুব যুক্তিগ্রাহ্য নয় বৌদি। তবে তো রাম-সীতা, অর্জুন-সুভদ্রা, পৃথিরাজ-সংযুক্তা প্রভৃতির ইতিহাস পুরাণ সবই মিথ্যে হয়ে যেতো।

—হ্যাঁ মিথ্যেই ঠাকুরপো। যে সব Reference টানলেন একটু চিন্তা করলে দেখা যায় সব ক্ষেত্রেই Survival of the fittest'র সূত্র—অনুযায়ী-আর-এখানে Tug of war চলছে দুই সমশক্তির।

—এর পরিণতি ?

—উভয় পক্ষের শক্তি যত বেশী হবে দড়িটা ছিঁড়ে যাবে।

—কত ভয়ানক।

—প্রগতির যুগে কিছুই ভয়ানক নয়—বরং ভয়ানক হচ্ছে জোর করে দুটী বিপরীত চরিত্রের একটা বন্ধনের মধ্যে থাকবার প্রাণান্তকর চেষ্টা করা—নিন্, এবারে আপনি হাত দিন তো Plateএ।

আমি গভীর চিন্তান্বিত অবস্থায় আপেলের টুক্‌রোটা Plate থেকে তুলে মুখে দিলাম—।

—"কি হে Philosopher, কি চিন্তা করছো এমন অভিনিবেশ সহকারে"—ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলেন শচীনদা। "দেখে মনে হচ্ছে কোন গভীর সমস্যায় পড়েছো—"

—"আচ্ছা শচীনদা, জীবনের অর্থ কি বলতে পারেন ?" খেজুরের টুকরোটা মুখের কাছে তুলে নিলাম।

—অর্থ ? খুব সহজ—জীবন অর্থ বেঁচে থাকা না মরা পর্যন্ত, তা সে যে ভাবেই হোক—

—না ঠাট্টা নয়—

—আরে ঠাট্টা দেখলে কোথায়—এছাড়া কোন অর্থ নেই। তবে যদি বলি লক্ষ্য কি সুখী হওয়া—বড়লোক হওয়া সে যে ভাবেই হোক—

—যাও, তোমাদের আলোচনা থামাওতো এখন। মুখ-হাত ধুয়ে এসো। ভালো করে মাথাটা ধুয়ে ফেলো কিন্তু—। বৌদি কথার মোড় ঘোরাতে চাইলেন। শচীনদা সাট খুলতে খুলতে বললেন—"তাইতো যাচ্ছি, কিন্তু—"

শচীনদা কথা শেষ করার আগেই আমি বিস্মিত স্বরে প্রশ্ন করলাম—"আরে কি ব্যাপার শচীনদা, আপনার বুকে-পীঠে ব্যাণ্ডেজ ?"

—"ফোড়া হয়েছিল, operation করিয়েছে"—বৌদি ব্যস্তসমস্ত হয়ে উত্তর দিলেন। কি হলো, যাও তো, দেরী করো না।"—

শচীনদা বিকট শব্দ করে হেসে উঠলেন।

—কি হলো শচীনদা, এত জোর করে—

—হাসলাম কেন ? তাই বলতে চাও তো ?

—হ্যাঁ

—জীবন, বুঝলে না এইটাই তো জীবন, আচ্ছা বলতো, ভালবাসা কয় প্রকার ?

—ও রসে বঞ্চিত গোবিন্দ দাস।

—তবে শোন। দুই প্রকার। স্বর্গীয় নারকীয়।

"জানেন ঠাকুপো, উনি এর উপর Research শুরু করে Thesis লিখবেন—" বৌদির কণ্ঠস্বর যেন কেমন তেতো তেতো মনে হলো।

—কিন্তু প্রশ্ন করলে না তে নটবর, ভালবাসা কোন পন্থী?

—উদারপন্থিই তো জানা আছে।—আমি বললাম।

—"পারলে না, সেও দুই প্রকার—অহিংস এবং সহিংস। একই ভালবাসার মধ্যেই দুটোরই বাস। ভালবাসাটাকে যখন একজনই ভোগ করে ততক্ষণ সেটা অহিংস, কিন্তু সেই ভালবাসারই যখন কোনও অংশীদার জুটে যায় অথবা সন্দেহ জাগে অংশীদার আছে বলে তখন ভালবাসা হাত নখ বের করে সহিংস হয়ে ওঠে।

শচীনদা একবার আড় চোখে তাকালেন বৌদির দিকে ঠোটের কোনায় একটু দুষ্টুমি ভরা হাসির রেশ—। বৌদিও একবার শচীনদার চোখা-চোখি তাকিয়ে গম্ভীর হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন—"জানিনা বাপু, যা ইচ্ছা তাই করো—"

আমি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলাম। সব যেন কেমন গোলমাল হয়ে গেছে মাথার মধ্যে। শচীনদা উদ্ধার করলেন। বল্লেন—"বুঝলে না ব্যাপারটা"—আমি নীরবে প্রশ্নবোধক দৃষ্টি মেলে ধরলাম শচীনদার দিকে।

"দিন তিনেক আগের ঘটনা"—শচীনদা শুরু করলেন, "আমার বুক পকেট থেকে একটা প্রেমপত্র আবিষ্কার করলো কমলা—লিখেছে "জ্ঞানদা"। ঠিক প্রেমপত্র নয় আমন্ত্রণ পত্র। লিখেছে আমাকেই—'তুমি যে বিয়ের পর এমনি করে ভুলে যাবে এটা কোন দিন আশা করিনি। যাই হোক তুমি ভুলে গেলেও আমি কিন্তু আজও তেমনি আছি। হাঁ শোন, আগামী রবিবার বিকেলবেলা আমার একক জলসার আয়োজন হয়েছে, আমিও গাইবো তাই তোমাকে গাইতে হবে। আরও কয়েকজন নামকরা গায়ক আসছেন। আসা চাই নইলে দুঃখ পাবো। প্রীতি অন্তে ইতি—তোমার "জ্ঞানদা'' এই হলো সমস্যা। একটা মেয়ের সঙ্গে এতদিন ধরে লুকিয়ে লুকিয়ে প্রেম করে চলেছি আর কমলার সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করে চলেছি। এতবড় অমানুষিক কাজ দেবতারও ক্ষমার অযোগ্য—এটাই হলো কমলার অভ্রান্ত লজিক—আর এর বড় ব্যাখ্যাকার শ্রীমতী ইতি। আমি কিছুতেই বুঝিয়ে উঠতে পারলাম না যে "জ্ঞানদা" কোন মেয়ে নয় আমারই এক শিল্পী-বন্ধু। অবস্থা ক্রমেই চরমে উঠলো। আমি অধৈর্য্য হয়ে শেষে বলে উঠলাম—'বেশ করেছি, হাজার বার করবো'। আর যায় কোথায়, কমলা দৌড়ে এসে বুকের উপর কামড় দিয়ে দাঁত বসিয়ে দিল আর সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান। Mental Shock অথবা হিংসার severity দেখে রাগবো কি? খুব শাস্তি পেলাম। বুঝলাম খুব গভীর ভালবাসা না হলে এমন হয় না,, কিন্তু এখন এই সঙ্কট থেকে রক্ষা পাওয়া যায় কি করে?

"চিঠি"—। ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়ালো ইতি, মুখখানা তার কি রকম কঠিন। বাঁকা হাসির রেখা ঠোটের কোণায়। "কার চিঠিরে?" মার না বাপীর," বৌদি ব্যস্তভাবে তাকিয়ে দরজার কাছে গেল—। "আজ্ঞে না! চিঠি তোমার সতীনের—এবার আবার লিখেছেন কিন্তু পোষ্টকার্ডে—উনি আজই বিকেলে আসছেন আসর জমাতে"—বলেই ইতি অদৃশ্য হয়ে গেল দরজার কাছ থেকে।

ঘরের মধ্যে বাজ পড়লেও বোধহয় একটা হতভম্ব হতাম না, যতটা হলাম ইতির কথায়—না, হাসি-তামাসার কথা নয়। নইলে বৌদি অমন করে ঠোট কামড়ে ধরে চোখের জল এবং কেমন যেন রাগ সংবরণ করার চেষ্টা করবেন কেন আর ইতিই বা রূঢ় স্বরে কথাগুলি বলে চলে যাবে কেন? প্রশ্ন করলাম —"ব্যাপারটা কি হলো, আপনার সতীনের চিঠি—রহস্য লাগছে খুবই—।" বৌদি পোষ্টকার্ডখানা হাতে এগিয়ে দিয়ে বললেন—"নিন্ পড়ুন, আপনার ধ্যান-ধারনার আদর্শ পুরুষ দাদা: নূতন পরিচয়টুকু জেনে যান—"

—কি পরিচয়—কিসের নূতন পরিচয়?

—ওতেই উত্তর পাবেন। আসলে পুরুষজাতটাই বেইমান—বিশ্বাসঘাতক—

—দাঁড়ান, বুঝতে দিন ব্যাপারটা। অন্যের চিঠি আমি পড়ি না দয়া করে এবার খুলে বলুন তো—?

—"খুলে বলবার কি আছে ঠাকুরপো। আপনার শচীনদার আমাদের বিয়ের আগে থেকেই "জ্ঞানদা" নামে কোন মেয়ের সঙ্গে বেশ মাখামাখি ছিল একথা জানতাম না। ইদানীং সেটা প্রকাশ হয়ে পড়েছে। এর আগের চিঠিতে উনি নিজের বাড়ীতে আমন্ত্রন করে নিয়ে গিয়েছিলেন। এই চিঠিতে লিখেছেন আজ বিকেলে উনি এখানে আসছেন। স্পর্দ্ধার সীমাটা একবার দেখুন। আসুক না একবার—এসপার নয় ওসপার। আমি অশিক্ষিত গেঁয়ো সরল বোকা মেয়ে নই যে ঠুঁটো জগন্নাথের মত অসহায় হয়ে মুখ বুজে সব সহ্য করে যাবো।" শেষটায় বৌদির গলার স্বর কেমন কেঁপে উঠলো—"আমার জন্য কি বিষও জুটবে না ঠাকুরপো?" কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন বৌদি। দরজার দিকে এগিয়ে চললেন ত্রস্তে। "এ-হে-হে-হে বৌদি এখানেইতো আপনি গেঁয়ো-মেয়ের পরিচয় দিলেন—" বৌদি একটু থেমে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। বিশ্বাস করতে পারলাম না, কেমন যেন রহস্যের গন্ধ পেলাম। আমি ভাবতে লাগলাম।

"কি হে, কি সমস্যায় পড়লে আবার"? শচীনদা ঘরের মধ্যে ঢুকে পাশের কৌচটায় বসে পড়লেন, "এ বাড়ীতে ঢুকে নতুন কিছু আবিস্কার করতে পারলে ভায়া?" শচীনদার দৃষ্টিটা খোলা জানলার মধ্য দিয়ে দূরে গিয়ে পড়লো। আমি কোন জবাব দিতে পারলাম না সহসা, ধীরে বললাম—"না, তবে গভীর এবং ভয়ঙ্কর কিছু আশা করছি।"

—ভয়ঙ্কর? কি রকম?

—একটা আদর্শের upset, পরিবর্ত্তন।

—"আদর্শের পরিবর্ত্তন!" প্রশ্নভরা দৃষ্টি শচীনদার—কোথায়? কার?

—কিছু মনে করবেন না শচীনদা, যদি বলি আপনার ·

—আদর্শের পরিবর্ত্তন ঘটে না, ঘটে অপমৃত্যু। তোমার কিসে ধারণা হলো আমার অপমৃত্যু ঘটেছে?

—টেবিলের ওপর ওই পোষ্টকার্ড এবং তার অলিখিত অজ্ঞাত ইতিহাসই তো যথেষ্ট প্রমাণ নয় কি শচীনদা—

—কোন চিঠি? শচীনদা তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে চিঠিটা হাতে নিয়ে বাজখাঁই গলায় হো হো করে হেসে উঠলেন—"জ্ঞানদা! হ্যাঁ জ্ঞানদা—শচীনদা চিঠিখানা পড়ে কি চিন্তা করে গম্ভীর হয়ে গেলেন। বল্লেন—"সত্যিই তো এখন কি করা যায় বলতো নটবর। একেবারে বাড়ী এসে হাজির হচ্ছে। একেই তো একে উপলক্ষ্য করে কমলা যে কুরুক্ষেত্র বাধিয়েছে তার ঝাল সামলাতেই চোখে সর্ষে ফুল দেখছি। তারপর স্বয়ং সশরীরে প্রতিদ্বন্দ্বীর সামনে হাজির—ওরে বাপস্ একটা পথ বাত্‌লাতে পার ভায়া, তাহলে প্রকৃত বন্ধুর কাজ করবে।"

—না শচীনদা, অন্যায় চিরদিনই অন্যায়। তাকে—

—বুঝলাম। কিন্তু যখন একটা অপরাধ হয়ে গেছে—বাঁচার পথ—

—ত্যাগ কর।

—কাকে কমলাকে—

—না, তোমার জ্ঞানদাকে।

—ওরে বাব্বা! সে মেয়ে আর ভয়ঙ্কর।

—শচীনদা, জীবনের পবিত্রতা যখন নষ্ট হয় তখন সব ধ্বংসই অনিবার্য্য-inevitable.

—সবই মানলাম নটবর, কিন্তু How to save the situation. Would you kindly find me a wayout?

—একমাত্র পথ ত্যাগ করা। আমরাই তোমাকে সাহায্য করবো।

—বেশ তাই করো। তোমাদের হাতেই ছেড়ে দিলাম সব।

কথা শেষ হতেই ঘরে ঢুকলো শচীনদার মেয়ে চূড়া। বল্লো "কাকু, মা বল্লেন আপনাদের স্নান করে নিতে, খাবার ready" চূড়া কথা শেষ করেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

—কিছু বুঝলে নটবর—শচীনদা বলে উঠলেন।

—না তো—

—এইটুকু বুঝলে না নটবর! মা তাঁর মেয়েকে পাঠিয়েছে অচেনা কাকুর কাছে সন্দেশ দিয়ে অথচ বাবা সেখানে উপস্থিত।

—এটা একটা ভদ্রতা।

—না হে তা নয়। কমলা ইচ্ছে করেই আমাকে avoid করছে। তোমার হয়তো জানা নেই সে আমার সঙ্গে Non-cooperation করছে—আমার সঙ্গে কথা বন্ধ।

দুপুরের খাওয়া দাওয়া সারতে একটু দেরীই হয়ে গেল। যাইহোক খাওয়া দাওয়া সেরে শচীনদার ডবল-বেড খাটে পাশাপাশি শুয়ে বিশ্রাম করছি আর টুকটাক কথাবার্ত্তা বলছি। দেওয়াল ঘড়িটায় টুং টাং করে তিনটা বেজে উঠলো। শচীনদা আলোচনা থামিয়ে উঠে পড়লেন বিছানা থেকে, বল্লেন—"—নটবর তুমি একটু rest নাও আমি এখনই আসছি" বলেই ব্যস্ত হয়ে বেরিয়ে গেলেন শচীনদা। কিন্তু তাঁর কথা বলার ভঙ্গীতে বুঝলাম কোথায় যেন একটা রহস্য লুকিয়ে আছে। আমি ভাবতে শুরু করলাম। বুঝলাম নাটকের দৃশ্য শুরু হয়ে গেছে আর যবনিকা নামবে মিলনে না বিরহে জানা নেই। তবে ভরসা সমাধানের ভার আমার হাতেই দিয়েছেন শচীনদা। ইতিমধ্যে কমলা বৌদিও দু একবার ঘরে ঢুকে অকারণে কি কারণে এটা ওটা নাড়াচাড়া করে গেছেন। ইতিও উঁকি মেরে গেছে। ঘুমাবার ভান করে সবই লক্ষ্য করে গেছি। শেষবার বৌদি ঘরে ঢুকে Radio steriogram এর উপর থেকে কি একটা সরাতে যেয়ে চনচন শব্দে মেঝেতে পড়ে কি একটা জিনিষ ভেঙ্গে গেল। বুঝলাম চীনা মাটির কিছু হবে। এই অবস্থায় ঘুমের ভান করে জেগেই রয়েছি। চোখ খুলতে দেখি বৌদি আমার দিকে চকিতে তাকিয়ে বলে উঠলেন—গেলতো ঘুম ভেঙ্গে। আপনার দাদা কোথায় গেলেন ?"

আমি উত্তর দেবার আগেই শচীনদা এক ভদ্রলোককে নিয়ে ভেতরে ঢুকলেন—এসো ব্যানার্জ্জী, এটাই অধমের শোবার ঘর। কমলা বৌদি বেরিয়ে যাচ্ছিলেন—শচীনদা তা দেখতে পেয়ে বলে উঠলেন—কমলা, ইনি হচ্ছেন মিঃ ব্যানার্জ্জী, ছোটবেলা থেকেই আমরা বন্ধু তবে বছর দুয়েকের বড়। সঙ্গীতচর্চ্চা করেন মানে খুব উঁচু দরের ওস্তাদ গায়ক। বহু রেকর্ড আছে। রেডিওতেও Special programme করেন। আর ইনি হচ্ছেন কমলা—আমার—"

কথা শেষ না করতে দিয়েই ব্যানার্জ্জী হাত জোড় করে নমস্কারের ভঙ্গীতে বলে উঠলেন—"সহধর্ম্মিনী, জী ব ন স ঙ্গি নী, জনম মরণকে সাথী, হ্যাঁ কমলা সত্যই সমুদ্র মন্থন করা লক্ষ্মী প্রতিমা, শুনলে তো আমি শচীনদের থেকে বড় সুতরাং আমি সম্পর্কে হলাম ভাসুর। তবে লজ্জার সম্পর্ক আমার সঙ্গে চলবে না, তোমার সঙ্গে আমি দাদার মত ব্যবহার করবো।"

—"আপনি বসুন," হাতজোড় করে প্রতি-নমস্কার জানালেন বৌদি।

"এত সৌভাগ্য যখন আমাদের, পরিচয়ও পেলাম, তখন ছাড়ছি না কিন্তু, কিছু শুনিয়ে যেতে হবে দাদার।"

—নিশ্চয়, নিশ্চয়। শোনাব বলেই তো এসেছি, তবে কতটা ভাল লাগবে বলতে পারছি না—

—আপনারা কথা বলুন আমি এখনই আসছি।

—না, না, তুমিও বোস কমলা। আলাপ যখন—।

—একটু চায়ের ব্যবস্থা করে আসছি। চা খাবেন না কফি—

—কফি হলে তো অপূর্ব্ব, তবে এত তাড়াতাড়ির কি আছে—

"আমি আসছি বলে কমলা বৌদি বেরিয়ে গেলেন। লক্ষ্য করলাম কথা বলবার সময় বৌদি একবারও শচীনদার দিকে চাইবার প্রয়োজন বোধ করলেন না। কথা বলবার সময়ই হাসিমুখেই ছিলেন যখন বেরিয়ে গেলেন তখন বেশ গম্ভীর। আমি প্রমাদ গুনলাম শেষের কথা চিন্তা করে। এই পরিবেশে শ্রীমতী জ্ঞানদা এলে জমবে কি রকম? শচীনদা বলে উঠলেন নটবর এঁর পরিচয় তো পেয়েছ। মিঃ ব্যানার্জ্জী এ হচ্ছে আমার ছোট ভাইয়ের স্থানে বন্ধু। আমার থেকে চার বছরের ছোট, পেশায় অধ্যাপক, লেখক, সমালোচক ও দার্শনিক। আমরা দুজনেই নমস্কার বিনিময় করলাম। উনি বল্লেন—"খুব আনন্দিত হোলাম ভাই"

ইতিমধ্যে কমলা বৌদি কফি ও সামান্য খাবার নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। কফি খেতে খেতে কথাবার্ত্তায় অনেক সময় কেটে গেলো। ইতিও মাঝে মাঝে উঁকি মেরে যাচ্ছে কখন গান শুনবে সেই আশায় আর শ্রীমতি জ্ঞানদার আগমন প্রত্যাশায়, কথাবার্ত্তার মধ্যে শচীনদা ২/৩বার উঠে বাইরে গেলেন। মুখে গভীর চিন্তার ছায়া একটু যেন বিব্রতভাব, আমিও বসে আছি উৎকণ্ঠা নিয়ে শ্রীমতি জ্ঞানদা এলে কি বিশ্রী একটা কাণ্ড হবে ভেবে। কমলা বৌদি খুব চিন্তান্বিত। ইতি এসে বসলো কমলা বৌদির পাশে। শচীনদাও ঘরে ঢুকলেন। ইতি কমলাবৌদির কানে কি যেন বলল। আমার শ্বাসও রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ শচীনদা বলে উঠলেন—"এই যা! ব্যানার্জ্জীদার নামটাই তোদের এখনও বলা হয়নি, ইনিই হচ্ছেন পদ্মশ্রী জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের সকলের প্রিয় জ্ঞানদা।" একথার সঙ্গে সঙ্গেই ইতি চট করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, সঙ্গে নিয়ে গেল কমলা বৌদিকে। জ্ঞানদা হতভম্ব হয়ে গেলেন কমলাবৌদির ব্যবহারে, আমি বোকার মত চেয়ে রইলাম শচীনদার মুখের দিকে। তিনি আমার এই চাহনির প্রশান্ত আননে আস্তে আস্তে বললেন—"কিছুই বুঝলেনা ভায়া—একেই বলে স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী, দেবতার বুদ্ধিরও অগম্য।"

তবু এ জীবনে আছে আরাম, আছে বিরহ, আছে দুঃখ, তারই পিছনে সুখ, মিলনে দ্বন্দ্ব, দ্বন্দ্বে মিলন, রসাভিখারী মন তারই আনন্দে বিভোর—এরই নাম মানবজীবন।

(৫৩২ পাতার পরবর্তী অংশ)

যাইতে পারে যে পাকিস্থানে হয় প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন পদ্ধতি অনুসৃত হইবে নয়ত বিপ্লব ও বিদ্রোহের ফলে পাকিস্থান আরও বহুভাগে বিভক্ত হইয়া নিজ রাষ্ট্রীয় স্বরূপ হারাইয়া অপর কোনও রূপ ধারণ করিবে। পাকিস্থান বর্ত্তমানে শান্তির কেন্দ্ররূপে যুদ্ধ বিগ্রহ বর্জ্জিত অবস্থায় চলিতে থাকিবে এই জাতীয় আশার কোনও বাস্তব ভিত্তি নাই।

ভারতবর্ষের যে রাষ্ট্রীয় পরিস্থিতি তাহা সর্বাঙ্গীনভাবে শান্তিপূর্ণ না হইলেও তাহার মধ্যে কোনও বৃহদাকার বিপ্লব বা বিদ্রোহের সম্ভাবনা লক্ষিত হয় না। ভারতবর্ষে যুদ্ধের হাওয়া যদি প্রবলভাবে বহিতে আরম্ভ করে তাহা হইলে তাহার মূল উৎস থাকিবে বিদেশে। অর্থাৎ পাকিস্থানকে অস্ত্র ও অর্থ দিয়া প্ররোচিত করিয়া যদি ভারত আক্রমণ করিতে কোনও বিদেশী মহাশক্তিমান্ জাতি সচেষ্ট হয় তাহা হইলেই ভারতে যুদ্ধ সম্ভাবনা ঘটিতে পারিবে। সাক্ষাৎভাবে চীন ভারত আক্রমণ করিবে বলিয়া বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন না। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ করিবার সম্ভাবনা আরও সুদূরপরাহত।

পৃথিবীর অপরাপর দেশে কোথাও যুদ্ধের আগুন জ্বলিয়া উঠিবার সম্ভাবনা নাই এমন কথা বলা যায় না। জাপান ও চীনের সখ্য কতকাল অটুট থাকিবে অথবা মলয় কিম্বা সুমাত্রা জাভায় যুদ্ধ লাগিয়া যাইবে কি না তাহাও স্থিরনিশ্চয়ভাবে বলা সম্ভব নহে। ইয়োরোপের সকল ধননীতি অনুসরণকারী জাতিগুলি এক জোট হইয়া যে অর্থ-নৈতিক শক্তি সঞ্চয়ে নিযুক্ত তাহা আমেরিকার হয়ত মনের মত হইতেছে না। কিন্তু তাহা হইতে যুদ্ধ লাগিয়া যাইবার কোনও আশঙ্কা দেখা যায় না। আমেরিকাতে শ্বেতকায় নাগরিকদিগের সহিত কৃষ্ণকায়-দিগের কলহ কখন কখন উৎকট আকার ধারণ করে, কিন্তু কৃষ্ণকায়গণ সংখ্যায় এতই অল্প যে তাহার কখন কখন হিংসার পথে চলিলেও ব্যাপকভাবে শ্বেতকায়দিগের বিরুদ্ধে সশস্ত্রভাবে যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইবে বলিয়া কেহ মনে করেন না। দক্ষিণ আমেরিকা সর্ব্বদাই বিপ্লব ও বিদ্রোহের কেন্দ্র বলিয়া প্রসিদ্ধ। রাষ্ট্রনীতি অথবা রাষ্ট্রনেতা অদলবদলে পাশবিক শক্তি ব্যবহার দক্ষিণ আমেরিকায় বহুকাল হইতেই প্রচলিত। কিন্তু সেই সকল দেশের বিপ্লববাদ কখনও বাহিরে প্রসারিত হয় না। সুতরাং দক্ষিণ আমেরিকার বিপ্লব দক্ষিণ আমেরিকাতেই আবদ্ধ থাকিয়া যায়। বিশ্বশান্তির আবহাওয়া দক্ষিণ আমেরিকা হইতে উত্থিত কোন ঘূর্ণি বায়ুর আলোড়নে কখনও গভীরভাবে আবর্তিত হয় না। সেইরূপ আশঙ্কা করিবারও কোন কারণ নাই। বিশ্ব-শান্তি ভঙ্গের সম্ভাবনা তাহা হইলে দেখা যায় শুধু চীন, পাকিস্থান, ইসরায়েল, আরব দেশগুলি ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়াতেই পরিস্থিত আছে। একটা সময় ছিল যখন বলকান অঞ্চলে, অর্থাৎ গ্রীস, বুলগেরিয়া, ইউগো-স্লাভিয়া, মণ্টিনিগ্রো, রুমেনিয়া প্রভৃতি দেশগুলিতে যুদ্ধ লাগিয়াই থাকিত। এখন সেইরূপ সম্ভাবনা না থাকিলেও বলকান ও তন্নিকটস্থ চেকোস্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরী, পূবজার্ম্মানী ও পোলাণ্ড প্রভৃতি দেশে রুশিয়ার সহিত কলহের কারণ কম্যুনিজমের রীতিনীতি পদ্ধতি গঠন ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে অঙ্কুরিত হইতে পারে। বস্তুতন্ত্রে বিশ্বাসী কম্যুনিষ্টগণ যদিও রাষ্ট্র ও সমাজের প্রগতির ক্রমবিকাশের কথা অস্বীকার করেন না, তাহা হইলেও তাঁহারা মার্কসবাদ অভ্রান্ত এবং সংস্কৃতির আবশ্যকতার উর্দ্ধে বলিয়া মনে করেন। রাষ্ট্রক্ষেত্রে নতুন নিয়ম প্রবর্ত্তন চেষ্টার ফলে হাঙ্গেরী ও চেকোস্লোভাকিয়ার রাজধানীর পথে পথে রুশিয়ার ট্যাঙ্ক তোপ উঁচাইয়া মার্কসবাদের চিরস্থির অভ্রান্ততা রক্ষার্থে উপস্থিত হইয়াছিল ও ঐ দুই দেশের জননেতাদিগের নূতন মতবাদ অনুসরণ চেষ্টা কঠিন হস্তে দমন করিয়াছিল। রুশিয়ার ট্যাঙ্ক যে চির অজেয় থাকিবে তাহা কে বলিতে পারে? এমন দিন আসিতেও পারে যখন জনমত ওয়ারস প্যাক্ট কিম্বা রুশিয়ার সামরিক শক্তির বিরুদ্ধে সক্ষমতার সহিত দাঁড়াইতে পারিবে। যে অবরোধ প্রথা মানব মনের মুক্ত হাওয়ায় পরিভ্রমণ অধিকার দমন করিয়া প্রবল শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, তাহা যে চিরকালই লৌহ পরদার আড়ালে একইভাবে থাকিতে সক্ষম হইবে তাহাই বা কে বলিতে পারে?

পরিমল গোস্বামী রচিত সর্বাধুনিক গ্রন্থ

প ত্র স্মৃ তি

লেখক কর্তৃক গৃহীত ৩৬ খানি ফোটোগ্রাফ, মূল্যবান্ মুদ্রণ, ৭৮ জন পত্র লেখক ও লেখিকার ৩৫০ খানি পত্র ও পত্রাংশ—আর তাদের ঘিরে লেখকের বিচিত্র স্মৃতি। বাংলা সাহিত্যে সম্পূর্ণ অভিনব। মূল্য বাইশ টাকা।

যাঁদের পত্র ঘিরে লেখকের স্মৃতি রচিত হয়েছে

অজিতকৃষ্ণ বসু—অঞ্জনা ভৌমিক—অতুলচন্দ্র বসু—অতুলানন্দ চক্রবর্তী—অমল হোম—অমিতা রায়—অমিয়া চৌধুরাণী—অশোক মৈত্র—আবদুল আজীজ আমান—আশু দে—ইন্দিরা দেবীচৌধুরাণী—কালিদাস নাগ—কালিদাস রায়—কিরণকুমার রায়—গীতশ্রী বন্দনা সেনগুপ্ত—গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য—গোপাল ঘোষ—গোপাল হালদার—চন্দ্রশেখর বেঙ্কট রামন্—জয়ন্তনাথ রায়—জয়ন্তী সেন—জাহান আরা বেগম—জীবনময় রায়—জ্যোতির্ময় ঘোষ—তপতী বিশ্বাস—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়—দিগিন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য—দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী—নলিনীকান্ত সরকার—নিখিলচন্দ্র দাস—নিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী—নীরদচন্দ্র চৌধুরী—নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়—পুলিন বিহারী সেন—পি. সি. সরকার—প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়—প্রমথ চৌধুরী—প্রমথনাথ বিশী—প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়—প্রেমেন্দ্র মিত্র—বনফুল—বনবিহারী মুখোপাধ্যায়—বারীন্দ্রকুমার ঘোষ—বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়—বিনয়কুমার সরকার—বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়—বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়—বিমলাকান্ত রায়চৌধুরী—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—মণীন্দ্রচন্দ্র সমাদ্দার—মণীষ ঘটক—মায়া বসু—মার্গারেট চ্যাটার্জী—মৈত্রেয়ী দেবী—রাজশেখর বসু—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—লীলা বন্দ্যোপাধ্যায়—লীলা মজুমদার—লীলা সিং—শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়—শশিশেখর বসু—শিবরাম চক্রবর্তী—শিশিরকুমার ভাদুড়ি—শীতলাকান্ত শীল—শোভা সেন—সতীনাথ ভাদুড়ী—সবিতা সেনগুপ্ত—সুধাকান্ত রায়চৌধুরী—সুধীরকুমার চৌধুরী—সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী—সৈয়দ মুজতবা আলী—হারীতকৃষ্ণ দেব—হেমলতা ঠাকুর।

পরিবেশক : রূপা অ্যাণ্ড কোং কলিকাতা-১২

পরিমল গোস্বামী রচিত

আধুনিক ব্যঙ্গ পরিচয়

মূল্য ছয় টাকা

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী বলেন—

বাংলা ভাষায় ব্যঙ্গ সাহিত্য সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ।

●

প্রেসিডেন্সি কলেজের বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক

শ্রীভবতোষ দত্ত বলেন—

আধুনিক ব্যঙ্গ পরিচয়ের ভূমিকাতে ব্যঙ্গের লক্ষণ যে রকম সুনির্দিষ্ট এবং পরিষ্কার করে বলা হয়েছে এমন আর কোন বইতে হয়েছে বলে জানি না।

পরিবেশক : নবগ্রন্থনা, ৮, কৈলাস বসু ষ্ট্রীট কলিকাতা-৬

ময়ূর

শ্রীসুধীর গুপ্ত

মেঘ-সম্ভারে ভরিল আকাশ, অরণ্য-শিরোভাগে
মেঘময়ী ছায়া রচে কোন্ মায়া,—যাদু ত'ার ভালো লাগে।
বুকের ভিতরে অঙ্কুর ধরে গোপন স্বপন-বীজে,—
আর কিছুখনে ঘন-বারি-ধারে সকলই যে যাবে ভিজে।
ময়ূর—ময়ূর, এমন সময়ে তোমার কণ্ঠে 'কেকা'
বাজিয়া বাজিয়া সঙ্গীতময় করে যে মেঘের লেখা।
রোমাঞ্চভরে যত শুনি গান, প্রাণ ওঠে সুরে ভরি' ;—
সঙ্গীত বুঝি রূপময় হ'য়ে বিরাজে পেখম ধরি'।
ময়ূর—ময়ূর, সম্মুখ দূর অপূর্ব গীতি-রবে
মুখর করিয়া কী যে মধুরিমা সঞ্চার করো ভবে।
কেকা-রব সে তো শেখা বুলি নয় ; মেঘাম্বরের সুর
অম্বর ছাপি' কণ্ঠে তোমার বেজে ওঠে সুমধুর।
বক্ষের গান ভরিয়া বিমান ফিরিয়া বক্ষ মাঝে
বাজিয়া বাজিয়া বুক উথলিয়া কণ্ঠে তোমার বাজে ;
উপলব্ধির গহন—গভীর মাধুরী মিশানো তায়,
কেকা-রব তাই শুনিলে কি আর কখনো তা' ভোলা যায়।
ময়ূর—ময়ূর, তুমি মহাকবি ; বিহঙ্গ কবিদল
ভাব-গম্ভীর তোমার গানের পায় কি কিছুতে তল।
কাকলি-মুখর চঞ্চল তা'রা কথার বাহারে মাতে ;—
গভীরতা নাই—গহনতা নাই, ভুলে যাই সাথে সাথে।
হঠাৎ-হঠাৎ ধ্বনির মন্ত্র উচ্চারি' ওঠো তুমি
গম্-গম্ করে থম্-থম্-করা পর্বত—বন-ভূমি ;
ধ্বনি যে সহসা পেখম তুলিয়া বুকের ভিতরে নাচে ;
ধ্বনি যে ব্রহ্ম তুমিই বুঝালে,—বুঝার কি আর আছে।

ত্রিপুরার অর্থনৈতিক উন্নতি

"ত্রিপুরা" সাপ্তাহিকে ত্রিপুরার অর্থনৈতিক উন্নতির ইতিহাস আলোচনা করিয়া একটি সুলিখিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা ইহার অধিকাংশ উদ্ধৃত করিতেছি :

ত্রিপুরা একটি প্রাচীন রাজ্য। ভারতের বিভিন্ন রাজকীয় রাজ্যের মধ্যে ত্রিপুরা সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। ত্রিপুরার মহারাজগণ একাধারে প্রায় তেরশ বছর ত্রিপুরায় রাজত্ব করেন। ত্রিপুরায় বহু মঠ মন্দির রয়েছে। দীর্ঘ পর্বতশ্রেণী এবং অরণ্য নিয়ে ত্রিপুরার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য মনোরম। ত্রিপুরার দৈর্ঘ্য ১৮৩·৫ কি: মি: এবং প্রস্থ ১১২·৭ কি: মি:। ত্রিপুরায় ছয়টি পর্বতশ্রেণী রয়েছে—যথা দেবতামুড়া, বড়মুড়া, আটারমুড়া, লংতরাই, সাখান এবং জাম্পুই।

ত্রিপুরা ভারতের অন্যান্য অংশ হইতে বিচ্ছিন্ন। আসামের কাছাড় জেলার মধ্য দিয়েই মাত্র একটি প্রবেশ পথ রয়েছে। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কালে আসামের পাথারকান্দি হতে ধর্মনগর পর্যন্ত রেল লাইন আনা হয়েছে। ত্রিপুরার জলবায়ু সাধারণত: উষ্ণ ও আর্দ্র। এ রাজ্যের স্বাভাবিক বৃষ্টিপাত ২১০০·৭ মি: মি:। মাটির জলশোষণকারী শক্তি খুব অল্প। এ রাজ্যের ৬০% ভূমি পাহাড়পূর্ণ এবং ৪০% সমতল ভূমি। লোকসংখ্যার দুই তৃতীয়াংশ এ সমতল ভূমিতে বাস করে। ত্রিপুরায় দশটি মহকুমা আছে।

মহারাজার রাজত্বকালে ত্রিপুরা খাদ্যে স্বয়ংসম্পন্ন ছিল। ভারত বিভাগের পর তদানীন্তন পাকিস্থান থেকে প্রচুর উদ্বাস্তু ত্রিপুরায় আসতে থাকে। ১৯৪১ সালের যেখানে ত্রিপুরার লোকসংখ্যা ছিল ৫,১৩.০০ লক্ষ সেখানে ১৯৫১ সালে লোক সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৬,৩৯ লক্ষ এবং ১৯৬১ সালে হয়েছে ১১,৪২.০০ লক্ষ। উদ্বাস্তু আগমনের ফলেই এ রাজ্যের লোক সংখ্যা এরূপ অস্বাভাবিক বেড়েছে। ফলে ত্রিপুরা খাদ্যে ঘাটতি এলাকায় পরিণত হয়েছে। একমাত্র কৃষিজাত ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমেই এই সমস্যার সমাধান করা সম্ভব। বন এবং কৃষিভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠা করেও এ সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করা যেতে পারে।

সমগ্র ত্রিপুরায় কৃষিই হলো জনগণের প্রধান অবলম্বন সস্তায় বিদ্যুৎ সরবরাহের অভাবে এখন পর্য্যন্ত উল্লেখযোগ্য কোন শিল্প গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি। পরিকল্পনায় যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নতি, বৈদ্যুতিক শক্তি এবং কৃষি উৎপাদনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ভারতের অন্যান্য অংশের মতো ত্রিপুরাতেও আর্থিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রবর্ত্তিত হয়েছে।

এ রাজ্যের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা খুব দ্রুত তৈরী করতে হয়েছিল এবং তা ছিল সংক্ষিপ্ত। বিভিন্ন কারণে প্রথম পরিকল্পনা রচনায় বিলম্ব হয়েছে এবং পরিকল্পনার আরম্ভ হওয়ার তৃতীয় বর্ষের পূর্ব্বে কোন কাজ আরম্ভ হয়নি।

উপযুক্ত শাসনতান্ত্রিক সংগঠন ছাড়াই একটি উচ্চাভিলাষপূর্ণ কর্মসূচী গৃহীত হয়েছিল। কর্মকুশল ব্যক্তির অভাবে যাতায়াতের সুব্যবস্থা না থাকায়, শ্রমিক ও জিনিষপত্রের অপ্রতুলতায় এবং ইনজিনিয়ারিং কর্তৃপক্ষের উপর আশাতীত ভাবে কাজের চাপ পড়ায়

প্রথম পরিকল্পনায় টাকা কম খরচ হয়েছে। উক্ত পরিকল্পনায় মূলধন ছিল ২১৯·৬৭ লক্ষ টাকা এবং খরচ হয়েছে ১৯১·৮৬ লক্ষ টাকা। এই সময় বাস্তবিক পক্ষে কোন উন্নয়নমূলক কাজ হয়নি। সে কারণে প্রত্যেকটি কাজই এলোমেলো ভাবে আরম্ভ করতে হয়েছিল। বিভিন্ন ক্ষেত্রে সরকারকে নানা বাধা বিপত্তির ভেতর দিয়ে কাজ করতে হয়েছিল।

এর মধ্যে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা শেষ হয়ে গেল। অবস্থারও অনেক উন্নতি হলো এবং পূর্বেকার রাজকীয় রাজ্যগুলো ইতিপূর্বে ভারতের অন্যান্য রাজ্যের পর্য্যায়ে এসে যায়। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় উন্নয়নমূলক কাজ খুব দ্রুত চলে এবং এ পরিকল্পনার জন্য বরাদ্দকৃত ৯০০.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে প্রায় সব টাকাই ব্যয়িত হয়।

এ সময়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রেই উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধিত হয়। কৃষিক্ষেত্রের উন্নতি লক্ষণীয়। এ সময়ে ১০,০০০ টন অতিরিক্ত খাদ্য শস্য উৎপাদনের যে লক্ষ ছিল, তা পুরোপুরী ভাবে সম্পাদিত হয়।

তাছাড়া নতুন রাস্তা নির্মাণের মাধ্যমে মহকুমার সংযোগ সাধন ব্যাপারেও যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল এবং কতিপয় প্রয়োজনীয় সীমান্তবর্তী রাস্তারও উন্নতি সাধন করা হয়েছিল।

তৃতীয় পরিকল্পনায় মঞ্জুরীকৃত মূলধন ছিল ১৬.৩২ কোটী টাকা। প্রথম পরিকল্পনার মূলধনের চেয়ে দ্বিতীয় পরিকল্পনার মূলধন ছিল চারগুণের চেয়েও বেশী এবং তৃতীয় পরিকল্পনার মূলধন ছিল দ্বিতীয় পরিকল্পনার দ্বিগুণ। যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নতি সাধনের উপর সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব আরোপ করা হলো কারণ দেশে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করার জন্য এবং গ্রামীণ এলাকার উন্নয়নমূলক কাজের প্রসারণের জন্য এ কাজটি বিশেষ প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছিল। রাজ্যের আর্থিক উন্নয়নের জন্য সমাজ উন্নয়ন পঞ্চায়েৎ ও সমবায়ের উপর প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল।

উদ্বাস্তু, এবং জুমিয়া অথবা স্থানান্তরিত কৃষকদের পুনর্বাসন দান রাজ্যের একটি জরুরী সমস্যা ছিল। প্রধাণতঃ আর্থিক উন্নতি কৃষির উপর নির্ভরশীল বলে বর্দ্ধিযুক্ত শ্রমিক চাহিদা পূরণ ব্যাপারে যথাযোগ্য অথবা উপযুক্ত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়নি এ পরিকল্পনায়।

তৃতীয় পরিকল্পনায় তিনটি উল্লেখযোগ্য কার্য্য আসাম থেকে ধর্মনগর পর্যন্ত রেলওয়ে লাইনের সম্প্রসারণ এবং ডম্বুর হাইড্রো ইলেকট্রিক প্রোজেক্টের কাজ আরম্ভ করা। বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও বার্ষিক পরিকল্পনার মূলধন ও ব্যয় নিয়ে উল্লেখ করা হলো।

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা	মূলধন	ব্যয়
(১৯৫১—৫৬)	২১০,৫৮৯	১৯১,৮৬০
দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা		
(১৯৫৬—৬১)	৯০০,০০০	৮৯২,০০০
তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা		
(১৯৬১—৬৬)	১৬৩২,০০০	১৫৫০,৬৬০
বার্ষিক পরিকল্পনা		
(১৯৬৬—৬৭)	৪৫০,০০০	২৮১,২৩৮
(১৯৬৭—৬৮)	৫০০,০০০	৩৭৪,৯৫৮
(১৯৬৮—৬৯)	৫০০,২৩০	৪৮৩,৫৭২

ত্রিপুরার আর্থিক পরিকল্পনার মুখ্য উদ্দেশ্য হবে দারিদ্র্য ও বেকার সমস্যা হ্রাস করা; জনগণকে দারিদ্র্যের হাত হতে রক্ষা করার জন্য তাদের ক্রয়ক্ষমতা বাড়াতে হবে। যারা কাজ করতে ইচ্ছুক তাদের লাভজনক কাজের সুযোগ দিতে হবে। নিম্নোক্ত আর্থিক কাঠামোর তালিকা থেকে আমরা রাজ্যের বিভিন্নমুখী অর্থনৈতিক অনগ্রসতার স্পষ্ট চিত্র পাই।

ত্রিপুরার অর্থনৈতিক কাঠামো

(১৯৬০-৬১)

বিভিন্ন বিভাগ	ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন বিভাগের আয় আসল পরিমাণ	শতকরা হার	ত্রিপুরায় কর্মে ব্যাপৃত লোকের নিযুক্ত ব্যক্তির সংখ্যা	বিভাগ অনুযায়ী বিভাজন শতকরা হার
১	২	৩	৪	৫
১। কৃষি ও তৎসংলগ্ন পশু পালন, বনরক্ষণ ও মৎস্য চাষ	২৩,১৮	৬১.৬	৩,২৬৬	৭৪·৭
২। খনিজ ও অপরাপর উৎপাদনকারী গঠনমূলক শিল্প	৪·৫০	১১·৯	৩৯.০	৯ ১
৩। ব্যবসা বাণিজ্য (পাইকারী, খুচরো এবং অন্যান্য ব্যবসা এবং ব্যাঙ্ক ইনসিওরেন্স)	৩·৩৭	৯·০	১৮·০	৪.২
৪। যানবাহন, গুদাম জাতকরণ এবং যাতায়াত রেলওয়ে রাস্তার অন্যান্য যানবাহন, গুদাম জাতকরণ এবং মালগুদাম ও যাতায়াত	.৯৫	২.৪	১.৮	১.১
৫। অন্যান্য চাকুরী, সরকারী চাকুরী বিভিন্ন ধরনের চাকুরী এবং গৃহ সম্পদ	৫·৬৭	১৫·১	৪·৬	১০·৯
মোট—	৩৭·৬৭	১০০·১	৪৩৭২	১০০·০

অর্থনৈতিক কাঠামো অনুসারে কর্মবিনিয়োগের সুযোগ বৃদ্ধি এবং জনগণের জীবন ধারার উন্নয়ন, প্রধানত আন্তর্বিভাগীয় বিভিন্নমুখী অর্থনৈতিক কার্যাবলীর অন্তর্গত। ত্রিপুরায় কর্মে ব্যাপৃত শ্রমিকের মধ্যে তিন চতুর্থাংশ কৃষি সংশ্লিষ্ট কাজে নিযুক্ত এবং এর উপরই রাজ্যের দুই তৃতীয়াংশ আয় নির্ভর করে। বিভিন্ন এলাকায় কৃষি কাজও খুব ভালভাবে চলছে না, রাজ্যের শতকরা ৬০ ভাগ জমিই এক ফসলী। শতকরা ০·২ ভাগ জমিতে জলসেচের বন্দোবস্ত আছে। সারের ব্যবহার নগণ্য। তাই হেক্টর প্রতি উৎপাদন অত্যন্ত কম। যেখানে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে হেক্টর প্রতি গড়ে চাউল পাওয়া যায় ১·৬০ মেঃ টন, সেখানে ত্রিপুরার পরিমাণ হলো ০·৭৮ মেঃ টন। কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য জলসেচ ও বিদ্যুৎ সরবরাহের প্রাধান্য দিতে হবে।

কৃষির উপর নির্ভরশীল লোকদের মধ্য হতে বেশ কিছু সংখ্যক লোককে সরিয়ে এনে শিল্প, যানবাহন, যাতায়াত এবং অনান্য কাজে সুযোগ দিতে হবে। এগুলো অবশ্য পরস্পর নির্ভরশীল। কৃষি ও শিল্পের উন্নয়নের জন্য রাস্তাঘাট, যানবাহন, রেলওয়ে, যাতায়াত, বিদ্যুৎ সরবরাহ এবং জলসেচ ব্যবস্থার বিশেষ উন্নয়নের প্রয়োজন। অপরদিকে কৃষি, ও শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে ব্যবসা, যানবাহন প্রভৃতি কাজগুলো এমনইতেই বেড়ে যাবে।

সম্পদকে ভিত্তি করেই বিভিন্নমুখী অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা যায়। ত্রিপুরা রাজ্যে দুটো উপযুক্ত সম্পদ রয়েছে, তা হলো শ্রমিক ও ভূমি। কিন্তু মূলধন ও উদ্যোগ অত্যন্ত নগণ্য। ক্রমবর্ধমান জনগণকে একমাত্র যদি জমির উপরই নির্ভর করতে হয়, তাহলে সেই ভূমির পরিমাণও যথেষ্ট নয়। ১০,৪৫,১০০ হেক্টর ভূমির শতকরা ৩ ভাগ মাত্র চাষোপযোগী। অপরদিকে ৬,৩৫,২৫২ হেক্টর বন এবং টিলা ভূমি।

ত্রিপুরার টিলা ভূমি ব্যবহারের মাধ্যমে বাগান উন্নয়নের বিশেষ সম্ভাবনা রয়েছে। ভূমির ব্যবহারের পরিকল্পনা নেবার সময় গোচারণ ভূমি এবং ঘাসউৎপাদনের জন্য জমি রাখতে হবে যাতে ডেয়রিফার্মের উন্নয়ন করা যায়। কারণ এটি হবে মিশ্র চাষের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং ত্রিপুরার কৃষকগণের পক্ষে তা করা উচিত। গ্রামের দারিদ্র্য দূর করতে হলে জমির উর্ধ্বসীমা নির্দ্ধারণের মাধ্যমে উন্নত প্রথায় ভূমি সংস্কার করতে হবে যাতে সমহারে ভূমি বন্টন সম্ভব হয় এবং উদ্বৃত্ত ভূমিগুলো ভূমিহীন কৃষি শ্রমিকদের মধ্যে বিলি করে দিতে হবে। ১৯৬১ সালে কৃষকদের সংখ্যা ছিল ২,৮০৮৮১ এবং কৃষি শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ৩২,৯১২। কিন্তু ১৯৭১ সালে কৃষকদের সংখ্যা কমে গিয়ে দাঁড়িয়েছে ২,৩৪,৬ ৫ এবং কৃষি শ্রমিকদের বেড়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে ৮৫,৬৫০। এতে বুঝা যায় যে গ্রামীণ এলাকার কিছু সংখ্যক লোক কিছু পরিমাণ জমি হস্তান্তরিত করেছে।

শিল্প

এখনো ত্রিপুরায় খনিজ ভিত্তিক কোন শিল্প নেই যদিও সম্প্রতি তৈল নিষ্কাশনের কাজ আরম্ভ হয়েছে। ত্রিপুরায় কিছু কুটির ও পারম্পরিক দ্রব্য উৎপাদনের শিল্পও রয়েছে—উৎপাদিত দ্রব্য হতে বার্ষিক আয় মাত্র ৪.০৫ লক্ষ টাকা এবং অল্প পরিমাণে বিভিন্ন শ্রেণী শিল্প তৈরীর সম্পদ রয়েছে, যার বার্ষিক আয় মাত্র ৪৫ লক্ষ টাকা। অতএব তৈলনিষ্কাশন ব্যবস্থার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া ছাড়াও স্থানীয় কাঁচামালের উপর নির্ভর করে পাট, কাগজ এবং প্লাইউডের মাঝারী ধরণের শিল্প তৈরীর পরিকল্পনাও নেওয়া উচিত।

বস্ত্র, চাউল, তৈল, ময়দার মিল, বেকারী, কাঠের আসবাবপত্র, মনোহারী, চামড়ার দ্রব্য, ভেষজশিল্প, ফল সংরক্ষণ প্রভৃতি জাতীয় কুটির ও গৃহশিল্পের জন্য সাহায্য ও উৎসাহ দিতে হবে। শিল্পসংগঠনে সাহায্যকারী উৎপাদিত দ্রব্যের মধ্যে ইটের ভাট্টা, লৌহ, তার প্রভৃতি বৃদ্ধির বিশেষ সম্ভাবনা রয়েছে।

যানবাহন, গুদাম জাতকরণ ও যাতায়াতের উন্নয়ন ব্যপারে বিশেগ সুযোগ রয়েছে। রাজ্যের আয় বৃদ্ধি করতে এবং জনগণের কর্মসংস্থানের ব্যাপারে রেলওয়ে দান নগণ্য নয়। একমাত্র রেলওয়ে সম্প্রসারণের ফলেই রাজ্যে কর্ম-বিনিয়োগের সুযোগ বেড়ে যাবে এবং রাজ্যের আয়ও যথেষ্ট বেড়ে যাবে বিভিন্ন গ্রাম, রাজ্যের এবং সংযোগকারী রাস্তা তৈরীর মাধ্যমেও ওই জাতীয় সুবিধে পাওয়া যাবে। প্রধান রাজপথের সাথে বিভিন্ন গ্রাম এবং জেলার হেড কোয়ার্টারগুলিকে সোজাসুজি সংযোগ করার জন্য বহু রাস্তার প্রয়োজন এবং আগরতলা পর্য্যন্ত বিস্তৃত না করে উত্তর ও দক্ষিণ জেলার মধ্যে অপর একটি রাজপথ তৈরীর প্রয়োজন। অধিক সংখ্যক রাস্তা তৈরীর সাথে সাথে যানবাহনের সুযোগ আসবে। যদি অন্যান্য দিকগুলো সমহারে বেড়ে চলে। হালে গুদাম জাতকরণ, গৃহনির্মাণ এবং এবং ব্যবসা বাণিজ্য আপনা থেকেই বেড়ে যাবে।

ত্রিপুরাতে জুমিয়ারাই সবচেয়ে দরিদ্র। প্রথম পরিকল্পনার শুরু থেকেই পাহাড়ী লোকদের স্থায়ী কৃষকে পরিণত করার জন্য চেষ্টা চলে আসছে। তথাপি এখন পর্য্যন্তও তাদের বহুসংখ্যক লোকের অর্থ নৈতিক উন্নতি সম্ভব হয়নি। এ সমস্যা সমাধানের জন্য আদিবাসীদের জন্য কলোনী না করে আদিবাসী গ্রাম তৈরী করতে হবে। সেখানে তারা নিজেরাই নিজেদের কাজকর্ম পরিচালনা করবে। বন, কৃষি, পূর্ত্ত বিভাগ এবং স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনমূলক প্রতিষ্ঠানে তাদের কর্মনিয়োগ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

পরিকল্পনানুসারে শিল্প, যানবাহন এবং ব্যবস্থার সম্প্রসারণের মাধ্যমে আর্থিক কাঠামো যুগ্মভাবে উন্নত হয়ে উঠবে বলে আশা করা যায়। সেজন্য গ্রামীণ রাস্তা উন্নয়ন, বন্যা নিরোধ, মাটির ক্ষয় নিবারণ, শস্য ভাণ্ডার নির্ম্মাণ, মজুত ভাণ্ডার, পুকুর ও বাঁধ নির্ম্মাণ প্রভৃতি পরিকল্পনা ত্রিপুরার অর্থনৈতিক পরিকল্পনার অবিচ্ছেদ্য অংশ হবে। এ সমস্ত পরিকল্পনার ফলে কেবল কর্ম্ম বিনিয়োগের সুযোগই বর্দ্ধিত হবে না, আয় ও সম্পদও বাড়বে। গ্রামীণ এলাকায় গ্রামবাসীগণ কাজের সুযোগ পাবে।

পরিকল্পনার মাধ্যমে শহর উন্নয়ন ব্যবস্থার ফলেও রাজ্যের আর্থিক উন্নয়ন হয়ে থাকে। নিকটবর্ত্তী যে সকল শহর সমূহে গ্রামীণ উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রি করা যায় এবং প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী সংগ্রহ করা যায়, গ্রামের সাথে তাদের যোগাযোগ না থাকায়, গ্রামীণ শিল্পগুলো টিকে থাকতে পারে না।

সেজন্য গ্রাম এবং বড় শহরের মধ্যে সংযোগ রক্ষার জন্য বড় বাজার এবং কৃষি শিল্পের এলাকা গড়ে তোলা প্রয়োজন।

(ডঃ জেঃ বি গাঙ্গুলীর "ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট অব ত্রিপুরা" নিবন্ধের অনুবাদ।)

রবীন্দ্রনাথ ও অতুলপ্রসাদ

"তত্ত্বকৌমুদী" পত্রিকায় অতুলপ্রসাদ সংখ্যায় সোমেন্দ্রনাথ গুপ্ত লিখিত প্রবন্ধ হইতে নিচের উদ্ধৃতিগুলি মুদ্রিত করা হইল:

উনিশ শতক বাংলাদেশের, সঙ্গীত, সাহিত্য ও সংস্কৃতির স্বর্ণযুগ। এই যুগেই জন্মেছিলেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ এবং প্রাদেশিক গীতিকবি অতুলপ্রসাদ। দশ বছরের ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও পরস্পরের মধ্যে যে অন্তরঙ্গ হৃদ্যতা গড়ে উঠেছিল, তা বোধ করি বয়সের হিসাবের অপেক্ষা রাখেনি।

ঢাকাতে স্কুলে পড়াকালীন তেরচোদ্দ বছরের ছেলে অতুলপ্রসাদ কবিতা, গান রচনা করতে সুরু করেন। কবিতা রচনা এবং গান গাইবার ক্ষমতা বাবার কাছ থেকে পাওয়া। পিতার মৃত্যুর পরে, সুরকার সুগায়ক, ধার্মিক মাতামহর সান্নিধ্যে তাঁর অন্তর্নিহিত এই গুণগুলি বিকশিত হয়েছিল। কিন্তু সর্ব্বোপরি তাঁর কবিত্ব-শক্তিকে প্রভাবিত করেছিল তরুণ কবি রবীন্দ্রনাথের রচনাসমূহ। বাল্যকাল থেকেই অতুলপ্রসাদ নিজের অজান্তে একজন রবীন্দ্র-ভক্ত। মনে রাখতে হবে, যেটা ছিল অন্যান্য বাঙালী কবিদের যুগ। অর্থাৎ প্রাক্-রবীন্দ্র-যুগ, যখন কবিতার আসর মাত করছেন হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেনের মত কবিরা। এই রকম আবহাওয়া থাকা সত্বেও অতুলপ্রসাদ, তাঁর প্রাণের রাজা, মনের রাজা, গানের রাজা বলতে, রবীন্দ্রনাথকেই বুঝ্তেন। সহ-পাঠিদের সঙ্গে 'কে বড় কবি' এই নিয়ে তর্কযুদ্ধ হতো। ছাত্রবন্ধুরা, শিক্ষকরা সব জোট বেঁধে হেমচন্দ্র বা নবীন সেনের পক্ষ নিতেন। বিখ্যাত বাগ্মী সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জ্বালাময়ী বক্তৃতা, হেমচন্দ্র, নবীন সেনের উত্তেজক কবিতা—অর্থাৎ এই প্রাচীনদের প্রলয় "বিষাণের" পাশে, রবীন্দ্রনাথের 'বেণু'র আওয়াজ ছিল বড় কোমল এবং মৃদু। অতুলপ্রসাদ নিশ্চিত হারবেন জেনেও, রবীন্দ্রনাথের পক্ষ নিতেন তর্কযুদ্ধে। সেদিন অতুলপ্রসাদের হার হলেও, পরে দেখা গেছে, অতুলপ্রসাদের রাজারই জিত, এমনই জিত, যে জিত ভারতবর্ষের আর কোনো কবির ভাগ্যে জোটেনি।

১৮৮৬ সাল। অতুলপ্রসাদের বয়স তখন পনেরো। সদ্য প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের 'কড়ি ও কোমল' পড়ে অতুলপ্রসাদ চমকিত। সেদিন থেকে তাঁর রাজার সম্বন্ধে শ্রদ্ধা আরও বেড়ে গেল, এবং তাঁকে চোখে দেখার অদম্য বাসনা অনুভব করতে লাগলেন।

১৮৮৯ সালে, প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়াকালীন বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে রবীন্দ্রসাহিত্যচর্চা প্রবলতর হয়ে উঠ্লো। কিন্তু রবীন্দ্র সাক্ষাৎ ঘট্লোনা। হঠাৎ সুযোগ আসাতে ১৮৯০-এর শেষে আইন পড়তে বিলাত গেলেন এবং দীর্ঘ পাঁচ বছর বাদে ব্যারিষ্টারি পাশ করে কলকাতায় ফিরে এলেন।

নাম লেখালেন কলকাতা হাইকোর্টে। কেননা, জোড়াসাঁকো তো কলকাতারই এলাকা, সুতরাং কলকাতায় থাকলে তাঁর রাজার দর্শন মিলবে। কিন্তু বছরের পর বছর অতিক্রান্ত-প্রায়। রবীন্দ্র-দর্শন আর হলো না। এদিকে পসার জমছে না বলে, চিন্তান্বিত অতুলপ্রসাদ ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দিশাহারা। এমন সময় সেই অঘটন ঘটলো। রবীন্দ্রনাথের এক ঘনিষ্ঠ আত্মীয়া একদিন জোর করে হাজির করলেন তাঁকে কবিসমীপে। কবিগুরুর আনন্দ্যসুন্দর স্নিগ্ধ কান্তি দেখে তিনি বিমোহিত। নিজেই এক জায়গায় পরে লিখেছেন—'প্রথম দর্শনেই প্রেম।' আবার কিছু দিন পরে এক চায়ের মজলিশে দেখা এবং সেদিন রবীন্দ্রনাথের স্বকণ্ঠে অপূর্ব গান শুনলেন। তাঁকেও সেদিন কবির বিশেষ অনুরোধে গাইতে হলো। তিনি লিখেছেন—'কম্পান্বিত কলেবরে ও কম্পিত কণ্ঠে' সেদিন ভারতের শ্রেষ্ঠতম গীতিকবি ও সুগায়ককে গান শোনালেন। শিষ্টতার প্রতিমূর্তি রবীন্দ্রনাথের সেদিনকার উৎসাহ ও আশ্বাসবাণী, অতুলপ্রসাদের সঙ্গীত-রচনাকে যে গভীর ভাবে প্রভাবিত করেছিল, তা তিনি অকপটে স্বীকার করেছেন। রবীন্দ্রসান্নিধ্য এবং তাঁর আশীর্বাণী অতুলপ্রসাদকে গানের জগতে করেছে সুপ্রতিষ্ঠিত, দিয়েছে স্বীকৃতি।

গভীর স্নেহ ও ভালবাসার বন্ধন অতি অল্পকালের মধ্যেই পরস্পরকে করেছিল অন্তরঙ্গ। রবীন্দ্রনাথের 'অতুলবাবু', এবং 'আপনি' সম্বোধন অল্পদিনেই 'অতুল' এবং 'তুমি'তে রূপান্তরিত হয়। পরস্পরকে লেখা চিঠি-পত্রগুলি এই শ্রদ্ধা ও ভালবাসার স্বাক্ষর বহন করছে। রবীন্দ্রনাথের স্নেহের আহ্বানে, অতুলপ্রসাদের যাতায়াত সুরু হলো জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে। প্রায়দিনই তিনি অনেকখানি সময় কাটিয়ে আসতেন রবীন্দ্রসান্নিধ্যে। কোনোদিন কবিকণ্ঠে শুনতেন নিজের রচিত বর্ষার কবিতা, কোনোদিন ভরা বর্ষায়, রবীন্দ্রনাথ স্বরচিত গান শোনাতেন অতুলপ্রসাদকে। অতুলপ্রসাদ স্বর্গীয় সুখ অনুভব করতেন সেইসব মুহূর্তে। কোনোদিন বা ঠাকুরবাড়ির এই গুণীজন-সভায় হাজির হতেন 'হাসির গান'-এর রাজা দ্বিজেন্দ্রলাল। তাঁর স্বরচিত হাসির গানে সকলের সঙ্গে কোরাসে যোগ দিতেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। অতুলপ্রসাদও ছিলেন সেই গায়কদের দলে।

একবার কলকাতা কংগ্রেসে আমন্ত্রিত ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের অবাঙালী প্রতিনিধিদের রবীন্দ্রনাথ জোড়াসাঁকোর বাড়িতে আহ্বান জানালেন। বাংলাভাষায় সম্পূর্ণ অজ্ঞ এই সব দূরাগত প্রতিনিধিদের শোনাবার জন্যে তিনি সংস্কৃত-ঘেঁষা বাংলায় অপূর্ব এক দেশাত্মবোধক গান রচনা করলেন। অন্যান্যের সঙ্গে ঠাকুর-বাড়িতে সেদিন অতুলপ্রসাদও গেয়েছিলেন সেই গান—'অয়ি ভুবন মনোমোহিনী।'

রবীন্দ্রনাথ-কেন্দ্রিক এই সাহিত্য-সংগীত-সভায় নিয়মিত আসতেন নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায়, লোকেন পালিত, বিখ্যাত গাইয়ে লালচাঁদ বড়াল, রাধিকা গোঁসাই এবং ঠাকুরবাড়ির অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, বলেন্দ্রনাথ প্রমুখ সকলেই উপস্থিত থাকতেন। এই সভার নাম ছিল 'খামখেয়ালি সংঘ।' এই চক্রের বৈশিষ্ট্য- খেয়াল-খুশিমত যে কোনো সভ্যের বাড়িতে আসর বসানো। এই সভার সর্বকনিষ্ঠ সদস্য অতুল-প্রসাদের বাড়িতে যেদিন আসর বসলো সেদিন রবীন্দ্রনাথের বাড়ি ফিরতে বাজলো রাত বারোটা। রবীন্দ্রসান্নিধ্যে অতুলপ্রসাদ উপভোগ করতেন আনন্দরস। কিন্তু কর্মস্থানের দূরত্ব এই দুই কবিকে একত্র বাস করতে দেয়নি। অবশ্য পরস্পরের চিঠিপত্রের আদান-প্রদান সেই ভৌগোলিক ব্যবধানকে দূর করেছিল।

১৯১৪ সাল। রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে অতুলপ্রসাদ রামগড়ে, দশদিনের আতিথ্য গ্রহণ করলেন।...সেবারেই রবীন্দ্রনাথের গান রচনার একটি চিত্র এঁকে অতুলপ্রসাদ লিখেছিলেন যে, রবীন্দ্রনাথ প্রতিদিন ভোরে উঠে বেরিয়ে যান দেখে কৌতূহলী অতুলপ্রসাদ একদিন তাঁকে গোপনে অনুসরণ করে, পাথরের আড়াল থেকে দেখলেন কবি বসেছেন পাথরের উপর, সামনে তুষারশুভ্র হিমালয়,

মাথার উপর অবারিত নীল আকাশ, চারধারে অজস্র পাহাড়ি ফুল, গুন গুন করে কবি নূতন গান রচনা করছেন—'এই লভিনু সঙ্গ তব, সুন্দর হে সুন্দর'। কবির সৌম্য মুখে রবির স্নিগ্ধ কিরণ। এই ভাবে সদ্য রচিত গানের সুরবিন্যাস দেখে মুগ্ধ অতুলপ্রসাদ লিখছেন, 'এই রকম করিয়া প্রায় প্রতি প্রাতে লুকাইয়া তাঁর গান রচনা শুনিতাম আর বাণীর বরপুত্রের সেই দেবময় মূর্তি হিমালয়ের কোলে উপবিষ্ট দেখিতাম। রামগড়ের এই দশদিনের গীতোৎসবের কথা কখনও ভুলিব না।'

১৯১৬ সালে পারিবারিক কারণে লক্ষ্ণৌ ছেড়ে অতুলপ্রসাদ এলেন বছর খানেকের জন্যে কলকাতায়। প্রায়ই অতুলপ্রসাদের ডাক পড়তে লাগলো শান্তিনিকেতনে, কবির কাছে। দীর্ঘ দিন পরে কবিসান্নিধ্য আবার তাঁকে আনন্দিত করে তুললো।

১৯৩১এ, লক্ষ্ণৌতে রবীন্দ্রনাথের ৭০ তম জন্মদিন মহাআড়ম্বরে পালিত হলো। অতুলপ্রসাদ বসন্ত-বাহার রাগে চোদ্দ লাইনের একটি গান রচনা করেন—

গাহ রবীন্দ্রজয়ন্তী বন্দন,
ভকত মনে আনো পুষ্পচন্দন।

রবীন্দ্রনাথকে তিনি বহুবার লক্ষ্ণৌ যেতে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। মাত্র দুবার কবি নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে পেরেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠির অংশবিশেষ এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। চিঠিটি ১৪ নভেম্বর, ১৯০৯ সালে লেখা: 'বরোদা যাবার পথে তোমার দুয়ার ঠেলা দিয়ে যাবার সংকল্প মনে রইলো। যে পর্যন্ত না তুমি মুখভার করো, তোমার ঘর জুড়ে দিন যাপন করবার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু একদিকে বরোদায় বক্তৃতার আসর অন্যদিকে ভবানীপুর বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনীতে সভাপতির পালা। এই দুয়ের মধ্যবর্তী সময়টি সংকীর্ণ অতএব আগমনী এবং বিজয়ার মধ্যে দীর্ঘ আয়োজন তোমাকে করতে হবে না।'

সে বছরে ডিসেম্বরের শীতেই রবীন্দ্রনাথ অতুলপ্রসাদের অতিথি হ'য়েছিলেন। দুই কবির হাস্যপরিহাসের উদাহরণ হিসেবে একটি ঘটনার উল্লেখ করা যায়। একদিন সকালে রবীন্দ্রনাথ খাচ্ছেন পায়েস ও ফলের রস আর অতুলপ্রসাদকে দেওয়া হ'য়েছে প্রিয়খাদ্য ওট মিলের পরিজ। আড়চোখে অতুলপ্রসাদকে দেখে নিয়ে গুরুগম্ভীর কণ্ঠে কবি বললেন 'অতুল, তোমাকে আমি বুদ্ধিমান্ বলে জানতুম। কিন্তু পরমান্ন ফেলে যে ঘোড়ার খাদ্য খায়, তাকে আর বুদ্ধিমান্ বলি কি করে।' অতুলপ্রসাদ প্রাণখোলা হাসি হেসে উঠলেন।

রবীন্দ্রনাথ তখন শান্তিনিকেতনে। অতুলপ্রসাদের আকস্মিক মৃত্যুসংবাদ এলো কবির কাছে। কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন কবি। শোকবিহ্বলতার ভাব সম্বরণ করে ধীরে ধীরে বললেন: 'অতুলপ্রসাদের মৃত্যু আমি স্বীকার করিনা। এক সুরলোক হইতে তিনি আর এক সুরলোকে গেলেন। এই মর্ত্যলোকে তিনি আপন সাধনায় যে সংগীতময় সুরলোক রচনা করিয়াছিলেন, সমস্ত জীবনের বেদনাভরা সাধনার অবসানে ভগবানের করুণায় পূর্ণ-প্রেমময় সুরলোকে তিনি আজ প্রয়াণ করিলেন। ঐ সুরলোক তাঁহাকে অমৃতময় শক্তি দান করিবে।'

কনিষ্ঠ ভ্রাতৃসম পরম সুহৃদের অকাল তিরোধানে ব্যথিতচিত্ত রবীন্দ্রনাথ রচিত সেই বিখ্যাত কবিতাটি— 'বন্ধু তুমি বন্ধুতার অজস্র অমৃতে'—অতুলপ্রসাদের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম শ্রদ্ধা, ভালবাসার অকপট স্বাক্ষর হিসেবে মুদ্রিত হয়ে আছে।

আসামে বঙ্গাল খেদা

আসামে যে বাঙ্গালী নিপীড়ন প্রায়ই হইয়া থাকে তাহা যে একটা সুপরিকল্পিত জাতীয়তার আদর্শ বিনাশক মতলববাজীর কথা ইহা অনেকেই বুঝিতে পারিয়াছেন। অহমিয়ারা আসামে সংখ্যালঘু এবং তাহাদের আশা বাঙ্গালীদিগকে আসাম ছাড়িয়া পলাইতে বাধ্য করিলে তাহারা সংখ্যাগুরুত্ব লাভ করিবে। রণজিৎ পুরকায়স্থ "যুগবাণী" সাপ্তাহিকে লিখিয়াছেন:

'বঙ্গাল খেদা আন্দোলন সম্বন্ধে খোলাখুলি

কয়েকটি প্রশ্নের আলোচনা অপ্রিয় হলেও অপ্রাসঙ্গিক নয় এবং তার প্রয়োজন হয়েছে।

প্রথমতঃ এ আন্দোলন সঠিক 'বঙ্গাল খেদা' নয়। মূলতঃ এটা সুপরিকল্পিত বাঙ্গালী হিন্দু খেদা। আজ পর্যন্ত যতবার আসামে বাঙ্গালী নির্যাতন হয়েছে এবং তাতে যত লোক হতাহত ও আসাম থেকে পালিয়ে গিয়েছেন তাদের কেহই বাঙ্গালী মুসলমান নন। কাজেই এটা নিছক 'বঙ্গাল খেদা' নয়। পরিতাপের বিষয় এই যে এই সব দাঙ্গাতে পূর্ববঙ্গাগত মুসলমানরা একটা সক্রিয় অংশ সর্বদাই গ্রহণ করেছে, যাদের একাংশ বিগত ২০।২৫ বৎসর যাবৎ পূর্ববঙ্গ থেকে ধাপে ধাপে হিন্দুদের উৎসাদিত করেছে। বিশেষতঃ আসামে বাঙ্গালী হিন্দু নারী নির্য্যাতনে এরাই মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে আসছে। অহমিয়ারা এই অপরাধে এতটা অপরাধী নয়।

দ্বিতীয়তঃ এত বড় একটা বহুভাষাভাষী রাজ্যের নাম আসাম হওয়াতেই তা যত অনর্থের কারণ হয়েছে। এই নাম যে সার্থক ছিল না তা ইতিমধ্যেই একাধিকবার প্রমাণিত হয়ে গিয়েছে। তা না হলে আসাম থেকে মেঘালয়, অরুণাচল, নাগাল্যাণ্ড ও মিজোরাম বেরিয়ে আসত না। সাবেক আসামে অহমিয়ারা সংখ্যালঘুই ছিলেন। তা সত্ত্বেও প্রদেশের নাম আসাম ছিল এবং এখনও আছে। যে কোন একটি সমগ্র অঞ্চল এবং তার অংশ বিশেষের একই নাম হওয়া যুক্তিযুক্ত নয়। আজও আসামে অহমিয়ারা সংখ্যাগুরু কি না তাতে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে, নইলে আসামের ৭১ সালের আদম সুমারির রিপোর্ট আজও প্রকাশ না করার কারণ ছিল না।

এই বঙ্গাল খেদার ব্যাপারে আসামের স্বর্গত মুখ্যমন্ত্রী গোপীনাথ বরদলৈর কৃতিত্ব সর্বাধিক। তিনিই সর্বপ্রথম এই বঙ্গাল খেদার opening ceremony করে গিয়ে ইতিহাসে এক বিশিষ্ট স্থান দখল করে আছেন। তিনিই শ্রীহট্ট জেলাকে পাকিস্থানে ঠেলে দিয়ে আসাম থেকে বাঙ্গালীর এক বৃহদাংশ অপসারণ করে অহমিয়াদের সংখ্যাগুরুতে পরিণত করার অপচেষ্টা করেছিলেন। তাঁরই উত্তরসূরীরা আজো তাঁরই আরদ্ধ ও অসমাপ্ত কাজ সম্পূর্ণ করার দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন মাত্র। এ সবের অর্থ বুঝতে অসুবিধা নেই, কিন্তু যেটা দুর্বোধ্য ও রহস্যময় সেটা হচ্ছে এই যে স্বর্গত জওহরলাল নেহেরু থেকে আরম্ভ করে ইন্দিরা-সিদ্ধার্থ রায় কোম্পানী (আনলিমিটেড)-এর আচরণ। এতে স্বভাবতই মনে হয় যে এঁরা সবাই 'হিন্দু-ফোবিয়াতে' ভুগছেন।

এই প্রসঙ্গেই তাঁদের কয়েকটি প্রশ্ন করলে তার জবাব পাওয়া যাবে কি?

১) যদি ভারতের যে কোন অংশে হিন্দু মুসলমান দাঙ্গা অনুরূপ ভাবে চলতে থাকে তবে তাঁরা কতদিন তা চলতে দিতেন।

২) আসামে যদি শাসন ক্ষমতায় কংগ্রেস সরকার না হয়ে অন্য দলীয় সরকার থাকতেন তবে তাঁরা এতদিন তা সহ্য করতেন কি?

৩) যাঁরা কথায় কথায় ভারতের সংহতির কথা প্রচার করে থাকেন সেই কংগ্রেস সরকার কি নিজ দলের চেয়ে সত্যিই জাতীয় সংহতির প্রশ্নে অধিকতর গুরুত্ব দিয়ে থাকেন।

৪) ভারত সরকার তথা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভাষা সংক্রান্ত নীতি আসাম ও পশ্চিমবঙ্গে কি অভিন্ন?

সাময়িকী

ভিয়েৎনামে যুদ্ধ বিরতি

বিগত ২১ জানুয়ারী ১৯৭৩ খৃঃ অব্দে মধ্যরাত্রে ভিয়েৎনামে সর্বত্র আমেরিকান রাষ্ট্র কর্তৃক গুলিগোলা চালানো রাষ্ট্রনীতিপ্রাপ্তভাবে বন্ধ করা হয়। যুদ্ধ যে সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ ভিয়েৎনামের সকল ক্ষেত্রে থামিয়া গিয়াছিল এমন নহে; কোথাও কোথাও ৩রা ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত যুদ্ধ চালিত ছিল যদিও ক্রমে ক্রমে তাহার গতি কমিয়া যাইতে আরম্ভ করে। অবশ্য আমেরিকার সৈন্য, বিমান বা নৌবহর দ্বারা যে আক্রমণ চালিত হইতেছিল তাহা উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েৎনামে সর্বত্র পূর্ণরূপে বন্ধ হইয়া যায়। দক্ষিণ ভিয়েৎনামের জনগণ এই যুদ্ধবিরতিতে বিশেষভাবে আশ্বস্ত হন, কেননা তাঁহারা আমেরিকার নিকট যে সাহায্য পাইতেছেন তাহাতে তাঁহাদের নিজেদের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা রক্ষা করিতে তাঁহারা সক্ষম থাকিবেন বলিয়াই তাঁহারা পূর্ণরূপে বিশ্বাস করেন। একথা অবশ্য সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন যে ভিয়েৎনামের সকল জাতি ও গোষ্ঠী যদি পরস্পরের স্বাধীনতা ও রাষ্ট্রীয় অধিকার রক্ষা ও সম্মান করিয়া না চলেন তাহা হইলে এই অঞ্চলে শান্তি রক্ষা দুরূহ হইবে। অবশ্য বৃহৎ বৃহৎ সামরিক শক্তিমান রাষ্ট্রগুলিরও এই শান্তি রক্ষার কার্য্যে সাহায্য করার বিশেষ প্রয়োজন থাকিবে। এই কারণেই সকল রাষ্ট্রই এ কথা স্বীকার করেন যে যুদ্ধ বিরতি হইলেও, শান্তি যদি দীর্ঘকাল স্থায়ী করিতে হয় তাহা হইলে তাহার জন্য বৃহত্তর আন্তর্জাতিক বৈঠক হওয়া একান্তভাবে আবশ্যক। এই বৈঠকে সম্মিলিত জাতি সংঘের সকল সভ্য-রাষ্ট্রকেই যোগদান করিতে আহ্বান করা প্রয়োজন। এইরূপ একটি বৈঠক বসিবার ব্যবস্থাও করা হইয়াছে এবং সেই কার্য্য যাহাতে সুসম্পন্ন হয় তাহার জন্য বিধিমতে চেষ্টা করা হইতেছে।

রাষ্ট্রপতি নিকসন যখন পিকিং গমন করেন তখন হইতেই দক্ষিণ পূর্ব্ব এশিয়ায় শান্তি স্থাপন চেষ্টা বর্দ্ধিতভাবেই করা হইতেছে। এই শান্তি যাহাতে পৃথিবীব্যাপী হয় সে দিকেও আমেরিকানদিগের বিশেষ লক্ষ্য আছে। এই কার্য্য সকল করিতে হইলে যে সকল শক্তিশালী রাষ্ট্র উত্তর ভিয়েৎনামের সাহায্যে এতকাল তৎপরতা দেখাইয়া আসিয়াছেন সেই সকল রাষ্ট্রের সহযোগিতা পাওয়া বিশেষ করিয়া প্রয়োজন। কোন কোন উচ্চপদস্থ রাষ্ট্রনীতিবিদের মতে পৃথিবীর সকল রাষ্ট্রই এখন যাহাতে সকল দেশেই শান্তি প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারে সেই দিকে নজর দিতেছেন এবং মনে করা যাইতে পারে যে পৃথিবীর সকল দেশই অতঃপর কিছুকাল শান্তির আবহাওয়ায় থাকিয়া নানান ক্ষেত্রে উন্নতি সাধন করিতে সক্ষম হইবে। ইহা আশার কথা সন্দেহ নাই এবং এইরূপ হইলে মানব সভ্যতার পক্ষে তাহা বিশেষভাবে কল্যাণকর হইবে বলা যাইতে পারে। যুদ্ধের সম্ভাবনা প্রকটভাবে উপস্থিত থাকিলে মানব প্রকৃতি সে অবস্থায় মন্দগতি হইয়া যাইতে বাধ্য হয়; কারণ সকল জাতি তাহার ফলে যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য বহু অর্থব্যয় করিতে বাধ্য হওয়াতে মানব উন্নতিকর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে দ্বিধা বোধ করে। কিন্তু যাহারা বিপ্লব চায় তাহারা অনেক ক্ষেত্রে ক্রমাগত যুদ্ধ চালিলে শেষ অবধি তাহারা সে অবস্থায় থাকিতে পারে না। তখন শান্তিই সকলের কাম্য হইয়া দাঁড়ায়। কারণ বিপ্লব চাহিলেও খাদ্য বস্ত্র ঔষধ শিক্ষা বাসস্থান বা গমনাগমনের ব্যবস্থা ও উপার্জ্জনের পন্থা না থাকিলে চলে না। যথা অতিঘোর যুদ্ধ যেখানে চলে সেখানেও মানুষকে খাইতে হয় এবং খাদ্য না পাইলে সৈন্যগণ যুদ্ধ করিতে সক্ষম থাকে না। সুতরাং বহু বৎসর বিপ্লবের আলোড়নে নিমগ্ন থাকিলে

যুদ্ধের আগ্রহ বিপ্লবীদিগের হৃদয়ে ক্রমশঃ নিস্তেজ হইয়া আসে; এবং দক্ষিণ পূর্ব্ব এশিয়াবাসী বিপ্লব পিপাসুদিগের তাহাই হইয়াছে। তাহারা এখন কিছুকাল যুদ্ধ বন্ধ রাখিয়া জীবনযাত্রার পথ সুগম করিয়া লইতে চাহেন। এই মানসিক অবস্থা বিচার যদি সত্য হয় তাহা হইলে চীন ও রুশিয়াও হয়ত যোদ্ধাদিগকে অস্ত্র ও অপরাপর মালমশলা সরবরাহে ঢিলা দিয়া এখন কিছুকাল সেই কার্য্যে ব্যবহৃত অর্থ-নৈতিক শক্তি মানব হিতকর অন্য কোন কার্য্যে নিয়োগ করিবেন। তাহা হইলে জগৎবাসীর মঙ্গলই হইবে। কারণ মতবাদ যাহার যাহাই হউক মানবহিত অথবা অহিত সকলের পক্ষেই প্রায় একই প্রকার থাকিয়া যায়। জীবনযাত্রার ধারা মূলতঃ সকলের পক্ষে একই থাকিয়া যায় এবং যাহার যাহা প্রয়োজন অথবা যে যে ক্ষেত্রে অভাব থাকে তাহার পক্ষে প্রয়োজনীয় বস্তু প্রাপ্তি ও অভাব দূরীকরণই সর্ব্বাগ্রে সাধিত হওয়াই বাঞ্ছনীয় মনে হয়। বিদ্রোহ বিপ্লব বা মতবাদ প্রতিষ্ঠার আবেগ প্রাণে সদাজাগ্রত থাকিলেও তাহা অপর সকল অভাববোধকে দমন করিয়া নাস্তির কোঠায় স্থাপন করিয়া দিতে পারে না।

মূল্যবৃদ্ধি রোধ হইতেছে না

বাজারে সকল বস্তুর মূল্য বৃদ্ধি হইয়া চলিয়াছে। অর্থাৎ ভারতীয় টাকার ক্রয় ক্ষমতা ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া চলিয়াছে। অপর সকল দেশের যে অর্থ যথা ডলার, পাউণ্ড, মার্ক বা ইয়েন সেগুলিও মূল্য হারাইতেছে অল্পবিস্তর। এই সকল কারণ উপস্থিত থাকায় ভারতীয় মুদ্রা টাকার মূল্য হ্রাস জগতের টাকার বাজারে করা না হইলেও বস্তুত তাহার মূল্য কমিয়াই যাইতেছে। প্রথমত ধরা যাউক চাউলের কথা। খোলা বাজারে যে চাউল বিক্রয় হয় তাহা লক্ষ লক্ষ ক্রেতা ক্রয় করিয়া থাকেন। তাহা কিছুকাল পূর্ব্বেও রেশনিংএর চাউলের সহিত প্রায় সমান মূল্যেই ক্রয় করা যাইত। এখন তাহার মূল্য কিলো প্রতি ৫০।৬০ পয়সা বাড়িয়া গিয়াছে এবং যে চাউল উৎকৃষ্ট তাহা কোথাও কোথাও ৪।৫ টাকা কিলো মূল্যও বিক্রয় হইতেছে। ময়দা বাজারে পাওয়া কঠিন এবং পাইলে মূল্য বিক্রেতার ইচ্ছামত হয়। আটার মূল্য রেশনিংএর মূল্যের তুলনায় খোলা বাজারে শতকরা ৫০ ভাগ অধিক। সরিষার তেল ঐ রকমই খোলা বাজারে শতকরা ৫০ ভাগ অধিক। মাছ মাংস প্রভৃতির বর্ত্তমানে মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে যেমন ইচ্ছা তেমন। আবাস গৃহের ভাড়া বাড়িয়াছে, জমির মূল্য বাড়িয়াছে এবং বাড়িয়াছে কয়লার মূল্য টাকায় চার আনা হারে। আজকাল একটা পুস্তকের মূল্য ৩০/২৫ টাকা হইলে কেহ কিছু মনে করেন না। ছেলেমেয়েদের স্কুলে পড়াইতে হইলে টিউশন সমেত মাথাপিছু একশত দেড়শত টাকা খরচ ধার্য্য হইয়াছে। কিন্তু মানুষের বেতন বা পূর্ব্বের মতই আছে। শুধু বাড়িয়াছে রাহাজানি, চুরি ডাকাতি ও পথে ঘাটে নিরাপত্তার অভাব। মুদ্রার ক্রয় ক্ষমতা ক্রমাগত নোট ছাপাইয়া ও সেই ছাপান টাকা নূতন নূতন ঋণ লইয়া সরকারী খরচের জন্য বাজারে ছাড়িয়া হ্রাস হইতে আরও হ্রাস হইতেছে। কিন্তু বেতন বাড়িতেছে না। কারণ নাকি এই যে, বেতন বৃদ্ধি আরম্ভ হইলে নূতন চাকুরী আর সৃষ্টি করা সম্ভব হইবে না। ইহা কোনও অর্থ-নৈতিক সত্যের উপরে নির্ভরশীল নহে। সকল বস্তুর মূল্য বৃদ্ধি হইলে বেতন বৃদ্ধি শেষ অবধি করিতেই হইবে। না করিলে নূতন চাকুরীর কেমন করিয়া সংখ্যা বৃদ্ধি হইবে তাহা বোঝা কঠিন। পুরাকালে একটা অর্থ-নীতিক ভ্রান্ত ধারণা প্রচলিত ছিল। তাহার নাম ছিল "ওয়েজ ফাণ্ড থিওরী" ও তাহার মূলে ছিল এই ভ্রান্তি যে সকল দেশের সকল বেতনভোগীর বেতন একটা নির্দিষ্ট তহবিল হইতে আসে এবং বেতন বাড়াইলে সেই "ফাণ্ডের" উপর টান পড়িয়া বেতন বৃদ্ধি সম্ভব হয় না। বস্তুতঃ বেতন যে অর্থ হইতে সর্ব্বদা দেওয়া হয় তাহা কোন তহবিলজাত নির্দিষ্ট পরিমাণাবদ্ধ সিন্দুক হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হয় না। বাজারের দ্রব্য, বেতনভোগী কর্ম্মী ও মূলধন বা মুদ্রার তহবিল—সকল কিছুই বৃদ্ধিও পরিবর্ত্তনশীল। ক্রয়বিক্রয় উৎপাদন মূলধন সৃষ্টি ও ব্যবহার কোনও কিছুই অপরিবর্ত্তনীয় নহে।

সরকারী কথা যে ভ্রান্ত ধারণার উপর নির্ভর করিয়া প্রচারিত হইয়াছে তাহা আজ শতাধিক বৎসর পাশ্চাত্যের কোনও অর্থনীতিবিদ উচ্চারণও করেন নাই। যাহাদের চাকুরী আছে তাহাদিগের বেতনবৃদ্ধি করিলে নূতন চাকুরী আর কাহারও হইতে পারে না কথাটার কোনও অর্থনৈতিক মূল্য নাই এবং মূল্য বৃদ্ধির মূলে যদি মুদ্রাস্ফীতি থাকে তাহা হইলে বেতন বৃদ্ধি না করিয়া অধিকদিন নিযোক্তা ও নিযুক্তদিগের মধ্যে শান্তি রক্ষা করা সহজ থাকিবে না। অর্থনীতির ইতিহাস চর্চ্চা করিলে দেখা যাইবে যে কর্মীদিগের বেতন বৃদ্ধির সহিত তাহাদের সংখ্যাবৃদ্ধির কোনও পরস্পরবিরোধী প্রতিকূলতা নাই। পৃথিবীর কর্মীর সংখ্যা যতই বাড়িয়াছে ততই তাহাদের উপার্জ্জনও বাড়িয়াছে। যদি বেতনবৃদ্ধি হইলে নূতন কর্মী নিয়োগ ব্যাহত হইত তাহা হইলে সকল দেশেই কর্মী সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাসই হইতে থাকিত।

পাকিস্থান কি আবার পুরাতন পথেই চলিবে

বাংলাদেশের যুদ্ধ অবসানে মনে হইয়াছিল যে অতঃপর পাকিস্থান ভারতের সহিত কলহ করিতে ততটা ব্যগ্র থাকিবে না। কিন্তু কিছুকাল হইল আবার পাকিস্থান কাশ্মীর লইয়া বিবাদের সুরে কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইহা আরম্ভ হইল টিক্কা খান চীনদেশ হইতে ঘুরিয়া আসিবার পর হইতে। অর্থাৎ সকলে সন্দেহ করিতেছেন যে চীনের নেতাগণ টিক্কা খানকে এমন কিছু আশ্বাস দিয়াছেন যাহাতে পাকিস্থান পুনর্ব্বার কাশ্মীর লইয়া কলহে প্রবৃত্ত হইতে সাহস পাইতেছে। চীন অবশ্য কাশ্মীর সম্পূর্ণরূপে ভারতের সহিত সংযুক্ত হইলে নিজেদের সাম্রাজ্যবাদের প্রসারে বাধাপ্রাপ্ত হইবে। আকশাই চীনের যে রাস্তা চীন পাকিস্থান অধিকৃত কাশ্মীরের উত্তর সীমানার ভিতর দিয়া স্থাপন করিয়াছে তাহাও যদি চীনের হাতছাড়া হইয়া যায় তাহা হইলে চীনের তুর্কীস্থান অঞ্চলের সহিত তিব্বতের পথে সংযোগ রক্ষা করা আর সম্ভব থাকিবে না। চীন তাহা হইলে যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে যাহাতে পাকিস্থান কাশ্মীর ত্যাগ করিয়া হটিয়া না যায়। টিক্কা খান কি গুপ্ত পরামর্শ করিয়া আসিয়াছেন ও চীন কতদূর অবধি পাকিস্থানের সপক্ষে থাকিয়া ভারত বিরুদ্ধতা করিবেন, এসকল প্রশ্নের উত্তর দেওয়া এখন সম্ভব হইতেছে না। আমেরিকার বিশ্বশান্তির প্রতিজ্ঞা ও চীনের সেই চেষ্টায় সহযোগিতা যদি বাস্তবরূপ ধারণ করে তাহা হইলে চীন ভারতের সহিত যুদ্ধে নামিতে চাহিবে না বলিয়াই মনে হয়। শুধু অস্ত্র সাহায্য করিয়া পাকিস্থানকে ভারতের সহিত যুদ্ধে নামাইবার ব্যবস্থা ভারতদমনের কার্য্যকরী পন্থা নহে। ইহা ব্যতীত পাকিস্থানের আরও দুইটি প্রদেশ স্বায়ত্তশাসন অধিকার লইয়া কেন্দ্রীয় শাসকদিগের সহিত কলহ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে পাখতুন আন্দোলন ও বেলুচিস্থানের মানুষের তদ্রূপ আকাঙ্খার অভিব্যক্তি, কোন কথাই অবহেলা করিয়া চলিলে পাকিস্থানের মঙ্গল হইবে না। ঐ দুই প্রদেশের মানুষ যদি খুসী মনে কোন নূতন ব্যবস্থা স্বীকার করিয়া লইয়া পাকিস্থানের অঙ্গ বলিয়া উক্ত রাষ্ট্রের সহিত সংযুক্ত থাকিতে প্রস্তুত হয়, তাহা হইলে কথাটা অন্যরূপ ধারণ করিবে। তাহা না হইলে পাকিস্থানের ভবিষ্যৎ ততটা উজ্জ্বল বলিয়া মনে হইবে না।

দেশ-বিদেশের কথা

রেশনিংএর কারণ কি ?

যখনই কোন প্রয়োজনীয় বস্তুর চাহিদার তুলনায় সরবরাহ কম থাকে তখনই দুই কারণে রেশনিং বা নিয়ন্ত্রিত সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়। প্রথম কারণ, যদি ক্রেতাগণ যথা ইচ্ছা ক্রয় করিতে পারেন তাহা হইলে যাহাদের পয়সা আছে তাহারা অধিক মূল্য দিয়া জিনিসগুলি কিনিয়া লইয়া যাহাদের পয়সা নাই তাহাদের একেবারেই না পাওয়ার গণ্ডিতে স্থাপন করিয়া দিবেন। অর্থাৎ অবস্থাপন্ন ক্রেতাগণ যাহা চাই তাহাই পাইবেন ও অপরে অতি প্রয়োজনীয় যেটুকু তাহাও পাইবেন না। দ্বিতীয় কারণ রেশনিং না করিলে দ্রব্যের মূল্য অযথা বাড়িয়া যাইবে কিন্তু সরবরাহ বাড়িবে না। কিন্তু রেশনিং করা প্রয়োজন হয় কেন ? যেখানে যথেষ্ট ক্রয় করিবার লোক আছে সেখানে সরবরাহ বাড়ে না কেন ? ইহারও নানান কারণ আছে। কোন কোন বস্তুর উৎপাদন বৃদ্ধি ইচ্ছা করিলেই হয় না। যথা যদি কোন কারণে ধান যথেষ্ট না হয়, অথবা অন্য কোন খাদ্য বস্তু, তাহা হইলে ক্রেতা থাকিলেই মাল সরবরাহ বাড়িয়া যাইবে না। এই সকল ক্ষেত্রে রেশনিং করিতেই হইবে। অন্যক্ষেত্রে এরূপ হইতে পারে যে মাল সরবরাহের ব্যবস্থা করিতে মূলধন অধিক মাত্রায় লাগে এবং উৎপাদনের কল কারখানা বসাইতেও সময় লাগে। সেরূপ ক্ষেত্রে হঠাৎ চাহিদা বৃদ্ধি হইলে তৎক্ষণাৎ সরবরাহ বৃদ্ধি সম্ভব হয় না। তখন আবার ঐ পূর্ব্ববর্ণিত উপায়ে রেশনিং বিক্রয় ও সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করা আবশ্যক হইয়া দাঁড়ায়। বিদ্যুৎ গ্যাস যদি অধিক করিয়া লোকে চায় তাহা হইলে তাহা অধিক করিয়া উৎপাদন করিবার ব্যবস্থা করিতে সময় ও মূলধন লাগিবে বলিয়া তাহা শীঘ্র শীঘ্র অধিক উৎপাদন করা সম্ভব হয় না। কিন্তু বিদ্যুৎ ও গ্যাস কিম্বা টেলিফোন অথবা বাসগৃহ কিভাবে অধিক প্রয়োজন হইবে তাহাও বিশেষজ্ঞদিগের পক্ষে পূর্ব্ব হইতেই জানা সম্ভব হয়। সামাজিক অর্থনৈতিক বিলিব্যবস্থা যথাযথ ভাবে চালিত থাকিলে ঐ সকল অবশ্য প্রয়োজনীয় বস্তু নিশ্চয় উপযুক্ত পরিমাণে সরবরাহ করাতে কোন বাধা না পড়াই আশা করা যাইতে পারে। কিন্তু যদি সব জানিয়াও বিদ্যুৎ, গ্যাস বা বাসগৃহ পুরাপুরি না পাওয়া যায় তাহা হইলে বলিতেই হইবে যে অর্থনীতির পরিচালনা কার্য্যে কোথাও কিছু গোলযোগ আছে। অতি আবশ্যকীয় বস্তু না পাওয়া যাইলে সময়মত ব্যবস্থার অভাবই প্রমাণ হইবে। বর্ত্তমানে যে বিদ্যুৎ সরবরাহ উপযুক্ত ভাবে করা হইতেছে না তাহার ফলে দেশের কাজ কারবারের মহাক্ষতি হইতেছে। অথচ সরবরাহ বৃদ্ধি হইতেছে না। এই সমস্যার কি ভাবে সমাধান সম্ভব ?

মুদ্রণ কর্ম্মীগণের ধর্ম্মঘট

ডিসেম্বর মাসের শেষের দিকে ছাপাখানার কর্ম্মীগণ কিছুদিন ধর্ম্মঘট করেন। কারণ তাঁহারা উপযুক্ত বেতন পাইতেছেন না ও তাঁহাদের আরও নানা প্রকার দাবি আছে। কিন্তু শুনা যায় যে মুদ্রণ কর্ম্মীগণ এ সকল কথা ঠিক করিয়া জানিতেন না। অন্তত অনেকগুলি ছাপাখানাতেই ধর্ম্মঘট গায়ের জোরে করান হইয়াছিল ও কর্ম্মীগণ সে বিষয়ে বিশেষ কিছু জানিতেন না। শুনা যায় যে ছাপাখানা কর্ম্মীদিগের একটা ইউনিয়ন আছে কিন্তু অধিকাংশ কর্ম্মীই ইউনিয়নের সভ্য নহে। এই অবস্থায় ধর্ম্মঘট করান কতটা উচিত হইয়াছিল তাহা বলা সহজ নহে। যে সকল ব্যক্তি ধর্ম্মঘট করাইতেছিলেন তাঁহারা যে সকল ছাপাখানায় কাজ হইতেছিল সেই সকল

স্থানে গিয়া কর্ম্মীদিগকে জোর করিয়া কাজ বন্ধ করিতে বাধ্য করিতে ছিলেন। ইহা ঠিক ন্যায়সঙ্গত অথবা মানুষের নিজের ইচ্ছায় চলিবার অধিকার রক্ষা করিয়া করা হইতেছিল না। জনমতকে যদি অল্পসংখ্যক ব্যক্তির ভয়ে স্বরূপ পরিবর্ত্তন করিয়া ঐ ক্ষুদ্রগোষ্ঠীর মতকে আশ্রয় করিয়া চেহারা বদলাইতে হয়, তাহা হইলে জনমতের আর কোনও মূল্য থাকেনা। ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর স্বেচ্ছাচারই জনমত বলিয়া চলিতে থাকে। ইহা একপ্রকার একাধিপত্য বা ইহাকে ফ্যাশিজম জাতীয় রাষ্ট্রনীতিও বলিতে পারা যায়।

ছাপাখানার কার্য্যে বাধা পড়ায় অনেক ছাপার কার্য্য যথাসময়ে শেষ করা সম্ভব হয় নাই। ইহাতে জনসাধারণের ক্ষতি হইয়াছে নিঃসন্দেহ। কাজ করিয়া কাহারও লাভ হইয়াছে কি না জানা যায় নাই। এই যে লাভ লোকসানের হিসাব ইহার সকল দিক বিচার করিলে মোটের উপর সামাজিক ভাবে লাভ অধিক হইয়াছে কি না তাহা কেহ কখনও বলিতে পারিবে না। কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর ইচ্ছা ও আগ্রহ অনুসরণ করিয়া বহুস্থলে বহু অসুবিধা ও লোকসানের সৃষ্টি প্রায়ই করা হইয়া থাকে। ইহা ঠিক সাধারণতন্ত্র অথবা লোকমত মানিয়া চলা নহে। ইহার মধ্যে কোন আদর্শেরই সুদূর বিস্তৃত সবলতা নাই। এই কারণে ইহার মধ্যে কম্যুনিজম ফ্যাশিজম অথবা অপর কোনও সর্বজন গ্রাহ্য মতবাদ ব্যক্ত হইতে দেখা যায় না। পাড়ার ছেলেদের দৌরাত্ম্যকে যেমন জাতীয় বা রাষ্ট্রীয় সংগ্রাম আখ্যা দেওয়া যায় না, এইরূপ অল্প সংখ্যক ব্যক্তির মতের জুলুমও সেইরূপ কোনও ভাবেই বৃহত্তর সামাজিক আকার ধারণ করিতে সক্ষম হয় না।

জাতীয় অধিকার রক্ষার দায়িত্ব

সংবিধানে যে সকল ব্যক্তিগত অধিকার ভারতীয় মানবজাতি সংরক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া সংবিধান রচনা করিয়াছেন তাহার মধ্যে ব্যক্তির প্রাণ, মান ইজ্জত, নিরাপত্তা ও সম্পত্তি রক্ষা করা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। অর্থাৎ কোন ভারতীয় মানুষের উপর যদি ভারতবর্ষের যে কোনও স্থলে এরূপ আক্রমণ করা হয় যাহাতে তাহার প্রাণনাশ বা দৈহিকভাবে আহত হইবার সম্ভাবনা ঘটে, অথবা তাহার ব্যক্তিগত মানসম্ভ্রম ও অর্থসম্পদ নষ্ট হয়, তাহা হইলে সেইরূপ আক্রমণকে সংবিধান বিরুদ্ধ বলিয়া সমগ্রজাতি অর্থাৎ ভারত সরকারের দমন করিবার দায়িত্ব উপস্থিত হয়। আসামে ঠিক ঐরূপ আক্রমণই বাঙ্গালীদিগের উপর ক্রমাগত চালানো হইয়াছে। একবার নহে বহুবার ও বহুকাল ধরিয়া। কিন্তু ভারত সরকার ইহার দমন চেষ্টা ত করেনই নাই বরঞ্চ নিজেদের প্রতিনিধি পাঠাইয়া অবস্থা পরিদর্শন করাইয়া, তৎপরে কোন দমন ব্যবস্থা না করিয়া, নিশ্চেষ্ট থাকিয়া অহমিয়া দুর্বৃত্তদিগকে আসকারাই দিয়াছেন। শ্রীমতী গান্ধীর পিতা ৺পণ্ডিত জবাহরলাল নেহেরু বহুকাল পূর্ব্বে একবার যখন অহমিয়া গুণ্ডাদিগের এই রূপই বাঙ্গালী নিগ্রহ কার্য্য ব্যাপকভাবে কৃত হইয়াছিল তখন তিনি আসামী যুবকদিগকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন বলিয়া আত্মমত ব্যক্ত করিয়াছিলেন। শ্রীমতী গান্ধী শুনা যায় বলিয়াছেন যে বাঙ্গালীদের কেহ ভালোবাসেনা। ভালো না বাসিলেও সংবিধানজাত অধিকার কাহারও বাজেয়াপ্ত হইয়া যায় না। কাশ্মীরী মাড়বারী, প্রভৃতি কোন কোন জাতির মানুষকে অনেকে ভালোবাসেনা কিন্তু সেই কারণে তাহাদিগকে হত্যা করিবার অধিকার কেহ পায় না। হিন্দু মুসলমানকে কিম্বা মুসলমান হিন্দুকে ভালো না বাসিলেও তাহাদের সাম্প্রদায়িক বিবাদ ভারত সরকার সর্ব্বদাই দমন চেষ্টা করেন। আসামের সংখ্যালঘু আসামী জাতিকে সংখ্যাগুরুত্বের অধিকার দিবার ব্যবস্থা হিসাবে আসাম হইতে বাঙ্গালী বিতাড়ন ব্যবস্থাতে কি ভারত সরকারের অনুমোদন আছে বলিয়া আমাদের ধরিয়া লইতে হইবে?

নতুবা ভারত সরকার আসামের জাতীয়তা বিনাশকারী "বঙ্গাল খেদা" বা বাঙ্গালী বিতাড়ন কার্য্যে কোন বাধা দিবার যথাযথ ব্যবস্থা করেন না কেন? কাছাড় যদি আসাম হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় তাহা হইলে

আসামের প্রদেশ হিসাবে আর বিশেষ মুল্য থাকিবে বলিয়া মনে হয় না। ইহা হইতে অনেক উত্তম ব্যবস্থা হইত আসামীদিগকে বর্বরতার পথ ছাড়িয়া মানবতার পথে চলিতে শিখাইলে। কিন্তু আসামের যে সকল রাষ্ট্রনেতার দিল্লীর উপর প্রভাব আছে তাহাদের ঐরূপ কোন সদিচ্ছা আছে বলিয়া মনে হয় না। তাহারা বাহিরে সাধুতার অভিনয় করিলেও ভিতরে ভিতরে স্বজাতীয় হত্যাকারী ও লুঠেরাদিগের সহায়তা করাতেই হয়ত বিশ্বাস করেন। তাহা না হইলে আসামের রাষ্ট্রনেতাগণ সমবেত ও সরলভাবে ঐ সকল অন্যায় অত্যাচার নির্মম হত্যা নারী নির্য্যাতন ও লুণ্ঠন কার্য্যের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন না কেন?

আয়রল্যাণ্ডের যুদ্ধ বিবাদ

ডাবলিন সহরের কিছু লোক একটা বাস ভাড়া করিয়া ডেরী হইতে ডাবলিন যাইতেছিলেন। তাঁহাদের এই যাত্রার কথা তাঁহারা একটি ইংলণ্ডের সাময়িক পত্রে প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে লেখা হইয়াছে "আমরা রবিবার সন্ধ্যা ৬॥০ ঘটিকায় ডেরী হইতে ডাবলিন যাত্রা আরম্ভ করিলাম। যখন আমরা প্রায় দশ মিনিট কাল ধরিয়া চলিয়াছি তখন হঠাৎ একটা ইট জানলা ভাঙ্গিয়া ভিতরে আসিয়া পড়িল। একজন ইংরেজ যুবকের গলায় আঘাত লাগিল কিন্তু জানলার কাঁচ ভঙ্গপ্রবণ ছিল না বলিয়াই আরও অধিক কিছু হইল না। আমরা অতঃপর সব আলো নিভাইয়া চলিতে লাগিলাম। শুধু সামনে লিখা ছিল "স্পেশাল"। আর ঐ ফারলং যাইলে পরে আর একটা ইষ্টকবৃষ্টির মধ্যে গিয়া পড়িলাম। আমাদের বাস চালক অদ্ভুত সাহসী ও সুকৌশলী ছিলেন বলিয়া আমরা সকলে জানলার নিচে মাথা নামাইয়া রাখিয়া এই ইটের ঝড় পার হইয়া যাইতে সক্ষম হইলাম। আরও কিছু দূরে পুনর্ব্বার ইষ্টকপাত আরম্ভ হইল। এইবার যাহারা ইট চালাইতে ছিল তাহারা নিজেরা রাস্তার পাশে পাড়ের আড়ালে

গা ঢাকা দিয়া ছিল। আমরা তাহাদের দেখিতে পাইতে ছিলাম না। অন্ধকারও গভীর ছিল।

আরও আশ্চর্য্য এই যে অতঃপর আরও দশ মাইল অতিক্রান্ত হইলে পরে আমাদের গাড়ী থামাইয়া স্থানীয় সৈন্যগণ খানাতল্লাস করিতে লাগিয়া পড়িল। দুইজন সৈন্য বাসের উপর উঠিয়া যাত্রীদের উপর যন্ত্র বন্দুক তাক করিয়া ধরিয়া রহিল ও আরও দুইজন তল্লাস চালাইতে লাগিল। ফলে একটা দুই পেনী মূল্যের সংবাদপত্র তাহারা লইয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল। এই সংবাদপত্রটি সর্ব্বত্রই সকলে ক্রয় করিয়া থাকে; কোন আইনের বাধা ছিল না সে সম্বন্ধে। ডাবলিন হইতে বেলফাষ্ট যাইবার রেলগাড়ীতেও এইভাবে ইট পাথর নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে এবং তাহা থামাইবার কোন চেষ্টা এখনও করা হইতেছে না। গাড়ীর জানলার কাচ ভাঙ্গা একটা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। সকলে শুধু এই কথা ভাবেন যে মন্দমতি দুর্মদ জনগণকে সভ্যভাবে চলিতে শিখান কতই কঠিন—অসম্ভব বলিলেই চলে।"

ইয়েরোপের কৃষ্টি কতটা গভীর?

অনেকেরই ধারণা যে জার্মানজাতির সকল ব্যক্তিই বৈজ্ঞানিক—অন্তত বিজ্ঞান চর্চ্চায় অল্পবিস্তর নিযুক্ত। ফরাসী জাতি সম্বন্ধে—পৃথিবীর মানুষ ভাবেন যে ফরাসীগণ কৃষ্টিগত প্রাণ। ইতালীয়ান জাতি সঙ্গীত ও সঙ্গীতকেন্দ্রিক "অপেরার" পিঠস্থান ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু সত্য অবস্থা কি তাহা বিচার করিলে দেখা যায় যে জার্মানজাতি সুকৌশলী কারিগরবহুল ও তাহারা নিজ কার্য্য যথাসম্ভব উত্তমভাবে ফাঁকি না দিয়া করিয়া থাকে। যে কয়জন বিজ্ঞানচর্চ্চা করেন তাঁহারাও নিজ নিজ কার্য্য বিবেকজাগ্রত মনোভাব লইয়াই করিয়া থাকেন। ফরাসী জাতির অধিকাংশ মানুষই কৃষ্টি অর্থাৎ সাহিত্যকলা সঙ্গীত নাটক ইত্যাদি লইয়া মাথা ঘামাইবার সুযোগ অনুসন্ধান করেন না। তাঁহারা চাষবাস, মদ্য প্রস্তুত, রেশম শিল্প অথবা নারীদিগের পরিধানবস্ত্র প্রসাধন উপকরণ ইত্যাদি লইয়াই ব্যাস্ত থাকেন। যাহারা ফরাসী কৃষ্টির সন্ধানে ইতস্ততঃ গমনাগমন করিয়া প্যারীস নগরের সেন নদীর বামউপকূলস্থ ল্যাটিন কোয়াটার চষিয়া ফেলেন তাঁহারা যাহা পান তাহা ফরাসী ঐতিহ্যজাত কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। যাহাই হউক তাহার একটা কৃষ্টির দিক আছে ও তাহা প্যারীসের নিজস্ব একথা বলা যায়। কিন্তু তাহার সহিত পুরাকালের অধুনা প্রায়লুপ্ত ফরাসী অভিজাতদিগের কোন রক্ত সম্পর্ক আছে বলিয়া মনে করেন না। তাঁহারা যে ভাষা বলেন তাহাও সেই অভিজাতদিগের সময় হইতে বিশেষভাবে গঠিত ফরাসী ভাষা কিনা তাহাও বিবেচ্য। ইতালীতে যাহারাই হস্তে "ব্যাঞ্জো" লইয়া টুং টাং আওয়াজ করে তাহারাই যে একটা বিশেষ প্রেরণার উৎস অথবা তাহাদের ভিতর দিয়াই যে ইউরোপীয় সঙ্গীতের ধারা অধিক শক্তিতে প্রবাহমান, এমন কথাও কষ্টকল্পনার কথা। আজকালকার জগতে কিসের ধারা কোন দিক দিয়া কিভাবে গতিমান হইয়া উঠিতেছে তাহার বিচার সহজভাবে কোনও পুরাতন রীতি অনুসরণ করিয়া করা যায় না

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস

ঃঃ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ঃঃ

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৭২তম ভাগ
দ্বিতীয় খণ্ড

চৈত্র, ১৩৭৯

৬ষ্ঠ সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

রাষ্ট্রনীতি সূত্র

সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক লোকের যাহাতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মঙ্গল হয় তাহাই সর্ব্বাধিক বাঞ্ছনীয়; অথবা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক লোকের মতে যাহা কর্ত্তব্য তাহাই মানিয়া লইতে হইবে; প্রভৃতি নীতি রাষ্ট্রীয় গঠন বা পরিচালনার মূল সূত্র নির্ণয় চেষ্টার উদাহরণ। কিন্তু ন্যায় বা সুনীতি কি তাহা সমর্থক সংখ্যা গণনা করিয়া স্থির করা মানবীয় আদর্শবাদের দিক দিয়া উপযুক্ত পন্থা নহে। শতকরা একান্নজন মানুষের যদি বাকি উনপঞ্চাশ জনকে দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া অর্দ্ধাহারে খাটাইয়া মারিলে সর্ব্বাধিক মঙ্গল হয় তাহা হইলে সেইরূপ ব্যবস্থা সর্ব্বাধিক বাঞ্ছনীয় এইরূপ কথা ন্যায়ানুমোদিতও নহে এবং তাহা মানবীয় আদর্শ বিরুদ্ধ। সর্ব্বাধিক সংখ্যার কথা ছাড়িয়া দিয়া এবং কোনও সংখ্যার কথা না তুলিয়া বলা যায় যে, অনেক কার্য্য ও ব্যবস্থা এইরূপ আছে যাহা যে কেহ যেরূপ ভাবেই করুক না কেন তাহা সর্ব্বদাই দুর্নীতি বলিয়া ধার্য্য হইবে। পৃথিবীতে যে সকল সামাজিক রীতি নীতি মানব সভ্যতার প্রসারের সহিত ক্রমশঃ এক এক করিয়া বর্জ্জিত হইয়াছে তাহার মধ্যে অনেকগুলিই কোনও না কোন সময়ে সর্ব্বজন অনুসৃত ছিল। যথা নরবলি, সতীদাহ, শিশুহত্যা, স্ত্রীলোকদিগকে সকল অধিকার বর্জ্জিতভাবে অবরুদ্ধ ও পুরুষের ইচ্ছার অধীন করিয়া রাখা, তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর উপরে উচ্চজাতির প্রভুত্ব; পুরোহিত, পূজারী বা রাজার যথেচ্ছাচারের অধিকার, দাসত্ব প্রথা, বেগার খাটাইবার রীতি, বাল্য বিবাহ, বিধবা বিবাহ নিরোধ ইত্যাদি ইত্যাদি। সকল ব্যক্তির ইচ্ছা থাকিলেও এই সকল রীতি অনুসরণ ক্রমশঃ মানব সমাজে অচল হইয়াছে। রাষ্ট্রক্ষেত্রে স্বায়ত্তশাসন প্রথার প্রবর্ত্তন ও অন্যান্য মানবীয় অধিকার প্রাপ্তি ও সুনীতি কি তাহাও বিচার করিয়া স্থির করা হইয়াছে। অধিক সংখ্যক মানুষের কোনও অন্যায় কার্য্য

করিবার অথবা ভ্রান্ত পথে চলিবার অধিকার আছে একথা সুনীতি-গ্রাহ্য নহে। কোনও সময় পৃথিবীর সকল মানুষ বলিত যে ধরণী তক্তার মত সমতল। এ কথাও সকলে মানিত যে সূর্য্য পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া ঘুরিতেছে। কিন্তু বহু সংখ্যক মানুষের ভুল ধারণার বিরুদ্ধে ক্রমশঃ অল্প সংখ্যক লোকের সত্যানুসন্ধানলব্ধ জ্ঞানের কথাই প্রতিষ্ঠিত হইল এবং মনুষ্য সমাজে পৃথিবী যে গোলাকার এবং সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া গতিশীল সেই কথাই সর্ব্বজন স্বীকৃত হইল। নরহত্যা, নারীহরণ, পরস্বাপহরণ প্রভৃতি যে অন্যায় তাহা ভোট দিয়া স্থিরীকৃত হয় নাই। ঈশ্বর আছেন বলিয়া বহুলোকে বিশ্বাস করেন এবং এবং তিনি নাই একথাও কম্যুনিস্ট জগতে অনেকে বলিয়া থাকেন। কিন্তু বুদ্ধিমান্ লোকে এই কথার ন্যায় ও দর্শন সঙ্গত প্রমাণাদিতেই অধিক আস্থা দিয়া থাকেন; ভোট দিয়া ধর্ম্মবিশ্বাস বা নিরীশ্বরবাদ বিচারে প্রবৃত্ত হ'ন না। সংখ্যাগরিষ্ঠ গোষ্ঠীর মতামত কার্য্যকলাপ ইত্যাদির কোন বিশেষ সামাজিক মূল্য আছে ইহা প্রমাণ করা কদাপি সম্ভব হয় না। সংখ্যাগরিষ্ঠদিগের বুদ্ধি, দৈহিক শক্তি, সাহস অথবা দেশভক্তি অপরাপর সংখ্যালঘিষ্ঠ গোষ্ঠীর ব্যক্তিদিগের তুলনায় অধিক, এ কথাও কেহ জোর করিয়া বলিতে পারেন না। ইতিহাসে বহু উদাহরণ পাওয়া যায় যে সংখ্যায় অল্প হইলেও সাহস শক্তি ও বুদ্ধিতে ক্ষুদ্রতর দলের নিকট বৃহত্তর দলের পরাজয় হইতেছে। দেশ শাসনের ক্ষেত্রে একাধিপত্য স্থাপন যখনই হয় তাহার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে অল্প সংখ্যক মানুষ যাহারা সংখ্যায় অধিক তাহাদিগকে হুকুমের দাস করিয়া চালাইয়া চলিতেছে। এক নায়কত্ব শাসনক্ষেত্রে সংখ্যা গরিষ্টতার মহিমাকে অস্বীকার করিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠা করিয়া থাকে। সুতরাং দেশের অবস্থা যখন শান্তিপূর্ণ ও স্বাভাবিক সহজ পথে অবস্থিত থাকে তখন সংখ্যা গণনা ও ভোটের সাহায্যে সকল কার্য্যই হইতে পারে, কিন্তু পরিস্থিতির পরিবর্ত্তন হইলে সেই রীতি অনুসরণ করিয়া চলা অনেক সময়ই আর সম্ভব থাকে না। যুদ্ধক্ষেত্রে যেমন সকল সৈন্যকেই সেনাপতির কথায় উঠিতে বসিতে হয়; সামাজিক আলোড়ন উপস্থিত হইলে তেমনই একের নির্দ্দেশে বহু মানবকে চলিতে শিখিতে হয়।

অদ্যাবধি আমাদের দেশে যে প্রকার নেতৃত্ব বা আদর্শবাদ ঘটিত কলহের সূত্রপাত হইয়া আসিয়াছে তাহাতে সাধারণতন্ত্র যথাযথভাবে পরিচালিত রাখিতে কোথাও কোন অসুবিধা হয় নাই। এক নেতার নেতৃত্বের অবসান হইলে নির্ব্বাচনের মাধ্যমে নেতা পরিবর্ত্তন এখনও হইতে কোনও বাধা উপস্থিত হইতেছে না। একটি কোন রাষ্ট্রীয় দল যদি জনসাধারণের সহানুভূতি ও বিশ্বাস হারায় তাহা হইলে নির্ব্বাচন ক্ষেত্রে অপর কোনও দল প্রথমোক্ত দলকে পরাজিত করিয়া নিজেদের প্রতিষ্ঠা সাধনে সক্ষম হইতে পারে ও সেই পরিবর্ত্তন এখন অবাধ শান্তিপূর্ণভাবে হইতে কোন অসুবিধা দেখা দিতেছে না। কিন্তু এই অবস্থা চিরস্থায়ী থাকিবে এমন কোনও নিশ্চয়তা আছে একথা কেহ বলিতে পারেন না। কিছুকাল পূর্ব্বে বামপন্থী রাষ্ট্রীয় দলগুলির কার্য্যকলাপের মধ্যে কিছু কিছু হিংসাত্মক ভাব লক্ষিত হইয়াছিল। বল প্রয়োগে প্রতিযোগিতা অপসারণ ও কোনও কোনও অবাঞ্ছিত ব্যক্তিকে হত্যা বা হিংসাত্মক আক্রমণে হাসপাতালে পাঠাইবার চেষ্টাও করা হয়। অর্থাৎ সাধারণ তন্ত্রের শান্তিপূর্ণ প্রচলন ব্যাহত হইবার লক্ষণ কিছু কিছু দেখা যায়। বর্ত্তমানেও রাষ্ট্রীয় দলগুলির মধ্যে হিংসায় বিশ্বাসী কর্ম্মী যে কোথাও কেহই নাই এ কথা বলা যায় না। জনসাধারণ অবস্থা বুঝিয়া এবিষয়ে সতর্ক থাকিলে তাঁহাদের মঙ্গল হইবে। অপরিণত মনোভাব যেখানে কার্য্যকর এবং অর্থনৈতিক অবস্থা যেখানে সুগঠিত নহে সেখানে জন সাধারণ সহজেই সুবিবেচনার পথ ছাড়িয়া নূতন পথে জীবন সমস্যার সমাধান চেষ্টা করিতে তৎপরতা দেখাইতে পারেন। ভারতবর্ষের প্রকট বেকার সমস্যা ও গভীর দারিদ্র্যক্লিষ্ট অবস্থা এদেশের জনগণকে সাধারণতন্ত্র বিরুদ্ধ অন্য কোনও উপায়ে নিজেদের উন্নতিসাধন চেষ্টা করিতে প্রণোদিত

করিতে যে পারে না এমন কথাও জোর গলায় বলা চলে না। কয়েকটি রাষ্ট্রীয় দল আছে যাহারা একনায়কত্ব অথবা ডিক্টেটরশিপ অনুগত ভাবে রাষ্ট্রগঠন করিতে অপারগ নহেন। কোন কোন দল আবার বাহিরের অপর কোন রাষ্ট্রের সাহায্য গ্রহণ করিয়া বিপ্লবের পথে ভারতীয় রাষ্ট্রকে নবরূপ দান করিতেও পিছপাও হইবেন না বলিয়া মনে হয়। এইরূপ পরিস্থিতিতে যাহারা সাধারণতন্ত্রে বিশ্বাসী তাঁহারাও আত্মরক্ষা অথবা জাতীয় আদর্শ ও ঐতিহ্য সংরক্ষণ হেতু বাধ্য হইয়া সাধারণতন্ত্রের শান্তিপূর্ণ পন্থা পরিত্যাগ করিয়া অপর উপায়ে উদ্দেশ্য সাধন ব্যবস্থা করিবেন না এমন কথাই বা কে বলিতে পারে? অর্থাৎ একাধিপত্য প্রতিষ্ঠা রক্ষণশীলতার দিক হইতেও চেষ্টিত হইতে পারে ও হইবার সম্ভাবনাও আছে একথা অস্বীকার করিতে পারা যায় না।

পাকিস্থানকে অস্ত্র সরবরাহ

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ১৯৭১ খৃঃ অব্দের বাংলাদেশ-ভারতের সহিত পশ্চিম পাকিস্থানের যুদ্ধের সময় ভারত ও পাকিস্থান, উভয় দেশকেই সকল প্রকার সামরিক সাহায্যদান বন্ধ করেন। সম্প্রতি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র যে সকল সামরিক অস্ত্রাদি অংশতঃ দিবার পরে উপরোক্ত কারণে দেওয়া বন্ধ হয়, সেই সকল সরবরাহ কার্য্য পুনরায় সম্পূর্ণ করিবেন বলিয়া পাকিস্থানকে অস্ত্র পাঠানো আরম্ভ করেন। এই অস্ত্র সরবরাহের ফলে পাকিস্থানের যুদ্ধ বিমান ও তাহার যন্ত্রাদির সংখ্যা বিশেষ করিয়া বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহা ব্যতীত ট্যাঙ্ক, অস্ত্রবাহক মোটর চালিত যান ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্রাদিও বহুল পরিমাণে আমেরিকার দ্বারা পাকিস্থানকে প্রদত্ত হইতেছে ও তার ফলে পাকিস্থানের অপর দেশকে আক্রমণ করিবার ক্ষমতা প্রবলতর হইতেছে। পাকিস্থানের অপর কোনও দেশকে আক্রমণ করিবার কথা উঠিলেই একমাত্র ভারতবর্ষের কথাই সর্ব্বাগ্রে লোকমনে জাগ্রত হয়। কারণ পাকিস্থান সর্ব্বদাই ভারতের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া থাকে ও কয়েকবার ভারতকে আক্রমণও করিয়াছে বলিয়া দেখা গিয়াছে। বর্ত্তমান কালে শেষ যে আক্রমণ হয় তাহা মুখ্যতঃ বাংলাদেশের বিরুদ্ধে হইয়া থাকিলেও পাকিস্থান নানাভাবেই ভারতবর্ষকে যুদ্ধে নামাইবার জন্য বিপর্য্যস্ত করিতে থাকে ও সর্ব্বশেষে ভারতেও বিমানকেন্দ্র প্রভৃতির উপর বোমা বর্ষণ করিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করে। প্রথমদিকে ভারতকে নাজেহাল করিবার জন্য প্রায় এক কোটি বাংলাদেশবাসী নরনারী শিশু প্রভৃতিকে বর্ব্বর আক্রমণ করিয়া দেশত্যাগ করিয়া ভারতে প্রবেশ করিতে বাধ্য করে। তৎসঙ্গেই পাকিস্থানের সৈন্যদল বা তাহাদের সহায়ক সশস্ত্র রাজাকর প্রভৃতিরা ভারতে বারে বারে অনুপ্রবেশ করিতে থাকে এবং কখন কখন বিমাণ অথবা ট্যাঙ্ক আক্রমণও করে।

ভারতের নিকট পরাজিত হইয়া এবং বাংলাদেশ হারাইয়া পাকিস্থান বিশেষভাবে শক্তিহীন হইয়া পড়ে এবং সেই কারণে পাকিস্থানের রাষ্ট্রপতি জুলফিকার আলি ভুট্টো ভারতের সহিত সখ্য স্থাপন চেষ্টা করেন। ভারত কোন সময়েই কোন জাতির সহিত সখ্য স্থাপনে অনিচ্ছুক নহেন, সুতরাং ভারত পাকিস্থানের সহিত সম্বন্ধ যাহাতে উন্নত ও শান্তিপূর্ণ হয় সেইরূপ ব্যবস্থার জন্য চেষ্টিত হয়েন। যুদ্ধ বন্দীদিগের স্বদেশে ফিরিয়া যাওয়া লইয়া কিছু মতের অনৈক্য থাকিলেও ভারত-পাকিস্থান বন্ধুত্ব সংস্থাপন অসম্ভব হইত না। কিন্তু ইতিমধ্যে যাহাতে উভয় দেশের বন্ধুত্ব না হইতে পারে আমেরিকা সেইরূপ পরিস্থিতি সৃজন করিতে আরম্ভ করায় পাকিস্থানের ভারত বিরুদ্ধতা আরও উদ্দীপিত হইয়া দুই রাষ্ট্রের মধ্যে প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপনে বাধার সৃষ্টি হইতেছে। এখন পাকিস্থান সামরিক মাল মশলা পাইতে আরম্ভ করায় তাহাদের ভারতের সহিত বন্ধুত্বের আগ্রহ বিশেষ করিয়া হ্রাস পাইতেছে বলিয়া মনে হইতেছে। সামরিক শক্তি যথেষ্ট বর্দ্ধিত হইলে ভারতের সহিত শত্রুতার আগ্রহই প্রবলতর হইয়া উঠিবে। অবস্থা বিচার করিলে দেখা যায় যে শত্রুতার পুনরুদ্গম এখনই হইয়াছে এবং পাকিস্থান আমেরিকা ও চীনের সাহায্যে ভারত আক্রমণের জন্য পুনর্বার প্রস্তুত হইতেছে। এই

কারণে আমেরিকার পাকিস্থানকে যে সামরিক সাহায্যদান তাহার যে কারণই আমেরিকা দেখান না কেন, তাহার ফলে যে ভারত-পাকিস্থান যুদ্ধ সম্ভাবনা আরও অধিক নিশ্চয়তা লাভ করিবে সে কথা আমেরিকা বুঝিতে পারেন নাই এমন অভিনয় আমেরিকা বিশ্ববাসীর নিকট করিলে তাহা অল্প লোকেই বিশ্বাস করিবে। আমেরিকা রুশিয়ার শত্রু ও ভারত রুশিয়ার বন্ধু। আমেরিকার ভারত বিরুদ্ধতার ইহাই সম্ভবতঃ প্রধান কারণ; কিন্তু আমেরিকা খোলাখুলি সেকথা বলেন না। পরন্তু ভারতকে কিছু কিছু সাহায্য করিতেও আমেরিকার কোন কৃপণতা দেখা যায় না।

ডাঃ করণ সিং-এর মন্ত্রিত্বে ইস্তাফা দান

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার ট্যুরিজম ও সিভিল এভিয়েশন মন্ত্রী ডাঃ করণ সিং সম্প্রতি একটি অ্যাভ্রো বিমান ভূপাতিত হইয়া তিনটি ব্যক্তির প্রাণহানি হওয়াতে নিজ মন্ত্রিত্বে ইস্তফা দিয়াছিলেন। তিনি ইস্তফা দিবার কারণ দেখান যে, কয়েকটি অ্যাভ্রো বিমান নষ্ট হইয়া যাওয়ার পরেও তিনি যখন বিমানগুলির ঐ অবস্থার কোন সফল চিকিৎসা সাধনে সক্ষম হয়েন নাই তখন তাঁহার পক্ষে আর মন্ত্রী থাকা উচিত নহে। ডাঃ করণ সিং খুবই বিবেকবানের মত কার্য্য করিয়াছিলেন কিন্তু প্রধান মন্ত্রী তাঁহার ইস্তফা গ্রাহ্য না করিয়া তাঁহাকে উহা প্রত্যাহার করিতে অনুরোধ করেন। ডাঃ করণ সিং সেই অনুসারে ইস্তফা পত্র প্রত্যাহার করেন। ইহা না করিলেই সম্ভবতঃ ভালো হইত। কারণ যদিও ডাঃ করণ সিং অতিশয় কর্ম্মক্ষম ব্যক্তি ও তিনি মন্ত্রীসভায় থাকিলে ভারতবাসী দিগের উপকারই হইবে তাহা হইলেও মন্ত্রীদিগের নানা ক্ষেত্রে যে সত্যকার অক্ষমতা দেখা যায় না এমন নহে। এবং সেই সকল ক্ষেত্রে যদি মন্ত্রিত্ব ত্যাগের নিয়মই প্রতিষ্ঠিত হয় তাহা হইলে তাহাতে জাতির মঙ্গল হইবে। সম্প্রতি যে কয়লা খনিতে দুর্ঘটনা ঘটিয়া অনেক কর্ম্মীর প্রাণহানী হইয়াছে তাহার জন্য অবশ্য খনি মন্ত্রী পদত্যাগ করেন নাই। সম্ভবতঃ তিনি নিজ অন্তরে নিজেকে ইহার জন্য দায়ী মনে করেন নাই। কিন্তু দায়িত্ব সকল ক্ষেত্রে সাক্ষাৎ দায়িত্ব হয় না; অনেক স্থলেই দায়িত্ব পরোক্ষভাবে প্রধান যিনি তাঁহার উপরেই ন্যস্ত হয়। খনি-মন্ত্রী খনি পরিচালনার কার্য্যের জন্য দায়ী নহেন এবংঅন্য অন্য যে সকল উচ্চ পদস্থ কর্ম্মচারীগণ সাক্ষাৎভাবে সেই কার্য্যের তত্ত্বাবধান করেন তাঁহারাই সকল দায়িত্ব গ্রহণ করেন, বলা যাইতে পারে। ইহা হইলে সম্ভবতঃ দেখা যাইবে কোন কোন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর এই জন্য জবাবদিহি করিতে হইবে। অবশ্য নাও হইতে পারে। কোন অতি সাধারণ কর্ম্মচারীর উপর দোষ চাপাইয়া সকল প্রভূত্বভারপ্রাপ্ত মহারথীগণই পার পাইয়া যাইতে পারেন। এইরূপ ভাবে দোষ থাকিলেও পার পাইয়া যাওয়ার রীতি বৃটিশ আমলে সর্ব্বত্রই প্রচলিত ছিল। কিন্তু স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হইবার পরেও যদি সেইভাবেই কাজ চালতে থাকে তাহা হইলে দেশের সকল কাজেই ঢিলা ভাব থাকিয়া যাইবে। ডাঃ করণ সিং যে কার্য্যের দায়িত্ব নিজ স্কন্ধে লইতেছিলেন তাহা বিশেষ করিয়া প্রশংসনীয়। তাহা না লইতে দেওয়া প্রধান মন্ত্রীর পক্ষে অনুচিত হইয়াছে। বৃটিশ আমলে লক্ষলক্ষ মানুষ দুর্ভিক্ষে অনাহারে প্রাণ হারাইলেও কোন বৃটিশ কর্ম্মচারীর চাকুরী যাইত না। কংগ্রেসী রাজত্বে দেশবাসীর বহু দুঃখ কষ্ট ঘটিয়া থাকিলেও জননেতাদিগের অঙ্গে তাহাতে কোনও আঁচড় পড়ে নাই। এখনও সেই পদ্ধতিই অনুসৃত হইতে থাকিবে বলিয়া মনে হইতেছে। দেশের কোন সমস্যার সমাধান না হইলেও রাষ্ট্রনেতাদিগের তাহাতে কোনও অসুবিধা হইবে না।

জাল ও ভেজাল

ভারতবর্ষের ব্যবসাদারদিগের মধ্যে ক্রেতাদিগকে প্রবঞ্চনা করার চিরপ্রচলিত ধারা কিছুতেই পরিবর্ত্তিত হইতেছে না। যে কোন বস্তু জনপ্রিয় হইয়া অধিক বিক্রয় হয় তাহারই নানাপ্রকার জাল সংস্করণ বাজারে বাহির হয়। মুদ্রা, হীরা জহরত হইতে আরম্ভ করিয়া খাদ্য, পানীয়, বস্ত্র, কলম, ঘড়ি, যন্ত্রের অংশ, ঔষধ প্রসাধন বস্তু ইত্যাদি ইত্যাদি সকল কিছুরই জাল হইয়া

থাকে এবং প্রত্যহ অসংখ্য লোক ঐ সকল ক্রয় করিয়া প্রতারিত হইয়া থাকে। জাল ঔষধ ব্যবহার করিয়া বহু রোগীর জীবন বিপন্ন হয় এবং জাল খাদ্য পানীয় খাইয়া অনেক লোকের স্বাস্থ্যহানি হইতেও দেখা যায়।

জালের সহিত সমান তালে চলে ভেজাল। পৃথিবীতে সম্ভবতঃ ভারতবর্ষই একমাত্র দেশ যেখানে দুগ্ধে জল মিশ্রিত করিয়া ক্রেতাদিগকে প্রতারিত করা হইয়া থাকে। যে জল মেশান হয় তাহা আবার অনেক সময় পরিষ্কার জল নহে। তৎপরে আছে চাউল ডাইল প্রভৃতি খাদ্য বস্তুতে কাঁকর ও ধুলা মেশান। ভালো জিনিসের সহিত পচা জিনিস মেশান ও আসলের সহিত নকল মিলাইয়া দেওয়া সর্বত্রই দেখা যায় এবং সিমেন্টের সহিত মৃত্তিকা, চায়ের সহিত কাঠের গুঁড়া ও চামড়ার কুচি অথবা চিনির সহিত বালুকাও মিশ্রিত হইতে দেখা যায়। তৈলের সহিত নিকৃষ্ট তৈল জাতীয় বস্তু অথবা পেট্রোলের সহিত কেরোসিন মিশ্রণও করা হইয়া থাকে। এই সকল জাল ও ভেজাল যাহারা করে তাহারা ভারতের সর্বত্র ছড়াইয়া আছে। তাহারা শিক্ষিত অশিক্ষিত ও নানা জাতীয়। কোন জাতি বা শ্রেণী বিশেষের মানুষ ইহারা বিশেষ ভাবে নহে। দুর্নীতি সর্বব্যাপ্ত ও তাহার প্রসার ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত হইতেছে। এই অপরাধ প্রবণতা যদি অচিরাৎ দমন করিবার ব্যবস্থা না করা হয় তাহা হইলে ভারতের কোনও উন্নতি কখনও হইবে না। দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা প্রভৃতি দূর করিবার চেষ্টার সহিত দুর্নীতি দূর করিবার চেষ্টাও একই সঙ্গে করা একান্তভাবে আবশ্যক।

পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস রাজ

পশ্চিমবঙ্গে শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের মুখ্যমন্ত্রিত্বে যে কংগ্রেস রাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহার প্রথম বৎসর পূর্ণ হইল বলিয়া কংগ্রেস বন্ধুগণ আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন। রাষ্ট্রীয় দল গঠন করিয়া শাসন ভার গ্রহণ করার যেরূপ একটা শক্তি সংগঠনের দিক দিয়া মূল্য আছে, তেমনি আবার দলের সমর্থকদিগের নিকট দলের সাত খুন মাফ নীতি অনুসরণের কারণে একটা খারাপ দিকও গড়িয়া উঠিয়া থাকে। অর্থাৎ যে স্থলে কোন ব্যক্তি অথবা দলের কার্য্যকলাপের মূল্য বিচার নিরপেক্ষ ভাবে করা উচিত, সেই স্থলে দলাদলির ফলে যে গুণ নাই তাহা আছে ও যে দোষ আছে তাহা নাই বলাই একটা রীতি হইয়া দাঁড়ায় ও তাহার ফলে কোনও সংস্কার কার্য্যই যথাযথ ভাবে অনুষ্ঠিত হইতে পারে না। রাষ্ট্রীয় দলের ও রাষ্ট্রনেতাদিগের অনুচরদিগের কল্পনা প্রসূত নিজেদের গুণাবলীর বর্ণনা ও প্রচারে দেশবাসী সত্য অবস্থা কি তাহা জানিতেও পারেন না; এবং কোন দোষের কথা কেহ বলিলে তাহার বিভিন্ন প্রকার সাফাই শ্রবণেও সেই একই অবস্থা আরও জোরাল হইয়া উঠে। নিরপেক্ষ ভাবে দেশের অবস্থা ও শাসন পদ্ধতি বা শাসন কার্য্যের বিচার করিলে সতত্তই দোষগুণ উভয়ই লোক চক্ষের সম্মুখে উপস্থিত করা হয়। দলাদলির আবহাওয়াতে একদল সমালোচক সত্যমিথ্যা মিশ্রিত শুধু দোষই দেখাইয়া থাকেন এবং অপর পক্ষ শুধু গুণ প্রদর্শনেই আত্মনিয়োগ করেন। কিন্তু এইরূপ অবস্থাতেও নিরপেক্ষ আলোচনা করা যাইতে পারে। কংগ্রেস রাজ স্থাপিত হইবার সময় যে সকল প্রতিশ্রুতি দান বা শাসন সংস্কারের দায়িত্ব গ্রহণের কথা উত্থাপিত হয় সেই কথা অনুসারে সকল কার্য্য করিতে বারো মাসের অনেক অধিক সময় লাগে। দ্বিতীয়তঃ কোন কোন প্রতিশ্রুতি রক্ষা সহজসাধ্য ও কোন কোনটি করিতে হইলে বহু অর্থব্যয় ও জাতির সমবেত চেষ্টার আবশ্যক হয়। সুতরাং অর্থাভাব জর্জ্জরিত পশ্চিম বঙ্গের পক্ষে সেই সকল প্রচেষ্টা অসম্ভবকে সম্ভব করিবার চেষ্টা। সেই জাতীয় কার্য্য পূর্ণরূপে না করিতে পারিলে তাহাতে কাহারও কিছু বলিবার থাকে না। যথা একটা প্রতিশ্রুতি অনেকাংশে রক্ষিত হইয়াছে। তাহা হইল, দেশে যে অরাজকতার আবির্ভাব হইয়াছিল তাহার অবসান সাধন। অনেকে বলেন কংগ্রেসের কর্ম্মীরা শক্তির অপব্যবহার করিয়াই পূর্ব্বকার গুণ্ডারাজ উচ্ছেদ করিয়াছেন। তাহা যদি হইয়াও ...কে এবং অহিংসার পথ ছাড়িয়া যদি কিছু কিছু হিংসাত্মক কার্য্য করিয়া

গুণ্ডাদিগকে দমন করা হইয়া থাকে, তাহা হইলেও যাহা করা হইয়াছে তাহাতে দেশের অবস্থা বিশেষ করিয়া উন্নতির দিকেই গিয়াছে। অহিংসনীতি অবলম্বনে উদ্দেশ্য সিদ্ধি যদি না হইয়া থাকে তাহা হইলেও শান্তি স্থাপনের কার্য্য এতই প্রয়োজনীয় হইয়া দাড়াইয়াছিল যে, তাহার জন্য অহিংসার আদর্শ কিছুটা খর্ব্ব হইয়া থাকিলেও তজ্জন্য জাতীয় ভাবে শোক প্রকাশ করিবার কোনও আবশ্যকতা লক্ষ্য করা যায় না। শাসন কার্য্যের বিভিন্ন শাখা প্রশাখায় কোনও উন্নতি হইয়াছে কি না, অথবা বেকার সমস্যা সমাধান, নিরক্ষরতা দূরীকরণ, স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নতি সাধন প্রভৃতি হইয়াছে কি না তাহার বিচার ব্যাপক ও সকল বিষয়ের একত্র ভাবে হইতে পারে না। কোথাও কোথাও উন্নতি হইয়াছে, কোথাও হয় নাই ও কোথাও বা অবনতির লক্ষণও দেখা দিয়াছে। উৎকোচ গ্রহণ, কার্য্য যথাযথ ভাবে ও সময়ে না করা প্রভৃতি বহু দোষ সরকারী দফতরে এখনও প্রবলভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে। জন সাধারণের অধিকার রক্ষা করিয়া ও সকলের সুখ সুবিধা দেখিয়া চলা ও সর্ব্বক্ষেত্রে সুনীতি প্রাধান্যভাবে ও সাধারণের সম্মান বজায় রাখিবার চেষ্টা ইত্যাদি এখনও রাজকার্য্যের রীতি ও ধারাগত হয় নাই। পুরাকালের রাজা প্রজা সম্বন্ধের খারাপ দিকগুলি এখনও আমলাগণ যতদূর পারেন প্রকট ভাবে রাখিয়া চালিবারই চেষ্টা করিয়া থাকেন। এক কথায় বলা যায় যে উন্নতি কিছু হইয়া থাকিলেও আরও অধিক ও বিস্তারিত উন্নতির ক্ষেত্র এখনও বহু স্থলে বর্ত্তমান রহিয়াছে। গা ঢিলা দিয়া সব কিছু হইয়াছে ভাবিবার কোনও কারণ এখনও দেখা যাইতেছে না। অবশ্য নৈরাশ্যের কারণও সর্ব্বত্র নাই।

জাতি, ভাষা ও সাম্প্রদায়িক কলহ

কলহ করিতে হইলেই যে কলহকারীদিগের মধ্যে জাতি, ভাষা, ধর্ম্ম, কৃষ্টি বা মতবাদের পার্থক্য থাকা আবশ্যক হইবে এমন কথা সর্ব্বক্ষেত্রে বলা চলে না। এক পরিবারের বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যেও কলহ হইতে পারে ও হইয়া থাকে। এক জাতি বা ধর্ম্ম সম্প্রদায় হইলেও তাহার অন্তর্গত ব্যক্তিদিগের মধ্যে নানা প্রকার গণ্ডি গঠিত হইয়া থাকে এবং সেই সকল গণ্ডির পারস্পরিক কলহ বিবাদ প্রায়শঃই ঘটিতে দেখা যায়। ভারতবর্ষ ক্ষুদ্র দেশ নহে। ভারতবর্ষে বহু জাতির বাস ও সেই সকল জাতির জনগণ বহু ভাষাভাষী, নানান ধর্ম্ম অবলম্বনকারী ও তাহাদের মধ্যে কৃষ্টি ও আচার ব্যবহারের একটা মূল সাদৃশ্য ও একতা থাকিলেও সর্ব্বত্রই কিছু কিছু পার্থক্যও অনেক সময় দেখা যায়। কিন্তু তাহা হইলেও যখন জাতি, ভাষা প্রভৃতির পার্থক্য থাকে ও কলহেরও সূত্রপাত হইতে দেখা যায় তখন যদিও ঐ পার্থক্যগুলিকেই কলহের কারণ বলিয়া ধরা হয় তথাপি যথাযথ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, ভাষা বা জাতিগত পার্থক্য একটা কলহের অজুহাত মাত্র, আসল কারণ যাহা তাহা অপ্রকাশিত থাকিয়া যায়। সেই ভিতরের গোপন কথা হইল ন্যায়তঃ যাহা যে পাইবার অধিকারী সে যদি অন্যায় ভাবে তাহা অপেক্ষা অধিক পাইবার চেষ্টা করে তাহা হইলে তাহাকে সকল প্রতিদ্বন্দ্বীদিগকে অপসৃত করিয়া নিজ কার্য্য সিদ্ধি চেষ্টা করিতে হয়। সেই যে প্রতিদ্বন্দ্বী অপসারণ কার্য্য তাহা সাধন করিতে হইলে কোন একটা কলহের কারণ অনুসন্ধান করিতে হয়। কলহের কারণ হিসাবেই জাতি, ধর্ম্ম ভাষা, রাষ্ট্রমত প্রভৃতির পার্থক্যের উল্লেখ ও উত্থাপন হইয়া থাকে। অর্থাৎ কলহের ইচ্ছা হয় কোন গোষ্ঠীর স্বার্থসিদ্ধির আবশ্যকতা উপলব্ধি হইতে। কলহ না হইলে অকারণে প্রতিদ্বন্দ্বীদিগকে আক্রমণ ও বিতাড়ন চেষ্টা করা চলে না। এবং আক্রমণ না করিলে কেমন করিয়া শত্রুপক্ষকে তাড়ান সম্ভব হইতে পারে? সুতরাং জাতি ধর্ম্ম ভাষা রাষ্ট্রমত যাহাই হউক কিছু একটার অব-তারণা করিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিতে হইবেই এবং তৎপরে আর কোনও নীতির কথা আর উঠিবার প্রয়োজন হইবে না। ভারতবর্ষে যেখানে যখনই কোনও জাতি গোষ্ঠী বা দলগত কলহ আরম্ভ হয় তখনই দেখা যায় যে তাহার কারণ বলিয়া যাহা প্রচারিত হয় তাহা শুধু লোক দেখান

কারণ—আসল কারণটার কথা কেহ খুলিয়া বলে না। এক পক্ষ অপর পক্ষকে বিধ্বস্ত করিতে না পারিলে তাহার পক্ষে রাষ্ট্রীয় শক্তির আসরে একাধিপত্য সৃজন সম্ভব হয় না। সেই কারণে তাহাদের যে কোন অজুহাতে একটা বিবাদের সূচনা করিতেই হয়। ভাষার কথা অথবা জাতির কথা তখন উত্থিত হয় বিবাদ চালাইবার জন্য।

আসামে যে বাঙ্গালী বিতাড়ন চেষ্টা হইয়া থাকে তাহার মূলে আছে অহমিয়াদিগের আসামের রাষ্ট্রক্ষেত্রে একাধিপত্য স্থাপন চেষ্টা। অহমিয়াগণ সম্ভবতঃ আসামে পূর্ণরূপে সংখ্যাগরিষ্ঠ নহে অর্থাৎ আসামের জনসংখ্যা যাহা তাহার মধ্যে অহমিয়াগণ শতকরা পঞ্চাশ জনের অধিক নহে। শুনা যায় যে আসামের অধিবাসীদিগের মধ্যে শতকরা ৪২ জন মাত্র অহমিয়া জাতীয়। বাকি ৫৮ জনের মধ্যে সর্ব্বাধিক সংখ্যক হইল বাঙ্গালী ও তৎপরে আছে বহু অন্যান্য জাতির মানুষ। অহমিয়াগণ যদি বাঙ্গালীদিগকে আসাম ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে বাধ্য করিতে পারে তাহা হইলে তাহারা হয়ত সংখ্যা গরিষ্ঠতাতে আরও অনেক জোরাল হইয়া উঠিতে পারিবে। আসামের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি শুধু অহমিয়া ভাষাই ব্যবহার করিবে ইত্যাদি কথা শুধু একটা ঝগড়ার অজুহাত। আসামে শিক্ষার প্রসার এত কিছু ব্যাপক নহে যাহাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মাধ্যম লইয়া জন সাধারণের শিরঃপীড়া হইতে পারে।

উড়িষ্যাতে যে বাঙ্গালীদিগকে আক্রমণ করা হইয়াছিল তাহার মূলে কোন রাষ্ট্রীয় কথা নাই বলিয়াই মনে হয়। আছে সস্তার আত্মম্ভরিতার কথা। ওড়িয়াগণ অপর কাহারও তুলনায় হেয় নহে ইহাই প্রমাণ করিবার জন্য যত গায়ে পড়িয়া ঝগড়ার চেষ্টা। ঐ সকল ওড়িয়াগণ মনে রাখে না যে সহস্র সহস্র ওড়িয়া বাঙ্গালার ভিন্ন ভিন্ন স্থলে নানা কার্য্য করিয়া দিন গুজরান করে। তাহাদের যদি বাঙ্গালা ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে হয় তাহা হইলে তাহারা মহা বিপদে পড়িবে। উড়িষ্যার যোদ্ধাগণ অবশ্য সে চিন্তা করে না।

কলিকাতার উন্নতিসাধন

কিছুদিন হইতে কলিকাতা মহানগরীর বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নতি সাধন চেষ্টা বহু অর্থ ব্যয় করিয়া করা হইতেছে। ইহা অবশ্য আমাদের শোনা কথা। কারণ যদিও পথে ঘাটে নানা স্থলে রাস্তা খুঁড়িয়া খাল কাটা হইতেছে এবং বৃহৎ বৃহৎ নল বসান হইতেছে দেখা যায় কিন্তু তাহা হইতে মহানগরীর কোন বিশেষ উন্নতি হইতেছে বলিয়া মনে করিবার কারণ দেখা যায় না। খাল কাটা, বৃহৎ বৃহৎ গর্ত্ত ও কাটা মাটির ঢিপি আমরা চিরকালই দেখিয়া আসিতেছি এবং একথাও ভাবিয়া আসিতেছি যে পয়সা খরচ করিয়া রাস্তা নির্ম্মাণের কি সার্থকতা থাকে যদি ক্রমাগতই সেই সকল রাস্তা আরও অর্থব্যয় করিয়া খুঁড়িয়া নষ্ট করা হয়। এই সম্পর্কে একটা কাহিনী মনে পড়ে, তাহা হইল অন্য একটি প্রদেশে একটি নদীর সেতু নির্ম্মাণের (?) কাহিনী। সেতুটি কোনও দিনই নির্ম্মিত হয় নাই কিন্তু তাহার জন্য "বিল" করিয়া টাকা দেওয়া ইত্যাদি হইয়া গিয়াছিল। এই সময় হঠাৎ এক অতি উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী ঐ পথে মোটর যোগে গমন করেন। যেখানে সেতু থাকিবার কথা সেখানে সকলে তাঁহার গাড়ী নদীবক্ষে নামাইয়া ঠেলিয়া পার করিতেছে দেখিয়া তিনি প্রশ্ন করিলেন, এই সেতু তো সম্প্রতিই নির্ম্মিত হইয়াছে বলিয়া আমরা জ্ঞাত হইয়াছি। ইহার জন্য টাকাও দেওয়া হইয়াছে। সেতু কোথায়? এই সকল কথা জানিতে পারিয়া সেতুর ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয় ফাইলে রিপোর্ট আদি ন্যস্ত করিয়া সেতুটি যথাযথ ভাবে নির্ম্মিত হয় নাই বলিয়া তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া নূতন করিয়া নির্ম্মাণ করার নির্দ্দেশ বহাল করিলেন। অর্থাৎ অনির্ম্মিত সেতুর জন্য একবার নির্ম্মাণের খরচ দেওয়ার পরে তাহা ভাঙ্গিবার খরচও তদুপরি দিবার ব্যবস্থা হইল। আমরা বলিতেছি না যে কলিকাতা মহানগরীর উন্নতি সাধনও ঐ সেতুর মতই একবার ব্যয়সাধ্য ভাবে করা হইয়া পুনর্ব্বার নাকচ করিয়া দিয়া তৃতীয় বারে সমাপ্ত হইবে। যেখানে মহা মহারথীগণ কর্ম্মের নক্সা প্রস্তুত করিয়া কার্য্যারম্ভ করেন সেখানে যে কোথায় কি হইতেছে,

কোথায় কিসের আরম্ভ অথবা শেষ, তাহা ক্ষীণবুদ্ধি সাধারণ মানুষের বোধগম্য নহে। মহানগরীর নানা স্থানে ভাঙ্গাগড়া চলিতেছে। কেহ কেহ বলেন, ভাঙ্গার কাজটাই দ্রুতগতি অগ্রসর হইতেছে, গড়াটা তত কিছু হইতেছে না। কিন্তু তাহার উত্তরে বলা যায় যে, পুরাতনকে ভাঙ্গিয়া গড়িতে হইলে ভাঙ্গাটাই প্রথম কথা, গড়াটা পরে আসিবে। সে যাহাই হউক, কলিকাতা মহানগরীর কোনও বিশেষ পরিবর্তন লক্ষিত হইতেছে না। উদ্বাস্তু নারী ও শিশু পথে ঘাটে সর্বত্র পূর্ব্বাপেক্ষা বহু অধিক সংখ্যায় বিরাজিত। তাহারা কে ও কোথা হইতে আগত তাহা লইয়া প্রশ্ন ও আলোচনা চলিতেছে কিন্তু কোনও বিশ্বাসযোগ্য উত্তর পাওয়া যাইতেছে না। খুঞ্চে বহনকারী ফেরিওয়ালা ও অস্থায়ী দোকানের বিক্রেতার সংখ্যা বাড়িয়াই চলিতেছে। কলিকাতার বিরাট গড়ের মাঠ ক্রমশ: নানা প্রকার দখলদারদিগের দখলের ফলে আকারে ক্ষুদ্রতর হইয়া উঠিতেছে। পদব্রজে যাহারা চলেন তাঁহারা দেখেন যে, চলিবার পথও নানা প্রকার দখলদারদিগের কবলে পড়িয়া আর না থাকার পর্য্যায়ে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। এক কথায় কলিকাতা যেমন ছিল তেমনই রহিয়াছে। কাটা খোঁড়া পূর্ব্বের মতই চলিতেছে। খোঁড়া হইলে আর ভরাট হয় না। জল জমিলে আর তাহা সরে না। আলো নিভিলে জ্বলে না। রাস্তার উপরে দোকান ও মানুষের বসবাস যেমন ছিল তেমনই চলিতেছে। শুনা যায় কলিকাতা একশত দুইশত কোটি টাকা খরচ করিয়া নবকলেবর প্রাপ্ত হইবে। টাকা খরচ হয়ত হইতেছে। নবকলেবর যতটা মনে হয় এখনও নিরাকার।

মানব প্রতিভার কথা

সৌন্দর্য্যবোধ, রস অনুভূতি; কথায়, সুরে, ছন্দে, বর্ণে, রেখায়, তালে, অঙ্গ সঞ্চালনের ভঙ্গিতে সেই অন্তরের উপলব্ধির বাহ্যিক প্রকাশ; এই সবই হইল কৃষ্টির শাখা প্রশাখার কথা। মানুষ মনের মধ্যে যে ভাব, আকৃতি, রূপ বা সৌন্দর্য্য কথার সমন্বয় সৃজন কল্পনা করে তাহাকে যদি অপরের সম্মুখে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করিয়া উপস্থিত করিতে পারে তাহা হইলে সেই প্রকাশ রস অভিব্যক্তি ও শিল্পকলার নিদর্শন বলিয়া মানব সমাজে গৃহীত হয়। মূল কথা হইল সৌন্দর্য্যবোধ ও রস অনুভূতি এবং তাহার বাস্তব ও বাহ্যিক প্রকাশ। কাব্য, সাহিত্য, চিত্রকলা, ভাস্কর্য্য, সঙ্গীত, বাদ্য, নৃত্য, নাট্য, ইত্যাদি সকল কিছুই শিল্পকলার অন্তর্গত এবং যুগে যুগে নানা দেশে ও পরিবেশে সেই শিল্পকলার সৃজন ও প্রচার মানব সভ্যতার বিশেষ প্রচেষ্টা বলিয়া ব্যক্ত হইয়াছে। এই ক্ষেত্রে সৃজনে অভিনবত্ব মানুষের বুদ্ধি, বোধ ও কল্পনা শক্তির পরিচায়ক এবং সেই মানসিক সৃষ্টি ক্ষমতাকেই কৃষ্টি প্রতিভা বলা হয়। ভাষার মাধ্যমে যে সুন্দরের অনুশীলন ও রসের অভিব্যক্তি তাহাই কাব্য সাহিত্যের জন্মদাতা। সুর ছন্দ তাল সৃজিত হয় শব্দের সাহায্যে। নৃত্য, নাট্য, অভিনয় সক্ষম করিতে হইলে ছন্দ, তাল ও ভাষার ব্যবহার আবশ্যক হয় এবং সেই কার্য্য যথাযথ ভাবে না করিতে পারিলে রস অভিব্যক্তি অসম্পূর্ণ অথবা নিষ্ফল হয়। চিত্রকলা ও ভাস্কর্য্যের বিষয়ে রেখা বর্ণ ও আকার রচনা কৌশল শিল্পীর প্রতিভার পরিচয় দেয়। অন্য নানান ক্ষেত্রেও রস অভিব্যক্তির কথা উত্থিত হইয়া থাকে। স্থাপত্য, উদ্যান বা সহরের গঠন পরিকল্পনা, এমন কি আসবাব, গৃহস্থালীর ব্যবহার্য্য রন্ধন, ভোজন, জলাধার পাত্রাদি, সকল কিছুর মধ্যেই শিল্প-কলার সৃজন প্রতিভা ব্যক্ত হইয়া থাকে। আর একটা বিশেষ ক্ষেত্রে এই শক্তি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। তাহা হইল বস্ত্রে ও পোশাকে। বস্ত্র শিল্প মানুষের কারুকার্য্য ক্ষমতার বিশেষ পরিচয় মানব সভ্যতার প্রারম্ভকাল হইতেই দিয়া আসিয়াছে। আরও দেখা গিয়াছে মানব শিল্প প্রতিভার প্রকাশ অলঙ্কারে ও অপরাপর নানা প্রকার শোভন বস্তুর গঠনে। অলংকার, বস্ত্র প্রভৃতির আকার প্রকারের বর্ণনা দিয়া বৃহৎ বৃহৎ পুস্তক রচিত হইয়াছে ও তাহাতে প্রাচীন মিশর, চীন, ভারতবর্ষ, গ্রীস প্রভৃতি দেশের অলংকারাদির সৌন্দর্য্য ও সৌষ্ঠব পূর্ণরূপে চিত্রিত ও বর্ণিত হইয়াছে।

(এরপর ৬৬৭ পৃষ্ঠায়)

উপজাতীয় জীবনে সাংস্কৃতিক সংযোগের প্রভাব

শ্রীসন্তোষ কুমার দে

আফ্রিকা, আমেরিকা, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড এবং ভারতবর্ষ প্রভৃতি প্রায় সকল দেশেই অসভ্য অর্ধসভ্য এবং বর্বর জাতি আছে। এইসব দেশে কোন কোন জায়গায় অসভ্য আদিবাসীরা একেবারে লোপ পেয়েছে আবার কোথাও বা তারা ক্ষয়িষ্ণু অবস্থায় কোনরকমে আপন অস্তিত্ব বজায় করে আছে। অথচ সভ্যতার আলোক এইসব দেশে আসবার আগে, এই অসভ্য আদিবাসীরাই ছিল সেই সব দেশের আদি অধিবাসী, সর্বত্র ছিল তাদের অবাধ গতি। দেশের তারাই ছিল অধিপতি, তাদের গড়া আইন-কানুনে তাদেরই গোষ্ঠীপতি তাদের শাসন করতেন; কিন্তু যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে যখন সর্বত্র এক অপেক্ষাকৃত সভ্য, জ্ঞানবিজ্ঞানে অগ্রসর ও উন্নততর অস্ত্রে বলীয়ান্ জাতির আবির্ভাব হলো তখন এইসব হতভাগ্যদের পরাজয়ের গ্লানি স্বীকার করে নিয়ে হয় দাস হিসেবে বাস করতে হল, নয়ত নিজেদের গ্রাম ও ঘর ছেড়ে পাহাড়ে পর্বতে বনে জঙ্গলে আত্মগোপন করে বাস করতে হল। পৃথিবীর সর্বত্র এই একই ইতিহাস।

অন্যদেশের কথা ছেড়ে দিয়ে এখন আমাদের ভারতবর্ষের কথাই ধরা যাক। সকলেই জানেন আর্যরা এদেশে আসবার বহুপূর্বে অনার্যেরা—যাদের আমরা আদিম অধিবাসী, অসভ্য, জংলী, পাহাড়ী বা বুনো বলি তারাই এদেশে বাস করত। কিন্তু এই অনার্যরাই যে আদি-অধিবাসী, অর্থাৎ ভারতেই উদ্ভূত বা ভূমিক (Autochthon) ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। ভাষাতাত্ত্বিক ও নৃতাত্ত্বিকেরা বলেন, এই আদি অধিবাসীরাও বহিরাগত। তাহলে এদের আগে এদেশে বাস করত কারা? তাহলে কি ধরে নিতে হবে ভারত ছিল জনমানবহীন, বা যারা ছিল তারা নিঃশেষে বিলীন হয়ে গিয়েছে? একথার উত্তর আমাদের পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয় এবং তা এখানে বিচার্যও নয়। কোল, ভীল, সাঁওতাল, ওঁরাও, মুণ্ডা, নাগা, কুকি, শবর, টিপরা, বিরাহার, লোনলা প্রভৃতি যে তিন কোটি নরনারী নেফা, নাগাভূমি প্রভৃতি ভারতের বিভিন্ন রাষ্ট্রের পাহাড়ে বনে জঙ্গলে বাস করছে তাদেরই কথা এখানে আলোচ্য। সভ্যতার সংস্পর্শে এসে তাদের কোন লাভ হয়েছে কি না, কিংবা এই বিজ্ঞানদীপ্ত সভ্যতা তাদের ধ্বংসের কারণ হবে কিনা বা এই উন্নততর সভ্যতার সংস্পর্শ মাটির কলসির সঙ্গে কাসার কলসির মিলনের মত তাদের পক্ষে মারাত্মক হবে কি না সেটাই হল বিবেচ্য।

যতদিন এইসব উপজাতি সভ্যতার সংস্পর্শে আসেনি, ততদিন তারা নিজেদের অভাব অভিযোগের প্রতিকার, নিজেদের উন্নতি ও বিকাশ, নিজেদের ভাল মন্দ নিজেদের ইচ্ছামত করতে পেরেছিল। তাদের এ উন্নতি ও বিকাশ অত্যন্ত ধীর ও বিলম্বিত, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই; তবু তারা নিজেদের ইচ্ছা ও আদর্শমত একটা সংস্কৃতি গড়ে তুলতে পেরেছিল তার বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। আদিবাসীদের সংস্কৃতি; একথা শুনে হয়ত অনেকে চমকে উঠবেন; কিন্তু সত্যিই তাদের একটি সংস্কৃতি ছিল, আফ্রিকা ও আমেরিকায় তার প্রচুর নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে। দক্ষিণ আমেরিকার মায়া ও আজটেক সভ্যতা ও সংস্কৃতি সত্যিই ছিল বিস্ময়কর। সাধারণ লোকের অজানা হলেও, নৃতত্ত্ববিদ্-

দের কাছে একথা অজানা নয়। এইসব আদিবাসী প্রাচীন কাল থেকেই সভ্য জাতির কাছে সাহায্য ও সহানুভূতি পায় নি—পেয়েছে শুধু ঘৃণা আর অবহেলা। অষ্ট্রেলিয়া, আমেরিকা, নিউজিল্যাণ্ড, প্রভৃতি দেশে এদের নিঃশেষ করবার সাধ্যমত চেষ্টা করা হয়েছিল। যেখানে তাদের সংখ্যাধিক্যের জন্যে শেষ করে দেওয়া সম্ভব হয়নি, সেখানে তাদের নির্মমভাবে শোষণ করে ক্রমহ্রস্বমান জাতিতে পরিণত করা হয়েছে। ভারতবর্ষেও এদের অবস্থার উন্নতি করবার চেষ্টা প্রাচীন কালে আর্য-জাতিরা কখনও করেন নি; বরং তাদের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলবারই চেষ্টা করেছেন। রামায়ণ, মহাভারত বা পুরাণে দুচারটি বন্ধুত্বের নিদর্শন বা অসবর্ণ বিবাহের উল্লেখ পাওয়া গেলেও, সেগুলোকে সাধারণ বা ব্যাপক বলা চলে না। রামচন্দ্র গুহক চণ্ডালের সঙ্গে মিতালি করেছিলেন, ভীমসেন হিড়িম্বাকে, অর্জুন উলুপী ও নাগকন্যা চিত্রাঙ্গদাকে, কৃষ্ণপুত্র প্রদ্যুম্ন অনার্যকন্যা প্রভাবতীকে, বিশ্রবা ঋষি অনার্যকন্যা নিকষাকে বিবাহ করেছিলেন, এক অনার্যকন্যার গর্ভে পরাশরের জন্ম হয়েছিল, সম্রাট অশোক বিদিশার ভীল কন্যার পাণি-গ্রহন করেছিলেন, এইরকম গুটিকতক বিচ্ছিন্ন ঘটনা থেকে কখনই এই সিদ্ধান্ত করা চলে না যে, এই অনগ্রসর আদিবাসীদের সঙ্গে আর্যজাতিরা তাঁদের নিজেদের সুখ দুঃখ ভাগ করে নেবার চেষ্টা করেছিলেন। বেদে এদের রাক্ষস, অসুর, দাস প্রভৃতি বলে বর্ণনা করা হয়েছে; পুরাণেও তাদের "কাক তাম্রমূর্দ্ধ্বা" বলে হেয় প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা হয়েছে। সংস্কৃত সাহিত্যে ব্যাধ, শবর, চণ্ডাল প্রভৃতি ২।৪টি উপজাতির নাম উল্লেখ আছে বটে, সে শুধু উচ্চবর্ণের পটভূমিতে তাদের আরও হীন প্রতিপন্ন করবার জন্যেই। কোথাও তাদের সুখ দুঃখ, হাসি কান্নাকে সহানুভূতির সঙ্গে বিচার করা হয়নি।

উপজাতিদের সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা, তাদের কৃষ্টিকে জানবার চেষ্টা, তাদের মধ্যে সভ্যতার আলোকপাত ও অর্থনৈতিক দাসত্ব থেকে তাদের মুক্ত করবার চেষ্টা ব্রিটিশ আমলেই কিছু কিছু হয়েছে এবং অতি আধুনিক সাহিত্যে দুচারজন দরদী সাহিত্যিক এদের সুখদুঃখকে সাহিত্যে রূপায়িত করে জনসাধারণের সহানুভূতির উদ্রেক করেছেন। খৃষ্টান মিশনারীরা ভারতে খৃষ্টধর্ম প্রচার করবার জন্যে ব্যাপকভাবে চেষ্টা করেছিলেন; কিন্তু যখন দেখলেন, যে-দেশে তাঁরা ধর্ম-প্রচার করতে যাচ্ছেন, সে দেশের ধর্ম, সংস্কৃতি, সভ্যতা ও সাহিত্য তাঁদের চেয়ে কোন অংশে কম নয় এবং ধর্মের আধার ভারতবর্ষে খৃষ্টধর্ম কোন নতুন দিগন্তের সন্ধান দিতে পারবে না, এককথায় যখন সভ্য ভারতীয়দের মধ্যে খৃষ্টধর্ম প্রচার ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো, তখন তাঁরা অসভ্য, জংলী, আদি অধিবাসীদের মধ্যে খৃষ্টধর্ম প্রচারে আত্মনিয়োগ করলেন এবং বুঝতে পারলেন ঐখানেই তাঁদের প্রকৃত কর্মক্ষেত্র। খৃষ্টধর্ম যদি ব্যাপকভাবে প্রচারলাভ করে তাহলে এখানেই তা সম্ভব। তাই এদের মধ্যে ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্য নিয়ে এদের সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপন করলেন। শহরের বিলাস, ঐশ্বর্য্য ছেড়ে বনে জঙ্গলে, পাহাড়ে পর্বতে উপজাতিদের সঙ্গে বসবাস করতে লাগলেন। তাদের জন্যে স্কুল পাঠশালা, দাতব্য চিকিৎসালয়, কো-অপারেটিভ সোসাইটি, অনাথ আশ্রম প্রসূতি সদন প্রভৃতি স্থাপন করলেন; তাদের সঙ্গে মেলামেশা করে তাদের সুখ দুঃখ, অভাব অভিযোগ জানবার চেষ্টা করলেন। তাদের ভাষা, রীতিনীতি, ধর্মাচরণ, লোকাচার প্রভৃতি জানবার চেষ্টা করলেন এবং সে সমন্ধে অনেক পুঁথিপত্রও লিখলেন ও অনেক অজানা তথ্যাদিও প্রকাশ করলেন। তারই ফলে ভারতবর্ষে নৃতত্ত্বের আলোচনার সূত্রপাত হল এবং এইসব অবজ্ঞাত জাতিদের সমন্ধে আমরা নিকটতম প্রতিবেশী হয়েও যা জানতাম না তা এইসব মিশনারীদের লেখা বই থেকে জানতে পারলাম। আমাদের অন্ধ চক্ষু অনেকটা খুলে গেল। আমরাও মিশনারীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে এইসব আদিবাসীদের সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করতে লেগে গেলাম। কিন্তু শিক্ষাদীক্ষায় ও নাগরিক যোগ্যতায় আজও তাদের ভারতীয় জনসাধারণের সমকক্ষ করে তুলতে পারি নি।

আজ প্রায় একশ' বছরের ওপর আদিবাসী বা উপজাতিরা হিন্দু ও অহিন্দু সভ্যতার সংস্পর্শে এসেছে। এই সংস্পর্শ তাদের পক্ষে কল্যাণকর হয়েছে কি না বা তাদের জাতীয় বিকাশ ও উন্নতির পক্ষে সহায়ক হয়েছে কি না সে বিষয়ে আজকাল নতুন করে তর্ক উঠেছে। প্রবল ও উন্নততর সভ্যতার সংস্পর্শে অনগ্রসর, শিক্ষা-দীক্ষায় হীন দুর্বল জাতি এলে, সভ্য জাতি যে তাদের গ্রাস করে ফেলবে, তাদের অস্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্য বিলুপ্ত হবে এরকম মনে করবার হয়ত কিছু কিছু কারণ আছে। জনকতক খ্যাতনামা নৃতাত্ত্বিক অন্তত এই রকম মনে করেন। রিভার্স নামে একজন বিখ্যাত নৃতাত্ত্বিক মেলানেশিয়ার আদি-অধিবাসীদের সম্বন্ধে অনেক গবেষণা করেছেন। গবেষণাকালে মেলানেশিয়ার আদিম অধিবাসীদের বংশাবনতি, শারীরিক দীর্ঘতার হ্রাস প্রভৃতি প্রথমেই তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শেষ পর্যন্ত তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌছান যে, এই সব অসভ্য জাতি উন্নততর সভ্যতার আক্রমণে প্রজনন শক্তি, মানসিক ও শারীরিক শক্তি অনেকটা হারিয়ে ফেলেছে। তাঁর এই মতবাদ কয়েকজন য়ুরোপীয় নৃতত্ত্ববিদ সত্য বলে মেনে নিয়েছেন এবং তাঁরা প্রচার করছেন যে, এইসব অনুন্নত জাতিদের অপমৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে হলে তাদের উন্নততর সভ্যতার আক্রমণ থেকে বাঁচাতে হবে। এ বিষয়ে সব চেয়ে বেশী প্রতিবাদ জানিয়েছেন Mr. Verrier Elwin। নৃতাত্ত্বিক হিসেবে তাঁর বেশ নাম আছে এবং এদেশের আদিবাসীদের মধ্যে বহুদিন বাস করে এবং এক আদিবাসী রমণীকে বিবাহ করে এদের রীতিনীতি ও সামাজিক আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞানলাভ করে অনেকগুলো প্রামাণ্য পুস্তকও ইনি লিখেছেন। প্রায় সব পুস্তকেই প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন যে, আদিবাসীদের অবনতির কারণ হল সভ্যতার সংস্পর্শ। বর্তমানে ইনি নেফা প্রশাসনের উপজাতীয় বিষয়ক উপদেষ্টা নিযুক্ত হয়েছেন। উপদেষ্টা হয়েই ভারতীয় সভ্যতা, বিশেষ করে হিন্দুসভ্যতার সংস্পর্শ থেকে উপজাতিদের বাঁচাবার জন্যে উঠে-পড়ে লেগেছেন। নেফা-দর্শন (এ ফিলসফি অব নেফা) নামে বইটিতে বলেছেন, হিন্দু-সভ্যতার সংস্পর্শে এলে নেফার উপজাতিদের জীবনের বালষ্ঠতা ও আদিম সৌন্দর্য্য একেবারে চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। কিন্তু নেফা উপত্যকায় তিনলক্ষ মোনপা, খওয়া, খার্মতি প্রভৃতি উপজাতিরা য়ুরোপীয় সংস্কৃতির সংস্পর্শে এলে, তাদের কোনরকম ক্ষতি হবে কি না সে বিষয়ে কিছুই বলেন নি। উপজাতির মেয়েরা শাড়ি পরতে চায় এটাও এলুইন সাহেব ভালবাসেন না। নেফার একটি গ্রামে একটা তাঁতকেন্দ্র খোলা হয়েছিল, তাতে উপজাতীয় মেয়েরা শাড়ি বুনতেও শিখেছিল। শোনা যায় এক বিদেশী সরকারী নৃতাত্ত্বিকের পরামর্শে এই শাড়ি-কেন্দ্রটি উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। এলুইন সাহেব "নেফা-দর্শনে" উপজাতীয় পরিচ্ছদের শিং-হাড়-পালক-লোম ও জীবজন্তুর দাঁতের ভারবহুল বৈচিত্র্য আর সেই সঙ্গে অধোলঙ্গতার মধ্যেও তেজোদীপ্ত জীবনের এক অপূর্ব সৌন্দর্য্য দেখে মোহিত হয়েছেন। বলেছেন ভারতীয় সাংস্কৃতিক প্রভাব নেফায় বিস্তৃত না হলে, উপজাতিদের সাংস্কৃতিক উন্নতি ওদের ভেতর থেকেই আপনা-আপনি গজিয়ে উঠবে। একথা কি কেউ মেনে নিতে পারবেন? ডাঃ বিরজাশঙ্কর গুহও একজন অভিজ্ঞ নৃতাত্ত্বিক। তাঁর মতে সাংস্কৃতিক সংস্পর্শ হল আদিবাসীদের উন্নতির হেতু। তাঁর নিজের কথা হল "Contact is progress"। কিন্তু দেশীয় নৃতাত্ত্বিকের কথায় কে আমল দেবে? বিদেশী নৃতাত্ত্বিক ও বিদেশী মিশনারীরা বরাবর ব্রিটিশ সরকারকে বিচ্ছিন্নতাবাদ জিইয়ে রাখতে পরামর্শ দিয়েছেন, স্বাধীন ভারতেও এর ব্যতিক্রম হয়েছে বলে জানা যায় না। তাই দেখা যায় 'নেফা-দর্শনে' এলুইন সাহেব মুণ্ড-শিকারের প্রথা বর্জন করতে বাধ্য করায় নাগাদের সাংস্কৃতিক ক্ষতি হয়েছে বলে মন্তব্য করতে সাহসী হয়েছেন। উপজাতিদের সংস্কৃতি ও সমাজকে বাঁচিয়ে রাখবার অজুহাতে, তাদের ভারতীয়তার সম্পর্ক হতে বিচ্ছিন্ন একটা জনসমাজ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত রাখবার

জন্যে একটা অভিনব উপায় উদ্ভাবন করেছেন—এটি হল তাঁর ন্যাশনাল পার্ক থিওরি। এ-বিষয়ে পরে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা যাচ্ছে। তাঁর 'দি এবরিজিন্যাল্‌স্‌' নামে এক পুস্তকে আদিবাসীদের এক স্বপ্নে গড়া মনোরম চিত্র এঁকেছেন। বলেছেন, যেসব আদিম অধিবাসী উন্নত সভ্যতার গ্রাসে পড়েনি, তাদের জীবন ছিল সুখ ও স্বাধীনতাপূর্ণ—স্নায়বিক হানি (loss of nerve) বা শক্তির অপচয় তাদের হয়নি। তাদের অল্পে সন্তুষ্ট, স্বাধীন ও অবাধ জীবন, আনন্দ ও অবসরের মধ্যে সামাজিক নৃত্যগীত ও উৎসবের ভেতর দিয়ে মন্দাক্রান্তা ছন্দে একটানা বহে যেত। আমরাও দেখেছি মহুয়ার বনে ফুল ফুটলে গন্ধে আমোদিত প্রাণ সাঁওতাল যুবক-যুবতী হাত ধরাধরি করে গাইত :—

ছেদারে ছেদারে ব' গাতে লাং তাঁ হে কান্‌
ছেদারে লেকা বড় লাদো বড়েম্‌ ক্রিয়া মকান
নে কায়রা ছাকমরে মায়া রেদ মে
নে নাবু গংকাম জনম্‌ জনম্‌।

আমাদের দুজনের বন্ধুত্ব অনেক দিনের। আমাদের ভেতর ভালবাসা অতি গভীর। এখন যদি কোন নতুন লোককে তুমি ভালবাস, তাহলে তাকে কলাপাতায় মুড়ে নদীর জলে ফেলে দিও।

এলুইন সাহেব বলছেন, যেদিন থেকে তারা প্রতিবাসীর উন্নততর সভ্যতার সংস্পর্শে এল, সেদিন থেকেই আরম্ভ হল তাদের সমস্ত আশা, আনন্দ-উৎসবের পরিসমাপ্তি ও জীবন-সংগ্রামে জয়ী হবার প্রবল প্রচেষ্টা। সহজ, সরল, অনাড়ম্বর জীবনের জায়গায় আজ দেখা দিয়েছে জটিলতা, কৃত্রিম অভাব ও তা মোচনের জন্যে প্রাণপণ প্রচেষ্টা। তাই এদের রক্ষা করবার জন্যে তিনি কতকগুলো প্রস্তাব করেছেন এবং এই প্রস্তাবগুলোর চরম পরিণতিই হল তাঁর "ন্যাশনাল পার্ক থিয়োরি'। এখন এই প্রস্তাবগুলো কতদূর সমীচীন তা বিচার করা যাক।

১) আদি বাসীদের 'ঝুম' চাষের অধিকার :—

অনেক উপজাতি আজও আছে যারা এখনও সভ্য সমাজে প্রচলিত লাঙলের সাহায্যে চাষ করবার প্রথা অবগত বা তাতে অভ্যস্ত নয়। তাই তারা প্রথমে জঙ্গলের খানিকটা অংশে আগুন লাগিয়ে দেয়, তারপর বড় বড় গাছ পুড়ে ছাই হয়ে গেলে জায়গাটা পরিষ্কার করে নিয়ে, লাঠির-ডগা দিয়ে ছোট ছোট গর্ত করে তাতে আলগাভাবে ধান ফেলে দেয়। পোড়া গাছের ছাই সারের কাজ করে। এই ভাবে তারা কিছু শস্য সংগ্রহ করে। মিঃ এলুইনের মতে আদিবাসীরা মা ধরণীর বুক লাঙল দিয়ে ক্ষত-বিক্ষত করে নিজেদের খাদ্য সংগ্রহ করতে চায় না। তাদের এ-বিশ্বাসের মূলে আঘাত করা উচিত নয়। এই ঝুম চাষ বন সংরক্ষণের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকারক। যদিই তাদের মধ্যে এরকম অন্ধ সংস্কার থাকে, তাহলে ঝুম চাষের সাহায্যে মাতা বসুন্ধরার বুকের আঘাত নিবারণ করা সম্ভব নয় সে কথাটা তাদের সহজেই বুঝিয়ে দেওয়া যায়। একটা গোটা শাল সেগুনের বন পুড়িয়ে না ফেলে লাঙলের সাহয্যে চাষ করলে অনেক বেশী শস্য পাওয়া যাবে, একথাটা তাদের বোঝানো মোটেই শক্ত নয়। বন, দেশ ও জাতির পক্ষে একটা মস্ত বড় সম্পদ তা প্রচারের মাধ্যমে তাদের সহজেই বোঝানো যায়। তাই দেখতে পাই কোল, ভীল, সাঁওতাল, শবর, ওঁরাও, চাকমা প্রভৃতি উপজাতিরা, যারা আগে ঝুম চাষে অভ্যস্ত ছিল, এখন লাঙল দিয়ে চাষ করতে অভ্যস্ত হয়েছে এবং তাতে কোন রকম অসন্তোষ প্রকাশ করেছে না। এরা লাঙল দিয়ে চাষের প্রথা জানত না বলেই ঝুম চাষ প্রথা অবলম্বন করেছিল। শিকারের পিছনে পিছনে সারা দিন অনিশ্চিত ভাবে ঘুরে ঘুরে খাদ্য সংগ্রহ করার চেয়ে অল্প আয়াসে ঝুম চাষে নিশ্চিত খাদ্য আহরণ করা যে অনেক ভাল, এই জ্ঞানের উন্মেষ হল বর্বর জাতিদের সভ্য জীবনে প্রবেশের পথে প্রথম পদক্ষেপ। কাজেই মিঃ এলুইন ঝুম চাষকে আদিবাসীদের জীবনচর্যার পদ্ধতি (Way of life) বলে যে প্রচার কাজ চালিয়েছেন, তা ঠিক নয়। ভূমিক্ষয়, বন্যা-নিবারণ এবং বৃষ্টিপাত বাড়ানোয় জন্যে বনসংরক্ষণ যে কত

প্রয়োজনীয়, তা আজকাল কারও অজানা নয়। কাজেই আইন করে ঝুমচাষ বন্ধ করলে, আদিবাসীদের জীবন-চর্যায় হস্তক্ষেপ করা হবে এবং তার ফলে তারা উন্নত-তর সভ্যতার গ্রাস থেকে নিজেদের বাঁচাতে না পেরে ধীরে ধীরে অবলুপ্ত হবে, এ ধারণার মূলে কোন সত্য নেই। সভ্যতার সংস্পর্শে এলে উপজাতিরা ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে এরকম কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। আসামের খাসিয়া সম্প্রদায় খুব ঘনিষ্ঠ ভাবে বর্তমান সভ্যতার সংস্পর্শে এসেছে। ওঁরাও ও সাঁওতাল, যারা খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেছে, তারাও প্রত্যক্ষভাবে সভ্যতার সংস্পর্শে এসেছে; কিন্তু এইসব শিক্ষিত আদিবাসীদের মধ্যে জন্ম সংখ্যার বা প্রজনন শক্তির হ্রাসের কোন লক্ষণই দেখা যায় না। যদিই বা জন্ম সংখ্যার হ্রাস কোথাও কোথাও দেখা যায়, সেটা মারাত্মক নয়। তেমন হ্রাস সভ্য সমাজেও দেখা যায় এবং তা শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে বংশবিস্তারের অনুপাতে কম নয়। সব দেশেই দেখা যায়, শিক্ষিত অপেক্ষা অশিক্ষিত, ধনী অপেক্ষা দরিদ্র লোকের মধ্যে জন্মহার বেশী। এটা ফল শিক্ষা ও অর্থ-নৈতিক অবস্থার ফল। এই সামান্য হ্রাসে জাতি ধ্বংস পায় না। ডাঃ ডি. এন. মজুমদার—A Tribe in Transition নামে এক বইতে বলেছেন যে, পূর্বপুরুষদের তুলনায় বর্তমানে হো সমাজে বংশবৃদ্ধির হার বেশী। সভ্যতার সংস্পর্শ যদি উপজাতিদের ধ্বংসের কারণ হয়, তা হলে বিদেশী মিশনারীরা উপজাতীয় জীবনে অনুপ্রবেশ করে এবং এক নতুন ধর্ম ও সংস্কৃতি প্রচার করে তাদের সামাজিক জীবনে হস্তক্ষেপ করছেন কেন? এ শুধু উপজাতীয়দের মনে ভারতীয়তার বোধ রোধ করবার জন্যেই, সে কথা কি বলে বোঝাতে হবে? তাই দেখা যাচ্ছে, বৈরী নাগাদের মনোভাব বিদেশী মিশনারীদের সমর্থন লাভ করছে। এ কপটতা আর কত দিন চলবে?

উপজাতীয় গোষ্ঠীর মধ্যে যে যে জায়গায় বংশবৃদ্ধির হার কম হয়েছে, বা যে যে উপজাতি ক্ষয়িষ্ণু হয়ে অবলুপ্তির পথে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে, তাদের এই ক্ষয়ের কারণ অনুসন্ধান করলে জানা যাবে যে, সভ্যতার সংঘর্ষ এই ক্ষয়ের কারণ নয়। তাদের সমাজে বিবাহের বহু নিষেধ ও কঠোরতা বর্তমান থাকায় ও একই ছোট গোষ্ঠীর মধ্যে রক্তের আদান প্রদান বহুকাল ধরে অব্যাহত থাকায়, তারা ক্রমশই ক্ষয়ের পথে এগিয়ে চলেছে। প্রসিদ্ধ নৃতাত্ত্বিক কীন সাহেব আফ্রিকার নিগ্রোজাতির আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন,—"ভিন্ন জাতির সাহায্য ছাড়া বিশুদ্ধ আফ্রিকান নিগ্রোর পক্ষে বর্তমান অবস্থার চেয়ে উন্নতি করা সম্ভব নয়; সত্যি কথা বলতে গেলে রক্তমিশ্রণ ছাড়া এ জাতির ভবিষ্যৎ কোন আশাই নেই। এই সত্য, বৃথা জাত্যাভিমান ও অন্ধ সংস্কার না থাকলে, অনেক আগেই সকলে মেনে নিতেন।" (A. K. Keane: Ethnology Homo Aethipicus দ্রষ্টব্য) জনস্টনের প্রতিবেদনেও দেখা যায় যে, তিনি এই মতকে সমর্থন করে আফ্রিকার নিগ্রোদের সঙ্গে ভারতীয়দের রক্তমিশ্রণের পক্ষপাতী। তিনি বলেছেন—"নিগ্রোজাতির যে রক্তমিশ্রণের প্রয়োজন, তা ভারতীয়দেরই সঙ্গে হওয়া উচিত। পূর্ব আফ্রিকা এবং ব্রিটিশ মধ্য আফ্রিকা এবং ব্রিটিশ মধ্য আফ্রিকার হওয়া উচিত হিন্দু আমেরিকা। (Eastern Africa and British Central Africa should become the America of the Hindu) এই দুই জাতের মধ্যে রক্ত মিশ্রণ হলে, ভারতীয়দের যে শারীরিক পুষ্টির অভাব আছে তা তারা পাবে এবং পরিবর্তে তারা নিগ্রো সন্তান-সন্ততিদের দেবে শ্রমশক্তি, উচ্চাশা ও সভ্য জীবন যাপনের আকাঙ্ক্ষা—যার নিগ্রোদের মধ্যে একান্তই অভাব।" (Johnston's Paper, P-31)

ডারউইনও এ-বিষয়ে যে মন্তব্য করেছেন তাও প্রণিধানযোগ্য। বলেছেন,

"The consequences of close inter-breeding carried on for too long a time are loss of size, constitutional vigour and fertility, sometimes

accompanied by a tendency to mal-formation." (Animals and Plants under Domestication by Darwin দ্রষ্টব্য।)

আরও দু-এক জন বিশেষজ্ঞের মতামত উদ্ধৃত করা যাচ্ছে:—"নিকট আত্মীয়ের সঙ্গে বিবাহ বিশেষ করে যদি তারা একই পরিবেশের মধ্যে প্রতিপালিত হয়, একই ধরণের হয়, তা হলে তাদের বংশগত দুর্বলতা বেড়েই চলবে। এই রকম বিবাহ যাজক সম্প্রদায়ের চেয়ে আরও তীব্র ভাবে আপত্তি করছি—যদিও আমাদের আপত্তি ধর্মের পরিপ্রেক্ষিতে নয়—শুধু সুপ্রজননের জন্যেই।" ("Glimpses of the Great" —Viereck.)

ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায় বহু প্রবন্ধে বলেছেন, উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুরা নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু ও মুসলমানের তুলনায় অতি দ্রুত লোপ পেতে বসেছে। এর অনেক কারণের মধ্যে প্রধান কারণ হল ছোট গোষ্ঠীর মধ্যে বহুকাল ধরে বিবাহ।

"Among the upper castes the paucity of females is increasing from decade to decade throughout Northern India and yet endogamy which perpetuated this trait is being maintained. Hindu orthodoxy now stultifies itself through a self-immolation of the race. Endogamy, hypergamy and internal differentiation and special grading of castes and groups might have been necessary amid a welter of diversity of folkes and cultures in the Upper Ganges region which lay on the high road of migration of peoples from the North-West. But at present these practices have become dysgenic. These now threaten a complete swamping of the upper class Hindus by the Chamars, Ahirs, Pasis, Lodhas, Santals, Nama Sudras and Rajbansis and by the Muslims." (Cal. Review, Vol. 55, No. 1, 1935.)

ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায় উচ্চবর্ণের হিন্দুদের সম্বন্ধে যা বলেছেন, তা সবই এই সব উপজাতিদের ক্ষেত্রে পরিপূর্ণভাবে প্রযোজ্য। এতগুলো মতামত নিয়ে আলোচনায় উদ্দেশ্য হল, মিঃ এলুইন যে বলেছেন, সভ্যতার সংস্পর্শে আসার জন্যেই উপজাতিদের প্রজনন শক্তি হ্রাস পাচ্ছে সেই মতবাদ খণ্ডন করবার জন্যেই। উপজাতিগুলো পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে গোষ্ঠী জীবন যাপন করছে এবং সেই গোষ্ঠীগুলোও হল ছোট ছোট। বিবাহে এদের নানারকম বিধিনেষেধ থাকায়, একই রক্ত বহুকাল ধরে একই গোষ্ঠীর মধ্যে প্রবাহিত হচ্ছে; ফলে তাদের প্রজনন শক্তি ও মানসিক শক্তি ও ক্রমশই হ্রাস পাচ্ছে। তাদের প্রয়োজন হল গোষ্ঠীর বাঁধ ভেঙ্গে ফেলা। নইলে বনে থেকে বন্যজীবন যাপন করলেও, আর কিছুকাল পরে তাদের বংশ লোপ পাবে। এই সমস্ত জীবন-বিজ্ঞান কারণ ছাড়াও, অর্থ-নৈতিক কারণেও সংখ্যা হ্রাস পাওয়া সম্ভব। আজ তাদের প্রয়োজন হল প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করে, একটা অনড় স্বাতন্ত্র্যে প্রতিষ্ঠিত না হয়ে, ভারতের সঙ্গে আত্মীয়তা ও ঐতিহাসিক সম্বন্ধ বোধ জাগিয়ে তোলা।

২) উপজাতীয়দের পানাসক্তি:—

উপজাতীয়দের মদ্যপান প্রথা দশেরা, ফাগ, সোরাই প্রভৃতি উৎসবের একটা বড় অঙ্গ বলে মনে হয়। আমাদের উৎসবের মতন এদের উৎসবগুলো পূর্বনির্দিষ্ট দিনক্ষণ হিসেবে হয় না। না হবার কারণ হল, এদের প্যাজ নেই এবং দিনক্ষণ গণনা করবার পদ্ধতিও জানা নেই। উৎসবগুলো অনেকটা ঋতু উৎসবের (seasonal festivals) মত। একবার আরম্ভ হলে অনেকদিন ধরে চলতে থাকে এবং সেইসময় তাদের পানোন্মত্ততা মাত্রাতিরিক্তভাবে চলতে থাকে। এই পানাভ্যাস তাদের কোথা থেকে এল? যদি সভ্যতার সংস্পর্শে এসে থাকে, তাহলে সভ্যতার সংস্পর্শ ক্ষতিকর হয়েছে বলতে হবে। আমাদের দেশে আদিবাসীদের মধ্যে যেরকম পানোন্মত্ততা দেখা যায়, আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের মধ্যে সেইরকম পানোন্মত্ততা আছে কি না? পৃথিবীর অন্যান্য অংশে শ্বেতকায়দের যাবার আগে বর্বর জাতিদের মধ্যে পানাভ্যাস ছিল কি না এবং থাকলেও কি—পরিমাণে ছিল, তা জানা দরকার।

শ্বেতকায়দের সংস্পর্শে এসে এ অভ্যাস হলেও হতে পারে যেমন উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বাঙ্গালী হিন্দুদের হয়েছিল। পশ্চিমের বিস্ময়কর সভ্যতা ও শক্তি দেখে সে যুগের অনেক বাঙালী যুবক মদ্যপান ও নিষিদ্ধ মাংসাহারকে সভ্যতা ও শক্তির উৎস বলে ভুল করেছিলেন। এক্ষেত্রেও এইরকম হয়েছে বলে মনে হয়। নইলে মদ্যপান তাদের উৎসবের অঙ্গ বলে মনে হয় না ; যদিও বর্তমানে অনেকটা এইরকম দাঁড়িয়েছে। তাদের এ কু-অভ্যাস প্রচার ও শিক্ষার মাধ্যমে দূর করা সম্ভব এবং তার আগে আবগারি নীতি আরও কঠোর করে তোলা উচিত।

৩) শিক্ষার প্রসারে অধিবাসীদের ক্ষতি :—

বর্তমানে যে রীতিতে আদিবাসীদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার হচ্ছে, মিঃ এলুইন তা পছন্দ করেন না। শুধু আদিবাসীদের শিক্ষাপদ্ধতি নয়, সভ্যতায় অগ্রসর হিন্দুদেরও শিক্ষাপদ্ধতি নির্দিষ্ট প্রথায় চলছে না। একথা স্বীকার করলেও তাতে শিক্ষার অপকারিতা প্রমাণ হয় না, শিক্ষাপদ্ধতিরই দোষ প্রমাণিত হয়। আদিবাসীদের শিক্ষার মধ্যে তাদের ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য গোষ্ঠীগত সংহতি ও ঐতিহ্য বজায় রাখতে হবে। তাদের ঐতিহ্য ও বৈশিষ্ট্যের বিনাশ কেও চায় না। আর হিন্দু তথা ভারতীয় সংস্কৃতির স্বভাব এই যে, তা কারও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য নষ্ট করে না। সে চায় অন্তরঙ্গ সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা। তাদের জাতীয় রাজরাজড়াদের ইতিহাস ও জীবনী, তাদের দেশের নদীগুলির উৎপত্তি, স্থানীয় ভূগোল, কৃষি, পশুপালন, মৃৎশিল্প, চর্মশিল্প, বস্ত্রবয়ন প্রভৃতি তাদের শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। তাদের গোষ্ঠীগত সংহতি যাতে নষ্ট না হয়, তাদের জাতীয় পর্বে তারা যেন ছুটি পায়, তাদের ছেলেদের যাতে অসভ্য বলে মনে না করা হয়, এসবের ব্যবস্থা করতে হবে। আমাদের দেশে স্কুল কলেজে শিক্ষা যেভাবে চলেছে, তাতে ছেলেমেয়েরা যে খানিকটা অকেজো হয়ে পড়ছে তাতে সন্দেহ নেই। শিক্ষাব্যবস্থা এদেশে আরও বাস্তবের পরিপ্রেক্ষিতে রচিত হয়নি ; তাই দেখা যায় স্কুল জীবন আর সমাজ জীবনের মধ্যে এত বেশী পার্থক্য। স্কুলজগৎ এক অবাস্তব স্বপ্ন জগৎ। এই জগতের বাইরে যখন ছেলেমেয়েরা আসে তখন দেখতে পায়, রূঢ় বাস্তবের আঘাতে তাদের স্বপ্নসৌধ ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে। স্কুলজীবন আর স্কুলের বাইরে সমাজ-জীবনের মধ্যে এই যে দ্বন্দ্ব তার সমাধান করা সম্ভব হয়নি বলে শিক্ষা ফলবতী হচ্ছে না। এ আমাদের দেশে সর্বসাধারণের পক্ষে যেমনভাবে সত্য, আদিবাসীদের পক্ষে ঠিক তেমনই ভাবে সত্য। মিঃ এলুইন এই মূল সত্যটি ধরতে পারেননি বলে এক ভুল সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। শিক্ষা ত্রুটিপূর্ণ হলেও তা মানুষের সমূহ ক্ষতি করতে পারে না। বর্তমান শিক্ষা যতই ত্রুটিপূর্ণ হোক না কেন তারই ফলে আদিবাসীদের গোঁড়ামি ও কুসংস্কার দূর হচ্ছে, তাদের উগ্র পশুস্বভাব শান্ত হয়ে আসছে এবং তারা নির্ঝঞ্ঝাট জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। এই শিক্ষার ফলে তাদের জাতীয় অবনতি বা স্নায়বিক হানি (loss of nerve) হচ্ছে একথা কিছুতেই স্বীকার করা যায় না। কিংবা যদি বলা হয়, (মিঃ এলুইন যা বলছেন) শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে তারা সভ্যতার সংস্পর্শে আরও নিবিড়ভাবে এসে পড়বে এবং তার ফলে তারা জাতীয় বিশেষত্ব হারিয়ে ফেলবে তাহলে সেটা হবে সত্যের অপলাপ। শিক্ষা মানুষকে আদিম জান্তবতা থেকে উদ্ধার করে মনুষ্যত্বের পদে উন্নীত করেছে। আদিবাসীদের পক্ষে এটার ব্যতিক্রম হবার কোন কারণ দেখা যায় না।

সভ্যতার সংস্পর্শে এসে উপজাতীয়রা ভারতীয়দের মত জামাকাপড় পরতে শিখেছে এবং যারা স্কুলে খৃষ্টান মিশনারীদের সংস্পর্শে এসেছে তারা হাফ-শার্ট হাফ প্যান্ট প্রভৃতি পরতে শিখেছে। নগ্ন বা অর্দ্ধ-নগ্ন জঙ্গল-জীবন আজ অতীতের ঘটনা। স্বাভাবিক জঙ্গল-জীবন মুছে গিয়ে কৃত্রিম সভ্যতা প্রবেশ করার জন্যেই কি এলুইন সাহেব দুঃখ প্রকাশ করেছেন? তিনি তাদের কৃষ্ণচর্মের

নগ্নতার (the eternally dressed nakedness of the brown skin) বা হাড়-চামড়া-পালকে শোভিত দেখতে ভালবাসেন। আদম-ইভের ছবিই তাঁর চোখে ভাল লাগে। জামাকাপড় পরে নগ্নতা ঢাকলে কখনই তা সংস্কৃতির পরিপন্থী হয় না। আজকের সভ্যজাতিরাও একদিন ছিল নগ্ন; কিন্তু তাদের নগ্নতা বা লজ্জাবোধ যে ছিল না তা নয়; বরং তার বিপরীতটাই প্রমাণ হয় তাদের গাছের ছাল বা পাতার আবরণে নগ্নতা দূর করবার চেষ্টায়। যে সব উপজাতি ছালের বা পাতার পোষাক সংগ্রহ করতে পারে না, তাদের মধ্যে সর্বাঙ্গে উল্কির চিত্রে লজ্জা নিবারণের চেষ্টা দেখা যায়। লজ্জা নিবারণের ব্যবস্থা করতে পারে না বলেই এখনও অনেক অসভ্য জাত নগ্ন হয়ে থাকে। আদিম যুগ পার হয়ে মানুষ যখন অল্পে অল্পে সভ্যতার আলো দেখতে পেল কার্পাসের চাষ ও বস্ত্রবয়ন বিদ্যা আয়ত্ত করল, তখন আর লতাপাতা বা উল্কি পরে নগ্নতা ঢাকতে হল না। সভ্য জাতিদের বস্ত্র পরিধানে যদি কোন ক্ষতি না হয়, তাহলে উপজাতিদেরই বা কাপড় পরলে ক্ষতি হবে কেন? নগ্নতা বা লজ্জাহীনতা সংস্কৃতির ভিত্তি নয়। বস্ত্রবয়ন জ্ঞানের অভাবে বা বস্ত্রক্রয়ের আর্থিক অক্ষমতার জন্যেই অনেক উপজাতি নগ্ন থাকে। স্বাস্থ্যরক্ষণ বা নিজেদের কৃষ্টি বা ধর্মীয় আচরণ পালনের জন্যে উপজাতীয়রা নগ্ন থাকে না; কাজেই বস্ত্র পরিধান করলে তাদের কৃষ্টি ক্ষুন্ন হবে এ ধারণা একেবারেই ভুল।

শীততাপ নিবারণের জন্যেও বস্ত্রের প্রয়োজন আছে এবং দেহের এই প্রয়োজন আছে বলেই তারা বস্ত্রের অভাবে আগুন জ্বালিয়ে শীত নিবারণ করে। অবশ্য একথা স্বীকার করতেই হবে যে, পরিচ্ছদ পরিধান করতে শেখার আগে তাদের শীততাপের সঙ্গে যুদ্ধ করবার যতটা ক্ষমতা ছিল, এখন নিশ্চয়ই ততটা ক্ষমতা নেই। এই স্বাভাবিক বাধাদান শক্তি (natural resistance) শুধু অধুনা আলোকপ্রাপ্ত জাতি নয় সমস্ত সভ্য জাতিই হারিয়ে ফেলেছে। এর জন্যে বৃথা শোক করে ত লাভ নেই।

৪) হিন্দী ভাষায় চর্চ্চা :—

হিন্দু সভ্যতার সংস্পর্শে এসে আদিবাসীদের হিন্দী-ভাষা (বাংলা ভাষা নয়) শিখতে হচ্ছে। মিঃ এলুইনের মতে এটা তাদের পক্ষে কল্যাণকর নয়। হিন্দীভাষা শিক্ষার ফলে তাদের নিজেদের যেসব সুন্দর সুন্দর কাব্য পুরাণ-উপকথা আছে সেগুলোর চর্চ্চা বাধা পাচ্ছে। তাদের নিজেদের সংস্কৃতির কথা তারা ভুলে যাচ্ছে। তাদের আদিপুরুষ লিংগোয় গাথাগুলো আবৃত্তি করতে বা "দাদারি" সঙ্গীত গাইতে তারা ভুলে যাচ্ছে। হয়ত একটু বাড়িয়ে বলা হচ্ছে। আমরা ইংরেজী শিখি বলে কি বাংলা ভাষা ভুলে যাচ্ছি, বা আমাদের কাব্য পুরাণকে অশ্রদ্ধা করছি? লিংগোর গাথা যদি আদি-বাসীরা আবৃত্তি না করে তাহলে বুঝতে হবে, হিন্দীর চর্চ্চা করে তারা বুঝতে পেরেছে লিংগোর মধ্যে এমন কিছু উচ্চ স্তরের সাহিত্যগুণ নেই যার জন্যে এর চর্চ্চা প্রয়োজন। হয়ত লিংগোর গাথা যুগোপযোগী নয় বা হিন্দীসাহিত্যে তারা এর চেয়ে উচ্চাঙ্গের সাহিত্য গুণসম্পন্ন কিছু সম্পদ পেয়েছে, যার ফলে লিংগোর গাথা তাদের আকর্ষণ করতে পারছে না। এত বলা সত্ত্বেও স্বীকার করতে বাধা নেই যে, এখানে আমরা এলুইন সাহেবের সঙ্গে খানিকটা একমত। আদিবাসীদের কাব্য পুরাণ-উপকথা-জনশ্রুতি বাদ দিয়ে তাদের শিক্ষাব্যবস্থা করা উচিত নয়। তাদের ঐতিহ্য ও সংস্কারের মধ্যে যা কিছু ভাল, তা সবই তাদের শিক্ষার অন্তর্গত করতে হবে। তাদের পূর্বপুরুষদের ইতিহাস ও নিজস্ব কৃষ্টি বাদ দিয়ে তাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা করলে তা হবে বিফল ও বন্ধ্যা। তবে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের অন্তত একটি ভাষা তাদের শিখতেই হবে, নইলে সর্বভারতীয় ভাবধারা হতে তারা হয়ে পড়বে বিচ্ছিন্ন। সেটা কাম্য নয়। আদি-বাসী সম্প্রদায় ছড়িয়ে আছে বিহার, পশ্চিমবঙ্গ ও ওড়িষায়; কাজেই আঞ্চলিক একটি ভাষা না শিখে উপায় নাই।

৫) আদিবাসীদের শিল্পকলা :—

মিঃ এলুইন গন্দ সমাজে বহুদিন বাস করায়, তাদের

সামাজিক ও অর্থনীতিক অবস্থা, শিল্প ও কলা সম্বন্ধে তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তবু তিনি যে মন্তব্য করেছেন, গন্দেরা উচ্চ সভ্যতার সংস্পর্শে বিশেষ করে হিন্দু সভ্যতার সংস্পর্শে এসে শিল্পকলাহীন হয়ে পড়েছে, তাদের অলঙ্কারিতার প্রতি আকর্ষণ ও সুন্দর শিল্প সৃষ্টির ক্ষমতা একেবারে নষ্ট হয়ে গিয়েছে, একথা একেবারেই মিথ্যা। হিন্দুদের শিল্প ও অলঙ্কার প্রিয়তা সর্বজনবিদিত। এক উচ্চতর শিল্প বা সংস্কৃতির সংস্পর্শে এলে, অপেক্ষাকৃত হীন শিল্প বা সংস্কৃতি একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যায় না, বরং সে শিল্প ও সংস্কৃতি আরও মার্জ্জিত ও উন্নতধরণের হবার সুযোগ ও সুবিধা পায়। হিন্দু শিল্প ও সংস্কৃতি অতি উচ্চস্তরের। আজও তার নিদর্শন অজন্তা, এলিফান্টা, কোনারক, ইলোরা, অঙ্কোরভট, বরবদুরে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। অন্যপক্ষে গন্দ বা আদিম আদিবাসীদের শিল্পকলা অতি স্থূল ও বিশেষত্ব বর্জ্জিত। এই প্রসঙ্গে অন্য প্রশ্নও মনে আসে। উচ্চ সভ্যতার সংস্পর্শে এসে যদি গন্দ শিল্পকলা নষ্ট হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে যে সমস্ত আদিম অধিবাসী কোন সভ্যতার সংস্পর্শে আসে নি, তারা কি শিল্পকলায় উন্নততর হয়ে উঠেছে? তা ত নয়। তবে হিন্দু শিল্পের সংস্পর্শে এসে তারা শিল্পকলায় হীন হয়ে পড়বে কেন?

হিন্দু সভ্যতা প্রভাবিত গন্দেরা তাদের সমাজে প্রচলিত প্রাচীন রীতির গহনা বর্জন করার আন্দোলন করেছিল। এই ঘটনাকে উপলক্ষ্য করে মিঃ এলুইন বলেন, হিন্দু প্রভাবেই গন্দদের শিল্প বোধ (decoration in artistic sense) অবনত হয়ে পড়েছে। গন্দরা অলঙ্কারের নামে স্থূল ও ভারী লোহা, কাঁসা, পিতল প্রভৃতি নিকৃষ্ট ধাতু, কাচ ও পাথরের দুর্বিসহ বোঝা সারা দেহে বহে বেড়াত, সর্বাঙ্গে উল্কি পরত। এখন তারা সভ্য হয়ে কারুশ্রী সম্পন্ন হাল্কা ও মূল্যবান্ ধাতুর গহনা পরবার আন্দোলন যদি করে থাকে, সেটা মোটেই দোষের বিষয় নয়—বরং মার্জিত রুচির পরিচয় বলে মেনে নেওয়া যায়।

আফ্রিকার নিগ্রোজাতির বেশ উন্নত ধরণের শিল্প ছিল। কিন্তু আজ সে শিল্প আর নেই, তার নিদর্শন এখন শুধু যাদুঘরেই মিলবে। এদের শিল্প ধ্বংস হয়ে যাবার কারণ, উন্নততর য়ুরোপীয় শিল্পের সঙ্গে সংঘাত নয়—সে হল তাদের স্বাধীনতা হারানর ফল। স্বাধীনতা হারাবার ফলেই তারা জাতীয়তাবোধ ও স্বধর্ম্ম বোধ হারিয়েছে—যা কিছু নিজস্ব তাকে নিম্ন ও হীন বলে শিক্ষা পেয়েছে এবং যা কিছু য়ুরোপীয় তাকেই শ্রেষ্ঠ বলে তাদের ধারণা হয়েছে, যেমন উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বাঙালী হিন্দুদের হয়েছিল। এই জন্যেই তাদের শিল্প বোধ নষ্ট হয়ে গিয়েছে। বিজেতা বিজিতের ওপর সর্ব্ব প্রকারে আপন প্রভুত্ব বিস্তার করে তাদের সব মূল্যবোধ নষ্ট করে দিয়েছে। যা আফ্রিকা বা অষ্ট্রেলিয়ায় ঘটেছে, দক্ষিণ আমেরিকায় তারই পুনরাভিনয় হয়েছিল। স্প্যানিয়ার্ডরা প্রাচীন মায়া জাতির শিল্প সংস্কৃতি, ভাষা সমস্তই নষ্ট করে দিয়ে নিজেদের সভ্যতা, ভাষা ও শিল্পকলা তাদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছিল। (History of the Conqeust of Mexico by Wm, Prescott and History of Peru by Wm. Prescott দ্রষ্টব্য) কিন্তু আমাদের দেশের আদিবাসীদের সম্বন্ধে একথা বলা চলে না। প্রতিবেশী হিন্দু সভ্যতা তাদের কাছে বিজেতার বেশে এক হাতে তরবারি অন্যহাতে শিল্পকলা নিয়ে উপস্থিত হয় নি; বন্ধু ও হিতাকাঙ্ক্ষী ভাবেই গিয়েছে; কাজেই cultural conquest যাকে বলে তা হওয়া সম্ভব হয়নি।

৬) আদিবাসীদের নৃত্য ও সঙ্গীত :—

কৃষ্টির আর একটি দিক নৃত্য ও সঙ্গীত সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে মিঃ এলুইন বলেন, ভারতীয় সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে ও শিক্ষালাভ করে সব চেয়ে বেশী ক্ষতি দেখা দিয়েছে আদিবাসীদের নৃত্য ও সঙ্গীতে—"Perhaps the most baneful result of education is its effect on singing and dancing." হিন্দু সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে আদিবাসীরা নিজেদের

গোষ্ঠীগত সঙ্গীত ও নৃত্য ভুলে গিয়েছে এবং তাদের এই বিস্মরণে হিন্দুসভ্যতা সাহায্য করেছে, এর চেয়ে অসত্য আর কি হতে পারে? হিন্দুজাতি নৃত্য ও সঙ্গীত পরায়ণ কাজেই তাদের অপর জাতির নৃত্য ও সঙ্গীতে বাধা সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। হিন্দুর ব্রতকাল-পালন সমস্তই নৃত্য ও সঙ্গীতের স্পর্শে প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। পরবে গুজরাটের গরবা নৃত্য ও দক্ষিণ ভারতে দেবদাসী নৃত্য সর্বজন বিদিত। ভজন, কীর্তন ও বাউল সঙ্গীত দিয়ে হয় ভগবানের আরাধনা। রামপ্রসাদী, শ্যামা সঙ্গীত, দেহতত্ত্ব, আগমনী প্রভৃতি বিভিন্ন সঙ্গীত হিন্দুর পূজা পার্বণকে সঞ্জীবিত করে রেখেছে। উনিশ শতকের প্রথম দিকে হিন্দু নৃত্য ও সঙ্গীত কলায় সাময়িক ভাবে ভাটা পড়তে দেখা যায়। সেই সময় সঙ্গীত কলা ভদ্রসমাজকে ত্যাগ করে সম্প্রদায় বিশেষকে আশ্রয় করেছিল; কিন্তু সে অবস্থা এখন আর নেই। বর্তমানে লোকনৃত্য, লোক সঙ্গীত পুনরুজ্জীবিত হয়েছে। ব্রতচারী প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান ঝুমুর, কাঠি ও চালী নৃত্য, সাঁওতালী ও রায়বেঁশে প্রভৃতি নৃত্যের উৎসাহ দিচ্ছে। তা ছাড়া সাঁওতালী নৃত্য ও সঙ্গীত রসের আনন্দ হিন্দুরা মনপ্রাণ দিয়ে অনুভব করছে। বিশ্বভারতীর কল্যাণে সঙ্গীত ও নৃত্যের আদর জনসাধারণের মধ্যে যথেষ্ট বেড়ে গিয়েছে। এ সত্ত্বেও যদি বলা হয়, হিন্দু সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে আদিবাসীদের নৃত্য ও সঙ্গীতের অধঃ-পতন হয়েছে, তাহলে তাকে নির্জলা মিথ্যা ছাড়া আর কি বলা যাবে?

৭) আদিবাসী-সংস্কৃতির পরিপ্রেক্ষিতে ফৌজদারি আইন সংশোধন :—

শ্রী এলুইনের নেফা-দর্শন। (এ ফিলসফি ফর নেফা) নেফার উপজাতীদের সম্পর্কে প্রশাসনের নীতি নির্ণয় করে দিয়েছে। তিনি বলেছেন, প্রতিবেশীর উন্নত সভ্যতার আক্রমণ হতে আদিবাসীদের বাঁচাবার জন্যে তাদের দেওয়ানি ও ফৌজদারি আইন সংস্কার করা উচিত নয়; অর্থাৎ যে বস্তু নিয়ম কানুন দিয়ে তাদের জীবন পরিচালিত হচ্ছে তার সংস্কার করা উচিত নয়; করলে তাদের জীবনে বিপর্যয় এসে উপস্থিত হবে; কারণ তারা যে সরল, অনাড়ম্বর জীবন যাপন করছে, তার মধ্যে সভ্যতা সম্মত আইন ও নিয়মের শৃঙ্খলা আনার প্রয়োজন নেই। এটা আদৌ যুক্তিসঙ্গত নয়। আদিবাসীরা যখন বনে বন্যজীবন যাপন করত তখন বনের-আইন চলতে পারত। বর্তমানে তারা সে-জীবন পিছনে ফেলে এসে ধীরে ধীরে সভ্যজীবনের ছায়াতলে এসে আশ্রয় গ্রহণ করছে। কাজেই এখন তাদের সভ্যজগতের নিয়ম কানুন মেনে চলা ছাড়া উপায় নেই। দেওয়ানী আইন, যেমন ভূমিসংক্রান্ত বা সম্পত্তি ঘটিত আইন বা উত্তরাধিকার সংক্রান্ত আইন সব সমাজেই সামাজিক ঐতিহ্য ও লোকাচারের ওপর লক্ষ্য রেখেই রচিত হয়েছে; কিন্তু অপরাধ সম্বন্ধীয় আইন সর্বত্র মোটামুটি একই নিয়মে প্রতিষ্ঠিত। ধর্ম ও লোকাচারের অজুহাতে কোন সমাজই অপরাধকে প্রশ্রয় দিতে পারে না। নরবলি, ডাইনী পোড়ানো, মুণ্ডশিকার, জবরদস্তি বিবাহ (marriage by capture), চুরি, ডাকাতি, নরহত্যা যা কোন কোন উপজাতীয় সমাজে আছে, তার সংস্কার সাধন নিশ্চয়ই দরকার। য়ুরোপেও একদিন ডাইনী পোড়ানোর ব্যবস্থা ছিল—জোয়ান-অব-আর্ককে এই নিষ্ঠুর প্রথার বলি হতে হয়েছিল; কিন্তু আজ সেসব জ্ঞানের আলোকে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে। কাজেই আদি-বাসীদের মধ্যে আজও যেসব কুসংস্কার আছে, শিক্ষা ও প্রচারের প্রভাবে সেগুলো ধীরে ধীরে দূর হয়ে যাবে, নিজেদের ভুল তারা বুঝতে পারবে। আইনের সংস্কারে তাদের জীবনের ধারার গতি রুদ্ধ হয়ে যাবে বলে শ্রীএলুইন যে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন, তা একেবারেই অসঙ্গত।

৮) দাও ফিরে সে অরণ্য :—

রেল, পুল, পাকারাস্তা, আধুনিক যানবাহন—এসমস্তই সভ্যতার দান। এগুলির সংস্পর্শে এলে আদিবাসীদের জাতীয় সংহতি নষ্ট হয়ে গিয়ে তাদের সমাজে ভাঙনের পথ প্রশস্ত হয়ে পড়বে বলে শ্রী এলুইন মন্তব্য করেছেন।

"The soul of the people ar soiled and grimy with the dust of passing mot r buses," এ কথার মধ্যে কোন সত্যই নেই। "কোথা সে খোলা মাঠ উদার পথঘাট, পাখির গান কই, বনের ছায়া," বলে খানিকটা দার্শনিকতা ছাড়া আর কোন লাভ হয় না। রেল, মোটর উড়োজাহাজ মানুষের জীবনে সুখ-শান্তি এনেছে কি না সে-প্রশ্ন এখন নতুন করে তুলে লাভ নেই। তবে একথা সত্যি যে এগুলোকে অস্বীকার করে আজ আর কেও আগের যুগে ফিরে যেতে চাইবে না এবং তা সম্ভবও নয়! এলুইন সাহেব আরও বলেছেন, আসাম সীমান্ত হতে মণিপুর পর্যন্ত যে নতুন কাট রোড তৈরি হয়েছে তার ফলে বেশ্যাবৃত্তি, অপরাধপ্রবণতা প্রভৃতি আদিবাসী সমাজে বেশ খানিকটা বেড়ে গিয়েছে। রেল, রাস্তা, পুল, মোটর, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন প্রভৃতির প্রচলনে অনুন্নত সমাজের অসভ্য, সরল বন্যজীবনের সঙ্গে সভ্য, সংস্কৃত জীবনের সংযোগ স্থাপন হবেই। তার ফলে এক সমাজের দোষ-এটি যেমন অন্যসমাজে সংক্রামিত হবে, উদ্যম, কর্মতৎপরতা, অধ্যবসায় প্রভৃতি গুণগুলোও তেমনি সংক্রামিত হবে। এ কথা সত্যি, সভ্য সমাজে অনেক ব্যাধি, ব্যভিচার, কলুষ আছে যা থেকে অসভ্য জংলী জীবন মুক্ত। সভ্যসমাজে অনেক গ্লানি ও অপরাধ চলেছে। বেশ্যাবৃত্তি সেখানে আইন-অনুমোদিত অসভ্য সমাজে এর চলন নেই, ব্যভিচার, যৌন-অপরাধ সেখানে ঘটলে তা শক্তহাতে দমন করা হয়। জংলী সমাজে আইন কানুন অত্যন্ত কঠোর, লোকসংখ্যাও সেখানে সীমিত। ফলে সে-সমাজে যে সব অপরাধ কঠোর আইনের সাহায্যে নিবারণ করা সম্ভব, বৃহৎ সভ্য সমাজে তা অনেক সময় সম্ভব হয় না। তাই সভ্য সমাজের কিছু কিছু পাপ অনুন্নত সমাজে গিয়ে পড়তে পারে। পাপ-পুণ্য, আলোছায়া নিয়েই ত জীবন ও সমাজ। শুধু আলো বা শুধুই ছায়া ত হয় না। এই প্রসঙ্গে শ্রীপ্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের একটা মন্তব্য মনে পড়ে,—"এক সভ্যতা কি অসভ্যতা এ দুয়ের কোনটিরই ভিতর মানুষের শান্তি নেই—না দেহের না মনের। যারা নিজেদের অসভ্য বলে জানে, তারা সভ্য হবার জন্য লালায়িত হয়; আর যারা নিজেদের সভ্য বলে জানে তারা স্বাভাবিক হবার জন্য লালায়িত হয়।"

সরল আদিবাসী জীবনে কিছু কিছু পাপ সংক্রমিত হতে পারে শুধু এই কারণেই রেল-স্টীমার, পথ ঘাট বর্জন করা চলে না। অপকার অপেক্ষা এগুলো উপকারই বেশী করেছে। আদিবাসী অঞ্চলে আজ যদি দুর্ভিক্ষ, মহামারী বা বন্যা হঠাৎ দেখা দেয়, পথ ঘাট থাকলে আধুনিক যানবাহনের সাহায্যে সে অঞ্চলে দুর্গতদেশের দুঃখ দূর করা সম্ভব হবে। পাপ সংক্রমণের ভয়ে এগুলোকে বর্জন করা কি যুক্তিযুক্ত হবে? রেল, স্টীমার, উড়ো জাহাজে চড়লে মাঝে মাঝে বিপদ হয়; সেই ভয়ে কি এগুলোকে এড়িয়ে চলতে হবে?

৯) গোষ্ঠীপ্রথা পরিপ্রেক্ষিতে আইন প্রণয়ন:—

এলুইন সাহেব বলেন, আদিবাসীদের বিচার পদ্ধতি উত্তরাধিকার, দেনা-পাওনা, বিবাহ প্রভৃতি সমস্ত বিষয় ভারতীয় সংস্কার ও ধারণা হতে সম্পূর্ণ পৃথক; কাজেই তাদের সমস্ত প্রথা ও লোকাচারগুলো সংগ্রহ করে, তার পরিপ্রেক্ষিতে তাদের জন্যে আলাদা আইন রচনা করা উচিত। অর্থাৎ তিনি বলতে চান, আদিবাসীদের আধুনিক সভ্যতার আলোক থেকে দূরে রেখে তাদের গোষ্ঠীগত প্রথা ও সংস্কারকে (ভালমন্দ নির্বিশেষে) কোন রকম রদবদল না করেই সেগুলোকে বিধিবদ্ধ আইনে পরিণত করতে হবে এবং সেই অনুসারে তাদের শাসন করতে হবে। এই জন্যে তিনি 'জাতীয় উদ্যান' (ন্যাশনাল পার্ক) নামে একটা পরিকল্পনা স্থির করেছেন। এই পরিকল্পনা অনুসারে অরণ্য ও পাহাড় সমেত একটা বিস্তীর্ণ ভূভাগ আদিবাসীদের বসবাসের জন্যে ছেড়ে দিতে হবে। সেখানে তারা তাদের উপজাতীয় নিয়মে নিজেদের সনাতন জীবন যাত্রা নির্বাহ করবে। সেখানে থাকবে না স্কুল পাঠশালা, গ্রন্থাগার, আধুনিক পথঘাট, পোষ্ট আফিস, টেলিগ্রাফ প্রভৃতি। সেখানে আবগারি আইন, জঙ্গল আইন,

ভূমি আইন কিছুই থাকবে না। নিজেদের গোষ্ঠীপতি শাসন করবেন তাদের। এক কথায় যেটুকু সভ্যতার আলো তারা পেয়েছিল, এক ফুঁ-এ তা নিভিয়ে দিয়ে তাদের আদিম বন্য জীবনে ফিরিয়ে দিতে হবে।

শোনা যায় আমেরিকান কর্তৃপক্ষ কিছু সংখ্যক লুপ্ত-প্রায় রেড ইণ্ডিয়ানদের নিয়ে একটি ষ্টেটের প্রায় অগম্য এক প্রত্যন্ত প্রদেশে একটি কলোনি স্থাপন করেছেন সেখানে তারা নিজেদের ইচ্ছামত চলে ফেরে, নিজেদের আইন মত চলে। রাষ্ট্রের কোন আইন কানুন তাদের ওপর প্রযোজ্য নয়। সেখানে এক গোষ্ঠীপতির অধীনে ঠিক আগের মত আদিম বন্য জীবন যাপন করে। বিদেশী পর্যটকরা কেও যদি অভিযোগ করে, সভ্য আমেরিকানরা আদিবাসী রেড-ইণ্ডিয়ানদের নির্মূল করে দিয়েছেন, তা হলে গাইডরা তাঁদের নিয়ে গিয়ে এই কলোনিটি দেখিয়ে আনেন আর বলেন, তাঁদের সরকার এই অসভ্যদের জন্যে যা কিছু দরকার সবই করেছেন, তাদের জীবনচর্যা ব্যাপারে কোন হস্তক্ষেপই করেন নি; এরা শুধু জ্ঞানবিজ্ঞানের সংস্পর্শ থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন রেখে আপন দোষেই প্রকৃতির নিয়মে আজ ক্ষয়িষ্ণু—আমেরিকান সরকার এদের নির্মূল করেন নি। হয়ত এলুইন সাহেব আমেরিকান সরকারের রেড-ইণ্ডিয়ানদের ব্যবস্থাপনা থেকেই এই অনুপ্রেরণা পেয়েছেন এবং সেই অনুসারে এখানেও কাজ করতে চান।

এলুইন সাহেব বলতে চান তাঁর কল্পনা অনুযায়ী ন্যাশন্যাল পার্কে আদিম জঙ্গল-জীবন যাপন করলে তাদের সমস্ত জাতীয় বৈশিষ্ট্য ও সংস্কৃতি বজায় থাকবে আধুনিক কৃত্রিম সভ্যতার ভারে পিষ্ট না হয়ে সরল, সহজ ও সতেজ জীবন যাপন করতে পারবে। তারপর যখন সভ্য জগৎ এদের জাতীয় সংস্কৃতি ও বৈশিষ্ট্যের ক্ষতি না করে উন্নতির জন্যে ঠিক বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিটি আবিষ্কার করতে পারবে, তখন তাদের অন্ধকার থেকে আলোয় আনবার চেষ্টা করতে হবে। তাঁর নিজস্ব ভাষা হল,—

"Innocence and happiness for a while till civilization is more worthy to instruct them and until a scientific age has learnt how to bring development and change without causing despair." এটি একটি অর্ধ সত্য।

এখন দেখা যাক এই রকম অবস্থায় সোভিয়েট রাশিয়া উপজাতীয়দের উন্নতি বিধানের জন্যে কি করেছেন। বিরাট সোভিয়েট রাষ্ট্রে এ দেশেরই মত বাসাকর, বুরিয়াট, তাতার, মোদানিয়া, মর্দাভিনিয়ান, ওসেটিন, য়াকুট প্রভৃতি অনেক অনগ্রসর জাতি এবং আদিগ, হানট, ঈভেনক, কারিয়াক, চুকচি, নেনটি, কোনিপার্মিয়াদ প্রভৃতি অনেক উপজাতি আছে। সে দেশের সরকার সভ্যতার সংস্পর্শের ভয় থেকে এইসব অগ্রসর উপজাতিদের বাঁচাবার জন্যে তাদের আলাদা করে না রেখে, তাদের শিক্ষা ও শাসন সংস্কার করেছেন—তাদের নিজ নিজ ভাষায় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ও যথাসম্ভব তাদের সামাজিক ভাল প্রথাগুলো বজায় রেখে। তাদের সংস্কৃতি ও বৈশিষ্ট্য নষ্ট হয়ে যাবার ভয়ে তাদের আলাদা করে রেখে, কৃত্রিম উপায়ে শাসনের ব্যবস্থা করেন নি। সোভিয়েট রাষ্ট্রের সভ্য ও উন্নত জাতিগুলির সঙ্গে অবাধে মিলেমিশে একই রকম শিক্ষা ও শাসনের ফলে যাতে তারা রাষ্ট্রের সংখ্যাগরিষ্ঠদের সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে সামনের দিকে এগিয়ে যায়, সকলের সঙ্গে সমান সুখদুঃখের ভাগী হয়। তাদের মধ্যে সমাজ চেতনা ও দেশাত্মবোধ জেগে ওঠে তার ব্যবস্থা করেছেন (Education in the USSR By F. Korolov দ্রষ্টব্য।)

শুধু আমাদের দেশেই বা আদিবাসীদের নিয়ে ন্যাশনাল পার্ক নামে আজব চিড়িয়াখানা কেন করা হবে? এর উত্তর কি মিঃ এলুইন দেবেন? জীবজন্তু নিয়ে শ্যাংচুয়ারী (অভয়ারণ্য) হয়, মানুষ নিয়ে নয়—এ কথা কি মিঃ এলুইন জানেন না? আজ আদিবাসীরা শিক্ষাদীক্ষায় প্রতিবেশী রাষ্ট্রের পিছনে আছে। তাদের আলাদা করে পিছনে না রেখে সমগ্রভাবে দেশের অন্যান্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে জোড় কদমে এগিয়ে যাওয়াটা কি মন্দ? ভারতীয় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতি সম্ভব নয়—যেমন সম্ভব হয় নি সোভিয়েট রাশিয়ায়। কোন বন্য আদিম জাতি উন্নত সংস্কৃতির সাক্ষাৎ সংস্পর্শে না এলে উন্নত হতে পারে না। এ সত্য অস্বীকার করে কোন লাভ নেই—দিনের আলোর মতই এটা সুস্পষ্ট।

উপজাতীয়দের মধ্যে যারা শিক্ষার আলোয় হৃদয়ের অন্ধকার দূর করতে পেরেছেন, সভ্যতার সংস্পর্শে এসেছেন, তাঁরা নিজ নিজ সমাজ ও দেশ ছেড়ে নাগরিক জীবন যাপন করছেন। তাঁদের আচার ব্যবহার, রীতি নীতি ভারতীয়দের মতই হয়ে গিয়েছে। ভাল লোক মন্দ লোক এ রকম না হয়েই পারে না। তাই দেখা যায় সিংভূম জেলায় একটা মিশ্র সংস্কৃতির উদ্ভব হয়েছে। সেখানে মনসা, টুসু, শিবরাত্রি, রথ, দোল, সরস্বতী, দেওয়ালী প্রভৃতি পূজা ধীরে ধীরে আদিবাসী জীবনে প্রবেশ করেছে। আবার আদিবাসীদের বাহপরব (আম বাকুনা), কোরাপরব (ধান্য রোপণ), গোমা পরব (রাখী-পূর্ণিমা), যমুনা মা পয়ব (নবান্ন), সোরাই পরব (দেওয়ালী) প্রভৃতি যে সব পর্ব হয়ে থাকে তার সঙ্গে হিন্দু পরবের বেশ মিল আছে। সিংভূমের অরণ্যে আদিবাসীদের দেব দেউলে যে সব জাগ্রত দেবদেবী আছেন, তাঁদের হিন্দু দেবদেবী থেকে পৃথক করা কঠিন। যেমন ধরুন—কেরা-মা, ঝশার মা, মোরগা-মহাদেব, জঙ্গলী-মহাদেব। আদিবাসীরা হিন্দুদেরই মত এঁদের পূজা দেন, মানসিক করেন সকল লোকের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করেন। পশ্চিম বাংলা ও ওড়িশার সঙ্গে সিংভূম জেলা লাগোয়া অঞ্চল; কাজেই একের লোকাচার ও ও সংস্কৃতি অপরের ওপর প্রভাব বিস্তার করবেই।

এইসব দেখেই মনে হয় এলুইন সাহেব গেল, গেল রব তুলেছেন। বলছেন, আদিবাসীরা হিন্দু সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে আপন বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলছে তারা হিন্দু হয়ে যাচ্ছে। এর ফলে আদিবাসীসমাজ লোপ পাবে, তাদের আদিম সৌন্দর্য একেবারে দূষিত হয়ে পড়বে। য়ুরোপীয় মিশনারীদের অনুকরণে জীবন নিবাহ করলে কি হবে, তা অবশ্য বলেননি। ভারতীয়দের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা না করলে উপজাতীয় জীবনের কোন সম্পর্ক নেই, এই যে শিক্ষা মিশনারীরা এতদিন দিয়ে এসেছেন সে তত্ত্ব ভ্রান্ত। একটি সংস্কৃত ও সুসভ্য সমাজ বা জাতির পাশে থেকে বন্য বা অর্ধসভ্য সমাজের অস্তিত্ব রক্ষা করা সম্ভব কি না এবং সম্ভব হলেও তা বাঞ্ছনীয় কি না তাও বিবেচ্য। কাজেই ভারতীয় কৃষ্টির ও জাতীয়তার বৃহত্তর ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকলে, আদিবাসীদের যথার্থ উন্নতি হওয়া সম্ভব নয়। আদিবাসীরা তাদের সাংস্কৃতিক জীবনের কোন বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য বিসর্জন না দিয়েও ভারতীয় জাতীয়তার সঙ্গে মিলতে পারে। একথা মিশনারীদের বোঝা উচিত। আদিবাসী সমাজের মধ্যে সরলতা, সত্যবাদিতা সংযম, অভাববোধহীনতা অল্পে তুষ্টিভাব প্রভৃতি অনেক গুণ আছে। চুরি, প্রবঞ্চনা, মিথ্যাবাদিতা, ব্যভিচার প্রভৃতি সভ্যসমাজের পাপগুলো তাদের মধ্যে নেই; কিন্তু কুসংস্কার কুপ্রথা অনেক আছে। উন্নত সমাজের সংস্পর্শে এলে এইসব কুসংস্কার ও কুপ্রথা দূর হবে। এতে তাদের সমষ্টিগত-ভাবে লাভ ছাড়া ক্ষতি হবে না। মনুষ্যজাতি একদিন অসভ্য ও বর্বর ছিল। আজ সে সভ্যতার আলো পেয়ে অবস্থার পরিবর্তন করতে পেরেছে। আজ তাকে ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্যে ফলমূল প্রভৃতি খাদ্য সংগ্রহ ও অনিশ্চিত শিকারের পিছনে দৌড়ে দৌড়ে জীবিকা নির্বাহ করতে হয় না; শীত নিবারণের জন্যে শুধুই আগুনের উপর নির্ভর করতে হয় না, লজ্জা নিবারণের জন্যে গাছের ছাল আর পাতার দরকার হয় না। আজ গুহায় বাস না করে সে অট্টালিকাবাসী হয়ে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত সমস্ত সুখ সুবিধা উপভোগ করছে। এতে সমগ্র মানবজাতি লাভবান্ হয়েছে। কাজেই আদিবাসীরা যদি উন্নত সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসে তাতে তাদের সামগ্রিক ক্ষতি হবে না। ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতার সংস্পর্শে এসে নিজেদের সমাজের দোষত্রুটিগুলো সংশোধন করতে পারবে, নিজেদের প্রথার কোনটি বর্জন ও কোনটির কোনটির শোধন

দরকার তাও জানতে পারবে; ফলে তাদের সমাজ কুসংস্কার মুক্ত হয়ে সংস্কৃত ও উন্নত হবে। এ ছাড়াও আরও একটি কথা মনে রাখা দরকার। হিন্দু সংস্কৃতি বা সভ্যতা তাদের কাছে বিজেতার বেশে যায় নি যে সে তাদের সংস্কৃতিকে ধ্বংস করে নিজেদের সংস্কৃতিকে তাদের উপর চাপিয়ে দেবে—যেমন স্প্যানিস ও পর্তুগিজরা করেছিল দক্ষিণ আমেরিকায়।

এককোটী বাট লক্ষ সাঁওতাল ভাষাভাষীদের সাহিত্য, সংস্কৃতি, ইতিহাস (অলিখিত), পৌরাণিক কাহিনী—যা হচ্ছে পুরাতন সমাজের ধর্মীয় মনন চিন্তার প্রতিচ্ছবি, নিছক ব্যাঞ্জনার খেলা নয়—এসবেরই যে ভাবেই হোক পুনরুজ্জীবন প্রয়োজন। এইসব সরল, নিরক্ষর প্রকৃতি-সন্তানদের জীবনের সমস্যার সমাধান করতে হলে যথাসম্ভব তাদের জীবনচর্যার বৈশিষ্ট্যের অনুকূলে তাদের সংস্কৃতি-সম্মতভাবে শিক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তারপর তারা সমাজের সংস্কার, রীতি-নীতির পরিবর্তন নিজেদের প্রয়োজন অনুসারেই করতে পারবে। সভ্যতার সংস্পর্শে এলে, তাদের পক্ষে আদিম জঙ্গল জীবন যাপন করা সম্ভব হবে না সাত্য আর তার স্বার্থকতাই বা কোথায়? তারা তখন বন্য সমাজের পরিবর্তে নিজেদের একটা স্বতন্ত্র সুসংস্কৃত সমাজ গড়ে তুলতে পারবে। সে সমাজ শিক্ষায় দীক্ষায় ভারতীয় সমাজের মত হয়ে উঠবে; কিন্তু তবু ঠিক ভারতীয় হবে না। তাদের মধ্যে আপন জাতীয় বৈশিষ্ট্যগুলো সংস্কৃত ও মার্জিত আকারে দেখা দেবে। তারপর কালক্রমে এই সমাজই ভারতীয় সমাজের সঙ্গে মিশে গিয়ে এক বৃহৎ ভারতীয় জাতিতে পরিণত হবে। এটাই হবে আদিবাসীদের লাভ আর সেইসঙ্গে ভারতীয়দেরও লাভ। এইসব বিবেচনা করে কিছুতেই বলা চলে না, হিন্দু সভ্যতার সংস্পর্শে আদিবাসীদের ক্ষতি হবে।

এইবার আমাদের দোষত্রুটির কথাও বলা দরকার। এতদিন আমরা আদিবাসীদের সম্বন্ধে কোন খোঁজখবর নেই নি, অসভ্য, জংলী বলে তাদের দূরে রেখে এসেছি। ভারতবাসীদের যে তারা ভাই, ভারতেরই যে তারা এক অঙ্গ, সেকথা ভাবিনি। খৃষ্টান মিশনারীরাই—যদিও ধর্মপ্রচার ছিল তাদের প্রধান উদ্দেশ্য—সর্বপ্রথম এদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন. তাদের শিক্ষাদীক্ষার ব্যবস্থা করেন, তাদের জন্যে স্কুল, পাঠশালা, হাসপাতাল প্রভৃতি করেন। তাদের ভাষায় কোন বর্ণমালা না থাকায়, রোমানলিপি প্রবর্তন করেন। ফলে তাঁরা সেখানে বেশ খানিকটা প্রভুত্ব বিস্তার করতে সক্ষম হন। তারই ফলে আজ শুনতে পাই হিন্দু সন্ন্যাসী, বৈষ্ণব গোঁসাই-এমন কি হিন্দু কীর্ত্তনীয়ারাও নেফা অঞ্চলে প্রবেশ করতে পারেন না। হিন্দু দেবদেবীর কোন ছবি তাদের ঘরে রাখা নিষিদ্ধ হয়েছে।

স্বাধীনতার পর হাওয়া খানিকটা বদলেছে। ভারত সেবাশ্রম সংঘের সন্ন্যাসীরা নেফাতে সমাজসেবা ও শিক্ষা প্রসারের কাজ আরম্ভ করেছেন। তাঁদের শিক্ষার ব্যবস্থায় ভারতীয় ভাষা, সঙ্গীত, উৎসব, ধর্ম ও সাহিত্যের সঙ্গে আদিবাসীদের যাতে যথেষ্ট পরিচয় ঘটে তারও ব্যবস্থা করতে হবে। সেবা ও শিক্ষার মাধ্যমে উপজাতীয়দের ভারতীয়তার সঙ্গে নিবিড় ঐক্য সমন্বিত করতে হবে যাতে বৃহৎ ভারতের সঙ্গে তাদের এক ঐতিহাসিক সম্বন্ধবোধ জেগে ওঠে। তাদের কল্যাণের জন্যে ভারতীয়দের আত্মনিয়োগ করে আপন করে নিতে হবে। এতে উভয়েরই মঙ্গল হবে। রবীন্দ্রনাথ দূরকে নিকট করবার কথা বলেছেন, এখানে আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত নিকটের আদিবাসীদের নিকটতর করা - তাদের নিবিড় বন্ধনে বাঁধা। তবেই "বিবিধের মাঝে মিলন মহান্" সার্থক হবে। এই মহান্ মিলন, মিলে মিশে এক হয়ে যাওয়ার মিলন নয়। এতে তাদের স্বাতন্ত্র্য মুছে যাবে না। তারা আপন মহিমায় সমুজ্জ্বল হয়ে উঠবে। তাই আবার বলতে হচ্ছে, ভারত সেবাশ্রম সংঘ, রামকৃষ্ণ মিশন প্রভৃতির আদিবাসীদের আর্থিক এবং সেই সঙ্গে আধ্যাত্মিক উন্নতির দিকেও দৃষ্টি দেওয়া দরকার। নইলে সম্প্রতি বিলগ্রাহামের নেতৃত্বে নাগাভূমিতে খৃষ্টধর্মে যে গণদীক্ষার পর্ব হয়ে গেল, তা উত্তরোত্তর বেড়েই চলবে। প্রতিবেশী রাষ্ট্রের ধর্ম ও সংস্কৃতি ফেলে বাহিরাগত ধর্ম ও কৃষ্টির দিকে ঝোঁক বাড়লে অনেক সমস্যা দেখা দেবে।

(৬৫২ পৃষ্ঠার পর)

মানব সভ্যতার, কৃষ্টির ও শিল্পকলার ইতিহাস চর্চা করিলে দেখা যায় যে সে সকলের যেরূপ একটা জাতিগত ধারা আছে তেমনি আছে ব্যক্তিগত প্রতিভা, রচনা ও গঠন কৌশলের উজ্জ্বল উদাহরণের অসংখ্য উল্লেখ। একভাবে দেখিলে সভ্যতা ও কৃষ্টি নানা যুগের বহু গুণী ও প্রতিভাশালী ব্যক্তির কাব্য, সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্পকলা, সঙ্গীত নৃত্যের ক্ষেত্রে সৃজন কার্য্যেরই সফলতার ইতিবৃত্ত। হোমার, ইউরিপিডিস, প্লেটো, সোক্রাটিস, ফিডিয়াস, প্র্যাক্সিটিলিস এর কথা না বলিলে গ্রীসের কৃষ্টি ও সভ্যতার কথা বলা হয় না। তেমনি সেই সকল যুগের বহু কবি, দার্শনিক, চিত্রকর-দিগের নাম এখন লোকে ভুলিয়া গিয়া থাকিলেও অজন্তার চিত্র শিল্পীগণের, মিংযুগের কলাকৌশলীদিগের কিম্বা মিশরের স্থপত ও ভাস্কর গোষ্ঠীর কথা বিস্ময় বিমুগ্ধ মনে সকলকে চিন্তা করিতে হয়। নাম যাঁহাদের জানা আছে, যথা মহাকবি কালিদাসের, তাঁহাদের কেহ কখনও ভুলিতে পারিবে না। প্রাচীনকাল হইতে মধ্য-যুগে ও তৎপরে আধুনিক কালে যে সকল গুণী ও প্রতিভাবান ব্যক্তি জগত সভ্যতাকে উন্নত করিয়া গিয়াছেন তাঁহাদের নামও চিরস্মরণীয় থাকিবে। এইভাবে সভ্যতা ও কৃষ্টির ইতিহাসে দান্তে, মিকাল আঞ্জেলো, লিওনার্ডো ডা ভিঞ্চি, সেক্স্পিয়র, মলিয়ের, হেন্রি আর্ভিং, গেয়টে, হিউগো, আন্না পাবলোভা, মাদাম কুরি, আইনস্টাইন প্রভৃতি অসামান্য প্রতিভাবান ব্যক্তিদিগের কথা লিপিবদ্ধ করিতে কেহ কখনও অন্যথা করিবে না। শুবার্ট, শোপ্যা, ভাগনার, মাদাম মেলবা, ক্রাইসলার, কুবেলিক, রোদ্যাঁ প্রভৃতির নামও ঐ একই পর্য্যায়ের। মহাপ্রতিভাবান ব্যক্তিদিগের প্রসঙ্গে সতত্ই একজন বহুগুণাকর কৃষ্টিকল্পতরুর নাম স্মরণপথে সূর্য্যের মত জাগ্রতভাবে দীপ্যমান হইয়া উঠে। তিনি আধুনিক কালে ভারতবর্ষে আবির্ভূত হইয়া থাকিলেও তাঁহার অলৌকিক প্রতিভা সম্পদের তুলনা কোন যুগে কোন দেশেই পাওয়া অসম্ভব বলিতে হয়। একাধারে কাব্য, সাহিত্য দর্শন, সঙ্গীত, নাটক, অভিনয়, নৃত্যকলা, চিত্রশিল্প, রাজনীতি সমাজ সংস্কার, অর্থনৈতিক গঠনকার্য্য, শিক্ষা ইত্যাদি নানাক্ষেত্রে বিচিত্র ক্ষমতার একত্রে অবতারণা আমরা শুধু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মধ্যেই দেখিতে পাই। প্রায় তিন সহস্র সঙ্গীত রচনা ও তাহাতে নিজস্ব সুর সংযোজন অসংখ্য কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ, উপন্যাস, নাটক ইত্যাদি লেখা ও বহু নাটকের অভিনয়, রঙ্গমঞ্চের পরিকল্পনা সাজ সজ্জা ইত্যাদির ব্যবস্থা রবীন্দ্রনাথ নিজেই করিতেন। মহাকবির প্রতিভা অতুলনীয়। কণ্ঠ-সঙ্গীতে, আবৃত্তিতে, অভিনয়ে, বক্তৃতায় তাঁহার সমতুল্য শক্তিমান ব্যক্তি সমসাময়িক কালে কোথাও দেখা যাইত না। কবিতা, সঙ্গীত, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ ও নাটকের ভাব সম্পদে ও ভাষার মাধুর্য্যে রবীন্দ্র রচনাবলী অতুলনীয়। শাস্ত্রগ্রন্থের ব্যাখ্যানে, দার্শনিক তথ্য বিশ্লেষণে, দেশাত্মবোধ বা অপর উচ্চাঙ্গের চিন্তাধারার ভাবার্থ প্রকাশে তাঁহার প্রতিভা অসামান্য বলিয়া সর্বদেশের গুণীজন সমাজে স্বীকৃত হইয়াছে। তাঁহার কর্ম্মজীবনকালীন ভারতীয়কৃষ্টি ও সভ্যতাকে রবীন্দ্রযুগের সভ্যতাই বলা হইয়া থাকে এবং ভারতের সেই সময়কার কাব্য সাহিত্য সঙ্গীত নাটক প্রভৃতির অঙ্গে অঙ্গে রবীন্দ্র-প্রতিভার চিহ্ন চিরঅঙ্কিত থাকিবে।

আধুনিককালে সভ্যতা ও কৃষ্টি অসাড় ও আড়ষ্টভাবে সকল উন্নতি ও অগ্রগমন ভুলিয়া পড়িয়া আছে এমন কথা বলা যায় না। বস্ত্র ও অলঙ্কার শিল্পে নানা প্রকার সখের জিনিস প্রস্তুত হইতেছে ও সে সকলের মধ্যে মানুষের কারুকার্য্য ও শিল্প প্রতিভা উত্তমরূপেই দেখা যাইতেছে। কোন শেক্স্পিয়র মলিয়ের বা রবীন্দ্রনাথ না থাকিলেও যাঁহারা সাহিত্য সেবা করিতেছেন তাঁহারা সকলেই প্রতিভাহীন নহেন। চিত্রকলা, ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্য নবরূপ ধারণ করিলেও যে সে নূতন আকৃতি প্রকৃতি সম্পূর্ণ গুণহীন তাহা বলা যায় না। স্থাপত্যের নূতনত্ব মানুষের প্রয়োজন সিদ্ধি সম্মুখে রাখিয়া অগ্রসর হইতেছে বলিলে ভুল হইবে না। নানাক্ষেত্রে কষ্ট-কল্পিত সৃষ্টি কার্য্য সম্মুখে ধরা হইতেছে ও তাহা বর্জ্জিতও হইতেছে। অনেক ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের সহিত তাল রাখিয়া প্রগতি নূতন পথে চলিতেছে। বিজ্ঞান নূতন নূতন সম্ভাবনা মানুষের নিকট তুলিয়া ধরিতেছে; কোথাও কোথাও মানব প্রতিভা সেই সকল কার্য্যে আত্ম-নিয়োগ করিয়া সৃষ্টির আগ্রহের নূতন নূতন অর্থ দেখিতে পাইতেছে। জনমত বলিতেছে মানব প্রতিভা পূর্ব্বের ন্যায় প্রবলভাবে শক্তিমান না হইলেও প্রতিভাবান ব্যক্তির সংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা বহুগুণ হইতে দেখা যাইতেছে। মহাগুণবানের সংখ্যা হ্রাস হইলেও সাধারণ গুণবান ব্যক্তির সংখ্যা অধিকই বলা যায়।

পরিমল গোস্বামী রচিত সর্বাধুনিক গ্রন্থ

পত্রস্মৃতি

লেখক কর্তৃক গৃহীত ৩৬ খানি ফোটোগ্রাফ, মুল্যবান্ মুদ্রণ, ৭৮ জন পত্র লেখক ও লেখিকার ৩৫০ খানি পত্র ও পত্রাংশ—আর তাদের ঘিরে লেখকের বিচিত্র স্মৃতি। বাংলা সাহিত্যে সম্পূর্ণ অভিনব। মূল্য বাইশ টাকা।

যাঁদের পত্র ঘিরে লেখকের স্মৃতি রচিত হয়েছে

অজিতকৃষ্ণ বসু—অঞ্জনা ভৌমিক—অতুলচন্দ্র বসু—অতুলানন্দ চক্রবর্তী—অমল হোম—অমিতা রায়—অমিয়া চৌধুরাণী—অশোক মৈত্র—আবদুল আজীজ আমান—আশু দে—ইন্দিরা দেবীচৌধুরাণী—কালিদাস নাগ—কালিদাস রায়—কিরণকুমার রায়—গীতশ্রী বন্দনা সেনগুপ্ত—গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য—গোপাল ঘোষ—গোপাল হালদার—চন্দ্রশেখর বেঙ্কট রামন্—জয়ন্তনাথ রায়—জয়ন্তী সেন—জাহান আরা বেগম—জীবনময় রায়—জ্যোতির্ময় ঘোষ—তপতী বিশ্বাস—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়—দিগিন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য—দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী—নলিনীকান্ত সরকার—নিখিলচন্দ্র দাস—নিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী—নীরদচন্দ্র চৌধুরী—নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়—পুলিন বিহারী সেন—পি. সি. সরকার—প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়—প্রমথ চৌধুরী—প্রমথনাথ বিশী—প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়—প্রেমেন্দ্র মিত্র—বনফুল—বনবিহারী মুখোপাধ্যায়—বারীন্দ্রকুমার ঘোষ—বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়—বিনয়কুমার সরকার—বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়—বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়—বিমলাকান্ত রায়চৌধুরী—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—মণীন্দ্রচন্দ্র সমাদ্দার—মণীষ ঘটক—মায়া বসু—মার্গারেট চ্যাটার্জী—মৈত্রেয়ী দেবী—রাজশেখর বসু—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—লীলা বন্দ্যোপাধ্যায়—লীলা মজুমদার—লীলা সিং—শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়—শশিশেখর বসু—শিবরাম চক্রবর্তী—শিশিরকুমার ভাদুড়ি—শীতলাকান্ত শীল—শোভা সেন—সতীনাথ ভাদুড়ী—সবিতা সেনগুপ্ত—সুধাকান্ত রায়চৌধুরী—সুধীরকুমার চৌধুরী—সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী—সৈয়দ মুজতবা আলী—হারীতকৃষ্ণ দেব—হেমলতা ঠাকুর।

পরিবেশক : রূপা অ্যাণ্ড কোং কলিকাতা-১২

পরিমল গোস্বামী রচিত

আধুনিক ব্যঙ্গ পরিচয়

মূল্য ছয় টাকা

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী বলেন—

বাংলা ভাষায় ব্যঙ্গ সাহিত্য সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ।

●

প্রেসিডেন্সি কলেজের বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক

শ্রীভবতোষ দত্ত বলেন—

আধুনিক ব্যঙ্গ পরিচয়ের ভূমিকাতে ব্যঙ্গের লক্ষণ যে রকম সুনির্দিষ্ট এবং পরিষ্কার করে বলা হয়েছে এমন আর কোন বইতে হয়েছে বলে জানি না।

পরিবেশক : নবগ্রন্থনা, ৮, কৈলাস বসু ষ্ট্রীট কলিকাতা-৬

বিপ্লবী শ্রীঅরবিন্দ

সন্তোষকুমার অধিকারী

অরবিন্দের জীবনকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র দুটি অধ্যায়ে ভাগ করা চলে। প্রথম জীবনের শুরু লণ্ডনে, সেণ্ট্ পল্‌স্ কলেজে; তখন তাঁর বয়স চোদ্দ। দ্বিতীয় জীবনের শুরু ১৯১০ সালে, যেদিন তিনি পণ্ডিচেরী যাত্রা করলেন, সেদিন। তখন তাঁর বয়স আটত্রিশ। তাঁর এই দুটি জীবনের মধ্যে এত প্রবল সীমারেখা যে, মনে হয়, দুই জীবনে তিনি দুই স্বতন্ত্র পুরুষ। তাঁর প্রথম জীবনের প্রকাশ তাঁর বুদ্ধিতে, ভাষণে, স্বাদেশিকতার প্রচারে, রাজনীতিতে এবং গুপ্ত বিপ্লব আন্দোলনের নায়কত্বে। অথচ এ জীবন ছিল গুপ্ত। তাঁর দ্বিতীয় জীবন প্রত্যক্ষ নয়, এক অধিমানসিক চেতনার দিব্যবিভায় শুধু প্রোজ্জ্বল। অথচ এই অপ্রত্যক্ষ ধ্যানের জগতে অবলীন ঋষি অরবিন্দর অস্পষ্ট ছবিই মানুষের চোখে উদ্ভাসিত। যাঁর স্বদেশচেতনা ও সংগ্রামী জাতীয়তাবাদকে আমরা ভুলে গিয়েছি, তাঁর দিব্যমানসের সাধনার ইতিহাস না জেনেও ঋষি অরবিন্দকেই আমরা প্রণাম দিয়েছি।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে যিনি প্রথম বিপ্লবের পথে পরিচালিত করলেন, যিনি উগ্র জাতীয়তাবাদী এবং স্বদেশপ্রেমিক সেই অরবিন্দের বিপ্লবী জীবনের সূচনা যেন পূর্বনির্দিষ্ট ছিল। তাই বিপরীত পরিবেশের মধ্যে থেকেও নির্দ্বিধায় তিনি অভ্রান্ত লক্ষ্যের দিকে নিজেকে পরিচালিত করেছেন।

তাঁর পারিবারিক রক্তের মধ্যেই স্বাদেশিকতার বীজ উপ্ত ছিল। অরবিন্দের জননী স্বর্ণলতা ছিলেন রাজনারায়ণ বসুর কন্যা। উনবিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষে রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের পরে স্বদেশচেতনাকে যিনি নিবিড়ভাবে হৃদয়ে অনুভব করেছিলেন, তিনিই রাজনারায়ণ বসু। রাজনারায়ণ বসুর আদর্শ ও চিন্তাকে সেদিন তাঁরই আর এক সুহৃদ্ নবগোপাল মিত্র রূপ দিলেন "হিন্দুমেলা"র মাধ্যমে। 'হিন্দুমেলা''তেই স্বাদেশিকতার অঙ্কুরকে সাধারণ মানুষের জীবনে উদ্গম করার প্রচেষ্টা। রাজনারায়ণ বসুর প্রবল স্বদেশচেতনাই যে তাঁর দৌহিত্রের রক্তে সঞ্চারিত হয়েছিল তাতে কোন ভুল নেই।

আশ্চর্য হতে হয় যখন দেখি, তাঁর পিতা ডাঃ কৃষ্ণধন ঘোষ পুরোপুরি সায়েব ছিলেন। তিনি নিজে ইংলণ্ড গিয়ে সায়েব হয়েছিলেন, এবং চেয়েছিলেন যে, তাঁর ছেলেরাও তাই হবে। পাঁচবছর বয়সে দার্জিলিংএর লরেটো কনভেণ্ট স্কুলে ছেলেকে দিলেন তিনি, আর তার সাত বছর বয়সে লণ্ডনে পাঠিয়ে দিলেন, সেখানেই তার শিক্ষা ব্যবস্থা উপযুক্ত হবে ভেবে। লণ্ডনে মিঃ ড্রুয়েটের পরিবারভুক্ত হয়ে গেলেন অরবিন্দ।

অরবিন্দর বয়স যখন চোদ্দ তখন তিনি সেণ্ট্ পল্‌স্ স্কুলের ছাত্র। লণ্ডনে ইংরেজী পরিবারের আবহাওয়ায় মানুষ, ইংরেজী স্কুলে শিক্ষিত বালকের মধ্যে জাতীয়তার বোধ যে জাগতে পারে এ'কথা ভাবার কোন কারণ নেই। অথচ এই বয়সেই তিনি রক্তে রক্তে অনুভব

করছেন তিনি ভারতের মানুষ, যে ভারত ইংরাজ রাষ্ট্রতন্ত্রের অধীনে। এই বয়সেই তিনি অনুভব করেছেন যে, দেশের জন্যে তাঁরও কিছু করবার আছে এবং তাঁর কর্তব্যও সুনির্দিষ্ট। ১৮৯০ সালে সেন্ট্ পল্‌স্ স্কুল থেকে শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আঠারো বছর বয়সেই আই সি এস পরীক্ষা দিলেন। পরীক্ষায় তিনি কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন, কিন্তু আই. সি. এস.-এর চাকরি তাঁর ভাগ্যে ছিল না। পরীক্ষা দিয়েছিলেন শুধু পিতার ইচ্ছায়, অথচ মনে তাঁর অন্য জগতের সাড়া। ব্রিটিশ শাসনযন্ত্রের উচ্ছেদের জন্যে যিনি সংগ্রাম করতে চান, সেই শাসনযন্ত্রেরই অংশ হয়ে যাওয়া তিনি কি করে মেনে নিতে পারেন? মনের এই অনিচ্ছা রূপ নিলো আচরণে। ঘোড়ায় চড়ার পরীক্ষায় প্রথম দিন পড়ে গেলেন; দ্বিতীয় দিন অনেক বিলম্বে পরীক্ষার সময় উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়ার পরে এসে পৌঁছোলেন।

হয়ত তাতেও রেহাই পেতেন না, যদি না ইতি-মধ্যেই তাঁর সম্পর্কে গোপন পুলিশ রিপোর্টে গভর্ণমেন্ট চকিত না হতেন। অরবিন্দ স্কুল ও কলেজের ডিবেট সোসাইটিতে ভারতের স্বাধীনতার অধিকার নিয়ে আলোচনা শুরু করেছেন। কেম্ব্রিজে তিনি 'ইণ্ডিয়ান মজলিশ' এর উৎসাহী সভ্য। এই মজলিশের বৈঠকে তিনি ভারতের কথা আলোচনা করেন। এমন কি লণ্ডনে ভারতীয় ছাত্রদের গুপ্তসমিতি লোটাস অ্যাণ্ড ড্যাগার-এরও তিনি সভ্য।

এটা কেমন করে সম্ভব হলো, ভাবতে গেলে মনে হয়, মাতামহের স্বদেশচেতনা সম্পর্কে তিনি পূর্ণ সজাগ ছিলেন, এবং সেই প্রেরণাই তাঁকে চোদ্দ বছর বয়সেই এ পথে টেনে এনেছিল।

অরবিন্দর জন্ম মুহূর্ত—১৮৭২ সাল—ইউরোপেও এক উত্তেজনাময় মুহূর্ত। ইতালীতে মাৎসিনি ও গ্যারিবল্ডী তখন বিপ্লবের পথে এগিয়ে চলেছেন। ছাত্র অরবিন্দ ফরাসী ও লাতিন ভাষায় সাহিত্য ও ইতিহাস পাঠ করেছিলেন। ফরাসী বিপ্লব ও মাৎসিনির বৈপ্লবিক আদর্শেও তিনি যে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

লণ্ডনে তিনি যে তরুণ বন্ধুদের সঙ্গ পেয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাম—কে জি দেশপাণ্ডে ও চিত্তরঞ্জন দাশের। লণ্ডনে চিত্তরঞ্জন দাশের সাহচর্য তাঁর পক্ষে প্রয়োজনীয় ছিল তাঁর দেশাত্মবোধকে উদ্দীপ্ত করে তুলতে।

অরবিন্দ বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থগুলি পড়েন সম্ভবতঃ বরোদায় এসে—১৮৯৩ সালের পরে। কিন্তু তাঁর বিপ্লব-চেতনায় সবচেয়ে বেশী প্রভাব বঙ্কিমের। বঙ্কিমের 'আনন্দমঠ' তাঁকে সংগ্রামের পথ দেখিয়েছে এ'কথা তিনি নিজে বলেছেন। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা—দেশকে 'মা' বলে অনুভব করার বেদনা—যা বঙ্কিমের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান। ১৯০৫ সালে স্ত্রীকে একটি চিঠিতে অরবিন্দ লেখেন—"অন্যলোকে স্বদেশকে একটা জড় পদার্থ কতগুলো মাঠ, ক্ষেত্র, বন, পর্ব্বত, নদী বলিয়া জানে,—আমি স্বদেশকে মা বলিয়া জানি; ভক্তি করি, পূজা করি।" আনন্দমঠের সন্তানদের মাতৃপূজাও দেশমাতৃকার জন্য সর্ব্বস্বদানের পণ অরবিন্দর জীবনে প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। তিনি কোন এক নির্জন পাহাড়ের কোলে শক্তি আরাধনার জন্য 'ভবানীমন্দির' স্থাপনের পরিকল্পনা করেন। তাঁর রচিত 'ভবানীমন্দির' প্রবন্ধে লেখেন—

"The deeper we look the more we shall be convinced that the one thing wanting which we must strive to acquire before all others is strength—strength physical, strength mental, strength moral.'

বিপ্লব আন্দোলনের পথিকৃৎ বাসুদেব ফাদ্‌কের প্রভাবও সম্ভবতঃ অরবিন্দর চিন্তাধারায় সক্রিয় হয়ে থাকবে। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ অরবিন্দর বরোদায় পৌঁছানোর মাত্র চোদ্দ বছর আগে ফাদ্‌কে কুর্ণুল জেলার মল্লিকার্জ্জুন মন্দিরে যান এবং প্রাণদানের সংকল্প নিয়ে লেখেন—আমি প্রণাম জানাই আমার ভারতের

অধিবাসীদের কাছে, আমি তোমাদের জন্যই আমার জীবন উৎসর্গ করছি। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা, আমার এই জীবনদান যেন তোমাদের মঙ্গলের জন্যই তিনি গ্রহণ করেন। *

অরবিন্দর লেখা 'ভবানীমন্দির' পুস্তিকা সম্পর্কে সিডিশন কমিটির রিপোর্টে লেখা হয়েছে—

The Bhawani Mandir (temple of Bhawani. one of the manifestations of the goddes Kali) exalts Bhawani as the manifestation of Sakti. Indians must acquirc mental physical moral and spiritual strengtb. They must copy the methods of Japan. They must draw strength from religion. How this is to be done is described in moving and powerful terms. The book is a remarkable instance of perversion of religious ideals to political purposes.

(দেবী কালীর নানারূপে আবির্ভাব ; তার মধ্যে একটি নাম ভবানী। 'ভবানীমন্দির'-এ ভবানীকে শক্তির প্রকাশ বলে তুলে ধরা হয়েছে। বলা হয়েছে, ভারতীয়দের মানসিক শারীরিক নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি অর্জ্জন করতেই হবে। জাপানের নীতিকে অনুসরণ করার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। ধর্ম থেকে তারা এই শক্তি-অর্জন করবে। কেমন ভাবে করবে তারই বর্ণনা জোরালো ও আকর্ষক ভাষায় দেওয়া হয়েছে। ধর্মের আদর্শকে রাজনৈতিক প্রয়োজনে বিকৃত করে ব্যবহার করার একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ এই বইখানি।)

বস্তুতঃ তাঁর ভবানীমন্দিরের আদর্শের রূপায়ণের জন্য অরবিন্দ অনেক দূর অগ্রসর হয়েছিলেন। দেশের যুব-সমাজকে বিপ্লবাত্মক কার্যসূচীর মধ্যে দিয়ে শিক্ষা দেওয়া ছিল তাঁর পরিকল্পনার অন্তর্গত। আর তিনি জানতেন যে ভারতের মত একটা দেশে ধর্ম্ম ও অধ্যাত্মকেই সামনে রেখে অগ্রসর হইতে হবে। এই উদ্দেশ্যে তিনি গুজরাটে নর্মদানদীর তীরের আশ্রম-গুলিতে ঘুরে বেড়ান। গঙ্গানাথ নামক স্থানে বন্ধু দেশপাণ্ডের সহযোগিতায় তিনি একটি বিদ্যালয়ও স্থাপন করেন ; নাম ভারতী বিদ্যালয়। ভবানীমন্দির পরিকল্পনার ধারাতেই এই বিদ্যালয়টিকে পরিচালনার চেষ্টা করেছিলেন। একসময় তিনি বারীনকেও নির্দেশ দিয়েছিলেন বাংলা বিহারের সীমান্তে কোন পাহাড়ের নির্জ্জনে মন্দির স্থাপনের উপযুক্ত স্থান নির্বাচন করতে।

বোম্বাই থেকে প্রকাশিত "ইন্দুপ্রকাশ" পত্রিকায় অরবিন্দ বঙ্কিমকে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক ও দ্রষ্টার মর্যাদা দিয়ে কয়েকটি প্রবন্ধ লেখেন। সুরাট কংগ্রেসের পরে মহারাষ্ট্রের অমরাবতীতে কংগ্রেসের একটি অধিবেশন হয়। এই সভায় উদ্বোধনী সঙ্গীত হিসাবে 'বন্দেমাতরম্' গাওয়া হ'লে অরবিন্দ 'বন্দেমাতরম্'-এর তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন—

—The song is not only a national anthem as the European nations look upon their own, but one replete with mighty powers being a sacred mantra, revealed to us by the author, of "Ananda Math."

'বন্দেমাতরম্' যে পরবর্তী যুগে সমস্ত জাতির কাছে আত্মদানের মন্ত্র হয়ে উঠেছিল এ'কথা প্রত্যক্ষ করেছি বারবার।

দ্বিতীয় যে মানুষ অরবিন্দর জীবনে প্রেরণায় অনুভূত তাঁর নাম স্বামী বিবেকানন্দ।

১৮৯৩ সালে যখন অরবিন্দ ইউরোপ থেকে ফিরে এলেন বরোদায় তখন স্বামীজি গেলেন আমেরিকায়। শিকাগোর ধর্মসভায় স্বামী বিবেকানন্দ শুধু হিন্দুধর্ম নয়, ভারতের মর্যাদাকে তুলে ধরলেন পৃথিবীর সামনে।

স্বামী বিবেকানন্দও অরবিন্দের মতই বঙ্কিমকে সাধারণ মানুষের কাছে টেনে এনেছিলেন, বরং তিনি ডাক দিয়েছিলেন তরুণ-সমাজকে, বজ্রকণ্ঠে বলেছিলেন —"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী। হে কলিকাতার যুবকবৃন্দ, ওঠো, জাগো ; কারণ শুভমুহূর্ত আসিয়াছে। সাহস সংগ্রহ কর,—তোমাদের জন্মভূমি

*Militant Nationalism in India by Dr. B. B. Majumder.

তোমাদের নিকট হইতে আজ মহান্ আত্মবলিদান চাহিতেছেন।” বলা যেতে পারে, ভারতবর্ষে স্বামীজিই প্রথম জননেতা যিনি সমস্ত দেশকে শক্তিমন্ত্রে উজ্জীবিত করতে চেয়েছিলেন। অরবিন্দ বললেন, “বিবেকানন্দের মতন বীর্যবান্ পুরুষসিংহ আর হয়নি। যিনি হিন্দুধর্মের জাগরণের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন, তিনিই কিনা যুবসমাজকে ডেকে বললেন—শরীর সাধনা এমন কি ভগবদ্‌গীতা পাঠ করা অপেক্ষাও গুরুত্বপূর্ণ। বললেন, ভুলিও না, তুমি জন্ম হইতে মায়ের জন্য বলিপ্রদত্ত।”

১৯০৮ সালে আলিপুর বোমার মামলার আসামী হ'য়ে অরবিন্দ যখন কারাগারে,তখনও তিনি প্রতি মুহূর্তে স্বামীজির বাণীই শুনেছেন, তাঁর কারাকাহিনীতে অরবিন্দ বর্ণনা করেছেন যে তাঁর ধ্যানের মুহূর্তে তিনি শুধু বিবেকানন্দর কণ্ঠই শুনতে পেতেন; এক পক্ষকাল ধরে স্বামীজি তাঁর কাছে কাছে থেকেছেন।

১৮৯৩ সালের আগষ্ট মাসে দেশপাণ্ডে সম্পাদিত ইন্দুপ্রকাশে অরবিন্দ প্রথম রাজনৈতিক প্রবন্ধ লিখতে শুরু করেন। তখন তাঁর বয়স একুশ।

“New Lamps for Old” এই শিরোনামায় অরবিন্দর প্রবন্ধগুলি তদানীন্তন কংগ্রেস নেতৃবৃন্দকে তীব্র সমালোচনা করে লেখা। অরবিন্দ পরিষ্কার করে বলেছিলেন, কংগ্রেসকে মুষ্টিমেয় কয়েকজন শিক্ষিত ব্যক্তির হাতে রাখলে চলবে না, তাকে নামিয়ে আনতে হ'বে জনসাধারণের মধ্যে। উদারপন্থী নেতাদের ব্রিটিশ প্রীতির তীব্র নিন্দা করে বিদেশী শাসনের অবসান ঘটানোর জন্য সমবেত হ'তে আহ্বান জানিয়েছিলেন। বলা বাহুল্য তাঁর এই প্রবন্ধগুলি এতই সুযুক্তিপূর্ণ ও জোরাল ছিল যে বিচারপতি রাণাডের মত লোকও বিচলিত হয়ে ওঠেন।

মহারাষ্ট্রে গুপ্তসমিতি গড়ে ওঠে ১৮৯৬ সালে। আর ১৮৯৭ সালে চাপেকার ভাইদের হাতে অত্যাচারী পুলিশ কর্মচারী র‍্যাণ্ড ও আয়ার্ষ্ট নিহত হন। এই সময় ঠাকুর সাহেব নামের এক প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি গুপ্ত সমিতি সংগঠনের কাজে এগিয়ে আসেন। অরবিন্দর সঙ্গে ঠাকুর সাহেবের যোগাযোগ ঘটে এবং অরবিন্দের নেতৃত্বে পুণায় গুপ্তসমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। আর একজন মহারাষ্ট্রীয় বিপ্লবী মাণ্ডাভালের সঙ্গেও অরবিন্দ পরিচিত হন। ঠাকুর সাহেব ভারতের বাইরে চলে যাওয়ায় এই গুপ্তসমিতিগুলি পরিচালনার ভার অরবিন্দর হাতেই পড়ে।

মহারাষ্ট্রে রাজনৈতিক চেতনার যিনি স্রষ্টা, তিনি হলেন লোকমান্য তিলক। তিলক চরমপন্থী ছিলেন। অরবিন্দর প্রবন্ধগুলি পড়ে তিনি আকৃষ্ট হন এবং যোগাযোগ করেন। তিলকের সাহচর্যে অরবিন্দের রাজনৈতিক চিন্তাধারা চরমপথের দিকেই সুনির্দিষ্ট মোড় নেয়।

এই সময়ে এক প্রবল শক্তিসম্পন্ন দেশপ্রেমিক যুবকের সঙ্গে তাঁর আলাপ হলো। বলা যেতে পারে, এই যুবকের সাহচর্যই তাঁকে বাংলায় বিপ্লববাদের পথে টেনে আনল।

এই যুবকের নাম যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। যতীন্দ্রনাথ তখন বরোদায় এসেছেন, ছদ্মনামে, সৈন্যবাহিনীতে ঢুকতে চান। উদ্দেশ্য সামরিক বিদ্যা আয়ত্ত করা ও বাঙ্গালী ছেলেদের শেখানো। যতীন্দ্রনাথকে সাহায্য করলেন অরবিন্দ।

যতীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশে সশস্ত্র বিপ্লবের সৃষ্টি করা। তার জন্য বিবেকানন্দ-নির্দেশিত পথে ব্যায়ামাগার স্থাপন ও ছেলেদের শিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে তিনি আগ্রহী ছিলেন। অথচ বাঙ্গালী অস্ত্রচালনা শিক্ষা ভুলে গিয়েছিল। কোন বাঙ্গালীকে সেনা-বিভাগে ঢুকতে দেওয়া হ'ত না। তাই যতীন্দ্রনাথ অবাঙ্গালীর ছদ্মবেশে বরোদায় সৈন্যবিভাগে প্রবেশ করলেন। অরবিন্দ এই পরিকল্পনাকে পুরো সমর্থন করেছিলেন, এবং এই উদ্দেশ্যেই ১৯০১ সালে যতীন্দ্রনাথকে তিনি বাংলায় পাঠালেন গুপ্তসমিতি স্থাপন করতে।

শুধু যতীন্দ্রনাথকে নয়, ছোটভাই বারীনকেও তিনি পাঠালেন। ১৯০২ সালে বারীন এলেন কলকাতায়, তখন তাঁর বয়স বাইশ; উদ্দেশ্য—"To organise a revolutionary movement with the object of overturning the British Government in India by violent means."

উদ্ধৃতিটুকু সিডিশন কমিটির রিপোর্ট থেকে নেওয়া।

ডক্টর ভুপেন্দ্রনাথ দত্তর লেখা "ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম" নামক গ্রন্থ থেকে বাংলাদেশে বিপ্লবাত্মক গুপ্তসমিতি স্থাপনের ও বৈপ্লবিক ধারা প্রবর্তনের প্রথম ইতিহাস পাওয়া যায়। তাতে জানা যায় এ' ধরনের প্রথম সমিতি স্থাপিত হয় ১৯০১ সালে। (অরবিন্দ তখন বরোদা কলেজে অধ্যাপনার কাজে রত।) বাংলায় এই গুপ্ত বৈপ্লবিক সমিতির সভাপতি হয় প্রমথনাথ মিত্র (পি. মিত্র. নামে খ্যাত)। সহকারী সভাপতি—চিত্তরঞ্জন দাশ ও অরবিন্দ ঘোষ কোষাধ্যক্ষ সুরেন ঠাকুর এবং ছাত্রদের পরিচালক যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

যতীন্দ্রনাথ কলকাতায় এসে ১০৮ সি আপার সার্কুলার রোডে ওঠেন এবং নির্দেশমত ছাত্রসংগঠন ও ব্যায়ামাগার ইত্যাদি স্থাপন করে ছাত্রদের শরীরচর্চ্চার দিকে মন দেন।

১৯০২ সালে অনুশীলন সমিতি প্রতিষ্ঠা হয় এবং অরবিন্দ ঘোষ, প্রমথনাথ মিত্র, চিত্তরঞ্জন দাশ, ভগিনী নিবেদিতা, বিপিনচন্দ্র পাল প্রমুখ নেতৃবৃন্দ অনুশীলন সমিতির সংস্রবে আসেন। [অনুশীলন সমিতির ইতিহাস—জীবনতারা হালদার।]

অরবিন্দ তাঁর অন্তরের মধ্যেই এক নূতন প্রেরণা অনুভব করেছিলেন এই সময়ে। ইতিমধ্যে তিনি যোগ সাধনার পথে এগিয়েছেন, কিন্তু তাঁর কৃত্য হিসেবে জেনেছেন—দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনকে দৃঢ় করে গড়া। স্বাধীনতা আন্দোলন তার কাছে নিছক রাজনীতি বা আদর্শের অনুসরণ নয়, এ ছিল তাঁর জীবন মরণ সমস্যা। পরবর্তীকালে স্ত্রীর কাছে একটি চিঠিতে তিনি মনের এই ভাব ব্যক্ত করে বলেছিলেন যে, সন্তান যদি দেখে, যে মায়ের বুকের ওপরে বসে অসুর তাঁর রক্তপান করছে তাহ'লে কি সন্তান নির্বিকার হয়ে থাকতে পারে? অরবিন্দ তাঁর সকল সাধনায় বড় বলে জেনেছিলেন স্বদেশরূপী মাকে শত্রু কবল মুক্ত করাকে।

তাঁর পরিকল্পনা ছিল প্রথমতঃ বৈপ্লবিক কর্মধারা। দ্বিতীয়: প্রচার ও সম্ভাব্য সকল উপায়ে গোটা দেশের মানুষকে স্বাধীনতাসচেতন করে তোলা।

বারীন্দ্রর লেখা থেকে আমরা জানতে পারি যে, অরবিন্দই তাঁকে বিপ্লববাদে দীক্ষা দেন। তাঁর দীক্ষা দেওয়ারও একটা পদ্ধতি ছিল। বারীনের একহাতে তরবারি ও অন্য হাতে গীতা দিয়ে তাঁকে দিয়ে শপথবাক্য উচ্চারণ করান—"যতদিন আমার দেহে প্রাণ থাকবে এবং যতদিন আমার দেশ স্বাধীন না হবে, ততদিন আমি বিপ্লবের পথে কাজ করে যাব।

১৯০২ সালেই অরবিন্দ গোপনে মেদিনীপুর যান। মেদিনীপুরে আত্মীয় সত্যেন্দ্রনাথ বসু ও হেমচন্দ্র কানুনগোকে (দাস) বিপ্লবের মন্ত্রে যথারীতি দীক্ষা দেন।

বাংলায় সংগঠনের ভার মোটামুটি যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওপরেই ছিল। বারীনকে পাঠিয়েছিলেন অরবিন্দ যতীন্দ্রনাথের সহকারী হিসেবে। তিনি নিজে মাঝে মাঝে ছুটি নিয়ে আসতেন আবার ফিরে যেতেন। বিপ্লব সংগঠনের কাজে অরবিন্দকে সাহায্য করতে এই সময়েই এগিয়ে আসেন নিবেদিতা। ১৯০৪ সালেও দীর্ঘ ছুটি নিয়ে অরবিন্দ কলকাতায় এসে থাকেন। ১৯০৫ সালে বারাণসী কংগ্রেসে তিনি উপস্থিত ছিলেন।

১৯০৬ সালে যুগান্তর পত্রিকার প্রতিষ্ঠা। সম্পাদক ডাঃ ভুপেন্দ্রনাথ দত্ত। তাঁর সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন অবিনাশ ভট্টাচার্য এবং অরবিন্দ ও বারীন্দ্র। বারীন্দ্র তাঁর দলবল নিয়ে তখন অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ, বোমা তৈয়ার ও হিংসাত্মক কাজে মনোনিবেশ করেছেন। সিডিশন কমিটির রিপোর্টে বলা হয়েছে—১৯০২ সালে বারীন্দ্র কুমার ঘোষ নামের এক বাঙ্গালী তরুণ বরোদা থেকে

কলকাতায় এসে পৌঁছান। বরোদায় তিনি তাঁর ভাই ও গাইকোয়ার কলেজের ভাইসপ্রিন্সিপাল অরবিন্দ ঘোষের কাছে থাকতেন। আসলে অরবিন্দর নির্দ্দেশেই বারীন্দ্র কলকাতায় আসেন এবং বাংলার নানাস্থানে ভ্রমণ করেন। শেষে আবার বরোদায় ফিরে যান। ১৯০৮ সালে আলিপুরে ম্যাজিষ্ট্রেটের সামনে আসামী বারীন বলেন—"আমি আবার বাংলায় ফিরি, উদ্দেশ্য স্বাধীনতার কথাকে প্রচার করা। আমি, বন্ধু অবিনাশ ভট্টাচার্য ও ভুপেন্দ্রনাথ দত্তর সহযোগিতায় যুগান্তর পত্রিকা চালু করি। ১৯০৭ সালের প্রথম দিকেই আমি ১৪/১৫জন যুবককে এক করে তাদেরকে ধর্ম্ম ও রাজনীতিতে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করি। আমরা এক বিপ্লবের স্বপ্ন দেখতাম এবং তার জন্যে তৈরী থাকার চেষ্টা করেছি। এর জন্যে কিছু কিছু অস্ত্রশস্ত্রও সংগ্রহ করেছি। সবশুদ্ধ আমি এগারোটা রিভলভার, চারটে রাইফেল, একটি বন্দুক পেয়েছি। আমাদের দলের অন্যান্য যুবকের মধ্যে উল্লাসকর দত্তও ছিলেন। তিনি বোমা তৈরী করার পদ্ধতি জানতেন। ...তাঁর সহায়তায় আমরা ৩২ মুরারীপুকুর রোডে অল্প অল্প বিস্ফোরক পদার্থ তৈরী করতে আরম্ভ করি।.. ... আমি ও উপেন্দ্র এই যুবকদের ধর্ম্ম ও রাজনীতিতে শিক্ষা দিয়ে থাকি।"

এই রিপোর্টেই বলা হয়েছে যে, বাংলার অশান্ত পরিবেশে আরও অশান্তি ও অস্থিরতা সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন বারীন ও তাঁর সহকর্ম্মীরা। বরোদা থেকে অরবিন্দ ঘোষ এসে তাঁদের সঙ্গে যোগ দিলেন। এই দুই ভাই (অরবিন্দ ও বারীন) তাঁদের অনুগামীদের সহযোগিতায় কয়েকটি পত্রিকা বার করলেন। তার মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক হলো বাংলা 'যুগান্তর'। এই পত্রিকার নীতি ও নির্দ্দেশ সম্পর্কে চিফ্ জাষ্টিস স্যর লরেন্স জেঙ্কিন্‌স্-এর মন্তব্য—"এতে রয়েছে ব্রিটিশ জাতির প্রতি তীব্র ঘৃণার সৃষ্টি, প্রত্যেকটি পংক্তিতে বিদ্রোহের ঘোষণা। এতে বলা হয়েছে, কিভাবে বিপ্লব ঘটাতে হবে।......"

রাশিয়ান বিপ্লবীদের অনুসরণ করে এদেশে সৈন্য-বাহিনীতে বিপ্লবের বীজ ছড়াতে হবে, একথাও যুগান্তরেই বলা হয়েছিল।

বাংলায় বিপ্লব আন্দোলন—বারীন ম্যাজিষ্ট্রেটের সামনে যে বিবৃতিই দিন—ইতিমধ্যে সুসংহত হয়ে উঠেছিল। অনুশীলন ও যুগান্তর-এর অনুগত যুবকের সংখ্যা কয়েকজন নয়, কয়েক হাজার। বিপ্লব সংগঠনের এই দ্রুত প্রসার এবং জাতীয়তাবাদের উদ্বোধন ঘটেছিল কিন্তু কার্জনের জন্যই। ১৯০৫ সালের বাংলাবিভাগ শুধু বাঙ্গালী নয়, ভারতবাসীর মনেই প্রচণ্ড বিক্ষোভ এনেছিল। অরবিন্দ তখনও রাজনীতিতে পুরোপুরি জড়াননি। বরোদা থেকেই বেনামে পুস্তিকা লিখে পাঠিয়েছিলেন—no compromise অর্থাৎ "আপোষ নয়"। কারণ লর্ড কার্জন যেন ভগবদ্-প্রেরিত হয়ে সুযোগ এনে দিয়েছেন। দেশবিভাগের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড প্রতিবাদ যে সংহতির সৃষ্টি করল সর্ব্বশ্রেণীর মানুষের মধ্যে যে দেশাত্মবোধ এনে দিল, তা অভুতপূর্ব্ব।

১৯০৬ সালেই অরবিন্দ বরোদার চাকরি ছেড়ে দিয়ে কলকাতায় চলে এলেন। আর এই সময়েই বিপিনচন্দ্র পাল ইংরাজী দৈনিক পত্রিকা 'বন্দে মাতরম্-এর প্রতিষ্ঠা করলেন। তিনি পত্রিকা সম্পাদনার কাজে অরবিন্দর সহায়তা চাইলেন।

তখন পর্য্যন্ত জাতীয় কংগ্রেসের কোন নেতাই ভাবেননি যে, ব্রিটিশ শাসনকে পুরোপুরি সরিয়ে দিয়ে স্বাধীন ও সার্বভৌম ভারতের প্রতিষ্ঠাই আমাদের আদর্শ। অরবিন্দ ঘোষণা করলেন 'বন্দেমাতরম' এর পৃষ্ঠায়—আমরা চাই পূর্ণ স্বাধীনতা, যার মধ্যে বিদেশী নিয়ন্ত্রণ আদৌ থাকবে না। ১৯০৭ সালের ২৬ এপ্রিল তারিখের একটি প্রবন্ধে লিখলেন—*

"The new movement is not primarily a protest against bad government,—it is a protest against the continuance of British control;

* The Liberation Sisir Kumar Mitra

whether that control is used well or ill, justly or unjustly........."

'বন্দেমাতরম্'-এর পৃষ্ঠায় স্বাধীনতালাভের উপায় হিসাবে অরবিন্দ বললেন—স্বদেশী, বয়কট এবং নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ-এর পথেই আমরা এই গভর্ণমেন্টকে অচল করে তুলব। তিনি লিখলেন, আমাদের আদর্শ স্বরাজ অর্থাৎ পূর্ণ স্বাধীনতা।

জাতীয়তাবাদের উদ্দেশ্য নিরূপন করতে গিয়ে অরবিন্দ লিখলেন—

"To recover Indian thought, Indian character, Indian perceptions, Indian greatness, and to solve the problems that perplex the world in an Indian spirit and from the Indian standpoint, this in one view is the mission of Nationalism."

নরমপন্থী ও ইংরেজ-ভক্ত কিছু নেতা বলতে চেয়েছিলেন যে, আমাদের দেশ এখনও স্বাধীনতালাভের যোগ্য হতে পারেনি। তাঁদের উদ্দেশে অরবিন্দর ভাষণ—

"Liberty alone makes a nation fit for liberty .no nation can be fit for liberty unless it is free ; none can be wholly capable of self-government, unless it governs itself."

" Our ideal is that of Swaraj or absolute autonomy free from foreign control."

স্বাধীনতা অর্জ্জনের জন্যে তাই অরবিন্দ গুপ্তবিপ্লবের পথ গ্রহণ করলেন। আন্দোলন পরিচালনার জন্য ডাকাতি করে অর্থসংগ্রহ করার প্রস্তাবও তিনি সমর্থন করেছেন।* মজঃফরপুরে কিংসফোর্ডকে হত্যা করতে ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকী রওনা হলেন, এর পিছনে ছিল দলের গোপন কর্ম্মসমিতির নির্দেশ। এই সমিতিতে ছিলেন রাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিক, চারুচন্দ্র দত্ত, (আই সি এস) ও অরবিন্দ।** তাই আলিপুর বোমার মামলায় নরেন গোঁসাই যখন রাজসাক্ষী হয়ে যায়, তখন অরবিন্দকে বাঁচাবার জন্যই কানাইলাল ও সত্যেন বোস তাকে গুলি করে মারে।

আলিপুর জেলের মধ্যেই অরবিন্দর চেতনায় অধ্যাত্মবাদ প্রবল হয়ে ওঠে। মুক্তি পাওয়ার পরে উত্তরপাড়ার এক জনসমাবেশে তিনি বলেছিলেন—"তুমি জানো, যে, আমি মুক্তি চাই না। অন্য সকলে যাহা চায়, তেমন কিছু আমি চাই না। আমি শুধু শক্তি চাই, যে শক্তি দিয়ে আমার জাতিকে আমি তুলে ধরতে পারব।"

* নলিনী কিশোর গুহ—বাংলায় বিপ্লববাদ। পৃঃ ৯৩

** গঙ্গানারায়ণ চন্দ্র—অবিস্মরণীয় ভারত। পৃঃ ১৫

স্মৃতির শেষ পাতায়

শ্রীদিলীপকুমার রায়

ছয়

বলছিলাম আমার বৈরাগ্যের কথা।

বাইরে থেকে দেখলে কেউ ধরতে পারত না আমার মনের উদাসী ভাব। এমনকি বন্ধুদের কারেও আমি বলতাম না আমার মন থেকে থেকে কেন উড়ুকু হ'তে চায় মাটির মায়া কাটিয়ে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একটি নির্দেশ আমার মনে গেঁথে গিয়েছিল: "ধ্যান করবে—মনে কোণে বনে।" অর্থাৎ মন্ত্রগুপ্তি—বাইরের লোক যত কম জানে অন্তরের উর্ধ্বচারণী অভীপ্সার কথা ততই ভালো। কারণ প্রার্থনার ফলে উপর থেকে কৃপার যে সাড়া আসে সে থিতিয়ে যায় নির্জনতায়, প্রগল্‌ভতায় এ-প্রাপ্তির রংচং ফিকে হয়ে আসেই আসে।

আমি তাই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একটি ছবির সামনে রোজ সকাল সন্ধ্যা ধ্যান করতাম ও প্রার্থনা করতাম যেন বিবাহ না করি, যেন মনে রাখি তাঁর মহাবাক্য যে, ঈশ্বর দর্শনই মানবজীবনের শেষ লক্ষ্য। সংসারে যতবার আশাভঙ্গ স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে ততবারই এই বিবাগী সুরের কাছে হাত পেতেছি সান্ত্বনার জন্যে: অর্থাৎ কী আসে যায় এ ও তা না পেলে—চাইতে হবে শুধু সেই পরম পদ যার নাম জীবন্মুক্তি—যার প্রসাদে প্রাপ্তি অপ্রাপ্তিও এগিয়ে দেয় বিকাশের দিকে। গীতার একটি শ্লোক আমার মন আদরেই বরণ করে নিয়েছিল এই সময়ে (ঠিক বিলেত যাত্রার আগে)

যং লব্‌ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্‌ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে॥

এমন পরম লাভ চাই—যার পরে মন কিছু চায় না আর, এমন স্থিতি—যে দুঃখদাহের পরেও বিরাজে নির্বিকার।

কিন্তু বিলেতে পা দেবার আগে জাহাজেই ঘা খেলাম—যার ফলে আরো উপলব্ধি করলাম—হাড়ে হাড়ে—নির্বিকার থাকা কত কঠিন। ঘটনাটির কথা আমার "এক হয় আর" উপন্যাসে বলেছি ভাবি তবু ফের বলি এ আত্মকথার ভূমিকায়।

আমি কলকাতা থেকে "খংগোয়া" নামে একটি জাহাজে উঠি ও মাস খানেক বাদে পৌঁছই লণ্ডনে। জাহাজে উঠে সে কী যন্ত্রণা—বিষাদ; কোথায় চলেছি অন্তহীন জলের দুঃসহ মরুপার হ'তে? যে পরম পাওয়ার স্বপ্ন দেখেছি, বিদেশে তো সে "মনের মানুষ কাঁচা সোনা"-কে মিলবে না, মিলতে পারে না। তার জন্যে চাই ভারতের পুণ্যভূমির আবহ। আমাদের হাজারো অবনতি হয়েছে মেনেও আমার এ বিশ্বাস কোনোদিনই টলে নি (যে কথা স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন তাঁর বিখ্যাত কলম্বো ভাষণে) যে, ভারত পুণ্যভূমি। সুভাষও একথা বলত উঠতে বসতে। জাহাজে "সী-সিক" হ'য়ে মন আমার যেন আরো বৈরাগী হ'য়ে উঠল। কেবল মনে পড়ত শ্রীমার মধুর মূর্তি, স্বামী ব্রহ্মানন্দের দিব্যকান্তি, শ্রীমা সারদামণির স্নিগ্ধ আশীর্বাদী বাণী: "ঠাকুরকে যে ছেলেবেলাই মনে মনে বরণ করেছে বাবা, সে ভাগ্যবান্‌—কারণ ঠাকুর তার হাত ধ'রে চালাবেন।" অতুলপ্রসাদের একটি গানও মনে পড়ত:

আমারে এ আঁধারে এমন করে চালায় কে গো?
আমি দেখতে নারি, ধরতে নারি, বুঝতে নারি
কিছুই যে গো।

মনে হ'ত—অলক্ষ্য ভগবতী কৃপা যখন আমাকে চালাচ্ছে তখন কেন আমি ছুটেছি সাত সমুদ্র পারে—কী পাব সেখানে যাতে মন ভরতে পারে? এ একটুও বাড়িয়ে বলা নয় যে, কেবলই মনে হ'ত ফিরে যাই এডেন থেকে। শুধু আমাকে সেন্টিমেন্টাল অথমা দিয়ে

লোকে হাসবে—এই প্রায়ই আমি দুরন্ত মনকে বশে আনতে পেরেছিলাম, এ দুঃসহ নিঃসঙ্গতার মধ্যেও ধৈর্য্য ধরে ছিলাম অনাগতকে বরণ করে। একটি চিন্তা কেবল মনকে আমার আশ্বাস দিত: সুভাষ বলেছিল আমাকে, সে-ও কেম্ব্রিজে আমার সঙ্গে যোগ দেবে।

নিঃসঙ্গতা বলে নিঃসঙ্গতা। আমার কেবিনে একটি আইরিশ সহযাত্রী কেবল আমার সঙ্গে কথা কইতেন। আর সব যাত্রী—সাহেব ও মেম—আমার দিকে ফিরেও তাকাত না।

এই সময়ে দুটি ইংরেজ শিশু আমার কাছে আসত ও অনর্গল গল্প করত। আমি তাদের চকলেট বা টফি দিলে তারা আহ্লাদে আটখানা হয়ে আমার গলা জড়িয়ে কোলে বসত।

মনে শান্তি না হোক, কিছুটা সান্ত্বনার রস পেলাম এই দুটি সরল শিশুর স্নেহসঙ্গে। সত্যি মনে হত যেন দেবতা পাঠিয়ে দিলেন দু-দুটি দেবদূতকে আমার ক্লিষ্ট মনের ব্যথাভার লাঘব করতে। ঠিক এই আলোর লগ্নেই শুধু মেঘ ছাওয়া নয়, পড়ল বাজ। একদিন সে শিশুদুটি ডেক-এ আমাকে দেখেই পালিয়ে গেল। আমি ছুটে গিয়ে তাদের ধরতেই তারা চেঁচিয়ে বলে উঠল: "ছাড়্। নেটিভ কোথাকার!"

বুঝতে বাকি রইল না কার কাছে তারা এ নবপাঠের দীক্ষা পেয়েছিল। ফলে ফের মন ভারি হয়ে উঠল বৈরাগ্যের চাপে। মনে পড়ত নানা বৈরাগ্যের গান, যেমন:

এমনি মহামায়ার মায়া—রেখেছে কী কুহক করে।
গাতায়াতের পথ আছে, তবু মীন পালাতে নারে।

বা রামপ্রসাদের

মন তুমি কৃষিকাজ জানো না
এমন মানব জমি রইল পতিত, আবাদ করলে ফলত সোনা।

বা রজনীকান্তের

কোলের ছেলে ধুলো ঝেড়ে তুলে নে কোলে।
ফেলিস নে মা, ধুলো কাদা মেখেছি বলে।

জীবন যখন কথা দিয়েও কথা রাখে না তখন মানুষ আরো জীবনের নিয়ন্তার কাছে সান্ত্বনার জন্যে হাত পাতে, কে না জানে?

সাত

বিলেতে গিয়ে যা দেখলাম তাতে কী ভাবে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে উঠলাম স্মৃতিচারণে কিছু লিখেছি। এ শেষ অধ্যায়ে সে সবের পুনরুক্তিকে পাশ কাটিয়ে লক্ষ্যমুখী থাকতে হবে—অর্থাৎ লিখতে হবে আমার মন সেখানকার সাংঘাতিক চঞ্চলতার মধ্যেও থেকে থেকে কী ভাবে পারের পারানি জোটাত।

তাই বলি সাধু সুন্দর সিং-এর কথা। তাঁর কথা যদিও আমার "ছায়াপথের পথিক" রমন্যাসে কিছু লিখেছি তবু তাঁকে বাদ দেওয়া চলবে না, কেননা সে-চঞ্চল উদ্‌ভ্রান্তির দুর্লগনে এ-মহাজনটি আমার কাছে এসেছিলেন যেন আমাকে মনে করিয়ে দিতে আমার স্বধর্মের কথা। এর আগে কলকাতায় এসেছিলেন কুমারনাথ তান্ত্রিক, এবার কেম্ব্রিজে এলেন সুন্দর সিং খৃষ্টদুলাল। তারপরে তাঁর সম্বন্ধে দু-দুটি জীবনী পড়ি। তিনি মুখেও আমাকে বলেন অনেক কিছু—বিশেষ করে, কীভাবে তিনি মরতে মরতে বেঁচে গিয়েছিলেন খৃষ্টের কৃপায়—যার অস্তিত্ব তিনি অন্তরে উপলব্ধি করেছিলেন এক অঘটনের মাধ্যমে। বলি—কীভাবে খৃষ্ট তাঁর কাছে এসে তাঁকে আপন করে নিয়েছিলেন চক্ষের নিমেষে। অঘটন আজও ঘটে—বিশেষ করে সাধকদের জীবনে, কিন্তু এরকম অভাবনীয় অঘটন ঘটে কালে ভদ্রে।

কেম্ব্রিজে আমার ঘরে এই দীর্ঘকায় আলখেল্লা পরা সৌম্য মহাত্মা উদিত হয়েছিলেন কেন মনে পড়ছে না। সম্ভবত আমার মুখে হিন্দি ভজন শুনবার আগ্রহ হয়েছিল। ভজন শুনে তিনি প্রসন্ন হয়ে আশীর্বাদ করেছিলেন এমন সহজিয়া ছন্দে যে তাঁকে নানা প্রশ্নবাণে উদ্ব্যস্ত করাও আমার পক্ষে সহজ হয়ে এসেছিল—আরও এই জন্যে যে, তিনি নিজের সাধনার কথা গোপন রাখতে চাইবেন না—অন্ততঃ আমার কাছে তো চান নি।

আমি তাঁর কাছে যা শুনেছিলাম ও পরে তাঁর দুটি জীবন চরিতে পড়েছিলাম তার চুম্বকটি এখানে পেশ করি।*

সাধু সুন্দর সিং জন্মেছিলেন ১৮৮৯ সালে এক গোঁড়া শিখ পরিবারে যেখানে "গুরুগ্রন্থ" ছিল একমাত্র গুরু—নিত্যপাঠ হ'ত এই মহাগ্রন্থের। সাধু সুন্দর সিং-কে পাঠানো হয়েছিল একটি খৃষ্টান মিশনারি স্কুলে। আশৈশব জিজ্ঞাসু এই মহাজন হিন্দুদের যোগসাধনায় ও দীক্ষা নিয়েছিলেন শান্তির গভীর তৃষ্ণায়। কিন্তু শান্তি পেলেন না কোন প্রক্রিয়ায়ই। ফলে স্কুলপাঠ্য বাইবেলে তাঁর ঘোর বিদ্বেষ জন্মাল। "আমরা শিখ, গুরুগ্রন্থই আমাদের উপাস্য, বাইবেল পড়ব কি দুঃখে?" দুঃখ-অশান্তির, কিন্তু বাইবেলে শান্তি মিলল কই? শেষে উত্ত্যক্ত হয়ে বাইবেলকেই যত নষ্টের মূল সাব্যস্ত করে তার উপর কেরোসিন তেল ঢেলে পুড়িয়ে ফেললেন তাঁর পিতৃদেবের চোখের সামনে। পিতা পুত্রকে রুখতে চেষ্টা করে হার মানলেন সদুঃখে। অতঃপর—(তাঁর নিজের ভাষায়ই বলি, মিসেস পার্কারের জীবনী থেকে অনূদিত):

"বাইবেল পুড়িয়ে আমি আরো অশান্ত হয়ে স্থির করলাম আত্মহত্যা করাই পন্থা। তিন দিন বাদে ভোর রাত তিনটেয় ঠাণ্ডা জলে স্নান করে আমি প্রার্থনায় বসলাম: যদি ভগবান্ সত্যি থাকেন তিনি আমাকে দিন মুক্তির দিশা; নৈলে আমি ট্রেনের সামনে প'ড়ে আত্মঘাতী হব। অকস্মাৎ সাড়ে চারটের সময় খৃষ্টদেবের আবির্ভাব। তিনি বললেন, "কেন তুমি আমাকে দুঃখ দিচ্ছ? আমি ক্রসে ঝুলেছিলাম তোমাদের জন্যেই তো, যাতে করে জগৎ মুক্তিস্বাদ পায়।" তাঁর এই তিরস্কার আমার অন্তরে ঝিকিয়ে উঠল বিদ্যুতের মতন। সঙ্গে সঙ্গে মনে আনন্দ নিটোল হয়ে উঠল—আমার রূপান্তর হল চিরদিনের জন্যে। অন্তর্হিত হবার পর পরমা শান্তি আমার মধ্যে নামল—যার নাম চিরন্তনী। এ কল্পনা নয়। যদি বুদ্ধ বা কৃষ্ণ আসতেন তবে সে আবির্ভাব কল্পনা হলেও হতে পারত, কিন্তু খৃষ্ট—যাঁর বিদ্বেষ আমাকে উদ্দীপ্ত করেছিল তিনি এলেন এভাবে, একে অঘটন—miracle—ছাড়া কী বলব। এ স্বপ্নও নয়—বিপর্যয় ঠাণ্ডায় ভোর রাতে বরফশীতল জলে স্নানের পরে কেউ স্বপ্ন দেখতে পারে না—এমন স্বপ্ন যা আমার সমগ্র সত্তাকে যেন ঢেলে সাজলো। এর শুধু একটিমাত্র নাম দেওয়া যায়—মহনীয় বাস্তব সত্য—"a Great Reality।"

ইতিপূর্বে আমি আত্মিক শান্তি সম্বন্ধে পড়েছিলাম কত কী। শুধু পড়া না, নানা অশান্ত চিত্তবিক্ষেপের যন্ত্রণায় প্রার্থনা করেছি দিনের পর দিন শান্তির জন্যে। কলকাতায় আমাদের "সুরধাম"-এর ছাদে একটি কাঠের ছোট্ট কুঠরি বানিয়ে সামনে পর্দা টেনে প্রার্থনা করতাম কৃষ্ণের বা জগন্মাতার কাছে। আমার ইষ্ট বরাবরই এই যুগল মূর্ত্তি: কৃষ্ণ কালী। সময়ে সময়ে—মনে পড়ে স্পষ্ট—নামত শান্তির ধারা—মূর্ধা থেকে। তার স্পর্শে সমস্ত দেহ মন যেন জুড়িয়ে যেত। কিন্তু এ শান্তি স্থায়ী হত না। সুন্দর সিং আমাকে বলেছিলেন শান্তি তাঁর মনে নেমেছিল বরাবরের জন্যে—চিরসাথীর মতন তাঁর সঙ্গে সঙ্গে চলত। এহেন আশ্চর্য অনুভূতি যাকে বলা যায় চিরস্থায়ী—খুব কম সাধকেরই হয়। শ্রীঅরবিন্দের কাছে শুনেছি, যোগের প্রধান (major) উপলব্ধিগুলি স্ফুট হয়ে ওঠে না বারো বৎসর সাধনার আগে। পরম ভাগবত শ্রীরামদাস সন্ন্যাস নেবার পরে পরিব্রাজক জীবনে পরমানন্দেই কাল কাটাতেন বটে। কিন্তু তাঁরও থেকে থেকে অশান্তি আসত। "এলে কী করতেন?" আমার এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছিলেন: "যেতাম চ'লে কোন নির্জন গুহায় বা শিখরে—আরো একমনে জপ করতাম 'শ্রীরাম জয় রাম জয় জয় রাম'। শ্রীমৎ রামদাস ছিলেন জন্মসিদ্ধ সাধু, জপসিদ্ধ। কিন্তু তিনিও একটানা শান্তির স্বাদ পাননি—বহুলাভের

* যাঁরা এ-মহাত্মা খৃষ্টবানীবাহের সম্বন্ধে জানতে চান তারা পড়তে পারেন মিসেস আর্থার পার্কার এর লেখা Sadhu Sundar Singh (Christian Literature Society.

আগে। সুন্দর সিং-এর যুগপৎ দর্শন তথা শান্তির উপলব্ধিকে তাই অনন্য বলা চলে। তবে তারপরে আরো অনেক মহাজনের সাধনায় হয়তো এই চিরস্থায়ী শান্তি নেমে থাকবে দুচার মাস সাধনার পরে। সাধনার নানা স্তরে নানা বিচিত্র উপলব্ধির কতটুকুই বা আমি জানি? নিজের সাধনা নিয়েই অস্থির—তা অপরের সাধনার মর্মজ্ঞ হব কি করে?

মরুক গে। সাধু সুন্দর সিং-এর মুখে তাঁর নানা আশ্চর্য উপলব্ধির কথা শুনতে শুনতে মন আমার ফের বিবাদী হয়ে গিয়েছিল সুদূর সাগরপারে কর্মময় ধ্বনিময় সংবাদময়; বিলেতে—এই-ই ছিল আমার পরম লাভ। মূল বক্তব্য এ সম্পর্কে।

না। আরো একটি লাভের কথা না বললেই নয়—বিশেষ করে এই জন্যে যে পরে যখন আমার জীবনেও অঘটনের শোভাযাত্রা শুরু হয় তখন সাধুজির দুটী অভাবনীয় অভিজ্ঞতার কথা বারবার মনে হত—যার বিলিতি নাম মিরাক্ল।

অঘটন যে সাধুর জীবনে ঘটে এ আমার অজানা ছিল না। বিলেত থেকে ফিরে শ্রীবরদাচরণ মজুমদারের সান্নিধ্যে আমি প্রথম চাক্ষুষ করি অকাট্য অঘটন—যার কথা স্মৃতিচারণে পেশ করেছি। কিন্তু ১৯২০ সালে যখন সাধু সুন্দর সিং প্রথম ইংলণ্ডে আসেন তখন আমি উৎসুক জিজ্ঞাসু হলেও অঘটন সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানতাম না ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায়। তাই সাধুজির অঘটন দুটির কথা একটু বলি।

এ-বর্তমান অবিশ্বাসের যুগে হয়ত অনেক স্বভাব-সন্দেহী বিশ্বাস করবেন না। না-ই করলেন—সত্যের আলো তো আর তাঁদের অবিশ্বাসের ছায়ায় কালো হয়ে যাবে না? এ অঘটন দুটির কাহিনী শ্রীমতী পার্কারের জীবনীতে বিশদ করে বর্ণিত হয়েছে—তাই আমি বলব যথাসম্ভব সংক্ষেপেই।

সাধু সুন্দর সিং আমায় বলেছিলেন যে তিনি খৃষ্টদেবের দর্শনের পরেই আদেশ পেয়েছিলেন তাঁর বাণীবাহ হবার। এমন শান্তি যে জীবনে পাওয়া যায় খৃষ্টদেবের কৃপায়, এ-ঘোষণা না ক'রে তাঁর উপায় ছিল না। শ্রীমতী পার্কার লিখেছেন, সাধুজির কণ্ঠে বেজে উঠেছিল বিখ্যাত খৃষ্ট স্তব:

Jesus! I my cross have taken,
  All to leave and follow thee;
Destitute, despised, forsaken,
  Thou from hence my All shalt be.

তোমার ক্রসের বাণীবাহ আজ হয়েছি আমি,
  ছাড়ি' ধনজন তোমারই করি অনুসরণ;
দিবে ধিক্কার সর্বহারায়ে সকলে স্বামী,
  তবু তোমারেই করিব কেবল প্রাণে বরণ।

খৃষ্টধর্মে দারিদ্র্য-রূপ ক্রস বহন করার দাম খুব বেশী। অর্থাৎ, কৃচ্ছ্রসাধন—দেহসুখস্পৃহাকে বাতিল করে। আনন্দের পথে সমতার আলোয় যে পরা ভক্তি ও প্রজ্ঞা লাভ হতে পারে শ্রেষ্ঠ খৃষ্টানদের মধ্যে অনেকেই মানেন না। সাধু সুন্দর সিং হয়ত কৃচ্ছ্রব্রতী বলতে যা বোঝায় তা ছিলেন না। স্বভাবে ছিলেন সহজিয়াই বলব। কিন্তু খৃষ্টের বাণী দুর্গম তিব্বতেও প্রচার করার প্রেরণা পেয়েছিলেন ইষ্টদেবেরই প্রেরণায় এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। কারণ অন্তরে এ-প্রত্যাদেশ না পেলে কেউ কোনো ধর্মের উদ্গাতা হতে উন্মুখ হয়ে ওঠেন না যেমন উঠেছিলেন এ পরম ভাগবত। তাই যে সব দেশে খৃষ্টের বাণী পৌঁছয় নি সেসব দেশ দুর্গম ও নিরাপদ নয় জেনেও তিনি গিয়েছিলেন হিমালয়ের দুর্গমতম উপত্যকায় তিব্বতে। সেখানে খৃষ্টধর্ম প্রচার করতে তাঁকে শুধু যে বেগ পেতে হয়েছিল তাই নয়, তিব্বতীদের উপহাস, ধিক্কার ক্রোধ ও, সর্বোপরি, বিদ্বেষকেও তিনি বরণ করেছিলেন দৈবপ্রেরিত বাধা ব'লে যাকে অতিক্রম না করলেই নয়। এ জন্যে তাঁকে বার বার মরণের দেহলিতে পৌঁছতে হয়েছিল কিন্তু—ঠিক সেই জন্যেই তাঁর ক্ষতিপূরণ মিলেছিল ত্রাতা খৃষ্টের অভয় করস্পর্শে—যার উপনাম অঘটন, মিরাক্ল। দুটি অঘটনের কথা এখানে সংক্ষেপে পেশ করব—তাঁর ধৈর্য সাহস ও আত্মনিবেদনের পরিচয় দিতে। (এ-দুটি কাহিনীর বিশদ বিবৃতি মিসেস পার্কারের জীবনীতে দ্রষ্টব্য।)

সাধু সুন্দর সিং বললেন : "আমি খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেছি বলতে না বলতে সে কী কাণ্ড! মায়ের-কান্না, বাপের ক্রোধ, আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবের ধিক্কার—সে সব অনুমান করতে পারবে সহজেই। আমাকে পিতৃদেব তাড়িয়ে দিলেন ত্যাজ্যপুত্র করে। কিন্তু আমি ভয় পাই নি। স্বয়ং খৃষ্টদেব আমাকে ধারণ করে ছিলেন,ভয় আসবে কোন্ পথ দিয়ে।"

তারপর শুরু হ'ল তাঁর পদযাত্রা। পাঞ্জাব কাশ্মীর আফগানিস্তান বেলুচিস্থান হ'য়ে তিনি পৌঁছলেন তিব্বতে—পদযাত্রা বলে পদযাত্রা—খালি পায়ে তিব্বতের মতন বরফের দেশে। ভাগবতী কৃপার শক্তি বিনা কে পারে অসাধ্যসাধন করতে?

কিন্তু তিব্বতীরা রেগে আগুন : খৃষ্টধর্ম্ম—বলে কী এ উন্মাদ! কিন্তু তিনি সমানে প্রচার করে চললেন খৃষ্টবাণী। শেষে রসার-এর লামার সামনে তাঁর বিচারে লামা দিলেন তাঁকে প্রাণদণ্ড; তাঁকে ফেলে দেওয়া হ'ল এক শুকন কুয়োয় যেখানে নানা পচা মৃতদেহের পূতিগন্ধে সাধুজি অস্থির হ'য়ে ডাকলেন (বাইবেলের ভাষায়) "ভগবান্! আমাকে কেন তুমি ত্যাগ করলে? কী অপরাধে?"

কুয়োটির মুখে ছিল মস্ত তালালাগানো ঢাকনি। উঠবেনই বা কেমন ক'রে? তৃতীয় দিনে যখন তিনি প্রার্থনা শুরু করেছেন তখন মনের কোণে এক টুকরোও আশার আলো নেই। এমন সময়ে হঠাৎ তিনি শুনলেন কুয়োর ঢাকনির তালা খোলার শব্দ। তারপরই নেমে এল একটি দড়ি। তিনি দড়ি ধরে কুয়োর পাড়ে উঠে দেখেন—কী আশ্চর্য—কেউ কোথাও নেই। তিনি টলতে টলতে ফিরে তিব্বতীদের নানা সংঘে ফের প্রচার শুরু করলেন। লোকে চমকে উঠল : এ কি ভূত নাকি? সে কুয়ো থেকে তো কেউ কোনদিন বেঁচে ফেরে নি।

যথাকালে লামার কাছে পৌঁছল দুঃসংবাদ যে, সে খৃষ্টান পাদ্রীর ভূত ফিরে এসে ভাষণ দিচ্ছে সমানে। লামা ক্ষেপে উঠলেন—কেউ নিশ্চয় তাঁর চাবি চুরি করে এ-দুর্দান্ত পাদ্রীকে মুক্তি দিয়েছে। খোঁজ খোঁজ—চাবি কোথায়? শেষে চমকে উঠলেন নিজের কোমরবন্ধে চাবিটি ঝুলছে দেখে। সঙ্গে সঙ্গে দারুণ ভয় তাঁকে পেয়ে বসল—খৃষ্টান পাদ্রীকে তিনি লোকলস্কর দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন শহরের বাইরে—নৈলে না জানি কি বিপদ ঘটবে—পাদ্রী তো ভূত হতেও পারে।

* * * * *

দ্বিতীয় অঘটনটি আরো চমকপ্রদ। খৃষ্টদেব বলেছেন, "খৃষ্টদেবের জন্যে যে প্রাণ দেবে সে পাবে নতুন আয়ু।"* এ যে কথার কথা নয় সাধুজি একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে প্রমাণ করতে চাইতেন সর্বত্র। ব্যাপারটা এই :

একদা তিনি তাঁর এক সহযাত্রীর সঙ্গে তিব্বতে সাংঘাতিক শীতে বাধ্য হয়ে কয়েক মাইল দূরে লোকালয়ের আশ্রয় নিতে চলেছিলেন। ঠাণ্ডায় অঙ্গ অবশ। তবু না চললে নিশ্চিত মৃত্যু। মাঝপথে হঠাৎ এক নিঃসঙ্গ মুমূর্ষু। সাধুজি সঙ্গীকে বললেন, একে তো ফেলে যাওয়া চলে না, চলো দুজনে মিলে কোনমতে নিয়ে তুলি কোন কুটীরে। সঙ্গী বিরক্ত হয়ে "না" বলে এগিয়ে চললেন নিজের প্রাণ বাঁচাতে। সাধুজি অগত্যা মুমূর্ষুকে পিঠে করে কোন মতে চললেন ইষ্টনাম জপতে জপতে। একটু বাদে—কী আশ্চর্য—এই পরিশ্রমে তাঁর নিজের ঠাণ্ডায় অবশ অঙ্গে কিঞ্চিৎ তাপ এসে উপস্থিত হ'ল মুমূর্ষুও হ'ল সে তাপের শরিক। ফলে দুজনেই বেঁচে গেলেন। কেবল পথের মাঝে সাধুজির সহযাত্রীটির মৃতদেহ তাঁদের চোখে পড়ল। নিজের প্রাণ বাঁচাতে যে পরকে পাশ কাটিয়েছিল সে-ই মরল অপঘাতে, আর বাঁচল সে-ই যে পরকে বাঁচাতে গিয়ে নিজের প্রাণকে পণ করেছিল। নবীন আয়ু এল না কি নবীন পথে? সাধুজি বলতেন হেসে নানা শ্রোতৃ-সংঘে। ইংরেজীতে একটি প্রবচনে আছে : "Truth is stranger than fiction।" এ সত্যটিকে আমিও আমার জীবনে উপলব্ধি করেছি বারবার—কেবল সেই সঙ্গে জুড়ে দিতে চাই—এ চমক জাগার কোন মানসিক শক্ত নয়, এখানে নাট্যকার—ভগবান্ আর তাঁর প্রতিনিধি—ভাগবতী কৃপা।

---

* He that loseth his life for my sake shall find it...St. Matthew (New Testament.)

আমার ইউরোপ ভ্রমণ

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়

(১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত গ্রন্থের মূল ইংরেজী হইতে অনুবাদ : পরিমল গোস্বামী)

ভিয়েনা এবং ইউরোপের অন্যান্য স্থানে আমার সর্বাপেক্ষা অধিক যাহা মনোহরণ করিয়াছে তাহা এই যে এই সব দেশের গভর্মেণ্ট বিদেশে ব্যবহারের উপযোগী নানা জিনিষ উৎপাদনের জন্য নিজ নিজ দেশের লোকদিগকে অবিরাম উৎসাহ দিয়া চলিয়াছেন। ভিয়েনাতেও বহু জিনিষ বিদেশে ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত করা হয়। পৃথিবীর সর্বত্র অস্ট্রিয়ার কনসাল রহিয়াছেন তাঁহারা সেই সব দেশের প্রয়োজন কি, চাহিদা কত, কি মূল্য, শুল্ক কি পরিমাণ, ইত্যাদি যাবতীয় সংবাদ নিয়মিত দেশের গভর্মেণ্টের নিকট পাঠাইয়া থাকেন। এই সব সংবাদ সাপ্তাহিক সার্কুলারে মুদ্রিত হয়। ইহার সম্পাদনা করেন এম. এ. দ. স্কালা। দূতাবাসগুলি হইতে নানা নমুনাও পাঠান হইয়া থাকে, যাহাতে তাহার অনুকরণে সেই সব প্রস্তুত হইতে পারে। এ চেষ্টা তাঁহাদের ব্যর্থ হয় নাই। জার্মানির প্রস্তুত শুধু যে ইউরোপ হইতেই ইংল্যাণ্ডে প্রস্তুত দ্রব্যাদি উচ্ছেদ করিতেছে তাহা নহে, খাশ ইংল্যাণ্ডেও সাফল্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতা চালাইতেছে। ভারতে যে ধরনের আদিকালের উৎপাদন ব্যবস্থা চলিতেছে তাহাতে জার্মানদের পদ্ধতি এদেশে প্রবর্তন করায় কিছু লাভ হইবে না। এমন কি ইংল্যাণ্ডেও এমন কোনও কেন্দ্রীয় অফিস নাই যেখানে বসিয়া সমস্ত ব্যক্তিগত উদ্যমের সঙ্গে যুক্ত থাকিয়া সকলকে পরামর্শ ও কর্মপ্রেরণা দান করা যাইতে পারে। এসব ব্যাপারে আমরা সবেমাত্র ট্রিপোটোলেমাস ইয়েলোলির স্তরে পৌছাইতেছি মাত্র। (স্কটের দি পাইরেটস দ্রষ্টব্য।) ভিয়েনাতে অনেক বিজ্ঞানসেবীর সঙ্গে পরিচিত হইলাম, ইঁহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হের এম ক্রাইশনার, য়োয়েৎসিনা, ফিনশ, শিনডাশনের, বেক, ক্রাৎস হেগের, কার্ল আনটন, লুডাহ্বিগ, ফন লোরেনস, লিবুরনাউ এবং আউগুস্ট ফন সেল্‌ৎসাইন। ইহাদের সঙ্গে এবং কয়েকজন বণিকের সঙ্গে ভারতীয় চা ও অন্যান্য শিল্পদ্রব্য অস্ট্রিয়ায় প্রচলন করা যাইতে পারে কি না সে বিষয়ে আলোচনা করিলাম। তাঁহারা এবিষয়ে সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছেন বলিলেন।

২১ শে ডিসেম্বর সোমবার আমি ভিয়েনা ত্যাগ করিলাম। পরদিন অধিকাংশ সময় অস্ট্রিয়ান আলপস পর্বতমালা পার হইতে কাটিয়া গেল। এই পর্বতমালা দেখিতে হিমালয়ের মত কিন্তু সে রকম উচ্চ অথবা খাড়া নহে। পাহাড় হইতে বাহির হইয়াছে এমন কয়েকটি স্রোতস্বিনীর গতিপথ ধরিয়া রেলপথ চলিয়া গিয়াছে। এই সব পাহাড় উচ্চতায় ৪০০০ ফুটের বেশি নহে। আলপস পর্বত অঞ্চলের কৃষকদের অবস্থা তাহাদের ছোট ছোট কুটির দেখিয়া মনে হইল না যে খুব ভাল। হিমালয় পর্বতের ধারের কনাইত এবং কোলিদের ছোট ছোট গর্তঘরের মত ইহাদের বাসগৃহ। অপরাহ্নে আমরা ইটালির সীমান্তে পঁতেব্বা নামক একটি ইটালিয়ান শহরে আসিয়া পৌছিলাম। আলপসএর ইটালিয়ান অংশ পার হইতে আরও কিছু সময় লাগিল। তাহার পর আমরা সমতল ভূমিতে আসিয়া পৌছিলাম। ১০-৫৫টায় রাত্রি কালে আমি ভেনিসে পৌছিলাম।

আমার নির্দিষ্ট স্থানে পৌছাইবার পূর্বে কিছুক্ষণ ধরিয়া ভেনিস ও ইটালির মূল ভূখণ্ড যুক্তকারী একটি সেতুর উপর দিয়া চলিলাম। ভেনিসবাসীর ভাষায় 'টেরা ফারমা'। দুই ধারে ল্যাগুনের বা মরা সমুদ্রের

অগভীর জল, দূর আড্রিয়াটিক সমুদ্রের দিকে বিস্তৃত। এই জল, ২০০ বর্গ মাইল অধিকার করিয়া আছে। একটি প্রকৃতি-সৃষ্ট ডাইক বা এমব্যাংকমেন্ট—লিডোরাল—অধুনা লুপ্ত রাজের জমিদারিকে সমুদ্র হইতে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। কয়েকটি খাল লিডোরালকে ভাগ করিয়া দিয়াছে, জোয়ারের সময় ইহার ভিতর দিয়া নৌকা চলে এবং মরা সমুদ্র বা ল্যাগুনের মধ্যস্থ কৃত্রিম খালে প্রবেশ করে। পনের শত বৎসর পূর্বে জোয়ার আসিয়া যখন এই মরা সমুদ্রে প্রবেশ করে, সে সময় কয়েকটি ছোট ছোট দ্বীপ ইহার ভিতর হইতে মাথা তুলিয়াছিল। ইহাদের মধ্যে একটি খুব ছোট ছোট দ্বীপের গুচ্ছ ছিল। উহাই এই ভেনেৎসিয়ার জ্রূণ অবস্থা। আমাদের লক্ষ্মী যেমন সমুদ্র হইতে উত্থিত হইয়াছিলেন, এই ভেনেৎসিয়াও জল হইতে তেমনি উঠিয়া কয়েক শতাব্দী ব্যাপিয়া এশিয়া মাইনর পর্যন্ত তাহার শাসনসীমা বিস্তার করিয়াছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে এই জলাভূমিতে অবস্থিত ছোট ছোট দ্বীপগুলি মূল ভূখণ্ড হইতে আগত অগণিত পরিবারকে আশ্রয় দিয়াছে। ইহারা অ্যালারিকের পরিচালনাধীন বর্বরদের ও অ্যাটিলার হাত হইতে বাঁচিবার জন্য এখানে ছুটিয়া আসিয়াছিল। এখানে ইহাদের জীবন দীর্ঘকাল এমনই করুণ এবং শোচনীয় ভাবে কাটিতেছিল যে রোমান সাম্রাজ্য ধ্বংসকামীরাও ইহাদিগকে অনুসরণ করিবার কোনও উৎসাহ বোধ করে নাই। তাহাদের "নৌকা ভিন্ন কোনও সম্পত্তি ছিল না, মাছ ব্যতীত কোনও খাদ্য ছিল না, লবণ ভিন্ন অন্য কোনও খনিজ দ্রব্য ছিল না।" রোম একদিনে নির্মিত হয় নাই, ভেনিসও তাহাই। কয়েক শতাব্দী লাগিয়াছিল মূল ভূখণ্ডের অনেকখানি দখল করিয়া এখানে একটি শক্তিশালী সাধারণতন্ত্র গঠন করিতে। ঐ স্থানের আশ্রয়প্রার্থীদের উত্তরপুরুষগণ লেভান্টের দ্বীপগুলির উপর বিজয়পতাকা উড়াইয়া, ধর্ম অভিযান চালাইয়া, ইউরোপ ও এশিয়ার সমস্ত বাণিজ্য নিজেদের হাতে আনিয়া এমন একটি সমৃদ্ধিলাভ করিয়াছিল, যাহাতে মৃত্যুর পূর্বে 'ডোজ' (তোম্মাসো মোচেনিগো ১৪২৩ খ্রীষ্টাব্দে, তাঁহার মৃত্যু শয্যায় ঘোষণা করিতে পারিয়াছিলেন—"আমি দেশকে শান্তিপূর্ণ এবং সমৃদ্ধিশালী অবস্থায় রাখিয়া যাইতেছি। আমাদের বণিকগণ এক কোটি স্বর্ণ মুদ্রা (ডুকাট) ব্যবসায়ে খাটাইতেছে, ইহা হইতে তাহারা প্রতিবৎসর চল্লিশ লক্ষ মুদ্রা লাভ করিতেছে। আমাদের ৪৫টি গ্যালি জাহাজ আছে, ৩০০টি যুদ্ধ জাহাজ আছে, ৩০০০ বাণিজ্য জাহাজ আছে, এবং ৫২০০০ নাবিক আছে। এক হাজার উচ্চবংশের ব্যক্তি আছে, তাহাদের প্রত্যেকের আয় ৭০০ হইতে ৪০০০ ডুকাট। বড় নৌবহর পরিচালনার জন্য আটজন নৌ-অফিসার আছে, ছোট ছোট নৌবহরের জন্য অপর ১০০ জন আছে। ইহা ভিন্ন বহুসংখ্যক রাজনীতিবিদ্, আইনবিদ্ এবং অন্যান্য অভিজ্ঞ ব্যক্তি আছে।" ভেনিস ধীরে ধীরে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে, তবু তাহার এই উন্নতি নিকটস্থ কোনও প্রবল বাধা না থাকাতেই অধিক সম্ভব হইয়াছে, কারণ তাহাদের চরিত্র বল খুব বেশী ছিল না। নেপোলিয়ান বলিয়া গিয়াছেন ভেনিস-বাসীরা স্বাধীনতার জন্য সৃষ্ট হয় নাই। মিথ্যা বলেন নাই। বিচারকদের খেয়ালখুশির উপর বিচার নির্ভর করিত, এবং বেনামা চিঠির উপর নির্ভর করিয়া সাধারণ মানুষকে চরম দণ্ড দেওয়া হইত। যে কোনও ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা, গোপনে বিচার করা, ভূগর্ভস্থ কক্ষে বন্দী করা বা হত্যা করা হইত, কিন্তু কেন, তাহা জনসাধারণের জানিবার উপায় ছিল না। ভেনিস ব্যক্তিস্বাধীনতার উপর শৃঙ্খলের পর শৃঙ্খল পরাইয়াছে, অবশেষে চারিধারে শুধু শৃঙ্খল অন্য কিছু দৃশ্যমান হয় নাই। তথাপি ভেনিস সমৃদ্ধ হইয়াছে, এবং তাহার সাফল্য কয়েক শতাব্দী স্থায়ী হইয়াছে। ইউরোপে তখন অন্ধকারের যুগ, শুধু ভেনিসে আলো জ্বলিতেছিল যদিও তাহা অত্যন্ত ক্ষীণ। তাই শক্তির সঙ্গে সংঘর্ষ বাধিবার সঙ্গে সঙ্গে ভেনিস ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। জেনোয়ার রিপাবলিক তাহাকে বার বার জলযুদ্ধে পরাভূত করিয়াছে, টার্কগণ তাহাদের

দূরের যাবতীয় অধিকৃত স্থান হইতে বিতাড়িত করিয়াছে, এবং শেষকালে অস্ট্রিয়া ও ফ্রান্সের মধ্যে সে পণ্য সামগ্রীর ন্যায় ক্রীত বিক্রীত হইয়াছে।

রিয়াল্‌টোর সেতুর উপর দাঁড়াইয়া নানা চিন্তায় মাতিয়া ছিলাম। গ্র্যাণ্ড ক্যানালের উপর এই সেতুটি বিখ্যাত। একটি মাত্র স্ফটিকের খিলানের উপর দাঁড়াইয়া আছে। এই খালটিই ভেনিসের যানবাহন চলার বড় পথ। আমার দক্ষিণ দিকে রিয়ালটো—বিখ্যাত রিয়ালটো—ভেনিসের বণিক—"দি মার্চ্যান্ট অভ ভেনিস"-এ যাহার উল্লেখ আছে। অদূরে একটি ছোট্ট বাড়ি, এক মৎস্যজীবী বাস করে, আমাকে গাইড ঐ বাড়িটি দেখাইয়া বলিল, ঐখানে শাইলক দি জ্যু তাহার টাকার ভাণ্ডার রাখিত। সম্মুখের একটি উচ্চ অট্টালিকা দেখাইয়া গাইড বলিল ঐখান হইতে পথের অপর পার্শ্বে সর্বাধুনিক সংবাদ সম্বলিত বহু ছোট ছোট কাগজ নিক্ষিপ্ত হইত, পরে উহার প্রত্যেকখানি এক 'গাৎসেত্তা' মূল্যে বিক্রয় হইত। ইহা হইতেই আমাদের বর্তমান 'গেজেট' নাম হইয়াছে। এইভাবে আমার গাইড রিয়ালটোর বহু দর্শনীয় দ্রব্যাদি দেখাইল। ভেনিসের সর্বাপেক্ষা দর্শনীয় মনে হইল পিয়াৎসা, অর্থাৎ স্কয়ার অফ সেণ্ট মার্ক। এইখানে সেণ্ট মার্কের গীর্জা রহিয়াছে। ইহার প্রবেশদ্বারের উপরে ১২০৫ সনে কনস্টান্টিনোপল হইতে আনীত চারিটি অশ্বমূর্তি রহিয়াছে। নেপোলিয়ন কর্তৃক ইহা প্যারিসে নীত হইয়াছিল, কিন্তু পরে পুনরুদ্ধার করা হইয়াছে। চার্চের ভিতরে প্রচুর উৎকীর্ণ অলঙ্করণ ও মোজেইকের কাজ রহিয়াছে। সৃজন দৃশ্যে গডকে প্রবীণ ভদ্রলোকের চেহারায় দেখানো হইয়াছে, মুখ ডিম্বাকৃতি, চোখ দুইটি খুব উজ্জ্বল নহে, কৃষ্ণবর্ণ শিরে মুকুট শোভা পাইতেছে, ইহার পর ডোজের প্রাসাদের সভাগৃহগুলি ও ভূগর্ভস্থ কক্ষগুলি পরিদর্শন করিলাম। অস্ত্রাগারে এইখানে প্রাচীনকালে আড্রিয়াটিক সমুদ্রের বিবাহে যে নৌকা ব্যবহৃত হইত তাহার মডেল রহিয়াছে। আসল নৌকাখানিতে সোনার কাজ করা ছিল। সেই সোনার জন্য নেপোলিয়ন নৌকাটিকে ভাঙ্গিয়া সোনা সংগ্রহ করেন। পোপ স্বয়ং ডোজদিগকে আড্রিয়াটিকের সঙ্গে বিবাহ দিতেন। ১১৭৭ সনে ডোজ পোপের কয়েকটি কাজ করিয়া দেওয়াতে তাহার বিনিময়ে ডোজ জিয়ানিকে একটি অঙ্গুরী দিয়াছিলেন। দিবার কালে বলিয়াছিলেন, "সমুদ্রের উপর কর্তৃত্ব জ্ঞাপক এই অঙ্গুরীটি গ্রহণ কর। প্রতি বৎসর তুমি ও তোমার পরবর্তীগণ চিরকাল ধরিয়া সমুদ্রকে বিবাহ করিবে। ইহাতে সকলে জানিতে পারিবে সে তোমাদের অধিকারে রহিয়াছে, এবং স্ত্রী যেমন স্বামীর শাসনাধীনে থাকে তেমনই আমি এই সমুদ্রকে তোমাদের শাসনাধীনে সমর্পণ করিতেছি।" ভেনিসে কাচ ও লেস্‌ শিল্প প্রতিষ্ঠান কয়েকটি দেখিলাম। এগুলির বাণিজ্যিক মূল্য যথেষ্ট। সেণ্ট মার্কোর গ্র্যাণ্ড হোটেল ভিকটোরিয়াতে আমার এক সিন্ধুবাসী ভারতীয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল।

ভেনিস হইতে আমি ফ্লোরেন্সে আসিলাম। বহু বিস্তীর্ণ শুভ্র তুষারক্ষেত্র পার হইয়া আসিতে আমি এট্রাস্‌কান অ্যাপেনিন পর্বতমালা দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম। কোথাও সবুজের চিহ্ন নাই, উচ্চ চূড়া পৃষ্ঠ অনুর্বর এবং শূন্য, সমতল ক্ষেত্র হইতে তিন হাজার ফুট উচ্চে মাথা তুলিয়াছে, কিন্তু নিম্ন পার্শ্বক্ষেত্র চেস্টনাট ও কাঠপ্রদানকারী বৃক্ষ সমূহে আচ্ছাদিত রহিয়াছে। অ্যাপেনিনের ভিতর হইতে বহু স্রোতস্বিনী তীব্র বেগে ছুটিয়া আসিতেছে। ডান্টে তাঁহার 'ইনফারনো' ৩০ সর্গে ইহাদের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ইহারা ছুটিয়া আসিয়া আরনো নদীতে পড়িতেছে। ফ্লোরেন্স ফুলের শহর। চারিদিকের দৃশ্য অপরূপ। এখানে ভাগ চাষীদের খামার, ওখানে দ্রাক্ষাক্ষেত, ফুলের বাগান চিত্রার্পিতবৎ ভিলাসমূহ। ফ্লোরেন্সে বাহিরের পরিদর্শকেরা একবার ডুয়োমো ক্যাথিড্রাল দেখেন। ইহার সুদৃশ্য গম্বুজ মাইকেল এঞ্জেলোকেও মুগ্ধ করিয়াছিল। ডুয়োমোর নিকট সাঁ জিওভানির ব্যাপটিস্টারিতে গাইড আমাকে তিনটি ব্রঞ্জ নির্মিত

প্রবেশদ্বার দেখাইল। বা-রিলীফ পদ্ধতিতে প্রস্তুত। অর্থাৎ যে সব মূর্তি তাহাতে উৎকীর্ণ হইয়াছে তাহা তল হইতে সামান্য উচ্চ। মাইকেল এঞ্জেলো ইহাদের দুইটিকে তাঁহার চিত্রে 'স্বর্গের দ্বার' নামে বিখ্যাত করিয়াছেন। কিন্তু এ স্থানের সর্বাপেক্ষা দ্রষ্টব্য আমার কাছে গ্নি উফিফিৎসি যাহাতে ফ্লোরেন্সের বিখ্যাত শিল্প সংগ্রহ রহিয়াছে। ইতিপূর্ব্বে আর কোথাও এমন আশ্চর্য সুন্দর সব পেইন্টিং, উৎকীর্ণ চিত্র, ভাস্কর্য, ব্রঞ্জ মূর্তি, মুদ্রা, মণিরত্ন এবং মোজেইক দেখি নাই। আমি রাফায়েল চিত্রিত ম্যাডোনার সম্মুখে আধ ঘণ্টার উপর দাঁড়াইয়াছিলাম, তবু সরিয়া যাইতে মন চাহিতেছিল না। দেখিলাম একজন মহিলা শিল্পী উহার মিনিয়েচার পেইন্ট করিয়া লইতেছেন। তখন কাজ প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, মিনিয়েচারটি আমাকে বিক্রয় করিতে পারেন কি না। আমি ভাবিয়াছিলাম ২০ ফ্রাঁর অধিক হইবে না। কিন্তু তিনি ৩০০ ফ্রাঁ চাহিলেন। অত দিবার আমার সাধ্য ছিল না। ফ্লোরেন্সের প্রধান চার্চগুলি দেখিলাম বিশেষ করিয়া সাঁ লোরেনৎসো এবং সাঁতা ক্রোচে। সাঁতা ক্রোচে চার্চে গ্যালিলিও, ডান্টে, মাকিয়াভেল্লি, মাইকেল এঞ্জেলো. আলফেরি ইত্যাদির মনুমেন্ট রহিয়াছে। ইহা হইতে ধারণা হইবে সে সময় কত বিখ্যাত ব্যক্তি এই ফ্লোরেন্সে জন্মিয়াছেন। আমি সব সময়েই ভাবিয়াছি মাকিয়াভেল্লির এত দুর্নাম কেন। তাঁহার 'দেল প্রিন্সিপ' গ্রন্থে তিনি যাহা বলিয়াছেন সভ্য দুনিয়ার আচরণ তাহা হইতে ভিন্ন নহে। ইহা ত আমরা প্রতিদিনই দেখিতেছি। প্রিন্স কি ভাবে বিশ্বস্ততা বজায় রাখিবে ?" তিনি ইহার উত্তর দিয়াছেন তাঁহার গ্রন্থের ১৮ সংখ্যক অধ্যায়ে। কিন্তু নীতিবাদীগণ অথবা মাকিয়াভেল্লির সমর্থকগণ ইহার যে উত্তরই দিন, এ প্রশ্নের বাস্তব উত্তর সব সময়ই প্রিন্সের শক্তির উপর নির্ভর করিয়াছে। "প্রিন্সের শ্রেষ্ঠ রক্ষীদুর্গ প্রজাবর্গের প্রীতি" মাকিয়াভেল্লি বলিয়াছেন। তিনি কৌশলী ছিলেন, কিন্তু তাঁহার সকল কৌশল সত্ত্বেও তিনি মেদিচিগণকে ফ্লোরেন্সের বাহিরে রাখিতে পারেন নাই। তিনি সাধারণ তত্ত্ববাদী ছিলেন না। প্রথম জীবনে তিনি সফল কর্মী ছিলেন, এবং তথ্যের দিকে তাঁহার খুব নজর ছিল। তত্ত্ববাদীদিগকে কর্ম্মক্ষেত্রে নামাইবার চেষ্টা পৃথিবীর পক্ষে নিষ্ঠুরতা ব্যতীত আর কিছু নহে। তাঁহাদিগকে নিজ নিজ তত্ত্ব লইয়া স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতে দেওয়া উচিত। রাষ্ট্রনীতি বিষয়ের লেখকরূপে বিষ্ণুশর্ম্মা এবং বাস্তব রাষ্ট্রনৈতিক কর্ম্মীরূপে চাণক্য অপেক্ষা মাকিয়াভেল্লি বহুগুণে নিম্নস্তরের। ফ্লোরেন্সের অধোগতি দুঃখের বিষয় যে সাফল্য সে লাভ করিয়াছিল, তাহার উপযুক্ত ছিল সে। ছোট্ট শহর হইতে সে সমৃদ্ধিতে অনেক বড় হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার সামরিক খ্যাতির প্রতি আমার কোনও আস্থা নাই। তাহার গণতান্ত্রিক নীতিতে সে অভিজাত সম্প্রদায়কে শাসন বিভাগের সকল প্রকার কাজ হইতে দূরে রাখিতে পারিয়াছিল ইহা বিস্ময়ের বিষয়। পক্ষান্তরে ভেনিস তাহার 'গোলডেন বুক'-এ অভিজাত বংশের বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষদের নাম তালিকাভুক্ত করিতেছিল। কারণ তাহারাই একমাত্র রাজকার্যের জন্য অনুমতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি। সিনিয়র গিগলিওলি জুওলজির অধ্যাপক,তাঁহার নিমন্ত্রণেই আমি ফ্লোরেন্সে আসিয়াছি। অপর এক অধ্যাপক, সিনিয়র কারনেল, এবং সিনিয়র পাওলো দাঁতে গাৎসা, সেনেটর, এই শহরে অবস্থানকালে আমাকে যথেষ্ট খাতির করিয়াছেন। বিজ্ঞানের মিউজীয়াম সমূহ দেখিয়া আমি চমৎকৃত হইয়াছি। প্রাণী বিজ্ঞান বিভাগে যে সব অস্থি কঙ্কাল প্রভৃতির মডেল আছে তাহা খুব মূল্যবান্। একদল বৈজ্ঞানিকের তত্ত্বাবধানে গত শতাব্দীতে (সপ্তদশ) এগুলি নির্মিত হইয়াছে, এবং এগুলির প্রত্যেকটি অংশ বৈজ্ঞানিক বিচারে নির্ভুলভাবে প্রস্তুত। ফ্লোরেন্স হইত অতঃপর আমি রোমে আসিলাম।

১৮৮৬ সনের ৩১শে ডিসেম্বর আমি এই মহৎ নগরীটির সঙ্গে প্রথম পরিচিত হইলাম। কত শতাব্দী ধরিয়া রোম পাশ্চাত্য জগতের রাষ্ট্রনৈতিক, আধ্যাত্মিক

ও নীতিধর্ম্মের পরিণাম নিয়ন্ত্রণ করিয়াছেন। এসকুইলিন পাহাড়ে উচ্চভূমিতে নির্ম্মিত কনটিনেন্টাল হোটেলে উঠিয়াছিলাম। প্রাচীন রোমের এইটি mons Esquilinus। সেরভিউস তুল্লিউস যে সাতটি পাহাড় রোমের সঙ্গে যুক্ত করিয়াছিলেন এইটি তাহাদের সপ্তম ও শেষ। সেজন্য ইহার নাম হইয়াছে সাত পাহাড়ের শহর। এই পাহাড় শুনিয়া কেহ মনে ভাবিবেন না ইহা উত্তর ভারতের হিল স্টেশনে যেমনে দেখা যায় তেমন পাহাড়। আগে এগুলি কেমন ছিল জানি না, বর্তমান রোম যে পাহাড়ে নির্ম্মিত সেগুলি সামান্য উচ্চ স্থান মাত্র। সবটা একত্রে সাধারণ ডাঙ্গা জমি বলিলেই ঠিক হইত কিন্তু শহরের গৌরবময় অতীতের প্রতি শ্রদ্ধা বশতঃ তাহা বলিলাম না। কৃষি বিভাগের সচিব সিনিয়র নিকোলা মিরাগলিয়ার সঙ্গে প্রথমে সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। ইটালিয়ান গর্ভমেন্টের নিকট আমার নাম খুব অপরিচিত ছিল না। কারণ অল্পদিন পূর্ব্বে, আমাদের ভাইসরয়ের অনুমতিক্রমে ইটালিয়ান গভর্মেন্ট রোমে নির্ম্মিত একটি সোনার ঘড়ি ও চেন আমাকে উপহার দিয়াছিলেন। সিনিয়র মিরাগলিয়া তাঁহার সেক্রেটারি সিনিয়র তুতিনোর সহিত আমাকে রোমের বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানগুলি দেখাইবার ব্যবস্থা করিলেন। ইহার পর আমি হাতে যেটুকু সময় ছিল তাহা রোমের দৃশ্যাদি দেখিবার কাজে ব্যয় করিলাম। বিখ্যাত সকল স্থানই দ্রুত দেখিয়া গেলাম, কিন্তু দুঃখের বিষয় ভ্যাটিক্যানের ভিতরে যাইতে পারিলাম না, কারণ তখন ছুটি চলিতেছিল, এবং বিশেষ অনুমতি সংগ্রহ করিবার সময় আমার ছিল না।

অবশ্য কলোসিয়াম (কোলোসিউম) অথবা ফ্লাবিয়ান অ্যামফিথিয়েটার দেখিয়াছি। ইহার আরম্ভ হইয়াছিল ভেসপাসিয়ানের দ্বারা এবং জেরুসালেম ধ্বংসের দশ বৎসর পর ৮০ খৃষ্টাব্দে ইহার নির্মাণ কার্য শেষ হয়। রোমে ঐতিহাসিক এত জিনিষ আছে যে ইহার যে-কোনও একটি লইয়া যে-কোন ব্যক্তি রোম সম্পর্কে গ্রন্থ রচনা করিতে পারে। দেখিলেই অতীতের ছবিটি মনে জাগিয়া উঠে, মনে কত ভাবের উদয় হয়। আমারও এইরূপই মনে হইতেছিল যখন আমি কলোসিয়ামের দ্বিতীয়তলে দাঁড়াইয়া নিচের সুবিস্তীর্ণ অ্যারিনা বা আঙ্গিনা দেখিতেছিলাম। এইখানে গ্লাডিয়েটরগণ মারাত্মক যুদ্ধে লিপ্ত হইত, এবং বন্য জন্তুগণ গর্জন করিতে করিতে ইহাদের সঙ্গে লড়াই করিত, আর সম্রাট্‌গণ, সিনেটরগণ, ভেস্টাল ভার্জিনেরা এবং তৎসহ ৮৭০০০ রোমবাসী দর্শক তাহাতে আমোদ অনুভব করিত। উন্মুক্ত গ্যালারিতে এত দর্শকের স্থান হইত। ডোরিক, আইয়োনিক এবং কোরিনথিয়ান ভঙ্গির স্তম্ভের উপর এই গ্যালারির খিলান নির্মিত হইয়াছিল। সেদিনের সমস্ত চিত্রখানি আমার মনশ্চক্ষে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

কিছুদিন পূর্বে পর্যন্ত ইংরেজ ঐতিহাসিক এবং লেখকদের ফ্যাশান ছিল মহম্মদের নিন্দা করা। তাঁহাকে পৃথিবীর চোখে নির্মমতম "ভ্যাণ্ডাল" বলিয়া জাহির করা। কিন্তু যখন নিজ চোখে দেখিলাম মন্দিরগুলি গীর্জায় পরিণত হইয়াছে, প্রাচীন সৌধগুলির অলঙ্করণ ভাঙ্গিয়া খ্রীষ্টান অট্টালিকা গড়া হইয়াছে, দেবদেবীদিগকে খৃষ্টান কালাপাহাড়েরা এমন করিয়া নষ্ট করিয়াছে যে তাহা আর চিনিবার উপায় নাই, তখন আমি আমার বাল্যকালে খৃষ্টান শিক্ষকদের নিকট হইতে যে শিক্ষা পাইয়াছি তাহা স্মরণ করিয়া না হাসিয়া পারি নাই। পৃথিবীর সকলেই একটি কথা ভুলিয়া যায় যে, খৃষ্টান হউক, মুসলমান হউক বা হিন্দু হউক, তাহার সৎকাজ বা অসৎকাজ সেই ব্যক্তির উপর নির্ভর করে, ধর্মের উপর নহে। একজন ব্র্যাডল, বহু ধর্মোপদেষ্টা হইতে উচ্চস্তরের, কুমীর পবিত্র গঙ্গামাতার মধ্যে ডুবিয়া থাকিলেও সে কুমীরই থাকিয়া যায়।

রোমের আবির্ভাবের আগে ক্যাপিটল পাহাড়ের নাম ছিল শনি। কথিত আছে শনিদেবতা এইখানে একটি নগর গড়িয়াছিলেন। একদা শনি দেব অন্যান্য দেবতাদের বড়ই অপ্রিয় হইয়া উঠেন, কারণ তিনি তাঁহার পিতা ইউরেনাসকে কাস্তের সাহায্যে অঙ্গহানি ঘটাইয়াছিলেন, এবং তাহার এক কুৎসিত অভ্যাস ছিল

নিজ সন্তান জন্মিবামাত্র খাইয়া ফেলা। সেইজন্যই তিনি স্বর্গ ত্যাগ করিয়া তাঁহার অস্থায়ী বাসের জন্য ক্যাপিটল পাহাড় মনোনীত করিয়াছিলেন। অস্থায়ী, কারণ তাঁহার ধারণা ছিল তাঁহার কুকার্য স্বর্গের বন্ধু এবং আত্মীয়বর্গ কিছুদিনের মধ্যেই ভুলিয়া যাইবে, তখন তিনি ফিরিয়া যাইতে পারিবেন। তিনি এখানে আসিয়া দেখেন, ইটালির লোকেদের বড়ই দুরবস্থা, তাহারা বর্ব্বরতার চূড়ান্ত অবস্থায় বাস করিতেছে। তাহাতে দুঃখবোধ করিয়া তাহাদের বৃক্ষ-কোটর, গুহা প্রভৃতির বাস হইতে বাহির হইয়া আসিয়া তাঁহার নিকট হইতে কি করিয়া সভ্য জীবন যাপন করিতে হয়, ঘরবাড়ী নির্মাণ করিতে হয়, জমি চাষ করিতে হয় তাহা শিখিবার জন্য তিনি অনুরোধ উপরোধ এবং তাঁহার যাবতীয় বাক্‌ক্ষমতা প্রয়োগ করিলেন। আমার গাইড বলিল, "একজন নিকৃষ্টধর্মী পেগান দেবতা এমন ভাল শাসনকর্তা হইতেই পারে না।"

আধুনিক কালে পালাৎসো দেল কাঁপিদোগলিওতে একটি মনোরম অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হইয়াছিল। কবি পেট্রার্ককে এইখানে লরেল ভূষিত করা হইয়াছিল সে সময়। সেটি ১৩৪১ সনের কথা। পেট্রার্ক একজন অসামান্য ব্যক্তি ছিলেন, এবং তাঁহার ভাবাবেগপূর্ণ প্রেম কাহিনী তাঁহার সময়ে সমস্ত ইউরোপে যথেষ্ট সাড়া জাগাইয়াছিল। ফ্লোরেন্সে তাঁহার জন্ম, কিন্তু তাঁহার পরিবারকে এই স্থান হইতে নির্বাসিত করাতে তিনি আভিনিয়ঁতে চলিয়া যান। ১৩২৭ সনে একটি চার্চে লরা নাম্নী এক সুন্দরী যুবতীকে দেখিয়া মুগ্ধ হন, এবং তাঁহার মনে তাহার প্রতি দুর্জ্জয় প্রেম জাগিয়া উঠে। লরা ছিল অপরের স্ত্রী। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও আমরণ (তাঁহার মৃত্যু হয় ১৩৭৪ সনে) তিনি লরার প্রতি তাঁহার নিষ্ঠা অক্ষুন্ন রাখেন এবং এই প্রেম স্বভাবতঃই ছিল আত্মিক প্রেম। দূর হইতে তিনি তাঁহার দেবীকে মনে মনে পূজা করিতেন, এবং তাঁহার কাব্যে প্রধানতঃ এই প্রেমের বিষয়ই স্থান পাইয়াছে। ইটালিয়ান গীতিকাব্যের ক্ষেত্রে ইহার স্থান উচ্চ। লরা বৃদ্ধ হইয়া পড়িল, তাহাদের সৌন্দর্য গত হইল, কিন্তু তখনও পেট্রার্ক তাঁহার দুর্জ্জয় প্রেমের নিষ্ঠা অপরিবর্তিত রাখিয়াছেন। তাঁহার বন্ধুগণ ইহাতে বিস্ময় প্রকাশ করিলে তিনি বলিয়াছিলেন plaga per allentar l'arco mon sana —ধনু আর আঘাত হানিতে পারে না, কিন্তু মারাত্মক আঘাত সে পূর্ব্বেই হানিয়াছে। আমি যদি তাহার দেহকে ভালবাসিতাম তাহা হইলে আমার বহু পূর্ব্বেই পরিবর্তন ঘটিত।" পরিচিত পারসিক কাহিনীর মজনুন তাহার প্রণয়িনী সম্পর্কে বন্ধুদের প্রশ্নের যে উত্তর দিয়াছিল তাহা অন্য জাতের। মজনুন ছিল সুপুরুষ যুবক, তাহার প্রণয়িনী ছিল কুৎসিত-দর্শনা বালিকা। তাহার এই রুচিতে বিস্ময় প্রকাশ করিয়া তাহার বন্ধুরা সে কথা বলিলে তাহার উত্তরে মজনুন বলিয়াছিল, "হায়, তোমরা যদি মজনুনের দৃষ্টিতে লয়লাকে দেখিতে।"

আমার রোমের গাইডটি একজন দেশপ্রেমিক। ১৮৪৯ সনে ফরাসীরা যখন রোম ঘিরিয়া ফেলে তখন এই লোকটি অবরুদ্ধদের মধ্যে ছিল। ইটালির সংহতি ও স্বাধীনতার জন্য এই গাইডটি গ্যারিবলডির অধীনে যুদ্ধ করিয়াছিল। তাহার দেশপ্রেম প্রশংসনীয়, কিন্তু উহা একদেশদর্শী। ইটালি যোদ্ধাদের খাতির করিয়াছে বেশি, কিন্তু যাহারা অজ্ঞতা, দারিদ্র্য প্রভৃতির সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া মরিয়াছে, তাহাদিগের প্রতি বিশেষ ফিরিয়া চাহে নাই। সেজন্য এক দার্শনিক ইটালি সম্পর্কে বলিয়াছেন, "the last refuge" of scoundrelism। কিন্তু আমি যদি জনমনের সমালোচক হইতাম তাহা হইলে বলিতাম, Religion, philanthropy and patriotism are the last solace of unrestful disappointed. (ধর্ম, পরহিত এবং দেশপ্রেম, এই তিন, অশান্ত হতাশদের শেষআশ্রয়")। আমরা প্রায়শঃ এমন ব্যক্তিদের দেখা পাই যাহাদের অদম্য উদ্যম ও উৎসাহ আছে, অথচ যাহারা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। এবং এমন সব নরনারীকে দেখি যাহারা প্রথম জীবনের কোনও

ভুলের জন্য স্বজন কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছে। এই ভুল সবসময়ে স্বকৃত নহে, অন্যের শয়তানিতে ঘটিয়াছে। এমন সব মানুষ, তাহাদের সেই উৎসাহ ও শক্তি প্রকাশের কোনও দিকে সুযোগ না পাইয়া দেশপ্রেম ও ধর্মকর্মকে আশ্রয় রূপে গ্রহণ করে, শয়তানেরা নহে। ইহারা নিচের স্তরে পড়িয়া থাকে, এবং তাহাদিগকে যে প্রত্যেকেই (দার্শনিকও বাদ নহে) লাথি মারিয়া যাইবে ইহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই। দুনিয়ার দস্তুর ইহাদিগকে লাথি মারা।

ইটালি উপদ্বীপটির দৈর্ঘ্য পার হইয়া আসিবার কালে এখানকার কৃষককুলের দুরবস্থার কথা স্মরণ না করিয়া পারিলাম না। ইটালির জমি সুফলা। সিল্ক, সুরা, জলপাইয়ের তেল, এবং অন্যান্য অনেক জিনিষ এখান হইতে বাহিরের বাজারে রপ্তানি হয়। কিন্তু যাহারা নিজহাতে পরিশ্রম করিয়া এসব উৎপাদন করে, জমি তাহাদের বিশেষ কিছুই দেয় না। উত্তর অঞ্চলের লমবার্ডিতে সিল্কগুটির চাষ হয়, কিন্তু যাহারা প্রায় পৌনে দুইকোটি তুতগাছ জন্মায় ও পালন করে তাহাদের বাস নিকৃষ্ট কুঁড়ে ঘরে। তাহাদের ভাগে আহার্য যাহা মেলে তাহাতে তাহাদের কোন মতে জীবন রক্ষা হয় মাত্র। কিন্তু এই যে তাহাদের শ্রমে ৫০ লক্ষ পাউণ্ড বার্ষিক আয় হয়, তাহা কি শুধুই যুদ্ধাস্ত্র সৈন্যদের জন্য ? এদেশের মধ্য অঞ্চলেও দারিদ্র্য রহিয়াছে, এবং দক্ষিণেও ঐ একই চিত্র দেখিলাম। নেপলস্ ষ্টেশন হইতে দ্রুত ছুটিয়া পমপেই এর ট্রেন ধরিবার কালে রেলওয়ে পোর্টার বখশিশের জন্য অনুনয় বিনয় করিতে থাকে। তখনই মনে পড়ে, হ্যাঁ, এইবার দেশের কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছি। মনে হয় যেন মহা ঐশ্বর্যশালী পূর্ব্ব দুনিয়ার মশলার সুগন্ধ নাকে প্রবেশ করিতেছে।

আঠারশত নয় বৎসর পূর্বে, অর্থাৎ ৭৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে আগস্ট, অপরাহ্ণ প্রায় একটার সময় প্রকৃতি বিজ্ঞানের লেখক প্লিনির ভগ্নী, ভেসুভিয়াস পর্বত হইতে যে ধূম উদ্গিরণ হইতেছিল তাহার দিকে ভ্রাতার দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। ঐ ধোঁয়া বিরাট এক বিপর্যয়ের সূচনা করিতেছিল। প্লিনি তাঁহার নৌকাগুলি সমুদ্রে ভাসাইয়া উহার আরও কাছে আসিলেন ভাল করিয়া দেখিবার জন্য। নিকটস্থ শহরগুলি যদি বিপন্ন হয় তবে সেখানকার লোকদের সাহায্য করিবার উদ্দেশ্যও ছিল। তিনি নৌকা হইতে স্টাবাইইতে অবতরণ করিতেই দেখিলেন, গভীর রাত্রির অন্ধকার হইতেও দিনটি বেশি অন্ধকার হইয়া উঠিল। মাটি ভীষণ ভাবে কাঁপিতে লাগিল এবং সেই সঙ্গে তপ্ত অঙ্গার ও চুনে পরিণত প্রস্তর খণ্ড চারিধারে বৃষ্টিধারার ন্যায় বর্ষিত হইতে লাগিল। তিনি ছুটিয়া খোলা মাঠের নিরাপদ স্থানে গেলেন, তাঁহার মাথার সঙ্গে এক বালিশ বাঁধিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি বাঁচিতে পারিলেন না। দম বন্ধ হইয়া তিনি মারা গেলেন। মাটি, তপ্ত অঙ্গার, ঝামা-পাথর, এবং জলন্ত কৃষ্ণ প্রস্তরখণ্ড ভেসুভিয়াস হইতে অবিরাম বর্ষণের ফলে অল্পক্ষণের মধ্যেই হেরকুলানিউম এবং পম্পেই শহর দুটি সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন হইয়া গেল। কালক্রমে পম্পেই শহর বিস্মৃতির অতল তলে ডুবিয়া গেল, তাহার আশা আকাঙ্ক্ষার সমাধি ঘটিল। মাত্র কয়েক বৎসর পূর্বে নুচেরিয়ার সহিত তুচ্ছ কলহ বাধিয়া উঠিয়াছিল। যাহার ফলে নেরো পম্পেইকে শাস্তি স্বরূপ দশ বৎসরের জন্য সর্বপ্রকার নাটক অভিনয়ের আনন্দ হইতে বঞ্চিত করিয়াছিলেন, সমস্তই নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল। পম্পেইকে পৃথিবী বিস্মৃত হইল, যেমন বন্ধুগণ! আমি এবং আপনি বিস্মৃত হইবেন, এবং তখন আমাদের স্থলে 'অন্য আমি' এবং 'অন্য আপনি' দেখা দিবে। ১৬০০ বৎসর যাবৎ এখানে যে একটি শহর ছিল তাহা কাহারও স্মৃতিতে রহিল না ; এবং এই ১৬০০ বৎসর ধরিয়া এইখানে শস্য ফলিয়াছে, দ্রাক্ষালতা বর্ধিত হইয়াছে, অথচ ইহারই নিচে এত কাল ধরিয়া কত ঘরবাড়ি, দোকানপাট, থিয়েটারগৃহ, প্রাসাদসমূহ, মন্দির, বিচারালয়, অ্যামফিথিয়েটার, স্নানাগার, বন্দীশালা রুটি কারখানা, পানথেয়ন, সালুস্টের গৃহ ইত্যাদি চিরনিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল, খনন কার্যের ফলে এসব তথ্য প্রকাশ হইয়া

পড়িয়াছে। ১৭৫৫ হইতে এই খনন আরম্ভ হইয়াছে। দৃশ্যাদি বিষয়ে বলিবার বিশেষ কিছু নাই। দুটি শহর যে এই দুর্ভাগ্যের হাতে পড়িয়াছিল তাহাই ইহাদের আকর্ষণ। যে ভাবে ইহা প্রায় অক্ষত অবস্থায় রহিয়াছে তাহাতে ১৮০০ বৎসর পূর্বেকার রোমান সমাজ-জীবনের উপর ইহা অনেকখানি আলোকপাত করিতেছে। নেপল্‌সের একটি মিউজীয়ামে এই স্থানের বহু মূল্যবান্ জিনিস সুরক্ষিত আছে। সমাধি হইতে উদ্ধারপ্রাপ্ত পম্‌পেই শহরটির 'পোর্তা দেল্লা মারিনা' হইতে হেরকুলানিউমের গেট পর্যন্ত পথ অতিক্রম করিলাম। পম্‌পেই হইতে পুনরায় নেপ্‌ল্‌স-এ ফিরিয়া আসিলাম।

প্রবাদ আছে, "প্রয়াগে প্রথমে মাথা মুড়াও, তাহার পর হে পাপী, তোমার যেখানে মরিতে ইচ্ছা হয়, সেইখানে গিয়া মর।" আর একটি প্রবাদ "মৃত্যুর পূর্বে নেপ্‌ল্‌স দেখিয়া লও।" আমি এই দুইটি কার্যই করিয়াছি, এইবার আমি শান্তিতে মরিতে পারিব। তবে নেপল্‌স 'দেখিয়া লও' অর্থে দেখিয়াছি, বেশী দেখা হয় নাই, হাতে সময় কম ছিল। শুধু মিউজীয়ামগুলি, অ্যাকোয়ারিয়ামটি এবং ভার্জিলের সমাধি দেখিয়াছি। ক্যাটাকুম বা ভূনিম্নস্থ সমাধিগুলির নিকট পালাৎসিও কাপোদিমন্ত-এ একটি সুন্দর মিউজীয়াম আছে, ইহাতে পেইন্টিং, পোর্সিলেন ও অস্ত্রাদি আছে। মুজেও নাৎসিওনালে বড় একটা আর্ট গ্যালারি আছে, এবং মার্বিলের সুন্দর একটি সংগ্রহ আছে। ইহা ব্যতীত মোজেইক, স্বর্ণ ও রৌপ্য অলঙ্কার, মুদ্রা, পমপেই ও হেরকুলানেউম হইতে আনীত অন্যান্য অনেক জিনিস আছে। নেপল্‌সে একটি উৎকৃষ্ট অ্যাকোয়ারিয়াম আছে। ইংরেজী ভাষায় মুদ্রিত অ্যাকোরিয়ামে রক্ষিত মৎস্যগুলির বিবরণ ঐখানে বিক্রয় হয়, তাহাতে পরিদর্শনকারীর খুব সুবিধা হয়। ইহাতে মাছগুলির চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে। ভার্জিলের সমাধির নিকট একটি বড় সুরঙ্গ আছে। সুরঙ্গের নেপল্‌স-এর দিকটিতে একটি ছোট পবিত্র স্থান আছে, সেটি সুন্দর একখণ্ড লাল কাপড় দিয়া ঢাকা। তাহার উপর কয়েকটি ছোট ও বড় আকারের পিতলে নির্মিত দেবতার মূর্তি যত্ন করিয়া রাখা আছে। পুরোহিত আমাকে দেখিয়া ছুটিয়া আসিয়া বলিল, তোমাকে কিছু পূজা দিতে হইবে। উক্ত কাজ করিলাম। কয়েকটি তাম্রমুদ্রা মেঝেতে রাখিলাম। সামান্য হইলেও পুরোহিত খুশি হইলেন। কারণ তিনি, আরও দাও বলিলেন না। অতএব তাঁহাকেও একটি দিয়া দিলাম। খুব খুশী হইলেন তিনি কিন্তু কি বলিলেন তাহা বুঝিলাম না। নেপল্‌স-এর ভেসুভিয়াস হোটেলে দুইজন পার্শী ভদ্রলোককে দেখিলাম, যদিও তাঁহাদের সঙ্গে আমি আলাপ করি নাই। নেপল্‌স হইতে সোজা ব্রিনদিসি চলিয়া আসিলাম। এখানে জাহাজ আমাকে আলেকজান্দ্রিয়াতে পৌঁছাইয়া দিবার জন্য প্রস্তুত ছিল। ৩রা জানুয়ারি, ১৮৮৭ সকালে আমি ইউরোপ ত্যাগ করিয়া সাধারণ ডাক বহনের পথে দেশে ফিরিয়া আসিলাম। আমি মোট ৮ মাস ২৭ দিন ইউরোপে বাস করিয়াছি।

সমাপ্ত

অক্ষয় সাক্ষর

প্রীতিময়ী কর ভারতী

(ক্ষিতিমোহন সেন)

নিবিড় বর্ষা, আকাশ ছাওয়া মেঘান্ধকার। দিনকে যেন রাত করেছে। অবিশ্রাম কি অঝোর বর্ষণ। বাইরের সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধ। কর্মহীন দিন অসহনীয় হয়ে ওঠে। ঘরের কাজ কোথায় কি বাকী আছে খুঁজতে হয়। তাই খুঁজি, তাও আলো জ্বালালে ভালো হয়।

অনেকদিন আলমারি, টেবিলের দেরাজগুলোয় হাত পড়ে নি। নিজের লেখা ও পড়াশুনার কাগজপত্র পত্রিকা, এগুলোই আজ ঝেড়ে ঝুড়ে রাখা যাক।

বহু পুরানো দিনের কত কি; কতদিনে কবে সঞ্চয় করেছিলাম আজ আর ভালো মনে পড়ে না, তবু এক-একটির দিকে তাকাই আর দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়ে থাকে। কতজনের কত চিঠি, কত বিশেষ ক্ষণে উপহার দেওয়া কবিতার ছন্দ, ফোটো, অটোগ্রাফ।

উল্‌টে দেখতে দেখতে সহসা উঠে এল হাতে একটা হলদে রঙের পুরানো কার্ড, আর তার গায়ে হিজি-বিজি দাগ টানার মত এক লাইন লেখা, অক্ষর বোঝা যায় না। তবু বোঝা যায় একটা নাম লিখে দিয়েছেন কেউ। কে সে? কি নাম? বুঝতে পারি, ক্ষণকাল পরে মনে পড়ে যায় আর লেখাটার দিকে অনিমেষ চোখে চেয়ে থাকি, যেন ধ্যানমগ্ন হয়ে যাই। মনে পড়ে এ লেখা শ্রদ্ধেয় স্বর্গীয় ক্ষিতিমোহন সেনের। শান্তিনিকেতনের।

শান্তি-নিকেতন। আবাল্যের কল্পলোকের স্বপ্নের ইন্দ্রধনু দিয়ে ঘেরা শান্তি নিকেতন। সেই চির কল্পলোকের স্থানকে চাক্ষুষ দেখবার সৌভাগ্য হয়েছিল পরিণত বয়সে একবার মাত্র। সেইসময় মহাগুণী পণ্ডিত বৃদ্ধ ক্ষিতিমোহন সেনকে দেখবার সৌভাগ্য হয়েছিল। আজ তিনি স্বর্গগত। এ লেখা তাঁরই হাতের স্বাক্ষর। অক্ষয় স্বাক্ষর, পুরানো কাগজ-পত্রের নথির মধ্যে আজও ধরা আছে।

শুধু কি এই কালির অক্ষরে ধরা স্বাক্ষরটুকু আছে, আর কিছু কি নেই? মনের মধ্যে কি কোন স্মৃতির স্বাক্ষর নেই? তাও আছে।

শান্তিনিকেতনের বহুজন-পরিচিত গুরুপল্লীবাসী আত্মীয় রবীন্দ্র ঘোষের বাড়ীতে অতিথি হয়ে তাঁরই সাহায্যে শান্তিনিকেতন ঘুরে দেখতে বেরিয়েছিলাম। প্রথমেই গিয়েছিলাম শ্রদ্ধেয় ক্ষিতিমোহন সেনের বাড়ীতে। শ্রীযুক্ত সেনের পুত্রবধূ উপস্থিত ছিলেন। আমাদের যত্ন করে ভিতরের দালানে নিয়ে গিয়ে বসতে বললেন। সেখানে দেখলাম অতিবৃদ্ধ অথর্ব্বপ্রায় এক সুপুরুষ আধশোয়া হয়ে বসে আছেন একখানি আরাম কেদারায়।

প্রণাম করতে তিনি চেয়ে রইলেন আমার দিকে, আমার সঙ্গের আত্মীয় আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন। এই ক্ষিতিমোহন সেনকে কলিকাতায় পূর্বে আমি দেখেছিলাম স্বর্গীয় ডঃ কালিদাস নাগের কন্যার বিবাহে

আচার্যরূপে। মধ্যবয়সে ইনি কত পৌরাণিক আদর্শ-মূলক কাহিনী কথকতা করে শোনালেন সুধীজন সমাজে। কালের নিয়মে আজ তিনি বৃদ্ধ, জরাগ্রস্ত। শ্রদ্ধানত হয়ে বললাম—"এতদিনে আমার কবিগুরুর শান্তিনিকেতনে আসবার সুযোগ হ'ল, আপনাকেও দেখতে পেলাম।"

তিনি ধীর গম্ভীর স্বরে করুণ মধুর হাসি হেসে বললেন—"নন্দপুরচন্দ্র বিনা বৃন্দাবন অন্ধকার।" কবি কালিদাস রায়ের বিখ্যাত কবিতার উদ্ধৃতি।

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে উপলব্ধি করতে লাগলাম। সত্যিই সে শান্তিনিকেতন আছে, আছে শালবীথি, আছে তাল- তমাল, নেই শুধু সেখানকার সেই 'বৃন্দাবন-চন্দ্র' কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ।

ফাল্গুনের শালতলা দিয়ে আসতে আসতে মনে পড়ছিল কবিগুরুর কবিতার ছত্র—"কখনও স্মরিতে যদি চায় মন, তবে এসো যেথা এই চৈত্রের শালবন।" আরও কত কথাই মনে এসেছিল। শুধু শালবীথি কেন, শান্তিনিকেতনের পথের ধুলোতে আকাশে বাতাসে আম্রবনে মুক্ত প্রাঙ্গণে যেন কবিগুরুর নাম অক্ষয় স্বাক্ষরে লেখা। যাঁরা কবিগুরুর দেবদুর্লভ রূপ চাক্ষুষ দেখেছেন, আজীবন সান্নিধ্যে থেকেছেন, পেয়েছেন তাঁর কর্মবহুল মহৎ জীবনাদর্শ, তাঁদের কাছে বৃন্দাবন অন্ধকার সত্যই। আর যাঁরা শুধু তাঁর স্থাপিত শান্তিনিকেতনের বনবীথিকায়, কাব্যগাথায় ও তাঁর সাহিত্যকলার সঙ্গে নিবিড় সম্বন্ধে জড়িত, তাঁদের দৃষ্টিতে তিনি চিরবিদ্যমান।

বলতে ইচ্ছা হ'ল কবি কালিদাস রায়ের কবিতার আর একটি উদ্ধৃতি—"বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছামি।"

আমি শান্তিনিকেতন গিয়েছিলাম দশবৎসর পূর্ব্বে। শুনতে পাই পূর্ব্বের সে শান্তিনিকেতন আর নেই। কবিগুরুর যে উদার ভাবগঙ্গা শান্তিনিকেতনের দু-কূল প্লাবিয়ে বয়ে যেত সেই শান্তি-নিকেতনের জন-মানস আজ বিপরীতমুখী স্রোতধারায় প্রবাহিত। চিরদিনের রাঙা পথগুলির অধিকাংশই পিচ ঢালা নাগরিক রাজপথে পরিণত। নেই সে চিরদিনের মৃৎকুটির, তার পরিবর্ত্তে সেখানে আজ হয়েছে ইটকাবাস।

মুখে কিছু বলা হ'ল না। তাঁর সেই ভাবগম্ভীর দৃষ্টির দিকে নীরবে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে পুনঃ প্রণাম করে বিদায় নেবার সময় শুধু বললাম—"একটু হাতের লেখা দেবেন?"

খুশী হয়ে সুস্মিত মুখে মাথা নেড়ে বললেন—"হ্যাঁ"।

পুত্রবধূ ঐ কার্ডখানা এনে দিলেন। কাঁপা কাঁপা হাতে লিখে দিলেন তাঁর নাম। অক্ষর বোঝা যায় না। হিজি-বিজি দাগের মত। তবুও ঐ তাঁরই হাতের পবিত্র স্বাক্ষর।

(শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু)

খুঁজতে লাগলাম। এরকম শ্রেষ্ঠ মানুষের মহতী স্বাক্ষর আর কি আছে। কিন্তু দেরাজের কাগজপত্রের মধ্যে আর কিছু পেলাম না। দেয়ালের গায়ে সহসা একটা টিকটিকি টিক্ টিক্ করে উঠল। হঠাৎ সেদিকে চোখ পড়ে গেল। কে বলে নেই, এই ত আছে। দেরাজের মধ্যে নয়, দেয়ালের গায়ে। দেরাজ বন্ধ করে দিয়ে এসে বসলাম পাশের সোফাতে।

ক্ষিতিমোহন সেনের বাড়ী থেকে বিদায় নিয়ে গিয়েছিলাম ভারতীয় স্বনামধন্য শিল্পী নন্দলাল বসুর বাড়ীতে, তাঁকে একবার চোখে দেখবার জন্য। সেদিন তিনি বেঁচে ছিলেন। এখন তিনিও স্বর্গগত।

সে বাড়ীতেও শিল্পীর কন্যা কিংবা পুত্রবধূ কে একজন উপস্থিত ছিলেন, আজ মনে পড়ছে না। তিনি আমাদের শিল্পীর ঘরেতেই নিয়ে গিয়ে বসতে বললেন। প্রণাম করে বসলাম।

মাটিতে মাদুর পেতে বসা। চারিদিকে শিল্পচর্য্যার সরঞ্জাম। ছোট খাট শ্যামবর্ণ মানুষটি, খাটো চুল, সাধারণ একখানা ধুতি পরা।

সমস্ত দেহ এবং মুখশ্রীতে শুদ্ধ চিত্তের বিশুদ্ধ শিল্প-তপশ্চর্য্যার প্রকাশ। অসীম শ্রদ্ধায় মন অবনত হয়ে

আসে। এখানেও আত্মীয় আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন। কলকাতায় কোথায় থাকি, কবে এসেছি, পূর্ব্বে এসেছিলাম কি না, কেমন লাগছে এইসব প্রশ্ন করে আলাপ করলেন শিল্পগুরু নন্দলাল বসু।

যথাযথ উত্তর দিলাম, নিজেকে যেন ধন্য মনে করলাম, এই বিখ্যাত মহৎ লোকের সঙ্গে কথা বলার সৌভাগ্যে।

আগেই শুনেছিলাম তাঁর স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়েছে। বাইরে চলাফেরার শক্তি নাই। বেশী পরিশ্রম, কোন অনিয়ম, বেশী কথা বলা চলে না। শুধু রোজ একটি করে ছবি আঁকেন। একটি ছবি আঁকছিলেন, প্রায় শেষ হয়েছে দেখলাম। কালিকলমের ছবি।

আমরাও আর বেশীক্ষণ থাকা উচিত মনে করলাম না। উঠবার আগে সাহস সঞ্চয় করে ব'লে ফেললাম— "আপনার দেখা পেলাম, কিন্তু প্রসাদ কিছু পাব না? বাড়ী গিয়ে সবাইকে কি বলব?"

আমি জানতাম অনেককে তিনি তাঁর হাতের ছবি দান করেছেন।

তৎক্ষণাৎ তিনি সম্মতিসূচক মাথা নেড়ে প্রসন্নচিত্তে হাতের সেই শেষ করা ছবিখানাতে আরও একটি কি দুটি দাগ দিলেন। বোধহয় ঐটুকু বাকী ছিল। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, আমার নাম কি?

নাম বললাম। সেই ছবিখানিতে আমার নাম লিখে পরে নিজের নামের স্বাক্ষর দিয়ে সহাস্যবদনে হাত বাড়িয়ে আমাকে ছবিখানা দিলেন।

কৃতার্থ মনে সে ছবি গ্রহণ করে বিদায় নিলাম।

সেই ছবি আজও আমার দেওয়ালে বাঁধানো রয়েছে। বৃহৎ একটা মহীরুহের শুষ্ক ভগ্ন গুঁড়ি।

একদিন ফুলে ফলে ভরে ওঠা যে বিস্তৃত শাখা প্রশাখা করেছিল কত পথিককে ছায়া দান, তার চিহ্ন মাত্র নেই। চেনা যায় না কোন গাছের গুঁড়ি বলে। মনে হয় একখণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তর। কিন্তু তারই চতুষ্পার্শ্ব ঘিরে উন্মুক্ত প্রান্তর জুড়ে রয়েছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কচি কিশলয়। অলক্ষ্যে একদিন এই বৃহৎ বৃক্ষের বীজ পতন হয়েছিল চারিদিক ঘিরে; তারই অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ কচি কিশলয়ে ভরে গিয়ে সৃষ্টি করেছে সবুজ প্রান্তর। আর তারই মাঝখানেই সেই অতীত পূর্ব-সূরীর সাক্ষী-স্বরূপ জেগে রয়েছে শুষ্ক বৃহৎ গুঁড়িখানা।

মুগ্ধ দৃষ্টিতে আপন ঘরের দেওয়ালে ছবিখানা দেখি আর ভাবি—শিল্পী যেন তাঁর আপন-ছবি এঁকেছেন। আরও ভাবি, চারিদিক ঘিরে এই যে শিল্পীর মানস-সৃষ্ট ভাবীকালের নূতনের আহ্বান, এর এক একটি অমনি ফুল ফলের দাক্ষিণ্যে ভরা ছায়াদানকারী বৃহৎ মহীরুহে পরিণত হবে কি? হবে কি শিল্পীমনের এই সম্ভাবনার আর আশার সার্থকতা? অথবা শিল্পীর এই স্বাভাবিক প্রত্যয়ের স্বপ্নকে ধূলিসাৎ করে দিয়ে ভাবীকালের ওই তরুণ অভিযাত্রীর দল উপেক্ষিত অবহেলিত নিষ্ঠা, শ্রদ্ধা ও অধ্যবসায়ের তপস্যাহীনতায় পরিণত হবে শুধুই আগাছার জঙ্গলে?

আপন সম্বিতে ফিরে যাই। স্বর্গীয় নন্দলাল বসুর স্মৃতিচয়ন এখনও শেষ হয় নাই।

শ্রদ্ধেয় নন্দলাল বসুর বাড়ীর বাইরে আসতেই সঙ্গী আত্মীয় বললেন—"শিল্পীকে দেখলেন, শিল্পীর আরও শিল্পপ্রতিভা দেখবেন চলুন নন্দনভবনে।"

নন্দন ভবন-এর প্রথম দরজার দুইপাশে শিল্পীর হাতের বৃহৎ দুটি আঁকা ছবি, বাঁদিকের ছবিটি বিখ্যাত হরপার্ব্বতীর ছবি, ডানদিকের ছবিটিও বিখ্যাত ছবি সম্রাট ঔরঙ্গজেবের। সম্রাটের নিজস্ব ভঙ্গিতে দাঁড়ানো পিছনদিকে দুই যুক্তকরের মুষ্টিতে কোরান, জপমালা ও শানিত ছুরিকা একসঙ্গে রয়েছে। সম্রাট ঔরঙ্গজেবের মূর্ত্ত পরিচয়।

নিবদ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে প্রবেশ করলাম হলঘরের ভিতরে।

এ কি? উৎসব সমারোহে যেন এ গৃহ চঞ্চল মুখর, সমস্ত দেওয়াল জুড়ে তারই জীবন্ত ছবি।

বুদ্ধজীবন কাহিনীর অংশ। হয়ত কোন উৎসব দিনের অসংখ্য সু-সজ্জিত নর-নারী সেই বৌদ্ধযুগের বস্ত্রালংকারে বিভূষিত অপূর্ব দৃপ্তভঙ্গিমায় পুষ্পমাল্য,

শঙ্খপদ্ম হস্তে বিবিধ বাদ্যবাদন রত; সু-সজ্জিত বিচিত্র ভঙ্গিতে গতিমান্ হস্তীযূথ, সব মিলে সমস্ত দেওয়াল জুড়ে যেন চলমান উৎসবের ছুটো-ছুটি লেগে গিয়েছে।

স্তব্ধ বিস্ময়ে দেখতে লাগলাম। এমন জীবন্ত ছবি আর দেখি নি। কে বলবে রং তুলি সহযোগে নির্জীব দেওয়ালের চিত্র এ। অপূর্ব—অপূর্ব। শুনেছি অজন্তা-গুহা পরিদর্শনের পর তারই কিছু প্রতিচ্ছবি শিল্পী এই নন্দনভবনে চিরঞ্জীবী কলাবিন্যায় আবদ্ধ করে রেখেছেন।

' '—চলুন, অনেক বেলা হয়েছে। আত্মীয়ের দিকে ফিরে তাকাই, তারপর নতশিরে সেখান থেকে বিদায় নিই।

(প্রতিমা দেবী)

সাইকেল রিক্শা করে চলতে চলতে ঘোষ মশাই বললেন—এবার কোথায় যাবেন?

—এই যে বললেন বেলা হয়েছে, এখন কি আর কোথাও যাওয়া যাবে?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, এখন মাত্র দশটা। আপনি যা তন্ময় হয়ে গিয়েছিলেন, আমি না তাগিদ দিলে আজ আর হয়ত ওখান থেকে ফিরতেন না।

সহাস্যে বলি—"যা বলেছেন, তাহলে আজ আপনাদের বৌঠানকে দেখান।"

প্রথমে যাই শ্যামলীতে। রবীন্দ্রনাথের মানস-সৃষ্টি মাটির ঘর। ভিতরে ঢুকে ঘুরে ঘুরে দেখি, কোথায় কবিগুরু বসতেন, লেখাপড়া করতেন, অন্যান্য কাজকর্ম ও অবস্থান করতেন। পিছন-দিকের বারান্দায় পুরানো-দিনের রবীন্দ্রনাথের ব্যবহৃত পরিত্যক্ত পালকী-খানা রয়েছে প্রায় ভাঙ্গা-চোরা অবস্থায়, দেখি আর কল্পিত স্মৃতির অবগাহনে ডুবে যাই।

প্রতিমা দেবী। রবীন্দ্রনাথের চিরস্নেহের পুত্রবধূ, শান্তিনিকেতনের বৌঠান। থাকতেন উত্তরায়ণে। সেখানে প্রবেশ পথের উপরে ছাদে গায়ে নীলমণির লতা লতিয়ে উঠেছে। কবির কবিতায় এই নীলমণির লতার কথা প্রকাশিত। প্রথম দৃষ্টিতেই চক্ষুকে আকৃষ্ট করে নিল। মরি, মরি, নীলমণি ফুলের কি রূপ, এমন নীল রং দেখতে পাওয়া দুর্লভ। নীলকান্তমণির দানাগুলো যেন থোকা থোকা হয়ে দুলছে।

আত্মীয় নিয়ে গেলেন প্রতিমাদেবীর ঘরে। প্রতিমাই—। সুদৃশ্য পুরাতন কাষ্ঠাসনে শুভ্র থান পরিহিতা প্রৌঢ়া যেন একখানি শ্বেতমর্মর প্রতিমা। রবীন্দ্র-তনয় রথীন্দ্রনাথ তখন বিগত। তাই এই শুভ্রবেশ। তাতেই এত রূপ। যৌবনশ্রী যখন সারা-দেহে ব্যাপ্ত ছিল, তখন কি রূপ ছিল কল্পনা করি।

মনে পড়ে গেল রথীন্দ্রনাথকে আমি দেখেছিলাম কলিকাতায় নিউ এম্পায়ারে শান্তিনিকেতন গোষ্ঠীর "তাসের দেশ" অভিনয় হয়েছিল, সেই আসরে। রাজ-পুত্রের অভিনয় করেছিলেন স্বয়ং শান্তিদেব ঘোষ। সেইখানে রথীন্দ্রনাথ ঘোরাফেরা করছিলেন। প্রতিমাদেবীর চেহারা দেখে তিনি নেই স্পষ্টই অনুভব হ'ল।

আলাপ করলেন। সেই কুশল প্রশ্ন—কোথা থেকে এসেছি, কোথায় থাকি, গুরুদেব থাকতে বুঝি এখানে আসা হয়নি?

সলজ্জ দুঃখের সঙ্গে বলি—না, সে সৌভাগ্য আমার হয়নি। এখানেও না, এমনকি অন্য কোথাও না। অনেক ইচ্ছা, অনেক চেষ্টা থাকতেও।

একটি কথা বলতে চরম শরমে আটকাল। দেখেছিলাম গুরুদেবের শ্রীমুখ তাঁর জীবনে নয়, মরণের পর। দেহান্তের পর সমুদ্রপ্রমাণ শ্মশানযাত্রী জনস্রোতের মধ্যে একখানি ফুটন্ত শতদল যেন ভেসে চলেছে। সারা দেহ পুষ্পরাশিতে আবৃত।

কিন্তু সে কি আর প্রকৃত দেখা, একথা কি আর প্রকাশ করার যোগ্য? দুর্ভাগ্যের এই করুণ কাহিনী?

আরও দুই-একটি আলাপের পর প্রণাম করে বিদায় নিই। ঘোষ মশাই নিয়ে যান বাগান দেখাতে।

প্রধান স্মরণীয় পারিজাত ফুলের গাছ। এতদিন যা

ছিল কল্পমায়া, তা কি আজ কায়া হয়ে ধরা দিল? না, ফুল দেখতে পাওয়া গেল না। শুধু গাছ।

আমি শান্তিনিকেতন গিয়েছিলাম ফাল্গুনের নব পল্লবিত শালবন আর আম্রমুকুলে ভরা বসন্তকালে। যখন ঝাঁকে ঝাঁকে ওড়ে ছোট ছোট "মৌচুষি" পাখীর দল; তখন এ পারিজাত ফুল ফোটে না। তাই পারিজাত ফুল দেখা হ'ল না। সযত্ন রোপিত কত বিচিত্র তরুগুল্মে ভরা প্রশস্ত বাগিচা দেখে এলাম ফলের বাগান দেখতে।

স্বর্গীয় রথীন্দ্রনাথের হস্তসৃষ্ট লতানো আম গাছ দৃষ্টি আকর্ষণ করল। লতানো ফুল গাছ দেখেছি, গোলাপ লতা, জুঁই লতা। লতানোর ফলের গাছ কথনো দেখিনি।

রথীন্দ্রনাথ ছিলেন একজন বিশেষ উদ্ভিদ্‌বিদ্যাবিদ্‌। বাঁশের বাখারির উপর দিয়ে লতিয়ে লতিয়ে গিয়েছে আম গাছ। বিস্ময়ে, আনন্দে চেয়ে চেয়ে দেখি, সেই আম-বাগানের পাশে পোষা ময়ূরের নাচ দেখে সেদিনকার ভ্রমণ শেষ করি।

উত্তরায়ণে রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিরক্ষার প্রদর্শনী সেদিনও তত বিস্তার লাভ করেনি। যে যে জিনিষ রাখা হয়েছিল সেগুলি পরিদর্শন করে গেলাম ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীর সঙ্গে দেখা করতে।

(ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী)

ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীর সঙ্গে আমার পূর্ব্বে পরিচয় ছিল। আমার পরিচালিত কলিকাতার মহিলা-সমিতির সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে তিনি দুইবার এসেছিলেন। একবার নব-আষাঢ়ে মেঘোৎসবে, আর একবার বোধহয় বাৎসরিক উৎসবে, ঠিক মনে নেই।

আমার অটোগ্রাফের খাতায় আমার নাম জড়িয়ে কবিতা লিখে দিয়েছিলেন। তাঁর হাতের সেই অক্ষয়-স্বাক্ষর আজও আছে।

তাঁর কাছে গেলে যত্ন করে ডেকে বসালেন। অনেক রকম আলাপ হলো। একসময়ে একখানা মাসিক পত্রিকা এনে দেখালেন। নাম "আলাপনী"। শান্তিনিকেতনের গৃহিণী ও বধূ মেয়েরা এটি প্রকাশ করেন। প্রতিমাসের শেষ সপ্তাহে নির্দিষ্ট দিনে তাঁদের বৈঠক বসে। সে বৈঠকের নামও 'আলাপনী'। আলাপ, আলোচনা, সঙ্গীত ও শিল্পচর্চা এইসব হয় সেই বৈঠকে। হয় পত্রিকা প্রকাশ, সম্পাদনা উনি নিজে করতেন কিংবা অন্য সভ্যা করতেন সে কথা আজ মনে পড়ছে না। জানি না সে "আলাপনী" বৈঠক আজও আছে কি না। কয়েকখানা আলপনী পত্রিকা আমাকে উপহার দিয়ে মিষ্টভাবে বিদায় দিলেন। চলে এলাম। সেই তাঁর সঙ্গে শেষ দেখা।

(সৈয়দ মুজতবা আলী)

শান্তিনিকেতনের আরও একজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার ইচ্ছা ছিল মনে মনে। কিন্তু বিগত দুদিন আর সে কথা প্রকাশ করিনি। সেদিন সন্ধ্যার পর ঘোষ মশাইকে বল্‌লাম—"আলী সাহেবকে একবার দেখা যায় না, সৈয়দ মুজতবার চিরদিন লেখাই পড়েছি, দেখিনি কখনো।"

ঘোষ মশাই—"কেন যাবে না? তিনি আমাদের বাড়ীর কাছেই থাকেন। আমি এখুনি যাচ্ছি, ব্যবস্থা করে আসব।"

পরদিন সকালে প্রস্তুত হয়ে গেলাম মুজতবা আলীর সঙ্গে দেখা করতে।

ছোট বাসা। ছোট বারান্দা পেরিয়ে বসবার ঘর। টেবিলের চারপাশ ঘিরে কত যে বইপত্র সং আসবাব সাজানো রয়েছে। কত কলম, কত রকমের, হঠাৎ দেখলে মনে হয় যেন কোন চিত্রশিল্পীর ঘর।

মাঝখানে লেখার টেবিল, তারই ওপাশে নিজের চেয়ারে বসে আছেন আলী সাহেব।

ধবধবে পাটভাঙ্গা শান্তিপুরী ধুতি পরণে, তেমনই পাটভাঙ্গা সিল্কের পাঞ্জাবি গায়ে। ধবধবে ফর্সা গায়ের রঙ, গোলাপী আভা।

আমরা ঘরে প্রবেশ করতে সসম্ভ্রমে বসতে বললেন। কিন্তু অনেকক্ষণ তিনি নতমুখে বসে রইলেন। একবার তাকালেন না, কথাও বললেন না।

কলিকাতার অচেনা আগন্তুক। তায় স্ত্রীলোক। কিছু পরিচয় অবশ্য দিয়ে এসেছিলেন আমার, না হলে হয়ত সাক্ষাতের ব্যবস্থাই হত না।

আলী সাহেবের ওই সঙ্কুচিত ভাব লক্ষ্য করে আমিই কথা বললাম। বললাম—"আপনাকে দেখতে এসেছি।"

তখন মুখ তুললেন, সহাস্যে বললেন—"আমাদের কি দেখবেন? আমরা তো এক-একজন আলু পটল ব্যবসায়ী।"

বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে হাসতে লাগলাম আমরা সকলেই।

জানতাম অত্যন্ত রসিক। তাঁর লেখা পড়ে কত যে হাসতে হয় তা জানতাম। তেমনি এ রসিকতার কথা।

বললাম—এরকম কথা ত কখনও ভাবি নি।

আলী সাহেব বললেন—"তবে কি ভেবেছিলেন? ভেবেছিলেন এসে দেখবেন, আমি বসে বসে গোলাপ-ফুলের পাপড়ি ছিঁড়ছি?"

হাস্যরসিকের প্রত্যক্ষ পরিচয়ে কৌতুক অনুভব করতে লাগলাম। বলতে ইচ্ছা হ'ল গোলাপ ফুলের পাপড়ি ছিঁড়তে দেখলাম না ঠিকই কিন্তু আপনার চেহারাখানা যা তাতে ফুটন্ত বস্‌রাই গোলাপ দেখা হয়ে যায়।

বলতে সংকোচ হ'ল, তাই বলা হ'ল না। নীরবে হাসি দমন করে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে রইলাম তাঁর দিকে।

হাস্যকৌতুকের ফোয়ারা বইয়ে আলী সাহেব বলতে লাগলেন, কিসে লেখকরা এক-একজন আলু পটলের ব্যবসায়ী নয়?

সব কথা মনে রাখতে পারিনি, একটি কথা মনে পড়ছে, অনেক লেখককে মেয়ের বিয়ের জন্য প্রকাশকদের কাছ থেকে টাকা দাদন নিতে হয়। এমনি আরও কত কি। সেই সঙ্গে ক্রমে ক্রমে বললেন কত দেশবিদেশের গল্প, কত ঐতিহাসিক তথ্য। যা আমি ওঁর লেখায় পড়িনি। দুঃখ হ'ল, এরকম জানলে একটা কাগজ কলমের ব্যবস্থা নিয়ে যেতাম, তা'হলে আজ সব কথা মনে থাকত।

আর একটি মাত্র কথা মনে আছে, পূর্ববঙ্গ-পশ্চিমবঙ্গ সম্বন্ধে সরস গল্প বলতে বলতে বলেছিলেন—"হিন্দু মুসলমানে ঘনিষ্ঠ মিলন ঘটে যখন হিন্দুরা বৈশাখ মাসে কাসুন্দি তৈরী করে।"

খুব হাসলেন এই কথায়। বেলা হয়ে গিয়েছিল, উঠে পড়লাম। বারান্দা অবধি এসে আলী সাহেব সহাস্যে, সসম্ভ্রমে আমাদের বিদায় দিলেন।

পরদিন শ্রীনিকেতনের শিল্প প্রতিষ্ঠান দেখে রবীন্দ্রতীর্থ পরিদর্শন শেষ করে ফিরে এসেছিলাম কলিকাতায়।

পরীক্ষা ঘরের আবোল তাবোল

পরিমল গোস্বামী

॥ ৫ ॥

এবারে অপেক্ষাকৃত সহজ ইংরেজী থেকে অনুবাদের কয়েকটি নমুনা দিচ্ছি। ইংরেজী অনুচ্ছেদটি ছিল এই—

After spending a great part of the night in anxiety, I got up and walked among the trees, but not without fear of danger. When I had gone a little farther into the island, I saw an old man who to me seemed very weak and feeble. I asked him what he did there, but instead of answering me he made a sign for me to take him upon my back and carry him over the stream. I thought he was really in need of my help, so I took him upon my back, and, having carried him over, bade him get down.

এই অনুচ্ছেদের প্রথম অংশটি বাদ দিয়েছি, কারণ সে অংশ সবাই মোটামুটি ভালই লিখেছে। এর ভিতর থেকে কিছু কিছু অংশের অনুবাদ তুলে দিচ্ছি।

১। যখন আমি ছোট ছিলাম তখন দ্বীপপুঞ্জে লোক দেখে ভয় পেয়েছিলাম। আমি জিজ্ঞাসা করার পর সে স্রোতের সঙ্গে মিশে গেল। আমি ভাবিয়াছিলাম যে সে আমাকে সাহায্য করিতে আসিয়াছিল। সে আমার পিছনে এসে আমাকে বার বার চেষ্টা করল। (carried = tried ? চেষ্টা করল ?)

২। সে আমাকে ভাবিয়াছিল আমি বড় ভীতু। আমাকে উত্তর দিয়াছিল যে সে আমার জন্য এক ঋতু ধরিয়া অপেক্ষা করিতেছে। (?)

৩। উত্তরে বলিল আমার জন্য একটি স্মৃতি তৈয়ার করিতেছিল। (made a sign for me, sign = স্মৃতি।)

৪। আমি চিন্তা করিলাম বাস্তবিক সে আমার সাহায্যকারী। সে আমাকে পিঠে করিয়া পার করিয়া দিল। আমি নামিলাম, তাহাকে বিদায় দিলাম।

৫। তাহাকে পিঠে করিয়া লইয়া বিছানায় নামাইয়া দিলাম। (bade = bed = বিছানা।) • •

৬। সে প্রত্যুত্তরে বলিল আমি তোমার পিঠের জন্য একটি নদীর রেখা আঁকিয়াছিলাম। (a sign = চিহ্ন = রেখা, made আঁকিয়াছিলাম।)

৭। যখন আমার কাকা এই দ্বীপ হইতে চলিয়া গেল (farther = father = কাকা।)

৮। উত্তরের পরিবর্তে সে গানের সুরে আমাকে নদী পার করে দিতে বলল। (sign = sing = গান।)

৯। যখন আমি আইসল্যাণ্ডের কিছুদূর গেলাম (island = আইসল্যাণ্ড।) সে নদী পারের জন্য আমার সাহায্য চাহিল এবং পশ্চাৎ ধরিবার জন্য গান শুনাইল।

১০। যখন আমি আয়ার্ল্যাণ্ডে গিয়াছিলাম। (island = আয়ার্ল্যাণ্ড।)

১১। সে উত্তর করিল সে আমার পিছনে নদীর ধারে একটি চিহ্ন স্থাপন করিয়াছে।

১২। রাত্রি অনেক হইলে সেখান হইতে হাঁটিয়া একটি গাছের কাছে যাইতেই এক বিপদ। (among the trees = একটি গাছের কাছে।) যখন আমি হ্রদের ধারে (island = হ্রদ) যাইতেছিলাম আমি এক বৃদ্ধকে দেখিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম কোথায় যাচ্ছ? সে জানাল সে গান জানে। (sign = গান।)

১৩। যখন আমি একটি দ্বীপের frather-এর নিকট গেলাম।

১৪। ক্ষীণ ও দুর্বল একটি স্ত্রীলোককে দেখিলাম।

১৫। তখন পিতা দ্বীপে এক বৃদ্ধকে দেখিয়াছিলাম। (farther—father—পিতা।)

ব্যাকরণের নানা দৃষ্টান্ত

১। আমাদের উচ্চারণের মধ্যে কতকগুলি স্বর আছে· যেমন অ আ ইত্যাদি। ইহাদের মধ্যে কোনটি উঁচু, কোনটি নীচু আবার কোনটি মধ্যম। উচ্চারণে এই সকলের সঙ্গীত রক্ষা করার নাম স্বরভক্তি অর্থাৎ স্বরে ভক্তি প্রকাশ।

২। যদি কোন বাক্যে দুইটি কর্ম থাকে তাহা হইলে তাহাদের একটি গৌণ কর্ম ও একটি মৌন কর্ম থাকে। এই বাক্যে যেটি প্রধান তাহাকেই গৌণ কর্ম বলে। যেমন গোয়ালা গরু হইতে দুধ দোহন করিতেছে।

৩। অলুক সমাস বলে কোন সমাস নাই। তবে বহুব্রীহি সমাসে সপ্তমী বিভক্তিতে ইহা লুক বা লোপ পায়—যেমন বাঁদরামি। (আসলে লোপ পায় না বলেই অলুক দৃষ্টান্তটা নিতান্তই "বাঁদরামি"।

৪। মিত+আলি—অপত্যার্থে মিতালি তদ্ধিত প্রত্যয়।

৫। মিশ+উক—মিশুক সম্মানার্থে ,, ,,।

৬। তামা+টে—তামাটে অপত্যার্থে ,, ,,।

৭। তামা+টে—তামাটে, যে খুব তামাক খায় এই অর্থে তদ্ধিত প্রত্যয়।

৮। যে সকল শব্দের উত্তর নিচ প্রত্যয় হয় ও নিচ প্রত্যয়ান্ত হয় বা নিচ ধাতু হয় তাহাকে নিজন্ত ধাতু বলে। যথা অম্ল অম্বল।

৯। ভাববাচ্যকে ‑পুক্ত কর্তা বলে যথা রাস্তা, নদী।

১০। যে ব্যাকে (বাক্যে) কর্ম কর্মবাচ্যে কর্তারূপে প্রকাশিত হয়, এবং ব্যাকে কর্তাকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, তাহাকে কর্মকর্তৃবাচ্য কহে। যে ব্যাকের চালনায় ক্রিয়া অন্যে করে তাহাকে নিজন্ত ক্রিয়া কহে।

১১। তালব্য বর্ণ—যে বর্ণ তালব্য দিয়া উচ্চারণ করিতে হয়, যথা তাল দিয়া বড়া তৈয়ার।

কাবুলিওয়ালা গল্পের স্মৃতি

১। রহমত এই ক্ষুদ্র বালিকাটিকে কিসমিস প্রভৃতি দিয়া তাহার ক্ষুদ্র লুব্ধটিকে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলাম। (স্পুনারিজমের দৃষ্টান্ত?)

২। রহমতের বজ্রাদপি কঠোরাণি ও মিনির মৃদুনানি চরিত্রটি ফুটিয়া উঠিয়াছে।

অনধিকার প্রবেশ গল্পের স্মৃতি

১। জয়কালী দেবীর রাধারমণের জিউ ছিল। (মূল গল্পে আছে জয়কালী দেবীর রাধানাথ জিউর মন্দির ছিল।)

২। রাধানাথ জিউয়ের মন্দির ছিল।

৩। রাধানাথ জিউরির মন্দির ছিল।

৪। রাধা জিউরির মন্দির ছিল।

৫। তাঁহার জয়কালীর মন্দির ছিল।

৬। মাধবীতানের গাছ ছিল। (জয়কালীর ঠাকুর বাড়ীতে মাধবী বিতান ছিল।)

৭। মাধবী লতানের গাছ ছিল।

৮। জয়কালীর মুক্তি যত কঠোর হউক। (মুক্তি = মূর্তি।)

৯। নলিনের ক্রন্দ্ব ক্রমে নিস্তব্দ্ব হইতে লাগিল। (বলবার উদ্দেশ্য ছিল নলিনের ক্রন্দন ক্রমে নিস্তব্ধ হইয়া আসিতে লাগিল। মূলে আছে; নলিনের আর্তকণ্ঠ যখন পরিশ্রান্ত ও মৌনপ্রায় হইয়া আসিয়াছে......। সম্ভবত নোট বই পড়ে যা মনে আছে তাই লিখতে চেষ্টা করেছে।

১০। মন মালিন্দর সৃষ্টি হইয়াছিল। ('মনোমালিন্য' কোনো নোটে থাকতে পারে। মূলে আছে, বিচ্ছেদের সম্ভাবনা ঘটিয়াছিল।)

১১। মাধবিতানের বাগান ছিল।

১২। মাধবী বিদান ফুল ছিল।

১৩। সুরাপানে উন্মুক্ত ডোমের দল। (উন্মুক্ত = উন্মত্ত।)

১৪। তিনি রোগীকে সিদ্ধ হস্তে সেবা করিতেন।

১৫। জয়কালী দেবীর খুব পণ্ডিপত্তি ছিল।

১৬। তিনি খুব বুদ্ধিমুক্তি নারী ছিলেন।

১৭। জয়কালীর চরিত্রে খুদ নাই।

অনুবাদ

১৯৫৩ সনের স্কুল ফাইনালের প্রশ্নপত্র হারিয়ে গেছে, তাই দুটি সম্পূর্ণ অনুবাদ আমার কাছে থাকা সত্ত্বেও মূল ইংরেজী সম্পূর্ণ দেওয়া গেল না। অতএব টুকরো লাইনের অনুবাদ নমুনা দিচ্ছি।—একটি অনুবাদ ছিল গ্যালিলিও সম্পর্কে। প্রথমেই Galileo নামটি কতরকম ভেবেছে (এবং চোখের সামনে ছাপা অক্ষরে দেখেও!) তার নমুনা—

১। জ্যালিলিও, ২। গ্যালিও, ৩। গ্যালিউ, ৪। গ্যালো, ৫। গোালিও, ৬। গ্লিলো, ৭। জেলিও, ৮। গিলারমো, ৯। গালিও, ১০। গ্যারিবল্ডি।

এর মধ্যে গিলারমো ও গ্যারিবল্ডি, ব্যাখ্যার বাইরে। চোখের ভ্রান্তি শুধু নয়, মনে হয় স্নায়ুর ভ্রান্তি। খুব ভয় পেলে—যাকে বলে নার্ভাস হওয়া—তেমন অবস্থায় এটি সম্ভব।

১। He had strange magical powers with which he could perform wonders.—তাহার এমন একটা শক্তি ছিল যাহার সাহসে সে ঘুরিয়া বেড়াইত। (wonders = wander = ঘুরিয়া বেড়ান।)

২। He was therefore called to Rome to appear before the Church authorities—

ক। গীর্জার গ্রন্থকারগণের সম্মুখে রোমেতে বলিয়াছিল। (authorities = authors, এবং called = বলিয়াছিল।)

খ। এই কারণে তাঁহাকে রোমের চার্চে গিয়া অথারাইজ করিতে হইল।

গ। সে রোমের চার্চের গ্রন্থকারদের নিকট গিয়াছিল।

ঘ। পূর্বে তাহাকে Rome to appear বলা হইত চার্চের সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা হইবার আগে। (therefore = before = পূর্বে। called = বলা হইত। 'অভিজ্ঞতা' কি করে এল বোঝা যায় না।)

৩। He will be sent to prison—তাহাকে ফাঁসিতে পাঠান হবে।

৪। মূল ইংরেজী বাক্যটি দেওয়া না গেলেও অনুবাদ বুঝতে অসুবিধা হবে না যথা: গ্যালিলিও বিশ্বাস করিতেন যে চন্দ্র পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরে না...। (চন্দ্র, ইংরেজী sun-এর বাংলা!)

৫। নক্ষত্র ও চারাগাছগুলি সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। এখানে মূলে ছিল planets, তা থেকে plants = চারাগাছ। এই অর্থ অনেকেই লিখেছে।)

৬। Galileo pretended to give up his beliefs—নিষ্ঠুর শাস্তির ভয়ে সে পেয়াদাদের পাঠাইয়াছিল। (pretended = sent = পাঠাইয়াছিল। beliefs = bailiffs = পেয়াদাগণ। belief মানে কি জানে না, কিন্তু bailiff জানে!)

৭। He was 78 when he died.—এই 78 এর অর্থ কি ভাও বিভিন্ন পরীক্ষার্থীর কাছে বিচিত্র রূপ ধরেছে। এরও ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যাবে না। যথা, ৮০ বৎসর, ১৯ বৎসর, ১৮ খ্রীষ্টাব্দ, ৭২ বৎসর, 18 বৎসর, ৭০ বৎসর, ৮০ বৎসর, ৮২ বৎসর, ৮৫ বৎসর, ६৮ বৎসর। 78 কথাটি চোখের সামনে দেখে এই ঘটনা কি করে সম্ভব হল। এও কি 'নার্ভাসনেস'?

৯। রোমে তাহাকে চার্চের গ্রন্থের বিপক্ষে বলা হইত।

১০। তিনি ডাকিয়াছিলেন গির্জার আর্চবিশপকে রোমে উপস্থিত থাকিতে।

নানা বাক্যে ভাষার নমুনা

১। মৌমাছি রবীন্দ্রনাথের পায়ে হুং ফুটাইয়াছিল।

২। আমাদের মনে কি ফুর্তি!

৩। পশুপক্ষীরা তাহাদের কঠোরের বাহির হয় না।

৪। আমি থাকিতাম স্কুল বোর্ডিনে।

৫। সার্জারি হইতে বহু চারাগাছ আনিয়াছিলাম।

৬। তালব্যবর্ণ জিব্রার অগ্রভাগে মুখের ভিতর উচ্চারিত হয়।

৭। নববর্ষে ধরিত্রীর বুকে কতশত বনস্পদ কীট-পতঙ্গ আপন আপন কর্তব্যভার ভুলিয়া উদাসীন ভাবে তৃণরাজির উপর ছুটিয়া বেড়ায়।

৮। আমি তাঁহার নিকট শীল ম্যাচে উপযোগিতার জন্ম আহ্বান করিলাম।

৯। বহু ধনীব্যক্তি গরীব দুঃখীকে ভোজন করেন।

১০। প্রবাসীগণ আনন্দবর্দ্ধন দ্বিগুন ভাবে বর্দ্ধিত করিয়া তুলে।

১১। আমি বোধ্যগমন করিতে পারি না।

১২। তাম্রমুদ্রা দিয়া আমার পকেট ভীর্ত করিয়া দিয়াছিল।

১৩। পতিমা বিশ্বার্জ্জনের সময়........।

১৪। কালবৈশাখীর ছড়।

১৫। নিভ্রীত গুহায় বাস করে।

১৬। ভগবানের কাছে আমরা চিরকাল কৃতঘ্ন।

১৭। গ্রীষ্মে বসন্ত কোথায় অন্তর্নিহিত হইয়া যায়।

১৮। কথাগুলি অত্যন্ত স্নেহগর্ভ হইতে উত্থিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই।

১৯। চাঁদ সদাগরের অবস্থা মোহনীয় হইয়া উঠিল।

২০। ফুই ফুই করিয়া বৃষ্টি হইতেছে।

২১। ইহাকে বর্ষাকাল বা winter season বলে।

২২। বাঘিনী একটা হইতে দুইটি বাচ্চা প্রসব করিয়া থাকেন।

২৩। বর্ষার আকাশে সূর্য্যোদয় খুব কম উদিত হয়।

২৪। সুজালা সুফালা শস্য সম্যালা।

২৫। লুৎফুন্নেসা ক্রীতদাসী রূপে আসিয়াছিলেন, ইহার রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া তিনি ইহার জলগ্রহণ করিয়াছিলেন। (বাণাপানি থাকলেও নিশ্চয় "বাণা জল" লিখত ছেলেটি। ভেবেছে এটি পানি, সংস্কৃত জাত, হিন্দিতে বলে, অতএব বাংলায় জল লেখাই ঠিক।

২৮। একান্নবর্তী পরিবার প্রথা আজ প্রায় উৎসাহিত হইতে চলিয়াছে।

২৯। টেলিভিশন প্রভৃতি দ্বারা ইংরাজীতে যাহাকে বলে coltureal হওয়া যায়।

৩০। তাহার মনে সিংহা বিদ্বেষ নাই।

৩১। বোর্ডানিকেল গার্ডেন। বটানিকাল গার্ডেন। বার্ণাট সাহেব (বারনার্ড শ—বারনাট সাহেব হয়েছেন।)

৩২। fully dressed—অত্যন্ত দুঃখপূর্ণ অবস্থায় ছিলেন। (dressed—distressed ?)

৩৩। এখন একান্তবর্তী পরিবার কম দেখা যায়।

৩৪। নৌকার মধ্যে একজন মাঝি ও একজন মোল্লা ছিল।

৩৫। আমি কিলান্ত হয়ে পড়েছিলাম।

৩৬। রাশিয়ার প্রধান স্টালিন, তিনি একজন বিজ্ঞান।

৩৭। (১) তিনি উদ্বোধনে মারা গেলেন। (২) তিনি উদ্বর্ধনে মারা গেলেন।

৩৮। জলে স্থলে অন্তরাত্মায় গ্রীষ্মের পদধ্বনি শুনা যাইতেছে।

৩৯। আমি বড়ই গর্ভ অনুভব করিতাম।

৪০। একটি তীর আসিয়া তাহাকে বৃদ্ধ করেন।

৪১। ম্যাট্রিপলিটান ইনসটিট্যুশন। মেট্রোপলিং ন কলেজ।

৪২। বর্ষা রুদ্ধ মূর্তিতে ধরণীকে গ্রাস করিতে উদ্যত হয়। দেখিলে ভীত সঞ্চার হয়।

৫৩। আমাদের text পরীক্ষার দেরী নাই।

৫৪। তিনি সাক্ষীর কাঠগোলায় দাঁড়াইলেন।

৫৫। "আমায় পদানত করে দাও হে তোমার চর ধূলির তলে।" (উদ্ধৃতি)

৫৬। ইহাই উপন্যাসের তুঙ্গ মুহূর্ত বা crimax।

৫৭। বঙ্কিমচন্দ্র রচিত জনগণমন গাহিতে লাগিলাম।

৫৮। শরতে কুমুদ শালিথ ইত্যাদি ফোটে।

৫৯। গোয়ালা গাভী হইতে দুগ্ধ দহন করিতেছে।

৬০। লাতেহার পাহাড়টি সঞ্জীবচন্দ্রের মনে বেশ রাখপাতা করিয়াছিল।

৬১। সৌন্দর্য আমার হৃদ স্পর্শ করে।

৬২। মনে হয় যেন দেবরাজের রথ আসিয়া বাংলায় সুভাষ বিতরণ করিতেছে।

৬৩। সঞ্জীবচন্দ্রের মনে ছন্দাক্রান্ত শব্দ স্পষ্ট বাজিয়া উঠিল। লেখক খুশী হইয়া আত্মপ্রশস্ত লাভ করিলেন। (মন্দাক্রান্তা ছন্দ—ছন্দাক্রান্ত শব্দ।)

৬৪। দাসী কতকগুলি মিষ্টান্ন লইয়া আসিত, আর তাহা পান করিত।

৬৫। পাথর বিদীর্ণ করিয়া একটি অশ্বত্থ গাছ জন্মিয়াছে।

৬৬। মেঘাবৃত্ত ও ঘনায়মান ধূর্ঘটিকার মত প্রলয়ের সৃষ্টি হয়।

৬৭। গৃষ্ম, বর্ষা, সরৎ, হেমন্ত, শিত, বশন্ত—ছয় ঋতু।

৬৮। উভয়েই দুইজনে ধার্মিক ছিলেন। তৈল্যের অভাবে বিদ্যাসাগর রাত্রিতে রাস্তায় পড়িতেন।

৬৯। লুৎফুন্নেসা প্রথমে নর্ত্তকীরূপে সিরাজকে ধাতহারা করেন।

৭০। তিনি পুষ্পফেন নিভ শয্যায় শুইতেন।

৭১। যীশুখ্রীষ্ট প্রচার করিয়া গিয়াছেন univershal brotherhood।

৭২। লাগুরদোল্লা সব সময় চাঁকা ঘুরাইতেছে।

বাঙালী ছাত্রদের ইংরেজী ও বাংলাভাষার জ্ঞান প্রায় একই রকম দেখা যাচ্ছে। অবশ্য শতকরা ১৫ এই রকম ছিল তখন। যারা ভাল, তারা প্রকৃতই ভাল লিখত, এবং তাদের উত্তরপত্র পড়ে আনন্দ হত।

যাই হোক, আমার ভাণ্ডার এখনও শেষ হয়নি, আরো অনেক আছে এবং নানা জাতীয় আছে। সবই ক্রমশঃ প্রকাশ্য। এবং আগেই বলেছি, এ পর্যায় শেষ হলে পাঠ্যপুস্তক-লেখকদের হাউলারগুলির কিছু নমুনা দেব। অনেক বই আমার হাতে আছে। আপাতত স্কুল ফাইন্যাল নিয়ে আবার আরম্ভ করি। (ছাত্রদের লেখায় স্পুনারিজম ও ম্যালাপ্রপিজম—দুইয়েরই প্রাদুর্ভাব প্রচুর দেখা যায়।)*

এবারে আরো কিছু অনুবাদের নমুনা

মূল ইংরেজী ছিল এই—

As I walked through this valley I perceived, it was strewn with diamonds, some of which were of surprising bigness. I took a great deal of pleasure in looking at them; but presently I saw at a distance a great number of serpents, so big and so long that the least of them was capable of swallowing an elephant. They retired in the daytime to their dens, where they hid themselves from their enemy. I spent the day in walking about the valley. When night came on I went into a cave, where I thought I might be in safety. I ate part of my food, but the serpents which began to appear hissing about in the meantime, put me into such extreme fear, that you may well imagine, I did not sleep.

এই ইংরেজী অংশটুকু স্কুল ফাইনাল সাধারণ ছাত্রের পক্ষে বেশ শক্ত, এই আমার নিশ্চিত ধারণা। সে জন্য অধিকাংশেরই অনুবাদ চেষ্টা হাস্যকর হয়ে উঠেছে। ম্যাট্রিকুলেশন-এর সময় একে কিন্তু কঠিন বলা যেত না, কারণ তখন ছাত্রদের ইংরেজী শেখার দিকে একটু চেষ্টা ছিল। যাই হোক, এই ইংরেজীর অনুবাদের নমুনা দেখা যাক। সবই আংশিক নমুনা—

১। কিন্তু শীঘ্রই আমি দূরে কতকগুলি ষাঁড় দেখিতে পাইলাম। তাহারা এত বড় এবং দীর্ঘ যেন

---

* স্পুনারিজম্—রেভারেণ্ড ডব্লিউ-এ স্পুনার নামক এক ভদ্রলোকের অভ্যাস ছিল বলে খ্যাত, একই বাক্যে কাছাকাছি দুটি শব্দের গোড়ায় ধ্বনিটির স্থান পরিবর্তন। Crushing blow না বলে blushing crow বলা।

ম্যালাপ্রপিজম্—শেরিডানের একটি নাটকের নারী-চরিত্র মিসেস ম্যালাপ্রপের ধরণে কাছাকাছি উচ্চারণের দুটি শব্দ নিয়ে হাস্যকর গোলযোগ। Arrangement of epithets না বলে arrangement of epitaphs বলার মতন।

হাতী ও চাতক পাখীর মত। (serpent=ষাঁড়, swallow=চাতক পাখী।)

২। ছোট সাপটি হাতীর মত ওলট পালট করিতেছিল। (least=ছোট। তারপরের ব্যাখ্যা সম্ভবত wallowing like an elephant !)

৩। এক একটি হাতীর শাবকের মত। (least= ছোট, অতএব শাবক।)

৪। উপত্যকা হীরায় পূর্ণ, উহার মধ্যে কতকগুলি ব্যবসাক্ষেত্র। (bigness=business=ব্যবসাক্ষেত্র।)

৫। তাহারা এত দীর্ঘ এবং বড় যে তাহাদের সমষ্টি একটি হাতীর চেয়েও বেশী।

৬। সাপগুলি এত বড় ও লম্বা যে হাতী হামাগুড়ি দিলে যেমন দেখায় তেমনি দেখিতে। (হামাগুড়ির ব্যাখ্যা পাওয়া যাচ্ছে না।)

৭। সাপগুলি ক্যাপাবিল ও সোয়ালো ছিল। (capable of swallowing থেকে একেবারে সরল চিত্তের অনুবাদ, অতিরিক্ত বোঝার ভান নেই।)

৮। আমি উপত্যকায় ভ্রমণ কালে বিস্ময়সূচক জন্তু দেখিয়াছিলাম যাহা হীরকমণ্ডিত।

পূর্বের ইংরেজী অনুবাদের কয়েকটি অংশ নতুন পাওয়া গেল তার নমুনা দিচ্ছি।—ইংরেজীতে ছিল— When I was a child, my friends, on a holiday, filled my pockets with coppers। অনুবাদ—

১। যখন আমি একটি শিশু ছিলাম, আমার বন্ধুগণ আমার পকেট সম্পূর্ণ বন্ধ করিয়া দিত।

২। যখন ছোট ছিলাম, বন্ধুরা অর্থ বোঝাই পকেট প্রদান করিয়াছিল।

৩। বালকের হস্তে সেবার কাজের জন্য আমার সমস্ত অর্থ দান করিলাম।

একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার—ছেলেরা 'কপার'। শব্দটি তামা রূপো ও কখনো শোনেনি, তাকে তামার পয়সা বা শুধু পয়সা তো ভাবতেই পারেনি। কেউ কপারকে ক্রীপার ভেবে লতা লিখেছে, কেউ ক্রপ ভেবে শস্য লিখেছে, কেউ পিত্তল, কেউ রূপা, কেউ দস্তা, কেউ কর্পূর, কেউ বা সোজা কোপার লিখেছে, কিন্তু তামা কেউ ভাবেনি। যারা ভাল অনুবাদ করেছে তারা পয়সা ঠিকই লিখেছে। আবার যারা পয়সা বা অর্থ লিখেছে তারা বাক্যের গঠন বুঝতে পারেনি, অর্থও বোঝেনি।

পুনরায় ব্যাকরণ বৈচিত্র্য

১। সমানাধিকরণ বহুব্রীহি—যেমন লাঠালাঠি, দুই লাঠির সমান অধিকার।

২। অনন্বয়ী অব্যয়—যে অব্যয় অনুনয় বিনয় প্রকাশ করে।

৩। নঞর্থক বহুব্রীহি—নী অর্থাৎ আলু নাই যাহাতে, আলুনী।

৪। ধেয়ে—দ্রুত বেগে ধাওয়া, কুকুর শৃগালটিকে ধেয়ে করিয়া আসিল।

৫। মনোযোগের সাহায্যে তিনি ধেয়েয়ে নিযুক্ত। (ধেয়ে=ধ্যান।)

৬। করণে—ইহা উদাত্ত স্বর। সকল শব্দ একভাবে উচ্চারিত হয় না। কোন কোন শব্দের উচ্চারণ অন্যের একটু উঁচু দরের। করণে, এই শব্দটি একটু উঁচু দরের।

৭। দশটি রথির উপযুক্ত—দাশরথি।

৮। দাশের রথী—দাশরথি। জমির দার—জমিদার।

৯। যে সমস্ত সমাস খণ্ড খণ্ড হইয়া বিভক্তির সহিত যুক্ত হয় তাহাকে বহুব্রীহি সমাস কহে।

১০। যে বাক্যে কর্তা ও কর্ম চুপ করিয়া থাকে তাহাকে কর্মকর্তৃ বাচ্য বলে।

১১। গৌণ কর্ম—যাহা গুণ প্রকাশ করে।

১২। 'তুমি কি চাও'—ভাববাচ্যে তোমি কি চাউ। ('তোমি কি চাউ' বাংলা হল কিনা সে ভাবনা

পরীক্ষার্থী নয়, তা ভাববেন পরীক্ষক। আগে যেমন 'আছ' ধাতুর রূপ দেখেছি—আছ আছিতম্ আছিতঃ।)

কয়েকটি পরিচিত শব্দের সাহায্যে বাক্য রচনার নমুনা আগে দিয়েছি। যে-সব ছাত্র ঐ-সব শব্দের ব্যবহারিক অর্থ জানে না, অথবা জেনেও পরীক্ষায় বসে ভুলে গেছে, তারা অনেক সময় এমন বাক্য রচনা করে যার স্পষ্ট কোনো অর্থ হয় না। এটা তাদের চাতুরি বলা যায়। যেমন চিনির বলদ দিয়ে বাক্য গঠনে দেখেছি। একজন লিখেছে, 'সে এমন ভাবে কথা বলে যেন চিনির বলদ'। এ বাক্য যে যথাযথ হচ্ছে না, তা সে জানে তবু ভাবে কিছু মার্ক হয়তো পাওয়া যাবে। একটি ইংরেজী হাউলার এই প্রসঙ্গে মনে পড়ল। প্রশ্ন ছিল astronomy ব্যবহার করে একটি বাক্য গঠন কর। একটি মেয়ে লিখেছিল, I can always find the word astronomy in my dictionary। পরীক্ষক এর জন্য কত মার্ক দেবেন?

বিবিধ

(১) তিনি প্রখর নিদাঘে বাড়ী গিয়া পৌঁছিলো। (২) প্রেমের দ্বারা সর্বসাধারণকে অবিমিশ্র করিতে হইবে। (৩) ডুমুরের ফুল গন্ধে ভরা। (৪) চিনির বলদ যথা, মা আমায় ঘুরাবি কত/চোখ ঢাকা বলদের মত। (ক্রমশঃ)

কংগ্রেস স্মৃতি

(চত্বারিংশ অধিবেশন—কানপুর—১৯২৫)

শ্রীগিরিজামোহন সান্যাল

সভানেত্রী মহাশয়া তারপর মহাত্মা গান্ধীকে দক্ষিণ আফ্রিকা সম্বন্ধে প্রস্তাব উত্থাপন করতে আহ্বান করলেন।

মহাত্মাজী বক্তৃতা মঞ্চের দিকে অগ্রসর হতেই সমবেত শ্রোতৃবৃন্দ "মহাত্মাজী কি জয়" ধ্বনি দ্বারা তাঁকে অভ্যর্থনা জানাল।

মহাত্মাজী নিম্নলিখিত প্রস্তাব পেশ করলেন:—

কংগ্রেস দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয় ডেপুটেশনকে সাদর অভ্যর্থনা জানাচ্ছে এবং যে সংঘবদ্ধ শক্তি উক্ত উপমহাদেশে তাঁদের অস্তিত্ব বিপন্ন করছে সেই শক্তির বিরুদ্ধে অসমান সংগ্রামের জন্য দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয় বাসিন্দাদের পূর্ণ সমর্থনের আশ্বাস দিচ্ছে।

কংগ্রেস জোরের সহিত মত প্রকাশ করছে যে "এরিয়া রিজার্ভেশন এ্যাণ্ড ইমিগ্রেশন এ্যাণ্ড রেজিষ্ট্রেশন বিল" ১৯১৪ সালের স্মাটস্-গান্ধী চুক্তি ভঙ্গ করেছে। এই জাতিবিদ্বেষমূলক বিলটি ভারতীয় বাসিন্দাদের অবস্থা ১৯১৪ সালের অপেক্ষা আরও অবনতির জন্যই শুধু পরিকল্পিত হয় নি-ঐ দেশে ভারতীয়দের পক্ষে বসবাস করা অসম্ভব করে তোলার জন্যই পরিকল্পিত হয়েছে।

কংগ্রেস এই অভিমত প্রকাশ করছে যে ভারতীয় বাসিন্দাদের পক্ষ থেকে উক্ত চুক্তির যে ব্যাখ্যা করা হয়েছে তা যদি ইউনিয়ন গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক গৃহীত না হয় তা হলে ১৮৮৫ সালের ৩ আইনের প্রয়োগের ফলে ১৮৯৩ সালে ট্রান্সভালে ভারতীয় বাসিন্দাদের উপর

অত্যাচারের জন্য যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল তা নিষ্পত্তির জন্য যে ভাবে সালিশের উপর ভার দেওয়া হয়েছিল অনুরূপভাবে এই বিষয় নিষ্পত্তির জন্যও সালিশের উপর ভার দেওয়া হোক।

এই প্রশ্ন মীমাংসার জন্য অন্যান্যদের সঙ্গে ভারতীয় প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি গোল টেবিল কনফারেন্সের যে সাজেসশন দেওয়া হয়েছে কংগ্রেস তা সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করছে এবং আশা করছে যে ইউনিয়ন গভর্ণমেন্ট ঐ সাজেসশন গ্রহণ করবে।

কংগ্রেস আরও অভিমত প্রকাশ করছে যে গোল টেবিলের প্রস্তাব এবং সালিশের প্রস্তাব ব্যর্থ হলে ইম্পিরিয়াল গভর্ণমেন্টের সুস্পষ্ট কর্তব্য হবে বিল ইউনিয়ন পার্লামেন্টে পাশ করলে তাতে সম্মতি না দেওয়া।

প্রস্তাব উপস্থিত করে মহাত্মা গান্ধী প্রথমে হিন্দিতে এবং পরে ইংরেজীতে প্রস্তাব সম্বন্ধে বক্তৃতা দিলেন।

প্রথমেই তিনি বললেন যে, সভানেত্রী মহোদয় তাঁর পরিচয় দিয়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকাবাসী বলে। তিনি এই সঙ্গে যোগ দিতে পারতেন "বাই এ্যাডপশন"। যদিও তিনি ভারতে জন্মগ্রহণ করেছেন তথাপি তিনি দক্ষিণ আফ্রিকাকে তাঁর বাসভূমিরূপে গ্রহণ করেছিলেন। যখন দক্ষিণ আফ্রিকার ডেপুটেশনের নেতা ডঃ রহমান এই প্লাটফরমে উপস্থিত হবেন তখন সকলে লক্ষ্য করবেন যে তিনি দাবি করছেন যে দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতবাসীরা তাঁকে (মহাত্মাকে) ভারতকে দান করেছেন।

তারপর তিনি প্রস্তাবিত বিল সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করে বললেন যে, দক্ষিণ আফ্রিকায় তাঁর দেশবাসীদের মাথার উপর বিলটি "ডেমোক্লিস-এর" তরবারির ন্যায় ঝুলছে। বিলটি পরিকল্পিত হয়েছে কেবলমাত্র তাঁদের মস্তকের উপর আরও বেশী অন্যায় চাপাতে নয়। তাঁদের দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে প্রকৃতপক্ষে বহিষ্কার করতে।

ডেপুটেশন এখানে এসেছে ভারতীয় জনগণের, কংগ্রেসের, ভাইসরয় এবং ভারত গভর্ণমেন্টের, এবং তাঁদের মারফৎ ইম্পিরিয়াল গভর্ণমেন্টের সমর্থন লাভ করতে। লর্ড রেডিং যে উত্তর দিয়েছেন তা সন্তোষজনক নয়। তিনি ডেপুটিশনকে বলেছেন যে ডোমিনিয়নের মর্য্যাদাযুক্ত উপনিবেশের আভ্যন্তরিক ব্যাপারে ভারত গভর্ণমেন্ট বা ইম্পিরিয়াল গভর্ণমেন্ট হস্তক্ষেপ করতে পারে না। প্রয়োজন হলে যে হস্তক্ষেপ করে তার প্রমাণ প্রবাসী ইউরোপীয়ানদের রক্ষার জন্য বুয়র যুদ্ধ।

মহাত্মাজী আরও বললেন যে দক্ষিণ আফ্রিকায় গভর্ণমেন্টের ভারতীয়দের তথায় বসবাস সম্বন্ধে ভয়ের একটি প্রধান কারণ ইসলামের আবির্ভাব।

তারপর তিনি স্মাটসের সঙ্গে তাঁর যে চুক্তি হয়েছিল তা যে ভঙ্গ করা হয়েছে সে সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে বললেন। স্মাটস বলেছিলেন যে এটা হল চূড়ান্ত মীমাংসা। ভারতীয়দের আর নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের ভয় প্রদর্শনের আবশ্যক হবে না এবং ইউরোপীয় বাসিন্দারা ভারতীয় সম্প্রদায়কে শান্তিতে থাকতে দেবে। মহাত্মা প্রশ্ন করলেন, কোথায় গেল স্মাটসের সেই শপথ-বাক্য?

মৌলানা মহম্মদ আলী প্রস্তাব সমর্থন করতে উঠে উর্দু'তে অভিভাষণ দিলেন।

তিনি বললেন যে অত্যন্ত দুঃখ ও বেদনার সহিত তাঁকে স্বীকার করতে হচ্ছে যে দক্ষিণ আফ্রিকায় তাঁদের ভাইদের সাহায্য দান ব্যাপারে তাঁরা একান্ত অসহায়, কারণ, বর্তমানে তাঁদের মহান্ নেতা মহাত্মা গান্ধীর চরকার বানী জাতি আর গ্রহণ করছে না। এখন হিন্দু মুসলমান, ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণ, নো-চেঞ্জার স্বরাজী এবং সম্প্রতি স্বরাজী ও রেসপনসিভ কো-অপারেশনিস্ট-পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাচ্ছে। বহির্ভারতে তাদের দেশের লোকেদের সাহায্য দেবার ক্ষমতা অর্জনের জন্য তাদের স্বরাজ লাভ করতে হবে। মহাত্মা গান্ধীর অনুসরণ যদি তারা করত তাহলে তারা সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী জাতির মোকাবিলা করতে

সমর্থ হত। যাই হোক, উপসংহারে তিনি বললেন যে, যখনই প্রয়োজন হবে তখনই তিনি কাজ করতে প্রস্তুত আছেন।

আর পি করাণ্ডিকর (ভূতপূর্ব কেন্দ্রীয় বিধান পরিষদের সদস্য) প্রস্তাবটি ইংরেজীতে সমর্থন করলেন। তিনি বললেন যে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের চাপে পড়ে ভারত গভর্ণমেণ্ট দক্ষিণ আফ্রিকার ইউরোপীয়ান বাসিন্দাদের স্বার্থে চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক আইন পাশ করে। গভর্ণমেণ্ট চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকের মনে এই আশার সঞ্চার করেছিল যে যে সকল শ্রমিক দক্ষিণ আফ্রিকায় যাবে তারা সেখানে নাগরিকের অধিকারে বসতিস্থাপন করতে পারবে। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে তারা সে দেশে যায়। সুতরাং তিনি মনে করেন যে ভারতীয় বাসিন্দাদের সেখানে বাস করার সেই প্রকার অধিকার আছে যা আমাদের এখানে আছে।

প্রস্তাবটি ভোটে গৃহীত হল।

প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পর সভানেত্রী মহোদয়া ডঃ রহমনকে ভাষণ দেওয়ার জন্য আহ্বান করলেন।

বিপুল জয়ধ্বনির মধ্যে ডঃ রহমন বক্তৃতামঞ্চে উঠে প্রথমে তাঁদের নেতা মহাত্মা গান্ধীকে ধন্যবাদ দিয়ে পরে অন্যান্য সকলকে ধন্যবাদ দিলেন।

অন্যান্য কথার পর তিনি মহাত্মাকে তাঁদের ফিরিয়ে দিতে কংগ্রেসের নিকট প্রার্থনা করলেন। তিনি জানালেন যে যদি সামান্য কয়েক মাসের জন্যও তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় যান তাহলেও তাঁদের সমুদয় সঙ্কট দূরীভূত হবে।

উপসংহারে তিনি বললেন, "আমরা আপনাদের সৈন্যরূপে এখানে এসেছি। যদিও আমরা চূর্ণ বিচূর্ণ ক্ষত বিক্ষত হয়েছি তথাপি আমরা পরাভূত হইনি। আমরা সংগ্রাম ত্যাগ করব না। এখন আপনাদের কর্তব্য হবে আমাদের বলা, সৈন্যগণ, তোমরা দক্ষিণ আফ্রিকায় সংগ্রাম চালিয়ে যাও। আমরা সর্বপ্রকারে তোমাদের সাহায্য করব। এবং ভারতের মহান্ গৌরব রক্ষা করব।

বক্তৃতার শেষে সভানেত্রীকে ধন্যবাদ দিয়ে ডঃ রহমন আসন গ্রহণ করলেন।

এমন সময় মৌলানা শওকত আলী দাঁড়িয়ে বললেন যে, এখন মহাত্মা গান্ধী তাঁদের নেতৃত্ব গ্রহণ করুন যাঁরা দক্ষিণ আফ্রিকায় সংগ্রাম করছেন তাঁরা মহাত্মা গান্ধীকে অনুসরণ করবেন।

তারপর এদিনের মত অধিবেশনের কার্য্য শেষ হল। পরদিন দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত অধিবেশন মুলতুবি রইল।

২৭শে ডিসেম্বর বেলা ১টার সময় কংগ্রেসের দ্বিতীয় দিনের অধিবেশন আরম্ভ হল।

পূর্ব্বদিনের মত শোভাযাত্রা সহ সভানেত্রী মহোদয়া প্যাণ্ডেলে প্রবেশ করে তাঁর আসন গ্রহণ করলেন। কয়েকজন বালক কর্তৃক "বন্দে মাতরম্" গীত হওয়ার পর সভার কাজ আরম্ভ হল।

সভানেত্রী মহোদয়া যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তকে বাংলার রাজবন্দী সম্বন্ধে প্রস্তাব উপস্থিত করতে আহ্বান করলেন।

যতীনবাবু নিম্নলিখিত প্রস্তাব পেশ করলেন।

এই কংগ্রেস ১৮১৮ সালের ৩ নং রেগুলেশনের অপব্যবহার এবং স্বৈরাচারভাবে বেঙ্গল অর্ডিনান্স জারি যা পরে ১৯২৫ সালের বেঙ্গল ক্রিমিনাল ল এমেণ্ডমেণ্ট অ্যাক্টরূপে পরিণত হয় তার নিন্দা করছে এবং নির্দিষ্ট অভিযোগ না এনে এবং প্রকাশ্য আদালতে বিচার না করে বহুসংখ্যক বাংলার স্বদেশপ্রেমিক যুবককে উপরিউক্ত রেগুলেশন এবং আইনের বলে গ্রেপ্তার ও অবরোধের তীব্রভাবে নিন্দা করছে এবং পুনঃ পুনঃ বিধান সভার ভিতরে ও বাহিরে অভিব্যক্ত জনমত উপেক্ষা করে তাদের অবরোধ রাখা তাদের প্রতি খারাপ ব্যবহার এবং তাদের বাংলার বাইরে প্রেরণেরও নিন্দা করছে।

প্রস্তাব উত্থাপন করে সেনগুপ্ত মশায় বললেন যে প্রায় চার বৎসর পুর্ব্বে ভারত গভর্ণমেণ্ট দমননীতিমূলক আইনগুলি বাতিল করে তৎপরিবর্তে অন্য কোন পন্থা গ্রহণ

করার জন্য রিপ্রেসিভ ল কমিটী নামে একটি উপদেষ্টা কমিটী গঠন করে। কমিটীর সভাপতি নিযুক্ত হন স্তর তেজবাহাদুর সপ্রু। অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে ছিলেন শ্রীনিবাস শাস্ত্রী, স্তর উইলিয়ম ভিনসেন্ট, যোগেশচন্দ্র চৌধুরী (জে চৌধুরী) প্রভৃতি। ১৮১৮ সালের ৩নং রেগুলেশন বর্জন করা সম্বন্ধে কমিটীর ঐকমত্য হয়, কেবল ব্যতিক্রম হিসাবে কমিটী অভিমত প্রকাশ করে যে সীমান্তের অশান্তির জন্য উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে এর প্রয়োগ করা চলতে পারে। ভারতগভর্ণমেণ্ট কমিটীর সুপারিস অনুমোদন ও গ্রহণ করে প্রতিশ্রুতি দেয় সুপারিস কার্য্যকর করতে আইন প্রণয়ন করা হবে। কিন্তু এই প্রতিশ্রুতি রক্ষিত হয়নি।

এই প্রসঙ্গে তিনি উপেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, সুভাষ-চন্দ্র বসু, সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, নেতাদের বন্দীজীবনের চিত্র সকলের সম্মুখে-তুলে ধরলেন।

উপসংহারে তিনি গভর্ণমেণ্টের উদ্দেশে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বললেন যে অশান্তির মূলোচ্ছেদের জন্য সংবিধান পরিবর্ত্তন দ্বারা স্বরাজের দাবি না মানলে অন্যান্য দেশের গভর্ণমেণ্টের মত একই ভাবে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ধ্বংস প্রাপ্ত হবে।

জয়াকর মশায় খুব দক্ষতার সহিত প্রস্তাব সমর্থন করলেন।

ডাঃ সত্যপাল উর্দ্দুতে প্রস্তাব সমর্থন করলেন।

শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী মশায় প্রথমে হিন্দিতে এবং পরে ইংরেজীতে প্রস্তাব সমর্থন করলেন।

তারপর যমনাদাস মেহেতা ইংরেজীতে,—ডাঃ আনসারী উর্দ্দুতে এবং পুরুষোত্তম রায় হিন্দিতে সমর্থন করার পর প্রস্তাব গৃহীত হল।

পরবর্তী প্রস্তাব উপস্থিত করলেন লালা লাজপত রায়। প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে এই কংগ্রেস গভীর দুঃখ প্রকাশ করছে যে গুরুদ্বার আইনানুসারে বিরোধের মীমাংসা হওয়া সত্ত্বেও আত্মসম্মানের পরিপন্থী কোনপ্রকার অঙ্গীকার না দেওয়ার মত তুচ্ছ কারণে গুরুদ্বার বন্দীদের গভর্ণমেণ্ট এখনও মুক্তি দেয় নি। কংগ্রেস এই মত প্রকাশ করছে যে গুরুদ্বার বন্দীদের মুক্তি না দেওয়া পর্য্যন্ত গুরুদ্বার প্রশ্নের কোন সুষ্ঠু নিষ্পত্তিই হবে না।

প্রস্তাব উত্থাপন করে লালাজী ইংরেজীতে তাঁর বক্তব্য শোনালেন'।

শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার মশাই ইংরেজিতে মৌলানা মহম্মদ আলী উর্দ্দুতে, পাঞ্জাবের পণ্ডিত নেকিরাম শর্মা হিন্দিতে, পাঞ্জাবের গাজী আবদুর রহমান উর্দ্দুতে, বোম্বাইয়ের বি এফ ভারুচা হিন্দিতে এবং সরদার মঙ্গল সিং হিন্দিতে প্রস্তাব সমর্থন করার পর তা গৃহীত হল।

পরবর্তী প্রস্তাব উত্থাপন করলেন টি প্রকাশম্।

প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে অ-বর্মি অপরাধী বিল এবং বর্মার সমুদ্রযাত্রীর ট্যাক্স বিল দুটি দ্বারা নাগরিকদের স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করা হয়েছে। কংগ্রেসের মতে প্রথম বিলটি দ্বারা ভারতীয় বাসিন্দাদের বিপুল স্বার্থ বিপন্ন করা হয়েছে, কারণ, এ দ্বারা নির্দোষ লোকদের কর্ত্তৃপক্ষের দয়ার উপর নির্ভর করতে হবে। কংগ্রেস অভিমত প্রকাশ করছে যে ভাইসরয় যেন এই দুটি বিল অনুমোদন—না করেন।

প্রকাশম্ মশায় জোরাল ভাষায় প্রস্তাবের স্বপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করলেন।

ব্রহ্মদেশের এস্ এস্ হলকর হিন্দিতে প্রস্তাব সমর্থন করলেন।

নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ইংরেজীতে এই প্রস্তাব সমর্থন করলেন।

সভানেত্রীর আহ্বানে বর্মার আবদুল সত্তরওয়ালা বহু বিস্তারে বিল দুটির বিরুদ্ধে বললেন।

তারপর বর্মার মদনজিত মশায়ও প্রস্তাব সমর্থন করলেন।

তারপরে ভোটে প্রস্তাব গৃহীত হল।

পরবর্ত্তী প্রস্তাব উত্থাপন করলেন ডাঃ সত্যপাল।

প্রস্তাব দ্বারা ২২শে সেপ্টেম্বর পাটনায় অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটীতে খদ্দর সম্বন্ধে গৃহীত প্রস্তাব পুনরায় স্বীকার করা হয়েছে।

প্রস্তাব উপস্থিত করে ডাঃ সত্যপাল উর্দু'তে তার ব্যাখ্যা করে বললেন যে খদ্দরের পোশাক পরিধান সর্বদাই তাঁদের স্বাধীনতা সংগ্রামের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় এবং এই কারণে ভারতের স্বরাজের কোন অনুরাগীর পক্ষে খদ্দর পরিধান সম্বন্ধে কোনপ্রকার আপত্তি করা উচিত নয়।

সি ভি ভেঙ্কটরামন আয়েঙ্গার প্রস্তাব সমর্থন করে ইংরেজীতে ভাষণ দিলেন। তিনি জানালেন যে খদ্দরের ব্যবহারের জন্য গ্রামে দরিদ্র লোকদের আর্থিক উন্নতি হয়েছে। তারপর তিনি বললেন যে যদি গভর্ণমেন্ট হাউসে, টী পার্টীতে বিশেষভাবে নির্দিষ্ট পোশাক পরতে আপত্তি না থাকে তাহলে তাঁদের রাজনৈতিক মতবাদ জানানোর জন্য বিশিষ্ট ভারতীয় পোশাক পরতে আপত্তি থাকার কোন কারণ নেই।

মৌলানা হজরত মোহানী একটি সংশোধনী প্রস্তাব উপস্থিত করলেন, তাতে বলা হয়েছে পাটনা প্রস্তাবের ৪র্থ অংশের ১নং ধারা থেকে এই শব্দগুলি বাদ দেওয়া হোক "অথবা হাতে কাটা বোনা খদ্দর রাজনৈতিক অথবা কংগ্রেসের অনুষ্ঠানে অথবা কংগ্রেসের কাজে ব্যাপৃত থাকার সময় পরিধান করে না"।

সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করে তিনি উর্দু'তে বললেন যে প্রত্যেক ভারতবাসীর কংগ্রেসের সদস্য হওয়ার অধিকার আছে কিন্তু খদ্দরের পোশাক না পরার জন্য যদি তাঁকে সেই অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয় অথবা তাঁকে খদ্দর পরতে বাধ্য করা হয় তা হলে তা জবরদস্তি ছাড়া আর কিছু নয়।

সি পি হিন্দুস্থানী প্রদেশের হামিদ আলি এই সংশোধনী প্রস্তাব উর্দু'তে সমর্থন করলেন।

মৌলানা মহম্মদ আলী সংশোধনী প্রস্তাবের বিরোধিতা করে মূল প্রস্তাব উর্দু'তে সমর্থন করলেন। তার পর সভানেত্রী বললেন যে মূল প্রস্তাব গিরধারী লাল মশায় ইংরেজীতে এবং উর্দু'তে ব্যাখ্যা করে শোনাবেন। তিনি প্রতিনিধিদের স্মরণ করিয়ে দিলেন যে তারা পাটনার প্রস্তাব দ্বারা বাধ্য এবং তাঁদের মধ্যে যদি কেউ খদ্দর সম্বন্ধে আইন-লঙ্ঘন করে থাকেন তা হলে তিনি ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত হবেন।

এই সতর্কবাণীর পর একজন প্রতিনিধি সভানেত্রীর মনোযোগ আকর্ষণ করে একটি বৈধতার প্রশ্ন উত্থাপন করে জিজ্ঞাসা করলেন যে খদ্দর পরিধান না করে মৌলানা হসরত মোহানী কি সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করতে পারেন?

সভানেত্রী তাঁকে এই প্রশ্ন না তোলার জন্য অনুরোধ করেন।

সভানেত্রীর নির্দেশ সংশোধনী প্রস্তাবের উপর ভোট নিয়ে দেখা গেল মাত্র ৩ জন তাঁর স্বপক্ষে ভোট দিয়েছেন। বাকী সকলে বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছেন সুতরাং সংশোধনী প্রস্তাব অগ্রাহ্য হল।

তার পর মূল প্রস্তাব ভোটে গৃহীত হ'ল। প্রস্তাব পেশ হওয়ার পর সভানেত্রী মহোদয়া জানালেন যে আমেরিকার একজন দূত এই অধিবেশনে উপস্থিত আছেন। তিনি কংগ্রেসের শুভ কামনা করেন এবং ভারতের স্বাধীনতা অর্জন সম্বন্ধে তাঁর পূর্ণ সহানুভূতি ও সমর্থন আছে, তাঁর নাম অধ্যাপক হোমস। তিনি যুক্ত রাষ্ট্রের পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। তার পর তিনি অধ্যাপক হোমসকে কংগ্রেসে অভিভাষণ দেওয়ার জন্য অনুরোধ করলেন।

অধ্যাপক হোমস সমবেত প্রতিনিধি এবং দর্শকবৃন্দের বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে বক্তৃতা মঞ্চে আরোহণ করলেন। তিনি মস্তকে গান্ধী টুপি ধারণ করেছিলেন।

অধ্যাপক হোমস বললেন যে তিনি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র সরকারের প্রতিনিধি নন। কোয়েকার নামে পরিচিত আমেরিকার বান্ধব সমিতির প্রতিনিধি। বেসরকারী ভাবে তিনি আমেরিকার শ্রমিক শ্রেণীরও প্রতিনিধি। এই উভয়বিধ যোগ্যতার বলে তিনি আমেরিকার জনগণের পক্ষ থেকে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি সহানুভূতি ও সমর্থন প্রকাশ করছেন। বিশেষ করে তাঁদের মধ্যে যে মহান্ নেতার আবির্ভাব

হয়েছে তাঁর প্রতি আনুগত্য ও ভালবাসাও তিনি প্রকাশ করলেন।

তারপর তিনি বললেন যে গত কাল ডঃ রহমনের মহাত্মা গান্ধীকে দাক্ষিণ আফ্রিকান বলে দাবি করতে তিনি শুনেছেন। তিনি আজ তাঁকে আমেরিকা এবং সমস্ত বিশ্বের জন্য দাবি করছেন।

উপসংহারে তিনি বললেন যে তাঁর পক্ষে ভারতের সমস্যা সম্বন্ধে কিছু বলা ধৃষ্টতা হবে।

অভিভাষণের পর সকলকে ধন্যবাদ দিয়ে তিনি আসন গ্রহণ করলেন। ডাঃ সত্যপাল অধ্যাপক হোমসের বক্তৃতা উর্দু'তে অনুবাদ করে শোনালেন।

তারপর পরবর্ত্তী প্রস্তাব উত্থাপন করলেন পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু। প্রস্তাবটি অতি দীর্ঘ এবং এই অধিবেশনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে এই কংগ্রেস গত ২২শে সেপ্টেম্বর পাটনায় অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটীর ১নং প্রস্তাবের 'খ' অংশ অনুমোদন করছে এবং সিদ্ধান্ত করছে যে কংগ্রেস দেশের স্বার্থে অংশভূক্তীয় রাজনৈতিক কাজ গ্রহণ করে তা চালিয়ে যাবে এবং উক্ত প্রস্তাবে যে অর্থভাণ্ড (ফাণ্ড) এবং সম্পত্তি অল ইণ্ডিয়া স্পীনার্স এসোসিয়েশনের (সর্বভারতীয় কাটুনী সঙ্ঘ) নিজস্ব বলে ঘোষণা করা হয়েছে এবং ভবিষ্যতে যা রাখা হবে তা ছাড়া কংগ্রেসের সমুদয় পরিচালন যন্ত্র এবং ফাণ্ড রাজনৈতিক কাজের জন্য নিয়োজিত হবে।

জাতীয় দাবি জোর করে আদায় করার জন্য এবং জাতীয় সম্মান রক্ষা করার জন্য শেষ পর্য্যন্ত আইন অমান্যই একমাত্র কার্য্যকর অস্ত্র এই বিশ্বাস কংগ্রেস পুনরায় ব্যক্ত করছে কিন্তু উপলব্ধি করছে যে দেশ এখন এর জন্য প্রস্তুত নয় এবং এরই পরিপ্রেক্ষিতে কংগ্রেস সিদ্ধান্ত করছে যে সমস্ত রাজনৈতিক কার্য্য পরিচালনার নীতিই হবে সকল কাজে আত্মপ্রত্যয় অর্জন যাতে জাতির স্বাস্থ্যবর্দ্ধনের সহায়তা হয় এবং স্বরাজের দিকে জাতির অগ্রগতির পথে গভর্ণমেণ্টকে বা অন্য কাউকে বাধাদানের জন্য প্রতিরোধের ক্ষমতা জন্মে। ক্রমশঃ

প্রকল্প রূপায়নে বিভক্ত বাংলার বর্তমান চিত্র

চিত্তরঞ্জন দাস

মৃত্যুঞ্জয়ী বাঙ্গালী

স্মরণীয় কাল : ১৯৭১-৭২ কাল

অভূতপূর্ব, অশ্রুতপূর্ব, অভাবনীয় ঘটনা। সৃষ্টিকাল থেকে এযাবৎ যা কখনও ঘটেনি পৃথিবীর ইতিহাসে, পাক-শাসিত পূর্ব-বঙ্গে তা ঘটেছে ১৯৭১-৭২ সালে। ক্ষমতার লোভ মানুষকে কীভাবে নির্মম ঘাতকের পর্য্যায়ে রূপান্তরিত করে, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পরিদৃষ্ট হয়েছে ওপার বাংলায় বর্বর পাক-বাহিনীর সশস্ত্র অভিযানকালে। পূর্ব-বাংলার সাড়ে সাতকোটি বাঙ্গালীকে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন ক'রে জনমানবহীন একটা বিরাট মরুভূমি সৃষ্টিকল্পে, অত্যাচারী জঙ্গী-শাসক কুখ্যাত ইয়াহিয়া খাঁর কঠোর নির্দেশে নর-রক্ত-লোলুপ পাক-দানবদল পশুবৎ হত্যা করেছে নিরস্ত্র নিরপরাধ তিরিশ লক্ষ বাঙ্গালীকে। হিংস্র জন্তুর ন্যায় ধর্ষণ করেছে দু'লক্ষাধিক অসহায়া নারীকে যার ফলে পূর্ববঙ্গে জন্মগ্রহণ করেছে অসংখ্য জারজ সন্তান। আশী হাজার ধর্ষিতা রমণী ভুগছে দুরারোগ্য যৌন-ব্যাধিতে। তিন কোটি বাঙ্গালী হয়েছে গৃহ-হারা, সর্ব-হারা। সোনার বাংলা হ'য়েছে নরকঙ্কাল শোভিত বীভৎস শ্মশান। সুদীর্ঘ ন'মাস কাল চলেছে বাংলাদেশে পাক চমূদের সেই নারকীয় ধ্বংস-লীলা। এ হেন মর্মন্তুদ ঘটনা কভু ঘটেনি বিশ্বের কোনও দেশে। অথচ বিশ্বরাষ্ট্রগুলি, যারা আধুনিক জগতে সভ্যতা ও শ্রেষ্ঠত্বের বড়াই করে থাকেন, এ ব্যাপারে প্রায় সকলেই ছিল নির্বাক্, নিস্পন্দ। প্রতিবাদ বা প্রতিরোধের কোনও সাড়া পাওয়া যায়নি তাদের কাছ থেকে। বরং কোন কোন শক্তিশালী রাষ্ট্র যথা :—চীন ও আমেরিকা পাকিস্তানকে মদত দিয়েছে বরাবর, আর প্রচুর যুদ্ধোপকরণ দিয়ে পরোক্ষভাবে করেছে তাদের সাহায্য ও সমর্থন।

একমাত্র ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী মানবতার অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত স্বরূপ, বাংলাদেশে নর-ঘাতক পাক-সেনা কর্তৃক নৃশংস হত্যা-লীলা, নারী ধর্ষণ, গৃহ-দাহ প্রভৃতি যাবতীয় ধ্বংসাত্মক কার্য্যারম্ভের অব্যবহিত পরেই অবস্থার গুরুত্ব বিশেষভাবে উপলব্ধি করে, পূর্ব্ববাংলার সাড়ে সাতকোটি নিরন্ন অসহায় বাঙ্গালীকে পশুশক্তির প্রতিরোধকল্পে করেছেন সর্ববিধ সাহায্য। ভারতে আগত এককোটি উদ্বাস্তুকে দিয়েছেন আশ্রয়, দিয়েছেন প্রয়োজনীয় খাদ্য ও বস্ত্র। সফর করেছেন সারা বিশ্বে, বিশ্ব-রাষ্ট্রসমূহের চেতনা উদ্বুদ্ধ করতে। রাষ্ট্রপ্রধানদের দ্বারে দ্বারে দিয়েছেন অবিরাম ধর্ণা, করেছেন অবিশ্রান্ত কাতর অনুরোধ, পেয়েছেন সৌজন্যমূলক নিষ্ক্রিয় সাড়া। তারই নির্দেশ ও অনুমত্যনুসারে ভারত সীমান্তে তখন গড়ে উঠল মুজিবনগর। সৃষ্ট হল কতিপয় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। ভারতীয় জওয়ানগণ দিলেন বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ। ক্রমশঃ সুসংগঠিত হল বাংলাদেশের সশস্ত্র মুক্তিবাহিনী। জীবন পণ করে তারা যুদ্ধ করল বর্বর পাক্-বাহিনীর সঙ্গে সুদীর্ঘ ন'মাস। বাংলা মায়ের লক্ষ লক্ষ বীর সন্তান রণাঙ্গনে হল শহীদ। কুশলী পাক-বাহিনী হল সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত, বিপর্য্যস্ত। শেষ পর্য্যায়ে যুদ্ধ সমাপ্ত হল মাত্র চৌদ্দ দিনে, ভারতীয় সামরিক-বাহিনী যখন বাধ্য হল প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে।

প্রায় এক লক্ষ পাক-সেনা করল অস্ত্র-ও আত্মসমর্পণ। ভারত ও বাংলাদেশের বিভিন্ন কারাগারে হল তারা যুদ্ধ-বন্দী। বাংলাদেশ হল পাক-কবলমুক্ত, সম্পূর্ণ স্বাধীন সার্বভৌম। বিশ্ব ইতিহাসে হল এক অপূর্ব্ব অভিনব অধ্যায়ের অভাবনীয় সংযোজন। দানব হস্তে মৃত্যুই

ছিল যাঁদের একমাত্র পরিণতি, পূর্ববাংলার সেই কোটি কোটি মানুষ অবধারিত মৃত্যুকে জয় করে হলেন মৃত্যুঞ্জয়ী বাঙ্গালী। সমগ্র বাঙ্গালী জাতির পক্ষে তাই ১৯৭১-৭২ সাল হয়ে রইল চিরস্মরণীয়। কিন্তু একথাও সত্য যে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশের গণহত্যা ও মুক্তিযুদ্ধের ব্যাপারে যথাসময়ে হস্তক্ষেপ কিংবা সর্ববিধ সাহায্য না করলে, আজ আর বাংলা-দেশের কোন অস্তিত্বই থাকত কি না, সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। সুতরাং সেদিক থেকে বাংলাদেশ ভারতের নিকট হ'য়ে রইল চির-ঋণী। তাই দু'দেশের মধ্যে চির-মৈত্রী থাকাই সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, যদি না অন্য কোনও বৈদেশিক রাষ্ট্রের প্রলোভনে প্রলুব্ধ হয় বাংলা-দেশ। তবে বিগত মহাসঙ্কটে সে শিক্ষা লাভ করেছে বাংলাদেশ, তাতে ভারতের সঙ্গে তার মৈত্রীর বন্ধন চির অটুট থাকবে বলেই সকলের দৃঢ় বিশ্বাস।

গণহত্যা ও মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিকা

খুনের বদলে খুন, রক্তের বদলে রক্ত, আঘাতের বদলে প্রত্যাঘাত। ইহাই বিশ্বের প্রচলিত রীতি। বাংলাদেশে ও হ'য়েছে ঠিক তাই। শান্তিপ্রিয় বাঙ্গালী ক্ষমতা-লোভী অবাঙ্গালীর নিকট থেকে পেয়েছে চরম আঘাত, তাই বীর বিক্রমে করেছে চরম প্রত্যাঘাত। ১৯৪৭ সালে অখণ্ড ভারত দ্বিখণ্ডিত হয়ে বৈদেশিক স্বার্থপুষ্ট পাকিস্তান সৃষ্ট হওয়ার পর সুদীর্ঘ পঁচিশ বছর কাল সংখ্যালঘু পশ্চিম পাক শাসকবর্গ পূর্ব পাকিস্তান অর্থাৎ বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ সাড়ে সাত কোটি বাঙ্গালীকে করেছে অবাধ শোষণ ও অশেষ নির্য্যাতন। যার ফলে ক্রমশঃ সেখানে স্বভাবতঃই গড়ে উঠেছিল স্বৈরাচারী সরকার বিরোধী তীব্র মনোভাব। শোষিত, নিপীড়িত মানব-মনে যখন জ্বলে ওঠে বিদ্রোহের বহ্নি শিখা, তখন তাদের মিলিত উষ্ণ নিঃশ্বাসে ধ্বংস হয়ে যায় অত্যাচারী শাসককুল, তুচ্ছ হয়ে যায় শাসকের প্রবল শস্ত্র-শক্তি নির্যাতিত গণ-শক্তির নিকট, বিক্ষুব্ধ জনতার ব্যাপক আক্রমণে সরকারের হয় শোচনীয় পতন। তাই যে বিষবৃক্ষ রোপণ করেছিল পাকিস্তান এই সোনার বাংলায়, দীর্ঘ দিনের পরিপক্ক সেই বিষফলেই হয়েছে পাকিস্তানের শোচনীয় পরাজয় বা যথাযোগ্য পতন।

শুরু থেকেই পশ্চিম পাক-শাসকগোষ্ঠীর স্বৈর-শাসনের ফলে ১৯৪৯ সালে পূর্ব পাকিস্তান অর্থাৎ বাংলাদেশে গঠিত হয়েছিল আওয়ামী লীগ নামে একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক দল, যার মাধ্যমে অত্যাচারী জঙ্গী-শাসনের বিরুদ্ধে প্রথম পদক্ষেপ হ'ল পূর্ব বাংলার সফল ভাষা আন্দোলন। অবশ্য সে সাফল্য অর্জনের নিমিত্তও আওয়ামী লীগ কর্মী এবং নেতৃবৃন্দকে যথেষ্ট ত্যাগ স্বীকার, অশেষ নির্য্যাতন ও কঠোর কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়েছিল। কিন্তু জঙ্গী সরকারের সাধ্য হয়নি তখন সেই আন্দোলনকে প্রতিরোধ করবার। পূর্ব বাংলার গণ-শক্তির নিকট পরাভূত হল পাক সরকার।

অতঃপর শুরু হল আওয়ামী লীগ নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছয় দফা দাবী আন্দোলন এবং সেই আন্দোলনের মাধ্যমেই পূর্ববঙ্গে ক্রমশঃ সংস্কার গণ-শক্তি বৃদ্ধি পেল আশাতীতরূপে। সুতরাং ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ অনায়াসে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে আইনতঃ সমগ্র পাকিস্তানের শাসনভার গ্রহণের অধিকারী হয়। কিন্তু আওয়ামী লীগ শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে স্বভাবতঃই পশ্চিম পাক জঙ্গী শাসকগোষ্ঠী হয়ে পড়ে ক্ষমতাচ্যুত। অতএব ক্ষমতার লোভ সম্বরণ করতে না পেরে পাকিস্তান সংবিধানের সর্ববিধ আইন কানুন সব সিকেয় তুলে রেখে সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙ্গালী নিধন যজ্ঞের আশু প্রকল্প রূপায়ণে ব্রতী হল জঙ্গী সরকার, অর্থাৎ মানব থেকে তখন রূপান্তরিত হল দানবে। তাই দানবীয় শক্তি প্রয়োগ করে সেই মহা-যজ্ঞের উদ্যোগ পর্ব তখন শুরু হল সাড়ম্বরে। পূর্ববঙ্গে অনুষ্ঠিত সে ঐতিহাসিক নর-নিধন যজ্ঞের প্রয়োজনীয় উপকরণ অর্থাৎ সর্বাধুনিক সমরাস্ত্র, গোলাবারুদ ও তৎসহ বিরাট দানব-বাহিনী যতদিন না বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা ও অন্যান্য শহরে এসে পৌঁছেছিল, ঠিক ততদিন জঙ্গী শাসক ইয়াহিয়া বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে প্রত্যহ দফায় দফায়

আলোচনা বৈঠকের মাধ্যমে নানাবিধ টালবাহানা করে আগামী দিনের জন্য বৈঠক মুলতুবী রেখে কেবলমাত্র কালক্ষেপই করেছিল, যাতে বঙ্গবন্ধুর মনে কোনও সন্দেহের উদ্রেক না হয় কিম্বা তার দানবীয় চক্রান্ত পূর্বেই ফাঁস হয়ে না পড়ে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য কুখ্যাত ইয়াহিয়ার নির্দ্ধারিত বৈঠকে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে লাগাতার আলোচ্য বিষয়বস্তুর প্রকল্পে সরকার পক্ষের মুখ্য উপদেষ্টা ছিল বর্ত্তমান পাক-প্রেসিডেন্ট জনাব জুলফিকার আলি ভুট্টো। শ্রীভুট্টো আজ পাকিস্তানের সর্বময় শাসনকর্ত্তা, আর তারই প্রভু প্রাক্তন পাক-প্রেসিডেন্ট জনাব ইয়াহিয়া সর্ব দোষে দোষী, পাক-কারাগারে বিচারাধীন বন্দী। হায়! অদৃষ্টের কী নির্মম পরিহাস।

পাক্-প্রকল্পের বাস্তব রূপায়ণ

বাঙ্গালী নিধন মহাযজ্ঞের সর্বাবিধ আয়োজন যখন প্রস্তুত অর্থাৎ সামরিক সাজসরঞ্জাম সহ বিরাট পাক-বাহিনী যখন বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্র সুপরিকল্পিতভাবে সুসজ্জিত, পাক সর্দার ইয়াহিয়া তখন বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে পূর্ব নির্ধারিত আলোচনা বৈঠক বাতিল করে দিয়ে, ব্যাপক গণহত্যা ও পোড়ামাটির নির্দেশ জারি করে পালিয়ে যায় ঢাকা থেকে পিণ্ডি। প্রভুর নির্দেশ পেয়ে অবিলম্বে আজ্ঞাবাহী দানবদল শুরু করল সশস্ত্র অভিযান ও ব্যাপক আক্রমণ। বিশ্ব-রেকর্ড সৃষ্টিকারী অতীব ঘৃণ্য সেই কলঙ্কিত অধ্যায়টি অর্থাৎ ব্যাপক গণ-হত্যা, লুন্ঠন, নারী ধর্ষণ, গৃহদাহ প্রভৃতি যাবতীয় কার্য্যারম্ভের অশুভক্ষণটি ছিল ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ গভীর রাত্রি, বলা বাহুল্য জনগণ তখন সুষুপ্তির ক্রোড়ে গভীর নিদ্রায় নিদ্রাভিভূত। সুতরাং অতর্কিতে আক্রান্ত হয়ে নিদ্রামগ্ন শিশু, বৃদ্ধ, যুবক, যুবতী বাংলাদেশের অসংখ্য মানুষকে সেই রাত্রেই চির-নিদ্রার ক্রোড়ে আশ্রয় নিতে হল। পাক-বাহিনীর অভিযান কিম্বা আক্রমণ সীমিত ছিলনা। উহা ছিল ব্যাপক বাংলাদেশের প্রায় সমস্ত শহর ও পল্লী অঞ্চলে এবং গণহত্যাও শুরু হয়েছিল সর্বত্র একই সঙ্গে। সুতরাং সেই রাত্রেই যে কত লোক হতাহত হয়েছিল তার সঠিক সংখ্যা নির্ণয় করা কখনও সম্ভব নয়। চতুর্দিকে জনকোলাহল, আর্ত্তনাদ, হাহাকার, গগনভেদী ক্রন্দনের রোল, নিরস্ত্র অসহায় মানুষের প্রাণ বাঁচাবার নিষ্ফল প্রচেষ্টা, পাক কামান ও গোলাগুলীর অবিশ্রান্ত বিকট গর্জন। সে এক অভাবনীয়, অভূতপূর্ব, নারকীয় ঘটনা। একই চিত্র চলেছে সুদীর্ঘ ন'মাস। তৎকালীন সেই লাগাতার গণ-বিধ্বংসী পরিস্থিতি কল্পনাতীত, বর্ণনাতীত, হৃদয়বিদারক।

পূর্ব্ববঙ্গের সর্ব্বজন-প্রিয় সুমহান্ নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে উপরোক্ত গভীর রাত্রে তাঁর ধানমণ্ডীর বাড়ী থেকে সকলের অজ্ঞাতসারে গ্রেপ্তার করে বিমানে পাঠান হয় পশ্চিম পাকিস্তানের লায়ালপুরে, নিভৃত এক কারাকক্ষে। তদবধি মুজিব জীবিত কি মৃত, সে সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্যাভাবে দেশবিদেশে সর্ব্বত্রই ছিল একটা দারুণ উৎকণ্ঠা। জুলাই মাসে হঠাৎ একদিন জনৈক পাকিস্তানী মুখপাত্র ভারতীয় সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে শেখ মুজিবের গ্রেপ্তার এবং পশ্চিম পাকিস্তানে বিচারাধীন কারা-বন্দীর খবর ব্যক্ত করেন। সেই থেকে জনগণ মুজিব জীবিত জেনে স্বভাবতঃই অশেষ তৃপ্তি লাভ করেন, কিন্তু বিচারের প্রহসনে বঙ্গবন্ধুর ভাগ্যে চরম মৃত্যুদণ্ডই যে অপেক্ষা করছে সে বিষয়ে প্রায় সকলেই ছিল নিঃসন্দেহ এবং সেজন্য সর্ব্বত্রই ছিল একটা গভীর উৎকণ্ঠা। অবশ্য শেষ পর্য্যন্ত সেই চরম মৃত্যু-দণ্ডেরই আদেশ জারি হল, কবর খোঁড়া হ'ল, দিন-ক্ষণও সব স্থির হ'ল। কিন্তু "রাখে কৃষ্ণ মারে কে, মারে কৃষ্ণ রাখে কে?" মৃত্যুপথ-যাত্রী মুজিব দেবতার কৃপা লাভ করলেন, অবশ্য সে দেবতা অপর কেহ নন, উক্ত কারাগারেরই ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীর অনুকম্পায় বঙ্গবন্ধুর অমূল্য জীবন রক্ষা পেল, তিনি হ'লেন মৃত্যুঞ্জয়ী। "সত্যমেব জয়তে।" সত্যেরই হল জয়। পরবর্তী ঘটনাবলী ইতিপূর্বে সবিস্তার প্রকাশিত হয়েছে প্রবাসীর একাধিক সংখ্যায়। সুতরাং বর্তমান চিত্রে উহার পুনঃ প্রদর্শন নিষ্প্রয়োজন মনে করি।

পশ্চিমবঙ্গে প্রতিক্রিয়া

পূর্ব্ব-বঙ্গে ঐতিহাসিক গণ-হত্যানুষ্ঠান শুরু থেকে সুদীর্ঘ ন'মাস কাল পশ্চিমবঙ্গ ছিল অগ্নিগর্ভ। সর্ব্বত্র

দারুণ উৎকণ্ঠা, উত্তেজনা, উদ্দীপনা। সংবাদপত্র থেকে শুরু করে রাজ্যের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলের মুখেই শুধু এক কথা—পূর্ব্ববাংলার মহাসঙ্কটের কথা। প্রবাসী আপনজনের আপদ বিপদের সংবাদ পেলে মানুষ যেমন সাধারণতঃ অস্থির চিত্ত হ'য়ে পড়ে এবং সুযোগ পেলে অবিলম্বে সেখানে ছুটে যায়, তেমনই পূর্ব্ববঙ্গের সেই চরম বিপদের সময়ে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ অধীর আগ্রহে প্রতি মুহূর্তে পরবর্তী সংবাদের জন্য সংবাদপত্র, রেডিও এবং লোক পরম্পরায় দৈনন্দিন খবর জ্ঞাতার্থে সদা-সর্ব্বক্ষণ ছিল অত্যুদ্‌গ্রীব। অসংখ্য যুবক ও তরুণের দল প্রাণের মায়া তুচ্ছ করে ওপার বাংলায় ছুটে গিয়ে ভাই-ভাইয়ের পার্শ্বে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করবার জন্যও ছিল সদা প্রস্তুত। কিন্তু মহাকাল দেশ বিভাগের ফলে পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গের মধ্যে যে দুর্ভেদ্য প্রাচীর তৈরী হয়েছিল, উভয় সরকারের সম্মতি ভিন্ন উহা অতিক্রম করবার অধিকার জনসাধারণের ছিল না। তাই বাধ্য হয়েই তারা এপার বাংলা থেকে ওপার বাংলার বিপন্ন ভাইদের যথসম্ভব সাহায্যার্থে ছিল সদা সচেষ্ট।

পূর্ব-বঙ্গ থেকে পশ্চিমবঙ্গে আগত ছিন্নমূল উদ্বাস্তুদের ত্রাণকার্য্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল সহস্র সহস্র তরুণ ও যুবক। পূর্ব্ববাংলার গণ-হত্যার ব্যাপারে পশ্চিম বাংলার মানুষ প্রায় প্রত্যহই সভা-সমিতির মাধ্যমে জানিয়েছে তাদের প্রবল প্রতিবাদ। স্থানীয় সংবাদপত্রে শুধু পূর্ব্ববাংলার খবর ভিন্ন বহু জরুরী খবরও স্থান পেত না সে সময়ে। মানুষের মন থেকে তখন অশুভ সাম্প্রদায়িকতার বীজাণু হয়েছিল সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত। হিন্দু মুসলমানের বৈষম্য ব'লে কিছুই ছিল না। বাংলা-ভাষাভাষী বাঙ্গালী—বাঙ্গালী। ওপার বাংলার বাঙ্গালী বিপন্ন, তাই এপার বাংলার বাঙ্গালী তাদের সেই মহা-বিপদে করবে সর্ব্বাধিক সাহায্য। এই ছিল তখন প্রায় সকলেরই মনোভাব এবং সে চিত্র দর্শন করে প্রায় সব সময়েই মনে হত :—

"উৎসবে ব্যসনেচৈব দুর্ভিক্ষে রাষ্ট্রবিপ্লবে
রাজদ্বারে শ্মশানেচ যস্তিষ্ঠতি সঃ বান্ধবঃ।"

পূর্ব্ব ও পশ্চিম-বঙ্গের হিন্দু মুসলমান—বাংলা মায়ের সন্তান। একই জাতি বাঙ্গালী জাতি। ভাই-ভাই। সুতরাং ভাইয়ের চেয়ে পরম বান্ধব জগতে আর কে আছে? তাই বিপন্ন বান্ধবদের বিপদ্‌মুক্ত করাই ছিল সকলের একমাত্র লক্ষ্য।

বিচারাধীন পাক-যুদ্ধ-বন্দী

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে আত্মসমর্পণকারী প্রায় এক লক্ষ পাক-হানাদার বাহিনী বৎসরাধিক কাল ভারত ও বাংলাদেশের বিভিন্ন কারাগারে রয়েছে বিচারাধীন বন্দী। জেনিভা যুদ্ধ-বন্দী চুক্তির শর্ত্তানুযায়ী সর্ব্বাধিক সুযোগ সুবিধা পেয়ে তারা বহাল তবিয়তে কারাবাস করছে এবং তাদের যথোপযুক্ত ভরণপোষণের বিরাট ব্যয়ভার বহন করছেন ভারত ও বাংলাদেশ সরকার।

অবশ্য পূব-বঙ্গের পাক-হানাদারগণ প্রকৃতপক্ষে জেনিভা চুক্তি বর্ণিত যুদ্ধ-বন্দীর পর্য্যায়ে পড়ে কি না, সেটাই ছিল পূর্ব্বাহ্নে বিচার্য্য বিষয়। কারণ যুদ্ধ-বন্দী বলতে সাধারণতঃ তাঁদেরই বুঝায় যাঁরা দুই বা ততোধিক দেশ কিম্বা রাষ্ট্রের বিঘোষিত সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করে শত্রুপক্ষ কর্ত্তৃক বন্দী হন। কিন্তু বাংলাদেশের গণ-হত্যাকারী বন্দীর সঙ্গে তার কোন তুলনামূলক প্রশ্নই ওঠা উচিত নয়, যেহেতু পশ্চিম পাকিস্তানের জঙ্গী শাসক গোষ্ঠী কায়েমী স্বার্থ এবং ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্যই সুপরিকল্পিতভাবে সামরিক-বাহিনী বা হানাদারগণ কর্ত্তৃক পূর্ব্ব পাকিস্তানের নিরস্ত্র নিরপরাধ নাগরিকদের করেছে হত্যা, লুণ্ঠন, ব্যাপক অগ্নি-সংযোগ ও নারী-ধর্ষণ প্রভৃতি অতীব জঘন্য অমার্জ্জনীয় অপরাধ। একই রাষ্ট্রের শাসকবর্গ করেছে শাসিতের উপর নৃশংস দানবীয় অত্যাচার সুদীর্ঘ ন'মাস কাল, যার কোন নজীর নেই বিশ্ব-ইতিহাসে। সুতরাং বাংলাদেশের তথাকথিত যুদ্ধ একেবারেই এক তরফা এবং কোন যুদ্ধের পর্য্যায়েই উহা পড়ে না কিম্বা পড়া উচিতও নয়। উহা ছিল সম্পূর্ণরূপে বাংলা ধ্বংসের পাক-প্রকল্প রূপায়ণ।

বাংলাদেশের কোটি কোটি মানুষ যখন বুঝতে

পারল যে পাক-ঘাতকদের উদ্যত খড়্গ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার তাদের আর কোন উপায়ই নেই, তখন তারা অনন্যোপায় হ'য়েই প্রকাশ্য অথবা পরোক্ষভাবে বিরাট পাকবাহিনীকে যথাসম্ভব বাধা দিতে বদ্ধপরিকর হল। কিন্তু সশস্ত্র সামরিক বাহিনীর সঙ্গে নিরস্ত্র অসামরিক মানুষের লড়াই কি করে সম্ভব? উহা একেবারেই প্রহসন বা প্রাণ বাঁচাবার নিষ্ফল প্রচেষ্টা এবং তার ফল যে কি হতে পারে, সহজেই তা অনুমেয়। অবধারিত মৃত্যুর কবল থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যই বাংলাদেশে শুরু হ'য়েছিল মুক্তিযুদ্ধ এবং প্রাণপণে যাঁরা যুদ্ধ করেছিল, তাঁরাই বাংলাদেশের মুক্তি-বাহিনী নামে খ্যাত।

মানবিকতার অপূর্ব দৃষ্টান্ত স্বরূপ ভারত যখন বিপন্ন বাংলাদেশের ব্যাপারে সর্বাধিক সাহায্য প্রদানার্থ এগিয়ে এল, তখন সে সাহায্য ও যথাসম্ভব প্রশিক্ষণ পেয়ে বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনী ক্রমশঃ শিক্ষিত ও সুসংগঠিত হয়ে পাক-দুশমনদের সঙ্গে সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হতে সক্ষম হ'ল। সুদীর্ঘ ন'মাস কাল মুক্তি-বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করে স্বভাবতঃই পাক-পশু শক্তির ক্ষয় ক্ষতি হ'য়েছিল বহুলাংশে। কিন্তু বংলাদেশে নব-শক্তি বা সৈন্য প্রেরণে অপারগ হয়ে জঙ্গী শাসক ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে একই সঙ্গে আক্রমণ করল পূর্ব ও পশ্চিম সীমান্ত। যার ফলে অবিলম্বে ভারতীয়-বাহিনী প্রেরিত হ'ল উভয় সীমান্তে এবং ৩রা ডিসেম্বর বাংলাদেশে প্রবেশ করে মাত্র ১০।১২ দিনের মধ্যেই পাক হানাদারদের সম্পূর্ণরূপে পর্য্যুদস্ত করে বাধ্য করল তাদের ১৬ই ডিসেম্বর অস্ত্র ও আত্ম-সমর্পণ করতে। সেই আত্মসমর্পণকারী হানাদারগণই বর্ত্তমানে ভারত ও বাংলাদেশের কারাগারে বিচারাধীন যুদ্ধবন্দী।

জগতে যারা সমাজ ধর্ম্মে বিশ্বাসী, তারা কখনও পূর্ববাংলার সেই নারকীয় ঘটনা সহজে বিস্মৃত হ'তে পারে না, কিম্বা যে পশুশক্তি সে ঘটনার জন্য সম্পূর্ণরূপে দায়ী তাদের কখনও ক্ষমার যোগ্য ব'লে মনে করে না। বর্ব্বর পাক বাহিনী পূর্ব্ববঙ্গে-নৃশংস গণ-হত্যা ও মাতৃজাতির উপর দলবদ্ধভাবে পাশবিক অত্যাচার ক'রে যে পাপরাশি-সঞ্চয় করেছে, তাতে সেই মহা-পাপীর দল দীর্ঘদিন জীবিত থাকলে তাদের পাপভারে সমগ্র পৃথিবী কলুষিত হবে। চরম অপরাধের জন্য চরম দণ্ডই ছিল তাদের যোগ্য প্রাপ্য, যদ্দ্বারা বিশ্ব-মানবসমাজ ন্যায় বিচার সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ জ্ঞান অর্জ্জন করতে পারত। কিন্তু সেই চরম দণ্ডোপযোগী দুষ্কৃত-কারীগণই আজ বাংলাদেশের ধর্ম্মাধিকরণে বিচারাধীন বন্দী, যাদের নিঃশর্ত্ত মুক্তির জন্য নির্লজ্জ পাকিস্তান প্রয়োগ করছে নানাবিধ কূট-নীতি বা কৌশল। বিনা দোষে যারা লক্ষ লক্ষ মানুষকে পশুবৎ হত্যা করতে পারে, বন্য জানোয়ারের ন্যায় যারা বলপূর্ব্বক লক্ষ লক্ষ সতীর সতীত্ব নষ্ট করতে পারে তারা কখনও ক্ষমার যোগ্য ব'লে বিবেচিত হ'তে পারে না। পৃথিবীর সমস্ত সুসভ্য দেশে একবিধ চরম অপরাধের জন্য চরম দণ্ড অর্থাৎ মৃত্যুর বিধানই আছে এবং থাকা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। নইলে সভ্য জগতের কোন চিহ্নই থাকতে পারে না। সুতরাং শেষ পর্য্যন্ত এদের ভাগ্যে কি আছে অনুমান করা কঠিন, তবে যদি বাংলা দেশের আদালতে বিচারের সিদ্ধান্তই বহাল থাকে, তাহ'লে বিচারকগণ অবশ্যই ত্রিশ লক্ষ বাঙ্গালী-শহীদ, দু'লক্ষাধিক নির্য্যাতিত রমণী এবং তৎসঙ্গে বঙ্গবন্ধুর দৃপ্ত ঘোষণার কথা পূর্ব্বাহ্নে স্মরণ করেই ন্যায় বিচার করবেন, এ দৃঢ় বিশ্বাস তাঁদের উপর অন্ততঃ বাঙ্গালী জনসাধারণের আছে। অতএব পাক-বন্দীদের ভাগ্যাকাশে উজ্জ্বল নক্ষত্র বেষ্টিত পূর্ণ চন্দ্রের উদয় হয়, কিংবা অমাবস্যার গাঢ় অন্ধকার চিরতরে সমাচ্ছন্ন থাকে, সেই অপূর্ব চিত্রটি দর্শন আশে বিশ্ববাসীর সঙ্গে আমরা বঙ্গবাসীও আকুল আগ্রহে অপেক্ষা করছি।

ক্রমশঃ

বড় ঘরের বড় কথা

(উপন্যাস)

পুষ্পদেবী সরস্বতী

এসব চিঠির উত্তর অধিকাংশ সময়ই বড়মা পাননা। আবার চললো হারু বাবুর কাছে ধর্ণা—সকাতর নিবেদন আমি নয় নিঃসন্তান বিধবা—তাবলে সুবোধ কি আমার জামাই নয় দিলুমই বা ওকে একটা ব্লেজার কোট কিনে তাছাড়া বড় খোকাকে ত আমিই ভিক্ষে দিয়েছি ও তো ভিক্ষে পুত্তুর আমার ওকেই বা একটা কোট দিতে আবার দোষ কি? এবার হারুবাবু চটে যান। বলেন এই ত কালীঘাট শুদ্ধ বদল বিলোন হল হল এবার তেলা মাথায় তেল ঢালা। শ্রীকুমারের একটা মাত্তর জামাই একটা মাত্তর ছেলে তাদেরও তোকেই জামা কিনেদিতে হবে সবই আশ্চার্য্য কাণ্ড। তার টাকা খায় কে? কিন্তু বড়মাকে বোঝায় কে? হারুবাবুরও কপাল বলতে হবে নইলে হারুবাবুর এমন হাত খোলা দিলদরিয়া মেয়ে জন্মায়। কিন্তু দেবীর কপাল খণ্ডাবে কে বলো? বড়মা শেষ পর্য্যন্ত না পেরে নিজের মুক্তোর খোকড়া জোড়া বেচেই ব্লেজার কোট কিনে সুবোধ আর বড় খোকাকে দিলেন। কিন্তু জামায়ের অঙ্গে সে কোট বড়মা পরাতে পারলেন, না—তার পরনে সেই আদ্যি কালের বুড়ুটে কোট। দেবী বলে তুমি যে কেন দাও বড়মা—বাবা তো কত সুন্দর সানফ্রক সার্জে'র কোট করিয়ে দিলেন। লং কোট ধুতির সঙ্গে পরবে বলে সে কোট আমার শাশুড়ী আমার নন্দাইকে দিয়ে দিলেন। তিনি কাটিয়ে নিজের মত করিয়ে নিলেন। এবারও কোটটা নিজের ভাইকে দিয়েছেন। বল্লেন "তোর তো তিনটে কোট রয়েছে শুধু ঝাড়ো আর তোলো তাই বাসুক ওটা পরতে দিলুম।" বড়মা বল্লেন কেন তুই গোছ গাছ করে রাখতে পারিস না? দেবী বলে তোমার জামায়ের আমার ওপর নির্ভর নেই বড়মা। সবই যার হাত তোমার। অমন সুন্দর সার্জ্জের শার্ট পাঞ্জাবী বাবা দিয়েছিলেন তাও তো দেখতে পাই না। কাকে দিয়েছেন কে জানে? তোমায় বলি না তোমার মনে কষ্ট হবে বলে—তুমি যে অমন সুন্দর জামদানী বেনারসীটা দিছলে না বেল ফুলের মালার মত নকশা করা তাও মেজমামী শাশুড়ীকে দিয়ে দিয়েছেন। নেভি ব্লু রং এর যে চিকনের শাড়ীটা আমায় দিয়েছিলে তাও দেখলুম বাক্সে নেই সেদিন দেখি মেজমামীমা পরে ফটো তুলিয়ে এলেন দ্বিতীয় পক্ষের বৌ ত? দিদিমা প্রথম পক্ষের বৌএর জামা কাপড় সব তুলে রেখেছেন প্রথম পক্ষের যে ছেলে আছে তার বৌএর জন্য বোধহয়।

দেবী বুদ্ধিমতী সে বোঝে তার প্রতি শাশুড়ী মায়ের কেন এই সপত্নীসুলভ বিদ্বেষ। যে ছেলেকে তিনি জীবনে মায়া যত্ন করেননি সেই ছেলে আজ স্ত্রীর আপ্রাণ সেবায় তার বশ হচ্ছে এই জিনিষটা তিনি সহ্য করতে পারেন না। দেবী ভাবে হায় হায় বশ কর্ব্বার কিই বা তার আছে? ওই সর্ব্ব জিনিষে বঞ্চিত মানুষটিকে কি দেবে সে? সবই ত ডাক্তারদের নিষেধ। চিনি খাবে না ভাত খাবে না আলু খাবে না ডায়বেটিস বলে, আবার নুন খাবে না ডিমমাংস খাবে না অ্যালবুমেন বলে, একটু ঢ্যাড়স সেদ্ধ আর ছানা ধরে দিতে দেবীর যেন বুকটা ফেটে যায়। অতি দরিদ্র রমণীও তার স্বামীকে দিনান্তে একথালা ভাত ধরে দেয় কি অপরাধে সেটুকু সুখ থেকেও সে বঞ্চিত হল। শাশুড়ীর নির্য্যাতনে আহারে বঞ্চিত শিশুদের দুঃখও তার মনে

পড়ে না স্বামী খেতে ভালোবাসেন অথচ খেতে পান না এই দুঃখে নিজের জীবনকে আরও বঞ্চিত করে নিজে চিনি আলু খায় না। তার ওপর বারমাসে তের পার্ব্বণ আজ বারমেসে মঙ্গলবার পরশু সোমবারে সারাদিনে তিনটে ফল। তবুও অভাগিনী কপালে বদ্‌নামের অন্ত নেই শাশুড়ী বলেন ছানা সন্দেশের উপোস। যাক্ দেবীর শাশুড়ীর কথা—তাঁর কথা বলতে গেলে কথার অন্ত থাকবে না।

হারুবাবুর আর এক ভাগনীর বিয়ে হয়েছিল ঝিকুড়-গাছিতে। যথারীতি বড় লোকের মূর্খ ছেলে দেখে বিয়ে দিলেন হারুবাবু কিন্তু বুড়ো বাপ বর্ত্তমান। এবার হারুবাবু বিপদে পড়লেন। বিপত্নীক হলে কি হবে বুড়ো ঝিয়ের বশ অবশ্য বশে থাকলে আপত্তি নেই হারুবাবুর কিন্তু কানাঘুশো শোনা যায় তলে তলে সম্পত্তি নাকি ঝিয়ের ভাইপোদের নামে করে দোবার কথা হচ্ছে। সম্পত্তি কম নয় তবু উড়ুলে আর কতক্ষণ? হারুবাবু বুড়ো নায়েবকে নিয়ে পড়ল। বসলো মন্ত্রণাগৃহ। শেষে স্থির হল নায়েবের সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে বুড়োর বিয়ে দোয়া হল। ছেলে বৌ উদযোগ করে বিয়ে দিলো-এমনি সঙ্গীন অবস্থা—। সেই দশ বছরের বৌ পাঁচিলে উঠে পেয়ারা পাড়তো—পাছে পাড়ার লোক দেখতে পায় বৌ ডাকতো অ বৌমা নেমে এস তোমার জন্য কত কাশীর পেয়ারা আনিয়ে রেখেছি দেখো। কিশোরীর জিভে ডাঁশা পেয়ারার যে স্বাদ কাশীর পাকা পেয়ারা ছাড়িয়ে রূপোর রেকাবী করে সাজিয়ে দিলে যে সে স্বাদ পাওয়া যায় না—তা বৌ জানতো না। এই বৌ হারুবাবুর ভাগ্নী। নায়েবের মেয়ে তার পায়ের নখের যুগ্যি রূপ ছিল না আবার ভদ্ররুচিও ছিল না ফলে যা হবার তাই হল। কর্ত্তা অতি বৃদ্ধ হবার পরে বাড়ীর ডাক্তার নায়েবের মেয়ের অধিকর্ত্তা হয়ে বসলো নিরুপায় হয়ে সবাই সহ্য করলো সেই ব্যভিচার। সেই ডাক্তারের সন্তানরাই শেষে জমীদার বলে পরিচিত হলেন। কথায় বলে টাকা যার মান তার। একেই বলে প্রকৃতির প্রতিশোধ।

হারুর পিসীমা পুঁটি কিন্তু কমদিন ঘর করেন নি পিসেমশাইকে নিয়ে।

শুধু পাঁচ কন্যাই নয়। কন্যা কটি প্রথম পক্ষের। পাঁচটি পুত্র সন্তানের জননী হলেন তিনি। জননী বলে জননী নামকরা মানুষদের মা। অনেকগুলি বিয়ে করা ছাড়া আর কোন বদ্ গুণ তাঁদের ছিল না। প্রত্যেকটি সন্তান নামকরা পণ্ডিত। পিসেমশায়ের সঙ্গে বিয়ে হয়ে-ও দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর বিবাহিত জীবন যাপন করলেন তিনি। ছেলেরা সুবর্ণ জয়ন্তী উদ্‌যাপন করলেন মহোৎসবে। ছেলেরা বিয়ে একাধিক করলেও ঘরবাসী হল না কেউ। রোজগার যেমন হাতে করলেন দানধ্যানও করলেন তেমনি হাতে। বধূরা রইল পিত্রালয়ে কুলীনের বৌ-এর মত। তবে পিসীমার সেবার অভাব হল না। এক ছেলে যথাসর্ব্বস্ব দান করে-ছিলেন রামকৃষ্ণ মিশনে—সেখানে সাধুরা পিসীমাকে মাথায় করে রাখলো। শেষ কদিন তাঁর আনন্দে ভরে উঠলো সুসন্তানের পুণ্যে। মানুষের-যে সময়টা সাধারণত হায় হায় করেই যায় সে সময়টা তিনি ঈশ্বর প্রাপ্তির আনন্দে ভরপুর রইলেন। তাঁর আসল নাম ছিল রামরঙ্গিণী কিন্তু কেউ ভুল করেও তাঁকে রণরঙ্গিণী বলতো না কারণ মূর্ত্তিমতী শান্তি ছিলেন তিনি কথাছিল মধুতে মাখা। বৌদের কখন নাম বলে ডাকতেন না তিনি বড়মা মেজমা সেজমা নমা ছোটমা ছিল তাঁর সম্বোধন। ছোট ভাইটি ছিল তাঁর বড় আদরের ধন। তাঁর পুত্রবধূকে ডাকতেন মা বলে। পিসেমশাই আগেই গত হয়েছিলেন। পিসীমা কিন্তু কারুকেই রেখে যেতে পারলেন না। অমন যে ছেলেরা বিশ্ব জোড়া যে ছেলেদের নাম তারা সবাই চলে গেল পিসিমা নিষ্পলক হয়ে দেখলেন। তখন পিসীমার একটা অঙ্গ পড়ে গেছে। সবশেষ ছোট ভাইও মারা গেলেন। এই ভায়ের খ্যাতিও কম ছিল না। এহ ঘটনাটা শুনেও পিসীমা যেন মানতে চাইলেন না। তবুও দশহরার দিনে একখানি নতুন ধুতি তিনি পাঠাতেন ভায়ের বাড়ীতে সঙ্গে চিঠি থাকতো—এই ধুতিটি পরিয়ে ভাইকে যেন পায়েস খাওয়ানো হয়। যত দিন পিসীমা বেঁচে ছিলেন এ ঘটনা বন্ধ হয়নি। ভাই নারায়ণ শাস্ত্রী নামকরা অধ্যাপক দেবচরিত্রের মানুষ ছিলেন।

পিসীমার পর হারুবাবু তার পর তিনটি সন্তানের পর নারায়ণবাবু জন্মালেন পিসীমাই তাঁকে সন্তান-স্নেহে মানুষ করেন। হারুবাবুর সঙ্গে নারায়ণবাবুর স্বভাবের কোন মিলই ছিল না। পিসীমা মারা গেলেন একশো সাত বছর বয়েসে কাশীতে রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে। তাঁরই এক ছেলে তাঁর যথাসর্বস্ব রামকৃষ্ণ মিশনে দান করেছিলেন তাঁরই গুরু ভাইরা এসে আদর করে পিসীমাকে নিয়ে গেল। পৃথিবীতে এক-একজন মানুষ আসে শুধু দিতে—নিতে নয় বড়মা পিসীমা এরা সেই জাতের মানুষ।

তাই ভগবান যখন পিসীমার দুহাত ভরে নানধন ঐশ্বর্য্য দিলেন সেদিন আর যেদিন সর্ব্বস্ব কেড়ে নিয়ে তাঁকে ভিখারিণী কর্লে'ন সেদিনও তাঁর কোন ভাবান্তর দেখা গেল না। সমান ভাবেই রইলেন তিনি শুধু মুখে নয় আচারে ব্যবহারে সুখে দুঃখে তাঁর জীবন ঈশ্বর চরণে সমর্পিত নির্মাল্যের মতই রইল। কখনো হাহাকারও কর্লে'ন না কখনো অহঙ্কারও স্পর্শ করল না তাঁকে। এখন বুঝতে পারি তাই সেকালের সবজজের মেয়ে হয়ে রূপোর গয়না আর তসরের চেলি পরে নির্ভাবনায় তিনি বুড়ো শিবের গলায় মালা দিয়েছিলেন। তাঁর কর্ত্তব্য শেষ হল কাশীর গঙ্গার দিকে আশ্রমের বারান্দায় তিনি শেষশয্যা পাতেন। বংশের বিদ্যা জ্ঞানের পূর্ণ মূর্ত্তি ছিলেন তিনি। শেষ অবধি সেই জ্ঞান অটুট ছিল তাঁর সেকারণ সাধুরা তাঁকে পড়ে শোনাতেন যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ নব যোগীন্দ্র উপাখ্যান বিষ্ণুপুরাণ মনুসংহিতা—। মন দিনে দিনে নব রসাধারে পরিপূর্ণ হয়ে উঠলো। যে পাঁচটি ছেলে তিনি হারিয়েছিলেন তারা অজস্র ছেলের মধ্যে বেঁচে উঠে তাঁকে ঘিরে রেখেছিল।

রুগীর ঘর ত নয় যেন তপোবন। পিসীমার মধুর কণ্ঠে উচ্ছ্বসিত হত।

"প্রভাতে যঃ স্মরেন্নিত্যং দুর্গা দুর্গাক্ষরদ্বয়ং
আপদ তস্য নশ্যতি তমো সূর্য্যোদয়ে যথা"

সত্যই মৃত্যুর তমসা ভেদ করে অমৃতের সূর্য্যোদয় ঘটেছিল তাঁর জীবনে। তাঁর, সাধু ছেলেরা বুক দিয়ে আগলে রেখেছিল তাঁকে। ডাকবার আগে তারা ছুটে আসে মার কাছে। পিসীমার বুকে এমন অমৃতময় স্নেহ ভগবান দিয়েছিলেন সে আস্বাদ পেয়ে সাধুরাও আকৃষ্ট হত। পাঁচটি ছেলের দশটি হাতের জায়গায় অনেক হাত এগিয়ে এলো তাঁর সেবার জন্য। দীর্ঘ দশ বৎসর পক্ষাঘাতে অবশ অঙ্গ হয়ে তিনি শয্যাগত ছিলেন কিন্তু সেবার অভাব হয়নি একদিনের জন্য। অভাব হল না তাঁর মুখের গোপাল ডাকের যদু-মহারাজ হরি-মহারাজ পূর্ণ-মহারাজ সবাই সেই গোপাল ডাকের আশায় উপস্থিত।

পিসীমার কাশী আসার ঘটনাও তেমনি অপ্রত্যাশিত। ডাক্তারী শাস্ত্রে বলে পাগল আর জিনিয়াস দুই নাকি পাশাপাশি থাকে। পিসীমার বড় ছেলের মাথার গোলমাল হল তাঁর ধারণা হল তাঁর জিভে বিষ আছে। কিছু খেলেই বিষাক্ত হয়ে তিনি মারা যাবেন। কোনমতেই কিছু খাওয়ান গেল না তাঁকে। তিনি আর হারুবাবুর ছোট ভাই নারায়ণ শাস্ত্রী মামা ভাগ্নে হলেও একবয়সী। তাছাড়া দিদিকে বড় ভালবাসতেন তিনি। নারায়ণবাবু দীর্ঘকাল নানা চিকিৎসা নানা চেষ্টাতেও তাঁকে বাঁচাতে পারলেন না।

মেজ ছেলে মারা গেলেন সন্ন্যাস রোগে। বিরাট দেহ বিশাল বুকের ছাতি—কি করে যে অমন ভাবে গেলেন ধারণার অতীত। সেজ ছেলে বলরাম আসামে হরি সংকীর্ত্তন কর্ত্তে গিয়ে কালাজ্বরে মারা গেলেন। নছেলে কলেরায়। ছোট ছেলে মারা গেল অপারেশনে টেবিলে পেটে কী যেন হয়েছিল। নারায়ণবাবু এই ভাগ্নেদের প্রাণের অধিক ভালোবাসতেন। বিশেষ করে হারুবাবুর ভাগ্নীদের প্রতি অবিচারে তিনি মনে বড় আঘাতও পেয়েছিলেন। ভাগ্নেদের বুক দিয়ে আগলে রেখেছিলেন তিনি। তবুও নিয়তির বিধান মানতেই হবে। ছোট ভাগ্নেটি মারা যাবার আগেই নারায়ণবাবুর মৃত্যু হয়। ইতিমধ্যে পিসীমার বৌরা পিতৃহীন হয়ে দু-তিনজন এসে উঠেছিলেন পিসীমার

কাছে। নারায়ণবাবু সস্নেহে তাঁদের আশ্রয় দিয়েছিলেন। তাঁদের ছেলেমেয়েরাও বড় হয়ে উঠেছে এমন সময় নারায়ণবাবু মারা গেলেন। সংসারে আর্থিক অনটন দেখা দিলো। হারুবাবু টাকা থাকলেও কারুকে দেখবেন না। মুক্তহস্ত নারায়ণবাবু থাকায় বিধবা ও পিতৃহীনেরা কোন অভাব কোনদিন টের পায়নি। যদিও ইতিমধ্যেই পিসীমার দুটি নাতি তীক্ষ্ণ মেধার বলে রাজ সরকারে উচ্চ পদ লাভ করেছে কিন্তু বিপদ ঘটল অন্যত্র থেকে। প্রায়ই বিবাহযোগ্যা কন্যা নিয়ে বাবা কাকাদের বিধবা স্ত্রী উদয় হন। বলেন বাবা তুমি সুপুত্র বিধবার কন্যাদায় উদ্ধার করো। বিধবার কন্যাদায় নয়, বাবা কাকার কন্যাদায়, না নিয়ে উপায় নেই। নারায়ণবাবু থাকতে তিনিও সাহায্য করেছেন। কিন্তু এখন চৈতন্যে আর গৌরাঙ্গকেই সামলাতে হয়। পিসীমার কিন্তু সমান হাসিমুখ। সন্দেশের জায়গায় বাতাসায় তাঁর বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই। কিন্তু টনক নড়লো অন্যত্র। বেলুড় মঠের সন্ন্যাসীরা বুঝলেন এবার পিসীমাকে সরাতে হবে। হঠাৎ একদিন চারজন সাধু এলেন পিসীমার কাছে পিসীমা ত আনন্দে আত্মহারা। বৌদের ডেকে বললেন ঘন করে ছোলার ডাল আর পরটা করো বৌমা আমার গোপালরা বড় ভালবাসে। আর ঐ কৌটোয় তিলকুটো আছে দাও ত মা। এবার হাসলেন মাধবানন্দ বললেন আজ আর তিলকুটোয় গোপালরা ভুলবেনা মা। আজ আমাদের অনেক চাওয়া। বসুন বৌদিরা আপনাদের কাছেই চাওয়া। বৌরা মুখ চাওয়া-চায়িয় করে পিসীমা নিষ্পলক চোখে চেয়ে থাকেন। কি চায় গোপালেরা এই নিঃস্ব রক্ত মায়ের কাছে? মাধবানন্দ বলেন বৌদি আপনাদের ত ছেলেরা বড় হয়েছে রোজগেরে হয়েছে। আজ বাদে কাল বিয়ে দেবেন নাতি-নাতনী হবে। দেখুন আমাদের কেউ নেই আমরা মাকে চাইতে এসেছি। মা তো অনেকদিন আপনাদের নিয়েই রইলেন। এবার কিছুদিন মাকে আমরা ভোগ করি। মাকে আমরা কাশী নিয়ে যাবো। আমাদের মধ্যে যাকে মা চাইবেন সেই মার কাছে কাশীতে থাকবে। আমরা বসছি ছেলেরা আসুক। সন্ধ্যে ঘনিয়ে এল পিসীমার নাতি দুজন ফিরলো অফিস থেকে। সাধুরা তাদের বুঝিয়ে বললেন মাকে আমরা কাশীবাস করাতে চাই। তোমরা উপযুক্ত হয়েছ মাঝে মাঝে যাবে দেখবে ঠাকুরমার কোন কষ্ট হচ্ছে কি না। কোন অভাব অভিযোগ আছে কি না। এবার হাসলো নাতি, বললো অভাব ও অভিযোগ এ দুটো কথাই ঠাকুরমার অভিধানে নেই। সাধু আবার বললেন তোমরা অমত কোর না বাবা সাতদিন বাদে আমরা এসে মাকে নিয়ে যাবো। বিদায় নিলেন তাঁরা।

পিসীমার সদানন্দময় মুখখানি আসন্ন তীর্থবাসের আশায় আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। হাতজোড় করে ঠাকুরকে বললেন ঠাকুর কত দয়া তোমার। পিসীমার এইটেই ছিল বৈশিষ্ট্য। দুঃখের সময় অনিবার্য্যের সামনে নিস্পৃহতা। আর সুখের সময় ঠাকুরের দয়া স্মরণ করা। মৃত সন্তানদের কথা বলে দুঃখ করতে কেউ তাঁকে শোনেনি। বলতেন আমার কত ভাগ্য তাই ঠাকুর অমন সব রত্ন আমায় দিয়েছিলেন। দিয়েছিলেন এইজন্যই কৃতজ্ঞ। কেন কেড়ে নিলেন এ বলে অনুযোগ নেই।

কাশীতে এসে পিসীমার কি আনন্দ সকাল বিকেল বিশ্বনাথের আরতি শোনেন। কাছে যাবার ক্ষমতা নেই। নাই বা চোখের দেখা হল? শ্রবণশক্তি ত রয়েছে। কাশীতে বিশ্বনাথের আরতি হয় ওঁকার সুরে। অর্থাৎ সৃষ্টি স্থিতি লয়। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের পূর্ণারতি—। শেষে লয়ের সুর রবীন্দ্রনাথের প্রলয় নাচন গানের কথা মনে করিয়ে দেয়। যিনি ডমরু বাজান তিনি অনেক সময় আরতির শেষে অচেতন হয়ে পড়েন। পিসীমা তন্ময় হয়ে যান বিশ্বনাথের আরাধনায়। কলকাতার কথা মনে হয় মনে হয় জীবনে এত আনন্দও ছিল। সাধুরা এসে বসেন পিসীমার কাছে—কেউ বা কেদার দর্শন করে ফিরলেন কেউ বা সঙ্কট। পিসীমা তন্ময় হয়ে শোনেন সেই দেব-দেবীর মহিমা। পাঠে

শ্রবণে কীর্ত্তনে পিসীমার জীবন আনন্দে বিভোর হয়ে উঠলো দেহ-যাতনার কথা মনেও রইল না। মনে পড়ে গীতার কথা

এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি
স্থিত্বাঽস্যামন্ত কালেঽপি ব্রহ্ম নির্ব্বাণমৃচ্ছতি।

মন যেন দিনে দিনে ভরে উঠলো অমৃত সুধারসে ধীরে ধীরে পূর্ব্ব জীবনের স্মৃতি বিস্মৃতির তলায় মিলিয়ে যেতে লাগলো। কই কিছু তাঁর হারায়নি ত সব পরিপূর্ণ হয়ে পূর্ণতমর উদয় হচ্ছে যে। এখানে তাঁর নাম হয়েছে পুঁটুমা। মিশনে বৃদ্ধ বৃদ্ধার অভাব নেই হরি মহারাজ হাঁকেন পুঁটুমার পুজোর যোগাড় দিয়েছ? যদু মহারাজ বলেন পুঁটুমার মিছরির পানা দোয়া হয়েছে ত? এই নামকরণে ও পিসীমার আনন্দের সীমা নেই। বলেন নিজের নাম ত ভুলেই গেছলুম মনে হচ্ছে আবার যেন বাপের বাড়ী এসেছি। বাবা এমনি করে ডাকতেন পুঁটুমা আমার গামছা কই রে? পুঁটুমা আমার খড়মজোড়া এগিয়ে দে না। সেদিন তাঁকে দেখতে এলেন তাঁর এক বোনঝি-জামাই ভদ্রলোক একমাত্র সন্তান হারিয়েছেন অধ্যাপক মানুষ তিনটি দিনের ছুটিতে কাশী এসেছেন। আসার সময় স্ত্রী বারে বারে বলে দিয়েছিলেন বড় মাসীকে দেখে এসো। স্ত্রীকে বলতে হত না স্বভাব গুনেই সবাই তাঁকে ভালবাসে। পিসীমার আনন্দের সীমা নেই। ঘরে তখন গীতা পড়া হচ্ছিল স্বামীজী বললেন "মানুষ নিজ নিজ প্রকৃতি নিয়েই জন্ম গ্রহণ করেন।" অধ্যাপক মশায়ের মনে পড়লো ক্যান্ত পিসীমার কথা—এই পিসীমারই নিজের বোন অদ্ভুত মানুষ এই ত সেদিনের কথা তাঁর বাড়ীতে এসেছিলেন ভদ্রমহিলা।

অধ্যাপকের স্ত্রী রুবী দীর্ঘকাল ব্লাড প্রেশারে শয্যাগত ঐ অবস্থায় একমাত্র মেয়ে মারা গেল এখন সেই প্রেসার বাড়লে আর বিধি নিষেধ মানতে রাজী হন না। বলেন "জীবনে বিতৃষ্ণা এসেগেছে এই রোগের জ্বালায়। অত বড় সন্তানশোকে যার মৃত্যু হল না সে নাকি আর মরবে। ডাক্তারদের সব বাড়াবাড়ি সব সময় সখী ধর ধর অবস্থা। মেপে চলা মেপে কথা বলা মেপে খাওয়া মনে যেন কোন উদ্বেগ না হয় নানান বায়নাক্কা। রুবী যেন দিনে দিনে অবুঝ হয়ে উঠছে বলে ডাক্তারদের ওষুধ নেই তাই বলুক তা না বলে কারুর রোগের খবর যেন তাকে দেয়া না হয় কোন ঝঞ্ঝাটের খবর যেন তার কানে না ওঠে ডাক্তার দের শতেক নিষেধ। কদিন ধরে আবার প্রেশারটা বেড়েছিল রুবীর কিন্তু তার যেন জেদ ধরে গেছে কিছু-তেই শয্যাশায়ী হবে না। সেই আয়ার হাতের পুতুল হয়ে বাঁচার সাধ নেই তার। মাথা ঘোরা নিয়েই টলতে টলতে-বাথরুমে যায় রুবী। আবার হাঁপাতে হাঁপাতেই বসে খায়। চান করলে হাঁপিয়ে যায় বলে ভাত খেয়ে চান করে। আবার শুয়ে হাঁপায় তবুও ঝিকে সঙ্গে নিয়ে চান কর্ব্বে না কারণ মৃত্যু যখন তার হবেই না তখন শুধু শুধু পরের হাত তোলায় সে থাকতে রাজী নয়। পিসীমা প্রায় নিরক্ষরা রুবী গ্র্যাজুয়েট। তাছাড়া মেয়ের মৃত্যুর পর অধ্যাপক মশাই নিজেই তাকে যত্ন করে দর্শন শাস্ত্র পড়িয়েছিলেন। রুবীর মেধা ছিল পড়াশোনাও কম করেনি কিন্তু সব সত্ত্বেও সন্তানের মৃত্যুকে সে নিয়তির বিধান বলে মেনে নিতে পাচ্ছে না। পিসীমা কিন্তু পাঁচ পাঁচটি উপযুক্ত সন্তানকে হারিয়ে তা মাথা নত করে মেনে নিলেন। উপায় কি ঠাকুরের যা ইচ্ছে তাই হবে। মনে প্রাণে-বলেছেন

"তোমারি ইচ্ছা হউক পূর্ণ করুণাময় স্বামী"

কিন্তু রুবী তা পারছে কই? তার অন্ধ ভালোবাসার কাছে যুক্তি তর্ক সব ভেসে যাচ্ছে বন্যার মুখে কুটোর মত। আসলে মনের গভীরে আছে আত্ম অহঙ্কার। ক' নিখুঁত করে গড়ে তুলেছিলুম তাকে কী সুপাত্রে দিয়েছিলুম কী সাজানো সংসার আমার চক্ষের পলকে সব মিলিয়ে গেল? কেন কেন? কী অপরাধ করেছি আমি জ্ঞানে কোন দোষ ত করিনি এই সব নিষ্ফল তর্ক যুক্তিতে কোন সান্ত্বনা খুঁজে পায় না রুবী—। দিনে দিনে প্রেশার বাড়ার কারণ তাইই।

রুবী নিজেও যে বোঝে না তা নয় তবু সে মেনে

নিতে পারছে না নিয়তির এই বিধানকে—। বুঝেও বুঝছে না যিনি দিয়েছিলেন তিনি নিয়ে নিয়েছেন রাখার মালিক ত সে নয়। নিরন্তর এই হারানর ক্ষোভ তাকে ব্যাকুল করে রেখেছে দিনে দিনে হারানর ব্যথা যেন তীব্র হয়ে উঠেছে।

অধ্যাপক নিরুপায় হয়ে চেয়ে দেখেন। ভাবেন এই কি বেশী জানার দুঃখ? মেয়ে তাঁরও কম প্রিয় ছিল না নাদেখে থাকতে পারবেন না বলে কলকাতাতেই স্থিতি এমন পাত্রে দিয়েছিলেন কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন কি? তাকেত হারিয়েইছেন আবার রুবীর এ কী অবস্থা? এক একবার ভাবেন রুবী পাগল হয়ে যাবে না ত? পাগলই ত হয়েছে হতে আর বাকি কি?

মীরার সঙ্গে সঙ্গেই রুবীরও মৃত্যু ঘটেছে। কিন্তু এ মৃতদেহ আগলে বসে থাকা ছাড়া উপায় নেই। দিনে দিনে অধ্যাপক যেন মূক হয়ে যাচ্ছেন। ঘটনাটা এত তীব্র ভাবে রুবীকে আঘাত করেছিল মাসতিনেক সে যেন ঘটনাটা উপলব্ধিই করতে পারেনি। স্বাভাবিক ভাবে ছিল। সবাই স্বস্তি পেয়েছিল তাকে দেখে। কিন্তু তার পরই তার এই প্রতিক্রিয়া দেখা গেল। কী বলে সান্ত্বনা দেবেন তাকে যা বলে সান্ত্বনা দোয়া যায় সবই রুবী নিজেই বলে তবু বুঝেও সে বুঝতে চায়না।

আজ পিসীমাকে দেখে অধ্যাপক মশায়ের সেই রবীন্দ্রনাথের অমর লেখা বারে বারে মনে পড়লো—

"সুখ শুধু পাওয়া যায় সুখ না চাহিলে
প্রেম দিলে প্রেমেভরে প্রাণ,
নিশিদিন আপনার ক্রন্দন গাহিলে
ক্রন্দনের নাহি অবসান।"

পিসীমা শুধু একবার জিগেস কর্লে'ন নগেন ভাল আছ বাবা অধ্যাপক মশাই বললেন হ্যাঁ পিসীমা। নগেনবাবুও বললেন না তাঁর একমাত্র কন্যার মৃত্যু কাহিনী। পিসীমাও জিগেস কর্লে'ন না একাধিক কথা। তারি মধ্যে একজন এসে পিসীমাকে মুগভেজা আর ছানা খাইয়ে গেল। যত্নের সীমা নেই বাহ্যাড়ম্বর নেই অথচ আন্তরিকতা আছে। সত্যিই যেন পিসীমা বানপ্রস্থ নিয়েছেন পেছ টান আর নেই। যতক্ষণ ঠাকুর যা ভার দিয়েছেন নিষ্ঠার সঙ্গে করেছেন এবার ছুটি দিয়েছেন তিনি। জিগেস করলেন না নাতিদের কথা রুবীর কথা কিছু নয়। হাতে মালা ঘুরছে চোখে আনন্দাশ্রু নিমাই চরিতামৃত পাঠ শুনে। আরতির ঘন্টা বেজে উঠলো নগেনবাবু উঠলেন হরিমহারাজ বল্লেন চলুন আরতি দেখে প্রসাদ নিয়ে যাবেন। হিন্দুর ঘরে কাশীতে গঙ্গা-তীরে মৃত্যু এর চেয়ে বাঞ্ছনীয় আর কি হতে পারে?

আসল কথা আত্মসমর্পণ পিসীমা সম্পূর্ণ ভাবে নিজেকে সঁপে দিয়েছেন ভগবানের চরণে শুধু নিজেকে নয় তাঁর যা কিছু সকলকে—।

অধ্যাপক মশায়ের মনে পড়লো আধুনিক জগতের একটি দৃশ্য তাঁরই এক বন্ধু মস্ত বড় ফার্মের মালিক। তাঁর মার অসুখে নামকরা নার্সিং হোমে তাঁকে দেখতে গেছলেন নগেনবাবু।

ডিসিপ্লিনের নামে আন্তরিকতা জিনিষটি যেন সেখান থেকে মুছে গেছে। সকলের মুখে একটা রুক্ষ কাঠিন্য ছাপ। বৃদ্ধা নিজের ছেলেকে বলেছিলেন কি যে লোড শেডিং চলছে একে নিঃশ্বাসের কষ্ট তার ওপর পাখা বন্ধ। আমার শ্রাদ্ধে তুই ঘটাঘটি করিসনি শুধু গরীবদের হাসপাতালে যে কখানা পারিস পাখা দিস। অধ্যাপকের চোখে একটা নূতন দিক খুলে গিয়েছিল। আজকালকার দিনে অসুখ হলেই নার্সিং হোমে দেওয়া ফ্যাশান। ব্যাস. বাড়ীর লোকের কর্তব্য শেষ।

ট্রেনিং নার্সদের হাতপাখা করা পা গা হাত টেপার আইন নেই। কাজেই লোড শেডিং হলে কি অবস্থা বোঝা কঠিন নয়। স্নেহ দয়া মায়া সেবা মমতা সব কথা মুছে গেছে অভিধান থেকে। কর্তব্য ভালবাসা এসব যেন পৌরাণিক কাহিনী বলে মনে হয়। কি বিভীষিকাময় জগৎ হয়ে উঠলো—। নগেনবাবুর মনে পড়লো তাঁর বাবা সুকুমারবাবুর কথা তিনি শিখিয়ে-ছিলেন প্রত্যহ ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর্বে। এই প্রার্থনার মন্ত্র ছিল নিজের সারাদিনের কাজ যেন তাঁর ইচ্ছামত হয়।

হিন্দু ব্রাহ্মণকুলে জন্ম নিলেও তিনি কোন কুসংস্কারে বদ্ধ ছিলেন না। সকালবেলা উদারকণ্ঠে তাঁর উপনিষদ গীতাপাঠ বহু মানুষকে মনে শান্তির সঞ্চার করতো—

আজ এখানেও সেই প্রার্থনা মন্ত্র পড়া হচ্ছে

দেহিমে জীবনং নিত্যং দেহিমে পরমাভয়ম্
দেহিমে শরণং ধ্রুবম্ দেহিমে পরমাশ্রয়ম্
অসত্যোমা সদ্গময় তমসো মা জ্যোতির্গময়
মৃত্যোর্মা অমৃতং গময় আবিরাবির্ম এধি।

নগেনবাবুর মনে হলো এই ত জীবন শুধু আনন্দ শুধু আনন্দ। সুকুমারবাবু ছিলেন কর্ম্মযোগী তাঁর ধর্ম্ম ছিল বহুজন হিতায় বহুজন সুখায়চ—। প্রতিজীবে শিবজ্ঞান ছিল তাঁর। পিতার উদ্দেশে মনে মনে প্রণাম কর্লে'ন নগেনবাবু। কি মনে হল আবার পিসীমার ঘরে ফিরে গেলেন নগেনবাবু দেখলেন পিসীমার শিয়রে বসে এক সাধু পাঠ কচ্ছে'ন।

ওঁ মধুবাতা ঋতায়তে মধুক্ষরন্তি সিন্ধবঃ
মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীঃ মধুনক্তমুতোষসো
মধুমৎ পার্থিবং রজঃ মধু দ্যৌরস্তনঃ পিতা
ওঁ মধুমান্নো বনস্পতি র্মধুমং অস্তু সূর্য্যঃ
মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ।

জানো মা আকাশে মধু বাতাসে মধু পার্থিব ধূলিও মধুময় মধুময় বনস্পতি মধুময় ওষুধি মধুর রাত্রি মধুর দিন দিগন্ত মধুময়—

পিসীমা দুটি হাত জোড় করে শুয়ে আছেন নীরবে নগেনবাবু বিদায় নিলেন। রুবীকে এসে পিসীমার শান্তিময় শেষ জীবনের কথা নগেনবাবু বললেন। রুবী কি যেন ভাবল নগেনবাবু জিগেস কর্লে'ন কাশী যাবে রুবী? রুবী চমকে বললো তোমার ছুটি কোথায়? নগেনবাবু হাসলেন ম্লান হাসি। বললেন আমার কথা তোমায় ভাবতে হবে না। আমি ঠিক থাকবো রঘুনাথ ত আছে রুবী ম্লান হেসে বললো না না তোমায় ছেড়ে আমি থাকতে পারব না। রাত্রে সারারাত নগেন বাবুর একটা হাত সে ধরে থাকে। হাতটা না পেলে বলে কই তোমার অভয় হাত দাও? নগেনবাবু বলেন সভয় না নির্ভয় কি যেন হাত তুমি বলো আমার মনে থাকে না। মনে মনে ভাবেন রুবীর চেয়ে ত আমি দশ বছরের বড় এ হাত ত রুবীকে বেশি দিন আগলাতে পারবে না কবে রুবী পিসীমার মত নিজেকে ভগবানের ইচ্ছায় সমর্পণ করে শান্তি পাবে?

আশ্চর্য্য কাণ্ড খবর পান ঐদিনই কাশীতে পিসীমার কাশী প্রাপ্তি ঘটেছে।

দক্ষিণের ভারতবর্ষ

কানাইলাল দত্ত

কথামৃতে আছে ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন কেউ আম গাছের ডালপাতা গোনে, কেউ আম খায়। অমৃতফলের আস্বাদ যিনি পেয়েছেন, ডালপাতার হিসাব নিয়ে তিনি অবশ্যই মাথা ঘামাবেন না। ভ্রমণ বৃত্তান্ত বহুলাংশে এই ডালপাতা গোনার ব্যাপার। নতুনকে দেখার আনন্দ, অপরিচিতকে জানার রোমাঞ্চ কথামুখে অপরের চিত্তে সম্প্রসারিত করা প্রায় অসম্ভব। প্রায় বল্লাম এই জন্য যে, ঠিকমত দেখার মন ও দৃষ্টির সঙ্গে সাহিত্যপ্রতিভার মণিকাঞ্চন যোগ সাধিত হলে সবই সম্ভব হতে পারে।

আমাদের এই পুরাতন দেশ ও তার পরিচিত মানুষ নিত্য নবরূপে নবীনতর প্রত্যাশা নিয়ে প্রকটিত হচ্ছে। আমরাও বদলে চলেছি নিরন্তর। এমনি করে বদলাতে বদলাতে দু দিন আগে হোক আর পরে হোক সবাই আমরা নিঃশেষে মুছে যাব। এ সত্য সুপরিজ্ঞাত। কিন্তু প্রকৃতির এই চরম নিয়তিকে স্বীকার করে নিয়েও মানুষ চেয়েছে দূর ভবিষ্যতের জনসমাজের কাছে তার চিন্তা ভাবনাকে পৌছে দিতে। এই মানসিকতা থেকেই কঠিণ পাহাড়ের বুকে হাতুড়ি আর বাটালি ঠুকে ঠুকে আমাদের পূর্বপুরুষেরা বিচিত্র সব ভাস্কর্য রচনা করে গেছেন। সৃষ্টি করে গেছেন অজস্র শিল্পসমৃদ্ধ মন্দির ও বিগ্রহ। ভারতের দক্ষিণাংশ জুড়ে রয়েছে শত সহস্র ছোট বড় মন্দির। সারা পৃথিবীর শিল্পরসিক মানুষ একবাক্যে এর অকুণ্ঠ প্রশস্তি করেছেন। হাজার হাজার বছর আগে আমাদেরই কোন পূর্বজের হাতের ছোঁয়ায় যে কঠিন পাথর এমন বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে সেই সব পাথর স্পর্শ করে আমি তাঁদের প্রণাম করতে চেয়েছিলাম। এই উদ্দেশ্য সাধনের শ্রেষ্ঠতম ক্ষেত্র যে দক্ষিণ-ভারত তাতে আর সন্দেহ কী।

একুশ দিনে বাঙ্গালোর থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত বিস্তৃত ভূমিখণ্ডের প্রধান তীর্থগুলি আমি পরিক্রমা করেছি। আমাদের মত মানুষের সাধ্য সীমিত। সুতরাং শুরু থেকেই পথঘাটের খোঁজখবর, থাকা খাওয়ার হদিস ইত্যাদি যাবতীয় প্রয়োজনীয় তথ্য জেনে না নিলে অকারণ সময় নষ্ট ও বৃথা ব্যয় অপরিহার্য হয়ে পড়ে। অনেকগুলি ভ্রমণকাহিনী পড়ে আমি নিজেকে তৈরী করে নিতে চেয়েছিলাম। আমি যে ক'টি ভ্রমণকথা পেয়েছিলাম তা ভাল করে পড়া সত্ত্বেও বাস্তবক্ষেত্রে বহু সমস্যা দেখা দিয়েছিল। আমার এই লেখা যদি কেউ পড়েন, আশা করি তাঁকে আর বিশেষ কোন সমস্যার মোকাবিলা করতে হবে না।

ভারত সরকারের ভ্রমণ দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করলে কিছু সাহায্য পাওয়া যায়। কিন্তু তাদের সব আয়োজনটাই বিত্তবান্ বিদেশী ভ্রমণকারীদের জন্য বলেই আপনার ভ্রম হবে। তবু আপনি নাছোড়বান্দা হলে তারই থেকে কিছু কিছু প্রয়োজনীয় খবরাখবর

সংগ্রহ করতে সমর্থ হবেন। বেরোবার আগে এটা করাই উচিত। এদের সাহায্যেই আমি একটি ভ্রমণসূচী তৈরী করেছিলাম। অবস্থার চাপে কার্যক্ষেত্রে তার কিছু রদ-বদল ঘটাতে হয়েছিল। সেই পরিবর্ত্তিত সূচিটি আমি এখানে তুলে দিয়েছি। এটাকে ভিত্তি করে যে কেউ সহজেই নিজের মত করে একটা দাঁড় করাতে পারবেন। ভ্রমণকারীদের জন্য রেলে বিবিধ সুযোগ সুবিধা আছে। সার্কুলার টিকিট তার অন্যতম। অনেকগুলি বৃত্তাকার পথ তাঁরা রচনা করে রেখেছেন। সে পথের ভাড়া চলতি মাশুলের চেয়ে অনেক কম। কারো প্রস্তাবিত ভ্রমণের পথ ভিন্ন হলেও তিনি এ সুযোগ পেতে পারেন। সে ক্ষেত্রে পূর্বাহ্ণেই রেলের কমার্শিয়াল দপ্তরের অনুমোদন নিয়ে নিতে হয়। কাজটা খুবই সহজ।

আমরা কলকাতা থেকে সরাসরি মাদ্রাজ গিয়েছিলাম। কলকাতা থেকে মাদ্রাজ যেতে মোটামুটি দু রাত এক দিন লাগে। অনেকে মাদ্রাজের ১৩৭ কিলোমিটার আগে গুডুর জংশনে নেমে তিরুপতি দিয়েই শুরু করেন। কিন্তু রাত দুটোর কাছাকাছি সময়ে গুডুর নামতে হয় বলে বহু জনে মাদ্রাজ থেকে তিরুপতি যাওয়াই পছন্দ করেন। দক্ষিণ ভারতের সর্বত্রই যাত্রীনিবাস আছে। অধিকাংশ আবাসগুলিতে খাবার ব্যবস্থা নেই। এদেশের খাবার বাঙালীর রুচিকর হয় না। অনেকে খেতেই পারেন না। নারকোল তেলে রান্না। টক ও ঝালের বিচিত্র সন্নিবেশে মাছ মাংস ডাল তরকারী সবই বিস্বাদ ঠেকে। দইটাও বিষ টক। চিনি চাইলে পাওয়া যায়। কিন্তু দামটা অনেক ক্ষেত্রে দইয়ের চেয়ে বেশি পড়ে। তবে হাঁ, ভাল লাগুক বা না লাগুক এ দেশে এলে কম বেশি ঐ খাবার খেতেই হবে। আর কয়েকদিন ধরে খেতে খেতে শেষের দিকে একেবারে মন্দ লাগবে না। একটু মাখন ও চিনি সঙ্গে রাখবেন। তাতেই কাজ চালিয়ে নিতে পারবেন। আরও কিছু নেওয়া হয়তো চলে। তাতে অসুবিধাও বিস্তর। বেড়াতে গিয়ে লটবহরের বোঝা বেশি হলেই নানান মুশকিল। নিজে যেটুকু বইতে পারা যায় তার চেয়ে বেশি না হলেই ভাল। দামী জিনিসপত্র পরিহার করেই চলা উচিত। মালপত্রের জন্য পিছুটান থাকলে বেড়াবার আনন্দটাই মাঠে মারা যাবে। আবার লটবহর বেশি হলে খাজনার চেয়ে বাজনা বেড়ে যাবে—কুলি-মজুর যান-বাহনের ব্যয় অনেক বাড়বে। মজুরের জুলুম সব দেশেই সমান। নতুন লোক দেখলে তারা ঠকিয়ে নেবেই। আইন ওখানে অচল। আর সে সময়ই বা কোথায় কখন পাবেন।

আর একটা কথা। ভ্রমণে একলা বেরোনো কোন কাজের কথা নয়। বড় দলের সঙ্গেও অনেক অসুবিধা। তিনচারজন অন্তরঙ্গ ও সমধর্মী লোক একত্রে বেরোতে পারলে সর্ব্বোত্তম। এতে মেজাজটা ঠিক থাকে। একলা হলে পদে পদে অসুবিধা। যান-বাহনের ভাড়া, থাকা-খাওয়ার ব্যয় প্রভৃতির ক্ষেত্রে যে সুবিধা সেটা উপেক্ষণীয় না হলেও তার উপর আমি জোর দেই না।

আমরা কোথাও পৌছে সরাসরি মালপত্র নিয়ে হোটেল বা লজে গিয়ে উঠিনি। কেউ বসে আছি স্টেশনে মালপত্র নিয়ে, অন্য জনে খোঁজ নিয়েছি পছন্দমত হোটেলের ও অন্যান্য প্রয়োজনের। তারপর সব ঠিকঠাক হলে একত্রে গিয়ে উঠেছি। এতে অনেক সুবিধা। শরীরের কথা বলা যায় না। ক্রমাগত ঘুরতে ঘুরতে ইতর-বিশেষ হয়ই। তখন বন্ধুজনেরাই তো সহায়। আরও সুবিধা দর্শনের ব্যাপারে। সমধর্মী মানুষ হলেও সমদৃষ্টি হয় না। দেখাশুনোর ব্যাপারে, অনুভব উপলব্ধির ক্ষেত্রে পার্থক্য থাকেই। এগুলির আদান-প্রদানের ফলে দর্শন মধুর ও মনোজ্ঞ হয়ে ওঠে।

মাদ্রাজ থেকে আমাদের ভ্রমণ-তালিকা ছিল এই রকম।

প্রথম দিন। মাদ্রাজ শহর। সমুদ্র, দুর্গ, সান্ টমাসের গির্জা, কপালেশ্বর ও পার্থ সারথির মন্দির, গান্ধী মণ্ডপ, আর্ট গ্যালারী ও মিউজিয়ম।

দ্বিতীয় দিন। মাদ্রাজ সরকারের টুরিষ্ট বাসে—
।পুরম্, পক্ষীতীর্থম্, ও মহাবলীপুরম্। ফিরবার পথে আডিয়ারে নেমে থিওসফিক্যাল সোসাইটি। এখান থেকে শহর আট কিলোমিটার মাত্র। বাস অপেক্ষা করে না। ফিরবার ব্যবস্থাটা নিজেদেরই করতে হয়। যাত্রী বাস মেলে।

ঐ রাত্রেই রেলে পণ্ডিচেরির যাত্রা এবং পরের দিন ভোরে পণ্ডিচেরি।

তৃতীয় দিন। সকালে—পণ্ডিচেরির শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, ও পণ্ডিচেরির শহর। বিকেলে (আশ্রমের বাস-এ) অরভিল।

চতুর্থ দিন। সকালে নিজেদের ব্যবস্থায় একটি গ্রাম দর্শন। দুপুরে খেয়ে নিয়ে চিদাম্বরম্। চিদাম্বরম্ শহরের মাঝখানে ধর্ম্মশালায় মালপত্র রেখে নটরাজ-মন্দির ও আন্নামালাই বিশ্ববিদ্যালয়। সময় থাকলে—গোবিন্দরাজা। সন্ধ্যার ট্রেন ধরে তাঞ্জোর। পথে পড়ে কুম্ভকোণম্।

পঞ্চম দিন। সকালে—বৃহদেশ্বরের মন্দির, সরস্বতী মহল। দুপুরের গাড়ি ধরে ত্রিচিরাপল্লী। মালপত্র স্টেশনে জমা দিয়ে তখনই বেরিয়ে পড়তে হবে। শ্রীরঙ্গনাথ মন্দির ও রক টেম্পল। রাত্রের গাড়ি ধরে রামেশ্বরম্।

ষষ্ঠ দিন। সমুদ্র, অগ্নিতীর্থ, রামজি-রোখা। রামেশ্বর মন্দির, আরতি দর্শন।

সপ্তম দিন। সকালে সমুদ্রস্নান। রামেশ্বর মন্দির। দুপুরের গাড়ি ধরে মাদুরা।

অষ্টম দিন। মাদুরায় মীনাক্ষী মন্দির। তিরুমালাই, নায়ক প্রাসাদ, টেপ্পাকুলম্ সরোবর। বসন্ত মণ্ডপ। শহর। রাত্রের গাড়ি ধরে কন্যাকুমারীযাত্রা।

নবম দিন। কন্যাকুমারী—মন্দির, গান্ধী মণ্ডপ, বিবেকানন্দ স্মৃতি সৌধ। অবস্থান।

দশম দিন। সকালে গ্রাম ও গীর্জা দর্শন ও শুচিন্দ্রম্ মন্দির। দুপুরে বাসে করে ত্রিবান্দ্রম্।

একাদশ দিন। পদ্মনাথ স্বামী মন্দির, সমুদ্র, মৎস্যশালা, শহর ও জলপথ। রাত্রের গাড়ি ধরে এর্নাকুলাম।

দ্বাদশ দিন। এর্নাকুলাম, কোচিন বন্দর, জলপথে ভ্রমণ। কোচিন বন্দরে অবস্থান।

ত্রয়োদশ দিন। রেল ধরে কোয়াম্বাটুর। এখান থেকে উটকামণ্ড হয়ে মহীশুর যাওয়া যায়। বাস ধরে মহীশুর।

চতুর্দশ ও পঞ্চদশ দিন। মহীশুর। ভ্রমণ সংস্থার বাসে শহর দর্শন। শ্রীরঙ্গ পাটনা, শ্রী সোমনাথপুর, টিপু সুলতানের প্রাসাদ, আর্ট গ্যালারি, চিড়িয়াখানা, কৃষ্ণরাজ সাগর-বৃন্দাবন গার্ডেন এবং চামুণ্ডি মন্দির।

ষোড়শ দিন। বাসে বাঙ্গালোর। শহর দর্শন।

সপ্তদশ দিন। ভ্রমণ সংস্থার বাসে— শ্রাবণবেলগোলা, বেলুড়, হালেবিদ। মহীশুরে বাস পাওয়া গেলে সেখান থেকেই যাওয়া সুবিধা। কিন্তু সব সময় বাস মেলে না।

অষ্টাদশ দিন। হোয়াইট ফিল্ড—সাঁইবাবার আশ্রম, বিমান নির্ম্মাণ কারখানা, লালবাগ। দুপুরের পরে বৃন্দাবন এক্সপ্রেস ধরে মাদ্রাজ প্রত্যাবর্তন।

ঊনবিংশ দিন। রেলে তিরুপতি।

বিংশতি দিন। তিরুপতি মন্দির দর্শন। রাত্রের গাড়িতে কলকাতা যাত্রা।

যাত্রা-লগ্ন আমরা সাধারণত পাঁজিপুঁথি দেখে বেছে থাকি। তা করুণ, তাতে ক্ষতি নেই। কিন্তু সূচিটা এমন করে করবেন যাতে পূর্ণিমার সন্ধ্যাটা কন্যাকুমারিকায় কাটে। তাতে যদি একটু খারাপ দিনেও বেরোতে হয় তবু ইতস্তত করবেন না। বিনোবাজি বলেছেন অশুভ বলে কিছু নেই। ওটা শুভেরই ছায়া মাত্র। শুভের রূপ দেখানোই অশুভের কাজ। অতএব মাভৈঃ।

দক্ষিণে যাত্রাক্ষণের শুভাশুভের কথায় অগস্ত্য মুনির কথা স্বভাবতই মনে পড়ে। হিমালয়ের খাতির তাঁর কন্যা গৌরীর গৌরবে। বিন্ধ্যও ভাবলেন অমন একটি কন্যা হলেই সব ঝামেলা মিটে যায়। গৌরীর মত কন্যা

হলে জামাইও হবে শিবের মত। তখন খাতিরটা আপনা থেকেই বেড়ে যাবে। তাই সাধনা করলেন কন্যার। একটি নয়, দুটি কন্যা তিনি লাভ করেন। নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে তাঁরা হয়েছিলেন শ্রীরাধা ও চন্দ্রাবলী। এই বিন্ধ্যগিরি উঁচু হতে হতে সূর্য্যের পথ রুদ্ধ করে দেন। সমগ্র দাক্ষিণাপথ অন্ধকারে ডুবে যায়। মানুষ ও দেবতা, সকলেই শঙ্কিত হলেন। দেবতারা অগস্ত্যকে ধরলেন। অগস্ত্যের শাপে ইন্দ্রত্ব প্রাপ্ত নহুষকে সাপ হতে হয়েছিল —এতই যার শক্তি তিনিই হচ্ছেন বিন্ধ্যকে বশীভূত করার যোগ্য শক্তিধর ব্যক্তি। দেবতারা তাই অগস্ত্যের শরণ নিলেন। তিনিও এক কথায় রাজি হলেন। বিন্ধ্য অগস্ত্যকে ভয় করতেন খুব। সামনে আসতেই তিনি আভূমি নত হয়ে মুনিকে প্রণাম করলেন। অগস্ত্য তাঁকে প্রত্যাবর্তন অবধি এইভাবে থাকতে নির্দেশ করে অতিক্রম করে গেলেন। আর ফেরেননি। তিনি দক্ষিণ দেশেই বে-থা করে প্রচুর সম্পদশালী হয়েছিলেন। বিন্ধ্য আজও অগস্ত্যের আদেশ পালন করে আনত হয়ে আছে। তারই প্রসারিত বাহুদ্বয় বুঝি বা পশ্চিমঘাট ও পুর্ব্বঘাট পর্ব্বতমালা।

থাকি নিউ ব্যারাকপুরে। হাওড়া স্টেশনের দূরত্ব মাইল বার তের হবে। পুরো তিন ঘণ্টা সময় হাতে নিয়ে বেরিয়েও নিশ্চিন্ত হতে পারি না। ট্যাক্সির বিভ্রাট মিটিয়ে জ্যাম ও জুলুমের মোকাবিলা করে ঠিক সময়ে হাওড়া ষ্টেশনে পৌছনোর গ্যারাণ্টি কেউ দিতে পারে না। তাই শিয়ালদহ থেকে বলম্‌ বলম্‌ পদ বলম্‌-এর হিসেবে সময় হাতে নিয়ে বেরোনোই যুক্তিসিদ্ধ। ফলে বিজ্ঞ হতে গিয়ে ঘণ্টা খানেক হাওড়া স্টেশনে বসে মানুষের যাতায়াত দেখলাম।

আমরাও এক সময় গাড়িতে উঠে বসলাম। যাত্রীর তুলনায় বিদায় জানাতে আমার জনতাই বেশি মুখর। অধিকাংশ যাত্রী দাক্ষিণী। তাঁরা মাতৃভাষায় কথা কইছেন। উচ্চকণ্ঠে দ্রুত উচ্চারণ এবং একাধিক জনের সমবেত আলাপের বিন্দুমাত্র বোধগম্য না হলেও আসন্ন বিচ্ছেদ জনিত বেদনায় যে তাঁরা কাতর তা আমরা অনুভব করেছিলাম। কোন কিছুই স্থায়ী হয় না। গাড়ি ছাড়বার ঘণ্টা পড়তেই আত্মীয়বন্ধুজনেরা নেমে গেলেন। বহুজনেরই চোখ সজল হয়ে এসেছিল। চোখের জলের ভাষা বুঝতে মুখের কথা বুঝবার দরকার না। সহযাত্রীদের প্রতি স্বভাবতই আমরা করুণার্দ্র হয়েছিলাম।

রেলের নিয়মে রাত ন'টা থেকে সকাল ছ'টা পর্য্যন্ত ঘুমোবার অধিকার। কিন্তু সহযাত্রীরা নির্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বেই খেয়ে দেয়ে ঘুমোবার উদ্যোগ করলেন। আমরাও তাদের সহগামী হলাম। আর অন্ধকার রাত্রে বসে বসে দেখবই বা কী! আলো আর অন্ধকার ঢাকা ঘরবাড়ি ছাড়া দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না কিছু। সুতরাং রাত্রের আহারাদি শেষ করে আমরাও শুয়ে পড়লাম। রাত তখন ন'টা হবে। আজকের রাত্রের আহার্য আমরা বাড়ি থেকে এনেছিলাম। সুধীরদার কন্যা ও পুত্রবধূদ্বয় খুব যত্ন করে সকলের জন্য প্রচুর লুচি ও মাছ ভাজা করে দিয়েছিলেন।

যাত্রাপথে

ঘুম ভাঙল বহরমপুরে চা কফির কোলাহলে। এমন অখাদ্য কফি ইতিপূর্ব্বে কখনো খেয়েছি বলে মনে পড়ে না। কফিতে আমরা অভ্যস্ত নই। কিন্তু এখানকার চা আরও খারাপ। পলাশায় আবার কফি। তারও ঐ একই হাল।

চোখ খুলেই পাহাড়ের হাতছানি দেখতে পেয়েছি। ছোট ছোট পাহাড়। কোথায়ও তা সবুজ আস্তরণে ঢাকা আবার কোথায়ও বা খণ্ড ও বিক্ষিপ্ত শিলার ছড়াছড়ি। উদ্ধত ভঙ্গিতে মাথা তুলে রয়েছেও অনেকে। কুয়াশার একটা পাতলা আস্তরণে শীর্ষদেশটি ঢাকা। মনে হয় অকম্পিত জলতরঙ্গের সঙ্গেই এর তুলনা হতে পারে। পাহাড়ের কোলে কোলে লাল মাটির বুকে সবুজ ধানের সমারোহ দেখে আমরা অবাক্‌ হই। পাথরের বুকেই বুঝিবা এরা ধান ফলিয়েছে। পলাশার পরে পাটও দেখেছি। আর দেখেছি অফুরন্ত তাল গাছের জটলা। খেজুর গাছ আছে, তবে সংখ্যা তার নগণ্য।

বেলা ন'টার কাছাকাছি সময়ে কয়েক মুহূর্তের জন্য আমরা থেমেছিলাম শ্রীকাকুলাম স্টেশনে। নকশাল আন্দোলনের কল্যাণে শ্রীকাকুলাম আজ বহুখ্যাত স্থান। নকশাল আন্দোলনের রীতিপদ্ধতি আমার নিকট দুর্বোধ্য। ওদের ভয়ে ভয়ে যখন ষাট টাকা ফিয়ের ডাক্তার চার টাকা নিয়েই রোগী দেখেন, কাজে ফাঁকি-দেনে-ওয়ালা সরকারী কর্মচারীরা ঠিক সময়ে আসেন যান তখন ভাল লাগে। কিন্তু যখন ওঁরা বিদ্যাসাগর আশুতোষের মুণ্ডচ্ছেদ করেন তখন দেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আতঙ্কিত হই। আর পুলিশ ও বিরোধীদের যখন খতম করেন তখন ভীত হই। জানি ভয় পাপ। তবু ভীত হয়েছি বীভৎসতা দেখে। অহিংসার সাধনা ভিন্ন মানুষের সত্যিকার কোন মঙ্গল হতে পারে না এই সত্যে বিশ্বাস আরও দৃঢ় হয়েছে। হিংসা মানুষের ধর্ম্ম হতে পারে না। ওটা পশুর ধর্ম্ম। শক্তিধর মানুষেরা সাধারণত এই কথাটা বিশ্বাস করে না। শক্তি তো আর কেবল গায়ের জোর বা বোমা বন্দুক মাত্র নয়। সমাজে সঙ্ঘশক্তি, অর্থশক্তি, বুদ্ধিশক্তি সর্ব্বোপরি ঐশী শক্তি ক্রিয়াশীল রয়েছে। এগুলি সম্মিলিত না হয়ে যদি সশস্ত্র সংঘর্ষ শুরু করে তা হলে ধ্বংস ছাড়া আর কি হতে পারে? বর্তমান সময়ের শ্রেষ্ঠ অহিংসার সাধক মহাত্মা গান্ধীর কথা আমরা অনেকেই জানি। কিন্তু এ সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দের কথা বহুবিদিত নয়। তিনি বলেছেন—"মানব জাতিকে তরবারির বলে শাসন করিবার চেষ্টা বৃথা ও অনাবশ্যক। আপনারা দেখিবেন যে সকল স্থান হইতে পশুবলে জগৎ শাসন নীতির উদ্ভব সেই সকল স্থানেই প্রথমে অবনতি আরম্ভ হয়, সেই সকল সমাজ শীঘ্রই ধ্বংস হইয়া যায়।"

শ্রীকাকুলামের পর ভিজিয়ানাগ্রাম। স্থানীয় লোক বলেন—বিজয়নগরম। এখানে রেলের লোক এসে দুপুরে যাঁরা ভাত খাবেন তাঁদের একটা করে রসিদ দিয়ে টাকা নিয়ে গেলেন। খাবার মিলবে ওয়ালটেয়ারে। আমিষ ভোজন মূল্য জনপ্রতি দুই টাকা সত্তর পয়সা। খাবারের দাম ২·১০ পয়সা, পৌঁছে দেবার মজুরী ·৫০ পয়সা এবং বিক্রয় কর ·১০ পয়সা মোট ২·৭০ পয়সা। আপনার নিশ্চয়ই জানতে ইচ্ছে করছে বিনিময়ে যে খাবারটা পাওয়া গেল তা কেমন। দু চামচে ভাত (সে ভাতে আমার পেট ভরেনি), একটু জলীয় ডাল, খানিকটা কাঁচকলার তরকারী, তুলসী পাতার মত এক টুকরো পাঁপর ভাজা, এক টিপ চাটনী, ঝোল সহ চার টুকরো মাংস ও এক চামচে দই। সে দই এতই টক যে বাঙালীর মুখে রোচে না। আমাদের ঝোলায় চিনি ছিল আর পেটে ছিল ক্ষিধে, তাই ওটার সদ্ব্যবহার করতে আটকায়নি।

যদি কোন কারণে মিলের অর্ডার দিতে ভুলে গিয়ে থাকেন তাতে কোন অসুবিধা হবে না। ওয়ালটেয়ারে গাড়ি অনেকক্ষণ দাঁড়ায়। রেষ্টুরেন্টে গিয়ে সহজে খেয়ে আসতে পারবেন। বাড়তি মিল অনেক সময় ফেরিও করে।

ওয়ালটেয়ার স্টেশনটি পাহাড়ের কোলে। প্রথম নজরেই চোখে ধরে। ওয়ালটেয়ারকে বলা হয় চির বসন্তের দেশ। এ নাম যে তার সার্থক তা গাড়িতে বসেই অনুভব করা যায়। অনেকক্ষণ ধরে দেখা যায় পথের দুধারেই উঁচু নিচু পাহাড়—কখনো একেবারে হাতের নাগালে, কখনো বা দূরে। বেশ লাগে এই ছবি আর লুকোচুরি খেলা।

ওয়ালটেয়ারে ডাব পাওয়া যায় প্রচুর। কিন্তু আমরা সেগুলিকে ডাব বলি না। বলি দুমড়ো নারকেল। বেশ পুরু শাঁস আছে প্রত্যেকটিতে। জল খেয়ে নারকেলটি এঁরা ফেলে দেন না, সেটিরও পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেন।

ওয়ালটেয়ার ষ্টেশনটিতে যেতে মূল পথ ছেড়ে ভিতরে ঢুকতে হয়। আবার এই পথে পিছু হটে মূল পথের সঙ্গে মিলন ঘটে। ফলে গাড়ির যাত্রামুখ যায় বদলে। এতক্ষণ আমেদের বগিখানা ছিল ইঞ্জিনের ঠিক পেছনেই, এবার হলো শেষ কামরা। ওয়ালটেয়ারের অল্প পরে একটা ছোট স্টেশনে গাড়ি থেমেছিল। নাম সীমাচলম।

নতুন রাজ্য অরুণাচলের বোন বলেই মনে হয় না কি? এখানেও মন্দির আছে। বহু লোকে তীর্থ করতে গিয়ে থাকেন। এই স্টেশন থেকে গণ্ডায় গণ্ডায় কলাওয়ালা এসে হামলা শুরু করে দিল। চাঁপা কলা কিন্তু বেশ বড় বড়। রঙেরও বাহার আছে। সস্তাও খুব। টাকায় বোলটা। সুধীরদা এক টাকার কিনে ফেল্লেন। এক টাকা বা আট আনার কলা প্রায় সকলে নিলেন। সস্তা বলেই হয়তো কেনা।

কাশীতে সস্তা কেনার একটা মজাদার গল্প শুনেছিলাম। সেখানে মাছের দাম কলকাতার তুলনায় অর্ধেকেরও কম। কলকাতা থেকে বাঙালীরা এসে সস্তা পেয়ে যেখানে আধ কেজি কিনলে চলে সেখানে ড্যাম চীপ বলে—দু কেজিই হয়তো কিনে ফেলেন। মাছওয়ালারা এঁদের অজ্ঞতার সুযোগে বাজার দরের চেয়ে কিছু বেশি আদায় করে নেয়। মেছুনীদের মুখে 'ড্যাম চীপ' কথাটি হয়েছে ড্যার্মচি। আর এই রকম খরিদ্দাররা হয়েছেন ড্যার্মচি বাবু।

বিকেলেও চা পাওয়া গেল না। চায়ের বড় আকাল এ দেশে। জনৈক সহযাত্রী বল্লেন রাজমাণ্ডিতে খোঁজ করলে ভাল চা পাবেন। খোঁজ করেছিলাম কিন্তু চা পাইনি। পাওয়া গেল ফুলের মালা। দক্ষিণে নারীর পুষ্পপ্রীতি বহুবিদিত। মালিকাহীন বেণী বিরল দর্শন। তবু খাদ্য পানীয়ের সঙ্গে প্লাটফর্মে ফুলের মালা ফেরির ব্যাপারটা বুঝে নিতে সময় লাগে। চা পান বিড়ি সিগারেটের মত ফুলও অপরিহার্য বিবেচিত না হলে রেল স্টেশনের যাত্রী গাড়ির জানালায় তার শুভাগমন ঘটত না। ফুল যাদের জীবনে এমনই অপরিহার্য সে মানুষগুলিও যে ফুলের মত সুন্দর হবেন তাতে আর আশ্চর্য কি!

রাজা মহেন্দ্রীর পরেই বিখ্যাত তীর্থ নদী গোদাবরী। প্রশস্ত নদী কিন্তু চড়া পড়েছে মধ্যস্থলে। নৌকা চলাচল করছে। সন্ধ্যা সমাসন্ন। তবুও ঘাটে বহু সুবেশী নরনারী শিশুকে দেখা গেল। স্থানীয় কোন উৎসবে এঁরা সমবেত হয়েছেন। তীর্থযাত্রী হলে শিশুর সংখ্যা এত বেশি কিছুতেই হতে পারত না। শান্ত স্নিগ্ধতার আমেজটুকু আমরা চলমান গাড়িতে বসেই অনুভব করতে পেরেছি।

পরবর্তী ছোট্ট স্টেশনটি থেকে বুকে যিশু খ্রীষ্ট ও মাতা মেরীর ছবি ঝুলিয়ে একটি বালক ভিক্ষুক উঠল। সে নীরবে হাত বাড়িয়ে যাত্রীদের সামনে দাঁড়ায়, মুখ ফুটে কিছু চায় না। চেহারা তার ভিক্ষুকের মত কিন্তু আচরণে পার্থক্য বিস্তর। যিশুর ছবি গলায় ঝোলানো ভিক্ষুক কলকাতায় নেই।

বেজওয়াদায় এসে রাতের খাবার পাওয়া গেল। খাদ্যে দাক্ষিণী স্বাদ আরও বেড়েছে। বেজওয়াদা ছাড়তেই কৃষ্ণা নদী। অন্ধকারে কিছুই দেখতে পেলাম না। শব্দে বুঝতে পারি সেতু পার হচ্ছি। অন্ধকার দেখতে দেখতেই কখন ঘুমিয়ে পড়েছি। ঘুম ভাঙল পরদিন ভোরে। আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই গাড়ি মাদ্রাজ স্টেশনে গিয়ে দাঁড়াবে। একটানা প্রায় ছত্রিশ ঘণ্টা চলে নির্দিষ্ট সময়ের বেশ কিছুক্ষণ আগেই আমাদের গাড়িখানা মাদ্রাজ সেণ্ট্রাল স্টেশনে পৌছে গেল।

মাদ্রাজ

রাজপথে তখন যাত্রী বাস-এর যাতায়াত সুরু হয়েছে যাত্রীসংখ্যাও তাতে বেশ। রেল মজুর ও রিকশাওয়ালার জুলুম এখানে কিছু মাত্র কম নয়। ভাষার অসুবিধার জন্য একজন সহযাত্রী একটি মজুর ঠিক করে দিলেন। গাড়ি থেকে সুটকেস ও বিছানা রিকশায় তুলে দিতে মজুরী ঠিক হলো দেড় টাকা। রেলের নির্ধারিত পারিশ্রমিক পঞ্চাশ পয়সা। পথে বেরোতেই কোন একটা হোটেলের একজন বাঙালী দালাল আমাদের পাকড়াও করলেন। তাঁর বেশবাস ও কথা বলবার ধরণ-ধারণই কেমন গ্রাম্য। তাঁকে তাই বাতিল করে দেওয়া হলো। জনৈক স্থানীয় মজুরের সঙ্গে সুধীরদা আশ্রয়ের সন্ধানে গেলেন, আমি মালপত্র নিয়ে ফুটপাথে বসে রইলাম।

আধ ঘণ্টার মধ্যে পছন্দমত আশ্রয় ঠিক করে সুধীরদা ফিরে এলেন। স্টেশনের কাছেই কানডান লজে আমরা উঠলাম। এখানে শুধু থাকার ব্যবস্থা। এদিকে অধিকাংশ স্থলে থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা পৃথক। দুই শয্যার একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থাৎ স্নান ও শৌচাগার সহ কামরার দৈনিক ভাড়া দশ টাকা।

গতকাল গাড়িতে কাকস্নান হয়েছে। সেখানে একই খুপরিকে শৌচাগার আর স্নানাগার রূপে ব্যবহার করতে হয়। স্বভাবের দোষে দ্বিতীয় ব্যক্তির ব্যবহারযোগ্য রেখে বহুজনেই ফেরেন না। গান্ধীজি দিব্যদৃষ্টিতে আমাদের চরিত্র দর্শন করে বলেছিলেন—"আপনি যদি গাড়ির শৌচাগার সযত্নে ব্যবহার করেন তা হলে সকলেই খুশি হবেন। অমনোযোগের সঙ্গে ব্যবহার করার সময় আপনি পরবর্তী যাত্রীদের কথা খেয়াল করেন না।" রেলের সর্বভারতীয় পঞ্জীতে কথাগুলি মুদ্রিত হয়েছে। ফল পেতে আরও অনেকদিন অপেক্ষা করতে হবে বলেই মনে হচ্ছে। যাই হোক স্নানের দৌলতে দীর্ঘ রেল ভ্রমণের ক্লান্তি ও কাকস্নানের কষ্ট নিমিষেই দূর হয়ে গেল।

মেঘ-মেদুর আকাশ নিয়েই মাদ্রাজ এসেছি। অল্প পরেই ঝির ঝির বর্ষা শুরু হলো। কিন্তু এ বর্ষার স্বাদ আলাদা। রোদ বৃষ্টির মাখামাখি চলছে সর্বক্ষণ। এটাকে বলে ফিরতি মৌসুমী হাওয়ার বর্ষা। কিন্তু বাংলায় আষাঢ় শ্রাবণ মাসে বর্ষার জলে যেমন ধান রোওয়া চলে এখানে এই সময় সর্বত্র তদ্রূপ ধান রুইতে দেখেছি।

বেরোবার মুখেই ঝুপ করে আচমকা বৃষ্টিটা এসে পড়ল। আমরা হোটেলের ম্যানেজারের ঘরে বসতে বাধ্য হলাম। কলকাতা থাকতেই শুনেছিলাম তামিল নাড়ুর শাসক দল দ্রাবিড় মুনেত্রা কাজাঘাম অর্থাৎ অর্থাৎ দ্রাবিড়ের অগ্রগামী দল ভেঙ্গে অপর একটি আন্না ডি এম কে দল হয়েছে। তা নিয়ে হাঙ্গামা হুজ্জুতও হচ্ছে বেশ। কলকাতার ছেলেরা ডি এম কে মানে করেছে ডি-ধরো এম=মারো ও কে=কাটো, অর্থাৎ ধরো-মারো-কাটোর দল। সত্যিকার মারামারি কাটাকাটিটার চেহারা কি জানতে চাইলে হোটেলের ম্যানেজার বল্লেন—নাথিং, এভরিথিং নর্মাল। কিছুই না, সবই স্বাভাবিক। কি বুঝবেন আপনি? খবরের কাগজে বড় বড় খবর আর ম্যানেজার বলেন কিনা নাথিং, এভরিথিং নর্মাল। যাইহক্, বোঝা গেল মাদ্রাজ শহরে সমস্যা গুরুতর কিছু নয়। দু'দিন ছিলাম, কোথায়ও গোলমালের সামান্যতম আভাস এই শহরে দেখিনি।

আমাদের অন্যতম সহযাত্রী অধ্যাপক মোহনলাল মিত্রের আসবার কথা দিল্লী থেকে। আজই দিল্লী-মাদ্রাজ জি টি আর এক্সপ্রেসে তাঁর আসবার কথা। সে গাড়ি পৌঁছোয় দশটায়।

তাঁকে যে ঠিকানা দেওয়া ছিল সেখানে আমরা উঠিনি। অতএব স্টেশনেই তার সঙ্গে দেখা করার দরকার। তাই সকালে আমরা দূরে কোথায়ও গেলাম না। কাছাকাছি একটু ঘোরাঘুরি করে স্টেশনে এসে বসলাম। সেন্ট্রাল স্টেশনে দোতলায় ভোজনালয়ে ভাল চা পাওয়া যায়। বারান্দায় বসলে শহরটিকে চমৎকার দেখায়। সামনে যানবহুল রাস্তা। তারপর কয়েকটি বাড়ি। বাস, আর কিছু দেখা যায় না। মনে হয় অল্প দূরেই চোখের সামনেই যেন শহরটি হঠাৎ হারিয়ে গেছে।

মোহনদা ঠিক সময়ে এলেন। তাঁকে খুঁজে পেতে কোন অসুবিধাই হলো না। দুপুরের খাওয়া সারলাম রেলের আমিষ ভোজনালয়ে। রাতেও এখানে খেয়েছিলাম, তাই দাক্ষিণী খাবারের তয়াবহ আস্বাদ আমাদের জন্য তোলা রইল।

বেলা দেড়টা নাগাদ আমরা হাঁটতে হাঁটতেই পৌঁছে গেলাম ৩৫নং মাউণ্ট রোডে ভারত সরকারের ট্যুরিস্ট দপ্তরে। এটাই শহরের প্রধান সড়ক। দর্শনীয় স্থানাদি সম্পর্কে কিছু কাগজপত্র পেলাম। কর্মীরা মুখে মুখে কিছু খবরও দিলেন। এখান থেকেই জেনেছিলাম

ট্যুরিস্ট ডেভলেপমেণ্ট কর্পোরেশন ও তামিলনাড়ু সরকারের ট্যুরিস্ট বিভাগের বাস নিত্য কাঞ্চীপুরম্, পক্ষীতীর্থম্ ও মহাবলীপুরমে যাতায়াত করে। মাদ্রাজ শহরও ঘুরিয়ে দেখানোর ব্যবস্থা আছে। ট্যুরিস্ট ডেভলেপমেণ্ট করপোরেশনের ভাড়াটা একটু বেশি। মাদ্রাজ শহর দেখার ভাড়া ছ'টাকা আর কাঞ্চী, পক্ষীতীর্থম্ ও মহাবলীপুরমের ভাড়া ষোল টাকা। মাদ্রাজ সরকারের বাসে ১৬ টাকার ভাড়া মাত্র বার টাকা।

টাকার রসিদ ও অন্যান্য খবরাখবর দিলেন জনৈক মহিলা কর্মী। তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা ও সৌজন্যশীল ব্যবহারের দ্বারা তিনি আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিলেন। সামান্য কথাবার্তার মধ্যেও মহিলাটির বৈদগ্ধ্যের পরিচয় পেতেও বিলম্ব হল না। তাই সাহস করে রাজাজির খোঁজ-খবর তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি ঠিকানা সংগ্রহ করে দিলেন। টেলিফোনে যোগাযোগ করার অনুমতিও পেলাম। এই আপিস থেকে ফোন করে আজ বিকেল সাড়ে তিনটেয় রাজাজির সঙ্গে দেখা করার ব্যবস্থা করা গেল। হাতে আমাদের ঘণ্টা খানেক সময়। শুনে নিলে যে সব বাসের নম্বর জোগাড় করেছি তার একটারও দেখা নেই। এমনি অপেক্ষা করতে করতে আধঘণ্টা কেটে গেল। আর দেরি না করে একটা ট্যাক্সি ধরে নানা পথ ঘুরে রাজাজির বহুল প্রচারিত 'কল্কি' পত্রিকা আপিসে পৌঁছোলাম ঠিক সাড়ে তিনটায়। পথে নানা জনকে জিজ্ঞাসা করতে হয়েছে। ট্যাক্সি চালক তো বটেই বহু তথাকথিত শিক্ষিত মানুষ রাজাজি নিবাসের খোঁজ রাখেন না।

ক্রমশঃ

ক্রীড়া জগতে মনুষ্য দেহাকৃতির শ্রেণী নির্ণয়ের সার্থকতা

রবীন্দ্রনাথ ভট্ট

সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা মনুষ্য শরীরের নির্দ্ধারিত কোন প্রকারের সামঞ্জস্য-পূর্ণ শ্রেণীবদ্ধ করণের নামই "Somatotyping"। একদল লোকের মধ্যে বিচার করে আমরা যখন ইহার তাৎপর্য্য উপলব্ধি করার চেষ্টা করি তখন হয়ত আমাদের মনে হবে সংসারের সকল মানুষই বিভিন্ন আকৃতি প্রকৃতি সম্পন্ন (As many different kinds of human beings as there are human beings)। এতৎ সত্ত্বেও ইহা কিন্তু নিশ্চিত প্রমাণিত হয়েছে যে সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা মানুষের আকৃতি-প্রকৃতি নির্দ্ধারণের এই শ্রেণী নির্ণয় পদ্ধতি নির্দিষ্ট ক্রীড়ায় নির্দিষ্ট প্রতিযোগী নির্দ্ধারণের জন্য ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হতে পারে।

১৯২১ সালে 'KRETSCHMER' মনুষ্যাকৃতিকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করেছিলেন যথা,—Asthenic বা দুর্বলাকৃতির মানুষ, Sthenic বা সবলাকৃতির মানুষ এবং Pyxnic বা বলিষ্ঠ গঠন সম্পন্ন খর্বাকৃতির মানুষ। বস্তুত আমাদের জানা প্রয়োজন সকল প্রকার মনুষ্যাকৃতিই এই তিনটি বিভাগের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। এরপর Sheldon এই শ্রেণী বিভাগকে আরও বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে পর্য্যালোচনা করার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি তাঁর এই শ্রেণী বিভাগে মনুষ্যাকৃতির দৈর্ঘ্য ও আয়তনের উপর নির্ভর না করে মনুষ্য দেহের গঠনের উপরই বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছেন। দৈহিক গঠন তিনটি অংশের উপর নির্ভর করে। (In terms of three components) Sheldon তাঁর সংখ্যা তাত্ত্বিক পদ্ধতিতে প্রতিটি মানুষকে এই শ্রেণী বিভাগের অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছেন। তাঁর মতে শারীরিক গঠন অনুসারে মনুষ্য দেহকে প্রধানতঃ তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে, যথা—

১। Endomorphy বা গোলাকার দেহাকৃতি সম্পন্ন মানুষ। ইঁহারা সাধারণতঃ মেদবহুল শরীরের অধিকারী হন।

২। Mesomorphy বা সুগঠিত দেহ সম্পন্ন মানুষ। ইঁহারা সাধারণতঃ পেশী সম্বলিত সুগঠিত অস্থি সম্পন্ন দেহাকৃতি সম্পন্ন হন।

৩। Ectomorphy বা লম্বা ছিপ্‌-ছিপে ধরণের মানুষ। মেদবাহুল্য বর্জিত লম্বা পাতলা ধরণের মানুষকেই সাধারণতঃ এই বিভাগেরও অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ইহার সহিত Ponderal Index-এর কিছুটা সম্পর্ক আছে। সাধারণতঃ দৈহিক উচ্চতাকে দৈহিক ওজনের ঘনমূল (cube-root) দ্বারা ভাগ করলেই আমরা Ponderal Index পাই।

উপরোক্ত তিনটি বিভাগের প্রত্যেকটিকে সাত সংখ্যার মানদণ্ডে (Seven point scale) মূল্যায়ন করে প্রাপ্ত তিনটি সংখ্যার সংমিশ্রণে যে কোন ব্যক্তির আকার প্রকৃতিগত প্রকার ভেদ করা যেতে পারে। এখানে আমাদের জানা প্রয়োজন যে বিভিন্ন দেহাকৃতির মানুষকে চিত্রাঙ্কিত করে তাদের পারস্পারিক সম্বন্ধ নির্দ্ধারণ করা যায়। এই প্রকার চিত্রাঙ্কিত বিভিন্ন দৈহিক গঠনের ছবির দ্বারা Somato chart তৈয়ারী করা হয়।
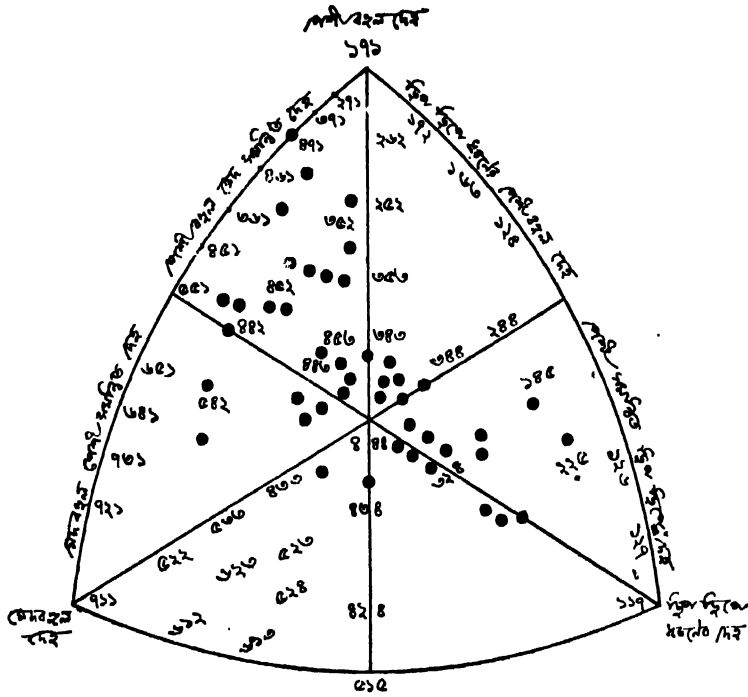
বিভিন্ন শারীরিক আকৃতির পারস্পারিক সম্পর্ক নির্দ্ধারণ।

১নং চিত্রের মধ্য বিন্দুতে অবস্থিত তিন সংখ্যা সম্বলিত সংখ্যা ৪৪৪ দ্বারা নির্দেশিত দৈহিক গঠনের মানুষ। এই সংখ্যাগুলি (৪৪৪) একজন মধ্যমাকৃতির সাধারণ চেহারার মানুষকেই নির্দেশ করে। দৈহিক গঠনের মাপ-কাঠিতে Endomorphy, Mesomorphy এবং Ectomorphy বিভাগের প্রতিটিতেই ইহার মূল্যায়ন করা হয়েছে সংখ্যা ৪ (চার)। এই চার সংখ্যাটি ১ এবং ৭-এর গড়। এই জন্যই Somato chart-এ ইহার মূল্যায়ন হয়েছে ৪৪৪। চিত্রের মধ্যবিন্দু থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে বিস্তৃত হয়েছে ক্রম পর্য্যায়ের মেদবহুল শরীরের মানুষ, উত্তর দিকে পেশী সম্বলিত মানুষ এবং দক্ষিণ-পূর্ব দিকে নির্দেশিত হচ্ছে লম্বা ছিপছিপে ধরণের মানুষ। মেদ ও পেশীর তারতম্য অনুসারে এই তিনটি বিভাগকে আবার বহুরকম ভাবে ভাগ করা যেতে পারে। যেমন Endomorphos বিভাগীয় ব্যক্তি সাধারণ স্থূলকায় ব্যক্তি অপেক্ষা অধিকতর পেশী সম্বলিত হতে পারেন অথবা Mesomorphos বিভাগীয় ব্যক্তি সাধারণ পেশী সম্বলিত মানুষ অপেক্ষা পাতলা ধরণের হতে পারেন।

কয়েকটি বিভিন্ন পদ্ধতিতে মেদ পেশী এবং পাতলা কাঠামোর সংমিশ্রণে উক্ত তিন প্রকার দেহাবয়বের আবার বিভিন্ন প্রকার ভেদ করা যেতে পারে। নীচে এই সকল বিভিন্ন পদ্ধতির বর্ণনা দেওয়া হলো।

১। Scopically—নির্দ্ধারিত মানের ফোটোগ্রাফ ছবির সঙ্গে তুলনাত্মক বিচার করে।

২। Metrically—ফোটোগ্রাফ ছবির মাপ সংগ্রহান্তে নির্দ্ধারিত Sheldon তালিকার সহিত তুলনা করে দৈহিক গঠনের মান নির্দ্ধারণ।

৩। ১নং এবং ২নং পদ্ধতির সহায়তায় তুলনামূলক বিচার পদ্ধতির দ্বারা দেহাবয়বের মান স্থিরীকরণ।

৪। পারনেলের সহজ পদ্ধতি—

দেহের বিভিন্ন অঙ্গের মাপ সংগ্রহ করে নির্দ্ধারিত বিচ্যুত মানের (standard deviation) সঙ্গে তাহার তুলনামূলক বিচার করে ব্যক্তি বিশেষের দৈহিক মান নির্ণয় করা সম্ভব হয়। প্রখ্যাত চিকিৎসাবিদ্ Ian. J. Macqueen-এর মতে এই শেষোক্ত পদ্ধতিটিই সর্বোৎকৃষ্ট প্রমাণিত হবে যদি যথোপযুক্ত Sheldon তালিকা পাওয়া যায়।
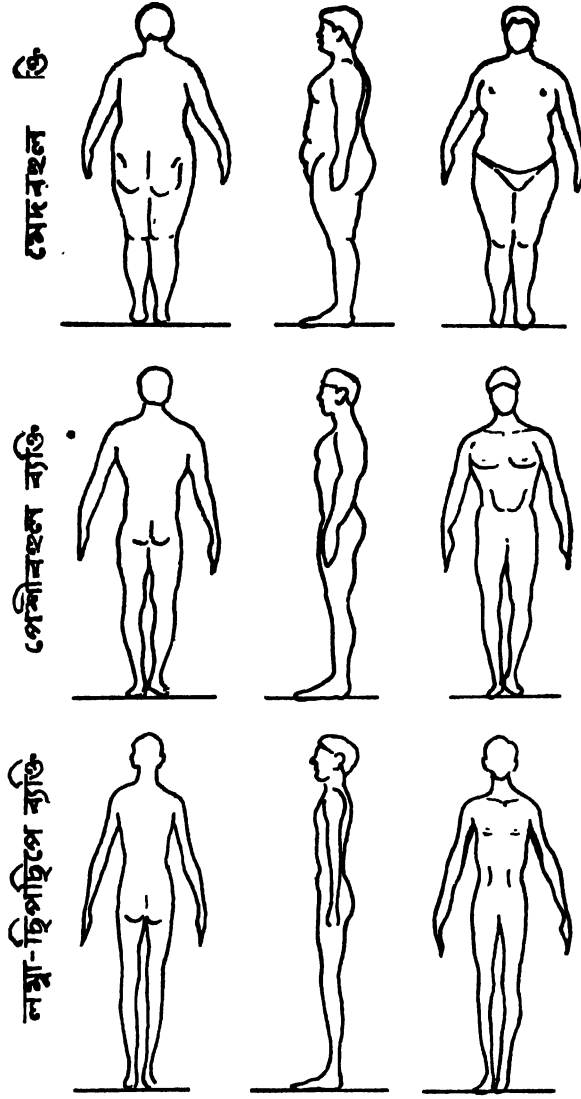
চিত্র নং - ২

২নং এবং ৩নং চিত্রে নির্দ্ধারিত মানের Sheldon ফোটোগ্রাফের নকল ছবি দেখান হয়েছে। ২নং চিত্রে প্রকৃত Endo, Meso এবং Ectomorphy দেহগঠন সম্পন্ন মানুষকে দণ্ডায়মান অবস্থায় দেখান হয়েছে।

৩নং চিত্রে Mesopane দেহগঠন সম্পন্ন মানুষকে দণ্ডায়মান অবস্থায় দেখান হয়েছে। এই Mesopane দেহাকৃতি সম্পন্ন মানুষ সম্বন্ধে আমাদের কিছু জানার প্রয়োজন আছে। Sheldon-এর তালিকা অনুযায়ী এই প্রকার মানুষ "মোটা পাতলা ব্যক্তি" বা fat thin man নামে অভিহিত হয়। ইঁহারা সাধারণতঃ সুসংবদ্ধ পেশী অথবা সুগঠিত অস্থি সম্বলিত হন না (Poorly developed muscle and bone)। এই প্রকার দৈহিক কাঠামোর ব্যক্তিরা সাধারণতঃ কোন ক্রীড়াতেই পারদর্শিতা প্রদর্শনে সক্ষম হন না। ব্যায়াম সম্বন্ধে ইহারা কোন রকম আগ্রহই প্রকাশ করেন না।
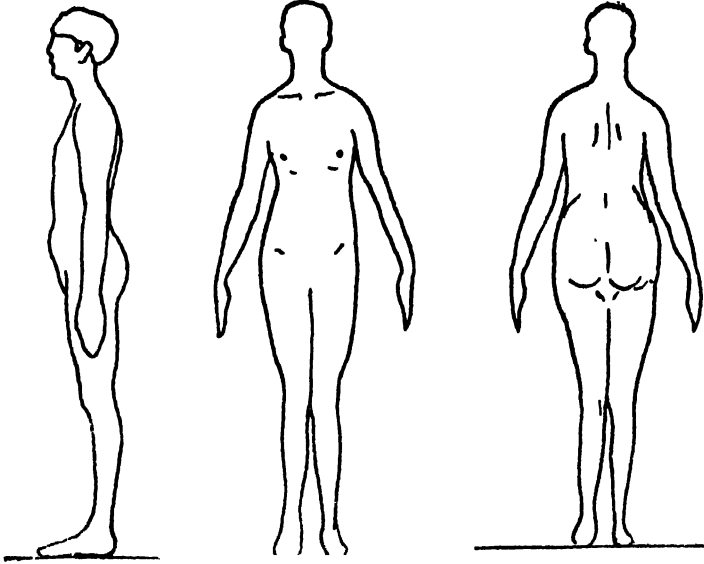
'MESOPANE' অর্থাৎ মোটা-পাতলা ব্যক্তি (FAT-THIN MAN)

চিত্র নং-৩

ক্রীড়া প্রশিক্ষণ ও ক্রীড়াবিদের দৈহিক আকৃতির ঙ্গে সম্পর্ক নির্দ্ধারণের প্রতি যারা অধিক আগ্রহশীল াদের নিকট "Somatotyping" বিষয়টি বেশ কৌতূহলোদ্দীপক হতে পারে। বহুদিনের গবেষণার র Sheldon এই পদ্ধতি অর্থাৎ Somatotype র্দ্ধারণের একটি ধারা নির্ণয় করতে সমর্থ হয়েছিলেন। ার দ্বারা তিনি প্রমাণ করেছিলেন মানুষের বাহ্যিক-কাশিত দৈহিক আকৃতি তাহার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের পর নিশ্চিত কিছু প্রভাব বিস্তার করে। Parnel-এরও বিষয়ে কিছু মূল্যবান্ অবদান আছে।

পূর্বে উল্লিখিত উপরোক্ত তিন প্রকার দেহাবয়বের ার ভিত্তি করে Sheldon মানুষের তিন প্রকার রিত্রিক বৈশিষ্টের কথা উল্লেখ করেছেন, যথা—

১। Endomorphic দেহাকৃতির লোকেরা ারণতঃ উদরসর্বস্ব ধরণের (Viscerotic) ব্যক্তিত্বের ধকারী হন। ইঁহারা সাধারণতঃ আরামপ্রিয়, দে এবং সহজ সরল জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত। ইঁহারা ায়াম, ক্রীড়া প্রভৃতি শ্রমসাধ্য কার্য্য এড়িয়ে চলতে ালবাসেন। সামাজিক আমোদ-প্রমোদ ও ভোজন বিলাস ইঁহাদের বিশেষ প্রিয়। ইঁহাদের প্রকৃতি বিচার করলে আমাদের মনে হবে ইঁহারা যেন খাবার জন্যই জীবন ধারণ করেন, জীবন ধারণের জন্য খাওয়া নয় (Tends to live to eat, to that eat to live)।

২। Mesomorphic দেহকাঠামোর অধিকারী লোকেরা সাধারণতঃ Somatotonic প্রকৃতির পর্য্যায়ে পড়েন। এই ধরণের লোকেরা সাধারণতঃ নির্ভীক, কষ্ট-সহিষ্ণু ও সাহসী মনোভাবাপন্ন হন (Spartan Attitude)। ইঁহারা শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্য তুচ্ছ করে আপনাদের ব্যায়াম কসরতে নিয়োজিত রাখতে বেশী পছন্দ করেন। ইঁহারা প্রায়ই রোমাঞ্চকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে ভালবাসেন। ইহাদের মধ্যে যুদ্ধ প্রিয়তার মনোভাবও দেখা যায়।

৩। Ectomorphy দেহাকৃতির লোকেরা সাধারণতঃ মস্তিষ্কপুষ্টি ও মস্তিষ্ক-সঞ্চালনের দিকে বেশী নজর দেন (Cerebrotonic)। ইঁহারা Endomorphy জাতীয় লোকেদের বিপরীত-ধর্ম্মী হন। অনেক সময় হয়ত বা তাঁহারা প্রচুর খিদের জন্য খেতে অভ্যস্ত। তবুও মনে হবে তাঁহারা যেন জীবন ধারণের জন্য খান (Eats

only to live)। সামাজিক আমোদ-প্রমোদ বা ভোজন বিলাসে এঁরা তেমন আনন্দ পান না। ইঁহারা ভীরু এবং আলোকোজ্জ্বল গৃহ পরিহার করে চলেন এবং সাধারণতঃ শান্ত এবং লাজুক প্রকৃতির হ'ন। এই প্রকৃতির লোকেরা কিছুটা আত্মকেন্দ্রিক মনোভাবাপন্ন এবং অতি শীঘ্রই লোকের বন্ধু হয়ে উঠতে পারেন। এই জাতীয় লোকেরা সকল শ্রমসাধ্য প্রচেষ্টা পরিহার করে চলেন এবং যে কোন কষ্টসাধ্য প্রচেষ্টাকেই ইঁহারা পাশবিক বলে গণ্য করেন।
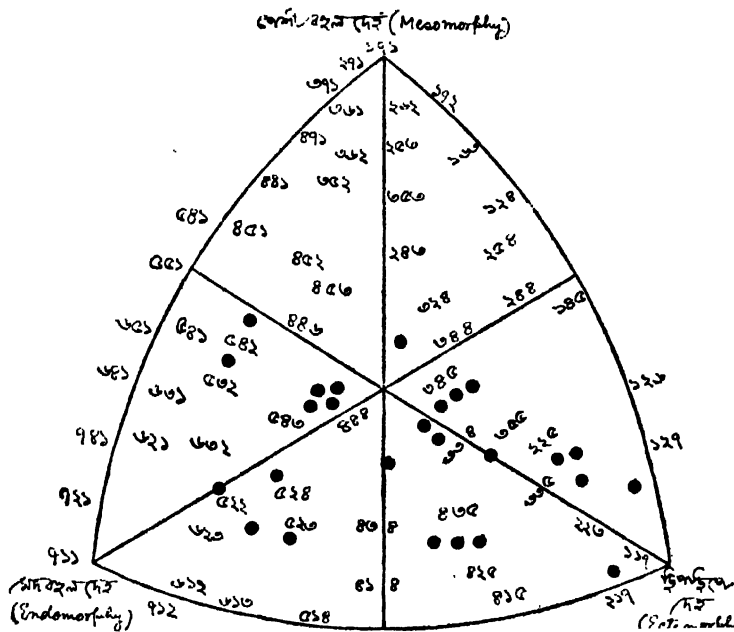
[illegible] দৈহিক আকৃতির ব্যক্তিগণ যাহারা ব্যায়াম ও ক্রীড়ায় তেমন আগ্রহ প্রকাশ করেন না।

৮নং চিত্রে দেখান হয়েছে, যে সকল পেশী সম্বলিত শরীরের ব্যক্তি (Mesomorphy) ব্যায়াম ক্রীড়ায় অনীহা প্রদর্শন করেন সাধারণতঃ তাঁহাদের অবস্থিতি সাধারণ পর্য্যায়ের Mesomorphy মান (৪৪৪) অপেক্ষা নিম্নতর। যে সকল ব্যক্তির Mesomorphy মান (৩)-এর নীচে, তাঁদের মধ্যে অতি অল্প ব্যক্তিই পেশী সম্বলিত মানুষের ন্যায় ক্রীড়ায় অংশ গ্রহণ করেন। কদাচিৎ কখনও তাঁদের দেহ সংস্পর্শক ক্রীড়া যথা মুষ্টি-যুদ্ধ, কুস্তী প্রভৃতি ক্রীড়ায় অংশ গ্রহণ করতে দেখা যায়। বিপরীত ক্রমে যাদের শ্রমসাধ্য বহি-র্বিভাগীয় (Outdoor Games) প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করতে দেখা যায় তাদের উপর যথোপযুক্ত Mesomorphy দৈহিক আকৃতির প্রভাব নিশ্চিতরূপে বিদ্যমান থাকে।
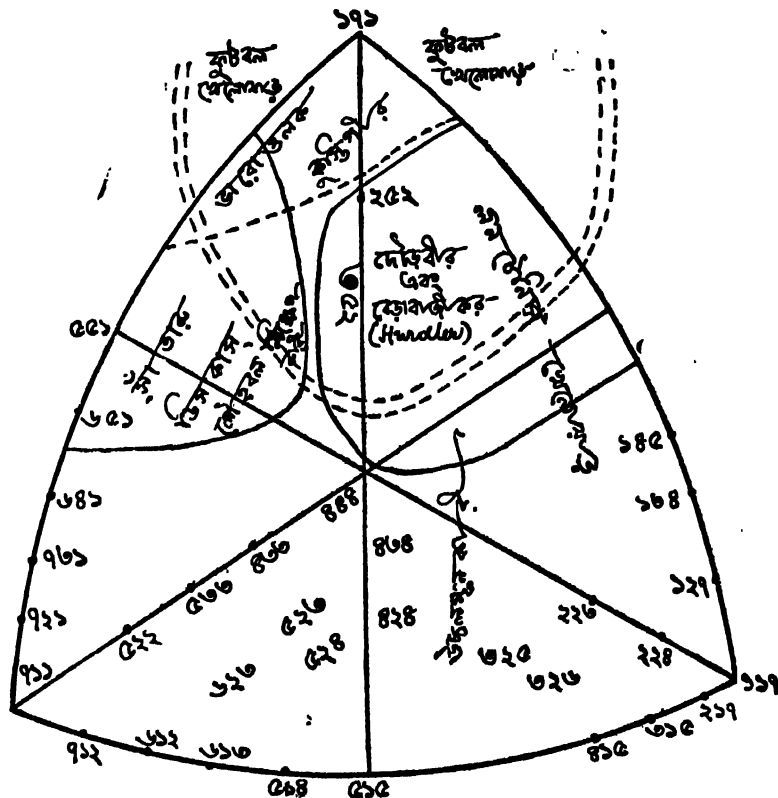
দৈহিক আকৃতি অনুসারে বিভিন্ন বিভাগীয় ক্রীড়াবিদগণের সম্পর্ক নির্দ্ধারণ।

আমরা জানি বিশ্বের বিভিন্ন মানুষের মধ্যে দৈহিক আকৃতিগত পার্থক্য এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের বিভিন্নতা বিদ্যমান আছে। Sheldon-এর বিজ্ঞানসম্মত দেহাকৃতিগত মানুষ শ্রেণীবদ্ধকরণ পদ্ধতির দ্বারা (Somatotyping) কোন্ মানুষের মধ্যে কোন্ ক্রীড়া-শক্তির সম্ভাবনা বর্তমান এবং কোন্ ক্রীড়ায় তার স্বাভাবিক আসক্তি থাকা সম্ভব তাহা আমরা সহজেই অনুসন্ধান দ্বারা জানতে পারি। এই পদ্ধতির দ্বারাই ক্রীড়াবিদের জন্য ক্রীড়োপযোগী দৈহিক চাহিদার তাৎপর্য্য উপলব্ধি করে আমরা তাহার জন্য যথোপযুক্ত প্রশিক্ষণ তালিকা প্রস্তুত করতে পারি। এই Somatotyping দ্বারা ক্রীড়াবিদ্ যে ক্রীড়ায় সক্ষম নয় সেই ক্রীড়ায় অহেতুক প্রশিক্ষণে কালক্ষেপ করার হাত থেকেও আমরা অব্যাহতি পেতে পারি। অন্যভাবে দেখলে আমরা বুঝতে পারব এই পদ্ধতি অবলম্বনের দ্বারাই ভবিষ্যতে বিশেষ প্রতিযোগিতার জন্য আমরা হয়ত বিশেষ ক্রীড়া প্রতিযোগী নির্বাচনেও সমর্থ হব।

Somatotyping-এর সাত সংখ্যার মানদণ্ডে বিশ্লেষণ করে ৫, ৬ এবং ৭নং চিত্রে দেখান হয়েছে ক্রীড়াবিদ্দের বেশীর ভাগেরই (Most of the Athletes) Mesomorphy পর্য্যায়ের মূল্যমান্ ৪ বা ততোধিক সংখ্যা। দৌড়বীর, বেড়া বাজীকর (Hurdler), উচ্চলম্ফনকারী প্রভৃতি ক্রীড়াবিদ্ অপেক্ষা সাঁতারু এবং কুস্তীগিরেরাই সাধারণতঃ অধিকতর মেদ সমন্বিত শরীরের অধিকারী হন। অর্থাৎ Sheldon-এর শ্রেণীবিভাগ তালিকা অনুযায়ী তাঁহারা Endomorphic Mesomorphos পর্য্যায়ভুক্ত। উক্ত তালিকানুযায়ী দৌড়বীর, উচ্চ-লম্ফনকারী প্রভৃতি ক্রীড়াবিদ্গণ Ectomorphic Mesomorphos তালিকাভুক্ত হন। অর্থাৎ ইঁহারা সাধারণতঃ পেশী সম্বলিত লম্বা ছিপছিপে শরীরের অধিকারী হন।

ডিসকাস, হ্যামার ও লৌহ বল নিক্ষেপকারী এবং পোল ভল্টের প্রতিযোগীগণ পেশীবহুল শরীরের অধিকারী হলেও উপযুক্ত পরিমাণ মেদ ও তাঁদের শরীরে বর্তমান থাকে। শরীরের এই মেদ পরিমাণের তারতম্য অনুসারে তাঁদের Endomorphic পর্য্যায়ের মূল্যায়ন সাধারণতঃ "১" সংখ্যা থেকে "৩" সংখ্যার ভিতর হয়।

বিভিন্ন দূরত্বের দৌড়বীরদের মধ্যেও দৈহিক কাঠামোর বেশ কিছুটা প্রভেদ দেখা যায়। এই বিষয়ে Sheldon-এর শ্রেণীবদ্ধকরণ (Somatotyping) অনেকের নিকটেই বেশ কিছুটা চিত্তাকর্ষক লাগতে পারে। এই তালিকায় দূরবর্তী ও মধ্যবর্তী পাল্লার দৌড়বীরদের সংখ্যাভিত্তিক মূল্যমান সাধারণতঃ '২৪৫' (অর্থাৎ Endo = ২, Meso = ৪, Ecto = ৫) অথবা '২৩৪' হয়। স্বল্প-পাল্লার দৌড়বীরগণ সাধারণতঃ সুগঠিত পেশীসম্পন্ন মধ্যমাকৃতির চেহারার অধিকারী হন। শরীরে মেদের পরিমাণ অনুসারে Somatotyping তালিকায় কদাচিৎ তাঁদের Endomorphic মান ২ সংখ্যার অধিক হয়। আমরা জানি দূরপাল্লার দৌড়ে ক্রীড়াবিদ্‌কে একই-প্রকার একঘেয়ে নিম্নাঙ্গ চালনা করে তার শরীরটিকে বহুদূর পর্য্যন্ত বয়ে নিয়ে যেতে হয়। উপরোক্ত তালিকা দ্বারাই আমরা উপলব্ধি করতে পারি কেন একজন দূরপাল্লার দৌড়বীরের লম্বা ছিপছিপে এবং দীর্ঘ নিম্নাঙ্গ-সম্বলিত শরীর হওয়ার প্রয়োজন হয়। স্বল্প-পাল্লার দৌড়ে কিন্তু প্রয়োজন হয় শক্তি, সামর্থ্য ও ক্ষিপ্রতা। আমরা জানি মধ্যমাকৃতি পেশীবহুল শরীরের ব্যক্তিগণ সাধারণতঃ লম্বা ছিপছিপে ধরণের ব্যক্তি অপেক্ষা অধিকতর বলশালী এবং ক্ষিপ্রতর। এই জন্যই স্বল্প-পাল্লার দৌড়ের ক্রীড়াবিদগণ সাধারণতঃ পেশী সমন্বিত মধ্যমাকৃতির চেহারার অধিকারী হন।
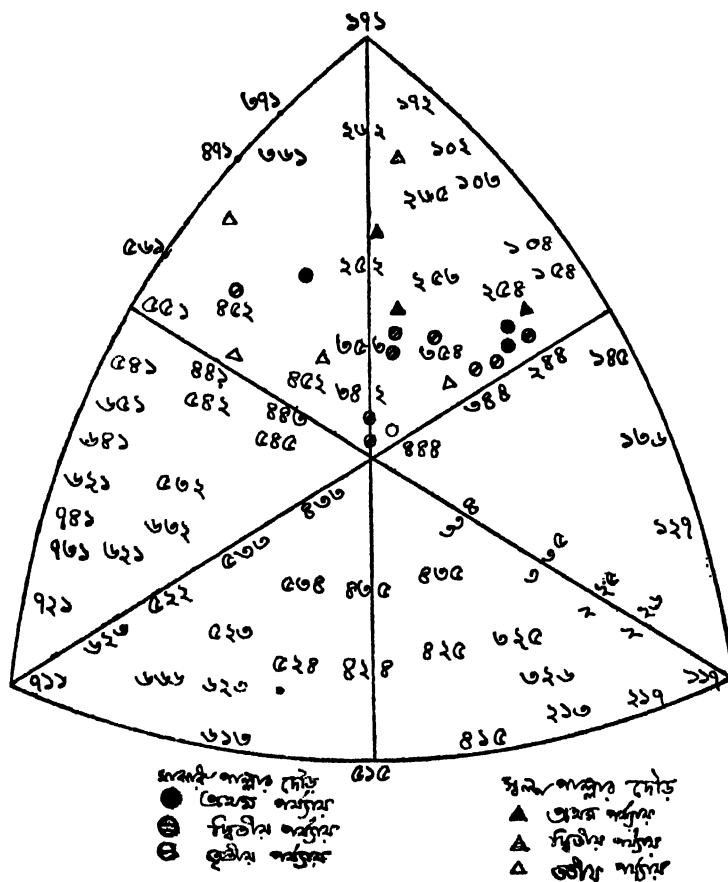
বিভিন্ন দূরত্বের দৌড়বীরের দৈহিক আকৃতির পরিচিতি।

যে সকল ব্যক্তি টেবিল টেনিস, টেনিস, গল্‌ফ (Golf) প্রভৃতি ক্রীড়ায় পারদর্শিতা প্রদর্শন করেন তাঁহারা সাধারণতঃ লম্বা ছিপছিপে দেহাকৃতির হন এবং Somatotyping-এর সাত সংখ্যার মানদণ্ডে তাঁদের শরীরে পেশী পরিমাণের তুল্যমান হয় সংখ্যা "৩" (অর্থাৎ Meso = ৩) যে সকল ব্যক্তির শরীরে মেদাধিক্যের তুলনায় পেশীর পরিমাণ নিতান্তই অল্প তাঁরা সাধারণতঃ কঠোর শ্রমসাধ্য ক্রীড়ায় কোন উন্নত ক্রীড়ামান প্রদর্শনে সমর্থ হন না। Mesop ne জাতীয় মোটা-পাতলা মানুষ (Fat-thin man) অথবা মেদবহুল লম্বা ছিপছিপে ধরনের মানুষকে সাধারণতঃ এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে সাধারণতঃ তাঁদের ঐ শারীরিক এবং মানসিক অসুবিধার জন্যই হয়ত তাঁহারা পারদর্শী ক্রীড়াবিদ্‌ হয়ে উঠতে পারেন না।
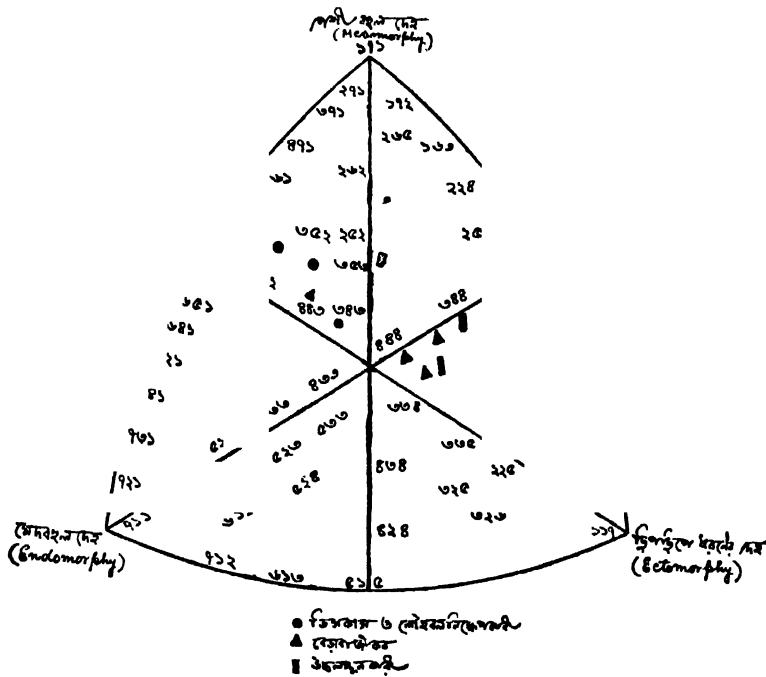
অন্যান্য বিভাগীয় ক্রীড়াবিদ্‌দের দৈহিক আকৃতির সম্পর্ক নির্দ্ধারণ।

মনুষ্য দেহের এই বিজ্ঞান ভিত্তিক শ্রেণীবদ্ধ করণের উপর নির্ভর করে যদি কোন ক্রীড়াবিদ্‌ দেহের অনুপযোগী কোন ক্রীড়ার প্রতি বিমুখ হয়ে উঠে তাঁর ক্রীড়া প্রশিক্ষণ বন্ধ করেন তবে সত্য সত্যই আমরা তাঁর প্রতি কোন দোষারোপ করতে পারি না। অবশ্য এই সকল হতাশ ক্রীড়াবিদ্‌দের জ্ঞাতার্থে ইহাও উল্লেখ করা যেতে পারে যে অতীতের বহু ক্রীড়াবিদ্‌ অনেক সময় সর্বপ্রকার শারীরিক মানসিক এবং পারিপার্শ্বিকের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়েও কেবলমাত্র স্বীয় প্রচেষ্টা এবং প্রশিক্ষণের বলেই কৃতিত্বের সু-উচ্চ শিখরে আরোহণ করতে সমর্থ হয়েছেন। ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে বিশেষ ধরণের প্রশিক্ষণ দ্বারাও ক্রীড়াবিদের ক্রীড়ামানের যথেষ্ট উন্নতি হওয়া সম্ভব।

বিষয়টির যথার্থতা উপলব্ধি করে ভারোত্তলকগণ বহুদিন পূর্ব থেকেই এক প্রকার প্রশিক্ষণ পদ্ধতি অনুশীলন করে এসেছেন। এই প্রকার প্রশিক্ষণের নাম "Type Training"। এই প্রকার প্রশিক্ষণের দ্বারা নির্দিষ্ট কোন ক্রীড়ায় মানুষের দেহাকৃতির বিরুদ্ধতা

সত্ত্বেও হয়ত তাকে উক্ত ক্রীড়ার উপযোগী করে তোলা সম্ভব।

ক্রম পর্য্যায়ের শক্ত এবং সহজ ব্যায়াম প্রশিক্ষণই এই Type Training-এর বিশেষত্ব। এই প্রশিক্ষণে অল্প সময় ব্যাপী ভারী ভার-প্রশিক্ষণের পর দীর্ঘকাল ব্যাপী পুনঃ পুনঃ অল্প ভার নিয়ে প্রশিক্ষণের রীতি অবলম্বন করা হয়। ব্যক্তি বিশেষের দৈহিক, চারিত্রিক এবং শারীরিক সক্ষমতার উপযোগী করেই Type Training-এর কঠিন এবং সহজ ব্যায়াম প্রশিক্ষণ তালিকা তৈয়ারী করা হয়। এই প্রশিক্ষণেরই একটি সহজ পদ্ধতি মুষ্টি-যুদ্ধ প্রশিক্ষণের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। এই ক্রীড়ায় ভারী ব্যাগ পেটান প্রশিক্ষণ (Heavy bag punching) ও দৌড় অভ্যাসের সঙ্গে অপেক্ষাকৃত হাল্কা ধরণের ব্যায়াম, যথা স্কিপিং এবং পা-সঞ্চালন কৌশল (Light skipping and foot work training) আয়ত্তাধীনে আনার প্রশিক্ষণ অবলম্বন করা হয়। চার মিনিটের কম সময়ে মাইল দৌড়বার প্রস্তুতিকালে ডাঃ রোজার ব্যানিষ্টারও এই পদ্ধতি অবলম্বনের দ্বারাই তাঁর প্রশিক্ষণ করেছিলেন। এই প্রশিক্ষণে তিনি কয়েকটি সিকি মাইল দৌড় (Quarter mile Running) আপনার যথাসাধ্য শক্তি নিয়োগ করে যথেষ্ট দ্রুতগতিতে ছুটেছেন। আবার ঐ একই সঙ্গে পর্য্যায়ক্রমে একাধিক মাইল দৌড় অপেক্ষাকৃত মন্থর গতিতে ছুটেছেন। কঠিন এবং সহজ ব্যায়াম প্রশিক্ষণের (Heavy and light training) ইহাও একটি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। বর্তমানের বহু ক্রীড়াবিদই এখন এই প্রশিক্ষণ পদ্ধতি অবলম্বন করে অনুশীলন করেন।

ভার প্রতিবন্ধকতার দ্বারা ক্রীড়া প্রশিক্ষণ এখন প্রায় প্রতিটি ক্রীড়াতেই অনুমোদন করা হয়। বর্তমানে পদ্ধতিটিকে রূপান্তরিত করে আরও উন্নততর করা হয়েছে। ইহার দ্বারা বিভিন্ন উপায়ে এই পদ্ধতি আরোপণ করা সম্ভব হয়েছে

বেসুরো

অমিয়কুমার মুখোপাধ্যায়

রমা একটু হাসল।

প্রতুল কাঁধ থেকে এয়ার ব্যাগটা নামিয়ে রাখতে রাখতে বললে, তোমার অতিথি হলাম। রাগ করবে না তো?

স্যুট পরে আগের চেয়ে বেশ লম্বা দেখাচ্ছে প্রতুলকে। পাঁচ বছর আগের দেখা প্রতুল বুঝি অনেকখানি বদলে গেছে। ধুতি ছেড়ে ফুলপ্যান্ট ধরেছে। মাথায় ফেল্ট হ্যাট, হাতে ঘড়ি, চোখে গগলস্।

গায়েও বুঝি বা একটু মাংস লেগেছে প্রতুলের। গাল দুটো বেশ ভারি ভারি। হঠাৎ দেখলে বড় বেশী গম্ভীর বলে মনে হয়। আগে ওর চেহারাটা ছিল বেতের ছড়ির মত রোগা লিকলিকে। মাথায় চুল ছিল ছোট ছোট। আর এখন চুলগুলো বেশ বড়, টুপি খুললেই মুখের ওপর এসে পড়ে।

গাড়ীর ক্লান্তি এখনও লেগে রয়েছে ওর চোখে মুখে। কপাল থেকে টপটপ করে ঘাম ঝরে পড়ছে। সুইচ টিপে পাখাটা চালিয়ে দিয়ে রমা বললে, তুমি বসো। আমি তোমার জন্যে চা তৈরী করে আনি।

জুতোর ফিতে খুলছিল প্রতুল। বলল, আমার জন্যে ব্যস্ত হয়ো না রমা। চা খাওয়া আমি ছেড়ে দিয়েছি।

বলো কি? রমা আশ্চর্য হয়ে বললে, চা খাওয়া ছেড়ে দিয়েছ? আগে যে তুমি চায়ের পিপে ছিলে!

তাই তো ছাড়তে পেরেছি। ভোগ না করলে কি ত্যাগ করা যায়? প্রতুল ঠাট্টার সুরে হাসল। ভারি মিষ্টি হাসি।

রমা লক্ষ্য করল, বাইরে প্রতুলের যতই পরিবর্তনই হোক না কেন, ওর মুখের হাসিটি ঠিক আগের মতই আছে। একেবারে ছেলেমানুষের মত সহজ হাসি। কলেজে পড়ত যখন, তখনও ওর মুখের হাসিটা ছেলে-মেয়েরা সকলই লক্ষ্য করত। প্রফেসর নিজেও মাঝে মাঝে লক্ষ্য করতেন। প্রতুল যখন হাসত তখন মেয়েদের বেঞ্চি থেকে অনেকে ফিক ফিক করে হেসে ফেলত, কারো বা গালদুটো রাঙা হয়ে উঠত আবেগে। আর বিহ্বলের মত অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকত রমা। ক্লাসের পড়ায় ভাল করে মন দিতে পারত না। লেকচার শুনতে শুনতে মাঝে মাঝে আড়চোখে তাকাত প্রতুলের দিকে, আর কেমন যেন আনচান করে উঠত মনটা।

প্রতুল হাত মুখ ধুয়ে আবার ঘরে এসে ঢুকল। একটা বেতের চেয়ার টেনে নিয়ে জানলার ধারে বসতেই রমা সামনে এসে দাঁড়াল জলখাবার নিয়ে। মাথার ঘোমটা খসে পড়েছে, শাড়ীর আঁচলটা লুটোচ্ছে পায়ের কাছে।

প্লেট থেকে একটা সন্দেশ তুলে নিয়ে প্রতুল বললে বাঃ, চমৎকার জিনিষ। তোমার নিজের হাতে তৈরি নিশ্চয়ই?

রমা মাথা নাড়ল. কলেজে পড়ত যখন, তখনও বাড়ী থেকে মিষ্টি তৈরী করে এনে রমা খাওয়াত প্রতুলকে। অফ-টাইমে একটা নিরালা জায়গায় গিয়ে বসত দুজনে। কোনদিন পার্কে, কোনদিন বা কলেজের ছাদে। প্রতুল খেতে খেতে হঠাৎ বলত, এ কি, তুমি খাবে না? প্রায় সব খাবার আমিই যে খেয়ে ফেললুম?

—তোমার জন্যেই তো এনেছি? তুমি খাবে বলে।

মিষ্টি তৈরী করায় অদ্ভুত হাত ছিল রমার। নানান রঙের আর নানান ঢঙের মিষ্টি তৈরী করতে পারত।

প্রতুল ঠাট্টা করে বলত, তুমি একটা মিষ্টির দোকান খোলো না কেন রমা? খুব বিক্রি হত।

—আমি মিষ্টির দোকান খুললে তোমাকে কিন্তু দোকানদার করব?

—সর্ব্বনাশ! তাহলে তোমার লোকসান অনিবার্য।

খাওয়া শেষ করে প্রতুল বলত, আঃ, খিদের সময় রোজ যদি এমনই মিষ্টি এসে মুখের সামনে হাজির হয়, তাহলে এই দুনিয়ায় আমি আর কিছু চাই না।

—তোমার মত লোভী আর আছে নাকি! রমা মুখ টিপে হাসত, আর ওর টানা টানা দুটো চোখ কেমন ঝিলমিল করে উঠতো আবেগে।

খোলা জানলাটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে প্রতুলের মনটা কোথায় যেন হারিয়ে যায়। অনেক উঁচুতে নীল আকাশে একটা চিল পাক খেয়ে খেয়ে ঘুরছে। যেন কতগুলো বৃত্ত, কতগুলো শূন্য এঁকে চলেছে আকাশের গায়ে। এই দুনিয়াতেও বুঝি কিছুই সত্য নয়, সবই শূন্য। মানুষের এই সমাজ, সংসার, মানুষের এই মন সমস্তই বুঝি একটি বিরাট শূন্যে ভরা। তাই বোধ হয় পৃথিবীটাকেও একটি শূন্যের আকারে গড়েছেন বিধাতা।

এই প্রাকৃতিক শূন্যের হাতছানিতেই বুঝি প্রতুলের জীবনটাও আজ শূন্য হয়ে গেছে, মিথ্যা হয়ে গেছে। তার অন্নের অভাব নেই, বিদ্যাবুদ্ধিরও অভাব নেই। শুধু একটি জিনিষের অভাবে সে আজ নিঃস্ব আর নিঃসঙ্গ।

আর রমা? রমা কি সুখী হতে পেরেছে? সে কথা রমাই জানে। কি জানি, হয়তো সুখী হয়েছে, হয়তো বা হয়নি, কিন্তু ওর চোখের কোলে কালি কেন? স্বাস্থ্যও কিরকম ভেঙ্গে পড়েছে। কে বলবে বাইশ বছরের মেয়ে রমা। যেন যৌবন যাই-যাই করছে।

বিয়ের পরে রমা কখনো প্রতুলের সঙ্গে দেখা করতে চায়নি, আর প্রতুলও কোনদিন ওর সামনে এসে দাঁড়াতে পারেনি। লজ্জায় না অপমানে, তা প্রতুল নিজেই জানে না। বোধ হয় দুটো কারণেই। তাছাড়া রমা যখন বাপের বাড়ী গিয়েছিল দুবছর আগে তখন ওর সঙ্গে দেখা করবার অবসর ছিল না। রমার বাবা বিপিনবাবু তখন মারা গেছেন। সমস্ত বাড়ীটায় শোকের ছায়া। রমা ওর বাবার মৃত্যু সংবাদ আগে শোনেনি। বিধবা মায়ের কোলে মুখ রেখে অঝোরে কাঁদতে লাগল।

জীবনের শেষ মুহূর্তে বাবার সঙ্গে দেখা হলো না। শুধু শেষ মুহূর্তে কেন, বিয়ের পর আর একটি দিনের জন্যও দেখা হয়নি বাবার সঙ্গে। বাপের বাড়ীতে আসতে চাইলেই মহিম বলত, একেবারে চলে যাও, আর আসতে হবে না।

ঘৃণায় অপমানে রমা আর মহিমের সামনে দাঁড়াতে পারত না। ছুটে চলে যেত ওর ঘরে। বিছানায় পড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদত।

শাশুড়ী এসে বলতেন, আর ঢঙ করতে হবে না, খুব হয়েছে। এবার দয়া করে একবার হেঁসেলে যাও। কেবল কাজে ফাঁকি দেবার চেষ্টা।

এসব কথা বিপিনবাবু জানতেন না। রমার মা তাকে শোনাননি পাছে তাঁর অসুস্থতা আরো বেড়ে যায়। প্রায় একবছর শয্যাশায়ী ছিলেন তিনি। চিঠি গেল, টেলিগ্রাম গেল, তবু রমা এল না, না একখানা চিঠি।

বিপিনবাবু বলতেন, রমু কি আমাদের ভুলে গেল গো?

কিরণময়ী বলতেন, কেন তুমি এতো ভাবছ বল তো? তোমার মেয়ে কি তেমন যে বাপ-মাকে ভুলে যাবে?

তবে বিপিনবাবু যেন একটু অস্থির হয়ে ওঠেন, তবে একবার এসে দেখে যেতে পারল না কেন রমা?

কিরণময়ী একটু আশ্বাসের সুরে বলতেন, এতদিন আসতে পারেনি হয়তো সংসারের ঝামেলায়। আর এখন? এখন সে নিজেই যে অসুস্থ? এই তো শ্রাবণে আট মাস হলো—

কিরণময়ী দিন গুনতে থাকেন। রমাও। বুকের ভেতরটা ধুক ধুক করে দিন রাত, আর একটি কচি প্রাণের প্রতি ভাষাহীন মমতায় যেন ভিজে ওঠে ওর দেহমন।

বিপিনবাবু অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠেছিলেন। বিছানা ছেড়ে উঠে বসতেন, কখনো বই পড়তেন, কখনো গল্প করতেন কিরণময়ীর সঙ্গে। ডাক্তার বললে, আর ভয় নেই।

ঠিক সেই সময় একদিন চিঠি এল, রমার বাচ্চা হয়েছে, কিন্তু মরা। এ-আশঙ্কা কিরণময়ীও করেছিলেন, কারণ মহিমকে তিনি জানতে পেরেছিলেন ভাল করেই। প্রায়ই সে মারধর করত রমাকে, কোন কোন দিন খেতে দিত না। ঘরে তালা বন্ধ করে রাখত।

চিঠিখানা মহিম লেখেনি। লিখেছিল ওদের পাড়ার একটি মেয়ে। মায়ের মুখে কি একটা নালিশ শুনে মহিম ধাক্কা মেরে রমাকে ফেলে দিয়েছিল ঘরের মেঝেয়। তার ফলেই গর্ভপাত হয়েছে।

চিঠিখানা পড়ে বিপিনবাবু চুপ করে রইলেন। একটি কথাও বললেন না। সেদিন রাত্রেই স্ট্রোক হলো তাঁর। আর সুস্থ হতে পারেন নি।

আকাশের সিঁড় বেয়ে সূর্যটা প্রায় মাথার ওপর উঠে এসেছে। চিলটা অবিরাম ঘুরছে আর মাঝে মাঝে এক একটা তীক্ষ্ণ চীৎকারে বিরাট শূন্যটাকে যেন চিরে ফেলতে চাইছে। কোথায় একটা গাছের আড়ালে একটা কোকিল অনেকক্ষণ ধরে ডেকে ডেকে সারা হচ্ছে।

রমা বললে, বাড়ীর সবাই ভাল তো?

সবাই বলতে তো আমি আর ঠাকুমা। প্রতুল বললে, তার মধ্যে আমাকে তো চোখের সামনেই দেখছ, বেশ হৃষ্টপুষ্ট হয়েছি। আর ঠাকুমা? তিনি তাঁর বার্দ্ধক্যের জরা-ব্যাধি নিয়েও একরকম ভালই আছেন।

বাপ-মা অনেকদিন আগেই মারা গেছেন প্রতুলের। প্রতুল তখন পাঁচ বছরের ছেলে। সেই থেকে ঠাকুমার কাছেই ও মানুষ হয়েছে। আদরে-আবদারে, স্নেহে-ভালবাসায় সারাজীবন ওকে বুকে ধরে রেখেছেন ঠাকুমা। মায়ের অভাব কখনো জানতে দেন নি। তার ঠাকুমার কাছে কিছু চেয়ে কোনোদিন নিরাশ হয়নি প্রতুল। কেবল একবারই তার ব্যতিক্রম হল। রমার কথা শুনে ঠাকুমা বললেন, ছিঃ, ওই ধিঙ্গী মেয়েকে বিয়ে করে মানুষে! কলেজে-পড়া মেয়ে, পাড়ায় পাড়ায় নেচে বেড়াচ্ছে; কেন, আর কি মেয়ে নেই দুনিয়ায়?

কিন্তু ঠাকুমার কথায় এত সহজে সায় দেবে প্রতুল, একথা কখনো ভাবতেই পারেনি রমা। কলেজ থেকে ফেরার পথে যখন পার্কের সেই নিম গাছটার তলায় বসে দুজনে গল্প করত, তখন প্রতুল নিজেই কতবার বলেছে, জীবনে অনেক বাধা আসবে, কিন্তু আমাদের বন্ধন যেন কিছুতেই ছিঁড়ে না যায়, রমা।

—কিন্তু তোমার ঠাকুমা যদি রাজি না হন বিয়েতে?

—নিশ্চয়ই হবেন। তুমি তো জানো, ঠাকুমা আমার কোন ব্যাপারেই বাধা দেন না। প্রতুল বলত, তাছাড়া তোমাকে তিনি ছেলেবেলা থেকে দেখছেন, জানেন। অতএব তাঁর রাজি না হবার তো কোন কারণ নেই।

—কিন্তু আমি যে গরীবের ঘরের মেয়ে।

—সেটা একটা বাধা নয়, রমা। খানিক চুপ করে থেকে প্রতুল বলেছিল, ধর তোমার মা-বাবার তরফ থেকে যদি কোন আপত্তি ওঠে? তুমি তাঁদের বোঝাতে পারবে তো?

রমা ঘাড় নাড়ে, পারব।

কিন্তু বিপিনবাবু বা কিরণময়ীর মতামতের কোনো প্রয়োজনই হয়নি সেদিন, কারণ ঠাকুমার অমতেই প্রতুল বদলে গেল। সমস্ত প্রতিজ্ঞা আর প্রতিশ্রুতি ভেঙে পড়ল তার মন থেকে। রমাকে আশ্বাসের সুরে বলেছিল, না-ই বা হল আমাদের বিয়ে? মানুষের প্রেম শাশ্বত, চিরন্তন, এই কি সবচেয়ে বড় নয়?

রমা মুখ নিচু করে বসেছিল, জবাব দেয়নি।

প্রতুল বলল, আমি চাই, ভাল ঘরে তোমার বিয়ে হোক। তুমি সুখী হও, রমা।

অনেকক্ষণ পরে মুখ তুলে তাকাল রমা। থমথম করছিল মুখটা। পার্কের আবছা অন্ধকারের দিকে চেয়ে শুধু বলেছিল, বাড়ী যাই।

রাস্তায় নেমেই একটা রিক্শা ডেকে রমা উঠে বসল। প্রতুল ঠায় দাঁড়িয়ে রইল পার্কের নিম গাছটার নিচে। দেখতে পেল, রমা রুমাল দিয়ে চোখ মুছছে।

ঠাকুমা কিন্তু এখন আপসোস করেন, মেয়েটা সত্যিই ভাল ছিল। কলেজে পড়া মেয়ে হলেও তিনি যা ভেবে-ছিলেন রমা তা নয়। ওকে ঘরে আনলে তাঁর সংসার আলো হয়ে উঠত। একটা বিভ্রান্তির ঘোরে কি যে করে বসলেন! মেয়েটারও জ্বালা-যন্ত্রণা আর ছেলেটার মনেও এক ছিটে শান্তি নেই!

রমার সব কথা তিনি কিরণময়ীর কাছেই শুনেছেন। প্রতুলকে মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করেন, রমু এখন কেমন আছে রে? মেয়েটাকে বড্ড দেখতে ইচ্ছে করে। কতদিন দেখিনি!

—দেখে কি হবে? প্রতুল গম্ভীরভাবে জবাব দেয়।

ঠাকুমা তাঁর ম্লান মুখে একটু হাসি ফোটানোর চেষ্টা করে বলেন, শোনো ছেলের কথা! দেখতে ইচ্ছে করে না? এতটুকু বয়েস থেকে যে দেখেছি মেয়েটাকে!

প্রতুল জবাব দেয় না। বুঝিবা একটু বিরক্ত হয় ঠাকুমার কথায়। মনে মনে সমস্ত ভুলচুক, সমস্ত অপরাধের বোঝা ঠাকুমার ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়। উনিই একদিন দুটি প্রাণের মসৃণ গতিপথকে রুদ্ধ করে দিয়েছেন। তাই রমা আজ ওর কাছ থেকে অনেক দূরে, অনেক তফাতে সরে গেছে। মাঝখানে তাদের বিরাট ব্যবধান।

—কি ভাবছ?

রমার কথায় একটু নড়েচড়ে বসলো প্রতুল, বললে ভাবছি তোমাকে।

—আমাকে?

—হ্যাঁ, তোমাকেই।

—কেন, আর বুঝি মানুষ পেলে না?

—মানুষ পেয়েছিলাম, কিন্তু তাকে নিয়ে ভাববার সুযোগ পাই নি রমা। প্রতুলের গলাটা বুঝি একটু কেঁপে উঠল, তোমার পাশাপাশি রেখে নীলিমাকে তুলনা করতে পারিনি।

রমা খিল খিল করে হেসে উঠল।

প্রতুল আশ্চর্য হয়ে ওর মুখের দিকে তাকাল, ওকি, হাসছ যে?

—হাসছি তোমার পাগলামি দেখে।

রমার চোখদুটো অত্যন্ত তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে। যেন কিসের আশায় প্রতুলের মনের ভেতরটা হাতড়ে বেড়াচ্ছে ডুবুরির মত। ঠিক এমনই করে প্রতুলও একসময় তাকিয়ে থাকত নীলিমার দিকে। জানতে চাইত, কি চায় মেয়েটা, কি তার মনের ইচ্ছে। কিন্তু একদিনের জন্যেও নীলিমাকে বুঝতে পারেনি প্রতুল। বিয়ের পর থেকেই দেখেছে, সে অসম্ভব গম্ভীর। কারো সঙ্গে কথা বলে না, হাসি-তামাসা করে না। সংসারে কি হচ্ছে, না হচ্ছে, কিছুই দেখত না সে। যেন নিজের খেয়ালেই বিভোর।

ঠাকুমা অবাক্ হতেন। কখনো ভাবতেন, কি জানি, হয়তো বাপ-মায়ের জন্যে মন কেমন করে মেয়েটার। আবার কোনদিন ডেকে বসাতেন নীলিমাকে। বলতেন, এসো বৌমা, তোমার সঙ্গে দুটো গল্প করি। আমার আর কে আছে? তোমারই তো আমার সব।

ঠাকুমা গল্প করতেন। তাঁর বাপের বাড়ীর গল্প, শ্বশুর বাড়ীর গল্প। নীলিমা শুনত, কিন্তু একটি কথাতেও সায় দিত না। গল্প শোনা শেষ হলে নিজের ঘরে গিয়ে ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়াত।

সাজতে ভালবাসতো নীলিমা। সারাদিন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সাজত, আর কতগুলো শিশি আর কৌটো নিয়ে নাড়াচাড়া করত। হিমানী, স্নো, সেন্ট, আরো কত কি? পাউডারের পাফ্ বোলাত মুখে চোখে, কপালে, ঘাড়ে, বুকে পিঠে, গলায়।

কোন কোন দিন প্রতুল ওর সামনে এসে দাঁড়াতো, বাঃ, বেশ সেজেছ। চমৎকার দেখাচ্ছে তোমাকে।

নীলিমা অস্পষ্ট হাসি হাসতো।

প্রতুল যেন অনুমতি চাওয়ার সুরে বলত, আজ সিনেমায় যাবে?

—চল্।

যেন কারো কোনো ইচ্ছাতেই সে বাধা দিতে চায় না, অথচ সব কিছুতেই নির্লিপ্ত। কি অদ্ভুত মন নীলিমার! প্রতুল অবাক্ হয়ে চেয়ে থাকত ওর মুখের দিকে, আর ভাবতো, কি আছে ওর মনে? অথচ কোনো দিন সাহস করে একটি কথাও জিজ্ঞেস করতে পারেনি নীলিমাকে। নীলিমা যেন পাথরের দুর্গের মধ্যে বসে থাকত। ওকে জানবার উপায় ছিল না।

কদিন বা বেঁচে ছিল নীলিমা? বিয়ের ঠিক পাঁচ মাস পরে মেয়েটি মারা গেল নিউমোনিয়ায়। তারপর আর বিয়ে করেনি প্রতুল।

নীলিমাকে দেখে দেখে রমার কথা মনে পড়ে যেত প্রতুলের কি। হাসি-উজ্জ্বল প্রাণ! যেখানে যেত রমা, সে-জায়গাটা যেন আলোয় আলোময় হয়ে উঠতো। গানে-বাজনায়, হাসি-গল্পে জমিয়ে তুলত রমা। কলেজের ছেলেরা বলতো, প্রতুল, তোর ভাগ্যটা ভাল। বিয়ে করে তুই সুখী হতে পারবি।

কিন্তু কোথায় গেল তাদের ভবিষ্যৎ-বাণী আর শুভেচ্ছা? সবাই জানত প্রতুলের সঙ্গে রমার বিয়ে হবে। তবু একটা বিভ্রান্তির ঢেউ এসে ওদের দুজনকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল দুদিকে। উচ্ছলতায় ভরা সেই রমাকে আজ কোথায় পাবে? নীলিমার মত সে-ও বুঝি আজ পাথরের দুর্গে বন্দিনী। তাকে জানা যাবে না, পাওয়া যাবে না। তার বদ্ধ জীবন-প্রবাহের মধ্যেই দিনে দিনে সে ক্ষয় হয়ে যাবে।

—তুমি বড্ড রোগা হয়ে গেছ, রমা। অসুখ-বিসুখ করেছিল নাকি?

—কই, না তো?

প্রতুল বললে, তবে এমন শুকিয়ে গেছ কেন?

—ওটা তোমার চোখের ভুল। রমা একটু হাসবার চেষ্টা করে বললে, শুকিয়ে যাব কেন আমি? আমি কি খেতে পাই না, না পরতে পাই না, না আমার স্বামী-সংসার নেই?

রমার মুখে অস্পষ্ট একটু হাসি ফুটে উঠেছে। চোখ দুটো চিকচিক করছে। অদ্ভুত দেখাচ্ছে ওকে। ঠিক এমনি করে আরেকবার রমাকে হাসতে দেখেছিল প্রতুল। তখন ওরা কলেজে পড়ত। ক্লাসে প্রফেসর আসেননি। সকলে গল্প করছে, গোলমাল করছে। একটি মেয়ে জিজ্ঞেস করেছিল রমাকে, তুই যে প্রতুলের পিছনে ছুটে বেড়াচ্ছিস, ধরে রাখতে পারবি ওকে?

—কেন পারব না? আমি কি মেয়ে নয়?

—তোর মত অনেক মেয়ে রাস্তায় গড়াগড়ি যাচ্ছে, রমু। তাছাড়া, ছেলেদের মন তো?

—তা হোক, তবু ওরা আমার সঙ্গে পারবে না। রমা বলেছিল, প্রতুলকে আমি যত দিতে পারি, ওরা পারবে দিতে?

একটু দূরের বেঞ্চিতে বসলেও কথাগুলো কানে গিয়েছিল প্রতুলের, আর দেখেছিল অদ্ভুত এক হাসিতে চঞ্চল হয়ে উঠেছে রমা—ঠিক আজকের মত। শুধু নিজের মুখের কথাতে পরিতৃপ্ত নয় রমা, ও বুঝি সেদিন আন্তরিক ভাবে বোঝাতে চেয়েছিল, প্রতুলকে ও পেয়ে গেছে। কিন্তু আজ? কেন এমন করে হাসছে রমা? আজও কি ও বোঝাতে চায়, সংসারে সব কিছুই ও পেয়েছে। এই অদ্ভুত হাসিই কি ওর প্রাপ্তির পরিতৃপ্তি?

প্রতুল বললে, জানি তুমি সবকিছুই পেয়েছ। কিন্তু সব থেকেও তোমার যে কিছুই নেই রমা!

রমার দুচোখ হঠাৎ ছলছলিয়ে এল। কিন্তু সে এক মুহূর্ত। তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিয়ে বললে, ওঃ, তাই নাকি?

প্রতুল ওর দীর্ঘ দৃষ্টি রোদে পোড়া তামাটে আকাশটার দিকে তুলে ধরে বলল, এই জীবনটা তাই জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে রমা! তাই তো এতদূর ছুটে এসেছি।

—দেখতে এসেছ বুঝি তোমার মত আরেকজনের

জীবনও জলে-পুড়ে খাক হচ্ছে কি না ?

—আমাকে ভুল বুঝো না, রমু। অত্যন্ত ব্যথিত স্বরে প্রতুল বললে, তোমার কাছে এসেছি আজ নতুন করে একবার বোঝাপড়া করব বলে।

—ও, বোঝাপড়া করবে ? এতক্ষণে বুঝলাম। ঘুমন্ত রাজপুরী থেকে রাজকন্যাকে চুরি করবে বলে বেরিয়েছ ? রমা খিলখিল করে হেসে উঠল কিন্তু প্রতুল, ভুল পথে এসেছে। এটা রাজপুরী নয়, আর যে মেয়েটা এখানে থাকে সে-ও রাজকন্যা নয়। সে ছিল একজন সামান্য কেরানির মেয়ে, আর আজ সে একজন গরীব কেরানির বউ। পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়ানো একটা ঝিঙ্গী মেয়ে।

প্রতুল আস্থিরভাবে রমার একটা হাত ধরে ফেলল, আমাকে ক্ষমা কর, রমা। আর কতদিন আমার ওপর রাগ করে থাকবে ?

রমা আস্তে নিজের হাতটা প্রতুলের কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে বললে, ছিঃ তোমার ওপর রাগ করব কেন আমি ? মেয়েরা কখন দুঃখ করে, রাগ করে জানো ? যখন একজনকে হারিয়ে তার মত কাউকে না পায়। কিন্তু আমার বেলা কি তাই ? তোমাকে আমি পাইনি, কিন্তু যাকে পেয়েছি তিনি যে তোমার চেয়ে অনেক বড়, অনেক উদার! আমার জীবনে তো দুঃখ আর রাগের জায়গা নেই!

প্রতুলের কান দুটো লাল হয়ে উঠলো, তবে কি যা শুনেছি সব মিথ্যে ?

—সব মিথ্যে, সব ভুল। রমা সজোরে মাথা নেড়ে বললে, এতদিন যা শুনেছ, তার একটি কথাও সত্যি নয়।

পায়ের তলা থেকে মাটি যেন সরে গেছে। যেন দাঁড়াবার স্থানটুকু নেই প্রতুলের। একটা অস্বাভাবিক অস্বাস্তিতে প্রতুলের মনটা ছটফট করতে লাগল।

বাইরের দিকে মুখ ফিরিয়ে একটু দূরে জানালার ধারে দাঁড়িয়ে আছে রমা। মুখটা ভাল করে দেখা যাচ্ছে না। ঝিরঝিরে বাতাসে আবিন্যস্ত চুলগুলো বারে বারে উড়ে এসে পড়ছিল ওর কপালে, মুখে, চোখে। আঁচলটা ঠিক তেমনিভাবেই পায়ের কাছে লুটোচ্ছে।

রমা কি ভাবছে কে জানে ? হয়তো ভাবছে প্রতুল একটা নির্লজ্জ বেহায়া লোক। ওর জীবন নিয়ে তামাসা করতে এসেছে। তাই বুঝি এদিকে আর চেয়ে দেখছে না রমা। ঘৃণায়, লজ্জায় বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে। আর কখনো বোধ হয় কথাও বলবে না প্রতুলের সঙ্গে।

বাগানের জবাগাছটা কেমন যেন মিইয়ে পড়েছে দুপুরের কাঠফাটা রোদে ফুলগুলো লাজুক মেয়ের মত মাটির দিকে মাথা ঝুঁকিয়ে ঝুলছে। দূরের ওই আধমরা পেয়ারা গাছটায় একটা কাক বসে বসে আপন মনে নিজের গা কামড়াচ্ছিল। পাখা ঝাপটে সেটা উড়ে গেল।

ঘরের দেয়ালের গায়ে এক দল পিঁপড়ে সারি বেঁধে এগিয়ে যাচ্ছে। কোথায় কে জানে ? প্রতুলের মনে হলো, দুনিয়াটা বুঝি বিরামহীন ভাবে এগিয়ে চলেছে। কেউ কারো জন্যে বসে নেই, সবাই নিজের নিজের কাজে ব্যস্ত। শুধু প্রতুলই বুঝি বসে আছে একজনের অপেক্ষায় ? কিন্তু তাকে চাওয়ার কোনো অধিকার তো ওর নেই। তাছাড়া রমা তো নিজেই বলেছে, মহিমকে পেয়ে সে সুখী। তার দুঃখ নেই, রাগ নেই, অভিমান নেই। তবে কার জন্যে প্রতুল এখনো বসে আছে এখানে ? চলে যেতে তার বাধা কোথায় ?

এয়ার-ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতেই রমা ফিরে তাকাল, ও কি ?

—আমি যাই, রমা।

—কোথায় যাবে ?

—বাড়ী যাই।

—ছিঃ, তুমি এমন করে আমাকে অপমান করবে, তা স্বপ্নেও কখনো ভাবিনি!

প্রতুল চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো।

রমা বলল, তুমি চলে গেলে উনি কি মনে করবেন ?

ছিঃ ছিঃ! আমি যে মুখ দেখাতে পারব না ওঁর সামনে, শাশুড়ীর সামনে!

প্রতুলের মুখখানি শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠেছে এরই মধ্যে। মায়ের কাছে বকুনি খেয়ে শিশু যেমন অভিমানে দাঁড়িয়ে থাকে, ঠিক তেমনিভাবে প্রতুল দাঁড়িয়ে আছে রমার সামনে। কেমন যেন অসহায় দেখাচ্ছে ওকে। দেখলে মায়া হয়।

ওর অবস্থা দেখে খিল খিল করে হেসে উঠল রমা। তারপর এগিয়ে এসে এয়ার ব্যাগটা প্রতুলের কাঁধ থেকে নামিয়ে রেখে বললে, মাগো, কি অবুঝ ছেলে তুমি! না জানি মেয়েদের মত কষ্ট সইতে হলে কি করতে'

দূর আকাশে ওই চালতা গাছটার মাথার ওপর এক টুকরো শাদা মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে। ঠিক যেন একখানা শাদা চাদর, পর্দার মত ঝুলছে শূন্য থেকে। কবে, কোন্ অজানা দেশ থেকে মেঘের টুকরোটা ভাসতে শুরু করেছে কে জানে? কোথায় গিয়ে থামবে তারও কি ঠিক আছে? চলাই বুঝি ওর কর্তব্য, চলতে চলতেই নিজেকে ফুরিয়ে ফেলবে। মানুষের জীবনটাও কি তাই নয়? পাওয়া না-পাওয়ার হিসেব করতে করতে কালের এক মহা সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে দেখতে পায়, সে নিজেই কখন ফুরিয়ে গেছে।

রমা বাইরে গিয়েছিল। ঘরে ঢুকে বললে, নাওয়া-খাওয়া সারবে না আজ? বেলা যে গড়িয়ে গেল?

প্রতুল চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, গঙ্গা থেকে চট্ করে একটা ডুব দিয়ে আসি। যাব আর আসব।

—না, তোমাকে এই অবেলায় গঙ্গায় নাইতে হবে না। বাড়ীতে চান কর। রমা আপত্তি তুলল, নতুন জায়গায় এসে বেকালে একটা অসুখ বিসুখ বাধাবে নাকি?

অনেকক্ষণ থেকেই একটা অস্বস্তির কাঁটা মনের মধ্যে খচ্ খচ্ করছে। কিছুতেই স্থির হতে পারছে না প্রতুল। সারাদিন যেন খেটে খেটে হয়রান হয়ে গেছে, সমস্ত শরীরে এমনি একটা অবসন্নতা। আর রমা? ওর ব্যবহার প্রথম থেকেই কেমন যেন ভাসা-ভাসা ঠেকছে। সেবা-যত্নের ত্রুটি নেই। কিন্তু সমস্তই যেন লোক-দেখানো। কিছুই আন্তরিক নয়। শুধু কর্তব্যের দায়ে সব করে যাচ্ছে। যেন ওর বন্ধু নয় প্রতুল, একজন কুটুম এসেছে বাড়ীতে।

স্নান করে খাওয়া-দাওয়া সারতে তিনটে বাজল। আরাম কেদারাটায় শুয়ে ঘণ্টাখানেক বিশ্রাম নিয়ে বেড়াতে বেরুল প্রতুল। রমা বলে দিল, ফিরতে দেরী করো না কিন্তু।

গঙ্গার ধারটা এদিকে বেশ উপভোগ্য। তাই বিকেল হলেই দলে দলে লোক আসে বেড়াতে। ছেলেরা কেউ খেলা করে, কেউ সাঁতার কাটে গঙ্গায়। ঘাটের সিঁড়িতে বসে বুড়োরা গল্প করে, কেউ ধর্মের, কেউ বা সংসারের। বাড়ীর বৌ-ঝিরা মাঝে মাঝে জল নিতে আসে ঘাটে।

অনেক যাত্রী নিয়ে তিনখানা নৌকো পাল তুলে দিয়ে ওপার থেকে এপারে আসছে। একসঙ্গে তাল রেখে দাঁড় টানছে মাঝিরা। জলের ওপর ছলাৎ ছলাৎ শব্দ। নৌকোর ছইয়ের ওপর বসে একটা লোক বাঁশী বাজাচ্ছে। গঙ্গার বুকে ছোট ছোট তরঙ্গের সঙ্গে পা ফেলে নেচে নেচে সুরটা ছড়িয়ে পড়ছে দূর দিগন্তে। প্রতুল মুগ্ধ হয়ে শুনতে লাগল। ভারি মিষ্টি সুর। যেন ছোট্ট একটি মেয়ে অনেক দূর থেকে ছুটে এসে তার কচি কচি আঙুল দিয়ে ওর বুকে শুড়শুড়ি দিয়ে একটা শিহরণ জাগিয়ে তুলছে।

একটু আগে ওই তালগাছটার মাথায় সূর্যের পড়ন্ত রোদ হাত বুলোচ্ছিল। এখন আর নেই। আজকের মত সে বিদায় নিয়েছে। বটগাছটার ডালে ডালে অন্ধকার ক্রমেই জটলা পাকাচ্ছে দুশ্চিন্তার মত। আর তারই লোভে কাকগুলো চিৎকার করতে করতে ছুটে আসছে। মানুষের মনও বুঝি দুশ্চিন্তাকেই বেশী ভালবাসে। তাই তার মাঝে যত সব উদ্ভট ভাবনা—বিরহ, রোগ, শোক, মৃত্যু। আর এই দুশ্চিন্তাই তাকে

রোগ-শোকের সিঁড়ি বেয়ে মৃত্যু পর্যন্ত ঠেলে দেয়। প্রতুল ভাবে, মানুষের যদি ভোগ-লালসা না থাকত, তাহলে বোধ হয় সুখী হতে পারতো মানুষ। পেতে চায় বলেই তার মনে এত না পাওয়ার দুশ্চিন্তা। সংসারে এত প্রাণী, কিন্তু বিধাতা সবার চেয়ে দুঃখী করে গড়েছেন মানুষকে। হাতে একটি ভিক্ষার ঝুলি দিয়ে তাকে তিনি পাঠিয়েছেন এই দুনিয়ায়।

বাড়ীতে ঢোকবার মুখেই থমকে দাঁড়াল প্রতুল ভেতরে যেন একটা দক্ষযজ্ঞ চলছে। হৈ চৈ, গালিগালাজ আর হট্টগোল। পুরুষের গলার আওয়াজটা বোধ হয় মহিমের। একটু আগে হয়তো অফিস থেকে ফিরেছে। আর বাড়ীতে ঢুকেই নারী শিক্ষার কাজে হাত দিয়েছে মহিম। প্রতুল বুঝতে পারল, রমা মার খাচ্ছে। দু-তিনটে নারী-কণ্ঠ মহিমকে অনুনয়ের সুরে বলছে, আর নয়, আর নয়, এবার ছেড়ে দাও। বউটা যে মরে যাবে দাদা!

—না। মহিম চীৎকার করে উঠল, হারামজাদীকে আজ খুন করে ফেলব।

মেয়েরা আটকাতে চেষ্টা করছে মহিমকে। ওরা কে? একজন তো বাড়ীর বুড়ি ঝি। প্রতুল ওকে সকাল থেকেই দেখেছে। আর দু'জন? ওরা বোধ হয় রমার বান্ধবী। আশেপাশেই কোথাও থাকে। ছুটে এসেছে গোলমাল শুনে।

বুড়ি ঝিটা কেঁদে ফেলেছে। রমার গায়ে মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বলছে, ছি ছি ছি, এমন কাণ্ড ভদ্দর লোকের ঘরে হয়!

রমার শাশুড়ী বললেন, এমন বউকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারতে ইচ্ছে করে।

—তোমরা যাও দিকিনি এখান থেকে! চেঁচামেচি করোনি। বুড়ি ঝিটা খেঁকিয়ে উঠল রমার শাশুড়ীকে। ও নাকি শাশুড়ীর বাপের বাড়ীর ঝি, অনেক দিনের পুরোনো। তাই শাশুড়ী ওর মুখের ওপর কথা বলতে পারেন না।

শাশুড়ী চলে গেলেন। মহিমও বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

বুড়ী রমার কাছে এগিয়ে এসে বললে, দেখি বউদিদি, কোথায় কেটে গেছে। বাছা রে, কাপড়খানা যে ভিজে গেছে রক্তে!

প্রতুল বাড়ীতে ঢোকেনি। আরো কিছুক্ষণ রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াল। তারপর যখন বাড়ীতে ঢুকল, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। চোরের মত পা টিপে টিপে ঢুকছিল প্রতুল। যেন ও নিজেই অপরাধী। কিন্তু ঘরের মুখেই রমার সঙ্গে দেখা।

রমা বললে, মাগো, এই বুঝি তোমার বেড়ানো হলো, ছোড়দা? কখন বেরিয়েছ, ফেরবার আর নাম নেই? আর উনি সেই সন্ধ্যে থেকে বসে আছেন তোমার সঙ্গে আলাপ করবেন বলে।

মহিম ঘরের মধ্যেই বসেছিল একটা চেয়ারে। খবরের কাগজে শেয়ার মার্কেটের পাতায় চোখ বুলাচ্ছিল। মুখ তুলে তাকাতেই রমা বললে, এ আমার বড় পিসীমার ছেলে। আমাদের বিয়ের সময় তুমি ওকে দেখনি। ছোড়দা তখন দিল্লীতে ছিল। পলিটেকনিকে পড়ত।

রমার কথা শুনে প্রতুল অবাক্ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। রমা এইভাবে ওর পরিচয় দেবে আর এমন সহজ ভাবে কথা বলবে, এটা ও ভাবতে পারেনি।

মহিম প্রতুলের মাথা থেকে পা পর্যন্ত একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে ভদ্রতার খাতিরে বললে, বসুন।

প্রতুল মহিমকে দেখছিল। চুলগুলো ছোট করে ছাঁটা। মাথার মাঝখানে প্রকাণ্ড একটা টিকি। মুখের জায়গায় জায়গায় বিশ্রী দাগ—বসন্তের না ব্রণর, ঠিক বোঝা যায় না। চোখদুটো এতো ছোট যে, লোকটা দেখতে পায় কি না, তাই সন্দেহ হয়।

ঝি এসে চায়ের সরঞ্জাম রেখে গেল টেবিলে।

চায়ে দুধ ঢালতে ঢালতে রমা বললে, আচ্ছা ছোড়দা, দিল্লী জায়গাটা কি রকম গো?

দিল্লীর মুখ কোনোদিন দেখেনি প্রতুল। তাই বন্ধুদের মুখে শোনা বর্ণনার আশ্রয় গ্রহণ করতে হল

ওকে। বলল, নিউ দিল্লীটা মোটামুটি ভালই, ওল্ড্ দিল্লীটা আঁস্তাকুড়।

চায়ের সঙ্গে নানারকম খাবার সাজিয়ে দিয়েছে রমা। মিষ্টি ছাড়াও বাড়ীতে তৈরি হিং-এর কচুরি। মহিম গোমড়া মুখে বলল, এসব আমি খেতে পারব না।

—খেতে পারব না বললে ভীষণ বকব আমি। রমা মুখ টিপে একটু হাসল।

মহিম হুকুমের ভঙ্গীতে আবার বললে, খাবারগুলো সরিয়ে নাও।

রমা ওর টেবিলের কাছে এগিয়ে এল। মহিমের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বলল, এত অভিমান কিসের? কার ওপর রাগ হলো গো? তারপর একটা মিষ্টি তুলে নিয়ে মহিমের মুখের সামনে ধরল, আমি খাইয়ে দিই?

যেন ষোলো বছরের একটা মেয়ে। নতুন যৌবনের নেশায় যেন অস্থির হয়ে উঠছে রমা। স্থান কালের জ্ঞান নেই। প্রতুল যে সামনে বসে আছে, বুঝিবা তাও ভুলে গেছে।

হিমমের মতো মানুষের মনও বুঝি টলে উঠেছে। অবাক্ হয়ে সে চেয়ে আছে রমার মুখের দিকে। বুঝতে পারছে না, মেয়েটার মনে আজ এত অস্থিরতা কেন? এত সাহস নিয়ে তো কোনোদিন ওর সঙ্গে কথা বলতে আসে না রমা?

মহিমের মাথাটা বুকের ভেতর জড়িয়ে ধরে রমা ফিক ফিক করে হেসে উঠল, কই, হাঁ করছ না যে? বাঃ রে, এইভাবে সারারাত বুঝি আমি দাঁড়িয়ে থাকব? খাবে না?

নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও হাঁ করল মহিম। রমা ওর মুখে একটা খাবার দিয়ে বললে, বাঃ, লক্ষ্মী ছেলে! এই তো চাই।

মহিম খাচ্ছিল। রমা ওর কদম-ছাঁট চুলে হাত বুলোতে বুলোতে বলল, একটা কথা রাখবে?

মহিম গোমড়া মুখে বসে রইল। কথা বললে না।

রমা আবদার ভরা কণ্ঠে বলল, আমাকে একটা কাকাতুয়া কিনে দেবে? কি সুন্দর কথা বলে কাকাতুয়া!

মহিম নিরুত্তর। স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলা যেন ধর্ম-বিরুদ্ধ, এমনই একটা ভাব।

রমার কথা যেন শেষ হতে চায় না। মহিমের উত্তরের প্রতীক্ষা না করেই অনর্গল কথা বলে যাচ্ছে, এবারে পুজোর ছুটিতে আমাকে আগ্রায় নিয়ে চল না গো? তোমাকে কবে থেকে বলছি। আগ্রা থেকে মথুরা-বৃন্দাবন হয়ে আমরা ফিরব। জানো, বৃন্দাবনে নাকি কত ময়ূর? কেবল ময়ূরের ছড়াছড়ি। ওখানে গিয়ে আমাকে একটা ময়ূর ধরে দিতে হবে কিন্তু। দেবে তো? আমি তাকে বাড়ীতে নিয়ে আসব।

মহিমের বিস্ময়ের ঘোর একটুও কাটেনি। রমার কাণ্ড দেখে সে যেন উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে উঠেছে। পাগল হয়ে গেল না তো রমা! যে কোনো দিন মহিমের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলতে পারে নি, ভালবাসবার সুযোগ পায়নি, সে আজ এমন দুঃসাহসী হয়ে উঠল কি করে? এত হাসি, এত কথা সে কোথায় পেল? মহিম তো কোনোদিন তাকে প্রশ্রয় দেয় নি? কঠোর শাসনে দূরে রেখেছে এতদিন। সেই শাসনের গণ্ডীই কি আজ ভাঙতে চায় রমা? যেন বড্ড বেশী ন্যাকামি করছে। রমার মুখের দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইল মহিম।

—কি দেখছ অমন করে?

মহিম গম্ভীর বললে, দেখছি তোমাকে।

—ছিঃ, অসভ্য! রমা ফিক করে একটু হেসে ঘর থেকে পালিয়ে গেল।

রাত্রে শোবার ঘরে গিয়ে প্রতুল অনেকক্ষণ বসে রইল চুপচাপ। রমার সঙ্গে আর দেখা হয় নি। সে আর আসেনি প্রতুলের সামনে। প্রতুলের মনে হল, এখানে আসা ওর ঠিক হয় নি। কাল সকালেই সে ফিরে যাবে কলকাতায়। কেন এল শুধু শুধু? নাই বা দেখা হত রমার সঙ্গে? যে-ধারণা নিয়ে সে এখানে এসেছিল, তা তো সত্যি নয়? রমা তো বেশ

সুখেই আছে। প্রতুলের কথা হয়তো কোনো দিন মনেই পড়ে না ওর। যদি বা কখনো মনে পড়ে, তবে তা হয়তো প্রায় ভুলে যাওয়া একটা স্বপ্নের মত। মহিমকে রমা ভালবাসে। সত্যিই ভালবাসে। প্রতুল তো নিজের চোখেই সব দেখল। মহিমের প্রতি কি অসীম ভালবাসা, কি অপরিসীম শ্রদ্ধা রমার! সন্ধ্যে বেলা কত মার খেল মহিমের হাতে, কিন্তু এতটুকু আঁচড় পড়েনি ওর মনে। সমস্ত গ্লানি ভুলে গেছে। তাই অতো খুশী, অতো উজ্জ্বল দেখাচ্ছিলো রমাকে। প্রেমের কি অদ্ভুত ক্ষমতা! সমস্ত দুঃখ, সব গ্লানি সে একটি মধুর প্রলেপ দিয়ে ঢেকে দেয়! প্রেম যেন একটা দৈব শক্তি।

কিন্তু কোথায় গেল রমা? সন্ধ্যার পর সেই যে গা ঢাকা দিল, আর তো দেখা যায় নি তাকে? প্রতুল ঘরের মধ্যে কিছুক্ষণ পায়চারি করল। হয়তো রমা একবার আসবে। কিন্তু কই? সে তো এল না? প্রতুল বুঝতে পারল রমা আর আসবে না। হয়তো সে এখন মহিমের পাশে শুয়ে হাসছে, গল্প করছে। আদরে-আবদারে হয়তো পাগল করে তুলেছে মহিমকে।

ঠাকুর ঘরের পেছনে যে ছোট ঘরখানা, তারই মেঝের বিছানা পেতে রমা শুয়েছিল। মহিম বাড়ী নেই। এমন সময় কোনো দিনই থাকে না সে বাড়ীতে। রাত্রের জন্যে আজকাল তার আলাদা বন্দোবস্ত আছে। সেখানে রাত কাটিয়ে সকালে বাড়ী ফেরে। নিঃসঙ্গ রাত রমার জন্যে রোজই বাঁধাধরা।

কলেজে পড়তে অনেকবার অভিনয় করেছে রমা নায়িকার ভূমিকায়। কিন্তু নিজেরই অভিশপ্ত জীবন নিয়ে যে আজ তাকে অভিনয় করতে হবে, একথা সে কি স্বপ্নেও ভাবতে পেরেছিল কোনোদিন? নারী জীবনের সব চেয়ে বড় আশায় সে ব্যর্থ, বঞ্চিত। কিন্তু কেন এই ব্যর্থতা, শূন্যতা আর এই জীবন-জোড়া কান্না! এর জন্যে দায়ী কে? কে তাকে এই বঞ্চিত জীবনের পথে ঠেলে দিয়েছে? তার আশায়-ভরা মায়ায়-গড়া সংসার তার হাত থেকে কেড়ে নিয়েছে কে? কে সেই অপরাধী? ভাগ্য নয়, বিধাতা নয়, রমা জানে সে হচ্ছে প্রতুল! তাকে কি ক্ষমা করা যায়? রমার মনে হলো এতদিনে বুঝি সার্থক হলো ওর অভিনয়। কিন্তু এই অভিনয়ে বাহবা দেবার কেউ নেই, হাত তালি দেবার কেউ নেই। আছে শুধু বোরখায় ঢাকা কালো রাত্রি আর তারায় ভরা অনন্ত আকাশ। এই আনন্দের বেদনা সে আজ কার কাছে জানাবে? বালিশে মুখ ডুবিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল রমা।

পাশের ঘরে প্রতুল তখন অঘোরে ঘুমোচ্ছে।

বুদ্ধির পরিচয়

লক্ষ্মী চট্টোপাধ্যায়

বহুদিন আগে ভারতবর্ষের কোন এক রাজ্যে খাবারের অভাব হয়। তখন সেখানের রাজা ঠিক করলেন যে যারা অকেজো, বোকা বা বুড়ো তাদের খেতে দেওয়া হবে না। এই খবর রাজ্যময় রটে গেল ও দলে দলে বুড়োবুড়ী সব রাজধানীর দিকে এগোতে লাগল। সকলেই তারা হাহাকার করছে—কেউ বলছে, "একি অন্যায়, বুড়ো হলে খাওয়া মানুষের একমাত্র সুখ আর সেটুকুও দেখছি কেড়ে নেবে।" অন্যরা বলছে, "তবে রে, কেমন খেতে না দেয় দেখে নেব। চল, ওদের খাবার ভাগ আমরা কেড়ে খাই।" আর একদল কেবল "চলবে না চলবে না, রাজার এ অন্যায় আইন চলবে না" "বলতে বলতে চলেছে। দলগুলি সব এক সঙ্গে রাজধানীর ভিতর যখন এল তখন তারা এক বিরাট জনতায় পরিণত হয়েছে। রাজামশাই এদের দেখে ভয় পেয়ে বল্লেন, "মন্ত্রী, কি করা যায় বল? এরা তো আমাদের মেরে ফেলতে পারে।"

মন্ত্রী বল্ল, "হুঁ-হুঁ, তাই তো, ব্যাপার ভাল নয়। আচ্ছা এক কাজ করা যাক, ওই বুড়োগুলোর গায়ে বোধ হয়, কিছু বেশি জোর আছে। আমরা আইনটা কিছুটা বদলে দি। বুড়োদের খেতে দেওয়া যাক, কিন্তু বুড়ীরা বাদ পড়বে। আর বোকা হাবা বা অকেজো, এদের তো আমরাই বেছে নেব। কাজেই বেশ কিছু লোক এই না খাওয়ার দলে পড়বে আর আমরা সকলে একটু বেশি খেতেও পাব।"

রাজা মশাই মন্ত্রীর বুদ্ধির প্রশংসা করলেন। এবার এই নতুন আইনটি রাজ্যময় ঘোষণা করা হল আবার। এর পর কতগুলো বুড়ো বুড়ীদের হাতে মার খেল আর বহু বুড়ীরা হাতে হাতা বেড়ি, বঁটি, সব নিয়ে রাজবাড়ির দিকে এগোতে লাগল। সকলেই বুঝতে পারল যে ব্যাপারটা সহজে মিটবে না।

সকাল বেলা মন্দিরে পুজো দেবার পর রাজার শাশুড়ী, মন্ত্রীর শাশুড়ী ও সেনাপতির শাশুড়ী এই সব কথা আলোচনা করছিলেন। সকলেই ঠিক করলেন যে রাজার এ আইনটাতে কে বোকা বিচার করবে সে বিষয় কোন সঠিক ঘোষণা নেই। কাজেই বুড়ীরা যদি শাসকদের বোকা বানাতে পারে তাহলে তাদের খাওয়া বন্ধ হবে। কে এ কাজের ভার নেবে তাই ঠিক করা হচ্ছে এমন সময় মন্ত্রীর শাশুড়ী রাজার শাশুড়ীকে বল্লেন, "দেখ ভাই, এটা কিন্তু তোমায় উদ্ধার করতে হবে। আমি যদি আমার জামাইকে বোকা বানাই তবে তোমার জামাই মন্ত্রীর মাথাটা কেটে ফেলবে। কিন্তু আইনটা যেমন আছে সেইরকমই থাকবে। এতে আমাদের কোন লাভ হবে না। রাজা নিজে বোকা বনলে তবেই আইন বদল হবে, নয়ত নয়।"

রাজার শাশুড়ী বল্লেন, "হ্যাঁ এ ত তুমি ঠিক বলেছ। আমি আমার মেয়ের সাহায্য পেলে তবে এই কাজটা হাতে নিতে পারি।" সব শাশুড়ীরা এক সঙ্গে এরপর রাণীর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। রাণীকে তাঁর মা বল্লেন, "দেখ, আজ আমাদের বোকা, অকেজো বুড়ী বলে না খাইয়ে মারছে, কাল তোদেরও এই অবস্থা হবে। কাজেই এই আইনটা তুলে দেওয়া দরকার। জামাইকে বোকা বানাতে হবে তোর সাহায্যে।" রাণী সব শুনে বল্লেন যে তিনি সাহায্য করতে রাজি আছেন।

পরদিন সকালে উঠে রাজামশাই দেখলেন যে তাঁর প্রাসাদ ঘিরে অসংখ্য বুড়ীরা চিৎকার করছে। ভয়ে আৎকে উঠে রাজা রাণীর আঁচল ধরে বল্লেন, "আমাকে বাঁচাও। ওই দেখ, ওদের দলের মধ্যে তোমার মাকে দেখছি। আর ওইদিকে সেনাপতির শাশুড়ী, আর পাশেই মন্ত্রীর শাশুড়ীকে দেখা যাচ্ছে! তুমি এখুনি গিয়ে ব্যাপারটা মিটমাট করে ফেল।"

রাণী উপরের দালানে দাঁড়িয়ে হাত জোড় করে বুড়ীদের সেখান থেকে যেতে বল্লেন। এতে তারা আরো জোরে চিৎকার করতে লাগল, এমনকি কয়েকজন ঝাঁটা নেড়ে চেঁচাতে শুরু করল। শোনা গেল কেউ বলছে, "রাজাকে ডাকো, এখানে আসতে বল, দেখি তার কত সাহস।" কেউ বলছে—"আজ আমরা এদের সবাইকে শেষ করব, মন্ত্রী সেনাপতি সব দেখে নেব।" সকলেই মোটের উপর চিৎকার করে বলছে, "দেখি না, কে কাকে খেতে না দেয়।"

রাণী আবার তাদের জোড় হাতে থামতে বল্লেন। এবার ভিড়ের মধ্যে থেকে তাঁর মা চিৎকার করে বলে উঠলেন, "তুই ওখান থেকে সরে যা বলছি নয়ত চুলের মুঠি ধরে সরাব! যা, রাজাকে ডাক এক্ষুণি"

কিন্তু রাজা কোথায় তাঁকে খুঁজেই পাওয়া গেল না। এদিক ওদিক সব খুঁজে চাকরগুলি রাজাকে কোথাও দেখতে পেল না। কাজেই রাণী আবার বুড়ীদের সামনে গিয়ে বল্লেন—"মায়েরা, রাজা এখন কাজে ব্যস্ত। যা বলবার আমাকে বলুন।"

তারা সকলে টিটকারি দিতে লাগল—"সেই ভাল, সেই ভাল, রাজার কত সাহস তা আমরা দেখতে পাচ্ছি। বেশ, যা বলবার তা বলছি আমরা। ওই আইনটা রাজাকে বদলাতে বল। আর একটা কথা আছে—আমরা যদি প্রমাণ করি যে রাজা মন্ত্রী বা সেনাপতি সবাই বোকা, তাহ'লে কি হবে?" রাণী তাড়াতাড়ি বল্লেন, "তাহ'লে তারাও খেতে পাবে না।"

বুড়ীর দল এ কথা শুনে খুব খুশী হয়ে সেখান থেকে চলে গেল। রাণী তখন এঘর ওঘর খুঁজে শেষে দেখলেন যে রাজা খাটের নিচে লুকিয়ে আছেন। তাঁকে বুঝিয়ে সেখান থেকে টেনে বার করে রাণী বল্লেন, "রাজা, ওরা তোমাদের যদি বোকা বানাতে পারে তবে তোমাদেরও খাওয়া দাওয়া বন্ধ, বুঝেছ?"

রাজা কাঁপতে কাঁপতে বল্লেন—"রাণী, তুমি যা বল তাই হবে। এখন ওরা সব চলে গেছে কি না দেখ।"

রাণী হেসে বল্লেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওরা সব চলে গেছে। এবার তুমি বেরোও তো ঐ ঘর থেকে।"

পরদিন সকালে রাজার নিমন্ত্রণ এল শাশুড়ীর বাড়ি থেকে। জামাই খাওয়ানো। শাশুড়ী বলে পাঠিয়েছেন যে জামাইয়ের নূতন আইন অনুসারে তিনি তো পরের বারে আর জামাইকে খাওয়াতে পারবেন না, তাই এবার যেন জামাই নিশ্চয় আসে। রাজা তো ভয়ের চোটে যেতেই চান না, তারপর রাণী যাবেন শুনে শাশুড়ীর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন।

জামাই আসবে খবর পেয়ে শাশুড়ীঠাকরুণ কাছের মন্দিরে চাকরকে পাঠালেন। সেখানে একদল সন্ন্যাসী থাকত। তাদের একজনকে চাকরটা ডেকে নিয়ে গেল। অল্পক্ষণ পরেই সেই সন্ন্যাসীকে রাজার শাশুড়ী আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বল্লেন, "দেখ, কাল রাত্রে কারাগার থেকে একজন ডাকাত পালিয়েছে। সে তোমার মত দেখতে সকলে বলছে। আজ সকালে মন্ত্রী ঠিক করেছে যে এ ব্যাপারটা রাজাকে না জানিয়ে তোমাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাবে ও যথাসময়ে ফাঁসি দেবে। তুমি যদি

বাঁচতে চাও তো ওই গেরুয়া কাপড় খুলে ফেল। আর এই নাও কিছু মোহর। অন্য কাপড় ওখানে আছে, সেগুলি পরে এ দেশ ছেড়ে পালাও।"

সন্ন্যাসীকে দুবার এ কথা বলতে হলো না। সে তাড়াতাড়ি নিজের কাপড় খুলে রেখে অন্য কাপড় পরে মোহরগুলি নিয়ে সে-রাজ্য ছেড়ে পালিয়ে গেল। চাকরকে কাপড় তুলে রাখতে বলে শাশুড়ী ঘরে ঢুকে গেলেন। নানা রকম মিষ্টি নিজের হাতে তৈরী করলেন ও রাঁধুনীকে দিয়ে করালেন। যত বেলা বাড়তে লাগল তত আয়োজন বাড়তে লাগল।

দুপুর বেলা রাজারাণী এলেন। খুব ঘটা করে শাশুড়ী জামাইকে খাওয়াতে বসালেন। এত আদর যত্ন দেখে রাজা মহানন্দে দু'বার করে সব কিছু খেয়ে ফেল্লেন। শাশুড়ী সবশেষে কতগুলি সন্দেশ পাতে দিয়ে বল্লেন, "বাবা, এগুলি আমি নিজে করেছি তোমার জন্য —বেশি করে খাও।"

রাজা গোগ্রাসে বেশ কতগুলি খেয়ে ফেল্লেন। খেয়ে দেয়ে উঠতে না উঠতেই রাজার ভীষণ ঘুম পেল। কেবল বড় বড় হাই উঠছে, ক্রমে রাজা আর বসতে পারেন না, সেইখানেই শুয়ে পড়লেন ধপাস করে। মনে হলো যেন রাজা বেঁহুস হয়ে পড়েছেন।

এবার রাণী তাড়াতাড়ি রাজার পোশাক খুলে ফেলে সন্ন্যাসীর গেরুয়া কাপড় তাঁকে পরিয়ে দিলেন। অতঃপর রাজার মাথা চেঁছে দিয়ে চাকরদের বল্লেন, "এই সন্ন্যাসীকে মন্দিরের সন্ন্যাসী দলের মাঝে শুইয়ে দিয়ে এস।" তারা সেখানে রাজাকে নিয়ে গিয়ে সন্ন্যাসীদের মাঝে রেখে এল।

ভোর বেলা রাজার ঘুম ভাঙল। ভীষণ তেষ্টা পেয়েছে, গলা যেন একেবারে শুকিয়ে গেছে। অভ্যাস মত চাকরকে ডেকে বল্লেন, "আমাকে ঠাণ্ডা জল দাও তাড়াতাড়ি—ভীষণ তেষ্টা পেয়েছে।" দু'চারবার এভাবে ডাকাডাকি করাতে কেউ কোন উত্তরও দিল না, জলও আনল না। বরং পাশের ঘুমন্ত সন্ন্যাসীরা তার গলার আওয়াজে জেগে উঠল ও রাগ করে তাকে গালাগালি দিতে শুরু করল।

"কি, ব্যাপার কি? কাকে এত ডাকাডাকি করছ? নিজেকে কোথাকার রাজা মনে করে হুকুম দিয়ে চলেছ?" কেউ বা রাগ করে তাকে সেখান থেকে বিদায় হতে বল্ল।

রাজার মাথায় যেন বাজ পড়ল। এ কি রহস্য? মাথা এত ভার যে রাজা উঠে ঠিক মত দেখতে পাচ্ছেন না। কোন মতে হাতে ভর দিয়ে চারিদিকে তাকিয়ে রাজা হতভম্ব হয়ে গেলেন। এ কোথায় এসেছেন তিনি? রাজবাড়ির সুন্দর ঘরই বা কোথায় আর তাঁর সোনা বাঁধান খাটই বা কোথায়? ভাল করে চোখ মুছে তাঁর মনে হলো যে তিনি কোন মন্দিরের সামনে এক দল সন্ন্যাসীদের মাঝে ঠাণ্ডা মাটিতে শুয়ে আছেন। কি আশ্চর্য্য! আর চুপ করে শোয়া যায় কি? রাজা দাঁড়িয়ে উঠে বিলাপ করতে শুরু করলেন—"হায়, হায়, এ কি হলো? আমি কি করে এখানে এলাম!" পরণে নিজের দেখলেন গেরুয়া কাপড়, মাথায় চুল নেই, গোঁফ দাড়ি কিছুই যে নেই। রাজা আর থাকতে না পেরে দৌড়ে মন্দির ছেড়ে রাজবাড়ির পথে চল্লেন।

সেখানে পৌঁছে তার কোনই লাভ হলো না, কারণ দারোয়ানরা তাঁকে বাড়িতে ঢুকতেই দিল না। রাজা যত চেঁচিয়ে তাদের হুকুম করেন, তারা তত গালাগালি দিয়ে তাঁকে বিদায় করবার চেষ্টা করে। শেষে তাদের দলের যে প্রধান সে এসে রাজাকে গলা ধাক্কা দিয়ে বার করে দিল। রাজা ক্ষেপে গিয়ে চিৎকার করে "রাণী, রাণী," বলে ডাকতে লাগলেন। বাড়ির ভিতরে খবর গেল যে একটা পাগলা সন্ন্যাসী জোর করে রাজবাড়িতে ঢুকবার চেষ্টা করছে আর এখন চিৎকার করে রাণীমাকে ডাকছে। রাণী তাঁর খাস ঝিকে সঙ্গে করে দালানে এসে সন্ন্যাসীকে বল্লেন, "তুমি আমাকে ডাকছ কেন? কি চাও?"

রাজা অবাক্ হয়ে বল্লেন, "রাণী, তুমিও আমাকে চিনতে পারছ না? আমি তো রাজা। দরোয়ানদের দরজা খুলতে বল।"

খাস ঝি মুখ বেঁকিয়ে বল্ল, "আ মরণ, তুমি রাজা না আর কিছু। কেউ কোনদিন ঐ রকম নেড়া মাথা, গেরুয়া পরা' ধুলো কাদা মাথা রাজা কখনো দেখেছে? দূর, দূর, লোকটা একেবারে পাগল ওকে এক্ষুণি বিদায় করে দাও"

রাজামশাই হতাশ হয়ে আবার মন্দিরের দিকে ফিরে চল্লেন। কিন্তু রাজধানীতে তখন এসব খবর রটে গেছে, —রাস্তায় ভিড় করে জনতা এই পাগলটাকে দেখতে এসেছে। কেউ টিটকারি দিতে লাগল, কেউ বা কাপড় ধরে টানতে লাগল! শেষে কতগুলি ছেলে ইট পাটকেল ছুঁড়তে শুরু করল। তখন রাজা প্রাণের ভয়ে শহর ছেড়ে পালিয়ে জঙ্গলে আশ্রয় নিলেন। সারাদিন ছোটাছুটি করে রাজা ঠিক করলেন যে রাত্তির হলে শাশুড়ীর বাড়ি যাবেন; তারপর কি হয় দেখা যাবে।

গভীর রাত্রে রাজা আপাদমস্তক চাদর মুড়ি দিয়ে শাশুড়ীর বাড়ি এসে হাজির হলেন। অন্ধকার ঘুটঘুটে রাত্তির, রাজার তো ভয়ে গা ছম্ ছম্ করছে, তবুও উপায় নেই, কাজেই রাজা আস্তে আস্তে পা টিপে টিপে চলেছেন। শাশুড়ীর বাড়ি পৌঁছে রাজা গলা খাঁকরাতে শুরু করলেন।—বাইরের বড় দরজার নিচে দাঁড়িয়ে ছিলেন এমন সময় এক বালতি ঠাণ্ডা জল উপর থেকে তাঁর মাথার উপর কে ঢেলে দিল। সঙ্গে সঙ্গে তারস্বরে কে চিৎকার করে উঠল—"বলি মাঝ রাত্তিরে কোন্ আহাম্মক রাজার শাশুড়ীর দরজার কাছে দাঁড়িয়ে গলা খাঁকরাচ্ছে?"

রাজা কাঁপতে কাঁপতে বল্লেন, "আজ্ঞে আমি রাজা —শাশুড়ী ঠাকরুণের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।"

আবার সেই গলা শোনা গেল—"হ্যাঁ, রাজা মাঝ রাত্রে শাশুড়ীর সঙ্গে দেখা করতে এসেছে না আর কিছু। দরোয়ান ধর চোরটাকে।"

রাজা এবারে ভেউ ভেউ করে কেঁদে ফেল্লেন, বল্লেন, "শাশুড়ীকে একবার ডাক না।"

অল্পক্ষণ পর তাঁর শাশুড়ী উঁকি মেরে রাজাকে দেখতে লাগলেন। দরজার আড়াল থেকে বল্লেন, "কই, আমার জামাইয়ের মত গলার আওয়াজ কি না শুনি?"

রাজা ভাঙ্গা গলায় বল্লেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমিই বটে।"

শাশুড়ী বল্লেন, "আওয়াজটা তো পুরোপুরি বোকা পাঁঠার মত নয়—আচ্ছা, এবার ঝি গিয়ে তোমার চেহারার বর্ণনা দিক।"

ঝি বাইরে যেতে শাশুড়ী বল্লেন, "বল দিখিনি, লোকটার মাথাটা ডাবের মত কতটা? কদমছাঁট চুল আছে কি না।"

ঝি বল্ল, "সে কি, এর মাথাটা একেবারে কামানো যে! একেবারে—পাকা বেলের মত।"

শাশুড়ী বল্লেন, "তাহলে তো মিলছে না। এবার

কুষ্ঠ ও ধবল

১০ বৎসরের চিকিৎসাকেন্দ্রে হাওড়া কুষ্ঠ-কুটীর হইতে নব আবিষ্কৃত ঔষধ দ্বারা দুঃসাধ্য কুষ্ঠ ও ধবল রোগীও অল্প দিনে সম্পূর্ণ রোগমুক্ত হইতেছেন। উহা ছাড়া একজিমা, সোরাইসিস, দুষ্টক্ষতাদিসহ কঠিন কঠিন চর্ম্ম-রোগও এখানকার সুনিপুণ চিকিৎসায় আরোগ্য হয়। বিনামূল্যে ব্যবস্থা ও চিকিৎসা-পুস্তকের জন্য লিখুন।

পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্ম্মা কবিরাজ, পি, বি, নং ৭, হাওড়া

শাখা :—৩৬নং হারিসন রোড, কলিকাতা-৯

দি বেঙ্গল আর্ট প্রিণ্টারস

৭, ইণ্ডিয়ান মিরার ষ্ট্রীট,

কলিকাতা-১৩

দেখ পোশাক কি রকম। যাত্রা দলের রাজার মত কাপড় চোপড় পরা? দেখলেই চোখ ঝলসে যায়?"

ঝি খিল খিল করে হেসে বল্ল, "মা গো মা, একেবারে পথের ভিখিরির মত কাপড় চোপড়। আর গায়ে কি গন্ধ, বোধ হয় বছর খানেক স্নান করে নি।"

শাশুড়ী বল্লেন, "এ তো কিছুই মিলছে না। আচ্ছা, এবার শেষ চেষ্টা করা যাক। এই পুঁথিটা ওর হাতে বল দিয়ে ওটা জোরে পড়ে শোনাতে। ও যদি সত্যই আমার জামাই রাজা হয় তো সে পড়তে জানেই না, আকাঠ মূর্খ বোকা ও নির্বোধ, কাজেই এটাই হবে ওর আসল পরীক্ষা।

রাজামশাই দরজার আড়াল থেকে সব শুনতে পেলেন। হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন। পুঁথিটা তাঁর হাতে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি চিৎকার করে বলে উঠলেন —"আরে এ আবার কি? শাশুড়ী ঠাকরুণ তো জানেন যে আমি পড়তে জানি না। বোকা ও নির্বোধ লোক। ওই রাণী সব বলে দেয়।"

এবার দরজা খুলে ঢুকতে দিলেন শাশুড়ী। বল্লেন, বাবা, নিজের মুখে অতগুলো লোকের সামনে স্বীকার করলে যে তুমি বোকা ও নির্বোধ। তা এবার তোমার ওই আইন অনুসারে তোমাকে তো আর খেতে দিতে পারি না।"

রাজা বল্লেন, "এখন থেকে ও আইন আর চলবে না। যা খাবার আছে দেশে সকলে ভাগ করে খাবে। আর আসল দোষ হচ্ছে খাদ্যমন্ত্রীর—তার মাথাটা কালই কাটা যাবে।"

এরপর রাজা নিজের বাড়ি ফিরে গেলেন এবং ভাল করে গরম জলে স্নান করবার পর রাণীর হাতের তৈরি গোটা চল্লিশেক গরম গরম রসগোল্লা আর পান্তুয়া খেয়ে শান্ত হয়ে ঘুমোতে গেলেন। আর তার পরদিন খাদ্যমন্ত্রীর গর্দান যাবার পর রাজ্যের বাকি লোকেরাও শান্তিতে নিজেদের ঘরে ফিরে গেল ও রাজার রাজ্যের সকলে আবার আগের মত দুঃখে সুখে বাস করতে লাগল।

ত্রিপুরায় খাদ্যাভাব

সাপ্তাহিক "ত্রিপুরা" পত্রিকায় প্রকাশ :

ত্রিপুরা সরকারের খাদ্য ভাণ্ডার (সেন্ট্রাল গোডাউন) একদম ফাকা। প্রতি সপ্তাহে প্রায় বারশত মেট্রিক টন চাউল গম দরকার। রাজ্যের ষোল লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে চৌদ্দলক্ষ লোককে রেশনের আওতায় ন্যায্য মূল্যের চাউল গম (আটা) দিতে হইতেছে। চাউল এবং গম আমদানিতে টানাটানি চালতেছে। নিত্য ভিক্ষা তনু রক্ষার মত চাউল আসা মাত্র বিক্রয়কেন্দ্রে রেশন শপগুলিতে পাঠান হইতেছে না। কমপক্ষে দুই মাসের খাদ্য মজুদার তরে মজুত রাখিবার নিমিত্ত রাক্ষুসে ব্যাণ্ড গুদাম তৈয়ার হইয়াছিল। আপাত দৃষ্টিতে দেখা যায় এফ, সি, আই (ফুড কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া) মাল আমদানি করিতে গাফিলতি করিতেছে। আরও একটু তলাইয়া দেখিতে যাইয়া অবাক লাগে: কেন্দ্রীয় খাদ্য দপ্তর ত্রিপুরা রাজ্যের খরাজনিত পরিস্থিতিতে খাদ্য সংকটের যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করিতেছেন না বলিয়াই খাদ্য মঞ্জুর এবং প্রেরণের স্বল্পতা ত্রিপুরাতে খাদ্যের আয় ব্যয় শূন্য স্থিতির উদ্ভব ঘটিয়াছে।

এই পরিস্থিতির মূল বা উৎস পাইতে হইলে আরও সূক্ষ্ম তদন্ত বা অনুসন্ধান করিতে হয় এবং এ অনুসন্ধানে পাওয়া যাইবে যে, কেন্দ্রীয় খাদ্য দপ্তর বা এফ, সি, আই বস্তুতঃ দোষী বা দায়ী বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না; রাজ্য সরকারের খামখেয়ালীই এই পরিস্থিতির জন্য বহুলাংশে দায়ী। রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় খাদ্য দপ্তরকে ত্রিপুরার খাদ্য পরিস্থিতি অনুধাবন করাইতে যে ভাব প্রকাশ এবং ভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন, কেন্দ্রীয় সরকার ঐ ভাব ও ভাষা সম্যক অনুধাবন করিতে পারেন নাই। এক কথায় ভাব ও ভাষা না বুঝাটাই কংগ্রেস সরকারের শ্রেষ্ঠ গুণ(?)। কি কেন্দ্রে, কি রাজ্যে সর্বত্র কংগ্রেস সরকারের পিছু না লাগিয়া থাকিলে কোন কাজ হাসিল হয়না। আমরা যাহাকে বলি তদ্বির তদারকী, আমলারা উহাকেই বলেন পারস্যু। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসেনগুপ্ত (খাদ্য মন্ত্রীও বটেন) দিল্লী যাইয়া কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী সমীপে যাত্রাটিয়্যাল ঢংএ ত্রিপুরার ভয়াবহ খরা জনিত খাদ্য সংকটের উপর একটা লেকচার ঝাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী তাঁহার পিঠ চাপড়াইয়া বলিলেন "হোগা, সবকুছ মিল যায়গা"—অমনি আমাদের সুখুবাবু আনন্দে গদগদ ও আহ্লাদে আটখানা হইয়া প্রেসের নিকট বিবৃতি ছাড়িলেন—"হোগিয়া; মেরে আরজ মঞ্জুর হো গেই। ৪০ হাজার টন খানা মঞ্জুর।"—মন্ত্রী পর্যায়ে আরজী পেশ এবং মঞ্জুরটাই যে শেষ পর্ব নহে সে খবর রাখে কয়জন? যাঁহারা রাখেন তাঁহারা হইলেন আমলাবর্গ। কেন্দ্রে এবং রাজ্যে সর্বত্রই দেনাপাওনার চাবিকাঠি আমলাদের হাতে। ত্রিপুরার টাইম সার্ভার আমলাগণ খামখেয়ালীতে যতটা দক্ষ ও পারদর্শী, উহার একদশমাংশও যদি তাঁহারা তদ্বির তদারকিতে নিয়োগ করিতেন, তবে সুখুবাবুর সংসার সোনার সংসারই হইত; এক বছরের খরাতেই "সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল" হইত না; বাড়তি খাদ্য মঞ্জুরের জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে আজ আবার দৌড়াইতেও হইত না।

এখানে উল্লেখ আবশ্যক সেনগুপ্ত সরকার গদীতে বসার পর কেন্দ্রীয় খাদ্য দপ্তরের নিকট খাদ্য সম্পর্কে কোন দাবী রাখেন নাই। জুলাই-আগষ্ট মাসে যখন খরার রুদ্র মূর্তি আবির্ভূত হয় তখন মুখ্যমন্ত্রী সেনগুপ্ত দিল্লী যাইয়া ৫০ পঞ্চাশ হাজার টন খাদ্যের দাবী

জানান। মঞ্জুর হয় ৪০ চল্লিশ হাজার টন। এই চালও ঠিকমত আসে না। কেন্দ্রীয় খাদ্যভাণ্ডার হইতে প্রতি মাসে মাত্র ২ দুই হাজার টন খাদ্য দেওয়া হইতেছে। প্রয়োজন যেখানে প্রায় ৫ পাঁচ হাজার টন, সেখানে দুই হাজার টন আসিলে গুদাম ফাঁকা হওয়াই ত স্বাভাবিক। এই স্বাভাবিকতা আসিয়াছে অনেক আগেই। এখন একেবারে বেসামাল পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়াতেই মুখ্যমন্ত্রী গত ২৫শে ফেব্রুয়ারী দিল্লীর দরবারে ছুটিয়াছেন। মার্চের মধ্যে ১৫ হাজার টন খাদ্য চাই-ই চাই।

বেকার সমস্যা

শ্রীহরিপদ মজুমদার ভগবতী কমিটির সুপারিশের ফলাফল সম্পর্কে "যুগবাণী" সাপ্তাহিকে যাহা লিখিয়াছেন তাহা হইতে মূল বিবরণগুলি আমরা পুনঃ-মুদ্রিত করিতেছি :

গত ১৯৭০ সালের ১৯শে ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় সরকার ভারতবর্ষের বেকারসমস্যা ও তা নিরসনের বিষয়ে অনুসন্ধান এবং কর্মসংস্থান বিষয়ে কি করা যায় তা তদন্ত করার জন্য শ্রী বি ভগবতীকে চেয়ারম্যান করে এক কমিটি গঠন করেন। উক্ত কমিটি ১৯৭২ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে তাঁদের সুচিন্তিত মাধ্যমিক রিপোর্ট দাখিল করেছেন।

উক্ত প্রতিবেদনের ৪ পৃঃ উল্লেখ করা হয়েছে যে ১৯৭১ সালের জুন পর্যন্ত যে হিসেব পাওয়া গেছে, তাতে দেখা যায় মোট চাকুরীপ্রার্থীর সংখ্যা ৪৪·৯৫ লক্ষ। তার মধ্যে ২০·৫৩ লক্ষ শিক্ষিত বেকার, অর্থাৎ ম্যাট্রিক বা তদূর্ধ্ব পাশ করা। এর মধ্যে ৬৫ হাজার ডিগ্রী বা ডিপ্লোমাধারী। বেকারত্বের এই ভয়াবহ অবস্থা বিবেচনা করে ভগবতী কমিটি দ্রুত কার্যকর করার জন্য কয়েকটি সুপারিশ করেন। অবস্থার গুরুত্ব বিবেচনা করে কমিটি চতুর্থ পরিকল্পনায় বরাদ্দকৃত অর্থের বাইরে আরও অর্থ বিনিয়োগ করে নিম্নলিখিত কর্মসূচীগুলি সম্প্রসারণের কথা উল্লেখ করেন।

(১) ক্ষুদ্র সেচ পরিকল্পনা (২) গ্রামীণ বৈদ্যুতিকী-করণ (৩) রাস্তাঘাট নির্মাণ ও নৌ-পরিবহনের সম্প্রসারণ (৪) গ্রামাঞ্চলে গৃহনির্মাণ পরিকল্পনা (৫) গ্রামাঞ্চলে পানীয় জল সরবরাহ (৬) শিক্ষা।

(ক) এ ছাড়া কমিটি আরও বলেন বর্তমান শিল্প ইউনিটগুলির পূর্ণশক্তি ব্যবহারের ব্যবস্থা করা এবং বন্ধ কলকারখানাগুলো খোলার ব্যবস্থা করা।

(খ) শিক্ষিত বেকারদের জন্য নতুন নতুন প্রকল্প চালু করা।

ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প

চতুর্থ পরিকল্পনায় ক্ষুদ্র সেচ পরিকল্পনায় যে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে তার উপর আরও অতিরিক্ত ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করার জন্য এই কমিটি সুপারিশ করেছেন। এই ১০০ কোটি টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দের ফলে অতিরিক্ত ৪ লক্ষ অদক্ষ শ্রমিক এবং ৫০,০০০ দক্ষ শ্রমিকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হতে পারে বলে কমিটি অনুমান করেন। চতুর্থ পরিকল্পনায় এই খাতে ৬৭৫ কোটি টাকা এবং এই অতিরিক্ত ১০০ কোটি টাকা দিয়ে শুধু ক্ষুদ্র সেচ কর্মসূচীতেই চতুর্থ পরিকল্পনার শেষ দু বছরে ২৩ লক্ষ অদক্ষ এবং ৪-৫ লক্ষ দক্ষ শ্রমিককে কাজ দেওয়া সম্ভব বলে তাঁরা মনে করেন।

গৃহ নির্মাণ

গ্রাম পুনর্গঠনের ব্যাপারে গৃহ নির্মাণ প্রকল্পের গুরুত্ব অপরিসীম। ভারতবর্ষে শতকরা ৮০ জনই গ্রামে বাস করে। মোটামুটি গ্রামাঞ্চলে ৫ ভাগের ৪ ভাগ লোকই গ্রামে কাঁচা ঘরে বাস করে। খুব জোর শতকরা ২ জনের পাকা বাড়ী আছে। চতুর্থ পরিকল্পনার বিশেষজ্ঞরা গ্রামাঞ্চলে ৭·১৮ কোটি পাকাবাড়ীর প্রয়োজন বলে হিসেব করেছিলেন ১৯৬৭-৬৮ সালে মাত্র ২·৬ লক্ষ নতুন পাকাবাড়ী তৈরী হয়েছে। চতুর্থ পরিকল্পনায় ২৩৭ কোটি টাকা সরকারী উদযোগে বাড়ী নির্মাণের জন্য বরাদ্দ করা হয়। এছাড়া বেসরকারী উদযোগ ধরে মোট ২·৮ লক্ষ বাড়ী নির্মাণ করার কার্যসূচী গৃহীত হয়। অপর দিকে জনসংখ্যার বৃদ্ধি হেতু (বছরে ১·৩৭ কোটি) বছরে মোট ২০ লক্ষ নতুন বাড়ীর প্রয়োজন। তার মধ্যে

গ্রামাঞ্চলে ২২ লক্ষ এবং শহরাঞ্চলে ৫ লক্ষ। এ প্রসঙ্গে বিভিন্ন দেশের গৃহ নির্মাণের হারও তাঁরা উল্লেখ করেন। প্রতি বছর প্রতি ১০০ জনের জন্য জাপানে তৈরী হয় ৭·২টি, হংকং-এ ৬·৮টি, ফ্রান্সে ৭·৩, ডেনমার্কে ৭·৬টি, যুক্তরাষ্ট্রে ৬·৫টি. পশ্চিম জার্মানীতে ১০·২টি এবং সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে ১০·৩টি। আর ভারতবর্ষে প্রতি হাজার জনে ২টি বাড়ী নির্মাণের লক্ষ্যেও পৌছান যাচ্ছে না। গৃহ নির্মাণের এই দুরবস্থা দূর করার জন্য ভগবতী কমিটি ১৯৭২-৭৩ সালের জন্য প্রতি হাজারে ০·৮ ইউনিট অর্থাৎ ৫·৬ লক্ষ নতুন বাড়ী তৈরী করা এবং ১৯৭৩-৭৪ সালের জন্য প্রতি হাজারে ০·৯ ইউনিট অর্থাৎ ৪·১ লক্ষ বাড়ী তৈরীর লক্ষ্য নির্ধারণ করেন।

এই হিসেবে প্রতি বাড়ীর জন্য ৩০০০ টাকা ধরে চতুর্থ পরিকল্পনার শেষ দু বছরে মোট ২০১ কোটি টাকার প্রয়োজন হবে।

এই গৃহ নির্মাণ প্রকল্পে শেষ দু বছরে ৭২ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান হবে বলে তাঁরা মনে করেন।

পানীয় জল সরবরাহ

সারা ভারতে এখন ১·৫ লক্ষ গ্রামে পানীয় জলের সুব্যবস্থা নেই। প্রায় ১০ কোটি লোক সু-পানীয় জল থেকে বঞ্চিত। চতুর্থ পরিকল্পনার বরাদ্দের বাইরে ৬১·৫৫ কোটি টাকা খরচ করে অতিরিক্ত ২১,০০০ গ্রামে পানীয় জলের ব্যবস্থা করার সুপারিশ করা হয়েছে। তাতে দক্ষ, অদক্ষ ইঞ্জিনীয়ার ইত্যাদি দিয়ে মোট ২৫,৪৯৮ জন লোকের কর্মসংস্থান সম্ভব হবে।

গ্রামীণ বৈদ্যুতিকীকরণ প্রকল্প

চতুর্থ পরিকল্পনায় ১৫ লক্ষ পাম্প/টিউবওয়েল এবং ৫০ হাজার গ্রামে বিদ্যুত সরবরাহ করার লক্ষ্য নির্দিষ্ট করা হয়েছিল। পরিকল্পনার প্রথম ৩ বছরেই তা পূর্ণ হয়ে গেছে। সুতরাং উক্ত লক্ষ্যের উপর আরও অতিরিক্ত ৩৭,০০০ গ্রামে বিদ্যুত সম্প্রসারণ করা এবং ৩ লক্ষ পাম্প সেট-টিউবওয়েল স্থাপন করা সম্ভব। এই জন্য অতিরিক্ত ব্যয় হবে ২৩৫ কোটি টাকা। এতেও বহু লোকের কর্মসংস্থান হবে, কিন্তু তার সংখ্যা কত তা উল্লেখ করেননি।

রাস্তাঘাট নির্মাণ

রাস্তাঘাট তৈরীর জন্য চতুর্থ পরিকল্পনায় মোট ৮৭১ কোটি টাকা ধরা হয়েছে। এই টাকার মধ্যে গ্রামাঞ্চলের রাস্তা নির্মাণের জন্য ১১২ কোটি টাকা ধার্য করা আছে। এছাড়া গ্রামের বাজারের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের জন্য ২৫ কোটি, কৃষিমন্ত্রকের হাতে ৫ কোটি এবং ৮ কোটি টাকা হরিয়ানা ও পাঞ্জাবের জন্য ধার্য করা হয়েছে। অর্থাৎ মোট গ্রামাঞ্চলে রাস্তাঘাট নির্মাণকল্পে ধার্য করা হয়েছে ১৫৫ কোটি টাকা। কিন্তু চতুর্থ পরিকল্পনার যে মধ্যমূবর্তী প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে, তাতে দেখা যায় পরিকল্পনার প্রথম তিন বছরে মাত্র ৩৯৪ কোটি টাকা খরচ হয়েছে, বাকী রয়েছে ৪৭৭ কোটি টাকা। এই বাকী টাকা চতুর্থ পরিকল্পনার শেষ দু বছরে ব্যয় করতে হবে। বাকী দু বছরে ৪৭৭ কোটি টাকা কাজে লাগান যাবে কি না সন্দেহ।

কমিটি মনে করেন রাস্তাঘাট নির্মাণে ১ কোটি টাকা ব্যয় করলে গড়ে সারা বছর ৫,৪৮৩ জন লোককে কাজ দেওয়া যেতে পারে। এই হিসেবে চতুর্থ পরিকল্পনার শেষ দু বছরে রাস্তাঘাট তৈরীতে ৮·৫ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান সম্ভব হবে বলে তাঁরা মন্তব্য করেন। এছাড়া নৌ-পরিবহন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ করেও বহু লোকের কর্মসংস্থান সম্ভব।

শিক্ষা

সারা ভারতে মোট ৪০·৯৫ লক্ষ চাকুরী প্রার্থীর মধ্যে ম্যাট্রিক পাশ হচ্ছে ১১·৯১ লক্ষ, আণ্ডার গ্র্যাজুয়েট ৫০·৯ লক্ষ, গ্র্যাজুয়েট ও উচ্চ শিক্ষিত ৩·৩৩ লক্ষ=মোট শিক্ষিত বেকার ২০·৫৩ লক্ষ।

ভগবতী কমিটি প্রাথমিক শিক্ষা সম্প্রসারণের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁদের মতে শিক্ষিত বেকারদের বেশী সংখ্যায় একমাত্র শিক্ষাক্ষেত্রেই নিয়োগ করা যেতে পারে। চতুর্থ পরিকল্পনার শেষ দু বছরে ১৩০ কোটি টাকা ব্যয় করে মোট ২·২৫ লক্ষ শিক্ষিত

বেকারদের কাজ দেওয়া যেতে পারে। এ ছাড়া ২০০০ পরিদর্শকেরও কর্ম্মসংস্থান হবে।

পার্ল বাক

ইউ এস আই এস কর্ত্তৃক প্রচারিত সংবাদ হইতে আমরা পরলোকগতা পার্ল এস বাকের নিম্নের সংক্ষিপ্ত জীবনীটি উদ্ধৃত করিতেছি :

একই সঙ্গে দুটি সংস্কৃতির চর্চা করা ও উপলব্ধি করা অপরিসীম শক্তিধরের কাজ। নোবেল পুরস্কারবিজয়ী অপ্রতিদ্বন্দ্বী মার্কিন লেখিকা পার্ল এস বাক সেই দুর্লভ ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। পরিণত বয়সে মৃত্যু হলেও তাঁর শূন্যস্থান পূর্ণ হবে না।

"মাই সেভারেল ওয়ার্লডস্" নামে আত্মজীবনী গ্রন্থটিতে পার্ল বাক লিখেছেন, সকালে তিনি তাঁর মার্কিন মায়ের কাছে লেখাপড়া শিখতেন, আর বিকালে পাঠ নিতেন একজন চীনা শিক্ষকের কাছে। কাজেই তাঁর মানসিক কেন্দ্রবিন্দুটি দুভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছিল। তিনি বলেছেন, তাঁর এই দুটি মনের দৃষ্টি দুটি দেশের দিকে প্রসারিত—একটি আমেরিকার দিকে, অন্যটি চীনের দিকে।

পার্ল বাকের আসল নাম পার্ল কমফর্ট সাইডেনস্ট্রিকার। ১৮৯২ সালের ২৬শে জুন পশ্চিম ভার্জিনিয়ার হিল্সবোরোতে তাঁর জন্ম হয়েছিল। তাঁর মাতাপিতা ছিলেন চীনে। সেখানে তাঁরা প্রেসবিটারিয়ান ধর্ম সম্প্রদায়ের মিশনারী ছিলেন। ছুটিতে তাঁরা হিল্সবোরোতে স্বগ্রামে ফিরে এলেন। সেই সময় জন্ম নিল পার্ল। পার্ল-এর বয়স যখন পাঁচ মাস তাঁরা আবার ফিরে গেলেন চীন। পার্ল বড় হয়ে উঠতে লাগল ইয়াংসি নদীর তীরে চিংকিয়াং-এ। তাঁদের পরিবারটি চীনা সম্প্রদায়ের মধ্যে বসবাস করতে লাগল। পার্ল ইংরেজী বলতে শেখার আগেই চীনা ভাষা বলতে শিখল। সে চীনা ছেলেমেয়েদের সঙ্গে খেলাধূলা করতে লাগল, তাদের পরিবারে যাতায়াত করতে লাগল। ফলে সে চীনাদের রীতিনীতি, আচার-আচরণ ভালভাবেই শিখল। পার্ল বাক লিখেছেন, তিনি যে চীনাদের থেকে পৃথক কোন জাতিভুক্ত একথা তিনি ভাবতেই পারতেন না।

তাঁর পড়াশোনা শুরু হল সাংহাই-এর একটি স্কুলে। পরে তিনি আমেরিকায় ফিরে এসে ভার্জিনিয়ায় র‍্যাণ্ডলফ ম্যাকন কলেজে ভর্তি হলেন। ১৯১৪ সালে স্নাতক হলেন এবং দুটি সাহিত্য পুরস্কার পেলেন। শিক্ষা অন্তে কিছুদিন তিনি একটি কলেজে মনস্তত্ত্ব অধ্যাপনা করলেন। এই সময়ে মায়ের অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে তিনি চীনে ফিরে গেলেন। চীনে এসে তিনি আবার শিক্ষকতা শুরু করলেন।

কর্ম্মজীবনের প্রথম দিকেই পার্ল বাক "আটলাণ্টিক মান্থলী," "ফোরাম ম্যাগাজিন" প্রভৃতি পত্রিকার জন্য লিখেছিলেন। ১৯২৬ সালে "এশিয়া ম্যাগাজিন" পত্রিকায় তাঁর প্রথম গল্পটি প্রকাশিত হয়। গল্পটির নাম "এ চাইনীজ উওম্যান স্পীক্স"। এছাড়া "দি চাইনীজ চিলড্রেন নেক্সট ডোর", "দি ওয়াটার বাফেলো চিলড্রেন," "দি ড্রাগন ফিশ" এবং "ওয়ান ব্রাইট ডে" প্রভৃতি পুস্তকে চীনে তাঁর মাতাপিতার সঙ্গে তাঁর নিশ্চিন্ত আরামের ও সুখের দিনগুলির প্রতিচ্ছবি দেখতে পাওয়া যায়।

১৯১৭ সালে ডঃ জন লসিং বাক-এর সঙ্গে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হওয়ার পর পার্ল সাইডেনস্ট্রিকার হলেন পার্ল বাক। নববিবাহিত দম্পতি চলে গেলেন উত্তর চীনে। এখানকার জীবন সম্পূর্ণ পৃথক। পরবর্তী কালে এই অঞ্চলের কথা পার্ল বাক লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁর সর্বকালের ক্লাসিক "দি গুড আর্থ" উপন্যাসে। পরে বাক দম্পতি তাঁদের কন্যাকে নিয়ে এক বছরের জন্য আমেরিকায় আসেন। শ্রীমতী বাক ইংরেজীতে এম এ ডিগ্রীর জন্য পড়াশোনা শুরু করেন এবং ১৯২৩ সালে এই ডিগ্রী অর্জন করেন। এই সঙ্গে তিনি "চীন ও পাশ্চাত্য" প্রবন্ধের জন্য ইতিহাসে সেরা মেডেলের পুরস্কারও লাভ করেন।

এই সময় থেকে শ্রীমতী বাক প্রচুর লিখতে থাকেন। একে একে তাঁর ইস্ট উইণ্ড ওয়েস্ট উইণ্ড; "দি এক্সাইল"

(তাঁর মায়ের জীবনী), "দি গুড আর্থ," "এ হাউস ডিভাইডেড", "সন্‌স," "দি মাদার," "ফাইটিং এঞ্জেল" (তাঁর পিতার জীবনী) গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হয়। ক্লাসিক চীনা উপন্যাস "শুই হু চুয়ান"-এর ইংরেজী অনুবাদও তিনি প্রকাশ করেছিলেন "অল মেন আর ব্রাদার্স" নাম দিয়ে।

পার্ল বাক ১৯৩৮ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। নোবেল কমিটি তাঁর উপন্যাস সম্পর্কে লিখেছিলেন, "চীনা কৃষক জীবনের যথাযথ রূপায়ণে তাঁর উপন্যাসগুলি অনবদ্য।"

জনপ্রিয় উপন্যাসগুলি ছাড়া পার্ল বাক অসংখ্য ছোটগল্প, শিশুপাঠ্য পুস্তক, ও প্রবন্ধাদি লিখেছেন। তাঁর অনেক গল্পেরই উৎস চীনা জনসাধারণের প্রতি তাঁর গভীর আগ্রহ। চীন তাঁর কাছে স্বদেশের মত হয়ে গিয়েছিল।

শ্রীমতী বাক ছিলেন 'ইস্ট-ওয়েস্ট অ্যাসোসিয়েশনে'র যুগ্ম প্রতিষ্ঠাতা। কয়েক বছর পর্যন্ত তিনি "এশিয়া ম্যাগাজিনের" যুগ্ম প্রকাশক ছিলেন।

১৯৪৯ সালে তিনি প্রতিষ্ঠা করলেন 'ওয়েলকাম হাউস'। মার্কিন ও এশীয় পিতামাতা-জাত সন্তানদের লালন পালনের জন্য এই প্রতিষ্ঠানটি গঠন করা হয়েছিল। শ্রীমতী বাক নিজেই পাঁচটি ছেলেমেয়ে দত্তক নিয়েছিলেন "দি চাইল্ড হু নেভার গ্রু" তাঁর নিজের কন্যারই কাহিনী।

শ্রীমতী বাক ১৯৫১ সালে আমেরিকান অ্যাকাডেমী অব আর্টস এণ্ড লেটার্স সংস্থার সদস্য নির্বাচিতা হন। তিনি পুলিৎজার পুরস্কারও লাভ করেছেন। ইয়েল, হাওয়ার্ড, লিঙ্কন, পশ্চিম ভার্জিনিয়া প্রভৃতি অনেকগুলি বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই তিনি অনারারী ডিগ্রী পেয়েছিলেন।

প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের মধ্যে সম্পর্কের উন্নতির জন্য তিনি বই লিখেছেন, প্রবন্ধ লিখেছেন, বক্তৃতা দিয়েছেন, ব্যাপকভাবে ভ্রমণ করেছেন।

১৯৬২ সালে ভারত পরিদর্শনকালে চীন-ভারত সম্পর্ক বিষয়ে তাঁর অভিমত ও তত্ত্ব ব্যাপক প্রচার লাভ করেছিল।

দেশ-বিদেশের কথা

ত্রিপুরার হাসপাতালের একটি ঘটনা

কিছুকাল পূর্বে "ত্রিপুরা" সাপ্তাহিকে একটি সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল যাহার মধ্যে সত্যজন জ্ঞাতব্য কথা কিছু ছিল। আমরা সেই সংবাদটি উক্ত পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

১১ই জানুয়ারী রাত্রে শ্রীমতী মঞ্জু সাহা ভি, এম, হাসপাতালে বিনা চিকিৎসায় মারা যায়। কর্তব্যরত ডাক্তারগণ নিজেদের দোষ চাপা দিবার জন্য তিন জন নার্সকে সসপেণ্ড করান। সুরু হয় নার্স আন্দোলন এবং মৃত্যুর জন্য দায়ী ডাক্তারদের আচরণ হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গার মত সর্ব সাধারণে প্রকাশ হইয়া পড়ে। স্বাস্থ্য অধিকার প্রমাদ গণিল। নার্সদের বক্তব্য না শুনিয়া, ডাক্তারদের কথায় অতি বিশ্বাস করিয়া যে ভুল করা হইয়াছে সেই ভুল যে ভণ্ডুল সৃষ্টি করিবে তাহা কেহই ভাবে নাই। স্বাস্থ্য অধিকার ত নয়ই, আই, এম, এ (ইণ্ডিয়ান মেডিকেল এ্যাসসিয়্যাশন সদস্য) ডাক্তারগণও নার্সদের সসপেণ্ডের ব্যাপারে বিন্দুমাত্র মাথা ঘামায় নাই। ডাক্তারে ডাক্তারে ধুস পরিমাণ বলিয়া একটা প্রবাদও যে আছে। নার্সদের বিক্ষোভ আন্দোলন যখন ভণ্ডুলের পর্য্যায়ে পৌছে, তখন ডাক্তার বাবুদের টনক নড়ে। গত ৩রা ফেব্রুয়ারী আই, এম, এ, ত্রিপুরা শাখার এক সভায় মৃতার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া এক প্রস্তাবে বলা হয় মৃত্যু সম্পর্কে উপযুক্ত তদন্ত ব্যতিরেকে তাড়াহুড়া ব্যবস্থা গ্রহণ করা ঠিক নহে। আই, এম, এ' এর তরফ

হইতে ইতিমধ্যে ঐ মৃত্যু সম্পর্কে তথ্যাদি সংগৃহীত হইয়াছে।

অতঃপর স্বাস্থ্য অধিকারের পক্ষে দিশেহারা হওয়াটাই বোধ হয় স্বাভাবিক। এই স্বাভাবিকতাটা ধরা পড়ে মুখ্যমন্ত্রীর নিকট। অতএব মুখ্যমন্ত্রীকেই চূড়ান্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হয়। ৫ই ফেব্রুয়ারী সকাল বেলা ৯টায় হঠাৎ মুখ্যমন্ত্রীর গাড়ীখানা ভি, এম, হাসপাতালে প্রবেশ করিল। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসেনগুপ্ত অতি দ্রুতবেগে প্রসূতি বিভাগ ও শিশু সদনটির নারকীয় কদর্য্য রূপ পরিদর্শন করিলেন। কর্তব্যরত নার্স ডাক্তারদের কোন কিছু না বলিবার সংকল্প লইয়া আসিলেও শেষ পর্য্যন্ত সংকল্প ত্যাগ করিয়া বেশ কয়েকটি কথা বলিতে হইল। তারপর......... সারাদিন মুখ্যমন্ত্রীর কক্ষে দরবারের আর শেষ হয় না। গভীর রাত্রে দরবারের হাত এবং সঙ্গে সঙ্গেই ডাঃ এম, এল, সাহার চাকুরী খতম এবং ডাঃ মনোজ চক্রবর্ত্তী ও ডাঃ শ্রীমতী শক্তি দাসগুপ্ত সসপেণ্ড।

আই, এম, এ গরম—নার্স বরখাস্তের ব্যাপারে যে ডাক্তারগণের ঘুম ভাঙ্গিতে তিন সপ্তাহাধিক কাল সময় লাগিয়াছিল, ডাক্তার বরখাস্তের পর কিন্তু তর সয় নাই এক দিনও। গতকাল তাহারা সভা করিয়াছে এবং মুখ্যমন্ত্রীকে চরম পত্র প্রদান করিয়া ৫ দিনের মধ্যে ডাক্তারদের উপর আদেশ প্রত্যাহারের দাবী জানাইয়াছে।

দেশের কথা

পশ্চিমবঙ্গের জনগণের মধ্যে বহুলোকের উপযুক্ত বাসস্থান নাই। তাঁহাদের জন্য গৃহনির্ম্মাণ করা আবশ্যক। যদি সকলের জন্য বাসের সুব্যবস্থা করিতে হয় তাহা হইলে গৃহের সংখ্যা দাঁড়াইবে পঞ্চাশ লক্ষের কাছাকাছি। সরকারী গৃহনির্ম্মাণ ক্ষমতা যাহা তাহাতে প্রয়োজনের শতকরা একের এক দশমাংশও নির্ম্মিত হইবে বলিয়া মনে হয়না। শতকরা একের এক দশমাংশ হইল পাঁচ হাজার। গত বৎসর দশ হাজার গ্রামে বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ করা হইবে বলা হইয়াছিল। বস্তুতঃ সরবরাহ করা হইয়াছিল ২২৮০টি গ্রামে। সকল বালক বালিকাকে বাধ্যতামূলকভাবে শিক্ষা দিতে হইলে ৩৬০০০ হাজারটি নূতন প্রাথমিক শিক্ষায়তন স্থাপন করা আবশ্যক। তাহা করা হইলে লক্ষাধিক শিক্ষক নিয়োগ করিতে হইবে। কিন্তু, ৩৬০০০ হাজারের পরিবর্ত্তে হয়ত ১০০০ হাজার শিক্ষায়তন স্থাপিত হইবে এবং নূতন নিযুক্ত শিক্ষকদিগের সংখ্যা হইবে ৩০০০। পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ১০০০০ হাজার গ্রামে শুদ্ধ পানীয় জল পাওয়া যায় না। এইরূপ অবস্থাতেও আমরা উন্নতির পথে দ্রুত অগ্রসর হইতেছি বলিতে আমাদের লজ্জা হয় না। উন্নতি কাহাকে বলে? মানুষ যদি বেকার অথবা অর্দ্ধ বেকার হয়, তাহাদের যদি বাসগৃহ না থাকে শিক্ষার ব্যবস্থা না থাকে, বাসগৃহের অভাবে তাহারা যদি যত্রতত্র যেন তেন প্রকারে দিন কাটাইতে বাধ্য হয়, এমন কি তাহাদের পানীয় জলেরও ব্যবস্থা যদি না করা হইয়া থাকে; তাহা হইলে তাহারা প্রগতিশীল ও সমাজবাদী বলিয়া যদি নিজেদের বিশ্বের সম্মুখে উপস্থিত করে তাহাতে কাহার কি লাভ হয়? ১৯৭২ খৃঃ অব্দে পশ্চিমবঙ্গে ১১ লক্ষ পনের হাজার দরখাস্তকারী বেকার ছিলেন। ১৯৭১ খৃঃ অব্দে শিক্ষিত বেকারদিগের সংখ্যা ছিল ৩,৭০,৫৪৭। ইহার মধ্যে ১০৯০৫৪ ব্যক্তি কলেজে ভর্ত্তি হইবার মত শিক্ষিত ছিলেন। ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ ছিলেন ২০২৪ জন বেকার। বি, এ, পাশ ছিলেন ৯৪৪৪২।

কংগ্রেসের অক্ষমতা

সোসিয়ালিষ্ট দলের জাতীয় সমাবেশে (ফেব্রুয়ারী ১৬-১৮, ১৯৭১) একটি প্রস্তাব উত্থাপিত হয় যাহার দ্বারা কংগ্রেসের অক্ষমতার কথা আরও বিশেষ করিয়া দেশবাসীকে দেখান হইয়াছে। কংগ্রেস ২৫ বৎসর কাল ধরিয়া ভারতবর্ষকে যেমন ইচ্ছা তেমনই করিয়া গঠিত করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন কিন্তু নিজেদের অক্ষমতার জন্যই তাঁহারা দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা, অর্থনৈতিক অসাম্য, বেকার সমস্যা, উচ্চমূল্য ও আরও অনেক অভাব অভিযোগ মিটাইতে সক্ষম হয়েন নাই। যে সকল বস্তুর অনেক প্রয়োজন তাহার উৎপাদনে ঘাটতি, কালো

বাজার ও অতিরিক্ত লাভের চেষ্টা ইত্যাদি বিভিন্ন অর্থনৈতিক রোগের ফলে "গরিবী হাটাও" একটা ফাঁকা আওয়াজে দাঁড়াইয়াছে।

পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা

সরকারীভাবে প্রকাশিত খবরের হিসাবে দেখা যায় যে ভারতবর্ষের শতকরা চল্লিশজন অধিবাসী দারিদ্র্যের চরম সীমারও নিচে জীবন নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। ইহাও সম্ভবতঃ ভারতের দুরবস্থার পূর্ণ বিবরণ নহে। কারণ দেখা যায় যে ১৯৬১ খৃঃ অব্দের পরে দশ বৎসরে ভারতের গ্রামের জনগণের ভিতরে যাহাদের কোনও জমি নাই তাহাদের সংখ্যা শতকরা পঞ্চাশ জন করিয়া বাড়িত হইয়াছে। যাহারা কর্ম্মক্ষম তাহাদিগের মধ্যে বেকারের সংখ্যা এতই অধিক যে গণনা করা সহজ নহে। ইহার সহিতই দেখা যায় যে ব্যবসাদারগণ সাদা ও কালো বাজারে শত শত কোটি টাকা লাভ করিয়া চলিয়াছেন। যে সকল ব্যবসায়ীর নাম করা হইয়াছে যে তাঁহারা লাভের কারবারে একাধিপত্য সৃষ্টি করিয়া ভারতবাসীর অর্থনৈতিক সাম্যবাদের ক্ষেত্রে একটা ব্যাধির মত হইয়া দাঁড়াইয়াছেন; সেই সকল ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর বাহিরেও এখন অপরাপর একাধিকারীর আবির্ভাব হইতেছে এবং দারিদ্র্যের সংখ্যাবৃদ্ধির সহিতই ঐশ্বর্য্যশালীদিগের সংখ্যা বাড়িয়া চলিয়াছে। গভর্ণমেন্টের যে সকল শুভ উদ্দেশ্য আছে তাহা সাধারণতঃ বলিতে গেলে শুধু কথাতেই থাকিয়া যাইতেছে কার্য্যতঃ কালো বাজারের টাকা কিম্বা অসৎ উপায়ে লাভ করিবার পন্থা কোনও কিছুরই দমন ব্যবস্থা করিতে গভর্ণমেন্ট সক্ষম হইতেছেন না। গভর্ণমেন্টের আয় অপেক্ষা ব্যয় অধিক হওয়াতে যে সকল উপায় অবলম্বনে টাকার ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে তাহা হইল মূল্য বৃদ্ধির প্রধান কারণ। ইহার মধ্যে জনসাধারণের সঞ্চয়ের টাকা ঋণ হিসাবে না পাওয়ায় ঋণের টাকা সৃষ্টি করিবার ফলে মুদ্রাস্ফীতি ক্রমশঃই বাড়িয়া চলিতেছে। সঞ্চয় ক্রমশঃ আরও কমিয়া চলিয়াছে। কারণ রাজস্ব আদায়ে অন্যায় শোষণনীতির অনুসরণ এবং সকল বস্তুর মূল্যবৃদ্ধি। গভর্ণমেণ্ট এখন ব্যক্তিগত মূলধনের সাহায্যে ও সরকারী সহযোগিতায় নূতন নূতন কারবার প্রারম্ভের চেষ্টা করিতেছেন। ইহা যে সহজে সর্ব্বজন আদৃত হইয়া ব্যবসার বাজারে গৃহীত হইবে, এরূপ মনে হয় না। বাজারে সরকারী কর্ম্মশক্তির উপর বিশ্বাস ক্রমশঃ নিস্তেজ হইয়া লোপ পাইতে বসিয়াছে।

সোসিয়ালিষ্ট দলের বিশ্বাস

সোসিয়ালিষ্ট দলের দৃঢ় বিশ্বাস যে কংগ্রেস জাতীয়করণ বলিয়া যেভাবে নানান ব্যবসা বাণিজ্য আমলাদিগের কবলে আনিয়া ফেলিতেছেন তাহাতে জাতীয় অর্থনীতির কোনও উন্নতি ত হইতেছেই না; হইতেছে আমলাদিগের শক্তি বৃদ্ধি, সরকারী মূলধনবাদের প্রতিষ্ঠা, অকর্ম্মণ্যতা ও দুর্নীতির অবাধ প্রসার। গভর্ণমেন্টের সম্বন্ধে জনসাধারণের যে ধারণা তাহা ক্রমশঃ খারাপ হইতে আরও খারাপ হইয়া দাঁড়াইতেছে। সোসিয়ালিষ্টদিগের মতে সরকারী কাজ কারবার সম্পূর্ণরূপে জাতীয় ও জাতির অর্থনৈতিক উন্নতি সমর্থক হওয়া উচিত। তাহাতে যে সকল দুর্নীতি ও অমঙ্গলকর বিষয় এখন বর্ত্তমান থাকিতে দেখা যাইতেছে সেই সকলের অপসারণ আবশ্যক। জাতীয় প্রতিষ্ঠানের যে সকল গুণ থাকা উচিত ভারতবর্ষের জাতীয় কারবারগুলিতে সে সকল গুণ অবর্ত্তমান থাকায় কর্ম্মী, ক্রেতা প্রভৃতিদের কোনও সুবিধা হয় না। আমাদের যে অর্থনীতি বর্ত্তমানে প্রতিষ্ঠিত আছে শুধ তাহাকে চুরমার করিয়া দিলেই জাতীয় অর্থনীতির গঠনকার্য্য সুসম্পন্ন হইয়া যাইবে না। আমাদের জাতীয় কর্ম্মকৌশল ও শ্রমশক্তিকে সুসংযতভাবে ব্যবহার করিয়া এমন একটা বাস্তবরূপ দিতে হইবে যাহাতে ৫০।৬০ কোটি মানুষ যথাযথভাবে খাইয়া পাইয়া সুগঠিত গৃহে বাস করিয়া জীবন নির্ব্বাহ করিতে পারে; এবং যাহাতে সকল বালক বালিকার শিক্ষালাভ, সকল রুগীর চিকিৎসা ও সকল ব্যক্তির সম্পদ ও আত্মরক্ষা কার্য্য উপযুক্তরূপে সাধিত হওয়া সম্ভব হয়।

সাময়িকী

রামমোহনের ধর্মচিন্তা

তত্ত্বকৌমুদী পত্রিকায় শ্রী অম্বুজ বসু উপরোক্ত বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। রাজা রামমোহন রায়ের ধর্মচিন্তা সম্বন্ধে অনেকের অনেক প্রকার ধারণা আছে। হিন্দু শাস্ত্র, ইসলাম বা খৃষ্টধর্ম সম্বন্ধে রাজা রামমোহনের মতামত লইয়া বহু আলোচনা তাঁহার দ্বিশত বার্ষিকী জন্ম বৎসরে নানান পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীঅম্বুজ বসুর প্রবন্ধটি এই সকল প্রবন্ধের অন্যতম এবং সাধারণের বোধগম্যভাবে সুলিখিত। আমরা এই প্রবন্ধটির অনেকাংশ এই স্থলে পুনর্মুদ্রিত করিতেছি।

সারা ভারতের নবজাগ্রতির প্রাণপুরুষ হলেন রাজা রামমোহন রায়। রামমোহনের জন্ম হয়েছিল ১৭৭২ সালের ২২ মে, মৃত্যু ২৭ সেপ্টেম্বর ১৮৩৩।

নবজাগ্রতির মূল চেতনা হল আপনার যা কিছু ঐতিহ্যগত, তার অনুসন্ধান, মূল্য-উপলব্ধি, চর্চা ও বিকাশের উদ্যম। ইউরোপের নবজাগ্রতি শুরু হয়েছিল ধর্মকে কেন্দ্র করে। প্রচলিত খ্রীস্টধর্মের কুসংস্কার ও মূঢ় প্রথানুগত্যের বিরুদ্ধে মার্টিন লুথার যে প্রবল আন্দোলন শুরু করেছিলেন তার থেকেই নবজাগ্রতির সূত্রপাত হয়েছিল। রামমোহনের আন্দোলনও তেমনি শুরু হয়েছিল ধর্মকে কেন্দ্র করেই: ধর্মের নব মূল্যায়ন, ধর্মের নামে যা কিছু অসত্য যা কিছু কুসংস্কার যা কিছু বর্জনীয় তাকে ত্যাগ করে তিনি সেই সব শাশ্বত বোধ ও বিশ্বাস-গুলির পুনরুদ্ধার করতে চেয়েছিলেন, যা আমাদের আধুনিক জীবন ও মননের উপযোগী এবং আমাদের অগ্রগতির পথে পাথেয় হতে পারে। এজন্য শুধু শাস্ত্র নয় শাস্ত্রের সঙ্গে আমাদের জ্ঞান অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধিকে তিনি সংযুক্ত করতে চেয়েছিলেন:

"আমাদিগের উচিত যে শাস্ত্র এবং বুদ্ধি উভয়ের নির্দ্ধারিত পথের সর্ব্বদা চেষ্টা করি এবং ইহার অবলম্বন করিয়া ইহলোকে পরলোকে কৃতার্থ হই।"

বেদান্তগ্রন্থঃ 'অনুষ্ঠান' পরিচ্ছেদ

প্রকৃতপক্ষে নবজাগ্রতির লক্ষণই হল বুদ্ধির বন্ধনমুক্তি। অন্ধ বিশ্বাস নয় ধর্ম ব্যাপারে ও মুক্ত বুদ্ধি বিচারশক্তির প্রয়োগ। যারা যুক্তিতে দুর্বল তাদের আপ্ত বচন হল "বিশ্বাসে মিলায় বস্তু, তর্কে বহুদূর।" ভারতীয় প্রাচীন ধর্মাচার্যরা কিন্তু এই বিচার-হীন বিশ্বাসের পথ কখনো স্বীকার করেন নি। বরং তাঁদের সাধনা ও প্রয়াস ছিল তর্কের মধ্য দিয়ে সত্যের সন্ধান। বিচারে প্রবলতর যুক্তির কাছে পরাস্ত হলে আপন প্রাচীন মতকে ভ্রান্ত বুঝে ত্যাগ করে নূতন মত গ্রহণ করতে তাঁরা বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ করতেন না। তাই আপন সত্যোপলব্ধির মধ্যে যে ধর্মমতকে যাঁরা অভ্রান্ত বলে বুঝেছেন বিতর্কের মাধ্যমে অন্যান্য প্রচলিত মতকে হারিয়ে হটিয়ে দিয়ে তাকে প্রতিষ্ঠা করা তাঁদের লক্ষ্য ছিল। এই ভাবেই শংকরাচার্য প্রচলিত ধর্মমত ধ্বংস করে আপন মত প্রতিষ্ঠিত করেন; এই ভাবেই ভক্তিবাদী বৈষ্ণব আচার্যরা রামানুজ, নিম্বার্কাচার্য ও চৈতন্যদেবের অনুগামী ষড়গোস্বামী বৈদান্তিক ও অন্যান্য ভক্তিবাদী বিশ্বাসের বিরুদ্ধে আপন আপন মত বিচারের মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠিত করেন। তারও পরে জয়পুরের মহারাজা সওয়াই জয়সিংহের স্বকীয়া মতবাদের বিরুদ্ধে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের আচার্য রাধামোহন ঠাকুরের বিতর্ক যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হয়েছিল। এ সব ছিল ধর্মমতাদর্শসমূহের আপন অস্তিত্ব রক্ষার মৃত্যুপণ লড়াই। সুতরাং অন্তত প্রাচীন মধ্যযুগের ভারতে "যত মত তত পথ" অথবা "সব ধর্ম এক সত্যের সন্ধান দেবে"—এসব কথা বিজ্ঞ ধর্মাচার্যদের কাছে সত্য বলে বিবেচিত ছিল না।

রামমোহনও তাঁদেরই মত আত্মধর্মে বিশ্বাসী

ছিলেন অন্যদের ধর্মে নয়। তাই সকল মতবাদীদের সঙ্গে তর্কে প্রবৃত্ত হয়ে সত্যের সন্ধানে তিনি নিয়ত নিয়োজিত থেকেছেন। তিনি খ্রীষ্টধর্মের 'ট্রিনিটি' বা 'ত্রয়ীদেব'-তত্ত্বকে চরম শ্লেষে বিদ্ধ করেছেন। আকৈশোর একেশ্বরবাদের প্রতিষ্ঠার জন্য আরবী-ফারসী সংস্কৃত-বাংলা ও ইংরাজী ভাষায় পুস্তিকা ও প্রবন্ধাদি প্রচার করেছেন। তিনি পরমতসহিষ্ণু ছিলেন, তুলনা-মূলক ধর্মতত্ত্বের তিনিই এদেশে প্রতিপক্ষকে কখনো তিনি ব্যক্তিগত আক্রমণ করেননি—যদিও বারবার স্বয়ং আক্রান্ত হয়েছেন। এসব সত্ত্বেও তিনি আপন মতের জন্য সংগ্রামে আপোষহীন ছিলেন। ধর্মমতের ক্ষেত্রে সমন্বয়বাদী ছিলেন—একথা কোনোমতেই বলা যাবে না।

আমরা দেখেছি, সকল ধর্মমতের মধ্যেই সত্য রয়েছে এ কথা প্রাচীন ধর্মাচার্যরা বিশ্বাস করতেন না। কিন্তু এ বিশ্বাস যে করেই হোক—অজ্ঞ জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল। এরই প্রাথমিক প্রকল্প দেখা যায় গীতায় শ্রীকৃষ্ণবচনে—'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্। (১১।৪)। দশমহাবিদ্যা প্রভৃতি উপাখ্যান রচনায়, দেবতাবিষয়ক নানা লৌকিক বা গ্রাম্য দেবতার সমন্বয়-সাধনের চেষ্টাও লক্ষ্য হয় যায়। তত্ত্বের গভীরে যাদের যাবার ক্ষমতা নেই সেই সব অজ্ঞ জনসাধারণই মনে করতো সব ধর্ম ভালো, বা সব দেবতার মধ্যে একই ঈশ্বরের কথা বলা হয়েছে।

পরে মধ্যযুগে হিন্দুধর্ম ও ইসলাম ধর্মের যে বিরোধ দেখা দিল—প্রাচীন পদ্ধতিতে বিতর্কের মাধ্যমে তার নিরসনের সম্ভাবনা ছিল না। কেন না এ বিরোধ মুখ্যত রাজনৈতিক। এর থেকেই এদেশে সাম্প্রদায়িক সমস্যার সূত্রপাত। তখন এই সাম্প্রদায়িক সমস্যাকে যারা নির্মূল করতে চেয়েছিলেন তাঁরাই এই জনগণের সমন্বয়বাদী চিন্তাধারাকে বড় করে তোলেন—ধর্মচেতনার বিকাশ হিসাবে নয়—সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান হিসাবে। কবীর, নানক, দাদু, আকবর, দারাশিকোহ—প্রভৃতি এই সমন্বয়বাদী প্রয়াস চালিয়ে গেছেন।—তাঁরা সকলেই এই সাম্প্রদায়িক বিভেদের প্রশ্নকেই বড় করে দেখেছেন; ধর্মের গূঢ় তত্ত্বের বিচারকে উপেক্ষা করে গেছেন। জনগণের পোষকতায়, কিংবা রাজপোষকতায় এইসব নূতন ধর্মাদর্শ প্রচারিত হয়েছে শাস্ত্রজ্ঞানীদের বিচারের পথ এই ভাবে পরিত্যক্ত হয়েছে। কিন্তু এইসব মনীষীদের সৎ উদ্দেশ্য সম্পর্কে শ্রদ্ধা জানিয়েও একথা স্বীকার করতে হবে—এই প্রয়াস পুরোপুরি নিষ্ফল হয়েছে।

রামমোহন ধর্মকে আবেগের উপর নয়, বিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। তিনি জানতেন যা আমাদের ধারণ করে রাখে তাই ধর্ম। সত্যই আমাদের ধারণ করে রাখে। এবং সত্যের নানারূপ হয় না। সত্য এক এবং অপরিবর্তনীয়। বিভিন্ন ধর্মের তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে জাগ্রত বুদ্ধি এই সত্যকে চিনে নিতে পারবে। এবং তখন এই সত্যধর্ম হবে আমাদের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির সহায়, সোপান, জীবন বিকাশের চাবিকাঠি। তিনি দেখাতে চেয়েছিলেন এ ধর্ম মূর্তিপূজা নয়, এ ধর্ম হাঁচি টিকটিকি, টিকি, পৈতে, যাত্রা, অযাত্রা বিচার, খাদ্যাখাদ্যসংস্কার নয়, এ ধর্ম সতীদাহের মত মৃত্যুপ্রদ কোনো যন্ত্রণা হতেই পারে না। যা কিছু যুক্তিহীন, কারণ না দেখিয়ে শুধু পালন করতে নির্দেশ দেয়, তা শুধু জনচিত্তকে ভীরু, জড় কর্মোদ্যোগহীন করে গড়ে তুলতেই সাহায্য করে। জাতির নামে এই বজ্জাতির, ধর্মের নামে এই মূঢ়তার বিরুদ্ধে রামমোহন শাস্ত্রজ্ঞান ও জাগ্রতবুদ্ধি নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন।

প্রথা ও লোকাচারের বিরুদ্ধে এই সংগ্রামে রাম-মোহনের জ্ঞান ও মুক্ত বুদ্ধিই ছিল তাঁর হাতিয়ার। যে জনসাধারণের কল্যাণ মানসে তাঁর এই সংগ্রাম তারা তাঁর পাশে এসে দাঁড়ায়নি। সে যুগের পরিবেশ গণমানসিকতা বিচারে সে প্রত্যাশাও ছিল না। তাই শাস্ত্রই ছিল তাঁর একমাত্র সহায়। আপন বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিতও করতে হয়েছে শাস্ত্রের নজীর তুলে, প্রতিপক্ষের আক্রমণকে প্রতিহতও করতে হয়েছে শাস্ত্রের নজীরের সহায়তায়। যাঁরা তাঁর প্রতিপক্ষ ছিলেন তাঁরা যুক্তি দিয়ে নয়,

সামাজিকভাবে রামমোহনকে একঘরে করে নির্য্যাতনের দ্বারা নিঃসঙ্গ ও হতবল করে দিতে চেয়েছিলেন। সেদিন যে সামান্য ক'জন লোক তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন তাঁদের একটি মাত্র যুক্তি ছিল—রামমোহন শাস্ত্রবিরুদ্ধ কথা একটিও বলেন নি। এই সামান্য-সংখ্যক সাহসী মানুষের সমর্থন রামমোহন কোনোমতেই ছাড়তে পারতেন না তাই কখনোই শাস্ত্রবিরুদ্ধভাবে আপন যুক্তি বা বিচারকে উপস্থিত করতে পারেন নি।

সেদিন শাস্ত্রও দুর্ল'ভ ছিল, শাস্ত্রজ্ঞান দুর্ল'ভতর। সেদিনের তথাকথিত সংস্কৃত পণ্ডিতরা মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের গণ্ডী পেরিয়ে পুরোহিত-দর্পণ পর্যন্ত পৌছাতে পারলেই লোকচক্ষে মহাসম্মানিত বিবেচিত হতেন। রামমোহনকে তাই ব্রাহ্মণদের খপ্পর থেকে এবং সংস্কৃত ভাষার খপ্পর থেকে শাস্ত্রকে উদ্ধার করে বাংলা ভাষার মাধ্যমে সাধারণের হাতে পৌছে দিতে হয়েছিল। রামমোহন যখন ঈশোপনিষদের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন তখন শাস্ত্রজ্ঞ (?) ব্রাহ্মণেরাই কেউ কেউ বলেছিলেন এই নামে কোনো উপনিষদ নেই। এটি রামমোহনের নিজের রচনা। তখন রামমোহনকে এই এই অভিযোগের উত্তরে প্রতিপক্ষের নেতৃস্থানীয় মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকারকেই সাক্ষী মানতে হয়েছিল।

রামমোহন ধর্ম্মসংস্থাপক নন, ধর্মসংস্কারক। তিনি নূতন ধর্ম প্রতিষ্ঠা করেন নি; ধর্ম্মকে সংস্কারমুক্ত করে জীবনমুখী করে নিতে চেয়েছিলেন। তা না হলে ঐ সংস্কারজীর্ণ ধর্মের কোনো মূল্য, কোনো প্রয়োজন থাকত না। যে ধর্ম মানুষকে শুধু যন্ত্রণাই দেয়, আশ্রয় দিতে পারে না মানুষ তাকে জীর্ণ মলিন বস্ত্রের মত ঘৃণার সঙ্গে বর্জন করে যেতো। আজ একথা অস্বীকার করা যাবে না রামমোহনের সংস্কারচেষ্টার পরিণামে হিন্দুধর্ম্মত্যাগের হিড়িক অনতিকাল মধ্যে বন্ধ হয়েছিল।

রামমোহন জানতেন, এই ধর্মসংস্কার ও মনুষ্যত্বের পুনঃপ্রতিষ্ঠায় শিক্ষাই সবচেয়ে বড় শক্তি। এবং সে শিক্ষা ধর্ম্মসংস্কারের সঙ্গে যুক্ত টোল বা মাদ্রাসার শিক্ষা ধর্ম্মনিরপেক্ষ জ্ঞান ও বিজ্ঞানের সঙ্গে যুক্ত ইংরেজি স্কুল কলেজের শিক্ষা। সেইজন্য সে যুগের যাবতীয় শিক্ষাবিস্তারপ্রচেষ্টার সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। তিনি সংস্কৃত ও ফারসী শিক্ষার বদলে ইংরাজীর মাধ্যমে শিক্ষার পোষকতা করেন। এংলো হিন্দু স্কুল ও ডাফ সাহেবের স্কুল (স্কটিস চার্চ কলেজ) প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তাঁর ব্যক্তিগত আগ্রহ ও সহায়তার কথা এ প্রসঙ্গে স্মরণ করতে হবে। হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তাঁর ভূমিকাকে অনেকে ছোট করে দেখতে চান। তা আমরা মনে করিনা কিন্তু সেই বিতর্কের পরিসর এখানে নেই। খ্রীষ্টীয় মিশনারী আলেকজাণ্ডার ডাফকে নিজে বাড়ি দিয়ে স্কুল করে দিয়ে, প্রতিদিন পরিচিত বাড়ির সন্তানদের নিজের ঘোড়ার গাড়ী করে বাড়ি থেকে তুলে স্কুলে এনে এবং স্কুল থেকে বাড়ি পৌছে দিয়ে রামমোহন ঐ স্কুল চালু করে গেলেন। যারা ভয় করতেন, মিশনারীদের শিক্ষায় ছাত্ররা ধর্ম ত্যাগ করবে তাঁদের ভয় ক্রমে ক্রমে ভাঙলো।

যা শ্রেষ্ঠ ধর্ম, বিচারশীল মানুষ তাই গ্রহণ করবে। রামমোহনের বিশ্বাস ছিল সংস্কারমুক্ত হিন্দুধর্ম্ম তথা ব্রাহ্মধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ ধর্ম—সুতরাং শিক্ষাবিস্তারের পরিণাম হিসাবে এই ধর্ম্মই বিশ্বধর্ম্ম হিসাবে পরিগৃহীত হবে। সুতরাং খ্রীষ্টধর্ম্ম, যার আন্তর অসঙ্গতি রামমোহন চমৎকার ভাবে নির্দেশ করেছিলেন, তার সম্পর্কে তাঁর ভয় পাবার কিছু ছিল না।

রামমোহনের ধর্ম্মচেতনার মর্ম্মমূলে মানবতার আদর্শ। মানুষের জন্যই ধর্ম লোকাচার সবকিছু—এ আদর্শ নব জাগৃতির। তাই রামমোহন সমাজের নিষ্ঠুরতম অমানবিক প্রথা সতীদাহের বিরুদ্ধে কঠোর প্রাণান্তিক সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিলেন।

কোনো ক্রোধ বা আবেগ থেকে রামমোহন সতীদাহের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন নি। এর পিছনে ছিল তাঁর প্রশান্ত বিচার ও সংকল্প। চিত্তের এই দৃঢ়তা রামমোহনের চরিত্রধর্ম্ম, বাঙালীসুলভ ভাবালুতা নয়। তাই সতীদাহ-রোধের জন্য কঠোর পরিশ্রমে অজস্র তথ্য

সংগ্রহের শ্রমস্বীকার এবং অসংখ্য শাস্ত্রীয় যুক্তিসংগ্রহে তিনি লিপ্ত হয়েছিলেন। এই মানবতার জন্যই তিনি জাতিবৈষম্য বর্ণবিভেদ অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে শাস্ত্রীয় প্রমাণ সংগ্রহ করেছিলেন।

কিন্তু ধর্মবিষয়ে রামমোহন শুধু সংস্কারকমাত্র ছিলেন না, তাঁর ধর্মচিন্তার মধ্যে একটা সৃজনশীলতার দিকও আছে। তিনি জানতেন আমাদের জাতক্রিয়া, উপনয়ন, বিবাহ, শ্রাদ্ধাদি সর্ববিধ সংস্কার যাবতীয় পূজাপার্বণ লোকাচার উৎসব সবই লৌকিক পৌত্তলিক ধর্মের অনপনেয় স্বাক্ষর বহন করছে। এসব কিছুর উপরেই আধুনিক চিন্তাশীল মানুষের শ্রদ্ধা নেই। তাই এগুলিকে আবার পুনর্গঠন করে নিতে হবে। নেতিমূলক মনোভাব নিয়ে পুরানো সব কিছুকে বর্জন করতে এক শূন্যতার সৃষ্টি হবে মাত্র। শূন্যতায় মানুষের মন ভরবে না। তাই নূতন অনেক কিছু উপাসনাপদ্ধতি লোকাচার উৎসব ইত্যাদি সৃষ্টি করতে হবে।

রামমোহন এই সবই গড়ে তুলেছিলেন। ব্রহ্মোপাসনার জন্য ব্রহ্মসঙ্গীত তিনি নিজে রচনা করেন। রামমোহন নিজে বড় সাহিত্যিক বা কবি কিছুই ছিলেন না। ধর্মের প্রয়োজনেই তাঁর এই পরিশ্রমসাধ্য সাহিত্য-প্রয়াস। রামমোহন রচিত ব্রহ্মসঙ্গীতগুলি ভাবগম্ভীর ও তত্ত্বভারাক্রান্ত। তবু তার প্রয়োজন ছিল। রাগের উপর প্রতিষ্ঠিত এই সব ধ্রুপদাঙ্গের গান যখন পাখোয়াজের সঙ্গে গাওয়া হত তখন উপাসনার উপযোগী এক ভাবাবহ রচিত হত।

মানুষের সঙ্গে মানুষের যে সম্পর্ক এ বিষয়ে কিছুই নির্দেশ ছিল না হিন্দুশাস্ত্রে। হিন্দুশাস্ত্র ethical বা নীতিমূলক নয়। কিন্তু বিভিন্ন ধর্ম ও মতাদর্শের সঙ্গে আমাদের ব্যবহারিক সম্পর্কের মান নির্ধারিত হতে পারে কেবল মাত্র নীতিধর্মের ভিত্তিতেই। নূতন লোকাচারের মতই ভারতবর্ষের হিন্দুসমাজে নূতন নীতিধর্মের প্রতিষ্ঠার ভাবনা একমাত্র রামমোহনের ব্যাপ্ত হৃদয়েই স্থান পেয়েছিল। রামমোহনের ধর্মমতাদর্শকে এদেশের মানুষ গভীর আন্তরিকতার সঙ্গে সেদিন গ্রহণ করেনি। আজ যদিও হিন্দু সমাজে রামমোহনের চিন্তাধারার বিপুল বিজয় সূচিত হয়েছে তবু ধর্মসম্পর্কে আধুনিক মানুষের কৌতূহল ক্ষীণতর হওয়ায় রামমোহনের ধর্মাদর্শের পর্যালোচনাও লুপ্ত হতে চলেছে; তবু যদি তাঁর প্রবর্তিত নীতিধর্মকে এ জাতি গ্রহণ করতো তাহলে অনেক সমস্যার সহজ সমাধান হতে পারতো।

জাতীয়করণ কি বামপন্থীদের মনঃপূত ?

সম্ভবতঃ অনেক ক্যুনিষ্টই কংগ্রেস সরকারের জাতীয়করণের ভিতর সমাজবাদের সারবস্তু দেখিতে পান না। আমরা নিম্নে পাক্ষিক পত্রিকা "লালতারা" হইতে নন কোকিং কয়লা খানগুলির জাতীয় করণ সম্বন্ধে তাঁদের সমালোচনা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

অবশেষে ননকোকিং কোলিয়ারীগুলিকেও ভারত সরকার রাষ্ট্রায়ত্ত করলেন। পূর্বে এ সম্পর্কে নীতি ঘোষণা করা থাকলেও ব্যাপারটি এমন ভাবে ঘটে যাবে তা জনসাধারণ আন্দাজ করতে পারেন নি। কিন্তু বড় বড় খনি মালিকেরা বা শিল্পপতিরা এ ব্যাপারটি জানতেন না বা আঁচ করতে পারেন নি বলে নেকী সুরে যে কাঁদছেন তা মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। যেখানে 'একান্ত গোপনীয়' পলিসী মায় বাজেট পর্যন্ত তারা আগে থাকেই জেনে যান, সেখানে এ খবরটি একেবারেই পান নি এমন কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। বিশেষ করে যে রাত্রে অর্ডিন্যান্স ঘোষণা করা হোল, সেদিন সকালেই বিহারের এক ইংরাজী সংবাদপত্রে (আশা করা যায় অন্য কোন কোন কাগজেও) এই সংক্রান্ত খবর ছিল। এই কাগজের প্রথম পাতায় প্রথম হেডিংই ছিল রাষ্ট্রায়ত্তের সম্ভাবনা প্রসঙ্গে; সুতরাং ব্যাপারটি অন্তত. ইণ্ডিয়ান চেম্বারস অব কমার্সের অজ্ঞাত ছিল না মোটেই।

এই অর্ডিন্যান্স জারী হবার সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেস ও সি. পি আই সমেত তার অন্যান্য সহযোগীরা এই বলে দুহাত তুলে নাচতে শুরু করে দিয়েছে যে "সমাজতন্ত্র এসে গেল আর কি" সারা ভারত ট্রেডইউনিয়ন কংগ্রেসের ২৯তম সম্মেলনে ডাঙ্গে সাহেব তো বলেই ফেললেন যে '১৯৭০ সালেই সমস্ত একচেটিয়া কারবার

খতম হবে'। সুতরাং মধুবনে মহাযজ্ঞের মত টাটা বিড়লারা নিজেদের বাঁচাতে শান্তি স্বস্ত্যয়ণ করতে লেগে যাক্। এখন কেবল রাম-রহিমের দল তাকিয়ে দেখুক কোন ঘোড়া আগে ছোটে, প্রিয়দাস মুন্সী না ডাঙ্গে সাহেব। অন্যদিকে সি. পি. এম প্রভৃতিরাও এই প্রগতিশীল অর্ডিন্যান্সকে অভিনন্দন জানিয়ে প্রমাণ করতে চাইছেন ইন্দিরা সরকার প্রকৃতই 'অর্দ্ধ ফ্যাসিষ্ট'; অবশিষ্টার্দ্ধ উদারনৈতিক, গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল। এই ইন্দিরা সরকারেরই প্রতিটি কার্য্যক্রমকে একদিকে নীতিগতভাবে সমর্থন করে (যেমন রাষ্ট্রপতি নির্বাচন, রাজন্যভাতা বিলোপ, ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ, বাংলাদেশ বিজয়, জেনারেল ইন্স্যুরেন্স, কোক কয়লা ও বর্তমানে নন-কোক কয়লা শিল্পগুলি জাতীয়করণ ইত্যাদি) তারা জনগণকে নিজেদের বিরুদ্ধেই ঠেলে দিচ্ছেন, আবার পরক্ষণেই অপরদিকে এই কার্যক্রমগুলির প্রয়োগগত দিকগুলিকে সমালোচনা করে বিরোধী সাজতে চাইছেন 'আমি জলে নামবো/জল ঘাটব/উথারি পাথারি সাঁতার কাটিব/তবু আমি বেণী ভিজাব না।'

আমরা জাতীয়করণের মূল প্রশ্নটিকে নিয়ে বর্তমানে আলোচনা করছি না—কারণ ইতিপূর্বে এই সংক্রান্ত বিষয়ে আমরা কয়েকবার আমাদের বক্তব্য সুস্পষ্টভাবে রেখেছি। অন্যান্যবারের মতই এবারও এই জাতীয়করণ সরকার করেছে দেশের স্বার্থে নয়, জনগণের স্বার্থে নয়, বৃহৎ বুর্জোয়াদের স্বার্থে। এর ফলে আমলাতান্ত্রিক পুঁজি জোরদার হবে। গোষ্ঠীস্বার্থ চরিতার্থ হবে, কয়লার দাম বাড়বে ও সাথে সাথে মজুর আন্দোলনকে দমাবার সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা বৃদ্ধি পাবে।

সরকার এই নীতি গ্রহণ করবার সময় নিজেই ঘোষণা করেছেন যে খনি মালিকেরা কয়লার মত গুরুত্বপূর্ণ সম্পদকে নষ্ট করেছে, উৎপাদন বাড়াচ্ছে না এবং খনি শ্রমিকদের উপর নিদারুণ শোষণ চালাচ্ছে। আমাদের প্রশ্ন, সরকার যেখানে সুষ্ঠুভাবে কয়লা উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন, সেখানে নিজ পরিচালনায় কি করে সফল হবেন? অন্য দিকে ভারত সরকারের পরিচালিত 'জাতীয় কয়লা উন্নয়ন কর্পোরেশনের' (N.C.D.C.) ব্যর্থতা তাদের গুণাগুণকেই প্রতিফলিত করছে। একথা খুবই ঠিক যে এই সমস্ত কয়লাখনি মালিকেরা নিজেদের মুনাফার থলি বাড়াবার জন্য ব্যাপকভাবে জাতীয় সম্পত্তিকে নষ্ট করছে বেহিসাবী ও অবৈজ্ঞানিক প্রথায় কাজ চালাবার নামে বহু খনি বছরের পর বছর আগুন জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে; কিন্তু এমন ঘটনা তো এন, সি, ডি, সি নিয়ন্ত্রিত খনিগুলির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এটা একান্ত সত্য যে মজুরদের উপর ভয়াবহ অত্যাচার চালাচ্ছে এই খনি মালিকেরা; কিন্তু এন, সি, ডি, সি-ও কি এক্ষেত্রে আদর্শ মালিক (Model Employer)? সমস্ত এন, সি, ডি, সি যে ঘুষ, দুর্নীতি, চুরি আর স্বজন পোষণের সংগঠন—একথা প্রত্যেকেরই জানা। অন্যান্য রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পগুলির মতই এন, সি, ডি, সি-ও এর থেকে মুক্ত নেই এটা একান্তই সত্যি। ভারত সরকার কি জানে না যে বছরের পর বছর এই ব্যক্তিগত খনিগুলিতে স্থায়ীভাবে কাজ করেও বহু শ্রমিকের নাম হাজিরা খাতায় ওঠে না, কন্ট্রাক্ট পদ্ধতিতে কাজ করার জন্য বহু শ্রমিক আইনতঃ কন্ট্রাক্টরের শ্রমিক। আজ হঠাৎ পূর্ব ব্যবস্থা গ্রহণ না করেই জাতীয়করণ করার মধ্য দিয়ে সেই সব হাজার শ্রমিক ছাঁটাই হয়ে গেল। মালিকদের যে দুর্নীতির কথা সরকার ঘোষণা করেছেন সেই দুর্নীতির শিকারে পরিণত হল সরল অশিক্ষিত শ্রমিকরা! এদের ত্রাণের রাস্তা কি জাতীয়করণের সমর্থকদের জানা আছে?

ওড়িশায় নন্দিনী শতপথীর শাসন শেষ

"দেশ" সাপ্তাহিকে শ্রীনবারুণ গুপ্ত লিখিয়াছেন:

চন্দ্রজিৎ যাদব বা উমাশঙ্কর দীক্ষিত যাই বলুন সবাই ওড়িশার মন্ত্রিসভা যে কোনদিন ভেঙ্গে পড়তে পারে। শেষ পর্যন্ত তাই হল। নন্দিনী শতপথীর মন্ত্রিসভার পতন ঘটল।

রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা যেভাবে ভেবেছিলেন এই পতন এসেছেও সেই-ভাবেই। সবাই বলেছিলেন, যে কোনদিন নীলমণি রাউতরায় ও তাঁর সমর্থকরা সরে দাঁড়াতে পারেন। হলও তাই। তবে এটা অনেকেই

ভাবতে পারেনি যে নীলমণিবাবুর সঙ্গে এত এম এল এ সরে দাঁড়াবেন। অনেকেই বলেছিলেন, বড়জোর দশ পনেরো জন যাবেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল প্রায় পাঁচশজন সরে দাঁড়ালেন।

এই দলত্যাগ তিনটে জিনিষ প্রমাণ করল।

প্রথমত প্রমাণ করল যে আমাদের দেশের জনপ্রতিনিধিরা অনেকে এখনও কেনারাম বেচারাম বা আয়ারাম গয়ারাম এবং আমাদের নেতারা যিনি যতই গণতন্ত্র বা গণতান্ত্রিক রীতিনীতির কথা বলুন না কেন এই আয়ারাম গয়ারামদের নিয়ে খেলতে বা এদের মাধ্যমে নিজ নিজ রাজনীতিক স্বার্থসিদ্ধি করতে পরম আগ্রহী। এ জিনিষ নন্দিনী শতপথীও করেছিলেন। এ জিনিষ বিজু পট্টনায়ক হরেকৃষ্ণ মহতাব আর সি এস সিংদেও জোটও করলেন।

দ্বিতীয়ত প্রমাণ করল যে, নন্দিনী শতপথীর একটা বিশেষ ক্ষমতা আছে বহু লোককে চটিয়ে দেওয়ার—শত্রু পক্ষকে শক্তিশালী হওয়ার সুযোগ দেওয়ার। নন্দিনী শতপথী যখন কেন্দ্রে মন্ত্রী তখন তিনি নিজে দেখেছিলেন কীভাবে বিরোধীপক্ষকে নানা কৌশলে বিভক্ত করে এবং নিজ পক্ষে নানা লোককে নিয়ে এসে এক জটিল পরিস্থিতির মধ্যে ইন্দিরা গান্ধী তার দলের বা গোষ্ঠীর শক্তি বাড়িয়েছিলেন এবং আত্মরক্ষা করে নন্দিনী দেবীর সে শিক্ষা কোন কাজে লেগেছে বলে মনে হয় না। হলে তিনি আত্মরক্ষা করতে পারতেন। হলে তিনি আর যাই করুন বিজুবাবু হরেকৃষ্ণবাবু এবং আর এন সিংদেওকে এক জোট হওয়ার সুযোগ করে দিতেন না। হলে তাঁর দলের এত এম এল এ একসঙ্গে দলত্যাগ করতেন না।

তৃতীয়ত প্রমাণ করল যে, বিজুবাবু হরেকৃষ্ণবাবু এবং আর এন সিংদেও জোট ওড়িশার রাজনীতিতে এখনও কত শক্তিশালী। মন্ত্রিসভার পতন ঘটাবার ব্যাপারে এই জোট তাঁদের শক্তি ও সাফল্য নিঃসংশয়ে প্রমাণ করেছেন। এরপর দেখার, নির্বাচনেও এঁর এই শক্তি দেখাতে পারেন কিনা।

একবার সরকার গঠন করতে হলে অবশ্য এদের পক্ষে এক থাকা কঠিন হত। আদর্শগত পর্যায়ে বিজুবাবু হরেকৃষ্ণবাবু এবং আর এন সিংদেও খুব বেশী ভিন্ন পথের পথিক না। হলেও এঁদের দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রচুর ফারাক। সিংদেও ধীর স্থির, বিজুবাবু অস্থির এবং চঞ্চল। তার উপর তো আছে ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত স্বার্থের সংঘাত। পাঁচ বছর একসঙ্গে চলা বা পাঁচ বছর সংখ্যাগরিষ্ঠতা বজায় রাখা এদের পক্ষেও কঠিন হতো। কিন্তু বিরোধী পক্ষ থেকে হয়তো দেড় দুবছর এঁরা ঐক্যটা বজায় রেখে দিতে পারতেন—যদিও সেটা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। ওড়িশার রাজনীতিতে এই তিন জন যতবার এক হয়েছেন এবং পরস্পরের ঘোরতর শত্রু হয়েছেন তত আর কেউ হননি।

নন্দিনী শতপথী প্রধানমন্ত্রীকেও নানাভাবে বিপদে ফেলেছেন।

প্রথমে বিপদে ফেলেছেন একেবারে শেষ মুহূর্তে পদত্যাগ করে। যেভাবে ও যে অবস্থায় তিনি পদত্যাগ করেছেন তাতে বিতর্কের যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে যে, পদত্যাগ যখন করলেন এবং রাজ্যপালকে যখন বিধান সভা ভেঙ্গে দেওয়ার পরামর্শ দিলেন তখন তাঁর গরিষ্ঠতা ছিল কিনা।

রীতি হল সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারালে রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শ গ্রহণ করবেন না। নিয়ম হল, তখন যিনি বা যাঁরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা দেখাতে পারবেন রাজ্যপাল তাঁদেরই সরকার গঠনের সুযোগ দেবেন।

অবশ্য এমন কোন আইন নেই। আইনের বিধান হল এ ব্যাপারে রাজ্যপালই সর্বময় কর্তা। তাঁর বিচারই চূড়ান্ত। তিনি যদি মনে করেন যে এই অবস্থায় কেউই স্থায়ী মন্ত্রীসভা গঠন করতে পারবেন না। তাহলে বিধানসভা ভেঙ্গে দিতে পারেন। আইনত এই বিচারে তিনি বিধানসভা ভেঙ্গে দিলে কেউ তা আটকাতেও পারেন না।

প্রবাসী' মাসিক সংবাদপত্রের স্বত্বাধিকার ও অন্যান্য বিশেষ বিবরণ প্রতি বৎসর ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ তারিখের পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশিতব্য :

(ফরম নং ৪)

(রুল নং ৮ দ্রষ্টব্য)

১। প্রকাশিত হওয়ার স্থান—	কলিকাতা (পশ্চিমবঙ্গ)
২। কিভাবে প্রকাশিত হয়—	প্রতি মাসে একবার
৩। মুদ্রাকরের নাম—	শ্রীশমীন্দ্রনাথ সরকার
জাতি	ভারতীয়
ঠিকানা	৭৭।২।১, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩
৪। প্রকাশকের নাম	ঐ
জাতি	ঐ
ঠিকানা	ঐ
৫। সম্পাদকের নাম	শ্রী অশোক চট্টোপাধ্যায়
জাতি	ভারতীয়
ঠিকানা	৩এ, এলবার্ট রোড, কলিকাতা-১৬
৬। (ক) পত্রিকার স্বত্বাধিকারীর নাম ঠিকানা এবং (খ) সর্বমোট মূলধনের শতকরা এক টাকায় অধিক অংশের অধিকারী-দের নাম-ঠিকানা—	১। শ্রীমতী রমা চট্টোপাধ্যায় ১, উড ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৬ ২। শ্রীমতী ঈশিতা দত্ত ১, উড ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৬ ৩। শ্রীমতী সুনন্দা দাস ১, উড ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৬ ৪। শ্রীমতী নন্দিতা সেন ১, উড ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৬ ৫। শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায় ৩এ, এলবার্ট রোড, কলিকাতা-১৬ ৬। শ্রীমতী কমলা চট্টোপাধ্যায় ৩এ, এলবার্ট রোড, কলিকাতা-১৬ ৭। শ্রীমতী রত্না চট্টোপাধ্যায় ৩এ, এলবার্ট রোড, কলিকাতা-১৬ ৮। শ্রীমতী অলকানন্দা মিত্র ৩এ, এলবার্ট রোড, কলিকাতা-১৬ ৯। শ্রীমতী লক্ষ্মী চট্টোপাধ্যায় ৩এ, এলবার্ট রোড কলিকাতা-১৬

আমি, প্রবাসী মাসিক সংবাদপত্রের প্রকাশক, এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, উপরি-লিখিত সব বিবরণ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

তারিখ—

প্রকাশকের সহি—স্বাঃ শ্রীশমীন্দ্রনাথ সরকার